163081

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
★ CALCUTTA ★

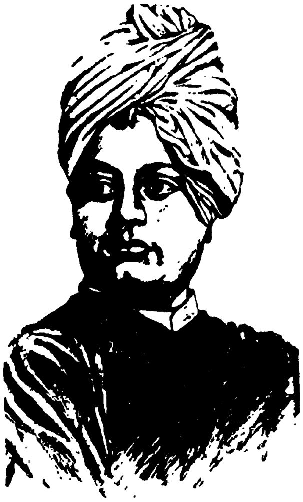

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

৯১তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯৫ হইতে পৌষ, ১৩৯৬ ; ইংরেজী : ১৯৮৯)

সম্পাদক

স্বামী নির্জরানন্দ (ফাল্গুন, ১৩৯৫ পর্যন্ত)
স্বামী সত্যব্রতানন্দ (চৈত্র, ১৩৯৫ হইতে)

RMIC LIBRARY
Acc. No. 163081
Class No. 205/ UDB
Date 30.10.91
St. Card
Class. ✓
Cat. ✓
Bk. Card
Checked

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : ছত্রিশ টাকা ☐ সডাক : বিয়াল্লিশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা : পাঁচ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৯১তম বর্ষ

(মাঘ ১৩৯৫ হইতে পৌষ ১৩৯৬)

অচিন্ত্য বিশ্বাস	(কবিতা)…	দ্বিতীয় প্রমিথিউস	৫১৪
স্বামী অচ্যুতানন্দ	(পরিক্রমা)…	উত্তরকাশীর নচিকেতা-তাল	৫৫২
	(কবিতা)…	রাসরসতাণ্ডবী	৭০৫
অজন্তা গুপ্ত	(প্রবন্ধ)…	গুরু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	… ৩২২
অজিতকুমার মাইতি	(পরিক্রমা)…	যমুনোত্রীর পথে	… ১৫৬
স্বামী অজিতাত্মানন্দ	(প্রবন্ধ)…	আচার্য শঙ্করের কর্ম-ভক্তিময় জীবন	… ১৮৫
অনিলবরণ রায়	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণ ও জ্ঞানতত্ত্ব	… ১২৯
অনিলেন্দু ভট্টাচার্য	(কবিতা)…	পাদদেশে অপেক্ষায়	… ৫১৬
অভী সেনগুপ্ত	(কবিতা)…	চার স্তবক	… ২৫৩
অমল সরকার	(কবিতা)…	বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে	… ১৫
অমিতাভ দাশগুপ্ত	(কবিতা)…	মানুষের জন্য	… ২৫২
স্বামী অম্বিকানন্দ	(স্মৃতিকথা)…	স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতিকথা	… ৩৩৪
অরুণকুমার দত্ত	(কবিতা)…	মমি	… ৭০৫
	(কবিতা)…	হতেই পারে	… ৭৬২
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	প্রাক্ ইসলামীয় যুগে ইরান	… ৩৪১
আনন্দ বাগচী	(বিশেষ-নিবন্ধ)…	অসময়ের ভাবনা	… ২০০
আশাপূর্ণা দেবী	(প্রবন্ধ)…	রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিকতা	… ২৮৫
ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়	(কবিতা)…	উপলব্ধি	… ৮০
উদয়কুমার চক্রবর্তী	(প্রবন্ধ)…	বাংলাভাষাঃ স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য	… ২৫
	(প্রবন্ধ)…	কলকাতার ভাষা	… ৪৭৬
	(প্রবন্ধ)…	বাঙলা সাহিত্যে গঙ্গা	… ৫৮৭
উমাপদ নাথ	(কবিতা)…	জীবন্ত ঈশ্বর	… ১৩৭
কঙ্কাবতী মিত্র	(কবিতা)…	কিছু দিতে চাই	… ২৫৩
	(কবিতা)…	এক টুকরো আলোর সামনে	… ৫১৩
কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	(অনুধ্যান)…	শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং আমরা	… ২৪৫
কবিতা সিংহ	(ধারাবাহিক-নিবন্ধ)…	কবি সারদা	… ১৩১, ২১৬
কমলা সেন	(যৎকিঞ্চিৎ)…	এই তো আলো—এই তো আলো	… ৬৬৭
কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)…	বিবেকানন্দ : একটি সনেট	… ১৪
	(কবিতা)…	আলোকতৃষ্ণা	… ২৫৩
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)…	বড় সাধ	… ১৯৬
	(কবিতা)…	নীল আকাশ	… ৫১১
স্বামী কাশীশ্বরানন্দ	(স্মৃতিকথা)	পুণ্যস্মৃতি	… ৬৬৪, ৭১০
কেশবচন্দ্র নাগ	(স্মৃতিকথা)…	কেমনে ভুলি করুণা তাঁর	৭৭২
ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল	(প্রবন্ধ)…	স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারীসমাজ	৩৬৮
স্বামী গম্ভীরানন্দ	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান	… ৬৫
স্বামী গীতানন্দ	(প্রবন্ধ)…	মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ-লীলা	… ৮৭
গোপেশানন্দ	(যৎকিঞ্চিৎ)…	শিক্ষা ও সত্য	… ১৬৬
	(রম্য রচনা)…	দুন্দুম	… ৬০১

চণ্ডী সেনগুপ্ত	(কবিতা)…	ক্ষমাসুন্দর	… ১৩৭
চন্দনা সরকার	(কবিতা)…	অমৃতের পুত্র	… ১৪
চন্দ্রনাথ সরকার	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	অ্যালার্জী	… ২৯২
স্বামী চেতনানন্দ	(প্রবন্ধ)…	'রামকৃষ্ণ' একটি নাম ও নামসাধনা	… ৫১৭
জয়নাল আবেদীন	(কবিতা)…	প্রভু, আমায় টানো	… ৮০
	(কবিতা)…	সাঁকো	… ৫০৯
জয়ন্ত বসুচৌধুরী	(কবিতা)…	বিপরীত গতি	… ৩২০
জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	শ্রীশ্রীমা ও কলকাতা	… ৪৪৯
জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নারী	… ২৪৭
জলধিকুমার সরকার	(পর্যালোচনা)…	শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত ভাষা	… ২১৩
জীবন মুখোপাধ্যায়	(ধারাবাহিক-প্রবন্ধ)…	প্রাচীন ভারতে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা	… ৩৮৩, ৬৫০, ৭০০
	(প্রবন্ধ)…	বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা	… ৬০৩
জ্যোতিভূষণ চাকী	(কবিতা)…	কথামৃত	… ৮৯
জ্যোৎস্না রায়চৌধুরী	(পরিক্রমা)…	দেবীতীর্থ কামাখ্যা	… ৩৪৮
তরুণ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)…	মাস্তুলের পাখি	… ৮০
তরুণ সান্যাল	(কবিতা)…	আনন্দ আর আনন্দ	… ১৬
	(কবিতা)…	বিবেকানন্দ	… ২৫২
	(প্রবন্ধ)…	ফরাসী বিপ্লবের দুশো বছর	… ৫৯২
তাপস বসু	(প্রবন্ধ)…	বিবেকানন্দ-মূল্যায়নের সাম্প্রতিক ধারা	… ৯৭
	(প্রবন্ধ)…	বিবেকানন্দঃ 'এই কলকাতারই ছেলে'	… ৪৪৫
	(প্রবন্ধ)…	রামপ্রসাদের গানে আর্থসামাজিক ভাবনা	… ৫৪৭
তারকনাথ ঘোষ	(প্রবন্ধ)…	আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামকৃষ্ণ	… ১৮৭
	(প্রবন্ধ)…	অবতরণের পটভূমিকা	… ৫৫৬
দিগম্বর দাশগুপ্ত	(কবিতা)…	ভারত-আত্মজা নিবেদিতা	… ৬৪০
দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	দক্ষিণবঙ্গের একটি প্রাচীন দুর্গাপূজা	… ৫০০
দিলীপকুমার দত্ত	(পরিক্রমা)…	দেবীতীর্থ জ্বালামুখীর পথে	… ৭৮৯
দীপ্তিকুমার শীল	(কবিতা)…	শ্রীরামকৃষ্ণঃ এক বিপ্লবের নাম	… ৮৯
দুর্গাদাস গোস্বামী	(কবিতা)…	শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তিঃ	… ৭৭
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)…	আমাকে শোধন করে	… ৬৪০
দেবিদাস বসু ও জলধিকুমার সরকার	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কালে কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চা	… ৬১০
দেবী রায়	(কবিতা)…	চল, মরণের পরপারে	… ১৩৮
	(কবিতা)…	বিবেকানন্দ	… ৫১১
ধীমান বড়ুয়া	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	কলেরা ও অন্যান্য উদরাময় রোগ সম্বন্ধে নতুন চিন্তা-ভাবনা	… ৬১৪
স্বামী ধীরেশানন্দ	(ধারাবাহিক-সঙ্কলন)…	সৎসঙ্গ-রত্নাবলী	২৬৯, ৩৩৭, ৩৯০, ৬৫৫, ৭৪৯, ৭৭০

ধ্রুব মার্জিত	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞান-মানসিকতা	… ৬৩৩
নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)…	বিবেকানন্দ-দর্শনম্	… ১৩
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণ-সমসাময়িক কলকাতার থিয়েটার	৪৭২
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)…	মহাকালের ডাক	… ১৫
	(কবিতা)…	কলকাতা	… ৪৫৬
	(কবিতা)…	যাওয়া নেই আসা নেই	… ৫১৬
নিভা দে	(কবিতা)…	শুধু খুঁজে ফেরা	… ৫১৩
নিমাই মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)…	বেদনার রঙ বদলায়	… ৩৮২
	(কবিতা)…	তিনশো বছর ধরে তুমি	… ৪৫৭
	(কবিতা)…	সব পেয়ে গেছি	… ৫১৬
নির্মলকুমার রায়	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে হাস্যগীতি	… ৭৪
	(প্রবন্ধ)…	পুরনো কলকাতার পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ	… ৪৩৮
	(প্রবন্ধ)…	দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ	… ৫০২
নিশীথরঞ্জন রায়	(প্রবন্ধ)…	রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা	… ৪২৬
স্বামী পরাশরানন্দ	(প্রবন্ধ)…	দুটি বিচার ও একটি তত্ত্ব	… ১১১
পলাশ মিত্র	(কবিতা)…	কন্যাকুমারীর শিলায়	… ১৪
	(সঙ্কলন)…	কলকাতা : কাব্য, কবিতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনে	… ৪৫৮
	(কবিতা)…	বেদনা ও প্রার্থনা	… ৫১২
	(প্রবন্ধ)…	কবিশেখর কালিদাস রায় : তুলসীমঞ্চের সন্ধ্যাপ্রদীপ	… ৭০০
স্বামী পুরাণানন্দ	(প্রবন্ধ)…	রামচরিতমানস অনুসারে রামচন্দ্রের বনবাসে ভরতের দুঃখ	… ৫৬১
পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	ভূমিকম্পের পূর্বাভাস : বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার কয়েকটি দিক	… ২৩২
পূর্বা সেনগুপ্ত	(প্রবন্ধ)…	স্বামী বিবেকানন্দ : এক নতুন অস্তিবাদের প্রবক্তা	… ১৪৫
প্রণবরঞ্জন ঘোষ	(কবিতা)…	দেড়শো বছর পারে	… ১১৬
	(গল্প)…	স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর একটি গল্প	… ৫৩৯
প্রণবেশ চক্রবর্তী	(প্রবন্ধ)…	রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে নেহরু পরিবার	… ৫৭৯
প্রদোষকুমার পাল	(কবিতা)…	যে সয় সে রয়	… ১৩৮
প্রবীর মিত্র	(কবিতা)…	জাগরণ	… ৫০৯
প্রভাতকুমার দাস	(প্রবন্ধ)…	যাত্রাগানের শহর কলকাতা	… ৭১৫
স্বামী প্রভানন্দ	(প্রবন্ধ)…	রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে বরাহনগর মঠের ভূমিকা	… ৫৬৭
প্রমোদ বসু	(কবিতা)…	সন্ন্যাসী প্রেমিক	… ২৫৪
প্রশান্তকুমার পণ্ডিত	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	মাসরুম চাষের সহজ পদ্ধতি	… ৭৯১

প্রিয়ব্রত ঘোষ	(যৎকিঞ্চিৎ)…	ধর্ম ও নৈতিকতা	… ৭৭৯
বলরাম মণ্ডল	(প্রবন্ধ)…	রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের আলোকে প্রাচীন ভারতের দেশরক্ষা-নীতি	… ৭৮৬
বাণী মার্জিত	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	মানব-স্নায়ুতন্ত্র ঃ যোগ ও শারীরবিজ্ঞানের আলোকে	… ৭৩৫
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	(সঙ্গ-প্রসঙ্গ)…	শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ	… ৪৮৫
স্বামী বিদেহাত্মানন্দ	(স্মৃতি-সন্দর্ভ)…	মারাঠী সাহিত্যিক মামা ওয়ারেরকর ও তাঁর 'বিবেকানন্দ-স্মৃতি'	… ৫৩৩
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	অবিস্মরণীয় উদ্বোধন	… ৪৬
	(বিশেষ-নিবন্ধ)…	উদ্বোধন-কে অভিনন্দন	… ২০০
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	বিবেকানন্দের নান্দনিক ভাবনা	… ৬৩৫
স্বামী বিমলাত্মানন্দ	(প্রবন্ধ)…	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাতীর্থ কলকাতা	… ৪৩২
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	অন্তর্দৃষ্টির কবি হপকিনজ	… ৫৭৮
বিশ্বনাথ ভড়	(পরিক্রমা)…	কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন	… ৪০৫
বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী	(কবিতা)…	আমি শুধু চেয়েছিলেম	… ৫১০
বীরেশ্বর পাল	(পরিক্রমা)…	মণিমহেশ	… ২৭১
	(পরিক্রমা)…	স্বর্গারোহণী	৬৫৯, ৭২০
ব্রত চক্রবর্তী	(কবিতা)…	সাঁকো পেরিয়ে	… ২৫৪
	(কবিতা)…	কয়েক টুকরো	… ৫১২
স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ	(কবিতা)…	তোমারেই যেন পাই	… ৩২১
	(প্রবন্ধ)…	সত্যিকারের মা	… ৭৫৩
ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	অল্পবয়সী ডায়াবেটিস রোগী	… ১৭১
স্বামী ভূতেশানন্দ	(প্রবন্ধ)…	স্বামী বিবেকানন্দ এবং আজকের যুবসমাজ	… ৫
	(প্রবন্ধ)…	আজকের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা	… ১২৫
	(ভাষণ)…	শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান	… ৩০৫
	(ভাষণ)…	দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়	… ৪৯০
ভূপেন্দ্রনাথ শীল	(কবিতা)…	সন্ধানী	… ৩৮২
স্বামী ভৈরবানন্দ	(যৎকিঞ্চিৎ)…	'মানবসম্পদ'	… ২৮০
মণিকা চক্রবর্তী	(কবিতা)…	তুমি	… ১৩৮
মণিময় গুপ্ত	(কবিতা)…	কর মাগো লয়	… ৫১০
	(কবিতা)…	উৎসর্গ	… ৭০৫
মদনমোহন মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)…	ব্রহ্মানন্দ লহ প্রণাম	… ১৬
মধুসূদন পাল	(কবিতা)…	মা, তোমাকে	… ৫১৬
	(কবিতা)…	সেই মানবী	… ৭৬২
মমতা রায়	(প্রবন্ধ)…	সমন্বয়চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ	… ৬৯
মানস দাস	(কবিতা)…	কণামাত্র দাও	… ১৩৭
	(কবিতা)…	অনুভবে মা সারদা	… ৭৬২
মানসী বরাট	(কবিতা)…	এ নহে নয়নের ভুল	… ৪৫৬

মানসী মজুমদার	(কবিতা)…	আবার দেখাও পথ	… ২৫৪
মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য	(ক্রীড়া-সমীক্ষা)…	উপেক্ষিত কবাডি ও বাংলার মেয়ে	… ৬৭০
স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ	(প্রবন্ধ)…	ধর্মসাধনায় এক নতুন আদর্শের দিশারী স্বামীজী	… ১৪২
	(পরিক্রমা)…	কুম্ভযাত্রীর ডায়েরী	… ২১৯
	(প্রবন্ধ)…	শান্তির দিশারী শ্রীমা সারদা দেবী	… ৬৯৬
মেরী লুই বার্ক	(সাক্ষাৎকার)…	স্বামীজীর আদর্শই পারে এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিতে	… ৫৫
মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়	(কবিতা)…	পরম প্রাপ্তি	… ৩২০
রতনকুমার নাথ	(কবিতা)…	পরশমণি	… ৫১৩
রবার্ট পার্কার এবং বিনোদ কুরিয়ান	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	প্রকৃতির আজব খনিজদ্রব্য—হীরক	… ৪১২
রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী	(আয়ুর্বেদ-নিবন্ধ)…	নেত্রস্বাস্থ্য	… ১১২
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	(কবিতা)…	কাছে আর দূরে	… ১৩৭
	(কবিতা)…	রূপ ও রূপান্তর	… ৪৫৭
লাউয়েল পন্তে	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা	… ৩৪৬
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	(কবিতা)…	নবীন তপস্বী তুমি	… ২৫২
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)…	পথ	… ১৫
	(কবিতা)…	দেখা	… ২৫৩
	(কবিতা)…	সঙ্গে আছি	… ৪৫৬
	(কবিতা)…	রাজার রাজা	… ৫১১
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	(প্রবন্ধ)…	স্বামী বিবেকানন্দ: জওহরলাল নেহরুর দৃষ্টিতে	… ৯
	(প্রবন্ধ)…	প্লেগের কলকাতায় নিবেদিতা	… ৪৫১
শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)…	মানুষ কেন নেশা করে	… ৬৭৩
শান্তশীল দাশ	(কবিতা)…	এস তুমি সহজ সাজে	… ৩২১
	(কবিতা)…	সর্ব সমর্পণ	… ৫১৩
শান্তিকুমার ঘোষ	(কবিতা)…	আর আমি মিশে যাই	… ৫১৪
শান্তিময়ী ঘোষ	(স্মৃতিকথা)…	পুণ্যস্মৃতি	… ২১৮
শিখরেশ চক্রবর্তী	(কবিতা)…	হেরে গেছ আমার কাছে	… ৩২১
শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	কামারপুকুরের পুণ্য ভূমিখণ্ড এবং সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা	… ৭৫৫
শেখ সদরউদ্দীন	(কবিতা)…	মায়ের সোনার বরণ দেখি	… ৫০৯
	(কবিতা)…	অন্ধকারে আলো জ্বেলে	… ৬৪০
শ্যামলকান্তি দাস	(কবিতা)…	তোমার আলো	… ২৫৩
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	(প্রবন্ধ)…	মাতা জগদ্ধাত্রী	… ৬৯৩
সংযুক্তা মিত্র	(কবিতা)…	প্রার্থনা	… ৮০
	(কবিতা)…	প্রত্যয়	… ৫১৪
সচ্চিদানন্দ ধর	(কবিতা)…	আত্মদীপ দাও জ্বেলে	… ১৯৬
স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ	(স্মৃতিকথা)…	মহারাজের স্মৃতি	… ১৫০
সন্তোষকুমার অধিকারী	(কবিতা)…	যেটুকু জীবন	… ৫১৫

সন্তোষকুমার মাজী	(কবিতা)…	মুছে যায় জলছবি	… ৩৮২
সন্দীপন বিশ্বাস	(কবিতা)…	শুধু মানুষই পারে	… ১৯৬
সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	(প্রবন্ধ)…	ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম-ভাবনার প্রতিরূপ	… ১৬২
সমরেশ মণ্ডল	(কবিতা)…	আলোক-সরণি	… ৩৮২
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)…	অশেষ পুরুষ	… ৫১১
	(প্রবন্ধ)…	পরিবেশ সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ	… ৩৩৯
স্বামী সম্ভবানন্দ	(স্মৃতিকথা)…	স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সান্নিধ্যে	… ২৫৫
স্বামী সর্বগানন্দ	(প্রবন্ধ)…	ছন্দ, সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক জীবন	… ২৬১
স্বামী সর্বাত্মানন্দ	(দেশান্তরের পত্র)…	শিকাগো দেখে এলাম	… ৬১৪
সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ	… ৭০৬
সুজাতা সেন	(প্রবন্ধ)…	অনন্যা, অপরূপা সারদা	… ৭৫৭
সুদীপ বসু	(বিশেষ-নিবন্ধ)…	উদ্বোধন-এর নব্বই বছরে পদার্পণঃ সমকালীন পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতে	… ২০৩
সুধাংশু দাম	(কবিতা)…	বেদুইন	… ৬৪০
সুধাংশুভূষণ নায়ক	(কবিতা)…	দক্ষিণেশ্বর	… ৮১
সুব্রত রুদ্র	(কবিতা)…	কালীপুজোর রাত্রি	… ১৪
সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	কিংবদন্তীর কলকাতা	… ৪৬৯
	(প্রবন্ধ)…	স্বামী বিবেকানন্দঃ একটি পত্র ও বর্তমান ভারতবর্ষ	… ৫৩১
সুমণি মিত্র	(প্রবন্ধ)…	ক্রমবিকাশবাদঃ ডারউইন ও বিবেকানন্দ	… ৩৭৫
	(প্রবন্ধ)…	দীন-ই-ইলাহী ও ব্রাহ্মধর্মঃ আকবর ও রামমোহন	… ৫৪০
সুশীলকুমার রুদ্র	(প্রবন্ধ)…	আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	… ৩৯২
	(প্রবন্ধ)…	দুর্গাঃ রূপ থেকে রূপান্তরে	… ৪৯৩
সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা)	(স্মৃতিকথা)…	স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ও আমি	… ৭৭৩
ব্রহ্মচারী সৈকতেশ	(কবিতা)…	রামকৃষ্ণকে খুঁজতে গিয়ে	… ৫১২
সোফিওর রহমান	(কবিতা)…	নমো হে নির্জনতা	… ৫১২
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ	(প্রবন্ধ)…	স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাঃ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	… ৩৪
	(প্রবন্ধ)…	স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা	… ৩০৮
	(প্রবন্ধ)…	মনের শক্তিবৃদ্ধির উপায়	… ৬৪৬
হরপ্রসাদ মিত্র	(প্রবন্ধ)…	বাঙলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যতা	… ১৭
হরিদাস মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)…	জাতীয় আন্দোলনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	… ১০৭
হরিপদ আচার্য	(প্রবন্ধ)…	অম্বুবাচী	… ৩২৪
	(প্রবন্ধ)…	দুর্গানামের রহস্য সন্ধানে	… ৪৯৬
হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী	(কবিতা)…	মানসিক	… ৬১৪

ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী (প্রবন্ধ)… শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বিবাহ … ৩৬৫
হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী (প্রবন্ধ)… ভারততত্ত্ববিদ্ বেণীমাধব বড়ুয়া … ৩৪৩
(প্রবন্ধ)… কলকাতার প্রাচীন বৌদ্ধসংস্থা … ৪৬৭
হোসেনুর রহমান (প্রবন্ধ)… আবুল কালাম আজাদ এবং ভারতীয় জীবনদর্শন … ৩১২

দিব্যবাণী: ১, ৬১, ১২১, ১৮১, ২৪১, ৩০১, ৩৬১, ৪২১, ৪৮১, ৬২৯, ৬৮৯, ৭৪৯

কথাপ্রসঙ্গে: স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

'উদ্বোধন'-এর একানব্বইতম বর্ষ-প্রবেশ—৩ ; একটি আত্মাহুতিঃ একটি প্রতীক—৬২ ; বিশ্বাস—১২২ ; "আত্মদীপো ভব"—১৮২ ; মাদকাসক্তিঃ সমাধান কোন্ পথে?—২৪২ ; ভারতের প্রযুক্তিক্ষেত্রে নূতন দিক্‌চিহ্ন—৩০২ ; শ্রীশ্রীমাঃ গুরুশক্তি—৩৬২ ; কলকাতার তিনশো বছরে পদার্পণ প্রসঙ্গে—৪২২ ; প্রসঙ্গঃ ঈশ্বরের মাতৃরূপ—৪৮২ ; শুভ বিজয়া—৬৩০ ; বিজয়া—৬৩০ ; জগদ্ধাত্রীঃ রূপে ও তত্ত্বে—৬৮৯ ; মমতাময়ী—৭৫০

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে: ৩৯, ৪১, ১৫০, ১৯৭, ২৮২, ৩২৮, ৩৯৮, ৫০৬, ৬৪৩, ৭২৬, ৭৬৬

মাধুকরী:

কামাখ্যানাথ মিত্র/স্বামী বিবেকানন্দ—৪৭ ; কালিদাস নাগ/জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়—৩১৬ ; কুমুদরঞ্জন মল্লিক/শ্রীশ্রীমা—৭৬৫ ; মা—৭৬৫ ; চুনীলাল বসু/স্বামী বিবেকানন্দ—২০৯ ; নলিনীকান্ত গুপ্ত/শ্রীরামকৃষ্ণ—১৩৯ ; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়/স্বামী বিবেকানন্দ—৩৮৮ ; ভগবান রামকৃষ্ণ—৬৪১ ; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়/জন্মোৎসব—৮২ ; নরদেবতা—৭২৯ ; শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ/পুরনো কলকাতা—৪৬২ ; সংবাদ প্রভাকর/কলকাতায় দুর্গাপূজা—৫৭৫ ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী/দুর্গাপূজা—৫৭৩ ; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কয়েকটি পত্র—৭৬৩

আনন্দের সন্তান

প্রদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায়—১৬০ ; স্বামী লোকেশ্বরানন্দ—৫৭৬ ; শঙ্করীপ্রসাদ বসু—৫৩ ; সুদীপ বসু—৮৫ ; ২২৮, ২৯০, ৩৫০, ৪১০, ৭৪০

বাতায়ন: ১৭০, ২৩০, ২৬০, ৩৩১, ৪০১, ৫৮৬, ৬৮১, ৭৭৭

পরমপদকমলে: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজীর ধর্ম—৪৪ ; গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—৮৩ ; একটু চেষ্টা—১৬৮ ; ঠাকুরের কাছে দরবার—২২৬ ; হাসছে কেমন!—২৮৮ ; পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে—৩৩২ ; পুরুষ সাবধান—৪৩৩ ; কেন—৬৭১ ; সেই আবেগে—৭৪২ ; অংশে অংশ মিলে পূর্ণ—৭৮৯

পুরাতনী: স্বামী অবধূতানন্দ—৩৫১ ; ব্রহ্মচারী সনৎকুমার—১৫৪

অপ্রকাশিত পত্র: স্বামী শিবানন্দ—১২৩, ১৮৩, ২৪৪, ৩০৪, ৬৩২ ; স্বামী সারদানন্দ—৪৮৪

গ্রন্থ পরিচয়: ৫৭, ১১৫, ১৭৩, ২৩৪, ২৯৫, ৩৫৩, ৪১৪, ৪৮০, ৬২২, ৬৮২, ৭৪৪, ৭৯৪

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ: ৫৯, ১১৬, ১৭৪, ২৩৬, ২৯৬, ৩৫৫, ৪১৬, ৪৪৪, ৬২৪, ৬৮৪, ৭৪৫, ৭৯৫

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ: ৬০, ১১৮, ১৭৬, ২৩৭, ২৯৭, ৩৫৭, ৪১৮, ৬২৪, ৬৮৫, ৭৯৭

বিবিধ সংবাদ: ১১৯, ১৭৭, ২৩৮, ২৯৮, ৩৫৮, ৪১৯, ৪৬৬, ৬২৫, ৬৮৬, ৭৪৬, ৭৯৮

বিজ্ঞান সংবাদ: ১২০, ১৮০, ২৪০, ৩০০, ৩৬০, ৪২০, ৪৫৫, ৬২৭, ৭৪৮, ৮০০

চিত্রসূচী: ৪(ক) ৬৪(ক) ৪৪৪(ক) ৪৪৪(খ) ৪৮০(ক)

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলি-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা — মাঘ ১৩৯৫

দিব্য বাণী

নববর্ষ-প্রবেশ

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

…আজ উদ্বোধন নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। গত মাঘের প্রথম দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। "দেবগুরু-প্রসাদে" এই এক বৎসর মধ্যে বঙ্গের প্রায় সকল স্থলেই, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেই বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। অনেক সহৃদয় মহাশয়-ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতাধিক সফলতা লাভ আর কোনও সহযাত্রী করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পাঁচজনের আশীর্বাদ ও সৎ ইচ্ছা থাকিলেই উন্নতি এবং উত্তরোত্তর উদ্দেশের সফলতা হইতে থাকিবে সন্দেহ কি।

উদ্বোধনের উদ্দেশ্য কিছু নিম্নশ্রেণীর নহে; আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত গুণাবলীকে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করাই উদ্বোধনের কার্য। প্রয়োজনীয় যে-সকল গুণাবলী স্বদেশে নাই তাহার আনয়ন করিতেই উদ্বোধনের আয়াস। নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-সাধনই ইহার জীবনোদ্দেশ্য।…

পরহিত—নিজ হিতেরই জন্য;—না, পরহিতের জন্যই পরহিত; বা, স্বভাববশতঃ পরহিত করিতে হয়, যে কারণেই হউক পরহিতমাত্রই মঙ্গলকর।

'নিজহিতের জন্য পরহিত'—কি প্রকার?—আদান-প্রদানভাবে পরহিত, অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পরোপকার। অথবা, স্বাভাবিক নিয়মে পরোক্ষে নিজহিত, অর্থাৎ পরহিত করিতে করিতে নিজহিত আপনা আপনি ভিতর ভিতর হইতে থাকে, পরোপকার করিতে করিতে পরোপকার করা অভ্যাস হইয়া যায়; নিজ চরিত্র ক্রমশঃ গঠিত হয়, স্বার্থ ক্রমশঃ চলিয়া যাইতে থাকে, কর্মক্ষয় হইতে থাকে, হৃদয়-গ্রন্থিসকল ছিন্ন হয়, অবশেষে জীবন্মুক্তি পর্যন্তও লাভ করিতে পারা যায়।

'পরহিতের জন্য পরহিত'—সে কেমন?—কোনও প্রত্যাশা পোষণ না করিয়া কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে পরহিতের নাম 'পরহিতের জন্য পরহিত।' আজ-কাল এই কর্তব্য-বোধটি, অনুরোধ উপরোধেই সচরাচর হইয়া থাকে; স্বয়ং উত্থিত হইতে অতি অল্পস্থলেই দেখা যায়। যদিও কখন উত্থিত হয়, কার্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে না হইতে, মনাকাশেই মিলাইয়া যায়; যদিও শূন্যে না উড়িয়া যায়, অপরের প্রতি উপদেশাকারে পতিত হয় মাত্র। তবে কি বিশুদ্ধ কর্তব্য-জ্ঞানে প্রকৃত উপকার নাই? আছে, খুব কম।… যাঁহারা স্বভাবতঃই পরহিতকারী, পরহিত যাঁহাদিগের একান্ত প্রকৃতিগত, পরহিত-কর্মই যাঁহাদিগের জীবনোদ্দেশ্য এবং পরমব্রত, তাঁহাদিগের নিকট হইতেই যথার্থ পরোপকারের প্রত্যাশা সর্বদাই করিতে পারা যায়। ইঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।…

কে বলে কর্ম—'ত্যাগের' কারণ হইতে পারে না? কর্মক্ষয় না হইলে কর্মত্যাগের চেষ্টা বিফল। কর্ম দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়; "পায়ে কাটা ফুটিলে আর একটি কাটা দ্বারা সেইটি তুলিতে হয়।" শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন, "ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।"

কর্ম রজোগুণের লক্ষণ; সত্ত্বের প্রভাবে ত্যাগেচ্ছার উদ্ভব; তমোগুণের প্রাদুর্ভাবে সত্ত্ব ও রজঃ প্রসুপ্ত থাকে, অজ্ঞানে জীব অভিভূত হইয়া

পড়ে। সেই তমোনাশের বিধিমতে চেষ্টা করা সকলকারই কর্তব্য—বিশেষ ভারতবর্ষে। ভারতবাসী আজ আলস্য-প্রধান—সে ওজস্বিতা আর তাঁহার নাই !!…

যে ভারতবাসীর প্রতি ধমনীতে কর্মস্রোত বায়ুর ন্যায় রহিয়াছিল; এককালে প্রতিগৃহে যে ভারতবাসীর প্রতি গৃহাভ্যন্তরে দেশহিতৈষণা দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল,… —যে ভারতবাসীর পরমারাধ্য ঋষি-তপস্বিগণ পর্যন্তও, কত ঈপ্সিত তপোভূমি-হিমালয় হইতে, মানবের এই কর্মভূমি আর্যাবর্তে উত্তরণপূর্বক রাজ্যশাসনাবধি কৃষি-গোরক্ষা পর্যন্ত—যাবতীয় কার্যবিভাগে পরম সহায়তা সম্পাদন করিতেন; অহো, যে ভারতে এককালে একটি সামান্য পরহিতের জন্যই ক্ষুদ্র শিশু পর্যন্ত এত ভীষণ ভাবে অবলীলাক্রমে প্রাণ দান করিয়াছিল; আজ কিনা সেই ভারতবাসীর সন্তান, ভারতের বক্ষে বসিয়া, পরহিতের কথা চুলোয় যাক—নিজ বিদ্যাভ্যাস অবধি পিতৃমাতৃসেবা পর্যন্ত (ভূমিকম্প কি?—ভারত বিদীর্ণ হইয়া যে, এখনও হৃদয়াগ্নি উদ্গার করেন নাই, এই যথেষ্ট) যাবতীয় অবশ্যকর্তব্য, বৈরাগ্য বা অনাবশ্যকতা-ভানে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন। ইহা কি তমোগুণের লক্ষণ নহে, সত্ত্বগুণের অপব্যবহার নহে?

কালের বিচিত্র গতিতে, এইরূপ, সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ অসৎ ব্যবহার ও অপব্যবহার হইয়া পড়ে। যখনই এইরূপ অবস্থা শেষ সীমায় পরিণত হয়,—তখনই পুনঃসংস্কারের একান্ত আবশ্যক। ভারতে এই পুনঃসংস্কারের সময় উপস্থিত; আলস্যবশে থাকা আর ভারতসন্তানের শোভা পায় না। ভারতের সর্বত্র সকল বিভাগে কিছু কিছু সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে; বীরগণ সর্বত্রই প্রায় নিদ্রোত্থিত হইয়া বদ্ধপরিকরে দণ্ডায়মান। কেবল ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে আজ পুনঃসংস্কারের তরঙ্গ উত্থিত, —বঙ্গেরও সকলে বদ্ধমুষ্টি না থাকিয়া, তমস্ত্যাগ করতঃ মুক্ত হস্ত প্রসারণ পূর্বক পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ হিতার্থে সাহায্য করুন।—"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমব্যপ্স্যথ।"

তমোগুণের নাশ রজোগুণের দ্বারা সাধিত হয়, সত্ত্বের দ্বারা অসম্ভব; রজঃ কর্মাত্মক, সত্ত্ব প্রকাশাত্মক। কর্মের দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থিসকল শিথিল হইলে সত্ত্বগুণ সত্যের বিকাশ করিয়া দেয়। দেশের মঙ্গল যদি কেহ চাহেন, কর্মঠ হউন; বিশেষ—বঙ্গবাসীগণের পক্ষে কর্মণ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; এই ঘোর কর্মযুগে কর্ম ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যাবতীয় কর্মমধ্যে, পরহিতকর্মই গরিষ্ঠ ও অতি মহৎ। পরের মঙ্গল করিয়া—দেশের মঙ্গল কর্ম করিয়া নিজ-ভারত-বাসীত্বের সার্থকতা করুন। নিজের জীবনকে ধন্য করুন। কর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দেখুন, বুঝিবেন—পরের মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল; পরহিত সাধনেই—নিজের হিতসাধন। অর্জুনকে দেশের সাধারণ হিতকর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন—"দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।"…

পাশ্চাত্যবাসীগণ আজ জগতের কত হিতসাধন করিয়াছেন; কেবল কর্মশীল বলিয়াই, তাঁহারা আজ এতদূর উন্নতি সকল বিভাগেই করিতে সক্ষম। পাশ্চাত্য প্রদেশে কর্মমাত্রই অতি পবিত্র বলিয়া আদৃত। সেই পাশ্চাত্য কর্মশীলতা, পবিত্র ভাবে, বঙ্গবাসীর অন্তরে আবির্ভূত করিয়া দেওয়াই উদ্বোধনের উদ্দেশ্য; প্রতিদানে—যাহাতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে আমাদের এই ভারতীয় প্রাচ্য পারমার্থিকতা প্রবেশ করে, তাহাও উদ্বোধনের লক্ষ্য। কতদূর কৃতকার্য হইবে বলা দুষ্কর।—জীবন পর্যন্ত ন্যস্ত করিয়া, যদি তৃণোত্তলনসম যৎসামান্য কার্যেও সফল হয়, কৃতার্থ ও পরম সৌভাগ্য মনে করিবে।

অতি মহৎ উদ্দেশ্য সহকারে উদ্বোধন জন-সমাজে শুভযাত্রা করিয়াছেন; কামনা-পরহিত; না, 'পর'—নহে; স্বজাতির স্বদেশের,—নিজের অভিন্ন বন্ধুবর্গের হিতকামনা। সমভিব্যাহারে সম্বল—একমাত্র নিঃস্বার্থতা; বিশ্বাস—সেই সম্বলেই কৃতকার্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সৎকার্যে নানা বিঘ্ন, বিপদ প্রতিপদে,—কেবল সহায়—পরমবন্ধু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। ভরসা—উদ্যম। প্রসাদ—জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্বাদ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।*

---

* উদ্বোধন, দ্বিতীয় বর্ষ, ১ মাঘ, ১৩০৬, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১—৬

কথাপ্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর একানব্বইতম বর্ষ-প্রবেশ

সূর্যের উদয় আমরা প্রত্যহই দেখি। দেখি উষার অরুণিমাও। ক্রমে রক্তিম আকাশের বুক চিরিয়া অভ্যুদয় হয় 'তিমিরবিদার' সূর্যের। ঘুমন্ত ভুবনকে তিনি এক লহমায় জাগরণে লইয়া আসেন। দীর্ঘ রাত্রির জড়তা, আলস্য ও নিদ্রাকে চূর্ণ করিতে করিতে তিনি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকেন। পৃথিবীতে আবির্ভাব হয় এক নূতন প্রভাতের। মানুষের মনে জাগ্রত হয় নবীন আশা, সঞ্চারিত হয় নূতন উদ্যম, নূতন প্রেরণা। কিন্তু যিনি রাত্রির জড়তা ভাঙিয়া মানুষকে নূতন জীবনের গতিতে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, আনিয়া দিয়াছিলেন-নবজীবনের তরঙ্গ, তাঁহার কথা মানুষ ক্রমেই ভুলিয়া যায়।

বিগত শতাব্দীতে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বামী বিবেকানন্দের যে আবির্ভাব তাহা প্রকৃতির আকাশে সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গেই তুলনীয়। জাতির জীবনের অন্ধকার রাত্রি, তামসিকতার পুঞ্জীভূত পাহাড় অপসৃত হইয়া গিয়াছিল তাঁহার আলোকোজ্জ্বল অভ্যুদয়ে। সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে আসিয়াছিল অভূতপূর্ব একটি জাগরণ, অদৃষ্টপূর্ব এক উদ্দীপনা, কর্মোদ্যোগ, আশা ও আত্মত্যাগের জোয়ার। তিরোধানের পর দুই দশকেরও অধিক জাতীয়-জীবনকে তিনি যেন ছাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে মোহগ্রস্ত ভারতবাসী তাঁহার আদর্শ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে শুরু করিয়াছিল। অবশেষে তাঁহাকে তাহাদের জীবন হইতে প্রায় বিসর্জনই দিয়াছে বলা যায়। গত ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্মদিবসকে 'জাতীয় যুবদিবস' হিসাবে ঘোষণা ও চিহ্নিত করিয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার। বিগত এক বছর ধরিয়া সারা দেশে তাঁহার আবির্ভাবের ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা। কিন্তু তাঁহার আদর্শকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে প্রতিষ্ঠা করার কোন অঙ্গীকার, কোন পরিকল্পনা, কোন প্রয়াস আজও চোখে পড়িতেছে না। অথচ সূর্যকে ছাড়া যেমন জগতের চলিতে পারে না, স্বামী বিবেকানন্দকে ছাড়াও তেমনই ভারতবর্ষের চলিবে না। ভারতবর্ষের তাঁহাকে চাই-ই। এবং এই 'চাই-ই' বিবেকানন্দের জন্য নহে, ভারতবর্ষের জন্যই। বিবেকানন্দ কখনো নিজের প্রচার চাহেন নাই। আত্মপ্রচারকে তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। এমনকি তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুরুর প্রচারও তিনি চাহেন নাই। তিনি শুধু চাহিতেন তাঁহার দেশবাসীরা 'মানুষ' হউন, তাঁহাদের মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটুক। তাহা না হইলে, তিনি জানিতেন, ভারতবর্ষ এক পরাধীনতা কাটাইয়া আর এক পরাধীনতার শিকার হইবে মাত্র। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষ আজ বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিতেছে না। তাহার আত্মিক ক্ষেত্রে যেন তমিস্রার অধ্যায় চলিতেছে। ইহার কারণ ভারতে যথার্থ 'মানবসম্পদ'-এর অপ্রতুলতা। বিবেকানন্দকে গ্রহণ করিলে, তাঁহার আদর্শকে জীবনের অঙ্গীভূত করিলে ভারতের তমিস্রা কাটিবে, ঘটিবে নূতন সূর্যোদয়। তাঁহার মানস-সন্তান 'উদ্বোধন' বিগত নব্বই বছর ধরিয়া তাহার সীমিত সামর্থ্য অনুসারে জাতির নিকটে সেই উদ্বোধনের বার্তাই শুনাইয়া আসিতেছে।

উদ্বোধন একানব্বইতম বর্ষে পদার্পণ করিল। কিন্তু এই সগর্ব পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে গভীর বেদনায় তাহাকে একটি মহা দুঃসংবাদও বহন করিতে হইতেছে। সঙ্ঘের একাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ মহাসমাধিলাভ করিয়াছেন। সমুন্নত আধ্যাত্মিক জীবন এবং বিরল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে উচ্চ অনুভূতি ও কর্মদক্ষতার সুষম সমন্বয় ঘটাইয়া তিনি যেভাবে সঙ্ঘকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিতেছিলেন তাঁহার প্রয়াণে সেই শূন্যতাবোধ মর্মে বড়ই বাজিতেছে।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ গত ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ রাত ৭-২৭ মিঃ কলকাতাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে মহাসমাধিতে লীন হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। বারাসত, শিকড়া-কুলীন গ্রাম এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা করে গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৮ তিনি বেলুড় মঠে ফেরেন এবং ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডে জটিলতার জন্য সেদিনই রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। সেবা প্রতিষ্ঠানে ডাঃ এস. এন. রায়, ডাঃ কে. বি. বক্সী এবং ডাঃ নিরঞ্জন ব্যানার্জীর মতো অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। চিকিৎসায় ভাল ফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে আসে এবং চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে তিনি মহাসমাধিতে লীন হন। রাত সাড়ে দশটায় সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর নশ্বর দেহ বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয়। পরদিন ২৮ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ দুটো পনের মিনিটে বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে মঠের সমাধিভূমিতে তাঁর পবিত্র দেহ চিতাগ্নিতে উৎসর্গ করা হয়। অপরাহ্ণ পাঁচটায় চিতাগ্নি নির্বাপিত হয়। পশ্চিমের আকাশে তখন সূর্যদেব অস্তাচলগামী।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশস্থ শ্রীহট্ট জেলার সাধুহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজের) মন্ত্রশিষ্য। তাঁর ব্রহ্মচর্য-নাম ছিল সৌম্যচৈতন্য। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুরুর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা পান।

রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সুদীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছরের জীবন ছিল কর্মবহুল। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্মসচিব। ১৯৩৬-৪১ এবং ১৯৪৪-৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। মাঝে তিন বছর তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টী নিযুক্ত হন এবং ঐ বছর থেকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্যতম সহ-সম্পাদক রূপে কাজ করেন। ১৯৫৩-১৯৬৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ। পুনরায় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের সহ-সম্পাদক এবং ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সংঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ হন। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি প্রয়াত দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত হন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ ছিলেন বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বাঙলা ও ইংরেজীতে তাঁর সম্পাদিত উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়া উল্লেখযোগ্য যেসব গ্রন্থের তিনি প্রণেতা সেগুলি হল ঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ (৩ খণ্ড) শ্রীমা সারদা দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা (২ খণ্ড), Apostles of Sri Ramakrishana, Holy Mother Sri Sarada Devi এবং History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission। আট খণ্ডে স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর সম্পাদনাও করেছিলেন তিনি। প্রতিখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নির্দেশিকা তাঁরই তৈরি। শেষের দিকে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মধুসূদন সরস্বতীর গীতার টীকা ইংরেজিতে অনুবাদের কাজে। এই কাজটি তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারলেন না।

তাঁর মহাপ্রয়াণে সংঘ শুধু একজন সুযোগ্য নেতাকেই যে হারিয়েছে তা নয়, হারিয়েছে বিরল শাস্ত্রজ্ঞান ও গভীরপাণ্ডিত্যের অধিকারী এক প্রাচীন বিনম্র সন্ন্যাসীকে এবং উন্নত আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন উচ্চকোটির এক সাধককেও।

প্রবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ এবং আজকের যুবসমাজ

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, বহমান স্রোতস্বিনীর জলই স্বচ্ছ নির্মল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। গতি রুদ্ধ হয়ে গেলে সে জল দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। নদী সমুদ্রকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলতে চলতে যদি মধ্যপথে গতি হারায় তাহলে তা বদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন প্রকৃতিতে তেমনি মানবসমাজেও সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য না থাকলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সামনে সুস্পষ্ট একটি লক্ষ্য রাখলে তবে অগ্রগতির প্রয়াস সংহত ও সার্থক হয়। আমাদের আজকের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এটি মনে রাখা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করবার আগে আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা দরকার ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য, আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতাকে। স্বামীজীও এর উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দেশের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন না হলে সমৃদ্ধি হবে অসংলগ্ন এবং হয়তো শেষপর্যন্ত তা অগ্রগতির পরিবর্তে অবক্ষয়ের দিকেই জাতিকে নিয়ে যাবে।

বিশেষ করে আজকের তরুণসমাজ, যারা দেশের ভবিষ্যৎ, যাদের মধ্যে একটা সাড়া জাগছে, তারা যাতে জীবনে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, তাদের মধ্যে জাগ্রত উৎসাহ উদ্দীপনা যাতে সঠিক পথে চালিত হয়, সেজন্য আমাদের যত্নবান হতে হবে। নতুবা সে-শক্তির এমন অপচয় বা অপব্যবহার হতে পারে যে, তাতে মানুষের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ঐহিক উন্নতি, অগ্রগতি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু যে অতীত থেকে দেশ ভবিষ্যতের দিকে চলেছে সেই অতীতকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অতীতের ভিত্তির উপরেই দেশকে গড়ে তুলতে হবে। যুবসমাজের যদি অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন চেতনা না থাকে, তাদের দশা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া নোঙরহীন নৌকার মতো, যা কখনো লক্ষ্যে পৌঁছায় না। এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি স্মরণ রাখতে হবে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যাওয়াটা যদি নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যের দিকে না হয় তাহলে অগ্রগতি নিষ্ফল হয়ে পড়ে। আধুনিকতা কখনো কখনো আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থিত হচ্ছে। সুতরাং আমাদের এই সত্যটি মনে রাখতে হবে। এভাবেই আধুনিকতার প্রবণতাকে দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে ফলপ্রদ একটি লক্ষ্যের দিকে সুপরিচালিত করা যেতে পারে। স্বামীজী বারংবার বলেছেন, অতীতের ভিত্তি না থাকলে সুদৃঢ় ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে না। অতীত থেকে জীবনীশক্তি আহরণ করেই ভবিষ্যৎ বাঁচে। যে-আদর্শ নিয়ে জাতি এতদিন চলে এসেছে, সেই আদর্শের দিকেই বর্তমান যুবসমাজকে চালিত করতে হবে, যাতে তারা দেশের সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারে।

আমি বলছিলাম আধুনিকতা কখনো কখনো আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থিত হচ্ছে। তার অর্থ হল আধুনিক সমাজ দেশের কল্যাণের জন্য ফলপ্রসূভাবে তার শক্তিকে চালনা করতে গিয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আধুনিকতার এই শক্তিকে সুপরিকল্পিত মহান লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে। এজন্যই স্বামীজী বলেছেন, যুবসমাজের সম্মুখে একটি লক্ষ্য স্থাপন করতে হবে এবং যাতে যুবসমাজ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তাদের প্রচেষ্টার সদ্ব্যবহার করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যুবশক্তির মধ্যে যে সচলতা, যে উদ্দাম ভাবাবেগ দেখেছি তা উপেক্ষণীয় নয়। তারা যে কিছু করবার চেষ্টা করছে এ তারই লক্ষণ। তাদের পরিচালনার ভার যাঁদের উপর, সেই প্রাচীনদের এ-সম্বন্ধে ভাবতে হবে। তরুণদের বিধিনিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে না রেখে, তাদের সুস্পষ্ট পথের নির্দেশ দিতে হবে।

প্রায়শঃ দেখা যায় যে প্রবীণরা যুবসমাজের মধ্যে কেবল দোষ দেখছেন। প্রবীণদের গলদটা হচ্ছে যে, যুবক-যুবতীরা কি করতে চাইছে, কি ভাবছে তা তাঁরা জানতে চেষ্টা করেন না। ফলে প্রবীণরা যুব-

সমাজকে নিন্দা করেন। আর যুবসমাজও প্রবীণদের উপেক্ষা করে, বেপরোয়া হয়ে যায়। তখন ব্যাপারটা আগুন নিয়ে খেলার মতো হয়ে পড়ে। যে-আগুন ঘরে প্রদীপ হয়ে আলো দেয় তা-ই আবার সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। যৌবনের মধ্যে যে-শক্তি রয়েছে তা ভালও নয় মন্দও নয়, সঠিক পথে চালিত হলে তা কল্যাণপ্রদ হবে; তার ব্যত্যয় ঘটলে বিধ্বংসী হবে। প্রচণ্ড একটা শক্তিকে কোন একটা সীমিত ক্ষেত্রে আবদ্ধ করতে গেলেই সীমা ছাড়িয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটে। যুব-তরুণদের মধ্যে যে প্রবল প্রাণশক্তি রয়েছে তাকে যথার্থ পথে পরিচালিত না করতে পারলে যে বিপর্যয় ঘটবে তা সমগ্র দেশ ও জাতিকেই প্রভাবিত করবে। কখনো কখনো প্রবীণরা বদ্ধ জলাশয়ের দশা প্রাপ্ত হন। তাঁরা ভাবেন তাঁদের ধ্যান-ধারণাই সঠিক এবং তাঁদের কালে তাঁরা যা করেছেন আজকের তরুণ-সমাজের তাই করা উচিত। তরুণ বয়সের কথা যদি তাঁদের স্মরণে থাকে, তাহলে তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, তাঁদের সেই সময়টাও সংঘাতহীন নিস্তরঙ্গ ছিল না, উত্তাল উদ্দামতা তাঁদেরও কিছু কম ছিল না। এবং জীবনপথে যত এগিয়েছেন অভিজ্ঞতার ফলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং প্রাজ্ঞ প্রবীণরা যদি তাঁদের অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান যুবসমাজকে দেখেন এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে দরদ ও মমতার সঙ্গে নবীনদের বোঝার চেষ্টা করেন এবং তাঁদের সাহায্য করেন তাহলে তার ফল ভাল হবে। অপরপক্ষে নবীনদেরও বুঝতে হবে, প্রবীণদের প্রয়োজন আছে। অতীত অভিজ্ঞতার একটা ধারা, যাকে সংস্কার বলা হয়, যা আমরা বহন করে থাকি, সেই সংস্কারই আমাদের মানসিক প্রবণতার উৎস। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেরই যেমন একটা অতীত আছে, তেমনি জাতিরও একটা সম্মিলিত অতীত থাকে। জাতিমাত্রেরই পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা থাকে এবং তারই ভিত্তিতে সে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির একটা পন্থা স্থির করে নেয়। আজ যারা তরুণ, যৌবনের শক্তি নিয়ে তারা চলতে আরম্ভ করছে। তাই অভিজ্ঞ প্রবীণদের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে তরুণরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্ধের মতো এগিয়ে না যায়, পথভ্রষ্ট না হয়। একটা দিঙ্‌নির্দেশ অবশ্যই চাই এবং তা সতর্কতার সঙ্গে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

আমরা শুনি যে, আমাদের তরুণদের নৈতিক মূল্যবোধ নেই, তারা উন্নাসিক, নাস্তিক, এরকম অনেককিছুই তাদের সম্বন্ধে বলা হয়। সম্ভবতঃ আমরা যখন তরুণ ছিলাম, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরাও আমাদের সম্বন্ধে অনুরূপ কথা বলতেন। তাঁদেরও ধারণা ছিল তাঁদের কালটা স্বর্ণযুগ এবং এখন সব কিছুরই অবনতি, অধঃপতন হচ্ছে। আবার আমরাও বর্তমানে এমন কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, আগে অর্থাৎ আমাদের যৌবনকালে সব কিছুই ভাল ছিল, এখন সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সেই বিশ্বাস, মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই, বর্তমান প্রজন্মের জনকদের।

প্রাচীনকে নস্যাৎ করে ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হয় না, স্বামীজী এ-ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যা-কিছু প্রাচীন তা-ই বর্জনীয়, এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুদার, সঙ্কীর্ণ। একটা ভিত্তির উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সেটাই আমাদের অতীত। অতীতই আমাদের বর্তমানে পৌঁছে দিয়েছে এবং বর্তমান প্রজন্মেরও এটা দেখা কর্তব্য যে, ভবিষ্যৎ বংশধররাও যেন আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের সব মানুষেরই কর্তব্য এবিষয়ে সচেতন হওয়া। জীবন এক প্রবহমান ধারা, জাতির ইতিহাসও সেইরকম। অতীত থেকেই বর্তমানের উদ্ভব। তেমনি বর্তমানই আমাদের ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। সতর্কতার সঙ্গে, গভীর মনোযোগ সহকারে বর্তমান ও অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে যুবসমাজের পথ নির্দেশ করতে হবে এবং দেখতে হবে তা যেন ভবিষ্যতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আধুনিকতার এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। তারুণ্যের উদ্বেল-শক্তি তরুণদের অশান্ত করে তোলে। তাদের সেই শক্তি, উৎসাহ উদ্দীপনার যাতে সদ্ব্যবহার হয়, তা জাতির তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন করতে পারে, সেইভাবে তাদের সুপরিচালিত করতে হবে।

স্বামীজী বলেছেন, অতীতের দৃঢ় ভিত্তি থাকলেই এই সমস্যার যথাযথ সমাধান করা যায়। কিন্তু

সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে, অতীত যেন তরুণদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ না করে, অতীত যেন বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। প্রাচীনেরা হয়তো একটা পন্থা নির্দেশ করে গিয়েছেন, তার কিছু রদবদল করা যেতে পারে, তবে পুরোপুরি সে-পথ পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে চলার প্রয়াস যুক্তিযুক্ত নয়। স্বামীজীর মতে, তাতে কেবল শক্তির অপচয়ই হবে। তিনি বলেছেন, গঙ্গার স্রোতকে জোর করে তার উৎসমুখ গোমুখে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তবে তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যাতে তা দেশ ও জাতির কল্যাণপ্রদ হয়। অন্যথায় ঐ প্রবল জলস্রোত ভালমন্দ সব কিছুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং বিধ্বংসী হয়ে উঠে ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলবে। অতীত ইতিহাস থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে আত্মস্থ করে যুবসমাজ ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করুক, এই ছিল স্বামীজীর মত। এই কাজটাই গুরুত্বপূর্ণ।

যুবসমাজের মধ্যে অতীতকে অবহেলা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সমাজব্যবস্থা যেমন ছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা এর পরিবর্তন চায়। তারা যে-অভিজ্ঞতা লাভ করছে অবশ্যই তারই ভিত্তিতে অতীতের মূল্যায়ন করবে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতাকেও জাতির অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশোধিত করা দরকার। বহুমুখিতা, বিশ্বমুখিনতা, অতি-আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ নিন্দনীয় নয়, বরং গ্রহণের মানসিকতা প্রশংসনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে পায়ের তলার মাটিকে ভুললে চলবে না। সে-মাটি হল ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি। প্রথম থেকেই এদেশের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক জীবন। আমরা বলে থাকি তরুণরা এর বিপরীত, তারা বস্তুবাদী, তাদের লক্ষ্য জাগতিক ভোগসুখ, এটাও সর্বাঙ্গীণ সত্য নয়। হয়তো আমরা তাদের যথাযথভাবে পরিচালিত করতে পারিনি, তাদের সামনে এমন একটা সুস্পষ্ট আদর্শ স্থাপন করতে পারিনি যেদিকে তারা তাদের অদম্য প্রাণ-প্রবাহকে প্রবাহিত করতে পারে। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা দৃঢ় যোগসূত্র থাকা দরকার, যুবসমাজ এই যোগসূত্র। তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করলে সবসময় তাদের থামিয়ে দেওয়া, বাধা দেওয়া উচিত নয়। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার মতো আশা আকাঙ্ক্ষা তারা যাতে পোষণ করে সেভাবেই তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং অতীত থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকলে তবে সে-শিক্ষা আমরা দিতে পারব। তারপর দৃষ্টি রাখব কিভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে যুবশক্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে দেশ গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে।

আমরা গরুর গাড়ির যুগ থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, সম্ভবতঃ এখন আমরা জেটযুগের সীমান্তে এবং পরে রকেটযুগেও পৌঁছব। তখন কেবল চাঁদে যাওয়ার কথাই ভাবব না, দূরবর্তী গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়া এবং তারপর তাও অতিক্রম করে যাওয়ার কথা ভাবব। অর্থাৎ আমরা যেখানে আছি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারি না। প্রাচীন ঋষিরা যেমন বলেছেন 'চরৈবেতি'—এগিয়ে চল, আমরা চাই সেই অগ্রগতি। স্বামীজী বলেছেন, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেম না। ওঠ, জাগো, অভীষ্ট পূরণ না হওয়া পর্যন্ত থেম না। আমরা আরামে আয়াসে আলস্যে বিলাসে ঝিমোচ্ছি। ভুলেই যাচ্ছি যে, আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যাঁরা বৃদ্ধ তাঁদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেলে তাঁরা মনে করেন, তাঁদের নিশ্চিন্ত নিদ্রায় যেন কেউ ব্যাঘাত না ঘটায়, তরুণদের উচ্ছ্বাস উদ্দামতা তাঁদের সেই শান্তি বিঘ্নিত করছে। কিন্তু তাঁরাই এদের পৃথিবীতে এনেছেন। কাজেই এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সমীচীন নয়। তাঁদের মনে রাখতে হবে এই তরুণদের এগিয়ে যাবার পথে উৎসাহ দেওয়া, নিজেদের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা তরুণদের পথনির্দেশ করার দায়ভার তাঁদেরই। আমরা অনেক ভুল করেছি। সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেক উত্থান পতন হয়েছে। সব জাতিরই ইতিহাসে এই চক্রবৎ উত্থান পতন হয়ে আসছে, কোথাও একটানা শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। স্বামীজী বলছেন, উত্থান পতন সত্ত্বেও আমাদের প্রাচীন জাতি এখনও বেঁচে রয়েছে। অন্য অনেক জাতির অভ্যুত্থান হয়েছে, তারা ধূমকেতুর মতো ইতিহাসের পাতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, আবার ধূমকেতুর মতোই ক্ষণস্থায়ী চমক সৃষ্টি করে অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ সুপ্রাচীন। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন

যে দেশ, সেই দেশের অতীত অবহেলার যোগ্য নয়। কারণ অতীতের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ধরনের সঙ্গতি সুস্থিতি ছিল এবং তাই জগৎপৃষ্ঠ থেকে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। গ্রীস-রোম-মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি মহান সভ্যতা একদিন ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আবার তারা অদৃশ্যও হয়ে গিয়েছে; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ভারতবর্ষের সনাতন জীবনধারা আজও অব্যাহত। যদি কখনও সে-ধারা অধোগামী হয়েছে, মনে হয়েছে বুঝি ভূপৃষ্ঠ থেকে এ-জাতির লোপ হবে, তখনই কোথা থেকে নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। সেই শক্তির আধার ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য—যে-আধার থেকে শক্তি আহরণ করে বারংবার তার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। ভারতের অতীত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তার সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ। তার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা না থাকলে নতুন কোন সৌধ রচনা করা যায় না, করলেও তা স্থায়ী হবে না। ভারত যে অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্য ও অসীম শক্তির আধার এটা আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আর একারণেই যুবসমাজের অতীতের অনুধ্যান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে তারা জানতে পারবে, একদিন তারা কি ছিল এবং তদনুসারে তাদের ভবিষ্যৎ-ও গড়ে তুলবার চেষ্টা করবে। ভারতের একটা মহান ঐতিহ্য ছিল, অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও সেই ঐতিহ্য ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ভবিষ্যৎকেও সঞ্জীবিত রাখবে। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা গর্ববোধ করব এবং এর প্রতি বিশ্বস্তও থাকব। ধনবল বা বাহুবল নয়, আধ্যাত্মিক শক্তির উপর ভারত সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কেউ কেউ বলেন, ধর্ম আমাদের জীবনের অধোগতির কারণ। স্বামীজী বলেছেন, তোমরা অতীতকে ভুল বুঝছ, ধর্মকেও ভুল বুঝছ। ধর্মই তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ধর্মকে ভুলে না গেলে এখনও তা বাঁচিয়ে রাখবে। স্বামীজী কর্তৃক বহুবার উচ্চারিত উপনিষদের বাণীটি হল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেম না। 'নিবোধত' মানে সত্যকে জান। অন্ধকার থেকে আলোর উদ্ভাস হয় না। অতীত ভারতবর্ষ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং সেটাই আমাদের পথ-প্রদর্শক।

তরুণদের কাছে তাই স্বামীজীর আহ্বান: তোমাদের শক্তিকে অপচয়িত, নিঃশেষিত হতে দিও না। অতীতের দিকে তাকাও, যে-অতীত তোমাদের অনন্ত জীবনরস দান করেছে, তার দ্বারা পুষ্ট হও। যদি অতীত ঐতিহ্যের সদ্ব্যবহার করতে পার, তার জন্য যদি গর্ব বোধ কর, তা অনুসরণ করে তোমাদের পথ নির্ণয় কর, তাহলে সেই ঐতিহ্য তোমাদের দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তার ফলে দেখবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমৃদ্ধির দিকে দেশের অগ্রগতি হচ্ছে। এইভাবেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। বৈজ্ঞানিকরা নতুন নতুন পথে অনুসন্ধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান বটে, কিন্তু তাঁরা কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অতীত প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করেন না? অণুর আবিষ্কার আকস্মিকভাবে হয়নি। বহু যুগের বহু বিজ্ঞানীর ঘর্মসিক্ত গবেষণার শেষে বর্তমান শতাব্দীতে আণবিকশক্তির অস্তিত্ব জানা গিয়েছে। এক্ষেত্রেও তেমনি আমাদের অবশ্যই পূর্ববর্তীদের প্রয়াসকে স্মরণে রাখতে হবে।

স্বামীজী আরও বলেছেন, উন্নতির প্রথম সোপান হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা না থাকলে বদ্ধদশা হবে এবং ক্রমে বিনাশ অনিবার্য। কাজেই যুবকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের পথ খুঁজে নিতে সাহায্যও করতে হবে। শুধু যুবকদের স্বামীজীর সতর্কবাণীটি স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা যেন সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে লাভবান হয়। এই মহান উত্তরাধিকার লাভ তাদের পরম সৌভাগ্য।

তরুণেরা অশান্ত, উদ্দাম, এটা তাদের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। তাদের প্রতি পদে নিষেধের ডোরে বেঁধে 'ভাল ছেলে' করে রাখলে তারা আর এগিয়ে যেতে পারবে না। বরং তাদের আরও অশান্ত হতে উৎসাহ দিতে হবে। আমরা যেন তাদের পিছন থেকে টেনে না রাখি। নতুন বন্দরের দিকে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে, পালে হাওয়া লেগেছে, প্রবীণদের কাজ হবে তাদের যাত্রাপথে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করা যাতে তারা দিগ্ভ্রান্ত না হয়। তবেই আজকের তরুণেরা আমাদের অতীতের প্রাপ্তিকে সমৃদ্ধতর করবে। বলা বাহুল্য, তাদের চলার পথে স্বামীজীর শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ সর্বদাই থাকবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ জওহরলাল নেহরুর দৃষ্টিতে

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

জওহরলাল নেহরুর জীবনে ও মননে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কি বিপুল স্থান ছিল তার বহু প্রমাণ নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। একটি আকর্ষক সংবাদ হল—জওহরলাল ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের শক্তিবাদের সমূহ সমর্থন করেছিলেন। ৭৪ বৎসরের বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী (বৎসরখানেকের মধ্যেই তাঁর দেহান্ত হয়েছিল) চীনা আক্রমণের কালো ধোঁয়ার মধ্যে আশার কবরের উপর দাঁড়িয়ে যখন উদ্‌ভ্রান্ত, সেইকালে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর সময়ে তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় শান্তি ও সুস্থিরতা আস্বাদনের আরাম-প্রহরে বিবেকানন্দকে ভুললেও ভোলা যেতে পারে, কিন্তু ঝড়ের সমুদ্রে নোঙর বাঁধতে হয় ঐ বিশ্বাসের শক্তিদণ্ডেই। বিবেকানন্দ সুনিশ্চিত শক্তির নির্ভর-দণ্ড।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লীর রামলীলা ময়দানের সুবৃহৎ জনসভায় জওহরলাল বললেন, চীনা-আক্রমণের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর, শীঘ্র বা সহজে তার মীমাংসা হবার সম্ভাবনা নেই। যে গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, তার সম্মুখীন হবার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে হবে। এবং বিবেকানন্দের শিক্ষাতেই যে জাতি আত্মপ্রস্তুতি লাভ করতে সমর্থ, জওহরলাল সজোরে সেকথা বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি বললেন ঃ

"স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহৎ ব্যক্তিরা এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, যত প্রতিকূল অবস্থাই আসুক, মানুষকে সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। যে আত্মিকধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিদের প্রেরণা দিয়াছে, সকলেরই উচিত সেই আত্মিকশক্তিকে কিছুটা অর্জনের চেষ্টা করা। স্বামী বিবেকানন্দ যদিও অতীত যুগের মানুষ, কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা ও মানববিকাশ এমন গভীর ছিল যে, তিনি সেই সময়ে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগেও প্রযোজ্য। স্বল্পায়ু এই ভারতীয় সন্ন্যাসী ছিলেন ভারতের সর্বকালের সর্বোত্তম রাষ্ট্রদূত। তিনি এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, সমগ্র বিশ্ব তাঁহার ভাব ও ভাবনার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

"স্বামী বিবেকানন্দ শুধু মানুষের আত্মিক উন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি একজন মহান দেশপ্রেমিক। তাঁহার লিখিত প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বহ্নি ছিল। দেশের যুবকদের এবং সকল ভারতবাসীর উচিত বিবেকানন্দের শক্তি-সঞ্চারী রচনাগুলি পাঠ করা। সেগুলি যদি স্কুলে ছাত্রদের পড়ানো হয়, ভালই হইবে। স্বামীজী জ্যোতির্ময় মনের অধিকারী। তিনি বহুল পরিমাণে জনগণের চিত্তকে জাগ্রত করিয়াছিলেন।···

"স্বামী বিবেকানন্দের সমান ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে কমই আছে। তিনি সমগ্র জাতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ইহার গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিয়াছিলেন।

"প্রোজ্জ্বলমনা এই সন্ন্যাসীর মুখের বা লেখার প্রতিটি কথাই ছিল অগ্নিশিখার মতো। ভারতের অন্তনিহিত ব্যক্তিত্বকে বিশ্বের নিকট পরিচিত করাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার শিক্ষা।"[১]

জওহরলাল বিবেকানন্দের শক্তিবাদকে বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু যখন "দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই করবার" জন্য উৎসাহিত করছিলেন, তখন বহুদিনের স্বীকৃত গান্ধীনীতি অসুবিধাজনক

---

[১] যুগান্তর ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৩

এই বক্তৃতার রিপোর্টের কিছু অংশ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৩ এই প্রকার ঃ

"Paying rich tribute to the manifold genius of Swami Vivekananda, the Prime Minister said, Swamiji was India's greatest good will ambassador in outside world, He had a luminous mind. His writings roused the minds and hearts of people, and had tremendous effect on him. (Mr. Nehru)".

ঠেকেছিল। অনেকেই বলেছিলেন, "তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর দেশের লোক, সুতরাং কিভাবে লড়াই করিবেন?" এই "অত্যন্ত ভুল ধারণার" খণ্ডনে নেহরু বলেছিলেন, গান্ধীজী অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত করতে বলেননি; বলেছিলেন, "ভীরুতা ও অস্ত্রধারণের মধ্যে যদি একটিকে বাছিয়া লইতে হয়, তিনি সকল সময়ে দ্বিতীয়টিকে বাছিয়া লইবেন।"[২] তাহলেও ভারতবর্ষীয় অহিংসাবাদের সঙ্গে কামান-বিমান-যুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন হচ্ছিল। নেহরু সেইজন্য অধ্যাত্ম-পুরুষরূপে সুপরিচিত বিবেকানন্দের অভীঃমন্ত্রের কথাই স্মরণ করবার নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

দেশের সঙ্কটকালে বিবেকানন্দের শক্তিমন্ত্র শোনাতে জওহরলাল এতই উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যে তিনি স্বামীজীর উপরে আরও একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। নয়া দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনে ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের ঐ বক্তৃতায় তিনি চীনা আক্রমণের ঘোর বিপদের কথা তুলে বললেন, "ঐ সমস্যা সমাধানের কোন যাদুমন্ত্র নাই;" সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে "মহাপুরুষগণের নির্দেশিত পথের অনুসরণে।" পুনশ্চ তিনি কেবল দুই মহাপুরুষের কথাই বললেন, বিবেকানন্দ ও গান্ধী: "বহু বিষয়ে স্বামীজী ও গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সাদৃশ্য ছিল। দুজনেই জানিতেন যে, ভারতের কোথায় শক্তি আর কোথায় দুর্বলতা। সাধারণ মানুষের মনে নির্ভীক চেতনা জাগাইয়া তুলিতে তাঁহাদের দুই জনেরই যথেষ্ট অবদান আছে।"

তবু গান্ধীর নয়, বিবেকানন্দের আদর্শই ঐ সঙ্কটক্ষণে অধিক বরণীয় বলে নেহরুর মনে হয়েছিল। সেজন্য তিনি বিবেকানন্দের রচনাবলী তরুণদের পড়বার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছিলেন: "স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষের নিকট দেশবাসীর সর্বাপেক্ষা শিক্ষণীয় হইল ভয়কে পরিহার করা। চীনা আক্রমণের ফলে দেশে আজ যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে স্বামীজীর আদর্শ ও কার্যক্রম অনুসরণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিক্ষা ও কার্যক্রম দ্বারা জাতির জীবনে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যে-মানুষ দুর্বল ও ভীরু তাহারা জীবনে কিছুই অর্জন করিতে পারে না।··· যদি আমাকে বালক ও যুবকদের নিকট একজন আদর্শ মহাপুরুষের নাম করিতে হয়, তবে প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক।"

আধুনিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর—এই দুই পর্বেই জওহরলাল নেহরু গভীর দাগ কেটে গেছেন। প্রথম পর্বের অন্যতম প্রধান নেতা তিনি এবং দ্বিতীয় পর্বের প্রধানতম। কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর আগ্রহ ছিল, এদেশে সমাজতন্ত্রী ভাবধারা প্রচারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যন্ত্রশিল্পায়নে উৎসাহের কারণে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতিত্ব করেছেন। ভাবনা, বক্তৃতার জন্য যেমন বিখ্যাত, তেমনি তিনি বিখ্যাত তাঁর লেখার জন্যও। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রগতিশীল বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ থাকায় যুবকেরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

জওহরলাল আধুনিক বুদ্ধিজীবী, উদারনৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁর কাছে মানুষের অধিকারহরণ অত্যন্ত অনুচিত, সেজন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, কিন্তু তাই বলে সুখাভিলাষী হব না কেন? ধর্ম—বড়ই রহস্যময়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বহির্বর্তী, যুক্তিহীন, প্রায়শই অন্ধতার পোষক, ধর্ম নিয়ে ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই, যখন বাস্তব-জীবনের মতো শক্তি ও সময়গ্রাসী ব্যাপার উপস্থিত।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ জওহরলালের জীবনে অন্যভাবে ধর্ম এসে গিয়েছিল, যার রূপ তিনি দেখেছিলেন রোমাঁ রোলাঁর রচনার মধ্যে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীতে রোলাঁ যে-ধর্মের রূপরেখা এঁকেছিলেন। জওহরলাল লিখেছেন: "রোমাঁ রোলাঁ যেভাবে ধর্মের অর্থ প্রসারিত

---

[২] যুগান্তর, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৩

করিয়াছেন, তাহাতে সম্ভবতঃ আনুষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ারা ভয় পাইবেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীতে বলিতেছেন : …অন্যপক্ষে একদল মানুষ আছেন, যাঁহারা নিজেদের সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা নিজেদের অতি-যৌক্তিক চেতনার ('Super-rational consciousness') মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত রাখেন—এবং এই অতিযৌক্তিক চেতনাকে আখ্যা দেন সোস্যালিজম্, কমিউনিজম্…। কিন্তু চিন্তার বিষয়বস্তু নহে, চিন্তার প্রকৃতির দ্বারাই চিন্তার মূল নির্ধারিত হয়।… যদি কোন চিন্তা নির্ভীকভাবে, সমস্ত ক্ষতির বিনিময়ে, সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, সত্যের সন্ধান করে, তবে আমি সেই চিন্তাকে ধর্মমূল বলিব।… এমন কি সংশয়বাদও যখন কোন শক্তিমান স্বভাবের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত হয়, তখন তাহা দুর্বলতা প্রকাশ না করিয়া শক্তিকে প্রকাশ করে —তখন তাহা ধর্মাত্মাগণের মহান বাহিনীর অভিযানে অংশগ্রহণ করে।" "[৩]

এই অংশ উৎকলন করার পরে নেহরু বলেছেন – "রোমাঁ রোলাঁ যে-সকল নিয়ম ও পণের উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেগুলি পূরণ করিতে পারিব, এমন ভরসা রাখি না, তবে ঐ শর্তে আমিও সেই মহান সৈনিকদলের এক অনুচর হইতে প্রস্তুত।"[৪]

জওহরলাল ঠিক কোন্ সময় থেকে বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে দুটি ঘটনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, একথা বলা যেতে পারে। প্রথম ঘটনা—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রোঁমা রোলাঁর রামকৃষ্ণ জীবনী ও বিবেকানন্দ-জীবনীর প্রকাশ, যার মধ্যে আধুনিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনের ভাবপূর্ণ, শক্তিসমৃদ্ধ উপস্থাপনা ছিল। দ্বিতীয় ঘটনা—স্বামী শিবানন্দের কাছে নেহরু-পত্নী কমলার দীক্ষাগ্রহণ। কন্যা ইন্দিরার বাংলায় অবস্থানকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজ) সস্নেহ তত্ত্বাবধানও নিশ্চয়ই জওহরলালের কৃতজ্ঞতার কারণ হয়েছিল। সেইসঙ্গে দীর্ঘ কারাবাসের কালে তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর গভীরতর অনুশীলনের।

আমেদনগর দুর্গে কারারুদ্ধ থাকার সময়ে 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' নামক বৃহৎ পুস্তকটি জওহরলাল লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের 'জীবনদর্শন' নামক অধ্যায়ে জওহরলাল নানা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক মতসমূহের ব্যাখ্যার পর ঝুঁকে পড়েছেন অদ্বৈত বেদান্তের দিকে। এই সূত্রে বিবেকানন্দের নামোল্লেখ না করেও তাঁর সুপরিচিত উক্তিগুলি উদ্ধার করেছেন। 'ষড়্দর্শন' নামক অধ্যায়ে জওহরলাল বেদান্ত ও যোগ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার বিশেষ উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থেরই 'রিফর্ম অ্যাণ্ড আদার মুভমেণ্টস্ অ্যামাং হিন্দুস্ অ্যাণ্ড মোসলেমস্' নামক উপ-অধ্যায়ের অনেকটা স্থান নিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ কথিত। এর মধ্যে নেহরু সংক্ষেপে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-কথা বলেছেন, এবং নিজ প্রবণতা অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জওহরলাল বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেছেন। সাময়িক পত্রে এবং পুস্তিকাকারে সেগুলি প্রকাশিতও হয়েছে। এইসব বক্তৃতার মধ্যে যেমন 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'তে প্রকাশিত বক্তব্যের সারাংশ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি প্রেক্ষিত অনুযায়ী নতুনতর মাত্রাও দেখা যায়। জওহরলালের বক্তব্য ঃ

"বর্তমানে কতসংখ্যায় তরুণেরা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ করে থাকে জানি না কিন্তু একথা বলতে পারি, আমাদের কালের বহু মানুষ তাঁর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত। আমার বিশ্বাস, বর্তমানের মানুষেরা যদি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ করে তাহলে তার থেকে

---

[৩] 'আত্মচরিত', জওহরলাল নেহরু—সতেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭১, পৃঃ ৩০৮

[৪] ঐ, পৃঃ ৩০৮

তারা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং তাদের অতীব মঙ্গল হবে।"[৫]

কিছুদিনের মধ্যেই (৪. ৩. ১৯৫১) জওহরলাল বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে বললেনঃ "আমার প্রথম যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন বই ও বক্তৃতাবলী পড়েছি। পরবর্তী কালে কারাবাস কালে যখন অবসর মিলেছে, তখন সেগুলিকে আবার পড়েছি। সবিস্ময়ে দেখেছি তার অক্ষয় রূপ, তা সমগ্র ভারতীয় আদর্শ ও বাণীর আধার।"[৬]

কিন্তু কেবল বিবেকানন্দ নন, বিবেকানন্দের গুরু, এযুগের প্রধান ধর্মপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকেও জওহরলাল প্রণতি না জানিয়ে পারেননি। ২০ মার্চ ১৯৪৯ তারিখে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে নেহরু যে বক্তৃতা দেন তার প্রথমেই তিনি নিজেকে পার্থিব মানবরূপে চিহ্নিত করে ঐশ্বরিক-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলার যোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। নেহরু বলেছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলার বিশেষ যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না—কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঐশ্বরিক মানব (Man of God); আর আমি পার্থিব মানুষ, জাগতিক কর্মে লিপ্ত, যা আমার সকল শক্তিকে গ্রাস করে।"

পরম শ্রদ্ধায় জওহরলাল বলেছেনঃ

পরমহংস স্পষ্টতই সাধারণ মানবসমাজের গণ্ডীর বহির্বর্তী। ভারতের বিরাট ঋষিদের ধারাতেই তাঁর আবির্ভাব—যে-ঋষিরা যুগে যুগে এসেছেন জীবন ও আত্মার ঊর্ধ্বতর রূপ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।"

চরম সত্য এক ও অখণ্ড। কিন্তু আপেক্ষিক জগতে সত্য নানা আকারে প্রকাশিত। সেই বহুত্বকে স্বীকারের দ্বারা ভারতবর্ষ মতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'তে দেখা গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ধর্মসাধনার সমাদরমূলক উল্লেখ নেহরু করেছিলেন। নেহরু জনজীবনের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকদের চিন্তা ও কর্ম সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। রামকৃষ্ণের মতো প্রফেট ও তাঁর আদর্শের কথা বলার সময়ে তিনি তাঁর মতো রাজনৈতিকদের আচরিত কর্মের ঔচিত্য বিষয়ে সম্ভাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। প্রফেট ও রাজনৈতিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যাবলী পৃথক হয়ে পড়ে। সম্মুখবর্তী সমস্যার মোকাবিলায় রাজনৈতিককে যেখানে বাধ্য হয়ে আপসের পথ নিতে হয়, সেখানে প্রফেটরা চিরন্তন সত্যের অনুগামী হিসাবে আপস-বিরোধী। নেহরু বলেছেন, রাজনৈতিকরা বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না, পিচ্ছিল পথে চলবার সময়ে অবাঞ্ছিত হাত তাঁদের ধরতে হয়। কিন্তু যদি তাঁদের চূড়ান্ত পতন থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়, তাহলে প্রফেটদের সত্যপথের আলোকের দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে। রামকৃষ্ণের মতো মানুষ দূরবর্তী, কিন্তু দূরবর্তী আলোকস্তম্ভও বটে—জওহরলালের সিদ্ধান্ত তাই।

জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর সমগ্র পরিবারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব কি ছিল, তার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রূপ দেখে নিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেছেন নেহরু-কন্যা ইন্দিরা গান্ধী—যখন তিনি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ তারিখে কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ রক-মেমোরিয়াল দর্শনান্তে ভাষণ দিয়েছিলেনঃ

"আমার পিতা ও মাতা, বিশেষতঃ আমার মাতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একথা অতি যথার্থ যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তা প্রভাবিত করেছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে, একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেও।"

---

[৫] Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, Jawaharlal Nehru,—Advaita Ashrama, Mayavati, 1949, pp, 1-5

[৬] Prabuddha Bharat, April 1951 pp, 91-92

কবিতা

বিবেকানন্দ-দর্শনম্

নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

নান্যদেকা চিত্রমালা জগদেতচ্চরাচরম্ ।
এষো বর্ণময়ো বর্গো ভাবমেকং প্রকাশতে ॥১॥

মানুষাঃ পূর্ণতাং যান্তি নান্যা বার্তা তু বর্ততে ।
পশ্যামঃ কেবলং তস্মি নৃনির্মাণং কথং ভবেৎ ॥২॥

আদর্শস্য বর্ণনঞ্চ শক্যতে স্বল্পশব্দভিঃ ।
ব্রহ্মত্বঞ্চ মনুষ্যাণামাচারে তৎপ্রকাশনম্ ॥৩॥

অন্নদানং বরং মন্যে বিদ্যাদানং ততঃ পরম্ ।
জ্ঞানদানং সদাশ্রেষ্ঠং জ্ঞানেন হি বিমুচ্যতে ॥৪॥

জ্ঞানভক্তিক্রিয়াযোগৈঃ রাজযোগসমাশ্রয়ে ।
সমং বৈ লভতে জ্ঞানমেকেনৈবাধিকেন বা ॥৫॥

ঈশ্বরো বৈ যবিষ্ঠঃ স্যাদিতিশ্রুতিবিবেচনা ।
যুবানো ধর্মশীলাঃ স্যুঃ শীলং ধর্মস্য ভূষণম্ ॥৬॥

জীবঃ শিব ইতি জ্ঞানং নরো নারায়ণো ধ্রুবম্ ।
জীবসেবা পরো ধর্মঃ পরোপকৃতয়ে বয়ম্ ॥৭॥

উত্তিষ্ঠত চরৈবেতি গুণান্ তামসিকান্ জহি ।
জাতশ্চেৎ প্রেহি সংসারাৎ ত্যক্ত্বা চিহ্নমনুত্তমম্ ॥৮॥

আলস্যং রোদনং বাপি ভয়ং ভাগ্যফলোদ্ভবম্ ।
ত্বয়ীমানি ন শোভন্তে জহি তানি মনোবলৈঃ ॥৯॥

মন এব মহচ্ছত্রুর্বন্ধুরপি তদেব হি ।
মনো দাসঃ প্রভুস্তস্য যদেকোঽসি তস্থা ভবেৎ ॥১০॥

জগতি সতি সত্যে তু ন লাভশ্চেৎ কিমু ক্ষতিঃ ।
প্রপঞ্চস্যাপি দেহস্য প্রয়োগে পুরুষার্থতা ॥১১॥

দেহোঽয়ং বদতি ব্যাসঃ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ ।
লব্ধব্যং প্রাক্ বলং দেহে ততো লভেৎ
মনোবলম্ ॥১২॥

মনসশ্চেন্দ্রিয়গ্রামসংযমাৎ তদ্বলং লভেৎ ।
আত্মবলং তদাযাতি যদ্বলেন জগজ্জয়ঃ ॥১৩॥

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ নূনমুভৌ তু কর্মণী ।
প্রবৃত্তিঃ স্বার্থবুদ্ধ্যাশ্চ নিবৃত্তিস্তদ্বিসর্জনে ॥১৪॥

নাহমগ্রে কদাপি স্যামন্যে সন্তু পুরঃ সদা ।
ত্যাগেঽস্মি প্রথমো নিত্যং ত্যাগঃ কাষ্ঠা
মতং ধ্রুবম্ ॥১৫॥

ত্রিলোকেষু কুতঃ পাপং ত্রিকালে ন ভবত্যপি ।
পৌরুষঞ্চ পুনর্বার্তা হ্যাত্মশ্রদ্ধা মহদ্বলম্ ॥১৬॥

প্রযত্নং শ্রদ্ধয়া কুর্যাৎ ধৈর্যেণৈকাগ্রচেতসা ।
শুদ্ধতয়া চ বীর্যেণ তরিতুং ভয়মুল্বণম্ ॥১৭॥

ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সূক্তং ব্রহ্মময়ং সনাতনম্ ।
দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে বৃহদারণ্যকং জগৌ ॥১৮॥

ঈশাবাস্যমিদং সর্বমসত্যং তৎ কথং ভবেৎ ।
যতঃ সর্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরম্ ॥১৯॥

অহমস্মীব সর্বত্র নাস্তি যন্ন ভবাম্যহম্ ।
কথং দুঃখং পরেষাং যৎ ন মে তদ্দুঃখকারণম্ ॥২০॥

পরেষাং বৈ হিতার্থায় স্বদেহস্য বরং ক্ষয়ঃ ।
জাড্যালস্যপ্রসুপ্তানাং জীবিতে কিং সমাঃ
শতম্ ॥২১ ॥

জীবন্তি কেবলং তে যে পরার্থৈকান্তজীবিতাঃ ।
অন্যেঽবরা মৃতেভ্যোঽপি জীবিতং যন্ন
তাদৃশম্ ॥ ২২ ॥

পরার্থে জীব ধীমন্ ত্বং পরসেবাপরায়ণঃ ।
জুহুয়াৎ জীবনং কর্তুং সার্থকং নরজীবনম্ ॥২৩॥

ন মন্যেঽস্তি তস্য ভাবো ন শক্নোতি যদীশ্বরঃ ।
দাতুং খামমুখে চান্নমনাথিন্যশ্রুমোচনম্ ॥ ২৪ ॥

ভুক্তির্হেয়া ন মুক্তেষা ভক্তিঃ কিঞ্চিদপেক্ষতাম্ ।
সর্বমুক্তি কাময়েঽহমুদারশ্রুতিসম্মতাম্ ॥২৫॥

সংসার এষঃ শুন এব পুচ্ছঃ
কৌটিল্যভাবং ন তু যাতি নূনম্
তথাপি পুংসঃ প্রযতঃ স্বভাব
ইত্থং শনৈর্যাতি প্রসাদমার্গম্ ॥২৬॥

কন্যাকুমারীর শিলায়

পলাশ মিত্র

কন্যাকুমারীর শিলায় ধ্যানমগ্ন তিনি।
মাথার উপর অনন্ত আকাশ
চারপাশে তিন সমুদ্রের
উদ্বেলিত উচ্ছলিত জলকল্লোল।
তাঁর গভীর গম্ভীর
ধ্যানমগ্ন রূপের কাছে
সমুদ্র বুঝি ম্লান ঃ
তাঁর মুখমণ্ডলের জ্যোতি আর শুভ্রতার কাছে
সফেন সমুদ্রের শুক্লতা বুঝি মলিন।
তিনি কিন্তু অটল শিলার মতো ভ্রূক্ষেপহীন ঃ
শান্ত সমাহিত নিষ্পলক ;
মনে হয় যেন পিনাকেশ
অথবা ভারতাত্মার নবীন সাধক।
কন্যাকুমারীর শিলায় ধ্যানমগ্ন তিনি।
চারিদিকে অসংবৃত দুরন্ত বাতাস ঃ
পার্থিব কামনা নয়, মুক্তি নয়,
কিছু নয়—
ব্যথাতুর মানুষের কল্যাণে কেঁদে ওঠে
তাঁর চিদাকাশ।

বিবেকানন্দ ঃ একটি সনেট

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

হে ভারত, ভুলেছ কি সে উদাত্ত উন্নত মহিমা,
চেয়েছিল বিশ্ব যার সমুজ্জ্বল গৈরিক চূড়ায়।
মধ্যাহ্নভাস্করনিভ অগ্নিময় সে বাণী কুড়ায়
সুদূরে প্রতীচ্যবাসী, ব্যাপ্ত করে জীবনের সীমা।
হে ভারত, আজ তুমি পুনরায় কার মুখে চাবে ?
আদিগন্ত প্রসারিত কোথা সেই দৃষ্টির বিস্তার ;
যে অমর বাণী শুনে আবার নতুন পন্থা পাবে
সমস্যাসঙ্কুল বিশ্ব। ভারতজননী বুঝি আর
এ-প্রজন্মে হবে নাকো পুনরায় জ্যোতিষ্কসম্ভবা।
সে ছিল নির্বোধতন্ত্র, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাকি
ঘোর আত্মপ্রতারণা, ঐসব ওপরচালাকি
মাতারা বর্জন করে আত্মকেন্দ্রে আজ পুনর্নবা।
তবুও প্রশ্নই থাকে অনাগত একুশের মুখে,
এ-প্রজন্ম ভোগে কেন অস্তিত্বের জটিল অসুখে ?

অমৃতের পুত্র

চন্দনা সরকার

ঐতিহাসিক সেই মহালগ্ন।
প্রাচীন ভারতের সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনল
পাশ্চাত্যের মানুষ তোমার মুখে ঃ
'শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ,
শোন দিব্যলোকের অধিবাসীগণ,
আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি।
তিনি সকল অন্ধকারের পারে,
তাকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।'
পাপবাদের বকুনি শুনতে অভ্যস্ত
পাশ্চাত্যের মানুষ প্রথম শুনল এই অভয়ের বাণী ঃ
'মানুষ পাপী নয়, মানুষ অমৃতের পুত্র।
মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ।
মানুষের যথার্থ রূপের উপর
মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ'।
শুনল সেই দিব্য আহ্বান ঃ
'তোমরা জড় নও, তোমরা চৈতন্য।
জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও'।
তুমি বলেছিলে ঃ
'মানুষ মিথ্যা থেকে সত্যে যায় না।
নিম্নতর সত্য থেকে যায় উচ্চতর সত্যে।
অবশেষে উপনীত হয় সেই পরম সত্যে
যার অপর নাম ঈশ্বর
যা তোমারই পূর্ণ বিকশিত স্বরূপ'।

কালীপুজোর রাত্রি

সুব্রত রুদ্র

অন্ধকারের কী এক গম্ভীর শোভা—
অমাবস্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে
বলে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ।
ভাল লাগে ভয়ঙ্কর যা কিছু,
জন্মে যারা শুধু খোঁজে দুঃখকে।
ঐ একটা জীবন, মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে
প্রহারের উন্মাদ কবিতার লাইন,
আগুন উসকে উঠছে
চণ্ড উপাদান…

বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে

অমল সরকার

বিবেকানন্দ আজ বেঁচে থাকলে
আমার মেরুদণ্ডখানা একবার দেখাতাম।
তা কি সোজা হবে, না, ধনুকের মতো
আরো বেঁকে যাবে ?
অথচ পঁচিশ বছরের যুবক আমি,
তারুণ্যে দৃপ্ত থাকার বয়েস—রাগ ও অনুরাগের
যে বয়েস জীবন ও যৌবনের।
আমার মেরুদণ্ড এমন হওয়ার কথা ছিল না।
বিবেকানন্দ আজ বেঁচে থাকলে
আমার মাটির মালসায় ফুটে ওঠা
একটি গোলাপ ফুল দেখাতাম।
কোন সুগন্ধ, সৌন্দর্য অনুভব করেন কিনা,
অথবা গন্ধহীন, বিবর্ণ দেখেন তাকে।
অথচ গোলাপ ফুলটি পূর্ণ পাপড়িতে
বিকশিত হয়েছিল।
প্রজাপতি আসবে বলে
রূপ ও রঙবাহারে সে উন্মুখ হয়ে থাকত।
কিন্তু প্রজাপতি আসেনি।
গোলাপটা শুকিয়ে যাচ্ছে,
হারিয়ে যাচ্ছে তার সুগন্ধ, সৌন্দর্য।
বিবেকানন্দ আজ বেঁচে থাকলে
তাঁর একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতাম।
জিজ্ঞাসা করতাম গলাটা কি ভরাট হবে,
শব্দ-প্রক্ষেপ ঝড় তুলবে মানুষের মনে ?
অথচ গলাটা দেখতে বেশ পুরুষ্টু,
রগটগ ছেঁড়াফুটো নয়।
কিন্তু সে গলার স্বরে কেউ ফিরেও চায় না।
বিবেকানন্দ আজ বেঁচে থাকলে শুধাতাম
দেখতে তো আমরা একই মানুষ,
কিন্তু 'মানুষ' হব কি করে ?
না কি অমানুষই হব মানুষ হয়ে ?
অথচ রক্তমাংসের শক্ত মানুষ আমরা।
মনুষ্যত্বের পূর্ণ বলয়
মাধুর্যের ও হৃদয়ের, তেজ ও বীর্যের,
যে মানুষ মন ও মননের, তা কেমন করে হবে ?
শুনেছি বিবেকানন্দের মেরুদণ্ডখানা
সোজা ছিল ইস্পাতের মতো,
পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ হয়ে
তিনি সৌন্দর্য ও সুগন্ধ বিতরণ করেছিলেন।
চীনা ঘণ্টাধ্বনির মতো তাঁর কণ্ঠস্বর
ধ্বনি তুলেছিল লক্ষকোটি মানুষের বুকে,
মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমার
সাকার বিগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি
মানুষরূপী সহস্র অমানুষের মাঝে।

মহাকালের ডাক

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পড়ে তো ছিলই দূরে স্বাদে গন্ধে ছিল
অমৃত যে ছিল তার খবর রাখেনি
পাঁজরে আগুন ছিল, স্নেহময় চোখ ছিল
কাঁধ অব্দি ছুঁয়ে ছিল ব্যথিত মানুষ।
ডাক দিল ঃ আয়
নীহারিকাপুঞ্জ থেকে, সমুদ্রের নিবিড়তা থেকে
জীবনের বিশালতা থেকে
এই ডাক শুনেছিল।
যেরকম ডাক শুনে লতাগুল্ম বৃক্ষকে জড়ায়
যে ডাকে বৃষ্টি নেমে আসে
যে ডাকে প্রদীপ জ্বলে ওঠে
যে ডাকে বিবেক জাগে বীজের আহ্লাদে।

পথ

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

যে কথা জেনেছি, যে গান শুনেছি
তাঁকেই জানি,
এ জীবনতারে বেজে ওঠে সুরখানি।
কাদাই মেখেছি, আড়ালে কেঁদেছি
পাইনি খুঁজে
পথের ঠিকানা। প্রতিদিনই থাকি—
দুচোখ বুজে।
অজ্ঞানতার আঁধারেই আজও আছি
আলোহীন ঘরে রোগ-ভোগে-মোহে বাঁচি।
বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ শোন
ত্যাগেই বাঁচব, প্রেমেই জাগব
পথ নেই আর কোন॥

আনন্দ আর আনন্দ

তরুণ সান্যাল

উড়াল মেঘের মধ্যে বাঁকা চাঁদ, নীচে শস্য বা অরণ্যে ফুল
সে তো অর্ধনারীশ্বরই, চৈতন্য আতুর করা জ্যোৎস্নায় বিজন
দশদিশি ছায়াচ্ছন্ন, হঠাৎই চমকায় তীব্র বিদ্যুতে ত্রিশূলে,
তাণ্ডবে বা লাস্যে নৃত্য ডমরু ডিম ডিম যার বিলয় সৃজন।
পদপাতে বিকলাঙ্গ-বিকৃতি মূর্ছায় যায়, আবৈখরী পরা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মহাবিশ্ব প্রবাহিত ধরেছে সঙ্গীতে,
—সে সবই মানুষ জানে, মানুষেরই মহিমায় আন্তর অধরা
জীবনকে ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যে বেঁধেছে এই দেহেরই নিভৃতে।
ওষধি ও বৃক্ষ লতাগুল্মে পাখী পতঙ্গ বা কীট পশু জীব
গৃহস্থ ও বন্য,—এই চরাচর তেজ ব্যোম নিখিল বিস্তৃতি
সবই করুণায় ধৃত—যে জানে সে পায় সত্তা, এবং সে শিবই,
আর মানুষের জন্যে সে হয় বিপ্লব, তার নতুন নির্মিতি
অন্নে ব্রহ্ম কর্মে ব্রহ্ম বা মানব ধর্মে ব্রহ্ম উৎসারই জীবন
এবং বিবেক তার আনন্দ—আনন্দ, আর আনন্দই পণ।

ব্রহ্মানন্দ লহ প্রণাম

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়

ঐশী লীলার রঙ্গমঞ্চে নিপুণ নাট্যকার
দিল হাতছানি যত কুশীলবে,
“ওরে তোরা আয়, আয় তোরা সবে।”
দিয়েছিলে সাড়া তুমি সেই ডাকে
ছাড়ি গৃহ সংসার ॥
নটগুরু সহ শুরু হল অভিনয়,
মানসপুত্র তুমি হলে তাঁর,
প্রিয়-আত্মীয় তাঁর আত্মার ;
উৎসর্গিত জীবন তোমার
শ্রীরামকৃষ্ণময় ॥
দিব্যহস্ত পরশে ধন্য, ঘটিল রূপান্তর,
নূতন জীবন, মুণ্ডিত কেশ,
ডোর-কৌপীন, ভিখারীর বেশ ;
পরম পথের সন্ধান পেয়ে
পুলকিত অন্তর ॥
আত্মিক স্তরে ওঠে তরঙ্গ, চাহিলে না পিছু পানে
পত্নী পুত্র জননীর স্নেহ,
হয়ে গেল পর, তারা নহে কেহ ;
মন্ত্রমুগ্ধ নারায়ণ-সখা
ইষ্টের আহ্বানে ॥
গুরুর পুত্র গুরুসম জ্ঞানে সবাকার পূজনীয়,
গুরুভ্রাতাগণে সম সমাদরে,
নিয়েছিলে টেনে আপনার করে,
ভেদাভেদ রেখা টান নাই সেথা
সবাই আপন প্রিয় ॥
যোগ্য নায়ক, কর্মদক্ষ সহজ সরল প্রাণ,
গুরু-নামাঙ্কিত মহান মিশনে
বসাল তোমারে শ্রেষ্ঠ আসনে ;
তবু কোন দিন মনে জাগে নাই
প্রভুত্ব-অভিমান ॥
ঘর ছেড়েছিল নদের নিমাই, প্রভু-তথাগত বুদ্ধ,
একই পথের পথিক তুমি যে,
ধনসম্পদ সব কিছু মিছে ;
চির অক্ষম কি কব মহিমা
কণ্ঠ যে অবরুদ্ধ ॥
জীবন-সন্ধ্যা এসেছে ঘনায়ে, সবহারা আমি আজ,
তোমার আশিস কৃপা করুণার
শেষ জীবনের শুধু কামনার,
প্রণাম লহ গো, ব্রহ্মানন্দ,
লোকগুরু, মহারাজ ॥

প্রবন্ধ

বাঙলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যতা

হরপ্রসাদ মিত্র

ভাব-ভাবনার বৈশিষ্ট্য, ওজস্বিতা, গদ্যরীতিতে নিজস্ব ভঙ্গি এবং অল্পসংখ্যক হলেও তাঁর রচিত কবিতা ও গানগুলির মাধ্যমে আবেগধর্মী রচনায় বাঙলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের যে ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর বিদ্যমান তা অনন্যসাধারণ। তাঁর প্রধান মৌলিক বাঙলা গদ্য রচনা বলতে যা বোঝায়, সেগুলি হলো যথাক্রমে 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে মাঘ, ১৩০৫ সালে—অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে। ১৩০৫-০৬ সাল থেকে প্রথম চার বছরের মধ্যেই এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, 'ভাববার কথা'-র প্রথম রচনা 'বর্তমান সমস্যা'-ই ছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রস্তাবনা। 'পরিব্রাজক' 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বছরের পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে 'বিলাত-যাত্রীর পত্র' নামে ছাপা শুরু হয়। দ্বিতীয় বছরে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। 'বর্তমান ভারত' পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকাতেই প্রথম দুবছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এছাড়া স্বামীজীর কিছু বাঙলা চিঠি এবং বাঙলা কবিতা তাঁর সাহিত্যবিচারের সময়ে বিবেচ্য।

বিবেকানন্দের লৌকিক-অলৌকিকের মিশ্র অভিজ্ঞতা, তাঁর অধ্যয়ন, কৌতূহল, যোগ, সমাধি, সর্বজীবে প্রেম, তীক্ষ্ণ বিচার, গভীর অভিনিবেশ, বিশ্বভ্রমণের ব্যাপ্তি, তেজস্বিতা ইত্যাদি ছিল তাঁর বাঙলা রচনাবলীর স্থায়ী প্রেরণা। আধুনিক প্রায় দুশো বছরের বাঙলা সাহিত্যে এরকম দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তাঁর গদ্যরীতির লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর রচনা যেন তাঁর নিজস্ব সহজ মৌলিক উচ্চারণ। তা অকৃত্রিম এবং প্রত্যয়গুণে চিত্তাকর্ষক।

উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে রামমোহন রায় যেমন এদেশে অন্ধ আচারের বন্ধন থেকে জনমানসের ব্যাপক চিত্তজাগৃতির আন্দোলন ঘটিয়ে গেছেন, স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি পরবর্তী পর্বে প্রবল আর-এক আন্দোলনের নেতার ভূমিকাতেই তাঁর ইংরেজী ও বাঙলা রচনা, ভাষণ ইত্যাদি রেখে গেছেন। তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে এই বিদ্রোহী ও সংস্কারক সত্তা থেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখা সম্ভব নয়। 'বাংলার নবযুগ' বইটিতে মোহিতলাল মজুমদার, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন সম্পর্কিত আলোচনায় যা লেখেন তার দুটি মাত্র বাক্য এই সূত্রে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। মোহিতলাল লিখেছেন ঃ "প্রায় সমসাময়িক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে মানুষমাত্রেরই যে স্বাধিকারবোধ—রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছিল,—রামমোহনের এই চেষ্টার মূলেও তেমনই এক ভিন্নতর বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিবার সেই একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইহাই সেযুগের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা।" তবে, মোহিতলাল লেখেন যে, রামমোহনের নতুন মুক্তিতন্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুক্তিবাদ শুধু সেকালের পণ্ডিতসমাজকেই আঘাত করেছিল, জাতির ব্যাপক সমষ্টিচৈতন্যে তার কোন সাড়া জাগেনি। ইউরোপের সংস্পর্শে ইউরোপের সাহিত্য-বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম প্রভৃতির চর্চা এবং স্বদেশের লুপ্ত ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারের উদ্যম—রামমোহনের মধ্যে এই দুই অভিমুখিতাই দেখা দেয়। মোহিতলাল মনে করেন, বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহ রামমোহনের তুলনায় বহুগুণে গভীর ও ব্যাপক ; কারণ, বিদ্যাসাগর সেবা ও প্রেমের শক্তিতে সাক্ষাৎ জীবনের ক্ষেত্রেই তাঁর বিদ্রোহকে 'সাকার' করে তুলেছিলেন। এসব মন্তব্যের চুলচেরা বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের ঠিক পূর্বের অবস্থা এক নজরে দেখে নেবার জন্যেই এসব কথার অবতারণা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে 'বিনয় সরকারের বৈঠক (দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৪৫)' বইয়ে অধ্যাপক সরকারের এই

মন্তব্যটিও একই কারণে স্মরণীয়ঃ "বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দেবী মামুলি হিন্দু দেব-দেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জল-মাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদ-নদীর দেবী, দেশ-দেবী, বাংলাদেশ। নয়া আধ্যাত্মিকতার ফোয়ারা ছুটছে এই মন্তর থেকে।" তিনি আরো লেখেন—"বন্দেমাতরম্ অহিন্দু আধ্যাত্মিকতার মন্তর, ভক্তিমার্গী নাস্তিকতার সুরা। এই মন্ত্রে কোঁৎ-পন্থী বঙ্কিম-দর্শনের সমাজসেবা বা মানব-পূজা সরস মূর্তি পেয়েছে।" স্বামীজীর সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় এই ধরনের মতামতের প্রাসঙ্গিকতা কতদূর, সেবিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় লাভের জন্যেই এইরকম কিছু কথার অন্ততঃ উল্লেখটুকু অনিবার্য।

এই কারণেই 'স্বদেশমন্ত্র' থেকে তাঁর গদ্য ভাষাভঙ্গির সর্বাধিক আবেগস্পন্দনের সুপরিচিত নমুনা—তাঁর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'সখার প্রতি' ইত্যাদি কবিতা এবং আরও নানা রচনা বারবার স্মরণীয়। তাঁর বাঙলা চিঠিগুলি একটু দেখা যাক। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে বোম্বাই থেকে ইন্দুমতী মিত্রকে লেখা সাধুরীতির বাঙলা গদ্যে তাঁর একটি চিঠির ভাষার নমুনা দেখা যাক। সে-পর্বে তিনি 'সচ্চিদানন্দ' নাম ব্যবহার করতেন। হরিপদ মিত্রের স্ত্রী ইন্দুমতীকে তিনি এই চিঠিতে লেখেনঃ "মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে যাইতে পারি না, কারণ ৩১ তারিখে এখান হইতে আমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র।" এই চিঠিরই কয়েক ছত্র পরে তিনি লেখেনঃ "তুমি ইন্দুমতী দাসী কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ-মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস, অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা ইন্দুমতী মিত্র ইত্যাদি।"

আরও বছর-তিনেক আগে, বাগবাজার কলকাতা থেকে স্বামী সারদানন্দকে ৬ জুলাই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা চিঠির ভাষার পার্থক্য দেখার জন্যেই সেখান থেকে এই নমুনাটুকু দেওয়া হলোঃ "আমার মনে হয়, তোমাদের কলিকাতা আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা এ পর্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটি তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটিই কর নাই, অর্থাৎ কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে, তাকে 'ওঠ ছুঁড়ী, তোর'বে', ব'লে জাগিয়ে দিলেই হলো। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই মুষ্টিমেয় লোকের অধিক কেহ জ্ঞান লাভ করে না, এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ-বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত; তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরান চাল, জানই তো। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের নামে যে ঠকবাজী চলিতেছে, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক এবং বীর্যবান হও। রাখাল লিখিতেছে যে, দক্ষ (অর্থাৎ স্বামী জ্ঞানানন্দ) তাহার সঙ্গে বৃন্দাবনে আছে এবং সে সোনা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে, আর একজন পাকা জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান তাহাকে আশীর্বাদ করুন এবং তোমরাও বল, শান্তিঃ! শান্তিঃ!"

তাঁর অজস্র ইংরেজি চিঠির বঙ্গানুবাদ আছে। সেগুলির সঙ্গে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাঙলা চিঠির সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব বাঙলা ভঙ্গির প্রসঙ্গে সেসব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'আরে দাদা', 'পাদ্রী-ফাদ্রী', 'গপ্পি' (গালগল্প অর্থে), 'পোড়া হিংসেটা' ইত্যাদি শব্দ,—ক্ষণে ক্ষণে সংস্কৃত থেকে সদুক্তি, কাব্যাংশ বা শাস্ত্র বাক্যাংশ, ভূরি পরিমাণে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার তাঁর এইসব বাঙলা চিঠিতে পাওয়া যায়। দেশে ছিলেন যখন, তখনও যেমন,

বিদেশ থেকে লেখা চিঠিতেও তেমনি। তবে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কের প্রভেদ অনুসারে ভাষার চাল বা ভঙ্গিরও পার্থক্য দেখা যায়, যেমন ১৮৮৯-এর ৪ জুলাই বাগবাজার থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে তিনি লেখেন ঃ "কাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব—এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই কলকাতায় বহু ধনী-মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়, আর মহাশয়ের সহিত এক দিবসের আলাপেই প্রাণ একপ্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।" আবার ১৮৯৪-এর ১৯ মার্চ শিকাগো থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে লিখছেন ঃ "প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো-সুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগল, তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বলল।··· দাদা, আমি দেখে-শুনে অবাক; বল বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির তো যথেষ্ট এদেশে। তবে আমার মতো তোদের হলো না, তা আমার কি দোষ?··· সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মতো মানে—মজুমদার করবে কি? পাদ্রী-ফাদ্রীর কি কর্ম? আরে এরা বিদ্বানের জাত। এখানে 'আমরা বিধবার বে দিই, আর পুতুল পূজা করি না'—এসব আর চলে না—পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে। ভায়া, এরা চায় ফিলসফি, learning ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।"

সাধুরীতির গদ্য এই পত্রাবলীতেই কোন কোন ক্ষেত্রে পোশাকি আদল ছেড়ে অনাড়ম্বর আটপৌরে চালে পৌঁছেছে। ঐ চিঠিতেই তিনি লেখেন ঃ "এদেশের বরফ যেমন সাদা, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা !!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" আবার ২০ মে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দকে লেখা চিঠির ভাষা সাধুরীতির এবং ভঙ্গি অকৃত্রিম। কিন্তু ভাষা তো আকাশ থেকে পড়ে না, তার মূল নিহিত থাকে লেখকের ভাবে, ভাবনায়, বিশ্বাসে, সঙ্কল্পে।

এইসব চিঠিতে তাঁর সংগঠনশক্তি, জীবপ্রেম, স্থিরবিশ্বাস ইত্যাদির পরিচয় সুস্পষ্ট। ১৮৯৫-এ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এবং সেই বছরেই মঠের সকলের উদ্দেশে গুরুভ্রাতাদের কাজের প্রশংসা করে পর পর দুটি চিঠিতে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতির কর্মনিষ্ঠার উল্লেখ করেন। প্রথম চিঠিতে হরমোহন একটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করছিলেন বলে উল্লেখ আছে এবং কালী, শরৎ, হরি, মাস্টার, গিরিশ-চন্দ্র প্রভৃতিকে সে-কাজে আত্মনিয়োগ করবার আগ্রহ দেখা যায়। তিনি লেখেন ঃ "দশজনে মিলিয়া একটা কার্য করা আমাদের চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে তো বড় ছোট দেখিতে পাই না, কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে, তার দৃঢ় নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ। কালী ও যোগেন টাউন-হল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল—কত গুরুতর কার্য। নিরঞ্জন, সিলোন প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে। সারদা কত দেশ পর্যটন করিয়া বড় বড় কার্যের বীজ বপন করিয়াছে। হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি, তখনই নূতন বল পাই। তুলসী, গুপ্ত, বাবুরাম, শরৎ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এক মহাশক্তি আছে। তিনি (অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেব) যে জহুরী ছিলেন, তাতে এখনও যদি সন্দেহ হয়, তাহলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাৎ কি?" প্রথম চিঠিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন ঃ

“সারদা (অর্থাৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) কি বাঙলা কাগজ বার করবে বলছে ? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়।” কালী ও যোগেন সম্বন্ধে যে উল্লেখ দেখা গেল, তা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা-টাউনহলে নাগরিকদের পক্ষ থেকে স্বামীজীর অভিনন্দন-সভা সম্পর্কে। আবার, নিরঞ্জনানন্দ সিংহলে ও দক্ষিণ-ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করে ১৮৯৫-এর প্রথম দিকে আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন, তারও উল্লেখ পাওয়া গেল। ১৮৯৪ থেকেই স্বামীজীর মনে মঠের এক আদর্শ মুখপত্র প্রকাশের চিন্তা ছিল। অবশেষে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি (অর্থাৎ ১ মাঘ ১৩০৫) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় পাক্ষিক ‘উদ্বোধন’ প্রথম প্রকাশিত হলো। সেকথা আগেই উল্লেখিত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৫-এর আর-একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে, বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলা চাই। তাতে পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় যাতে ফলপ্রসূ হয়, সেকথাও ছিল। এইভাবে নানা গঠনমূলক কাজেই হৃদয়ের বিকাশ হবে, এই কথা জানিয়ে, মা-ঠাকুরানীর (সারদাদেবীর) জন্যে একটু জমি কেনবার ব্যবস্থা করতে বলেন। একজন হৃদয়বান মহাতেজস্বী লোকের কথা সেসব ঃ “নাই বা হল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানুষি কথা। রাম রাম। আবার ‘নেই নেই’ বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কিনা ? ও কোন্ দিশী বিনয়—‘আমি কিছু জানি না। আমি কিছুই নই’— ও কোন্ দিশী বৈরাগ্য আর বিনয় হে বাপ। ওরকম ‘দীনাহীনা’ ভাবকে দূর করে দিতে হবে। আমি জানি না তো কোন্ শালা জানে ?” আবার পূর্ব প্রসঙ্গে তাঁর কথা ঃ “রাখাল ভায়া,—আমার টাকা-কড়ি সব মজুত, খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো। জমির জন্য ৩।৪ অথবা ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তো ক্ষতি নাই। ঘর-দোর এক্ষণে মাটির ভাল। একতলা কোঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর-দোর ধীরে ধীরে উঠবে। যে নামে বা রকমে জমি কিনলে অনেক দিন চলবে, তাই উকিলদের পরামর্শে করিবে। আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা ; তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ-নরকের ভেদ। এদেশের লোক এককাট্টা হয়ে কাজ করে, আর আমাদের সকল কাজ বৈরিগ্যি, হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।” এই চিঠিতেই তিনি চেয়েছেন সমিতি, সংঘ “যদি একটা মঠ বানাতে পারো, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোড়ার ডিম। মাদ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কাজ করবে। তাদের কাজ করবার অনেক শক্তি আছে।” আবার প্রচার ও গঠনের ব্যাপারে ঐ চিঠিতেই তাঁর পরামর্শ ঃ “চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে গ্রামে বা শহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি ? হরিসভা প্রভৃতিগুলোকে ধীরে ধীরে ‘স্বাহা’ করতে হবে। কি বলব তোদের ? আর একটা ভূত যদি আমার মতো পেতুম। ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন।” তাঁর ‘পত্রাবলী’ বড়ো বিচিত্র আনন্দের পাঠ। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি চিঠি লিখেছেন, যেমন ১৮৯৭-এর ১৯ মার্চ দার্জিলিং থেকে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ থেকে এবার তাঁর এই আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অন্যান্য বাঙলা রচনার কথায় এগিয়ে যাওয়া যাক।

১৩০৪ সালে রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময়ে ‘ভাববার কথা’র প্রথম প্রবন্ধ ‘হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ’ প্রকাশিত হয় ‘হিন্দুধর্ম কি ?’ নামে এক পৃথক পুস্তিকায়। এটি বেরিয়েছিল ‘উদ্বোধন’-এর চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায়। সাধুরীতির গদ্যে ‘বেদদ্রষ্টৃত্ব’, ‘জ্ঞানবেত্তৃত্ব’, ‘প্রপাতিত নদীর জলরাশি’, ‘শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময়’ ইত্যাদি শব্দসম্ভার এটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি’ হল অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার রচিত ‘The life and sayings of Ramakrishna’ বইটির সমালোচনা। ‘উদ্বোধনে’র প্রথম বছরেই পঞ্চম সংখ্যায় ম্যাক্সমূলার-কৃত ‘রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি’ নামে এটি ছাপা হয়। ম্যাক্সমূলার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট

সংখ্যার 'Nineteenth Century' পত্রিকায় 'A Real Mahatman' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন এবং ১৮৯৮-এর নভেম্বরে 'Ramakrishna ঃ His Life and Sayings' নামে তাঁর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ম্যাকসমূলারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথাগুলি সুপরিচিত। কিন্তু সূচনায় ভাষার সারল্য ও বিশিষ্টতা দেখার জন্যে কিঞ্চিৎ নমুনা তুলে দেওয়া দরকার। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিপুল ব্যয়ে এবং ম্যাকসমূলারের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমে ঋগ্বেদসংহিতা প্রকাশিত হয়। স্বামীজী সেকথা উল্লেখ করে লেখেন—"অধ্যাপক ম্যাকসমূলারের জীবনে এই ঋগ্বেদ-মুদ্রণ একটি প্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বসবাস—জীবন-যাপন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে অধ্যাপকের কল্পনায় ভারতবর্ষ—বেদ-ঘোষ-প্রতিধ্বনিত, যজ্ঞধূম-পূর্ণাকাশ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-বহুল, ঘরে ঘরে গার্গী-মৈত্রেয়ী-সুশোভিত, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের নিয়মাবলী-পরিচালিত, তাহা নহে। বিজাতি-বিধর্মী-পদ-দলিত, লুপ্তাচার, লুপ্তক্রিয়, ম্রিয়মাণ, আধুনিক ভারতের কোন্ কোণে কি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাও অধ্যাপক সদাজাগরূক হইয়া সংবাদ রাখেন।" ম্যাকসমূলার তাঁর এই প্রবন্ধ লেখবার আগে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'Theistic Quarterly Review' পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী প্রবন্ধ 'Paramhamsa Ramakrishna' বের হয় এবং পরে পৃথক পুস্তিকারূপে 'উদ্বোধন' থেকে ছাপা হয়। ১৮৯৬-এর 'Asiatic Quarterly Review' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনি লেখেন 'A Modern Hindu Saint' নামে প্রবন্ধ। স্বামীজী তাঁর এই বাংলা নিবন্ধে ম্যাকসমূলারের বইটি সম্বন্ধে লেখেন ঃ "এই পুস্তকের প্রথম অংশে মহাত্মা-পুরুষ, আশ্রম-বিভাগ, সন্ন্যাসী, যোগ, দয়ানন্দ সরস্বতী, পওহারী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর অবতারণা করা হইয়াছে।" তারপর লেখা হয় ঃ "বর্তমান লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র দাস—তৎসঙ্কলিত রামকৃষ্ণ-জীবনীর উপাদান যে অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি উদূখলে বিশেষ কুট্টিত হইলেও ভক্তির আগ্রহে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়া সম্ভব, তাহাও বলিতে ম্যাকসমূলার ভুলেন নাই এবং ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের দোষঘোষণ করিয়া অধ্যাপককে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর-মুখে দুই-চারিটি কঠোর-মধুর কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপূর্ণ বাঙালীর বিশেষ মনোযোগের বিষয় সন্দেহ নাই।" এই বইয়ের আগে লেখা ম্যাকসমূলারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সঙ্গে আলোচ্য বইটির তুলনাসূত্রে স্বামীজীর উক্তি এই ঃ 'প্রকৃত মহাত্মা' নামক প্রবন্ধে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, এবার তাহা অতি যত্নে আবরিত। একদিকে মিশনারী, অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল—এ উভয় আপদের মধ্য দিয়া অধ্যাপকের নৌকা চলিয়াছে।"

'ভাববার কথা'-তে মোট ন'টি বিষয় আছে এবং 'বর্তমান সমস্যা' যে 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা' রূপে ছাপা হয়, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যের মহিমার কথা আছে এবং দেশকালের বাধা তুচ্ছ করে ভারতীয় ভাবৈশ্বর্য যে অন্য জাতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তাও স্বামীজী বলেছেন। প্রাচীন গ্রীসের বলবীর্যের ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি এবং সারা ইউরোপে তার প্রভাবের কথা আছে। তারপর তিনি লেখেন ঃ "অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রীক উৎসাহ সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর শাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধ ভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত।" তারপরেই স্বামীজী লেখেন ঃ "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান, একের গভীর

163081
THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE

চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা, একের মূলমন্ত্র ত্যাগ, অপরের ভোগ, একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত।” ‘বর্তমান সমস্যা’ উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে লেখা। একদিকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার উত্তরাধিকারী সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতি, ইরানী, আরবীয়দের অভ্যুদয়, অন্যদিকে, ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি,—এই অতীতের ভাবনাসূত্রেই লেখা হয়ঃ “ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।” এই কথার পরেই তাঁর প্রশ্ন —“প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?” অতীতের যথাযথ পুনরাবৃত্তি যে সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতে ঠিক কী যে ঘটবে তাও অনির্ধারিত, এই মন্তব্যের পরে তিনি ভারতের পক্ষে প্রবল রজোগুণের উদ্দীপন ও আত্মকর্তৃত্বে সম্মুখগতি কামনা করেন। অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বরণীয় বটে, কিন্তু উনিশ শতকের শেষপ্রান্তের এই ভারতপ্রেমী বিশ্বপথিক অনুভব করেছিলেন যে, “যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না—যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই।” মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তখন লোকান্তরিত বটে, কিন্তু তাঁর বন্ধু ও গুরুভ্রাতা গিরিশচন্দ্র, সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আরও অনেকে ছিলেন। তবে, দেশের বিপুল জনসংখ্যার হিসেবে তাঁরা তো মুষ্টিমেয় মাত্র। তাই তিনি লেখেনঃ “সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তি সঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব ‘অবিদ্যা’—সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ-জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে,—এ-ভারতে কয়জন?” তারপর তাঁর মন্তব্যঃ “যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?” সত্ত্বগুণে পৌঁছতে হলে রজোগুণের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। ভোগ শেষ না হলে যোগ সম্ভব নয়। বিরাগ না ঘটলে ত্যাগ দেখা দেবে কেন? এই ছিল তাঁর যুক্তি। দেশ তখন তমোগুণসমুদ্রে ডুবছে। উনিশ শতকের অজস্র স্বনামধন্য কীর্তিমানদের কথা মনে রেখেও তাঁকে একথা বলতে হয়েছে যে, ‘বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ’ নিঃস্বার্থভাবে সত্য-কে ধারণ করাই তখন যথার্থ উন্নতির পথঃ “এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?” রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে মূলতঃ এদিক থেকে বিবেকানন্দের চিন্তার সামীপ্যই চোখে পড়ে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন এবং সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে ভূদেব ঠিক কোন্ কোন্ দিক থেকে এই পাশ্চাত্য প্রেরণা কত বেশি মেনেছিলেন বা মানতে চাননি, সে-চিন্তা বিশদতর আলোচনা দাবি করে বটে, কিন্তু উপস্থিত নিবন্ধে তা জরুরী নয়। বরং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার সম্পাদককে লেখা বিবেকানন্দের যে চিঠির উদ্ধৃতি ‘ভাববার কথা’-তে ‘বাঙলা ভাষা’ নামে ছাপা হয়েছে, ভাষা ব্যবহারের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব সেই চিন্তাসূত্রগুলি অধিক প্রাসঙ্গিক। সেই পুরো প্রবন্ধটিই একজন সচেতন ভাষাশিল্পীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা ও নির্দেশ। তিনি জানান যে, আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় যাবতীয় বিদ্যার প্রচার ছিল বলে বিদ্বান ও জনসাধারণের মধ্যে অপার ব্যবধান দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস লোক-সাধারণের ভাষাতেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের কথায়, “পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি

আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?" এই 'স্বাভাবিক ভাষা' বলতে তিনি বুঝতেন সেই সহজ ভাষা যাতে মনের সব ভাব প্রকাশিত হয়, যাতে দর্শন-বিজ্ঞানের চিন্তা ও বিচার ঘটে থাকে। বলা বাহুল্য পরিভাষা এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তিনি 'পরিভাষা'র উল্লেখ করেননি বটে, কিন্তু সহজ চলিত রীতিই আদর্শ হোক, তাঁর এই আসল বক্তব্যের মধ্যেই তার প্রয়োজনীয়তা একভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। যেমন তিনি লেখেন, "ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।" কলকাতার ভাষাই যেহেতু বাংলার সব অঞ্চলের বোধ্য ভাষা, অতএব সেই ভাষাই গ্রহণযোগ্য। স্বামীজী তা বললেন। সংস্কৃত ভাষা-ব্যবহারের কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য ছিলঃ "ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীনকালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।" তিনি চেয়েছিলেন ভাষার ক্ষেত্রে বৃথা অলঙ্করণ নয়, চলিত রীতিতেই যথার্থ প্রাণের বল। তবে সাধুরীতি পুরোপুরি ত্যাগ করেননি তিনি—'ভাববার কথা'-র 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটিতেও তার পরিচয় আছে। আবার 'ভাববার কথা' নামে অনুচ্ছেদ-পর্যায়ে দুই রীতিই মেনেছেন তিনি। বইটির শেষ রচনা 'শিবের ভূত', তাঁর দেহত্যাগের পরে পাওয়া তাঁর স্বহস্তে লেখা অসমাপ্ত একটি গল্প।

তাঁর 'পত্রাবলীতে', শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' যেমন সাহিত্যের আবেদন ছড়িয়ে আছে, তেমনি তাঁর 'পরিব্রাজক'-এ এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'তেও। ১৩১৮ সালের তৃতীয় সংস্করণে 'পরিব্রাজক' সম্বন্ধে প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত এই মন্তব্য 'বাণী ও রচনা'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণের ষষ্ঠ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছেঃ "পরিব্রাজকের কাগজপত্র অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার অস্ট্রিয়া হইতে তুর্কি হইয়া ইজিপ্ট প্রত্যাগমনাবধি ভ্রমণ-কাহিনী কতক সবিস্তারে এবং কতক 'ডায়েরি'র আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সবিস্তার বর্ণনাংশটি বর্তমান সংস্করণে পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত এবং 'ডায়েরি'র নোটগুলি পরিশিষ্টের মধ্যে মুদ্রিত করা হইল।…" ১৮৯৯-এর ২০ জুন কলকাতা থেকে 'গোলকোণ্ডা' জাহাজে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণে যাত্রা করেন এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে পত্রাকারে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠিয়ে দেন। 'উদ্বোধন'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ-ভ্রমণের কাহিনী, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) এবং 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি' ১৮৯১, ২য় খণ্ড ১৮৯৩) নামে অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। দুজনের রচনারীতির তুলনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এঁরা উভয়ে পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও পৃথক। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'পরিব্রাজক'-এর সমকালীন রচনা। 'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে এলেখা ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। 'পরিব্রাজক'-এর 'গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ'-এর প্রথম অনুচ্ছেদ, আর তাঁর 'বর্তমান ভারত'-এর (যেটিকে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন ভারতেতিহাসের পূর্বাপর সম্বন্ধ নিরীক্ষার এক 'অমূল্য রত্ন' এবং 'অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ' শেষ অনুচ্ছেদ) 'স্বদেশ-মন্ত্র' আবেগের স্পন্দনগুণে পরস্পর তুলনীয়। এই দুটি থেকে মাত্র কয়েক ছত্র মিলিয়ে দেখা এক পরম উপভোগের বিষয়। প্রথমটিতে তিনি লিখেছেনঃ

"হৃষিকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল যার মধ্যে দশ হাত গভীরে মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে

কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ ?"

এরই পরবর্তী অংশে গঙ্গাজলের মহিমার কথা আছে, বৃহৎ-বদনাকার কমণ্ডলুর মধ্যে গঙ্গাজল নিয়ে যেতে তাঁর অসুবিধার কথাপ্রসঙ্গে কিছু পরিহাস আছে, আবার গঙ্গাবিধৌতা বঙ্গভূমির রূপবর্ণনাও আছে, যেমন—"এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাংলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মালয়ালমে (মালাবারে), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ, —এতে কি রূপ নাই ? আর আমাদের গঙ্গার কিনার —বিদেশ থেকে না এলে ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না।" এই বর্ণনায় মেঘের নানা রঙ, হাওয়ায় তাল-নারকেল-খেজুরগাছের মাথা চামরের মতো দোলা, আম লিচু কাঁঠালগাছের সারি, শ্যাম শ্যাম ঘাসের বিস্তার দেখা যায়। গঙ্গা, পদ্মা, দামোদর, বঙ্গোপসাগরের প্রসঙ্গ আছে,—১৭৭০-এ গঙ্গা নাকি প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল, ৯ অক্টোবর, ১৭৩৪ বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময়ও নাকি সেইরকম ঘটেছিল, এসব তথ্য আছে। জাহাজের প্রসঙ্গ আছে। আবার 'ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' অংশের ভাষাভঙ্গির বিশেষত্বও ভোলবার নয়, যেমন—"আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্‌' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি। যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা-কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা।"

অতঃপর 'বর্তমান ভারত' থেকে স্বদেশমন্ত্র নামে সুপরিচিত লেখাটির কয়েক ছত্র দেখা যাক ঃ

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত···" ইত্যাদি।

এই ভঙ্গিকে বলা যায় গভীর আবেগের উচ্চগ্রাম। একে পরমাশ্চর্য গদ্যকাব্য বলতেই আপত্তি হবে কেন ?

"ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই",—এর সুর ও সরল-গম্ভীর শব্দসম্ভার তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণভজনের এই পাঠে কিঞ্চিৎ ভিন্ন সুরে উচ্চার্য হলেও উভয়েই কি বন্দনা-গীতি নয় ?

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥

তাঁর 'বীরবাণী'র 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' এই আত্মমগ্নতার আরো এক উচ্চভাবের বাণী—যা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির বাচক হয়ে উঠেছে ঃ

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥

'সখার প্রতি' এবং 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' এবং 'সাগর-বক্ষে' সেই একই কবি বিবেকানন্দের রচনা। এগুলির প্রবাহে নিহিত আছে অবিস্মরণীয় এক মহাযোগীর ধ্যানদৃষ্টি। তাঁর সখা ও গুরুভ্রাতা 'জি. সি.' অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেই এসব রচনায় তাঁর মনোধর্মের কতকটা মিল অনুভব করা যায়।

তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের বহুমুখী স্পন্দনেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অনন্যতা লক্ষণীয়। আমাদের সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির প্রতিফলন শুধু রসসম্ভোগের দিক থেকেই নয়, তথ্য ও তত্ত্বের, বর্ণনা ও বিচারের ভাষাগত অনন্যতার দিক থেকেও অবশ্যই স্মরণীয়।

বাঙলা ভাষা : স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য

উদয়কুমার চক্রবর্তী

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ভাববার-ই মতো। ভাষা ভাবকে বহন করে। কিন্তু লিখিত ভাষায় ভাষা-ব্যবহার এমন স্তরে চলে গেছে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে ভাব বহনের দূরত্ব। অর্থাৎ সাধারণের বোধগম্য হচ্ছে না ভাষা, তা কেবল বিদ্বানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। ফলে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছে ভাষা-ব্যবহার, তা কালক্রমে কখনো কখনো ভিন্ন পথ ধরেছে। আমাদের সকলেরই জানা, স্বামী বিবেকানন্দ বারবার ভাষাকে ভাবের বাহন হিসাবেই প্রচার করতে চেয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন ভাষা-ব্যবহারের নানা দিক। সেগুলিকে সূত্রাকারে সাজালে আমরা দেখব বিবেকানন্দ ছিলেন এক সফল ভাষাবিজ্ঞানী। অন্যদিকে শুধু তত্ত্ব নয়, প্রয়োগ-এর দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অগ্রণী সাহিত্যিক। আমরা এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দের বাঙলা গদ্যভাষা রচনার তত্ত্বগুলি প্রথমে উপস্থাপিত করে, তারপর তাঁর গদ্যভাষার প্রয়োগগত দিকটি আলোচনা করব।

বাঙলা গদ্যভাষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য নির্দেশমূলক (Prescriptive)। তিনি লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট রূপ দেবার কথা ভেবেছেন। তাঁর বক্তব্যগুলি এভাবে বিন্যস্ত করা যায়।[১]

ক. "সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা" (দিতে হবে)।

খ. "স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?"

গ. "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?"

ঘ. "যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?"

ঙ. "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।"

চ. "ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত।"

ছ. "বাংলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।"

জ. "ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে।"

বাঙলা ভাষার গঠনপ্রকৃতি কি করলে যথেষ্ট পরিমাণে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে সে-বিষয়েও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত আমরা জানতে পারি।[২] এখানে সে-গুলিকেও সূত্রাকারে সাজিয়ে দেওয়া হল।

ঝ. "ভাষার গোপন কথা হল সরলতা।"

ঞ. "চিন্তাধারাকে এমনভাবে অভিব্যক্ত করতে হবে যা অতি সহজেই সংযোগস্থাপন করতে পারে।"

ট. "সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙলা ভাষাকে রূপ দেওয়া উচিত হবে না।"

ঠ. "পালিভাষার অনুকরণে রূপ দিলে হয়তো ভাল ফল পাওয়া যাবে, কারণ ঐ ভাষার সাথে বাঙলা ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।"

ড. "বাঙলা ভাষায় কার্যকরী শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহারে সকল সংস্কৃত শব্দই গ্রহণ করা যেতে পারে।"

ঢ. নতুন শব্দচয়নের জন্যও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।"

---

[১] ভাববার কথা : 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৪-৩৭

[২] Complete Works of Swami Vivekananda, vol. v (1973), p. 259

বাঙলা ভাষার আদর্শ রূপ কি হবে, তা নিয়ে বিবেকানন্দের মধ্যে কোন রকম দ্বিধা ছিল না। [ক] এবং [ঝ] সূত্রে তিনি সাধারণ লোকের ভাষাকে তথা ভাষার সরল ভঙ্গিটিকে ব্যবহার করার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষাই ছিল তাঁর কাছে আদর্শ ভাষা। এ ভাষা চলিত এবং গভীর অর্থবহ।[৩]

বাঙলা ভাষা সংস্কৃত আদর্শকে ধরে ক্রমশঃ প্রাণহীন হয়ে পড়ছিল। বিবেকানন্দ তাকে মনে করেছেন ভাষার অস্বাভাবিক চলন। একে তিনি পছন্দ করেননি। প্যাঁচোয়া বিশ্লেষণ, বাহাদুর সমাস-কে মড়ার লক্ষণ বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি চেয়েছেন ভাষার স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে [দ্রষ্টব্য 'খ' সূত্র], চেয়েছেন পালি ভাষার অনুসরণ [দ্রষ্টব্য—'ঠ' সূত্র], সংস্কৃত ভাষার অনুসরণ নয় [দ্রষ্টব্য 'ট' সূত্র] চলিত ভাষাকে বাঙলা সাহিত্যে তথা লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে গ্রহণের প্রস্তাব তিনি দেন।

মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ আসলে মুখের ভাষাকেই লিখিত ভাষার মর্যাদা দিতে চান। চলিত বলতে তিনি ঘরোয়া কথাবার্তার ভাষা বুঝিয়েছেন [দ্রষ্টব্য 'ঘ', 'ঙ']। শুধু তাই নয়, মানসিক প্রক্রিয়াকে তিনি এমন একটি ভাষায় প্রকাশ করাতে চান যা আমাদের সংযোগ স্থাপনে বিশেষ কার্যকর হয়ে ওঠে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যকে দুটি ধারায় ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ, ভাষা-ব্যবহারকে তিনি প্রাধান্য দিচ্ছেন। অর্থাৎ যে-ভাষা আমাদের আবেগ বহন করে মুখের ভাষায় প্রকাশিত হয় তাকেই তিনি সরাসরি সাহিত্যে প্রকাশের কথা বলেছেন [দ্রষ্টব্য 'ঙ' সূত্র]।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি একটি কল্পিত রূপ-এর কথা বলেছেন। দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা করার একটি ভাষারূপের কথা আমাদের জানান এবং তাকেই দর্শন-বিজ্ঞান লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলেন [দ্রষ্টব্য 'ঘ' সূত্র]। এই প্রক্রিয়াকে তিনি চিন্তাধারার অভিব্যক্তি বলে মনে করেন [দ্রষ্টব্য 'ঞ']।

সর্বোপরি ভাষার ক্ষেত্রে নমনীয়তাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন [দ্রষ্টব্য 'চ']। ভাষাকে দুমড়ে মুচড়ে যে-কোন আকার দেবার কথা তিনি জানান। সেজন্য ভাষার শব্দভাণ্ডার, ভাষার ব্যাকরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যকরী শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে আকর হিসাবে গ্রহণ করতে চান [দ্রষ্টব্য 'ড']। সংস্কৃত অভিধান থেকে সব ধরনের কার্যকরী শব্দের প্রতিশব্দ সংগ্রহ করা উচিত—এই মত তিনি পোষণ করতেন। পাশাপাশি নবশব্দ নির্মাণের কথাও তিনি বলেছেন [দ্রষ্টব্য 'ঢ']। বিবেকানন্দ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোন ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ না হলে সে-ভাষার উন্নতি সাধন হয় না।

বিবেকানন্দ সংস্কৃত শব্দকে স্বাগত জানিয়েছেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গদ্যরীতিকে স্বাগত জানাননি। তার চেয়ে তিনি পালি ভাষাকে বাঙলা ভাষার আদর্শ মনে করেছিলেন। আসলে বাক্যগঠনের সরলীকরণ তিনি চাইছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বাক্য গঠনের যে জটিলতা তা বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দন নিয়ে আসার পক্ষে অন্তরায় বলে বিবেকানন্দ মনে করেছিলেন।

কলকাতার কথ্যভাষাকে বাঙলা ভাষায় লিখিত রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। ১৯১৪-র আগে একমাত্র বিবেকানন্দ-ই চলতি ভাষাকে লেখার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবার প্রবল দাবী উত্থাপন করেন। সেক্ষেত্রে তিনি চলিত বাঙলা কোন অঞ্চলের ভাষা নিয়ে গঠিত হবে সে-কথাও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের আগেই বলে যান। বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন বহুদিন থেকেই কলকাতা-নবদ্বীপ অঞ্চলের ভাষা শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলছিল। তাই শহর কলকাতার ভাষা একদিন আদর্শ কথ্যভাষায় পরিণত হবে, এই সার্থক সম্ভাবনার কথা তিনি অনেক আগেই বলে যান।

এই প্রসঙ্গে দ্বি-ভাষাগত সমস্যা, যাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা 'ডাইগ্লসিয়া' বলেছেন,[৪] বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে সেরকম দুটি মান্য ভাষা থাকার সম্ভাবনার

Ibid.

[৪] Charles A. Furguson 1959 খ্রীষ্টাব্দের Word পত্রিকার 15 সংখ্যায় 325—40 পৃষ্ঠায় তিনি এর সংজ্ঞা দেন।

কথা তিনি বলেছেন। আর এই দুটি মান্য ভাষার মধ্যে একটি অবশ্যই জয়ী হবে।

> “যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।”[5]

বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের প্রত্যাশা সফল হতে চলেছে তা লক্ষ্য করা যাবে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে সাধু ও শিষ্ট চলিত ভাষা—এই দুটি মান্য ভাষা পাশাপাশি চলেছে। ১৯১৪-র আগে সাধু ভাষা দু-একটি গ্রন্থ ছাড়া সর্বত্রই প্রচলিত ছিল, তেমনি ১৯৫০-এর পর চলিত-ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর দিন থেকে খবরের কাগজে চলিত ভাষাকে গ্রহণ করার পর সাধুভাষা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এক সময় এই ভাষা মান্য ভাষার স্থান হারিয়ে ফেলবে—একথা আজ অনেক পরিমাণেই সত্য।

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দ মনে করতেন, ‘ভাষা ভাবের বাহক।’ সুতরাং ভাব অনুযায়ী ভাষার চেহারা বদল হতে পারে, একথা তিনি হয়তো জানতেন। তা নাহলে ভাষাকে ইস্পাত করতে চাইতেন না, দুমড়ে মুচড়ে নানা রূপ দেবার কথা বলতেন না। তবুও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে তাঁর এ-ধরনের মন্তব্য থেকে ঃ

> “যে ভাষায় নিজে মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয় ?” [দ্রষ্টব্য ঘ]

> “স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।” [দ্রষ্টব্য ঙ]

মনে হতে পারে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য সব কিছু লেখার ক্ষেত্রে আমরা একই রকম ভাষা ব্যবহার করব। কিন্তু একথা ভেবে আমরা বিষয় ভেদে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যটি যদি না মেনে নিই তাহলে ভুল করা হবে।

মৌখিক ভাষারীতির ক্ষেত্রেও আমরা বিষয়ভেদে ভাষা-ব্যবহারের ভিন্নতা লক্ষ্য করি। সুতরাং লিখিত ভাষায় সেই মৌখিক রীতির প্রভাব পড়লেও বিভিন্ন বিষয় ভাষার চেহারা দেবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে, তা আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারব না। বিবেকানন্দ বাঙলা ভাষার যে মান্য মৌখিক বা চলিত রীতির কথা বলেছেন তা নিশ্চয়ই একটি অবিমিশ্র সংহত বৈচিত্র্যহীন ভাষা নয়। তার নানা ধরনের ব্যবহারিক বৈচিত্র্য অবশ্যই আছে। এই ব্যবহারিক বৈচিত্র্যকে ইংলন্ডের ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন ‘রেজিস্টার’।[6]

ভাষা ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য আসে তাকেই হ্যালিডে রেজিস্টার বলে চিহ্নিত করতে চান।[7] সাহিত্যের ক্ষেত্রে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তেমনি এদের মধ্যেও সংরূপ (genre) অনুযায়ী নানা বিভাগ থাকে। আর সেই অনুযায়ী ভাষাবৈচিত্র্যকে রেজিস্টার বলা যায়।[8] পবিত্র সরকার ব্রাইট ও ফিশম্যানের সূত্রগুলিকে ধরে লক্ষ্য করেছেন ঃ “রেজিস্টার আর কিছুই নয়, শ্রোতা (receiver of the message) এবং উপলক্ষ্য (Setting)-এ

বাঙলা সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত এর উদাহরণ হিসাবে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। দ্রষ্টব্য—সমাজভাষাবিজ্ঞান ঃ ভাষা দেশ কাল—পবিত্র সরকার, (১৩১২), পৃঃ ১৬৯

[5] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬

[6] সমাজভাষাবিজ্ঞান ঃ ভাষা দেশ কাল, পৃঃ ১৭০

[7] ‘Variety according to use’—M. A. K. Halliday's Descriptive Linguistics in Literary Studies প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, Linguistics and Literary Style, Donald C. Freeman, Ed. Holt, Rinehart and Winston, Irc 1970, p. 67

[8] ‘We may talk of the register of literature, subdivided into the registers of prose and verse, each subdivided further into the various genres.’—Ibid.

দ্বয়ের প্রভাবে একটি ভাষার ব্যবহারে যে রীতিগত বৈচিত্র্য ঘটে, তাই।"[৯]

ডারবিশায়ার তাঁর 'এ গ্রামার অব স্টাইল' গ্রন্থে এডিনবার্গ স্কুলের এবং নিয়ো-ফার্দিয়ানদের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন ঃ "The doctrine of register can be summed up by saying that in different kinds of language-uses, which arise to be uttered in response to different kinds of human activities, different kinds of linguistic features are found to be appropriate."[১০]

রেজিস্টার যে ভাষাবৈচিত্র্যকে তুলে ধরে, তা বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অন্তর্দৃষ্টির—একথা ডারবিশায়ার মনে করেন। অবশ্য এর সঙ্গে তিনি 'context sense, medium, tenor and style'-এর ধারণা রেজিস্টার-এর ধারণাকে প্রকাশ করে, তা সমাজভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন।[১১]

রেজিস্টার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার মূল কারণ হল, বিবেকানন্দের গদ্যভাষা বৈচিত্র্যহীন ভাষারীতি তৈরি করেছে, না, বিষয় ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা। এ আসলে ভাষা রেজিস্টার নিয়েই আলোচনা। বাঙলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের দান পরিমাণের দিক দিয়ে তেমন কিছু নয়, কিন্তু পরিমাণকে অনায়াসেই অতিক্রম করে গেছে রচনার গুণগত সমৃদ্ধি ও মান। আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবেকানন্দের গদ্যভাষার মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

বিবেকানন্দ গদ্য এবং কবিতা ও গান রচনা করেছেন। গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি সাধু উপভাষা এবং চলিত উপভাষা উভয়ই ব্যবহার করেছেন। প্রথম পর্যায়ে সাধু উপভাষা ব্যবহার করলেও, পরবর্তী কালে যখন তিনি চলিত ভাষা ব্যবহার করার কথা বলেন, তখন থেকেই তাঁর লেখায় চলিত ভাষার প্রবর্তন ঘটে। বর্তমানে প্রচলিত মান্য কথ্যভাষার (Standard colloquial dialect) কাছাকাছি মৌখিক ভাষাই তিনি চলিত ভাষা হিসাবে সাহিত্যে ব্যবহার করেন। ফলে রেজিস্টার এর দিক দিয়ে বলা যায়, বিবেকানন্দ সাধু গদ্যভাষার রেজিস্টার এবং চলিত গদ্যভাষার রেজিস্টার উভয়ই ব্যবহার করেছিলেন।

রচনার সংরূপগত বিভাজনে বিবেকানন্দের রচনাকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

ক. চিঠিপত্র
খ. প্রবন্ধ ও বক্তৃতা
গ. ভ্রমণ বা ডায়েরি

চিঠিপত্র, প্রবন্ধ বা বক্তৃতা, ভ্রমণ যাই হোক না কেন, তার ভাষা অবশ্যই বিষয়, মাধ্যম, ভাব, অভিপ্রায় (tenor), শৈলী প্রভৃতি অবলম্বন করে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে তা লক্ষ্য করা যাবে। সংরূপ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য ছাড়াও একই সংরূপ-এর অন্তর্গত নানা লেখা বিষয় অনুসারে, মাধ্যম বা ভাব বা উদ্দিষ্ট জনসম্পর্কিত ধারণা (tenor) এবং শৈলী অনুসারে আলাদা আলাদা ভাষারূপ ব্যবহার করতে পারে।

বিবেকানন্দের চিঠিপত্রের ভাষা থেকে প্রবন্ধের ভাষা এবং উভয়ের থেকে ভ্রমণ-এর ভাষা আলাদা হয়ে যাচ্ছে তা আমরা এই প্রসঙ্গে দেখে নিতে পারি।

ক. "গোলাপ-মা, যোগীন-মা এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জনও বোধ হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না। আপনি কেমন আছেন?"[১২]

খ. "মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না।"[১৩]

---

[৯] সমাজভাষাবিজ্ঞান ঃ ভাষা দেশ কাল, পৃঃ ১৭০

[১০] A Grammar of Style—A. E. Darbyshire, Andre Deutsch, 1979, p. 37

[১১] 'Comprehended under the concepts of register are the sub-concepts of context, sense, medium, tenor and style'—Ibid, p. 37

[১২] বলরাম বসুকে এলাহাবাদ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ তারিখে লেখা পত্র।

[১৩] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬

গ. "এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। ঐ যে 'দূরাদয়শ্চক্র' ফক্র 'তমালতালীবনরাজি' ইত্যাদি ওসব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেননি, সমুদ্রও দেখেননি, এই আমার ধারণা।"[১৪]

প্রথম উদাহরণটিতে অন্তরঙ্গ আলাপের সুর পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে রয়েছে কুশল বিনিময় এবং সংবাদ জ্ঞাপন। বোঝা যায় এই ভাষারীতি চিঠিপত্রের সংরূপকে স্বীকার করে। দ্বিতীয় উদাহরণে রয়েছে তৎসম শব্দবহুল ভাবগম্ভীর তত্ত্ব আলোচনা এবং একটি বিশেষ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে যুক্তির অবতারণা। শেষ উদাহরণটি বর্ণনার স্বচ্ছতায়, ভ্রমণের খবরে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের কথাই মনে করায়।

কোন্ বিষয় নিয়ে বলা হচ্ছে, তা লক্ষ্য করলে একই সংরূপের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ভাষা-ব্যবহারে পাওয়া যাবে যেমন, ঠিক তেমনি বিষয়-সাদৃশ্য নানা সংরূপের মধ্যে একটি আপাত মিল সৃষ্টি করে থাকে। বিবেকানন্দের চিঠিপত্রের ভাষাই ধরা যাক।

এক সময়ে তিনি সাধুভাষায় লিখেছেন চিঠিপত্র, পরবর্তী কালে লিখেছেন চলিত বা মৌখিক রীতিতে। এখানে অবশ্য আমরা ভাষা ব্যবহারে বিষয়গত বৈচিত্র্য কি ভূমিকা নিচ্ছে তা লক্ষ্য করব।

ক. "মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। কোন কাজই ছোট নয়, এ-সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মতো, সর্ষপের মতো ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে। বুদ্ধিমান সে-ই যে এটি দেখতে পায় এবং সকল কাজকেই মহৎ করে তোলে।"[১৫]

খ. "সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর্ম কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাঙ্গতে হে"—কর্ম কর্ম কর্ম even unto death."[১৬]

গ. "আমার বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে-সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা।"[১৭]

ঘ. "যাক—এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্ছাটির মতো ঘাটে-মাঠে দোকান হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে—আমি তার সিকির সিকিও করতে পারিনি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা! এদের পূজা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।"[১৮]

ঙ. "শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals ইত্যাদি চাই।"[১৯]

প্রথম এবং শেষ দুটি উদাহরণই উপদেশমূলক। প্রথমটি কর্মবিষয়ে শিক্ষা, শেষটি লোকশিক্ষা—নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। বলা বাহুল্য পড়ার সময় দুটি উদাহরণ-এর ভাষারীতিগত পার্থক্য খুব সহজেই বোঝা যাবে। তেমনি বাকি তিনটি উদাহরণই জ্ঞাপনমূলক। দ্বিতীয়টি গুরুভাই-এর কাজে উচ্ছ্বসিত। তৃতীয় উদাহরণে ধর্ম ও তন্ত্র বিষয়ে নিজের মনোভাব জানাচ্ছেন। চতুর্থ উদাহরণটি মার্কিন দেশে নারীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথায় পূর্ণ। প্রতি উদাহরণ বিষয়গত যে

---

[১৪] বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৬৪-৬৫

[১৫] স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত ১১ জুলাই, ১৮৯৭, আলমোড়া থেকে পত্র।

[১৬] স্বামী অখণ্ডানন্দকে আলমোড়া থেকে ১৫ জুন, ১৮৯৭ তারিখে লেখা পত্র।

[১৭] গাজীপুর থেকে ১৮৯০, ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা পত্র।

[১৮] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ১৮৯৪, ২৫ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা পত্র।

[১৯] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ১৮৯৪-এর গ্রীষ্মে আমেরিকা থেকে লেখা পত্র।

সূক্ষ্ম পার্থক্য বহন করছে, ভাষারীতি কিছু পরিমাণে তার উপর নির্ভরশীল।

প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং ভ্রমণ-বর্ণনার সময় বিষয়গত বৈচিত্র্য একইভাবে ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছে। সুতরাং এই আলোচনায় উদাহরণ না বাড়িয়ে আমরা বিষয়গত সাদৃশ্য নানা সংরূপ-এর মধ্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়, বিবেকানন্দের রচনা অবলম্বনে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।[২০]

যে-বিষয় অবলম্বন করে লেখক লিখছেন, সেই বিষয়ের কিছু কিছু শর্ত অবশ্যই থেকে যায়। অবশ্য একথাও ঠিক, আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় যে-বিষয় বর্ণিত হয়েছে, অনাড়ম্বর সহজ ভাষায় সে-বিষয় অনায়াসেই বর্ণিত হতে পারে। ফলে, একথাও একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট ভাষারীতি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিশেষ এলাকা (range) মেনে চলে। আড়ম্বরপূর্ণ অথবা নিরাভরণ ভাষায় কেউ নানা বিষয় নিয়ে লিখলে তার একটা বৈচিত্র্য অবশ্যই থাকবে। আমরা সেই আপেক্ষিক ভাষা-বৈচিত্র্যকেই এখানে দেখাতে চাইছি, তা এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল।

163081

> চ. "ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে।"[২১]
>
> ছ. "বৌদ্ধেরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু-আম্নায় হয়ে গেছে। উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের বলে 'মহাযান'; আর দক্ষিণী অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতিদের বলে 'হীনযান'।[২২]
>
> জ. "পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি।"[২৩]

(চ) উদাহরণটি জাতির চরিত্র গঠন সম্পর্কে উপদেশ, (ছ) বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে এবং (জ) পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য বিষয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য। [চ] এবং [জ] প্রবন্ধ থেকে নেওয়া এবং [ছ] ভ্রমণকাহিনী থেকে। বিষয়বস্তুর বিচারে চিঠিপত্র থেকে প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যে যথাক্রমে [ক], [গ] এবং [ঘ]-এর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। [জ] উদাহরণ বাদ দিলে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাষারীতিগত সাদৃশ্যও দুটি ক্ষেত্রে কাজ করছে। কিন্তু যেখানে ভাষারীতিগত মিল নেই, সেখানে আমাদের রেজিস্টার-এর অন্যদিকগুলি মিলিয়ে দেখলে ধরা পড়বে কেন এই পার্থক্য। আমরা একটু পরেই সে-প্রসঙ্গে উপনীত হব।

বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সম্পর্কের আর একটি কথা বিবেকানন্দের সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত। বিষয়-এর সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের নৈকট্য থাকা উচিত। ভাষা যদি বিষয় থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়ে তবে তা কখনই সার্থক হতে পারে না। বিবেকানন্দ মূলতঃ ভাষা-ব্যবহার বিষয়ানুগত করেছেন।

বিবেকানন্দের গদ্যভাষায় রিডানডেন্সি-র[২৪] স্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ভাষাকে তিনি জ্ঞাপন (information)-এর কাজে সরাসরি প্রয়োগ করেছেন। আড়ম্বর, ভণিতা এবং তির্যক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যথাসম্ভব তিনি পরিহার করে ভাষাকে বক্তব্য অভিমুখে চালিত করেছেন। কিন্তু সহজবোধ্য করবার প্রয়োজনে রিডানডেন্সি-র ব্যবহার তাঁর লেখাতেও এসেছে। যেমন,

"কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ি যায়; সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাক ঢোল হাজির।…" ইত্যাদি এক মজার কাহিনী বলেছেন নিম্নলিখিত বক্তব্যটি প্রসঙ্গে ঃ

"এত বড় পদ্মা ছেড়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য হুগলি নামক ধারায় কেন বর্তমান তার কারণ অনেকে

---

[২০] গোঁড়ামিহীনভাবে দেখলে একই বিষয়বস্তু অন্য সংরূপ-এরও ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে তা বর্তমান প্রবন্ধকারের 'আরণ্যক ঃ সংরূপ ও গদ্যভাষা-গদ্যরীতি' প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্রঃ তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক নানা চোখে, রমা প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃঃ ৮৭-১০৬ দ্রঃ।

[২১] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪ [২২] ঐ, পৃঃ ৯৯ [২৩] ঐ, পৃঃ ২৪৬

[২৪] "The arithmetical difference between the theoretical total capacity of a code and the average amount of information conveyed by it is the codes redundancy." A Grammar of Style—A. E. Darbyshire, p. 21

বলেন যে, ভাগীরথীর মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা।"২৫

বিষয় অবশ্যই ভাবকে (sense) অবলম্বন করে মূর্ত হতে চায়। ধরা যাক যে-উদ্দীপনা বিবেকানন্দের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল তাকে তিনি রূপ দিতে চাইছেন। ফলে লেখায় উদ্দীপনা সঞ্চার হচ্ছে। যেমন,

> "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত।'২৬

আবার স্বদেশবাসীর কৃতিত্বে যে আনন্দ মনে জেগেছে, সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এইভাবে ঃ

> "সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। এক যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে।'২৭

উদ্দীপনাকে প্রকাশ করতে কাটা কাটা বাক্যখণ্ড ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি সম্বোধন শব্দের বেশিমাত্রায় প্রয়োগ ভাষায় গতি সঞ্চার করেছে, যে গতি উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চাইছে। পরবর্তী উদাহরণে শ্রদ্ধা বিজড়িত স্তুতিবাচন অন্তরের শ্রদ্ধামণ্ডিত অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। তৎসম শব্দবাহুল্যও উপল-মণ্ডিত বাকস্পন্দ সৃষ্টি করেছে।

অনেক ক্ষেত্রেই অন্তরের ভাবময়তাকে যথাযথ প্রকাশ করতে পেরেছেন বিবেকানন্দ। সব লেখকই চান নিজের চিন্তাতরঙ্গকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে।২৮ কেউ সফল হন, কেউ হন না। এক্ষেত্রে লেখকের নিষ্ঠা এবং প্রতিভা সমানভাবে কাজ করে। বিবেকানন্দ স্বল্প রচনায় কোথাও সেই নিষ্ঠার অভাব রাখেননি। ভাষাবিজ্ঞানসম্মত সংগঠনে এই ভাবরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভাষাবিজ্ঞানসম্মত এই সংগঠন আসলে মাধ্যম (medium)।

লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে মাধ্যম নানাবিধ হতে পারে, যেমন কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণীর সঙ্গে পার্থক্য থাকে বিজ্ঞাপনের, আবার তার সঙ্গে রান্নার বই-এর, ভালবাসার কবিতার, ভাবগম্ভীর প্রবন্ধের, সরস ভ্রমণকাহিনীর ইত্যাদি ইত্যাদি। মাধ্যম-এর সাহায্যে রচনার সংরূপগত পরিচয় আমরা পেতে পারি। লেখকের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়। আমাদের আলোচনার প্রথমদিকে আমরা দেখেছি বিবেকানন্দ মোটামুটি তিন প্রধান মাধ্যম অবলম্বন করেছেন গদ্যভাষার ক্ষেত্রে। মাধ্যমকে আরও বিস্তৃত করে বলতে গেলে বলা যায় ঃ

চিঠিপত্র—ব্যক্তিগত, সাধারণ,
প্রবন্ধ—ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ক
বক্তৃতা—লিখিত, তাৎক্ষণিক ; আনুষ্ঠানিক, সাধারণ
কথোপকথন—প্রশ্নোত্তরে
ভ্রমণ—ডায়েরিমূলক। এবং বাণী।

মাধ্যম-এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত অভিপ্রায় বা tenor।২৯ এর মধ্য দিয়ে বক্তা-শ্রোতার মধ্যে বা লেখক-পাঠকের মধ্যে একটি সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বক্তা বা লেখক তাঁর শ্রোতা বা পাঠক সম্বন্ধে যে চিন্তা, অনুভূতি, ধারণা বা জ্ঞান বা কল্পনা বিষয়, ভাব ও মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পোষণ করেন, তা তাঁর কথা বলায় বা লেখায় প্রকাশিত হয়।

---

২৫ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৬, ৬৮ ২৬ ঐ, পৃঃ ২৪৯ ২৭ ঐ, পৃঃ ১২৪

২৮ "But most speakers and writers would seem to belive that what they say and write has sense, and that the purpose of what they say and write is to embody this sense in some kind of linguistics structuring." A Grammar of Style, p. 39

২৯ "Allied to the component of medium is that of tenor, which is a name for the way in which the social relationship between the encoder and decoder of messages influences the language use,." Ibid, p. 39-40

শিশুসাহিত্যে যে-ভাষায় লেখক লেখেন, তার সঙ্গে বয়স্ক পাঠকের জন্য রচিত সাহিত্যের ভাষা নিশ্চয়ই পৃথক করতে চান।

বিবেকানন্দ যেটুকু রচনা করেছেন তাতে এই অভিপ্রায় বা tenor-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাবে। কার জন্যে তিনি লিখছেন সে-চিন্তা তাঁর মধ্যে সবসময়েই ছিল। তাঁর লেখায় এই কারণেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে।

‘পরিব্রাজক’ যখন লেখেন, তখন সমগোত্রীয় অন্তরঙ্গতা তার ভাষায় অনুভব করা যায়। পাশাপাশি ‘বর্তমান ভারত’ পড়লে বোঝা যায় উদ্দিষ্ট জনের সঙ্গে সম্পর্ক অন্তরঙ্গতার নয়। গাম্ভীর্যের দূরত্ব আছে। পাশ্চাত্যে যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন ইংরেজিতে, তাতে ভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রকাশ আছে। অবশ্য বিবেকানন্দ বিদেশীজনের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছেন। আমরা জানি, চিকাগো বক্তৃতায় ‘Sisters and Brothers of America’—এই সম্বোধনে তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই সম্বোধন অন্তরঙ্গতার এবং উষ্ণ হৃদয়ের। ‘গীতা সম্পর্কে মতামত’ প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গে যে-সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে পাঠককে সম্ভ্রমের আসনে তিনি বসিয়েছেন। পাঠককে সাধারণ স্তরে রেখে তাদের ভাষায় কথা বলেছেন,

> “রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আর সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগলো।”[৩০]

বর্ণনাত্মক সমাজভাষাবিজ্ঞানে (Descriptive sociology of language) ডাইভার্সিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। ফিশম্যান সূত্রাকারে আমাদের জানিয়েছেন যে, ভাষার বক্তা, ভাষার বিশেষ রূপ, শ্রোতা, ভাষা ব্যবহারের বিশেষ উপলক্ষ এবং উদ্দেশ্য—এগুলি আমাদের দেখা দরকার।[৩১] হাইমস্ ভাষার চরিত্র নির্ধারণে বক্তা (sender) শ্রোতা (receiver) এবং উপলক্ষ (setting)—এই তিন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চান।[৩২] ফলে, পাঠক সম্পর্কে লেখকের অভিপ্রায় সাহিত্যরূপ নির্মাণে বিশেষভাবেই সহায়তা করে।

লেখক পাঠকের সঙ্গে কোন্ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন, তা সব আগে বোঝা যায় সম্বোধন-এর ব্যবহার দেখে। আমরা বিবেকানন্দের গদ্যভাষায় লক্ষ্য করব, তিনি সম্বোধনবাচক শব্দ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে প্রবন্ধ রচনায় সম্পর্কবাচক শব্দ প্রবন্ধ রচয়িতা ব্যবহার করেন না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ব্যতিক্রম। তিনি পাঠককে কখনো ‘তুমি’ কখনো ‘আপনি’ ইত্যাদি সম্পর্কবাচক শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করেছেন।[৩৩] এখানে দু-একটি বাক্য লক্ষ্য করা যাক।

ক. “এবার **তোমারও** পাঠিয়েছ দেখছি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েছ **ভায়া**।”[৩৪]

খ. “যদি **বল** ও-কথা বেশ; বাঙালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব?[৩৫]

গ. “তবে বিদেশী, **তুমি** যত বলবান নিজেকে **ভাবো**, ওটা কল্পনা।[৩৬]

ঘ. “ওটা কোনদিশি ভদ্রতা **হে বাপু**?”[৩৭]

যে-কথা বলতে চাইছি, সে-কথা বলার জন্য আর বেশি উদাহরণ দরকার নেই। সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ যে পুরুষ-বাচক বিশেষ্য (Person Noun) ব্যবহার করেন, তা মধ্যম পুরুষ এবং

---

[৩০] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১৭১

[৩১] “Who speaks (or writes) what language (or what language variety) to whom and to what end ?” দ্রঃ The Sociology of Language, by Fisherman in Language and Social Context—Giglioli, Pier Paolo—Ed., 1982, Penguin Books, p 45 ; সমাজভাষাবিজ্ঞান, পৃঃ ১৬৪

[৩২] “এগুলিই ভাষারূপটির conditioning factor”, সমাজভাষাবিজ্ঞান, পৃঃ ১৬৫

[৩৩] এপ্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র ‘পাঠক’ সম্বোধন ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে।

[৩৪] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬২ [৩৫] ঐ, পৃঃ ৩৪ [৩৬] ঐ, পৃঃ ১৫১ [৩৭] ঐ, পৃঃ ১৫২

অন্তরঙ্গমূলক। উদাহরণ দেখলে বোঝা যাবে তিনি একই প্রবন্ধে প্রথম দিকে ব্যবহার করেছেন সম্মানবাচক পুরুষ-বিশেষ্য এবং একটু পরেই আবেগ-তাড়িত হয়ে অন্তরঙ্গ সম্বোধন ব্যবহার করেছেন। বিবেকানন্দের গদ্যভাষায় সম্পর্কবাচক শব্দ এবং পুরুষ-বিশেষ্য উল্লেখযোগ্য অন্তরঙ্গতার সুর নিয়ে এসেছে। পাঠককে এইভাবেই তিনি আত্মীয় করে নিয়েছেন। এই কারণেই তাঁর ভাষা পাঠককে উদ্দীপ্ত করে তোলে। উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য বিবেকানন্দ ঘন ঘন পুরুষ-বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সবক্ষেত্রে এত ব্যাপক হারে তিনি সম্পর্ক-বাচক বিশেষ্য ও সম্বোধন পদ ব্যবহার করেননি। কিন্তু যেখানে করেছেন সেখানে লেখকের অন্তরের উত্তাপ, বক্তব্যের দৃঢ় স্পর্শ পাঠকের অন্তরকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে।

বিষয়, মাধ্যম, ভাবরূপ, অভিপ্রায়—এই সব নিয়ে লেখকের ভাষাশৈলীকে বুঝে নেওয়া যায়। বিবেকানন্দের গদ্য অবলম্বনে আমরা এ-পর্যন্ত সেই শৈলীকে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বর্তমান ভাষাসংগঠনতত্ত্বের বিচারে বাকি রয়ে গেল আরও অনেক কিছু।

বিবেকানন্দের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে, ভাষা ব্যবহারের আরও নানাদিক লক্ষ্য করতে হবে। বিবেকানন্দ অভিপ্রায় (Tenor)-সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। সাধারণের কাছে সহজ ভাষায় বক্তব্য পৌঁছে দেবার কথা তিনি বারবার বলেছেন।[৩৮]

সুতরাং তৎসম শব্দের বদলে কীভাবে তিনি মৌখিকরীতির শব্দ ব্যবহার করছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ দেখলে সহজেই এই ক্রম-বিবর্তন ধরা পড়বে। এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে তৎসম শব্দ বাহুল্য দিয়ে,

> "সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দন-বিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে সম্মুখে পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদদৃষ্ট বংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিত বদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।"[৩৯]

এ ভাষা মন্ত্রের মতো উচ্ছ্বাসময়, অথচ সংহত ভাবগাম্ভীর্যকে ধারণ করে আছে। অথচ একটু পরেই এই একই গ্রন্থে তিনি সম্পূর্ণ প্রচলিত রীতির ভাষা ব্যবহার করেন,

> "তোমাদের দু'চারজনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়?"[৪০]

হাড়-জ্বালাতন, চরে খাওগে, দুনিয়া, মুরদ প্রভৃতি মৌখিকরীতির শব্দ ও ইডিয়ম ব্যবহার করেছেন। একই সঙ্গে লক্ষণীয় বাক্যের দৈর্ঘ্য। তৎসমবহুল বাক্যে বিশেষণ বাহুল্য এবং বাক্যের দৈর্ঘ্য যেমন দেখা যাবে, তেমনি তার পাশাপাশি মৌখিকরীতির শব্দ পূর্ণ বাক্যের ক্ষেত্রে বিশেষণ ব্যবহারের স্বল্পতা এবং বাক্যের স্বল্প দৈর্ঘ্য সহাবস্থান করছে।

বিবেকানন্দের রচনা যেখানে প্রবল গতিবেগ ধারণ করে তাঁর অন্তরের আবেগময়তাকে ফুটিয়ে তুলেছে, সেখানে পুনরুক্তি এবং সমান্তরালতা (Parallelism) এসে পড়েছে।

বিবেকানন্দের নঞর্থক বাক্য ব্যবহার, প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। সংগঠন বিজ্ঞানগত আলোচনায়[৪১] এর গুরুত্ব যথেষ্ট। আমাদের আলোচনায় বিবেকানন্দের বাক্য ব্যবহারগত আরো অনেক দিকের কথা বলা বাকি রয়ে গেল। গবেষক পাঠক নিশ্চয়ই প্রবন্ধের বিস্তারের কথা মনে রেখে মার্জনা করবেন। আমরা এখানে বিবেকানন্দের গদ্যভাষাশৈলী নিয়ে শুধু একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি।

---

[৩৮] বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫ [৩৯] ঐ, পৃঃ ১৪১ [৪০] ঐ, পৃঃ ১৫১

[৪১] ভাষাবিজ্ঞানগত আলোচনা অবলম্বন করে বাক্যের অধোগঠন (Deep Structure) থেকে কিভাবে লেখক নানা সংবর্তনের (Transformation) মধ্য দিয়ে সাহিত্যরূপটির অধিগঠন (Surface Structure) সৃষ্টি করেছেন, তা লক্ষ্য করারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এবিষয়ে উৎসাহী পাঠক Richard Ohmann-এর Generative Grammars and the Concept of Literary Style এবং James Peter Thorne-এর Stylistics and Generative Grammars দেখতে পারেন। দ্রঃ Linguistics and Literary Style. 1970, Donald C. Freeman Ed. 1970, p. 182, 258

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা ঃ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

আর পাঁচজন ছেলে-মেয়ের মতোই ওরা বসে আলোচনা করছিল। দেশের কথা। সমাজের অবস্থা। মানুষের অগ্রগতি ও নিঃসঙ্গতা।

কিন্তু অন্যান্যদের থেকে ওরা কিছুটা আলাদা। তাই আলোচনা যতই দানা বাধছিল, ওরা বুঝতে পারছিল যে, একটা কিছু করা দরকার। আলোচনা তাই নিছক নেতিমূলক দিকে পালটে গঠনমূলক পথে এগিয়ে গেল। এই মুহূর্তে কি করা যায়? কি করতে পারি আমরা, এই মুষ্টিমেয় যুবক-যুবতীরা? ওরা সিদ্ধান্ত নিল স্বামীজীর দিগ্‌দর্শন থেকে। সমাজের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা নিয়েই একটা পরীক্ষা করা যাক।

একদিন। দুদিন। তিনদিন। ওরা একটা পরিকল্পনা ছকে নিলো তিনদিনের মাথায়। প্রথমেই স্থির করে নিল শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি দিক। স্বামীজীর চিন্তাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে—এই নিয়ে আলোচনা হল আবার। তৈরি হল একটি 'রিসার্চ প্রোজেক্ট'। কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হল। কাজ শুরু করল একটি সুসংবদ্ধ টীম।

অথচ কতই বা বয়স ওদের। ২৪ থেকে ৩০। সবাই ওরা 'বিবেকানন্দ ইউথ ফোরাম'-এর সদস্য। বোম্বে শহরের অধিবাসী। ওরা তরুণ-সমাজের মধ্যে স্বামীজীর ভাব ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছে অনেকগুলি বস্তিতে। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যায় স্বামীজীর সমাধান কিভাবে কার্যকরী করে তোলা যায়, এ-নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত 'রিসার্চ প্রোজেক্ট'-এ কাজ করছে প্রায় ২০ জন। টীমে আছে অভিজিৎ দেশপাণ্ডে (শিশু-বিশেষজ্ঞ), বিদ্যা কুমারন (মনোবিজ্ঞানী), স্যামুয়েল জনসন (কলেজের ছাত্র), দেবযানী দাশগুপ্ত (অধ্যাপিকা), মনীষা কাপুর (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী), সাধনা খারওয়ারকার (ডাক্তার), বিজয় আরোলকার (শিক্ষক), কৃষ্ণপ্রসাদ যোগভূষণ (যোগ-বিশেষজ্ঞ), পূর্ণিমা কণ্ট্রাক্টার (শিক্ষিকা) এবং আরও অনেকে।

ওরা বেছে নিয়েছে তিরিশজনের মতো ছাত্র-ছাত্রীকে। সবাই স্কুলে পড়ে। ক্লাস সেভেন থেকে টেনে। সপ্তাহে একদিন, দেড় থেকে দু ঘণ্টার ক্লাস। ছ-মাসের ট্রেনিং। প্রথম দলের ট্রেনিং শেষ হলে টীমের সদস্যরা মূল্যায়ন করবে তাদের প্রোগ্রামের। পরিমার্জিত রূপ দেবে। তারপর দ্বিতীয় দলকে নিয়ে পরীক্ষা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

'শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ'—স্বামীজীর এই উক্তিকে সামনে রেখেই এই প্রোজেক্ট তৈরি হয়েছে। একটি পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে।

মানুষের জীবনে অনেক সাময়িক লক্ষ্য থাকে। পরীক্ষায় ভাল ফল করা, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া, একটি ভাল চাকরি পাওয়া কিংবা নিজের ব্যবসা শুরু করা, চাকরিতে ক্রমাগত প্রমোশন, অথবা ব্যবসার বিস্তৃতি, বিয়ে করা, ছেলে-মেয়েকে বড় করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশের জীবনেই কোন চরম লক্ষ্য থাকে না। জীবনটাকে আমি কোন্ কাজে লাগাতে চাই, কি করতে চাই জীবনে—এসব প্রশ্ন মনে না ওঠায় জীবনটা হয়ে পড়ে একঘেয়ে, তাৎপর্যহীন, সমাজের ধাক্কায় ধাক্কায়, স্রোতে ভেসে যাওয়া পাতা বা গাছের ডাল। 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি ও জগতের কল্যাণ করা—স্বামীজী দিয়ে গেছেন এই আদর্শ। মেরী হেলকে লিখেছিলেন ঃ "দর্শন বা বিজ্ঞান, ধর্ম বা সাহিত্য

—যে-কোন একটিকে অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট জীবনে সেইটিই তোমার উপাস্য দেবতা হোক।" 'জগদ্ধিতায়' শব্দটির মাধ্যমে স্বামীজী পরিষ্কার ভাবে বললেন, প্রতিটি মানুষেরই সামাজিক দায়-দায়িত্ব বা 'সোসাল কমিটমেণ্ট' আছে। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এই দায় সীমাবদ্ধ নয়, সমাজকে টেনে তুলতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এ-পথে সক্রিয় করে তোলা দরকার।

তৃতীয়তঃ, তত্ত্বসর্বস্ব জ্ঞানে স্বামীজীর আস্থা ছিল না। তিনি বারবার বলেছেন ব্যবহারিক বেদান্তের কথা। আদর্শকে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে তা না জানা থাকায় অনেকেই ব্যবহারিক জীবনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। বাকিরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ থাকলেও এই সততাকে ব্যাপকভাবে সমাজে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারেন না। এসব সমস্যার সমাধানে দুটি পদ্ধতি প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত জীবনে ক্রমশঃ পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার ক্রিয়াপদ্ধতি। দ্বিতীয়তঃ, সাংগঠনিক স্তরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহমর্মী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্রমাগত প্রয়াস।

পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

যেহেতু এই 'রিসার্চ প্রোজেক্ট' এখনও প্রাথমিক স্তরে আছে, সেহেতু ছাত্রদের প্রধান কয়েকটি সমস্যা নিয়েই এরা কাজ করছে। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার উপরি-উক্ত তিনটি বক্তব্যকে মনে রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল সমস্যাগুলির সমাধানে চারটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ঃ

(১) মনঃসংযোগ।
(২) স্বাধীনভাবে ইতিবাচক (Positive) চিন্তা করা।
(৩) মূল্যবোধকে কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে তার পথ আবিষ্কার করা।
(৪) জীবনকে তাৎপর্যময় (Meaningful) ও সৃজনশীল (Creative) করে তোলা।

এই চারটি বিষয় যদি ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীরা আয়ত্ত করতে শেখে তবে ওদের জীবনের ধারাই পাল্টে যাবে।

পথের বাধা ও সমাধান

কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল এ-পথে কিছু বাধাও আসছে। বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষক—বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক—গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বাইরে নতুন কিছুতে আগ্রহী নন। অনেকে আবার মুখে সমর্থন জানালেও পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে সন্দিহান।

দ্বিতীয় বাধা এল অভিভাবকদের কাছ থেকে। অনেকের মধ্যেই দেখা গেল যে, তাঁরা সন্তানের ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব-বিকাশের চেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল এবং কেরিয়ারকেই প্রধান মনে করেন।

এই দুটি বাধার সম্মুখীন হয়ে ঠিক করা হল, যে-অভিভাবকেরা এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী, শুধু তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়েই কাজ শুরু করা হবে। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে স্থির হল যে, যাঁরা এতে উৎসাহী তাঁদের সাহায্যে এই প্রোজেক্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

এই বাধাগুলি অবশ্য অভিজিৎ-মনীষা-বিজয়দের একটি নতুন শিক্ষা দিল। তারা বুঝল, মানুষ আপাতদৃষ্টিতে যতই আধুনিক হোক না কেন, প্রকৃত অর্থে মানসিক জড়তাকে অধিকাংশ লোকই জয় করতে পারেনি। ফলে গতানুগতিক চিন্তার বাইরে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এরা ভয় পায়। এরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে সমালোচনা করে, অথচ নতুন পথ খুঁজে বের করতে অনাগ্রহী।

এইসঙ্গে আরেকটি জিনিস শিখল বিদ্যা-জনসন-সাধনা-রা। নতুন চিন্তাই যথেষ্ট নয়, একে প্রয়োগের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হবে। মানুষ আজ সবকিছুতেই বিশ্বাস হারাচ্ছে। এই পটভূমিকায় মানুষের সামনে নতুন পথের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারলে তবেই ওরা এ-বিষয়ে উৎসাহী হবে।

মনঃসংযোগ

স্বামীজী বলেছিলেন যে, যদি তিনি আবার শিশুকালে ফিরে যান তবে একগাদা বই পড়ার আগে প্রথমেই মনঃসংযোগের ওপর জোর দেবেন। পড়া, কাজ, খেলা ইত্যাদি সর্বত্রই মনঃসংযোগ (concentration) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের সমস্যা হল, যে-বিষয়টি তাদের ভাল লাগে, সে-বিষয়ে তারা সহজেই মনঃসংযোগ করতে পারে, অন্য বিষয়ে নয়। তাই এই প্রোজেক্টে মনঃসংযোগ বাড়াবার একটি পদ্ধতি শেখানোর ব্যবস্থা হল।

আধ্যাত্মিক সাধনায় যে ধ্যানের উল্লেখ আছে তার সরাসরি প্রয়োগ না করে একটু সরল করা হল। মনকে শান্ত করা (relaxation), সচেতন করা (awareness) এবং একাগ্রতা (concentration) —এই তিনটি পদ্ধতি একে একে শেখানো। শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখলেই মন শান্ত হয়ে আসে। বিভিন্ন রঙের ফুটকি দেওয়া একটি বোর্ডের দিকে তাকিয়ে একই রঙের ফুটকিগুলিকে আলাদা-আলাদাভাবে লক্ষ্য করা, চোখ বন্ধ করে শরীরের প্রধান অংশগুলি সম্বন্ধে একে একে সচেতন হওয়া ইত্যাদি পদ্ধতিতে মনের সচেতনশক্তি বাড়ে। একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন চোখ বন্ধ করে পাখির উড়ে যাওয়া (দ্রুত ভ্রাম্যমাণ), নদীর স্রোত বা মেঘের ভেসে যাওয়া (ধীর গতি), এবং পরে বরফে ঢাকা পাহাড়শ্রেণী বা পূর্ণিমার চাঁদ (স্থির বস্তু) চিন্তা করা। ছাত্রদের মন স্বাভাবিকভাবে চঞ্চল থাকে বলে প্রথমে দ্রুত ধাবমান বস্তু, পরে ধীরগতির বস্তু এবং শেষে স্থির বস্তুর ওপর ধ্যান করলে (সঠিক অর্থে ধ্যান নয়, ধারণা) সুবিধে হয়।

এছাড়াও আরও কিছু পদ্ধতি ওদের শেখানো হয় যার সাহায্যে মনের শক্তি বাড়ে, বিপদের মুখে পড়েও মাথা স্থির রাখতে পারে।

স্বামীজী বলেছিলেন, কোনও বস্তুতে বা বিষয়ে মন রাখা (ধারণা) ও তা থেকে মন তুলে নেওয়ার (প্রত্যাহারের) শক্তি প্রয়োজন। ধরা যাক, বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র (সেতার, গীটার, বাঁশি ও তবলা) বাজছে। এক-একটি এক-একরকম রাগ ও তালে। সব কটিই একসঙ্গে বাজছে, কিন্তু ছাত্রদের বলা হল —শুধু সেতার শোনার চেষ্টা কর, অন্যগুলির দিকে নজর দিও না। কিছুক্ষণ পরে গীটারের ওপর মন দিতে বলা হল, এরপর বাঁশি ও শেষে তবলা। এতে ধারণা ও প্রত্যাহারের অভ্যাস তো হবেই, সেইসঙ্গে নানারকম আকর্ষণের মধ্যেও একটি বিশেষ লক্ষ্যে মন স্থির করার অভ্যাস হবে। চোখ বন্ধ করে চাঁদ ও পাহাড় চিন্তা করার সময় সাদা রঙকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এভাবে লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙকেও কাজে লাগানো যায়। গায়ত্রী-ধ্যানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার করা হয়, কারণ মনের ওপর রঙের বিশেষ প্রভাব আছে।

স্বাধীন চিন্তা

বিতর্কমূলক বা পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যে সাজানো একটি লেখা দিয়ে ওদের বলা হয়ঃ যে-সব পয়েন্ট তুমি সমর্থন কর সেখানে টিক (✓) দাও, যেখানে মনে হচ্ছে ভুল আছে সেখানে ক্রশ (×) দাও। এবারে লেখ তোমার যুক্তি। কিংবা বিজ্ঞানের ক্লাসে এমন প্রশ্ন করা হয় যার উত্তর ওদের বইয়ে নেই। ক্লাস সেভেনের ছাত্রদের জিজ্ঞেস করা হলঃ বিপরীতধর্মী দুটি চুম্বক-মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে কেন? প্রথমে ওরা তন্নতন্ন করে বইয়ে উত্তরটি খুঁজল। পেল না। তখন নিজেরাই ভাবতে শুরু করল। যার যা মনে হল, তা-ই বলল।

স্বামীজী বলেছিলেনঃ ক্লাসে গিয়ে দেখি শিক্ষকই কথা বলে যাচ্ছেন আর ছাত্রেরা চুপ করে আছে; এটা ঠিক নয়, বরং শিক্ষক চুপ করে থাকবেন ও ছাত্রেরা কথা বলবে। এর তাৎপর্য হল—ছাত্রদের মনকে তথ্যভারাক্রান্ত করা নয়, বরং কৌতূহলী ও অনুসন্ধানী করে তোলাই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

আড্ডা বা অলস আলোচনার মাধ্যমে যে শুধু সময় ও শক্তিই নষ্ট হয়, কাজের কাজ কিছু হয় না, বরং মানুষকে তা দুর্বলতার দিকে ঠেলে দেয়—এটি বুঝিয়ে দেওয়া হয় ছোট-ছোট নাটকের মাধ্যমে। মানুষের শুধু মন্দ দিক নয়, ভাল দিকও আছে;

সমাজে দুঃসহ পরিস্থিতিতেও 'রুপোলী রেখা' (silver lining) রয়েছে—এগুলি কিভাবে লক্ষ্য করতে হয়, খুঁজে বের করতে হয়, এর ওপর জোর দিয়ে কিভাবে চিন্তা ও কর্মকে ইতিবাচক (positive) পথে নিয়ে যেতে হয়, ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেই ওদের চিন্তা নতুন পথে মোড় নেয়।

মূল্যবোধের প্রয়োগ

কোনটি ভাল কোনটি মন্দ তা সবাই মোটামুটি-ভাবে জানে। সমস্যা হল, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল্যবোধকে (human values) ধরে রাখা ও তার প্রয়োগ করা। এটি শেখাবার সময় প্রথমেই জোর দেওয়া হয় মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের ওপর। বেদান্তের মূল কথা ("তুমি অসীম সম্ভাবনাময়") যার ওপর স্বামীজী খুবই জোর দিয়েছেন, সেই ভাবটিকে ছাত্রদের মনে গভীরভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ওদের বলা হয়ঃ তোমাদের যেসব গুণ আছে সেগুলি খাতায় লেখ। এতে ওরা খুবই উৎসাহী হয়ে ওঠে, নিজের ওপর বিশ্বাস বাড়ে। এরপর ওদের বলা হয়ঃ তোমার জীবনের একটি ঘটনার কথা লেখ যেখানে তোমার এই গুণ প্রকাশ পেয়েছিল। শেষে ওদের কিছু ধাঁধার সমাধান করতে হয়। যেমন কেউ লিখল—আমার একটা গুণ হল যে, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। পরে সে একটি ঘটনার কথা লিখল যেখানে সে কষ্ট করেও সত্যনিষ্ঠ থেকেছে। এবারে তাকে একটা ধাঁধার সমাধান করতে দেওয়া হল—

> "মনে কর, তোমার মা তোমাদের দুই ভাইকে বাইরে কাটা ফল, ফুচকা ইত্যাদি খেতে বারণ করেছেন। তুমি একদিন দাদাকে দেখলে ফুচকা খেতে। বাড়িতে এসে তার পেট ব্যথা শুরু হল। মার প্রশ্নের উত্তরে তোমার দাদা বারবার বলল যে সে বাইরে কিছুই খায়নি। মা তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এবিষয়ে কিছু জান কিনা। তুমি এখন কি করবে?
>
> (১) বলব, হ্যাঁ, দাদা ফুচকা খেয়েছে।
> (২) বলব, জানি না বা দেখিনি।
> (৩) মাকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে বলব—হ্যাঁ দাদা খেয়েছে, তবে মা, তুমি ওকে এখন বকো না, কারণ নিজের ভুল ও বুঝতে পেরেছে।"

এই ধরনের ধাঁধায় তিন-চারটি উত্তর দেওয়া থাকে। ওদের বলা হয় যে-কোন একটিতে 'টিক' দিতে। এর সাহায্যে ওরা বুঝতে পারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে চলা উচিত। তারপর যে ধাঁধা দেওয়া হয় তাতে কোনও উত্তর থাকে না।

> "মনে কর, খেলায় একটা ম্যাচ জেতার পর আনন্দ করার জন্য তোমরা রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে। ফলে বাড়ি ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল। তোমার বাবা রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাকে বলেছি সন্ধ্যে ছ'টার পর কিছুতেই বাইরে থাকা চলবে না, তবুও কেন কথা শুনছ না? বাবা রাগে কাঁপছেন। তুমি কি করবে?"

দ্বিতীয় ধরনের ধাঁধায় কোনও উত্তর দেওয়া থাকে না বলে ছাত্রকে নিজে-নিজেই চিন্তা করতে হয়। এতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে মূল্যবোধের প্রয়োগ করা দরকার।

এ-ছাড়াও ওদের কয়েকটি 'প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌ মেথড' শেখানো হয় যার সাহায্যে ওরা ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, সাময়িক সুখের প্রলোভনকে জয় করতে পারে, কয়েকটি সুনীতি অভ্যাস করতে পারে ইত্যাদি।

তাৎপর্যময় ও সৃজনশীল জীবন

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই কোন-না-কোন ধরনের সৃজনশক্তি থাকে। কেউ ভাল ছবি আঁকে, কেউ গান করে, কেউ অঙ্কে ভাল, কেউ বা মেশিনের যন্ত্রপাতিতে উৎসাহী, এ-রকম। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে তাকে সেই বিষয়ে আরও এগিয়ে চলার পথটি দেখিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিদিন সে

যাতে অন্ততঃ একঘণ্টা ঐ বিষয়ে দেয়, তা বলে দিয়ে তার দৈনন্দিন রুটিনে কখন সে এটি করতে পারে তাও বলা হয়।

শিল্পী, বিজ্ঞানী, ধার্মিক, দার্শনিক প্রমুখ সকলেরই যে সোশাল কমিটমেণ্ট থাকা দরকার, এটি বুঝিয়ে দেওয়া হয় নানান গল্পের মাধ্যমে। এটি না থাকার জন্যই যে বিজ্ঞানীরা মানুষ-মারার-অস্ত্র আবিষ্কার করেন, ডাক্তার অনাবশ্যকভাবে বেশি ওষুধ খেতে বলেন, ইঞ্জিনীয়ারের তৈরি রাস্তা বেশিদিন টেঁকেনা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাস হয় না—এ-সব সিদ্ধান্তে ছাত্ররা নিজেরাই আসে আলোচনার মাধ্যমে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীরই যে সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে—এই ভাবটি ওদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

জীবনের নানান সাময়িক লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যও যে থাকা দরকার এবং সেদিকে তাকিয়েই সাময়িক লক্ষ্যগুলির গতি স্থির করতে হয়। এটি ওদের শেখানো হয় নানারকম ধাঁধা ও খেলার মাধ্যমে। সমাজে যাদের গণ্য-মান্য বলে মনে করা হয় তাঁদের জীবনকে ভাল করে লক্ষ্য কর, অর্থ ও পদ মানুষকে সত্যিই খুশি করে কিনা এবং এই দুটি থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন অমানুষ হয়ে ওঠে, এসব বিষয় নিয়ে ওদের চিন্তা করতে বলা হয়। দেখা গেছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা এবিষয়ে নতুন নতুন সুন্দর চিন্তা ও যুক্তি উপস্থাপিত করতে পারে। এইসঙ্গেই ওদের বলা হয়ঃ তুমি জীবনে কিভাবে বাঁচতে চাও তা লেখ।

আরেকটি শিক্ষা—খবরের কাগজ থেকে একটি দুঃখজনক ঘটনা শুনিয়ে বলা হয় ওদের মতামত লিখতে। তারপর ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়, খবরের কাগজ সবাই পড়ে, কিন্তু পাঠক তিন শ্রেণীর। একদল নির্লিপ্তভাবে পড়ে যায়। পাঞ্জাবে দশ জনের মৃত্যু, ইথিওপিয়ায় দুর্ভিক্ষ, আর ওলিম্পিক থেকে ভারতের শূন্যহাতে ফেরার খবরগুলি ওদের কাছে সমান। দ্বিতীয় দল এসব খবরে উত্তেজিত হয়, বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে। কিছুক্ষণ পরে সব ভুলে যায়। তৃতীয় দল পাঠক এসব খবরে শুধু দুঃখই পায় না, এর সমাধানে নিজেরা কিছু করতে উদ্যোগী হয়। এরাই যথার্থ পাঠক। সমাজের মন্দ দিকগুলির সমাধানে ছাত্র-ছাত্রীরা কি করতে পারে এ-বিষয়ে ওদের মতামত নেওয়া হয়। এভাবে প্রত্যেকের মনেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, অন্যকে সমালোচনা না করে নিজে কিছু করার চেষ্টাটাই বেশি দরকার।

শেখানোর পদ্ধতি

ক্লাসগুলিকে গতানুগতিক ক্লাস না করে ওয়ার্কশপ (workshop) করে তোলা হয়। কিভাবে? খেলা, গল্প, আলোচনা, ধাঁধা ইত্যাদির সাহায্যে শেখানো হয়। কোন বক্তৃতা নয়, কারণ এ-জিনিসটি ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ অপছন্দ। স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ওদের বাধ্য করা হয়, এই-সঙ্গেই বেশ কিছু প্র্যাক্‌টিক্যাল পদ্ধতি শেখানোর মাধ্যমে ওরা উপকৃত হয়ে ওঠে।

ছ-মাসের কোর্সের মধ্যে প্রতি দেড় মাস অন্তর মূল্যায়ন করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। আগে যেখানে ছিল সেখান থেকে এগিয়ে গেছে কিনা, গেলে কতটা গেছে, এ-বিষয়ে ওদের মা-বাবা ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে রিসার্চ-প্রোজেক্টের কার্যকারিতার মূল্যায়নও হয়।

মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ—বলেছিলেন স্বামীজী। আনন্দের কথা, স্বামীজীর নানান চিন্তা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর ভাবধারার প্রয়োগ নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যুবসমাজের মধ্যে। স্বামীজী সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছিলেন যুব-সমাজের ওপর। তারা সাড়া দিচ্ছে আজ ব্যাপক-ভাবে।

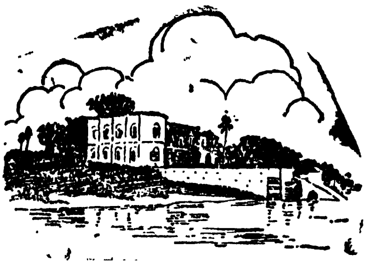

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

[এবারের এই বিভাগের রচনাদুটি স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী ও 'উদ্বোধন'-এর ৯০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে।]

১ স্বামীজীর প্রসঙ্গে

স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত কথোপকথন*

স্বামীজীর একটা বিশেষত্ব ছিল, উনি খুব নিজের ভাব চাপতে পারতেন। হয়ত ভেতরে এক রকম ভাব; কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখালেন বা কথা কইলেন যে, লোকে কিছু বুঝতে পারল না।

গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গলাভের জন্য যখন ছিলেন তখন কয়েক জন গুরুভ্রাতার সঙ্গে অমৃতবাবু বলে এক ভদ্রলোকও ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখেছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের লোক ছিলেন। স্বামীজী পওহারী বাবাকে দেখে ওঁদের শুনিয়ে শুনিয়ে এমন সব কথা বলতেন, আর এমন সব ভাব-ভঙ্গি করতেন, যেন ঠাকুর কিছু নন, পওহারী বাবা আরও বড়। এই ধর, যেমন বললেন, "পওহারী বাবা কেমন কতদিন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন।" অমৃতবাবু ঐসব শুনে শুনে রেগে উঠতেন, আর মাঝে মাঝে বলে উঠতেন 'গুরুদ্রোহী গুরুদ্রোহী!'

স্বামীজী পরে এখানে বলেছিলেন, "তারপর থেকে আমার ওপর তাঁর ভক্তি দিনকে দিন কমে গেল, আর আমার তাঁর ওপর ভক্তি দিনকে দিন বেড়ে গেল।"

প্রশ্ন—কেন? ঠাকুরের উপর তাঁর শ্রদ্ধা দেখে?

র—হাঁ।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী—তারপর ঐ অমৃতবাবুর কোন এক আত্মীয় সাধু হয়। তিনি ঐ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলেন, "দেখ, তোমরা ঐ নরেনের কাছে যেও না। সে নাস্তিক, পরমহংস-দেবকে মানে না। তোমরা ঐ রাখাল-টাখালের কাছে যাবে।" আত্মীয়টি তখন বললে, "না, নরেন এখন মানে।" তখন অমৃতবাবু বলেন, মানে? এখন ওসব মানে? মহাত্মা-টহাত্মা মানে?"

প্রশ্ন—আচ্ছা, স্বামীজীর তো পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হয়েছিল?

উত্তর—সে দীক্ষা মানে (আমাদের যে-রকম ধারণা) ঠিক দীক্ষা নয়। ওঁর তখন সমাধিস্থ হব বলে ঝোঁক। একেবারে সমাধিস্থ হয়ে থাকব, মাঝে মাঝে দু-একদিন একটু নেমে কিছু খেয়ে নেব—এই রকম ইচ্ছা। তিনি দেখলেন যে, পওহারী বাবা ঐ রকম সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তাই দেখে ওঁর ধারণা হয়েছিল যে পওহারী বাবা একটি কিছু উপায়ে ঐ রকম হন। সেইজন্য ওঁর মনে হয়েছিল যে, পওহারী বাবার কাছ থেকে সেই রকম একটা কিছু শিখে নিতে পারলে উনিও ঐ রকম সমাধিস্থ হতে পারেন।

প্রশ্ন—আচ্ছা, স্বামীজীর ঐ রকম দীক্ষা নেবার ইচ্ছার পর ঠাকুর তাকে দেখা দেন,—এই রকম যে গল্প আছে সে সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

উত্তর—ঐ তোমরা যা পড়েছ আমরাও তাই। ওটার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না। তবে মনে হয়, স্বামীজী যখন পওহারী বাবার কাছে শিখতে যান, তখন পওহারী বাবা এমন ভাব দেখাতেন, যেন স্বামীজীই একজন মহাপুরুষ, তাঁর কাছ থেকেই কিছু পেলে ভাল হয়। এই রকম দেখে শেষে তাঁর পওহারী বাবার কাছে কিছু শেখবার আগ্রহ কমে যায়।

প্রশ্ন—আচ্ছা, আপনারা কেউ জিজ্ঞাসা করেননি স্বামীজীকে, ঐ ঠাকুরের দর্শন দেওয়া সম্বন্ধে?

উত্তর—তুমিও যেমন! স্বামীজীকে ওকথা জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিল কার?

* * *

তোমরা স্বামীজী-সম্বন্ধে যতই বল যে, 'তিনি এই করেছেন, ঐ করেছেন, এই বলেছেন, ঐ

---

* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মন্ত্রশিষ্য, স্বামীজীর অধিকাংশ ইংরেজী গ্রন্থ ও বক্তৃতাবলীর অনুবাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট স্বামী শুদ্ধানন্দজীর (সুধীর মহারাজের) সহিত বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসীর (তখন ব্রহ্মচারীর) কথাবার্তার ডায়েরী হইতে সংগৃহীত।

বলেছেন,' আমার কিন্তু স্থির ধারণা যে, তিনি যতই কাজ করুন, ওটা তাঁর স্বরূপ নয়। তাঁর স্বরূপ হল ধ্যান, তপস্যা, এই দিকে। আমার এ মনে হবার কারণও আছে। তাঁর শেষ বয়সে একদিন ওপরের ঘরে আমি তাঁকে হাওয়া করছি। তখন তাঁকে সারারাত হাওয়া করতে হত। আমাকে সাধারণতঃ থাকতে হত না; কিন্তু সেদিন লোক ছিল না কি কারণে, আমিই ছিলুম। হাওয়া করছি, এমন সময় মানুষে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে-রকম কথা কয়, সেই রকম উনি কি বলে উঠলেন। আমি সব কথা বুঝতে পারলুম না, দু-একটা কথা বুঝলুম। উনি বলছেন—'অহংটাকে একেবারে নাশ করে ফেলতে হবে।'

স্বামীজী তখন ঢাকায়—আমরা দু-একজন সঙ্গে ছিলাম। ওঁকে কয়েকজন এসে জিজ্ঞেস করে,—'মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ হওয়া ভাল না বেশি বয়সে?' উনি তো direct (সোজা) কিছু উত্তর দিতেন না। এসব বিষয়ে অমনি general (সাধারণ) ভাবে উত্তর দিতেন। এখানেও ও কথার স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বল্লেন, 'হাঁ এই dowry system-ই (পণপ্রথাই) child-marriage (বাল্য-বিবাহ) তুলে দেবে' কাজেও তাই হয়েছে। এত যে আজকাল বেশি বয়সে মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে, এই dowry system-ই তার কারণ।

* * *

শরীর যাবার কিছু আগে স্বামীজী আমাদের দু-একজনকে বললেনঃ "দেখ, আমি ত মায়ের কখনও কিছু করলুম না; আর আমার শরীরের যে-রকম অবস্থা, তাতে আর দু-এক বছরের বেশি বাঁচব বলে মনে হয় না। তাই আমার ইচ্ছা মাকে কিছু তীর্থ করাই; তাহলে তবু তাঁর কিছু করা হবে। তা তোমরা যদি আমায় এ-বিষয়ে সাহায্য কর ত ভাল হয়; আমার নিজের শরীরের ত এই অবস্থা।"

তারপর আমি আর অন্য কয়েক জন স্বামীজীর মা ও দিদিমাকে নিয়ে কয়েক জায়গায় যাই।

তখন একটা বেশ মজার ব্যাপার হয়েছিল। স্বামীজীর মা তাঁকে বলতেন, "দেখ, এসব তো অনেক হল, বেশ ভাল; এইবার একটা বিয়ে কর"। তার উত্তরে স্বামীজী বলতেন, "দেখ মা, বিয়ে করবার কি দরকার? এই দেখ না আমার সব কত বড় বড় ছেলে রয়েছে।" এই বলে সব দেখাতেন।

আর যখন স্বামীজীর দিদিমা ঐ কথা বলতেন, তখন স্বামীজী বলতেন, "দেখ দিদিমা, এখনও আমার হাতে কিছু টাকা আছে; তুমি এই বেলা মর, আমি তোমার বেশ ঘটা করে শ্রাদ্ধ করি।"

প্রশ্ন—আচ্ছা, স্বামীজীর দীক্ষা-সম্বন্ধে কি রকম মতামত ছিল?

উত্তর—ওঁর দীক্ষার ওপর বিশেষ ঝোঁক ছিল না; ওঁর ছিল সন্ন্যাস। উনি বলতেন, "হাজার হাজার ছেলে আসবে, আমি তাদের একধার থেকে মাথা মুড়িয়ে দেব, আর তাদের বাপেরা এসে কাঁদবে, আমি দেখব।" মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার মানে সন্ন্যাস দেওয়া আর কি।

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে তখন বিজ্ঞান স্বামী (হরিপ্রসন্ন মহারাজ) এসেছেন। আমরা শুনলাম যে, বিজ্ঞান স্বামীর মা এসেছেন। তারপর স্বামীজী যাচ্ছেন, আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছি। দেখি একজন স্ত্রীলোক আসছেন। কাছে এসে সামনা-সামনি হতে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি হরিপ্রসন্নর মা?"

তিনি উত্তর করলেন, "না, আমি তার শত্তুর।"

প্রশ্ন—স্বামীজী তখন কি করলেন?

উত্তর—করবেন আর কি? তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

বৃহস্পতিবারের বারবেলা, মঘা ইত্যাদির কথা উঠল। সুধীর মহারাজ বললেনঃ

শশী মহারাজ ওসব ভীষণ মানতেন। আবার আমাদের মধ্যে অনেকে ছিল যাদের ওসব পছন্দ হত না। তা একবার এমন হল যে, মঠে দুটো দল হয়ে গেল। যারা ওসব মানত তারা বললে, "যারা ওসব মানে না তারা ঠাকুরকেই মানে না।" ঠাকুর ওসব মানতেন কিনা। তখন দ্বিতীয় দলের মধ্যে কানাঘুষো হয়ে কথাটা গিয়ে স্বামীজীর কাছে পড়ে। স্বামীজী তার উত্তরে বললেন, হাঁ, ওসবের effect (ফল) আছে, তবে আত্মার শক্তি অসীম; আত্মার শক্তি ওসব evil effect (কুফল) কাটাতে পারে। আত্মার শক্তি বাড়াও—ওসব কিছুই করতে পারবে না।

উদ্বোধনের জয়যাত্রা

কুমুদবন্ধু সেন

দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। এই অর্ধ শতাব্দী যাবৎ 'উদ্বোধন' দেশের জন-জাগরণে, সাহিত্যের নূতন শৈলীর ভাবধারায়, ব্যষ্টির স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উদার সম্প্রসারিত দৃষ্টি আনিয়াছে। কোন সংকীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্র গণ্ডী বা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা-দ্বেষ লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যুগোপযোগী মহাসমন্বয়ের দৃষ্টিতে—পূর্ব ও পশ্চিমের ব্রহ্মবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মিলনে এক নূতনতর মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠনে জাতির সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 'উদ্বোধনে'র আবির্ভাব বা বোধন হইয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ জলদগম্ভীর ও ওজস্বিনী ভাষায় 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 'উদ্বোধনে'র ৫ম বর্ষে ১৩০৯ সালে ১লা মাঘের ১ম সংখ্যায় পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ সুস্পষ্ট প্রাঞ্জলভাবে উহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "হে পাঠক! 'উদ্বোধন' ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্য বা ব্রহ্ম-শক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়-নিহিত রজঃ বা ক্ষত্র-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাতশিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে—সর্ষপতুল্য বীজই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য মনুষ্য-শরীরেই জড়শক্তি-নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্ব-সংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতন শক্তি আবার জাগরিতা।"

'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজীর লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা—সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট ছাপাখানা, তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণা ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সুদৃঢ় সংকল্প, নিষ্কাম কর্ম-প্রচেষ্টা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়। আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধনে'র সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকাপ্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় কতদিন তিনি কখনও অনাহারে, কখনও অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আজ কম্পোজিটার অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানাস্থান তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য লইবার জন্য কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনও কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময়ে পত্রিকা প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যারাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থার আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার

মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোন কালিমা দেখা যাইত না। বেশির ভাগ কম্পোজিটার ও প্রেসম্যান বস্তিতে বাস করিত। তিনি বিনাসঙ্কোচে বস্তির মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ লইতেন। কতদিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্ণকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতেছেন এবং তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহাদের 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি যাইতেন।

এদিকে পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল-ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে [স্বামীজীর] তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমুলের ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে' তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধনে' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, "কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না!" স্বামীজী বলিলেন, "ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল—তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হল বল?" স্বামী-ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা দুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে—বিশেষ কম্পোজিটার প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনও কখনও তিনি 'উদ্বোধনে'র জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

আজ যে চলিত ভাষায় [সাহিত্যের প্রসার] হইয়াছে—তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামীজীর বাঙলা রচনা। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছু দিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, "কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?" দীনেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি এই মাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাঙলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হচ্ছে

পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' এছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।” বইখানি লইয়া দীনেশবাবু চলিয়া গেলেন। এই চলিত ভাষার ধারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা-গোমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। বহুপূর্বে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় চলিত ভাষা ছিল—তাহা ব্যঙ্গ-রঙ্গ তামাসা। গভীর চিন্তা ও সাহিত্যিক মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া স্বামীজীর প্রাণস্পর্শী চলিত ভাষা 'উদ্বোধনে' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যকে 'উদ্বোধন' কিরূপ পরিপুষ্ট করিয়াছে, 'উদ্বোধনে'র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

লীলাপ্রসঙ্গ,' 'ভারতে শক্তিপূজা' প্রভৃতি বাংলার অগণিত নরনারীর প্রাণে শুধু শান্তি দান করে নাই —অনেকের সাধনায় চিন্তায় ও জীবনে প্রেরণা দান করিয়াছে। অনুবাদ-সাহিত্যের আদর্শ রচনা দেখিতে পাই বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলীতে। বঙ্গভাষায় এখন পর্যন্ত ইহা অতুলনীয়। 'রাজযোগ', 'কর্মযোগ' প্রভৃতি গ্রন্থও সুন্দর অনূদিত হইয়াছে। অনেকে ইহা স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের ইহা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব দান। রুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস ও গল্প ব্যতীত চিন্তাশীল প্রবন্ধ-সহায়েও যে মাসিকপত্র চলিতে পারে—ইহার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন—'উদ্বোধন'।

বিগত অর্ধ-শতাব্দীকাল 'উদ্বোধন' বাঙালী হিন্দু-নরনারীকে, আভিজাত্য-অভিমানী হিন্দুগণকে শিখাইয়াছে—যদি এখনও বাঁচিতে চাও, তোমরা তোমাদের মাতৃভূমি—তোমাদের সমাজ ও ধর্ম বাঁচাইতে চাও—তবে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হরণ করা অপেক্ষা আর মহাপাপ কি হইতে পারে? যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া এতদিন অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছ—তাহাদের অধিকার দাও, বিদ্যা দাও, তাহাদের তোমাদের মতো মানুষ করিয়া তোল, সব ভেদ দূর কর। স্বামীজীর ভাষায় বলি—ভারতকে উঠাইতে হইবে, আর পুরোহিতদলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন, পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দু যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়—তাহা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে আজ ইহাই প্রধান সমস্যা।

'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, “উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

“ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে, না মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমান হিন্দুগণকে জয় করিল —এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্য সভ্যতার অভাব।”

সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'উদ্বোধন'কে অভিবাদন করিয়া বলিতেছি—হে 'উদ্বোধন', তোমার দিব্য কণ্ঠে ফুটিয়া উঠুক শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্বাধীনতার বাণী —এই স্বাধীন ভারতে তোমার আদর্শ সমুজ্জ্বল হইয়া কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রেরণা আনুক—কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক সাধনায়, কি ধর্মক্ষেত্রে ধ্বনিত হোক—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দের প্রেমপরিপূর্ণ উদার বাণী ও মহোজ্জ্বল আদর্শ। সভ্যতার নবরূপ গঠনে কোটি কোটি নরনারী উদ্বুদ্ধ হোক—ভারত আবার সকল বিষয়ে জগতের মহাবরেণ্য আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত হোক।

পরমপদকমলে

স্বামীজীর ধর্ম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভগবান মানি না। বেশ মানতে হবে না। ধর্ম পুরোহিতদের ব্যবসা। বেশ, তাহলে অধার্মিক হয়ে যাও। তারপর? মানুষ থাকবে তো? না সব অমানুষ হয়ে যাবে! স্বামীজী এই আশঙ্কাই করেছিলেন। তিনি যখন আমাদের ফেলে চলে গেলেন, তখন আমাদের একটা জাগরণের কাল চলেছে। মহা, মহাপুরুষরা একাধিক ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের আলো ফেলছেন। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বৃত্তে চলে আসছেন যুবকরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে। স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন আদর্শবাদীরা। সে-ও আর এক সন্ন্যাস। বিদায়ের আগে স্বামীজী সচেতন করে দিয়ে গেলেন, জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়, পাবে এক মহাসত্য—আমাদের জাতির শক্তির মূল স্তম্ভ হল তার আধ্যাত্মিকতা। এই শক্তির বলেই একটি জাতি ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। জাতি মানে মানব-গোষ্ঠী। যে-জাতির বেশির ভাগ মানুষই দেহবাদী, ইন্দ্রিয়পর, ভোগ ছাড়া যারা আর কিছু চায় না, কর্কশ, নিষ্ঠুর, দানবভাবাপন্ন সেই জাতি ইতিহাসে অল্প সময়ের জন্য প্রভুত্ব করে চিরবিলীন হয়ে যায় মহাকালে। কিন্তু যে-জাতিতে সেই মানুষের সংখ্যা বেশি, যাঁরা বুঝতে শিখেছেন আনন্দ দেহে নেই, ইন্দ্রিয়সুখে নেই, জৈবতায় নেই, যাঁরা দেহসীমা উত্তীর্ণ হয়ে ভূমার শক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যাঁদের চেতনায় বারে বারে উঁকি মেরে যায় চিন্তা, বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে না পারলে জীবন কেবল আসা আর যাওয়া, জীবন কেবল আহার, নিদ্রা আর মৈথুন; হয়তো তাঁরা সিদ্ধপুরুষ বলতে যা বোঝায় তা হতে পারেননি, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও হলেন না; কিন্তু সচেতন এই মানব-গোষ্ঠীর চিন্তার আলোকে সমগ্র জাতির চেহারা খুলে গেল। শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, শিল্পে-সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, প্রগতি নতুন একটি ধারা খুঁজে পেল। স্বামীজীর এই কথায় কোথাও কিন্তু ভগবান নেই। পুরোহিত নেই। ধর্ম নেই। ভগবান ভরসা বলে বসে থাকার তামসিক ইঙ্গিত নেই। আছে উপলব্ধির কথা। ভোগের দুর্ভোগ থেকে সরে আসার কথা। মানুষের যদি বিচার-বুদ্ধি না থাকে তাহলে অবিচার বেড়ে যায়, তখন আর প্রগতি নয় অধোগতি। যে-জাতিতে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে সে-জাতি ক্ষয়িষ্ণু। পতন তার আসন্ন। অনন্তের চেতনা না থাকলে বড় কিছু করা যায় না। সভ্যতার নামে একটা অসভ্য তালগোলের জন্ম হয়।

স্বামীজী নিজে ছিলেন বহুমাত্রিক এক ব্যক্তিত্ব, যে-কারণে কখনও তাঁকে 'নাস্তিক' বলেও মনে হয়। তাঁর কোনওরকম কুসংস্কার ছিল না। তিনি ছিলেন উদার মানবতাবাদী। জাতপাতের কোনও বিচার কোনও কালে ছিল না। শিবজ্ঞানে জীবসেবা—এই ছিল তাঁর সার কথা। স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ছিল বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত। বেরিয়ে পড়। নিজেকে অতিক্রম করে এগিয়ে চল। ইন্দ্রিয়ের হাত না ধরে ধর অমিত অমৃতশক্তির হাত। সে-শক্তি বজ্রে নেই, বিদ্যুতে নেই, নেই সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, নেই সংঘজীবনে। সেই শক্তি আছে নিজের ভেতরে। নিজেকে ধরতে পারলেই ধরা যায় সেই শক্তিকে। নিজেকে ধরা মানে, নিজেকে আদর্শ করে তোলা। ঈশ্বরোপম, দেবোপম।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী আমাদের নিয়ে গেছেন ঈশ্বরের উৎস-সন্ধানে। ঈশ্বর আর এক অর্থে ধর্ম। ধর্মের উৎস অনুসন্ধানে। ইতিহাস আমাদের সামনে দুটি ধারা তুলে ধরেছে। একটি হল আত্মার মতবাদ। প্রাথমিক স্তরে আত্মা মানে গীতার আত্মা ছিল না। এক থেকে বহু—বেদান্তের এই দর্শনও নয়। আত্মা মানে স্পিরিট। মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন, মানুষের ভেতর আর একটা মানুষ বসে আছে। দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের মানুষটি বেরিয়ে আসে। প্রথমটি মৃত হলেও দ্বিতীয়টি জীবিত। মৃতদেহটি যতদিন সংরক্ষিত রাখা যাবে, দ্বিতীয় অদৃশ্য মানবটি ততদিনই জীবিত

থাকবে। মিশরীয়রা এই বিশ্বাসেই দেহটিকে মমি করে বিশাল বিশাল পিরামিডের তলায় সমাহিত রাখতেন। সংরক্ষিত মৃতদেহের ক্ষতি হওয়া মানে দ্বিতীয় মানবটির আহত হওয়া। এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বাবিলোনিওরাও। তাঁদের বিশ্বাসে সামান্য একটু ভিন্নতা ছিল। তাঁরা মনে করতেন, দেহমুক্ত এই দ্বিতীয় সত্তাটির মধ্যে কোনও প্রেম-ভালবাসার অস্তিত্ব থাকত না। জীবিতদের ভয় দেখিয়ে দাবি করত, আমাকে খাদ্য দাও, পানীয় দাও। আমাকে সর্বব্যাপারে সাহায্য কর। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতিও তার আর কোনও মমতাবোধ থাকত না। এই বিশ্বাস থেকেই এল উপাসনা। পূর্ব-পুরুষের উপাসনা। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ছিল। এখনও আছে। হিন্দুরা এই দ্বিতীয়টিকে বলবেন প্রেত। প্রেত-শান্তির প্রথাও প্রচলিত আছে। প্রেতোদ্ধারে গয়ায় পিণ্ডদান। চৈনিকদের মধ্যে এখনও পূর্ব-পুরুষের উপাসনাই হল ধর্ম।

ধর্মের দ্বিতীয় ধারাটি হল প্রকৃতির উপাসনা। সন্ধ্যা নামে সূর্যাস্তে, নীলাকাশে ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ, ধেয়ে আসে দুর্জয় ঝটিকা, প্রকৃতির কখনও সংহার মূর্তি, কখনও মধুর প্রকাশ; মানুষের মনে হল এর পেছনের রহস্যটা কী! কোন্ মহাশক্তির খেলা। কে নাড়ায় এই কলকাঠি। বিজ্ঞান তখনও আসেনি। ঋষির কল্পনা ছুঁতে চাইল অনন্তকে। প্রকৃতির এক এক রূপ থেকে জন্ম নিল এক এক দেবতা, এক এক দেবী। কেউ ভীষণ ভীষণা, কেউ মধুর মাধুরী। গ্রীকদের সমস্ত দেবদেবীই প্রকৃতির বিমূর্ত রূপ। হিন্দুর বেদ প্রকৃতির উপাসনা।

দুটি বিপরীত ধারাকে সমন্বয় করে স্বামীজী এনেছেন তৃতীয় একটি ধারা। আর স্বামীজী সেইটিকেই বলেছেন ধর্মের প্রকৃত অঙ্কুর। নিজের জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানে পৌঁছোবার সংগ্রামই হল ধর্ম। কোথাও মানুষ জানতে চাইছে পূর্বপুরুষের আত্মার অবস্থান, দেহাবসানের পর মানুষের পরমগতি কী, কোথায় পরলোক। কোথাও মানুষ বুঝতে চাইছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির পেছনে কোন্ পরমাপ্রকৃতি, দিনরাত্রির খেলা খেলছেন মেঘ-রৌদ্রের খেলা। আনমনে কোন বিশ্বশক্তি মহাসিন্ধুকে নিয়ে খেলছেন। গ্রহ-তারকাকে ঘোরাচ্ছেন।

এরপর স্বামীজী বলছেন, স্বপ্নাবস্থাতেই মানুষ ধর্মের প্রথম সন্ধানটি পেয়েছিল। অমরত্বের ধারণাও এসেছিল স্বপ্ন থেকে। নিদ্রায় দেহের সাময়িক মৃত্যু। কোথায় কিভাবে পড়ে আছি কোনও জ্ঞানই নেই। সেই অবস্থায় মন চলে গেছে স্বপ্নলোকে। জাগ্রত অবস্থায় যার কোনও অস্তিত্ব ছিল না, নিদ্রিত অবস্থায় তা বাস্তব, আবার জাগরণে অন্তর্হিত। তখনই মানুষের মনে হল মৃত্যুতেই মানুষের শেষ নয়। চিরলয়ের পরেও যাবার একটা জায়গা আছে। দেহ ফেলে মন যাবে সেই পরলোকে। স্বপ্নে তারই ইঙ্গিত। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল মনকে দেহাতীতলোকে পাঠাবার সাধনা। স্বপ্নের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আসার আগেই মানুষের এই সাধনা শুরু হয়ে গেছে। তার এই সাধনার ফলেই মানুষ আবিষ্কার করেছে, মনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় যা জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থার ঊর্ধ্বে। সমাধি। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা গেছেন। ফিরে এসেছেন অসাধারণ অনুভূতি নিয়ে। খুলে গেছে আধ্যাত্মিক লোকের সিংহদুয়ার।

কেউ কেউ বলতে পারেন স্বামীজী ঈশ্বর মানতেন না; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য ঈশ্বরীভূত পুরুষকে মানতেন। কারণ, তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে জেনেছিলেন ইন্দ্রিয়ের খাঁচাকে চুরমার করে, বিষয়ের জগৎকে পায়ে দলে মনকে উচ্চলোকে পাঠাতে পারলে কোন ভাবময় অবস্থায় লীন হওয়া যায়। স্থূলে আনন্দ দেহ দিয়ে ধরতে হয়। ক্ষণস্থায়ী। পরমানন্দ মন দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। আর সেই স্পর্শে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। সত্য হয়ে ওঠে ব্রহ্ম। যেখানে কোনও কিছুই আপেক্ষিক নয়।

এইবার স্বামীজীর স্পষ্ট কথা—কেউ খেয়ে আনন্দ পায়। আমাদের বলার কোনও অধিকার নেই, খেয়ো না। সেইরকম তাদেরও কোনও অধিকার নেই বলার, কেন তোমরা আধ্যাত্মিক চিন্তায় আনন্দ পাও। মানুষ যখন নিচের তলায় থাকে সে যে-জাতিরই হোক, তার আনন্দ হল ইন্দ্রিয়সুখে। সেই সেই মানুষই যখন প্রকৃত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হয়, তখন তাঁর আনন্দ উচ্চচিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে। আর আধ্যাত্মিকতা। সে অনেক উচ্চস্তরে। আর সিদ্ধি। ঠাকুর বলতেন—কোটিকে গুটিক।

প্রবন্ধ

অবিস্মরণীয় উদ্বোধন

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

উদ্বোধন মাসিকপত্রের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, তাকে কোন মতেই আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের এই বিখ্যাত মুখপত্রে আমার জীবনের প্রথম লেখা একেবারেই প্রথম পৃষ্ঠায় বেরিয়েছিল। এই ঘটনা আমার কাছে একটা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মতো। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক বা প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আমি যখন কলেজে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশে হুগলীর চুঁচুড়ায় আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নামে আমার সমবয়সী একজন যুবক ছিলেন, যিনি আমার পূর্ব-পরিচিত। তিনি পরে বিপ্লববাদী লেখকরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রাণতোষ আমাকে একদিন বললেন ঃ “কাজী-দার কাছে যাবে ?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ “কাজী-দা কে ?” প্রাণতোষ বললেন ঃ “কাজী নজরুল ইসলাম।” আমি একথায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। প্রাণতোষ বললেন ঃ “চল আজকেই যাই।” তখন হুগলীতে একটি অতি সাধারণ ভাড়াবাড়িতে নজরুল ইসলাম থাকতেন। প্রাণতোষ সেই বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন ঃ “কাজী-দা আছেন ?” এই ডাক শুনে কাজী-দা নিচে নেমে এলেন এবং প্রাণতোষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “বলুন তো কাকে সঙ্গে এনেছি ?” নজরুল ইসলাম আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললেন ঃ “বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।” আমি একেবারেই স্তম্ভিত। জীবনে যার সঙ্গে দেখা বা পরিচয় হয়নি তিনি কি করে আমাকে চিনলেন ? উনি যাদুবিদ্যা জানেন নাকি ?

অবশ্য কিছুকাল পরে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হল। নজরুলের বাড়িতে তখন রোজ সন্ধ্যাবেলা তরুণ এবং সাহিত্যিকদের একটা আড্ডা বসত। সেই আড্ডায় উদ্বোধন পত্রিকা পড়া হতো। তাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হতো। একদিন সেই আড্ডায় উদ্বোধন নিয়ে কাড়াকাড়ি হল। তার প্রথম পৃষ্ঠা খুলেই দেখা গেল আমার নাম। আমার লেখা একটা দীর্ঘ কবিতা সেবার উদ্বোধনের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। প্রাণতোষ বললেন ঃ “আমি একে চিনি। এটা কোন ছদ্ম নাম নয়।” উদ্বোধন পত্রিকার সেই সংখ্যাতে নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছিল যাতে নজরুলের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল। উদ্বোধনের সেই সংখ্যা এবং আরও কিছু সংখ্যা আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে আজও রক্ষিত আছে। সেই সংখ্যাটি ছিল মাঘ ২৬শ বর্ষ।

তারপর থেকে উদ্বোধনের সঙ্গে আমার ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ সংযোগ হতে লাগল। আমি যখন উত্তর কলকাতায় বাস করতাম তখন উদ্বোধন অফিসে আমার যাতায়াত ছিল। বলা বাহুল্য, তখন ছিল স্বামী বিবেকানন্দের যুগ। সারা দেশেই স্বামীজীর সেই ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত’ বাণী প্রচারিত হয়েছিল। স্বামীজী ছিলেন প্রচণ্ড রকমের স্বদেশপ্রেমিক এবং মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রদূত। তাঁর বাণী—“Arise, Awake, and stop not till the goal is reached” আমাদের প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত করত। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। বাস্তবিক আমরা স্বামীজীর এই অগ্নিমন্ত্রে রোমাঞ্চিত হতাম। আমার যৌবনে উদ্বোধন পত্রিকা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। সরলভাবে বলা যেতে পারে, নজরুল ইসলামের পরিচয়ের সূত্র থেকে আমার জীবনে এমন বহু ব্যাপার ঘটেছে যার মূলে সূত্র ছিল উদ্বোধন পত্রিকা। আজও উদ্বোধন সগৌরবে প্রচারিত হচ্ছে এবং এখন সে ৯০তম বর্ষ অতিক্রম করে ৯১তম বর্ষে পদার্পণ করল। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন ভারতবর্ষে নবযুগ সৃষ্টি করেছিলেন এবং উদ্বোধন পত্রিকার ছিল তাতে একটি প্রধান ভূমিকা। আমি উদ্বোধনের ৯১তম বর্ষে পদার্পণ এবং স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী অতিক্রম উপলক্ষে উদ্বোধনের সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ

কামাখ্যানাথ মিত্র

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব গত ৯ই জানুয়ারি তারিখে ভারতের সর্বত্র, এবং ভারতের বাহিরে মেসোপটেমিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে ও স্টেটস সেটলমেণ্টে, এবং পাশ্চাত্য জগতেরও প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই যে জগদ্ব্যাপী অনুষ্ঠান, ইহার কারণ কি? এই প্রশ্ন অদ্যকার দিনে স্বতঃই মনে উত্থিত হয়। এই প্রকার বৃহৎ অনুষ্ঠান রামকৃষ্ণ ব্যতীত বর্তমান ভারতের আর কাহারও স্মৃতি উপলক্ষে আমরা দেখি নাই বা শুনি নাই। তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্তমান ভারতের ও বর্তমান বাংলার বিবেকানন্দ বর্তমান জগৎকে ও বিশেষভাবে বর্তমান ভারতকে এমন কিছু দিয়াছেন, যাহার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ; —এমন কোন আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি স্থাপন করিয়াছেন, যাহার আকর্ষণী শক্তি আমরা মর্মে-মর্মে অনুভব করিতেছি। এবং যাহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ও আয়োজন সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু তাঁহার দান ও আদর্শ উপলব্ধি করিবার পূর্বে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব-ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। যিনিই তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। বিবেকানন্দের অভ্যুদয় ভারতের ও জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার বীরমূর্তি দেখিয়া, তাঁহার জ্বালাময়ী বাণী শুনিয়া, তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব, পবিত্রতা, উৎসাহ, শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও প্রেমের স্পর্শ পাইয়া কত লোকের যে জীবনের স্রোত ফিরিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর যেদিন হইতে তাঁহার বীরবাণী প্রচারিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই এদেশে নবযুগের উন্মেষ হইয়াছে,—স্বদেশে-বিদেশে শত শত লোক তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য-প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষের খ্যাতির সূচনা এদেশে নয়,—সুদূর আমেরিকায়। …একজন অজ্ঞাতকুলশীল, সহায়সম্বলহীন বিদেশী শ্যামকায় সন্ন্যাসী চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় দাঁড়াইয়া "Sisters and brothers of America" বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র সহস্র সহস্র শ্বেতকায় নরনারী আসন ত্যাগ করিয়া, টুপি ও রুমাল আন্দোলন করিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিল; তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র তিনিই ধর্মমহাসভার প্রধান নায়ক হইলেন; এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। জুলিয়াস সীজারের ন্যায় তিনিও বলিতে পারিতেন, "I came, I saw, I conquered"।

তাঁহার মহত্ত্বের সর্বপ্রথম পরিচয় পাই তাঁহার গুরুদেবের শ্রীমুখে, পরমহংসদেব তাঁহাকে "খাপখোলা তলোয়ার" বলিতেন। আরও বলিতেন, "এত বড় আধার এ-যুগে আসে নাই। আমার সমস্ত কাজ একে দিয়ে করিয়ে নেব।" তারপর চিকাগো ধর্ম-মহাসভার পর শত শত গণ্যমান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার মহত্ত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। 'ম্যাক্সিম গান'-এর আবিষ্কারক স্যার হিরাম ম্যাক্সিম তাঁহাকে, 'ধর্মজগতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তাঁহার 'প্র্যাগম্যাটিজম' নামক সুবিদিত গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ The paragon of Vedantic missionaries.

এত বড় কাণ্ড যখন সংঘটিত হইল, তখন স্বামী বিবেকানন্দের বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর। ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সংবরণ করে। আচার্য শঙ্কর, শোনা যায়, ত্রিশ (?) বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের কার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় শঙ্কর-দিগ্বিজয় অপেক্ষাও বৃহৎ ব্যাপার। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ৪।৫ বৎসর থাকিয়া ধর্মপ্রচার ও ধর্মসংঘ গঠিত করিবার পর, তিনি ভারতে পদার্পণ করেন; এবং অনেক স্থলে বক্তৃতা ও স্থানে স্থানে মঠ, সেবাশ্রম ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করেন; এবং 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'

নামক দুইখানি মাসিকপত্র পরিচালনা করেন। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতা ও রচনা ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ; বাঙলা ভাষায়ও কিছু-কিছু আছে। বাংলাদেশের যুবকমণ্ডলীকে আমি এইসমস্ত রচনা পাঠ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করি। আমার বিশ্বাস, এই সকল রচনা পাঠ করিলে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিবেন। তাঁহার মনস্বিনী ইংরেজ শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা রচিত 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' এবং তাঁহার ইস্টার্ন এ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলস রচিত চারিখণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিতেও সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্মের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাংখ্য, পাতঞ্জল রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ সম্বন্ধে যে-যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং যেরূপ প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় ও তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা সনাতন সত্য প্রচার করিয়াছেন এবং সর্বধর্মের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু বলিব না। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দ সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানাভাবে প্রচার করিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কেবল ভারতের নহেন—তিনি সমগ্র জগতের, এ-কথা স্বীকার করি; কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে, বিশেষভাবে তিনি ভারতের; তিনি এ অধঃপতিত দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সভ্যতাভিমানী, বলদৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতিবর্গের মধ্যে ভারতের মহিমা ও গৌরব তিনি তেজের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং এই মুমূর্ষু জাতির মধ্যে তিনি নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি ধর্মের ভিতর দিয়া এই মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। এ-জাতির সামাজিক-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান তিনি ধর্মের ভিতর দিয়া সুন্দরভাবে করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ এই পাশ্চাত্য-সভ্যতা-মোহমুগ্ধ ভারতবাসীকে স্বদেশাভিমুখে ফিরাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তাঁহার পূর্বে এবিষয়ে যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাও আমাদের নমস্য; কিন্তু স্বামীজীর চেষ্টার পার্শ্বে তাঁহাদের চেষ্টা ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তাঁহার বীরবাণী এ-যুগের মোহমুদ্গর। তাঁহার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবশ্য তিনি কিছুই করেন নাই; কারণ, তাঁহার কার্যপ্রণালী সাধারণ সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর কার্যপ্রণালী হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি কেবল প্রেরণা দিয়াছেন। দেশের চারিদিকে নবজাগরণের যে-সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে আর কেহই নহেন—স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্মপ্রচারক ও ধার্মিক বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি, তিনি কেবল তাহাই ছিলেন না, দেশের চিন্তা তাঁহার প্রধান চিন্তা ছিল। এই চিন্তা তাঁহাকে আত্মহারা ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাই মহামতি স্বর্গীয় বাল-গঙ্গাধর তিলক তাঁহাকে 'পেট্রিয়ট-সেইন্ট' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

হিন্দু ও ভারতবাসী নামে স্বামী বিবেকানন্দ অতিশয় গৌরব বোধ করিতেন। অথচ 'হিন্দু' বলিতে আমরা সচরাচর যেরূপ মানব বুঝি, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা ছিলেন না। তিনি যদি তাহা হইতেন, তাহা হইলে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে যাইতেন না; এবং আমেরিকান ও ইংরেজকে তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিতেন না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক আমরা কল্পনাও করিতে পারি না; কিন্তু স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতা তাঁহাকে কূপমণ্ডূকে পরিণত করে নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তিনি সমন্বয়সাধন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন, এবং এখনও বলিয়া থাকেন; কিন্তু স্বামীজীর সমন্বয়ের মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা আর কাহারও মধ্যে আমি সেরূপ লক্ষ্য করি নাই। সমন্বয়ের মধ্যেও জাতীয় বিশিষ্টতা ও জাতীয় গৌরব তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে একটা শঙ্করভাব অনেক সমন্বয়কারীর মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু স্বামীজীর প্রণালীর মধ্যে তাহার স্থান আদৌ নাই। তিনি নিজে যেমন হিন্দু ও স্বদেশপ্রেমিক থাকিয়া পাশ্চাত্য-ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও নিজস্ব করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীও

সেইরূপ করুক। ইংরেজ যেমন ফ্রেঞ্চ ও জার্মান কালচার হজম করিয়াও ইংরেজই থাকে, জার্মান যেমন ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ কালচার হজম করিয়াও জার্মানত্ব হারায় না, স্বামীজীও সেইরূপ চাহিয়াছিলেন যে, আমরা পাশ্চাত্য কালচার হজম করিয়াও ভারতবাসীই থাকিব। হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির কথা আমরা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চাপে এখন অনেক বলিতেছি বটে, কিন্তু স্বামীজী ধর্মের দিক দিয়া সে-কথাটা অনেক পূর্বে বলিয়াছিলেন। "India must have an Islamic body and a Vedantic soul"—তাঁহার উদার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য উত্থিত হইয়াছিল। "অস্পৃশ্যতা দূর কর, নতুবা হিন্দুজাতি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে", এ কথাও আমরা এখন বলিতেছি সত্য; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ অনেককাল পূর্বে যেরূপ মর্মস্পর্শী ভাষায় সমাজ-শরীর হইতে এই কলঙ্ক দূর করিতে তাঁহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেরূপ জীবন্ত ভাষা আর কাহারও মুখে শুনিলাম না। বর্তমান কালে 'ছুঁৎমার্গ' বলিয়া যে-কথাটি সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও বক্তৃতামঞ্চে ঘন ঘন শুনা যাইতেছে, তাহা সর্বপ্রথম স্বামীজীর মুখেই উচ্চারিত হইয়াছিল। ছুঁৎমার্গের উপর তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াও, দুঃখের বিষয়, আমাদের চৈতন্য এখনও হইল না। আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষার একটি আদর্শও তিনি আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, যাহা আমরা বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্থাপিত ইংরেজী স্কুল-কলেজেও দেখি না, এবং যাহা গতানুগতিক দেশাচার ও লোকাচার পীড়িত হিন্দু-সমাজেও দৃষ্ট হয় না। তিনি বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ বেদান্ত-প্রচারকের ন্যায় তাহা প্রচার করেন নাই; এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে পাশ কাটাইয়া অরণ্যে ও গিরি-গুহায় আমাদিগকে আশ্রয় লইতে বলেন নাই। সে-পথ সকলের জন্য নহে। তিনি বেদান্তের সত্যকে সম্পূর্ণ নতুন ধরনে প্রচার করিয়াছিলেন; এবং বাস্তব জীবনে তাহার কার্যকারিতা দেখাইবার জন্য 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' নামক বহুমূল্য উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তের এই যে নূতন প্রকারের ইন্টারপ্রিটেশন বা নব্য ভাষ্য—ইহা স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক প্রতিভা উদ্ভূত, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। সেজন্য কেহ কেহ ইহাকে 'নিয়ো বেদান্তিজম' আখ্যাও দিয়া থাকেন। আবার বেদান্তের সত্য যেখানে দেশ, কাল অথবা মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেখানেও তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন; কারণ সেই রাজ্যটাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্বরাজ্য। তাঁহার বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়; আর বোধহয় সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জানা যায় তাঁহার গভীর ও মহান-ভাবপূর্ণ 'সঙ অব্ সন্ন্যাসিন্' নামক ইংরেজী কবিতায়। এরূপ ইংরেজী কবিতা আমি কোন ইংরেজ কবির লেখনী হইতেও পাই নাই। পরলোকগত মনস্বী পণ্ডিত ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন তাঁহার বেদান্ত সম্বন্ধে যে নিবন্ধ লিখিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন, এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তিনি সেই নিবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ইংরেজী ভাষাতেই অধিকাংশ বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং ইংরেজী ভাষাতেই অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার কর্মক্ষেত্র বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু বঙ্গভাষাতেও তিনি 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং অনেকগুলি সুন্দর ও গভীর ভাবোদ্দীপক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যে তিনি এক নূতন রচনাপ্রণালী, নূতন লিখনভঙ্গি ও নূতন প্রকারের তেজস্বিতা দান করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিশদভাবে কোন কথা বলা অনেক সময়সাপেক্ষ। সেজন্য আমি মাত্র কয়েকটি সঙ্কেত দিয়া গেলাম। তাহা হইতেই আপনারা তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। আমি অনেক বড়লোককে আমার জীবনে দেখিয়াছি, এবং স্বামীজীর দর্শনলাভও আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত বড়লোক যে কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি—আর কাহাকেও দেখিয়া নয়। আমি পৃথিবীর কয়েকটি মহাপুরুষের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহারা ইংল্যাণ্ডের কার্লাইল, ইটালীর ম্যাটসিনি ও রুশিয়ার টলস্টয়; কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী আমি স্বামী বিবেকানন্দের নিকটে।

স্বামীজীর ধর্মমত ও অন্যান্য মত কিরূপ ছিল—এই প্রশ্নের উত্তর আমি অতি সংক্ষেপে প্রদান করিব। তিনি অদ্বৈতবাদকেই চরম সত্য বলিয়া মানিতেন, এবং এই চরম সত্যকে সাধনাদ্বারা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, ইহা এক প্রকার নাস্তিকতা মাত্র—শুষ্ক-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—ভক্তি ও কর্মের পরিপন্থী। তদুপরি আবার মায়াবাদ নামক যে বস্তুটি ইহার সঙ্গে জড়িত—মায়াবদ্ধ জীবের সে নামটি শুনিলে একেবারেই চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। কিন্তু স্বামীজীর অদ্বৈতবাদে সেরূপ কোন আশঙ্কার কারণ নাই, যেহেতু তিনি প্রকৃত ভক্ত ও অক্লান্ত কর্মী ছিলেন; এবং গীতোক্ত ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ ব্যাখ্যা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। সমস্ত মার্গকে এবং বিভিন্ন ধর্মকে তিনি চরম সত্য অদ্বৈতের সোপানাবলী বলিয়া মনে করিতেন; এবং এইরূপে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়াছিলেন। গুরুগত-প্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতেন; কিন্তু আমাদের দেশে এই গুরুবাদের যে ব্যভিচার ঘটিয়াছে, এবং গুরুবাদের নামে যে কুলগুরু-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ইনি তাহার সমর্থন করিতেন না। তিনি দেবদেবীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন। এবং পুনর্জন্মবাদ মানিতেন। অবতারের অস্তিত্বও স্বীকার করিতেন; কিন্তু আমাদের দেশে অবতারের যেরূপ বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি, তাহা দেখিয়া এ-বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সকলেই বোধহয় জানেন, এক সময়ে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং সেসময়ে তিনি প্রতিমাপূজা মোটেই সহ্য করিতে পারিতেননা; কিন্তু তাঁহার গুরু পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার এই বিদ্বেষ দূরীভূত হইয়াছিল। যদিও মূর্তিপূজা তিনি কোথাও প্রচার করেন নাই, তথাপি সরল ও অকপট মূর্তিপূজাকে তিনি সম্মান করিতেন; কাহারও ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করিতেন না। তবে মূর্তিপূজাকে তিনি হিন্দুর অবশ্যকর্তব্যকর্ম বলিয়া মনে করিতেন না; এবং যে-হিন্দুর মূর্তিপূজায় আস্থা নাই, তাহাকে জোর করিয়া মূর্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বলিতেন না। যাহারা মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব সত্ত্বেও কেবল লোকমতের ভয়ে মস্তক অবনত করে, তাহাদিগকে তিনি কপটাচারী মনে করিতেন। মোটের উপর, রামকৃষ্ণের ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি ভাবের ঘরে চুরি দেখিতে পারিতেন না। অন্য দিকে, যদি আবার কেহ পাদরী সাহেবের অনুকরণে মূর্তিপূজাকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, এবং সেই হঠকারীকে বেশ করিয়া দু-কথা শুনাইয়া দিতেন। অধিকারভেদের সারতত্ত্ব তিনি মানিতেন; কিন্তু অধিকারভেদের দোহাই দিয়া সমাজে যে অত্যাচার, অবিচার ও আত্মম্ভরিতার তাণ্ডবনৃত্য হইতেছে, তাহার প্রতি তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। বর্ণাশ্রমের মূলতত্ত্ব তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন; কিন্তু যে বর্ণাশ্রমে গুণকর্মের কোন লক্ষণ নাই, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। বরং এই চাতুর্বর্ণের নামে দেশের মধ্যে যে সহস্র জাতির গঠন হইয়াছে,এবং পরস্পরের মধ্যে যে চৈনিক প্রাচীর সগর্বে মস্তক উত্তোলিত করিয়া হিন্দু-সমাজকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। ও-ব্যাপারটাকে তিনি উদাসীনতার দৃষ্টিতেই দেখিতেন। আর যে-ধর্মটা হিন্দুধর্ম নামে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, সেটাকে তিনি একটা উপহাসের বস্তু ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতেন না। অন্তর্শুদ্ধি-সাধন ও নিষ্পাপতাকেই তিনি ধর্মের প্রধান অঙ্গ মনে করিতেন। পরমহংসদেবের কথায় বলিতে গেলে, "কামকাঞ্চনে আসক্তি যে জয় করিয়াছে, সে যদি শূকরমাংস ভক্ষণ করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু মন যাহার কামকাঞ্চনে পূর্ণ, সে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেও তাহাকে ধার্মিক বলা যায় না।" সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ-ভ্রমণ তিনি উচিত বিবেচনা করিতেন। বাল্য-বিবাহের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, একদল যুবক-যুবতী চিরকৌমার্যব্রত পালন করিয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে। তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন।

যাঁহার মতবাদ এইরূপ—গোঁড়া বা সঙ্কীর্ণমনা হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দু বলিতেই হয়তো আপত্তি করিবেন। তাঁহারা ঘরের কোণে বসিয়া সকলেই বলেন, "আহা! হিন্দুধর্মের মতো কি আর ধর্ম আছে? এ যে সনাতন ধর্ম। আমাদের ন্যায় আধ্যাত্মিক জাতি আর কোথায়?" আর যখন শুনেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ইওরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রাধান্য সপ্রমাণ করিয়াছেন, তখন মনে মনে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—যেন এ কাজটা তাঁহারাই করিয়াছেন। কিন্তু এ-কথাটা ভাবিয়া দেখেন না যে, ঘরের কোণে বসিয়া 'আমি বড়' বলায় এবং বিশ্বসভায় বিশ্বমানবের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতার একটা বোঝাপড়া করিয়া তাহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করায় কত তফাৎ। এ-কাজটা করিতে হইলে যে কতটা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে হয়, এবং কতটা মনস্বিতা, সাধনা, সাহস ও পান্ডিত্য আবশ্যক, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ভারতের এক সুদূর বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারত অতিক্রম করিয়া দেশ-বিদেশে খাঁটি ভারতের ধর্ম প্রচার করিতে যাইতেন। আর তারপর স্বামী বিবেকানন্দ সাতসমুদ্র পার হইয়া খাঁটি ভারতের ধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। বোধ হয় দেড় সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে এত বড় ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। তথাপি আমি জানি, এরূপ লোকও আছেন, যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকলাপে আত্মপ্রসাদ লাভ করা সত্ত্বেও, তাঁহার সমস্ত মতবাদ শুনিয়া এবং আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহাকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত হন। কুণ্ঠিত হউন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুধর্মের ন্যায় উদার ধর্ম যেমন জগতের নাই, তেমনি হিন্দুসমাজের ন্যায় সঙ্কীর্ণসমাজও জগতের আর কোথাও নাই—অর্থাৎ হিন্দু-সমাজ ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলেও, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে এই পতিত হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহার আদর্শ জীবনে পালন করিতে হইবে; এবং তাঁহার যে কথাগুলি মনোহারী নয়, অপ্রিয়, অথচ সত্য ও হিতকর, সে-কথাগুলি তাড়াতাড়ি চাপা না দিয়া, সেগুলির প্রতি বিশেষ নিবিষ্টচিত্ত হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, এবং তাঁহাদের মধ্যে একপ্রাণতা আনয়ন করিতে হইবে। আর তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তাঁহাদের আদর্শের দিকে হিন্দুসমাজের অপর সকলকে আকৃষ্ট করিয়া হিন্দুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত, সবল ও সুস্থ করিতে হইবে। সেজন্য যদি কাহারও বিরাগভাজন হইতে হয়। তাহাতেও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। আমাদিগকে ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইবে এবং দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ধৈর্য হারান নাই। ধৈর্য হারাইলে তিনি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিতেন। সে-শক্তিও তাঁহার ছিল। আর তিনি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিলে, আমার বিশ্বাস সেই সম্প্রদায় অন্যান্য আধুনিক সম্প্রদায় হইতে সংখ্যাধিক্যে ও তেজ-বীর্যে অনেক অধিক পরিমাণে বলীয়ান হইত। কিন্তু নূতন সম্প্রদায় গঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না। কারণ, যে-সমস্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; এবং সে-অভিজ্ঞতা তাঁহাকে নূতন সম্প্রদায় স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছিল। তিনি সমগ্র হিন্দুসমাজকে উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিলেন। আমরাও যেন তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্যুত না হইয়া, সকলের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সদ্ভাব রাখিয়া, দৃঢ়পদে অগ্রসর হই। এই অচলায়তনকে সচল করা দুদিনে সাধ্য নয়, এবং যার-তার কর্ম নয়। তথাপি এই কাজ আমাদিগকে করিতে হইবে, এবং এই আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে। এই আদর্শ যদি আমরা জীবনে কিঞ্চিন্মাত্রও পালন করিতে পারি, তবেই স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সভার সার্থকতা আছে। নতুবা ইহা একটা ফ্যাসান মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত হইলেও, বর্তমান দেশাচার ও লোকাচারসম্মত নয়। এবং ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ ও মনের ভাব হইতেও সম্পূর্ণ পৃথক। কেহ কেহ সেজন্য ইহাকে 'নিউ হিন্দুইজম' বলিয়া থাকেন। এককথায়, যদি আমাকে কেহ বলিতে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মটা কী, তাহা হইলে আমার উত্তর,—শক্তিপূজা, আত্মপ্রত্যয়,

স্বাবলম্বন, শৌর্য ও বীর্য। এই যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা স্বাবলম্বনের কথা শুনিতে পাইতেছি, ইহার মূলে স্বামী বিবেকানন্দ। বারবার তিনি বলিয়াছেন, “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”। বারংবার তিনি বলিয়াছেন, “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত” এবং “অভীঃ অভীঃ”। প্রচণ্ড ঐশী-শক্তি ও বিরাট পুরুষকার স্বামী বিবেকানন্দরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। দার্শনিক বার্গসন তাঁহার ‘ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন’ নামক গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন : “life is a cavalry charge”. একথাটা সর্বতোভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তাঁহার কার্যপ্রণালী ‘cavalry charge’-এর অনুরূপই ছিল। আর আমেরিকানরা তাঁহার নাম দিয়াছিল—‘সাইক্লোনিক মঙ্ক’। কারণ, বক্তৃতা ও যুক্তির মুখে ঝড়ের ন্যায় তিনি সমস্ত উড়াইয়া লইয়া যাইতেন। বাঙলাদেশ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার-এর জন্মদাত্রী ; কিন্তু পুরুষসিংহের জন্মদাত্রীও যে তিনি হইতে পারেন, স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়া তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া বাঙালীজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া বাঙালীকে আর ‘ডাইং রেস’ বলিয়া মনে হয় না। আমরণ স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিমন্ত্রেরই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এত বড় নির্ভীক ও তেজস্বী সন্ন্যাসী এ-জগতে আর কখনো আবির্ভূত হন নাই। এযুগের ধর্মপ্রবর্তক আর কেহই নহেন—কেবল রামকৃষ্ণশিষ্য বিবেকানন্দ। সে-ধর্মে দুর্বলতা নাই, নিরীহ ভালমানুষী নাই, নাকি সুরে কান্নার চিহ্নমাত্রও নাই। আর ঐ যে আধ্যাত্মিক নামে একপ্রকার স্ত্রীজাতিসুলভ ‘কাব্যিকরসের’ ঢং উঠিয়াছে। তাহার নামগন্ধও সে-ধর্মে বিদ্যমান নাই। এজাতির রোগ তিনি যথাযথভাবে নির্ণয় করিয়াছিলেন। সে-রোগ দুর্বলতা। সে-রোগ তমোগুণকে সত্ত্বগুণ মনে করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা, সে-রোগ কপটতা ও ভণ্ডামী, সে-রোগ পরপদলেহন ও পরানুচিকীর্ষা। সে-রোগ ‘স্লেভ মেণ্টালিটি।’ তাই সদর্পে মস্তক উত্তোলন করিয়া জগতের সমক্ষে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন “আর দাসোহহম্, দাসোহহম্ নয়, —ঢের হইয়াছে,—এখন শিবোহহম্, শিবোহহম।” তাঁহার শক্তির উৎস ব্রহ্মচর্যে, ত্যাগে ও বৈরাগ্যে। আসক্তিই ভয়। বৈরাগ্যই অভয়,—একথা জলদ-গম্ভীর স্বরে পুনঃ পুনঃ তিনি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। যে-শক্তি তিনি প্রচার করিয়াছেন তাহা আসুরিকশক্তি নয়,—দেবশক্তি ; অগ্নিমন্ত্রে তাঁহার দেশবাসীকে তিনি দীক্ষিত হইতে বলিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, “চালাকীদ্বারা মহৎ কার্য হয় না,– প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।” বজ্রনির্ঘোষে তিনি আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। গভীর প্রেম ও বেদনার সহিত ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে দেশকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। এখনও কি আমরা ঘুমাইয়া থাকিব ? শ্রবণ করুন, মহাপুরুষ কি বলিতেছেন—

“হে ভারত, এই পরানুবাদ, এই পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা ; এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ?… ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই ‘মায়ের’ জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না,—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত। তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর,—সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল,—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল,—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ ;… বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ; ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিন রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।”*

সংগ্রহ : প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

---

* ভারতবর্ষ, দশম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩০, পৃঃ ৬৬৭—৭২

আনন্দের সন্তান

'আমরা আনন্দের সন্তান'

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

"স্বামীজী! আপনি এত হাসেন কেন? আপনি না আধ্যাত্মিক মানুষ!"

এই বিমর্ষ ধর্মীয় প্রশ্ন ও তিরস্কার শুনে স্বামীজী হাসিতে আরো উচ্ছল হয়ে উঠলেন। বললেন ঃ "আরে, আধ্যাত্মিক বলেই তো হাসি। আমরা তো পাপী নই—আমরা অমৃতের সন্তান, আনন্দের সন্তান।"

স্বামী বিবেকানন্দের হাসি-খুশি ভারি চেহারার দিকে তাকিয়ে পাশ্চাত্যদেশের অনেকের চোখে ও মনে একটা অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা জেগে থাকত—কোথায় এঁর সেই আধ্যাত্মিক মানুষের যোগ্য ছুঁচলো মুখ, কোথায় এঁর পাকানো শীর্ণ চেহারা? এতখানি সহাস্য মেদ!! স্বামীজী উত্তরে বললেন ঃ "আধ্যাত্মিক মানুষেরা আনন্দে মোটা হয়—আমি মোটা মানুষ—সুতরাং আমি আধ্যাত্মিক মানুষ।" একথা বলবার সময়ে কৌতুকে ঝিকিয়ে উঠল তাঁর দুই চোখ।

বিবেকানন্দ হাসছেন, বলছেন তোমরা সবাই হাস।

বিবেকানন্দকে গোড়াতে ধরা যাক তাঁর খেলাস্থলে কোন রূপক অর্থে নয়—একেবারে খাঁটি খোলা মাঠে।

গোড়াতেই একটা চমকপ্রদ ছবি—

ঝড় উঠেছে কালবৈশাখীর। কালো আকাশ ছিঁড়ে বজ্র-বিদ্যুতে মাতামাতি। পাক-খাওয়া পাগল জলের সঙ্গে হালের দাঁড়ের লড়াই। ছেলেটা হা-হা করে হাসছে, দাঁড়-ধরা হাতের পেশী ফুলে উঠছে আবেগে, ঘন চুলের রাশি এলোমেলো হয়ে উড়ছে বাতাসে, আকাশের বিদ্যুৎ নেমে জ্বলছে বিশাল চোখে, অন্য সকলে ভয়ে জড়সড়, শুধু সেই ছেলেটির গলায় ঝড়ের গান।

বিশ্বনাথ দত্ত গম্ভীর হয়ে পুত্রকে বললেন ঃ "দক্ষিণেশ্বরে যাবার অন্য রাস্তাও আছে, ঝড়ের সময়ে নৌকায় না গেলেও চলে। রাম তো গাড়ি-ভাড়া করেই যায়।"

পুত্র নরেন্দ্রনাথ চুপ করে শুনে চলে এলেন। রাম দত্ত গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশায়ের কাছে যায় ঠিকই—সেটাই রাম দত্তের পথ—কিন্তু আমার—

আহিরিটোলার ঘাটে আবার ঝড়ো সন্ধ্যার মুখে নরেন্দ্র দত্ত উঠে পড়লেন নৌকায়—পরমহংসের কাছে যাবেন। এমনই বহু ঝঞ্ঝা এড়িয়ে পরমহংসকে অধিকার করতে হবে তাঁকে। তা ছাড়া—ঐ অ্যাডভেঞ্চার। সিমলার ডানপিটে ছেলে নরেন্দ্র দত্ত, যে-গান রচিত হয়নি তখনও, সে-গান হয়তো গাইলেন অন্য ভাষায়—"আজি ঝড়ের রাতে আমার অভিসার।"

সিমলার ডানপিটে ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বন্ধুদের প্রাণ, সামাজিক সম্মেলনের মধ্যমণি, নিঃসন্দেহে প্রতিভা-ঝলকিত, প্রেরণাদিব্য বোহেমিয়ান, —বললেন বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। জীবনটা নরেন্দ্রনাথের কাছে সজীব গভীর কিছু—অনন্ত প্রশ্নে আকুল সমুদ্রবিশেষ—তাঁর হাসি, তাঁর খুশি, তাঁর খেলা, সে সকলেই ঐ সাগরের রৌদ্রচুম্বিত ঊর্ধ্বতরঙ্গ।

স্বামী বিবেকানন্দের যে-মূর্তি আজ আমাদের সামনে ধরা আছে, তাতে কিন্তু মাঠের খেলার চিহ্ন নেই। যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ তিনি—তিনিও খেলার মাঠে নেমেছিলেন, সে মাঠকে ছাড়েননি জীবনের শেষ অবধি—এ-কথাগুলো তাঁর সম্বন্ধে বিস্ময়কর মনে হতে পারে অবশ্যই। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে কলকাতার সম্বর্ধনাসভায় স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "আমি কলকাতারই ছেলে; এখানকার যে-ধুলোয় বসে খেলেছি আমি, তার উপর বসেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই"—স্বামীজীর সে-কথাগুলিকে আমরা মনে করেছি সুন্দর ভাষণ, কিন্তু গভীরভাবে বিশ্বাস করিনি। যাঁর দিকে তাকালে অপার বিস্ময় আসে, তিনিও আমাদের মতো খেলেছিলেন—ছিলেন লঘুতায়, চপলতায়।

বিবেকানন্দের জীবনীকার লুই বার্ক লিখেছেন ঃ

"ভুলে যাই, সকলেই ভুলে যায়—তিনি কত তরুণ ছিলেন—সমুদ্রে হাঁসের মতো ডুব দিতে বা প্রিয়পাত্রদের মধ্যে প্রাণখুলে হাসতে তিনি কত ভালবাসতেন। তিরিশের কোঠার একেবারে তলার দিকে তাঁর বয়স ছিল বলেই যে তিনি এমন করতেন তা নয়, আরও কারণ, তিনি অসীমের সীমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখানে জগজ্জননীর নিত্য উৎসব। স্বামীজী গভীরভাবে নিত্যভাবে তরুণ।"

কাহিনীকে বল্গামুক্ত করলেই অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা যায়। প্রথমেই হাজির হন অশ্বারোহী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের প্রিয় সম্রাট আকবরের পা ঘোড়ায় চড়ে বেঁকে গিয়েছিল ; আর এক প্রিয় দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান ঘোড়ার পিঠে ঘুমোতেন। সুতরাং বিবেকানন্দকেও ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে। কবে, কখন ? আজীবন। টগ্‌বগিয়ে চলেছেন প্রথম থেকেই। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, বিলে, তুই বড় হয়ে হবি কি ? বিলে সগর্বে জানাল, কোচোয়ান। শ্রীমান বীরেশ্বরের চোখে তখন রঙিন ছবি—বাড়ির কোচম্যান কোলে বসিয়ে তাকে বড় লোভনীয় গল্প বলেছে—

"দেখ বিলুবাবু, তোমায় ঘোড়ায় বসিয়ে এমন ঘোড়া চালিয়ে দেব যে, ঘোড়া ঐ ছাদের উপর গিয়ে উঠবে, হাওয়া দিয়ে চলে যাবে, আর টগ্‌বগ্‌ শব্দ করবে। আর পক্ষীরাজ যে ঘোড়া আছে, তাতে চড়লে মেঘের উপর পর্যন্ত যাওয়া যায়।"

বিলুবাবু অল্প বয়স থেকেই কল্পনা-সমৃদ্ধ। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন নিয়ে তিনি মোটে ব্যস্ত ছিলেন না। সুতরাং ভবিষ্যতে 'পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনবার' প্রতিজ্ঞা করতে তাঁর বাধেনি। বিলুবাবু যখন তাঁর পিতার কাছে পছন্দসই কেরিয়াররূপে কোচোয়ানিকেই নির্বাচন করলেন, তখন একথা না বললেও চলে, তিনি পক্ষীরাজের কোচোয়ানি করতেই চেয়েছিলেন।

পক্ষীরাজ না জুটুক, কয়েক বছরের মধ্যে একটা সাদা বর্মী-ঘোড়া তার বরাতে জুটে গেল। সেটাকে নিয়ে বালক নরেন্দ্র হই-হই করে কলকাতার রাস্তায় ছুটছে, সেই দেবভোগ্য দৃশ্যের উল্লেখ সবিশেষ না পাওয়া গেলেও ঐ বালক যখন বিশ্ববীর, তাঁর তখনকার সওয়ারী ছবির কিছু বর্ণনা পেয়েছি একজন বিখ্যাত বাঙালীর কাছ থেকে, তাঁর নাম অশ্বিনীকুমার দত্ত।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে কি জুন মাস। অশ্বিনীকুমার আলমোড়ায় গিয়েছেন। একদিন পাচকের মুখে শুনলেন, 'এক অদ্ভুত বাঙালী সাধু এসেছে, যে ইংরেজী বলে, ঘোড়ায় চড়ে এবং রাজার মতো ঘুরে বেড়ায়'। সাধুটি অবশ্য কে, তা অশ্বিনীকুমার তখনই বুঝলেন এবং 'সৈনিক সন্ন্যাসী'র সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে পথে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।—স্বামী বিবেকানন্দ ? কে তিনি ? চিনি না তো।—ওহো ! ঘোড়সওয়ার সাধু ? ঐ তো তিনি—ঘোড়ার পিঠে !

অশ্বিনীকুমার দেখলেন—দূরে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে উড্ডীন গৈরিক। একটি বাড়ির গেটে ঘোড়া থামল—এক ইউরোপীয় গেট খুলে ঘোড়ার মুখ ধরে বাড়ির সামনে নিয়ে গেলেন—সন্ন্যাসী নেমে পড়লেন।

কাব্যের মতো শোনাচ্ছে কথাগুলো ? কিন্তু বাস্তবাধিক বাস্তব। অনেকগুলি চিঠিতে স্বামীজী পরিণত বয়সে তাঁর ঘোড়াচড়ার উল্লেখ করেছেন।—

"তুমি যদি আমাকে পার্বত্য হরিণের মতো পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে, অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে রাস্তায় চড়াই-উতরাই করতে দেখতে, তাহলে খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে।"

"এখানে আমার নিত্যকর্ম—যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড়ে ওঠা, বহু দূর পর্যন্ত ঘোড়ায় দৌড়ানো।…এর পর যখন দেখা হবে, দেখবে আমার চেহারা কুস্তিগিরের মতো।" "ঘোড়া চড়াটা বেজায় রপ্ত হচ্ছে—কুড়ি ত্রিশ মাইল একনাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছুমাত্র বেদনা বা exhaustion হয় না।"

আমেরিকা ও ইউরোপে, কয়েক বছরের পরিশ্রম তাঁর 'বিশ বছরের আয়ু হরণ করে নিয়েছিল।' তারপরেই ভারতে পদার্পণমাত্রে গোটা দেশের আহ্বান ; কলম্বো থেকে কলকাতা পর্যন্ত রথে দাঁড়িয়ে বিজয়ী বীরের ঘোষণা ঃ 'আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, তারও চেয়ে জ্বালাময়ী কর্ম, হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত !'—যখন একথা বলছেন তখন তাঁর নিজের দেহ ভিতরে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। তিনি তখনও হাসছেন আর বলছেন—'আর বড় জোর চার পাঁচ বছর আছি—**I shall not live to see forty**'।

সাক্ষাৎকার

স্বামীজীর আদর্শই পারে এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিতে

মেরী লুইস বার্ক

স্বামী বিবেকানন্দ কি কেবল একজন অধ্যাত্ম-পুরুষ ? না, তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত এমনই এক ব্যক্তিত্ব, যিনি কাল-কে অতিক্রম করেছেন অনায়াসে, সবলে নাড়া দিয়েছেন মানুষের চেতনাকে, পরবর্তী বহু যুগের মানুষের চিন্তার আহার্য দিয়ে গেছেন এবং আন্তরিকভাবে চেয়েছেন প্রতিটি মানুষ আপন শক্তিতে সমস্ত বাধাকে জয় করে নির্মাণ করবে তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ। বিবেকানন্দের সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা আবিষ্কারে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অগ্রণী পথিক শ্রীমতী মেরী লুইস বার্ক—'সিস্টার গার্গী' নামেই যিনি এদেশে সমধিক পরিচিত। এই বিদেশিনী মহিলা গত চার দশক ধরে বিবেকানন্দের উপর গবেষণারত। সেকারণে ভারতে এসেছেন বার বার। ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কো শহরের বাসিন্দা 'বিবেকানন্দ পুরস্কারে' ভূষিত শ্রীমতী বার্কের বিবেকানন্দ-গবেষণার সেই প্রেক্ষাপট জানার জন্য একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল বেলুড় মঠের আন্তর্জাতিক অতিথি ভবনে।

প্রশ্ন—এবছর স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ তাঁর বাণীকে কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে আপনার মনে হয় ?

উত্তর—সারা বিশ্বের মানুষ কতটা স্বামীজীকে গ্রহণ করছেন, এবিষয়ে সঠিক কোন ধারণা আমি দিতে পারব না। তবে বলতে পারি স্বামীজীকে জানার আগ্রহ বহু লোকের আছে এবং তা ক্রমশঃ বাড়ছে। স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ এত বিস্তৃত ও ব্যাপক যে, তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব। তবে যে যতটা গ্রহণ করতে পারে, তাতে তার কল্যাণ হবে। এটা যেমন ব্যষ্টির ক্ষেত্রে, তেমনি সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন—কিভাবে এবং কবে আপনি স্বামীজী-সম্পর্কে গবেষণার কাজে নিজেকে যুক্ত করেছেন ?

উত্তর—একটু-আধটু লেখার ঝোঁক বরাবরই ছিল। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েশন করেছিলাম। সাহিত্য আমার খুব ভাল লাগত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত সোসাইটির সদস্য হয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল পুরনো সংবাদপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লেখার। আরও বিশদভাবে জানার জন্য নিউইয়র্ক লাইব্রেরীতে যাই। সেইসময় স্বামীজীর প্রতি আমার আগ্রহ দেখে একজন আমাকে একখানি ফাইল উপহার দিলেন যার মধ্যে ছিল স্বামীজী-সম্পর্কিত বহু অমূল্য তথ্যের মাইক্রোফিল্ম এবং কিছু মূল্যবান নথি। সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজীকে দেখালাম ঐ ফাইলটি। তিনি দেখামাত্রই আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন স্বামীজীর জীবনের ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত ঘটনাগুলি গ্রন্থাকারে লিখে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করার জন্য। আমি স্বামী অশোকানন্দজীর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। তাই গুরুর আদেশমতোই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঐ গবেষণার কাজে নিয়োগ করলাম। সে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা! তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে বহুবার বহু জায়গায় ছুটে যেতে হয়েছে। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেরিয়েছি তথ্যের সন্ধানে। ইংল্যান্ডে গিয়েছি, এসেছি ভারতবর্ষে। একবার নয়, একাধিকবার। প্রথমে ভেবেছিলাম 'বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য ভ্রমণঃ নূতন আবিষ্কার' বিষয়ে গবেষণা-গ্রন্থটি দুটো ভাগেই শেষ হবে। দুটো খণ্ড বের হল। প্রথম খণ্ড 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকাঃ নিউ ডিসকভারিজ' বের হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ড 'স্বামী বিবেকানন্দঃ হিজ সেকেণ্ড ভিজিট টু দি ওয়েস্টঃ নিউ ডিসকভারিজ' বের হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ড

দুটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম। কিন্তু এত তথ্য পেতে লাগলাম যে, মনে হল বেশ কয়েক খণ্ড হয়ে যাবে। এই সময়, বোধহয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ, স্বামী যোগেশানন্দ তাঁর গবেষণার সব কাগজ আমার হাতে তুলে দিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ইংল্যাণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ। সেইসব তথ্যাবলী পাওয়ামাত্র আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। ছুটে গেলাম ইংল্যাণ্ডের বহু জায়গায়। আমার লেখার কাজ চলতে লাগল। প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যকে নতুন করে সাজালাম। তার মধ্যে পূর্ব-প্রকাশিত দুটো খণ্ডের তথ্য তো থাকলই। অদ্বৈত আশ্রমই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন। অবশেষে 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দি ওয়েস্ট ঃ নিউ ডিসকভারিজ' নামে ছটি খণ্ডে সমাপ্ত হল গ্রন্থটি। ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রশ্ন—আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা ঐ মূল্যবান খণ্ডগুলি পেয়েছি যা থেকে স্বামীজীর সম্বন্ধে বহু অজানা তথ্য জানা গেছে। এজন্য ভারতীয়মাত্রেই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। পশ্চিমের মানুষেরা আপনার গ্রন্থ সম্বন্ধে কি বলেন?

উত্তর—পশ্চিমের অনেকেই আমার বই পড়েছেন। আমার মনে হয় অনেকেই ঐ বইগুলি পড়ার পর স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, আরও বিশদভাবে তাঁরা জানতে চাইছেন।

প্রশ্ন—পশ্চিমে আপনি ছাড়া আর কেউ কি স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে এমনভাবে চর্চা করছেন?

উত্তর—অনেকেই আজ চর্চা করছেন স্বামীজীকে নিয়ে। যেমন ওয়াশিংটন স্টেটের চিকো (Chico) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ উইলিয়াম ইতিমধ্যেই বিবেকানন্দের উপর একখানি বই লিখেছেন। আরও অনেকেই কাজ করেছেন।

প্রশ্ন—'সিস্টার গার্গী' এই ভারতীয় নাম আপনি পেলেন কিভাবে?

উত্তর—মঠ ও মিশনের লোকান্তরিত অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আমার নাম দিয়েছিলেন 'সিস্টার গার্গী'।

প্রশ্ন—পশ্চিমে স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ মানুষকে কতখানি প্রভাবিত করেছে?

উত্তর—স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ হল অতি সূক্ষ্ম (subtle)। এই বাণী আজ আমেরিকা ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশের মানুষের অন্তরের গভীরে ক্রমে প্রবেশ করছে। সেখানকার আধ্যাত্মিকতা-সচেতন ও চিন্তাশীল মনের মানুষদের মাধ্যমে এখন তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। পশ্চিমের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই সূক্ষ্ম-গভীর বাণী ও আদর্শ প্রচারিত হতে আরও সময় লাগবে, তা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন—স্বামীজীর বাণী বা আদর্শ পশ্চিমের মানুষকে বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে কি মুক্ত করতে পারবে?

উত্তর—(মৃদু হেসে) স্বামীজী নিজে বলেছেন, মানুষের মধ্যে বস্তুতান্ত্রিকতা থাকবেই। কিন্তু স্বামীজীর চিন্তা ও আদর্শ মানুষকে বুঝিয়ে দেবে বস্তুতান্ত্রিকতাই সর্বস্ব নয়, তার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে তাকে এবং সে তা পারবেও।

প্রশ্ন—আজ পৃথিবীর বহু দেশের বহু মানুষ স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে চর্চা করছেন, এর কারণ কি?

উত্তর—এর কারণ খুবই পরিষ্কার। সারা বিশ্ব আজ নিউক্লিয়ার-অস্ত্রের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। যে-কোন মুহূর্তে এই সুন্দর পৃথিবী সেই অস্ত্র-প্রতিযোগিতার ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। স্বামীজীর আদর্শই পারে মানুষের অন্তরে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ জাগাতে, যুদ্ধ নয় শান্তিই মানুষের আকাঙ্ক্ষা—এই চেতনাকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই পৃথিবীর নানাদেশে আজ স্বামীজীর চর্চা চলছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শই আজ মানুষকে এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিতে পারে।

বিবেক-সমুদ্রে মগ্ন হবার আনন্দে এক বিদেশিনী নারী যাত্রা শুরু করেছিলেন। সময় তার কঠিন হস্তাবলেপে তাঁর বহিরঙ্গের সৌন্দর্য যতই হরণ করেছে, ততই উজ্জ্বল হয়েছে তাঁর অন্তরের দীপশিখা। এখনো তিনি অক্লান্ত, প্রাণশক্তিতে পূর্ণ। তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বিবেকানন্দকে গ্রহণ করার অর্থ—নতুন করে বাঁচা।

সাক্ষাৎকার ঃ অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

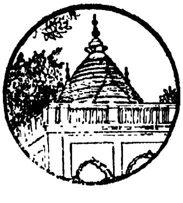

গ্রন্থ পরিচয়

অনিন্দ্য অনিবার্য বিবেকানন্দ

হোসেনুর রহমান

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ ঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদক)। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা-৭০০ ০২৯। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৮৮। মূল্য ঃ পঁচাত্তর টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে বিস্ময়কর এক সংযোজন। তাঁর ১২৫তম জন্মবর্ষ ভারতবাসীর কাছে সেই একই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি আজও সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসেননি যেন। আজও আমরা তাঁকে দেখার আগে দেখি তাঁর গেরুয়া পোশাক। দেখি না বৌদ্ধিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক বিবেকানন্দকে। বুঝি না তাঁর উদ্বোধনের বাণী। বুঝতে চাইনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখক বিবেকানন্দকে বা 'বর্তমান ভারত'-এর ঐতিহাসিক বিবেকানন্দকে। বা বুঝতেও চাই না 'পরিব্রাজক' বিবেকানন্দকে। কারণ খুব সহজ। আমরা গতানুগতিক মানুষকে চিনতে ভালবাসি। সেই চেনার মধ্যে নিরাপত্তার ধারণা নিঃশব্দে বেঁচে থাকে। ধর্মের গতানুগতিকতাকেও বুঝি। কারণ গতানুগতিক ধর্ম চিন্তার বিপ্লবের কথা বলে না। সমাজকে ঢেলে সাজানোর কথাও বলে না। কোন মতে বেঁচে থাকার কথা বলে। জীবনের অর্থ যেন ধর্মের মানুষের কাছে দিনগত পাপক্ষয়। ধর্মের অর্থ যেন দেশ ও কালের কাছে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদের কাছে ধরা পড়ে না। ধর্ম যেন শৃঙ্খলিত এক বহু পুরাতন দানব। সে কেবলই সমাজ নামক বৃহত্তর দানবের কাছে বাধা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ এই মৃত ধর্মের মৃত: দেহে আঘাত হানলেন। সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ঐশ্বর্যের কথা উদাত্তকণ্ঠে শোনালেন। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীকে মানুষের ধর্ম কী তা পরিষ্কার করে বোঝালেন

ভারতবর্ষের মানুষের জীবনধারণের মধ্যে একটি অলিখিত অখণ্ড ঐক্য আছে। পূর্ণমাত্রায় সে ঐক্য সদা-সর্বদা প্রবাহিত, সেটি আমাদের বোঝালেন। আবার এও বোঝালেন, ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষ এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। কিন্তু সে-ধর্ম কোন্ ধর্ম ? সে-ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের ধর্ম। সে-ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে। জাতিধর্মনির্বিশেষে 'মানুষের ধর্ম'-কে বড় করে তোলে। এই 'মানবচর্চা' পৃথিবীতে এই তো সবে সেদিন আরম্ভ হল। আর স্বামী বিবেকানন্দ এসব লোকচর্চার কথা ভারতবর্ষকে তথা পৃথিবীকে শোনালেন বিগত শতাব্দীর শেষ লগ্নে।

ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে বুঝতে বিবেকানন্দ এক ভারতজিজ্ঞাসাকে বড় করে তুললেন। অধ্যাত্মবাদ, বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা হোক প্রতিটি ভারতবাসীর একান্ত ধর্ম। এই হল স্বামীজীর জীবনসাধনার প্রথম ও প্রধান কথা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ভগবান জাগ্রত। প্রতিটি মানুষ অনন্ত সম্ভাবনার অধিকারী। অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই তো স্বয়ং ভগবানের বাস। সেই ভগবান-মানুষ বিবেকানন্দের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষার। সেই মানুষ ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে প্রকাশিত হোন—এই বিবেকানন্দের একান্ত প্রার্থনা। অর্থাৎ মানুষ চেয়েছেন তিনি সর্বক্ষণ।

এই বিবেকানন্দ-ধারণা আজ আমাদের একটু একটু করে অস্থির করছে। এবার আমরা অনুভব করতে পারছি বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের চূড়ান্ত পরিবর্তন চেয়েছিলেন। চিন্তার জগতে তিনি ধর্মকে মানুষের সেকিউলার ধ্যান-ধারণার অন্তর্গত করতে চাইলেন। ধর্মকে ত্যাগ করে ধর্মকে আমাদের বরণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি স্তরে—বিবেকানন্দ এই দাবি করলেন। বহুক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বিশ্ববিবেককে একটু বেশি পরিমাণে ভারতবিবেক বলে আমাদের মনে হয়েছে কোন কোন সময়। কারণ ঃ তাঁর একনশ্বর বিধাতার নাম ভারতবর্ষ। আমাদের বহুদিনের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস তাঁর আবির্ভাবে লুপ্ত হতে শুরু

হয়েছে। তিনি ঘোষণা করলেন, আত্মশক্তি আত্মপরিচয়, স্বদেশ, সভ্যতা, কর্মযোগ, বেদান্ত—এই হল ভারতবর্ষ। তাঁর বেদান্ত সব ধর্মকে ছাড়িয়ে সব ধর্মকে নিয়ে এই মহাজীবন-জিজ্ঞাসার এক আধ্যাত্মিক অভিসার। এই বিবেকানন্দ-ধর্মকে গ্রহণ করার যোগ্যতা আমাদের আজও হয়নি। কিন্তু এই হল আগামীকালের পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম, এই ধর্মে হিন্দুর ধর্ম আছে, মুসলমানের ধর্ম ইসলাম আছে। আবার এই ধর্মে হিন্দুও নেই। ইসলামও নেই। কেবলমাত্র মানুষের সমৃদ্ধ জীবন চেতনার প্রকাশ আছে। এসব চিন্তা ক্রমশঃ আমাদের আক্রমণ করছে। আমাদের সুখের জীবন ক্রমশঃ বিবেকানন্দ কেড়ে নিচ্ছেন। এই তো আমাদের পরম আনন্দ। আমরা ক্রমশঃ অনুধাবন করতে পারছি আনন্দঘন বিবেকানন্দকে। অনুধাবন করতে পারছি ঃ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ বিবেকানন্দ।

আলোচ্য গ্রন্থ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' সেই চিন্তার ফল। অত্যন্ত মূল্যবান ফল। বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের বিবেকানন্দ-জিজ্ঞাসার, বিশ্লেষণের প্রকাশ ঘটেছে এই বিশাল গ্রন্থে। স্বয়ং সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর ভাষায় ঃ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দের প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখন বের হল পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। এটি প্রায় নতুন বই। ১৪টি নতুন প্রবন্ধ এতে যুক্ত হয়েছে, আবার পুরনো প্রবন্ধেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আরও কিছু নতুনত্ব আছে। যেমন, স্বামীজী সম্পর্কে কয়েকটি স্মৃতিকথা, বিভিন্ন মনীষীদের স্বামীজী সম্পর্কে অভিমত, একটি বিস্তৃত জীবনপঞ্জী এবং স্বামীজীর পনেরোটি আলোকচিত্র।'

আমার বিশ্বাস, বাঙালীসমাজ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ', কেবল পড়বেন না, এই মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহও করবেন। কারণ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' বিবেকানন্দের সার্বিক জীবনচেতনাকে সমৃদ্ধতর আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছে। বিবেকানন্দ-দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিটি বিভাগ এই সংকলনে উপস্থিত। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এবং কারা এই বিবেকানন্দ-চিন্তায় অংশ গ্রহণ করেছেন? রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, মেরী লুইস বার্ক, বিমানবিহারী মজুমদার, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অমিয়কুমার মজুমদার ও আরো আরো বহু প্রখ্যাত লেখক।

প্রাপ্তি-স্বীকার

হিমালয়ের চারধাম ঃ স্বামী শ্যামলানন্দ প্রণীত। প্রকাশক ঃ স্বামী শ্যামলানন্দ, ১৯৩, রিজেন্ট কলোনী। কলিকাতা-৭০০ ০৪০। মূল্য ঃ দশ টাকা।

বিবেকানন্দ মানবেশ্বর সঙ্গীত ঃ বিমলচন্দ্র চৌধুরী। প্রকাশক ঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডু চৌধুরী, দুইল্যা, হাওড়া। মূল্য ঃ দশ টাকা।

গোপালসোনা ঃ স্বামী মৃগানন্দ। প্রকাশক ঃ স্বামী হীরানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, ১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৭০০ ০৩২। মূল্য ঃ বার টাকা।

খাপছাড়া কবিতা ঃ অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব), বিরচিত। প্রকাশিকা ঃ অসীমা নস্কর, ১৮, তারামণি ঘাট রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৪১। মূল্য ঃ ১৫·০০।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন আমার ভাল লাগে? ঃ শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার। গ্রন্থকার ও প্রকাশক ঃ শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, ৮৯, অশোক রোড, গাঙ্গুলীবাগান, কলিকাতা-৭০০ ০৮৪। মূল্য ঃ ছয় টাকা।

বাণিজ্যেতে যাবই ঃ শ্রীসঞ্জয়কুমার বসু। পরিবেশক ঃ সর্বশ্রী দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০৭৩। মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব ঃ কষণপুর আশ্রম (দেরাদুন) গত ১৮—২০ নভেম্বর '৮৮ তিনদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব, জনসভা, ভক্তসম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা, প্রবন্ধরচনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে। দুস্থদের মধ্যে ১২৫টি পশমী কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থের প্রকাশ করেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। তিনি ১৮ নভেম্বর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন।

আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২ ও ১৩ নভেম্বর (১৯৮৮) আগরতলা টাউন হলে দুইটি সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাবেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ও সহ-সম্পাদকত্রয় স্বামী গহনানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ ভাষণ দেন। ১২ নভেম্বর ত্রিপুরা সরকারের যুব-কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী রতন চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার স্বাগত ভাষণ দেন। ১৩ নভেম্বর সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচিব আই পি গুপ্তা।

গত ১৪ নভেম্বর, '৮৮ পুরী রামকৃষ্ণ মঠ ও পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ উদ্যোগে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পুরীধামে পদার্পণের এবং উড়িষ্যায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা আরম্ভের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে পুরী মঠে সকালে বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ হয়েছে। অপরাহ্নে স্বামী ভক্ত্যানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন পুরী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বি. কে. মহান্তি এবং বক্তা ছিলেন স্বামী দিনেশানন্দ। বক্তাগণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও উড়িষ্যায় তাঁর প্রভাব নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। সভাশেষে একশো দশজন দুস্থ মহিলাকে নতুন শাড়ি ও খাবার বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধন

গত ৮ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ নয়াদিল্লী আশ্রমের নতুন সাধননিবাসের উদ্বোধন করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ কলেজের চারজন ছাত্র গত এপ্রিল ১৯৮৮তে অনুষ্ঠিত বি. এ. পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম ও তৃতীয় এবং সংস্কৃতে প্রথম ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ ঃ মালদা এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বন্যাপীড়িতদের মধ্যে বিতরণের জন্য ১০৫০টি পশমী কম্বল মালদা আশ্রমে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ ঃ দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার ৩টি মহকুমার ৫৩০টি পরিবারের মধ্যে ৪০০টি শাড়ি ও ২০০টি ধুতি বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন ঃ বিহারে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মুঙ্গের জেলার হাসানপুর গ্রামে ১৪টি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

বহির্ভারত

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি ঃ গত ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ এবং স্বামী গণেশানন্দ।

২৫ ডিসেম্বর রবিবার যীশুখ্রীষ্টের উপর ভাষণ দিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় স্বামী প্রমথানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উপর ক্লাস নিয়েছেন এবং শনিবারগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর উপর আলোচনা করেছেন স্বামী প্রমথানন্দ এবং রবার্ট রীড। ১৪ ডিসেম্বর উপনিষদের উপর একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ৩০ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি পালন করা হয়। ঐদিন হাতে হাতে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর নববর্ষের প্রাক্‌সন্ধ্যা অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার ঃ গত ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে এবং ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে তাঁর বাণীর উপর আলোচনা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার পাতঞ্জল-যোগসূত্র এবং প্রতি মঙ্গলবার গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী অনিকেতানন্দ (দীনেশ) গত ১৮ নভেম্বর '৮৮ মস্তিষ্কে রক্তচলাচল ব্যাহত হওয়ায় হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ভোর ৩-৩০ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে আসানসোল, বরিশাল, নরেন্দ্রপুর (তৎকালীন পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম), সারগাছি, তমলুক, জামতাড়া এবং বম্বে কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাত্রাণ ও অন্যান্য দুর্ভিক্ষত্রাণে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন।

স্বামী অজপানন্দ (পূর্ণ) হজকিন্স লিম্ফোমা রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৯ নভেম্বর '৮৮ বেলা ৯-২৫ মিঃ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অজপানন্দ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঁথি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি মেদিনীপুর, বরানগর, মালদা, বেলুড় মঠ, বলরাম মন্দির এবং গদাধর আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও আনন্দেই তাঁর দিনগুলি কাটছিল এবং ইষ্টনাম জপ করতে করতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

সাধুচিত গুণাবলীর জন্য তাঁরা উভয়েই সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ শনিবার শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ।

খ্রীষ্টোৎসব

গত ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ 'সারদানন্দ হল'-এ ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। ভগবান যীশুর প্রতিকৃতির সম্মুখে আরতির পর তাঁর বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। আলোচনার পর ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

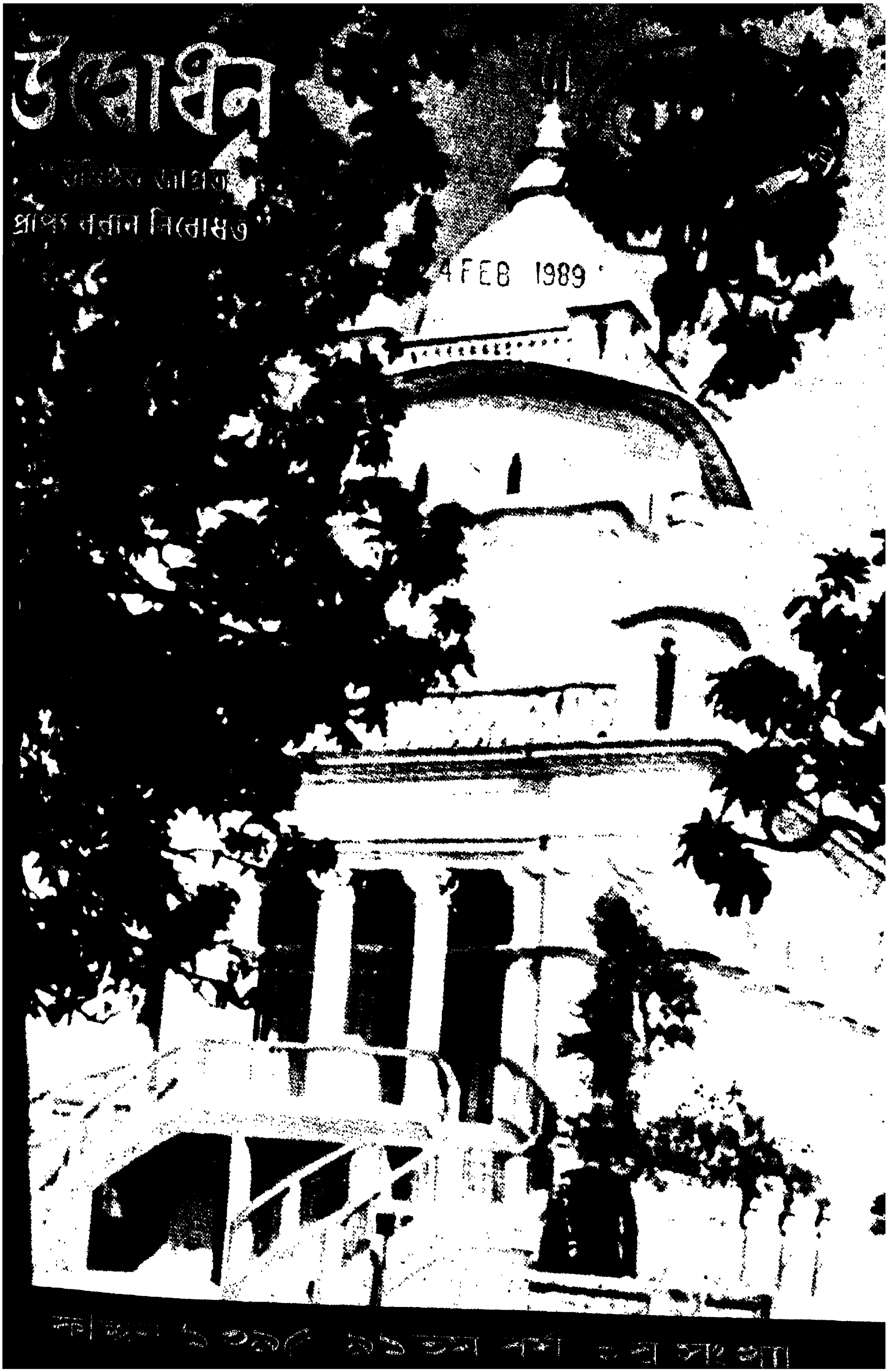

4 FEB 1989

ফাল্গুন ১৩৯৫ ৯১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

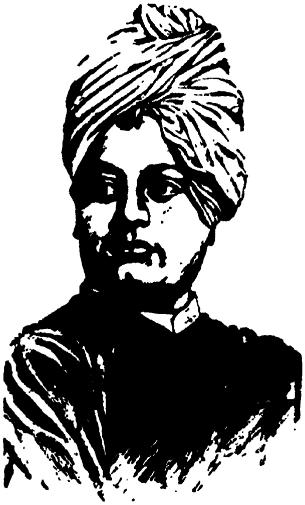

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত অভেদ জ্ঞান

স্বামী অভেদানন্দ

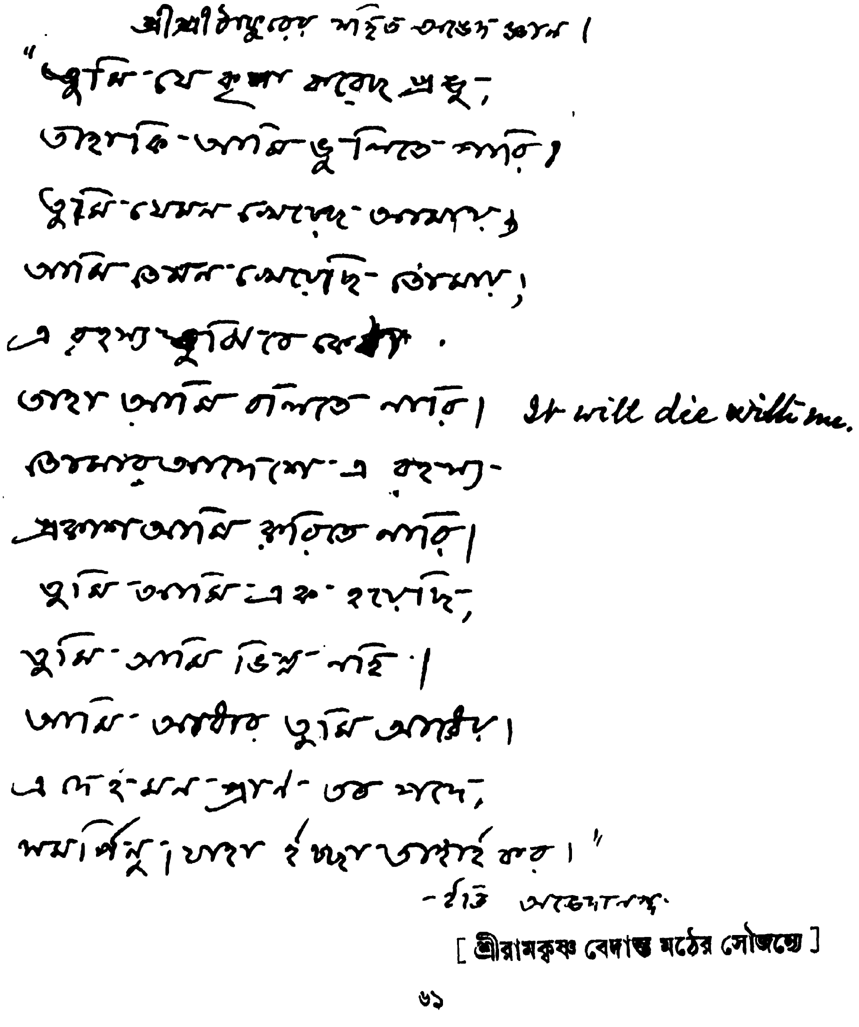

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত অভেদ জ্ঞান।

"তুমি যে কৃপা করেছ প্রভু,
তাহা কি আমি ভুলিতে পারি?
তুমি যেমন মেনেছ আমায়,
আমি তেমন মেনেছি তোমায়;
এ রহস্য তুমি তো বোঝ
তবু আমি বলিতে নারি। It will die with me.
তোমার আমার যে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করিতে নারি।
তুমি আমি এক হয়েছি,
তুমি আমি ভিন্ন নহি।
আমি তোমার তুমি আমার।
এ দেহ মন প্রাণ তব পদে,
সমর্পিনু, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

-ইতি অভেদানন্দ

[শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সৌজন্যে]

কথাপ্রসঙ্গে

একটি আত্মাহুতি ঃ একটি প্রতীক

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমেরিকার বিখ্যাত 'লস এঞ্জেলস টাইমস' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি-সহ একটি বিস্ফোরক খবর প্রকাশিত হইল ঃ হলিউডে চিত্রতারকাদের অভিজাত পল্লীতে এক ধনী পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সুন্দরী যুবতী কন্যা—নাম ন্যান্সি লুইস মুর—প্রকাশ্য দিবালোকে একটি ব্যস্ত মোটর সার্ভিস স্টেশনে নিজেই নিজের শরীরে পেট্রোল ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। মোটর সার্ভিস স্টেশনের কর্মচারীদের ব্যাপারটি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসে। কিন্তু তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আগুনের লেলিহান শিখা ততক্ষণে ন্যান্সির সর্বাঙ্গ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ন্যান্সি নির্বিকার, অবিচলিত, নীরব। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে জ্বলিতেছে। তাহার বাঁ-হাতে ধরা শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ভারতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষের ফটোগ্রাফ। সেই পুরুষের দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে ন্যান্সির প্রশান্ত ধীর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি।

সংবাদে আধ্যাত্মিক পুরুষটির কোন পরিচয় দেওয়া ছিল না। ফটোগ্রাফটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের।

ন্যান্সি কেন ঐভাবে আগুনে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিল, তাহার কথা সংবাদে প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশিত হয় নাই কেন শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোগ্রাফ হাতে ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে তাঁহার দিকে সে ঐভাবে তাকাইয়া ছিল। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ঐসময় লস এঞ্জেলস-এই সংবাদটি দেখেন। এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন ঃ "ন্যান্সি চেয়েছিল, সে নিজে মশাল হয়ে জ্বলে উঠবে মোহান্ধকারে পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে পথের সন্ধান দেবার জন্য। সেইজন্যই বোধহয় রামকৃষ্ণদেবের ছবির দিকে ধ্যাননিমগ্ন দৃষ্টি রেখে দেশলাইয়ের আগুন সে বুকের কাছে ছুঁইয়েছিল।"

বাস্তবিক তাহাই। ন্যান্সি যেন একটি প্রতীক। বিলাস-ঐশ্বর্যের তুঙ্গ-শিখরে স্থাপিত পাশ্চাত্যের হর্ম্যসভ্যতা আজ হৃদয়ের চূড়ান্ত শূন্যতায় ভুগিতেছে। বাহিরের সম্পদ বাড়িয়াছে, আরও বাড়িতেছে। কিন্তু হারাইয়া যাইতেছে অন্তরের মাধুর্য, অন্তরের আনন্দ। বহু বছর আগে পাশ্চাত্যের এই ভোগলোলুপতার আকার দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি এখনও তোমরা এই আত্মঘাতী ভোগলিপ্সা হইতে নিজেদের সংযত না কর, তাহা হইলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তোমাদের সভ্যতা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে। মনে রাখিও, তোমরা একটি আগ্নেয়গিরির উপর তোমাদের সভ্যতাকে বসাইয়া রাখিয়াছ।

স্বামীজীর সেই সতর্কবাণীতে পাশ্চাত্য কর্ণপাত করে নাই। পরপর দুইটি বিশ্বধ্বংসী মহাযুদ্ধ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তবুও মানুষের চৈতন্য ফিরিতেছে না। আজও পৃথিবী জুড়িয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চলিতেছে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা—কে কত ভোগের উপকরণে দেশের মানুষকে ভাসাইতে পারে। ইহার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যে আরও বেশি করিয়া উদ্ভব হইতেছে উদগ্র স্বার্থপরতার, নির্বাধ ইন্দ্রিয়পরতার, বল্গাহীন দেহসর্বস্বতার।

ভোগভূমির ভূস্বর্গ হলিউডে মার্কিন যুবতী ন্যান্সীর অগ্নিতে স্বেচ্ছায় আত্মদান সেই সর্বংলেহী ইহসর্বস্বতার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। যে আগুনে সে পুড়িল, সে আগুন ঐ ইহসর্বস্বতার প্রতীক। সেই ইহসর্বস্বতা হইতে শান্তি কিসে নিজের জীবন দিয়া ন্যান্সি তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছে। শান্তি ভারতের শাশ্বত বাণীতে ঃ "ভোগে নয়, সংযমেই শান্তি।" সেই বাণীর সাকার মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ—যাঁহার ফটোগ্রাফ ন্যান্সি স্বয়ং জ্বলিতে জ্বলিতে হাতে ধরিয়া জগৎকে দেখাইয়াছিল।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের প্রয়াণে ভারত সাধু-সমাজের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিগত ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮, শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি লাভের সংবাদে উত্তরাখণ্ডের ভারত সাধু-সমাজ গত ৩০ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় বিবেকানন্দ ভজনালয়, উজেলি, উত্তর কাশীতে এক বিশেষ মহতী সভায় মিলিত হয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভারত সাধু-সমাজের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্য অতিথি ছিলেন স্বামী সুর্যানন্দ।

সভার প্রারম্ভে সমবেত সাধুবৃন্দ এবং ভক্ত-মণ্ডলী দুই মিনিট নীরবতা পালন করে প্রয়াত মহারাজজীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অতঃপর স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মলীন মহারাজজীর অত্যুজ্জ্বল কর্মময় জীবনের উপর বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেনঃ বর্তমান আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ ছিলেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রধান প্রধান উপনিষদ্গুলি ও ব্রহ্মসূত্রের ইংরেজী অনুবাদ, বাঙলায় উপনিষদ্-গ্রন্থাবলীর সঙ্কলন, এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রচনা করে তিনি দেশ-বিদেশের অগণিত অধ্যাত্ম-পিপাসুগণের নিকট এক বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, প্রয়াত মহারাজজী যখন গঙ্গোত্রী ও গোমুখ দর্শনকালে উত্তর-কাশীতে আসেন, তখন তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি আরও বলেনঃ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি সমগ্র সাধু-সমাজ এবং দেশের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর মহান পবিত্র আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে চিরশান্তিতে বিরাজমান থাকুক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণেও উত্তরাখণ্ডস্থ ভারত সাধু-সমাজ অনুরূপ সভার আয়োজন করেছিলেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বেলুড় মঠে মহাফেজখানা ও সংগ্রহশালা

আনন্দের সঙ্গে আমরা জনসাধারণকে জানাচ্ছি যে, বেলুড় মঠে একটি মহাফেজখানা ও সংগ্রহশালা (Archive and Museum) স্থাপিত হয়েছে। স্থির হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান প্রধান কার্যালয় ভবনটিতে এটি অদূর ভবিষ্যতে স্থানান্তরিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘড়ি, জুতা ইত্যাদি, চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি, ব্যক্তিগত দিনলিপি, ব্যবহৃত গ্রন্থাদি এবং তাঁদের প্রদত্ত সম্বর্ধনা-সম্ভাষণ এই মহাফেজখানা এবং সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হবে। তাছাড়া, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের চরণচিহ্নও সেখানে সংরক্ষিত হবে।

সঙ্ঘের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে উল্লিখিত দ্রব্যাদির কিছু থাকলে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের নিকট তা হস্তান্তর করার জন্য একান্ত অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বহু প্রজন্মের ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণের কাছে প্রদর্শনের জন্য সংগ্রহশালায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলি সংরক্ষণ করা যায়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ

গত ২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৯ রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সংস্থার বৈঠকে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়। তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ হলেন। গত ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ একাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি লাভে এই পদটি শূন্য হয়। শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এর পূর্বে তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ।

স্বামী ভূতেশানন্দজী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার সোমসাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার সরকারী সংস্কৃত কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হওয়ার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষা, এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। তাঁর ব্রহ্মচর্য নাম ছিল প্রিয়চৈতন্য।

রামকৃষ্ণ সংঘে স্বামী ভূতেশানন্দজীর কর্মজীবন খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। যোগদানের পর থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠের কর্মী ছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী কর্মসচিব। এর পরবর্তী দুবছর তিনি মহীশূর ও মাদ্রাজে বিশ্ব-ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিলং কেন্দ্রের প্রধান হন। সেসময় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দরিদ্র ও উপজাতিদের মধ্যে তিনি সেবাকাজ পরিচালনা করেন। এরপর ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ একুশ বছর তিনি রাজকোট কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টী ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক হয়ে বেলুড় মঠে আসেন এবং ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংঘের সহাধ্যক্ষ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন। সহাধ্যক্ষ হওয়ার পর তিনি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষ পদেও বৃত ছিলেন।

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির পর থেকে ২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৮ নতুন অধ্যক্ষের নির্বাচন পর্যন্ত সংঘের নিয়মানুসারে অছি পরিষদের প্রবীণতম সদস্য শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ (ভরত মহারাজ) অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান সর্বজনবিদিত। সর্বজনবিদিত তাঁর সহজ-গভীর বাক্‌বৈদগ্ধ্যও। তাঁর পরম স্নেহময় ব্যক্তিত্ব সাধু-ভক্ত সকলের কাছেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ' (৫ খন্ড), 'মুণ্ডকোপনিষদ্‌', 'শরণাগতি', 'উপনিষদ্‌ ও আজকের মানুষ' গ্রন্থগুলি যেমন বিদ্বৎসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তেমনি হৃদয় জয় করেছে অগণিত অধ্যাত্মপিপাসু নরনারীর। তাঁকে মঠাধীশরূপে লাভ করে সংঘের সকল সভ্যই যে পরম কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত হয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, পূজনীয় মহারাজ যেন সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে সংঘকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান

স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেসব মনীষী অনুধ্যান করেছেন, তাঁরা অনেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের বহু সহস্র বছরের সংস্কৃতির নির্যাস অথবা পরিপূর্ণ বিকাশস্বরূপ। তিনি স্বয়ং বলে গেছেন 'যে রাম যে কৃষ্ণ তিনি ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ'। এটা ব্যক্তিত্বের একত্বের দিক থেকে বলেছিলেন, অথবা বিভিন্ন ভাবধারার পুঞ্জীভূত সমষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন—তা বিবেচ্য। 'সংস্কৃতি' বলতে আমরা অবশ্য এখানে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির কথাই বলছি। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট নিদানস্বরূপ আমরা যদি এক-একজন করে ভারতের বিশিষ্ট অবতার-পুরুষদের জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই, তাহলে কথাটা হয়তো আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। প্রথমে ধরা যাক শ্রীরামচন্দ্রের কথা। আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, অবতার তো তিনি ছিলেনই, কিন্তু যে-সমস্ত গুণাবলীর জন্য তিনি আমাদের কাছে আজও পূজ্য, সেগুলি হচ্ছে তাঁর সত্যপালন, তাঁর মাতাপিতার প্রতি অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রজানুরঞ্জন, তাঁর উদারতা ইত্যাদি। ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখতে পাই মার কাছে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করলেন, কিন্তু বললেন সত্য আমি দিতে পারলাম না। সত্যকে তিনি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। গিয়েছিলেন কালীমন্দিরের অদূরে শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়িতে। মল্লিকমশাই বলেছিলেন আপনার পেটের অসুখ আছে, যাবার সময় একটুখানি ওষুধ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু মল্লিকমশাই নিজে হাতে করে না দিয়ে ভুলক্রমে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। ঠাকুর তখন বিদায় নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরবেন। ভাবলেন, ওষুধ দিতে চেয়েছিল, ভুলে গেল দিতে, তা কর্মচারীর কাছে ওষুধটা চেয়ে নিলেই তো হয়। তাই নিলেন। তারপর কালীবাড়ির পথ আর তিনি খুঁজে পান না। অথচ সামান্যই তো দূরত্ব। তাই আবার ফিরে গেলেন ওষুধটি ফেরৎ দিতে। দেখলেন কর্মচারীটি সেখানে তখন নেই। তাঁর মনে হল, আমি সত্যরক্ষা করিনি, যার কাছ থেকে নেবার কথা ছিল, তাকে না জিজ্ঞেস করে তাকে না বলে আমি নিয়ে এসেছি। ওষুধটি জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "ওগো, তোমাদের ওষুধ এই রইল"। তারপর দেখলেন কালীবাড়ির পথ সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। সঞ্চয় তিনি করতে পারতেন না। শ্রীশ্রীমা একদিন তাঁর আঁচলে খাওয়ার পর একটুখানি মশলা বেঁধে দিলেন। নহবত থেকে চলছেন তিনি নিজের ঘরে। দূরত্ব একশো ফুটও তো নয়। কিন্তু পথ হারিয়ে চললেন গঙ্গার দিকে। বলছেন ঃ "মা ডুবি?" সত্য পালন করা হয়নি যে। এমনই ছিল তাঁর সত্যের উপর আঁট। তাঁর পিতৃভক্তির পরিচয় আমরা অবশ্য দিতে পারব না। কারণ তাঁর ছেলেবেলাতেই তিনি পিতৃহীন হয়েছিলেন। তবে তাঁর মাতৃভক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। মাকে এনে তিনি রেখেছিলেন নহবতে, নিত্য সকালে সেখানে যেতেন, তাঁর পাদবন্দনা করতেন। যখন বৃন্দাবনে গেলেন তীর্থদর্শনে, তখন তাঁর মনে হল এখানে থেকে গেলেও হয়। গঙ্গামায়ী নামে একজন সাধিকা সেখানে ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে তাঁর সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে দিতে চাইলেন। বললেন ঃ "থাকুন আপনি এখানে"। তিনিও থেকেই যাবেন ঠিক করলেন। ব্যাপার দেখে হৃদয় মামাকে বোঝাতে শুরু করলেন, না, চল ফিরে যাই। একদিকে হৃদয় অন্যদিকে গঙ্গামায়ী। হৃদয় হঠাৎ বললেন ঃ "তুমি যে এখানে থাকবে বলছ, তাহলে দিদিমাকে (অর্থাৎ চন্দ্রমণি দেবীকে) কে দেখবে?" যেই বলা, সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "তাই তো, আমি যদি এখানে থেকে যাই তাহলে আমার বুড়ো মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবে কে?" ঠিক করলেন, না থাকা চলবে না। তখন সাধিকা তাঁর একহাত ধরে টানছেন বৃন্দাবনে রাখবার জন্য, আর হৃদয় আর এক হাত ধরে টানছেন তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ঠাকুর কিন্তু থাকতে পারলেন

না। মায়ের সেবার জন্য তিনি ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। রামচন্দ্রের মতো তিনি রাজা ছিলেন না। সুতরাং প্রজানুরঞ্জনের কথা ওঠে না। কিন্তু মানুষের জন্য তাঁর ভালবাসার অজস্র প্রমাণ আছে। তাঁর উদারতাও সর্বজনবিদিত।

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান বার্তা সমন্বয়। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।" যে যেমন পথেই আসুক না কেন আমি তাকে স্নেহভরে সেই পথেই গ্রহণ করে থাকি, মানুষ যে-পথেই চলুক না কেন সকলে আমার দিকেই এগিয়ে চলেছে। এতবড় উদার কথা তিনি বললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এমনই যে, টিপ্পনী-ভাষ্য প্রভৃতির ভিতরে ভগবানের উদারভাব আবৃত হয়ে গিয়ে ক্রমে একটা সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধারণ করল, যার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয়ের বার্তা আমরা ভুলে গেলাম। সেই বার্তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, সেই বার্তার ভিতরে নবজীবন প্রদানের জন্য, চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের সেই কথাগুলো শিখিয়ে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করলেন। শুধু ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতেই নয়, পাশ্চাত্যে এবং অন্যত্র উদ্ভূত অন্যান্য প্রধান ধর্মমতেও তিনি সেই সাধনা করলেন এবং সিদ্ধিলাভ করে বললেন, "যত মত তত পথ"। এ তাঁর কথার কথা নয়। মুখে বলে একথা তিনি বুঝিয়ে দিতে চাননি। সাধনা করে তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়ে বিভিন্ন রূপে আস্বাদন করে। তাঁর সেই অনুভূতির কথা, সেই ভাবের কথা, সেই উপলব্ধিজাত সত্যের কথাই তিনি বলে গিয়েছেন, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন। একেই বলে সমন্বয়। আর একটি কথা আমরা পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে, সেটা হচ্ছে কর্মযোগের কথা। সংসারে থাকবে কিন্তু সংসারে ডুবে যাবে না, কাজকর্ম করে সমস্ত ফল ভগবানে অর্পণ করবে। নিজের কিছু থাকবে না। কথাটা আমরা যেভাবে এই ভাষ্য-টিপ্পনীর ভিতর দিয়ে পেয়েছিলাম, আজকে ঠাকুরের ভাব অবলম্বন করে যেন তার ভিতরের নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। তিনি কি বললেন? বললেন ঃ "প্রতিমাতে পুজো হয়, আর মানুষে হয় না?" মানুষকে তিনি দেবতারূপে দেখেছিলেন, সচল নারায়ণরূপে দেখেছিলেন। সেই নারায়ণকে তিনি পুজো করেছিলেন। একবার দেওঘরে গিয়ে গরিবদের দুঃখদুর্দশা দেখে তিনি মথুরবাবুকে বলেছিলেন ঃ "এদের অভাব তুমি মোচন কর।" মথুরবাবু হিসেবী লোক। হিসেব করে বললেন, "বাবা! লোকগুলোর সংখ্যা তো দেখছি নেহাত কম নয়। এতগুলো টাকা যদি খরচ করে ফেলি তাহলে তো তীর্থদর্শন হবে না।" শুনে ঠাকুর বললেন, "আমি যাব না তোমার তীর্থদর্শনে।" বর্তমান যুগে যিনি হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়েছেন, মৃন্ময় মূর্তিতে যিনি চিন্ময় ঈশ্বরীকে দর্শন করেছেন, প্রতিমার নাকের কাছে তুলো ধরে দেখেছেন তুলো নড়ে, মা কথা বলেন, মা রুনুঝুনু নূপুর বাজিয়ে মন্দিরের উপর উঠে আলুথালু কেশে গঙ্গা দর্শন করেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "আমি এদের সঙ্গে বসলাম। আমি এখান থেকে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত এদের অভাব দূরীভূত হচ্ছে।" কেন? শাস্ত্র বলছেন, "যে-ভগবান সর্বজীবের ভিতরে সুহৃদরূপে, অন্তরাত্মারূপে বিরাজিত রয়েছেন, তাঁকে অবহেলা করে যদি কেউ অতি মূল্যবান উপহারসামগ্রী ভগবানকে দান করেন, ভগবানের পাদপদ্মে ঢেলে দেন, তাতে তিনি তত খুশি হন না যত খুশি হন তিনি নারায়ণরূপী মানবের সেবাতে।" এখানে আগে পুজো করে তারপর ফল ভগবানে অর্পণ করব সেকথা উঠছে না। যে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং মনুষ্যদেহ ধারণ করে সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরই আমি পুজো করছি। নিজে কিছু পাবার উদ্দেশ্যে আমি পুজো করছি না। এখানে ফল অর্জন করা, ফল অর্পণ করার কথা ওঠে না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি একটু নতুন রকম বলেই মনে হয়। তাঁরই কথা তিনি বলেছেন, ভগবানের কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু যে-কথার অর্থ আমরা ভুলে গিয়েছিলাম সে-কথাটি তিনি আবার আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। একদিন যাচ্ছেন ঝাউতলার দিকে, পিছনে ফিরে তাকালেন, কলকাতার দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাই তো, লোকগুলো এই যে শোক, মোহ, দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে আছে, যদি দরকার হয় আমি এদের জন্য বারবার শরীর

গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

মানুষ সাধারণতঃ ভগবানলাভের জন্য গিরিগুহা-কন্দরে গিয়ে থাকে। তারা নিজের মুক্তি চায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তা চাননি, তিনি সকলের মুক্তি চেয়েছিলেন। ধিক্কার দিয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, "আমি ভেবেছিলাম তুই মস্তবড় একটা বটগাছের মতো বা অশ্বত্থ গাছের মতো বড় হয়ে উঠবি, যার ছায়ায় এসে শতসহস্র লোক আশ্রয় পাবে, তাদের জীবনের জ্বালা জুড়াবে, আর তুই কিনা এত স্বার্থপর? বললি, তুই নিজের মুক্তি চাস, তুই নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাস!" ঠাকুর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন পরের জন্য আত্মসমর্পণেই রয়েছে নির্বিকল্প সমাধির চেয়েও বড় অবস্থা, মুক্তির চেয়েও গভীরতর সার্থকতা।

ভগবান বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন। তিনি রাজত্ব ছেড়ে গিয়েছিলেন, সুন্দরী স্ত্রী ও সদ্যোজাত পুত্রকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ কি ত্যাগ করেছিলেম? গরিবের ছেলে, ত্যাগের মতো কিছুই ছিল না। কাজেই ত্যাগ আর তিনি কি করবেন! কিন্তু, তাঁর জীবনে ত্যাগের যে মহিমা দেখতে পেলুম, অবাক হয়ে গেলুম তাতে। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এলেন, শুনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল হয়ে গেছেন। ভাবলেন, তাহলে এসময় তো আমার সেখানে যাওয়া দরকার। তাঁর সেবা করার প্রয়োজন। এলেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে। পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রীকে তিনি দূরে সরিয়ে দিলেন না। নহবতে যেতে বললেন না। বললেন, "তুমি এ ঘরে থাক। তা না হলে তোমার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হবে না।" তাঁকে রাখলেন তিনি তাঁর পাশে। তাঁর সেবা-শুশ্রূষা-যত্ন করে তাঁকে ভাল করলেন। তারপরে পুজোর আসনে বসিয়ে তাঁকে জগন্মাতারূপে পুজো করলেন। নিজের সাধনলব্ধ সমস্ত ফল, জপমালা মায়ের চরণে অর্পণ করলেন। এই নবীন ধারা, নবীন চিন্তা শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের ভিতরেই দেখা গেল। এখানেই তাঁর ত্যাগ। ধাতু স্পর্শ করলে বিছার কামড়ের মতো হাতে ব্যথা হয়, শরীর বিকল হয়ে যায় এমন কথা তো কখনও শুনিনি। নরেন্দ্রনাথ লুকিয়ে তাঁর বিছানার নিচে একটি রুপোর মুদ্রা রেখে চলে গেছেন দূরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঘরে ছিলেন না। ঘরে এসে তিনি বসলেন বিছানায়। আর বসার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে বললেন, "দ্যাখ তো বিছানার নিচে কি আছে?" বিছানা ঝাড়তেই পাওয়া গেল একটি রৌপ্য মুদ্রা। সম্মুখে দাঁড়ানো নরেন্দ্রনাথ তখন অধোমুখ। ঠাকুর তখন সব বুঝেছেন। বললেন, "ঠিক করেছিস। সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি।" এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ।

শঙ্করাচার্য নির্বিকল্প সমাধিমান পুরুষ। নির্বিকল্প সমাধির কথা তিনি ব্যাখ্যা করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। তোতাপুরী বহু বছর ধরে সাধনা করে যে-নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের তা লাভ করতে লেগেছিল মাত্র তিন দিন। তারপর তিনি বলেছিলেন, জ্ঞানের পরেও আছে বিজ্ঞান। শঙ্করাচার্যের জীবন যদি আমরা ভাল করে অনুধ্যান করি তাহলে দেখতে পাব তাঁরও জীবনে জ্ঞানের পরে বিজ্ঞানের একটা অধ্যায় ছিল। তিনি নির্বিকল্প সমাধিমান পুরুষ হয়েও ভক্তিমূলক বহু স্তোত্র রচনা করেছেন, ভক্তিমূলক বহু গ্রন্থ লিখেছেন। ভারতের সর্বত্র ঘুরে মঠ স্থাপন করেছেন, দশনামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দশনামী সম্প্রদায়ের উপর তিনি বেদবেদান্ত রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। ভাবের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতকে তিনি একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। মানুষের মধ্যে ব্রহ্মচেতনাকে, ধর্মচেতনাকে তিনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এইভাবে জ্ঞানের পরে তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অবস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সমাধি থেকে নেমে এসে সকলের ভিতরে রইলেন। সকলেরই ত্রাতা, সকলকে জাগিয়ে তোলবার জন্য, শুধু নিজের মুক্তি লাভের জন্য নয়। শুধু বাঙালী নয়, শুধু ভারতবাসী নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ যাতে ভগবান লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারে, সে-পথকে সুগম করবার জন্য, সে-পথকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের সামনে দাঁড়ালেন। 'প্যারাবলস্'-এর ভিতর দিয়ে যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত'তেও তাই দেখি প্রত্যেকটি কথার ভিতরে, প্রত্যেকটি গল্পের ভিতরে কি প্রাণপ্রদ শক্তি রয়েছে! বলা হয় শব্দই শক্তি। সেই

শব্দের শক্তি যে কি তা যদি উপলব্ধি করতে হয়, অনুভব করতে হয়, তাহলে 'কথামৃতের' পাতা উল্টে দেখতে হবে। মানুষ তার ভিতর পাবে নতুন নতুন অনুপ্রেরণা। মানুষটি যেন তার ভিতরে জেগে বসে আছেন সকলের ভিতরে প্রেরণা জাগিয়ে দেবার জন্য। জ্ঞানের পরেও যে বিজ্ঞানের স্তর শ্রীরামকৃষ্ণ তা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, ভগবানকে চোখ বুজলেই শুধু দেখা যায়, আর চোখ চাইলে দেখা যায় না—এ কেমনতর কথা? বলেছিলেন, দেবমন্দিরে গিয়ে যখন আমি ধ্যান, প্রার্থনা করছি তখনই আমি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করব, আর মন্দির থেকে বেরিয়ে এলে, অফিসে গেলে বা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বাস করতে গেলে বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করতে গেলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না, এ কেমনতর কথা? ভগবান যদি সর্বব্যাপী হন, শাস্ত্র যদি বলে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তাহলে সে-কথাটির একটা বাস্তবিক তাৎপর্য থাকা দরকার। মুখে 'নেতি নেতি' বলে সবটাকে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সামনে যে জগৎটা আছে, যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাকে কি সত্যি উড়িয়ে দেওয়া যায়? ঠাকুর বললেন, কাঁটা বিঁধছে, লাগছে, রক্ত বেরুচ্ছে আর বলব কাঁটা নেই, জগৎ নেই? এ কেমন কথা? সাধুকে বললেন, "সাধু, তোমার নামে যে নানা কথা রটছে।" সাধু বললেন, "ও তো সব মায়া হ্যায়, এ যা শুনছ তুমি এ সব মিথ্যে, সব মায়া।" উত্তরে ঠাকুর কি বলেছিলেন? "অমন বেদান্তে আমি···।" এই ছিল ঠাকুরের ভাব। ভগবান যদি সর্বত্র থাকেন, তাহলে তিনি কি জগৎ-ছাড়া? জগৎটাকে যে বাদ দিলে, 'নেতি' বলে উড়িয়ে দিলে, ওটা ভগবান নয় বললে, ভগবানেরই তো খানিকটা বাদ পড়ে যাবে। জগৎ তো তাঁকে ছেড়ে নেই। এই বোধের নাম জ্ঞানের পরে বিজ্ঞান। এই কথা বলে মানুষকে ভগবান-আস্বাদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। কল্পনা নয়, দর্শনের কচকচি নয়। ভগবান সর্বত্র রয়েছেন সত্যি সত্যি। আমার ঘরে রয়েছেন, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি সকলের ভিতর রয়েছেন। এক বিধবা ঠাকুরকে বলেছিলেন, "বাবা, আমার মন ভগবানের দিকে যায় না। ধ্যান করতে বসলে যেন মনটা কেমন হয়ে যায়।" "কেন গো, কার কথা মনে পড়ে?" "না, আমার ভাইপোর মুখখানি মনে পড়ে।" "বাঃ বেশ হয়েছে। তা ওকে তুমি বালগোপাল বলে ভাববে।" শিখিয়ে দিলেন পথ, বালগোপাল বলে ভাবতে আরম্ভ করলেন বিধবা। সিদ্ধিলাভ করে গেলেন তিনি। এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে যেতেন সেখানেই ভগবৎ ভাব জাগিয়ে তুলতেন। তখনকার দিনে উঠেছিল সংস্কারের হুজুগ, শুকনো নৈতিকতার যুগ। ঠাকুর বললেন, 'তোমরা কীর্তন কর, হরি হরি বল, মায়ের নাম কর।' শুধু সমাজ-সংস্কার করে কি হবে, শুধু নৈতিকতা করে কি হবে, যদি ভগবানের আসন হৃদয়ে না স্থাপিত হয়? আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে অবতারগণ আসেন, ঈশ্বরের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ভিতরে ভগবৎভাব, ধর্মোন্মাদনা জাগিয়ে দেন। আমাদের শাস্ত্রে সমতার কথা আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা জীবনে তাকে প্রতিফলিত করতে পারিনি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ভক্তের জাত নেই। বলেছিলেন জাত একভাবে উঠে যেতে পারে—তা হল ধর্মকে অবলম্বন করে। কেন না ভক্তের জাত নেই। তিনি তো রাজনীতিবিদ ছিলেন না, অর্থনীতিবিদও ছিলেন না। তিনি ছিলেন দ্রষ্টাপুরুষ, তিনি অবতার। ধর্মের দৃষ্টিতে সব দেখেছেন। শাস্ত্রও তাই বলেছে, ধর্মকে অবলম্বন করেই সমতা আনতে হবে। ঠাকুর তাঁর নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। নানা জাতের লোক খেয়ে গেছে, উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে সেই জায়গা তিনি পরিষ্কার করে ফেলেছেন, আবার উচ্ছিষ্ট থেকে তুলে নিজে খাচ্ছেন। মেথরের বাড়িতে গিয়ে তার পায়খানা পরিষ্কার করেছেন। আমরা কি ভাবতে পারি তাঁর মন কোন্ উঁচু সুরে বাঁধা ছিল? এ লোকদেখানো কোন ব্যাপার ছিল না। ভগবানের সঙ্গে তিনি নিত্য-সান্নিধ্য অনুভব করেছেন, ভগবানের সঙ্গে সর্বদাই এক হয়ে থাকতেন, তাই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল এসব করা। এযুগে ঠাকুর এক নবীন ভাবে নতুন রূপে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, নতুন শক্তি নিয়ে, নতুন প্রেরণা নিয়ে। যদি একটুখানিও তাঁর ভাব গ্রহণ করতে পারি ধন্য হয়ে যাব আমরা।*

---

* ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে প্রদত্ত ভাষণ।

সমন্বয়চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ

মমতা রায়

॥ ১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। এই 'চৈতন্য' কথাটি তিনি অত্যন্ত গভীর অর্থে ব্যবহার করেছেন। এক কথায় 'চৈতন্য' বলতে তিনি বোঝাতেন ঈশ্বরদর্শনোদ্ভূত এক অখণ্ড বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতার উপলব্ধি। সকলের অন্তর্নিহিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দর্শনকেই তিনি চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরদর্শন বলতেন। এই দর্শন চর্মচক্ষুর দ্বারা হতে পারে, আবার হতে পারে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে। প্রাণাধিক ব্যাকুলতা, বালকসুলভ সরলতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকলে যে ঈশ্বরকে চর্মচক্ষেও দেখা যায় একথা ঠাকুর তাঁর নিজের জীবনে প্রমাণ করেছিলেন। এইরূপ দর্শনের জন্য যে কিরূপ প্রাণপাতকরা ব্যাকুলতার প্রয়োজন হয়, তার বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তাঁর প্রথম দর্শনলাভের বিবরণপ্রসঙ্গে দিয়েছেনঃ "মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে। মা-র দেখা বোধহয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে এ-জীবনে আর আবশ্যক নাই। মা-র ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময় সহসা মা-র অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। ··· ঘরদ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি এক অসীম অনন্ত চেতনজ্যোতিঃ-সমুদ্র!"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্যঃ "এই রূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতনজ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি? —ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়; কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা' 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"[২] বরাভয়করা চিন্ময়ী-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেনঃ "দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকার সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।"[৩] অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে, ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই, এই দুই-এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই; এই দুই-এর **সমন্বয়েই** তিনি। আবার তার অতিরিক্তও তিনি।

সংঘর্ষ নয়—সহযোগিতা, সংহার নয়—সহমর্মিতা, মতবিরোধ নয়—সমন্বয় ও শান্তি—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন। কারো ভাব নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তিনি বলতেন, যাঁর যেমন ভাব তিনি তেমন ভাবেই ঈশ্বরকে দেখবেন। যিনি জ্ঞানের চর্চায় মগ্ন, তাঁর জ্ঞানই হবে তাঁর ঈশ্বরোপচার। ভক্ত যিনি তাঁর ভক্তির আন্তরিকতার রঙে ঈশ্বর রঞ্জিত হবেনই, কর্মী যিনি নিষ্কাম কর্মই হবে তাঁর ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথ। যে ভাবেই হোক, যে পথেই হোক, আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে লক্ষ্য, ধর্মসকল পথমাত্র।

যিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী তিনি তো সাকার নিরাকার, এক এবং বহু দুইই হতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, তখন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে-বরফ গলে যায়।"[৪] যিনি এক তিনি যদি বহুরূপে প্রকাশিত হন তাহলে শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানে যে বিরোধ, সে-বিরোধের অবকাশ কোথায়? এঁরা সকলেই তো একই জায়গার

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, (উদ্বোধন কার্যালয়, (১৩৫৮), সাধক ভাব, পৃঃ ১১০-১১১

[২] ঐ, পৃঃ ১১১

[৩] ঐ, পৃঃ ১১২

[৪] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১৫।২

পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন, যদিও যাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হচ্ছে—কেউ বলছেন ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ কৃষ্ণ, কেউ শিব, আবার কেউবা বলছেন ঈশ্বর অথবা আল্লা অথবা গড্‌। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে কলসী করে—বলছে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে চামড়ার ডোলে করে—তারা বলছে 'পানি'। খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে, তারা বলছে 'ওয়াটার'। যদি কেউ বলে, না, এ-জিনিসটা জল নয় পানি, কি পানি নয় ওয়াটার, কি ওয়াটার নয় জল, তাহলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি; এসব ভাল নয়।"[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব হল, ধর্মসমন্বয়ের এই যে পথ তিনি বিশ্বকে দেখিয়েছেন তা প্রচার করার আগে তিনি নিজ জীবনে তা মূর্ত করে তুলেছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান, কিন্তু সাধন করেছেন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধন পন্থায়। আবার সাধন করে প্রকৃত মুসলমানের মতো আল্লার ভজনা করেছেন উপলব্ধি করেছেন আল্লাকে। উপলব্ধি করেছেন খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টকে যথার্থ খ্রীষ্টানের মতো ভক্তিতে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা শ্রীম-র ভাষায়, "ঠাকুর সর্বধর্মসমন্বয়ার্থ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদির ভাব সাধন করিয়া অপরদিকে, আল্লামন্ত্র জপ ও যীশুখ্রীষ্টের চিন্তা করিয়াছিলেন, যে ঘরে ঠাকুর থাকিতেন সেখানে ঠাকুরদের ছবি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি ছিল। যীশু জলমগ্ন পিতরকে উদ্ধার করিতেছেন, এ ছবিও ছিল।"[৬] পৃথিবীর আর কোন সিদ্ধপুরুষ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়-অনুসৃত ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিত সাধনপথের এরূপ সমন্বয় দেখাতে পারেননি যা মানবসমাজকে ন্যায়নীতি ও পবিত্রতার নতুন পথে পরিচালিত করতে পারে। আর এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মহত্তম তাৎপর্য।

মানবজীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরোপলব্ধি। যে-ধর্মের পথে সেই উপলব্ধি আসুক তা গ্রহণীয়, সমান শ্রদ্ধেয়। আর তাই যদি হয় তাহলে ধর্মে ধর্মে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে এত যে বিরোধ, যার ফলে বিশ্বে এত অশান্তি, এত বিবাদ ও রক্তপাত তার তো কোন অবকাশ নেই। ধর্মকে করে তুলতে হবে এই উপলব্ধির বাহন, আর ধর্মভিত্তিক এই উপলব্ধিটি প্রসারিত করতে হবে জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত এই ভাবটির বৃহত্তর তাৎপর্য অনুধাবন করার মধ্যে নিহিত রয়েছে সুসংহত সমাজগঠনের বীজ এবং বিশ্বশান্তি, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের চাবিকাঠি। এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ভারততত্ত্ববিদ্‌ অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশমের নিম্নোক্ত মন্তব্যটিঃ "সাম্প্রতিক কালে··· সমগ্র পৃথিবীতে সঞ্চারিত হয়েছে পারমাণবিক যুদ্ধের ত্রাস, এরই পল্লবিত সূত্র ধরে সর্বত্র মানুষ-মানুষীরা আজ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্ত্রস্ত এবং শঙ্কিত। সম্ভবতঃ আজ মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর এবং ধর্মবোধ এখন তাদের আগের চেয়ে অনেক কম। পৃথিবীর নানাপ্রান্তে আজ মুসলমান ও ইহুদী, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক তিক্ততা হিংস্রতার রূপ নিচ্ছে। [শুধু তাই নয়,] পৃথিবীর অনেক দেশ ধর্মকে বাদ দিয়ে চলার কথা সগর্বে ঘোষণা করছে, অনেকে আবার ধর্মকে প্রাচীনকালের অর্থহীন প্রতীকরূপে চিহ্নিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে আজ পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন আগের চেয়েও বেশি··· একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষাই পারে আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।"[৭]

॥ ২ ॥

সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের। জগৎ-মিথ্যা, সংসার মিথ্যা একথা তিনি বলেননি। মহাচৈতন্য-স্বরূপের প্রকাশ হিসাবে এ-জগতও সমান সত্য—একথা বোঝাতে গিয়ে তিনি যেসব উপমা

---

[৫] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১।১৩

[৬] ঐ, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা

[৭] উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৯২, পৃঃ ১৫৯

ব্যবহার করেছেন তা অতুলনীয় বলে পূর্ণ উদ্ধৃতির দাবি রাখে ঃ “যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ ‘নেতি নেতি’ করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন—ঈশ্বর মায়াজীবজগৎ। তখন বোধ হয় জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে, বেলটা ওজনে কত ছিল দেখতো, তুমি কি খোলা বীচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না, ওজন করতে হলে খোলা বীচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এতো ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগতকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে, বিচার করার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্তাতে শাঁস সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

“অনুলোম বিলোম, ঘোলের মাখন, মাখনেরই ঘোল, যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখন হয়েছে, যদি মাখন হয়ে থাকে তাহলে ঘোলও হয়েছে, আত্মা যদি থাকেন তো অনাত্মাও আছে।

“যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা (Phenomenal world), যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য (Absolute); যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভালমন্দ, শুচি, অশুচি সমস্ত।”৮

“...তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই, মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না, তাহলে যে ওজনে কম পড়বে।”৯

এই জগৎ সংসার মিথ্যা নয় একথা জানাই কিন্তু মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাকে বুঝতে হবে যে, মানবজীবনের লক্ষ্য অবিদ্যা থেকে বিদ্যার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে, জীবাত্মা থেকে পরমাত্মার অর্থাৎ ‘ক্ষুদ্র আমি’ থেকে ‘মহা আমি’র বিশ্বচৈতন্যে উত্তরণ। ভাব থেকে মহাভাবে উত্তরণের পথে সব থেকে বড় বাধা ক্ষুদ্র আমিত্ব, অহংবোধ। মায়ার এই গণ্ডিবদ্ধতা মানুষকে ঘোচাতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় “বেদান্ত মতে স্ব-স্বরূপকে চিনতে হয়। কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠির স্বরূপ—যেন জলকে দুভাগ কচ্ছে, আমি আলাদা, তুমি আলাদা।”১০ এই আলাদা ভাব থেকেই যত অভাব, যত বিভেদ, অজ্ঞানতা-প্রসূত এই ‘আলাদা’ ভাব এবং তজ্জনিত সমস্ত রকমের অভাব। ঈশ্বরকে জানাই হচ্ছে আসল জ্ঞান, সেই জ্ঞান যাঁর হয়েছে, তিনি জানেন অদ্বৈত সেই ঈশ্বরের প্রকাশ হিসাবে সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরত্ব এবং সেই ঈশ্বরের অধিকারী হিসাবে সকল মানুষ পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। শুধু আত্মীয়তা নয়, মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সাম্যের বন্ধনেও আবদ্ধ। অর্থাৎ মানবাত্মায় অদ্বৈতের প্রকাশ আত্মীয়তায় (kinship), ঐক্যে (unity) এবং সাম্যে (equality)। এই উপলব্ধি আনবে মানুষে মানুষে হানাহানি, বিবাদ-বিসংবাদ ও পারস্পারিক সব বিরোধের অবসান। আনবে মানব-সমন্বয় (Harmony of humanity) এবং পূর্ণবিকশিত মনুষ্যসমাজ।

অদ্বৈতের উপলব্ধির জন্য সাধারণ সামাজিক মানুষের সংসার ত্যাগ করা অপরিহার্য নয়। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিজন সকলকে নিয়ে সে থাকবে। সংসারের সকল কর্ম করবে, কিন্তু মনটিকে ফেলে রাখবে ঈশ্বরের পদতলে পরম নির্লিপ্ততায় ও অনাসক্তিতে। ঠাকুরের কথায়, “মনটি দুধের মতো। সেই মনকে যদি সংসার-জলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন ক'রে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন তোলা হল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সেই মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার-জলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।”১১ ঠাকুর আরও বলেছেন, “জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।”১২ ‘আমি’ ত্যাগ না করলে মনকে নিরাসক্ত ও ঈশ্বরমুখী করা যায় না, কিন্তু আমি

---

[৮] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৯।২

[৯] ঐ, ১।১০।৬

[১০] ঐ, ৪।১০।৪

[১১] ঐ, ১।৮।২

[১২] ঐ, ১।১১।৭

ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না'—ঠাকুরকে বললেন কেশবচন্দ্র সেন। ঠাকুর জবাব দিলেন, "কেশব,—তোমাকে আমি সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্তা', 'আমার স্ত্রী-পুত্র', 'আমি গুরু' এসব অভিমান 'কাঁচা আমি'—এইটি ত্যাগ কর। এইটি ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে থাক, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।"[১৩] 'আমি' বলে সত্যিকারের যে কিছু নেই সেটা বোঝাবার জন্য ঠাকুর বললেন, "আমি কে? ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোন জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোন্‌টা 'আমি'? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে। শেষে যা থাকে তাই আত্মা, চৈতন্য। আমার 'আমিত্ব' দূর হলে ভগবান দেখা দেন।"[১৪]

মহাদ্রষ্টা রামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন আত্মাভিমানই (egoism) আজকের পৃথিবীতে সবথেকে বড় সমস্যা। ব্যক্তি-মানুষের (individual) ক্ষেত্রে তা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য একটি জাতির (nation) ক্ষেত্রেও। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে আত্মাভিমান দূর করাই আজকের তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী ও বিপথগামী মানবতাকে রক্ষার উপায় সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥

অত্যুচ্চ আদর্শবাদ বা নীতিবাদ শ্রীরামকৃষ্ণকে বিচ্যুত করতে পারেনি তাঁর বাস্তববোধ থেকে। এই দুইয়ের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় করার পরামর্শ তিনি সংসারী মানুষকে দিয়েছেন। 'অহিংসা পরম ধর্ম' একথা তিনি মানতেন। কিন্তু অনিষ্টকারীকে হিংসা থেকে বিরত করার জন্য 'ফোঁস করার' প্রয়োজনীয়তা যে বাস্তবে থাকতে পারে—একথা তিনি অস্বীকার করেননি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য তাঁর বহুকথিত সাপ ও ব্রহ্মচারীর গল্পটি। ব্রহ্মচারী সাপকে অহিংস হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এদিকে রাখাল বালকেরা যখন দেখল সাপটি তাদের আর কামড়াতে আসে না তখন তারা তাকে নিপীড়ন করে তাকে মৃতপ্রায় করে ফেলল। এক বছর পরে ব্রহ্মচারী সে পথে এসে সাপটির খবর নিয়ে তাকে হীনবল দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "ঠাকুর মনে পড়েছে বটে, রাখালরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাউকেও কামড়াব না, বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, কেমন করে জানবে?" ব্রহ্মচারী বললেন, "ছি, তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে পারিস না? আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন? দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে; তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই।"[১৫] শ্রীরামকৃষ্ণের এই গল্পটি প্রসঙ্গে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁর রামকৃষ্ণজীবনীতে যে মন্তব্য করেছেন তা অবশ্য উল্লেখনীয়: "সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, রামকৃষ্ণ গান্ধীজীর মতোই কার্যে ও বাক্যে অহিংসাপন্থী ছিলেন। তিনি কেবল মানুষের সম্বন্ধে নহে, সমস্ত জীবের সম্বন্ধেই অহিংসার বাণী বিশেষভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

"কিন্তু রামকৃষ্ণ গান্ধীর অপেক্ষা অধিক রসিক। গান্ধীজীর অপেক্ষা তাঁহার প্রতিভাও ছিল অধিক সর্বতোমুখী। রামকৃষ্ণ কখনো কোন নিয়ম বাঁধিয়া দিতে চাহিতেন না; তিনি এক নিমেষেই যে-কোন বস্তুর উভয় দিক দেখিয়া লইতেন। ফলে, এই 'মায়ার' জগতে এই পরমাত্মার আকুল প্রেমিকটি সকল প্রশ্ন সমাধানের একটি সুচারু বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি মার মতোই শূন্যগর্ভে আত্মার ঘুড়িগুলিকে ছুঁড়িয়া দিলেও ঠিক সময় না হইলে তিনি সর্বদাই সেগুলিকে সহজ বুদ্ধির সুতা ধরিয়া মাটিতে টানিয়া নামাইতেন। তাহারা যাহাতে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতেই রাখিতেন।[১৬]

---

[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৬।২

[১৪] রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী—ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলার, (অনুবাদ: রঞ্জিত সিংহ,) গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃঃ ১৩৬

[১৫] শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৯।৬

[১৬] রামকৃষ্ণ-জীবন, রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদ: ঋষি দাস (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৪৯), পৃঃ ১৮৫-১৮৬

৪

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের আর একটি মহান দিক হচ্ছে অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে মানবসেবার সমন্বয়। নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে যে কঠোর তিরস্কার করেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করতে পারি। তারই ফলশ্রুতি স্বামীজীর ঘোষণাঃ শুধু অধ্যাত্মসাধনা নয়, সন্ন্যাসীর মুক্তি আসবে মানবসেবায় আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে, মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে, দেশের ও দশের সেবাকর্মের মাধ্যমে। দয়া নয়, নিঃস্বার্থ সেবা, দীনদরিদ্র, দুঃখী, দলিত, নিপীড়িত সকল মানুষকে 'শিবজ্ঞানে' সেবার কাজই হবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের কাজ যা মানুষের মধ্যে আনবে চেতনা এবং মহাচৈতন্যে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়ঃ "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই (ideal) ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত এবং স্বামীজী-কথিত এই দায়িত্বেরই সার্থক উত্তরসাধক আজকের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

অপরোক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলছেনঃ "মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন, ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এসব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।"[১৮] এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যে সামগ্রিক প্রয়োগ তিনি করেছিলেন তার মর্মকথা হচ্ছে—সমন্বয়। বিরামহীনভাবে তিনি বলে গেছেনঃ "দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। ...মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল। কেননা, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না করলে তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। কবীর বলতো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।'

"হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাহিছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়িতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া করে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারও জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।

"আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সবরকম খেতে ভালবাসি।"[১৯]

সমন্বয়ের সার্থকতম রূপকার যিনি সেই শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথায় এই প্রবন্ধের উপসংহার টেনে বলিঃ "সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে। ...যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক।"[২০]

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত এই সমন্বয়ের পথ যদি আমরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করি তবে তাই হবে আমাদের দেশ ও জাতি গঠনের, আমাদের জাতীয় সংহতি-সাধনার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

---

[১৭] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃঃ ৫৪

[১৮] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২১।১

[১৯] ঐ, ২।১৫।১

[২০] ঐ, ৪।১৫।১

শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে হাস্যগীতি

নির্মলকুমার রায়

লৌকিক জগতে সাধারণ হয়েও যিনি অসাধারণ, সামান্য হয়েও যিনি অসামান্য, গৃহী হয়েও যিনি সন্ন্যাসী, মানব হয়েও যিনি দেবতা,—সেই আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশক্তিমান আনন্দব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে যেমন অনির্বচনীয় কালাতীত দিব্যসঙ্গীত ধ্বনিত হতো, তেমন সেই একই রসব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে মাঝে মাঝে কৌতুক বা হাস্যগীতিরও আবির্ভাব হতো। বৈচিত্র্য-বিলাসী শ্রীরামকৃষ্ণ মা-ভবতারিণীর কাছে যেমন শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন, তেমনি আবার শুকনো সন্ন্যাসীর বদলে রসে-বশে রাখার জন্যও মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাই তাঁর লীলার অন্ত্যভাগেও রস-বৈচিত্র্যের ধারাটিকে তিনি বজায় রেখেছিলেন। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠান করেও তিনি কেমন সহজে অবতরণ করতেন লৌকিক আনন্দধারায় জীবজগতের একেবারে সমতল ভূমিতে, তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। তিনি যেমন মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় শুভাগমন করেছেন, তেমনই আবার সার্কাসে বা রঙ্গালয়েও ফিরেছেন রসের সন্ধানে।

রসিকপ্রবর শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে রঙ্গরসের যেসব গীতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তা আমাদের পক্ষেও আনন্দসহকারে উপভোগের বস্তু। তবে, তৎকালীন হাস্যগীতিতে অনেক সময় যে-রকম অমার্জিত গ্রাম্য-ভাষা ব্যবহৃত হতো, সেই যুগে ঐ ভাষা ব্যবহারে কেউ আপত্তি করতেন না, বা দোষ ধরতেন না—যা বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে অশ্লীল বা শ্রুতিকটু বলে মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু হাস্যগীতির ভাষাগুলি লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যেই নিছক আনন্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হতো এবং সেগুলি অশালীন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হতো না। এই সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের একটি মূল্যবান উক্তি স্মরণ করা যেতে পারেঃ "দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে আছে, দিবসত্রয় মহামায়ার আরাধনায় সাধকের মন মধুময় হওয়ায় নবমীর কর্দম-ক্রীড়ায় অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ দোষাবহ নয়। তথাপি আমার মতো অন্তরের কুরুচির পুটলী পুরিয়া সুরুচিপ্রকাশক যদি কোন নব্য সভ্য বলেন ইহা দূষ্য, তাহাতে বলা যাইতে পারে, ইহা লোকোত্তরপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কিছু বলিবার পূর্বে যদি আমরা শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করি, তাহলে সকল গোলই মিটিয়া যায়। শাস্ত্র বলেন,—ভগবদ্দর্শন ফলে যাঁহার চিত্ত অসন্দিগ্ধ, ভেদভাব বিনষ্ট ও পাপপুণ্য-বিশীর্ণ, সেই সুদুর্লভ মহাপুরুষ জাগতীয় বিধি-নিষেধের পার।"[১]

প্রকৃতপক্ষে, ঠাকুরের হাস্যগীতি ছিল নিছকই আনন্দগীতি এবং ঠাকুর কেবলমাত্র অপরকে আনন্দ-দানের জন্যই যে হাস্যরসের অবতারণা করতেন, তা নয়; তাঁর নিজের জন্যও মাঝে মাঝে এমন হাল্কা-ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন হতো। কারণ, ঠাকুর বলতেনঃ "সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—কিন্তু 'নি'-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না; আবার নিচের গ্রামে নামতে হয়।"[২] অর্থাৎ সঙ্গীতজগতে যেমন উচ্চগ্রামের 'নি'-তে গায়কের পক্ষে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হয় না এবং পুনরায় নিচুস্বরে নামতে হয়, তেমনই সাধকের পক্ষেও পরমব্রহ্মে সব সময় অবস্থান না করে জীবজগতেও মনকে নামিয়ে আনার প্রয়োজন হয়। সে প্রয়োজন লোককল্যাণের জন্যই। উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিধর শ্রীরামকৃষ্ণের এই হাস্যরসও ছিল তাঁর উচ্চগ্রামে স্থিত মনকে ভাবজগৎ থেকে জীবজগতে যুক্ত রাখার জন্য। এবং অবশ্যই এটির প্রয়োজন ছিল।

হাস্যময় সারল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে হাস্যগীতি পরিবেশনের কয়েকটি তথ্য উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯০, পৃঃ ১০৫-১০৬

[২] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।৯।৩

একদা দক্ষিণেশ্বরে রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের উপস্থিতিতেই তাঁর জন্মোৎসব পালনের দিনের একটি ঘটনা ভক্তপ্রবর বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল বর্ণনা করেছেন ঃ "বেলা প্রায় দুইটা, এইবার পঙ্‌ক্তিভোজের উদ্যোগ। চিড়া, দধি ও চিনি পরিবেশন হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর বালকের মতো বলিলেন, 'রামের কি ছোট নজর, আমার জন্মোৎসবে কিনা চিড়ের ব্যবস্থা করল।' ভদ্রসন্তান ভক্তগণের পক্ষে শীতের দিনে চিড়া-দধির ফলার সুখজনক নহে ভাবিয়া তাহাদিগকে আনন্দ-ভোজন করাইবার অভিলাষে সানন্দে গীতি ধরিলেন—'মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি শোভনম্'। (দুঃখের বিষয় গানের অবশিষ্ট অংশ স্মরণ নাই)। রঙ্গরসে গীতটি জমাইবার জন্য যখন 'আরে' 'আরে' বলিয়া আখর দিতেছেন, এমন সময় কোন এক ভক্ত 'হরি' 'হরি' বলায় রসভঙ্গ হইলে সহাস্যে কহেন—'শালা এমন অরসিক যে, রসগোল্লা না বলে হরি হরি বললে।' এমন সময় একজনকে দধি পরিবেশন করিতে দেখিয়া, উল্লাসে হাত তুলিয়া গাহিতে লাগিলেন—

'দে দৈ, দে দৈ, আমার পাতে,
ওরে ব্যাটা হাঁড়িহাতে।
ওরা কি তোর বাবার খুড়ো,
(তাই) ওদের পাতে ঢালছিস হাঁড়ি হাঁড়ি ॥'

অরসিক ভক্ত রসজ্ঞানলাভে 'রসগোল্লা' 'রসগোল্লা' বলিয়া জয় দিলে, একটা হাস্যরোল সমুত্থিত হইল। ব্রাহ্মণসন্তান—অনেক স্থানে বিবিধ মিষ্টান্ন-সমন্বিত নিমন্ত্রণ খাইয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে এরূপ আনন্দ-ভোজন কোথাও ভাগ্যে ঘটে নাই।"[৩]

অন্তিমকালেও ভক্তসঙ্গে কৌতুকপ্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের একটি বর্ণনায় আছে ঃ "আনন্দই ব্রহ্ম। কেবল যে ঈশ্বর-আরাধনায় উহা লাভ করিতে হইবে, এমত নহে। পরপীড়ন ও আত্মবঞ্চন পরিহারে সদাচারী হইয়া ক্রীড়াকৌতুক এবং রহস্য দ্বারাও ভক্তচিত্তে যাহাতে আনন্দের উদয় হয়, সেজন্য ঠাকুর তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন—গোমড়া (বিমর্ষ) মুখ আমি দেখিতে পারি না ; তাই বুঝি স্নেহের আবাহন। কারণ না বুঝিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে উপস্থিত হইলে আনন্দকন্দ প্রভু আনন্দ বিতরণ-মানসে লাটুর কোষ-বৃদ্ধি দেখিয়া হোলং, কিবা দোলং, 'তারে না দুলালে আপনি দোল' বলিয়া নানারূপ রঙ্গরসের আখর সঙ্গে এমন কীর্তন আরম্ভ করিলেন, যাহাতে আমরা সকলেই হাস্যরসে অভিভূত হইলাম। এমন তো কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই যে, রোগ-যাতনা উপেক্ষা করিয়া কে কোথায় আশ্রিতগণকে পরিতুষ্ট রাখিতে সদাই ব্যস্ত। অথবা আমাদের চক্ষে রোগ-ভেল্কি লাগাইয়া যেন অপর কাহারও পীড়ার সমবেদনায় রোগীর ন্যায় আচরণ ; অন্তরে কিন্তু পূর্ণ আনন্দ। এরূপ ভাব কেবল প্রভুতেই সম্ভব।"[৪]

নানা রঙ্গরসের গানের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুক-গীতি সম্পর্কে ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বা মন্তব্য করেছিলেন, সে-সম্পর্কে সান্যাল মহাশয় বলেন ঃ "ঠাকুর একদিন ভাবভরে বলেন—মা বেদবেদান্তের ক, খ, আর খেউর খিস্তির ক, খ, কি আলাদা, তুমি তো পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী। তাই একদিন গিরিশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মা-কালীর সম্মুখে 'লক্ষ্মী, সরস্বতী—যারা পটল ভেজে হ'ল সারা' ইত্যাদি এমন খেউড় গান করেন, শুনে গিরিশবাবু বলেন যে, আমি খেউড় গানে বিখ্যাত, তা এ খেউড়েতেও আপনি আমার গুরু।"[৫]

এছাড়া, সান্যাল মহাশয় ঠাকুরের কণ্ঠে পরিবেশিত কতকগুলি রঙ্গরসের গানের উল্লেখ করেছেন।[৬]

'কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি।
দোনো ছোক্‌রা বি সাৎ, দোনো ছুক্‌রি বি সাৎ
আর এক বেটা জুলপি কাটা, বাঘটা কামড়ে নেচে
টুঁটি ॥'…ইত্যাদি।

'একবার নেমে দাঁড়া শ্যামা,
ভাঙল বুড়োর পাঁজর-কটি।
শিব মলে অনাথ হবে
কার্তিক গণেশ ছেলে দুটি ॥'…ইত্যাদি।

'আই মা কি লাজের কথা মিন্‌সের ওপর মাগী।
বেটীর পদতলে পড়ে ভোলা, অপরূপ এক
যোগী ॥'…ইতাদি।

---

[৩] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৬৮

[৪] ঐ, পৃঃ ১১১

[৫] ঐ, পৃঃ ১০৫

[৬] ঐ, পৃঃ ১০১

কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তও ঠাকুরের হাস্যগীতির কথা উল্লেখ করে তাঁর নানাপ্রকার ভঙ্গিমায় ভক্তদের হাস্যরসে ডুবিয়ে দেওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি এইরূপ ঃ

“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনী সেজেগুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্তনী দাঁড়াইয়া, হাতে রঙীন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে, ‘আসুন।’ আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

অভিনয়দৃষ্টে ভক্তেরা সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।”[৭]

ভক্ত মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে মাষ্টার মহাশয়ের একটি বর্ণনায় আছে ঃ—

“কেশবাদি ভক্তগণ প্রাঙ্গণে বসিয়া খাইতেছেন। ঠাকুর নিচে আসিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনন্দের জন্য লুচিমণ্ডার গান গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন।”[৮]

ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুরের গাওয়া রঙ্গগীতি সম্পর্কে মাষ্টার মহাশয় বর্ণনা করেছেন ঃ

“ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়ে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের কন্যা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল; তাহার বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও দু-একটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে।…ঠাকুর মেয়েটিকে গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল—‘মাইরি, গান জানি না।’ তাহাকে আবার অনুরোধ করাতে, বলিতেছে,—‘মাইরি বল্লে আর বলা হয়?’ ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন। প্রথমে কেলুয়ার গান, তারপর—

‘আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি;
তোর ভাতার এলে বলবে কি।”
(ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শুনিয়া হাসিতেছেন)।”[৯]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য বর্ণিত এমন একটি মজার ঘটনার কথা জানা যায়, যা নাকি সব কৌতুকগীতিকে অতিক্রম করেছিল। ঘটনাটি ঘটে ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি জয়রামবাটীতে। ঘটনাটি এইরূপ ঃ—

“কামারপুকুরের ভক্তমানুষেরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিল ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে, সেইরূপেই তাঁহাকে পাইয়াছিল। জয়রামবাটীর বিষয়ী লোকেরা দেখিল ক্ষেপা জামাইরূপে,—ক্ষেপা জামাইরূপেই তাঁহাকে লাভ করিল।… (জয়রামবাটীর) মুখুজ্যেদের ছোট বাড়িখানির উঠানের একপাশে একটি সজিনার গাছ ছিল ও সেই গাছের ডালগুলি তখন ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সজিনা গাছের তলায় পা মেলিয়া বসিয়া ক্ষেপা জামাই গান ধরিলেন ঃ

‘যার নাকেতে নাক ফুল, দু-হাত মাপা চুল,
তার সঙ্গে পাতাব আমি সজনা ফুল।
বড় সাধ আছে মনে—
সজনা ফুল পাতাব শাউড়ী তোর সনে ॥’

শাশুড়ী শুনিতে পাইয়া বলিলেন, ‘ছি ছি আমি শাশুড়ী।’ ‘শাশুড়ী কি…লেখা আছে?’—ক্ষেপা জামাই উত্তর দিলেন। শাশুড়ী ছুটিয়া পলাইলেন কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া।”[১০]

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হাস্যগীতি ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অনেক কৌতুকাবহ ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি আমাদের নিরানন্দ জীবনকে আকর্ষণ করে আনন্দময় স্বসত্তাবোধের প্রতিষ্ঠায়।

---

[৭] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১২।২

[৮] ঐ, ৫।পরি-৯।২

[৯] ঐ, ৪।১৫।২

[১০] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস প্রকাশন, ১৩৮৯, পৃঃ ১০০-১০১

কবিতা

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তিঃ

দুর্গাদাস গোস্বামী

স্পর্শাদেব সুধায়িতা হি বসুধা যৎপূতপাদাব্জয়ো-
র্য-ন্নামস্মরণাৎ প্রয়াতি চ ভবব্যাধিঃ সমাধিং ধ্রুবম্ ।
যস্যাশীর্বচসা নৃণাং ফলতি চ প্রাঙ্ মুক্তি-মুক্তাফলং
বাঞ্ছাকল্পতরুং নমামি তমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভুম্ ॥ ১

যঃ কামারপুকুরাভিধে সুনিভৃতে গ্রামে দ্বিজস্যান্বয়ে
নিঃসম্পৎ 'ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণি'তো বঙ্গেষ্ববাপজনুঃ ।
হুগলীমণ্ডলবর্তিনি প্রতিদিনং শুক্লেন্দুবদ্ বর্ধিতঃ
কৈশোরং স গদাধরোঽনয়দিহ ক্রীড়ন্ পঠংশ্চ
ক্রমাৎ ॥ ২

তস্যাভূৎ সময়ে যদোপনয়নং স্নেহাৎ স্বপিত্রো-স্তদা
লোকাচারবিধিং স্বশাস্ত্রবিধিমপ্যুৎসৃজ্য তেজোবলাৎ ।
ভিক্ষান্নাদিকমগ্রহীৎ প্রথমতঃ স্বং কর্মকারস্ত্রিয়া-
ধাত্রীমাতুরসৌ করাৎ সমদৃশা বশ্যোঽপি
পিত্রোঃ সদা ॥ ৩

উড্ডীনাং গগনেঽস্থিরাং সিতবকশ্রেণীং নিরীক্ষ্য ক্ষণাদ্
গচ্ছন্ গ্রাম্যপথে কদাচিদপাতৎ সম্মূর্ছিতো ভূতলে ।
ভাবাবেশবশাৎ সমাধিমিহ সঃ স্বং সূচয়নং ভাবিনং
গ্রামস্থৈঃ প্রতিবেশিভিঃ সহৃদয়ৈর্নীতশ্চ
পশ্চাদ্গৃহম্ ॥ ৪

মাত্রাদেশবচো নিশম্য চ শিরোধার্যঞ্চ কৃত্বাদরা-
দাদর্শং গৃহিধর্মপালনবিধেঃ স্মৃত্বা নবে যৌবনে ।
শ্রেয়োঽর্থী জয়রামবাট্যভিহিতে গ্রামে সবর্ণাং শুভাং
সৎকন্যামপি সারদামণিমসৌ তাং পর্যণৈষীদ্বশী ॥ ৫

গঙ্গারোধসি দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালিকামন্দিরং
রাজ্ঞীরাসমণিপ্রতিষ্ঠিতমভূৎ কালে প্রশস্তে স্থলে ।
তত্রাস্তে ভবতারিণীতি বিদিতা কালী চ বিষ্ণোর্গৃহং
কিঞ্চ দ্বাদশশম্ভুমন্দিরকুলং সংস্থাপিতে তিষ্ঠতঃ ॥ ৬

আগচ্ছৎ কিল দক্ষিণেশ্বরপুরে তৎ কালিকামন্দিরং
সার্ধং রামকুমারনামকনিজজ্যেষ্ঠাগ্রজেন স্বয়ম্ ।
পশ্চাৎ পঞ্চবটীতলে চ সুচিরং শ্রীকালিকা-সাধনং
কৃত্বা সিদ্ধিমগাৎ প্রসিদ্ধিমপি সঃ স্বেষ্টপ্রসাদাৎ
পরাম্ ॥ ৭

স্থিত্বা তন্ত্রপথে চরংশ্চ সুচিরং স ব্রাহ্মণীভৈরবী
নির্দেশাৎ কঠিনং তপঃ পরমগাৎ স্বাভীষ্টসিদ্ধিং
পরাম্ ।
বেদান্তোক্তমতে চরন্নপি তপ-'স্তোতাপুরী'-ব্রহ্মবিৎ-
সাধোঃ পদ্ধতিতঃ স্বসিদ্ধিমচিরাৎ স
জ্ঞানমার্গেঽপ্যগাৎ ॥ ৮

আত্মানং প্রকট্য সদ্‌গুরুরিতি প্রব্যাকুলোঽভূৎপরং
শুদ্ধাত্মা ভগবৎপ্রসঙ্গবিষয়ে সৎসঙ্গসঙ্গায় সঃ ।
শ্রীরাখাল-নরেন্দ্রমুখ্যযুবকা-স্তৎস্থানমেকৈকশঃ
শ্রেয়োঽর্থং সমুপেত্য তেন মিলিতাঃ শ্রীরামকৃষ্ণেণ চ ॥৯

শান্তং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমমলং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভুং
দ্রষ্টুং তস্য মুখাচ্চ ধর্ম-ভগবত্তত্ত্বানি শুশ্রূষবঃ ।
গৌরী-নারায়ণ-পদ্মলোচনপ্রভৃতয়ঃ শাস্ত্রজ্ঞ-সাধকা-
স্তত্রায়ন্নপি দেশমান্যকৃতিনো নানাগুণিজ্ঞানিনঃ ॥ ১০

যোগ-জ্ঞানপথৌ কলৌ সুকঠিনৌ মত্বা মুদোপাদিশৎ
পথ্যং ভক্তিপথং স নারদমতং ভক্তাংস্তথান্যান্ সদা ।
শিষ্যান্ বিশ্বজনাংস্তথা ভুবি শিবজ্ঞানেন সেবাং পরাং
জীবানাং সমুপাদিশচ্চ শিবদাং স ব্রহ্ম-জীবৈক্যতঃ ॥১১

যঃ সার্ধং বলরাম-ঘোষগিরিশেত্যাদৈঃ স্বভক্তৈস্তথা
স্ত্রীভক্তৈরকরোচ্চিরং বহুবিধাং লীলাং মনোজ্ঞাং মুদা ।
লীলাসংবরণেঽকরো-ন্নিজমনঃ কর্মাবসানে স্বয়ং
লীলামানুষবিগ্রহঃ স ভগবান্ হা !
রামকৃষ্ণপ্রভুঃ ॥ ১২

আক্রান্তঃ স গলক্ষতেন গুরুণা স্থিত্বা চ নানাস্থলে
ভূত্বা কল্পতরু-স্তনুত্যজনতঃ প্রাগেব কাশীপুরে ।
আশীর্ভি-স্ত্বভিষিচ্য শিষ্যনিবহান্ ভক্তাংশ্চ লীলাবধৌ
ত্যক্ত্বা মর্ত্যতনুং জনাংশ্চ সশুচঃ স
ব্রহ্মলীনোঽভবৎ ॥ ১৩

স্থিত্বা মন্ত্রগুরো-মর্ত্যেঽখিলবিবেকানন্দমুখ্যাস্তত-
স্তপ্ত্বা কৃচ্ছ্রতপঃ স্বসিদ্ধিমগমন্ ভূত্বা চ সন্ন্যাসিনঃ ।
তচ্ছিষ্যাঃ প্রভুরামকৃষ্ণকথিতামধ্যাত্মবাণীং ক্ষিতৌ
সেবাধর্মমপিপ্রচার্য চ গুরোরাজ্ঞাং মুদাঽপালয়ন্ ॥১৪

ঊর্ধ্বং সিদ্ধগুরোঃ স্বধামগমনাৎ তস্য প্রভাবান্মহান্
বেলুড়াখ্যপদে মনোরমমঠঃ পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠাং গতঃ।
তচ্ছিষ্যাঃ পৃথুভারতেঽপিচ বহির্বিশ্বে ব্যতন্বন্ মুদা
নানাসুন্দরমন্দিরাশ্রমমঠানাদর্শ-ভাবানপি ॥ ১৫

ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাদিহংসবিদিতঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ পুরা
ভক্তেভ্যো ব্যতরৎ কথামৃতমহো! তত্রাগতেভ্যো হি যৎ।
তৎ সর্বং স্মৃতিতোঽলিখৎ স্বয়মহঃপঞ্জ্যাং ভুবঃ শ্রেয়সে
ভক্তোত্তংস 'মহেন্দ্রগুপ্ত' ইতি সঃ খ্যাতঃ সুধীঃ
প্রত্যহম্ ॥ ১৬

ভূত্বাপীহ গৃহী স্ত্রিয়াঞ্চ ভবনে সত্যাং যুবত্যামপি
ব্রহ্মজ্ঞঃ পুরুষোঽত্যজচ্চিরমহো! যঃ কামিনী-কাঞ্চনে।
অভ্যর্চ্য স্ববধূং তথা ভগবতীজ্ঞানাব্জপাক্ষস্রজ-
স্তৎপাদার্পণতঃ স্বনিবৃতিমগাদ্ বিশ্বেঽ-
দ্বিতীয়ো হি সঃ ॥ ১৭

নানাধর্মমতে বগাহ্য সুচিরং তপ্ত্বা তপঃ সোঽব্রবীদ্
যাবন্ত্যেব মতানি সন্তি ভুবনে তাবন্তি বর্ত্মানি চ।
ভেদে গম্য ইহৈক এব ভগবানিত্যৈক্যমালোক্য যো
নানাধর্মসমন্বয়াদ্বয়মহাচার্যোঽভবৎ কার্যতঃ ॥ ১৮

আস্যে হাস্যমহো! সদৈব ভগবল্লীলাপ্রসঙ্গোঽপি সা
ধর্মাখ্যানকথা তথা চ মনসি স্ত্রী-কাঞ্চনত্যাগিতা।
স্নেহঃ শিষ্যগণে স্বভক্ত-গুণিষু শ্রেয়োঽর্থিতার্তে কৃপা
তস্যাসন্নপি বিশ্বমানবরতিঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভোঃ ॥ ১৯

মূর্তা কিং নু পবিত্রতা সরলতা সর্বজ্ঞতা দীনতা
কিং ভূতেষ্বনুকম্পিতা নু ভগবৎসত্তাশ্রিতা তত্তনুম্।
ইত্যারূঢ়বিতর্কসংশয়পদাঃ সিদ্ধান্তপক্ষেঽক্ষমাঃ
স্তব্ধাঃ সান্দ্রগভীরবিস্ময়রসে মজ্জন্তি বিদ্বজ্জনাঃ ॥২০

(বঙ্গানুবাদ)

যাঁর পবিত্র পাদপদ্মদ্বয়ের স্পর্শমাত্রেই বসুধা সুধায় পরিণত হয়েছে, যাঁর নামস্মরণে ভবব্যাধি নিশ্চিতরূপে বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং যাঁর আশীর্বাদে লোকের দ্রুত মুক্তিরূপ মুক্তাফল ফলে, সেই বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ১

যিনি বঙ্গদেশে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর নামক সুনিভৃত গ্রামে, ব্রাহ্মণবংশে, সম্পদবিহীন ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির থেকে জন্মলাভ করেছিলেন, সেই গদাধর প্রত্যহ শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার মতো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে খেলা-ধুলো ও লেখাপড়া করে কৈশোর অতিবাহিত করেন ॥ ২

মাতাপিতার স্নেহবশতঃ সময়মতো যখন তাঁর উপনয়ন হয়েছিল, তখন তিনি তেজস্বিতাবলে লোকাচারের নিয়ম ও আপন শাস্ত্রীয়বিধান বিসর্জন দিয়ে, সর্বদা মাতাপিতার বাধ্য-অনুগত হওয়া সত্ত্বেও (সর্বভূতে) সমদৃষ্টিবশতঃ নিজের ভিক্ষান্ন প্রভৃতি প্রথমে ধাত্রীমাতা কর্মকারস্ত্রীর হাত থেকেই গ্রহণ করেছিলেন ॥ ৩

তিনি একদা গ্রাম্যপথে চলতে চলতে আকাশে উড়ন্ত চঞ্চল শুভ্র বলাকাপংক্তি দেখতে পেয়ে ভাবাবেশ-বশতঃ ক্ষণেকের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবী জীবনের সমাধি সূচিত করেছিলেন। পরে, তাঁর সহৃদয় গ্রামস্থ প্রতিবেশীরা তাঁকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন ॥ ৪

তিনি মাতার আদেশ শ্রবণ করে এবং সমাদর-পূর্বক তা শিরোধার্য করে, তৎসহ গৃহস্থদের গৃহধর্ম পালন বিধানের আদর্শ স্মরণ করে, নবীন যৌবনে শ্রেয়-কামী হয়ে জয়রামবাটী নামক গ্রামে সবর্ণা ও সুলক্ষণা সৎকন্যা সারদামণি দেবীকে সংযম-রক্ষাপূর্বক বিবাহ করেছিলেন ॥ ৫

রানী রাসমণি প্রশস্ত কালে ও প্রশস্ত স্থানে গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরপুরে শ্রীকালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মন্দিরে দেবী ভবতারিণী নামে সুপরিচিতা কালী বিরাজ করছেন। আর, সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে বিষ্ণুমন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির ॥ ৬

শোনা যায়, তিনি আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে সেই শ্রীশ্রীকালীমন্দিরে স্বয়ং এসেছিলেন। পরে, তিনি দীর্ঘকাল পঞ্চবটীতলায় কালীসাধনা করে স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রসাদে সিদ্ধি ও প্রসিদ্ধি—দুই-ই চরম লাভ করেছিলেন ॥ ৭

তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশক্রমে দীর্ঘদিন কঠিন তপস্যা অনুষ্ঠান করে শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট-সিদ্ধি লাভ করেন। এরপর, ব্রহ্মজ্ঞ সাধু তোতাপুরীজীর পদ্ধতিক্রমে বেদান্তোক্তমতে তপস্যা করে জ্ঞানমার্গেও অচিরকাল মধ্যেই আপন সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৮

গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করবার পর সেই শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ ভগবৎশিক্ষাবিষয়ে সাধুপ্রকৃতি সৎসঙ্গীদের সঙ্গলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তখন, রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ শ্রেয়োলাভের

জন্য একে একে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন ॥ ৯

শান্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্মল চরিত্র প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এবং তাঁর মুখ হতে ধর্মতত্ত্ব ও ভগবত-তত্ত্বসমূহ শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে গৌরী পণ্ডিত, নারায়ণ শাস্ত্রী, পদ্মলোচন প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞগণ ও সাধকগণ সেখানে আসতেন। আর আসতেন দেশের মান্য কৃতী পুরুষরা এবং নানা গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিরা ॥ ১০

কলিকালে যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ অত্যন্ত কঠিন মনে করে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) নারদপ্রোক্ত কল্যাণকর ভক্তিমার্গের বিষয়েই ভক্ত ও অন্যদের সানন্দে উপদেশ দিতেন। আর, আপন শিষ্যদের ও বিশ্ববাসীদের উদ্দেশ্যে শিবজ্ঞানে নিখিল জীবের সেবা, যা নাকি শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলপ্রদ, তাই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যহেতু সর্বদা উপদেশ দিতেন ॥ ১১

যিনি বলরাম (বসু) গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি পুরুষ ভক্তদের ও স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে সানন্দে সুদীর্ঘকাল নানাবিধ মনোরম লীলা করেছিলেন, হায়! আপন কর্মের সমাপ্তিতে লীলাবশতঃ মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু স্বয়ং লীলাসংবরণ করবার জন্য মনঃস্থির করেছিলেন ॥ ১২

তিনি ভীষণ গলক্ষতরোগে আক্রান্ত হয়ে নানাস্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং শেষে দেহত্যাগের পূর্বেই কল্পতরু হয়ে নিজ শিষ্যগণকে ও ভক্তবৃন্দকে আশীর্বাদের দ্বারা অভিষিক্ত করে স্বীয় লীলাবসানে আপন মর্ত্যদেহ ও শোকাতুর লোকজনদের ত্যাগ করে ব্রহ্মলীন হয়েছিলেন ॥ ১৩

মন্ত্রগুরুর মতে অবস্থান করে বিবেকানন্দপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যগণ কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। পরে, তাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণকথিত অধ্যাত্মবাণী ও সেবাধর্ম প্রচার করে গুরুর আদেশ সানন্দে পালন করেছিলেন ॥ ১৪

সিদ্ধগুরুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) স্বধাম গমনের পরে তাঁর প্রভাববশতঃ 'বেলুড়' নামক স্থানে বিশাল ও মনোরম মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর শিষ্যগণ বিশাল ভারতবর্ষে এবং ভারতের বহিঃস্থিত বিশ্বেও সানন্দে বহুসংখ্যক সুন্দর মন্দির, আশ্রম ও মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাব ও আদর্শসমূহ প্রচার করেছিলেন ॥ ১৫

ব্রহ্মজ্ঞ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বে তাঁর সমীপে আগত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে যে কথামৃত বিতরণ করতেন, সেইসব জগতের মঙ্গলের জন্য নিজের স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে প্রতিদিন আপন দিনপঞ্জীতে স্বয়ং লিখে রাখতেন ভক্তচূড়ামণি মহেন্দ্র গুপ্ত নামে বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ॥ ১৬

নিজে গৃহী হলেও এবং নিজগৃহে যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, যে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ চিরকালের জন্য কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করেছিলেন এবং যিনি নিজের স্ত্রীকে ভগবতীজ্ঞানে পূজা করে, তাঁর চরণে নিজের জপমাল্য সমর্পণ করে আপন শান্তি লাভ করেছিলেন, তিনি এই বিশ্বে অদ্বিতীয় সাধু ॥ ১৭

তিনি নানা ধর্মমতে দীর্ঘকাল অবগাহন করে ও কঠোর তপস্যা করে বলেছিলেন যে, জগতে 'যত মত, তত পথ' আছে। মত ও পথের ভেদ বা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকলেরই গম্য সেই একমাত্র ভগবানই—ভেদের মধ্যে এই ঐক্য দর্শন করে তিনি কার্যতঃ নানা ধর্মমতের সমন্বয়কারী অদ্বিতীয় মহান্ আচার্যে পরিণত হয়েছিলেন ॥ ১৮

সেই প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখে ছিল সর্বদাই হাস্য, ভগবৎ-লীলাপ্রসঙ্গ ও ধর্মবিষয়ক বিবিধ উপাখ্যান। মনে ছিল স্ত্রী ও কাঞ্চন বিষয়ে ত্যাগাকাঙ্ক্ষা, শিষ্যদের প্রতি ছিল স্নেহ, স্বীয় ভক্ত ও গুণীদের জন্য ছিল কল্যাণকামনা। আর্তদের জন্য ছিল কৃপা আর বিশ্বমানবের জন্য ছিল ভালবাসা ॥১৯

তাঁর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ আশ্রয় করে পবিত্রতাই কি মূর্তি পরিগ্রহ করেছে? নাকি, তাঁর দেহাশ্রয়ে সরলতা, সর্বজ্ঞতা ও দীনতাই মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে? অথবা, তাঁর দেহ-অবলম্বনে সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াই প্রমূর্ত হয়েছে? কিংবা, স্বয়ং ভগবৎ-সত্তাই তাঁর দেহ-ধারণ করে জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে? এইভাবে, নানা বিতর্ক ও সংশয়ে আবিষ্ট এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষম। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্তব্ধ হয়ে নিবিড় ও গভীর বিস্ময়রসে নিমগ্ন হয়ে যান ॥ ২০

মাস্তুলের পাখি

তরুণ মুখোপাধ্যায়

মাস্তুলের স্থির ঐ পাখিটির চোখে
উদাস নীলিমার প্রগাঢ়তা
আমি চাই।
এতকাল ব্যবহৃত হয়ে হয়ে আমার পোশাকে
জমেছে অনেক মলিনতা আর
ঈর্ষা, অহং, কামনা—
নতুন পোশাক তাই বড় প্রয়োজন
যার গায়ে পাব
ভোরের শিউলির পবিত্র সুবাস
পাব আশ্বিনের রোদের প্রসন্নতা।
আমাকে একবার সমুদ্রে কে নিয়ে যাবে ?
কে দেবে আমাকে
কথামৃতের মাস্তুলের পাখিটির ঐ
ধ্যানের প্রতিভা!

প্রভু, আমায় টানো

জয়নাল আবেদীন

প্রভু তুমি আমায় টানো
এখান থেকে অনেক দূরে
যেথায় সুখের পাখি ওড়ে
সেই ঠিকানা তুমিই জানো
প্রভু সেথায় আমায় টানো।

প্রভু তুমি আমায় টানো
আকাশের ঐ তারার ফাঁকে
শান্তি যেথায় ছবি আঁকে
সেই ঠিকানা তুমিই জানো
প্রভু সেথায় আমায় টানো।

প্রভু তুমি আমায় টানো
যেথায় শুধুই প্রেম পাওয়া যায়
যেথায় শুধুই সুখ পাওয়া যায়
সেই ঠিকানা তুমিই জানো
প্রভু সেথায় আমায় টানো।

উপলব্ধি

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

তোমার সংস্পর্শে আসার আগে
তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি সম্পূর্ণতা।
তোমার বাণীর সাথে পরিচিত হবার আগে
খুঁজেছি কথার মতো কিছু কথা।

মানুষ হয়েও যেন অমেরুদণ্ডী থেকেছি,
বড় সংলাপ আর ওজনধারী পুঁথির মধ্যে
হৃদয়ের বার্তা পাইনি খুঁজে। তাই
খানিকটা দায়গ্রস্ত হয়ে মানুষকে ভালবাসা,
'জীবে প্রেম' নয়।
পুণ্য গঙ্গাতীর অথবা শুদ্ধ
দেবালয় ছেড়ে শেষে
হৃদয় পেয়েছি আমি 'তব কথামৃতে।'

প্রার্থনা

সংযুক্তা মিত্র

আলোকের শতদল তুমি,
তোমায় পাইনি বলে
এ আঁধার ঘোচেনি এখনো।
কুয়াশায় ভরে আছে জীবনের আঁকাবাঁকা পথ,
ঊষর প্রান্তর তাই ছেয়ে আছে ঝরাপাতাদলে।
কত তীব্র বেদনার অসহ দহন
জর্জর প্রহারে করে সুতীক্ষ্ণ আঘাত ;
তবু সেই অন্ধকারে
জেলে রাখি আশার প্রদীপ,
হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে অনুভবি
নিঃশব্দ চরণপাতে তব আগমন।
হে জ্যোতির্ময়, হে পুণ্য, হে প্রিয়,
ভরে দাও রিক্ত ডালি মোর
সঞ্চিত যত আবর্জনা
সরে যাক।
পুণ্য-শান্তি-করুণার স্পর্শে
দাও তুমি অভয় সান্ত্বনা।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ এক বিপ্লবের নাম

একটি বিপ্লবের সূচনা
শহর থেকে দূরে
বাংলার প্রত্যন্ত এক পল্লীতে
সহজ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের
সবুজ-ঘেরা নরম মাটির
ধূসর ভিটেয়।

সময়ের স্রোতে
সেই বিপ্লব,
গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে
শ্যামল সবুজ মাঠ ছাড়িয়ে
শহর মাতিয়ে
গোটা ভারতকে তোলপাড় করে,
সবার অলক্ষ্যে
স্বদেশের সীমা হয়েছে পার!
বিশ্বব্যাপ্ত নীরব এই বিপ্লবের নাম-
শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

কথামৃত

জ্যোতিভূষণ চাকী

কথা যদি অমৃত হয়,
হয় তা দিব্য-গান,
কথা যদি অমৃত হয়,
মৃতেরা পায় প্রাণ।
তেমন কথক এসেছিলেন,—
ধন্য এ সংসার।
কথা তো নয়, কথার ছলে
ভাবের পারাবার।

দক্ষিণেশ্বর

সুধাংশুভূষণ নায়ক

দক্ষিণেশ্বর! নামটি শুনেই বিহ্বল।
শিরায় ধমনীতে রোমাঞ্চের অনুভব।
মন্দির স্থাপন, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তো রাজকীর্তি-
কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলে তুমি।

গৃহী সন্ন্যাসী, মূর্খ জ্ঞানী, ধনী নির্ধন,
অভিজাত অপাংক্তেয়,
কত মানুষের সমাগম তোমার এই সাধনপীঠে।
তোমার সন্তানেরা এখানেই পেলেন
অমৃতের সন্ধান ; বার্তা তার জানিয়েছিলেন
সারা জগতের কাছে।

আমরা আসি, ঘুরি ফিরি,
মন্দিরে প্রণাম করি। নহবতে দেখি মা-কে,
গঙ্গার তীরে পঞ্চবটীকে,
তোমার কক্ষে কান পাতি
যদি শুনতে পাই তোমার কথামৃত
যাদুতে যার বদলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র
আরও কত খ্যাত-অখ্যাত।

তুমি বলেছিলে—'এখানে যে আসবে
তার শেষ জন্ম।'

মনে পাই বল। তোমার কথা তো
মিথ্যা হতে পারে না।

হে আমার প্রিয়তম প্রভু,
তোমার চরণরেণুর স্পর্শধন্য
দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থকে প্রণাম! কোটি প্রণাম।

মাধুকরী

জন্মোৎসব

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

চল, চল আজ দক্ষিণেশ্বরে যাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছ, চল, আজ রামকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া জড় ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবন-মনকে সার্থক করি। বড় ভাগ্য না হইলে মর্ত্যলোকে এমন অপূর্ব রূপ এমন আবির্ভাব দেখা যায় না। চল, চল বাঙালী, আজ তোমার জাতীয় জীবনের নব জাগরণের শুভ মুহূর্তক্ষণে ঐ নরদেবতাকে দেখিয়া ধন্য হইয়া আসি। জান কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কে?

রামকৃষ্ণকে চিনিতে হইলে হিন্দু-সাধনার গোড়ার কথা একটু বুঝিতে হয়। বিংশতি কোটি হিন্দু সন্তান জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঈশ্বর-ভাবের ভাবুক। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণবদনকমল হইতে যে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইয়াছে, উহাই এই ঘোর কলিযুগে হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের আচার-ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, আদান-প্রদান—সমস্তই কৃষ্ণ প্রচারিত নিবৃত্তিমার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। কত বিপদ বিপ্লব—কত ঘাত-প্রতিঘাত—কিন্তু হিন্দুজাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণপ্রভাবে হিন্দু অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বসুদেবনন্দন, কংস-কেশী-চাণূর-মর্দন যে অমৃততত্ত্ব প্রচার করেন, তাহা জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, হিন্দুজাতির জ্ঞান ভক্তি ধর্ম কর্ম ও সমাজকে নূতন তেজ, নূতন শক্তি এবং নূতন গৌরব প্রদান করিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া যত ধর্মান্দোলন হইয়াছে, সমস্তই সেই কৃষ্ণপাদপদ্মনিঃসৃত জ্ঞান-গঙ্গার বীচি-বিক্ষোভ মাত্র। এইরূপ সুদূরব্যাপী যুগপ্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না।

পুরাতন যুগের অন্তিমকালে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হন। এই সনাতন সত্যটি শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে কলিযুগপ্রারম্ভে আমাদের শুনাইয়াছিলেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আজ যিনি রামকৃষ্ণরূপী, তিনিই সেই যুগসম্ভাবনা। যাহা আমরা আমাদের সাধনা ও শক্তিবলে পারি না, তাহাই তিনি কৃপা করিয়া সিদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কি করিতে আসিয়াছেন? হিন্দুর জীবন্ত ও বহু ইতিহাস তাঁহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষাকে পুনরায় তিনি জীবনে পরিস্ফুট—বেগবন্ত করিতে আসিয়াছিলেন।

কথাটাকে মান্য করিতে ভুলিও না। তাই আমেরিকায় তোমার বেদান্তের ধ্বজা উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে তোমার শাস্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়াছে। তোমার সমাজের ছায়া অনুসরণ করিবার জন্য সেই ফিরিঙ্গী নরনারীগুলির কি প্রাণপণ আকিঞ্চন, তাহা জানো কি? কাহার কৃপায় ইহা হইয়াছে? তোমার গোলামখানার বিদ্যায় নহে। ঐ ব্রাহ্মণের কৃপায়! রামকৃষ্ণরূপী ব্রহ্মণ্য-শক্তিকে যদি আবার বরণ করিতে পার, তবে তোমার বিজয়-নিশান আবার জগৎ জুড়িয়া উড্ডীন হইবে; তোমার স্বদেশী ও স্বদেশীয়ানা ধন্য হইবে।

আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায় আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংবিন্দুগুলিকে ভগবৎচরণবিনির্গত জাতীয় জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। এসো—এই জন্মোৎসবের দিনে হিন্দুর সেই ঐতিহাসিক পারম্পর্যকে অঙ্গীকার করি। মূল ভ্রষ্ট হইলে বিনাশ অপরিহার্য। এসো, আজ সমগ্র দেশের সহিত—অতীত সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের অনুভূতির সহিত—স্বদেশানুরাগের মত্ততার সহিত এক বিরাট অভেদ প্রাণ-নৈবেদ্য উৎসর্গ করি। কোটি বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইবে, আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে।

এই জন্মোৎসবদিনে রামকৃষ্ণকে সেই পারম্পর্যের সূত্র ধরিয়া পর্যবেক্ষণ কর—ধন্য হও।*

---

* **মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৪২, শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃঃ ৮০**

পরমপদকমলে

গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যত না ছিলেন সন্ন্যাসীর তার চেয়ে ঢের বেশি ছিলেন গৃহীর। গৃহীকে আদর্শ গৃহী করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। গৃহ-দুর্গে বসে অহরহ জগন্ময়ী চিন্ময়ীর স্মরণ-মনন করতে করতে পরমপদে লীন হয়ে যাও—আমাদের জন্য এই ছিল তাঁর বাণী। কথামৃতকার শ্রীম যখন প্রথম তাঁর কাছে গেলেন, সে এক অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার। প্রথম দিনটিতে মাত্র দুটি কথা। সসঙ্কোচে শ্রীম জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।' ঠাকুর ভাবে ছিলেন। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সমাগত। এই সান্ধ্যক্ষণে ঠাকুর কখনও এ-জগতে কখনও ও-জগতে। শ্রীমর প্রশ্নে তাঁর ভাবান্তর হল। তিনি থেমে থেমে বললেন—'না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।' লক্ষ্যণীয়, ঠাকুর লোকদেখানো কোনও অনুষ্ঠান করতেন না। কোনও ভড়ং ছিল না। ভেক ছিল না; তিনি গুরু হতে চাননি। আমরা তাঁকে গুরু করে নিতে বাধ্য হয়েছি—যেমন শ্বাসে আমাদের বাতাস নিতেই হয়, তা না হলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি; মৃত্যুর ভাব হয়। তাঁর গেরুয়া ছিল না। ছিল না মালাচন্দন। 'সন্ধ্যা যাঁর সন্ধানে ফেরে' তাঁর আবার আনুষ্ঠানিক সন্ধ্যার কি-বা প্রয়োজন ? তিনি তো পার্ট-টাইম সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ফুলটাইমার। অদ্বৈত জ্ঞানটি আঁচলে বাঁধা ছিল তাঁর। মায়ের কোলেই তিনি বসে থাকতেন। সাজ-সজ্জায় সাধারণ একজন বাঙালী গৃহী। কালো গলাবন্ধ কোটটি পরে যখন দাঁড়াতেন তখন কোনও ভাবেই মনে হত না যে তিনি আমাদের থেকে পৃথক। গৃহীর উজ্জ্বল মূর্তিটি আমাদের সামনে তুলে ধরে ঠাকুর বলতে চেয়েছিলেন, 'ঘাবড়াও মাৎ।' 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী, কাঞ্চি, কেবা চায়!' ত্রিসন্ধ্যা কালী বলে যাও।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎটি বড় সুন্দর। সেইদিন আলাপ অনেক গভীরে গেল। প্রথম দিনের ভয় আর সঙ্কোচ কাটাতে পেরেছেন মাস্টার মহাশয়। ঠাকুরও এই আগ্রহী, সৌম্য মানুষটিকে জানতে চান, কারণ শ্রীমকে দিয়ে তিনি বিশাল একটি কাজ করাবেন, শ্রুতিলিখন। ঠাকুর শ্রীমর প্রাথমিক পরিচয় নিলেন। যেন চাকরির দরখাস্ত পূরণ করাচ্ছেন। হঠাৎ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি বিবাহ হয়েছে ?' মাস্টার বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' ঠাকুর যেন ধাক্কা খেলেন। আশা ভঙ্গ হল তাঁর। মাস্টার মহাশয়ের মনে হল, তিনি যেন শিউরে উঠলেন—'ওরে রামলাল, যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে!' মাস্টার মহাশয় ঘোরতর অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ভাবছেন, বিয়ে করা কি এত দোষের। ঠাকুরের পরের প্রশ্ন—'তোমার কি ছেলে হয়েছে ?' মাস্টারমহাশয়ের বুক ঢিপঢিপ করছে। তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে।' ঠাকুর যেন এবারে একেবারেই হাল ছেড়ে দিলেন—'যাঃ ছেলে হয়ে গেছে!'

অর্থাৎ! কেন তুমি সংসার করলে! 'দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ এসব দেখলে বুঝতে পারি।' তাহলে কি দাঁড়াল ? সংসার পঙ্ককুণ্ডে সব ডুবে গেল! জীবনটা ভেস্তে গেল! না! ঠাকুর আমাদের হতাশ করার জন্যে আসেননি। ষোড়শ সন্ন্যাসী শিষ্যের জন্যে তিনি দেহ ধারণ করেননি। তিনি সংসারে কলুর বলদের মতো জোতা অসংখ্য মানুষকে পথ দেখাবার জন্যে এসেছিলেন। সে-পথ হল গৃহস্থ-সন্ন্যাস। 'সব কাজ করবে; কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে, সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে

জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়।' সেই রামপ্রসাদের কথা, 'ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।' আর কি ভাবতে হবে! তুমি যেন বড় মানুষের বাড়ির দাসী। 'বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে, আমার রাম, আমার হরি। কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।' ঠাকুর মাস্টারমশাইকে শিক্ষা দিচ্ছেন। কচ্ছপ হও। 'কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান? আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।' মন তোর। এই হল মন্ত্র। তারপর কি করবে? 'ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।' কঠ-উপনিষদ্ যেমন বলছেন, 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।' হৃদয়ের সব কামনা তুলে ফেলে দাও। তুমি মরবে। মরতে তোমাকে হবেই। কিন্তু কামনাশূন্যে হতে পারলে মরণশীল মানুষও অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। ইহজীবনেই হতে পারে ব্রহ্মভোগী।

ঠাকুর আরও উপদেশ দিলেনঃ 'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা। সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধন দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাকবে।'

শুধু সংসার নয়। সংসারে থেকেও চাই প্রতি মুহূর্তের বিচার। সুর ভুললে চলবে না। সদাই মনে চলবে গুনগুনুনি—'সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে। বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে॥' সুর না ভোলার পথ হল বিচার। ঠাকুর গৃহী শ্রীমকে বলছেন, 'সংসারে ঢুকেই যখন পড়েছ, তখন তো আর উপায় নেই। সে তোমার প্রারব্ধ। কিন্তু সব ঠিক থাকবে যদি বিচারটি ঠিক থাকে। কি সেই বিচার! 'কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার; বুঝেছ?'

শ্রীম বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তুবিচার।'

ঠাকুর বলছেন—'হাঁ, বস্তুবিচার। এই দেখ টাকাতেই বা কি আছে, সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র, এইসব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?'

'ভবে সে-ই সে পরমানন্দ, যে-জন পরমানন্দময়ীরে জানে। সেজন না যায় তীর্থপর্যটনে।' কারণ 'যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে'। ঠাকুর গাইতেন, 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো না কো কারো ঘরে।' আর আমরা বলি, 'পাখি তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণনামের মাস্তুলে।' সংসার জ্বলছে জ্বলুক। আমরা রামকৃষ্ণভাবের অগ্নি-নিরোধক অ্যাসবেস্টাস জ্যাকেটটি পরে বসে থাকি। পঙ্কের পাঁকাল হয়ে থাকি।

আনন্দের সন্তান

"শালা ধরে ফেলেছে রে!"

সুদীপ বসু

একটি ছবি। কথামৃতকার চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে এঁকে নিয়েছেন।

বড়বাজার দিয়ে গাড়ি চলছে। দেওয়ালীর ভারি ধুম। আলোবৃষ্টি এবং পিঁপড়ের মতো লোকে লোকারণ্য। কোথাও মিষ্টান্নের দোকান, কোথাও বা আতর-গোলাপের। গাড়ি একটি আতরওয়ালার দোকানের সামনে এসে পড়ল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মতো ছবি ও রোশনাই দেখে আনন্দ প্রকাশ করছেন। চতুর্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চস্বরে বলছেন: "আরো এগিয়ে দেখ, আরো এগিয়ে।" বলতে বলতে হাসছেন। বাবুরামকে উচ্চহাস্য করে বলছেন: "ওরে এগিয়ে পড় না, কি করছিস?" ভক্তেরা হাসতে লাগলেন।

পূর্বের দুই অবতার রাম এবং কৃষ্ণ সহাস্য ছিলেন কিনা এবং থাকলে কতখানি, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হাসিতে জগৎ মাতিয়ে গেছেন। মায়ের কাছে তার প্রার্থনা—"মা, আমায় রসেবশে রাখিস।" শ্রীরামকৃষ্ণ শুকনো সাধু নন, তিনি রসিক, রসময়। নরেন্দ্রনাথকে আনন্দের সাগরে তিনিই নিক্ষেপ করেছিলেন। মনে পড়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কথালাপ—"মনে কর এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথায় বসে রস খাবি?" নরেন্দ্রনাথ বললেন, "আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। কেননা বেশিদূরে গেলে ডুবে যাব।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেছিলেন—"বাবা, এ সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নেই। এ সাগর অমৃতের সাগর।"

এই-ই শ্রীরামকৃষ্ণ। এক আনন্দ থেকে অপর আনন্দ, পার্থিব আনন্দ থেকে অ-পার্থিব আনন্দে উল্লম্ফন—শ্রীরামকৃষ্ণ তারই বার্তাবহ। তিনি আনন্দের সন্তান। গল্পটি স্বয়ং তিনিই শুনিয়েছিলেন। পাঁচিলের ওপারে কি আছে জানার জন্য কয়েকজন গিয়েছিল। একজন পাঁচিলের উপরে উঠল, তারপর হা-হা হাসিতে ফেটে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্য পারে। দ্বিতীয়জন তা-ই, তৃতীয়জনও। কিন্তু একজন ফিরে এসেছিল সেই আনন্দের সংবাদ অন্যদের দেবার জন্য। আমাদের জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই চতুর্থজন। দুঃখের পৃথিবীতে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মানুষের জীবনে হাসি কতখানি মূল্যবান, তা তিনি জানতেন। গিরিশচন্দ্র সবিনয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, "ফচ্কিমিতেও আপনাকে পারলুম না।" না বলে উপায় কি? জয়গোপাল সেনের বাগানে লাল পাড়ের কাপড়পরা তাঁকে দেখে কেশবচন্দ্র সেন যখন বললেন, "আজ যে বড় রঙ, লালপাড়ের বাহার", শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।"

কিন্তু শোকের ক্ষণে? বাগবাজারের শোকাতুরা ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে তাঁর যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণী অধীর হয়ে বলেছিলেন, "ওগো লটারীতে এক লাখ টাকা পেয়েছিল একটা মুটে, শোনামাত্র আহ্লাদে সে মরে গিয়েছিল, সত্যি মরে গিয়েছিল—ওগো আমার যে তাই হলো গো! তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করো—না হলে মরে যাব সত্য সত্যই।"

'ঠাকুর হাসিতেছেন।'

ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর। ঠাকুর ও ভক্তদের দেখছেন, ছেড়ে যেতে পারছেন না।

'ঠাকুর হাসিতেছেন।'

প্রদীপ ধরে একজন সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। আসতে আসতে এক জায়গায় তেমন আলো হল না। ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলছেন—"পিদ্দিম ধরো! পিদ্দিম ধরো! মনে করো না ফুরিয়ে গেল পিদ্দিম ধরা।"

'ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।'

হাসির মধ্য দিয়েই ঝলসে উঠেছিল তাঁর খরশান বিদ্রূপ। কৃষ্ণকিশোর নিজেকে আকাশবৎ ('আমি খ') বলতেন। তাই 'টেক্সোওয়ালা':এসেছিল শুনে তাঁকে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ: "সে কি গো, তুমি তো 'খ'—আকাশবৎ। যাক শালারা ঘটি-বাটি নিয়ে যাক, তোমার কি?" গেরুয়াপরার অধিকার ছিল না, এমন একটি মানুষ একবার এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে শুনিয়েছিলেন, "একজন বলেছিল, 'চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী'—আগে চণ্ডীর গান গাইত এখন ঢাক বাজায়।"

অর্থের অহঙ্কারে স্ফীত মানুষের চেহারা কেমন হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাও রসিয়ে রসিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। ঐ মানুষগুলির চেহারা এবং মনোবৃত্তি কুৎসিত ব্যাঙের মতোই বলে তাঁর মনে হয়েছিল। শুধু অর্থ? মান নয়? শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, রোগা লোকও বুটজুতো পায়ে দিলে শিস দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে সাহেবদের মতো লাফিয়ে ওঠে। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই গল্পগুলি শুনে তাঁর সামনে বসা মানুষগুলি কিভাবে হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন।

ক্লাসিক রসিকতার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত উক্তি। গলির মোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে সদলে প্রবেশ করতে দেখে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা কিছু মন্তব্য করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনতে পেয়ে হাসতে হাসতে মাস্টার মহাশয়কে বলেছিলেন—"হ্যাঁগা কি বলে? 'পরমহংসের ফৌজ আসছে'? শালারা বলে কি?"

কিংবা—বলরামের বাড়িতে থালাভর্তি মোহনভোগ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য—"ওরে মাল এসেছে। মাল। মাল। খা। খা!"

শ্রীরামকৃষ্ণ রসিকতার ঢেউ এনে দিয়েছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রার্থনা-কক্ষেও। প্রার্থনার সময়ে কেশব সেন বলেছিলেন তাঁরা যেন ভক্তিনদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ভক্তদের ডুব দেবার ইচ্ছা শুনে চিকের আড়ালে মেয়েদের দেখিয়ে বলেছিলেন—"একেবারে সবাই ডুব দিলে এঁদের কি দশা হবে? একবার আড়ায় ওঠো, আবার ডুব দিও, আবার ওঠো।"

কিন্তু মৌতাত যাঁর ধরেছে? যিনি পরবর্তী কালে অগণিত মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে উঠবেন, সেই শ্রীম দ্বিতীয়বার যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করলেন, সেদিন ঠাকুর, "ঐরে আবার এসেছে।" বলেই উপস্থিত ছেলে-ছোকরাদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন, "একটা ময়ূরকে বেলা চারটের সময়ে আফিম খাইয়ে দিছিল। তারপর দিন ঠিক চারটের সময় ময়ূরটা এসে উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।"

আনন্দ! আনন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য-আনন্দের শীর্ষে অবস্থান করে মানুষকে জানিয়েছিলেন সেই পরমানন্দের স্বরূপ। একটি-দুটি বাক্যে তাকে প্রকাশ করবার সাধ্য একমাত্র তাঁরই ছিল।

"মাছগুলো খেলে বেড়াচ্ছে। দেখলে আনন্দ। যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে ক্রীড়া করছে—আত্মারূপ মীন।"

"মাটির নীচে আছে কলসীভরা ধন। সে-ধন চাইতে হলে খুঁড়তে হবে মাটি, মাথার ঘাম পড়বে পায়ে। অনেকক্ষণ খোঁড়ার পরে যখন কোদাল লাগল কলসীর গায়ে, শব্দ হল ঠং—তখন আনন্দ। যত ঠং ঠং শব্দ—তত আনন্দ। কোদাল ফেলে কলসী বের করে কলসী দেখে নাচে। কলসী থেকে মোহর ঢালে, হাতে করে গণে। দর্শন—স্পর্শন—সম্ভোগ। আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ!"

"হৃষিকেশের এক সাধু সকালবেলায় উঠে গিয়ে দাঁড়ায় ঝরনার কাছে। সমস্ত দিন ঝরনা দেখে আর বলে ঈশ্বরকে—'বাঃ বেশ করেছ! বাঃ বেশ করেছ! কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!' তার অন্য জপ-তপ নাই। রাত্রি হলে ফিরে যায় কুটিরে।"

বাউলের দল এল—নাচল, গাইল, চলে গেল—কেউ জানতে পারল না। কিন্তু কেউ কেউ জানতে পেরেছিলেন। তাঁদেরই একজন ক্যান্সারের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন—আমি তো দেখছি আপনি খুব আনন্দে আছেন। সব যন্ত্রণা মুহূর্তে চলে গিয়েছিল। আনন্দে প্রতিষ্ঠিত সেই পুরুষ সহাস্যে বলে উঠেছিলেন—"শালা ধরে ফেলেছে রে!"

মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ-লীলা

স্বামী গীতানন্দ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্ব, লোক-কল্যাণ-প্রচেষ্টা এবং তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিভা জ্ঞানি-গুণি-ভক্তহৃদয়ে এক অপূর্ব লীলাময় ভাবপ্রবাহে বিধৃত হয়ে আছে। তখনকার বাংলা ও উড়িষ্যার জনসাধারণ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা, যাঁরা ক্ষণকালের জন্যও তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই মহাপ্রভুকে দেবমানবের আসনে বসিয়ে হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এমন এক মহাজীবন—যাঁর প্রভাবে অসংখ্য জীবন প্রভাবিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবিতকালেই কিছু কিছু লেখা হতে আরম্ভ হয়েছিল। পরবর্তী কালে মহাপ্রভুর জীবন, বাণী ও অবদানের উপর অসংখ্য বই লেখা হয়েছে এবং আজও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, চৈতন্য-চরিতকারেরা প্রায় সকলেই তাঁর জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, দেহান্ত সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে যাননি। এর ফলে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান একদিকে যেমন কুহেলিকাময় হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এই কুহেলিকা সরিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য নানা মতের ও তথ্যের উদ্ভব হয়েছে। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর কোন কোন জীবনীকার তাঁর অন্তর্ধানের বিষয়ে একটু-আধটু ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং সেই ইঙ্গিত-রেখার অনুসরণ করে ঐ বিষয়ে একটা অস্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলারও প্রয়াস করা হয়েছে।

মহাপ্রভুর মহান লীলা-বিধৃত জীবন সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই আমাদের তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনলাভে বিভোর ছিলেন, তাঁদেরই শরণ নিতে হবে। তাঁরা যা লিখে এবং বলে গেছেন, তা-ই মহাপ্রভুর জীবন-প্রকাশের মুখ্য উপাদান, মহাপ্রভুর জীবিতকালেই সম্ভবতঃ তাঁর দুজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ তাঁর সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু লিখেছিলেন। এঁরা হলেন স্বরূপ দামোদর এবং মুরারি গুপ্ত।

মহাপ্রভুর পুরীধামে অবস্থানের, বিশেষ করে তাঁর শেষ আঠারো বছরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ দামোদর; তিনি ছিলেন একাধারে মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক, পরম বন্ধু এবং তাঁর সাধন-ভাবের প্রকৃত সমঝদার। "প্রভুর অত্যন্ত মর্মী রসের সাগর।"[1] স্বরূপ দামোদরের পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। নবদ্বীপেই ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে তাঁর ভাবে প্রভাবিত হন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে ইনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে কাশীতে গিয়ে নিজেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—নাম হয় স্বরূপ দামোদর। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের তীর্থাদি দর্শন করে পুরীধামে ফেরার কিছুদিন পর স্বরূপ দামোদর সেখানে এসে মহাপ্রভুর আশ্রয় নেন। স্বরূপ দামোদর সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন ঃ

কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥[2]

ইনি ছিলেন মহাপণ্ডিত, রসবেত্তা, সুগায়ক এবং নৃত্যকুশলী—"সঙ্গীতে গন্ধর্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।"[3]

স্বরূপ দামোদর প্রথম থেকেই পুরীতে মহাপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মহাপ্রভুর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই সেবার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভু তাঁর জীবনের শেষ বারো বছর প্রায় সর্বদাই অন্তর্মুখ অবস্থায় থাকতেন। দিনের বেলায় তিনি জগন্নাথ দর্শন, অন্তরঙ্গ ভক্তদের সাথে ভগবৎ প্রসঙ্গ, ইত্যাদিতে কাটাতেন। কিন্তু রাত্রিতে ভাব বৃদ্ধি হলে স্বরূপ দামোদর প্রিয় সখার মতো রামানন্দের সাথে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গীত-গোবিন্দ, ভাগবত প্রভৃতি থেকে ভাবের অনুরূপ শ্লোক পাঠ এবং গান করে মহাপ্রভুকে কিছুটা সুস্থ রাখতেন। তৃতীয়তঃ স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভু থেকে

---

[1] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৯, ২।১০।২৪৭

[2] ঐ, ২।১০।২৪৮

[3] ঐ,

বয়সে বড় ছিলেন ; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভাবাবেশে-বিভোর নিজেকে রক্ষায় অসমর্থ মহাপ্রভুকে পরম স্নেহে, বাৎসল্যভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা করতেন। চতুর্থতঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত মধুর ভাব তো স্বরূপ দামোদরের বিশেষভাবেই ছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে স্বরূপ দামোদরের জীবনে একই সঙ্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের বিশেষ প্রকাশ হয়েছিল। ভক্তিশাস্ত্রের বিভিন্ন সাধনায়—দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ ব্যবহার, বাৎসল্যের মমতাধিক্য এবং মধুরের প্রেমপূর্ণ সেবা—স্বরূপ দামোদরের জীবনে মূর্ত হয়ে তাঁকে আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। মহাপ্রভুর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে আর কেউ-ই মহাপ্রভুকে অবলম্বন করে ভক্তির বিভিন্ন ভাবের সিদ্ধিলাভে সমর্থ হননি। এদিক থেকে বিচার করলে স্বরূপ দামোদরই ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনের তত্ত্ববেত্তা ও তাঁর জীবনতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। "স্বরূপ ছিলেন যেন মহাপ্রভুর শেষজীবনের অন্ধের যষ্টি। বহির্জীবনের সঙ্গী গোবিন্দ ও স্বরূপ, অন্তর্জীবনে স্বরূপ ও রামানন্দ। কোন রাজ্যেই মহাপ্রভুর স্বরূপ ছাড়া এক পাও চলিবার উপায় ছিল না। আহারে, বিহারে, শয়নে তিনি সর্বদাই মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতেন।"[৪]

মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থানের ঘটনাবলী অবলম্বনে স্বরূপ দামোদর একটি 'কড়চা' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ; দুঃখের বিষয়, সেই কড়চা আর পাওয়া যায় না। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে দেখতেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপ গোস্বামীর 'কড়চা' থেকে উদ্ধৃতিতে পাই ঃ

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥[৫]

কৃষ্ণ প্রেমের বিশেষ বিকাশই হচ্ছেন রাধা ; তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা এবং কৃষ্ণ স্বরূপতঃ আলাদা নয় ; কেবল লীলাবিলাসের জন্যই দুই দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা চৈতন্যের মধ্যে এক হয়ে প্রকটিত হয়েছেন। রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি নিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই চৈতন্যকে প্রণাম করি।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে স্বরূপ দামোদরের কড়চায় কিছু পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছুদিনের মধ্যেই তিনিও দেহত্যাগ করেন। কেউ কেউ বলেন "গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই · স্বরূপ দামোদর অচেতন হইলেন ···হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইল।"[৬] তাই হয়তো স্বরূপ দামোদরের পক্ষে মহাপ্রভুর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত সম্বন্ধে লেখা সম্ভব ছিল না।

মুরারি গুপ্ত ছিলেন মহাপ্রভুর বাল্যসঙ্গী, যদিও তিনি মহাপ্রভু থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তা ছাড়া মুরারি গুপ্ত প্রতি বছর রথের সময় পুরীতে এসে তিন-চার মাস মহাপ্রভুর সঙ্গ করতেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং মহাপ্রভুর জীবনের বহু ঘটনাই তিনি জানতেন। মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহাপ্রভুর জীবনের, বিশেষ করে নবদ্বীপলীলার ঘটনাবলী অবলম্বনে একটি 'কড়চা' লেখেন এবং তা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এইটিই মহাপ্রভুর জীবন-ইতিহাসের আদি ও প্রকৃষ্টতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের শেষের দিকে এমন কতকগুলি শ্লোক রয়েছে, যা থেকে মনে হয় যে, ঐ শ্লোকগুলি পরবর্তী কালে কেউ মুরারি গুপ্তের নামে তাঁর কড়চাতে সংযোজন করেছেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, কড়চাটি মহাপ্রভুর জীবিতাবস্থায় লেখা হলেও, প্রক্ষিপ্ত কিছু শ্লোক-সহ মহাপ্রভুর তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর প্রচারিত হয়। নবদ্বীপলীলা প্রধান 'কড়চায়' মহাপ্রভুর অন্তর্ধানলীলা অপ্রাসঙ্গিক বলেই হয়তো মুরারি গুপ্ত ঐ বিষয়ে কিছু লেখেননি।

কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন সংস্কৃতে 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক' এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ

---

[৪] চৈতন্য-পরিকর—রবীন্দ্রনাথ মাইতি, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ২৬৫

[৫] চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১।২

[৬] চৈতন্য-পরিবার, পৃঃ ২৬৭

পার্ষদ শিবানন্দ সেন প্রতি বছর রথের পূর্বে গৌড়ীয় ভক্তদের নিয়ে পুরীধামে যেতেন, এবং সেখানে ৩/৪ মাস কাটিয়ে আসতেন। তাঁর ছোট ছেলে পরমানন্দ সেন সাত বছর বয়সে বাবার সাথে পুরীতে গিয়ে মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করেন। পরমানন্দই পরে 'কবি কর্ণপূর' উপাধি লাভ করেন। তিনি তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থ দুইটির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং শিবানন্দ সেন ও অন্যান্য চৈতন্য-পার্ষদের কাছ থেকে। কবি কর্ণপূরের জীবিতকালেই মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। সুতরাং কবির পক্ষে মহাপ্রভুর জীবনের খুঁটিনাটি বহু ঘটনাই জানা সম্ভব হয়েছিল এবং তিনি তাঁর গ্রন্থে সেসব লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাপ্রভুর অদর্শনের পর মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁকে কিছুটা সান্ত্বনা দেবার জন্য কবি কর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেন। কথিত আছে, ঐ নাটকে যিনি মহাপ্রভুর অভিনয় করেছিলেন, তাঁকে দেখে প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎ মহাপ্রভু বলেই মনে হয়েছিল। পণ্ডিতেরা 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের রচনাকাল ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বলে স্থির করেছেন। এছাড়া কবি কর্ণপূর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে, মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় নয় বছর পরে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্' রচনা করেন। মহাপ্রভুর জীবিতকালেই বাংলা ও উড়িষ্যার বহু লোক তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলে অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। একদিন পুরীধামে শ্রীবাসাদি ভক্তেরা মহাপ্রভুর গুণ-কীর্তন করছিলেন; মহাপ্রভু শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "কৃষ্ণ নাম-গুণ-কীর্তন ছেড়ে তোমরা এসব কি করছ?" ঠিক ঐ সময় দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোক এসে 'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য কোলাহল করতে থাকেন। তাঁদের আর্তি দেখে মহাপ্রভু বাইরে এসে তাঁদের দর্শন দিলেন। দর্শনলাভে ধন্য হয়ে তাঁরা তখন মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলে স্তব করেন। এই শুনে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুকে বললেন:

কে শিখাইল এ লোকে কহে কোন্ বাত।
ইহা সভার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত॥
সূর্য যে উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার তৈছে চরিতে॥[৭]

আশ্চর্য লাগে যে, কবি কর্ণপূরের মতো এত বড় একজন পণ্ডিত, মহাপ্রভুর মতো সর্বজনমান্য মহাপুরুষের জীবনের তিরোধানের মতো একটি বড় ঘটনা সম্বন্ধে একেবারেই মৌন থেকে গেলেন।

বৃন্দাবনদাস ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, মহাপ্রভুর তিরোধানের পনের বছর পরে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। বাঙলা ভাষায় মহাপ্রভুর জীবনেতিহাসের এইটি-ই প্রথম এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেছিলেন কিনা জানা নেই। তিনি ছিলেন চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র। নারায়ণী শৈশবে মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা পেয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর আদেশে এবং তাঁরই কাছ থেকে মহাপ্রভুর কথা শুনে 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। চৈতন্যভাগবত রচনার জন্য বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যচরিতের ব্যাসদেব আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। "চৈতন্য-লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।"[৮] কিন্তু চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর জীবনের বহু ঘটনাই লিপিবদ্ধ হয়নি। মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা এবং তাঁর পুরীধামে অবস্থানের সময় ভক্তদের সঙ্গে লীলার কথাই বিশেষভাবে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর সমক্ষে মহাপ্রভুর লীলাই বৃন্দাবনদাস বিশেষভাবে কীর্তন করেছেন। ফলে মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ এবং মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেননি। একই কারণে বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর শেষ বারো বছর ধরে দিব্যোন্মাদের অবস্থার কথাও বলেননি। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর ভগবত্তা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃন্দাবনদাস প্রথমে বইটির নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রেখেছিলেন। পরে গ্রন্থটি ভাগবতের অনুরূপ দেখে বৃন্দাবনের ভক্তেরা গ্রন্থের নাম বদলিয়ে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রাখেন। বৃন্দাবনদাস ভাগবতের সাথে মিলিয়ে মিলিয়েই যেন মহাপ্রভুর জীবনকে চিত্রিত করেছেন। সুতরাং ভাগবতের অনুকরণেই তিনি মহাপ্রভুর জীবনের শেষ অধ্যায় লিখবেন—

---

[৭] চৈতন্যচরিতামৃত, ২।১।১৪৬

[৮] ঐ, ২।১।১৩৪

এইটিই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছুই লেখেননি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর তিরোধানের অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পরে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পারেননি। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বছর বয়সে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে যান। তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত এবং রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কাছে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। বৃন্দাবনে তিনি ষড়-গোস্বামীদের পূত সঙ্গ লাভ করেন এবং রঘুনাথ দাসের সাথে রাধাকুণ্ডে বাস করতেন।

রঘুনাথদাস যখন চৈতন্য-চরণ লাভের আশায় সর্বস্ব ত্যাগ করে পুরীধামে যান, তখন মহাপ্রভু তাঁকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ করেন; সেই থেকে তিনি স্বরূপ দামোদরের একান্ত অনুগত হয়ে মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে সাধন করতে থাকেন। এর ফলে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল। মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের তিরোধানের পর তিনি বৃন্দাবনে চলে যান এবং রাধাকুণ্ডে অতি কঠোর সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। এই রঘুনাথের কাছ থেকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর শেষজীবনের ঘটনাবলী বিশেষভাবে জানতে পারেন।

মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হলেও, মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা, যখন তিনি প্রায় সর্বদাই ভগবৎভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন, সেই সময়কার কথা কেউ-ই লেখেননি। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-ই তখন আপামর জনসাধারণের উপযোগী গ্রন্থ বলেই পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু এই গ্রন্থেও বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের কোন কথা লেখেননি। অতএব চৈতন্যলীলার সার যে অন্ত্যলীলা, সেই সম্বন্ধে একটি গ্রন্থের প্রয়োজন বৃন্দাবনের ভক্তেরা বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন। এদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের অসামান্য পাণ্ডিত্য, কঠোর তপস্যাপূত জীবন এবং সর্বোপরি চৈতন্য-জীবনের তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান, তাঁকে এই কাজের বিশেষ উপযুক্ত করে তুলেছিল। বৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলী কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে লিখবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধ এবং মদনমোহনের ইচ্ছা জেনে তিনি এই কাজে ব্রতী হন। বস্তুতঃ চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যে কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের, ভক্তির সঙ্গে যুক্তির, তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের এক বিস্ময়কর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "কেবল বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অক্ষয় সম্পদ-রূপে গণ্য হইতে পারে।"[৯]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে, বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনের যে-সব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেসব বিষয় তিনি সবিশেষ না লিখে সূত্রাকারে উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের কথা, তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা লিখতে চেষ্টা করেছেন। কারণ এই সময়েই মহাপ্রভুর জীবনের শ্রেষ্ঠ লীলার বিকাশ হয়েছিল।

চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।[১০]

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার ঘটনা এবং গূঢ়তত্ত্ব স্বরূপ দামোদরের কাছে ছিল এবং তাঁর কাছ থেকে সেসব রঘুনাথদাস লাভ করেছিলেন। রঘুনাথদাসের কাছ থেকে শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থ ভক্তদের উপহার দিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, মহাপ্রভু তাঁর জীবনের শেষ বারো বছর রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সাথে রাত্রিদিন কৃষ্ণ প্রেমরস আস্বাদন করেছেন। তার সম্যক্ বিবরণ দেওয়া অনন্তদেবের পক্ষেও সম্ভব নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই রসের এক কণামাত্র স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছেন।

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥
সেই সব রস-লীলা আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণি, নাহি পায় অন্ত॥[১১]

চৈতন্যলীলার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ

---

[৯] চৈতন্য-পরিকর, পৃঃ ৪৭০

[১০] চৈতন্যচরিতামৃত, ২।২।১৫৭

[১১] ঐ, ৩।২০।৬২৩

ব্যাপার—বুদ্ধির দ্বারা তা জানা যায় না—এই বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত শেষ করেছেন।

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত-বর্ণন কৈল সমাপন ॥[১২]

এই গ্রন্থেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-লীলা সম্বন্ধে একেবারেই নীরব থেকেছেন। ভগবানের লীলার অন্ত নেই ঠিক; কিন্তু তাঁর প্রকট লীলা থেকে অপ্রকট লীলায় অধিগমন তো আছেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে পূর্ববর্তী অবতার শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম লীলার অনুকরণে মহাপ্রভুর জীবনের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস না লিখবার আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ বলেন যে, অবতারকল্প মহাপুরুষদের জীবনীকারেরা অনেকেই বিশেষ করে নিজেদের স্মরণ মননের জন্য জীবনীগ্রন্থ লিখে থাকেন। শ্রদ্ধেয় প্রিয়জনের দেহান্ত, তা যেভাবেই হোক, অত্যন্ত দুঃখপ্রদ সন্দেহ নেই। সেইজন্য অনেক সময়ই মহাপুরুষদের অন্তর্ধান সম্বন্ধে জীবনীকারেরা মৌন থেকেছেন। মহাকবি বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্তই লিখেছেন (কারও কারও মতে)। পরবর্তী অংশ, উত্তরকাণ্ড মহাকবির নাম দিয়ে অপর কেউ লিখে থাকবেন। গোস্বামী তুলসীদাসও শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বর্ণনা করে 'রামচরিত-মানস' শেষ করেছেন—তাঁর অপ্রকট লীলার কথা লেখেননি। তাছাড়া বাল্মীকির উত্তরকাণ্ড, যিনিই লিখে থাকুন, তিনি লিখেছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র অনুজগণের সাথে সশরীরে বৈষ্ণবতেজোমধ্যে প্রবেশ করলেন। শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগ এইভাবে জাগতিক দৃষ্টিতে রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। পুরাকালের লোকেদের মানসিকতা সম্ভবতঃ এইরকমই ছিল যে, অবতারকল্প মহাপুরুষদের দেহত্যাগ সম্বন্ধে কিছু লেখা হবে না, অথবা হলেও তা কোন অপার্থিব কাহিনীর অন্তরালে সূচিত হবে। এই কারণেই হয়তো প্রথম দিকে চৈতন্যজীবনীকারেরা মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে কিছু লিখে যাননি।

মহাপ্রভুর চরিতকারেরা, যাঁরা সবচেয়ে বেশি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে জানতেন, তারা কেউ-ই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বিষয়ে কিছু বলেননি; কিন্তু কেন এই নীরবতা? এই প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করেছেন।

বৈষ্ণবেরা বলেন যে, অবতারের দেহ চিন্ময়—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; সাধারণ মানুষের মতো পঞ্চভূতে গড়া নয়; সুতরাং তাঁর পক্ষে এই চিন্ময় দেহসহ বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করা অথবা জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হওয়া স্বাভাবিক। আবার কেউ বলেন যে, ভগবান অনাদি অনন্তকাল ধরে লীলা করে চলেছেন। কখনো তিনি তাঁর নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে লীলা করেন, আবার কখনো বা মর্তধামে প্রকটিত হয়ে লীলা করেন। ভগবানের লীলার অন্ত করা যায় না। সুতরাং অবতারের লীলার অন্ত বর্ণনা করা অপরাধ।

অনেকের মতে গুণগ্রাহী ভক্তদের মধ্যে এমন একটা ধারণা তখন ছিল যে, অবতারকল্প মহাপুরুষদের জন্ম, কর্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে কিছু-না-কিছু অপ্রাকৃত ঘটনা থাকতেই হবে, নইলে অবতারত্ব, মহাপুরুষত্ব ঠিক ঠিক প্রমাণিত হবে না। তারই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতাচার্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অনেকেরই দেহত্যাগের যথাযথ বিবরণ এবং তাঁদের মরদেহের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে কবীর, মীরাবাঈ, অণ্ডাল প্রভৃতি অনেকের পার্থিব দেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভক্তেরা তাদের গুরুকে ইষ্টের সঙ্গে এক বলে মনে করেন। গুরুর মরদেহ ইষ্টের অঙ্গে বিলীন হয়েছে বলে প্রচার করে গুরুর মৃত্যুকে তাঁরা রহস্যাবৃত করে রাখেন। তাঁদের ধারণা এই-ভাবে তাঁদের গুরুর মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এতে আর যাই হোক না কেন, সত্যের অপলাপ বিলক্ষণই হয়ে থাকে। ভগবান যখন দেহধারণ করে মানুষী লীলা করেন, তখন তাঁর জন্ম, কর্ম, মৃত্যু—সবই প্রাকৃত মানুষের মতোই হবার কথা। তাই ভাগবতে দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকা লীলার অন্তে ব্যাধের বাণে দেহত্যাগ করেন।

---

[১২] চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।২০।৮২৪

এতে যদি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ব্যাহত হয়ে না থাকে, তবে অপর অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষদের বেলাতেই বা তা ব্যাহত হবে কেন?

যাই হোক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে, মহাপ্রভুর দুইজন অন্তরঙ্গ, মহাপ্রভুর দেহাবসানের বিষয় আঁচ করেছিলেন। একজন হরিদাস, অপরজন অদ্বৈতাচার্য। হরিদাস (জন্ম ১৪৫০ খ্রীঃ) মহাপ্রভু থেকে ছত্রিশ বছরের বড় ছিলেন। একদিন পুরীতে মহাপ্রভু খবর পেলেন হরিদাস অসুস্থ। মহাপ্রভু গিয়ে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

প্রভু কহে কোন ব্যাধি, কহ তো নির্ণয়।
তিঁহো কহে সংখ্যা সংকীর্তন না পুরয় ॥

মহাপ্রভু বললেন ঃ "তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, এবার নাম জপের সংখ্যা কমিয়ে দাও। তুমি সিদ্ধ হয়েছ; লোকের উদ্ধারের জন্যই তোমার আবির্ভাব; নামের মহিমা তুমি যথাযথ প্রচার করেছ; এখন সংখ্যা অল্প করে জপ কীর্তন কর।" হরিদাস জপের সংখ্যা কমাতে রাজি না হয়ে বললেন ঃ

লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিত্তে ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥[১৩]

মহাপ্রভুর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বছর। বললেন ঃ "আমার যা-কিছু সুখ, তা তোমাকে অবলম্বন করে; সুতরাং আমাকে ছেড়ে তোমার চলে যাওয়া উচিত নয়।" হরিদাস তখন মহাপ্রভুর পা জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "আর মায়া করো না; তোমার লীলার পুষ্টির জন্য কত সব ভক্তেরা রয়েছেন। আমার মতো একটা সামান্য কীট নষ্ট হলে, কি এসে যাবে?" দেখা যাচ্ছে, হরিদাস অন্তরে অনুভব করেছিলেন মহাপ্রভু আর বেশিদিন এই মরজগতে থাকবেন না। তাই তিনি মহাপ্রভুর আগেই চলে গেলেন।

অদ্বৈতাচার্য বয়সে মহাপ্রভু থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরের বড় ছিলেন। মহাপ্রভুর পূর্বে ইনিই ছিলেন বাংলার বৈষ্ণব সমাজের নেতা। জগতের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাতে আবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তার জন্য ইনি বহু আরাধনা করেছিলেন। "কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার;"[১৪] সেইজন্য অদ্বৈতাচার্যকে 'গৌর-আনা-গোসাই' বলা হয়। মহাপ্রভুর জীবনের শেষের দিকে অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুর থেকে হেঁয়ালি করে একটি তরজা মহাপ্রভুকে লিখে পাঠান ঃ

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥[১৫]

তরজা শুনে মহাপ্রভু একটু হেসে, "তাঁর এই আজ্ঞা" বলে চুপ করে রইলেন। সম্ভবতঃ স্বরূপ দামোদর তরজার অর্থ বুঝেছিলেন। কারণ, তিনি মহাপ্রভুর অন্তররাজ্যের প্রায় সব খবরই জানতেন—তিনি ছিলেন "মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ"; তবুও তিনি সাহস করে মহাপ্রভুকে তরজার অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন।[১৬]

প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন।

মহাপ্রভু বললেন—"অদ্বৈতাচার্য পূজাতে বিশেষ পারঙ্গম এবং আগম-শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি। পূজার জন্য তিনি দেবতাকে আবাহন করেন এবং পূজা সমাপনান্তে দেবতাকে বিসর্জন দেন; তিনি মহাযোগেশ্বর; তরজার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না।" মহাপ্রভুর কথা শুনে "স্বরূপ গোসাঞি কিছু হৈলা বিমন।" আর মহাপ্রভুর

সেদিন হইতে প্রভু আর দশা হইল।
কৃষ্ণ বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥

অদ্বৈতাচার্য প্রহেলিকাময় তরজা পাঠিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য যাতে এক মহাপ্রভু ছাড়া অপর কেউ তরজার অর্থ বুঝতে না পারে। কিন্তু যাঁর জন্য তা পাঠালেন, তিনি যদি তার অর্থ বুঝতে না পারেন, তবে তা পাঠানোই ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। আর তাই যদি হয়, তবে সেইদিন থেকেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা আরও অনেক বেড়ে গেল কেন? সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন—"প্রভু মাত্র বুঝে, কেহ বুঝিতে না পারে।" স্বরূপ দামোদরের পক্ষেও এই তরজার অর্থ বোঝা হয়তো সম্ভব ছিল;

---

[১৩] চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।১১।৫৬৪-৬৫ [১৪] ঐ, ১।৩।২১ [১৫] ঐ, ৩।১৯।৬১২ [১৬] ঐ, ৩।১৯।৬১৩

নইলে তিনি হঠাৎ বিমনা হয়ে গেলেন কেন? অদ্বৈতাচার্য সম্ভবতঃ তরজার মাধ্যমে মহাপ্রভুকে বলতে চেয়েছিলেন, যে-উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর অবতরণ তা সফল হয়েছে; মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম এখন দেশে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং প্রেমধর্মরূপ 'চাউলের' আর চাহিদা নেই। অর্থাৎ তরজার মধ্যে মহাপ্রভুর লীলা-সংবরণের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, অদ্বৈতাচার্যের পক্ষে কি একথা বলা সম্ভব ছিল, মহাপ্রভু তাঁর নরলীলা সংবরণ করুন? আবার অনেকে মনে করেন, নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচার নিয়ে তখনকার দিনে বাংলার বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব এসেছিল; এমনকি মহাপ্রভুর কাছেও এই সম্বন্ধে অভিযোগ উঠেছিল। এই তরজার মধ্য দিয়ে অদ্বৈতাচার্য সেই কথাই মহাপ্রভুকে জানিয়েছেন। এই অর্থ মেনে নিলে স্বরূপ দামোদরের বিমনা হওয়ার এবং মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের অবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, তরজা শোনার পর থেকেই মহাপ্রভু

উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।
রাধা ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥

এর কিছুদিন পরেই ২৯শে জুন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু অন্তর্ধান করলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু আছে—"চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান।"[17] কিন্তু কোথায়, কখন, কি পরিস্থিতিতে তিনি অন্তর্ধান করলেন, এইসব বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোন কথাই বলেননি।

চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে, একবার মহাপ্রভু যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এবং এক জেলের মাছ ধরা জালে জড়িয়ে পড়ায়, সেই জেলে তাঁকে সমুদ্র থেকে পারে তুলে আনে।[18] এইভাবে সেবার মহাপ্রভুর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে মহাপ্রভু হয়তো এইভাবেই যমুনা মনে করে সমুদ্রে নেমে যান—আর ওঠেননি।

এবার মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বিষয়ে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। লোচনদাস ছিলেন মহাপ্রভুর পার্ষদ নরহরি দাসের শিষ্য। বর্ধমান জেলায় লোচনদাসের জন্ম হয়। নরহরিদাসের প্রেরণায় লোচনদাস বাঙলায় মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী পাঁচালীর ঢঙ্গে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। এর আগে বাঙলাতে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একটিমাত্র গ্রন্থ, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' প্রচারিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যেই লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়েছিল। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে লোচনদাস লিখেছেন:

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে॥

… …

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত-আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হইল অদর্শন॥[19]

বর্ধমান জেলায় ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জয়ানন্দের জন্ম হয়। জয়ানন্দের পিতা সম্ভবতঃ নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের টোলের একজন ছাত্র ছিলেন। পুরী থেকে গৌড়ে যাবার পথে মহাপ্রভু কিছুক্ষণের জন্য তাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জয়ানন্দ তখন মায়ের কোলের শিশু মাত্র। মহাপ্রভুই শিশুর নাম রেখেছিলেন 'জয়ানন্দ'। এছাড়া সম্ভবতঃ তিনি আর কখনও মহাপ্রভুকে দর্শন করেননি। জয়ানন্দ তাঁর মাতা-পিতা এবং যেসব চৈতন্যপার্ষদ ও ভক্তদের তিনি সঙ্গ লাভ করেছেন, তাঁদেরই কাছে শুনে পাঁচালীর ঢঙে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের সাতাশ বছরের মধ্যেই এই গ্রন্থটি রচিত হয়। 'চৈতন্যমঙ্গলে' মহাপ্রভুকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে এবং মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য জয়ানন্দ নিজেই চৈতন্যমঙ্গলের কথকতা কীর্তন করতেন। জয়ানন্দ তাঁর

---

[17] চৈতন্যচরিতামৃত, ১।১৩।১০২

[18] ঐ, ৩।১৮।৬০৬

[19] চৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস, শেষ খণ্ড, বঙ্গবাসী, কলকাতা, ১৩২০, পৃঃ ১৪৮

গ্রন্থে অনেক জায়গায় বৈষ্ণব-আদর্শ লঙ্ঘন করেছেন। সেজন্য এই গ্রন্থটি বৈষ্ণবসমাজে অনুমোদন লাভ করেনি।

মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে জয়ানন্দ লিখেছেন ঃ

আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিভাগ নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্টি দিবসে।
সেই লক্ষে টোটা এ শয়ন অবশেষে ॥
মায়া-শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥[২০]

রথযাত্রার সময় নাচতে গিয়ে মহাপ্রভুর বাঁ পায়ে ইটের আঘাত লাগে এবং ষষ্ঠ দিনে পায়ের ব্যথা খুব বেড়ে যায়। তার ফলে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে গিয়ে তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। "মায়া-শরীর থাকিল ভূমে পড়ি"—কিন্তু এই মায়া-শরীরের যে কি হল, জয়ানন্দ সেবিষয়ে কোন কথাই বলেননি।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে রয়েছে ঃ

একদিন গোরা জগন্নাথ নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল 'হা নাথ' বলিয়া ॥
প্রবেশ মাত্রতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল ॥
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিল।
গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈল ॥

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তমকে বলেছেন ঃ

ওহে নরোত্তম এই স্থানে গৌরহরি।
না জানি পণ্ডিতে কি কহিল ধীরি ধীরি ॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥

উড়িষ্যার কবি ঈশ্বরদাস 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে মহাপ্রভুর অন্তিম লীলা সম্বন্ধে লিখেছেন, চন্দন যাত্রার সময় মহাপ্রভু জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপে দিয়েছিলেন। জগন্নাথ আনন্দিত হয়ে মহাপ্রভুকে কোলে নিয়ে শ্রীমুখ বিস্তার করে মহাপ্রভুকে গ্রাস করলেন। সকলে দেখল জগন্নাথ চৈতন্যরূপ ধারণ করেছেন।

জগন্নাথ মন্দিরে মুক্তিমণ্ডপে ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবত' পাঠ শুনে বাসুদেব তীর্থ নামে একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী ঈশ্বরদাসকে প্রশ্ন করেন—"মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের অঙ্গে লীন হয়েছেন, একথা লিখলেন কেন?" অনেক পীড়াপীড়ি করাতে ঈশ্বরদাস বললেন, "এ বড় গোপন কথা"। ঈশ্বরদাস পরে তার 'চৈতন্যভাগবতে' আর একটি অধ্যায় রচনা করেন। তাতে তিনি লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্যের মায়া-শরীর পড়েছিল মন্দিরে। সিংহাসন থেকে ত্রৈলোক্যমোহন জগন্নাথ তা দেখে ক্ষেত্রপালকে (মন্দিরের এক দেবতা) আদেশ করলেন—'এ পিণ্ডশরীর অন্তরীক্ষ-পথে বেগে বহন করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গা জলে বিসর্জন দাও।' ক্ষেত্রপাল জগন্নাথের আজ্ঞা পালন করলেন।"[২১]

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা লিখেছেন। কেউ লিখেছেন, মহাপ্রভু বিলীন হন জগন্নাথ মন্দিরে, কেউ লিখেছেন গুণ্ডিচা বাড়িতে, কেউ লিখেছেন টোটা গোপীনাথে, আবার কেউ লিখেছেন সমুদ্রে। তাঁর অন্তর্ধানের সময় এবং তারিখ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া (ঈশ্বরদাস), কেউ বলেছেন আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী রাত্রি দশটা (জয়ানন্দ), আবার কেউ বলেছেন আষাঢ় শুক্লা সপ্তমী রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর (লোচনদাস)। এই সব পরস্পরবিরোধী মতবাদ থেকে মনে হয়, মহাপ্রভুর তিরোধানের উপরোক্ত বর্ণনার কোনটাই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, এবং মহাপ্রভুর মরদেহও পাওয়া যায়নি। যদি তাঁর মরদেহ তাঁর অনুগামীরা পেত, তাহলে নিঃসন্দেহে সেই দেহাবশেষের উপর বিরাট মন্দির তৈরি হতো। রাজা প্রতাপরুদ্র এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের সেইটি হতো একটি বড় সান্ত্বনার স্থান; আর সেখানে সারা ভারতের অজস্র ভক্তেরা যুগ যুগ ধরে তাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে এই দেব মানবের পূজা করত।

উড়িষ্যার সেই সময়কার সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে জানা যায়, কটক দুর্গের অধ্যক্ষ গোবিন্দ বিদ্যাধর, রাজা প্রতাপরুদ্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুকে সাহায্য করেন।

---

[২০] চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, উত্তর খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ২৩৬

[২১] ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য—নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, রত্নাবলী, ১৩৯২, পৃঃ ২২২

গোবিন্দ বিদ্যাধর অত্যন্ত হীন চরিত্রের মানুষ ছিলেন এবং প্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে অর্থ ও ক্ষমতা লাভ করে তিনি ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্রকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন (১৫৪০-৪১ খ্রীঃ)। আবার বিদ্যাধরের নাতি নরসিংহকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি মুকুন্দদেব হরিচন্দন সিংহাসনে বসেন। এইভাবে গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাতে দেশ ও জাতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।[২২]

কেউ কেউ মনে করেন, গোবিন্দ বিদ্যাধর বা তার মতো প্রতাপরুদ্রের কোন প্রতিপক্ষ মহাপ্রভুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করা। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, "সেকালে শ্রীচৈতন্য অধিকাংশ উড়িষ্যাবাসীর উপাস্য হয়ে উঠলেও (১) জনগণ ও রাজার উপর তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ আশঙ্কিত হয়েছিল, (২) 'জগন্নাথ দারুব্রহ্ম, আর চৈতন্য তাঁর সচল বিগ্রহ'—এই জাতীয় প্রচার জগন্নাথ সেবকদের একাংশের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, (৩) চৈতন্য ও তাঁর সহচরদের জাতিভেদ-বিরোধী প্রচার ও ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের জীবিকায় এবং সামাজিক মান-মর্যাদায় ঘা পড়েছিল—দলিত সর্পের মতো তারা হিংস্র হয়ে উঠেছিল এবং (৪) বিদ্যাধরের মতো অভিসন্ধি-পরায়ণ রাজনীতিক ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এইসব বিক্ষুব্ধ ধর্মান্ধদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল—এটাই স্বাভাবিক। এই অশুভ আঁতাতের মধ্যেই সম্ভবতঃ নিহিত আছে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের মূল কারণ।"[২৩]

উড়িষ্যার উপরি-উক্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা জানা দরকার।

জয়ানন্দ লিখেছেন যে, রথের সময় মহাপ্রভুর পায়ে ইঁটের আঘাত লাগে এবং তাতেই তাঁর দেহত্যাগ হয়; তাঁর মায়া-শরীর টোটা গোপীনাথে পড়েছিল। তাই যদি হবে, তবে ঐ শরীর কোথায়, কি ভাবে, সমাহিত করা হয়, সে-সম্বন্ধে চৈতন্য-অনুরাগীরা কেউ-ই কিছু জানতে পারলেন না, এটা বিশ্বাস করা যায় না।

লোচনদাস, ঈশান নাগর এবং উড়িষ্যার কবিরা, যাঁরা মহাপ্রভুর বিষয়ে লিখেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একমত যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের অঙ্গে বিলীন হয়েছেন। পণ্ডিতেরা অনেকে সন্দেহ করেন, উড়িষ্যার তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, দুষ্কৃতকারীরা আগে থেকেই ষড়যন্ত্র করে মহাপ্রভু গর্ভমন্দিরে ঢুকতেই আচম্বিতে দরজা বন্ধ করে দেয়। এইভাবে তারা মহাপ্রভুকে তাঁর স্বজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এদিকে মন্দিরের বাইরে থেকে যখন দরজা খোলার জন্য বার বার চিৎকার হতে থাকে, তখন দুষ্কৃতকারীদের একাংশ প্রচার করে দেয় যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের অঙ্গে মিশে গেছেন। তখন অনেকেই বিশ্বাস করতেন, মহাপ্রভু জগন্নাথের-ই সচল বিগ্রহ। জগন্নাথ-ই তাঁর সচল বিগ্রহকে আত্মসাৎ করেছেন শুনে অনেকেই হয়তো তা বিশ্বাস করে থাকবে। সেইজন্য তারা শ্রীচৈতন্যের মায়া-শরীর সম্বন্ধে আর খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। আবার সেই সময় মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বিষয়ে কারও কারও মনে সন্দেহ হয়েছিল।

ঈশান নাগর লিখেছেন ঃ

প্রবেশ মাত্রতে দ্বার রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল।

এই আশঙ্কার কারণ কি? আবার মন্দির খোলা মাত্র "গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈল"—এই অনুমানের-ই বা কারণ কি ছিল? কেউ কি এই নৃশংস ঘটনার কোন পূর্বাভাস পেয়েছিলেন?

ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবতের' বিবরণীতে এই সন্দেহের একটা আভাস পাওয়া যায়। আকস্মিক মন্দিরদ্বার বন্ধ হওয়া এবং জগন্নাথের অঙ্গে মহাপ্রভুর বিলীন হবার কথা প্রচার হতেই, মন্দিরে একটা বিশৃঙ্খলা এবং ভয়মিশ্রিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। সেই সুযোগে দুষ্কৃতকারীদের অপর অংশ গোপনে মহাপ্রভুর মরদেহ বহু দূরে নিয়ে গিয়ে কোন নদীতে বিসর্জন দেয়। প্রশ্ন ওঠে—

---

[২২] পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, রত্নাবলী, ১৩৯২, পৃঃ ৩১০

[২৩] ঐ, পৃঃ ৩১০

রাজা প্রতাপরুদ্র এবং জনসাধারণ কি মহাপ্রভুর দেহের সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর করেননি, এবং করে থাকলে ঐ বিষয়ে তাঁরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ?

"ঈশ্বরদাস বলেছেন তিনি তাঁর গুরুর কাছে চৈতন্যদেহ বিসর্জনের 'অত্যন্ত গুপ্ত এহু কথা' শুনেছেন। চৈতন্য তিরোধানের পর ঈশ্বরদাসের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ 'একশ' 'দেড়শ' বছর একথা গুপ্ত রইল কি ভাবে? হয়তো এর আগে যাঁরা জানতেন, রাজদণ্ডের ভয়ে তাঁরা একথা প্রকাশ করতেন না। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী, কেউ এসবের মূলে না থাকলে এমন নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা এবং সমকালীন ভক্ত-কবিদের চৈতন্য-দেহ বা চৈতন্য-সমাধি সম্পর্কে এমন লোহ-কঠিন নীরবতা সম্ভব হতো না। এ সবই আবার প্রতাপরুদ্রের পুত্র-হন্তা, সিংহাসন দখলকারী ও ভোই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ বিদ্যাধরের দিকে সন্দেহের তীর ফলকটি সঞ্চালিত করে।"[২৪]

তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়। উড়িষ্যার বসবাসকারী লোকেরাই না হয় রাজদণ্ডের ভয়ে চৈতন্য-তিরোধানের কথা গোপন করেছেন; কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর যেসব ভক্তেরা গৌড় দেশ কিম্বা বৃন্দাবনে চলে যান, তাদের তো সে ভয় ছিল না। তাছাড়া সেই সময় বহু উড়িষ্যাবাসী মহাপ্রভুকে জগন্নাথের সচল বিগ্রহ বলে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। রাজশক্তির পরিবর্তনের পরেও তাঁরা এই মহামানবের অন্তর্ধান প্রসঙ্গে ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু বলেননি অথবা কোথাও কিছু লিখে যাননি, একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সময় নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে ছিলেন। জয়ানন্দ লিখেছেন—"চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি"—এই সংবাদ পেয়ে তিনি প্রথমে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান। পরে বৈষ্ণবেরা যাতে হতাশ হয়ে না পড়ে, তার জন্য তিনি সদর্পে ঘোষণা করেন ঃ

নিত্যানন্দ স্বরূপে জদি নাম ধরোঁ।
আচণ্ডাল আদি জদি বৈষ্ণব না করোঁ॥
জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
প্রেমভক্তি দিআ সভাএ নাচামু কীর্তনে।[২৫]

মহাপ্রভুর তিরোধানে নিত্যানন্দ প্রভুর এই ছিল প্রতিজ্ঞা—'চণ্ডাল ও যবনে জাতিভেদ করব না, প্রেমভক্তি-প্রবাহে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব।'

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বিষয়ে এ-পর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। 'সাড়ে চারশ' বছর আগে যে রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে মহাপ্রভুর দেহত্যাগ হয়েছিল, তার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা হবে এবং সেইসব নূতন তথ্যের আলোকে হয়তো একদিন এই যবনিকার অপসারণ সম্ভব হবে।

শ্রীভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন মুখ্যতঃ লীলাবিলাসের জন্য; পৃথিবীতে আসবার পর আনুষঙ্গে তিনি দুষ্টের দমন এবং ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন। আসল উদ্দেশ্য লীলা বিলাস—খেলা করা। এই লীলা বিলাসের সবটাই তাঁর কাছে আনন্দদায়ক। তিনি আনন্দস্বরূপ; সুতরাং তাঁর কাছে তাঁর বাল্য লীলা যেমন আনন্দময়, কৈশোর ও যৌবন লীলাও তেমনি আনন্দময়। আবার মহাপ্রভুর বেলায় তাঁর গম্ভীরা লীলাও সেই রকমই আনন্দময়—যদিও সেই আনন্দের বহিঃ প্রকাশ দেখতে পাই তীব্র দুঃখ-কষ্টের আবরণে। "বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়।"[২৬] সেই ভাবে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলাও তাঁর কাছে আনন্দময়, যদিও ভক্তের কাছে তা পরম দুঃখদায়ক। আমরা দেখি, লীলার বিশেষ পোশ্টাই তখনই হয়, যখন সেই লীলার মধ্যে একটু লুকোচুরির ভাব থাকে। মহাপ্রভু তাঁর অন্তর্ধানকে রহস্যময় করে এই লীলার বিশেষ পোশ্টাই করে গেছেন। এখনও গবেষকেরা তাঁর অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে তাঁরই চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকেন; আর সাধারণ মানুষ, আমরা, তাঁর আধ্যাত্মিক ভাববিহ্বলতার সাথে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে কোল দেবার এবং প্রেমভক্তি বিতরণের আগ্রহ দেখে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁরই কথা ভাবতে থাকি—এই তো পরম লাভ!

[২৪] পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পৃঃ ৩১১-১২

[২৫] চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ, উত্তর খণ্ড, পৃঃ ২৩৫

[২৬] চৈতন্যচরিতামৃত, ২।২।১৫২

বিবেকানন্দ-মূল্যায়নের সাম্প্রতিক ধারা

তাপস বসু

১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যায়ন চলেছে দেশ জুড়ে। এই মূল্যায়নে ভারতের জাতীয় জীবনে, জাতীয় সমস্যা-সমাধানে, জাতীয় সংহতি রক্ষায় বিবেকানন্দ-চিন্তা কতটা মৌলিক এবং প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে যেমন আলাপ-আলোচনা চলছে, লেখালেখি হচ্ছে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ; তেমনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, জাতীয়তাবোধের বিকাশে বিবেকানন্দের ভূমিকার উজ্জ্বলতাকেও ঠিক ঠিক ভাবে পরখ করার চেষ্টা চলেছে। এসব ছাপিয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে নানা বিষয়—বিশেষতঃ স্বামীজীর সমাজ-অর্থনৈতিক ভাবনা। স্বামী বিবেকানন্দের চেতনার আকাশ জুড়েই ছিল মানুষ, মানুষ আর মানুষ তাঁর প্রথম কথাটি মানুষ, মাঝের কথাটি মানুষ এবং শেষের কথাটিও মানুষ। ভারতবর্ষের শোষিত, নিপীড়িত মানুষজনের উন্নতির বিষয়টি ছিল স্বামীজীর সমাজ-অর্থনৈতিক ভাবনার প্রধান আলম্বন। 'উন্নতি' বলতে তিনি শুধু আর্থিক উন্নতির কথাই বলেননি, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সচেতনতার মধ্য দিয়ে আত্মোন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আত্মোন্নতি, আত্মবিকাশ, আত্মবিশ্বাস, আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরশীলতা—এসব শব্দ স্বামীজীর বক্তৃতায়, আলোচনায়, চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে বারবার উঠে এসেছে। ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে স্বামীজী শূদ্র-জাগরণের অবশ্যম্ভাবী বিষয়টি দৃপ্তভাবে ঘোষণা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও তিনি নির্দিষ্ট পথনির্দেশও করেছেন। সাম্প্রতিককালে বিবেকানন্দ-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে এবং পাচ্ছে বিশেষভাবে।

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষকে নিয়ে স্বামীজীর 'উন্নত অহংকার' ছিল। আসলে স্বামীজী পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে ভারতবর্ষের প্রকৃত চেহারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পূর্ব-ভারতে তাঁর ধর্মসিদ্ধি, সেই সিদ্ধির ফল পশ্চিম-ভারতের ঊষর ভূমিতে পেঁৗছে দিয়ে মানুষের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন, আবার উত্তর-ভারতের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তিনি মানুষের মুক্তির যে গন্ধ বুকে নিয়েছিলেন তাই পেঁৗছে দিয়েছিলেন দক্ষিণ-ভারতের পথে-প্রান্তরে। ভারতবর্ষের প্রকৃত চেহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই স্বামীজী অভিজাত মানুষজনের উদ্দেশে বলতে পেরেছিলেন: "তোমরা শূন্যে বিলীন হও"। নতুন ভারত বেরিয়ে আসুক দীর্ঘদিনের প্রপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত, অন্ত্যজ গোত্রের মানুষজনের "ঝুপড়ির মধ্য থেকে"—এও ছিল তাঁর গভীর অভীপ্সা। তাঁর দৃপ্ত ভাষায় আমাদের সামনে ঝলসে উঠেছে তাবৎ অত্যাচারী মানুষের মুখ আর খোদিত হয়ে গিয়েছিল নতুন ভারতবর্ষের রঙিন ছবি আমাদের মনের মণিকোঠায়। শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হয়ে অবহেলিত, পাশ্চাত্য মানুষজনের কাছে অজ্ঞাত তাঁর প্রিয় ভারতবর্ষ—যা প্রজ্ঞায় সংহত, চৈতন্যে উদ্দীপ্ত; দাসত্বের ধূলি সরিয়ে উন্নত অহংকারে তাকে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাণস্পন্দন আমরা শুনতে পেয়েছি তাঁর মধ্যে। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর কাছে "যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসী।" তাঁর সমকালের ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি সত্যিই তাঁর পদচিহ্নের পদাবলী হয়ে দেখা দিয়েছে।

॥ ৩ ॥

১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে বিভিন্ন বাঙলা পত্র-পত্রিকায় স্বামী মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যে-সকল প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—তার মধ্যে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৯০তম বর্ষের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক ভারত গঠনে

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান' এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক হোসেনুর রহমানের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও আজকের ভারতবর্ষ" প্রবন্ধ দুটি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মবোধ, সমাজের কল্যাণ, মানুষে মানুষে আত্মিক বন্ধন, গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জাতীয়তাবোধের বিকাশে স্বামীজীর প্রভাব কিভাবে সূচিত হয়েছে সেই ছবিই তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক নানা তথ্য ও তত্ত্বের উপস্থাপনায়। প্রবন্ধের শেষে আজকের ভারতবর্ষে স্বামীজীর কল্যাণকামী চিন্তা-ভাবনার সবটা যে রূপায়িত হয়নি তাও উল্লেখিত হয়েছে এইভাবে ঃ "স্বামীজীর চিন্তায় যা ছিল, বাস্তবে তা সবসময় রূপায়িত হয়নি। সেই রূপায়ণের দায়িত্ব স্বামীজী দিয়ে গেছেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দেশের শিক্ষিত, সৎ, কর্মনিষ্ঠ যুবসমাজের কাছে।" ভারতবর্ষের যুবসমাজকে স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা, আহ্বান কিভাবে উদ্বোধিত করেছে তার বিবরণ আছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের মাসিক মুখপত্র 'ভারত বিচিত্রা'র মার্চ (১৯৮৮) সংখ্যায়, হামদুল্লা ফারুখের প্রবন্ধ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় যুবসমাজ' নিবন্ধে।[১]

অধ্যাপক রহমানের প্রবন্ধটি নাতি-দীর্ঘ। অধ্যাপক রহমান সংক্ষিপ্ত পরিসরে আজকের ভারতবর্ষে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কোথায় এবং কতখানি সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছেন ঃ "আধুনিক মানুষ বিবেকানন্দ অনেক বেশি ব্যস্ত 'মানুষ' তৈরি নিয়ে। তিনি মানবতাবাদী সামাজিক মানুষ চান। হিন্দু চান না। মুসলমান চান না। সুস্থ, সবল, মুক্ত শিক্ষিত মানুষ চান। এবং এই ভয়ানক চাওয়া তিনি চেয়েছেন যখন আধুনিক পৃথিবী আনুষ্ঠানিক ধর্মের শৃঙ্খলে বাঁধা। আজ আমরা কি এইসব ভয়ানক চাওয়াকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ? পারিনি বলেই এসেছি বিবেকানন্দ ও তাঁর জীবন ও কর্মকে স্মরণ করতে। কারণ আজই তাঁকে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার।" মানুষকে মানুষের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল স্বামীজীর লক্ষ্য। সচেতন মানুষ চেয়েছিলেন। আজকের ভারতবর্ষে সেই সচেতন, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মানুষ একান্তভাবে কাম্য। স্বামীজীর কথাতে বলতে পারি—যথার্থ মানুষ পেলে অন্যান্য বিষয়গুলি অনায়াসেই কুসুমিত হয়ে উঠবে। যথার্থ মানুষের অন্বেষণের প্রসঙ্গটি অধ্যাপক রহমান ৩০ মার্চ ১৯৮৮ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধেও বিশ্বজনমন প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার ঐ বিশেষ ক্রোড়পত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিবেকানন্দের অমোঘ, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রেক্ষাপটেই প্রকাশিত হয়েছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক দুজনই রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ আন্দোলনের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্। দুজনেই সন্ন্যাসী ; পার্থক্য—একজন বয়সে, অভিজ্ঞতায়, মেধায়, অনুধ্যানে প্রবীণ, অপরজন বয়সে নবীন, অবশ্যই প্রজ্ঞায় ধনী। প্রথমজন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং দ্বিতীয়জন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। আজকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, যুদ্ধ আশঙ্কায় কম্পমান পৃথিবীকে ভারতবর্ষ পথ দেখাবে—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্বামীজীর উক্তির আলোকে বিষয়টি মনোজ্ঞভাবে পরিস্ফুটিত করেছেন—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ" নিবন্ধে। ভারতবর্ষের সংহত প্রজ্ঞা, বৈদান্তিক দর্শন, মানবিক চেতনায় সম্পৃক্ত অধ্যাত্মচিন্তার সূত্রে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীকে পথ দেখাবে স্বামীজী আমাদের সামনে তাঁর উজ্জ্বল অনুভবকে ঘোষণা করেছেন। স্বামীজীর সেই অনুভবজাত ঘোষণার রূপায়ণটি ব্যাখ্যা করে তার বাস্তবায়নের প্রসঙ্গটি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তুলে ধরেছেন নিবন্ধের শেষাংশে ঃ "আজ সমস্ত পৃথিবী পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ে আতঙ্কিত। বিজ্ঞান আজ 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' হতে চলেছে। পৃথিবী কি করে রক্ষা পাবে ? এইখানেই ভারতের ভূমিকা। ভারত বৈচিত্র্যময়। তবু ভারত ঐক্যে বিশ্বাসী। দ্বন্দ্ব একেবারে এড়িয়ে চলতে পারে না, তবে চেষ্টা করে। স্বামীজীর আশা ছিল—ভারত এক নতুন সমাজ গড়বে। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য হবে—সবার সমান মর্যাদা। এটা সম্ভব হবে যদি ঐহিক সম্পদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পদের মিলন ঘটে। বড় শহর,

---

[১] প্রবন্ধটি উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৯৫, সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

বড় অট্টালিকা, বড় রাস্তা, তার সঙ্গে বড় মাপের মানুষ। এই বড় মাপের মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ। এই দুই সম্পদের মিলনই স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে, ভারতকে আন্তর্জাতিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করবে।" স্বল্প কথায় প্রাঞ্জলভাবে স্বামীজীর ভাবনাটি এখানে আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন, অধ্যাত্মচিন্তা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ত্যাগ, ঐক্যভাবনায় সমন্বিত ভারতবর্ষ পৃথিবীর সামনে আলোকবর্তিকা রূপে উদ্ভাসিত হবে, তার সূচনা শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় ও ত্যাগের সুমহান আদর্শের মধ্যে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের সেই চিন্তারই প্রচারক।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 'আন্তর্জাতিক মানুষ' স্বামী বিবেকানন্দের দেশকে গভীরভাবে ভালবাসার উৎসভূমিটি 'চিহ্নিত' করেছেন: "ভারতকে তিনি ভালবাসতেন একটি গভীরতর কারণে। ভারত ছিল তাঁর কাছে দেবভূমি, পুণ্যভূমি। যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র তার প্রতীক ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে সত্যের প্রতীক, শান্তির প্রতীক, ঐক্যের প্রতীক। তাই বলেছেন—'তব তরে হের/ প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন / তব মৃত্যু নাহি কদাচন'।" সত্যিই তো এই ভারতবর্ষের কখনও মৃত্যু হতে পারে না। প্রবন্ধটিতে ভারতবর্ষের কাছে পাশ্চাত্য কি গ্রহণ করবে তার কথা আছে, আর আছে ভারতবর্ষকে একটি আদর্শ সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপায়িত করার বিষয়ে স্বামীজীর অভিমতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন বিপ্লবী জীবনতারা হালদারের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধে (উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫) এবং 'ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমি এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রবন্ধে (দেশ ৯ জানুয়ারি-৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮)।

॥ ৪ ॥

স্বামীজীর ভারতচিন্তার পাশাপাশি সমাজ—অর্থনীতিক ভাবনা নিয়ে বেশ কয়েকটি মননশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হয়েছে স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে স্বামীজী নতুন ভারতগঠনের যে আহ্বান রেখে গিয়েছেন—তার মধ্যেই সীমায়িত হয়ে আছে তাঁর সমাজভাবনার বিষয়টি। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুনানক অধ্যাপক অমলেন্দু দে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় (আগস্ট, ১৯৮৮) 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজভাবনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা' শিরোনামে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন সেই দীর্ঘ প্রবন্ধে স্বামীজীর সমাজভাবনার উৎস, ভিত্তি এবং তার বাস্তবায়নের বিষয়টি ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসা, তথ্য বিশ্লেষণ, দেশীয়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটিকে প্রাবন্ধিক তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন—(১) সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব ও অগ্রগতি: ইউরোপে এবং ভারতে ধর্ম সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রীদের মনোভাব; (২) বিবেকানন্দের সমাজভাবনা (৩) ভারতের বর্তমান সামাজিক—রাষ্ট্রিক গঠনে বিবেকানন্দের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব ইউরোপে কিভাবে হয়েছিল তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক দে ইংলণ্ডের ওয়েনপন্থী এবং ফ্রান্সের ফুরিয়েপন্থী ইউরোপীয় মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে পুঁজি ও মুনাফার বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে সামাজিক অবিচার দূর করার বিষয়ে তত্ত্ববিদ্‌গণ এক ধরনের সমাজবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস পূর্ব প্রচলিত মতবাদ ও তত্ত্বের আমূল সংস্কার করে গতিশীল করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে। রামমোহনের সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা এবং ধর্মীয় বাতাবরণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ইংলণ্ডে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্প্রসারণে ১৮৭০-এ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমজীবী সমিতি' ছোটখাটো ভূমিকা নিয়েছিল। কার্ল মার্কসের সঙ্গে সংযোগের সূত্রপাতও ঘটে এই সময়। তবে এই সংযোগ দীর্ঘ কোন ভূমিকা যে নিতে পারেনি তা আমরা বুঝতে পারি—১৮৭৫-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' প্রবন্ধটি প্রকাশের সূত্রে। সেখানে মার্কস-এঙ্গেলসের ভাবনা প্রতিফলিত হয়নি, নামও উল্লেখিত হয়নি। যতদূর মনে হয় নীলচাষকে কেন্দ্র করে শ্রমজীবী মানুষজনের যে সমস্যা দেখা

দিয়েছিল তা নিরসনে সেই মুহূর্তে মার্কসীয় ভাবনায় আত্মস্থ হয়ে তার প্রয়োগ এদেশের মাটিতে সম্ভব ছিল না। এদেশের মানুষজনের সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করেই স্বামীজী নিজস্ব ভাবনায় তা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮৯৭-এ ভারতে ফিরে তিনি কলম্বো থেকে লাহোর পর্যন্ত যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন সেখানে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা রেখেছিলেন—জনগণের সাহায্যে জনগণের মুক্তি ঘটাতে হবে। ঐসব বক্তৃতায় তিনি সমাজতন্ত্র, মূলধন এবং শ্রমের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য সমাজে এগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েও মন্তব্য করেছেন। এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সার্থক প্রবক্তা রূপে আমরা স্বামীজীকেই অভিহিত করব। তাঁর আগে যে প্রয়াস আমরা দেখি তা ছিল অসম্বদ্ধ, খণ্ডিত। স্বামীজী তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন শূদ্রজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। এবং তা প্রথম আসবে রাশিয়ায় ও তারপর চীনে। স্বামীজীর অনুমান মিথ্যে হয়নি। এদেশে শূদ্রজাগরণের ক্ষেত্রে মার্কসীয় ভাবনা নয়, ভারতীয় নিজস্ব ভাবনা যা বেদান্তের সূত্রে গ্রথিত তাকেই আদর্শ বলে অভিহিত করেছেন স্বামীজী। অধ্যাপক দে প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে স্বামীজীর সমাজভাবনার ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—অদ্বৈত বেদান্তের সূত্র ধরেই বিবেকানন্দ "এক শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজ" গড়ার স্বপ্ন দেখেন। এই চিন্তা কোথাও ধার করা নয়, ভারতের নিজস্ব চিন্তা। অদ্বৈত বেদান্তেই তা পাওয়া যায়। কিন্তু, এই সমাজ কেমন হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদ করে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠেছে।" প্রবন্ধের তৃতীয় পর্বে আজকের সমাজ পটভূমিতে স্বামীজীর সমাজভাবনা কার্যকরী করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে সব শেষে যে মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন নিঃসন্দেহে তাতে মার্কসিস্ট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর ভাবনার মৌলিকতাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে: "বস্তুতঃ ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক গড়নের দিকে তাকালেই বিবেকানন্দের সমাজভাবনার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি হয়। ব্যক্তির সততার উপরে তিনি যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তার প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনধারায় অপরিসীম, তা বলাই বাহুল্য। ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসও গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর 'অ্যানটি ডুয়িং' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস লেখেন—'Society cannot free itself, unless each individual is freed'. সম্প্রতি চীনেও 'সমাজতান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সভ্যতা' গড়ার জন্যে 'ব্যক্তির মুক্তি'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিবেকানন্দের সমাজভাবনাতেও তার উপাদান পাওয়া যায়। খাঁটি মানুষরাই সুস্থ সবল সমাজ গঠনে সহায়ক হতে পারে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। এই খাঁটি মানুষ গড়ার দায়িত্ব পালনে বিবেকানন্দের দিকে আমাদের তাকাতে হবে।"

আরো একজন মার্কসিস্ট বুদ্ধিজীবী, স্কটিশচার্চ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তরুণ সান্যাল আনন্দবাজার পত্রিকার উল্লেখিত ক্রোড়পত্রে 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-আর্থনীতিক ভাবনা' প্রবন্ধে স্বামীজীর ভাবনায় সমাজের রূপরেখা কিভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিল—তা তুলে ধরেছেন। স্বামীজীর সমাজভাবনার শূদ্রের অধিকার সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই 'শূদ্র' বলতে স্বামীজী ঠিক কাদের অভিহিত করেছেন—তা অধ্যাপক সান্যাল অন্বেষণ করেছেন তাঁর প্রবন্ধের মধ্যভাগে: "স্বামী বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক চিন্তার মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রী ভারতের কল্পনা আছে। এখানেই তিনি ভারতের শোষণ-শাসনের নিপীড়িত মানুষের উত্থান আকাঙ্ক্ষা নিপীড়িত উচ্চবর্ণ মানুষের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়েছেন, তিনি ভাবী শূদ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কেই উৎসাহ বোধ করেছেন। এই শূদ্রত্ববোধ কেবল ভারতীয় নিম্নবর্ণের মানুষদের বিষয়েই তাঁর ছিল না, কার্যতঃ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ-শাসনে জর্জর গোটা ভারতীয় জাতি তাঁর বিচারে ছিল শূদ্র। দু-ধাপের শূদ্রত্ব ভারতে তখন বিরাজ করছিল। ইংরেজ শাসকের কাছে সমগ্র ভারতবাসীর শূদ্রত্ব ও উচ্চবর্ণের নিপীড়নের ফলে নিম্নবর্ণের শূদ্রত্ব।" সমাজভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশ্চিমী

বৈশ্য সভ্যতার বিপরীতে ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত 'ধর্ম'-বোধ যুদ্ধমহিমা যেমন তুলে ধরেছিলেন, তেমনি রেখেছিলেন দেশের মধ্যে নতুন সমাজ অর্থনীতি গড়ে তোলার কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর কথা প্রবন্ধের শেষাংশে অধ্যাপক সান্যাল তুলে ধরেছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে এবং সর্বমানবের ঐক্যসূত্রের ভিত্তি, চিহ্নিত করেছেন বিবেকানন্দ-কথিত 'বৈদান্তিক মানবধর্মে'র উল্লেখে। প্রবীণ মার্কসবাদী রাজনীতিক, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনে শুধু নয়, বিশ্বের পরিবর্তনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, কর্ম ও বাণীকে খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় মনে করেন। মার্কসীয় তত্ত্বের উল্লেখে দেশ পত্রিকায় (১৬ জুলাই, ১৯৮৮) তিনি লেখেন—"মার্কস-এর মূল মন্ত্র ছিল ঃ 'দর্শনশাস্ত্রীরা বিশ্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নানাভাবে। কিন্তু চাই এই বিশ্বের, পরিবর্তন।' এ মন্ত্রের সাধনে বিবেকানন্দের জীবন কর্ম ও বাণী যে সহায়ক শক্তি, তা বলতে কুণ্ঠা নেই……।"

আরো একজন প্রবীণ মার্কসবাদী লেখক গোপাল হালদার 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯৮৮) প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধে একালে বিবেকানন্দ মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। প্রবন্ধের প্রথম পর্বে ব্যক্তিজীবনে বিবেকানন্দের দ্বারা কিভাবে উদ্বোধিত হয়েছিল তাঁর বিপ্লবী চেতনা, সেকথা উল্লেখ করেছেন ঃ "বলা বাহুল্য, স্বামীজী তাঁর আধ্যাত্মিক আদর্শ আর অদ্বৈতবাদের আলোকে সেই সমাগত ভবিষৎকে মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর করবার কথাও বিশেষরূপেই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তথাপি আমরা তাঁকে জেনেছি প্রধানতঃ আমাদের নতুন কালের যুগনায়করূপে, অতীত ভারতের মহা প্রবক্তারূপে, এবং আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষা আর আলোকে জাতীয় আদর্শের পথনির্দেশক হিসেবে। সামাজিক কুসংস্কারের অন্ধকারমুক্ত নতুন সমাজের উদ্বোধক হিসেবে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ধনী-দরিদ্র, শূদ্র-ব্রাহ্মণ—সকল ভারতবাসীর সমানাধিকারের প্রবক্তা হিসেবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি ভেদোত্তীর্ণ প্রাণবান নতুন জীবনের উদ্বোধক হিসেবে।" প্রবন্ধের মধ্যভাগে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন—একথা শ্রীহালদার উল্লেখ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটি দীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করে স্বামীজীর জীবন ও কর্মধারার স্বরূপটিও তিনি তুলে ধরেছেন। স্বামীজীর দেহান্তরের পর তাঁর চিন্তাধারা ভারতবর্ষের পক্ষে কতটা জরুরী হয়ে উঠেছিল তার কথা শ্রীহালদার তুলে ধরেছেন ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে মেনে—"…তখন থেকেই (আনুমানিক ১৯২০) একদিকে বিবেকানন্দের শিক্ষা ক্রমশঃ জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে বাংলা ছাড়িয়ে ভারতের নানা প্রান্তে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—সমস্ত পবিত্র প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের সম্পদ হয়ে গেল।" প্রবন্ধের শেষাংশে শ্রীহালদার খানিকটা সংশয়াসক্ত হয়ে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। দুটি মন্তব্য এখানে উধৃত করছি ঃ "বিবেকানন্দ বাস্তব জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলেও আমাদের আরও সংশয় থেকে যায়। তিনি যে—স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তা জাতির —জনসাধারণের স্বাধীনতা। কৃষক-মজুর প্রভৃতি জনসাধারণের স্বাধীনতা। কৃষক-মজুর প্রভৃতি উৎপাদনশীল শ্রেণীর হাতে (শূদ্রদের) শাসনক্ষমতা না দিলে সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় না। একথাটি তাঁর মনে উঁকি দিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক এই বাস্তব ভাবাদর্শ এবং কর্মকাণ্ডের দিকে পা না বাড়িয়ে, বরং শ্রীরামকৃষ্ণের থেকেই যে ভক্তি এবং মানব প্রেম প্রভৃতি লাভ করেছিলেন, তা আশ্রয় করে অধ্যাত্ম বিশ্বাস অবলম্বন করে রইলেন। নিজের আশৈশব ভগবৎ চেতনার মধ্যে নিজেকে, মহৎ প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন।"

"আন্তরিক মার্জনা ভিক্ষা করেই বলতে চাই নিজের শেষ সংশয়ের কথা। কাল তো থেমে থাকে না, ইতিহাসে যুগের পর যুগান্তর আসে। বিবেকানন্দ একটা যুগান্তরের শেষে যতদূর পেরেছেন ভাবীযুগকে দেখেছেন, কিন্তু ১৯১৭ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নতুন যুগ (যাকে তিনি মনে করেছিলেন শূদ্রের যুগ) যে সত্যই শোষক শ্রেণীর দাবি নিয়ে উদ্ভব হবে তা সম্পূর্ণ তাঁর অগোচর হওয়ার কথা নয়।……যা বিবেকানন্দ বলেছেন, মুখ্য বা গৌণ, তাই একমাত্র অবলম্বনই নয়, যুগধর্মে তার

মধ্যেই কিছু যদি নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়ে থাকে, তবু তার একটুও ত্যাজ্য, পরিবর্তনীয় হবে না—নিশ্চয়ই এরূপ আচরণ বা তথাকথিত সাধনা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নয়। তাই মঠ আর মিশনে, পূজা, আচরণে, বিধানে নিয়মে, পুরোহিততন্ত্র, আর সনাতন বিধি নিয়ম, সেগুলো অক্ষরে-অক্ষরে সর্বত্র প্রতিপালন কি এখনো প্রয়োজন ?" শ্রীহালদারের সংশয়াচ্ছন্ন মন্তব্য-দুটির মধ্যে সঠিক মূল্যায়নের গতি রুদ্ধ হয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে বলতে পারি—শূদ্রজাগরণের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে শ্রীহালদার বিবেকানন্দকে যে রূপে দেখতে চেয়েছেন তার সঙ্গে বিবেকানন্দের ৩৯ বছরের জীবনের শেষ ১০ বছরের হিসেব না মেলাই স্বাভাবিক। শ্রীহালদার কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে যুক্ত, তার আগে স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছিলেন। 'শূদ্রজাগরণ'-এ সশস্ত্র বিপ্লব কিংবা শূদ্রদের নিয়ে সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল—শ্রীহালদার এমনটিই বুঝেছেন। স্বামীজীর মত ও পথটা ছিল স্বভাবতই স্বতন্ত্র। উপর থেকে নেতৃত্বের অঙ্গুলিনির্দেশ তিনি চালাননি। শিক্ষা-সচেতনার মধ্য দিয়ে তাদের আত্মজাগরণের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি। প্রত্যেকে যদি অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে তাহলেই কাঙ্ক্ষিত জাগরণ ঘটবে যথার্থ-ভাবে—নচেৎ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জাগরণে 'শূদ্রেরা' গৌণ হয়ে যাবে, মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা। দ্বিতীয়তঃ শ্রীহালদার স্বামীজীর মানবসেবা ও অধ্যাত্মচেতনা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন—এর উত্তরে বলা যায় শূদ্রজাগরণের প্রেক্ষাপট; অভিজাতদের শূন্যে বিলীন হওয়া এবং অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষজনদের মধ্য থেকে নতুন ভারতের আবির্ভাব—স্বামীজীর এই অভীপ্সা মানবসেবার আদর্শ এবং বৈদান্তিক চেতনা থেকেই উৎসারিত। আর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই সেই উৎসের প্রবাহ আর স্বামীজীর তাতেই অবগাহন। পরের মন্তব্যটির মধ্যেও স্বামীজীর উত্তরসূরীদের 'সনাতন বিধি' বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী তো প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে আধুনিক ভাবধারা সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর ভাবানুরাগীরা তা অনুসরণ করেছেন যুগধর্ম অনুযায়ী। তাঁরা তো সনাতনী পুরোহিততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষণ করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীকে অনুধ্যান, অর্চনার, মধ্য দিয়ে তাঁদের কাজে—আত্মনিবেদনে শক্তি সঞ্চয় করেন। শ্রীহালদার গতানুগতিক পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের রামকৃষ্ণ আরাধনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এটি তাঁর ভ্রান্তি। দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রসারিত কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় শুধুই মঠ-মিশনের পূজা-আচরণ, বিধি-নিয়মই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। স্বামীজী সম্পর্কে এখন থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে শ্রীহালদার যে অভিমতটি জ্ঞাপন করেছিলেন তাঁর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে এ-সংশয় নিরসনের সূত্র আমরা খুঁজে পাব ঃ "তাঁর সাধনাই তো সমস্ত ধনতন্ত্রের মধ্যে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে আমাদের প্রেরণা দান করেছে যার ফলে পৃথিবীর বিরাট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা অগ্রসর হতে পেরেছি। আজ যদি তাঁর সাধনার কিছুমাত্র আমাদের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে এই যে দুর্দশাগ্রস্ত এবং দৈন্যগ্রস্ত স্বাধীনতার সার্থক রূপ দিতে আমরা অসমর্থ হয়েছি, সেই পরাজয়ের গ্লানিও আমরা নিশ্চয়ই মোচন করতে পারব।"[২]

জাতীয়তাবোধের বিকাশে এবং আধুনিক ভারত নির্মাণে স্বামীজীর ভূমিকা মূল্যায়ন করে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দুটি পত্রিকায়। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি'তে (৭ অক্টোবর ১৯৮৮) প্রকাশিত অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ পর্বটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, আর দ্বিতীয়ভাগে আছে—সেই জাতীয়তাবাদের বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা। আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। সাম্প্রতিক কালে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে নতুন তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্রে

---

[২] স্বামীজী প্রসঙ্গ, পীযুষকান্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (১৯৭১), পৃঃ ১৯-২০

বিবেকানন্দের মূল্যায়নে আরও তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণার গতিপ্রবাহের সঙ্গে যোগ না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখায় হাত দিলে তথ্য-বিচ্যুতি ঘটতেই পারে। প্রবন্ধের শেষাংশে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন: "বিবেকানন্দ শুধু সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে ভারতীয় জনগণের মুক্তি চাননি, তিনি ইংরেজের দাসত্ব থেকেও ভারতবর্ষের মুক্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে, স্বামীজী ভারতে ইংরেজ শাসনের অপকীর্তির প্রচুর নিন্দা করলেও ভারতের মাটি থেকে তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপসারণের দাবি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেননি।" অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যটি তথ্য-সমর্থিত নয় তা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। ১৩ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টারের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মেরী লুইস বার্ক, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁদের গ্রন্থে এবিষয়ে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ দিয়েছেন। ভারতবর্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ-শক্তিকে অপসারণের যে আন্দোলন প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকে বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে ধিক্কার জানিয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্তকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতেই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপসারণের সুস্পষ্ট ঘোষণা। এরপর নানা বক্তৃতা, চিঠিতে—সব দেবদেবীকে সরিয়ে দেশ-জননীকে আরাধ্যা দেবীর আসনে বসিয়ে আরাধনার যে আহ্বান জানিয়েছেন তাতেও স্পষ্ট হয়েছে বিবেকানন্দের বক্তব্য। সঠিকভাবে বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহিংস, অহিংস—দু-স্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একথা আজ প্রমাণিত।

আরও একজন প্রবীণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী জলিমোহন কল স্টেটসম্যান পত্রিকায় (মিসেলেনী, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮) 'Vivekananda—The Apostle of Modernity' প্রবন্ধে স্বামীজীর মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন কিভাবে ঘটেছে তা নানা দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর জীবনের নানা পর্ব, নানা ঘটনা, নানা মন্তব্যের আলোকে প্রবন্ধটি লিখিত। স্বামীজীর চিন্তায় আধুনিকতার সূত্রগুলি কিভাবে এসেছে তা শ্রীকল উল্লেখ করেছেন এইভাবে: "The modernity of Vivekananda's outlook can be seen also in his attitude towards women, towards education and towards science and technology." স্বামীজীর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গ, জনগণের উন্নতি, নারী-সচেতনতা, বিজ্ঞান ও কারিগরীদক্ষতায় দেশের উন্নতি—এসব বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন শ্রীকল। সব শেষে স্বামীজীর চিন্তা ও ভাবাদর্শে ভারতবর্ষের ক্রমমুক্তি ঘটবে, আধুনিকতার উজ্জ্বল স্পর্শে, একবিংশ শতাব্দী দ্বারপ্রান্তে সেই প্রত্যয়ের কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন: "The life and teachings of Swami Vivekananda may be said to form a watershed dividing medieval from modern India. As we prepare to enter the 21st Century, the forces engaged in the struggle to make India a truly modern nation, to ensure that the country develops economically and politically and that the downtrodden masses are liberated could find in Swami Vivekananda the 19th century Saint, a powerful ally." ছাত্রাবস্থায় কম্যুনিস্ট যুব-সংস্কৃতি সংস্থা ও গণনাট্য সঙ্ঘ, তারপর সরাসরি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শ্রীকলের এই মূল্যায়নে তাঁর পরিণত চিন্তা প্রতিফলিত। ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে স্বামীজী সম্পর্কে যে মূল্যায়ন হয়েছে এবং হচ্ছে—তার অনেকটাই মার্কসবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের। তারই কয়েকটি আমরা এখানে তুলে ধরলাম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—স্বামীজী সম্পর্কে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা একসময় যে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছিলেন তার নিরসন ঘটিয়ে ক্রমাগত তাঁরা স্বামীজীর যথার্থ মূল্যায়নে ব্রতী হচ্ছেন এটি নিঃসন্দেহে সুখের। এ-প্রসঙ্গে মার্কসবাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি মনে পড়ছে। তাঁর কালে মার্কসবাদীদের বিবেকানন্দ সম্পর্কে মনোভাব ও সে-সম্পর্কে ডঃ দত্তের মন্তব্য আমরা উদ্ধার করতে পারি ঃ "ইদানিং মার্কসবাদ সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহী ধারণাযুক্ত ছোকরারা স্বামীজীকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে। তাঁর জীবনকালে সমাজসংস্কারকরা তাঁকে ঐ আখ্যা দিত, কারণ তিনি বলতেন না যে, কিছু বিধবার বিয়ে দিয়ে, কয়েকটি অসবর্ণ বিয়ে ঘটিয়ে ভারতের নবজাগরণ সম্পন্ন করা যাবে।... তাঁর মতে কাম্যবস্তু হল, 'জনগণকে শিক্ষা দিয়ে জগতের প্রগতিশীল মানুষের সর্বস্তরে উন্নীত করা।' আবার 'স্বামীজী তাঁর কালের বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন।'...তাই তারা যে তাঁকে বুঝতে পারেনি, বা ভুল বুঝেছিল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এইসব তথাকথিত সংস্কারকেরা, নিজেদের যারা প্রগতির ধ্বজাধারী মনে করত, তারা তাঁকে বলত প্রতিক্রিয়াশীল।' এবং একালের অজ্ঞ মেকি মার্কসিস্টরা তাঁকে বলে প্রতি-বিপ্লবী॥ স্থূলবুদ্ধি অজ্ঞরাই বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণী জ্ঞানের অভাবে এহেন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সস্তা বুলি দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।"[৩] সত্যিই নয়। তাই মার্কসবাদীদের এককালের মূল্যায়ন ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। একালের মূল্যায়ন অবশ্য তা থেকে অনেক স্বচ্ছতর। শ্রেণীসংগ্রাম, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবে অংশগ্রহণ, সশস্ত্র বিপ্লব এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান—মার্কসবাদীদের এই লক্ষ্য কেন্দ্রায়িত হয়েছে সর্বহারাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে। বিবেকানন্দ শূদ্রজাগরণ এবং তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন ভারত-ইতিহাসে ব্যাখ্যার মাধ্যমে। মার্কসবাদীদের লক্ষ্যের সঙ্গে স্বামীজীর লক্ষ্যের অভিন্নতা এখানে। তবে স্বামীজী সশস্ত্র সংগ্রামে আস্থাশীল নন। কেননা তা হিংসাকে প্রলম্বিত করে, ঘৃণা-বিদ্বেষকে উচ্চকিত করে। নবগঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তার কুপ্রভাবও সংক্রামিত হয়। আত্মবোধের জাগরণ, চরিত্রগঠন, শিক্ষা-সচেতনতার মধ্য দিয়ে যে জাগরণ—বিপ্লব সংগঠিত হবে তাই কল্যাণকর। প্রয়োগজনিত পার্থক্য আজ মার্কসবাদীরা বুঝতে পারছেন—এটা সুখের।

॥ ৬ ॥

স্বামীজী সম্পর্কে গত বছরে (১৯৮৮) আরও বেশ কিছু ভাল প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলিতে মৌলিক চিন্তার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা গেছে। এগুলির মধ্যে শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের 'মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংগ্রামে', (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মার্চ), প্রণবেশ চক্রবর্তীর 'ভারতের প্রথম সমাজতান্ত্রিক চিন্তানায়ক' (দেশ, ১৯ মার্চ—৩০ এপ্রিল), স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'মানুষ বিবেকানন্দ' (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৯৫), শিশির করের 'সন্ন্যাসী সাংবাদিক' (উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৯৫), ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও হয়তো আরও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ অনুল্লেখিত রইল। পরিশেষে বলব, স্বামীজীর মূল্যায়নে যুক্তি, অনুভব, উপলব্ধি প্রগাঢ়ভাবে আমাদের সমস্ত অনুসন্ধিৎসা, অজ্ঞতার দুয়ার উন্মোচিত করে দিক। প্রসঙ্গত শঙ্করলালের কথা উদ্ধৃত করে বলতে পারি ঃ "বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তায় দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের ইতিহাস বরাবরই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দাবী করেছে, আজও করে। নিবেদিতা, রোলাঁ প্রমুখ মনীষীরা বলা চলে, এই বিচারপদ্ধতির সূত্রপাত করেছেন মাত্র। প্রখর যুক্তিবাদের নিরিখে ছাড়া বিবেকানন্দের বিচারের আর কোনও পথ আছে বলেও তো মনে করতে পারি না। বিবেকানন্দের রচনাবলীকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মাথায় ঠেকিয়ে পূজা করার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবমাননা স্বয়ং বিবেকানন্দের। পূজা নয়, তিনি প্রধানতঃ চেয়েছিলেন তাঁর উপলব্ধি ও অনুভূতির প্রতি মানুষের মনস্কতা।"[৪] শুধু পূজা নয়, অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে ভ্রান্ত মূল্যায়ন নয়, যুক্তি, তথ্য আর সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে উদার সচেতন দৃষ্টি বিনিময়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যায়নে যুক্ত হোক তীব্র গতি। ভারত তথা পৃথিবীর ক্রমমুক্তি এবং উজ্জ্বল উদ্ধারের জন্য এটা একান্ত আবশ্যক।

---

[৩] Swami Vivekananda : Patriot Prophet, 1st Edn, Calcutta, pp. 2-3 & 11

[৪] 'মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংগ্রামে' আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ মার্চ, ১৯৮৮

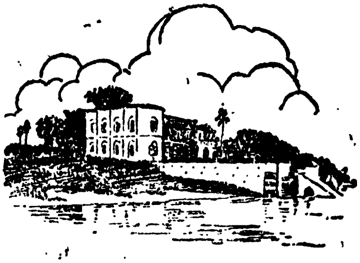

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বড় বউ

গিরিশ ঘোষ

[পৌষ (১৩৯৫) সংখ্যার পর]

ললিতাদেবীর আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তত্রাচ বলিলেন, "তোর টাকা, তুই যাকে খুশি দিবি, সৎ কার্য করিবি।"

প্যা।—কে করে বল? খবরের কাগজে পড়েছিলেম, টাকার নিমিত্ত বাপকে গুলি করিয়াছে! চক্ষের উপরে দেখিলাম, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বধ হইল। আমি বুঝিয়াছি, টাকাতে এই সব কাজই হয়, আর কিছু হয় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছি, ঠাকুর হাসে!

ল।—কেন তুই বে করবি নে? ঘর সংসার করবি নে? পিতৃপুরুষের নাম লোপ করবি?

প্যা।—বউ দিদি, ঠাকুর যদি মনে করেন, দাদাদেরই ভাল করবেন। আর যদি মনে করেন, আমি একশটা বিয়ে করলে মেরে ফেলবেন। ঠাকুর বলেছেন, ও সব ঠাকুরের কাজ। আমি ও সব করব না।

ললিতাদেবীর আর উত্তর সরিল না।

ঘোরতর মকদ্দমা চলিতেছে। আর মকদ্দমা চলিলে কিশোরীমোহন ও রাধামোহন জাল উইল আদালতে দাখিল করিয়াছে—তাহা প্রমাণ হইবে। অনন্যোপায় হইয়া কিশোরীমোহন, মাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছে। তিনি বড় বউকে বুঝাইয়া বিপদ হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু বড় বউ-এর ধনুক-ভাঙ্গা পণ, শাশুড়ির বাক্যেও অটল রহিলেন। শেষ পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধ মাতা তৃতীয় পুত্রকে, বউকে বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। প্যারীমোহন ও ভাজকে বলিল, "দাদাদের ছেড়ে দাও।" ললিতাদেবী উত্তর করিলেন, "তুই ভাবিসনি, আমাদ্বারা আমার শ্বশুরের ছেলেদের কোনও অনিষ্ট হবে না। আমি তাদের ভালর নিমিত্তই করিতেছি।" শেষে দাঁড়াইল, উভয় ভ্রাতা অর্ধেক সম্পত্তি বউ-এর নামে লিখিয়া দিয়া জাল হইতে নিস্তার পাইল। মনে ভাবিয়াছিল, বউ-এর জীবনসত্ব বই তো নয়। যখন দান বিক্রয়ের অধিকার নেই, আমরাই তো পুনর্বার পাইব।

বড় ভাজের আনুগত্য করিতে আসে; ললিতাদেবী দূরে দূরে করিয়া তাড়ান। সকলে মনে করে, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেছে। সমস্ত আয় সৎ কর্মে খরচ করেন। বিধবা ননদ দুইটিকে বিশেষ যত্নে রাখেন। হাঁটিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যান, পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন। সুলোকে বলে, যে বাড়িতে বিপদ সে বাড়িতে যান। কিন্তু পুরুষ দেখিয়া তাদৃশ সমীহ করেন না। সকলের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কন; ইহাতে কু-লোকেরাও নানা কথা কয়। বিষয় কার্য প্যারীমোহনই করেন। এই সময়ে প্যারীমোহনের মার হঠাৎ বৃন্দাবন লাভ হইল। ললিতাদেবী দুইটি ননদকে দিয়া সমারোহে চতুর্থী করাইলেন। কিশোরীমোহন রাধামোহনও শ্রাদ্ধ-শান্তি করিল। প্যারীমোহন ঐ সঙ্গে দান উৎসর্গ করিল, কিন্তু সে সমস্তই ললিতাদেবীর ব্যয়ে। ললিতাদেবী, তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, যত ব্যয় করিতে পারে যেন করে। প্যারীমোহনের কাজে লোকে শত শত আশীর্বাদ করিয়া গেল।

যে খরচের নিমিত্ত কিশোরীমোহন ও রাধামোহনের অর্থের আবশ্যক হইয়াছিল, গণনার ভিতর এত অর্থ নেই যাহাতে তাহার কুলান হয়। শীঘ্রই উভয়ে সর্বস্বান্ত হইল। অন্ন জোটে না। এমন কি দুই একদিন কোন ক্রমে কাটিয়াছে। এসময়েও অর্থ সাহায্য চাহিতে গেলে, ললিতাদেবী দেখাই করেন না। ইহাতে তাঁহার মহা নিন্দা হইতে লাগিল। নিন্দুকের জিহ্বা যাহা সৃষ্টি করিতে পারে, পাঁচটা ব্রহ্মা তাহা পারেন কিনা সন্দেহ; আর কল্পনাশক্তিতে ব্রহ্মার চৌদ্দপুরুষ হার মানেন। সন্তানতুল্য প্যারীমোহনের নাম ললিতাদেবীর সহিত কুভাষায় একত্রিত হইতে লাগিল। কিন্তু

তেজস্বিনী ললিতাদেবী যেরূপ ভাবে চলিতেছেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। দেনার দায়ে উভয় ভ্রাতারই জেল হইল। ছুটলি জোচ্চুরীর দাবীও দুই একটা নয়, পেটের দায়ে একে ওকে ঠকাইতে হইয়াছে। একদিন ললিতাদেবী স্বয়ং জেলে গিয়া উপস্থিত। ভ্রাতাদ্বয় কাকুতি মিনতি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ললিতাদেবী ঘৃণার সহিত থামাইলেন। বলিলেন, "চুপ কর। তোমাদের ঋণে মুক্তি দিব, যাহা জুয়োচ্চুরি করিয়াছ তাহা হইতেও বাঁচাইব; কিন্তু আমার অবর্তমানে যে সম্পত্তির তোমরা অধিকারী হইবে, যদি এই দণ্ডে দেবোত্তর করিয়া দাও, তবে;—নচেৎ নয়। এবং সেই দেবোত্তর সম্পত্তি যতদিন প্যারীমোহন বর্তমান থাকিবে, সেই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তারপর সে যাহাকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেবে, সেই করিবে। পরে তোমাদের পুত্র-সন্তানেরা মানুষ হইলে, তাহারা সেই ভার পাইবে। তোমরা দুই ভাই কোনও সংস্রবে থাকিতে পারিবে না। আপাততঃ তিনশো টাকা করিয়া তোমাদের মাসোহারা দিব।" অগত্যা জেলের ভয়ে, পেটের জ্বালায় উভয়কে সম্মত হইতে হইল।

সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর হইল। ললিতাদেবী তীর্থে যাইবেন সংকল্প করিয়াছিলেন, সে কথা প্যারীমোহনকে বলিলেন। প্যারীমোহন বলিল, "কি সম্বল লইয়া যাইবে?"

ল।—আমার তো কিছু নেই, ঠাকুরকে দিয়াছি, তবে কি লইয়া যাইব?

প্যা।—তোমার চলিবে কিসে?

ল।—ভাই, তুমি তো শিখাইয়া দিয়াছ—ঠাকুর দিবেন।

প্যা।—ঠাকুরের অনুমতি লইয়াছ কি? আর এক কথা, তুমি কি কুলদেবতাকে কেবল তোমার সম্পত্তি দিয়াছ? কায়, মন, জীবন কি অর্পণ কর নাই? তুমি কুল-নারী, তুমি একা তীর্থে যাইলে কুলদেবতার তো নিন্দা হইবে না?

ললিতাদেবী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমি আর তীর্থে যাইব না।"

প্যা।—সেই ভাল। তুমি না থাকিলে, ঠাকুরের সেবাকার্য ভাল হইবে না।

ল।—বুঝেছি, ঠাকুর যেদিন কাজে জবাব দিবেন, সেইদিন যাইব, নচেৎ আমার যাবার উপায় নাই।

ললিতাদেবী প্যারীমোহনের দাড়ি ধরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। প্যারীমোহন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। একাহারেই বিধবা কুল-দেবতার সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।

একদিন রাধামোহন বলিতেছে, "মেজ দাদা, উকিল বলে 'দেবোত্তর হইতে সম্পত্তি ছাড়াইয়া লওয়া যায়।' তুমি কি বল?"

কি।—ও কথা মুখে আনিও না, উকিলের কথাতেই জেলের সাজা হইত। ধর্মে ধর্মে বাঁচিয়া গিয়াছি, এবার ফাঁসি যাইতে হইবে। আমি এখন বুঝিতেছি বউ আমাদের ভাল করিয়াছে, ছেলেপিলে মানুষ হবে—মান সম্ভ্রম থাকবে। যাহা বিষয় লইয়াছিলাম, তাহা তো দুই দিনে ফুঁকিয়া দিয়াছি। এ পাইলেও দুই দিনে না হয় দশ দিনে ফুঁকিয়া দিব।

রা।—তবে যাউক।

কি।—রেখো। কুকর্মে সুখ নেই, তুই কি আজও বুঝিসনি?

রা।—কাজেই বুঝিতে হইবে।

কালে রাধামোহনও বুঝিল।

ঠাকুরের সম্পত্তি প্যারীমোহনের জিম্মায়।

প্যারীমোহন ঠাকুর বাড়িতেই থাকিয়া ঠাকুরের কর্ম করেন। ঠাকুর বাড়িতেই থাকেন। ঠাকুরের ভোগের সামগ্রী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিজনের নিমিত্ত যথাযোগ্য পাঠাইয়া, সমস্ত অতিথি-সেবার পর যাহা বাকী থাকে—তাহাই খান। আদর্শ চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক, তাঁহার নিকট উপদেশের নিমিত্ত আসিতে লাগিল। প্যারীমোহন কিছুই বলিতেন না, কেবল একটি শ্লোক আওড়াইয়া প্রণাম করিতেন:

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
যাঁহার কৃপায় সরে মূকের বচন।
পঙ্গু যাঁর কৃপাবলে পর্বত লঙ্ঘিয়া চলে
করি সে-পরমানন্দ মাধবে বন্দন॥

দুইটি ভাইপো প্যারীমোহনের কাছে থাকিত। তাহারা শ্লোকটি শিখিয়াছিল ও আনন্দে পাঠ করিত। শুনিয়া সকলে ভরসা করিত, বাঁড়ুজ্যে বংশের কুলদেবতার পূজা বহুদিন থাকিবে। *

[সমাপ্ত]

* উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৮-৩৪১।

জাতীয় আন্দোলনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের (১৮৬১-১৯০৭) অবদান আজও যথার্থভাবে নির্ণীত হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ ও 'ডন'-এর সতীশচন্দ্রের সমসাময়িক এই পুরুষসিংহ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মস্তবড় যুগসারথি ছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলকাতায় যুবকদের স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ, চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূল শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'ডন সোসাইটি' (জুলাই ১৯০২)। সতীশচন্দ্র-পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের (১৯০৬-১০) সঙ্গে বিবেকানন্দী ভাবাদর্শের সংযোগ ছিল সুনিবিড়। স্বামীজীর চিতাগ্নি থেকে আরও যে দুটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বেরিয়ে এলো, তার একটি ভগিনী নিবেদিতা, আর একটি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। বিবেকানন্দের আরব্ধ 'ফিরিঙ্গিজয়ব্রত উদ্‌যাপন-এর সাধনাকে সফল করে তুলবার জন্য একদা-বিবেকানন্দ-বিরোধী ব্রহ্মবান্ধব শেষ জীবনে তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। যে মহাপ্রাণ যোদ্ধা-সন্ন্যাসী আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর পূর্বে জগদ্বিখ্যাত অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতাবলী প্রদান করে পাশ্চাত্য জগতে ভারতবাসীর জন্য ঠিকানা কায়েম করেছিলেন, যে অকুতোভয় মনীষী শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় ও সংগঠনে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য অবলম্বন ছিলেন, যিনি স্বদেশী স্বরাজ আন্দোলন শুরু হবার উষালগ্নে সুপ্তিমগ্ন জাতির কানে অনাগত স্বরাজের বোধনশঙ্খ বাজিয়েছিলেন, যিনি বৈদ্যুতিক কশাঘাতে দুর্বল, ক্লীব, তামসিকতায় মগ্ন স্বদেশবাসীকে একদিন সচকিত করেছিলেন, সেই কীর্তিমান, ত্যাগী, নির্ভীক, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষসিংহকে বাঙালী আজ ভুলতে বসেছে।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বাশ্রমের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ধর্মমতের বিবর্তন ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। জন্মে ও কুলধর্মে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী ও সনাতনী, যৌবনে কেশব সেন-পন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম, তৎপর প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান, তৎপর রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, সর্বশেষে বৈদান্তিক ও কট্টরপন্থী ন্যাশন্যালিস্ট। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে বিবেকানন্দ যখন ফিরিঙ্গিজয়ব্রত উদ্‌যাপনে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ভাবমগ্ন ও কর্মরত, তখন ব্রহ্মবান্ধব খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের প্রয়াস করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সনাতন হিন্দুধর্মের সপক্ষে যে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হয় খ্রীষ্টাশ্রয়ী ব্রহ্মবান্ধব তাকে প্রথমদিকে মোটেই সুনজরে দেখতে পারেননি। এই সময় তাঁর অমূলক ধারণা ছিল যে, ভারতের বৈদিক ধর্ম বহুত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত,—এই ধর্মে একেশ্বরবাদের স্থান নেই, যে একেশ্বরবাদের জীবন্ত-প্রকাশ তিনি একমাত্র ক্যাথলিক ধর্মাদর্শেই লক্ষ্য করেছিলেন। জীবনের এই পর্বে তিনি বেদান্ত-বিরোধী এবং স্পষ্টতঃ বিবেকানন্দ-বিরোধী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের 'সোফিয়া' পত্রের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব স্বামী বিবেকানন্দ ও অ্যানি বেসান্ত প্রচারিত হিন্দুধর্ম বিষয়ক ব্যাখ্যাগুলিকে 'নারকীয় ভ্রম' (infernal errors) বলে কশাঘাত করলেন। বিবেকানন্দ ও বেসান্ত তাঁদের ভ্রমাত্মক ধর্মব্যাখ্যার দ্বারা গোটা দেশটাকে অন্ধকার ও দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন,—এই ছিল ব্রহ্মবান্ধবের সুস্পষ্ট অভিযোগ। আবার ঐ বৎসরের 'সোফিয়া' পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় তিনি "রামকৃষ্ণ কে ?" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাক করে বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করলেন। তিনি লিখলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মানুষ রামকৃষ্ণকে রাম ও কৃষ্ণের মতো পূর্ণাবতার বানাতে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং তাঁদের ভ্রমের জন্য তিনি পরিতাপও প্রকাশ

করেন। তিনি লেখেন যে, রামকৃষ্ণ একজন ভাল ও মহৎ ব্যক্তি কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তাঁকে কোন অবস্থাতেই যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে সমান আসনে বসানো চলে না। জীবনের এই পর্বে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল এই যে, বেদান্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নয়—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়েই হবে ভারতের পুনর্জন্ম।

॥ ৩ ॥

কিন্তু যে-খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্রহ্মবান্ধব পাগল হয়ে উঠলেন, তা মামুলি ও সুপ্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম ছিল না। তিনি লিখলেন, ভারতে হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার প্রায় স্থির ও নিশ্চল হয়ে গেছে। কারণ খ্রীষ্টধর্ম এদেশে বিদেশী ধর্ম ও বিজেতা জাতির ধর্ম। যেমন তেমন করে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারিত হলে ভারতের জনগণ তা গ্রহণ করবে না। ভারতের জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারকে গতিশীল ও জয়যুক্ত করে তুলতে হলে বেদান্তের পরিভাষা ও বেদান্তের চিন্তা-প্রণালী খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকদের গ্রহণ করতে হবে ভারতবর্ষে গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীরাই জনগণের কাছে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধার পাত্র। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদেরও হিন্দু-সন্ন্যাসীর বেশভূষা পরিধান করতে হবে ও হিন্দু চিন্তা-প্রণালীর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে হবে। তাঁদের আচার-আচরণে ও বেশভূষায় ইউরোপীয় ছোঁয়াচটুকু পর্যন্ত থাকা চলবে না। ব্রহ্মবান্ধব জব্বলপুরে নর্মদাতীরে যে হিন্দু ক্যাথলিক বা 'কাস্থলিক মঠ' স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মোদ্দা কথা এটাই। নতুন যুগের হাওয়া ও আলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার উপরই ভারতে খ্রীষ্টধর্মের ভবিষ্যৎ,—এই ছিল তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়।

বিশ শতকের গোড়ায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কার্তিক চন্দ্র নানের সহযোগিতায় ব্রহ্মবান্ধব যে 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী' বা 'বিংশ শতাব্দী' নামে যে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন তাতে ভারতে ক্যাথলিক ধর্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে তীক্ষ্ণ আলোচনা ছাড়াও ঐ পত্রিকায় থাকত জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বচ্ছ প্রতিফলন। খ্রীষ্টধর্মানুরাগী উপাধ্যায় অকুণ্ঠচিত্তে ঐ পত্রিকায় বেদান্তের জয়ধ্বনি তুললেন। হিন্দুসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তিনি ক্রমশঃ বিভোর হয়ে পড়েন। বেদান্তের গভীর অনুশীলনের ফলে ক্রমশঃ তাঁর পূর্বেকার বহু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় এবং বিবেকানন্দ-বিরোধী ব্রহ্মবান্ধব প্রচণ্ড বিবেকানন্দ-প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়ে ওঠেন। এই সময় 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) পত্রে 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধে তিনি এই বলে প্রাণের কথা ব্যক্ত করলেন ঃ

"হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং ইউরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রমধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইউরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহ-পরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠিত হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও।"[১]

আত্মপ্রতিষ্ঠা না থাকলে জাতীয় মনীষার সম্যক্ বিকাশ-সাধন সম্ভবপর নয়। ধার-করা জিনিস দিয়ে বহিরঙ্গের শোভাবর্ধন যতই আমরা করি না কেন, পরকীয় ভাব আত্মস্থ না হলে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও স্বাভাবিক স্ফুরণ হয় না। বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও চিঠির মধ্যে এই সুর বারবার ধ্বনিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মবান্ধবের মনে যে আকাঙ্ক্ষাটি প্রবলতম ছিল তা হল হিন্দুসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি হবে ভারতের শিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতি। তিনি যীশুখ্রীষ্টকে জগতের পরিত্রাণকর্তা বলে ভজনা করলেও তিনি জন্মে, কুলধর্মে, আচার-ব্যবহারে নিজেকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলেই জ্ঞান করতেন। তাঁর বিচারে কোন বিশেষ ধর্মমত পোষণের উপর—এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকারের উপরও—কোন ব্যক্তির হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। হিন্দুসমাজের উদার বক্ষে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মানুসরণকারীরাও স্থানলাভ করে থাকে। ব্রহ্মবান্ধব নিজেকে 'ঈশাপন্থী হিন্দু' বা

---

[১] এই প্রসঙ্গে হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়ের 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থখানি (কলিকাতা ১৯৬১, পৃঃ ৪৭-৭২) দ্রষ্টব্য।

'হিন্দু ক্যাথলিক' বলে পরিচয় দিতেন। ভারতীয় থেকে, হিন্দু থেকে তিনি খ্রীষ্টতত্ত্ব অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু-সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করে হিন্দুজাতির আচার-ব্যবহার পালন করে ও হিন্দুদর্শনের পরিভাষা ও চিন্তা-প্রণালী প্রয়োগ করে তিনি এদেশে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারে কৃতসংকল্প হন। জাতীয় স্বরূপকে বিনষ্ট করে নয়, অক্ষুণ্ণ রেখেই হিন্দুজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনায় তিনি জীবনপণ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় সংগঠনের পশ্চাতেও একই আদর্শের প্রেরণা সক্রিয় ছিল। স্বদেশী শিক্ষা প্রচার করে দেশের যৌবনশক্তিকে 'স্বদেশী' ভাবাপন্ন করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনব্রত।

॥ ৪ ॥

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বোলপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে শুনলেন—বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন। অতীতের বিবেকানন্দ-বিরোধী ব্রহ্মবান্ধব এই সময় বিবেকানন্দী-ভাবাদর্শে কি পরিমাণ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন, সে-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ

"দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যখন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানি ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে? কেন—তাঁহার তো অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও, বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে বিলাত যাইব…বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে! যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগর-পারে লইয়া যায়—সে সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরই সাতাশ টাকা লইয়া 'বিলাত' যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম।"

॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা 'সন্ধ্যা' পত্রের সম্পাদনা। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সন্ধ্যা' দৈনিক প্রতিষ্ঠাকালে অনুষ্ঠান-পত্রে উপাধ্যায় লিখলেন ঃ

"রাজা ম্লেচ্ছ।… উপজীবিকার জন্য, মানসম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে।… রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। …ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্যকলাপ ও দেশ-বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলা-কৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহার মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবি ঢং নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে।… আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন সুর যুগযুগান্তর ধরিয়া বাজিতেছে।"[২]

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। মূল্য ছিল মাত্র এক পয়সা। মেঠো, গ্রাম্য, সহজ, সরল, সর্বজনবোধ্য ভাষায় এর প্রবন্ধাদি লিখিত হতো। 'সন্ধ্যা'য় উপাধ্যায় ক্রমশই উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। ফিরিঙ্গি সমাজ ও সভ্যতার কদর্য রূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। ব্রহ্মবান্ধব ইউরোপীয়দিগকে 'ফিরিঙ্গি' পরিভাষায় অভিহিত করতেন। ইংরেজনবীস বাঙালীবাবুকেও তিনি চাবুক লাগাতে সংকোচ বোধ করেননি। বিবেকানন্দের মতো তিনিও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন ধর্মের নামে সারা দেশটা ক্লৈব্য ও তামসিকতায় ভরপুর। বাঙালীবাবুদের তামসিকতায় নিমজ্জিত, ভীরু, নিরাপদ জীবনকে তিনি নিষ্করুণভাবে

---

[২] এই প্রসঙ্গে হরিহাস ও উমা মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

আঘাত করলেন। বিবেকানন্দী-বিক্রম নিয়েই তিনি সেদিন যোদ্ধার বেশে বাঙালীর জীবনমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রে তিনি লিখলেন ঃ

“তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের এই কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাবকাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না। …দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটি খাওয়াইতে হইবে। দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না।…রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।”

উপাধ্যায়ের যেমন সঙ্কল্প, তেমন কাজ। তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকার চাবুক খেয়ে স্বদেশী যুগে বাঙালীর মোহভঙ্গ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ত্রিশের দশকে লিখেছিলেন,

“সেই সময় দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সম ; দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে-ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।”

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হল। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্রহ্মবান্ধব এক লিখিত বিবৃতিতে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন, “এই বিচারে আমি কোনরূপ অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক নই, কারণ বিধাতা-নির্দিষ্ট স্বরাজ-ব্রত উদ্‌যাপনে আমার কোন অংশের জন্য আমি বিদেশী জাতির নিকট—যে জাতি বর্তমানে আমাদের শাসক এবং যার স্বার্থ আমাদের প্রকৃত জাতীয় আত্মবিকাশের পথে অন্তরায়-স্বরূপ, তার নিকট—কোন জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।” ব্রহ্মবান্ধবের এই তেজঃদৃপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সেদিন জাতীয় আন্দোলনে কি অপরিমিত শক্তি সঞ্চার করেছিল, তা আমাদের অনেকের পক্ষেই একালে ধারণা করা কঠিন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিচারাধীন অবস্থায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি 'জাতীয়'-ভাবে এতই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি কালীঘাটে গিয়ে মার মন্দিরে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গুণগ্রাহীরা বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিমতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থখানি পঠিতব্য।

॥ ৬ ॥

ব্রহ্মবান্ধবের মহাপ্রয়াণে বাংলার জাতীয়তাবাদী দল (মডারেটপন্থী রাজনীতিকগণ যাদের 'একস্ট্রিমিস্ট' পরিভাষায় চিহ্নিত করতেন সেই রাজনীতিক দল) স্বাধীনতা যুদ্ধের এক প্রধান পুরোহিত ও সেনাপতিকে হারালেন। কিন্তু তাঁর বাণীর মধ্যে ও মহাপ্রয়াণের মধ্যে জাতীয়তাবাদীরা প্রত্যক্ষ করলেন জাতীয় আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণ। 'বন্দে মাতরম্' পত্রে অরবিন্দ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে চিহ্নিত করলেন নব ভাবাদর্শের ঋত্বিক ও শহীদরূপে (“as a saint and martyr of the new faith”)। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল 'বন্দে মাতরম্' পত্রে অরবিন্দ 'Indian Resurgence and Europe' ('ভারতীয় পুনরুজ্জীবন ও ইউরোপ') শীর্ষক যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ বুঝবার পক্ষে তা অপরিহার্য। ঐ প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখলেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য দ্বিবিধ—প্রথমতঃ, ভারতের জন্য স্বরাজলাভ, যে স্বরাজের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের তৎকালীন অস্বাস্থ্যকর অবস্থার দূরীকরণ সম্ভব হবে ; এবং দ্বিতীয়তঃ, এর উদ্দেশ্য হবে স্বদেশী স্বরাজের প্রতিষ্ঠা—ইউরোপীয় ধাঁচের মতবাদের আমদানী নয়। আর এই কারণেই এদেশে স্বরাজ আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল স্বদেশী ভাবের অভিব্যক্তিতে। এই অভিব্যক্তি শুধু বিদেশী পণ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি,—বিদেশী আচার-

ব্যবহার, বিদেশী বেশ-ভূষা, বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীকে স্বকীয় সভ্যতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ("to bring the people back to their own civilization")। তৎকালে বিদেশী জিনিসের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের মধ্যে যদি কিছু যুক্তিহীন আবেগ ও উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হয়ে থাকে, বুঝতে হবে তা ছিল অস্বাভাবিক অবস্থার, ভয়াবহতার বিরুদ্ধে প্রকৃতির ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া। উপাধ্যায় ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের ঐ বিশেষ পর্বের জীবন্ত প্রতীক। ইউরোপ থেকে ধার-করা আচার-ব্যবহার তিনি জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গ থেকে খসিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন আর চেয়েছিলেন কট্টর-পন্থী, আপোষবিহীন ভারতীয় হতে। অরবিন্দের ভাষায়, "He was never weary of harping on the necessity of stripping from oureselves every rag of borrowed European thought and habits and becoming intensely, uncompromisingly Indian." এই দৃঢ়চরিত্রের মানুষটির বহিরঙ্গের ঢং বা চাল-চলন বাদ দিয়ে আমরা যখন তাঁর ব্যক্তিত্বের সারমর্ম অনুসন্ধান করব তখন দেখব এটাই ছিল তাঁর জীবনের আসল বাণী। ইউরোপীয় সভ্যতা ও ধর্মাদর্শের সর্বস্তর পরিক্রমার পর তিনিও তাঁর জন্মভূমির মতো প্রচণ্ডবেগে তাঁর পিতৃপুরুষদের ধর্ম, দর্শন, কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের দিকে আবার প্রত্যাবর্তন করলেন। পুরনো বাংলা তার শক্তি, সাহস ও অকৃত্রিম আদর্শনিষ্ঠা নিয়ে তাঁর জীবনে মূর্তিমন্ত হল। অরবিন্দ মন্তব্য করলেনঃ "His (Upadhyay's) declaration in Court and his death put a seal upon the meaning of his life and left his name stamped indelibly on the pages of history, as a saint and martyr of the new faith···we have to take up his work and incorporate the essence of it into the accomplished heritage of the nation."

ঐ অনবদ্য প্রবন্ধে অরবিন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন যে, নিজের স্বরূপকে খুঁজে পাওয়া ও প্রতিষ্ঠা করাই নব আন্দোলনের মৌল বৈশিষ্ট্য। শুধু বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান ঘটালেই চলবে না —চাই জাতীয়ভাবে ভারতীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ যদি ইউরোপের পদাঙ্কানুসরণ করে এবং তার রাষ্ট্রিক আদর্শ, সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে, তবে সে ইউরোপের মতোই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। ভারতের এরকম বিবর্তন ভারতের বা ইউরোপের কারো স্বার্থেরই অনুকূল নয়। 'পরধর্ম ভয়াবহ'—এতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং জাতির স্বকীয় স্বরূপ বিনষ্ট হয়, স্বাভাবিক ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পরিবর্তে লক্ষণীয় হয় অস্বাভাবিক, বিকৃত, অবরুদ্ধ অভিব্যক্তি। ভারতবর্ষ যদি তার আত্মার স্বরূপকে যথার্থভাবেও সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে চায় তবে তা তাকে করতে হবে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই। এর অন্যথা হলে ভারত মরে যাবে। জীবনের মূল উদ্দেশ্য বা আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কোন জাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণ জীবন-বিকাশ কখনও সম্ভব নয়। তাই বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের মতো অরবিন্দও লিখলেনঃ "If India follows in the footsteps of Europe, accepts her political ideals, social system, economic principles, she will be overcome with the same maladies. Such a consummation is neither for the good of India nor for the good of Europe. If India becomes an intellectual province of Europe, she will never attain to her natural greatness or fulfil the possibilities within her··· whenever a nation has given up the purpose of its existence, it has been at the cost of its growth. India must remain India if she is to fulfil her destiny··· The whole world is interested in seeing that India becomes free so that India may become herself."[৩]

---

[৩] Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics, Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee, Calcutta, 1964, pp. 356-57, দ্রষ্টব্য।

নেত্রস্বাস্থ্য

রবীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী

পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু প্রধানতম। উপনিষদে প্রার্থনা আছে ঃ পশ্যেম শরদঃ শতম্। জীবেম শরদঃ শতম্। শৃণুয়াম শরদঃ শতাৎ।—আমরা যেন শতবর্ষ দেখতে পারি, শতবর্ষ বাঁচতে পারি, শতবর্ষ কানে শুনি। লক্ষণীয় এই প্রার্থনায় প্রথমেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অপ্রতিহতত্ব প্রার্থনা করা হয়েছে। সুতরাং এই মন্ত্রে দর্শনেন্দ্রিয়ের সর্বগ্রগণ্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে। অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যা-ই গ্রহণ করা হোক না কেন, রূপ উপলব্ধি না হলে তাদের যথার্থ স্বাদ উপলব্ধি হয় না। তাই দৃষ্টিশক্তি যাতে অটুট থাকে এবং চোখ যাতে সহজে রোগাক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ও চোখের যত্ন নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন দোষের উপর ভিত্তি করেই সকল রোগ দেহে আশ্রয় করে থাকে। চক্ষু হল তেজগুণযুক্ত। এজন্য কফ থেকেই এর অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। 'চরকসংহিতা' নামক বিখ্যাত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রণেতা চরক বলেছেন ঃ

চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাচ্ছ্লেষ্মতো ভয়ম্।
ততঃ শ্লেষ্মহরং কর্ম হিতং দৃষ্টেঃ প্রসাদনম্॥

অর্থাৎ চক্ষু তেজগুণসম্পন্ন। কফ থেকে বিশেষভাবে এর ভয়ের কারণ। কেননা কফ জলীয় ও শীতগুণবিশিষ্ট। অতএব দৃষ্টিশক্তির বলাধানকারী কফনাশক কার্য হিতকারী।

চক্ষুরোগ সাধারণতঃ আঘাত, ধোঁয়া, ধুলো, সূক্ষ্ম পাথরের টুকরো, লৌহকণা, জীবাণু-সংক্রমণ (Infection), অভিষ্যন্দ (Conjunctivities), অচ্ছোদপটল-এ (cornea) ঘা, অধিমন্থ (Glaucoma), দৃষ্টিমান্দ্য (Error of refraction), ছানি (Cataract) এসব কারণে হতে পারে। তাছাড়া যে-দ্রব্য শরীর গ্রহণ করতে চায় না তা খেলে অর্থাৎ এলার্জি (Allergy)-র জন্যও চক্ষুরোগ হওয়া সম্ভব।

চক্ষুরোগ সম্বন্ধে আমরা দু-প্রকার ব্যবস্থা নিতে পারি—প্রতিষেধক (Preventive) এবং রোগ-আরোগ্যমূলক (Curative)। চক্ষুরোগ যাতে না হয় সেজন্য আয়ুর্বেদের স্বস্থবৃত্তে কিছু নিয়ম পালনের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

প্রক্ষালনং মতং পাণ্যোঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারণম্।
মলশ্রমহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রাক্ষসাপহম্॥

—উষাকালে মলমূত্র ত্যাগ করে হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়া কর্তব্য। তার ফলে সেসকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিষ্কার থাকে। শরীরের মল ও নিদ্রাজনিত ক্লান্তি নাশ হয়, বীর্য বর্ধিত হয়, চক্ষুর উপকার হয় ও জীবাণু নাশ হয়। প্রাতঃকালে নাসারন্ধ্রদ্বারা জল পান করা চোখের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। একে 'নাসাপান' বলে। এ-সম্পর্কে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

বিগতঘননিশীথে প্রাতরুত্থায় নিত্যং
পিবতি খলু নরো যো ঘ্রাণরন্ধ্রেণ বারি।
স ভবতি মতিপূর্ণশ্চক্ষুষা তার্ক্ষ্যতুল্যা
বলিপলিতবিহীনঃ সর্বরোগৈর্বিমুক্তঃ॥

—যে প্রাতঃকালে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে রাত্রি শেষ হবার একটু পূর্বে প্রতিদিন উঠে নাক দিয়ে ঈষদুষ্ণ (লবণসহ) জলপান করে, তার বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, সে গরুড়তুল্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং তার শরীরের বলি বা চর্মশৈথিল্য ও পক্ককেশ দূর হয়; সে সকল রোগ থেকে মুক্তিলাভ করে। সুতরাং নাসাপান শুধু চক্ষুর পক্ষেই নয়, সর্ব-অর্থেই উপকারী। তবে, হিক্কা (হেঁচকি), বাত ও কফরোগে আক্রান্ত হলে নাসাপান করা উচিত নয়।

এখন কতকগুলি উপায়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যা অবলম্বন করলে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বজায় থাকে ঃ (১) প্রত্যুষে মুখ-হাত ধোয়ার পর মুখগহ্বর জলপূর্ণ করে চোখ খুলে সাধ্যমত জলের ছিটা দিলে চোখ পরিষ্কার থাকে ও দাঁত শক্ত হয়। (২) সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করা একান্ত আবশ্যক। (৩) প্রাতঃকালে, বিশেষতঃ

সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বাভাবিক সবুজ-পরিবেশে আধ-ঘণ্টা থেকে একঘণ্টা ভ্রমণ করা দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক। (৪) দিনে পাঁচ হতে পনের মিনিট শবাসন অর্থাৎ চিৎ হয়ে চোখবন্ধ রেখে শরীরকে সম্পূর্ণ শিথিল করে শুয়ে থাকা চোখের পক্ষে ভাল। এসময় লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। শ্বাস ছাড়ার সময় চিন্তা করতে হয় যে, শরীরের সব গ্লানি, মল ও রোগ বের হয়ে যাচ্ছে ; এবং শ্বাস গ্রহণ করবার সময় চিন্তা করতে হয় যে, শরীরে প্রাণ, বল ও নেত্রে শক্তি আসছে। (৫) দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখতে পায়ে জুতো পরা, তেলমালিশ ও পদ-প্রক্ষালন উপকারী। আয়ুর্বেদাচার্য বাগ্‌ভট্ট বলেছেন ঃ

> দ্বে পাদমধ্যে পৃথুসন্নিবেশে শিরে গতে তে
> বহুধা চ নেত্রে।
> তাম্রক্ষণোদ্বর্তনলেপনাদীন্ পাদপ্রযুক্তান্
> নয়নে নয়ন্তি ॥
> মলোষ্ণ্যসংঘট্টনপীড়নাদ্যৈস্তা দূষয়ন্তে
> নয়নানি দুষ্টাঃ।
> ভবেৎ সদাদৃষ্টিহিতানি তস্মাদুপানদভ্যঞ্জন-
> ধাবনানি ॥

—আমাদের পায়ের তলার মাঝখানে দুপায়ে দুটি শিরা আছে যা চোখ পর্যন্ত নানাভাবে সংযুক্ত। মল, উষ্ণতা, ঘর্ষণ, পীড়ন প্রভৃতির জন্য ঐ শিরাদ্বয় দূষিত হলে চোখও দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য পাদুকা ব্যবহার, পায়ে তেলমালিশ, পদ-প্রক্ষালন অর্থাৎ পা ধুয়ে পরিষ্কার রাখা চক্ষুর পক্ষে উপকারী।

উপরে যে-সব নিয়ম ও পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, এসবই চক্ষুরোগের প্রতিষেধমূলক উপায়। এখন রোগ-আরোগ্যমূলক অর্থাৎ চক্ষু রোগাক্রান্ত হলে কি করণীয় এ-সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

চোখে ধুলো, পাথরকণা বা লৌহকণা লেগে থাকলে জলের ছিটা দ্বারা চোখ ধুয়ে ফেললে অনেক সময় তা বের হয়ে যায়। যদি তৎসত্ত্বেও এরূপ মনে হয় যে, যেন চোখের ভিতরে কিছু থেকে গিয়েছে, তবে উপরিস্থ চোখের পালক অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা নিচের চোখের পালকের উপর টেনে মিনিটখানেক রেখে দিলে সেই অস্বস্তি দূর হয়ে থাকে। তারপর দুই হাতের তালু পরস্পর কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করে হাতের তালু দ্বারা চোখে স্বেদ বা তাপ দিলে সেই কষ্ট আরাম হয়। যদি তাতেও কষ্ট লাঘব না হয়, তবে গরম ভাতের পুঁটুলি করে স্বেদ দিলে কষ্ট আরাম হয়। তাতেও কষ্ট দূর না হলে বুঝতে হবে যে, উপরিস্থ পালকের ভিতরের অংশে বা অচ্ছোদপটলে (Cornea-য়) সেই লৌহকণিকা বা পাথরের টুকরা লেগে রয়েছে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন দোষের উপর ভিত্তি করেই সকল রোগ দেহে আশ্রয় করে থাকে।

'চরকসংহিতা' নামক বিখ্যাত আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের প্রণেতা চরক বলেছেন ঃ চক্ষু তেজ-গুণসম্পন্ন। কফ থেকে বিশেষভাবে এর ভয়ের কারণ। কেননা কফ জলীয় ও শীত-গুণবিশিষ্ট। অতএব দৃষ্টিশক্তির বলাধানকারী কফনাশক কার্য হিতকারী।

আয়ুর্বেদাচার্য বাগ্‌ভট্ট বলেছেন ঃ আমাদের পায়ের তলার মাঝখানে দুপায়ে দুটি শিরা আছে যা চোখ পর্যন্ত নানাভাবে সংযুক্ত। মল, উষ্ণতা, ঘর্ষণ, পীড়ন প্রভৃতির জন্য ঐ শিরাদ্বয় দূষিত হলে চোখও দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য পাদুকা ব্যবহার, পায়ে তেলমালিশ, পদ-প্রক্ষালন অর্থাৎ পা ধুয়ে পরিষ্কার রাখা চক্ষুর পক্ষে উপকারী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদশাস্ত্র 'চক্রদত্ত' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ চোখ ও উদরের রোগ, প্রাতিশ্যায় (সর্দিলাগা), ব্রণ ও জ্বর এই পাঁচপ্রকার রোগ লঙ্ঘন বা উপবাস দ্বারা পাঁচদিনে উপশম হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, উল্লিখিত রোগে অনেক ক্ষেত্রে ঔষধের কোন প্রয়োজন হয় না। আর ঔষধের সাথে লঙ্ঘন বা উপবাস পালন করলে ঔষধও শীঘ্র ফল দেয়।

এক্ষেত্রে পরিষ্কৃত বস্ত্রদ্বারা তা বের করা যায়। তাতেও ফল না হলে চক্ষুবিশেষজ্ঞের শরণ নেওয়া প্রয়োজন।

যে-কোন যন্ত্রণাদায়ক চক্ষুরোগের উপক্রম হলে যেমন চোখ-ওঠা, চোখে লালিমা, ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলে লঙ্ঘন বা উপবাস উপকারী। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদশাস্ত্র ‘চক্রদত্ত’ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রাতিশ্যায়ব্রণজ্বরাঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ।

—চোখ ও উদরের রোগ, প্রাতিশ্যায় (সর্দিলাগা), ব্রণ ও জ্বর এই পাঁচপ্রকার রোগ লঙ্ঘন বা উপবাস দ্বারা পাঁচদিনে উপশম হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, উল্লিখিত রোগে অনেক ক্ষেত্রে ঔষধের কোন প্রয়োজন হয় না। আর ঔষধের সাথে লঙ্ঘন বা উপবাস পালন করলে ঔষধও শীঘ্র ফল দেয়।

সাধারণ চোখ-ওঠাতে হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধুর ক্বাথের জল চোখে ফোঁটা ফোঁটা (drop) দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো হরিদ্রা দিয়ে রাঙিয়ে বারে বারে চোখ মুছলে চোখ উঠাতে আরাম হয়। চোখের জ্বালা বা অস্বস্তিতে রক্তচন্দন ও লোধ জলে পিষে চোখের পাতার চামড়ার উপর লাগালে আরাম বোধ হয়। অধিক যন্ত্রণা হলে ঐ লেপের সঙ্গে অর্ধরতি আফিম ঘষে দিলে বিশেষ আরাম হয়। পুনরায় যন্ত্রণা হলে স্বেদ, বা হাতের তালুর স্বেদ আরাম দান করে।

খাওয়ার পর হাত-মুখ ধুয়ে ভিজা দুই হাতের তালু ঘর্ষণ করতে করতে গরম হবার পর হস্তস্থ জলবিন্দু চোখে দিলে ও হাতের তালু বন্ধ-চোখে লাগালে তিমির রোগ বা দৃষ্টিমান্দ্য দূর হয়। এসম্বন্ধে আয়ুর্বেদগ্রন্থ ‘ভাবপ্রকাশ’-এ বলা হয়েছে ঃ

ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা অক্ষোর্ধ্বং প্রদীয়তে জলম্।
অচিরেনৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি ॥

—সকালে ও বিকালে শ্বেত পেঁয়াজের রস ১-২ ফোঁটা চোখে দিলে চোখের ছানিতে উপকার হয়। ইহা সুপরীক্ষিত ঔষধ। এই রস চোখে দেওয়ামাত্র কিছুক্ষণ খুব জ্বালা করে বটে, তবে আস্তে আস্তে কমে যায়।

চোখের অচ্ছোদপটলে (Cornea) শ্বেতদাগ (corneal opacity) হলে শঙ্খভস্ম চন্দনের মতো জলে ঘষে চোখে লাগালে সামান্য সাদা দাগ নষ্ট হয়; তবে গভীর দাগে ইহা ফলপ্রদ হয় না। সমুদ্রফেন-ভস্ম দিলেও অল্প শ্বেতদাগ সেরে যায়। চন্দ্রোদয়াবর্তি (আয়ুর্বেদীয় ঔষধ) মধুসহ লাগালে সামান্য দাগ, অক্ষিপল্লব ফুলে উঠলে (Trachoma) যে কষ্ট হয়—এসব সেরে যায়।

এখন কতগুলি নিয়ম পালনের উল্লেখ এবং দ্রব্যের নাম করা হচ্ছে যে-নিয়মগুলি পালন এবং যে-দ্রব্যগুলি ব্যবহার করলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে এবং চোখ ভাল থাকে ঃ

শোবার অব্যবহিত পূর্বে দুই নাসাপুটে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা গো-ঘৃতের নস্য নিলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। শ্বেতপুনর্নবামূলের রস ১/২ ফোঁটা চোখে দিলে চোখের জ্যোতি বাড়ে। শ্বেতমূলীর ক্ষীরপাক (শতমূলী দুধ ও জলসহ জ্বাল দিয়ে ঐ দুধ) চিনি দিয়ে সেবন করা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। দেওয়ালে কোন কালবিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতক্ষণ পর্যন্ত চোখে জল না আসে ততক্ষণ তাকিয়ে (প্রায় ৩—৭ মিনিট) থাকলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে এবং চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এই প্রক্রিয়াকে ত্রাটক বলে।

ত্রিফলা, ঘি, মধু, শতমূলী, মুগডাল, শাক, জাঙ্গল মাংস, ডালিমফল, চিনি, সৈন্ধব লবণ, আঙুর, আকাশোদক (বৃষ্টির জল), প্রভৃতি বস্তু এবং বিরেচন বস্তিশোধন প্রভৃতি প্রক্রিয়া চোখের পক্ষে হিতকর।

পায়খানা-প্রস্রাবের বেগরোধ, অজীর্ণ, হজম না হতেই পুনরায় আহার করা, ক্রোধ, শোক, দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, রোদে ঘোরা, বিদাহী (শরীর জ্বালা-কারী) ও বায়ুবর্ধক দ্রব্য সেবন চক্ষুর ক্ষতিকারক। প্রখর সূর্য ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে তাকিয়ে থাকাও চোখের পক্ষে হানিকর।

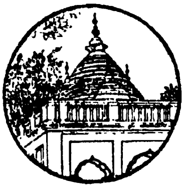

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

অশোক কুণ্ডু

সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা। সম্পাদনা ঃ তাপস বসু, বরুণ সাহা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া। মূল্য ঃ কুড়ি টাকা।

বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নবদ্বীপের একটি বিশেষ অবদান আছে। একদা দোলপূর্ণিমায় নবদ্বীপে জন্ম নিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি যে প্রেমমন্ত্র প্রচার করেছিলেন তা জাতি-ধর্ম-বর্ণের গণ্ডি অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

চৈতন্যদেবের পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব আরো এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই তথাকথিত অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষটির জীবন ও বাণী যে ভাবধারাকে প্রকাশ করেছে তাও কোন বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। দেশ-কাল-নির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার মন্ত্র ক্রমশই প্রসারলাভ করছে।

রামকৃষ্ণের স্বপ্নকে সফল করে তুলেছিলেন যিনি, সেই স্বামী বিবেকানন্দ হলেন মূর্তিমান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, প্রাণসত্তা বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছে।—চৈতন্য রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের এই ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির ‘সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা’য়।

সংকলনের প্রথমেই কুমুদনাথ মল্লিকের গ্রন্থ থেকে ‘নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত’ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তা থেকে নবদ্বীপের ইতিহাসটি জানা যাবে। সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ‘নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয়’ প্রসঙ্গটিকে তুলে ধরেছেন। জয়গুরু গোস্বামীর ‘শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক নবদ্বীপের জীবনচর্যা’য় তৎকালীন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। মিহিরকান্তি রায় ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদদের নবদ্বীপ পরিক্রমা’-র বিবরণ দিয়ে বলেছেন ঃ “ঠাকুর আর তাঁর পার্ষদেরা শুধু নবদ্বীপ বেড়াতে আসেননি কিংবা আসেননি চৈতন্যদেবকে যাচাই করতে; তাঁরা এসেছিলেন গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে আর ভাবীকালের উত্তরসূরীদের জ্ঞানদান ও ভক্তিদান করতে।” এছাড়া —স্বপন বসুর ‘ঊনিশ শতকের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ’ এবং জ্ঞানাংকুর গোস্বামীর প্রবন্ধ মিলে এই ছয়টি প্রবন্ধের বিষয় নবদ্বীপ।

এরপর এসেছে শ্রীচৈতন্য প্রসঙ্গে নয়টি প্রবন্ধ। সেগুলিতে যথাসম্ভব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে চৈতন্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মুসলমান ভক্তদের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য প্রবন্ধ তিনটি উল্লেখযোগ্য। লেখকদের মধ্যে আছেন ঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, অরুণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেমন অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে, তেমনি স্বাভাবিকভাবে শ্রীমা ও নিবেদিতা সম্বন্ধেও প্রবন্ধ আছে। এগুলির সংখ্যা এগারোটি। চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের তুলনামূলক প্রবন্ধ আছে তিনটি। বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদাদেবী সম্বন্ধে লিখেছেন সরস্বতী মিশ্র। অন্যতম সম্পাদক তাপস বসু তাঁর ‘ভুবনজোড়া আসনখানি’ প্রবন্ধে চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের মত ও পথের বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য প্রাবন্ধিকরা হলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, প্রেমবল্লভ সেন, বন্দিতা ভট্টাচার্য, সচ্চিদানন্দ ধর, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আটটি প্রবন্ধ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রচিত। প্রাবন্ধিকেরা হলেন স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রশান্ত সিংহ প্রমুখ। প্রতিটি লেখাই তথ্যনিষ্ঠ, মননবদ্ধ। শ্রীচৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষকদের অধিকাংশ জনের লেখায় সমৃদ্ধ এই স্মারকগ্রন্থটি সত্যিই চমৎকার। একই মলাটের মধ্যে ভারতাত্মার তিন উজ্জ্বল প্রতিনিধির আলোচনা সংগ্রহে রাখার মতো।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব ঃ বেলুড় মঠে গত ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৮ শ্রীশ্রীমায়ের ১৩৬তম আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিন ব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানে অগণিত ভক্ত নর-নারী যোগদান করেন। দুপুরে প্রায় পনের হাজার ভক্ত খিচুড়ি-প্রসাদ পান। অপরাহ্নে স্বামী স্মরণানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

সালেম কেন্দ্র গত ১৪—২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর চতুর্থ পর্যায়ের উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। প্রবন্ধ, বক্তৃতা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এসব প্রতিযোগিতায় মোট ৭৬২জন ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে ২৭ নভেম্বর এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৩২৫ জন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করেছিল।

রাঁচি স্যানাটরিয়াম গত ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বর '৮৮ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী জনসভা ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে।

জলপাইগুড়ি আশ্রম গত ৬—৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত উৎসবের চতুর্থ পর্যায় উদ্‌যাপন করেছে। এই চারদিন জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। ৭ ডিসেম্বর ভক্তদের জন্য এক সাধন-শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

নয়াদিল্লী কেন্দ্র গত ১৭—৩১ ডিসেম্বর '৮৮ পর্যন্ত উক্ত উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ১৭ ডিসেম্বর উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুব-সম্মেলন, ভক্ত-সম্মেলন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ। ২০ ডিসেম্বর আন্তর্ধর্ম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী।

গত ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের ১২৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠে সারাদিন ব্যাপী আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অমলানন্দ, স্বামী বিকাশানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, তাপস বসু, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ও সৌরেন্দ্র সরকার।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে মিশনের ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল বেলুড় মঠে গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৮৮) বিকাল ৩-৩০ মিনিটে। সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী বলেন, ১৯৮৭—৮৮ বৎসরটি রামকৃষ্ণ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম আবির্ভাবের এইটি সমাপ্তি বৎসর। আবির্ভাব উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে বেলুড়মঠে এই বছরের (১৯৮৯) জানুয়ারিতে স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথিতে।

এই বছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি জানান ঃ অরুণাচলের ইটানগরে হাসপাতালে "আলট্রা-সাউণ্ড ক্যান্সার প্রতিষ্ঠাপন; শিলচরে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-কেন্দ্রের প্রবর্তন; চেঙ্গলপট্টু (তামিল নাড়ু), গুয়াহাটী ও রাজমহেন্দ্রিতে (অন্ধ্রপ্রদেশ) নতুন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছে। রায়পুর কেন্দ্র কর্তৃক অন্ধ্রপ্রদেশে বস্তার জেলার অবুঝমাড় উপজাতি এলাকায় ব্যাপক সেবাকাজ সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে বহিরাগত রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র, সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যালয়, গ্রাম-উন্নয়ন শিক্ষণ কেন্দ্র, সঠিক মূল্যের দোকান প্রভৃতিও পূর্বের মতো চালু আছে।

ত্রাণ সেবাকাজ ঃ এই সময়ের মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণকাজে

ব্যয়িত করেছে প্রায় ৬২·৩১ লক্ষ টাকা। প্রায় ১৩·৯ লক্ষ টাকা মূল্যের দানে প্রাপ্ত নানান ত্রাণ-সামগ্রীও বিতরিত হয়েছে।

চিকিৎসা সেবাকাজঃ মিশন ৮টি হাসপাতাল, ৫৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১৫টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিচালনা করে। প্রায় ৩৯ লক্ষ লোক উপকৃত হয়েছেন এবং ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৪·৭২ কোটি টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও তাদের হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়-গুলির মাধ্যমে প্রায় ৭·৬৩ লক্ষ লোকের সেবা করেছে।

শিক্ষা সেবাকাজঃ আমাদের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংসদের বাৎসরিক পরীক্ষাগুলির ফলাফল খুবই সন্তোষজনক এবং বহু মেধাবী ছাত্র প্রথমদিকের বিভিন্ন স্থান লাভ করে। মিশনের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১,৩৪১টি এবং ১,২৮,৭৫০জন। এই কাজে মিশনের ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৬·৩৫ কোটি টাকা।

গ্রাম-উন্নয়ন ও উপজাতি সেবাকাজঃ মঠ ও মিশনের গ্রামীণ ও পার্বত্য এলাকার কাজ উল্লেখযোগ্য। সেখানে আমাদের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় অবস্থিত। এই উদ্দেশ্যে মিশনের খরচের পরিমাণ প্রায় ৯২ লক্ষ টাকা।

বহির্ভারতে সেবাকাজঃ বিদেশে অবস্থিত আমাদের কেন্দ্রগুলি মূলতঃ আধ্যাত্মিকতা প্রচারে রত। ওখানেও বেশ কিছু শিক্ষালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে।

বেলুড় মঠে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত ভারত ও ভারতেতর মিশন ও মঠের শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬ এবং ৭৩।

এখানে বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমানে মিশন পশ্চিমবঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় হিঙ্গলগঞ্জ ও গোসাবায় ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে রত। এছাড়া, বিহারে ভূমিকম্পগ্রস্ত লোকদের মধ্যে মিশনের পুনর্বাসন কাজ এখনও অব্যাহত।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

রামকৃষ্ণ মঠ পল্লীমঙ্গল, কামারপুকুর গত ২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে ১১২জন রোগীর চোখে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করা হয়। পল্লীমঙ্গলের পক্ষ থেকে তাদের চশমা দেওয়া হয়েছে।

গত ১৮—২৫ নভেম্বর পর্যন্ত জামতাড়া আশ্রম পরিচালিত শিবিরে ৫২জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, ও চশমা দেওয়া হয়েছে, এবং ১৫—২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আগরতলা পরিচালিত শিবিরে ৫৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির বেলুড় এবং রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর কলেজের দুজন ছাত্র যথাক্রমে ১৩শ ও ১৪শ স্থান অধিকার করেছে।

উদ্বোধন

গত ১৮ ডিসেম্বর বোম্বে আশ্রমের গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র সাকোয়ারে নবনির্মিত কমিউনিটি হল ও 'ওয়ার্কশপ'-এর উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

বহির্ভারত

সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া) ঃ গত নভেম্বর মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবারে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। ৮ নভেম্বর সোসাইটিতে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ কালীতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী সারদেশানন্দ (গোপেশ মহারাজ) গত ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৮, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে সকাল ৯-০৭ মিঃ বৃন্দাবন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল চুরানব্বই বছর। গত ৯ ডিসেম্বর রাত প্রায় ১-৩০ মিঃ তাঁর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তাঁর ডানদিক অবশ হয়ে যায়। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করে দেখেন যে, তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং রক্তচাপও অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসায় ভাল ফলও পাওয়া গেল। তাঁর চেতনাও ফিরে আসে। কিন্তু ১১ ডিসেম্বর সকালে তিনি পুনরায় এই রোগে আক্রান্ত হন এবং অবশেষে তাঁর অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে আসে।

তাঁর অন্তিমলগ্ন ছিল আশ্চর্যজনক। কিছুক্ষণের জন্য হঠাৎ তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির গতি বন্ধ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চুল দাড়ি সব খাড়া হয়ে উঠে। শরীরে তখন প্রাণের কোন চিহ্নই ছিল না। কিন্তু মিনিট তিনেক পরে তিনি একটা লম্বা শ্বাস নেন এবং নাড়ীও আবার ধীরে ধীরে চলতে থাকে। এবার বেশ কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়ে পর পর তিনবার শ্বাস নেন। কিন্তু শেষবারে শ্বাসটি ভিতরেই থেকে যায়। অপেক্ষা করেও যখন শ্বাস ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেন ও মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর নশ্বর দেহ পবিত্র যমুনায় সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী সারদেশানন্দ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন। ঐ সময় তিনি কয়েক বছর শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘের জয়রামবাটী কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী কেন্দ্রের কর্মী হন। কাছাড়, মনসাদ্বীপ, হিঙ্গলগঞ্জ এবং মাদ্রাজে বড় বড় ত্রাণ-কার্যে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তপস্যায় অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বৃন্দাবন সেবাশ্রমে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। মাঝে একবছর (১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি আগরতলা আশ্রমে কাটিয়েছেন। তাঁর দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ও শ্রীচৈতন্যদেব। বাস্তবিক জ্ঞানের সঙ্গে উচ্চ আদর্শবাদের যথাযথ সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। এজন্য বহু সাধু-ব্রহ্মচারীর যথার্থ পথপ্রদর্শক ও বন্ধু ছিলেন তিনি। সাধকজীবনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর সরল ও কঠোর জীবন-যাপন এবং নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভালবাসা প্রবীণ ও নবীন সকলকেই আকৃষ্ট করত। মধুর স্বভাব ও সকলের সঙ্গে প্রীতি-পূর্ণ সম্পর্কের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব

গত ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ (১৫ পৌষ ১৩৯৫) বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজনগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৩৬তম শুভ আবির্ভাব-তিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভক্ত নরনারী মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করেন। বেলা ১১-৩০ মিঃ থেকে ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৯-১০ মিঃ 'সারদানন্দ হল'-এ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অসিতাভ দত্ত। তারপর বেহালা সুরপীঠের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

সারদানন্দ মহারাজের আবির্ভাব-উৎসব

১৩ জানুয়ারি '৮৯, শুক্রবার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের ১২৪তম আবির্ভাব-উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ তাঁর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা-সারদা' লীলাগীতি পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম ও সহশিল্পীবৃন্দ।

জাতীয় যুবদিবস

গত ১২ জানুয়ারি '৮৯, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে স্বামীজীর উপর বক্তৃতা, আবৃত্তি, কুইজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুল-কলেজের বহু ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিভিন্ন বিষয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। তাছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই স্বামীজীর বই এবং প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ।

সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের নব নির্মিত মন্দিরে গত ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী সত্যঘনানন্দ এবং স্বামী পুরুষানন্দ মহারাজ যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পুণ্য পট প্রতিষ্ঠা করে মন্দির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বেদপাঠ, গীতা পাঠ, বাস্তুযজ্ঞ, বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী আত্মস্থানন্দ বেলা ১১ টায় কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন। পূজা-হোমাদি সম্পন্ন করেন স্বামী শশীধরানন্দ মহারাজ। মধ্যাহ্নে প্রায় দুহাজার নরনারায়ণকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিনামূল্যে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

রামপাড়া (হুগলী) রামকৃষ্ণ সারদা সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা ২০ নভেম্বর ১৯৮৮ রামপাড়া বি. এল. দে দাতব্য হাসপাতাল ও নারায়ণী বালিকা বিদ্যালয়ে রোটারী ক্লাব আয়োজিত বিনামূল্যে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনায় সক্রিয় সহযোগিতা দান করে। চৌদ্দজন চিকিৎসকের একটি দল ৪৬ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করেন। সংঘের সহযোগিতা ও ব্যবস্থাপনায় এটি ছিল চতুর্থ চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবির।

একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন

দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার অনগ্রসর তিলজলা অঞ্চলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে মানবসেবা এবং জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী রূপায়ণে সম্প্রতি বিবেকানন্দ সেবা সংসদ গঠিত হয়েছে। বিগত চার মাসে দ্বিতীয় রবিবারগুলিতে তিলজলা হাই-স্কুলে মানুষের জীবনের বিকাশে, চরিত্র গঠনে এবং সেবাকাজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন অমিয়কুমার মজুমদার, তাপস বসু, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ এবং স্বামী বলভদ্রানন্দ।

জামসেদপুরে তুলসী-ভবন

কয়েক মাস আগে জামসেদপুরে সিংভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে রামচরিতমানস রচয়িতা তুলসীদাসের স্মৃতিতে 'তুলসী-ভবন' নির্মাণ করা হয়েছে। এই ভবনকে রামায়ণ গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত রামায়ণ সংগ্রহ এবং এইসব রামায়ণ রচয়িতাদের জীবন-কাহিনী ও চিত্র এখানে থাকবে।

ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্মদিন উদ্‌যাপন

গত ২ নভেম্বর হাওড়ায় ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ১৫৫তম জন্মদিন পালন করা হয়। ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়নস্-এর উদ্যোগে এই স্মরণসভা হয়। উল্লেখ্য মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক। তাঁর নামে হাওড়ার একটি রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

যীশুখ্রীষ্ট কি ভারতে বৌদ্ধ হয়েছিলেন ?

যিশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রায়ই নতুন কোন খবর দিয়ে চমক লাগিয়ে দেন গবেষকরা। তেমনই একটি খবর হল বারো বছর বয়সে তিনি চলে আসেন ভারতে। এখানে আসার পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী রূপে ফিরে যান ইজরায়েলে। চমক লাগানো খবরটির জন্মদাতা বেলগ্রেডের 'নিন' সংবাদপত্রের সাংবাদিক ড্র্যাগন জোভানোভিক। সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে পাইরটের কাছে গুহার মধ্যে একটি গির্জা আছে। তার দেওয়ালে প্রাচীন ফ্রেস্কো চিত্রে রয়েছে মুণ্ডিত-মস্তক যিশুর ছবি, যা দেখে তাঁকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী মনে হয়। ছবিটা অবশ্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। জোভানোভিক এর আগে একটি বইতে লেখেন পুনরুত্থানের পরে যিশুখ্রীষ্ট পালিয়ে আসেন ভারতে। ভারতেই তিনি দেহত্যাগ করেন। কাশ্মীরে শ্রীনগরে তাঁর দেহ সমাধি দেওয়া হয়।

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

সলিল মুখোপাধ্যায়

বিরল ধাতু ইনডিয়াম আবিষ্কারের ১২৫ বছর

বিরলধাতু 'ইনডিয়াম' (Indium) আবিষ্কার হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফারডিনান্ড রাইচ এবং ফিয়োডর রিটোর নামে দুই বিজ্ঞানী জিঙ্ক ব্লেন্ড (জিঙ্ক ধাতুর আকরিক)-এর মধ্যে থ্যালিয়াম ধাতুর অন্বেষণ করছিলেন। এই দুই বিজ্ঞানী বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে যখন অশোধিত জিঙ্ক ক্লোরাইডের দ্রবণ পর্যবেক্ষণ করছিলেন ঠিক তখনই তারা একটা সুস্পষ্ট গভীর নীল-বেগুনী রঙের (Indigo blue) রেখা দেখেন। এই ধরনের গভীর নীল-বেগুনী রঙের রেখা আগে কখনও দেখা যায়নি। এই দুই গবেষণাকারী ভাবতে থাকেন নিশ্চয়ই কোন নতুন ধাতবমৌল ঐ অশোধিত জিঙ্ক ক্লোরাইডের দ্রবণে লুকিয়ে আছে, যেটা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে সুস্পষ্ট গভীর নীল-বেগুনী রেখা দিচ্ছে। পরে তারা এই নতুন ধাতবমৌলটি জিঙ্ক ক্লোরাইডের দ্রবণ থেকে আলাদা করতে সক্ষম হন। এই দুই বিজ্ঞানী এই নতুন ধাতবমৌলের নাম রাখেন 'ইন্ডিয়াম'-এর বৈশিষ্ট্যমূলক গভীর নীল-বেগুনী রঙের (Indigo-blue) বর্ণালীর জন্য।

ইনডিয়াম কম-বেশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। যদিও সামান্য পরিমাণে অনেক খনিজ আকরিকের সঙ্গে ইনডিয়াম পাওয়া যায় তবুও বিশেষভাবে এবং বেশি মাত্রায় জিঙ্ক (দস্তা) এবং লেডের (সীসার) খনিজ আকরিকে পাওয়া যায়। ইনডিয়াম বিভিন্ন জিঙ্ক আকরিকের সঙ্গে শতকরা ১/১০ (১000 ভাগে ১ ভাগ) মাত্রা পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। ভূত্বকে ইনডিয়াম মাত্র ১ কোটি ভাগে ১ ভাগ পাওয়া যায় যেটা প্রায় রুপোর (সিলভার) প্রাচুর্যের সমান।

বাণিজ্যিকভাবে ইনডিয়াম নিষ্কাশন করা হয় জিঙ্কঘটিত আকরিক থেকে জিঙ্ক নিষ্কাশনের পর। ইনডিয়াম নিষ্কাশনের প্রায় এক ডজন পদ্ধতি আছে।

ধাতব ইনডিয়াম রুপোর মতো সাদা এবং সীসার (লেডের) থেকেও নরম। ইনডিয়াম ধাতু সাধারণ অবস্থায় ঘাতসহ এবং নমনীয়। শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে ইনডিয়াম সাধারণ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করে না কিন্তু এর গলনাঙ্কের ওপরে খুব তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া হয়। ইনডিয়াম বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে সংকরধাতু তৈরি করতে পারে।

তড়িৎবিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন ধাতুর ওপর ইনডিয়াম-এর প্রলেপ তৈরি করা যায়। প্রলেপযুক্ত ইনডিয়াম ক্ষয় প্রতিরোধকের কাজ করে। ইনডিয়াম ধাতুর প্রলেপ ঘর্ষণসহনক্ষম, তাই ভারী মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশে বিশেষ করে বেয়ারিং (Bearing)-এ ব্যবহার আছে। অতি বিশুদ্ধ ইনডিয়াম, জারমেনিয়াম ট্রানজিস্টার এবং রেক্টিফায়ার (rectifier) তৈরিতে ব্যবহার হয়। বেশ কয়েকটি কম গলনাঙ্কের সংকরধাতু তৈরিতে ইনডিয়ামের ব্যবহার আছে। যেমন, শতকরা ২৪ ভাগ ইনডিয়াম এবং শতকরা ৭৬ ভাগ গ্যালিয়ামযুক্ত সংকরধাতু ১৬° সেঃ তাপমাত্রায় গলে অর্থাৎ সাধারণ তাপমাত্রায় এটি তরল। জৈব ইনডিয়াম যৌগ যেমন ইনডিয়াম লরেট কম মাত্রায় পেট্রলজাত পদার্থের সঙ্গে ব্যবহার করলে পেট্রলজাত পদার্থের জ্বলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

যদিও ইনডিয়াম ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছিল আজ থেকে ঠিক ১২৫ বছর আগে; কিন্তু এর ব্যবহার আজও যেন সীমিত। এর একটা কারণ এটা বিরল ধাতু বলে। শুধু তাই নয় সারা বিশ্বে ইনডিয়ামের উৎপাদন কতখানি তারও সঠিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া কষ্টকর। ইনডিয়ামের প্রাচুর্য ভারতবর্ষে কতখানি তারও সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। আমাদের দেশে এই বিরল ধাতুর ওপর আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন।

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

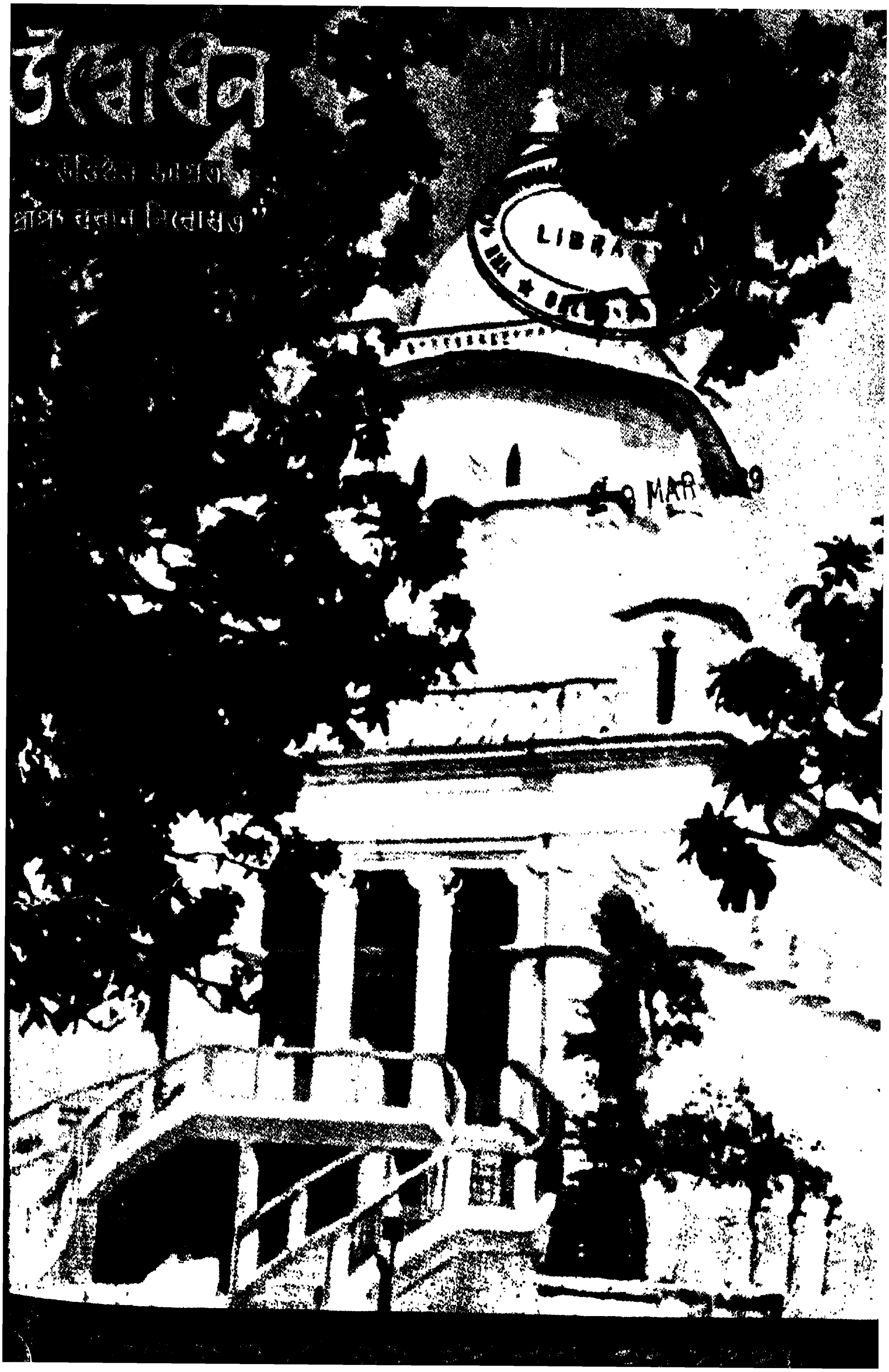

LIBRARY
9 MAR

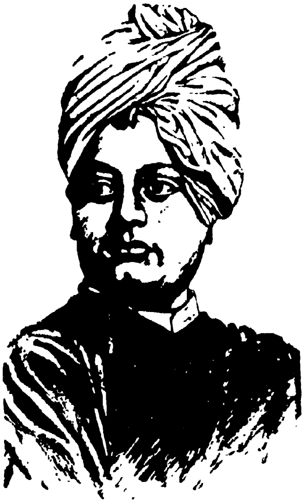

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা চৈত্র, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

নাভ কমল মে হ্যায় কস্তুরী,
ক্যায়সে ভরম টুটে পশুকা রে।
বিনা সদ্‌গুরু নর য়্যাসাহি ঢুঁঢ়ে,
জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে ॥

অজ্ঞাত

নিজের নাভির মধ্যেই রয়েছে কস্তুরী। কিন্তু মৃগ তা বুঝতে পারে না। কস্তুরীর গন্ধে পাগলের মতো সে বনের মধ্যে ছুটে বেড়ায়। সদ্‌গুরু না পেলে মানুষেরও অবস্থা ঐরকম হয়। সে জানতে পারে না যে, তার আপন অন্তরেই বিরাজ করছেন ভগবান।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
★ CALCUTTA ★

কথাপ্রসঙ্গে

বিশ্বাস

মৈকো কাঁহা ঢূঁঢ়ো বন্দে ম্যায় তো তেরে পাস মো।
খোজোগে তো অব মিলুঙ্গা পলভরকি তল্লাস মো ॥
ন দেওলমে ন মসজিদমে ন কাশী কৈলাসমে।
ন হ্যায় মে আউধ দ্বারকা মেরা ভেট বিশ্বাস মো ॥

—কোথায় আমাকে খুঁজিতেছ? আমি তোমার কাছে-কাছেই তো রহিয়াছি। যদি সত্যসত্যই আমাকে চাহ, এক পল মাত্র খুঁজিলেই আমাকে পাইবে। আমি মন্দিরে থাকি না, মসজিদেও নয়, কাশী অথবা কৈলাসেও নয়, অযোধ্যা অথবা দ্বারকাতেও নয়। শুধু বিশ্বাসেই আমাকে পাইবে।

পদটি কবীরদাসের। এ তাঁহার মুখের কথা নহে, প্রাণের কথা। তাঁহার উপলব্ধি, তাঁহার অভিজ্ঞতা।

ভারতে বা ভারতের বাহিরে যত সন্ত-মহাপুরুষ আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন বিশ্বাসের সাকার বিগ্রহ। এই বিশ্বাস জগৎপ্রপঞ্চের পিছনে মূল শক্তি হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতে পারে, অথবা সেই মূল শক্তিই স্বয়ং আমি বা তাহার অংশ আমার মধ্যে বিদ্যমান, এই বিশ্বাসও হইতে পারে।

মানুষ স্বভাবতই অবিশ্বাসী। মানুষ বলে, প্রত্যক্ষ দর্শন হইলে তবেই বিশ্বাস করিব। 'Seeing is believing'—আগে চর্মচক্ষুতে দর্শন, তবেই বিশ্বাস। তবে চর্মচক্ষুতে যাহাই দেখি তাহাই যে সত্য নহে, যাদুবিদ্যা দর্শনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তো আমরা জানি। আবার সকল সময় আমরা যে স্বচক্ষে দেখিয়া তবে বিশ্বাস করি তাহাও সত্য নহে। যেমন, আমাদের মধ্যে কয়জন নিউইয়র্ক বা টোকিও দেখিয়াছি? কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা বলি নিউইয়র্ক বা টোকিও নাই? বলি না। কেন বলি না? কারণ, ভূগোলে পড়িয়াছি, অথবা এমন লোকের মুখে শুনিয়াছি যিনি বা যাঁহারা 'দ্রষ্টা' লোক অথবা যাঁহার বা যাঁহাদের বিশ্বস্ততা এমনই পর্যায়ের যে, আমরা নির্বিচারে তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। অর্থাৎ এখানে বিশ্বাসের ভিত্তি দাঁড়াইল দুইটি বস্তু: এক—গ্রন্থ, দুই—ব্যক্তি।

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র ধর্ম। সেক্ষেত্রে কবীর এমন একজন 'দ্রষ্টা' ব্যক্তি এবং তিনি যে চূড়ান্তভাবে সৎ, অকপট এবং একজন আধিকারিক-পুরুষ তাহা তাঁহার কালের বহু মানুষ স্বীকার করিয়াছিলেন। আবার, তিনি তাঁহার যে-অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী, সমকালীন এবং পরবর্তী অনুরূপ ব্যক্তিদের সূত্রেও আমরা জানিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, যুগ যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা ধর্মের 'প্রকাশিত' (Revealed) গ্রন্থগুলিতেও ঐ কথা উচ্চারিত। লৌকিক ক্ষেত্রে যদি 'দ্রষ্টা' বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং গ্রন্থের সাক্ষ্যকে আমরা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে অধ্যাত্মক্ষেত্রেও অনুরূপ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না কেন? মানুষ যুক্তি চায়। ইহা তো যুক্তিই।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে গুরু এবং শাস্ত্রের ভূমিকার কথাই আমরা এখানে বলিতে চাহিতেছি। গুরু এবং শাস্ত্রের বাক্যে দৃঢ় প্রতীতিকেই আমাদের শাস্ত্রাদিতে বলা হইয়াছে বিশ্বাস। গুরু এখানে সাধারণ অর্থে দীক্ষাগুরু নহেন। গুরু অর্থে এখানে আচার্য—ধর্মাচার্য, লোকাচার্য। যেমন কৃষ্ণ, ব্যাস, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, কবীর, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ। আর 'শাস্ত্র' বলিতে বুঝিতে হইবে প্রধানতঃ শ্রুতি বা বেদ এবং গীতাদি গ্রন্থ যাহাতে পূর্বোক্ত আচার্যগণের উক্তি বিধৃত রহিয়াছে। এইসব আচার্যের জীবন হইল মূল শাস্ত্র বেদের প্রায়োগিক রূপ বা কর্মে পরিণত ভাষ্য। তাঁহাদের উক্তি-নিচয়কে ধারণ করিয়া গীতাদি যে-সমস্ত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে তাহা মূল শাস্ত্র শ্রুতির সম্প্রসারণ মাত্র।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রটি যুক্তি বা লৌকিক বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাহা মূলতঃ অনুভূতির রাজ্য। সুতরাং সেখানে বিশ্বাসের প্রয়োজন ও ভূমিকা অনেক বেশি। ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৬।১১।২৫

শ্রীমান নীলকণ্ঠ,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শুদ্ধানন্দ স্বামীকে যে পত্র তুমি লিখিয়াছিলে, তাহা তিনি আমাকে দেখিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে তিনি যাহা তোমাকে লিখিয়াছিলেন তাহাও আমাকে জানাইয়াছেন। আমি তাঁর কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মিথ্যা কথা ছ্যাঁচা জল বেশিদিন থাকে না। তোমরা প্রভুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাক। তাঁর নাম কর, ধ্যান কর। কেহ আশ্রমে আসেন ভাল, তাঁদের সহিত ধর্মালাপ করিবে। কেহ না আসেন, তাও ভাল। তোমরা সত্যস্বরূপ ঠাকুরকে ধরিয়া বসিয়া থাক। তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন। এ সময়টা তোমাদের ওস্থান ছাড়িয়া যাওয়া একেবারেই উচিত নয়। ঠাকুর তোমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করিতেছেন এবং উহা দৃঢ় করিয়া দিতেছেন। ইহা তোমাদের এক ঘোর সাধনা। কখনই ভীত হইও না। একমাত্র সত্যস্বরূপ, যুগাবতার, যুগসংস্থাপক, অহেতুকী কৃপাসিন্ধু ঠাকুরকে স্মরণ-মনন, তাঁর শ্রীচরণ-ধ্যান, তাঁর বিষয় পাঠ, তাঁর গুণ-কীর্তন করিয়া বসিয়া থাক।··· লোকে যাহা ইচ্ছা তোমাদের বলুক, তোমরা তাহাতে কর্ণপাত করিও না।··· "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্যেরই জয়, মিথ্যার নয়। লোকে যা ইচ্ছা রটনা করুক।

মঠে এবার খুব ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। ২১।২২ জন ভুগিয়াছে। এখন ধীরে ধীরে সব উঠিতেছে। একজন এখনও অন্ন পথ্য করে নাই। সকলে খুব দুর্বল। এখন কেহ কোথাও Relief করিতে যাইতে পারিবে না। এখন Malaria একটু কমিতেছে, শীতও পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ভৈরব সম্বন্ধে কাগজে যাহাই বাহির হোক তোমরা সেসব গ্রাহ্য করিও না। সত্য ঘটনা যাহা হইয়াছিল সে তাহা উপেনবাবুকে লিখিয়া পাঠাইয়াছে। সেখানকার লোক বিশ্বাস করুক বা নাই করুক তোমরা চুপচাপ আপনার কাজ করিয়া যাও প্রভুর ইচ্ছায়। প্রভুকে স্মরণ কর তাঁর শ্রীপদে খুব প্রার্থনা কর। দেখিবে তাঁর মহিমায় সব মিথ্যা ভাসিয়া যাইবে। তোমাদেরও হৃদয়ে বিশ্বাস ভক্তি খুব বাড়িয়া যাইবে। কখনই এখন ওস্থান ছাড়িও না। প্রভু সব ঠিক করিয়া দিবেন। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তোমরা জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

পুঃ এসময় তোমরা চলিয়া আসিলে যারা শত্রুতা করিতেছে, তারা মনে করিবে ইহারা দোষী, নতুবা পালাবে কেন? তোমরা ঠিক ঠাকুরকে ধরিয়া বসিয়া থাক, আহারাদির কোন কষ্ট হইবে না ঠাকুরের কৃপায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বেলুড় মঠে মহাফেজখানা ও সংগ্রহশালা

আনন্দের সঙ্গে আমরা জনসাধারণকে জানাচ্ছি যে, বেলুড় মঠে একটি মহাফেজখানা ও সংগ্রহশালা (Archive and Museum) স্থাপিত হয়েছে। স্থির হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান প্রধান কার্যালয় ভবনটিতে এটি অদূর ভবিষ্যতে স্থানান্তরিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘড়ি, জুতা ইত্যাদি, চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি, ব্যক্তিগত দিনলিপি, ব্যবহৃত গ্রন্থাদি এবং তাঁদেরকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা-সম্ভাষণ এই মহাফেজখানা এবং সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হবে। তাছাড়া, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের চরণচিহ্নও সেখানে সংরক্ষিত হবে।

সঙ্ঘের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে উল্লিখিত দ্রব্যাদির কিছু থাকলে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের নিকট তা হস্তান্তর করার জন্য একান্ত অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বহু প্রজন্মের ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণের কাছে প্রদর্শনের জন্য সংগ্রহশালায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলি সংরক্ষণ করা যায়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড় মঠ

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

প্রবন্ধ

আজকের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা

স্বামী ভূতেশানন্দ

ধর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনা প্রায়শঃ হয়ে থাকে। দ্বৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদের বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় খুব কাজে লাগে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষের জীবন নিতান্ত গতানুগতিকভাবে কাটে। জন্ম হল, বাবা-মা বড় করলেন, লেখাপড়া শিখলাম, তারপর জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা, বিবাহ—ঘর-সংসার, এইভাবে চলল। আমাদের কাছে যাঁরা তাঁদের সাংসারিক জীবনের কথা বলেন তাতে দেখা যায় জীবনটা যেন দুঃখবেদনার সমষ্টি। হয়তো সংসার সচ্ছল, অভাব অনটন নেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শান্তি আছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুঃখবোধ রয়েছে। বহু লোকের জীবনই এই। কারো বা তা এত গা সওয়া হয়ে গিয়েছে যে, কোন যন্ত্রণাবোধই নেই। আর কেউ বা দুঃখবেদনায় বিচলিত, বিব্রত, বিধ্বস্ত। এখন, এঁদের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ কতটা প্রাসঙ্গিক, তাঁর জীবন, আদর্শ কাকে কিভাবে সাহায্য করবে তা সহসা বলা কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছেন। একটি ছেলে কাছাকাছি বসে ছিল। ঠাকুর সেখান থেকে সরে বসলেন। পরে বলেছেন, দেখলাম যে, সে বিষয়ে একেবারে ডুবে আছে। এখানে কি দেখা যাচ্ছে? ঠাকুর দেখাচ্ছেন বিষয়ীদের কাছে তিনি ঘেঁষেন না, অথচ তাদের জন্যই তো তাঁর আসা। অবশ্য বিষয়ীরা তাঁর কাছে বিশেষ আসত না। ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা আসতেন, ভক্তেরা ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন, আর তাঁরা ব্যস্ত হচ্ছেন, কখন যাবেন। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুত হয়ে বলছেন, তোমরা কথা বল, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি। অর্থাৎ ভাল লাগছে না। আবার কেউ কেউ ঠাকুরের কাছে এসে মাদুর পেতে শুয়ে পড়তেন। ঘুম যখন ভাঙত তখন যাবার সময় হয়েছে। ঠাকুরের কাছে যেতেন অনেকে, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সত্যিকারের কিছু উপদেশ নেবেন বা তাঁর সান্নিধ্য জীবনে কাজে লাগাবেন তেমন দৃষ্টান্ত খুব কম। অধিকাংশই এই রকম। ঠাকুর পরিহাস করে বলতেন, যাত্রা শুনতে এল। চাটাই পেতে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল (গ্রামের যাত্রায় শ্রোতারা চাটাই নিয়ে আসত)। যাত্রা ভাঙলে হৈ চৈ হচ্ছে, তখন ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বলে, যাত্রাদল এসে গিয়েছে?

ঠাকুর মানুষকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত আর নিত্য। পূর্বে যাদের কথা বলা হল এরা বদ্ধজীব। এরা কারা? আমরাই। আত্মসমীক্ষা করলে বুঝতে পারব আমাদের জীবন কোন স্তরের। ভগবানের কথায় তেমন রুচি নেই, বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রবল। কখনো সাধুসন্ন্যাসীর কাছে গেলে বলি, ছেলের অসুখ ভাল করে দাও, মেয়ের যেন একটা ভাল বিয়ে হয় ইত্যাদি। সব সংসারের বিষয়। এছাড়া যেন সাধুর কাছে পাওয়ার মতো কিছু নেই। ঠাকুরের কাছেও এমনি কত প্রার্থনা। ঠাকুর তো দেখিয়েছেন তিনি কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড করেন না। একজন ঠাকুরের কাছে এসে বলছে, শুনেছি এখানে পরমহংসদেব ওষুধ দেন। ঠাকুর সশঙ্কিত হয়ে বলছেন, না না, এখানে না, ঐ পঞ্চবটীতে। সাধুর কাছে বা ভগবানের কাছে আমরা সংসারের এইসব বিষয়ই চাই। মুখে বলি জ্ঞান-ভক্তি চাই—কিন্তু বাস্তবিক তা কতটুকু চাই? এরকম অবস্থায় ঠাকুর আমাদের কোন কাজে লাগবেন সেই কথা ভাববার। আমরা সাধারণতঃ যা চাই ঠাকুরের কাছে সেসব কিছুই নেই। ধনদৌলত নেই, রোগ ভাল করতে পারেন না বা করেন না, মামলায় জিতিয়ে দেওয়া, ছেলেমেয়ের পরীক্ষা পাস, চাকরি পাওয়া, মেয়ের বিয়ে, প্রভৃতি পার্থিব ব্যাপারে আশীর্বাদ চাইলে বলতেন, 'মা জানেন, আমি কিছু জানি না'। এমন যে ঠাকুর তাঁকে দিয়ে আমরা কি করব? তাই যখন দেখে যে, তাঁর কাছে এসে পার্থিব কিছু লাভ হচ্ছে না তখন বলে 'দূর, এত আশা করে এলাম কিছু লাভ হল না।' কেউ কেউ বলে, 'আমি দীক্ষা

নেবার পর থেকে সংসারে নানা অঘটন ঘটছে, এটি কি দীক্ষার দোষে হচ্ছে?' এর উত্তরে বলব : ঠাকুর বলেছেন, ভগবানের জন্যই ভগবানকে চাইব। তাঁকে উদ্দেশ্য রূপে চাইব, উপায় রূপে নয়। তিনি এই দেবেন, ওই দেবেন—এইসব আশা করে তাঁকে চাইব না। কিন্তু সেরকম মানসিকতা নিয়ে ঠাকুরের কাছে কজনই বা আমরা যাই? আমরা যা চাই তা তাঁর কাছে পাই না। ফলে কি করি? একদিকে মুখে 'ঠাকুর ঠাকুর' বলি আর অন্যদিকে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হই। আমি সেইসব ব্যক্তিদের দোষ দিচ্ছি না, শুধু মানুষের বাসনার কথা বলছি।

একবার এক জায়গায় গিয়েছি, একজন আমাকে বলছে, 'আপনি হাত দেখতে জানেন?' আমি বললাম, 'না'। 'কুষ্ঠী দেখতে জানেন'? 'না'। 'ওষুধ জানেন?' 'না'। 'তাহলে আপনি কি জানেন?' ভাবলাম, সত্যিই তো আমি কি জানি? এইসব মানুষের আশা মেটাবার মতো বস্তুসম্ভার আমার কাছে কিছুই নেই। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণকে এদের ভাল লাগে। কেন লাগে? একটি কারণে ভাল লাগে তা হচ্ছে, এমন সরল আত্মভোলা, সকলের দুঃখে দুঃখী মানুষ কজন মেলে? যিনি সর্বদাই ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বলেন, ঈশ্বর ছাড়া যিনি আর কিছু জানেন না, অথচ কেউ সন্তান হারিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দুঃখের কথা জানালে, তাঁর চোখে জল। এই ঠাকুরকেই তো আমরা চাই। যিনি আমাদের দুঃখে দুঃখ পান, উদাসীন হয়ে থাকেন না তাঁকেই তো আমরা চাই। তিনি সব দুঃখ বিপদ থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করতে নাও পারেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে আমরা এমন একজন দরদীকে পাই যিনি আমাদের দুঃখ বোঝেন।

বুঝলাম। কিন্তু এই ঠাকুর সংসারে আমাদের কতটুকু কাজে লাগবেন? তিনি যে কঠোর তপস্যা করেছেন তা আমরা পারব না। তবে তিনি যে বলেছেন এক হাতে ভগবানকে ধরে আর এক হাতে সংসার কর তা বরং কতকটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। দুহাতে তাঁকে ধরা, সে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুরের উপদেশে বৈরাগ্যের কথা অনেক আছে বটে, তবে সে বৈরাগ্যের অর্থ এই নয় যে, সকলকে সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে। কথামৃত যিনি সংগ্রহ করেছেন সেই মাস্টারমশায়েরও এই সমস্যা হয়েছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, যদি স্ত্রীর সঙ্গে মতে না মেলে তাহলে কি করব? ঠাকুর বললেন, বার বার বোঝাবে, বুঝিয়ে তোমার মতে নিয়ে আসবে। পরের প্রশ্ন : তাতেও যদি না বোঝে, যদি সাধনপথে বিঘ্ন হয়? ঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন, তাহলে তাকে ত্যাগ করবে। মাস্টারমশায় চিন্তাকুল—এতদূর যেতে হবে? ঠাকুর বললেন, ওগো, যে আন্তরিকভাবে ভগবানকে ডাকে, তিনি তার সব অনুকূল করে দেন। মাস্টারমশায় বলছেন, শুনে তাঁর চিন্তাগ্নিতে জল পড়ল। ঠাকুর বলেছেন, সাধনা করতে হবে। কিন্তু যে পারছে না তাকে বলেছেন যতটুকু পার করবে। গিরিশকে বলছেন, দেখ আর কিছু না পার তো সকালে বিকালে তাঁর নামটা কোর। গিরিশ চিন্তা করছেন, বলব করব কিন্তু পারব কি? পারব না। ঠাকুর বললেন, আচ্ছা, দিনান্তে একবার অন্ততঃ তাঁর নাম কোর। গিরিশ তখনও নীরব। বলছেন, এমন কতদিন কেটে গিয়েছে যে, নানা ঝামেলার ভিতরে মন একবারও ঈশ্বরের কথা ভাবে না। কাজেই দিনান্তে একবার করব এ-প্রতিশ্রুতিই বা দিই কি করে? তখন ঠাকুর বললেন, তাও যদি না পার তো আমাকে বকলমা দাও। অর্থাৎ আমাকে ভার দাও। গিরিশ বললেন, বাবা নিশ্চিন্ত হলাম। তিনি যদি আমাদের ভার নেন তো বাঁচা যায়। আমরা ভার বইতে পারছি না। আমরা ভগবানকে ডাকতে পারছি না, তাঁকে ধরতে পারছি না, তিনি যদি ধরে নিয়ে যান তাহলে হয়। কিন্তু গিরিশকে ঠাকুর যে কথা বলেছেন তা সকলকে বলেননি। তাদের কথায় বলেছেন, এখানে এসে সব বলে এটা করে দাও, ওটা করে দাও, নিজেরা কিছু করবে না। অর্থাৎ সেরকম প্রশ্রয় তিনি দিচ্ছেন না যে, তোমাদের সব ভার আমি নিলাম, তোমাদের কিছু করতে হবে না? বলছেন, আমি ষোল টাং করেছি তোরা না হয় এক টাং কর। অর্থাৎ খানিকটা করলেই হবে। সেই 'খানিকটা' কতখানি তাতো আর পরিষ্কার করে বলে দেননি। আমরা ভাবি, দেখা যাক কি করা যায়। বেশ কিছু লোক এমন আছেন যাঁরা দীক্ষা নেবার পর বলেন, মন্ত্র ভুলে গিয়েছি। অর্থাৎ

মন্ত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই ছিল না। এইরকম হয়, এটা আশ্চর্যের কিছু না। তাহলে ঠাকুরকে দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন ? মাঝে মাঝে বুঝি, আমাদের প্রয়োজন আছে। চারদিক থেকে এমন আঘাত পাই যে না বুঝে উপায় নেই। তাই ঠাকুরের কাছে বলি তিনি যদি কোন উপায় করে দেন।

ঠাকুর উপায় করতে প্রস্তুত। তিনি তীব্র জ্বলন্ত ভাষায় বদ্ধজীবের বর্ণনা করে বলছেন, মাছ মুখে জাল নিয়ে কাদায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। ভাবে বেশ আছি। জানে না যে, জেলে এখনি হিড় হিড় করে ডাঙায় টেনে তুলবে। আমরাও সব জানছি চোখের সামনে দেখছি তবু চেতনা নেই। বদ্ধজীবের এই লক্ষণ। একজন বললেন, বদ্ধজীবের কি কোন উপায় নেই ? ঠাকুর জোর দিয়ে বললেন, কেন থাকবে না ? নিশ্চয়ই আছে। ঠাকুরের কাছে কোন হতাশার কথা নেই। কি উপায় ? উপায় হচ্ছে—ভগবানের নামগুণগান, সাধুসঙ্গ, মাঝে মাঝে নির্জনে ভগবানকে ডাকা। এইসব করতে করতে বাঁধন ধীরে ধীরে শিথিল হবে। হঠাৎ টান দিলে কিছু হবে না। মায়াজাল এমন শক্ত কিছুতেই ছেঁড়ে না। কাজেই তাদের জন্য বললেন, এখন না হলেও ক্রমশঃ হবে।

কাশীপুরে ঠাকুর যখন 'কল্পতরু' হয়েছিলেন, সকলকে উদ্ধার করবার জন্য, নিজের ভাণ্ডার যখন উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তখনো কিন্তু একজনকে বলেছেন, 'তোমার পরে হবে'। অর্থাৎ সময় অনুকূল না হলে কল্পতরুও যেন আমাদের ফল দিতে চায় না। কিন্তু 'হবে না' একথা কাকেও বলেননি। প্রত্যেকেরই হবে এই আশার বাণী আমরা তাঁর কাছে শুনতে পাই। আশ্বাস দিয়ে সকলকে বলেছেন, 'তাঁর নাম করতে করতে এই অজ্ঞানমোহ ধীরে ধীরে কেটে যাবে।'

এজন্য তিনটি উপায় বলেছেন। নামগুণগান, সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস। নির্জনবাস মানে হাওয়া বদলাতে যাওয়া নয়, নির্জনে গিয়ে ভগবানের সম্বন্ধে একটু চেতনা জাগানো, চিন্তা করা। এইরকম করতে করতে অজ্ঞানের বাঁধন একটু শিথিল হয়। সাধুসঙ্গ মানে সাধুর সঙ্গে একত্র বাস করা নয়, সাধুর আদর্শ গ্রহণ করা। যাঁর সান্নিধ্যে গেলে ভগবানের সম্বন্ধে মনে চেতনা জাগে, সৎচিন্তা মনে আসে তাঁকেই সাধু বলে। প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনা মনে পড়ছে। নবাগত এক ব্যক্তি উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছে গিয়েছেন। বলছেন, সাধুসঙ্গ করতে এসেছি। সারদানন্দ মহারাজ বললেন, বাপু, ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন তখন কালীবাড়ীর ঠাকুর চাকর চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে থাকত, পাড়াপড়শীরাও প্রতিদিন প্রায় আসাযাওয়া করত। বছরের পর বছর এই রকম চলেছে। কিন্তু তাদের কারও জীবনে যে কোন পরিবর্তন ঘটেছে তা তো শোনা যায় না। সাধুর কাছে গেলেই সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুর জীবনের যা শিক্ষা তা গ্রহণ করবার জন্য একটু আগ্রহ থাকা দরকার। না হলে সে সঙ্গে কোন কাজ হয় না।

সেইরকম নির্জনবাস বলতে কেবল বাইরে থাকা নয়, যাতে চেতনা জাগে ভগবৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হই সেইভাবে সময়টিকে কাজে লাগানো। নির্জন অরণ্যে বাঘ ভালুকও তো থাকে তাদের কোন পরিবর্তন হয় কি ? বনে জঙ্গলে আদিবাসীরা থাকে কিংবা হিমালয়, যাকে দেবতাত্মা বলা হয়, যা কত মুনি-ঋষির তপস্যার ক্ষেত্র, সেখানে পাহাড়ীরা থাকে তাদের জীবন তো গতানুগতিক ধারায় চলে। কাজেই স্থানমাহাত্ম্য বা বাহ্য আচার আমাদের কাজে লাগে না। ঠাকুর বলছেন, 'এত জপ করে আবার বলে কিনা পাপী, পাপী।' অর্থাৎ জপ করছে কিন্তু তাঁর নামে সকলে যে পবিত্র হয় সে বিশ্বাস নেই। ঠাকুর বলেছেন তাঁর নামকীর্তন করতে। কিন্তু কীর্তনীয়ারা যে কীর্তন করেন তাতে তাঁদের কয়জনের ধর্মজীবনে অগ্রগতি হয় জানি না। যাঁদের চেতনা হয় না তাঁরা যেন হাতার মতো। হাতায় করে পরমান্ন ইত্যাদি সুখাদ্য পরিবেশন করা হয় কিন্তু হাতার কি তাতে কোন ইষ্টাপত্তি আছে ? নেই। একজনের ধর্মবক্তা হিসাবে খ্যাতি ছিল। তিনি একদিন তাঁর অন্তরের কথাটি বলছেন, সকলকে ধর্মকথা শোনাই আর লোকে খুব সুনাম করে, কিন্তু আমার নিজের তো সন্দেহ যায় না। অপরকে বলছেন কিন্তু নিজের ভিতরে সন্দেহ যাচ্ছে না। ঠাকুর ভাগবতের পণ্ডিতের কথা বলছেন। খুব বড় পণ্ডিত। রাজার কাছে গিয়ে

রোজ ভাগবতের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে শেষকালে বলেন, 'রাজা বুঝেছ'? রাজা বলে, 'আগে তুমি বোঝ।' ভাবেন, রাজা কি আমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি? পরদিন আরও চিন্তা করে খুব ভাল করে তৈরি হয়ে ব্যাখ্যা করেন। যথারীতি বললেন, 'বুঝেছ?' রাজা বলে, 'তুমি বোঝ।' এইরকম কয়েকদিন শুনে একদিন ভাবলেন আমি তো রোজ বোঝাচ্ছি, কিন্তু আমার জীবনের উপর এর প্রভাব কতটুকু? রাজার কাছে যাই অর্থের জন্য, যে-অর্থের দ্বারা আমি ভোগসামগ্রী পাব। ভাগবতে সব ছেড়ে ভগবানকে ধরার কথা বলা হচ্ছে। তাহলে আমার ভাগবত বোঝা আর কি করে হল? পণ্ডিতের তখন বৈরাগ্য এল। রাজাকে খবর পাঠালেন, 'রাজা, এইবার আমি বুঝেছি।' পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। এ হল একেবারে চূড়ান্ত। আমরা কি আর ঐরকম সংসার ত্যাগ করে চলে যাব? তা নয়।

ঠাকুর বলেছেন, সংসারে থেকে ভগবানকে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত করে নিয়ে চলতে হবে। না হলে মুখে তাঁর কথা বলছি আর জীবন যেমন তেমনি ধারায় চলল, এতে কোন লাভ নেই। ঠাকুর বলেছেন, আমার যা বলার বললাম, তোমরা ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও। অর্থাৎ তাঁর সব কথা আমরা নিতে পারব না, কিন্তু যেটুকু পারি সেটুকু বেছে নিয়ে যেন দৃঢ়ভাবে চলতে চেষ্টা করি।

যেমন, ঠাকুর বলেছেন, সত্য কথা কলির তপস্যা। সত্যকে ধরে থাকলে ভগবানকে পাব। একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হতে পারব, তা নয়, কিন্তু অকারণ মিথ্যা বলব না এরকম যদি চেষ্টা করি তাহলেও কিছুটা এগোলাম। অর্থাৎ মনের উপর একটু বাঁধন পড়ুক, তাহলে ধীরে ধীরে জীবন উন্নত হবে।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা করছি ঠাকুরের শিক্ষার সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখতে হবে যে, কোথায় কতখানি পার্থক্য হচ্ছে। তাঁর উপদেশের অনুরূপ করে জীবনকে চালানোয় কতখানি চেষ্টা করছি। চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে। পুরোপুরি পারব না ঠিকই, কিন্তু একটু-আধটু চেষ্টা তো সকলেই করতে পারি। তিনি জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে থাকলে কোন্‌টা আমাদের কর্তব্য, কোন্‌টা নয়, তা তাঁর জীবনের আলোকে বুঝে নেব। ঠাকুরের ভক্তদের কাছে এই কথাগুলি বিশেষ করে জানাবার এবং আলোচনা করবার। শুধু গৃহস্থ নন, সাধু গৃহস্থ নির্বিশেষে সকলকেই ভাবতে হবে। কারণ, পূর্ণ আমরা কেউ-ই নই। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করব মনের সেরকম সঙ্কল্প—তা খুব দৃঢ় হোক বা না হোক—আদৌ আছে তো? তা নিয়েই এগোতে চেষ্টা করতে হবে। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাঁর ছাঁচে নিজেদের ঢালতে চেষ্টা করব। ঠাকুর বলেছেন, ছাঁচ তৈরি রয়েছে তোরা নিজেদের ঢেলে নে। তিনি হলেন ছাঁচ। বলছেন, রান্না করা রইল; তোরা বাড়া ভাতে বসে যা। ধর্মজীবন বলতে কি বোঝায় তিনি তা দেখিয়ে গিয়েছেন, কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। কেবল বুদ্ধির সাহায্যে বিষয়টি বুঝলে হবে না, জীবনে অনুসরণ করতে হবে। ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললে তিনি কৃপা করে পথের বিঘ্ন দূর করে দিয়ে এগিয়ে যাবার প্রেরণা ও শক্তি দেবেন। আমাদের প্রার্থনা তিনি শুনবেন। আমাদের কেবল একটু আন্তরিকতা দরকার। আমাদের প্রথম প্রার্থনা হবে আন্তরিকভাবে যেন তাঁর ভক্ত হতে পারি। দ্বিতীয় প্রার্থনা, আমাদের জীবনে তিনি যেন নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সর্বদা তাঁকে লক্ষ্য করে চলতে হবে।

'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥'

আমরা নিজেদের দুর্বল মনে করি, কিন্তু মনে রাখতে হবে তাঁর শক্তি আমাদের ভিতরে আছে। স্বামীজী বলেছেন, 'রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্'—আমরা রামকৃষ্ণের দাস আমাদের আবার দুর্বলতা কি? 'কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ'—আমরা তারা গ্রহ নক্ষত্র চিবিয়ে খাব, ত্রিভুবনকে উপড়ে ফেলে দেব। এত শক্তি আমাদের ভিতরে আছে। এ তাঁরই শক্তি।

হৃদয়ের দ্বার যদি খুলে রাখি তিনি তাঁর শক্তি ঐশ্বর্য, আধ্যাত্মিক সম্পদে হৃদয় পূর্ণ করে দেবেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সাহস এবং প্রেরণা দেন।*

---

* ৮ মে, ১৯৮৭ তারিখে অমুক রামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত ভাষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও জ্ঞানতত্ত্ব

অনিলবরণ রায়

দার্শনিক জীবন ও জগতের সামগ্রিকতায় বিশ্বাস করেন। মানুষ, তার সমাজ এবং রাষ্ট্র দার্শনিকের কাছে বিচ্ছিন্ন কোন অস্তিত্ব নয়। বিশ্বপ্রকৃতি বা এই জগৎ-সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনুষ্যজীবন, সমাজজীবন এবং রাষ্ট্রজীবন এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। এই সামগ্রিকতা, অবিচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের পটভূমিকায় দার্শনিক মানুষের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে আপাতদৃশ্য যে বাস্তবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি দার্শনিক সেই আপাত অবয়বের (existence) অন্তরালে অবস্থিত মৌলসত্তার (essence) অনুধাবন করেন তাঁর সত্যদৃষ্টি বা মননের দ্বারা। বস্তুতঃ যে-কোন জিনিসের মৌলসত্তার আবিষ্কারই হল দর্শন। এই দর্শন যদি শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা আপাতদর্শন হতো তাহলে ফটোগ্রাফার ও দার্শনিকের মধ্যে কোন তফাৎ থাকত না। কিন্তু দার্শনিক বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে যে অতীন্দ্রিয় চৈতন্য রয়েছে তাকে তাঁর সৃষ্টিশীল মননের দ্বারা আবিষ্কার করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এখানেই দার্শনিকের বিশিষ্টতা। দার্শনিকতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে যে-কথা বলা হল তা অবশ্য ভাববাদী দর্শনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বস্তুবাদী বা জড়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রে নয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন। অবশ্য প্রচলিত অর্থে তিনি পণ্ডিত ছিলেন না। কারণ স্কুল কলেজে কখনো তিনি অধ্যয়ন করেননি বা সুনির্দিষ্ট কোন দর্শনতত্ত্ব রচনা করেননি। কিন্তু যে জীবনোপলব্ধির পরিচয় তিনি তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় রেখে গেছেন, 'যার কিছু নিদর্শন আমরা পাই শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে এবং স্বামী সারদানন্দ রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে, তা আমাদের প্রগাঢ় বিস্ময় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। আমরা সেখানে লক্ষ্য করি যে, পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তারাশির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি ও চিন্তার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের জনক প্লেটো আপাতজ্ঞান ও যথার্থজ্ঞানের মধ্যে তারতম্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিপ্রসূত আপাতজ্ঞান কোন একটি বিশেষ বিষয়কে জানা মাত্র। যথার্থজ্ঞান যা তা চিরন্তন অর্থাৎ দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং তা অবিসংবাদিত ও সর্বজনীন। অর্থাৎ যা বিশ্বজনীন পূর্ণসত্য তাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোঝা যায় না, তাকে উপলব্ধি করতে হয় ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্য বা মননের দ্বারা। 'রিপাবলিক' গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে একটি উপমা সহকারে প্লেটো বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন। গুহার বন্দী শৃংখলাবদ্ধ এক মানুষ। তার সামনে রয়েছে গুহার দেওয়াল এবং পিছনে জ্বলছে আগুনের শিখা। সে সম্মুখস্থ দেওয়ালে দেখে তার নিজের ছায়া। এই ছায়া অলীক ও মিথ্যা হলেও গুহাবদ্ধ মানুষ কিন্তু এই ছায়াকেই বাস্তব ও সত্য বলে গ্রহণ করে। সে বুঝতে পারে না যে, গুহাতীত যে বিরাট বিশ্ব রয়েছে, সেই অখণ্ড ও বিশ্বজনীন ভাবকে জানাই হল সত্যকারের জ্ঞান লাভ করা।

প্লেটো কথিত এই জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানতত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে জানাই হচ্ছে সত্যকারের জ্ঞান—একমাত্র এই জ্ঞানের মধ্যেই সেই পূর্ণসত্য নিহিত আছে যা শাশ্বত, চিরন্তন, সর্বজনীন, অবিসংবাদিত ও অপরিবর্তনীয়। প্লেটোর মতো শ্রীরামকৃষ্ণও 'কথামৃতে' (১।১৭।৪) একটি উপমা দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেনঃ "কি রকম জানো? বেদান্তের একটি উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু বেগুন সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আলু বেগুন চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে, 'আমি নড়ছি,' 'আমি লাফাচ্ছি'। ছোট

ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা বুঝি জীয়ন্ত, তাই লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আলু বেগুন, পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বলছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে নেওয়া যায়, তা হ'লে আর নড়ে না, জীবের 'আমি কর্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়।

ঈশ্বরের শক্তিতে সব শক্তিমান।"

অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরকে জানাই হচ্ছে পরম জ্ঞান—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "the grandest of all sciences"—শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। জ্ঞানের তিনটি স্তর উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "বিজ্ঞান কি না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে।

ঈশ্বর দর্শন করে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, "জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" কিন্তু প্লেটো কথিত গুহাবদ্ধজীব যেমন গুহাস্থ আলোকে প্রতিফলিত নিজের ছায়াকেই একমাত্র সারবস্তু বলে মনে করে সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণও সংসারের অসার মায়ায় আবদ্ধ বদ্ধজীবের কথা বলেছেন ঃ "তাদের হুঁশ নাই, তারা জালে পড়েই আছে, অথচ জালে বদ্ধ হয়েছি, এরূপ জ্ঞানও নাই। ...বদ্ধজীব নিজের আর পরিবারের পেটের জন্য দাসত্ব করে—আর মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ করে ধন উপায় করে।"[২]

আজকের বস্তুবাদীসমাজে এই বদ্ধজীবদেরই সংখ্যাধিক্য। প্লেটো বলছেন, মানুষ নিছক পেটের (appetite) দাস নয়। তার জীবনের লক্ষ্য appetite থেকে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে reason-এ উত্তীর্ণ হওয়া, স্বার্থশূন্যতার সঙ্গে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণে নিযুক্ত হওয়া এবং তার দ্বারা সত্যকারের আত্মোপলব্ধি (self-realisation) করা। তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো 'spirit', 'reason' ও 'appetite' (তুলনীয়, ভারতীয় শাস্ত্রকথিত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ)—এই তিন গুণের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন এবং রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব সেই 'guardian' শ্রেণীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন যাঁরা সত্যকারের 'reason'-এর প্রয়োগে সম্পূর্ণ আত্মস্বার্থশূন্য হয়ে যথার্থ দার্শনিকের ন্যায় রাষ্ট্রপরিচালনা করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণও মানুষকে দেহ থেকে ক্রমে দেহাতীত আকাঙ্ক্ষার দিকে অগ্রসর হবার কথা বলেছেন। বলেছেন সেই অগ্রগতি যে যত বেশি করবে সে ততই মানুষ হিসেবে উন্নত। এবং সেই মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে পৃথিবীতে আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের ততই সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত এই জ্ঞানতত্ত্ব থেকে আজকের ভোগবাদী মানুষ অনেক দূরে সরে গেছে বলেই আজ সমগ্র বিশ্বে সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মানুষের এত অবনতি। আত্মসর্বস্বতা নয়, আত্মত্যাগ ও বিশ্বচেতনার আলোকে আত্মোপলব্ধি—এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানতত্ত্বের মূলকথা। প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বও অনেকটা সেই কথাই বলে। 'অনেকটা' বলা হল এইজন্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে প্লেটোকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত জ্ঞানের এই পথই আনতে পারে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ ও সংহারের পরিসমাপ্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও শান্তি।

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৩।১

[২] ঐ, ১।১২।২

ধারাবাহিক-নিবন্ধ

কবি সারদা

কবিতা সিংহ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ পৌষ, ১৩৯৫ সংখ্যার পর]

সারদার বয়স তখন চৌদ্দ-পনের বছর। কামারপুকুরে স্বামীর ঘরে থাকতে এলেন। সঙ্গে ছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী আর রামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে সারদার বর্ণ-পরিচয় হয়। কিন্তু হৃদয় তাঁকে বর্ণ-পরিচয় পড়তে দেখে সেটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। সারদা লুকিয়ে আর একটি বর্ণ-পরিচয় কিনে আনান। এই সময়টি ছিল কিশোরী সারদার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখনীয় সময়। তাঁর আত্মগঠনের সময়। সারাদিন সংসারের কাজ। রাতে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন। সারারাত তাঁরা গল্প করেই কাটিয়ে দিতেন। কত কথা। কত ভাববিনিময়। সংসারের সঙ্গে কিভাবে যুঝতে হবে, পরিবারের কোন সদস্যের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, পরিবারের সকলের সেবা কেমনভাবে করতে হবে, এমনকি প্রদীপের সলতেটি পর্যন্ত কিভাবে পাকাতে হবে, কিভাবে প্রদীপে রাখতে হবে। সারাদিন সংসার, আর রাতে অনন্যব্যক্তিত্ব স্বামী। সাতমাস কামারপুকুরের এই বসবাস, সারদার অন্তরে স্বামীর প্রতি প্রেম এবং শ্রদ্ধা সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সেযুগে স্বামীরা ছিলেন প্রভু। স্ত্রীরা ক্রীতদাসী। স্বামী কখনো স্ত্রীকে সমান সমান ভাবতেন না। অর্ধাঙ্গিনীও নয়। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী পেতেন অবহেলা তাচ্ছিল্য এবং স্বেচ্ছাচার। কিন্তু সারদাকে রামকৃষ্ণ কখনো মৃদুভাবেও আঘাত করেননি। সর্বদা সমান আসন দিয়েছেন। রহস্য রসিকতা গল্প কাহিনী এবং স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আজ থেকে একশো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে কজন স্ত্রী এমন সৌভাগ্য আর সম্মান পেয়েছিলেন এই বঙ্গভূমিতে, তা আমাদের জানতে বাসনা হয়। এই সময়কার এবং পরবর্তী কালেরও আনন্দ ও উপলব্ধির কথা সারদা অকপটে নিবেদন করেছিলেন। প্রিয়-প্রেমের সে এক অমেয়, অপাপবিদ্ধ, সরল স্বীকৃতি।

সেই সময় একসঙ্গে শুতুম
সারারাত গল্পেই কেটে যেত।
(মনে পড়ে) সেই নৌকো করে বালি হয়ে
দেশে যাওয়া
পরস্পর প্রসাদ খাওয়া,
কত গান। কত গানই গাইলেন।*
কখনো নিরানন্দ দেখিনি তাঁকে।
সকলের সঙ্গে আনন্দে আছেন।
আমার হৃদয়মধ্যে যেন আনন্দের পূর্ণঘট।
আনন্দের পূর্ণঘট ঐ কাল থেকেই—
সেই দিব্য অনুভব,
সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর
কতদূর কতদূর পূর্ণ থাকত তা
বলে বোঝাবার নয়।

এরপর আঠারো-উনিশ বছর থেকে নহবতের জীবন শুরু। সারদা মাঝে মাঝে অবশ্য জয়রামবাটী গেছেন। সেখান থেকে গেছেন কামারপুকুরে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই নহবতেই ছিলেন। কেমন ছিল এই নহবতের জীবন? রামকৃষ্ণের ঘরের উত্তর-দিকে একটি চারকোণা বারান্দা। তার উত্তরে ফুলের বাগান। তারই পরে নহবতখানা। নহবতখানার পাশেই গঙ্গা। দোতালা। নহবতের নিচের অতি ছোট ঘরখানিতে সারদা থাকতেন। ঘরের ছাদ থেকে ঝুলত জিওলমাছের হাঁড়ি। সারদা রান্না করতেন। রামকৃষ্ণের জন্য, ভক্ত ও অতিথিদের জন্য। জপধ্যান করতেন। মহিলা ভক্তরা রাত্রিবাস করতে ইচ্ছুক হলে ঐ ঘরেই তাঁদের শোবার ব্যবস্থাও করতেন। তাঁকে কেউ কোনদিন দেখতে পেত না। ভোররাত্রে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে তিনি স্নান এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আসতেন। একবার এক কুমিরের

---

* এই অংশটির কাল নিশ্চিত নয়।

গায়ে অন্ধকারে প্রায় পা দিয়ে ফেলেছিলেন। কখনো কখনো ঘাট নির্জন দেখলে সারদা বিকালে চুল শুকোতে আসতেন। সেই সময় সারদার সঙ্গে দেখা হতো মেছুনিদের। দূর থেকে দেখতেন জেলেদের। মুগ্ধ হয়ে তাদের গান শুনতেন।

অপূর্ব এই সহজ-সুন্দর জীবন। স্বামীপ্রেমে টই-টম্বুর। সদ্য ষোড়শীরূপে পূজিতা। হৃদয়ে মহাজীবনের উজ্জ্বল আস্বাদ, অথচ সামান্য গৃহ-কর্মে লিপ্ত। ঘটনাবিহীন ঘটনাবহুলতায় বিচিত্র উপলব্ধিভরা, সেবা-প্রেম-সুরভিমিশ্রিত জীবনের। কবিতা সারদায় কথায়।

নহবতের জীবন (১)

রাত চারটেয় নাইতাম।
বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত,
তাইতে চুল শুকোতাম

তখন মাথায় অনেক চুল ছিল

মেছুনীরা ছিল আমার সঙ্গি,
গঙ্গা নাইতে এসে ঐ বারান্দায়
চুবড়ি নামিয়ে রাখত
আমার সঙ্গে কত গল্প করত।
আবার যাবার সময় চুবড়িগুলো নিয়ে যেত।

নহবতের জীবন (২)

তখন আমার অন্যরকম চেহারা ছিল
গয়না পরা,
লালপেড়ে শাড়ি।
রাতে যখন চাঁদ উঠত—
গঙ্গার ভিতর স্থির জলে তার ছায়া দেখে
কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতাম
চাঁদেও কলঙ্ক আছে
আমার মনে যেন
কোন দাগ না থাকে

রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতাম,
অশান্তি কেমন? কোনদিন জানতুম না।
জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে
জোড় হাতে বলেছি,
তোমার ঐ জোছনার মতো
আমার অন্তর নির্মল করে দাও।

তখন কি মনই ছিল আমার!
বৃন্দে একদিন একটা কাঁসি গড়িয়ে দিলে,
আমার বুকের মধ্যে এসে যেন লাগল।
আমি কেঁদে ফেললাম।

রাতে কে বাঁশি বাজাত,
শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল
হয়ে উঠত। মনে হত
সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশি বাজাচ্ছেন।
অমনি সমাধি হয়ে যেত।

রূপানুভূতি (১)

নীলকন্ঠের গান কি চমৎকার!
তিনি বড় ভালবাসতেন।
কি আনন্দেই ছিলাম—
যেন আনন্দের হাটবাজার।
তিনি গান গাইতেন
যেন মধুভরা।
গানের উপর যেন ভাসতেন
সে গানে কান ভরে আছে
এখন যে গান শুনি
সে শুনতে হয় বলে শুনি।

রূপানুভূতি (২)

দক্ষিণেশ্বরে একদিন
আশা বলে একটি মেয়ে
বাগানে
কালো কালো পাতা একটি গাছ থেকে
সুন্দর একটি লাল ফুল তুলে
হাতে নিয়ে
খালি বলতে লাগল
এমন লাল ফুল, এমন কালো পাতা!
তোমার এ কী সৃষ্টি!

বলে আর কাঁদে—
বলে আর কাঁদে।
'তোর হলো কিগো ? কাঁদছিস কেন ?'

সে আর কিছু বলতে পারে না,
খালি কাঁদে
আর বলে
আহা, এই ফুলগুলির, কেমন নীলরঙ
দ্যাখো !

রূপানুভূতি (৩)

একদিন রঙ্গন আর যুঁইফুল দিয়ে
সাত লহর গড়ে মালা গেঁথেছি,
পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই
কুঁড়িগুলি সব ফুটে উঠল।

গয়না খুলে মাকে
সেই ফুলের মালা পরানো হল।
তিনি মাকে দেখতে গিয়েছেন
দেখে, ভাবে বিভোর।

'আহা কালো রঙে কি সুন্দর মানিয়েছে !
কে ? কে ? এমন মালা গেঁথেছে ?
আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো গো
মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে
একবার এসে দেখে যাক।'

নহবতের জীবন এক অদ্ভুত প্রেম ও আনন্দময় বিরহের জীবন। তিনি এত কাছে, তবু এত দূরে। সামনের ঘরেই তো রামকৃষ্ণ রয়েছেন। সেখানে কত কথা, কত গান, কত আলোচনা। কিন্তু কখনো কখনো সারদা দুমাসেও একবার তাঁর দেখা পাননি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে, বাঁশের বেড়া অল্প ফাঁক করে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সেই আনন্দ সম্মেলনের কথা ও গানের আওয়াজ শুনতেন। সেই ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে পরে সারদার পায়ে বাত হয়ে যায়।

সেই নহবতের জীবনে সারদার স্বামীসেবা ছিল কাজ আর স্বামীচিন্তা করা ছিল ধ্যান। স্বামীকে তিনি এই সময় মাড়োয়ারীর টাকা না নেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শও দিয়েছেন। আবার স্বামীর অপছন্দ জেনেও বলেছেন সবার আগে তিনি মা। কোন নারী রামকৃষ্ণের জন্য খাবার নিয়ে যেতে চাইলে, তাঁর অসন্তোষ সত্ত্বেও তিনি তাকে নিষেধ করতে পারেননি। ধ্যানবতী সারদা একদিন অপূর্ব একটি ফুলের মালা গেঁথে পাঠিয়েছিলেন স্বামীকে। মালার প্রতিটি পুষ্পে মাখা ছিল সারদার প্রেম। সেই প্রেমমাখা মালা রামকৃষ্ণ পরেছিলেন। এই ভালবাসার কাহিনী পাই সেই 'সোনার মানুষ'-র সম্বন্ধে সারদার বর্ণনায়।

'সোনার মানুষ'

কি মানুষই এসেছিলেন !
কি সদানন্দ—
হাসি কথা গল্প কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা।
আমি কখনো তাঁর অশান্তি দেখিনি।
আহা যদি লেখাপড়া জানতুম
তো, সব টুকে টুকে রাখতুম !

তিনি আমাকে কখনো 'তুই' পর্যন্ত বলেননি।
দক্ষিণেশ্বরে খাবার দিতে গেছি
তিনি লক্ষ্মী* মনে করে বলেছেন,
'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস',—
আমি বললুম,—'আচ্ছা'।

গলার স্বর শুনে টের পেয়ে
সঙ্কুচিত হয়ে বললেন,
'আহা তুমি ? আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী !
কিছু মনে করো না।'

পরদিন নহবতের সামনে গিয়ে বলছেন
'দ্যাখো গো ! সারারাত আমার ঘুম হয়নি
ভেবে ভেবে,
কেন এত রূঢ় বাক্য বললাম'।
কখনো আমাকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেননি
কিসে ভাল থাকব—তাই করেছেন।

* লক্ষ্মী রামকৃষ্ণের ভাইঝি।

যেমন দেখেছি তাঁকে

গায়ের রঙ যেন হরিতালের মতো
সোনার ইষ্টকবচের সঙ্গে মিশে যেত।
তেল মাখিয়ে দিতুম
দেখতুম গা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে।

তাঁর ঘরে নাচ, গান, কীর্তন, ভাবসমাধি,
দিনরাতই চলত।
সামনে বেড়া ফুটো করে দেখতাম
কত ভক্ত আসত কত গান কীর্তন হতো।

শুনতাম আর ভাবতাম
আমি যদি ঐ ভক্তদের একজন হতাম
কাছে থাকতে পেতাম, কত কথা শুনতাম
কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন
দেখা পেতাম না।

মনকে বোঝাতাম
তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ
তাঁর দর্শন পাবি?

নবতে যখন থাকতুম
সমস্ত দিন বসে মালা গেঁথে
ওঁর কাছে পাঠালাম—
ওঁকে বোলো, (এ মালা) পরতে হবে।

মালা পরে গান গাইলেন
'ভূষণ বাকি কি আছেরে?
আমি জগৎচন্দ্র হার পরেছি।'

ঐশ্বর্য

ত্যাগই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য
একদিন খেয়ে নহবতে গেছেন।
বেটুয়ায় মশলা ছিল না,
দুটি যোয়ান-মৌরি খেতে দিলাম
কিছু কাগজে মুড়ে হাতে দিলাম
বললাম 'নিয়ে যাও!'
নহবতের ঘর থেকে নিজের ঘরে যাচ্ছেন।
ঘরে না গিয়ে সোজা
দক্ষিণ দিকের নহবতের কাছে
গঙ্গার ধারে পোস্তায় চলে গেছেন,
পথ দেখতে পাননি
হুঁশ নেই
বলছেন, 'মা ডুবি! মা ডুবি!'

বৌ মানুষ! কাকে পাঠাই?
হৃদয়কে ডাকালাম
হাতে দুটি যোয়ান-মৌরি দিয়েছিলাম।
সাধুর সঞ্চয় করতে নেই
তাই পথ দেখতে পাননি।
তাঁর যে ষোল আনা ত্যাগ।

ত্যাগই তাঁর ভূষণ!

এত আনন্দের পরই পট পরিবর্তন। রামকৃষ্ণ কর্কট রোগে অসুস্থ। সারদা গেলেন স্বামীর নিরাময়ের জন্য, তারকেশ্বরে হত্যে দিতে। সেই সময় এক বিচিত্র মনোভাব তাঁর মধ্যে এসেছিল। শঙ্কা-বেদনার গুহাপথ দিয়ে, সারদা প্রেম থেকে পৌঁছে গেলেন এক রুদ্র বৈরাগ্যে। কে স্বামী? কে স্বজন? এ জগতে কে কার? এই সবকিছু নিয়ে, যে কঠিন ভাবনা উঠেছিল সারদার মনে, তা তিনি কে কি মনে করবে বলে অন্তরে রুদ্ধ রাখেননি। অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন।

রুদ্র বৈরাগ্য

অসুখের সময়
তাঁর অসহ্য কষ্ট হতো।
তারকেশ্বরে হত্যে দিতে গেলাম।
একদিন যায়
দুদিন যায়,
পড়েই আছি।
পরের রাতে শব্দ—
চমকে উঠলাম
যেমন অনেক হাঁড়ি সাজানো
ঘা মেরে কেউ যদি একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়
সেই রকম শব্দ!

জেগে উঠেই মনে ভাব এল
এ জগতে কে কার স্বামী ?
এ সংসারে কে কার ?
জগৎ আমার কাছে ফাঁক হয়ে গেল !

এ জগতে কে কার স্বামী ?
এ সংসারে কে কার ?
কার জন্যে আমি এখানে হত্যা দিতে এসেছি ?
একেবারে সব মায়া কাটিয়ে বৈরাগ্য এনে দিল।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে
কুণ্ড থেকে স্নানজল চোখেমুখে দিলাম,
খানিকটা খেলাম।
পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।
পরদিনই চলে আসি।

রামকৃষ্ণ চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, "কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"

রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কামারপুকুরে আছেন সারদা। সেখানে তাঁর কিছু অলৌকিক দর্শন হয়। কিন্তু কবিরা কি লৌকিকেই অলৌকিক সৃজন করেন না ? করেনই তো। এতে আছে একটি কাব্যময় শব্দ। তা হল—চিন্ময়-স্বামী। বৈষ্ণবতন্ত্রের চিন্ময়-স্বামী। এই বৈষ্ণবতন্ত্র অতি গূঢ় বস্তু। এতো সারদার কল্পনা করার কথাই নয়। যিনি প্রেম জেনেছেন, তিনি চিন্ময়-স্বামীকেও জানতে পারেন। চিন্ময়-স্বামীর কি কখনো মৃত্যু হয় ?

চিন্ময়-স্বামী

হাতের বালা খুলে ফেলেছিলাম।

ভাবতাম গঙ্গাহীন দেশে থাকব কি করে ?
একদিন দেখি সম্মুখের রাস্তা দিয়ে আসছেন।
তিনি আগে আগে
পিছনে নরেন, রাখাল, বাবুরাম—
আরও কত লোক !
তাঁর পা থেকে জলের ফোয়ারা
ঢেউ খেলে খেলে
জলের স্রোত
আগে আগে আসছে।

ভাবলাম, দেখছি ইনিই তো সব,
এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা !
রঘুবীরের ঘরের কাছের
জবা গাছ থেকে
মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে
সেই গঙ্গায় ফেলতে লাগলাম।
বললেন, 'হাতের বালা ফেলো না
বৈষ্ণবতন্ত্র জানো তো ?'
'বৈষ্ণবতন্ত্র কী ?
আমি তো কিছু জানি না।'

'আজ বিকালে গৌরমণি আসবে,
তার কাছে শুনবে।'

সেদিন বিকালে গৌরদাসী এল
শুনলাম, চিন্ময়-স্বামী !

দর্শন (১)

আকাশের চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে
ক্রমে হাওয়ায় মেঘ সরে গেলে
তবেই তো ধীরে ধীরে আবার চাঁদ !
ফস্ করে কি দেখা যায় ?
যেমন ফুল নাড়তে নাড়তে ঘ্রাণ
চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ
তেমনি ভগবততত্ত্বের আলোচনা করতে করতে
তত্ত্বজ্ঞানের উদয়।

তবে নির্বাসনা হলে এক্ষুণি হয়।

সূর্য থাকে আকাশে
জল থাকে নিচুতে
জলকে কি ডেকে বলতে হয়—
ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও ?
সূর্য আপন স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে
জলকে উপরে তুলে নেয়।

মনের দুর্বলতা ?

ওটা প্রকৃতির নিয়ম
অমাবস্যা পূর্ণিমা আছে না ?
তেমনি ।

দর্শন (২)

কি কষ্ট যে তাঁর—কে বুঝবে ?

এ কি খালি জীবের ?
এ যে তাঁর ।
বসে বসে ভাবছিলাম
দেখলাম শেষ নেই
কি কষ্ট যে তাঁর কে বুঝবে ?

তিনি ছাড়া কিছু নেই
জীবের ধার কি শোধ হবে না ?
না, এ ধার শোধ হবার নয়,
দাঁতে কুটো কেটেও নয় ।
জীব যে তাঁর
কি কষ্ট যে তাঁর কে বুঝবে ?

কত শোক তাপ পেয়ে
কত জ্বালা যন্ত্রণা সয়ে
জীব ছটফট করছে,
তিনি না হলে
কে তার জ্বালা ঘোচাবে ?
কি কষ্ট যে তাঁর কে বুঝবে ?

তিনি যে ব্যথার ব্যথী
তিনি যে নিজে তার চেয়েও জ্বালা পাচ্ছেন
কি কষ্ট যে তাঁর কে বুঝবে ?

কলকাতার জলের কল

আগে জলের কল তো দেখিনি
কলঘরে দেখি কল সোঁ সোঁ করে
সাপের মতো গজরাচ্ছে ।

ভয়ে একছুটে গিয়ে বলেছি
'ওগো দেখবে এসো
কলের ভিতর সাপ এসেছে
সোঁ সোঁ করছে ।'

তারা হেসে বললে
'ওগো ও সাপ নয়
জল আসবার আগে
অমন শব্দ হয় ।'

আমি তখন
হেসে কুটিপাটি ।

মনেতেই সব

মনেতেই সব ।
মনেই শুদ্ধ মনেই অশুদ্ধ

দয়া যার শরীরে নেই
সে কী মানুষ ?

যদি শান্তি চাও কারো দোষ দেখো না ।
দোষ দেখবে নিজের ।
জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ
কেউ পর নয়,
জগৎ তোমার ।

মানুষ নিজের মনটিকে আগে দোষী করে
তবে পরের দোষ ধরে
দোষ দেখলে অপরের কী ?
নিজেরই ক্ষতি ।

পথ অনেক

পথ অনেক
তাই সকলের কথাই সত্য ।
যেমন, গাছে সাদা কালো লাল
নানা রকমের পাখি বসে
হরেক রকম বোল বলে ।

ভিন্ন ভিন্ন হলেও
সবই তো পাখির বোল ।

একটাই বোল—অন্যগুলি বোল নয় ?
এরূপ বলি না ।

শান্তি-অশান্তি

লোকে বলে, জীবনে বড় অশান্তি ।
কিসে শান্তি ?
কত কী বলে ।

আমি তাদের দিকে চাই,
এরা এমন কথা বলে কেন ?

আমি তো, অশান্তি বলে কিছু জানলাম না ।

[ক্রমশঃ]

কবিতা

কণামাত্র দাও

মানস দাস

বিশ্বাসের বাগানে ফুল নেই,
বরং আছে কিছু কাঁটানটে
অবিশ্বাসে সর্বাঙ্গ মুড়ে।
সেসব প্রবল অস্বীকারে ঝেড়ে ফেলা
প্রয়োজন এক্ষুনি।
হে পরমপুরুষ, তুমি এসো।
তোমার পরম প্রজ্ঞা
আর অমিত শক্তির
কণামাত্র দাও তুমি আমাকে।
আমি হই অজন্মার আঁধারের আলো
অবিশ্বাসী কাঁটানটে কেটে করি সাফ
বিশ্বাসের বাগানখানা।

ক্ষমাসুন্দরে

চণ্ডী সেনগুপ্ত

তুমি বলেছিলে ঃ যত মত তত পথ।
সাগরে যাবার পথটাই দরকার
কেউ বলে জল, কেউ পানি—ওয়াটার
কেউ পায়ে চলে, কেউ বা হাঁকায় রথ ॥
তুমি বলেছিলে ঃ সব জীবে নারায়ণ
লুকিয়ে থাকেন, ভরিয়ে রাখেন মন।
সব ধর্মের অন্তে যে শেষকথা
তার নাম জেনো অসীম পবিত্রতা ॥
তুমি বলেছিলে ঃ একশো বছর পরে
ফিরবে আবার মর্তের খেলাঘরে।
তমসার এই মোহনায় তাই ভাবি
ক্ষমাসুন্দর ঠাকুর তোমার ছবি ॥

জীবন্ত ঈশ্বর

উমাপদ নাথ

রামকৃষ্ণ, তুমি যেথা যত ধর্মদ্বীপ আছে
কাছাকাছি নিয়ে এসে
একটি মাত্র ভূখণ্ড গড়িলে ঃ কারও থেকে কেউ
মূলতঃ পৃথক নয়, এই শিক্ষা
বিশ্বে প্রচারিলে। তুমি এলে
তাই লোক চিনিল ধর্মকে। ধর্ম শুধু
ছিল স্বপ্নঘোর। তুমি তার গড়িলে ভূগোল,
জীবনে জাগালে তার
অনির্মোচ্য সাকার স্বরূপ ঃ সেবার মন্ত্র দিলে,
প্রেম দিলে, ভক্তি দিলে, দিলে জ্ঞান
অতন্দ্র প্রহরীরূপে ধর্মের ভূমিতে।
মানুষ গড়িতে এলে, গড়ে গেলে
নিজ কর্মশালে। ভোগরঙ্গশালে
দেখালে ত্যাগের মূর্তি ঃ ত্যাগহীন ভোগ যত
দুর্ভোগের দুরন্ত প্রহার। সেই রিপু-কারাগার হতে
মুক্তির মোক্ষম চাবি দিয়ে গেলে জনতার হাতে।
রামকৃষ্ণ, তুমি এলে
এ বিশ্বে চাক্ষুষ হল প্রকটিত জীবন্ত ঈশ্বর।

কাছে আর দূরে

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

মনকে মনের মতো গড়নে ধরনে
ভাস্কর হবার হাতে যতটা সময়
প্রচেষ্টা আদল দিতে অথবা অন্যথা
কি-জানি হয়-কি তার ব্যতিক্রম প্রায়!
না হলে কেন-বা হবে অজানা বিক্ষোভ
কিংবা কিছু আক্ষেপের অসন্তোষ রোষ ?
যা-কোন কি ভাবে আসে ভাবনার পারে
পারানি দেবার মতো নদীকূলে আসা।
কারণ নদীর স্রোত বয়ে বয়ে গিয়ে—
মনের চেতনা জমা খড়কুটোগুলো
হয় তো পাবে কি শেষ প্রাপ্তির মোহনা—
যেখানে সমুদ্রে ঢেউ উত্তাল উচ্ছল!
আমাদের কারুকাজ কাছে ছুঁয়ে থেকে
ঘাটে থেমে নেমে মাঠে সংসারী সবুজে—
দূর মোহনার দিকে শিল্পীর দৃষ্টির
অপার বিস্ময় থাকে নিয়ে গভীরতা।
অথচ কাছের আর দূরের আকাশ
অবসর মতো এসে আলোয় ভরায়!

তুমি

মণিকা চক্রবর্তী

পূজারী এসে দ্বার খুলে দিল।
তারপর প্রদীপটি তুলে
আরতি করে রাখল তোমারই সামনে
পদ্মের আসনে যেখানে তুমি বসে আছ।
তোমার মাথায় কোন মোহনচূড়া নেই,
অথবা শিবের মতো বিশাল জটা।
নিরাভরণ তোমার অঙ্গ থেকেই যেন
নির্গত হচ্ছে বর্ণচ্ছটা।
পবিত্রতার স্বরূপ তুমি,
আমি তোমারই সামনে বসে ভাবছি
মাত্র একশ তিন বছর আগেও ছিলে তুমি জীবিত।
আজ মন্দিরে স্থান পেয়েছ।
কিন্তু না, শুধু বাইরের মন্দিরেই নয়,
কোটি কোটি মানুষের
হৃদয় নামক মন্দিরেও
আজ তোমার যে অধিষ্ঠান।

চল, মরণের পরপারে

দেবী রায়

পেয়েছো দুটি রুটি, পরণে লঙ্গোটি
বলো, আর কি চাই ?
যার আছে খোদ ত্রিভুবন-নাথ
সে কি কভু হয় ভিখারী-অনাথ।
পোড়া এ দেহ থাকুক না পড়ে
লোভ, মায়া ও মূঢ়-অহংকার ছেড়ে
খোপ ছেড়ে চলো, চলে যাই
আনন্দধাম, ঐ সে দেখা যায়

সাকার কে করি নিরাকার
নিরাকার কে একমাত্র সাকার

—কে সে গায় ?
'দরিয়ার মাঝে এক আজব কারখানা
কণ্টকেও ফোটে ফুল, তবু তোর প্রাণ মাতল না।
তুমি অন্ধ, আমি কানা—চুরি করে আর একজনা…'
আর কতকাল ভবের এ সংসারে…

চলো, সেই অমৃত-সাগরে
চলো, মরণের পরপারে ধাই !

যে সয় সে রয়

প্রদোষকুমার পাল

দুখের মাঝে সুখের আলো
পেতেই যদি হয়
স্মরণ করো সেই বাণীটি
যে সয় সে রয়।

বিপদকালে আলোক-দিশা
দেখতে যদি হয়
স্মরণ করো সেই বাণীটি
যে সয় সে রয়।

সংসারেতে সকল জ্বালা
ভুলতে যদি হয়
স্মরণ করো সেই বাণীটি
যে সয় সে রয় !

ভয়ের মাঝে অভয়মন্ত্র
শুনতে যদি হয়
স্মরণ করো সেই বাণীটি
যে সয় সে রয়।

অশান্ত মন শান্ত করে
চলতে যদি হয়
স্মরণ করো সেই বাণীটি
যে সয় সে রয়।

স্মরণ রেখো নিজের মনে
সারা জীবনময়
অমূল্য সেই মহাবাণী
যে সয় সে রয়।

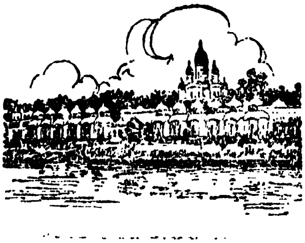

মাধুকরী

শ্রীরামকৃষ্ণ

নলিনীকান্ত গুপ্ত

॥ ১ ॥

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সার—এক কথায় ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্মের, ভগবৎ-সাধনার, আত্মানুভূতির বহু পথ ও মত আছে—তাহাদের এক-একটি ধরিয়া এক-একটি মার্গ, সম্প্রদায়, এমনকি জাতি পর্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদান্ত ও তন্ত্রমার্গ, বৈষ্ণব ও শাক্তসম্প্রদায়, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান জাতি—ইহারা প্রত্যেকে ঘোষণা করে ও বিশ্বাস করে যে, আসল ও পূর্ণ সত্য সে-ই পাইয়াছে এবং অতিরিক্ত গোঁড়া যাঁহারা তাঁহারা নিজের সত্যকে সত্য বলিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, অপরের সত্যকে মিথ্যা, অন্ততঃ অর্ধ বা ইতর-সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনা ও উপলব্ধির দ্বারা—শুধু চিন্তা-জগতে বিচারের ও তর্কসিদ্ধান্তের দ্বারা নয়—প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যাবতীয় ধর্মপথের, অধ্যাত্মসাধনার মূল এক ও অভিন্ন। একই মূল সত্যকে নানা নামে, নানারূপে, নানা রঙে মানুষের প্রতীতি অভিব্যক্ত করিয়াছে। সে মূল সত্য সন্ময়, চিন্ময়, আনন্দময়—তাহা অনন্ত অনির্বচনীয়; স্বরূপে তাহা অরূপ, নির্গুণ নিরাকার, অবাঙ্‌মনসগোচর—তাহাই আবার রূপের মধ্যে সাকার, সগুণ, সান্ত; তাহা পরমজ্ঞান, পরমশক্তি, পরম প্রেম—আবার তাহাই নেতি নেতি, নির্বিকল্প, কৈবল্য, শূন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের, অধ্যাত্মের মর্মস্থানে পৌঁছিয়াছেন, কারণ তিনি তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন ঐ মর্মের পথে। শুদ্ধ বৈদান্তিক ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চলেন জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—বিচার বিতর্ক, ধ্যান-ধারণা-সমাধির পথে; তিনি মস্তিষ্ককে আশ্রয় করিয়া মস্তিষ্কের উপর উঠিয়া যান, তাহার সত্তার চেতনার মুখ্যতঃ হইল এই ঊর্ধ্বায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ একই ব্রহ্মোপলব্ধিতে পৌঁছিয়াছেন ঐ রকম বুদ্ধির ঊর্ধ্বায়নের ফলে ততখানি নয় যতখানি হৃদয়ের মধ্যে, অন্তর্হৃদয়ের মধ্যে—'এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে',—গভীর অভিনিবেশের, অবগাহনের ফলে; অন্তরাত্মার অতলে তিনি এতখানি চলিয়া গিয়াছেন যে, যে-পরিবেশেই তাঁহাকে দেখি তিনি সেই একই ঊর্ধ্বভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আবার হৃদয়পথে তিনি অতখানি গভীরে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণ বৈষ্ণবসুলভ ভাববিলাসিতা, আবেগ আতিশয্য অতিক্রম করিয়া তিনি একটা ভাবঘন স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। আর তান্ত্রিকের প্রাণশক্তি সাধনায় অবান্তর উপাঙ্গ সব পরিহার করিয়া, উহার মূলতত্ত্ব যে প্রাণকে মায়ের চিন্ময় শক্তিতে ভরিয়া তোলা তাহা সংসিদ্ধ তিনি করিয়াছিলেন সে প্রাণকে অন্তরাত্মার তীব্র আস্পৃহা-বহ্নিতে সমিদ্ধ ও জ্যোতির্ময় করিয়া। ফলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার বৈশিষ্ট্যই হইল, এই অন্তঃপুরুষের একাগ্র একান্ত তীব্র আস্পৃহা, তাহার নৈসর্গিক অযত্নসুলভ বিবেক-বৈরাগ্য পরানুরক্তি ও সমাহিতি অন্তশ্চেতনার সেই সব সহজ আদিশক্তি যাহাদের সহায়ে পথের জটিলতা কুটিলতা দীর্ঘতা হইয়া উঠে সরল ঋজু হ্রস্ব। এক-একটি সাধন ধারা, স্বাভাবিক গতিতে চলিলে যাহাতে প্রয়োজন হয়, সমস্ত জীবন, এমনকি একাধিক জীবন এবং দারুণ কৃচ্ছ্র-প্রয়াসপূর্ণ জীবন, তাহাদের প্রত্যেকটি তিনি আপনার অন্তঃপুরুষের প্রদীপ্ত চেতনার মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া ধরিয়াছেন, হেলায় যেন তাহার সিদ্ধি আনিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানে ছিল স্বয়ংপ্রকাশ অব্যর্থতা, সহজ নিশ্চয়তা, তাঁহার ভক্তিতে প্রীতিতে অকুণ্ঠ আত্মদানের নিবিড়তা ও সারল্য—কিন্তু তাঁহার শক্তি আরও চমৎকার, অনির্বচনীয়। কারণ, এই শক্তির বাহ্য আড়ম্বর নাই, জোর-জবরদস্তি নাই, নাই উগ্রতা প্রচণ্ডতা—এত স্বাভাবিক, এত কমনীয়, অথচ এত তেজোময় সামর্থ্যময়। সে ব্রহ্মণ্যশক্তির

কিঞ্চিৎমাত্র বিবেকানন্দের বিপুল ক্ষাত্রবিক্রমে শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছিল। কারণ সে-শক্তি অন্তঃপুরুষের সহজাত অঙ্গভঙ্গ, চেতনার নিজস্ব ছন্দ, সত্তার আপন প্রভা-বিকীরণ।

॥ ২ ॥

জগতে যুগে যুগে যে মহাপুরুষেরা অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা এক-একটি সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক ঘটনা-মাত্র নয়। স্থূলপ্রকৃতির মধ্যে একটা ক্রমবিবর্তন চলিয়াছে, তাহা আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি—সেই রকম আধ্যাত্মিক বা অন্তশ্চেতনার ক্ষেত্রেও সৃষ্টির মধ্যে চলিয়াছে এক ক্রমবিবর্তন। অতএব, বিভূতি—ইঁহারা এই ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন ও বিবিধ সোপান নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এক-একজন উপর হইতে এক-একটি বিশেষ চেতনা ঐহিকের মধ্যে নামাইয়া ধরেন, মানব-চেতনার পক্ষে তাহাকে আয়ত্ত করা বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য করিয়া তোলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে এক যুগাবতার ছিলেন। তিনি নিজের মধ্যে মূর্ত করাইয়াছেন 'অধিমানস' চেতনা—মনের বুদ্ধির অব্যবহিত উপরে যে বিশ্বগত সার্বভৌম চেতনা—যাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি গীতার বিশ্বরূপদর্শনে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। বুদ্ধের অবদান 'বোধি'—ঊর্ধ্বতর, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বুদ্ধি; এই বৃত্তির ভিতর দিয়া, ইহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি অধ্যাত্ম-চেতনাকে মানবচেতনার গোচর করিয়া ধরিয়াছেন। শঙ্করের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা আরও এক ধাপ কাছে আসিয়াছে—কারণ, শঙ্কর হইলেন তর্কবুদ্ধির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার অবতরণ, অধ্যাত্ম-চেতনার মধ্যে তর্কবুদ্ধির উন্নয়ন। খ্রীষ্ট অধ্যাত্ম-চেতনাকে মানুষের আরও ঘরের কাছে আনিয়া, মানুষের আপনার এবং অন্তরঙ্গ করিয়া দিয়াছেন—অধ্যাত্মচেতনাকে হৃদয়ে নামাইয়া আনিয়া, ফুটাইয়া ধরিয়া, উপলব্ধি করিয়া এবং উপলব্ধি করাইয়া। মহম্মদের মধ্যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল অধ্যাত্মচেতনাকে কেবল মনে নয়, হৃদয়ে নয়—প্রাণের কর্মৈষণার মধ্যে, জীবনীশক্তির মধ্যে আরও বাস্তব; আরও সজীব ও মূর্ত করিয়া ধরিতে। চৈতন্যের মধ্যে সংসিদ্ধ হইয়াছিল এই প্রাণেরই আর এক অংশের দীক্ষা বা অধ্যাত্ম-উপনয়ন—যাহা হইল কামনার, আসঙ্গ-লিপ্সার, আবেগের ক্ষেত্র।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, এই সকল মহাপুরুষেরা যে যে বৃত্তি ধরিয়া অধ্যাত্ম-চেতনা উপলব্ধি করিয়াছেন বা যে যে বৃত্তিকে অধ্যাত্ম-চেতনার প্রভায় রূপান্তরিত করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে আর কেহ সে বিশেষ সাধনা করে নাই বা তাহাতে সিদ্ধি পায় নাই; আমরা বলিতেছি ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত চেতনার কথা—মানুষের মধ্যে একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীগত সিদ্ধির পথ ও সম্ভাবনা ইঁহারাই আপন আপন ভাবে তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন। আগে যেখানে গভীর জঙ্গলে পায়ে-চলা পথের দাগ ছিল কি না ছিল, হয় ছিল শুধু দূরে দূরে দুই একটি বিচ্ছিন্ন পদচিহ্ন মাত্র—সেখানে এই সকল অবতার বিভূতিগণ পাকা সড়ক যেন বাঁধাইয়া দিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে সহজেই ঐ পথে নির্বিঘ্নে চলিতে পারে।

॥ ৩ ॥

মন প্রাণ নয়, স্থূল চেতনা দিয়া ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করা, দেহের মধ্যে দেহকোষেরই মর্মে দেহগত অন্তঃপুরুষের জাগরণ—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে যেন এই পার্থিব লোকেরই আত্মা সচেতন হইতে চাহিয়াছে। আমি বলিয়াছি রামকৃষ্ণ হইলেন মূলতঃ হৃদ্‌পুরুষের দিব্য-চেতনা—এই হৃদ্‌পুরুষই ব্যক্ত—আধারের, দেহ প্রাণ মনের নিগূঢ় অধ্যক্ষ, ইহারই মধ্যে আসিয়া আধারের সকল নাড়ী মিলিয়াছে। হৃদ্‌পুরুষেরই সম্যক্ জাগরণে, মনোময় প্রাণময় এমনকি অন্নময় পুরুষ জাগ্রত হয়—ভগবৎমুখী হয়, চায় আত্মার সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য। মানুষের এই অন্তঃপুরুষ চিরদিনই ভগবানকে চাহিয়া আসিয়াছে—তাহার স্বাভাবিক গতিই হইল অধ্যাত্মের দিকে; মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে যে একটা ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন আছে, তাহার মূল এইখানে। অন্তরাত্মার চেতনা যতখানি জাগ্রতের মধ্যে প্রকট ও প্রতিষ্ঠিত হইতে

পারে, সেই জাগ্রতও ততখানি ভগবৎমুখী হয়, ভগবৎসত্তায় গড়িয়া উঠে। অন্তরের চেতনা ধরিয়া, অন্তরের ঊর্ধ্বতর লোকে স্থিতিতে উঠিয়া যাওয়া মানবচেতনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ অতীতে বেশির ভাগ সাধনমার্গের লক্ষ্য এই ধরনের ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে অধ্যাত্মসাধনার মোড়টি যেন ঘুরিয়া গিয়াছে। অতীতের সকল সাধনার ধারা তিনি নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের সারটি আত্মসাৎ করিয়াছেন, এইভাবে চেতনাকে, আধারকে বিশুদ্ধ করিয়া, শাণিত করিয়া, ভরাট করিয়া তাহাকে প্রযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন এক নূতন লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ্য আর কিছু নয়—জাগ্রতে ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করা, আধিভৌতিক অধ্যাত্মের রাজ্য স্থাপন করা, এই জড়-আয়তনকে, এই নিরেট নিথর অজ্ঞানকে পরম জ্যোতির আনন্দের স্পর্শে সঞ্জীবিত, রূপান্তরিত করিয়া তোলা। অবশ্য এই লক্ষ্যটি ঠিক এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্যচেতনায় যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সজ্ঞানে এই উদ্দেশ্যেই যে তিনি কাজ করিতেছিলেন এমন হয়তো বলা চলে না। কিন্তু এই লক্ষ্যের ভিত্তি তিনি গড়িয়া দিয়াছেন, এই লক্ষ্যের দিকে গতির সূচনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন।

তন্ত্রের দিক হইতে তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের সাথে সাথে তন্ত্রের উপর সমান বা অধিকতর জোর দিয়াছেন। তাই কামিনীকাঞ্চন লইয়া, ব্যাধি লইয়া তাঁহাকে বিশেষ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ভোগ করিতে হইয়াছে। নতুবা আশ্চর্য বোধ হয় না কি—অনেক সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্পতর শক্তি লইয়া এতখানি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের হাত এড়াইয়া গিয়াছেন কি রকমে? রহস্যের মীমাংসা এই হইতে পারে—নিম্নতর প্রাণের মধ্যে স্থূল দেহেরও মধ্যে অন্তরাত্মার জ্যোতি ও আস্পৃহা শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনাকে ধরিয়া নামিয়া আসিতে চাহিয়াছে, যাহাতে এই নিম্নতর ও নিম্নতম অঙ্গেরও অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠে, ইহারাও চায় ভগবানকে, অধ্যাত্মচেতনাকে। অবশ্য এই ধারার শেষ বা পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ নহেন, তাঁহার কাজ শেষ করা নয়, শুরু করা—তিনি পরিণতি নহেন, তিনি হইলেন নবজন্ম।

এই দিক হইতে দেখিলে তাই আমরা বলিতে পারি, পার্থিব চেতনার জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ সদ্যোজাত ভাগবত-চেতনা—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাগবত-চেতনা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে তাহার লোকাতীত স্থিতি হইতে এই লৌকিকের দিকে, সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলতরের মধ্যে আপনাকে মূর্ত করিয়া ধরিতে চাহিয়াছে; কিন্তু এযাবৎ স্থূলতম স্থূলকে তাহা স্পর্শ করে নাই—আর এইজন্যই সূক্ষ্মতর জগতেও সাধারণভাবে অধ্যাত্মের অবিসংবাদী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দৈবদুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন যাহার ভিতর দিয়া দ্যুলোক আসিয়া ভূলোককে স্পর্শ করিয়াছে। স্বর্গ পৃথিবীতে আসে নাই, কারণ পৃথিবী স্বর্গকে চায় নাই—আত্মা দেহকে অমৃতময় করিয়া তোলে নাই, কারণ দেহ নিজে আত্মাকে চিনে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ হইলেন স্বর্গের সেই যাদুস্পর্শ, আত্মার সেই স্ফুলিঙ্গ যাহা পার্থিব আয়তনের অন্তর্যামীকে জাগ্রত করিয়াছে, শরীর আত্মাকে, অন্নময় পুরুষকে সচেতন করিয়া ঊর্ধ্বমুখী করিয়াছে।

আবার বলি, রামকৃষ্ণের নিজের লক্ষ্য এই রকম ছিল, অথবা সজ্ঞানে এই আদর্শের সাধনা তিনি করিয়াছেন তাহা হয়তো নয়। আমি বলিতেছি তাঁহার সাধনার স্বাভাবিক পরিণতির কথা, বিশ্ব-প্রকৃতি বা ঊর্ধ্বতর প্রচ্ছন্ন চেতনা তাঁহাকে কোন সার্থকতার যন্ত্র করিয়াছে সেই রহস্য।

বহিরায়তন অবধি, একান্ত স্থূল অঙ্গ ও ক্ষেত্র পর্যন্ত অন্তঃপুরুষের ভাগবত-চেতনার প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তার—নবযুগে অধ্যাত্মের এই অভিযান ও দিগ্বিজয় মূর্ত হইয়াছে বিবেকানন্দের মধ্যে। বাহির অপেক্ষাও বাহির, স্থূল হইতেও স্থূল হইয়া পড়িয়াছে মানুষের চেতনা যে দেশে, পাশ্চাত্যেরও পাশ্চাত্য সেই আধুনিক আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের এই তেজঃস্ফুলিঙ্গটি কেন ও কি উদ্দেশ্যে যে আসিয়া পড়িল, তাহার অর্থ আমরা বুঝি এই রকমে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে একটি যুগান্তর, অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্তনে মানবচেতনার একটি নূতন পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত।*

সংগ্রহঃ সংহতি চৌধুরী

---

* **বিচিত্রা, নবম বর্ষ, ২য় খণ্ড, মাঘ ১৩৪২, ১ম সংখ্যা**

ধর্মসাধনায় এক নতুন আদর্শের দিশারী স্বামীজী

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ছোট্ট গৃহমধ্যে ভক্তপরিবৃত হয়ে সদালাপ করছেন। কথায় কথায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসঙ্গ উঠল। ঠাকুর ভক্তদের বৈষ্ণব মতের সারমর্ম বোঝাতে লাগলেন। ঐ মতের তিনটি সার কথা—নামে রুচি, বৈষ্ণব-পূজন, জীবে দয়া। প্রথম দুটি ঠাকুর ভক্তদের বোঝালেন। কিন্তু তৃতীয়টির বেলায় 'জীবে দয়া' বলেই সমাধিস্থ হলেন। আর কিছু বলতে পারলেন না। এই অবস্থা উপস্থিত হলে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে এসে ঠাকুর বললেন, "জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" ভাল কথা। সকলেই শুনলেন। কিন্তু একজন ছাড়া সেকথা কারও মনে দাগ কাটল বলে মনে হল না। সে-একজন হলেন নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ। নরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানপিয়াসী, যুক্তিবাদী। ঈশ্বরকে জানতে চান, বুঝতে চান। অদ্বৈতজ্ঞান ভাল লাগে তাঁর। ভক্তিমার্গীদের ভাব-অঙ্গভঙ্গিকে বেশি আমল দেন না। অনেক সময় এগুলিকে স্নায়ুরোগ বলেই মনে করেন। এতদিন শুনে এসেছেন অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে হলে সংসার, লোকসঙ্গ এসব বর্জন করে বনে যেতে হবে। আর এতো ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রথাই। বেদান্তজ্ঞান লাভ করতে হলে সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাও, চোখ বুজে ধ্যান কর, বিচার কর 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। তবে তো ভূমার ধারণা হবে। কিন্তু আজ যে নতুন কথা শুনছেন। "শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" এ যে বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যা। আত্মজ্ঞানলাভের নতুন সাধন-পথ। নরেন্দ্রনাথ নতুন আলোক দর্শন করলেন। সকল প্রাণীর মধ্যেই তো শিবস্বরূপ মঙ্গলময় একই ভগবান বিরাজ করছেন। তবে জীবের সেবা তো তাঁরই সেবা। নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন, এ হল বনের বেদান্তকে ঘরে আনার পথ। আরও দেখলেন, এ যে জ্ঞান ও ভক্তিকে সম্মিলন করার উৎকৃষ্ট পথ। চিন্তা করলেন, সর্বভূতে যতদিন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে না পারা যায় ততদিন তো সাধকের পক্ষে যথার্থ ভক্তিলাভ সুদূরপরাহত। ঈশ্বরবোধে জীবের সেবা করলে তবে তো সকলের ভিতর তাঁকে দর্শন করে সাধক যথার্থ ভক্তিলাভে কৃতার্থ হতে পারে। আর অদ্বৈতজ্ঞানও তো তা-ই—সর্বভূতে সেই এক-কে দেখা। আর কর্ম। যে-কর্মের দ্বারা রাগ, দ্বেষ, দম্ভ প্রভৃতি মনের ময়লাগুলি দূরীভূত হয়ে মনকে নির্মল করে, চিত্তকে শুদ্ধ করে—যে চিত্তশুদ্ধি পরমজ্ঞান বা পরা ভক্তিলাভের একান্ত সহায়ক, তারও তো উপায় পাওয়া যায় এই শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্যে। সংসারের সকল মানুষকে যদি শিব ভাবতে পারা যায়, আর এই ভাব নিয়ে তাদের সেবা করা যায়, তবে নিজেকে অন্যের থেকে বড় ভাববার অবকাশ কোথায়? আর আপনি অন্যের চেয়ে বড়—এভাব মনে স্থান না পেলে, রাগ-দ্বেষ, অহংকারাদি দূর হলে তবে তো সাধক শুদ্ধচিত্ত হয়ে স্বল্পকালের মধ্যেই আপনাকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব বলে ধারণা করতে সক্ষম হবে। আর যাঁরা রাজযোগের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করতে চান তাঁদের বেলায়ও এপথ প্রশস্ত। কেননা রাজযোগীদেরও ধ্যানধারণাদি কর্ম করতে হয়। বস্তুতঃ কোন দেহধারীই যখন কর্ম না করে থাকতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মানুষ্ঠান করলে তার দ্বারা রাজযোগীও যে তাঁর লক্ষ্যে আশু পৌঁছতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মানুষ্ঠানই যে সকল সাধকের পক্ষে প্রশস্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর বাইরে এসে নরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন: ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো আজ যা শুনলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শোনাব। শুনিয়েও ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীকেই তিনি পরবর্তিকালে প্রচার করেছেন। নাম দিয়েছেন 'প্র্যাকটিক্যাল

বেদান্ত।' এই বেদান্ত সর্বসাধারণের উপযোগী। বড় সহজ। শুধু একটু চিন্তা মাথায় রাখতে হবে—যাদের জন্য কাজ করছি তারা সকলেই ভগবান। যা করছি, তা ভগবানেরই সেবা।

এই বাণীর প্রয়োজনীয়তা তো সহসা ফুরোবে না ; কারণ এ যুগবাণী। সুদীর্ঘকাল এর প্রয়োজন থাকবে। প্রয়োজন থাকবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এর অনুপ্রবেশের। তাই স্বামীজী অনুভব করলেন এক স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার—যার সদস্যরা এই বাণীকে স্বীয় জীবনে কার্যকরী করে, আচরণ করে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করবেন এবং আপামর জনসাধারণকে এই বাণীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবেন। সেজন্য তিনি 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই আদর্শকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামক নবীন এক সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে 'জীবসেবা'-রূপ কর্মটিকে স্বামীজী শুধু ধর্মোপদেশদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, ধর্মোপদেশ ধারণা করতে হলে যেসব অন্তরায়গুলি আছে, জনসাধারণের মধ্য থেকে সেই অন্তরায়গুলি দূর করার জন্যও সন্ন্যাসীদের কাজ করতে হবে—এই ছিল স্বামীজীর নির্দেশ। নিজের জীবন দিয়ে তিনি এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামীজী তাঁর সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের এই কর্মযোগে জড়ালেন কেন ? বস্তুতঃ শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ আদর্শ গৃহীদের পক্ষেই প্রশস্ত। আগেকার সনাতনপন্থী সন্ন্যাসীদেরও তো মঠ ছিল। তাঁরা তো স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মতো সাধারণের জাগতিক কল্যাণের কাজে নিজেদের জড়াতেন না। এখানে চিরাচরিত ভারতীয় সন্ন্যাসাশ্রমের সঙ্গে বিরোধ হচ্ছে না কি ? এর উত্তর—যুগপ্রয়োজন। যুগপ্রয়োজনেই স্বামীজী সন্ন্যাসীদের কর্মধারার এই পরিবর্তন করেন। আর এই পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবির্ভাবের তাৎপর্যের একটি বিশেষ দিক। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের আদর্শ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—অর্থাৎ নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ। মনে রাখা দরকার 'আত্মনো মোক্ষার্থং'—সন্ন্যাসজীবনের যা উদ্দেশ্য—মুক্তি, তার সঙ্গে আগেকার সন্ন্যাসীদের আদর্শের কোন বিরোধ নেই। পার্থক্য শুধু 'জগদ্ধিতায় চ'—'এবং জগতের কল্যাণ'—আত্মমুক্তির এই অভিনব উপায়ের দিকটি নিয়ে। প্রাচীন যুগের সনাতনপন্থী সন্ন্যাসীরাও যে জগৎকল্যাণে কাজ করতেন না, তা নয়। তবে তাঁদের কাজ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানেই সীমাবদ্ধ থাকত।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে দেখেছেন যে, দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও উচ্চশ্রেণীর নিপীড়নে তাদের ধর্মভাব চাপা পড়ে আছে। স্বামীজীর অভিজ্ঞতায় ও মননে ধরা পড়েছিল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড—ভারতের আদর্শের মূল সুর। সাধারণের এই সুপ্ত ধর্মভাবকে জাগাতে হলে প্রয়োজন অশিক্ষা, কুসংস্কার থেকে তাদের মুক্ত করা, শোষণ-পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন করা। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের দারিদ্র্য দূর করে দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থায় সহায়তা করা। কেননা স্বামীজীর মতে, ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো মানুষকে অপমান করা, পাগলামো মাত্র। তাই তিনি বলেছেন ঃ ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্ম-দেবতার পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে ধর্মকর্মের কথা কেউ শুনবে না।

এ-প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক স্বামীজী বেদান্ত প্রচার করতে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে গিয়েছিলেন মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমতঃ তিনি বুঝেছিলেন ভারতের যে অধ্যাত্মসম্পদ রয়েছে এবং যা বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় সমুজ্জ্বল হয়েছে, সে-অধ্যাত্মসম্পদ আধুনিক বিশ্ববাসীর মহাকল্যাণসাধন করবে। এই মহাকল্যাণকারী সম্পদকে তিনি পাশ্চাত্যে বিতরণ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। কিভাবে তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হবে এ-চিন্তা তাঁকে আকুল করেছিল। তিনি

জানতেন পাশ্চাত্য এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান করে ফেলেছে। তিনি সেই সমাধান-রহস্যটি জানার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। এমন সময় শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনের বার্তা তাঁর কাছে একটি সুযোগরূপে উপস্থিত হল। তিনি স্থির করলেন পাশ্চাত্যে ভারতের শাশ্বত বাণীকে একদিকে যেমন তুলে ধরবেন, তেমনি তাদের কাছ থেকে জেনে নেবেন জীবন-সংগ্রামে সফলতার কৌশলটি, সে-দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্প-প্রসারের ব্যাপারটি। এইটি তাঁর ধর্মমহাসম্মেলনে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে একটি অধ্যাত্ম-কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য অর্থসংগ্রহও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, এই অধ্যাত্মকেন্দ্রকে অবলম্বন করেই তাঁর চিন্তার রূপায়ণ ঘটবে এবং দেশে নব-জাগরণের সূচনা হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। স্বামীজীর চিঠিপত্র ও বক্তৃতায় তার স্পষ্ট উল্লেখ পাই। শিকাগো থেকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে এক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন: "আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য—নিজের একটি কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা।" 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন: "আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি তথায় যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা-প্রতিকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কার্য করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বামীজীর মতে জনসাধারণের দৈনন্দিন অভাব-অনটন মোচন এবং ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা না করে ধর্মশিক্ষা দিলে তা ফলপ্রসূ হবে না।

স্বামীজীর চিন্তায় আরও ধরা পড়ে ছিল—একদল ত্যাগী মানুষই সাধারণের এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তনে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা করতে পারে। এজন্যই স্বামীজী মঠস্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন: "প্রথমতঃ কতগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেরা সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠস্থাপন করে কতগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে সে-বিষয়ে উপদেশ আর তার সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে।" স্বামীজী মনে করতেন, যুগ যুগ ধরে গৃহস্থরা সন্ন্যাসীদের সেবা করে আসছে; তাঁদের সাধনায় রসদ যুগিয়ে আসছে। সুতরাং সন্ন্যাসীদেরও উচিত গৃহস্থদেরও প্রতিদানে সেবা ও সহায়তা দেওয়া।

স্বামীজী তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা দিয়ে এও বুঝেছিলেন যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য সন্ন্যাসীদেরও কর্মের প্রয়োজন আছে। সকলেই সমাধিমান পুরুষ হয় না, আত্মজ্ঞানীর সংখ্যা দুয়েক জনা। কাজেই সন্ন্যাসীরাও যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরই বর্তমান আছেন—এই দৃষ্টি নিয়ে মানুষের সেবা করেন তবে তার দ্বারা ঈশ্বরেরই সেবা করা হবে—ইষ্টেরই পূজা করা হবে। তার ফলে তাঁদের চিত্তশুদ্ধিও ত্বরান্বিতই হবে। তাই তাঁর মন্ত্রোপম বাণী: বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? / জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এই স্বামীজীর নতুন মত, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নতুন পথ—এ তাঁর একটি অন্যতম অবদান। লক্ষণীয়, বর্তমানে তাঁর এই আদর্শ শুধু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ নেই। অন্যান্য সন্ন্যাসী-সংগঠনের মধ্যেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। এখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণও নিজেদের অল্প-বিস্তর মানবকল্যাণ কর্মে নিজেদের যুক্ত রাখার শুধু প্রয়াসই করছেন তা নয়, সেই প্রয়াসকে তাঁদের ধর্মজীবনের অঙ্গ বলেই ভাবছেন। কারণ যুগ যে তাই চাইছে। স্বামীজীর এ আদর্শ তো শুধু মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবার নয়। এ-ভাব সর্বজনীন। এ-ভাব সকল আধ্যাত্মিক ও চিন্তাশীল মানবের মনে প্রবেশ করবেই। সুতরাং বর্তমান কালে অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন আদর্শ। এবং স্বামীজীই সেই নতুন আদর্শের দিশারী—পথিকৃৎ

স্বামী বিবেকানন্দঃ এক নতুন অস্তিবাদের প্রবক্তা

পূর্বা সেনগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর ভারত তখন বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। দেশে এসেছে নবজাগরণের জোয়ার, উন্নতমস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাতরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে দেশ। তোড়জোড় চলছে, প্রাচীনকে ভেঙে ধ্বংসের মাধ্যমে দেশ গড়ার অথবা নতুনের নিন্দাবাদ করে প্রাচীনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার। মানুষ বিচলিত, সন্দেহের দোলায় দুলছে—ঠিক কোন্ আদর্শের শক্ত মাটি তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা এনে দেবে, তা নিয়ে বিভ্রান্ত। ঠিক এরকমই সন্ধিক্ষণে, এক মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণের তরুণ শিষ্য ভারতের বার্তাবহ হয়ে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে শোনালেন এক অদ্ভুত বাণীঃ "বিনাশ নয়, সহযোগিতা ; বিরোধ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

যদি কেবল এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্লেষণ করতে যাই তবে প্রথমেই তাঁর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আকর্ষণ করবে।

ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবজাগরণের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়, সেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছিলেন ফ্রান্সের মহান সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ত কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭)। অগাস্ত কোঁতের মতবাদ 'ধ্রুববাদ', 'অস্তিবাদ' বা Positivism নামে খ্যাত। কোঁতের 'অস্তিবাদ'-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে তা কোঁতের প্রভাবের ফলে নয়। কারণ, জীবন ও জগতের ক্ষেত্রে আশাপূর্ণ কথার ফুল দিয়ে যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মালাটি কোঁত গেঁথেছিলেন, তা ভারতীয় দর্শনবহির্ভূত ছিল না। উপনিষদ্ ও গীতা আমাদের আশাবাদী হতেই তো শেখায়। তাই বলা যায়, কোঁতের কাছ থেকে স্বামীজী কোন প্রেরণা পেয়ে থাকলে তা তাঁকে আধুনিক উপকরণ এবং কাঠামো যুগিয়েছিল মাত্র।

আলোচনার প্রথমেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কাকে বলে তা একটি উপমার সাহায্যে আমরা বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। ধরা যাক একটি গ্লাসের অর্ধেক জল। এই অবস্থাকে আমরা দুই ভাবে বর্ণনা করতে পারি, প্রথমতঃ, অর্ধেক গ্লাসে জল আছে; দ্বিতীয়তঃ, অর্ধেক গ্লাসে জল নেই। দুইটি বাক্যই অবস্থার সঠিক রূপ বর্ণনায় সক্ষম হলেও ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সবক্ষেত্রেই অবস্থাটিকে ইতিবাচক বাক্য অর্থাৎ প্রথম বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি আমরা জগতের নেতিবাচক ক্ষেত্রটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যাব? না, তা নয়, জগতে 'হ্যাঁ' যেমন সত্য 'না'ও তেমনিই সত্য, আমরা 'না'কে অস্বীকার করব না, উপেক্ষা করব মাত্র। কেন উপেক্ষা করব?—এই না-কে অতিক্রম করার জন্যই, জগতের সমস্ত বস্তুই তার নিজ অপূর্ণতাকে, সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে পূর্ণতার দিকে যেতে চাইছে, এই যাওয়ার পথে, তার নিজক্ষেত্রের উজ্জ্বল দিকই হবে প্রেরণা। হতাশা দিয়ে হতাশাকে দূর করা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন আশার। কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি স্বামীজীর চিন্তাধারার সর্বস্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। আছে সাধনপদ্ধতিতে, জীবনদর্শনে এবং সর্বোপরি সমাজদর্শনে—'দ্য চিলড্রেন অব ইমমর্ট্যালিটি। সিনার্স?"—"হে অমৃতের সন্তানগণ! পাপী?"—এই পাঁচটি শব্দকে সমাজবিজ্ঞানী বিনয়সরকার পাঁচটি শব্দের বোমা বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এই শব্দগুলির আঘাত মানুষের মনে এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। সঞ্চার করে এক প্রবল অস্তিবাদের বোধ।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্ময় এক ঋষির মতোই স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে বিশ্বের জন্য এই আশার বাণী

উচ্চারিত হয়েছিল। নতুন সূর্যোদয়ের আভার মতোই মানুষের মনে ধরেছিল আত্মবিশ্বাসের রঙ। "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—যত ক্ষুদ্রই হই না কেন অমৃতের অংশ তো বটে। আর পাপ? না পাপ বলে কিছু নেই। তবে কি মানুষে ভুল করে না? হ্যাঁ, ভুল করে। আর এই ভুল করা, স্বামীজীর মতে, ক্ষুদ্রতর সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে যাওয়ার উপায় মাত্র। জীবনের কঠিন কর্মচক্রের পাকে পড়ে মানুষ ভুল করে অনেক; কিন্তু তার এই ভুলগুলিরও একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। কারণ এই ভুলগুলি মানবজীবনের নদীকে বেগবান করে তোলে, তাকে শুধরে দিয়ে নির্মল করে তোলে। স্বামীজী কোন এক সময় গৃহীভক্ত দেবেন মজুমদারকে বলেছিলেনঃ "একটানা উন্নতিই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে। প্রত্যুত প্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান উহাই প্রকৃত মহত্ত্ব।" মানুষ যখনই তার ভুল বুঝতে সক্ষম হয়, সেই মুহূর্তে ধীরে হোক আর দ্রুতই হোক, নিজেকে শোধরাতে চেষ্টা করে, এর পরবর্তী ধাপেই হয় এই ভুল থেকে তার উত্তরণ। স্বামীজী বলেছেনঃ "ভ্রম-প্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয় ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ড ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভূদেবের উংপত্তি ভ্রম প্রমাদপূর্ণ নরকুলেই।"

মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখেছিলেন স্বামীজী, প্রাণময়, জীবনময় একটি মানুষ। তাঁর কাছে কোন দিনই মনুষ্যত্বের রূপ একটি নীতিবাগীশ যন্ত্রের চেহারা নেয়নি। জীবন যেন এক বিস্তীর্ণ সমুদ্রতটরেখা, যার উপর এসে আছড়ে পড়ছে উদ্দাম ভালমন্দের ঢেউ, তাকে ভাঙছে, গড়ছে। ওপরে উন্মুক্ত আকাশ, যেখানে নেই কোন বাধা। জীবন এক পথ, এবং এই পথ দুর্যোগময়। তাই অনেক সময় পান্থরা হয় বিপথগামী। স্বামীজী এই বিপথগামিতাকে স্বীকার করলেন, কিন্তু তাকে গুরুত্ব দিলেন না। বললেন, মানুষ ভুল করে আবার মানুষই সেই ভুল শোধরাবার ক্ষমতা রাখে। বললেনঃ "গরু কখনও মিথ্যা কথা বলে না, দেওয়াল কখনও চুরি করে না, কিন্তু গরু গরুই থাকে, দেওয়াল দেওয়ালই থাকে।" মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাসের এ এক অপূর্ব নজির।

এই অপূর্ব বিশ্বাসের সার্থক প্রকাশ ঘটত স্বামীজীর ভালবাসায়, যে ভালবাসা মানুষের জীবনকে নতুনভাবে গড়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার ভাই রিচমণ্ড নোবল অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "স্বামীজীর সাক্ষাং যে পেয়েছে, কোন না কোনভাবে উন্নীত না হয়ে সে পারবে না। মানুষটা হয়তো মন্দ লোকই রয়ে গেল, কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সে এইটুকু সান্ত্বনা অন্ততঃ পাবে, সে আরও কত মন্দ হতে পারত, কিন্তু হয়নি। স্বামীজীর সংস্পর্শ কোন না কোনভাবে মন্দত্বের সংশোধন না করে পারে না।"

এখানে আমরা একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, স্বামীজী কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। একদিন বললেন, আমি মুখে মুখে মঠের নিয়ম বলে যাচ্ছি, কেউ একজন লিখে নিক। লেখনীধারণে এগিয়ে এলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ (সুধীর মহারাজ)। স্বামীজী বলে গেলেন, লিখে নিলেন সুধীর মহারাজ। লেখার পর স্বামীজী বললেনঃ "যদি কোন নিয়ম নেতিবাচক ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে ইতিবাচক করে নিবি।" নেতিবাচক ভাব সম্পর্কে স্বামীজীর ছিল এমনই দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর দৃষ্টিতে যে 'না'-এর অস্তিত্ব নেই। যখন জগতের দিকে তাকাচ্ছেন, তখন জগতের তুচ্ছতা, অবিশ্বাস, দুর্বলতা, ভীরুতা, আহত করছে তাঁকে। তিনি গর্জে উঠছেনঃ "বলো 'অস্তি-অস্তি'। 'নাস্তি নাস্তি' করে দেশটা গেল। সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্তশক্তি আছে, ওরে হতভাগাগুলো নেই নেই করে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় বজ্র মারে, রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে জন্ম গেল। এযে ছুঁচোগিরি, 'দীনাহীনাভাব'—ও হল

ব্যারাম।"—যে জীবনসিঁড়ি আমাদের অতিক্রম করতে হবে, তার কোনটি মসৃণ, আবার কোনটি বন্ধুর; কিন্তু উত্তরণের ক্ষেত্রে দুটির গুরুত্বই সমান। অনেক ভুলের পরেও একটি মানুষ তার চরিত্র গঠন করতে পারে। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অব্যক্ত রয়েছেন ব্রহ্ম। তাই স্বামীজী বলেছেন ঃ "মানুষকে পাপী বলাই পাপ।"

আমরা সাধারণতঃ ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়গুলিকে 'না'-এর সমষ্টি হিসাবে দেখে থাকি। বৈরাগ্যবান, তপস্যাপ্রবণ মানুষ বলতে আমরা বুঝি এমন একজন মানুষ যার মনুষ্য-জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা অনুভূতি কিছুই নেই। কিন্তু স্বামীজীর মতে ত্যাগ কোন নেতিবাচক বিষয় নয়। ত্যাগ বলতে বুঝি, কোন বৃহত্তর আদর্শের জন্য ক্ষুদ্রতর আদর্শকে বর্জন। যেমন, দেশের স্বার্থের জন্য পরিবারের স্বার্থ ত্যাগ। আর বৈরাগ্যের সংজ্ঞা, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, সংসারে বিরাগ এবং ঈশ্বরে অনুরাগ। অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি, কেবল বিয়োগ নয়, যোগের ব্যাপারও বর্তমান। বিয়োগ যতটুকু তা ঐ যোগেরই ফলশ্রুতি। ক্ষুদ্র আদর্শকে বর্জনের জন্য বৃহত্তর আদর্শ যেমন প্রয়োজন, তেমনি কেবলমাত্র সংসারে বিরাগ হলে হবে না, চাই, ঈশ্বরে অনুরাগও। মানুষের সাধন-জীবন প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে, যেখানে কামনার সংযম অপরিহার্য। কিন্তু এই কামনার সংযম বলতে আমরা কি বুঝব? কামনার দমন? আমরা দুটি পথের মধ্যে যে-কোন একটিকে বেছে নিতে পারি, প্রথমতঃ নিজ কামনার প্রকাশ করতে পারি, দ্বিতীয়তঃ কামনাকে দমন করতে পারি। কিন্তু এই দুই পথেরই কুফল রয়েছে, এর কোনটিই বৈজ্ঞানিক নয়। রামকৃষ্ণ-দর্শন এক্ষেত্রে মানুষকে দেখালো নতুন এক পথ দমন নয়, প্রকাশও নয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজ মনকে লক্ষ্য করা। শুধু 'মোড় ফেরানো'। এর ফলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হব। এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তিও উল্লেখযোগ্য, "ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই··· তুমি জেনো তোমার একজন মা আছেন।" কথামৃতের পাতায় পাতায় কামনার 'মোড় ফিরিয়ে' দেবার পরামর্শ পাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য মানবমনের এই ছয় শত্রুগুলিকে সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। কিভাবে তা সম্ভব? যদি লোভ করতে হয় ভক্তির জন্য লোভ করতে হবে। যদি কামনাই থাকে তা ঈশ্বরলাভের কামনায় চালিত কর। তাহলে কোন গোল থাকবে না। এক্ষেত্রে 'কথামৃত' থেকে এই উদ্ধৃতিটি স্মরণীয় ঃ

"একজন ব্রাহ্মভক্ত—কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর উপর ভালবাসা—আর এই সদা-সর্বদা বিচার—ঈশ্বরই সত্য, জগৎ অনিত্য।

ব্রাহ্মভক্ত—কাম, ক্রোধ, রিপু রয়েছে, কি করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছয় রিপুকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা। যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়, তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। 'আমার আমার' যদি করতে হয়—তবে তাঁকে লয়ে। যেমন—আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহংকার করতে হয় তো বিভীষণের মতো—আমি রামকে প্রণাম করেছি এ-মাথা আর কারুও কাছে অবনত করব না।"

যে ভালবাসা আমরা একটি মানুষকে দিই, সেই ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করতে হবে। মন তো একটাই; দুটি তো নয়, কেবল তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত না করে, মহৎ উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হবে মাত্র। ভাল এবং মন্দের ঢেউ-এর মধ্যে থেকেই সৎ উদ্দেশ্যকে ধরে থাকতে হবে। নিজের মনের ক্ষেত্রে বা অপরের ক্ষেত্রে জোর করে সংস্কারের চেষ্টা বা জমিয়ে রাখার চেষ্টা সম্বন্ধে স্বামীজীর এক বিখ্যাত উক্তি—"যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে।" আমার মধ্যে মন্দের অস্তিত্বকে আমি জানব, কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করব না, তাকে অভিশাপ দেব না, তাকে সহ্য করতে হবে, তার দিকেই বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত, তাকে রাঙিয়ে নিতে হবে অন্তরের আরেকটি বৃত্তি—সদ্-প্রবৃত্তির রঙে। এটাই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনযাপনে রামকৃষ্ণ-দর্শনের নতুন অবদান।

স্বামী বিবেকানন্দ হলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ব্যক্তিগত জীবনে সন্ন্যাসী হলেও চিন্তাধারায় ছিলেন উচ্চশ্রেণীর এক সমাজবিজ্ঞানী। ভারতবর্ষের সমাজ বিষয়ে ও সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক ধারা বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণে তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। তাঁর সমাজ-জীবন বিশ্লেষণের মূলেও আছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণে, সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারার বিশ্লেষণে, সামাজিক গতি-প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়, সর্বোপরি সামাজিক পরিবর্তনের পদ্ধতির আলোচনায় তাঁর আশাবাদী, গঠনমূলক, ইতিবাচক দর্শনকে প্রয়োগ করেছেন তিনি।

স্বামীজীর সময় ভারত ছিল পরাধীন, ইংরেজ-শাসিত। ইংরেজ সব সময় ভারতবাসীকে বুঝিয়েছে, তারা জাতি হিসাবে নিকৃষ্ট, অনুন্নত। ভারতের সমাজ, ধর্ম, প্রথা, রীতি-নীতি সব নিয়েই তাদের ছিল সমালোচনা, উপহাস। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে নিজ ধর্মকে স্বামীজী যেমন বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তার সঙ্গে সমাজকেও টেনে তুলে আনলেন। তাঁর ঐকালের বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায় আমরা ভারত সম্বন্ধে যে আলোচনা পাই তাতে দেখা যায়, তিনি ভারতের সমাজ সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি অভিযোগের উত্তরে সমাজের প্রথা ও আচারগুলির ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। ভারত সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্যের মনোভাবের প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলিষ্ঠ ভাষায় বললেন ঃ "বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা। ভারতের বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথমে বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।" তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, ভারতবাসীর হীনম্মন্যতাকে দূর করে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করা, স্বামীজী বলছেন ঃ "আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছে—আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশা করেনি, তাই আমি তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইট মেরেছে তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি—সুদে আসলে।"

ভারতের আচার সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যক্তিগত মত যাই থাকুক না কেন, পাশ্চাত্যের মাটিতে বসে, পাশ্চাত্যের মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষের সমালোচনা বিন্দুমাত্র সহ্য করেননি স্বামীজী। সমালোচনার উত্তরে তিনি বার বার তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সমাজের অন্ধকার দিকটি সব সমাজেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজও কোন অংশে কম নয়। কোন্ সমাজ কতখানি উন্নত তা বিচার করতে হবে তার সর্বোৎকৃষ্ট উৎপাদনের মাধ্যমে, তার নেতিবাচক দিকটির মাধ্যমে নয়। একটি আপেল গাছের উৎকর্ষ তার ভাল ফলগুলির মাধ্যমেই বিচার করতে হবে, নিচে পড়ে থাকা নষ্ট আপেলগুলির মাধ্যমে গাছটির যথার্থ উৎকর্ষের মান উপলব্ধি করা যাবে না। তাই ভারতবর্ষকেও বুঝতে হবে তার চিরাচরিত ধর্মীয় ঐতিহ্য, ভাব এবং আদর্শের মাধ্যমে, সমাজে মাঝে-মধ্যে প্রচলিত নানা আচার-বিচারগুলির মাধ্যমে নয়।

স্বামীজী ভারতবর্ষের সমাজ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন বিভিন্ন ভাগে। বৌদ্ধ বিপ্লব, মুসলিম আক্রমণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাকে পরস্পর সাজিয়ে স্বামীজী ভারতের সমাজ-চরিত্রের একটি বিশেষ ধারাকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয় সমাজ পুরোহিতশক্তি, রাজশক্তি, বৈশ্যশক্তির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হয়েছে। শেষ ও পরবর্তী ধাপ হল শূদ্রের শাসন, যেখানে ঘটবে অর্থনৈতিক সাম্য। সামাজিক ধারার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানে নতুন নয়, হার্বার্ট স্পেনসার, অগাস্ত কোঁত থেকে শুরু করে মার্ক্সের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল এই সামাজিক বিশ্লেষণ। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আলোচনায় এই কথাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে, মানব-সভ্যতার বিকাশকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যে পর্যায়গুলির চরিত্র প্রমাণ করে মানব-সভ্যতা

ক্রমবিকাশমান। মানবসভ্যতার রূপ পালটেছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। স্বামীজীর সমাজভাবনা উপরোক্ত বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীদের তুলনায় কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোঁতের মতো স্বামীজীও সমাজে ক্রমোন্নতির কোন পর্যায়কেই অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেননি। কারণ প্রতিটি পর্যায় পরবর্তী পর্যায়ের পথকে সুগম করে তোলে। স্বামীজী তাই তাঁর আলোচনায় প্রতিটি সামাজিক পর্যায়ের ইতিবাচক দিককে তুলে ধরেছেন। কোন পর্যায়কে অস্বীকার বা পর্যায়গুলির নেতিবাচক ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেননি। সর্বোপরি তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীদের থেকে বিশিষ্ট হয়ে একটি আদর্শ সমাজের আশা করেছেন যে-সমাজ তার পূর্ববর্তী প্রতিটি সমাজের গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত হবে। স্বামীজী বলছেন : "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হতো যেখানে পুরোহিতযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়যুগের সংস্কৃতি, বৈশ্যযুগের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রযুগের সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, অথচ কোনটির দোষ থাকবে না, তাহলে তাই হবে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ; কিন্তু এমনটি হওয়া কি সম্ভব?"—সামাজিক ক্রমবিকাশের বর্ণনায় স্বামীজীই প্রথম পথিকৃৎ যিনি কোন সামাজিক পর্যায়ে গিয়ে থেমে যাননি। মার্ক্সের অর্থনৈতিক সাম্যের পরবর্তী স্তর মানসিক সাম্য এবং তারও পর আধ্যাত্মিক সাম্যের ক্ষেত্র পর্যন্ত তাঁর ভাবনা বিস্তৃত।

সামাজিক বিপ্লব সম্বন্ধেও স্বামীজীর ধারণা অত্যন্ত মৌলিক, তিনি বিবর্তনবাদী এবং বিপ্লববাদী—এই দুই চরম মতবাদের ইতিবাচক দিককে গ্রহণ করে অভূতপূর্ব এক নজির সৃষ্টি করেছেন, সাধারণতঃ বিপ্লব কথাটির অর্থ আমূল পরিবর্তন। এই আমূল পরিবর্তনে সামাজিক কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিবর্তনই বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে, যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, তা প্রাচীনের থেকে একেবারে ভিন্ন বা নতুন। স্বামীজীও সমাজের আমূল পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় বলে চিহ্নিত করলেন। কিন্তু রক্তপাতের মাধ্যমে, শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে, উন্নত মানুষকে নিচে নামিয়ে ('levelling down') তিনি সামাজিক পরিবর্তন চাননি। তার মতে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে বিবর্তনের ('levelling up') মাধ্যমে। এই বিবর্তনের পথে মূল মাধ্যম হল মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সচেতনতা। শ্রেণী-সংঘর্ষ বা শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, শ্রেণী-সমন্বয় ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধ্বংসকে ভিত্তি করে কোন মঙ্গলময় শক্তি সংগঠিত হতে পারে না। সমাজের গঠনমূলক এবং ইতিবাচক ক্ষেত্রের ছবি তিনি এইভাবেই প্রতি ক্ষেত্রে এঁকে গেছেন।

রোমাঁ রোলাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative." কবির কাছে সন্ন্যাসীর রূপ ছিল এমনই। তিনি ছিলেন আশা, ভরসা ও উৎসাহের মূর্ত প্রতীক। মনুষ্যত্বের প্রতি ভালবাসায় তিনি এমনই পূর্ণ ছিলেন যে, তাঁর তাত্ত্বিক, মানসিক এবং শারীরিক কাঠামোর প্রতিটি অংশ ছিল আশাপূর্ণ অঙ্গীকারে গঠিত। তাঁর মহাজীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠা মানুষের কাছে সেই অঙ্গীকারকেই পৌঁছে দেয় : "Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out." অথবা : "বল, আমি সব করতে পারি। নেই নেই বললে সাপের বিষও নেই হয়ে যায়। খবরদার, No নেই নেই! বল হাঁ হাঁ, সোহহং সোহহং।"

শ্রীরামকৃষ্ণ গড়তে এসেছিলেন, ভাঙতে নয়। তাঁর যোগ্যতম বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে জীবনের সবটুকুই তাই গঠনমূলক। কোন ভাঙার গান তিনি গাননি। তিনি কেবল মানুষকে আশা দিয়ে যাননি, মানুষকে বিশ্বাস করে গেছেন, ভালবেসে গেছেন। এই ধ্রুববাদী সন্ন্যাসীর কাছে, আমরা প্রত্যেকেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। আমরা অমৃতের সন্তান। আমরা জ্যোতির সন্তান।

স্মৃতিকথা

মহারাজের স্মৃতি

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

যতদূর মনে পড়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসেই আমি মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) প্রথম দর্শন লাভ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শ ও কর্মপন্থার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে পরিচয় থাকায় সুযোগ পেলেই আমি দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ প্রভৃতি স্থান এবং শ্রীশ্রীমা, মহারাজ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-সংকলক শ্রীম-প্রমুখকে দর্শন করবার ইচ্ছা পোষণ করতাম। এই সংকল্প নিয়েই আমি আমাদের শহর থেকে কলকাতা আসি। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীম-কে দর্শন করার দু-একদিন পর—সরস্বতীপূজার দিন ফেরিতে গঙ্গা পার হয়ে বেলুড়মঠে পৌঁছই। ঘাস-বিছানো মঠ-প্রাঙ্গণ পার হয়ে সাধুদের মঠবাড়ির দিকে যাবার সময় দেখতে পেলাম—মহারাজ খোলা বারান্দায় বসে আছেন ফটকের দিকে মুখ করে। প্রথমবার মঠে গিয়ে এইভাবেই মহারাজকে আমি দর্শন করি। মহারাজকে সেই আমার প্রথম দর্শন। আমার কাছে এটা একটা অপূর্ব যোগাযোগ বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী কালে স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী অখিলানন্দের কাছে শুনেছি—তাঁদেরও একই রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আমি মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি নিলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোত্থেকে আসছি; কোথায় থাকি। আমি বললাম—স্বামীজী ঢাকায় গিয়ে যে বাড়িতে ছিলেন—তার খুব কাছেই আমাদের বাড়ি। এরপর আমি আমাদের—বাড়ির আশপাশের বর্ণনা করছিলাম। কারণ আমি ভেবেছিলাম—মহারাজও স্বামীজীর সঙ্গে ঢাকায় গিয়েছিলেন। তাই ওখানকার কথা তাঁর কিছু মনে আছে। মহারাজ বাধা দিয়ে বললেনঃ "না, আমি ঢাকায় যাইনি।"

"আপনি ওখানে যাননি ?

"না, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ?"

আমি উত্তর দিলামঃ "হ্যাঁ"। উনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কেমন করে নেবে ?" আমি বললাম—"যে ভদ্রলোক স্বামীজীকে ওদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকেই বলব। আপনার ওখানে যাবার সব বন্দোবস্ত তিনিই করে দেবেন।" মহারাজ মৃদু হেসে বললেনঃ "ও, তাহলে তুমি ঐভাবে আমাকে নেবে ?" মহারাজ তারপর আমাকে ঠাকুর প্রণাম করতে বললেন; আর বললেন স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা করতে। আমি উপর তলায় ঠাকুরঘরে গেলাম। নিচে নেমে এলে আমাকে প্রসাদ দেওয়া হল। পরে আমি গঙ্গার ঘাটে হাত ধুতে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় একজন সৌম্যদর্শন সাধু নামছেন দেখলাম। আমি তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলামঃ "স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ কোথায় আছেন ?" তিনি নিজের দিকে দেখিয়ে বললেন—"এখানে"। বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মহারাজের কাছে গেলাম বিদায় নেবার জন্যে। ঐ দিন সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বর যাবার ইচ্ছা ছিল। কাছেই ফেরিঘাটে কিভাবে যেতে হবে তা মহারাজ আমাকে বলে দিলেন। আমার সঙ্গে একজন লোকও দিলেন পথ দেখাবার জন্যে। সময়মতো নৌকো না পাওয়ার দরুন সেদিন গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণেশ্বর যেতে বেশ রাত হয়েছিল।

মহারাজকে আমি দ্বিতীয়বার দর্শন করি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। তিনি মঠবাড়ির নিচের বারান্দায় একটা বড় বেঞ্চিতে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। আমি ঠিক তাঁর সামনে আর একটা বেঞ্চিতে বসলাম। তখন বেলা প্রায় এগারটা। এই সময় একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন। মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করলেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, ইনি কে ? মহারাজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এঁকে চিনিস তুই ?" আমি বললামঃ "ওঁকে আমি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে পূজা করতে দেখেছি।" মহারাজ বললেনঃ "ঠিক বলেছিস, উনি আমাদের রামলাল-দাদা। ঠাকুরের ভাইপো।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও এবং সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি খুব শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি সন্ন্যাসী হবার সংকল্প তখনো পর্যন্ত করিনি। মহারাজের কাছে যতবারই গিয়েছি, ততবারই নানা

প্রসঙ্গে আমাকে বুঝতে দিয়েছেন—তিনি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আগে থেকেই সব জানেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "এখানে যত পারিস ঘন ঘন আসবি। তাতে তোর লাভ বই ক্ষতি হবে না।"

এরপর কয়েক বছর আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়নি। কারণ আমি যখনই মঠে গিয়েছি মহারাজ তখন বাইরে। এর মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়ে গেছে। এর পর ঢাকায় দেখি মহারাজকে। সেখানে মহারাজের কাছে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রেমানন্দজী বললেন ঃ "এ ছেলেটি আমাদের মঠের জন্য এখানে একটা জমি সংগ্রহের চেষ্টা করছে।" মহারাজ বললেন ঃ "আমি ওকে চিনি।" প্রেমানন্দজী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কেমন করে? ও যখন মঠে গিয়েছে তখন তো তুমি মঠে ছিলে না।" আমি তখন বললাম ঃ কয়েক বছর আগে আমি মহারাজের সঙ্গে মঠে দেখা করেছিলাম।"

মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "আমার জন্যে একটু জায়গা করে দিতে পারিস তুই?" তিনি ঠিক কি উদ্দেশ্যে কথাটি বললেন আমি প্রথমে তা বুঝতে পারিনি। তিনি আবার একই প্রশ্ন করলেন। আমি বললাম ঃ "মহারাজ, এসবই তো আপনার জন্যে।" তিনি সরলভাবে হাসলেন। তখন বুঝিনি যে, আমার হৃদয়ে তাঁর স্থান হবে কিনা—একথাটাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যে কত গভীর তাৎপর্য থাকত—এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। আমরা সব সময় তা ধরতে পারতাম না।

কোন এক সময় মহারাজ আমাকে বলেছিলেন ঃ "ধ্যানজপ যেভাবে করছ করে যাও।" ছোটবেলা থেকেই আমি রোজই উপাসনা করতাম। কিন্তু এর দ্বারা কিছু লাভ হচ্ছে কিনা বা আমি ঠিক পথে এগোচ্ছি কিনা—তা আমি বুঝতে পারতাম না। মহারাজকে কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিনি। তাই তাঁর এ কথাটি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। উনি কি করে জানলেন? আমি তো ওঁর কাছে কোন উপদেশ চাইনি। কয়েকবারই উনি আমাকে বলেছিলেন ঃ "অধৈর্য হয়ো না।" জানি না তিনি ঠিক কি বলতে চেয়েছিলেন। আমার মনে হয় আমি ধৈর্য হারাইনি এরপর যখন তাঁর কাছে ধর্মোপদেশ চেয়েছিলাম তখন আমাকে কয়েকটি কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন ঃ "তোমার নতুন জন্ম হবে।" সত্যি আমার মনে হয়েছিল—আমার ভিতর একটা আলো জ্বলে উঠল—যা এখনও অনির্বাণ রয়েছে। ক্রমশঃ অনুভব করলাম—আমার মধ্যে যেন জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে গেছে। সমস্ত ধর্মজগৎ আমার কাছে যেন একান্তই পরিচিত।

সাধু-জীবন গ্রহণ করব কিনা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থির করতে পারিনি। ঐ সময়ই এই বিষয়ে মহারাজের পরামর্শ প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন ঃ "যতদিন তোমার মা বেঁচে থাকবেন ততদিন তুমি তাঁকে ছেড়ে আসতে পারবে না। তাঁকে দেখবার আর কেউ নেই। তুমি তাঁর সেবা কর। এখন কেবল সত্যকে ধরে থাক আর ব্রহ্মচর্য পালন কর।" এছাড়া তিনি আমাকে আর কোন নিয়মপালনের আদেশ দেননি।

দীক্ষার সময় মহারাজকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ "ইষ্টদেবতার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক হবে?" তিনি বললেন ঃ "তুমি যতই ধর্মজীবনে অগ্রসর হবে ততই তোমার ভিতরে তা গড়ে উঠবে। ...তিনিই তোমার সর্বস্ব।" তারপর তাঁর কাছে মন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। মহারাজ সেদিন বলেছিলেন ঃ "মন্ত্র ও ইষ্টের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুই-ই এক। তিনিই তোমার সব।" একটা বিষয়ে মহারাজ খুব জোর দিতেন। তা হল তাঁর নির্দেশগুলি নিয়মিত ধৈর্যের সঙ্গে যথাযথ পালন করা। তিনি দুবার আমাকে পুরশ্চরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

নিজের সম্বন্ধে বা শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে মহারাজ খুবই কম বলতেন। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে গৃহীভক্ত ললিতবাবু দেওয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি দেখিয়ে মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "ঠাকুর এই রকমই দেখতে ছিলেন?" মহারাজ ছবিখানির দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। মনে হল তাঁর মনের গভীর ভাবটি তখন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

মহারাজের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-দর্শনের সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। যোগাযোগটি এভাবে ঘটে। একদিন উদ্বোধন কার্যালয়ে শুনলাম, মহারাজ তাঁর

এক ভক্তকে বলছেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। একথা শোনামাত্র আমি দেরি না করেই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলাম। কারণ মহারাজের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-দর্শন একটি অপূর্ব সুযোগ বলেই আমার মনে হয়েছিল। বেলা তিনটে নাগাদ দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে আমি সদর দরজার কাছে মহারাজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলাম মহারাজ আসছেন—উদ্বোধন কার্যালয়ে যে ভক্তটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর গাড়িতে। আমাকে দেখেই—আমি কিভাবে এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ফেরি-নৌকায় এসেছি শুনে বললেন: "মঠ থেকে বড় একটা স্টীমলঞ্চে সাধুরা সব আসছেন। এতে একশ যাত্রী নিতে পারে। তুমি ফেরার সময় এই লঞ্চে করে যেতে ভুলো না।" এরপর এক এক করে কয়েকটি মোটর গাড়ি এল। এগুলিতে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও কয়েকজন ভক্ত। এর পর মঠ থেকে সাধুদের নিয়ে স্টীমলঞ্চটি পৌঁছল। সাধু ভক্ত দর্শনার্থী প্রায় একশজন হয়েছিল। আমি এতটা কল্পনা করিনি। ভেবেছিলাম মহারাজ বুঝি একাই আসছেন। ভক্তেরা পূজার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি ফল ফুল মিষ্টি এনেছিলেন। চারিদিকে বেশ বড় রকমের উৎসবের পরিবেশ। কালীমন্দিরের সামনে বসে অখণ্ডানন্দ মহারাজ স্তব পাঠ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল ভক্তি ও ভাবে রক্তিম। সাধু ও ভক্তের দল মন্দিরটি পরিক্রমা করলেন। কিন্তু সকলেই নীরব ছিলেন। মহারাজও কোন কথা বলেননি। আমরা আশা করেছিলাম তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরের পুরনো দিনের কথা শুনতে পাব। কিন্তু মনে হল মহারাজের হৃদয় সারাক্ষণ এত গভীর ভাবে ভরপুর যে, কথা বলার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। আমরাও কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি। সাধুভক্তের দলটি নির্বাক ছবির মতো মন্দির পরিক্রমা শেষ করলেন। মাঝে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হল। সন্ধ্যায় সাধুদের সঙ্গে স্টীমলঞ্চে বেলুড় মঠে ফিরে গেলাম।

তীর্থস্থানের প্রতি মহারাজের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনগুলি আমি তাঁর সঙ্গে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে কাটিয়েছি। ঐ আশ্রমটিতে মহারাজ খুব আনন্দে থাকতেন। সময় সময় ওখানকার উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিবেশের কথা খুব বলতেন। ওখানে তখন পূজা-উৎসব ভজনকীর্তনাদি নিত্যই হতো। মহারাজ সবাইকে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন।

নিত্যই সকালে ধ্যান করবার জন্য আমরা মহারাজের ঘরে উপস্থিত হতাম। সন্ধ্যায় সাধুরা সবাই তাঁর ঘরে আসতেন ও নানা প্রশ্ন করতেন। মহারাজ সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কখনো কখনো প্রাণস্পর্শী আলোচনা হতো। একদিন আমি বেশ একটু দেরিতে হাজির হই। ঘরটি লোকে ভর্তি। আমি সাধুদের মধ্যে একটু জায়গা খুঁজছিলাম। ঘুরে ঘুরে বসার জায়গা খুঁজছি দেখে মহারাজ রহস্য করে বললেন: "প্রথম প্রথম নকশা করে পরে লিখতে শিখবে। ওখানে ঢুকতে হলে তোমায় আগে প্রাথমিক নিয়মগুলি পালন করতে হবে।" মহারাজের কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

একদিন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম: "ভগবানের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে না। আবার সংসারের প্রতিও আসক্তি বোধ করি না। এটা কি আমার খারাপ সংস্কারের ফল? মহারাজ বললেন: "এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

সব জায়গাতেই দেখেছি সূর্যাস্তের পর মহারাজ সেবককে ডেকে গঙ্গাজল নিয়ে হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর কিছুক্ষণ জোড়হাতে বসে ধ্যান করতেন।

সব সময়ই আমি মহারাজের কাছে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। একবার ললিতবাবু মায়ের জন্মভূমিতে মন্দির তৈরির জন্য আমাকে অর্থসংগ্রহ করতে বলেন। কিন্তু মহারাজ এতে মত দেননি। তিনি ভেবেছিলেন—এ কাজ আমার পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হবে। মহারাজকে আমি কদাচিৎ কখনো কোন উপহার দিয়েছি। কিন্তু যখনই তাঁর জন্যে কিছু নিয়ে গেছি—তা তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আমি খুব বড় রকমের ভুল-ত্রুটি করলেও তাঁকে আমার উপর অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। একবার আমি একটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। এই ত্রুটি যে-কোন ধর্মগুরুর কাছেই ক্ষমার অযোগ্য মনে হতো। কিন্তু মহারাজের ক্ষমাশীলতার তুলনা ছিল না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে দেখেছি—মানুষের দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও

যে তিনি শুধু ভালবাসতে পারতেন তা নয়, সমস্ত দোষত্রুটি নিয়েই মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর এই ভালবাসাই আমাকে বেঁধেছিল তাঁর সেই আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় ছিল না। তাঁর শিষ্যদের নিন্দা-সমালোচনা তিনি কখনো বরদাস্ত করতে পারতেন না।

একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দুপুরে বিশ্রামের পর তিনি শোবার ঘরটিতে বসে ছিলেন। মায়ের সঙ্গিনী শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যা গোলাপ-মা এই সময় ঘরে ঢুকলেন। তিনি মহারাজকে একজন গৃহীভক্তের কথা বলেছিলেন। এই ভক্তটি তাঁর বাড়িতে বিশেষ পূজাদির আয়োজন করে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন এবং তাঁদের কিছু উপহারও দিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে গোলাপ-মা মন্তব্য করলেন ঃ "ভক্তটি সাধুদের খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, কিন্তু ওর স্বভাবের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না।" একথা শুনে মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন ঃ "গোলাপ-মা, তুমি কিছু বুঝতে পারনি।"

কখনো কখনো মহারাজ স্বামী অখণ্ডানন্দ ও অন্য গুরুভাইদের সঙ্গে রহস্য করতেন। আমাকেও এ-ব্যাপারে সাহায্যের জন্য নিতেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি ও মুখমণ্ডলে সব সময়ই একটা প্রশান্ত গম্ভীর ভাব দেখা যেত।

গুরুভাইয়েরা মহারাজকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একদিন স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধন থেকে মঠে এলেন মহারাজকে স্বামী তুরীয়ানন্দের স্বাস্থ্যের খবর জানাতে। তুরীয়ানন্দজী তখন অসুস্থ হয়ে উদ্বোধনের দোতলায় ছিলেন। সারদানন্দজী মহারাজের খাটের পাশটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। মহারাজ তাঁকে কাছে বসতে বললেন। কিন্তু সারদানন্দজী দাঁড়িয়েই রইলেন। মহারাজ বার বার অনুরোধ করায় তিনি মহারাজের কথা রাখবার জন্যই বিছানার এক কোণ তুলে খালি খাটের উপর বসলেন। ভাবটা হল এই যে, মহারাজ যে বিছানা ব্যবহার করেন সেখানে বসার যোগ্যতা তাঁর নেই।

একদিন সকালবেলায় মহারাজ মঠের জমির একপাশে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছু দূরে কয়েকটি গরু ঘাস খাচ্ছিল। এর মধ্যে লক্ষ্মী নামে একটি গাই মহারাজের খুব আদরের ছিল। মহারাজকে দেখেই গাইটি ছুটে কাছে এল। মহারাজ তাকে আদর করতে লাগলেন। আমি কাছেই ছিলাম। মহারাজ বললেন ঃ "এ কলা খেতে খুব ভালবাসে।" কলা নিয়ে আসব কিনা জানতে চাওয়ায় উনি বললেন ঃ "তাহলে খুব ভাল হয়।" আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে বাজার থেকে প্রায় এক ডজন কলা কিনে নিয়ে এলাম। মহারাজ তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাইটিও তাঁর কাছে অপেক্ষা করছিল।

ভজন-কীর্তন মহারাজের খুব প্রিয় ছিল। মঠে নিয়মিত সমবেতভাবে কালীকীর্তন ও রামনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা তিনিই করেন। অনেক সময়ই তাঁকে সাধুদের এই কীর্তনগান খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে দেখেছি। তিনি এসময় ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। একদিন বিকেলে একটা বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছিলাম। মহারাজের কাছে অনুমতি নিতে গেলে তিনি বললেন ঃ "আজ সন্ধ্যায় কালীকীর্তন হবে। এতে যোগ দিতে ভুলো না।" কাশীতে থাকাকালে তিনি অনেকগুলি মন্দিরে এই কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ ছিল।

একদিন স্বামী ধীরানন্দ আমাকে দেখিয়ে মহারাজকে বললেন ঃ "আপনার কাছে এর কয়েকটা প্রশ্ন আছে।" মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "তুমি একজন মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছ, তাঁকে প্রণাম করেছ, তাঁর পদস্পর্শও করেছ। এর পরেও তোমার আর কী প্রশ্ন থাকতে পারে ?"

মহারাজের কাছে যাবার আগে আমি গীতা-উপনিষদ্ নিয়মিত পাঠ করতাম। কিন্তু তার কৃপালাভের পরই এইসব শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম বুঝতে পেরেছি। শাস্ত্রপাঠ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করলেও আমি প্রথম প্রথম এগুলির ঠিক ঠিক তাৎপর্য ধরতে পারতাম না। পরবর্তী কালে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে অসুবিধা হতো না। আমার বিশ্বাস, মহারাজজীর কৃপার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তিনি ধর্ম-কথা বেশি বলতেন না, কিন্তু স্বয়ং মৌন থেকে তিনি অন্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করতে পারতেন। তিনি ছিলেন ভালবাসা ও করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁর অহেতুকী কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল।

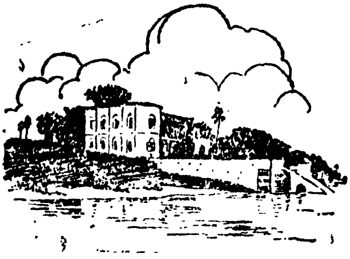

পুরাতনী

ত্যাগই মহাশক্তি

ব্রহ্মচারী সনৎকুমার

দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপুর কন্যার নাম রমা। রমা যেমন সুন্দরী, তেমনি ভক্তিমতী। হিরণ্যকশিপু তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন মহর্ষি ত্বষ্টার সঙ্গে। কিন্তু রমার মনে আদৌ সুখ ছিল না। কারণ, তিনি সন্তানহীনা। ঠিক করলেন, তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে সন্তান লাভ করবেন। শুরু হল মহাদেবের উদ্দেশে তাঁর সুকঠিন তপস্যা। তপস্যায় প্রসন্ন হলেন মহাদেব। আবির্ভূত হয়ে বললেন, তিনি রমাকে বরদান করতে চান। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে রমা দুটি বর চেয়ে নিলেন। প্রথম বর—তাঁর পুত্র যেন একাধারে ক্ষাত্রিয়োচিত পরাক্রম এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর অধিকারী হয়। দ্বিতীয় বর—সেই পুত্র যেন প্রচলিত কোন অস্ত্রেই বধ্য না হয়। মহাদেব উচ্চারণ করলেন—'তথাস্তু'। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষাত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য যেমন এই পুত্রের মধ্যে থাকবে, তেমনি একই সঙ্গে এই পুত্র হবে এ-যাবৎ প্রচলিত যে-কোন অস্ত্রেই অবধ্য।

রমার এই তপস্যালব্ধ পুত্রই বৃত্র।

একদিকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বৃত্রকে উপনয়ন-সংস্কার করিয়ে বৈদিক শিক্ষা দান করলেন, অন্যদিকে অস্ত্রগুরুর কাছে অধীত হতে লাগল অস্ত্রশিক্ষাও। যৌবনকাল উপস্থিত হলে বৃত্র পৃথিবী জয় করার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। একে একে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে পৃথিবীর অধীশ্বর হলেন তিনি। তারপর অগ্রসর হলেন স্বর্গরাজ্য জয় করতে। ঘোরতর যুদ্ধের পর স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন বৃত্র। পরাজিত ইন্দ্র পরাজয়ের গ্লানি এবং অপমান মাথায় করে দেবতাদের নিয়ে পলায়ন করলেন ব্রহ্মলোকে।

স্বর্গের অধীশ্বর এখন বৃত্র। কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে সারাক্ষণই নাড়া দিত। ইন্দ্র পরাজিত, কিন্তু জীবিত। ভবিষ্যতে তিনি যে আবার স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবেন না, তার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং শত্রুর শেষ করতে হবে। শুক্রাচার্য বললেন, ব্রহ্মলোকে অবস্থিত ইন্দ্রকে হত্যা করার একমাত্র উপায় সেই লোকে গমন করা। আর তার জন্য প্রয়োজন দুশ্চর তপস্যা। নৈমিষারণ্যে সেই তপস্যা করে ইন্দ্র দেবতাসহ ব্রহ্মলোকে গেছেন।

'উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি।' উদ্যমই সিদ্ধির মূল-মন্ত্র। আত্মবিশ্বাসী বৃত্র বিপুল উদ্যমে অগ্রসর হলেন নৈমিষারণ্যের দিকে। রাজ্যভার যোগ্যজনে অর্পণ করে দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন তিনি। বহু বছর ধরে বৃত্রের নিরাবরণ দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল কত উদ্দাম ঝঞ্ঝা, কত প্রখর সূর্যকিরণ, কত প্রবল বর্ষণ। কিন্তু না, তপস্যা থেকে বিরত হলেন না বৃত্র।

এদিকে ব্রহ্মলোকে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রমাদ গণলেন। বৃত্র যে ক্রমশঃ-ই মহাশক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠছে। যে-কোন ভাবে তপস্যার ত্রুটি ধরে তাকে বিরত না করলে সমূহ বিপদের হাত থেকে কেউ দেবতাদের বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু ত্রুটিহীন তপস্যা বৃত্রের। দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন ব্রহ্মা।

সব শুনে বিষ্ণু বললেন: "দেহে ক্ষাত্রশক্তি এবং মনে অমিত ব্রহ্মতেজ বৃত্রের মধ্যে সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকাতেই সে ব্রহ্মলোক বিজয়ের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে চলেছে। তাছাড়া মহাদেবের বরে প্রচলিত সবরকম অস্ত্রেই সে তো অবধ্য। সুতরাং নতুন সৃষ্ট মহাশক্তিশালী অস্ত্রে তপস্যারত বৃত্রকে হত্যা সম্ভব।" দেবতাদের করুণ মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল উদ্বেগের ছায়া—কি সেই অস্ত্র? সকলকে আশ্বস্ত করে ভগবান বিষ্ণু বললেন: "আজীবন সত্যবাদী, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর, ভগবৎপ্রেমে নির্মল অন্তঃকরণ এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র কোন জীবিত

ব্রাহ্মণ যদি স্বেচ্ছায় তাঁর অস্থি দান করেন, সেই অস্থি দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে নতুন অস্ত্র—বজ্র। সেই বজ্রেই হবে বৃত্রের নিধন।" দেবতারা শুনে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ, কোথায় পাবেন সেই মহৎ ব্রাহ্মণের দেখা যিনি স্বেচ্ছায় জীবন দান করবেন? বিষ্ণু বললেন ঃ "পুষ্করতীর্থে সরস্বতী নদীতীরে এক অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন। তাঁর নাম দধীচি।"

ইন্দ্রসহ দেবতারা গেলেন দধীচির কাছে। পরম আনন্দে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে দেবতাদের আপ্যায়ণ করলেন দধীচি। পরম বিনয়ী ও মহাত্মা সেই ব্রাহ্মণকে তাঁরা কঠোরভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে এসেছেন! তাঁর আন্তরিক উষ্ণ আপ্যায়নে লজ্জা, সঙ্কোচ আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দেবতাদের হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। কিন্তু নিরুপায় যে তাঁরাও। যা-হোক সসঙ্কোচে ইন্দ্রই ব্রাহ্মণের কাছে নিবেদন করলেন তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য।

আকস্মিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত পরম প্রিয়বস্তু লাভ করলে মানুষ যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, দধীচিও তেমনি ইন্দ্রের কথা শোনামাত্র পরম আনন্দে বিগলিত হয়ে গেলেন। দধীচির এমন ব্যবহারে দেবতারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। দধীচি ইন্দ্রকে বললেন ঃ 'ভগবন্! আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার দেহাস্থি দিয়ে সমবেতভাবে দেবকুলকে রক্ষা করা সম্ভব একথা ভাবতেই আনন্দে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। আপনারা আশ্রমে এসে আমাকে এই অনুরোধ করায় আমি ধন্য হয়েছি। কৃপা করে আপনারা আমাকে একটু সময় ভিক্ষা দিন। এখনই আমি শ্রীভগবানের ধ্যানে বসে পরমাত্মায় সম্মিলিত হব। আপনারা তখন আমার দেহাস্থি সংগ্রহ করে নেবেন।" মহামুনি দধীচি মহাধ্যানে মগ্ন হলেন।

যথাকালে দধীচির পূতাস্থি থেকে প্রস্তুত বজ্র নিয়ে দেবরাজ নৈমিষারণ্যে চলে গেলেন। দূর থেকে বৃত্রকে দেখেই তিনি বুঝলেন, বহুবর্ষের কঠোর তপঃপ্রভাবে বৃত্রের দেহ থেকে মহাতেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ব্রহ্মলোক-বিজয়ের তপস্যা করে তিনি আজ মহাশক্তিতে শক্তিমান হতে চলেছেন। নিদারুণ শঙ্কা আর চরম উত্তেজনায় ইন্দ্র বৃত্রকে লক্ষ্য করে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। দধীচির পূতাস্থি-প্রসূত বজ্র কালানলের মতো মহা পরাক্রমশালী বৃত্রের উপর পতিত হওয়ামাত্র ভস্মীভূত হল তাঁর দেহ।

যে অপরাজেয় আসুরী-শক্তি দেবতাদের পর্যন্ত পরাহত করে ব্রহ্মলোক বিজয়ের তপস্যায় সিদ্ধ হতে চলেছিল, পবিত্রতা ও আত্মত্যাগের অপরিমেয় শক্তির কাছে সেই শক্তিও হল বিধ্বস্ত। বজ্রের ভিতর এত শক্তি এল কোথা থেকে? দধীচির পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক আর অপাপবিদ্ধ দেহাস্থির মধ্যেই তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছিল সেই মহাশক্তি। বিশেষতঃ পরার্থপরতার তেজ, নিঃশেষে আত্মত্যাগের মহিমা সেই শক্তিকে করেছে ভয়ঙ্কর, করেছে মহিমময়। সেই শক্তির কাছে জগতের সমস্ত শক্তিই পরাভূত হতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও দর্শন যুগ যুগ ধরে ঘোষণা করছে এই আত্মত্যাগের মহিমা। সব চেয়ে বড় ত্যাগ আত্মত্যাগ। দধীচি সেই ত্যাগের আদর্শ দেখিয়েছিলেন। তাই তিনি অমর হয়ে আছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "ত্যাগেই ধর্মের আরম্ভ, ত্যাগেই ধর্মের সমাপ্তি। ত্যাগই মহাশক্তি। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা।" বেদও বলছেন, "ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া / ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" সন্তান, সম্পদ, অথবা যজ্ঞের দ্বারা নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বলাভ সম্ভব। দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনী আজও ভারতবাসীকে ত্যাগের শাশ্বত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এদিকে অন্যায়ভাবে বৃত্রকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকেও করতে হয়েছিল তার প্রায়শ্চিত্ত। বৃত্রকে হত্যা করার পরই ইন্দ্রের শরীর মন থেকে সমস্ত ঐশী শক্তি, তেজ আর দৈবী গুণাবলী নিষ্প্রভ হয়ে গেল। অসুর হলেও ব্রাহ্মণোচিত অনেক গুণের অধিকারী এবং মহা-পুরুষকারসম্পন্ন ছিল বৃত্র। তপস্যারত সেই বৃত্রকে হত্যার ফলস্বরূপ ইন্দ্রের এই দুর্দশা। ব্রহ্মার উপদেশে বহুতীর্থ ভ্রমণের ফলে ইন্দ্র ঐ পাপ থেকে ক্রমে মুক্ত হলেন।

যমুনোত্রীর পথে

অজিতকুমার মাইতি

চিরতুষারাবৃত বন্দরপুঞ্জ পর্বতমালা। তারই পশ্চিমাংশের এক হিমবাহ থেকে উৎপত্তি পূতসলিলা যমুনার। ছলছল কলকল শব্দে এই যমুনোত্রীতেই তার প্রথম অবতরণ। সরু ফিতের বেণী দুলিয়ে—নৃত্যরতা যমুনা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে তুষার রাজ্যের অর্গল ভেঙে এই যমুনোত্রীরই পাষাণ প্রান্তরে। যমুনোত্রীই যমুনার প্রথম লীলানিকেতন।

দু-পাশেই খাড়াই পাহাড়ের প্রাচীর। মাঝখানে কয়েক ফুটের এক ছোট পাহাড়ী উপত্যকা। এই উপত্যকারই একাংশে প্রপাত-আকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে কল্লোলিনী যমুনা। উচ্ছল হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে নিচু থেকে আরও নিচুতে তার দুগ্ধশুভ্র জলের ধারা নিয়ে। এই জলধারার বাম তীরে যে শতখানেক ফুটের মতো ঢালু ভূমি, তাই বলতে গেলে যমুনোত্রীর তীর্থক্ষেত্র। যমুনা মায়ের ছোট একটি মন্দির, উষ্ণ জলের কুণ্ড তিনটি—আর দিব্যশিলার আস্তানা—মোটামুটি এগুলিই এই তীর্থের মুখ্য আকর্ষণ। কিন্তু আরও আকর্ষণ যমুনোত্রীর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সে-সৌন্দর্য সত্যই মনমাতানো।

এই অবর্ণনীয়-সৌন্দর্যের দিকে অভিভূত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে হয় সবাইকে। যমুনার একটানা কলস্বর অর্কেস্ট্রার মতো কানে বাজে প্রত্যেক যাত্রীরই। এক মোহময় পরিবেশে মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মভোলা করে তোলে তাদের। এক দৃষ্টিতেই বলতে হয় যমুনোত্রী অপরূপা।

এই অপরূপা যমুনোত্রীর এক শিলাখণ্ডে বসে দেখছিলাম যমুনার অবতরণলীলা। মুগ্ধ চিত্তে উদাস দৃষ্টিতে উপভোগ করছিলাম যমুনোত্রীর অসামান্য রূপ। ক্লান্তিকর চড়াই পথের পথশ্রম ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল বন্দরপুঞ্জের উপর দিয়ে বয়ে আসা হিমেল হাওয়ায়। একটানা পাঁচ কিলোমিটার রুক্ষ চড়াই উত্তরণে খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

'চা পিলিয়ে বাবুজী—' বলে চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল আমার ঘোড়ার সহিসটি। এমন সময় যে গরম চায়ের প্রয়োজন তা বুঝেছিল সে। তাই নিকটবর্তী একটি দোকান থেকে চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল নিজেই। তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনি। গাড়োয়াল দেশের দরিদ্র সহিসটি হনুমানচটি থেকে যমুনোত্রী পর্যন্ত তের কিলোমিটার পথের সঙ্গী। ঘোড়ার সঙ্গে সমান তালে উঠে এসেছে সে আমার সঙ্গে নানা গল্প করতে করতে। ঘোড়ার সওয়ার হয়েও ক্লান্ত হয়েছি আমি। কিন্তু তাকে ক্লান্ত হতে দেখিনি আদৌ। তার অনাবিল হাসি ভুলিয়ে রেখেছিল আমার ক্লান্তিকে।

চা শেষ করে তারই হাতে তুলে দিলাম কাপটি। এক কাপ চা তাকেও খেয়ে নিতে বললাম। টাকা নিয়ে কাপ ফেরত দিতে চলে গেল সে। খানিক পরেই ফিরে এসে দেখাল আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যত শিগ্‌গির ফিরতে পারা যায় ভাল। নতুবা দুর্দশার একশেষ হবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সত্যিই কালো মেঘের আনাগোনা। গাছের মাথায় মাথায় মেঘের কুণ্ডলী। অথচ কিছুক্ষণ আগেও দেখেছিলাম নীল আকাশ; বন্দরপুঞ্জের তুষারাচ্ছাদনের উপর সূর্যের সোনালী কিরণ; কলহাস্যময়ী যমুনার জলে সূর্যের প্রতিবিম্বন।

জানকীবাঈচটি থেকে সাতসকালে যাত্রা হয়েছিল শুরু। এই জানকীবাঈচটি এ-পথের শেষ চটি। চটি বলতে পথের দুপাশে ৮।১০ খানা ছোট ছোট ঘর। কয়েকটা চায়ের দোকান। এরই মধ্যে বড় বলতে গেলে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের 'ট্রাভেলার্স-লজ'। এই লজেরই একটা 'ডর্মিটরি'

পেয়েছিলাম আমরা সাতজন যাত্রী। রাতের আস্তানা, গরম তোশক, গরম খাবার মিলেছিল ভালই। হনুমানচটি থেকে আট কিলোমিটারের মাথায়—যমুনার ডান তীরে এই চটি ৯,৫০০ ফুট উঁচু। যমুনার ধারা সোজা নামতে নামতে বাঁক নিয়েছে হঠাৎ এখানেই। কিছুটা গড়িয়েই পুনরায় বেঁকে নামছে খরশালির দিকে। যমুনার অপর পারেই খরশালি। এ-পথের শেষ বসতি।

লজের পাশ দিয়েই যমুনোত্রীর পথ। নির্জন, নিরালা। পথের পরেই গভীর খাদ। খাদের মধ্য দিয়েই বইছে যমুনা। অবিরত কলকল শব্দ। সন্ধ্যের কিছুটা পরেই চাঁদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল পথঘাট। পাহাড়ের কোলে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর মাথায় ছিল চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। গড়িয়ে-পড়া যমুনার স্বচ্ছ ধারার উপর ছিল আলোর ঝিকিমিকি। প্রকৃতির সে এক অনির্বচনীয় রূপ। লজের লনে বসে রাতের যমুনাকে যে কি অপূর্ব সুন্দর লেগেছিল তা বলে বোঝানোর নয়।

মনে পড়েছিল সারাদিনের কথা। সকালে মুসৌরী থেকে বেরিয়ে কেম্পটি জলপ্রপাত পরিদর্শন করে গাড়ি এসেছিল যমুনার কূলে। যমুনার কূল ধরেই একটানা গাড়ি এসেছিল নওগাঁ হয়ে ১১২ কিলোমিটার দূরের জনপদ বারকোটে। দুপুরের খাওয়া বারকোটে সেরেই গাড়ি ছেড়েছিল পুনরায়। যাত্রার বিরতি হনুমানচটিতে। বারকোট থেকে হনুমানচটি ৩৪ কিলোমিটার। হনুমানচটির উচ্চতা ৯০০০ ফুট। পথে পড়েছিল গাঙ্গানী, কাথনোর, যমুনাচটি ও সিয়ানাচটি। হনুমানচটিতেই গাড়ি চলার পথের সমাপ্তি। এবার থেকে যাত্রা শুরু ঘোড়ার পিঠের সওয়ারী হয়ে।

দলে আমরা সাতজন আমি, আমার গৃহিণী ও কন্যা অঞ্জনা, বন্ধু বিশ্বনাথ রায়, তাঁর গৃহিণী ও তাঁর কন্যা সুতপা। আর ছিলেন বন্ধু কৃষ্ণপদ পাল। সাত যাত্রীর জন্য বাছাই করা হল সাতটি ঘোড়া যমুনোত্রী যাত্রার। ঠিক হল পথে রাত কাটানো হবে জানকীবাঈচটিতে। তার জন্য দিতে হবে প্রত্যেক যাত্রী পিছু মজুরী ১৫০ টাকার অতিরিক্ত ২৫ টাকা করে। গাড়িতেই মালপত্র রেখে শীতের পোশাক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমরা যমুনোত্রীর পথে যাত্রার। সামান্য কিছুটা সময় লেগেছিল চা-টিফিন খাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে হনুমানগঙ্গার পুলের সন্নিকটেই ঘোড়াগুলিকে ঠিক করে রেখেছিল সহিসেরা। হনুমানগঙ্গা এই হনুমানচটিতেই এসে মিশেছে যমুনার সঙ্গে। 'যমুনা-মাঈকি জয়' ধ্বনি দিয়ে আমরা একে একে উঠে পড়লাম নিজ নিজ ঘোড়ায়। যাত্রা শুরু হল যমুনার বাম তীর ধরেই।

মন্থরগতিতেই চড়াই পথে উঠে এসেছিল ঘোড়াগুলি। কাঁচা পাহাড় ভেঙে ধ্বস নেমেছিল অনেক স্থানেই। অতি সন্তর্পণে ঘোড়াগুলি পার হচ্ছিল সেই ধ্বসের জায়গাগুলি। সত্যিকথা বলতে কি, ধ্বসের সেই সংকীর্ণ জায়গাগুলি পার হতে বুক দুরদুর করেছিল সবারই। চলার পথে ছিল আনন্দও যেমন আবার রোমাঞ্চও তেমনি। এক পাশে যমুনা, অন্য পাশে সবুজ অরণ্যে ভরা পাহাড়ের খাড়াই প্রাচীর। মাঝে সংকীর্ণ পাহাড়ী চড়াই-উতরাই পথ। মাথার উপর নীল আকাশ। দূরে দৃশ্যমান বরফের আচ্ছাদনে মোড়া বন্দরপুঞ্জের শিখর। আশেপাশে রঙবেরঙের বাহারী ফুল। সে যেন এক স্বপ্নলোকের যাত্রা।

ফুলচটিকে পিছনে রেখে খরশালির অদূরে নদী পার হয়ে ঘোড়াগুলি এসেছিল যমুনার ডান তীরে। সারি সারি ঘোড়াগুলি চলেছিল এক ছোট সবুজ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে। পাচনবাড়ি হাতে নিয়ে কয়েকটি রাখাল বালককে দেখেছিলাম সেই সবুজ উপত্যকার বুকে গরু মহিষ চরাতে। বাঁ পাশে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে অগণিত ঝরনা। কানে আসছে অবিরত ঝরঝর শব্দ। মাঝে মাঝে ঘোড়াগুলি পথশ্রমের ক্লান্তি মেটাতে জল পান করছিল ঝরনাগুলি থেকে। পথের পাশে কোথাও শুয়েছিল দু-চারটি তেল-চিকচিকে লোমশ কুকুর—দেখতে ঠিক যেন ভালুকের মতো। কোথাও বা অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে নাম-না-জানা পাখীর ঝাঁক। তাদের কলকাকলি। মাঝে মাঝে হিমেল হাওয়ায় আন্দোলিত ফুলের চুমকি বসানো অরণ্যানীর

গালিচা। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন এক অচিনপুরের যাত্রী।

সূর্যাস্তের কিছুটা আগেই আমাদের ঘোড়ার কনভয় পৌঁছেছিল জানকীবাঈচটিতে। স্থানীয় এক ভদ্রলোক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ট্রাভেলার্স লজে। লজের চৌকিদার দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের ডর্মিটরি। বালতি ভরে দিয়েছিলেন গরমজল হাতমুখ ধোয়ার জন্য। কিছুক্ষণ পরেই গরম চা ও টোস্ট। সারাদিনের পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনে তাই ছিল যথেষ্ট। সাড়ে নয় হাজার ফুট উঁচুতে নির্জন জানকীবাঈচটি আমাদের কাছে মনে হয়েছিল প্রকৃতির এক অপূর্ব লীলানিকেতন।

হুঁস ছিল না কতক্ষণ ডুবে ছিলাম পথের এই সৌন্দর্যের মধ্যে। হঠাৎ কন্যা বলল: "বাবা—আমাদের স্নান শেষ, এবার তোমাদের পালা। ভারি আরাম গরম জলে স্নান করতে।"

এবার উঠতেই হল আমাকে, পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত উষ্ণ জলের কুণ্ডে নামলাম স্নানের জন্য। ইতিমধ্যে চলে এসেছেন বিশ্বনাথবাবু ও কৃষ্ণপদবাবু। তাঁরাও স্নানের জন্য নামলেন কুণ্ডে, স্বচ্ছ গরম জলের কুণ্ড। শীতের আবহাওয়ায় এই গরম জলের কুণ্ডে স্নান ভারি আরামপ্রদ। ভাবতেও অবাক লাগে সদ্য বরফগলা কনকনে যমুনার ধারার মাত্র কয়েক ফুট তফাতেই এই টগবগে গরমজল। এই দুটি কুণ্ড ছাড়া রয়েছে সূর্যকুণ্ড নামে আরেকটি উষ্ণ জলের কুণ্ড। এই কুণ্ডের জলে অনেকেই চুবিয়ে রেখেছেন চালের পুঁটুলি। মিনিট দশ-পনের পরেই তা থেকে চালগুলি সেদ্ধ হয়ে পরিণত হচ্ছে ভাতে—যা এদের ভাষায় প্রসাদ।

সামনেই যমুনা-মায়ের মন্দির। পুজার থালি নিয়ে দেখলাম মেয়েরা ঢুকছেন মন্দিরে।

পুরাণমতে যমরাজার ভগিনী যমুনা। যম ও যমুনা উভয়ের পিতা সূর্য ও মাতা সংজ্ঞাদেবী। সূর্য কশ্যপমুনির পুত্র এবং সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার তনয়া। যম-যমুনা উভয়ের মধ্যেই প্রীতির সম্পর্ক। প্রতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যমুনা ফোঁটা দেয় ভাই যমকে তাঁর দীর্ঘ ও সুখী জীবন কামনায়। আমাদের দেশে প্রচলিত ছড়া: 'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা—আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।' সেই যমুনার পুজা। হয়তো বা যমুনার মাধ্যমে যমকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য। যমরাজা কতটা সন্তুষ্ট হলেন জানি না। তবে চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম ঠিকানা না উঠলেও দেখলাম নাম ঠিকানা উঠল পান্ডাদের খাতায়।

অদূরেই দিব্যশিলার আস্তানা। খাড়াই পাহাড়ের পাশে কয়েকটি সিন্দুর মাখানো শিলা। পাহাড়ের মধ্য থেকে অবিরত নির্গত হচ্ছে ঝিরঝিরে উষ্ণ জল। শিলাগুলিকে ধৌত করে নামছে সেই উষ্ণ জলের ধারা। তারই মাঝে ফুলপাতা নিয়ে বসে আছে ভক্ত যাত্রীর দল। ধূপ-দীপের নৈবেদ্য। মন্ত্র পড়াচ্ছেন পান্ডারা। স্নান সেরে আমরাও পৌঁছালাম সেই দিব্যশিলার আস্তানায়। মেয়েদের সঙ্গে আমাদেরও মন্ত্র পড়ালেন পান্ডারা। কতক সংস্কৃত কতক গাড়োয়ালী হিন্দি। পরের দৃশ্য চিরন্তন তীর্থের দৃশ্য। যাত্রীদের নিকট থেকে দক্ষিণা আদায়ের কারসাজি।

যাক সে-কথা, যমুনোত্রীর কথাই বলি। কুণ্ডের তীরেই মাধববাবার আশ্রম, সাদামাটা এক কামরা ঘর, অন্ধকার ঝুপড়ি। বাবাজী এবং সেবক সদাই ব্যস্ত যাত্রীদের সেবায়। প্রত্যেক যাত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন শুকনো প্রসাদ। ভক্তিভরে সবাই নিচ্ছেন সেই প্রসাদ। হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন সবাইকে। মাঝে মাঝে পরিচয় নিচ্ছেন কারও কারও। প্রশান্ত আনন।

মাধববাবাকে প্রণাম করে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম, তখনও যাত্রীর সমাগম তেমন নেই। বোধহয় আমরাই সেদিনের প্রথম যাত্রীদল। সকাল সকাল রওনা হয়েছিলাম জানকীবাঈচটি থেকে। পাঁচ কিলোমিটার পথ বলতে গেলে সবটাই প্রাণান্তকর চড়াই। সেই চড়াই ভাঙতে লেগেছিল প্রায় তিন ঘণ্টার মতো। যমুনার ডান তীর ধরেই এসেছিল ঘোড়াগুলি পাহাড়ের গা ধরে। এক এক স্থান এতই সঙ্কীর্ণ যে একটা ঘোড়ারও চলতে কণ্টকর। তার উপর পাহাড়ের শৈলশিরাগুলি (Ridge) এমন নেমে এসেছে যে ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসে থাকাও চলে না। মাথায় চোট লাগার

সম্ভাবনা, মাথা বাঁচিয়ে এই পাহাড়-পথে চড়াই পার হওয়া যে কি বিপজ্জনক তা কেবল অনুভব করেন ভুক্তভোগীরাই। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা, তার উপর অতিরিক্ত কনকনে ঠাণ্ডা। তার কিছুটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় প্রত্যেক যাত্রীকেই।

এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আসে যাত্রীদল যমুনোত্রীতে। এসেছি আমরাও। আঞ্চলিক মনোরম দৃশ্যাবলী উৎসাহ দেয় যাত্রীদের এই ঝুঁকি নেওয়ার। যমুনোত্রীর উচ্চতা ১০,৮০০ ফুট।

যাই হোক, পুজার্চনার পর সবারই কিছু খাওয়ার তাগিদ। খাবারের অর্ডার দেওয়াই ছিল। সবাই আমরা এসে উঠলাম নির্দিষ্ট দোকানটিতে। খাবার বলতে কিছু গরম পুরি ও শুকনো মিঠাই। দোকানের পরিস্থিতি দেখে সবারই চক্ষু ছানাবড়া। অল্প পরিসর অপরিচ্ছন্ন দোকানঘর। ভাল করে বসে খাওয়ারও ব্যবস্থা নেই। কাঠের জ্বাল দিয়ে পাকোড়া ভাজছেন এক বৃদ্ধ। আমরা পৌঁছাতেই তিনি শুরু করলেন আমাদের অর্ডার দেওয়া পুরি ভাজতে। ঠাণ্ডার ধাক্কা সামলাতে আমরাও সবাই তাঁর উনুনটির চারপাশে ঘিরে বসলাম। ইচ্ছা—গরমে কিছুটা গা-হাত-পা সেঁকে নেওয়া। আমাদের ঘোড়ার সহিসরা বসল দোকানের উঠোনটিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে যাই হোক সারা গেল খাওয়ার পর্ব। খাওয়া বলা ঠিক হবে না—ক্ষুন্নিবৃত্তি।

কন্যা একটি ছোট গাগরিতে ভরে আনল সদ্য নির্গতা যমুনার পবিত্র বারি। পূতসলিলা যমুনা। এই যমুনোত্রীতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নৃত্যের তালে তালে নেমে চলেছে নূপুরনিক্কণা যমুনা। হিমালয়ের বুকেই এই যমুনার ধারা প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। মুসৌরী থেকে কিছুটা দূরে হরিপুরের কাছে যমুনা নেমেছে সমতল ভূমিতে। তারপর দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা ইত্যাদির উপর দিয়ে যমুনা বয়ে এলাহাবাদে আত্মসমর্পণ করেছে গঙ্গার বুকে। এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলই প্রয়াগতীর্থ। বৃন্দাবনের যমুনাকে অনেকেই ডাকেন কালিন্দী বলে। এই কালিন্দী তথা যমুনাকে ঘিরে মথুরা-বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলা ভারত ইতিহাসের এক পুণ্যময় অধ্যায়। এই যমুনার কূলেই আগ্রার বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল। ভারতের রাজধানী দিল্লীও এই যমুনার কূলেই। যমুনার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার। ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর অন্যতম এই যমুনা।

যমুনোত্রী বন্দরপুঞ্জের পাদদেশে এক ছোট জনপদ। গুটিকয়েক দোকান, ছোট একটি মন্দির নিয়েই যমুনোত্রী। মাঝখান চিরে নামছে যমুনার ধারা। কয়েকটি কাঠ ফেলে সংযোগ করা হয়েছে উভয় তীরের। রাত কাটানোর তেমন উপযুক্ত ঘর-বাড়ি নেই। দু-একটি প্রাচীন ধর্মশালা। তাও তেমন প্রশস্ত নয়। ইদানীং লজ হয়েছে একটি। কেরোসিনের আলো জ্বেলে রাত কাটাতে হয় যাত্রীদের। উপযুক্ত গরম পোশাক না থাকলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হয় নিদারুণ। খাওয়ার ব্যবস্থাও অপ্রতুল। তাই প্রত্যেক যাত্রীই সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে আসেন।

সাধারণ যাত্রীদের পক্ষে হৃষীকেশ থেকে যমুনোত্রীর পথে বাসে হনুমানচটি যাওয়াই সুবিধাজনক। হৃষীকেশ থেকে হনুমানচটি পর্যন্ত বাস চলে নিয়মিত। বাসপথের দূরত্ব ২০৯ কিলোমিটার। হনুমানচটি থেকে ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি বা পদব্রজে জানকীবাঈচটি হয়ে যমুনোত্রী যাতায়াতে ২৬ কিলোমিটার। অবশ্য গাড়িতে করে যাঁরা যান তাঁরা দেরাদুন বা মুসৌরী থেকে বারকোট হয়েও হনুমানচটি যান। যমুনোত্রীর মন্দির খোলা থাকে অক্ষয়তৃতীয়া থেকে দীপাবলী পর্যন্ত। অন্য সময় যমুনোত্রী থাকে সাধারণতঃ তুষারাবৃত। তাই এই সময়ের মধ্যেই যমুনোত্রী যায় সবাই। নতুবা যমুনোত্রীর পথে বাধা বহু। বৃষ্টি, ধ্বস—এ-পথের নিত্য-ঘটনা। তাই সেই মানসিকতা নিয়েই যাত্রা করতে হয় যমুনোত্রী।

সহিসরা তাগিদ দিচ্ছে ফেরার। যমুনা-মায়ের প্রতি প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। বিদায় যমুনোত্রী।

আনন্দের সন্তান

'তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী'

প্রদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন মা একটা গল্প বললেন ঃ এক হাবা ছেলে পুজোর পর দিদির বাড়ি যাবে মিষ্টান্ন নিয়ে ; দোকানে গিয়ে বললে, আমায় ভাল মেঠাই করে দাও, আমি দিদির বাড়ি নিয়ে যাব। চতুর দোকানী বুঝতে পারলে, ছেলেটা বোকা। সে চাকা চাকা করে ওল কেটে সেদ্ধ করে, গুড়ের রসে ফেলে নতুন হাঁড়িতে সুন্দর লাল কাপড়ে বেঁধে রাখলে। হাবা এলে পরে সে হাঁড়িটা দিয়ে বললে—এ নতুন ধরনের মেঠাই, চমৎকার খেতে।

হাবা ভাই মেঠাই নিয়ে বোনের বাড়ি চলল। পথে তার ভারি লোভ হল একখানি চেখে দেখতে। অতি সন্তর্পণে হাঁড়ির মুখটি খুলে সে একখানি চাকতি বের করে একটু চেখে বললে, আঃ ভারী চমৎকার। রস টপ্ টপ্ করছে। লোভ সামলাতে পারে না, পর পর আরও সে খেতে লাগল। তখন তার প্রাণ যায় আর কি। মুখে লাল কেটে পরিত্রাহি ডাকছে, আর মনে মনে বলছে, এমন উপাদেয় জিনিস পড়ে যাচ্ছে মুখ থেকে। ওরে, কড়ির জিনিস পড়িসনি, কড়ির জিনিস যাসনি।

গল্প শুনে সবাই হেসে লুটোপুটি।

একবার মায়ের দাঁতে ব্যথা হয়েছে। মায়ের ভারী তথা দ্বারী সেবক স্বামী সারদানন্দ দাঁতটি তুলে ফেলার জন্য ডাক্তার এনেছেন। কিন্তু এ-খবর মায়ের কর্ণগোচর হওয়ার পর থেকেই মায়ের আর খোজ পাওয়া যায় না—মা অদৃশ্য। খোজ—খোজ—খোজ, কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না তাঁকে। গোলাপ-মা দোষ দেন সারদানন্দজীকেই। তাঁর তো বোঝা উচিত ছিল—মা-ঠাকরুন সুশীলা—কমলা-মূর্তি ; কাটাছেড়ার নাম শুনলে ভয় তো পাবেনই। হতাশ স্বামী সারদানন্দ বলেন, অভয়া যদি ভয় পান সে দোষ কি শরতের ? ডাক্তারকে বলেন—বুঝলে কি হে ব্যাপারটা ? মা-ঠাকরুনকে এখন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সুতরাং তুমি নিজের পথ দেখ। অতএব ডাক্তারকে বিদায় নিতে হল। এরপর আবার অনুসন্ধানে মাকে খুঁজে পাওয়া যায় খাটের তলায়। সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে লুকিয়ে আছেন তিনি।

একদিন জয়রামবাটীতে একদল সাপুড়ে এসেছে। ডুগডুগি বাজিয়ে তারা মায়ের বাড়ির সামনে এলে মায়ের বালিকার মতো খুব কৌতূহল হল সাপ খেলা দেখার। কাউকে না পেয়ে নিজেই ডাকলেন তাদের। পারিশ্রমিক কিছু ঠিক না করেই বললেন—খুব ভাল ভাল খেলা দেখাও। তোমাদের খুশি করে বখশীশ দেব। খেলা দেখানো হলে মা খুব সন্তুষ্ট হলেন। তাদের দুটো টাকা, একটা কাপড় এবং মুড়িগুড় খেতে দিলেন। বিদায় নেবার সময় সাপুড়েদের নেতা মায়ের চরণস্পর্শ করে প্রণাম করে। মা-ও তৎক্ষণাৎ তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ইতিমধ্যে খেলা দেখতে অনেকেই এসেছিলেন। মামীদের একজনের এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ "সাপুড়েকে টাকা দিয়েছ, কাপড় দিয়েছ, খেতে দিয়েছ, এই তো বেশ। ওদের আবার ছোঁয়া কেন বাপু ! সারাক্ষণ সাপ নিয়ে থাকে, সাপের বিষ হাতে লাগে। ওদের কখনও ছুঁতে আছে ?" মা কাঁচু-মাচু হয়ে বলেন ঃ "কি করি বলো ? লোকটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, আমি কি করে বারণ করি ? প্রণামই যদি করলে, আর আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবোনি ? তোমাদের এ কেমনতর কথা।"

মায়ের প্রসাদ পাবার জন্য সকলেরই বড় ব্যাকুলতা আর আগ্রহ। একবার মায়ের জ্বর হয়েছে। পথ্য ঠিক হয়েছে দুধ-সাগু। একদিন প্রায় একসের পরিমাণ দুধসাগু মাকে খেতে দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ শরীরে মায়ের মুখে রুচি নেই, মা বেশি খেতে পারেন না। খানিকটা সাগু খেয়ে ভক্তদের হাসতে হাসতে ডেকে বলেন ঃ "কি গো আজ যে প্রসাদে ভক্তি নেই।"

জয়রামবাটীতে স্বামী অরূপানন্দ একদিন মাকে বলছেন: "কালে তোমার জন্য লোকে কত সাধন করবে।" মা হেসে উত্তর দিলেন: "বল কি? সকলে বলবে, আমার মায়ের এমনি বাত ছিল, এমনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত।"

জনৈক সাধুভক্ত একদিন মায়ের পাদপদ্মে পদ্মফুল প্রদান করে প্রার্থনা করেন: "আমাকে আর ঘুরোবেন না।" মা হাসিমুখে উত্তর দেন, "আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুরতে পারলে, আর আমি একটু ঘোরাব না?"

মায়ের কাছে থাকতেন একজন সাধু সেবক। মায়ের হাতে হাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেন, একদিন একটা খুব বড় বেল কাশী থেকে কোন ভক্ত এনেছিলেন। মা ঐ বেলটা রেখেছিলেন খাটের তলায়। সেদিনের তরকারি কাটা শেষ করে মা ঐ সাধুভক্তকে বলেন বেলটা এনে দিতে। সেবক জানালেন: "আপনার খাটের তলায় তো বেল নেই মা।" মা বললেন: "আমি নিজে রেখেছি কোথা যাবে? ভাল করে দেখ।" সেবক আবার বলেন: "না মা, বেল নেই।' সেকথা শুনে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "খাটের তলায় কি আছে?" সেবক উত্তর দেন, "একটা কুমড়ো আছে।" মা বুঝলেন ব্যাপারটা। হাসতে হাসতে বললেন, "ঐ কুমড়োটাই নিয়ে এস।"

পাগলী-মামীর অত্যাচার মা সহ্য করতেন নীরবে। সব কথা শুনতেনও না, জবাবও দিতেন না। মাঝে মাঝে রঙ্গরস করে দু-এক কথার জবাব দিতেন। একদিন বললেন: "পাগলে কি না বলে! কামারপুকুরে রাত্রে ঘরে শুয়ে আছি, শুনতে পাচ্ছি মাতালদের একজন বলচে, ওরে আমার পা-টা কোথায় গেলরে? আর একজন বলচে, ওরে লাহাবাবুদের ঘরে দুর্গাপুজা হচ্ছে; তোর পা-টা তার প্রধান নৈবিদ্যিতেই বোধহয় গেছে!"

একবার একজন বৃদ্ধা বেলুড়মঠ দর্শন করে মায়ের কাছে এসেছেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন: "হ্যাগা, তোমরা বেলুড় মঠ কি রকম কি দেখে এলে?" একজন মহিলা বললেন, "আহা-মা! কি বলব! বেলুড় মঠে কি বড় বড় গরু গো! ওরকম বড় বড় গরু আমাদের দেশে নেই।" মা বৃদ্ধাকে বার বার জিজ্ঞাসা করছেন: "কেন ঠাকুরঘরে যাওনি? ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সাধুরা কি পরিপাটি করে সাজিয়ে যত্ন করে রেখেছে, দেখোনি?" মহিলা বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি।" মা আবার বলেন: "ঠাকুরের ত্যাগী-সন্তানদের দর্শন করেছো?" মহিলা উত্তরে বলেন: "করেছি, কত যত্ন করলেন তাঁরা। আমরা যে তোমার দেশ থেকে এসেছি।" মা জিজ্ঞাসা করেন, "আর সেই ফুলের মতো পবিত্র ব্রহ্মচারীদের দেখোনি?" মহিলার উত্তর: "কি শ্রদ্ধা তাঁদের! আমাদের পরিবেশন করে খাওয়ালেন।" মা বলেন: "তারা সব কিভাবে কত কাজ করছে, দেখেছ? আহা! তাদের দেখলেও কত পুণ্য! গঙ্গার ঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর দর্শন হয়, তা দেখেছ?" মহিলার উত্তর: "সবই দেখেছি, কিন্তু ও রকম গরু আর দেখিনি!"

মায়ের ভাইগুলি এক একটি রত্ন। সব সময় পরস্পরকে হিংসা। এই বুঝি দিদির কাছ থেকে একজন বেশি আদায় করে নিল! মা জানতেন ভাইদের এসব ব্যাপার। এতে তিনি মজাও পেতেন। বড়ভাই প্রসন্ন-মামা কলকাতায় থেকে যজন-যাজন করেন। কলকাতায় থাকা তাঁর মনঃপূত নয়। কিন্তু কি আর করবেন! অর্থোপার্জনের জন্য থাকতেই হয়। কালী-মামা জয়রামবাটীতেই থাকেন। একবার দুর্গাপুজার আগে প্রসন্ন-মামা কলকাতা যাচ্ছেন। মা তখন জয়রামবাটী এসেছেন। যাবার সময় মাকে বলছেন: "দিদি, তুমিও দেশে এলে, আমাকেও এবার কলকাতায় যেতে হচ্ছে। কালীরই এখন সুবিধা হলো। দেশে জমিজমা নিয়ে ছেলেপিলের সঙ্গে ঘরে থেকেই বেশ সংসার চালাচ্ছে, আবার তুমিও এসে পড়লে। (অর্থাৎ পুজার সময় তোমার কাছে এবং ভক্তদের কাছ থেকে কালী-মামার হাতে দু-চার পয়সা আসবে।)" কথাগুলি কালী-মামার কানে গেল। তিনি বুঝেছেন প্রসন্ন-মামার ঐসব কথা বলার অর্থ কি। তাই তিনি প্রসন্ন-মামাকে উদ্দেশ করে বললেন: "দিদির কাছে কাঁদুনি গাইছে টাকা আদায়ের জন্য!" শ্রীমার সামনেই এইসব কথাবার্তা হচ্ছে। মা শুনে হাসতে হাসতে বলছেন: "ভাইগুলি আমার রত্ন বটে!"

প্রবন্ধ

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম-ভাবনার প্রতিরূপ

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

উনিশ শতকের সূচনাপর্বে ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ করে ইংরেজী কাব্যে, যে অভিনব মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তা ছিল সর্বদিক দিয়েই অভূতপূর্ব। নব ভাবধারায় অভিষিক্ত এই যুগের সাহিত্যকে 'রোমাণ্টিক' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই ইংরেজী 'রোমাণ্টিক' কথাটির কোন সার্থক পারিভাষিক শব্দ বাঙলা ভাষায় অদ্যাপি উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয়নি। উনিশ শতকের আদিপর্বের ইংরেজী সাহিত্যে প্রযুক্ত এই রোমাণ্টিকতার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। রোমাণ্টিকতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল কল্পনাশক্তির সংবেদনশীলতার চরম উন্মেষ ঘটিয়ে তাকে যুক্তির স্থলাভিষিক্ত করা। রোমাণ্টিক কবিরা এই উন্নত ও পরিশীলিত কল্পনাশক্তি ও সহজাত অববোধ (intuition)-কে জীবন ও প্রকৃতির সব রহস্যের সমাধানে প্রয়োগ করতে প্রবৃত্ত হন।

যে-কবির কাব্যে রোমাণ্টিকতার এই মূল তত্ত্বটি সর্বপ্রথম বাঙ্ময় হয়ে ওঠে তিনি নিঃসন্দেহে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০—১৮৫০)। এখানে উল্লেখ্য, যে-কাব্যসঞ্চয়নটিকে রোমাণ্টিক যুগের সূচক হিসাবে গণ্য করা হয় সেই 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' (Lyrical Ballads)-এর সিংহভাগ কবিতাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনা। এটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। অপর যে কবির কবিতা এতে স্থান পায় তিনি হলেন স্যামুয়েল টেইলার কোলরিজ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিসর্গ-অনুরাগ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইংল্যাণ্ডের লেক ডিস্ট্রিক্ট (Lake District)-এ জন্ম ও বাল্যকাল অতিবাহন ওয়ার্ডসওয়ার্থকে সুযোগ দিয়েছিল নিবিড় নিসর্গ-সংসর্গের। তাঁর মনটি ছিল অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ও অন্তর্মুখী। তাই তাঁর নিসর্গ-অনুভূতির সূচনা হয় বাল্যকালেই—যার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে তাঁর 'প্রেলিউড্' (The Prelude) কাব্যে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থকে শুধুমাত্র প্রকৃতি-প্রেমিক বললে যথেষ্ট হবে না। তিনি নিজেই নিজেকে ভূষিত করেছেন 'প্রকৃতির উপাসক' (Worshipper of Nature) আখ্যায়। প্রকৃতি ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর সত্তার আশ্রয়। প্রকৃতির বাহ্যরূপের অন্তরালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন রূপাতীত এক সর্বব্যাপী সত্তাকে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ইত্যাদির মধ্যে। এই শব্দ-গন্ধ-বর্ণ-ময় মর্ত্যভূমি সেই সত্তার দ্বারা প্রাণিত, ওতপ্রোত। তাই প্রকৃতি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে জড় নয়, চৈতন্যময় বলে প্রতীত হয়েছে। তিনি কান পেতে শুনেছেন প্রকৃতির না-বলা বাণী, অনুভব করেছেন মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিসর্গানুভূতি ও তদুদ্ভূত অধ্যাত্মবোধ বিধৃত হয়ে আছে তাঁর অসংখ্য কবিতায়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তাঁর মহাকাব্য-সদৃশ রচনা—'দি প্রেলিউড' (The Prelude) এবং 'দি এক্সকারশন' (The Excursion)। আর এই আধ্যাত্মিক ভাবরাজিই সংহত আকারে ও অধিকতর শিল্পসম্মতভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'টিনটার্ন অ্যাবি' (Tintern Abbey) এবং 'ইমমর্টালিটি ওড' (Immortality Ode)-শীর্ষক কবিতা দুটিতে—দার্শনিক ভাবনা-ভিত্তিক কবিতা হিসাবে যা ইংরেজী সাহিত্যে তুলনারহিত। এই দুটি কবিতাকে বর্তমান আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা তাই সমীচীন হবে। এ-দুটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনোদর্শনের মূল তত্ত্ব।

প্রকৃতি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে চির-কল্যাণময়ী রূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ

"...and this prayer I make,
Knowing that Nature never did betray
The heart that loved her ; 'tis her previlege,
Through all the years of this our life, to lead
From joy to joy :
(Tintern Abbey, lines : 121-125)

—আর এই কথা আমি বলি, আর তা জেনেই আমি বলছি, যে প্রকৃতিকে ভালবাসে তার সঙ্গে সে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। আমাদের প্রতি তার বিশেষ অনুগ্রহ হল, আজীবন সে আনন্দ থেকে অধিকতর আনন্দে আমাদের সত্তার উত্তরণ ঘটায়।

বলা বাহুল্য, প্রকৃতির প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন ইংরেজী সাহিত্যে ছিল নজিরবিহীন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই মনোভাব স্বতই আমাদের স্মরণে আনে উপনিষদের যুগের আরণ্যক ঋষিদের কথা। তাঁরা বাস করেছেন প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে। মুগ্ধ নেত্রে নিসর্গ-শোভা দেখতে দেখতে তাঁদের অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছে সুন্দরের স্তবগান। বেদমন্ত্রে এই শ্রুতিকে তাঁরা ধরে রেখেছেন স্মৃতির সাহায্যে। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে একে দেবতার সৃষ্ট কাব্য বলে অনুভব করেছেন তাঁরা, বলেছেন—'পশ্য দেবস্য কাব্যম্'—দেখ, দেবতার রচিত এই কাব্য। দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির নদ-নদী-বনস্পতি, এমন-কি ধূলিকণাকেও মধুময় মনে হয়েছে, আবেগ ভরে বলেছেন ঃ 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।'

কিন্তু তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির এই বাহ্যরূপের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ভেদ করে প্রসারিত হয়েছে সেই সর্বকারণের কারণ, মূলতত্ত্বে। রূপসাগরে ডুব দিয়ে তাঁরা সন্ধান করেছেন অরূপ রতনকে। প্রকৃতি তাঁদের কাছেও প্রতিভাত হয়েছে চিন্ময়ীরূপে। দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে সদা-বিরাজমান পরমসত্তাকে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, অনুভব করেছেন সেই সত্তার সঙ্গে একাত্মতা।

১৩১৬ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রম' শীর্ষক যে অভিভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন ঃ "এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ—তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে, এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু আত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।"[১]

ওয়ার্ডসওয়ার্থের ক্ষেত্রেও এই তপোবনসুলভ পরিবেশে, প্রকৃতির সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে জীবন-যাপনের সুযোগ ঘটেছে। দীর্ঘ ৫০ বছর তিনি যন্ত্রসভ্যতার কোলাহলময় পরিমণ্ডল থেকে দূরে—ইংল্যাণ্ডের লেক ডিস্ট্রিক্টের গ্র্যাসমিয়ার (Grasmere) ও রাইড্যাল মাউণ্ট (Rydal Mount) অঞ্চলে তিনি শোভাময়ী প্রকৃতির শান্ত নিরালা কোলে বসবাস করেছেন। এর ফলে আমাদের আরণ্যক ঋষি পিতামহদের মতো তাঁর মনোদর্শন গড়ে ওঠে প্রকৃতি-তন্ময়তা থেকে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হতে অতীন্দ্রিয় জগতে উন্নয়নই ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য। ভারতের অধ্যাত্মবাদে আত্মস্বরূপোপলব্ধি বা আত্ম-দর্শন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেরই নামান্তর, কারণ, অধ্যাত্মশাস্ত্র অনুসারে জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন।

ঈশ্বর মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোকে বহির্মুখী করেছেন। এর কারণ মানুষ যাতে দুর্দর্শ গূঢ়াহিত সত্যকে,—অর্থাৎ তার স্ব-স্বরূপকে,—অনায়াসে উপলব্ধি করতে না পারে। কঠোপনিষদে (২।১।১) তাই বলা হয়েছে ঃ

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্
পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

---

[১] রবীন্দ্ররচনাবলী, পঃ বঃ সরকার, ১৩৬৮ সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ২১৫-১৬

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর আত্মজ্ঞান লাভের অনুপযুক্ত করেছেন। সুতরাং জীব বহির্বিষয় সমূহই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নয়। কদাচিৎ বিরল কোন বিবেকী অমৃতত্বের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক স্ব-স্বরূপকে দর্শন করেন। আচার্য শঙ্কর এই শ্লোকের 'আবৃত্তচক্ষু' হয়ে অমৃতত্ব লাভের সাধনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপমা দিয়েছেন নদীর উজান-স্রোতে ফিরে চলার সঙ্গে—"নদ্যাঃ প্রতিস্রোত—প্রত্যাবর্তনমিব।"

বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-ময় বাহ্য প্রকৃতির অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমসত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটেছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ক্ষেত্রে যে-অন্তর্মুখিনতার দ্বারা, যে নিদিধ্যাসনের দ্বারা, তা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ধারার সঙ্গে সর্বাংশে সঙ্গতিশীল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধ্যানদৃষ্টিও প্রকৃতির দৃশ্যমান রূপ হতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে প্রসারিত হয়েছে অন্তরের অন্তঃস্তলে যেখানে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন পরমসত্তার সঙ্গে, সাংখ্য-দর্শনের সেই 'কেবল' (The Absolute) এর সঙ্গে। 'টিনটার্ন অ্যাবি' কবিতায় অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বর্ণিত হয়েছে তাঁর এই মিস্টিক্ উপলব্ধি, রূপ হতে রূপাতীতে উত্তরণের গূঢ় যোগক্রিয়া। টিনটার্ন অ্যাবির সন্নিহিত অঞ্চলের নিসর্গ-শোভা তাঁর স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত থেকে কেমন করে তাঁকে প্রাণিত করেছে এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে, কবিতাটিতে তার অপূর্ব বর্ণনা পাই ঃ

"These beautious farms,
Through a long absence, have not been to me,
As is a landscape to a blind man's eye ;
But oft, in lonely rooms, and 'mid the due
Of towns and cities, I have owed to them,
In hours of weariness, sensations sweet,

* * *

And passing even into my purer mind,
With tranquile restoration….
That serene and blessed mood,
In which the affections gently lead us on,—
Until, the breath of this corporeal frame
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living Soul ;
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things."

(lines 23-27, 29-30, 41-48)

—এই দৃশ্যপট দীর্ঘ অদর্শনের ফলে আমার কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়নি—যেমন হয় দৃষ্টিহীন জনের কাছে। পরন্তু নিরালা কক্ষে ও জনপদের কোলাহলমুখরতার মধ্যে, অবসাদগ্রস্ত মুহূর্তে—আমি এর দাক্ষিণ্যে লাভ করেছি মধুর অনুভূতি। আর তা আমার অন্তরের অন্তস্তলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পুনঃ সংস্থাপন করেছে গভীর প্রশান্তি। স্মৃতিতে সঞ্চিত সেই সৌন্দর্যানুভূতি জাগায় সেই প্রশান্ত নির্মল মানসিকতা, যার ফলে ক্রমোত্তরণ ঘটে সেই স্তরে যেখানে লুপ্ত হয় দেহবোধ, স্তব্ধ হয় রক্ত-সঞ্চালন, উপনীত হই আমরা চৈতন্যময় আত্মস্বরূপে। আর তখন সুরের মূর্ছনায় ও আনন্দের গভীর অনুভূতিতে লাভ করি আমরা সেই দিব্যদৃষ্টি যা প্রত্যক্ষ করে অনিত্যের অন্তরালে নিত্যকে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই উপলব্ধি ও তার উৎস ও উপলক্ষের সঙ্গে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে উপনিষদের ঋষিদের উপলব্ধি ও তা লাভ করার পন্থা-প্রকরণের।

উপসংহারে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গটির আর একটু তথ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক আলোচনা বোধ হয় সমীচীন হবে।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিমূলে রয়েছে যে তত্ত্বত্রয়, তা হলো ঃ (১) আত্মার অমরত্ববাদ (২) জন্মান্তরবাদ এবং (৩) অদ্বৈতবাদ। এর মধ্যে প্রথম তত্ত্ব দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। একটি অপরটির

অনুসিদ্ধান্ত। ভারতের সনাতন ধর্মীয় ধারণার কেন্দ্রে রয়েছে আত্মার অবিনাশিতা ও তার পুনর্জন্ম—এই যুগ্ম তত্ত্ব। বলতে গেলে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র এই আত্মার অমরত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত জন্মান্তরবাদ। বৌদ্ধধর্মেরও এটি মূল তত্ত্ব। গীতা ও উপনিষদের বিবিধ শ্লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ। আত্মার জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করার সঙ্গে জীর্ণবাস বর্জন করে মানবের নববস্ত্র পরিধানের উপমাটি তার মধ্যে সর্বজনপরিচিত (গীতা ২।২২)। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে জীবের 'মৃত্যু' না বলে বলা হয়েছে 'দেহান্তর প্রাপ্তি'। আলোচ্য প্রসঙ্গে এটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। অন্যত্র উক্ত হয়েছে—এই নশ্বর দেহে আত্মা অবিনশ্বর; দেহের লয় হলেও আত্মার বিনাশ হয় না—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" (গীতা ২।২০)

ওয়ার্ডসওয়ার্থের আত্মার অমরত্ব-প্রতিপাদক বিখ্যাত 'ইমমর্টালিটি ওড' কবিতায় এই তত্ত্বটি উপস্থাপিত হয়েছে অনন্য ব্যঞ্জনায়ঃ

"Our birth is but a sleep and a forgetting ;
The Soul that rises with us, our life's Star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar."

(lines 58-61)

—আমাদের জন্মগ্রহণ যেন এক নিদ্রা ও বিস্মৃতি। আমাদের জীবন-তারকারূপে যে আত্মা উদিত হয় আমাদের জন্ম-লগ্নে, ভিন্ন পরিমণ্ডলে ছিল তার অবস্থান। সে আসে সুদূর এক লোক থেকে।

এরপর আসা যাক উপনিষদ্ ও গীতার মূল উপপাদ্য—'অদ্বৈতবাদ'-এ। ঈশ্বরই সর্বত্র রয়েছেন। একমাত্র তিনিই আছেন সর্বত্র। ঈশোপনিষদের বহুজনবিদিত প্রথম মন্ত্রটিতে বলা হচ্ছেঃ

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

—ব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু অনিত্য বস্তু আছে তার সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। এর প্রতিধ্বনি পাই গীতার শ্লোকেঃ "বাসুদেবঃ সর্বমিতি।" (গীতা ৭।১৯)। বাসুদেবই সব।

'টিনটার্ন অ্যাবি' কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশ্ব-পরিব্যাপী এক পরমসত্তার উপলব্ধি বিবৃত হয়েছে এক অনবদ্য প্রাঞ্জলতায়ঃ

"And I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man ;
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things".

(lines 93-102)

—আমি অনুভব করেছি এক সত্তার অবস্থিতি যা আমাকে এক মহাভাবের আনন্দে আলোড়িত করে। আমি লাভ করেছি সর্বত্র-সঞ্চরমান সেই সার্বভৌম সত্তার ধারণা যার অবস্থান যুগপৎ সূর্যাস্তের আলোকে, দিগন্তবিস্তারী সমুদ্রে, জীবন্ত বাতাসে, সুনীল আকাশে এবং মানুষের অন্তঃকরণে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি এক গতিময় চৈতন্য—যা প্রাণিত করে সকল ধ্যান-ধারণার বিষয়বস্তুকে এবং যা সদা-প্রবহমান বিশ্বচরাচরের আদ্যন্তে।

ইংরেজী সাহিত্যে এই দৃষ্টি Pantheism নামে আখ্যাত। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই দৃষ্টি—যার ফলে বহুর মধ্যে সেই পরম এককে প্রত্যক্ষ করা যায়—বেদান্তের অদ্বৈত-দর্শনেরও ফলশ্রুতি। এই দৃষ্টি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লাভ করেছেন উপনিষদের ঋষিদের অনুসৃত নিসর্গ-অনুধ্যানের মাধ্যমে।

যৎকিঞ্চিৎ

শিক্ষা ও সত্য

স্বামী গোপেশানন্দ

সুশীল বড় সুবোধ। কারো গুণ বই দোষ দেখে না। সভার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা নিদ্রাযোগান্তে বিরাট হাঁ-মুখে ততোধিক বিরাট হাই তুলে কম বেশি বত্রিশটি দন্ত বিকশিত করে আমাকে বললে ঃ "কি সুন্দর আপনার বক্তৃতা। সকলে গলে জল হয়ে গেছে।" সুশীলের বিশ্বাস নিষ্কামভাবে মিথ্যা কথা বলা কর্মযোগতুল্য। কেন যে এখনও তার ঈশ্বর-দর্শন হচ্ছে না—সেটা বোঝা দুষ্কর।

এই সুশীলও নিশ্চয় ছেলেবেলায় পড়েছিল—"সদা সত্য কথা বলিবে।" লেখকের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল কিনা বলা সুকঠিন। কিন্তু তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাচ্চা বয়সে যাঁকে আমরা ইংরেজীতে বলতাম—গড মুন লার্নিং ওশন্। যতটুকু মনে আসছে—যারা ঠিক ঠিক পড়তে ও বানান ঠিক করে লিখতে পারত তারা শিক্ষক মহাশয়ের শ্রীহস্তের বেত থেকে বঞ্চিত হতো এবং পরীক্ষায় মোটা অঙ্কের নম্বর পেত। সত্য কথা বলার জন্যে নম্বর দেবার স্থান তখন প্রগ্রেস রিপোর্টে ছিল না। বোধ করি সে-ধারা এখনও বর্তমান। লেখা ও পড়ার জন্যে পরিশ্রম করতে হতো। কারণ, "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই।" সুতরাং পড়, আরো পড়।

শিক্ষা কাকে বলে এ-নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এমনও লোক আছেন যাঁরা বলেন, ছলে বলে কৌশলে কার্যসিদ্ধি করাই প্রকৃত শিক্ষা। আর তাঁরাই নাকি জীবনে কৃতকার্য। তাঁদের মতে তখনই শুধু সত্য কথা বলা উচিত, যখন অন্যকে ফাঁসিয়ে নিজেকে বাঁচানো যায়। সত্য বলে নিজের গলায় ফাঁস পরতে কোন্ মূর্খ চায়? যে চায় সে পাগলা-গারদে যায়। পরম পূজনীয় পিতৃদেবের সত্যরক্ষার জন্যে রঘুপতি রামচন্দ্রের হলো বনবাস। এই ঘটনা সত্য কিনা তা নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু খবরের কাগজে হামেশাই দেখা যায় সত্য আচরণের জন্যে এখানে ওখানে মানুষকে হয় ভিটেমাটি ত্যাগ করতে হচ্ছে, না-হয় তার ধোপা-নাপিত বন্ধ হচ্ছে। খবরের কাগজের কথা অবশ্য বেদবাক্য নয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম—"হাতির পেটে মানুষের বাচ্চা হয়েছে।" কেউ কোথাও তা দেখেছে কিনা জানা নেই। যদি কেউ তা দেখে থাকে তবে তা ঐ খবরের কাগজে। রঘুবীরের পরমভক্ত ক্ষুদিরামকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। এ-ঘটনা তো মিথ্যে নয়। সত্যরক্ষার পুরস্কার যদি এই হয়, তাহলে সত্যকে ধরে রাখবার কোন অর্থ আছে কি? এর জন্যেই তো মিথ্যা মহামারির মতো চারদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনারা বলতে পারেন—সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যেই ক্ষুদিরামের কোল আলো করে সত্যের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। ঘটনা ওরকম ঘটে থাকলেও অবতাররা তো ঘন ঘন আসেন না। তাঁরা তো 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' এ হেন অবস্থায় সত্যরক্ষার আর কি কোন দরকার আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ কলিযুগের তপস্যা হলো সত্যরক্ষা করা। তপস্যা অথবা মহাতপস্যা যাই বলা হোক না কেন, এই তপস্যা কি জন্যে? সিদ্ধান্ত যদি এমন হয় যে, জীবনের উদ্দেশ্য হলো ভগবান লাভ এবং তার উপায় হচ্ছে সত্যরক্ষা করা, তাহলে যাঁরা হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝেছেন শুধু তাঁদের পক্ষেই সত্যরক্ষা করা সম্ভব। অন্যদের পক্ষে নৈব নৈব চ। এই সত্যরক্ষা করাই কি শিক্ষা?

এ-বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলীর কিছু অংশ আপনারা আবার পড়ুন ঃ

"মা, আপনার মতে আমাদের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের জন্য এত খরচ করিতেছেন—দুই-বেলা গাড়ি করিয়া স্কুলে পাঠাইতেছেন এবং পুনরায় বাড়ি ফিরাইয়া আনিতেছেন—দিনে ৪।৫ বার করিয়া আমাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতেছেন—বস্ত্র পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত রাখিতেছেন—দাসদাসী নিযুক্ত করিতেছেন—আমি ভাবি এত কষ্ট এত পরিশ্রম, এত ক্লেশ আমাদের জন্য কেন? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

ছাত্রজীবন শেষ করিলে আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রবেশ করিয়া সারাজীবন গাধার ন্যায় অবিশ্রান্ত ভাবে খাটিতে হইবে এবং তৎপরে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। মা, আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রের কোন্ বিভাগে দেখিলে আপনি সর্বাপেক্ষা সুখী হইবেন? বড় হইলে আমাদিগকে কোন্ কার্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন—জানি না আপনার মনে ইচ্ছা কি। মা, জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার কিংবা অন্য কোনও বড় হাকিমের গদিতে বসিলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—ধনকুবের বলিয়া সংসারী লোকের দ্বারা পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে—প্রচুর ধনশালী, গাড়ি, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা ম্ভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে, না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা 'প্রকৃত মানুষ' বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানি না। আপনার পুত্রকে কিরূপ দেখিলে আপনার সর্বাধিক আনন্দ হইবে—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।…

"মা, ভাবিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়, ভাবিলে মর্মাহত হইতে হয়—যিনি আমাদের জন্য এত করিতেছেন, যিনি কি সম্পদে বিপদে, কি গৃহে কি অরণ্যে, সর্বদাই আমাদের বন্ধু, যিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া আছেন—যিনি আমাদের এত নিকটে আছেন—যিনি আমাদের খুব আপনারই জিনিস, আমরা তাঁহাকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকি না। আমরা সংসারের ছারবস্তু লইয়া কত অশ্রুত্যাগ করি কিন্তু একবারও তাঁহার উদ্দেশে একবিন্দুও অশ্রু ফেলি না—মা, আমরা যে পশু অপেক্ষাও অকৃতজ্ঞ ও কঠিনহৃদয়। ধিক্ সেই শিক্ষা—যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই—নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। লোকে তৃষ্ণার্ত হইলে পুষ্করিণী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মেটে? কখনই না—মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ঃ ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"

"লেখা পড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব? কখনই না। আর যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন হইয়া চলিতে পারে এবং ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকে বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়—প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান।…

"আমরা বৃথা 'ধন' 'ধন' বলিয়া হাহাকার করি, একবারও ভাবি না, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ-প্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই তো ধনী। তাহার তুলনায় মহারাজাধিরাজরাও দীন ভিখারী। এরূপ অমূল্যধন হারাইয়াও আমরা যে জীবিত আছি—ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়

"আমরা 'পরীক্ষা আসিতেছে' বলিয়া ব্যস্ত হই, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্মের নিকট। লেখাপড়ার পরীক্ষা তো সামান্য পরীক্ষা—তাহা দুইদিনের জন্য। কিন্তু সে-সব পরীক্ষা অনন্তকালের জন্য। তাহার ফল জন্মে জন্মে ভোগ করিতে হইবে।"

আপনারা বলতে পারেন সুভাষচন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ে ধারণা স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে পাওয়া। কথাটা সত্য হলেও বিচার বিবেচনা না করে তিনি স্বামীজীর কথা গ্রহণ করেছিলেন—এমন কথা ত্রিভুবনে কেউ বলবেন না। এমনকি খবরের কাগজেও সে-খবর পাওয়া যাবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীজীর শিক্ষা বিষয়ে ধারণা কার কাছ থেকে পাওয়া? শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। তবে স্বামীজীও নির্বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা গ্রহণ করেননি। যাচাই করে তবে গ্রহণ করেছিলেন। সেকথা সকলেই জানেন। আবার প্রশ্ন হতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা বিষয়ে ধারণা কোথা থেকে পেলেন? তিনি পেয়েছেন তাঁর উপলব্ধি থেকে। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। তিনি ছিলেন স্বয়ং সত্যস্বরূপ। তাই তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারলেও সত্যকে ত্যাগ করতে পারেননি। যিনি সত্যকে ধরে রাখেন তিনি সত্যই হয়ে যান। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছিলেন

একটু চেষ্টা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জীবনে একটা কিছু ধরতে হয়, কোনও একজনকে ধরতে হয়, কিংবা কোনও একটা বিশ্বাসকে। একটা আলো, যা আমাদের পথকে আলোকিত করবে। জীবনের শূন্যতা ভরে দেবে। যখন দিশা হারাব তখন এসে হাত ধরবেন। কি সেই বিশ্বাস! কার সেই হাত! মানুষের! বিশ্বাস! সে কি ভগবৎ-বিশ্বাস! মানুষ জীবনে প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক কিছু ধরতে ছোটে অনেক সময়। বাল্যে ছুটেছি লোভের পেছনে, যৌবনে ভোগের পেছনে, বার্ধক্যে হতাশা এসে হাত ধরেছে। তখন সেই করুণ সঙ্গীত—জীবন আমার বিফলে গেল, লাগিল না কোনও কাজে।

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে এই ভাবেই ভেসে চলেছে শত-সহস্র জীবন। মাঝে মাঝে খোঁচা মারছে প্রশ্ন, কেন এলুম, কি করতেই বা এলুম, এখানের পাট চুকিয়ে যাবই বা কোথায়! মানুষের শেষটা কি? প্রশ্ন আসে কিন্তু দাঁড়াবার জমি পায় না। প্রাত্যহিকতায় ভেসে চলে যায়। আমরা দুই আর দুইয়ে চার, সাত আর দুইয়ে নয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। চাকরি, প্রোমোশান, ছেলের এডুকেশান, মেয়ের বিয়ে, বাতের ব্যথা, তিন কামরার ফ্ল্যাট, ইনকাম ট্যাক্স, ওয়ার্ল্ড কাপ, এইসব নিয়ে এমন মেতে যাই, কোনও কিছুই আর খেয়াল থাকে না। হয়তো পুরীতে গেলাম। ফিরে এসে প্রভু জগন্নাথের কথা না বলে, বলতে থাকি ভোগের কথা, মহাপ্রসাদের কথা। গেলাম দেওঘর, সাতকাহন করে শুরু করলাম প্যাঁড়ার সমালোচনা, আগে কি ছিল, এখন কি হয়েছে!

যে ভেবেছিল, পৃথিবীতে টাকাটাই বুঝি সব, গাড়ি, বাড়ি, মোটা ব্যাংক ব্যালান্স হয়ে যাবার পর দেখলে, নাঃ, কি যেন একটা নেই, শান্তি। কি যেন একটা নেই, বৈচিত্র্য! সেই একদিন, একরাত। মনে হতে থাকে, বড় নিঃসঙ্গ আমি। মনে হয়, সবই আছে, নেই প্রেম। নিঃস্বার্থ ভালবাসার বড়ই অভাব, সর্বত্র দেহি, দেহি। চারপাশে যারা আছে তারা সকলেই উমেদার। সংসারে যতক্ষণ দিতে পারা যায় ততক্ষণই খাতির। স্বার্থের সুতোয় টান পড়লেই সব মুখোশ খুলে যায়, স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। এই উপলব্ধি থেকেই আসে হাহাকার—'আমি কোথায় পাবো তারে?' কারে? যে আমাকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে পারে। এই হাহাকারই দেয় সেই বোধ—ওরে আমি বদ্ধজীব! অষ্টপাশ আমায় বেঁধেছে।

ওই ভাবনাটুকুই সার। কারণ ঠাকুর সংসারী জীবের ধরনধারণ খুব ভাল বুঝতেন। এই ব্যাপারে তাঁর সুন্দর সেই গল্প, "উট কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটাঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধল, গয়না পরল। এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়েও হয়। মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

"আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয় তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।"

এই 'সাপের ছুঁচো গেলা' সংসারীদের তাহলে কি হবে! যারা বুঝেছে অথচ বেরোতে পারছে না। দেহে বেরনোর প্রশ্নই আসছে না। লাইন দিয়ে পাড়াকে পাড়া সব সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, "এমন দিন কি হবে মা তারা!" মনে বেরনো। মনে মুক্ত হওয়া। মনটাকে বের করে আনা। বের করে এনে সঁপে দেওয়া। তাঁর হাতে। তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী, তুমি যেমন করাও তেমনি করি। আমি জানি, ঠাকুর বলে গেছেন: "বদ্ধজীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে আনা হয়, ভাল জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে

ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহলে মরে যাবে।”

আমি তাহলে কাকে ধরব? ঠাকুরকেই ধরব। ঈশ্বর অনেক দূরে। আমার সেই পদ্মলোচন পণ্ডিতের অবস্থা। বিচারসভায় বিচার হচ্ছে—শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচনকে প্রশ্ন করলেন পণ্ডিতরা। ঠাকুর বলছেন ঃ “পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বললে, আমার চৌদ্দ পুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।” আমারও সেই একই অবস্থা, আমি ঈশ্বরের কথা শুনেছি, দেখিনি কোনও দিন। আমার মতো অপদার্থকে দেখা দেবেনও না কোনদিন। এই সৃষ্টি কার, তাও জানি না। বিজ্ঞান বলে এক, পরাবিজ্ঞান বলে আর এক। এইটুকু বুঝি, জীবন জ্বলছে, পুড়ছে। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধিতে ধামসাচ্ছে। যত মার খাচ্ছি ততই সরে আসছি আমার করুণাময় ঠাকুরের দিকে। দেরি হয়ে গেছে ঠিকই, তবু এখনও সময় আছে। চীনা প্রবাদে বলে, সুপুত্রের পরিচয় মেলে পিতার প্রয়াণের পর। তখন দেখতে হয়, সে পিতার পথ কতটা ধরে রাখতে পারছে। আমিও সেই সুপুত্র হতে চাই। ঠাকুরের পথ ধরে। সহসা সরব না। শত প্রলোভনেও না। তিনি আমাকে দিয়েছেন বিশ্বাস। তিনি আমাকে পূর্ব ও পরজন্মের বিশ্বাস দিয়েছেন। চুলোয় যাক বিজ্ঞান। ঠাকুর বলছেন, “পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শবসাধনা করছিল; গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগল। শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে নেমে এসে, আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতে করতে মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বললেন—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে—মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি। যে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না। আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন আমার উপর এত কৃপা হল! ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে।”

জন্মান্তরে বিশ্বাস ঠাকুরই আমাকে দিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসেই এজন্মের বেচাল আমার নিয়ন্ত্রিত। যতটা পারা যায় নিজেকে সৎ রাখা, বিষয়-বিমুখ করে রাখা, সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইষ্ট থেকে মন যেন না সরে যায়! এ-জন্মে না পাই, পরের জন্মে, পরের জন্মে না হলে তার পরের জন্ম। কোনও এক জন্মে পাব নিশ্চয়। ঠাকুর বলেছেন ঃ “বাঘ যেমন কপকপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি অনুরাগের বাঘ কাম-ক্রোধ এইসব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না।” এ-জীবনে অনুরাগটাও যদি হয়। ঠাকুর বলেছিলেন ঃ “যারা কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে—ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বদ্ধজীব। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবে? যেমন কাকে ঠোক্‌রানো আম ঠাকুর-সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ।”

কাকে ঠোক্‌রানো আম তিনি অপছন্দ করতেন। আমাকে যাতে কাম-কাঞ্চনে না ঠোকরায়, সতর্ক হবার চেষ্টা করতে হবে আপ্রাণ। “সংসারী জীব, এরা যেমন গুটিপোকা।” আমি সেই গুটিপোকা হব না। ঠাকুর বলেছেন ঃ “মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আসতে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু।” না গুটিপোকার মৃত্যু আমার কাম্য নয়। “যারা মুক্ত জীব, তারা কামিনীকাঞ্চনের বশ নয়। কোন কোন গুটিপোকা অত যত্নের গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু দু-একটা।” সেই দু-একটার একটাও কি আমি হতে পারব না!

কিভাবে! “একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়িতে কেবল বিষয়ের কথা। পাখি দাঁড়ে বসে রাম-রাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করবে।” আমাকে যেমন করেই হোক দাঁড়ে বসতে হবে। “এই দেহমন্দির অন্ধকার রাখতে নেই। জ্ঞানদীপ জেলে দিতে হয়।” সেই দীপ জ্বালাবার চেষ্টা করতে হবে। জীবনটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবার আগে অনুরাগের আঠা মাখাতে হবে। ধরব তাঁকে, যিনি আমার হাত কোনও দিন ছাড়বেন না। তিনি কে? আমার অটল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের ফোয়ারা কে খুলবেন? আমার ঠাকুর।

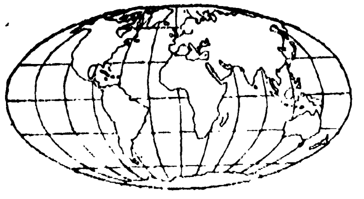

বাতায়ন

জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নে 'মেইজি' শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার (Meiji Restoration) আগে, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক যুগে, বিভিন্ন শিক্ষণসংস্থা বিভিন্ন শ্রেণীর চাহিদা পূরণ করত। প্রাদেশিক শাসকগণ সামন্তশ্রেণীর সন্তানদের জন্য স্কুল স্থাপন করত, আর গ্রামীণ লোকেরা ধনী ব্যবসাদার বা ধনী কৃষকসম্প্রদায়ের জন্য স্কুল চালাত। শহরে 'টেরাকয়া' নামে এক ধরনের স্কুল ছিল যেখানে সাধারণ ঘরের ছেলেদের লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো হতো। মেইজি রেস্টোরেশনের পর শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক শিক্ষার ধারা প্রবর্তিত হয়, যার ফলে সারা দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যেক শিশুকে ৩ বা ৪ বৎসরের জন্য স্কুলে যেতে হতো। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৬ বৎসরের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, এখনকার মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলশিক্ষা ৯ বৎসরের করা হল। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী দুইটি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ঃ শিক্ষার মৌলিক আইন, এবং স্কুল-শিক্ষার আইন। জাপানে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, শান্তিকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আত্মনির্ভরশীল নাগরিক তৈরি করা. যাদের মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে এবং সত্য ও শান্তির প্রতি ভালবাসা থাকবে। মৌলিক আইনের আর একটি মূল নীতি হলো যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের শিক্ষার সমান সুযোগ থাকবে। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে শিক্ষাসুযোগের বাছবিচার করা আইনবিরুদ্ধ। রাজনৈতিক জ্ঞান ও ধর্মীয় সহনশীলতার উপর আইনে জোর দেওয়া হয়, কিন্তু রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দলের সঙ্গে শিক্ষার যোগ সক্রিয় আইনবিরুদ্ধ। আইনে সমাজশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়, যার ফলে রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে লাইব্রেরী, মিউজিয়াম প্রভৃতি স্থাপিত করতে প্রণোদিত করে।

জাপানে শিক্ষাব্যবস্থাকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়ঃ কিন্ডারগার্টেন (১-৩ বৎসর), প্রাথমিক স্কুল (৬ বৎসর), নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল (৩ বৎসর), উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল (সাধারণতঃ ৩ বৎসর) এবং ইউনিভার্সিটি (সাধারণ ৩-৪ বৎসর) এ ছাড়া দুই বৎসরের জুনিয়র কলেজ আছে ও অনেক ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নয় বৎসরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক, এবং এই সুযোগ ৬ হতে ৯ বৎসরের বালক-বালিকাদের প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে ৯৯.৯৮ শতাংশকে বিভিন্ন স্কুলে পাওয়া যাবে। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেছে যে, কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ৭৩·৭ শতাংশ নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের ৭৫.৬ শতাংশ, এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ২৮·৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বেসরকারি স্কুলে পড়ে।

জাপানে শিক্ষার পরিচালন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত। শিক্ষণমন্ত্রণালয়ের কাজ হলো সমন্বয় সাধন করা। স্কুলের আয়ব্যয়ের পরিকল্পনা, শিক্ষণকর্মসূচী, স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডের উপর ন্যস্ত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সদস্যগণকে নির্বাচিত করেন। শিক্ষার বিষয় কি কি হবে, স্কুলগুলি নিজেরাই শিক্ষণমন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট 'কোর্স অফ স্টাডি'র সঙ্গে সমন্বয় রেখে তা ঠিক করে। মন্ত্রণালয় যেসব বই অনুমোদন করে স্থানীয় স্কুল কর্তৃপক্ষ তা থেকে তাদের স্কুলের বই নির্বাচিত করে।*

---

* **JAPAN CALLING, MAY 1988**

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

অল্পবয়সী ডায়াবেটিস রোগী

ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত

দেশবিশেষে তফাৎ থাকলেও ডায়াবেটিস (বহুমূত্র রোগ—Diabetes mellitus—ডায়াবেটিস মেলিটাস) রোগীর সংখ্যা সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান। অধিকাংশের ক্ষেত্রে রোগলক্ষণ প্রকাশ ত্রিশোর্ধ্বে হলেও শতকরা ২-৩ জনের ক্ষেত্রে একুশ বৎসরের আগেই এই রোগ দেখা যায়। অল্প বয়সে ডায়াবেটিস রোগের (জুভেনাইল ডায়াবেটিস—Juvenile diabetes) আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রায় কয়েক লক্ষ। আমেরিকায় মূলকেন্দ্র স্থাপন করে 'জুভেনাইল ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশন' কোটি কোটি ডলার খরচ করে এদের জন্য গবেষণা চালাচ্ছেন। আমরা কিন্তু ব্যবহারিকভাবে তার সুফল এখনও পাইনি। তবে ভবিষ্যতে কি হয় দেখা যাক।

আমাদের উদরে প্যাংক্রিয়াস (Pancreas—অগ্ন্যাশয়) নামে একটি গ্ল্যান্ড (Gland) বা গ্রন্থি আছে, যার বিশেষ ধরনের দেহকোষ (বি-সেল, B-cell) হতে ইনসুলিন (Insulin) নামক একটি গ্রন্থিরস নির্গত হয়। আমরা যে শর্করা জাতীয় খাদ্য (Carbohydrate) খাই, তা অন্ত্রে চূর্ণিত হয়ে গ্লুকোজ (Glucose) আকারে রক্তে প্রবেশ করে। ইনসুলিনের সাহায্যে শরীরের দেহকোষগুলি গ্লুকোজকে হজম করে নিজেদের পুষ্টি সাধন করে। ইনসুলিনের অভাব হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে (Hyperglycaemia) গিয়ে ডায়াবেটিস রোগের সৃষ্টি করে। আমাদের শরীরে অনেক গ্ল্যান্ড আছে, যাদের প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের গ্ল্যান্ড তার গ্রন্থিরস নালী পথের (duct) মাধ্যমে পাঠায়, যেমন স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড (salivary gland) যার গ্রন্থিরস হচ্ছে লালা। অন্যধরনের গ্ল্যান্ড, এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড (endocrine gland) যাদের কোন নালীপথ নাই বলে তাদের গ্রন্থিরস সোজাসুজি রক্তপ্রণালীতে ঢেলে দেয়, যেমন থাইরয়েড, পিটুইটারি, প্যাংক্রিয়াস প্রভৃতি। প্যাংক্রিয়াসে বি-সেল (B-cell) নামক একরকম দেহকোষ আছে, যেগুলি হতে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডের বৈকল্য জনিত যতরকমের অসুখ আছে, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস-ই প্রধান। এই রোগে রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্রাবে গ্লুকোজ বের হয়, তৃষ্ণা বাড়ে, শরীর কৃশ হয় এবং কিছুদিন এইভাবে চললে অন্যান্য নানা উপসর্গের (complications) সৃষ্টি হয়। রক্ত পরীক্ষা করলে (বিশেষতঃ ভাত খাওয়ার দুঘণ্টা পরে) রোগ ধরা পড়ে। সাধারণভাবে এই রোগ সম্বন্ধে উদ্বোধনে (৭৭তম বর্ষ, পৃঃ ২৩৪) আলোচনা হয়ে গেছে। বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় জুভেনাইল ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ যেমন ধীরে ধীরে আসে, জুভেনাইল ডায়াবেটিস-এর রোগলক্ষণ তাড়াতাড়ি দেখা যায়; শরৎ ও শীতকালে এই রোগ প্রকাশের সম্ভাবনা বেশি। দেহকোষগুলির (প্যাংক্রিয়াসের পূর্বোক্ত বি-কোষগুলিরও) গায়ে একরকমের প্রোটিন আছে যাদের বলা হয় এইচ. এল. এ. (H. L. A. or Human Leukocyte Antigen)। রক্ত পরীক্ষা করে যেমন বিভিন্ন লোকের রক্তকে 'এ' 'বি' 'এ বি' এবং 'ও' (A, B, A B & O)-তে ভাগ করা যায়, তেমনি দেহকোষের এইচ. এল. এ. দ্বারাও দেহকোষকে এ, বি, সি, ডি (A, B, C, D)-তে ভাগ করা যায়। বি-কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ইনসুলিন নিঃসরণ কমে যায় ও ডায়াবেটিস হয়। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে এ, বি, সি, ডি,-র বিভিন্নতা আছে। আমাদের দেশেও দিল্লী ত্রিবান্দ্রম ও কলকাতার ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এইচ. এল. এ ধারক বি-কোষে ক্ষতের পরিমাণ সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে যার সঙ্গে লেখকও যুক্ত ছিলেন। ডায়াবেটিস মেলিটাস

রোগীদের চেয়ে জুভেনাইল ডায়াবেটিস রোগীদের 'বি' এবং 'ডি' এইচ. এল. এ-র পরিমাণ বেশি। এর ফলে পূর্বোক্ত রোগে যেমন পুরুষানুক্রমে রোগ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, শেষোক্তদের ক্ষেত্রে সেরূপ পাওয়া যায় না। যমজ-সন্তানদের একজনের ডায়াবেটিস মেলিটাস হলে, অন্যেরও সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু তাদের একজনের জুভেনাইল ডায়াবেটিস হলে, অন্যের হবার সম্ভাবনা পঞ্চাশ শতাংশ মাত্র। বি-কোষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা ঠিক জানা নেই। তবে জুভেনাইল ডায়াবেটিস, ভাইরাস আক্রমণের ফলে হওয়ার খুব সম্ভাবনা। খাদ্যবৈগুণ্যেও ডায়াবেটিস হওয়া সম্ভব।

রক্তে 'সুগার' (গ্লুকোজ্) বৃদ্ধি, প্রস্রাবের সহিত 'সুগার' নির্গমন, ওজন হ্রাস, মূত্রাধিক্য, অতিরিক্ত পিপাসা, ক্ষুধা ইত্যাদি আরম্ভে দেখা দিয়ে ক্রমে চোখ, বৃক্ক (কিডনি), হার্ট, সবরকম স্নায়ু (নার্ভ) ইত্যাদি কিছুটা বিকল হয় এবং সেক্ষেত্রে জীবাণু আক্রমণ ও 'কিটোসিস' (ডায়াবেটিক কোমা) হবার সমধিক সম্ভাবনা। জুভেনাইল ডায়াবেটিস—চিকিৎসাধারা প্রণিধানযোগ্য। চিকিৎসার অত্যুৎসাহে খাদ্যবস্তুর অস্বাভাবিক হ্রাস করলে অন্যান্য শারীরিক বিকলতা দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় 'ক্যালরী', শর্করা-স্নেহ-প্রোটিনের সমতা এবং ভিটামিন-খনিজপদার্থ-জলের বিধিমত প্রতুলতা আবশ্যক। বয়স্ক ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় 'সুগার' কমানোর ট্যাবলেট আকারে যেসব ঔষধ খাওয়ানো হয়—অল্পবয়সী ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সেগুলি অকার্যকরী। এদের সর্বদাই ইনসুলিন ইঞ্জেক্শন্ প্রয়োজন। মেয়েদের প্রসবাবস্থায় শিশু এবং মা উভয়ের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই দীর্ঘস্থায়ী রোগ এমন সময় দেখা দেয়, যখন শরীর ও মন উভয়ই গঠনমুখী এবং রোগকে মেনে নিতে রোগীর সচল অর্থাৎ পসিটিভ (*positive*) মনোবৃত্তি আবশ্যক। চিকিৎসক-অভিভাবক-পরামর্শদাতারা সেটা গড়ে দিতে পারেন না। পারস্পরিক মিলন ও প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যে শিবির-জীবন বা ক্যাম্প-লাইফ-এর ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি ছয় থেকে একুশ বছরের আঠাশ জন ডায়াবেটিস ছেলে-মেয়ের সিমলা পাহাড়ে সাত দিন শিবির-জীবন আয়োজিত হয়েছিল। উদ্যোগীরা অনুধাবন করে বলেছেন, "সঠিক কর্মসূচী থাকলে শিবির-জীবন অল্পবয়সী ডায়াবেটিস রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।"

শিবির-জীবনের উদ্দেশ্য ঃ অভিজ্ঞ সহায়ক ও চিকিৎসকের উপস্থিতিতে (১) রোগের উৎস, লক্ষণ, সমস্যাগুলির স্ব-আনুভূতিক পারস্পরিক আলোচনা (২) ডায়াবেটিক-খাদ্যবিষয়ক ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন (৩) ইনসুলিন ইঞ্জেক্শন্ নিজ শরীরে প্রয়োগ ও তার মাত্রাপরিবর্তন—আবশ্যকতার উপলব্ধি। (৪) বহির্ভ্রমণ ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদান। (৫) স্বাস্থ্যরক্ষার সারনীতির আলোচনা এবং প্রয়োগ। (৬) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি। সময়ভিত্তিক এই শিবির-জীবন চলাকালীন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অভিভাবক ও অন্য সুস্থ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ থাকবে।

যে অল্পবয়সী ডায়াবেটিস রোগীরা পরবর্তী জীবনে ব্যবহারিকক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই চিকিৎসক-অভিভাবক ছাড়াও পারস্পরিক ও প্রকৃতির উপর আস্থাশীল নির্ভরতা ছিল। শরীর ও মনের গঠনের দিকে নজর না দিয়ে কেবলমাত্র পুঁথিগত চিকিৎসায় এই সব ডায়াবেটিস রোগীর সাধারণ জীবনযাপন (Normal life, despite diabetes—WHO) সম্ভব নয়। গবেষণার ধারা যেভাবে এগোচ্ছে বয়স্ক-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও, অদূর ভবিষ্যতে অল্পবয়সী ডায়াবেটিস রোগ-দূরীকরণ হয়তো সম্ভব হবে। তবে সকলের দেখা উচিত যাতে রোগাক্রান্তদের মধ্যে কোনরকম হীনম্মন্যতা বোধ না আসে।

গ্রন্থ পরিচয়

গীতা-আলোচনায় নতুন সংযোজন

হরিপদ চক্রবর্তী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। স্বামী সত্যানন্দ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬। মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা।

গীতা হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। গীতা বেদের সার। তাই হিন্দুদের কাছে এই গ্রন্থের মর্যাদা সর্বাধিক। হিন্দু তথা সনাতন ধর্মে গীতার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অসাধারণ। হিন্দুধর্মে প্রচলিত প্রায় প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতবাদ ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রাদির যে ব্যাখ্যা-ভাষ্য করতেন, তার মধ্যে প্রস্থানত্রয়ের (উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র) স্থান ছিল সর্বোচ্চ। সেজন্য শঙ্করাদি বিভিন্ন আচার্য উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর সম্বন্ধ কি—এ-নিয়ে বিচার বিতর্ক করে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, পরিণামবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদগুলি সৃষ্টি হয়েছে। এর সূত্র ধরে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ একটি বিরাট গীতাভাষ্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, আনন্দগিরি, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখের গীতার উপর ভাষ্য-টীকা-টীপ্পনী সুপরিচিত। এগুলি সাম্প্রদায়িক ভাষ্য। পরবর্তী কালে অসাম্প্রদায়িক আলোচনা, ব্যাখ্যা বা ভাষ্যও অনেকে করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম স্বামী বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী।

যে-বিষয়গুলির ত্রিকাল সত্তা আছে অর্থাৎ সব যুগেই যার প্রাসঙ্গিকতা অটুট—তার মধ্যে আত্মতত্ত্ব প্রধান। আত্মার স্বরূপ কি, দেহের সঙ্গে দেহীর সম্বন্ধ কি প্রকার ইত্যাদি প্রশ্নের বিচারই মুখ্যতঃ আত্মতত্ত্বের বিষয়। গীতার মধ্যে সেই আত্মতত্ত্বকে কিভাবে উপলব্ধি করা যায় তার কথা বলা হয়েছে। দেহ, দেহী বা আত্মার সঙ্গে সমাজ ও জগতের যে সম্বন্ধ, সেই সূত্রে কর্তব্যকর্মের যে বৈচিত্র্য, জ্ঞানে, ধ্যানে, ভক্তিতে অর্থাৎ মানসিক সকল বৃত্তির প্রয়োগে তার যে উপলব্ধি সেটিই সংসার-জীবন। ঐহিক ও ও পারত্রিক দুদিকেই তার প্রয়াস। কাজেই তত্ত্বগতভাবে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে তার সঠিক উপলব্ধি লাভ করাই আসল উদ্দেশ্য। প্রিয়জনের মৃত্যুভাবনায় অর্জুনের যে আপাতনির্বেদ এসেছিল, প্রতিমুহূর্তে বিচিত্র ধর্মসঙ্কটে, প্রতিটি মানুষ জীবনের কুরুক্ষেত্রে তেমনি এক একজন অর্জুন হয়ে যায়। কি শ্রেয়, কি করা উচিত তা ভেবে মানুষ ব্যাকুল হয়ে পড়ে। অন্তর্যামী হৃষীকেশ এইসব দ্বিধাগ্রস্ত বিভিন্ন জীব-পার্থকে ডেকে বলেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'—হে পার্থ, ক্লীবতাকে আশ্রয় করো না। বলেন ঃ 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। বলেন ঃ 'মামেব শরণং ব্রজ'—আমার শরণ নাও। 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'—আমি সমস্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষা করব তোমাকে।

গীতা সর্বকালের সকল মানুষের শাস্ত্র, মানবধর্মগ্রন্থ। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানসিকতারও স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। সেইসব কারণে পরিবর্তিত মানসিকতারও পক্ষে গীতার আকর্ষণ ও গীতার বাণী প্রমাণ তো বটেই, বোধহয় সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক।

স্বামী সত্যানন্দ রচিত সমালোচ্য গ্রন্থটিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা গীতামুখে কথিত নানা তত্ত্বের নতুন ধরনের আলোচনা পাই। গীতা-আলোচনায় গ্রন্থটি একটি নতুন সংযোজন। আধুনিক পরিশীলিত বুদ্ধির পাঠকগণ এই গ্রন্থের মধ্যে একটি আলাদা স্বাদ পাবেন। গীতার বিদগ্ধ পাঠক ছাড়াও সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি পালন

গত ২৯ জানুয়ারি '৮৯ বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭তম আবির্ভাব-তিথি উৎসব পালিত হয়েছে। ঐদিন মঠে বহু ভক্তের সমাগম হয়। দুপুরে প্রায় পনের হাজার ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে স্বামী আত্মস্থানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ২৬ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে যুব-আলোচনাচক্র, শিক্ষাবিদ্‌দের আলোচনাচক্র, শারীরিক দক্ষতা প্রদর্শন, যাত্রা, যন্ত্রসঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৭ জানুয়ারি শিক্ষাবিদ্‌দের আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বামীজীর অবদান। ঐ আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। এই উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের উপর একটি প্রদর্শনী। ২৬ জানুয়ারি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ভারতীয় জীবনধারার বিভিন্ন দিকে স্বামীজীর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত তা এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে। স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী সিরামিকের তৈরি পুতুল ও চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার শিল্পের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব, কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজীর ধারণা কিভাবে কার্যকর হচ্ছে, শিক্ষা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম দিনগুলির কথা, বিভিন্ন কেন্দ্রের রামকৃষ্ণ মন্দিরের মডেল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া স্বামীজীর ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র, বই, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাঁর হাতেলেখা পাণ্ডুলিপিও প্রদর্শিত হয়। ঐদিন পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন যুব সম্মেলনের বিবরণ-গ্রন্থ' (রিপোর্ট) এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী লিখিত 'সাধ্য ও সাধনা' নামে একটি বাংলা বই প্রকাশ করেন।

হায়দ্রাবাদ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর শেষ পর্যায়ের উৎসব এবং জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে গত ১২ জানুয়ারি। এ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ রচনা, বিতর্ক, বক্তৃতা, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় পাঁচ হাজার যুব-প্রতিনিধি যুব-সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে।

১২ জানুয়ারি কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের একটি ইংরেজী রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

দিল্লী আশ্রমে গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন কেন্দ্রীয় যুব-কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট আলভা।

আগরতলা, আঁটপুর, বলরাম মন্দির, বারাসাত, ভুবনেশ্বর, চিঙ্গেলপত্তু, কোয়েম্বাটোর, দেওঘর, জয়রামবাটী, কালাডি, মাদুরাই, মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোম, মাদ্রাজ মিশন আশ্রম, পুরী মিশন, রাঁচি স্যানাটরিয়াম এবং সারগাছি আশ্রমেও অনুরূপ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বি. এসসি. পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর কলেজের চারজন ছাত্র অনার্সসহ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফিজিক্স-এ দুজন ছাত্র ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থান, কেমিস্ট্রীতে একজন ৩য় এবং স্ট্যাটিস্টিক্স-এ একজন ২য় স্থান লাভ করেছে।

গত ডিসেম্বর মাসে অরুণাচল প্রদেশের চ্যাংল্যাং-এ অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে নরোত্তমনগর বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ ঝঞ্ঝাত্রাণ ঃ গত ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের কালীতলা, গোবিন্দকাটি এবং যোগেশগঞ্জ অঞ্চলের ৫৪০৭টি পরিবারের মধ্যে ৩৮২৭টি পশমী কম্বল, ১৪৯টি তুলোর কম্বল, ৩৬৩৯টি শাড়ি, ৩৬০৭টি ধুতি, ৩৮২৬ সেট শিশুদের পোশাক এবং বিভিন্ন ধরনের ৪৩৩১টি পুরনো পোশাক গত মাসে বিতরণ করা হয়েছে। ৭০৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে ও ৮৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বই, কাগজ, পরীক্ষার ফি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যহ ১৬০জন শিশুকে দুধ (গুঁড়োদুধ থেকে তৈরি), চিনি ও বিস্কুট দেওয়া হয়েছে।

শিকড়া-কুলীনগ্রাম আশ্রমের মাধ্যমে বসিরহাট অঞ্চলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১০,০০০ শিশুদের পোশাক, ১০০টি পশমী কম্বল, ৩০২টি বিভিন্নরকম কাপড়-চোপড় বিতরণ করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর চিকিৎসাত্রাণ ঃ গত ১০ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে মকরসংক্রান্তি মেলায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা ও মনসাদ্বীপ আশ্রমের সহযোগিতায় চিকিৎসা-শিবির খোলা হয়েছিল। সেখানে বহির্বিভাগে ১০৩৩ জন রোগীর ও অন্তর্বিভাগে ২১জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। তাছাড়া দুঃস্থদের মধ্যে ২৫টি তুলোর কম্বল দেওয়া হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ ঃ রাজমুন্দ্রী আশ্রমের মাধ্যমে ঐ শহরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২৭২টি পরিবারের মধ্যে ৫৬০ কিলোঃ চাল, ৩০ কিলোঃ তেঁতুল ও ৩৮০ কিলোঃ তরিতরকারি বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন ঃ বিহারের মুঙ্গের জেলায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২৬টি ভূমিকম্প-প্রতিরোধক বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে।

শিকড়া-কুলীনগ্রাম আশ্রমের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে ১৩৩টি পরিবারকে তাদের ঝড়ে বিনষ্ট ঘরবাড়ি তৈরির জন্য 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কর্মসূচী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বাঁশ, টালি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ ঃ দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে নীলফামারী জেলার দিমালা মহকুমায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৩৭৪টি পরিবারের মধ্যে ৫৭৪টি শাড়ি এবং ৩৯৫টি লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া) ঃ গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবার স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। ২১ ও ২৮ জানুয়ারি 'মায়ের কথা'-র উপর আলোচনা হয়েছে। ১ জানুয়ারি নববর্ষ উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথির দিন সন্ধ্যায় পূজা, ভজন, স্তোত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানান্তে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিগীতি, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানান্তে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার ঃ গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ও ২৯ জানুয়ারি যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণীর উপর আলোচনা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার পাতঞ্জল-যোগসূত্র এবং প্রতি মঙ্গলবার গসপেল অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ-এর উপর ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

গত ৬ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট আর. প্রেমদাস এবং হিন্দুসংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী সি. রাজাদুরাই কলম্বো আশ্রম পরিদর্শন করেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী ধৈর্যানন্দ (রজনী) গত ২৪ জানুয়ারি '৮৯ সকাল ৫-৪০ মিঃ বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুখে তিনি কয়েক মাস যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন। অবশেষে মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বেলুড় মঠ, মায়াবতী, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, কনখল এবং দেওঘর কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। চিকিৎসা বিভাগের কাজ ভালবাসতেন বলে তিনি ঐসব কেন্দ্রে প্রধানতঃ চিকিৎসা বিভাগেই সেবা করেছেন। সরল ও আমুদে স্বভাবের জন্য তিনি সকলের কাছে প্রিয় ছিলেন।

স্বামী অনন্তরানন্দ (কেশব) গত ২৬ জানুয়ারি ৩-১৫ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বহুমূত্র ও প্রস্টেট গ্রন্থির চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস পূর্বে তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনখল সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে সারদাপীঠ, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ভুবনেশ্বর, করিমগঞ্জ, পুরী মঠ, ইনস্টিটিউট অব কালচার, পুরুলিয়া, বরানগর রামহরিপুর এবং বেলুড় মঠের কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কয়েকবার তিনি ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাড়িঘর তৈরির কাজে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। অসুস্থতাবশতঃ অবসর নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এসব কাজ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। নিয়মনিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

স্বামী দীপ্তানন্দ (প্রবোধ) গত ২৭ জানুয়ারি বেলা ১০ ঘটিকায় বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে আসে। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজের) মন্ত্রশিষ্য স্বামী দীপ্তানন্দ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানের পর থেকেই তিনি বেলুড় মঠের ঠাকুর ভাণ্ডারে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে কাজ করে আসছিলেন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং তখন থেকেই আরোগ্য ভবনে বাস করছিলেন। সুমধুর স্বভাব এবং আমৃত্যু সহাস্য মুখ ছিল তাঁর মানসিক প্রশান্তির ফলশ্রুতি।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২৯ জানুয়ারি, বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদির মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭তম আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। তাছাড়া গত ৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ। ২০ জানুয়ারি এবং ৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন স্বামী গর্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ী আশ্রম, জলেশ্বর, উড়িষ্যা ঃ গত ৩০ ডিসেম্বর '৮৮, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উক্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই আশ্রমের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য-শিবিরের আয়োজন করা হয়। ঐ স্বাস্থ্যশিবিরে ১১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১৩০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করা হয়।

শিখরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ, উত্তর ২৪-পরগনা ঃ গত ৩০ ডিসেম্বর '৮৮, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ-মাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ১৩৬তম জন্মতিথি বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, লীলাগীতি, কালী-কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। ঐদিন প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে এক ধর্মসভাও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়, মাকড়দহ ঃ গত ৩০ ডিসেম্বর '৮৮ থেকে ১ জানুয়ারি '৮৯, দিবসত্রয় শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব তিথি-উৎসব পালিত হয়েছে। ১ম দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঊষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি। ঐ দিন প্রায় ১৭০০ জন ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ জানুয়ারি ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন স্বামী হীরানন্দ। স্বামী দিব্যানন্দ ও অধ্যাপক হোসেনুর রহমান ভাষণ দেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর '৮৮, অশোক নগর (উত্তর ২৪-পরগনা) শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সংঘ গৃহে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি বিশেষ উদ্দীপনার সঙ্গে পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের জন্ম-শতবার্ষিকী এই আশ্রমের উদ্যোগে গত ২১ ডিসেম্বর '৮৮ থেকে আরম্ভ হয়। ঐ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয়। এক সভায় স্বামী পুরুষানন্দ ও স্বামী শিবময়ানন্দ স্বামী মাধবানন্দজীর স্মৃতিচারণ করেন। স্বামী গিরিজাত্মানন্দজীর পরিচালনায় সঙ্গীতালেখ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচার, স্বামী মাধবানন্দজীর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ, তাঁর জন্মস্থান সংরক্ষণ, বিভিন্ন সেবামূলক ও অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, নদীয়া জেলার শান্তিপুরের অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রাম স্বামী মাধবানন্দজী ও কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দজীর জন্মস্থান।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একাদশ সংঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি পরিচালিত আশ্রমে ২০ ডিসেম্বর শুভাগমন করেন এবং ২১, ২২, ২৩ ডিসেম্বর অবস্থান করেন। ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর প্রায় দুই শতাধিক ভক্তজনকে দীক্ষা দেন। তাঁর শুভাগমন ও পুণ্য অবস্থান উপলক্ষে চারদিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ অনুধ্যান-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুধ্যান-অনুষ্ঠানে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে ক্রমানুযায়ী মনোজ্ঞ আলোচনা করেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, স্বামী অনাময়ানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ এবং অধ্যাপক তাপস বসু। সঙ্গীত ও স্লাইড প্রদর্শনী ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ। এই উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-তীর্থ নবদ্বীপে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মহাসমাধির পূর্বে এটিই ছিল পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের সর্বশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান।

গত ১৮ ডিসেম্বর '৮৮ অখিল ভারত রামকৃষ্ণ পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে সারাদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার আলোকে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার মন্ত্রী সরল দেব, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, বহু অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র ও যুবক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা।

বরাহনগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি মঠ-প্রতিষ্ঠা দিবস ও সমিতির সাংবাৎসরিক উৎসব যথাক্রমে ১৯ অক্টোবর, ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর '৮৮ তারিখে মঠভূমি ১২৫/১ প্রামাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬-এ উদ্‌যাপন করেছে। ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর পূজা, হোম, ধর্মসঙ্গীত, ধর্মসভা, সাধুসেবা, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দুই দিনে ধর্মসভাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদকদ্বয় স্বামী গহনানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী রমানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, প্রণবেশ চক্রবর্তী, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্রমুখ। বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রবৃন্দ ও শিবপুর প্রফুল্ল তীর্থ গীতিআলেখ্য পরিবেশন করে।

গত ১৮ নভেম্বর (১৯৮৮) বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম গারো পাহাড় জেলার ডালুগ্রামে ডালু শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সংঘের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। উক্ত উৎসবে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী দেবদেবানন্দ, স্বামী রঘুনাথানন্দ, স্বামী সুমেধানন্দ, স্বামী শ্রীশানন্দ, স্বামী অলোকানন্দ ও বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বেশ কিছু আদিবাসী ভক্তও উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন বিকালে সংঘস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন মেঘালয়ের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পি. এ. সাংমা। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ ত্রাণকার্যের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে ঐ স্থানে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হয়।

নিবেদিতা-পুরস্কার

পঞ্চাশের দশকের কলকাতায় কয়েকটি তরুণ কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাক্যকে—'দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'—কর্মে রূপ দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তা থেকেই ক্রমে জন্ম নিয়েছিল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ্। সেদিনের সেই তরুণদের অন্যতম লোকশিক্ষা পরিষদের বর্তমান কর্ণধার শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। এবার 'নিবেদিতা-পুরস্কার' প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করলেন হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম। ৯ অক্টোবর, ১৯৮৮, শিবশংকর চক্রবর্তীর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে অনুষ্ঠান-সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন: "আমার মতে এক যোগ্য ব্যক্তিকে এবার পুরস্কার দেওয়া হল।" শিবশংকর চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে জানালেন, স্বামীজীর কথাকে স্মরণে রেখে লোকশিক্ষা পরিষদ কিভাবে গ্রামীণ যুব সংগঠনগুলির সাহায্যে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক প্রকল্প নির্মাণ করছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যেও আজ লোকশিক্ষা পরিষদের কর্মধারা বিস্তৃত। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু।

পরলোকে জীবনতারা হালদার

প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী **জীবনতারা হালদার** ২০ জানুয়ারি, ১৯৮৯, ৯৬ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোক গমন করেছেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর হাত ধরে এসেছিলেন এই সমিতিতে। জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্র এবং অর্থলাভের যে পরিকল্পনা লাডলিমোহন মিত্র, যতীন্দ্রলোচন মিত্র করেছিলেন, সেই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য জীবনতারা ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কারারুদ্ধ হন এবং ১৯১৮ পর্যন্ত অন্তরীণ ছিলেন। তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্ম সম্পর্কে Confidential Report from Police Register (C. I. D. Special Branch, Calcutta)-এ লিখিত ছিল 'He appears to have been a dangerous person।' একদা 'ইণ্ডাস্ট্রি' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে নিয়মিত লেখক, জীবনতারা লণ্ডনের 'দি এমপ্রেস,' 'পাঞ্চ' পত্রিকার জন্যও কলম ধরেছেন। তাঁর লেখা 'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস' গ্রন্থটি সুপরিচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে জীবনতারার সুদীর্ঘকালের যোগাযোগ ছিল। অনুশীলন সমিতির সভ্যরূপে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবায় সানন্দে অংশ নিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষতঃ বৈপ্লবিক কার্যকলাপের উপর স্বামী বিবেকানন্দের কি বিপুল প্রভাব ছিল, সে-বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদন 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে' শিরোনামে উদ্বোধন পত্রিকার (৮৯-৯০ বর্ষ) তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এই প্রাক্তন বিপ্লবী কয়েক মাস আগেও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও উদ্বোধন কার্যালয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাতে।

পরলোকে জ্যোতির্ময়ী দেবী

জ্যোতির্ময়ী দেবী চলে গেলেন ১৭ নভেম্বর, ১৯৮৮, প্রায় পঁচানব্বই বছর বয়সে। নবীনদের কাছে প্রেরণা, সকলের কাছেই বহুমানিতা এই লেখিকার প্রয়াণে একটি কাল সমাপ্ত হল। জন্মসূত্রে তিনি প্রবাসী। কিন্তু রাজস্থানের রুক্ষ পটভূমিকা তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রকে উর্বর করেছিল। রাজস্থানী নারীদের বীর্যবত্তা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল নানা পারিবারিক বিপর্যয়কে সবলে অতিক্রম করতে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে, বাঙালী নারীকুল যখন পর্দার আড়ালে, তখন জ্যোতির্ময়ী দেবী অশেষ ধৈর্য এবং সাহসে বাঙলা, ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং আরো বহু বিষয়কে আয়ত্তে এনেছিলেন। সেই সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙলা সাহিত্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। যুগপৎ বাংলা এবং রাজস্থানের নারীদের অধিকারবোধ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তাঁর লেখনীতে। সেইসঙ্গে যৌথ পরিবারের ভাঙনের ছবিও ফুটে উঠেছিল সেই সব রচনায়।

উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতার রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্যকীর্তি। বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিতা—ভুবনমোহিনী পুরস্কার, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫), রবীন্দ্র-পুরস্কার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১-৭২), হরনাথ ঘোষ মেডাল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৮২), শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার; ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের লেডিস স্টাডি গ্রুপ অর্থ-পুরস্কার এবং মেডাল প্রদান করে (১৯৮৪) তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ স্বীকৃতি এসেছিল বিশিষ্ট সাহিত্যশিল্পীদের কাছ থেকেও। তাঁর 'সোনারূপা নয়' গ্রন্থটির ভূমিকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ঃ "সত্য, স্মৃতি এবং কল্পনা-মিশ্রিত এই কাহিনীগুলি ভারতীয় সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি বলেই বিবেচিত হবে।"

'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছিল সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা এবং পাঠিকাও ছিলেন তিনি। গভীর অধ্যাত্মবোধ তাঁর চেতনায় বিরাজিত ছিল। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর শতবার্ষিকী গ্রন্থে তাঁর 'স্বামীজী-জয়পুরে' নামক লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সে রচনাটিতে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মায়ের স্বামীজী-দর্শনের পবিত্র স্মৃতি বিধৃত। উদ্বোধন-এর পৌষ ১৩৭০ সংখ্যায় 'বিবেকানন্দ' নামে কবিতায় যখন তিনি লিখেছিলেন ঃ "তোমাতে মিলিল যেন সাগরে সাগর", তখন জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর অনুভূতিতে বহু মানুষের প্রাণের কথাকে একটি বাক্যে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা **মৃণালিনী দেবী** গত ২২ জানুয়ারি সকাল ৭-৪০ মিঃ নব্বই বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্বামী অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে উভয়েরই বিশেষ যোগাযোগ ছিল। প্রয়াতা মৃণালিনী দেবী শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্যা ছিলেন। 'মাতৃদর্শন' গ্রন্থে তাঁর স্মৃতিকথা রয়েছে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী **হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** (ভমুবাবু) গত ৬ অক্টোবর ১৯৮৮, সকাল ১০-১০ মিঃ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে উদ্বোধন কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

‘স্বর্গীয় পাকা টমেটো’

সাধারণতঃ গাছ থেকে তোলার কয়েকদিনের মধ্যে টমেটো নরম হতে থাকে। ইউনাইটেড স্টেটস্‌-এ সেজন্য সবুজ অবস্থায় টমেটো গাছ হতে তোলা হয় এবং ইথিলিন গ্যাস দিয়ে কৃত্রিমভাবে পাকানো হয়। এরকম করা হয় যাতে সুপারমার্কেটে উজ্জ্বল লাল রঙ হওয়া অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। কিন্তু ইজরায়েল-এর হিব্রু ইউনিভারসিটির ফ্যাকালটি অফ এগ্রিকালচার নূতন প্রজাতির টমেটো সৃষ্টি করার জন্য কয়েকশো ধরনের টমেটো মিলনের চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে ‘স্বগীয় পাকা টমেটো’ যার রঙ, স্বাদ ও সুগন্ধ চার সপ্তাহ পর্যন্ত নষ্ট হয় না। আমেরিকার সুপারমার্কেটে এটি বিক্রি হতে আরম্ভ হয়েছে ও শীঘ্র আমেরিকার গোলাবাড়িতেও এর স্থান হবে। কারণ ইজরায়েল এই দোআঁশলা টমেটোর বীজ বাইরে রপ্তানী করতে আরম্ভ করেছে।

[News from Israel, October, 1988 p. 8]

ইউনাইটেড কিংডমে সাইকেলচালক, মাথায় আঘাত ও হেলমেট

ইউনাইটেড কিংডম (ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড)-এ সাইকেলচালকদের দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিকারের জন্য অন্য দেশের তুলনায় সেরকম কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অক্সফোর্ড-এর ‘এ্যাকসিডেণ্ট সার্ভিস’ নামক সংস্থার ১ জানুয়ারি ১৯৮৩ থেকে ৩১ মে ১৯৮৫ পর্যন্ত যেসব দুর্ঘটনা নজরে এসেছে, তার রিপোর্টে বলা হচ্ছে :

সাইকেলচালকদের দুর্ঘটনা পথ-দুর্ঘটনার ২৮ শতাংশ। ১৮৩১টি সাইকেল দুর্ঘটনায় মাথায়, মুখ-মণ্ডলে বা উভয়স্থানে চোট লেগেছে ৯৫৮ জনের (৫২ শতাংশ)। মাথায় চোট লাগার হিসাব : ১৭৮ জনের সামান্য ছড়ে যাওয়া, ৩১৪ জনের মস্তিষ্কে সামান্য চোট এবং ৩৭ জনের গুরুতর মস্তিষ্কে জখম; ছয় জন মারা গিয়েছেন। মাত্র ১২ জন (০'৭ শতাংশ) সাইকেলচালকের মাথায় হেলমেট ছিল।

মোটরসাইকেল-চালকদের (যাদের হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক) এবং সাইকেলচালকদের মধ্যে মাথায় চোট লাগার ঘটনা তুলনামূলকভাবে সাইকেল-চালকদের মধ্যে অনেক বেশি (১৬৯ সাইকেলচালক—অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ, কিন্তু ১১৪ জন মোটরসাইকেল-চালক—অর্থাৎ ১৫ শতাংশ)। অক্সফোর্ড রিং রোডে, যেখানে সাধারণ রাস্তা ও ‘সাইকেল গলি’ (cycle lane) আলাদা করা আছে, সেখানে সাইকেল-চালকদের দুর্ঘটনা অনেক কম দেখা গেছে।

এই সমীক্ষা হতে বলা যায় যে, সাইকেলচালকদের হেলমেট পরা উচিত এবং বড় রাস্তায় ‘সাইকেল লেন’ থাকলে সাইকেল চালকদের দুর্ঘটনা কমবে।

[British Medical Journal, vol. 296,
23 April 1988, pp. 1161-1162]

জাপানী নারীরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু

জাপানী নারীর আয়ু গড়পড়তা ৮১'৩৯ বছর। এই আয়ু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের চেয়ে বেশি। জাপানী পুরুষরা বাঁচে গড়পড়তা ৭৫'৬১ বছর। দীর্ঘায়ু হিসাবে জাপানী নারীর পরেই আইসল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডের নারীদের স্থান।

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় জাপানী নারীদের আয়ুষ্কাল গড়পড়তা বেড়েছে ০'৪৬ বছর এবং পুরুষদের ০'৩৮ বছর। জাপানের মহিলা ও পুরুষদের আয়ুষ্কালের পার্থক্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫'৭৮ বছর। জাপানী পুরুষরা ৪০ বছর আগে যত বছর বাঁচত, এখন গড়পড়তা ২৫'৫৫ বছর বেশি বাঁচে। গত মহাযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই, জাপানী মহিলারা যত বছর বাঁচত, এখন তার চেয়ে ২৭'৪৩ বছর বেশি বাঁচে। [Japan Calling, August 1988, p. 6]

উদ্বোধন

১০১তম বর্ষ

[illegible]

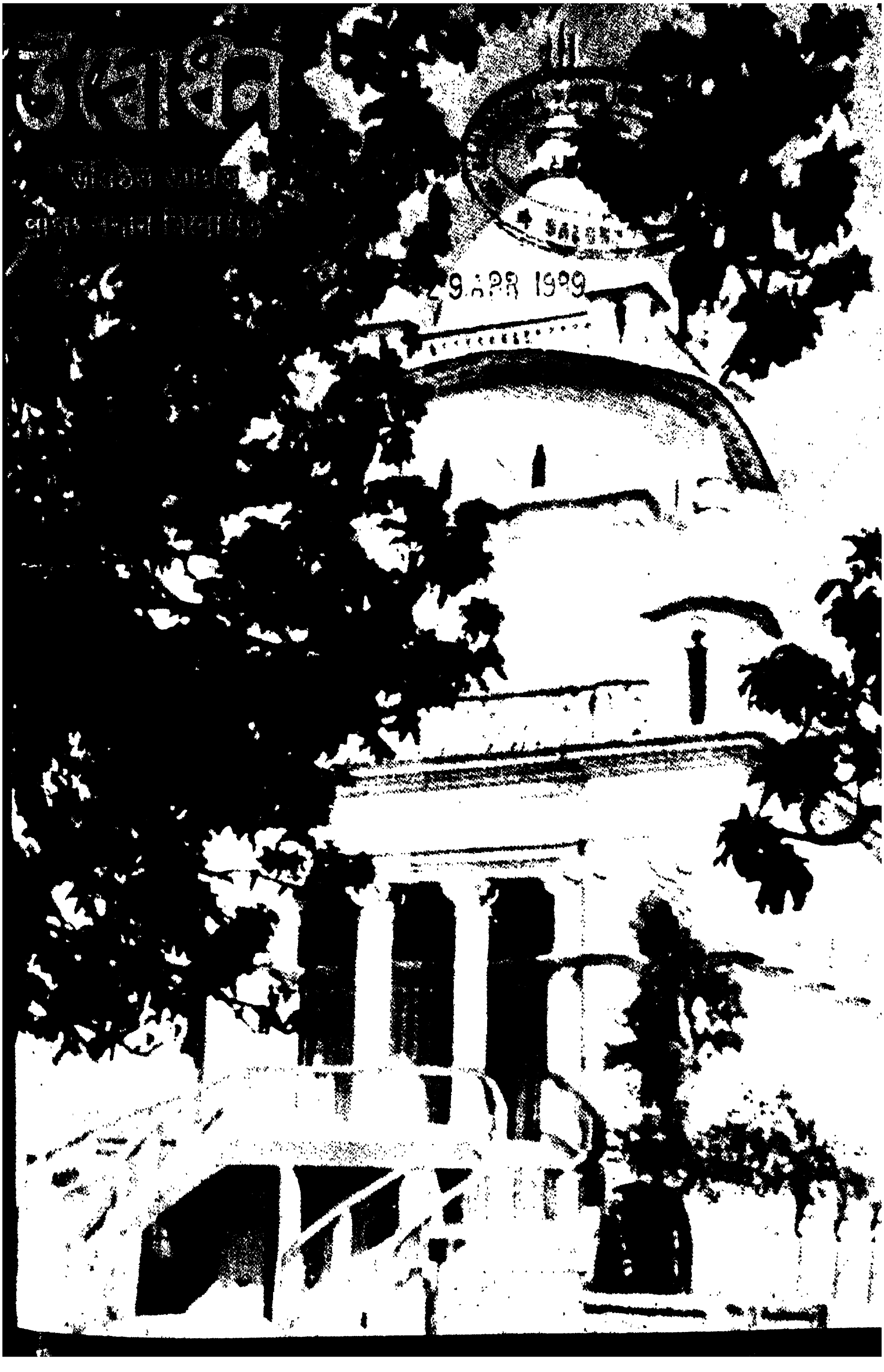

29 APR 1999

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ··· ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।··· এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো।
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো॥

সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা।
আতুরেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনাতুরা॥

সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা।
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা॥

সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নত্থি কিঞ্চনং।
পীতিভক্খা ভবিস্সাম দেবা আভাস্সরা যথা॥

বুদ্ধদেব

শত্রুর প্রতি শত্রুতায় বিরত হয়ে, এস আমরা সুখে কালাতিপাত করি। এস, আমরা অহিংস হয়ে হিংসাকারীদের মধ্যে সুখে জীবন যাপন করি।

আতুরগণের (রাগাদি মানসিক রুগ্নতা দ্বারা ক্লিষ্ট) মধ্যে, এস, আমরা অনাতুর (ক্লেশরহিত) হয়ে সুখে কালাতিপাত করি; এস, আমরা আতুর মানুষদের মধ্যে অনাতুর হয়ে বিচরণ করি।

এস, আমরা বিষয়াসক্ত মানুষদের মধ্যে অনাসক্ত হয়ে বাস করি; এস, আমরা আসক্তদের মধ্যে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করি।

যেহেতু আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই, তাই আমরা সুখে কালাতিপাত করব। দীপ্তিমান দেবগণের ন্যায়, এস, আমরা প্রীতি উপভোগ করি।

[ধম্মপদ, সুখবগ্গ (১-৪)]

কথাপ্রসঙ্গে

"আত্মদীপো ভব"

মহাপরিনির্বাণের পূর্বে প্রিয়তম শিষ্য ও উত্তরসূরী আনন্দকে বুদ্ধ তাঁহার অন্তিম বার্তায় বলিয়াছিলেন ঃ "আত্মদীপো ভব।"—তুমি আত্মদীপ হও।

কথা সামান্য। কিন্তু তাৎপর্য সুগভীর। বুদ্ধ আনন্দকে বলিতে চাহিয়াছিলেন ঃ অপর কোন অদৃশ্য উৎস হইতে আলোক আশা না করিয়া কেবলমাত্র আপন শক্তিতে বিশ্বাসবান্ হইয়া তুমি একটি প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়া ওঠো। নিষ্কম্প ধ্রুবতারার মতো তুমি জ্বলিতে থাকো তোমার সকল সতীর্থের সম্মুখে। তোমার আলোতে সতীর্থদের জীবনের অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে। তোমাকে দেখিয়া তোমার সতীর্থরাও এক-একটি প্রদীপ হইয়া উঠিবে এবং তোমার শিখা হইতে তাহারা নিজ নিজ প্রদীপ জ্বালাইয়া লইবে।

বুদ্ধ চাহিতেছিলেন জ্বলন্ত জীবন, জ্বলন্ত চরিত্র। তাহার জন্য প্রয়োজন নিরন্তর সতর্কতা, সদাজাগ্রত বিচারবুদ্ধি, অনলস উদ্যমশীলতা এবং অনির্বাণ উৎসাহাগ্নি।

বুদ্ধ জানিতেন এইগুলির কোন বিকল্প নাই। যে-কোন আন্দোলনের, যে-কোন সংগঠনের প্রাণশক্তি নির্ভর করে যিনি বা যাঁহারা সেই আন্দোলন বা সংগঠনকে পরিচালনা করেন—তাঁহার বা তাঁহাদের ব্যক্তিজীবনের শুদ্ধতা, আচরণের নৈর্ব্যক্তিকতা, স্বভাবের উদ্যমশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির আশাবাদিতার উপর।

প্রদীপ অর্থাৎ প্রদীপের অগ্নি এখানে অনেক কিছুরই প্রতীক। অগ্নি চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রতীক। কারণ অগ্নি অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই। কথায় বলে, 'অগ্নিশুদ্ধি'। অগ্নির কাছে কাহারও বিশেষ সমাদর নাই। অগ্নির কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তাই অগ্নি নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতীক। অগ্নি তাপ দান করে, অর্থাৎ সজীবতা সঞ্চার করে। অগ্নি তাই উদ্যমশীলতার প্রতীক। আবার অগ্নি আশার প্রতীক। গভীর অন্ধকারের মধ্যে অগ্নি বহন করিয়া আনে অন্ধকারনাশের বার্তা। তাই বুদ্ধ যখন প্রিয়তম শিষ্যকে অন্তিম বার্তা দিয়াছিলেন, তখন তিনি আনন্দের কাছে এক যথার্থ মহাজীবনের প্রত্যাশা রাখিয়াছিলেন। প্রত্যাশা রাখিয়াছিলেন আরেকজন বুদ্ধের আত্মপ্রকাশের।

বস্তুতঃ বুদ্ধের জীবন ছিল তাঁহার অন্তিম বাণীর সাকার রূপ। চরিত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধ, ব্যবহারে একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক, কর্মে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত পরম অনলস এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বদা চূড়ান্ত আশাবাদী। তিনি অনর্থক বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। তিনি শুধু একটি মহাজীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগামীরা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিত ইহাই জীবন, ইহাই আদর্শ। তিনি স্বয়ং একটি বিরাট অগ্নিমশাল হইয়া সকলের সামনে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বুদ্ধের পরে যিনি তুল্য শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি আচার্য শঙ্কর। কোন অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাসবান্ না হইয়া শুধু আপন পুরুষকারকে সম্বল করিয়া তিনি আত্মদীপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই অর্থে তাঁহার মধ্যে বুদ্ধকেই আরেক রূপে জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আচার্যের আবির্ভাবের দ্বাদশ শতাব্দী অতিক্রম উপলক্ষে ইহা আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি।

প্রবাদবাক্যে বলা হয় ঃ উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ শ্রেয়। বাস্তবিক সহস্র বচনে যে-কাজ না হয়, একটি আদর্শ জীবন-যাপনে অনায়াসেই তাহা হইয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন ঃ "মনে রাখিবে—ব্যক্তিগত চরিত্র এবং ব্যক্তিগত জীবনই হইল শক্তির উৎস, অন্য কিছু নহে। জগতের একান্ত প্রয়োজন হইল চরিত্র। একমাত্র চরিত্রই পারে আদর্শকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করিয়া তুলিতে। 'অন্ধকার অন্ধকার' বলিয়া বৃথা চিৎকার না করিয়া একটি প্রদীপ আনয়ন কর। দেখিবে মুহূর্তে অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে।" এই কথারই প্রতিধ্বনি পাইতেছি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ঃ "এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ / পরিপূর্ণ একটি জীবন। / নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ, / থেমে যাবে সহস্র বচন।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একটি কথারই প্রতিধ্বনি—যাহা সার্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে প্রজ্ঞাপুরুষ তথাগত উচ্চারণ করিয়াছিলেন ঃ "আত্মদীপো ভব।"

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

Ramakrishna Mission
Belur Math, Howrah
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

মা হরিদাসী,

অনেকদিন পর তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি নিজহাতে এখন লিখিতে পারি না, হাত কাঁপে।—এ পত্রখানা খুব আস্তে আস্তে ধরে লিখলাম।

মা, তুমি ধ্যানজপে লেগে থাক, ঠাকুর তোমায় নিশ্চয় শান্তি দিবেন, আমি বলছি। মন একেবারে যে একভাবে থাকিবে তা নয়। কখনো কখনো খুব আনন্দ হবে, কখনো কখনো আবার কম হবে—এ মনের স্বভাব ; সেজন্য তুমি বিশেষ দুঃখিত বা হতাশ হইও না। তুমি খুব শান্তি পাবে। ঠাকুর কেবল হৃদয়ের প্রেম চান, খুব প্রেমের সহিত বালকের ন্যায় তাঁর কাছে আবদার করবে। তিনি তোমায় খুব দয়া করবেন ; খুব শান্তি দেবেন আমি বলছি।

আমার শরীর ভাল নয় ; ঠাকুর কোনরকমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যতদিন তাঁর ইচ্ছা রাখবেন। বৃদ্ধ জরাজীর্ণ শরীর ; তবে ঠাকুর বড় দয়াল, বড় প্রেমময়, খুব আনন্দে রেখেছেন দয়া করে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিও। প্রার্থনা করি, তোমার শরীর মন খুব ভাল থাক। মঠে ৺মহামায়ার প্রতিমায় আরাধনা হইবে—প্রতিমা একমেটে হয়েছে। ইতি

তোমার চির শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

Ramakrishna Mission
Belur Math, Howrah
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

মা হরিদাসী,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দ হইয়াছে। আমার হাত কাঁপে, তাই নিজে লিখতে পারি না। তবে তুমি লিখেছ বলে কোন রকমে দু-লাইন লিখলাম। আন্তরিক প্রার্থনা করি, তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকুক এবং তোমার জপ ধ্যান খুব জমে যাক। তুমি একেবারে তাতে ডুবে যাও ও খুব শান্তিতে থাক। তোমার উপর ঠাকুরের দয়া আছে আমি নিশ্চয় জানি ; তোমার খুব উন্নতি হবে।

প্রার্থনা করি, তোমার মা আরোগ্য হউক—তোমার ভয় নাই ; ঠাকুর তাঁকে ভালই রাখবেন, চিন্তা নাই। আমার শরীর পূর্ববৎ, বরং ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে আসছে। সব ঠাকুরের ইচ্ছা—কোন চিন্তা নাই। শরীর গেলেও আমি অবিনাশী অজর, অমর, নিত্যশুদ্ধ মুক্ত—এ জ্ঞান ঠাকুর দয়া করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত। তোমার জ্ঞানভক্তি খুব বাড়ুক।

ঢাকার গোলমাল সব শুনেছি। প্রভুর ইচ্ছা মঙ্গলই হইবে, শীঘ্রই শান্তি হইবে। খোকা মহারাজ এইখানেই আছেন ; অনেকটা ভাল আছেন। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানবে। তুমি ভালই থাকবে।… মণীন্দ্র, যোগেন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ও অপর সকলকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ দিও। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে)

বাংলা ১৩৯৬ সাল, ইংরেজী ১৯৮৯-৯০ খ্রীঃ

তিথি-কৃত্য

শ্রীরামচন্দ্র	রামনবমী	১ বৈশাখ	শুক্রবার	১৪ এপ্রিল	১৯৮৯
শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২৭ বৈশাখ	বুধবার	১০ মে	,,
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	৬ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	২০ মে	,,
গুরুপূর্ণিমা	আষাঢ় পূর্ণিমা	২ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	১৮ জুলাই	,,
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	১৪ শ্রাবণ	রবিবার	৩০ জুলাই	,,
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	১৭ আগস্ট	,,
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	৮ ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	২৪ আগস্ট	,,
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৪ ভাদ্র	বুধবার	৩০ আগস্ট	,,
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	৭ আশ্বিন	শনিবার	২৩ সেপ্টেম্বর	,,
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১৩ আশ্বিন	শুক্রবার	২৯ সেপ্টেম্বর	,,
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	২৪ কার্তিক	শুক্রবার	১০ নভেম্বর	,,
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	২৬ কার্তিক	রবিবার	১২ নভেম্বর	,,
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২১ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	৭ ডিসেম্বর	,,
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	৪ পৌষ	মঙ্গলবার	১৯ ডিসেম্বর	,,
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	৮ পৌষ	শনিবার	২৩ ডিসেম্বর	,,
শ্রীযীশুখ্রীস্ট	—	৯ পৌষ	রবিবার	২৪ ডিসেম্বর	,,
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	১৯ পৌষ	বুধবার	৩ জানুয়ারি	১৯৯০
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	২৬ পৌষ	বুধবার	১০ জানুয়ারি	,,
শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	৪ মাঘ	বৃহস্পতিবার	১৮ জানুয়ারি	,,
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	১৪ মাঘ	রবিবার	২৮ জানুয়ারি	,,
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	১৬ মাঘ	মঙ্গলবার	৩০ জানুয়ারি	,,
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	২৬ মাঘ	শুক্রবার	৯ ফেব্রুয়ারি	,,
.. ঠুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১৫ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২৭ ফেব্রুয়ারি	,,
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২০ ফাল্গুন	রবিবার	৪ মার্চ	,,
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২৭ ফাল্গুন	রবিবার	১১ মার্চ	,,
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	১৫ মার্চ	,,
শ্রীরামচন্দ্র	রামনবমী	২০ চৈত্র	মঙ্গলবার	৩ এপ্রিল	,,

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২০ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	৩ জুন	১৯৮৯
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৪ আষাঢ়	সোমবার	১৯ জুন	,,
	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২১ আশ্বিন	শনিবার	৭ অক্টোবর	,,
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১১ কার্তিক	শনিবার	২৮ অক্টোবর	,,
	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১৭ মাঘ	বুধবার	৩১ জানুয়ারি	১৯৯০
	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১১ ফাল্গুন	শুক্রবার	২৩ ফেব্রুয়ারি	,,

প্রবন্ধ ■

আচার্য শঙ্করের কর্ম-ভক্তিময় জীবন

স্বামী অজিতাত্মানন্দ

বছর দশেক আগের কথা। একদিন জনৈক ব্রহ্মচারী এক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন: “মহারাজ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সাধু-সন্ন্যাসীদের অবদান কতখানি?” প্রবীণ সন্ন্যাসী ঝটিতি উত্তর দিয়েছিলেন: “ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে শুধু বুদ্ধকে বাদ দিয়ে দাও—দেখ কতখানি জায়গা খালি হয়। তাছাড়া বৈদিক ঋষি থেকে শুরু করে শঙ্কর-চৈতন্য-বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেকে আছেন।” কথাগুলি আমি পাশ থেকে শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল—সত্যই তো, এঁদেরকে বাদ দিলে ভারতীয় সংস্কৃতির কতটুকু অবশিষ্ট থাকে।

বুদ্ধের পর বহু সময় কেটে গেলে তাঁর প্রচারিত ধর্মও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকৃতদশাপ্রাপ্ত হয়। সমাজে ধর্মের জায়গায় নানারূপ কুসংস্কার, বামাচার প্রভৃতি প্রবল আকার ধারণ করে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় শঙ্করাবির্ভাবের সন্ধিক্ষণ এইরূপ: ‘‘বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবনতির কালে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ··· বৌদ্ধধর্মের মুক্তদ্বারপথে নানাজাতীয় বর্বর তাদের বিচিত্র রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছিল, আর তার ফলে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতীয় সমাজে। সেই প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। কোন নূতন মতবাদের প্রচার না করে বা কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা না করে তিনি বৈদিক ধর্মকেই পুনর্বার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করেছিলেন।”[১]

এখানে আর একজন ব্যক্তির পরিচয় না দিলে শঙ্করের ভূমিকার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে না। তিনি কুমারিল ভট্ট। তিনিই প্রথম বৌদ্ধধর্মের প্রতিবাদ করেন। তিনি বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রচার করে জনগণকে তাতে লিপ্ত করেছিলেন। ফলে হিন্দুরা পুনরায় বৈদিক কর্মকেই অবলম্বন করল। বৌদ্ধধর্ম ক্রমে কোণঠাসা হতে শুরু করল। ঐ সময় যে বৈদিক জাগরণ হয়েছিল—তার নায়ক ছিলেন শঙ্কর; কিন্তু কুমারিল ক্ষেত্রটি ভালভাবে তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু সমাজের কিছু লোক বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা কুমারিলের প্রচারিত কর্মমার্গে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁদের মনে খটকা লাগল পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলাভ হলেও, স্বর্গভোগ তো চিরন্তন নয়। পুণ্য শেষ হলেই আবার এই জগতে ঘুরে ফিরে আসতে হবে। তাহলে উপায়? এই উপায় নির্দেশ করতেই শঙ্করের আবির্ভাব।

শঙ্করের সামনে প্রথম কাজ হলো তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের এমন একটি যুক্তিপূর্ণ দর্শন দেওয়া যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন। তা করার জন্য বেদকে ভিত্তি করে তিনি অদ্বৈতবেদান্তমতে প্রধান উপনিষদগুলির ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করের যুক্তিতে তাঁদের মনের সন্দেহ চলে যায়। শুধু তাই নয়, ঐ বিচারকে ভাঙিয়েই ভারতীয় পণ্ডিতগণ হাজার বছরেরও বেশি কাটিয়ে দিলেন।

শঙ্করের জ্ঞানের দিকটা এতই উজ্জ্বল যে, তাঁর চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলি প্রায় নিষ্প্রভ। তা নইলে এখন থেকে বারশো বছর আগে পায়ে হেঁটে সমস্তভারত দুবার পরিক্রমা করে ধর্মপ্রচার কাজটিতে আমরা কতটা নজর দিই! আমাদের এই ‘হাই টেক’-এর যুগেও তো ভারতের সাক্ষরতার হার মাত্র কমবেশি শতকরা তিরিশভাগের মতো। আর এই বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ধর্মের নামে, জাতের নামে চারিদিকে যা হচ্ছে তা শুনলেও শিহরিত হতে হয়। শঙ্কর সনাতন বৈদিকধর্মের ঠিক সুরটি ধরেছিলেন। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন এ-বিষয়ে তাঁর ও আচার্য শঙ্করের অনুভূতি একই। সেই অনুভূতির কথা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ‘স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে’ গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। “স্বামীজী আমাদিগকে তাঁহার সেই বহুদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাসজীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

[১] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড (১৯৭৭), পৃঃ ২১৬

"তিনি বলিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে-সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।'

"এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, 'শংকরাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় জ্ঞান। বলিতে কি আমার চিরন্তন ধারণা—' বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আবেগময় হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি যেন সুদূরে নিবদ্ধ হইল—'আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মতো কোন এক অলৌকিক দর্শন-লাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি ঐরূপে সেই প্রাচীন জ্ঞানকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, বেদ ও উপনিষদের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করাই তাঁহার সমগ্র জীবনের কাজ'।"[২]

ভাষ্য রচনা করে তিনি উপনিষদের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করেছিলেন। কিন্তু ঐ স্পন্দনকে জাতীয় জ্ঞানে মিলিত করার জন্য তাঁকে আরও অনেক কিছু করতে হয়েছিল। ঐ আরও কিছু জানার জন্য তাঁর কর্মময় জীবনই অনুধ্যান করার প্রয়োজন। তিনি ভালভাবেই জানতেন অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী বিরল। সেজন্যই বিভিন্ন স্তরের সাধক ও মুমুক্ষুদের জন্য পূজার্চনাদিরূপ কর্ম ও দ্বৈতভাবেই উপাসনাদি প্রচলনের জন্য বহু তীর্থস্থানের সংস্কার-সাধন তিনি করেছিলেন। এ-বিষয়ে চারটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) হৃষীকেশের গঙ্গা থেকে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর বিগ্রহ উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। (২) বদরীক্ষেত্রে নারায়ণকুণ্ড থেকে নারায়ণ-বিগ্রহ উদ্ধার ও তাঁর পূজা প্রবর্তন। (৩) পুরীধামে চিল্কাহ্রদ থেকে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। (৪) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পঞ্চদেবতার পূজা প্রচলন। তিনি শুধু তীর্থস্থানগুলির শুদ্ধিবিধানের জন্যই সমগ্র ভারতে তীর্থপর্যটন করেননি, পরন্তু নিজে তীর্থকৃত্যাদি সম্পাদন করে ঐ সকল স্থানের মহিমা প্রকাশ এবং অগণিত নরনারীকে দেবপূজার মর্মবাণী শুনিয়ে পূজার্চনাপরায়ণ করেছিলেন। গীতায় বলা হয়েছে, 'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।' আচার্য শঙ্করের দৃষ্টান্তে এখনও ভারতে অগণিত হিন্দু দেবার্চনা-বন্দনাদিতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

এ-বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে আমরা তাঁর রচিত ৫৪ খানি উপদেশগ্রন্থ ও ৭৫ খানি স্তবস্তুতির (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের হিসাব অনুযায়ী) উল্লেখ করতে পারি। অনেকে অবশ্য এর সবগুলিকে আচার্যের রচনা বলে মনে করেন না। কারণটা বোধ হয় প্রকাশের ও উপস্থাপনার বিভিন্নতা। কিন্তু এটা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর গ্রন্থের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয়। সমগ্র ভারত তীর্থপর্যটনকালে তিনি নানা প্রকৃতির লোককে অধিকারী অনুযায়ী শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেখানেই তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থও রচনা করেন। তাই তাঁর ছোটখাট রচনাগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ও প্রকাশেও পার্থক্য দেখা যায়। আর বিশেষ দার্শনিক গ্রন্থগুলি সকল জায়গায় প্রচারিত হয়। কারণ, তাঁর প্রধান শিষ্যরা প্রায় তাঁর সাথে সাথেই থাকতেন। এ-বিষয়ে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর সাথেও তুলনা করতে পারি। তিনি পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে যে-ভাষায় শিক্ষা দিয়েছিলেন, প্রাচ্য শিষ্যগণকে সেভাবে দেননি। যদিও তত্ত্বগুলি একই তবুও অধিকারীভেদে তাদের প্রয়োগ ও উপস্থাপনা ভিন্নপ্রকৃতির। স্বামীজীর অন্তরের ভক্তিভাব তাঁর খুব অন্তরঙ্গগণই দেখতে পেয়েছিলেন। শঙ্করের ক্ষেত্রেও সে-কথা খাটে না কি?

এই প্রবন্ধে শঙ্করের দর্শনের বিষয় আলোচিত হয়নি। তাঁকে প্রতিদিন আমরা মায়াবাদী, অদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবেদান্তের কট্টর ভাষ্যকার বলেই অনুধ্যান করে এসেছি। তাঁর গোঁড়া অনুগামীরা তাঁর কর্ম ও ভক্তির ভাবে পূর্ণ জীবনের কথা ভুলে গিয়ে তাঁকে শুধুমাত্র একজন শাস্ত্রব্যাখ্যাকার পণ্ডিত হিসাবে জনসমাজে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর অপূর্ব কর্ম-ভক্তিময় জীবন উপেক্ষিত হয়েছে।

---

[২] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৯৮০), পৃঃ ২৮৮-২৮৯

আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামকৃষ্ণ

তারকনাথ ঘোষ

॥ ১ ॥

আচার্য শংকরের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তবে বেশির ভাগ ঐতিহাসিকেরই সিদ্ধান্ত এই যে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (৭১০ শকাব্দে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে) তাঁর জন্ম হয়। সে অনুসারে এ-বছর তাঁর আবির্ভাবকাল থেকে বারোশো বছর অতিক্রান্ত হল। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান হয়। এরই মধ্যে তিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেকালে প্রচলিত অন্য সব বিশিষ্ট ধর্মাশ্রিত দার্শনিক মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন—তর্কযুদ্ধে সেকালের বিভিন্ন-মতাশ্রয়ী পণ্ডিতদের পরাজিত করে এবং প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ দশোপনিষদ্, গীতা আর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও কয়েকটি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করে। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যরচনা আচার্য শংকর নিজে করেছিলেন কিনা সে-বিষয়ে মতভেদ আছে।) এছাড়া বেদান্তের অনুশীলন আর প্রচারের জন্য তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন, যেটি বৌদ্ধযুগের অবসানের পর ভারতের বৃহত্তম ও বিশিষ্টতম সাধক-সম্প্রদায়ের মর্যাদা পেয়ে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সম্প্রদায়-বিচারে দশনামী সন্ন্যাসী। পাছে মায়ের মনে কষ্ট হয় এজন্য তিনি সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্ন ধারণ করেননি, কিন্তু তোতাপুরীর কাছে যে-দীক্ষা নিয়ে নির্বিকল্প সমাধিযোগে বেদান্তের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তা সন্ন্যাসেরই দীক্ষা। সম্প্রদায় অনুসারে তাঁর নাম বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পুরী—শৃঙ্গেরী মঠের আশ্রিত; মহাবাক্য যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। তাঁর থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগে অবতীর্ণ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন—ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা, কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা।

আচার্য শংকর 'মায়াবাদী' সন্ন্যাসী আখ্যায় সুপরিচিত। এ অভিধা সুসঙ্গত কিনা সেবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। আচার্য শত শত গ্রন্থে ব্যাখ্যাত বেদান্ততত্ত্ব অর্ধশ্লোকে প্রকাশ করেছিলেন ঃ 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ (তখন হরিনাথ) রীতিমত বেদান্তচর্চা অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বেদান্তের এই সার তত্ত্বটির কথাই বলেছিলেন। আচার্য শংকর যদি ব্রহ্মকেই চরম সত্য বলে ঘোষণা এবং ভাষ্যাদি তাবৎ রচনায় সেই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, তাহলে তাঁকে 'ব্রহ্মবাদী' আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। কিছুটা তির্যক্‌ভাবে তাঁকে 'মায়াবাদী' বলা হয়ে থাকে, কেননা তাঁর মতে জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নয়, প্রতীয়মান মাত্র। সেই ভ্রান্ত প্রতীতির মূল মায়া, যা 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়া'—আছেও বলা যায় না, নেইও বলা যায় না। সেই মায়াই (অজ্ঞান বা অবিদ্যাও বলা হয়) জীবের চৈতন্যকে আবৃত করে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে সে নিজের স্বরূপ ভুলে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল ভাষায় শাংকর বেদান্তের এই তত্ত্বটি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বিভিন্ন অংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভক্তের রাজা' হতে চেয়েছিলেন। হয়েছিলেনও (দ্বৈতভাবেই ভক্তি সম্ভবপর), কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বকে তিনি অধ্যাত্মসাধনার চরম প্রতিষ্ঠাভূমি বলে জানতেন, নিজে সে-ভূমিতে আরূঢ় হয়েছিলেন। তারও পরে জগদ্গুরুরূপে তাঁর ভাব বিকিরণ। তাঁর ভাবে ভাবিত হয়েই স্বামী বিবেকানন্দ (বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদেশে) অদ্বৈতবেদান্তের প্রচার করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন এ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের অভিমতই চূড়ান্ত নির্দেশক। এবিষয়ে সব সন্দেহ নিরসন

করে তিনি একটি পত্রে (১৫ ভাদ্র ১৩০৯) লিখেছেন ঃ "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী।

জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য দ্বৈতবাদী।"

আচার্য শঙ্করের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের (বিশেষতঃ মিশনের) সবচেয়ে অমিল দেখা যায় কর্ম সম্পর্কে চিন্তায়।* আচার্য শঙ্কর কর্মকে জ্ঞানসাধনার অন্তরায় বলেছেন। ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে তিনি জ্ঞান আর কর্মের বিরোধকে 'পর্বতবৎ অকম্প্য' বলে মন্তব্য করেছেন। বিভিন্ন উপনিষদে (গীতাতেও) স্বর্গকাম হয়ে অথবা যে-কোন কামনা নিয়ে কর্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা আছে, কেননা সে-কর্মের ফল অচিরস্থায়ী এবং তা বন্ধনের কারণ। গীতাভাষ্যে জ্ঞানযোগকে চরম মূল্য দিলেও কর্মযোগের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে গীতার যেটি মূল শিক্ষা সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার আদর্শ তিনি অবশ্য অনুমোদন করেছেন; তবে তাঁর মতে কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে তবে জ্ঞানসাধনায় অধিকার হতে পারে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাবল্ল্যাধ্যায়ে একাদশ অনুবাকে (যেটি সমাবর্তনকালে শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশ) ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত থেকে দু-একটি বাক্য চয়ন করে আচার্য শঙ্করের এ-বিষয়ে অভিমতের সারমর্ম অনুধাবন করা যেতে পারে।

—'প্রাগ্‌ ব্রহ্মবিজ্ঞানান্নিয়মেন শ্রৌতস্মার্ত-
কর্মাণীত্যেবমর্থঃ।
অনুশাসনশ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থত্বাৎ।
সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধসত্ত্বস্য আত্মজ্ঞানম্‌
অঞ্জসৈবোৎপদ্যতে।'

—ব্রহ্মবিজ্ঞানের আগে নিয়মানুসারে (অর্থাৎ যথাবিধি) বেদানুসারী আর স্মৃতিশাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম করতে হবে।—সমাবর্তনকালে শ্রুতির উপদেশ (উপদিষ্ট) পুরুষের (চিত্তবৃত্তির) সংস্কারের উদ্দেশ্যে। চিত্তবৃত্তি সংস্কৃত (অর্থাৎ পরিমার্জিত) হলে বিশুদ্ধসত্ত্ব সাধকের আত্মজ্ঞান সহজেই উৎপন্ন হয়।

শ্রৌত-কর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত যজ্ঞাদি বিভিন্ন ক্রিয়া কালক্রমে কাম্যকর্মে পরিণত হয়েছে। উদ্দিষ্ট দেবের প্রসন্নতা অবশ্যই মন্ত্ররচনা বা মন্ত্রগানের উদ্দেশ্য; অধ্যাত্মসাধনদৃষ্টিতে ঐহিক কামনা গৌণ বা নিম্নাধিকারীর জন্য—সমর্থ সাধকের পক্ষে মন্ত্রের রাহস্যিক অর্থই মননীয়। এ-প্রসঙ্গে শ্রীঅনির্বাণের বিশ্লেষণ স্মরণ করা যেতে পারে। 'বেদমীমাংসা' প্রথম খণ্ডের 'প্রাক্‌-কথন'-এর কিছু অংশ ঃ

"মন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'মীমাংসা'। দুটি সংজ্ঞা একই ধাতু থেকে এসেছে। মন্ত্র দেবাবিষ্ট মননের স্বতোবিচ্ছুরণ, আর অভ্যাসের দ্বারা তাকে বুদ্ধিগত করবার প্রচেষ্টা হল মীমাংসা। মন্ত্রের রহস্যকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে তার প্রতিপাদ্য কর্মচোদনা ও জ্ঞানপ্রেরণাকে সুসংবদ্ধ রূপ দেবার স্বাভাবিক চেষ্টা হতে ব্রাহ্মণগুলির আবির্ভাব।"

---

* প্রবন্ধকারের এই মতটি ঠিক নয়। কারণ, আচার্য শঙ্করের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্ম সম্পর্কে চিন্তায় বাস্তবিক কোন অমিল নেই। যে-কর্মকে শঙ্কর জ্ঞানের অন্তরায় বলেছেন তা সকাম কর্ম। সকাম কর্ম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ নয়, আদর্শ নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের কোন বিরোধ তো নেই, বরং তা সাধারণ সাধকের পক্ষে জ্ঞানলাভের অপরিহার্য অঙ্গ। কেন-না নিষ্কাম কর্ম চিত্তশুদ্ধি করে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানলাভের অধিকারই জন্মে না—শঙ্করের এই অভিমতের কথা প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন। শঙ্করের এই অভিমতের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের রূপকার স্বামী বিবেকানন্দের মতেরও কোন অমিল নেই। স্বামীজীও স্বীকার করেছেন, জ্ঞানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্মের অবশ্য প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র বাণীকে অবলম্বন করে স্বামীজী 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আদর্শে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যে-কর্মের প্রবর্তন করেছেন, তার মধ্যে সকাম কর্মের কোন স্থান নেই—আছে শুধু জীবকে শিব ভেবে তার সেবা করার নির্দেশ, যা চিত্তশুদ্ধির জন্য ধর্মসাধনার যুগোপযোগী পরিবর্তন মাত্র। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের শেষ অনুচ্ছেদে প্রবন্ধকারও তা স্বীকার করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মের একটি যুগোচিত নবসূত্র নির্দেশ করেছেন—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।" স্বামীজী এই "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-কে বা ঈশ্বরার্থে নিবেদিত কর্মকেই বলেছেন প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত বা কর্মে পরিণত বেদান্ত।—সংযুক্ত সম্পাদক

দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী কালে জ্ঞানপ্রেরণার সূত্রগুলি হারিয়ে গেছে। সাধারণ অধিকারীর অধিগম্য কর্মপ্রবর্তনা নিয়েই প্রভূত আলোচনা হয়েছে। বোধহীন অনুষ্ঠানসর্বস্ব কর্মকাণ্ডের নিরতিশয় প্রসার রোধ করার জন্যই আচার্য শঙ্করকে কর্ম নাকচ করতে হয়েছে—বিশেষ করে অধ্যাত্ম-সাধনার পক্ষে কর্ম যে প্রবল অন্তরায় একথা তিনি নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে বলেছেন। কালক্রমে কর্ম না করাটাই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির দ্বার—এমন একটা মূঢ় বোধ জাতির চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে।

আচার্য শঙ্কর যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ঐভাবে অনুষ্ঠানসর্বস্ব কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ করার প্রয়োজন ছিল। একালে বিষয়টি ভিন্নতর দৃষ্টিতে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এখন বিবাহাদি অনুষ্ঠান ছাড়া লোকসমাজে বৈদিক ক্রিয়ার প্রচলন নেই—কোন কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানে নামে মাত্র তার অস্তিত্ব বজায় আছে। স্মার্তকর্ম লোকাচারের সঙ্গে মিশে নানা রূপ নিয়েছে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সেসব মেনে চলা হলেও আধুনিক মননের পক্ষে, বিশ্বতোমুখ জীবনচেতনায় সেসবের সারবত্তা স্বীকার করা প্রায়শঃ দুঃসাধ্য—অসাধ্যও বলা যায়।

তবে ?

'পুরুষসংস্কারার্থ'—চিত্তের বিশুদ্ধি সম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মের একটি যুগোচিত নব-সূত্র নির্দেশ করেছেন—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। অধ্যাত্ম-সাধকের পক্ষে জীবে শিবত্ব দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। 'এষো দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—এই মন্ত্রবাণীর তাৎপর্য বিশ্বময়—বিশেষতঃ মানবসত্তায় ওতপ্রোত পরমদেবকে সেবারূপ নিয়ত 'অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধিগত করার প্রচেষ্টা।' পূর্বকালে ছিল প্রথমে চিত্তশুদ্ধি তারপর জ্ঞানসাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মসাধনপ্রেরণায় যুগপৎ জ্ঞানপ্রেরণা আর কর্মসাধনার পন্থা নির্দেশ করে ভারতের সুপ্রাচীন ভাবনাকেই নবাকার দিয়েছেন। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আধুনিক বিশ্বজীবনে প্রচলিত লোককল্যাণের ভাবনা আর গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ।

আচার্য শঙ্কর ভক্তির বিরোধী ছিলেন—এ ভ্রান্ত ধারণা সুপ্রচলিত। জ্ঞানমার্গের সাধনায় লভ্য অদ্বৈততত্ত্ব সম্পর্কে একান্ত অসহিষ্ণু ভক্তিবাদীদের সরব প্রচারই এর কারণ। বিশেষতঃ বাংলায় 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রমুখ গ্রন্থে জ্ঞানমার্গীদের উদ্দেশ করে প্রায়-কটূক্তি করা হয়েছে; মহাপ্রভুকেও জ্ঞানবিরোধী রূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আচার্য শঙ্কর অবশ্যই জ্ঞানমার্গের প্রবক্তা, কিন্তু তিনি আদৌ ভক্তিবিরোধী ছিলেন না। নির্গুণ ব্রহ্মকে তত্ত্বরূপে চরম মূল্য দিলেও তিনি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে সাধনার বিশিষ্ট সোপানের মর্যাদা দিয়েছেন—উপনিষদ্‌-ভাষ্যের বিভিন্ন অংশে এটি লক্ষ্য করা যায় (বিশেষ মন্ত্রভাষ্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন)। গীতাভাষ্যেও তিনি ভক্তিমার্গের সাধনাকে স্বীকার করেছেন (দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাষ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়)। —এ ছাড়া তিনি যেমন একদিকে বেদান্তের বিভিন্ন প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনই অজস্র স্তোত্র রচনা করেছেন। দেবদেবীর বন্দনামূলক স্তোত্র নিঃসংশয়ে অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির বিশেষ মূল্যেরই স্বীকৃতি। আচার্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত বা ভাবাশ্রিত বিভিন্ন মঠে অদ্বৈত বেদান্তের রীতিমত চর্চা হলেও অন্ততঃপক্ষে একটি মন্দির বা দেবগৃহ দেখা যায়, সেখানে দেবাদিদেব মহাদেব গৌরীপট্ট-সহযোগে লিঙ্গমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি মঠস্থিত সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী মাত্রেরই নিত্য উপাস্য। বহু মঠে নিত্য সন্ধ্যায় সমবেত-কণ্ঠে পুষ্পদন্ত-বিরচিত 'শিবমহিম্নঃ-স্তোত্র' পাঠ করা হয়। (মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের হাততালি দিয়ে হরিনাম করা দেখে তোতাপুরীজীর পরিহাস কৌতুকমাত্র।)

অধ্যাত্মসাধন সম্পর্কে আচার্য শঙ্করের সমগ্র মনোভঙ্গির সার গীতার একটি শ্লোকের (অথবা একটি শব্দেরই) ভাষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। গীতার দশম অধ্যায়ের অষ্টম থেকে দশম শ্লোকে সততযুক্ত ভক্তদের সাধনাচরণের বর্ণনা করে শ্রীভগবান একাদশ শ্লোকে বলেছেন ঃ

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

—"সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া তাঁহাদের সম্যক্ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান)-জনিত উজ্জ্বল বিবেকরূপ প্রদীপ দ্বারা তাঁহাদের অবিবেকজনিত মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহান্ধকার নাশ করি।" (স্বামী জগদীশ্বরানন্দের অনুবাদ)

'জ্ঞানদীপেন'—শব্দটির শাঙ্করভাষ্য ঃ

"জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন মদ্ভাবনাভিনিবেশবাতেরিতেন ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষাদিকলুষিতনিবাতাপবারকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্র্যধ্যানজনিতসম্যগ্দর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেন ইত্যর্থঃ।"

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের অনুবাদ ঃ

"জ্ঞানদীপের দ্বারা ; [সেই জ্ঞানদীপ কিরূপ ?] ভক্তিজনিত চিত্তের প্রসাদরূপ তৈলের দ্বারা সেই বিবেকবোধরূপ জ্ঞানদীপ অভিষিক্ত, ঈশ্বরভাবনাভিনিবেশরূপ বায়ু দ্বারা তাহা প্রথমে পরিচালিত বা প্রজ্বালিত, ব্রহ্মচর্যাদি সাধন দ্বারা জনিত সংস্কারে সহিত মিলিত প্রজ্ঞাই সেই প্রদীপের বর্তি, বিরক্ত অন্তঃকরণই সেই দীপের আধার, রাগ ও দ্বেষের উদয়ে যাহা কলুষিত হয় না, সেই বিষয়চিন্তাবিহীন চিত্তরূপ যে আবৃত গৃহ, তাহাতেই সেই দীপ নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতে থাকে। সর্বদা বিদ্যমান যে একাগ্রতা ও ধ্যান, তাহা দ্বারা উৎপাদিত যে যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রভা, তাহা দ্বারা সেই জ্ঞানদীপ সর্বদা উদ্ভাসিত।"

শাঙ্কর ভাষ্যের এই অংশটি অধ্যাত্মসাধনসূত্র—সাধনার পক্ষে যা যা প্রয়োজন এবং আবশ্যিকও, এখানে তা নির্দেশ করা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে 'ভক্তি'র ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রজ্ঞারূপ বর্তিকা যে প্রজ্বালিত হবে তার মূলে ভক্তিজাত চিত্তপ্রসাদরূপ স্নেহপদার্থের নিষেক চাই। ভক্তি (বৈদিক বা ঔপনিষদ ভাবনায় 'শ্রদ্ধা') না থাকলে জ্ঞানদীপ প্রজ্বালিত হবে না। নিরন্তর ভক্তিই সাধনান্তে জ্ঞানরূপে বিভাসিত হয়।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবানুসারে ('শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ-সংবাদ স্মরণীয়) বলা যায়—ভক্তিমার্গের সাধনায় (সাধকের আধারবিশেষে) ঐ ভক্তি পরিণামে প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ ভক্তি বলতে যা বোঝায় প্রেম তা থেকে পৃথক স্ব-তন্ত্র এক তত্ত্ব। ভক্তি—ভজনাত্মিকা বৃত্তি, তাতে পৌরুষ প্রয়াস আছে ; কিন্তু প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত—তা কোন প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের মতোই তা স্বয়ংপ্রকাশ—প্রভেদ কেবল উপলব্ধির প্রকারভেদে। যিনি ভা-স্বরূপ তিনিই রস-স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অজস্র উপদেশের মধ্যে একটি বিশেষভাবে তাৎপর্যময়—ঈশ্বরকে ভালবাসাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। বৈধী ভক্তি নয়, রাগানুগা ভক্তি। চেষ্টা করে ভক্তি করা নয়, প্রাণের ভিতর থেকে ভালবাসা। মহাপ্রভুর মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ভালবাসার জীবন্ত বিগ্রহ—অনুরাগীমাত্রেরই সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা।

আঠারশো ছিয়াশির পয়লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ আশীর্বাণী প্রণিধানযোগ্য। 'চৈতন্য হোক'—এ কি কেবল বিবেকবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য অভয়াশিস ? মনে হয়, কল্পতরু হয়ে তিনি একেবারে শেষের কথাটিই বলে দিয়েছেন। এ 'চৈতন্য' —প্রজ্ঞান—ঐতরেয় উপনিষদে যাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, যা অনির্বচনীয় চরম উপলব্ধি।

সবশেষে চেতনার চৈতন্যে উত্তরণের এই আশীর্বচন কেন ? মনে হয়, ঐ পুণ্যদিনে কেবল কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সমবেত কটি ভক্তকে নয়, সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে তাঁর এ দিব্যবাণী। তিনি জানতেন, ভবিষ্যতে এমন সব মানুষ তাঁর কাছে আসবে, শাণিত বুদ্ধি যাদের সহজাত, হৃদয়বৃত্তিকে যারা মনোবিকলন-পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করবে অথবা মস্তিষ্কের বিক্রিয়া বলে নির্দেশ করবে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ থেকে তারা বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবে না। সে অনাগত কালের জ্ঞানাগ্রণী মানুষের উদ্দেশে তাঁর মহাবাণী 'চৈতন্য হোক'—চেতনার জাগৃতিমাত্র নয়, চৈতন্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠা।

দুটি বিচার ও একটি তত্ত্ব

স্বামী পরাশরানন্দ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে আবির্ভূত শ্রীভগবানের মানববিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে ভগবদ্‌প্রেমের সর্বগ্রাসী বন্যা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। প্রেমের সেই প্লাবনে মানুষ ভুলেছিল নিজেকে, ভুলেছিল তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভুলেছিল স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান, ভাবোন্মত্ত হয়ে সে ছুটে চলেছিল পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার বাসনায়। ভাবের বন্যায় ভেসেছিল নবদ্বীপ, ভেসেছিল বঙ্গদেশ, ভেসেছিল ভারতভূমি, আর পাঁচশো বছর পর নামের বন্যায় আজ ভাসছে পৃথিবীর দুই গোলার্ধ।

নবদ্বীপের ভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে আজ থেকে পাঁচশো তিন বছর আগে আকাশের চাঁদের রূপ নিয়ে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশু আস্তে আস্তে বালকে পরিণত হয়। বালকের চঞ্চলতা, দুষ্টুমি ও সমবয়স্কদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের কৌতুক ও রঙ্গরস যশোদানন্দনের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। খৈ, সন্দেশ ফেলে মাটি খাওয়া, গঙ্গার ঘাটে বন্ধুদের নিয়ে জলে ঝাঁপানো, জল ঘোলা করা, দেবতার গলার মালা নিজে পরা ও দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য খেয়ে নেওয়া, আবার এরই মধ্যে কখনো কখনো ভাবের ও একাগ্রতার আবেশে সংজ্ঞা হারিয়ে অতিজাগতিক স্তরে চলে যাওয়া। এ সবই হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার মাধুর্যময় রূপ। শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ন্যায়ের উপর বই লেখা ও বিভিন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করা, এসবের মধ্যে নিমাই পণ্ডিতের কৈশোর কেটে যায়। যৌবনের প্রথম পাদে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করে কিছুকাল পরে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধাদি কাজে গয়ায় গমন করেন। সেখানে ঘটে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর ভেতরের সুপ্ত ভক্তিভাব জেগে ওঠে; শ্রীকৃষ্ণের মধুর নাম উচ্চারণ করতে করতে চোখের জলে বুক ভেসে যায়, দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়, আবার কখনো বা স্তব্ধভাব ধারণ করে চুপ করে বসে থাকেন। ফিরে এলেন নবদ্বীপে; তাঁর এই অদ্ভুত পরিবর্তনে অবাক হলো নবদ্বীপবাসী। ভয় পেলেন শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু আনন্দিত হলেন অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, মুকুন্দ, দামোদর, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তের দল। নবদ্বীপে শুরু হল নিমাই-এর নেতৃত্বে ভক্তি-আন্দোলন। শ্রীবাসের বাড়িতে ভক্তি-শাস্ত্রপাঠ, ভজন ও কীর্তন রূপ নিল বিরাট বিরাট খোল করতাল মৃদঙ্গ শিঙা সহযোগে নগর সংকীর্তনের। নবদ্বীপের হাজার হাজার ভক্তের দল নিমাই নিতাই অদ্বৈত প্রমুখকে কেন্দ্র করে নামের পশরা নিয়ে ঘরে ঘরে মধুর হরিনাম বিলিয়ে যেতে লাগল। দুশ্চরিত্র পাষণ্ড জগাই-মাধাই ভক্তে রূপান্তরিত হলো। মুসলমান কাজী মেনে নিল কীর্তনের ভগবদ্‌-ভক্তি প্রেরণা দানের শক্তিকে। ঈশ্বরীয় ভাবের বন্যায় নবদ্বীপবাসীরা তখন ভাসতে শুরু করেছে। প্রভুর তখন অন্যরূপ চিন্তা হল। ভগবানের নাম সকলেই করছে, আনন্দ পাচ্ছে, অশ্রু পুলকও কোনও কোনও ভক্তের দেখা যাচ্ছে সত্য, কিন্তু জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন তো হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে ত্যাগের অভাব। ত্যাগী পুরুষকে আদর্শ না করাই হচ্ছে মূল কারণ। জাগতিক ভোগ বা সংসারে পুরোপুরি সত্যবুদ্ধি করা এবং ঈশ্বরের রাজ্যে এগিয়ে যাওয়া—এক ব্যক্তির পক্ষে একই কালে সম্ভব নয়। কারণ দুটি রাস্তা হচ্ছে বিপরীত-মুখী। ভোগের শেষ হলেই বিবেকী ব্যক্তির ত্যাগের রাজ্যে ঘটবে উত্তরণ। এসব ভালভাবে চিন্তায় ও বিচার করে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নেওয়া ঠিক করলেন। ভাবটা হল এই, প্রভুকে যৌবনকালে সবকিছু ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করার জন্য সর্বত্যাগীর বেশে দেখলে আদর্শ সম্বন্ধে ভক্তরা সচেতন ও সজাগ হবেন।

ঠিক চব্বিশ বছরের মাথায় কাটোয়ায় কেশব-ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন নিমাই পণ্ডিত, নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ইত্যাদি ভক্তদের ইচ্ছা ছিল সন্ন্যাসের পরেও মহাপ্রভু নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে থাকুন; কিন্তু পূর্বাশ্রমের কাছাকাছি থাকতে তিনি কিছুতেই রাজি নন।

অবশেষে গর্ভধারিণী শচীদেবীর ইচ্ছানুযায়ী চৈতন্যদেব নীলাচলে বা পুরীতে থাকাই ঠিক করলেন। ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে বহু গ্রাম, জনপদ, জঙ্গল, সাগর, নদী ইত্যাদি পেরিয়ে অবশেষে পুরীধামের নিকটে উপস্থিত হলেন। জগন্নাথের মন্দির তখনও চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে। আঠার নালার কাছে তিনি সঙ্গীদের তাঁকে অনুসরণ করতে বলে ভাবের বশবর্তী হয়ে দ্রুতপদে শ্রীমন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথের দারুব্রহ্ম রূপ দেখে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেব তাঁকে আলিঙ্গন করতে যান এবং সংজ্ঞাশূন্য হয়ে জগন্নাথের পদতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। মন্দিরের প্রহরীরা হৈ হৈ করে মারার জন্য বেত নিয়ে এগিয়ে এল। রাজার সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম মন্দিরের মধ্যে ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর অপূর্ব দিব্যকান্তি ও ভাবাবেশ দেখে বিস্মিত হয়ে ইঙ্গিতে প্রহরীদের নিরস্ত করলেন। সংজ্ঞাহীন সন্ন্যাসীকে সার্বভৌম অন্য লোকের সাহায্যে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিছু পরেই নিত্যানন্দ অন্য ভক্তদের নিয়ে জগন্নাথের মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সব কিছু শুনে তাঁরা গেলেন সার্বভৌমের বাড়ি। সেখানে প্রভুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। চৈতন্যদেবের ইচ্ছা অনুযায়ী সার্বভৌম তাঁর বাড়ির নিকটে একটি নির্জন জায়গায় জনৈক আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁদের বাসস্থান ঠিক করে দিলেন।

সেই সময়ে পুরীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্ন্যাসী বাস করতেন। সার্বভৌম নৈয়ায়িক, মীমাংসক ও বেদান্তশাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পুরীর বহু সন্ন্যাসীকে তিনি শাঙ্কর-ভাষ্যসহ বেদান্তশাস্ত্র পড়াতেন। চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে সার্বভৌমের আত্মীয়তা ছিল। সুতরাং স্নেহের নিমাই এই অল্প বয়সে সন্ন্যাস নেওয়ায় তাঁর মনে দুঃখ হলো। স্নেহ-পরবশ হয়ে তিনি সন্ন্যাসীকে বললেন, "সন্ন্যাসধর্ম ঠিক ঠিক পালন করা খুব কঠিন, বিশেষতঃ তোমার মতো যুবকের পক্ষে। আমি তোমাকে বেদান্তশাস্ত্র পড়াব; এতে তোমার বুদ্ধি মার্জিত হবে আর তুমি যথার্থ সন্ন্যাসীর জীবনযাপনে সক্ষম হবে।" চৈতন্যদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সার্বভৌমের কাছে ব্রহ্মসূত্র পড়তে শুরু করলেন। ব্যাসদেবের বেদান্তদর্শন শঙ্করের ভাষ্য অনুযায়ী সার্বভৌম ব্যাখ্যা শুরু করলেন। ভক্তি-উপাসনা, সগুণ ব্রহ্মবাদ সব খণ্ডন করে ব্যাসসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় যে একমাত্র নির্গুণ নির্বিশেষ অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব, ভাষ্য অবলম্বনে এই সিদ্ধান্ত সার্বভৌম স্থাপনা করতে লাগলেন। ভগবদ্‌ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেব এ-রকম ব্যাখ্যা শুনে প্রাণে বিষম ব্যথা পেলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। সাত দিন এভাবে কেটে গেলে সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার, তুমি চুপচাপ বসে থাক। বোঝ কি বোঝ না, কিছুই জানতে পারি না।" চৈতন্যদেব বললেন, "সূত্রের অর্থ অতি সুন্দরভাবেই বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা বুঝতে পারছি না; সূত্রের অর্থকে ঢেকে রেখে আপনি ভাষ্যব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। সূত্রের মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা না করে আপনি কল্পনা-অর্থের দ্বারা তা আচ্ছাদিত করে দিচ্ছেন। দেখুন, বেদ হচ্ছে স্বতঃপ্রমাণ; সেই বেদ বা শ্রুতির মধ্যে উপনিষদ্ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। উপনিষদের মুখ্যার্থ নিয়েই ব্যাসদেব এই ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন। আপনি মুখ্যার্থ বাদ দিয়ে গৌণার্থ কল্পনা করে ব্যাখ্যা করছেন,—শব্দের অভিধা-বৃত্তির বদলে লক্ষণা বৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছেন। স্বতঃপ্রমাণ বেদের শব্দের অর্থের জন্য লক্ষণা-বৃত্তি করলে স্বতঃপ্রামাণ্যেরই হানি হয়। ব্যাসদেবের সূত্র হচ্ছে সূর্যকিরণের মতো। শঙ্করের ভাষ্যরূপ মেঘের দ্বারা তা আচ্ছাদিত হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বেদ-পুরাণ ব্রহ্ম বলতে সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবানকে বোঝাচ্ছে। উপনিষদ্ যেখানে তাঁকে নির্বিশেষ বলছেন,সেখানে তাঁর প্রাকৃত অবস্থাকে নিষেধ করে অপ্রাকৃতকে স্থাপন করছেন। সৃষ্টির পূর্বে 'তদৈক্ষত প্রজয়া বহু স্যাম্' এই সকল শ্রুতিতে বলা হচ্ছে, ব্রহ্মের যখন বহু হতে ইচ্ছা হল, তখন তিনি প্রাকৃত শক্তিকে অবলোকন করলেন। এখন এই দেখার কাজ চোখের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু তখনো প্রাকৃত চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দের সৃষ্টি না হওয়ায় এসব ইন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃতত্বই প্রমাণিত হচ্ছে। উপনিষদে বলা হচ্ছে, যা থেকে সব কিছু এসেছে, যার দ্বারা জীবিত থাকে আর অন্তে যাতে প্রবেশ

করে তাই ব্রহ্ম। প্রথমটিতে ব্রহ্ম অপাদান কারক, দ্বিতীয়টিতে করণ কারক আর তৃতীয়টিতে তিনি অধিকরণ কারক। এই তিনটি কারকের সমাবেশ সবিশেষ ব্রহ্মেই সম্ভব, নির্বিশেষে নয়। সুতরাং উপনিষদের মুখ্যার্থ ধরলে ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ আনন্দস্বরূপ বিগ্রহ, তিনি নিরাকার, নির্বিশেষ নন।

“ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি বা চিদ্‌শক্তির তিন অংশে তিনটি রূপ—সৎ অংশে সন্ধিনী শক্তি, চিৎ অংশে সংবিৎ আর আনন্দ অংশে তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। যে ব্রহ্মে স্বাভাবিকভাবেই তিন শক্তি রয়েছে, ভাষ্যকার তাঁকে কি না নিঃশক্তিক বলছেন। ঈশ্বর হচ্ছেন মায়াধীশ আর জীব হচ্ছে মায়াধীন—এই ভেদ না মেনে এদের কি না অভেদ বলা হচ্ছে। সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত মূর্তি ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে যিনি সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র বলেন, তিনি পাষণ্ড ও অস্পৃশ্য। ব্যাসদেব জীবের উদ্ধারের জন্য সূত্র রচনা করলেন, কিন্তু ভাষ্যের এই মায়াবাদ শুনলে সর্বনাশ হয়। পরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ, বিবর্তবাদ নয়। ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’ ইত্যাদি সূত্রে পরিণামবাদের কথাই বলা হয়েছে। চিন্তামণি নিজে অবিকারী থেকেও যেমন রত্নরাশি প্রসব করে, তেমনি ঈশ্বর তাঁর অচিন্ত্য শক্তিতে ইচ্ছামাত্রে এই জগৎ-রূপে পরিণত হয়েও নিজে অবিকারী থাকেন। ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি চারটি বেদবাক্য বেদের একদেশ বলে কখনো মহাবাক্য হতে পারে না ; সমস্ত বেদের আশ্রয়, ঈশ্বর স্বরূপ, বিশ্বাশ্রয় প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য।”

চৈতন্যদেব ব্যাস-সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে এ-রকম বহু দোষ দেখালেন। সার্বভৌম তাঁর সঙ্গে বিচার শুরু করলেন। কিন্তু বহু শাস্ত্রে সুনিপুণ, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিবান পুরুষ শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবের সঙ্গে তিনি পেরে উঠলেন না। তিনি তর্কে পরাজিত হলেন। তখন চৈতন্যদেব বললেন ঃ “এতে শঙ্করের দোষ নাই ; স্বয়ং ভগবানই তাঁকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। মহাদেব ভবানী দেবীকে পদ্মপুরাণ গ্রন্থে [৬২ অধ্যায় ৩১ শ্লোক] বলছেন, ‘মায়াবাদকে মিথ্যা শাস্ত্র এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলে সকলে জানে ; ব্রাহ্মণ হয়ে কলিতে আমিই এই মত প্রচার করেছি’।” একথা শুনে সার্বভৌম বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেলেন। চৈতন্যদেব বললেন, “আপনি অবাক হবেন না ; ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ—শ্রীমদ্‌ভাগবত বলছেন ঃ

‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥’
[১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায় ১০ শ্লোক]

অর্থাৎ শ্রীহরির এতাদৃশ গুণাবলী যে যাঁদের সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেছে, যাঁরা আত্মজ্ঞ তাঁরাও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন।”

চৈতন্যদেবের সঙ্গে কথাবার্তা বিচার ও মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের হৃদয়ে বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। তাঁর অনুভব হলো যে, সাক্ষাৎ কৃষ্ণই জীবকে প্রেমভক্তি শেখাতে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। আত্মগরিমা, অহংকার, পাণ্ডিত্যাভিমান বিসর্জন দিয়ে তিনি প্রভুর শরণাগত হলেন চৈতন্যদেব কৃপা করে সার্বভৌমকে প্রথমে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ, পরে মোহন মুরলীধর কৃষ্ণরূপ দেখালেন। সার্বভৌম প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্তব-স্তুতি শুরু করলেন; ভক্তিভাবে বিগলিত সার্বভৌমকে চৈতন্যদেব আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রেমের আবেশে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার দেখা গেল। তিনি আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। জ্ঞানী ও পণ্ডিত বাসুদেব পরম ভক্তে পরিণত হলেন। পরবর্তী কালে তিনি ভক্তিসম্বন্ধীয় বহু বিখ্যাত শ্লোক রচনা করে ভক্তমহলে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

সার্বভৌমের সঙ্গে বিচার ছাড়া আরেকজনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের শাস্ত্রবিচার হয়েছিল। তিনি কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী। বৃন্দাবনে যাবার পথে কয়েকদিন এবং ফেরার পথে মহাপ্রভু দুমাস কাশীতে অবস্থান করেন। মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন কাশীর দশনামী সন্ন্যাসীদের মণ্ডলেশ্বর। তিনি অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানমার্গ প্রচার করতেন এবং ভগবদ্‌ভক্তি ও উপাসনামার্গের উপর কটাক্ষ করে শাস্ত্রযুক্তির সাহায্যে ব্রহ্মের রূপকল্পনা এবং সগুণ সাকার উপাসনা ভ্রান্ত বলে প্রচার করতেন। সন্ন্যাসিমণ্ডলীর এক সমষ্টি ভাণ্ডারায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রবিচার হয় এবং সার্বভৌমের মতো তিনিও পরাজিত হন। এর কয়েকদিন পরে চৈতন্যদেব পঞ্চগঙ্গাঘাটে স্নান করে বিন্দুমাধবহরির দর্শন করেন।

শ্রীভগবানকে দর্শন করার পর আনন্দে ভক্তগণ সঙ্গে হরি সংকীর্তন শুরু করলেন। ভজন-কীর্তন খুবই জমে উঠল। একটু পরে আনন্দের আবেশে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ তিনি অপরূপ নৃত্য শুরু করলেন। শত শত লোক এই দেবদুর্লভ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে আনন্দে হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল। প্রকাশানন্দ স্বামীও শিষ্যদের নিয়ে সেখানে কোন কারণে উপস্থিত হয়েছিলেন। সংকীর্তনের শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে জনতার সঙ্গে মিশে দেখতে গেলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর এই ভাবোন্মত্ত নৃত্য দেখে তিনি আত্মসংবরণ করতে পারলেন না; আবিষ্টের ন্যায় শিষ্যদের নিয়ে তিনিও সংকীর্তনে যোগ দিলেন। চৈতন্যদেবের ভাব সংবরণ হলে তিনি প্রকাশানন্দ স্বামীকে দেখতে পেয়ে ভক্তিভাবে তাঁকে প্রণাম করলেন। কিন্তু প্রকাশানন্দের শুষ্ক হৃদয় তখন ভক্তির রসে হয়ে উঠেছে মধুর, সরস ও সজীব। তিনি মহাপ্রভুকে বিনীত প্রার্থনা জানালেন শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে ভক্তিমার্গের রহস্য ব্যাখ্যা করার জন্য। মহাপ্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতকে ভক্তিমার্গের প্রধান সিদ্ধান্তগ্রন্থের উচ্চাসনে বসিয়ে বললেন যে, এটিকে বেদ, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের সার বলা যেতে পারে। এতে সগুণ নির্গুণ দুই ব্রহ্মেরই কথা বলা আছে; পরমেশ্বরের তত্ত্ব ও লীলাকথা বিশেষরূপে এখানে আলোচিত হওয়ায় এই গ্রন্থপাঠে ভগবৎ-তত্ত্বের জ্ঞান-ভক্তিভাবের স্ফুরণ ঘটে। এর পর মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের উক্তি আর ভাগবতের অনুরূপ শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনটিরই একবাক্যতা দেখালেন। প্রকাশানন্দ তাঁর সঙ্গে তত্ত্বকথায় বেশ কয়েকদিন আনন্দ কাটান। চৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কট্টর জ্ঞানী পরিণত হলেন একনিষ্ঠ ভক্তে। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি বৃন্দাবনে কাটিয়েছিলেন।

ওপরের দুটি বিচার আর মহাপ্রভুর বিভিন্ন সংলাপ ও কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ে বহু মত গড়ে উঠেছে। শঙ্করাচার্য বলেন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আত্যন্তিক অভেদ। মধ্বাচার্য বলেন আত্যন্তিকভেদ, ভাস্করাচার্য বলেন সম্বন্ধটা হচ্ছে ভেদাভেদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ভেদবাদী বা অভেদবাদী নন, তাঁরা ভেদাভেদবাদী। কিন্তু এই ভেদাভেদবাদ ভাস্করাচার্যের ভেদাভেদবাদ অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই ভেদাভেদ সম্বন্ধের মূল কারণ হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ জীব হলো ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান বলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকবে। তাঁরা উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের বহু উল্লেখ করে তাঁদের মতকে স্থাপন করেন। "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধায়ত একে॥" (২।৩।৪৩)—জীব ব্রহ্মের অংশ (অংশ ও অংশীতে স্বরূপতঃ অভেদ)। আবার নানাব্যপদেশাৎ—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে নানা অর্থাৎ ভেদের উল্লেখও আছে। 'অন্যথা চাপি'—ভেদব্যতীত অন্য রূপ অর্থাৎ অভেদের উল্লেখও আছে। যেমন দাশকিতবাদিত্বম্। অথর্ববেদে ব্রহ্মসূক্তে সব মানুষকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে অভেদও আছে। উক্ত সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্যও লিখেছেন যে, অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গে যেমন ভেদ আছে, আবার উষ্ণতার দিক দিয়ে তারা অভেদ। তেমনি জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে, আবার চৈতন্যের দিকে তারা অভেদ। সুতরাং ভেদাভেদ উভয়ই বিদ্যমান বলে জীব ব্রহ্মের অংশ।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, শ্রুতিতে ভেদ এবং অভেদ। দু-রকমেরই বহু বাক্য পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি একই উপনিষদে ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দেখা যাচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে, বলা হচ্ছে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই (অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম।) (৬।৮।৭)। এটি অভেদবাচক বাক্য। আবার বলা হচ্ছে (৩।১৪।১)। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলানিতি শান্ত উপমীত।"—সকলই ব্রহ্ম, (যেহেতু) ব্রহ্ম হতে সব কিছুর উৎপত্তি তাঁতে স্থিতি এবং তাঁতেই লয়। শান্ত চিত্তে তাঁর উপাসনা করবে। ব্রহ্মকে উপাসনা করার কথা বলা হচ্ছে। সুতরাং ব্রহ্ম হচ্ছেন উপাস্য আর জীব হচ্ছে উপাসক। অতএব এখানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করা হচ্ছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আমরা এ-রকম ভেদবাচক ও অভেদবাচক দু-রকমের বাক্যই পাচ্ছি। একই শ্রুতিতে যখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক ও অভেদবাচক বাক্য-

সকল আছে এবং অন্যান্য বহু শ্রুতিতেও সে-রকম রয়েছে, তখন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ বা আত্যন্তিক অভেদ—কোন সম্বন্ধই শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। তাহলে পরস্পরবিরোধী বাক্য একই শ্রুতিতে থাকত না। সুতরাং প্রকৃত সম্বন্ধ হচ্ছে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র রচনা করেছেন। এই গ্রন্থেও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্থাপন করা হয়েছে। শ্রীজীবগোস্বামী বহু সূত্রের উল্লেখ করে তাঁর তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। এখানে একটির উল্লেখ করা হচ্ছে। "উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুণ্ডলবৎ" (৩।২।২৭) ॥ উভয়ব্যপদেশাৎ (জীব ও ব্রহ্মে ভেদ এবং অভেদ এই উভয় প্রকার উল্লেখ আছে বলে) অহিকুণ্ডলবৎ (সাপ ও তার কুণ্ডলীর অনুরূপ বলা যেতে পারে)। সাপ যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, তখন সাপ ও কুণ্ডলী, স্বরূপে উভয়েই সাপ,—এই হিসাবে তারা অভেদ। আবার সাপ ও কুণ্ডলীকে ঠিক এক বলা চলে না। তারা ভিন্ন; সুতরাং তাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। সেরকম ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে চিৎ অংশে কোনও ভেদ নেই বলে তারা অভেদ। কিন্তু ব্রহ্ম হলেন বিভু চিৎ। আর জীব, অনু চিৎ। জীব ব্রহ্মের চিৎ কণ অংশ—এ-হিসাবে তাদের মধ্যে ভেদ আছে। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা, মায়াতীত [মায়ার অধীশ্বর] আর জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান, সৃষ্ট বস্তু, মায়া কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অশেষ দুঃখের আকর, ইত্যাদি কারণে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে। "অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২]—ব্রহ্ম জীব থেকে ভিন্ন এবং অধিক। এরূপে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একই সঙ্গে নিত্য ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ থাকাতে তাদের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত হলো।

শক্তি ও শক্তিমনের অবিচ্ছেদ্যত্বের উপরেই অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন। তাঁদের এই স্বীকৃতি মুখ্যতঃ শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্ ও গীতা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির অবিচ্ছেদ্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ,—আগন্তুক নয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ-সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, কস্তুরীর গন্ধকে যেমন কস্তুরী থেকে পৃথক করা যায় না, দাহিকা শক্তি বা উত্তাপকে যেমন অগ্নি থেকে পৃথক করা যায় না, সেরকম শক্তিকেও শক্তিমান থেকে পৃথক করা যায় না। আচ্ছা, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে শুধুমাত্র অভেদ বর্তমান, না কি ভেদও বর্তমান? কস্তুরীর দৃষ্টান্তটাই ধরা যাক। যেখানে কস্তুরী সেখানেই গন্ধ; কস্তুরী থেকে গন্ধকে কিছুতেই আলাদা করা যাচ্ছে না,—অতএব তারা অভেদ। কিন্তু যেখানে কস্তুরী দেখা যাচ্ছে না, ঘরের এক কোণে লুকানো আছে, সেখানেও কস্তুরীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, কস্তুরীর বহির্দেশেও যখন কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হচ্ছে, তখন তারা একেবারে অভিন্ন, তাও মনে করা চলে না। অতএব দেখা গেল, কস্তুরী এবং তার গন্ধের মধ্যে অভেদমনন যেমন দুষ্কর, ভেদমননও সেরকমই দুষ্কর।

জীবগোস্বামী তাঁর 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে (৩৬-৩৭ পৃঃ) এই কথাই বলেছেন। শক্তিকে স্বরূপ থেকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলে তাদের ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলে অভেদ প্রতীত হয়। তাই শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদ স্বীকার করতে হয় আর এই ভেদাভেদ যে অচিন্ত্য, তাও স্বীকার করতে হয়। শক্তি বলতে জীবগোস্বামী ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি—এই তিন শক্তিরই কথা বলেছেন। সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের সমস্ত বস্তুর সঙ্গেই ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

এই তত্ত্বের প্রবর্তক ও অনুগামীরা বলেন যে, এতে সব শ্রুতিবাক্যের প্রতি সমান মর্যাদা দেখানো হয়েছে, ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক বলে কিছু শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা দেখানো হয়নি, ব্রহ্মের শক্তিকে অস্বীকার করে ব্রহ্মকেও শূন্যত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। মুখ্যবৃত্তি ত্যাগ করে শ্রুতির ব্যাখ্যা করার সময় লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া হয়নি, ইত্যাদ ইত্যাদি। যাইহোক, এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে আমরা জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলির সুন্দর সমন্বয় দেখতে পাচ্ছি। আর জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলে অংশ-অংশীজ্ঞানে জীবব্রহ্মের ভেদাভেদও চমৎকারভাবে এখানে স্থাপনা করা হয়েছে।

আত্মদীপ দাও জ্বেলে

(বুদ্ধদেবকে নিবেদিত)

সচ্চিদানন্দ ধর

‘প্রেয়ে’র সুবর্ণপাত্রে গুপ্ত ‘শ্রেয়’-ধন।
পরিহরি মিথ্যাদৃষ্টি, করিয়া যতন
অনাবৃত করিয়াছ সেই সত্যজ্ঞানে—
শ্রেয়ের সুস্থিত প্রজ্ঞা-প্রশান্তি-নির্বাণে।
বিচারের, বৈরাগ্যের অষ্ট মার্গ ধরি
চারি আর্য-সত্যালোকে দেখালে প্রচারি
আত্মদীপ-বলে জীব হয় ‘তথা’-গত,—
যথা জন্ম-জরা-মৃত্যু সর্ব অপহৃত।
আমার এ-মিথ্যাদৃষ্টি, প্রেয়-প্রলোভন
জন্ম হতে জন্মান্তরে করেছে প্রেরণ
সত্যের সন্ধানে। যুগ হতে যুগান্তরে,
লক্ষ নবজাতকের পরীক্ষা আগারে—
খুঁজিয়া হয়েছি ক্লান্ত সেই ‘শ্রেয়’ ধনে।
আত্মদীপ দাও জেবলে, প্রজ্ঞা-বোধি-জ্ঞানে।

দেড়শো বছর পারে

(শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদিত)

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

দেড়শো বছর ধরে
তোমার স্মরণে যারা দীপ জেবলে রাখে,
তারা এও জানে,
হাজার বছর পারে
তুমি তবু অনির্বাণ দীপ্যমান শিখা,
সৌম্য, সমাহিত, সুস্মিত, সুন্দর,
অলৌকিক জ্যোতির পদ্ম
নিহিত মিলনসূত্রে নিখিল প্রাণের।
(ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়)
এ বিশ্বের অনাহত হৃৎকেন্দ্রে
নিত্য আবির্ভাব।
তাই তো প্রণাম চলে
কালের সমুদ্র বেয়ে
কালহীন দিগন্তের পারে।
(অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ)

শুধু মানুষই পারে

(স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদিত)

সন্দীপন বিশ্বাস

বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে শুনি মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি।
তখন মনে হয় আমি কেন ফুল ফোটাতে পারি না—
কেন জন্ম দিতে পারি না সোনালী ধানের।

আবার কখনও কখনও
বুকে বাজে পর্ণমোচীর খসখস শব্দ,
সুদূর প্রান্ত থেকে তখন
ভেসে আসে ঘুঘুর ডাক—
দিশেহারা হয়ে খুঁজি মানুষের মুখ।

আমরা তো মহেঞ্জোদড়ো থেকে উঠে আসিনি।
তবে কেন শূন্যতায় ভরে থাকে মানুষের বুক?
মানুষই পারে ফুল ফোটাতে—
শুধু মানুষই পারে জন্ম দিতে সোনালী ধানের।

বড় সাধ

(রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত)

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিস্মৃতির বাতায়ন, চোখ রাখি যেই
বিস্ময় মানি, সেই কুরুক্ষেত্র দেখে।
সেই সব ক্ষয়ে যাওয়া থাম
অনেক বিস্মৃত নাম, একটি আধারে।
তারি মাঝে দীর্ঘ তরু, পল্লবিত বহু
বাহু মেলি পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি নাশে।
ঊর্ধ্বমুখী মাথা তার আকাশের গভীরতা মাপে,
প্রশাখার অন্তরালে
স্নিগ্ধ-দুগ্ধ ছায়া ধরে রাখে,
শিকড়ে আকড়ি থাকে মাতৃপদভূমি,
নিত্য নৃত্য চুমা দিই পত্র পুষ্প ফলে।
বড় সাধ সেই শাখে দোলনা দিই বাঁধি,
তারি তলে দুটি অন্ন বাঁধি, সব খাই
ক্ষণকাল বাসা বাঁধি
বন্ধুর দীর্ঘ পথ যেতে,
কোলাহল অন্তরালে কই কিছু কথা।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

(ইনি যোগিনী মা নামে পরিচিতা ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবনকাহিনীর কতক কতক অংশ তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তদবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।)

আজ যথার্থ'ই পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখন গৃহে ছিলাম, তখন এই পথটি বড় লোভনীয় বলিয়া মনে হইত। পাখি যেমন খাঁচার পথ খুঁজে, তেমনি মন দিবানিশি পথের চিন্তাই করিত। কেবলই মনে হইত, "কবে আমি পথে বাহির হইব ?" আজ এতদিনের সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে, যথার্থ'ই আমি পথে বাহির হইয়াছি।

আমি আজ পথে বাহির হইয়াছি। ভাবিলে যেন আশ্চর্য হইতে হয়। কিন্তু জগতে 'আশ্চর্য' বলিয়া কোন কথা নাই। আমি যে পথে বাহির হইয়াছি, একথা যেন আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এই তো তারকেশ্বরের রাজপথ, চৈত্রের গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসীর দল পথে ভিড় করিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে গগনভেদী স্বরে "বম্ বম্ মহাদেব" ধ্বনি উঠিতেছে। সেই পথেরই একপ্রান্তে আমি দাঁড়াইয়া আছি। দাঁড়াইয়া আছি কেন, না, সন্ন্যাসীর ভিড়ে পথে চলিতে পারিতেছি না, নহিলে আমার অতি উৎকণ্ঠিত মন কখনও এমন ভাবে পথপ্রান্তে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিত না।

মনের এই দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি যে কতদিন হইতে হইয়াছে, ভাবিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। মনে হয় যেন আমার জ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই এই উৎকণ্ঠারও সঞ্চার হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহা নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে আর এই পূর্ণ একবিংশতি বৎসরে সেই উৎকণ্ঠা আর সকল ভাবের আশ্রয়ই পরিহার করিয়া কেবলমাত্র একই ভাবে একাগ্র হইয়া এতই বলশালী হইয়াছে যে,—আমি কুলকন্যা, কুলবধূ—আজ আমাকে পথের বাহির করিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরে বিবাহান্তে প্রথমে শ্বশুরগৃহে গিয়া রুগ্ন স্বামীর শুশ্রূষার ভার পাইয়াছিলাম। পুতুল খেলায় যেমন আমার তন্ময়তা ছিল, দেখিলাম পীড়িতের শুশ্রূষায়ও মন ঠিক সেই রকমই লাগিয়া গিয়াছে। তখন কি চিন্তা ছিল ? কখন স্বামীকে পথ্য দিতে হইবে, কখন ঔষধ খাওয়ার সময়, কোনটি ত্রুটি হইল, এই সকল বিষয়গুলিই তখন আমার চিন্তার বিষয় ছিল। আমি প্রায় সর্বদাই স্বামীর প্রয়োজন মতো তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিতাম। নববধূর এরূপ আচরণ অনেকে পছন্দ করিতেন না। এইরূপ আচরণে যে আমার নিন্দা হইত না তাহা নহে। কতবার স্বকর্ণে নিন্দা শুনিয়াছি,—কিন্তু কি যে বিচিত্র স্বভাব, নিন্দা হইবে এজন্যও কিছুমাত্র শঙ্কা হইত না।

পিত্রালয়ে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "চুরি করিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন, মিথ্যা কথা বলিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন।" কিন্তু আমি মাঝে মাঝে চুরি করিয়া—ঘরে চাল আলু আর পোস্ত থাকিত তাহাই লইয়া—ভিখারীদের দিতাম। —"শ্যামসুন্দর যদি পাপ দেন ?" তখনই শ্যামসুন্দরের কাছে যাইতাম, বার বার প্রণাম করিয়া বলিতাম, "শ্যামসুন্দর পাপ দিও না" "শ্যামসুন্দর পাপ দিও না।।" শ্যামসুন্দরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি হাসিতেছেন, "নাঃ, শ্যামসুন্দর আমায় কখনো পাপ দেবেন না। না হলে হাসছেন কেন ?"—আমাদের সেই শ্যামসুন্দর। যে কাজটায় বিপদে পড়ি,—শ্যামসুন্দর সহায় আছেন। দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে বলি, "শ্যামসুন্দর, দুধ যেন উথলে পড়ে

না।" কড়ি খেলতে বসে বলি, "শ্যামসুন্দর, আমার যেন ভাল দান পড়ে।"

আমাদের সেই শ্যামসুন্দর। স্কুলে গিয়া শুনিলাম—মেম বলিতেছে, "মাটির ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা; একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। তোমরা বল, প্রতিমা পূজা করিব না।" মেয়েরা সমস্বরে বলিত, "প্রতিমা পূজা করিব না।" শুনিয়া রাগে আমার শরীর জ্বলিতে লাগিল। শ্যামসুন্দর তো মাটির ঠাকুর, শ্যামসুন্দর নাকি মিথ্যা? স্কুলের ছুটি হইলে সকল মেয়েদের একত্র করিয়া বলিলাম, "ভাই, তোমরা বল তো শ্যামসুন্দর সত্য না মিথ্যা?" আমার কথায় সকল মেয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহারা একথা মোটেই ভাবে নাই। আমি বলিলাম—খুব রাগিয়াই বলিলাম, "শ্যামসুন্দর সত্য, সত্য, সত্য, কখনও মিথ্যা নয়। কাল স্কুলে গিয়া মেমের সম্মুখে এই কথা বলিবে।" তখনই মেমের হস্তস্থিত সেই সুগোল লম্বা বেতগাছটি সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে বেতকে কে না ভয় করে? আবার আমার রাগকেও ভয় আছে। কয়েকজন সকাতরে বলিল, "মেম, ভাই তা হলে মারবে।" মার খাবার ভয়? শঙ্কা কাহাকে বলে, সে জ্ঞান বিধাতা আমায় দেন নাই। কেন? না, সকল মেয়েই প্রহার যে কেমন মধুর তাহা বেশ জানে, কেবল আমিই জানি না। প্রহারের সঙ্গে আমার এ পর্যন্ত কোন পরিচয় নাই। আমি বলিলাম, 'আমি সকলের আগে দাঁড়াইব। মেম যদি মারে, আমি মার খাইব, বলিব যে আমিই সকলকে শিখাইয়াছি।"— মেয়েরা আমার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আবার ভয়ও পাইতে লাগিল। যাহা হউক শেষে তাহাদের ভয় সারিয়া গেল।

পরদিন বিদ্যালয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময় আমি সকলের আগে দাঁড়াইয়াছি, মেয়েরা আমার কিছুদূরে পিছনে। মেমের হাতের কাছে সেই সুগোল লম্বা চকচকে বেতগাছটি আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া আমার ভয় হইবে কি, "শ্যামসুন্দরকে মিথ্যা বলিয়াছে?" তাহাই মনে করিয়া রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বলিতেছিল। যাই মেম বলিল, "মাটির ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা," তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চৈস্বরে বলিলাম, "মাটির ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য,।" আমার পিছন হইতে মেয়েরাও সেই সঙ্গে যোগ দিল। মেম একেবারে নির্বাক, রাগ করিবে কিনা তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, অবশেষে অঙ্গুলি সংকেতে আমাকে নিকটে ডাকিয়া মৃদু মিনতির স্বরে বলিল, "শরৎ, বালিকা নষ্ট করিও না।"

মেয়েরা ভাবিয়াছিল, আমাকে খুব মার খাইতে হইবে, কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত হইল। সেইদিন হইতে মেমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল। আমি দুপুর বেলায় জলখাবারের ছুটির সময় বাড়ি হইতে কোঁচড়ে করিয়া কাঁচা পেয়ারা আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে একত্রে যখন খাইতাম, মেমকেও দুটি-একটি দিতাম। অবশেষে মেমের পেয়ারার উপর অতিশয় লোভ দেখিয়া একদিন এক ঝুড়ি পেয়ারা আনিয়া দিয়াছিলাম।

শ্যামসুন্দরের কথা যখন উঠিল, তখন সেই গোয়ালার ছেলের কথা আরও দু-একটি বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মা কথায় কথায় বলিতেন, "শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে।" মার কথায় প্রথম প্রথম আশ্চর্য হইতাম, ভাবিতাম—ব্রাহ্মণ হইয়া আমরা গোয়ালার ছেলের প্রসাদ কেমন করিয়া খাই? তার পরে দেখিলাম শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে হইলে কি হয়, শ্যামসুন্দরই বাড়ির রাজা। যখন ধানভানা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের জন্য চাল হইতেছে; যখন ডাল ভাঙ্গা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের ডাল, হাত দিতে নাই; এইরকম তরিতরকারি দই সবই শ্যামসুন্দরের; বেশি কথা কি, খাবার জিনিস মাত্রই শ্যামসুন্দরের। তবে আর শ্যামসুন্দরের প্রসাদ না খাইয়া উপায় কি, প্রসাদ না খাইলে কি উপবাস করিয়া মরিব? মাকে যখন বলিলাম, "মা, শ্যামসুন্দর যে গোয়ালার ছেলে, প্রসাদ খাইলে জাত যায় না?" মা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "এখনও কি আর গোয়ালাই আছে, বামুন বাড়ি থেকে থেকে বামুন হয়ে গিয়েছে।" মা আমাদের চেয়েও শ্যামসুন্দরকে বেশি ভালবাসিতেন। একদিন ভোগ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মা স্নান করিয়া আচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র উঠিয়াই বলিলেন, "ভোগে চুল আছে; আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়া হয় নাই।" আমায় হাত দিয়ে দেখিয়ে গেল যে, ভোগে এই এত

বড় একগাছি চুল আছে, আমার খাওয়া হয় নাই।" ভোগ আনিয়া ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, যথার্থই ভোগের ভিতর চুল, দেখিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন—"বেলা কি কম হয়েছে, শ্যামসুন্দর উপবাসী আছেন।" আমাদের যদি কোনদিন খাওয়া না হয়, মা কি তাহলে কাঁদেন? জ্বর হয়ে যে কতদিন উপবাস করে থাকি, মা একদিনও তো কাঁদেন না। আর আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়ার বেলা হয়ে গেল বলে মার এত কান্না!

শ্যামসুন্দরকে আমরা যখন তখন গিয়া প্রণাম করিতাম। বাবা মাকে কখনও প্রণাম করি নাই; ঠাকুরের নিকট বাবা মা যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, কেবল সেইরকম প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রণাম করিতে হয়, মা অনেক করিয়া বলিয়াছেন। কেমন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, আমি তো জানি না; সকলের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, সকলে দেখিয়া হাসিয়া খুন, "এ আবার কি প্রণাম?" আবার কেহ বা "এত বড় মেয়ে প্রণাম করিতেও জানে না?" বলিয়া নিন্দা করে।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি।—নিন্দা হইবে এ ভয় আমার কোন কালে ছিল না, সেজন্য অনেকের প্রিয় হইতাম আবার অনেকের অপ্রিয় হইতাম। স্বামী কিছুদিন ভুগিয়া সেবার আরাম হইলেন, মনে হইল যেন বেশ সুস্থ হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে।" আমি হাসিতে লাগিলাম, "আমি বাঁচাইলাম! বেশ তো কথা! আমি কি শ্যামসুন্দর নাকি?" স্বামী আরাম হইলেন, কিন্তু ভাল করিয়া খাইতে পারিতেন না। আমার উপর রাঁধিবার ভার ছিল। রাঁধিতে গিয়া আমার কান্না আসিত, এত অল্প তেল ঘিয়ে কেমন করিয়া রাঁধিব? স্বামী রান্নাঘরে আসিয়া দেখেন, আমি কাঁদিতেছি; কান্নার কারণ জানিয়া ভাঁড়ার হইতে লুকাইয়া তেল ঘি আনিয়া দিতেন। সকলে রান্নার খুব সুখ্যাতি করিত, কিন্তু যিনি লুকাইয়া তেল ঘি আনিয়া দিতেন, অর্ধেক সুখ্যাতি তাঁহার হওয়া উচিত ছিল।

ছয়মাস কাটিয়া গেল। ছয়মাস পরে আমি একখানি পত্র পাইলাম, সেখানি আমার স্বামীর কোন ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম, আমার স্বামী ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। আরও তিনি আমায় লিখিয়াছেন, আপনার স্বামীর জীবনের স্থায়িত্বের অনেকটা আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে। কেন, তিনি তাহা একেবারে খুলিয়া লেখেন নাই, তবে তাহার কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

আমার বয়স তখন ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। আকস্মিক বজ্রপাতের তুল্য এই পত্রখানি পাইয়া সহসা আমি বালিকাকাল হইতে একেবারে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলাম। বৈধব্যই যে আমার অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় বিধিলিপি, সেইদিন তাহা বুঝিলাম। সে বিধিলিপি কতদিনে পূর্ণ হইবে, স্বামীর আয়ু—আর কতদিন তাহা আমি জানি না, শ্যামসুন্দর জানেন; কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটিতেও যেন তাঁহার এই অল্পাবশিষ্ট দিন আরও হ্রাস না হইয়া যায়, সেজন্য আমি সেইদিন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। একটি একটি দিন যাইত; আর ভাবিতাম, জানি না আর কতদিন!—সে কি দারুণ উৎকণ্ঠা! প্রতি মুহূর্ত সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের প্রতীক্ষায় রহিতাম আমি যে এ অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত যাপন করিতাম, স্বামী তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না। তখন আমি এতই কপটতা শিখিয়াছিলাম।

যে দিনের প্রতীক্ষায় দিনে দিনে পলে পলে এই দারুণ উৎকণ্ঠা বহন করিতেছিলাম—সে দিন আসিল, আবার সে দিন অতীতও হইয়া গেল। কিন্তু আমার কি উৎকণ্ঠার শেষ হইল? তাহা তো নয়! মন যখন শোকের জড়তা হইতে কিছু পরিমাণে মুক্ত হইল, তখন প্রথমেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল, "এ জীবন কিসের জন্য?" কেন যে বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া থাকিয়া যে কি লাভ হইবে, এইরূপ প্রশ্নের অঙ্কুশে মন দিবানিশি আহত হইতে থাকিল। গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইব, তখন এই আবার এক নূতন কামনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইব, এই এক নূতন উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল।*

[ক্রমশঃ]

---

* উদ্বোধন ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৭-২২

বিশেষ-নিবন্ধ

উদ্বোধন-কে অভিনন্দন

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

উদ্বোধন-এর একানব্বইতম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। এই সংখ্যার অঙ্গসজ্জা এবং রচনাবলী এককথায় অপূর্ব। উদ্বোধন-এর সম্পাদকীয় বিভাগকে যে কি বলে অভিনন্দন জানাব তা জানি না। স্বামী গম্ভীরানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়লাম। তাঁর মতো মনীষী সত্যিই বিরল। উদ্বোধন-সম্পাদক এবং উদ্বোধন-এর সঙ্গে সংযুক্ত সকল সেবকবৃন্দকে আমার বিনীত নমস্কার ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশিষ্ট ও শক্তিশালী লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ উদ্বোধন নিরলসভাবে তার সমাজগঠনের কাজ করে চলেছে। বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রিকার একটি আলাদা মর্যাদা ও স্বতন্ত্রতা আছে। এটি আমি আমার ছেলেবেলা থেকে লক্ষ্য করে আসছি। উদ্বোধন শতবর্ষের পথে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে দেখে গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করছি। এই অগ্রগতি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের অগ্রগতি; আর সেই অগ্রগতিতেই দেশ ও জাতির কল্যাণ।

অসময়ের ভাবনা

আনন্দ বাগচী

বিশ্বাসের অবিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসের বিশ্বাস ঢের ভাল। স্বামীজীও এমনি করেই বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তবে স্বামীজীর মানসিক প্রস্তুতিব সঙ্গে আমাদের আজকের বিক্ষিপ্ত মানসিকতার তুলনা করছি না। তাঁর অবিশ্বাস ছিল বৈজ্ঞানিক চেতনা-প্রসূত। সন্দেহের কষ্টিপাথরে খতিয়ে দেখা। প্রথমেই যোগের দিকে, গুণের দিকে না গিয়ে বিয়োগের পথে, ভাগের পথে যাওয়া। অর্থাৎ নকলের ভেতর থেকে আসলকে খুঁজতে যাওয়ার বদলে আসলের ভেতর থেকে নকলকে আগে খুঁজে বের করা। কারণ খাদ যে চেনে, খাদকে যে টেনে বের করতে পারে খাঁটি সোনা তো তার হাতের মুঠোয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই 'মাথায় বৃহৎ জটা, ধুলায় কাদায় কটা' ক্ষ্যাপা পরশমণি খুঁজে পায়নি, কারণ সে শুধু অন্ধের মতো পরশমণিকেই খুঁজে বেড়িয়েছে। আসলে সত্যকে পেতে হলে আগে মিথ্যাকে খুঁজে বের করতে হবে, ঈশ্বরকে জানতে হলে আগে মায়াকে জানতে হবে। নইলে মুক্তি নেই। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই তত্ত্বটুকুকে বিনা আয়াসে জেনে রাখলে তো চলবে না।

এই দিক থেকে এ যুগের সৌভাগ্য এই যে আমরা মিথ্যার মধ্যেই অষ্টপ্রহর বাস করছি, পাঁকের মধ্যেই শরীরে-মনে গড়াগড়ি খাচ্ছি। আমরা কেউই নিখাদ নই, খাদ আমাদের অঙ্গের ভূষণ, অন্তরের আবরণ। মিথ্যাকে, ছলনাকে খুঁজতে তাই আমাদের দূরে দৌড়তে হবে না, নাগালের বাইরে হাতড়ে মরতে হবে না। সে তো একেবারে চোখের সামনেই রয়েছে। বলতে কি ভ্রূমধ্যেই অবস্থান করছে। তবু মিথ্যাকে চিনতে পারছি না, আলাদা করে নিতে পারছি না কেন? আসলে আমাদের সেই বোধটুকু জন্মায়নি, সেই বিশ্বাস, প্রতীতি নেই বলে। পাগলের যেমন বোধ নেই বলে নর্দমার পাঁকে এবং পরমান্নে ফারাক নেই। বিষ্ঠায় সে দুর্গন্ধ পায় না। আমরাও তেমনি নিজের অন্তরের মালিন্যের যখন দুর্গন্ধ পাব, বর্জ্যপদার্থকে তখনই অনায়াসে বিয়োগ করে নিতে পারবো। সারকে পেতে হলে আগে অসারের জ্ঞান চাই। চোখের সামনে যা বড় মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে ছোটকে যোগ করে আরও বড়োর মরীচিকা তৈরি করে লাভ নেই। ছোটকে তার তলায় রেখে বাদ দিতে হবে। বড়োর উচ্চতা তাতে কিছুটা কমতে পারে

কিন্তু তার ফল ভালই হয়, সে নাগালের মধ্যে আসে। বিয়োগ অঙ্কই বলুন আর ভাগই বলুন তার তো এই রীতি, এই নিয়ম। একেই বোধ হয় শত্রুভাবে ভজনা করা বলে। শর্টকাটের রাস্তা।

প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কথাটিও ঘুরিয়ে বললে একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যান্বেষণের প্রয়োজন নেই, রোগকেই কারণসহ খুঁজে নাও। তাকেই কারণ কর, তাহলেই তোমার কায় এবং কাম্য আবরণমুক্ত হবে।

এত কথা মনে হবার কারণ, আজকের মানুষের ধর্মের প্রতি অস্থির আবেগ। ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিক পথের দিকে এক ধরনের অবচেতন ঝোঁক এসে গেছে সাধারণ মানুষের। এক জাতীয় অপ্রকৃতিস্থ পক্ষপাত। তারা টাই-টেরিলিন পরেও গাছ-পাথর-মন্দিরে মাথা ঠেকাচ্ছে। ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, ধর্মসভায় জড়ো হচ্ছে, মঠে আশ্রমে তীর্থস্থানে দর্শনার্থী হচ্ছে। গুরু খুঁজছে, দীক্ষা নিচ্ছে। আসলে ভেতরের অশান্তি আর অবিশ্বাস তাদের ঠুকরে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা থিতু হতে পারছে না। একেই অবিশ্বাসের বিশ্বাস বলেছি। অনিশ্চয়তার মধ্যে, দোলাচল অবস্থার মধ্যে ঈশ্বর ভাবনা। মনের মধ্যে দৃঢ়তা আসেনি, ঋজুতা আসেনি—জ্ঞানতঃ চেতনা-সঞ্জাত এই অন্বেষণ নয়। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা নয়। কর ফাঁকি দিয়ে পুঁজি বাড়ানোর মতো, কালো টাকার স্তূপ জমানোর মতোই এও এক ধরনের সুলভে পুণ্যার্জনস্পৃহা। আখের গুছোনোর আকাঙ্ক্ষা। এটা ঠিক স্বামীজীর অবিশ্বাসের বিশ্বাস নয় বলাই বাহুল্য। এটা নিজের প্রতি আস্থার অভাব, অবিশ্বাসের খড়কুটো আঁকড়ানো।

তবু একে ভাল লক্ষণই বলব। মরা মরা করতে করতে রামে পৌঁছানো। রামরূপ যার মনের মধ্যে আসছে না, মুখের অক্ষম বচনই তাকে হয়তো কখনো কূলে পৌঁছে দেবে। এক্ষেত্রে অর্ধসত্যও ভাল এই কারণে যে, সে অন্ততঃ অর্ধমিথ্যাকে বর্জন করতে পেরেছে।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক, নিশ্চয় বুঝতে পেরে গেছেন আমার এই স্বতঃপ্রণোদিত লেখাটির নেপথ্যের কারণটি কি ? বলা বাহুল্য, তবু বলি। আপনাদের পত্রিকার একানব্বই বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি আমার হাতে এসেছে। এবং সব মিলিয়ে সংখ্যাটি আমাকে কিঞ্চিৎ ভাবনায় ফেলেছে।

কোন মানুষকে যখন শতায়ু হবার কামনা জানানো হয় তখন ঠিক ধরা যায় না এই প্রার্থনাকারীটি তাঁর যথার্থই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, না মিত্রবেশী শত্রু। অন্ততঃ আজকের দিনে। শতায়ু হওয়া অভিশাপের সামিল। তাই শত্রুর পক্ষেই এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা জানানো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন পত্রিকাকে বিশেষ করে মাসিক পত্রিকাকে শতায়ু হওয়ার ভবিষ্যৎ কামনা জানানো তো শত্রুর পক্ষে সম্ভবই নয়, অতি বড় মিত্রের পক্ষেও না। বাংলা দেশে কোন সাহিত্য মাসিকপত্রই সম্ভবতঃ পঞ্চাশে পা দেয়নি। কিন্তু সেই পঞ্চাশ বছরের কাল্পনিক রেকর্ডও ভেঙে উদ্বোধন আজ একানব্বইতে পা দিল। অর্থাৎ শতাব্দী-পূর্তির দশকে পা দিল। তার জীবনে যাকে বলে নিরানব্বইয়ের ধাক্কা এল অন্য অর্থে। এই বয়সে স্বভাবতই তার কোমরে বাত, শিরদাঁড়ায় বক্রতা এবং চোখে ছানি এসে যাবার কথা। মস্তিষ্ক-বিকৃতি এবং স্মৃতিভ্রংশ হবার কথা।

দীর্ঘজীবী পত্র-পত্রিকামাত্রের ক্ষেত্রেই এই জরা-বিকার আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। শেষ পর্বে পৌঁছে প্রত্যেকেই প্রায় জনপ্রিয়তা এবং পূর্ব সুনাম হারিয়ে ফেলেছে। বেঁচে থাকার দায় বাড়িয়ে রীতিমতো বোঝায় পরিণত হয়েছে। তার আদর্শে গ্রহণ, সজীবতায় ক্ষয় ধরেছে। উত্তর প্রজন্মের সঙ্গে তার যেমন সেতুবন্ধন ঘটেনি, তেমনি অতীতের সপ্রতিভ প্রাণশক্তির সঙ্গেও তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সমযুগ, সমকালের উপযোগী হবার মতো আধুনিকতা সে আর অর্জন করতে পারেনি।

কিন্তু সমস্ত রকম আবেগশূন্য হয়েও বলব উদ্বোধন এর ব্যতিক্রম। শুধু ব্যতিক্রমই না, সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে কালোত্তীর্ণ হবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপর্যুপরি কঠিন সময়ের নানা সংকটসন্ধি পার হয়ে নিজের জোরে ন-টি দশক পার হয়ে আসা সামান্য কথা নয়। বিশেষ করে উদ্বোধন-এর মতো একটি ধ্রুপদী পত্রিকার পক্ষে কাজটা ছিল আরও কঠিন। এই লঘুচিত্ত মানুষের রুচিবিকারের যুগে গল্প উপন্যাস কিংবা মনোরঞ্জনী চটক ছাড়াই পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করার চেষ্টার মধ্যে

সত্যাগ্রহী সদাচার, অনন্য চরিত্র এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন। এই তিনটি ঈপ্সিত বস্তুই এই পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান। এর সম্পাদক ও সেবক-কর্মীদের একাগ্র শ্রম এবং নিরলস শুভচিন্তা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। উদ্বোধন প্রচলিত অর্থে সাহিত্য পত্রিকা নয়। জনমানসে ধর্মসংস্কৃতির বীজ বপন ও আধ্যাত্মিকতার উদ্বোধনই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এক পবিত্র জীবনাদর্শ এবং জগদ্দর্শনই তার প্রাণশক্তি। পরিবার নিঃস্পৃহ, সংসারপ্রবাসী হয়েও সমাজচারী কিছু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ব্যক্তির হাতে এই ঐতিহ্যবহনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠার অভাব কোন দিনই অনুভূত হয়নি; কিন্তু একটা আশঙ্কার সম্ভাবনা বরাবরই ছিল। দ্রুত পরিবর্তমান যুগরুচি ও সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে অবহিত না থাকার সম্ভাবনা। বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাল না মেলার ঝুঁকি। যুগোপযোগী হয়ে উঠতে না পারলে মন্ত্রও অচ্ছুৎ এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ঐতিহ্য হয়ে উঠে নির্বাসনের অচলায়তন। পত্রিকার আয়ু যত বাড়ে ততই তাকে নবীকরণের মধ্য দিয়ে আধুনিক হয়ে উঠতে হয়। তার ধারণ ও গ্রহণ-ক্ষমতা বাড়াতে হয়। আত্মসংস্কারের উদারতা এবং আবেগনিরপেক্ষ যৌক্তিকতার প্রয়োজন হয়। একদা যা ছিল ভক্তি-নির্ভর, চোখ-কান-বোজা বিশ্বাসের বিষয়, তাকেই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ে পৌঁছে দিতে হয় উত্তরকালে।

উদ্বোধন প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতি নিয়ে, ধীরলয়ে এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই দিকেই এগোচ্ছিল বলেই এই সচেতন এবং অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস হয়তো অনেকেরই চোখে পড়েনি। তবে বিগত বছর থেকেই তার আঙ্গিক এবং আত্মিক রূপান্তর ক্রমশঃ টের পাওয়া যাচ্ছিল। এ বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই সেটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দেখে একটা জিনিস স্পষ্ট হলো যে, উদ্বোধন তার আদর্শ এবং ঐতিহ্য থেকে চ্যুত না হয়েও অতীতের অনুবৃত্তিতে, গতানুগতির অচলায়তনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। এক কথায় বলা যায়, সে সেকালের পত্রিকা হয়েও সেকেলে হয়ে যাচ্ছে না। আজকের হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেও সমকালীনতার পথেই চলেছে। সমাজের নাড়ির স্পন্দন সঠিকভাবে ধরতে পারাই যথার্থ আধুনিকতা। উদ্বোধন তা পেরেছে। আর তাই আজকের মানুষের অনেক কাছে এসে পড়েছে। এর ফলে অনুমান করছি তার গ্রাহক সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এর সত্যতা আমার কাছে অনুমানমাত্র হলেও পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ হাতে কলমে প্রমাণ পেয়েছেন। তবে গ্রাহক সংখ্যা অল্প কিংবা বিস্তর যাই বেড়ে থাকুক, তার প্রচার যে অনেক ব্যাপ্তি পেয়েছে, আরও অনেক বেশি করে সাধারণ মানুষের নজরানা পেয়েছে তার প্রমাণ এই পত্রিকার পাতায় অনেক নতুন নতুন লেখক-লেখিকার আবির্ভাব। এঁদের নতুন বলছি এই জন্যে যে, যাঁরা ছিলেন ভিন্ন ক্ষেত্রের থিতু লেখক, নিছক সাহিত্যের কারবারী, কল্পনাজগতের অভিযাত্রী তাঁরা এই প্রথম ধর্মভাবনার জগতে নিবিষ্ট হচ্ছেন। তাঁদের অনতিস্পষ্ট বিশ্বাস ক্রমে প্রত্যয়ের দিকে এগোচ্ছে। এটা যে নিছক নাম ছাপানোর উদ্দেশ্যে নয়, লেখাগুলিই তা প্রমাণ করবে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে অনেক সাহিত্য প্রকাশকও ক্রমে দেখা দিচ্ছেন। তাঁদের বিজ্ঞাপনগুলিও প্রমাণ করে তাঁরা এটা নিছকই সৎকর্মে দাতব্য চাঁদা হিসাবে দিচ্ছেন না, তাঁদের প্রত্যাশিত পাঠকলোকচক্ষুর বাইরে অকারণ তালিকা পেশ করছেন না। তাঁদের ব্যবসায়িক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই নির্ভুলভাবেই আঁচ করে নিয়েছে যে, এই বিজ্ঞাপন নেহাতই অজায়গায় পেশ করা হচ্ছে না। একই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, মঠাশ্রমও এখানে মধ্যযুগীয় প্রাচীর প্রথায় আবদ্ধ নেই। সে তার অঙ্গনকে প্রসারিত করে উদার গ্রহণ ও ধারণ-শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মন আর অমূল তরুর মতো অস্থিতিস্থাপক কল্পবৃক্ষের মতো ভাসমান নয়, ক্রমশঃ তার শিকড় সদ্যোজাত বিশ্বাসের মাটিতে নেমে আসছে। অবিশ্বাসের ভিতর থেকে এই জায়মান বিশ্বাসকে আমি অভিনন্দন জানাই; সকলের কাছেই আজ আমার একটিই প্রার্থনা ঃ সত্যেরে লও সহজে।

উদ্বোধন-এর নব্বই বছরে পদার্পণ : সমকালীন পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতে

সুদীপ বসু

মাত্রই এক পঙ্‌ক্তিতে সংবাদটি প্রকাশ করা যেত— উদ্বোধন পত্রিকা নব্বইতম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তথাচ প্রধান বাংলা সংবাদ পত্র-পত্রিকাগুলি এবং ইংরেজি পত্রিকাও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাপারটিকে তুলে ধরলেন। তা কি কেবল এই কারণেই—উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা? নিঃসন্দেহে তা অন্যতম প্রধান কারণ। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বকে শিরে ধারণ করেই এই পত্রিকার যাত্রা শুরু। কিন্তু সে-কারণ 'অন্যতম প্রধান', এটাও স্মরণে রাখতে হবে। উদ্বোধন বাংলা পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে একটি নতুন মাইলস্টোন স্থাপন করল। দীর্ঘ উননব্বই বছর একাদিক্রমে চলার পর সে নব্বইতে পা ফেলেছে —এই ঘটনাটি পাঠক-সাধারণকে নাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

"চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নাই।··· মোচ্ছব এমন মাচাবি যে দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়।" স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ চিঠিতে লিখেছিলেন এ-কথা। তারপর কিভাবে দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে, যাকে আক্ষরিক অর্থেই সংগ্রাম বলা যায়, উদ্বোধন প্রকাশিত হয়েছিল, তা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। বঙ্গসংস্কৃতির যাঁরা ধারক এবং বাহক, সেইসব দিক্‌পাল মানুষেরা গত নব্বই বছর ধরে এই পত্রিকার পোষকতা করেছেন তাঁদের লেখার মাধ্যমে। সেই বৃহৎ তালিকা উপস্থিত করবার চেষ্টা করব না, শুধু কয়েকজনের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করব: গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এস. ওয়াজেদ আলি, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কালিদাস নাগ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নজরুল ইসলাম, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ।

সাহিত্যবোদ্ধা এবং সাহিত্যসেবী অনেক সন্ন্যাসীই সম্পাদক হয়ে নানা সময়ে এসেছেন এবং উদ্বোধনের হাল ধরেছেন যোগ্য হাতে। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ছাড়াও অপরাপর বিখ্যাত সম্পাদকদেব মধ্যে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী সুন্দরানন্দ এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

বিষয়বৈচিত্র্য এই পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্ম, দর্শন ছাড়াও সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজ এবং সমাজবিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বহু বিষয়ে অনেক উচ্চমানের লেখাই উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকেও লেখা অনূদিত হয়েছে। এইসব লেখা প্রকাশের জন্য যে-কোন মুক্তমনা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাই গর্ববোধ করতে পারে।

নব্বই বছর আগে উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যা এবং সেই বছরে প্রকাশিত অন্যান্য সংখ্যাগুলির কি কি সমালোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তার দু-একটি নমুনা প্রসঙ্গতঃ দেখে নেওয়া যেতে পারে। বৈশাখ, ১৩০৬, 'সাহিত্য' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'প্রস্তাবনা'র অংশ-বিশেষ উদ্ধার করে লিখেছিলেন:

"ইহা অপেক্ষা আর কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে কিনা জানি না। উদ্বোধনের আহ্বানে এই চির-নিদ্রিত জাতি উদ্বুদ্ধ হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। আমরা আর কখনও বিবেকানন্দ-স্বামীর বাংলা রচনা দেখি নাই। শুনিলাম ইহা তাঁহার প্রথম রচনা। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার নূতন ভঙ্গি ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়—সত্যই প্রতিভা সর্বতোমুখী।"

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সংখ্যার সাহিত্য পত্রিকায় লেখা হয় "শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীর 'বর্তমান ভারত' চিন্তাপূর্ণ সুপ্রবন্ধ চিন্তাশীলের সুপথ্য। 'তিব্বত-ভ্রমণ' চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মাত্রায় অতি অল্প। ৮৯ সংখ্যায় 'পরমহংসদেবের উপদেশ' পরম রমণীয়।" 'বিলাত-

যাত্রীর পত্র’ (পরবর্তী কালের ‘পরিব্রাজক’) উদ্বোধনেই প্রথম বেরিয়েছিল। সমাজপতি সাহিত্য পত্রিকার কার্তিক ১৩০৬ সংখ্যায় সে-সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

“উদ্বোধন। আশ্বিন। ‘বিলাতযাত্রীর পত্র’ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত। স্বামীজীর পত্রসমূহ চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার বহুদিন সঞ্চিত বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ”

পুরনো ইতিহাস এক পলক দেখে নেওয়া গেল। এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক আধুনিককালের দিকে। উদ্বোধনের নব্বই বছরে পদার্পণের ঘটনা এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটিকে সানন্দে অভিনন্দন জানান একাধিক দৈনিক পত্র ও সাময়িক পত্র। সেসব সংবাদে প্রাধান্য পেয়েছে ঃ

(ক) নব্বই বছর ধরে উদ্বোধনের অব্যাহত প্রকাশ
(খ) স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠা
(গ) ধর্ম-সম্প্রদায়ের পত্রিকা হয়েও মুক্তদৃষ্টি এবং বিষয়বৈচিত্র্য
(ঘ) উত্তরোত্তর উন্নতি এবং পরিবর্তিত কালের প্রয়োজন অনুভব করে সম্পাদনা

লক্ষণীয়, ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকায় একদা সম্পাদকের থেকে প্রধান লেখকের নাম বড় অক্ষরে মুদ্রিত বলে যে বিদ্রূপ করা হয়েছিল (“প্রধান লেখক সম্পাদক হইতে বড়”), তাকেই একালের বুদ্ধিজীবীরা অতিশয় গৌরবের বিষয় বলে ঘোষণা করেছেন।

“১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯ সালে ‘উদ্বোধন’-এর সেই জন্মলগ্ন থেকেই সে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, আজ তার নব্বই বছরের জন্মদিনেও এটাই তার প্রথম পরিচয়।/ বাঙালীর অধ্যাত্মজীবনের মুখপত্র হিসেবে তার সংগঠনী অবদান যেমন সামান্য নয়, তেমনি বাঙলা সাহিত্যের চিরায়ত ধারার সঙ্গে তার নিবিড় যোগসূত্রও অনস্বীকার্য।” —১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ তারিখের দেশ পত্রিকার ‘সাহিত্য’ বিভাগে উদ্বোধনের নব্বই বছর উপলক্ষে দু-পৃষ্ঠাব্যাপী যে-লেখাটি বেরিয়েছিল, সেখানে ছিল ঐ বাক্যগুলি। লেখকের নাম প্রবন্ধের শেষে ছিল না, কিন্তু উদ্বোধনের চরিত্র নির্ণীত হয়েছিল যথাযথভাবেই। একদিকে যেমন উদ্বোধনের যাত্রাপথের অনুপুঙ্খ ইতিহাস, অন্যদিকে তেমনই নিপুণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে অপরাপর পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্বোধনকে বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রয়াস ঃ

“অবশ্যই একটি সাময়িক পত্রিকার জীবনে নব্বই বছর খুব অল্প সময় নয়। সাময়িক পত্রিকার এই অকালমৃত্যুর দেশে সাময়িক কথাটাই তার আক্ষরিক বিশেষণ। এদেশে অধিকাংশ বিখ্যাত পত্রিকাই ছিল এক-পুরুষের কাগজ। বিশেষ এক সম্পাদক-পুরুষের ব্যক্তিত্ব তথা চারিত্র্যশক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ হারাবার পর সাময়িক পত্রিকা কদাচিৎ সেই আদর্শ আর কর্মক্ষমতা নিয়ে বেঁচেছে, যদিই বা বেঁচেছে, সেই প্রতিষ্ঠাতার মহিমান্বিত পতাকাকে সে বেশিদিন উড্ডীন রাখতে সক্ষম হয়নি। সেই কারণেই পত্র-পত্রিকার সাময়িক আয়ুষ্কাল প্রলম্বিত হলে তার জীবদ্দশাতেই বেদনাদায়কভাবে তার মধ্যে জরা ও মৃত্যুলক্ষণ দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি।

“তাই উদ্বোধন পত্রিকার নব্বই বছরে পদার্পণ স্বভাবতই আমাদের বিস্মিত করেছে। গোটা ভারতবর্ষের কথা সঠিক জানা নেই, তবে এই বাংলায়, বাঙলা ভাষায়, এর নিকটবয়স্ক কোন সাময়িক পত্রিকাই আজ আর জীবিত নেই, কোনদিন ছিলও না। উনিশ শতকের প্রান্তসীমা থেকে যাত্রা শুরু করে বিশ শতকের শেষ পর্বে যে-শতবর্ষের উপকণ্ঠে সে এসে পৌঁছেছে সেই দীর্ঘকালের ইতিহাস তার নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগামিতারই ইতিহাস। আর এই ইতিহাস সৃষ্টির পিছনে আছে চিরন্তন বাংলার সেই ‘আনন্দমঠ’রূপী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উৎসর্গিত প্রাণ নির্ভীক সন্তানবৃন্দের এক অব্যাহত পরম্পরা তাঁদের সচেতন কর্মকুশলতা। একথা বলাই বাহুল্য বহু কালান্তরের সাক্ষী এই পত্রিকার বিগত উননব্বই বছর কিছু সঙ্কট-সংশয়হীন সুসময় ছিল না, অনেক বন্ধুর পথই তাকে অনেক আয়াসে অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে কৃতিত্বের কথা এই, অনিয়মিত প্রকাশের বিঘ্নিত আয়ু নিয়ে সে বিমর্ষভাবে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচেনি কোনদিন। এই জানুয়ারিতে প্রকাশিত তার নববর্ষ সংখ্যাটি আর একটি বিশেষ কারণে প্রোজ্জ্বল, এটি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীরও স্মরণিকা। উদ্বোধন কেবল একটি পত্রিকা মাত্র নয়, এক অসামান্য লোকমানস সংগঠনের সক্রিয় প্রেরণা।”

রচনাটি এখানেই শেষ হয়নি, দীর্ঘ স্থান নিয়ে লিখিত হয়েছে কোন্ পটভূমিকায় স্বামীজী এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শকে জীবনায়নের মধ্য দিয়ে বাস্তবিক করে তুলতে এবং তাকে আবিশ্ব ব্যাপ্তি দিতে বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মিশন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তাঁর মনশ্চক্ষের সামনে খ্রীস্টিয় চার্চের সংগঠনী সাফল্য। এই সময় থেকেই তাঁর মনের মধ্যে মিশনের উপযোগী একটি মুখপত্র প্রকাশের ইচ্ছা ঘনীভূত হতে থাকে। নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অনেকের সামনে তিনি ভারতবাসীর ধর্মীয় বোধোদয়ের উদ্দেশ্যে এবং আত্মবোধনের সংকল্পে একটি বাঙলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা প্রথম ব্যক্ত করেন।...

"কিন্তু এই ভারতভিক্ষুর হাতে সেদিন পত্রিকা প্রকাশের উপযোগী অর্থ ছিল না। তাঁর ব্যস্ত, শ্রমক্লিষ্ট জীবনে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করার মতো অবকাশও ছিল না। কিন্তু সংকল্প ছিল। তাই ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পরেও বছর দেড়েক অপেক্ষা করতে হয়েছিল উদ্বোধনের আত্মপ্রকাশের জন্য।...

"উদ্বোধনের সেই মাঘ সংখ্যায় বিবেকানন্দের সুলিখিত এক দীর্ঘ প্রস্তাবনাও ছাপা হয়েছিল। তাতে উদ্বোধনের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং কর্মপন্থা ও পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সেই আলোচনার এক টুকরো উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যাক।—

'...সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল।... রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?... এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।...' এই শতাব্দী তখনো শুরু হয়নি, এরকম এক সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে বিবেকানন্দের কলমে যে ওজস্বী নতুন রীতির গদ্য প্রকাশ পেয়েছে সে হিসেবেও তাঁর এই প্রস্তাবনা অবিস্মরণযোগ্য। আমাদের সমাজ ও অধ্যাত্ম জীবনে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের প্রবন্ধ রচনায় এবং বাঙলা গদ্য-ভাষার তাঁর যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা ছিল সেকথা আজ আমরা অনেকেই তলিয়ে দেখি না। চলিত গদ্যের ঋজু ধারালো অথচ প্রাণসঞ্চারি অন্তঃসলিল ধারাটি তিনি এনে দিয়েছিলেন বাঙলা গদ্যে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে তিনি যে বিশেষভাবেই ভাবিত ছিলেন তা দেখতে পাই উদ্বোধন প্রকাশের দু-মাস আগে ১৮৯৮ সালের নভেম্বরে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে এক আলাপচারিতে :

'...বাঙলা ভাষাটিকে নতুন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব।...ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্ন মাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই।'...

"১৮৯৯ সালের ১৪ জানুয়ারি (১ মাঘ ১৩০৫) স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় উদ্বোধন বেরলো পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে।... ত্রিগুণাতীত চার বছর পত্রিকাটির সম্পাদনার যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রেস চালিয়েছেন। এই প্রেসে তখন বাইরের কাজও করা হত। ত্রিগুণাতীতানন্দ ছিলেন এক অসাধ্যসাধক কর্মীপুরুষ। উদ্বোধনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে আক্ষরিক অর্থেই তিনি নিজের প্রাণপাত করে গেছেন। তিনি শুধু কাজের মানুষই ছিলেন না, ছিলেন এক আত্মভোলা মজার মানুষ। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন ও কৃপণতা করে তিনি কাগজ আর প্রেস চালাতেন।... বিবেকানন্দ যে ঠাট্টা করে উদ্বোধন-কে উদ্বন্ধন বলতেন, এই কথাটা তাঁর জীবনে যেন সত্যি হয়ে উঠেছিল। গলার দড়ির মতোই জীবনমৃত্যুর মাঝখানের সবচেয়ে নিকটবর্তী বাস্তব সত্য হিসেবেই এর দায়দায়িত্বকে তিনি গলায় তুলে নিয়েছিলেন। ব্যাপারটা যদি বা কারো দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকে বিবেকানন্দের যায়নি।

"উদ্বোধনের প্রথম চার বছরের সংখ্যাগুলির সম্পাদনার পর তাঁর ওপরে ভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯১৫ সালের ১০ জানুয়ারি সানফ্রানসিস্কোতে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর উদ্বোধনের সম্পাদনা মোট বাইশবার হাত বদল করেছে। ব্যাপারটা উদ্বোধনের পক্ষে ভালই হয়েছে। পালা করে স্বল্পকালের মেয়াদে সম্পাদক বদলের ফলে সম্পাদনায় যেমন শৈথিল্য আসেনি, তেমনি কাল-বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ব্যক্তিত্বের নিযুক্তি

ঘটায় জনসংযোগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হবার সুযোগ পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা তাকে ক্রমাগত আধুনিক ও তরুণ রেখেছে। গৃহাশ্রমের পাশে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসাশ্রমের লোকচর্চা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। সৃজনশীল লোকরঞ্জনধর্মী সাহিত্যের সীমান্তরক্ষীর মতো উদ্বোধনের ধ্রুপদী চিন্তাধারা, অধ্যাত্মবুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির মধ্য দিয়ে জাতির মানসসংগঠনের দায়িত্ব পালন করে এসেছে। সাংসারিক মানুষের জীবনে ফলিত ধর্মবোধের উৎসারণ ঘটাতে তাঁর সুনির্বাচিত রচনাবলীর অবদান অনস্বীকার্য।

"প্রথমাবধিই উদ্বোধনের যাত্রা শুরু হয়েছিল বহু স্মরণীয় মূল্যবান রচনার পুঁজি নিয়ে। এই সব রচনার মধ্যে স্বামীজীর রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, ভাববার কথা, পরিব্রাজক (বিলাতযাত্রীর পত্র), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (আংশিক), স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শ্রীরামানুজ চরিত, ভগিনী নিবেদিতার স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্বামী-শিষ্য-সংবাদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"…[উদ্বোধনে] নানা শিরোনামে নানা উপদেশ, উদ্ধৃতি ও গল্পের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী মানবধর্ম ও জনপথের সরলীকরণের কথা, বৈদান্তিক বস্তুবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সামাজিক সাম্যবাদ, নব্যমানবতাবোধের ও জনসেবার আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়াও অনুবাদ ছিল এই পত্রিকার আর একটি উন্মোচনী বাতায়ন। ব্রহ্মবাদিন, প্রবুদ্ধভারত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বেদান্তদর্শন বিষয়ক রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটানো হয়েছে।

"কেবল সন্ন্যাসীবৃন্দের রচনাই নয়, মিশন-মঠের বাইরে সমাজের বহু চিন্তাশীল মনীষী ও খ্যাতকীর্তি লেখকদের রচনাও উদ্বোধনে সাদরে গৃহীত হয়েছে। ফলে গোটা সমাজের সমকালীন চিন্তাধারার সার নিষ্কাশনের দ্বারা এই উদারনৈতিক ধর্মপত্রিকাটি হয়ে উঠেছে মত বিনিময়ের ও ভাব সম্মিলনের ক্ষেত্র।

"স্বামী বিবেকানন্দের এই মানস পতাকা, যাবতীয় কুসংস্কারমুক্ত এই সমন্বয়ী পত্রিকাটি যাঁরা নব্বই বছর বহন করে এসেছেন তাঁরা স্বভাবতই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। এর প্রস্তাবনাকালে স্বামীজী লিখেছিলেন—যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য-বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহু কালার্জিত রত্নরাজি ভাসিয়া যায় ; ভয় হয়, প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায় ; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট' হইয়া যাই।

"বস্তুতঃ আমাদের সমাজে স্বামীজীর সেই আশঙ্কা এখন এক বেদনাদায়ক সত্যে পরিণত হয়েছে। এখন এমন এক সময় যখন মানুষের মন থেকে মানবিক মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতার সম্যক্ ধারণা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন কেউ আর কারও পরার্থপর শুভেচ্ছায় বিশ্বাস করে না। যেন তেন প্রকারে আত্মস্বার্থসিদ্ধিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। দেশের কাজ এখন আর সাধারণ মানুষের হাতে নেই দেশ-সেবার কোন পথই এখন আর লেবেলহীন মানুষের সামনে খোলা নেই। উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা সবই এখন সরকারি আমলা আর রাজনীতির শামলা পরা মানুষের মুঠোয়। অসাধারণ মানুষের সঙ্গে আসাধারণ মানুষের এখন শুধুই কাগজের বন্ধন, ভোটপত্রের পরোক্ষ সংযোগ। এই দুরূহ অবস্থায় এখন মানুষের মনের মধ্যে ধর্মবুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের সংক্রমণ ঘটানো আর ধৈর্যশীল অপেক্ষা ছাড়া জনকল্যাণের বাস্তবিক কোন পথই খোলা নেই। উদ্বোধন মানুষের সার্বিক হতাশা ও অতৃপ্তির মধ্যে সেই কাজই করে চলেছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮) বক্তব্য জানালেন নিজস্বভাবে। 'কলকাতার কড়চায়' নিবেদিত হলো উদ্বোধন পত্রিকার প্রতি 'সশ্রদ্ধ অভিবাদন' :

"নব্বই বছর আগে একটি পাক্ষিক পত্রিকার প্রস্তাবনায় যখন লেখা হল 'কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে ; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ। আমাদিগকে ওজস্বী কর ; হে বলস্বরূপ। আমাদিগকে বলবান কর।' তখন অচেতন পাঠকও অনায়াসে ধরতে পারবেন এমত বাণী বঙ্গভাষায় একজনেরই কলম থেকে বর্ষিত হতে পারে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রিকাটির নাম তাঁর

প্রদত্ত, 'উদ্বোধন'।...শিকাগো থেকে কিছুকাল আগে চিঠিতে লিখেছেন তিনি যে, 'চিরকাল চিৎকার ও কলমপেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য, সামান্য হলেও অনেক উত্তম' কিন্তু দৈনিক পত্রের জন্য স্বামীজীর আগ্রহ ক্রমশঃ তীব্রতর হল।... ধারাবাহিকভাবে এই পত্রে প্রকাশ পেয়েছিল বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত', তার পরে 'বিলাতযাত্রীর পত্র', দুই কিস্তি পরে সেই সমুদ্রস্বনিত ভাষায় লেখা ভ্রমণকাহিনী নাম পাল্টাল, 'পরিব্রাজক।' তাছাড়া বেরিয়েছিল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।... পত্রিকাটি শুধু ধর্মপ্রচারেই রত ছিল না, জ্ঞান ও প্রতিভার সর্ববিধ প্রকাশেই পত্রিকাটির পুণ্যকর্ম।... সেইসঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখব স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপরিমেয় কর্মশক্তিকে, প্রভূত ভোজনপ্রিয় সেই সাধক সারাদিন অভুক্ত থেকে পত্রিকার কাজ চালাতেন।... 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে তার শতবর্ষ যাত্রার পথে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন প্রেরণ করি।"

এছাড়া ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৮ আনন্দবাজার পত্রিকা নব্বই বছরে পদার্পণ সংবাদটি প্রকাশ করে অসংখ্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৫ জানুয়ারি স্টেটস্‌ম্যান বিশেষভাবে স্মরণ করেছিলেন—উদ্বোধন পত্রিকা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তন করেছিলেন।

১৫ জানুয়ারি বর্তমান পত্রিকায় লেখা হলো : "নব্বইতম বর্ষে একটি বাঙলা পত্রিকার পদার্পণ সাময়িক পত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।"

ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন যুগান্তর পত্রিকা। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রণবেশ চক্রবর্তী 'নব্বই বছরে উদ্বোধন' নাম দিয়ে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ রচনা লিখলেন :

"স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে পরিহাস করে বলতেন 'উদ্বোধন' নয়, 'উদ্বন্ধন'। সেই উদ্বোধনই সুদীর্ঘ ৯০ বছর অতিক্রম করে আজ শতবর্ষের লক্ষ্যে নির্ভয় যাত্রী।... বাস্তব অর্থেই বাঙলা সাময়িক পত্রের যদি কোন নির্মোহ এবং পক্ষপাত-দোষবর্জিত ইতিহাস কোনদিন রচিত হয়, তাহলে সেখানে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীর তিলে তিলে জীবন সমর্পণের ইতিবৃত্তটি হবে সব থেকে রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবেও এই পত্রিকার জন্ম, কিন্তু শুধুই ধর্মপত্রিকা নয়।... স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাবের ১২৫ বছর পূর্তি এবং উদ্বোধনের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটি যে-কোন চিন্তাশীল পাঠকের কাছেই একটি পরম সম্পদ।"

১৮ ফেব্রুয়ারি যুগান্তর পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল এক সংবাদ। 'বিশেষ প্রতিনিধি' উদ্বোধনের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে প্রশ্ন করেছিলেন :

"ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার মধ্যে অন্য কোন পত্রিকা কি একটানা ৯০ বছর ধরে অবিরাম চলেছে? প্রশ্ন করেছিলাম সংশ্লিষ্ট অনেককেই। কিন্তু কেউই দ্বিতীয় কোন পত্রিকার নাম করতে পারেননি।"

১০ এপ্রিল 'এই মুহূর্তে' শিরোনামে বর্তমান পত্রিকা লিখেছিলেন :

"...এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্বামীজী লিখিত প্রস্তাবনা থেকে 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতবর্ষের জনজীবনে নৈতিক অধঃপতন, ঘোরতর নিষ্ক্রিয়তা, সাহসিকতার অভাব, সর্বোপরি পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন, আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী জনজাগরণ। সেই জনজাগরণের স্বরূপ কেমন হবে, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি গ্রীক জাতির শৌর্য, বীর্য, কর্মোচ্ছলতার কথা স্মরণ করেছেন : 'ভূমধ্যসাগরের পূর্ব কোণে ... প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিত ... সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ় স্নায়ুপেশী-সমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল অধ্যবসায়সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যে একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। স্বামীজী বর্তমান যুগে এই জাতির যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইউরোপ ও আমেরিকাকে। তাঁরাই গ্রীক জাতির বিশিষ্ট গুণাবলীর যথাযথ কর্ষণ ও চর্চা করে চলেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন, 'চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা... আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।' ভারতীয় প্রাজ্ঞ মনীষার ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবধারায় আশ্রিত এমন এক জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার কথা তিনি বলেছিলেন, যেখানে রজোগুণের প্রভাবে অর্থাৎ বিজ্ঞান ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ কৌশলে

ঐহিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। ··· আর 'এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য'।”

কাটা কাটা বাক্যে সুন্দরভাবে মতামত জানিয়েছেন অনুতোষ ঘোষ কথাসাহিত্য শ্রাবণ ১৩৯৪ সংখ্যায় ঃ

“নব্বই বছরের বেশি পরমায়ু নিয়েও এই মাসিক পত্রিকা যুবশক্তিতে ভরপুর। এখন যেন নতুন করে এর দেহে নবযৌবন সঞ্চারিত হয়েছে।··· বর্তমান জাগ্রত মনের সব ক্ষুধারই খাদ্য এতে রয়েছে। এবং বলা বাহুল্য সুখাদ্য।”

উপসংহারে সমালোচক লিখেছেন ঃ “কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়াটাই বোধহয় বড় সেবা। উদ্বোধন এই সেবাকর্মে নিরবধিকাল উদ্বোধিত থাকুন।”

নব্বইতম বর্ষের উদ্বোধন শারদীয়া সংখ্যা সম্পর্কে বর্তমান পত্রিকা যে মন্তব্য করেছিল, তা উপন্যাস-গল্পহীন প্রবন্ধ-কবিতা-রম্যরচনা-স্মৃতিকথা সম্বলিত এই পত্রিকার গতিশীলতা এবং মুক্তদর্শন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সমালোচনা ঃ

“এবার সবার আগে হাতে এসেছিল উদ্বোধন পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। ··· উদ্বোধন পত্রিকার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র আছে। তাতে এমন কিছু প্রকাশিত হতে পারে না যা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নয়। স্বভাবতই এই জাতীয় পত্রিকার রচনায় খুব বেশি বৈচিত্র্য প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু পত্রিকাটি নিছক ভক্তিরসাশ্রয়ী বলে যাঁদের ধারণা, তাঁরা এর প্রবন্ধ, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা এমন কি ধর্মীয়তত্ত্বের আলোচনাগুলি পড়লেও বিস্মিত হবেন।···প্রবন্ধগুলি নানা তথ্যে ও তত্ত্বচিন্তায় পূর্ণ যা পাঠ করে চিন্তাশীল পাঠকরা ভূরিভোজনের আনন্দ পাবেন।”

এছাড়াও বর্তমান পত্রিকার 'এই মুহূর্তে' কলমে উদ্বোধন আষাঢ় এবং শ্রাবণ সংখ্যা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়েছিল।

উদ্বোধন অতঃপর নব্বই অতিক্রম করে একানব্বইতে পা দিয়েছে। সে-সংবাদও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রধান দৈনিক পত্রিকায় বেরিয়েছে। আনন্দবাজার (১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৯), যুগান্তর (১৮ জানুয়ারি), আজকাল (৮ ফেব্রুয়ারি), Amrita Bazar Patirka (১৮ জানুয়ারি), The Statesman (১৬ জানুয়ারি), The Telegraph (২৩ জানুয়ারি)।

১২ জানুয়ারি ১৯৮৯-তে আজকাল পত্রিকা এক পৃষ্ঠাব্যাপী বিবেকানন্দ-প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। উদ্বোধন-পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ একটি সুপাঠ্য রচনা লিখলেন—'উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-শরীর।' দীর্ঘ এবং সুলিখিত এই প্রবন্ধে পাওয়া গিয়েছিল উদ্বোধন পত্রিকা প্রবর্তনার পিছনে স্বামীজীর চিন্তাভাবনা, বাঙলা গদ্য ভাষাকে সবল করার প্রয়াস এবং জাতির দুর্বল দেহে নবশোণিত সঞ্চারের আন্তরিক ইচ্ছাকে। নিবন্ধের শেষ কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধারের প্রলোভন সংবরণ করা গেল না ঃ

“ 'উদ্বোধন'-এ স্বামীজী শুধু জাগরণের বাণী, উদ্বোধনের আহ্বান দিতে চেয়েছিলেন জাতিকে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'উদ্বোধন'-এ সাধারণকে কেবল Positive ideas দিতে হবে। Negative ideas মানুষকে weak করে দেয়।”

“স্বামীজীর বাণীকে মন্ত্র করে 'উদ্বোধন' এগিয়ে চলেছে শতবর্ষের দিকে। 'উদ্বোধন'-এর একানব্বইতম জন্মবর্ষে পদার্পণ এবং স্বামীজীর একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী সমাপন উপলক্ষে 'উদ্বোধন' স্বামীজীর সেই মহাবাণীকে—যে বাণীকে এতকাল সে তার প্রচ্ছদে বহন করে আসছে—জাতিকে পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঃ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—ওঠো, জাগো। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না'।”

নব্বইতে পদার্পণ এবং পূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধন যেভাবে সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে, তা এক কথায় বিস্ময়কর। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ললাটে বহু শতাব্দীর আয়ুষ্কাল। সেই আয়ুর দ্বারা উদ্বোধন পত্রিকার জীবনও চিহ্নিত—একথা বোধহয় বলা চলে। কিন্তু আরো একটি কথা, যে-কথা প্রায় সব পত্র-পত্রিকাই উদ্বোধন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—কালের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এই পত্রিকা এগিয়ে চলেছে কালান্তরের দিকে। নূতনের আবাহন এবং পুরাতনের অর্চন, সেইসঙ্গে মানুষের চেতনার সার্বিক জাগরণ—বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন, উদ্বোধন তার একক শক্তিতে সেই দুরূহ কাজ করার চেষ্টা করে চলেছে সময়ের হাতে হাত রেখে।

মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ

চুনীলাল বসু

…স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আমা অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট ছিলেন। আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ি তখন তিনি বি. এ. পড়িতেন। আমার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুর বাটীতে তিনি সর্বদা আসিতেন এবং তথায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই পরিচয় উত্তরকালে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া তাঁহার তিরোভাবের দিন পর্যন্ত আমাকে তাঁহার পবিত্র সঙ্গসুখলাভের আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

ছাত্রজীবনেই আমরা তাঁহার চরিত্রগত বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই জন্য তাঁহার সহপাঠিগণের হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাঁহারা অনেক বিষয়ে তাঁহার মত ও নেতৃত্ব বিনা বিচারে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতেন। মানুষকে পরিচালন করিবার উপযুক্ত শক্তি দিয়াই যেন প্রকৃতি তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচর্যব্রতধারী পূত-চরিত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কাহারো কাহারো স্বভাব নিষ্কলঙ্ক ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সর্বদা একত্রে থাকিলেও তাঁহার চরিত্র কখনো কোনরূপে মলিনতা-স্পৃষ্ট হয় নাই। তিনি আজীবন অধ্যয়নশীল ও জ্ঞানানুশীলনে রত ছিলেন। ছাত্রজীবনেও আমরা তাঁহার এই বৃত্তি অনুশীলনের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ লক্ষিত হইত। বি. এ. ক্লাসের পাঠ্য ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ ব্যতীত তিনি এই দুই বিষয়ে অনেকানেক পাশ্চাত্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারের গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বিভিন্ন মতামত সম্বন্ধে তিনি সর্বদা চিন্তা ও বিচার করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার তর্কশক্তি ও বিচারবুদ্ধি সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি, তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাচুর্য বিচারে অনেক স্থলেই তাঁহাকে অজেয় করিয়া তুলিত। বয়সে তিনি নবীন হইলেও অনেক প্রবীণ খ্রীস্টধর্ম-প্রচারক পণ্ডিতগণ খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ক বিচারে তাঁহার নিকট অনেক সময়ে অপদস্থ হইয়া যাইতেন। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ তর্কশক্তি ও বিচারপ্রিয়তা ছাত্রজীবনে তাঁহার বিপদের কারণও হইয়াছিল। ইহার ফলে এক সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বিবিধ ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলেও এবং তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করিলেও তাঁহার এই বিষম সংশয় নিরাকৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুদিনের জন্য এক প্রকার নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঈশ্বর আছেন কিনা, এই কঠিন সমস্যার সন্তোষকর সমাধানের জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা সর্বদা তাঁহার অন্তরে জাগরূক থাকিত।

এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরের সাধু পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনের আশ্চর্য ত্যাগ ও ভক্তির কাহিনী এবং তাঁহার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অপূর্ব ধারণা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন ও পরীক্ষা করিবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদয় হইল এবং কালবিলম্ব না করিয়া সংশয়-বিক্ষিপ্ত অথচ সত্যান্বেষী এই যুবক জিজ্ঞাসু হইয়া পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাহেন্দ্রক্ষণে গুরুশিষ্যের এই প্রথম মিলন সংঘটিত হইল; ধর্মজগতে ঐক্য-প্রতিপাদক অসাম্প্রদায়িক উদার মত প্রচারের ভিত্তি এই শুভক্ষণে স্থাপিত হইল।…

গুরুশিষ্যের এই শুভমিলনে আমরা ঈশ্বরের

মঙ্গলহস্তের প্রভাব স্পষ্টভাবে দর্শন করিতেছি। বিবেকানন্দের মতো প্রতিভামণ্ডিত শক্তিশালী পুরুষ জগতে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিলে সমাজের ঘোর অমঙ্গল ও অকল্যাণ সংসাধিত হইত। তাই ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে এরূপ অপূর্ব সংযোগ উপস্থিত হইল যে, পূর্ণ জ্ঞানের সামীপ্যে অবিলম্বে অজ্ঞান তিরোহিত হইল! আলোকের সংস্পর্শে অন্ধকার চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হইল। বিশ্বাসের নিকট অবিশ্বাস পরাজিত হইল। সত্যের নিকট অসত্য মস্তক অবনত করিল। গুরু, স্বীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া 'সর্বধর্মসমন্বয়'রূপ যে অমৃত উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই মিলনের ফলে শিষ্য-কর্তৃক তাহা জগতের মানুষকে বিতরণ করিবার শুভসংযোগ উপস্থিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কয়েকজন ধর্মসংস্কারক ও ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বেদবিদ্ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে জন্মদান করিয়া ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়াছেন। ইঁহারা কেহ বা বেদের, কেহ বা উপনিষদের ধর্ম, প্রচলিত অপর সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব মত প্রচারে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা এ-দেশে ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে সম্প্রদায় বিশেষে যে বিশেষ সুফল প্রসব করিয়াছে, সেবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে কেবল একজন মাত্র মহাপুরুষ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি সাধনাবলে প্রচলিত সকল ধর্মের মধ্যেই সত্যের প্রতিষ্ঠা অভ্রান্তরূপে দর্শন করিয়া, "বিভিন্ন ধর্মমত ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র", এই মহাসত্য প্রচার করিয়া পরস্পর বিবদমান ভিন্নধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত বিরোধ খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার প্রচারিত এই সত্য জগতের ধর্ম-ইতিহাসে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের এক অপূর্ব দান। পূর্বপূর্ব ধর্মপ্রচারক বা ধর্মসংস্কারকগণ, যিনি যখন যে ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন, তিনি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রচলিত অপর সকল ধর্মমতের নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ধর্মজগতে এত বিবাদ বিসম্বাদ, এত সংকীর্ণতা, এত অসহিষ্ণুতা, এত নিরপরাধের নিগ্রহ, এত নৃশংসতা, এত শোণিতপাত, কেবল এই মতবিরোধ হেতু সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবদমান ধর্মজগতে সমন্বয় (Harmony) ও শান্তি স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই উদার সার্বভৌমিক মহাসত্য প্রচার করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে শিষ্যরূপে স্বহস্তে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতবাসী হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে চিরদিনই উদারপন্থী। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় সমাগত জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের নিকটে হিন্দুর উদার ধর্মমতের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য ও মহত্ব উপভোগ করিতে হইলে তাঁহারই কথায় ও তাঁহারই ব্যবহৃত ভাষায় তাহার পরিচয় প্রদান করা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন :

"I am proud to belong to a religion which has taught to the world both tolerance and universal acceptence. We believe not only on universal toleration, but we accept all religions as true. I belong to a religion in whose sacred language, the Sanskrit, the word exclusion is untranslatable. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and of all nations of the earth. We have gathered in our bosom the purest remnants of the Israelites, a remnant which came to Southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny, I belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings: 'As the different streams have their sources in different places and mingle their water in the sea, O Lord, so the different paths which men take through different tendencies, various though they may appear, crooked or straight, all lead to Thee.' "

এই যে উপমা তিনি প্রদান করিয়াছেন, ইহা শিবমহিম্নঃস্তোত্রের একটি শ্লোক হইতে গৃহীত—প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে ইহা প্রত্যহ উচ্চারিত হয়। উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার ভাবে ইহা অতুলনীয়।

সংস্কৃত শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল ঃ

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

ইহার অর্থ এই ঃ

বেদ, সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জলদর্শন ও গীতার যোগ, পশুপতি মত অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের মত, বৈষ্ণবদিগের মত ইত্যাদি নানা বিভিন্ন ধর্মপথে, নিজ নিজ রুচির বিচিত্রতাহেতু সরল অথবা বক্রগতিতে লোকসকল ভ্রমণ করে এবং যে যে পথ অবলম্বন করে, সে সেইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করে; কিন্তু হে ভগবন্! নদীসকলের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি,—সেইরূপ এই সকল ধর্মপথের গন্তব্য একমাত্র তুমিই।

স্বামীজীর উপরি-উক্ত উক্তিতে কেবল যে তাঁহার উদার ধর্মমত প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নহে; তাঁহার জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষের প্রতি তিনি কিরূপ গভীর প্রেম ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বধর্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক আস্থা ছিল, এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস শুধু মুখে নহে, উহা তাহার প্রাণের সহিত অবিচ্ছিন্ন; উহা তাহার সাংসারিক জীবন-যাত্রার অপরিত্যাজ্য সাথী এবং পারলৌকিক জীবনে একমাত্র সহায়। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, হিন্দুর জীবন ধর্মবিশ্বাসের সহিত এইরূপ ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত বলিয়া হিন্দুজাতির কিংবা হিন্দুধর্মের বিলোপ কখনই সম্ভবপর নহে। ইহা তাঁহার কাছে কবির কল্পনা, ভাবুকের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস বা অনুমানের বিষয় ছিল না; এই ভাব তিনি অভ্রান্ত সত্য-রূপে হৃদয়ে সর্বদা পোষণ করিতেন। আমেরিকা-বাসিগণের নিকট তিনি তাঁহার এই সত্য ধারণা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন।…

স্বামী বিবেকানন্দের, তাঁহার স্বদেশবাসীকে প্রধান দান—নূতনভাবে আর্ত বিপন্নের সেবা। দরিদ্রের সেবা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই সেবাকে তিনি যে গৌরব ও মহত্ত্বের গরিমায় অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এযুগের একটি অপূর্ব দৃশ্য। 'দীনদরিদ্র', 'ভিখারী', 'কাঙ্গাল' প্রভৃতি অবজ্ঞা ও অসম্মানসূচক নামে যাহাদের আমরা চিরদিন অভিহিত করিয়া আসিতেছি, তিনি তাহাদের মধ্যে জগতের স্বামী তাঁহার প্রেমময় নারায়ণের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে 'দরিদ্রনারায়ণ' নামে সম্বোধন করিয়াছেন এবং 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবাই ঈশ্বরসেবা, একথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আজ ভারতের সর্বত্র দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য যে-সকল আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা যে স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ধারার সেবাধর্ম প্রচারের ফলে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার গুরু সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর দল সৃজন করেন নাই। স্বামীজী সেবাকার্যের জন্য, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর সঙ্ঘ সৃজন করিয়া গিয়াছেন। এবং সেই ত্যাগ-মহিমা-মণ্ডিত সঙ্ঘ দিন দিন নিঃস্বার্থ উদ্যমশীল কর্মী যুবকদিগের দ্বারা পরিপুষ্টিলাভ করিতেছে। ত্যাগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ও ত্যাগের অপূর্ব মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তিনি সংসারে প্রবেশ না করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সন্ন্যাসের অর্থ কর্মত্যাগ নহে, ইহার অর্থ এই যে, আপনাকে চিত্তবিভ্রমকারী বিবিধ সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া কর্মদ্বারা পরার্থে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা। ইহা দ্বারা কর্মশক্তি স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, জগতের বিস্তৃত কার্যক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ

করিবার সুবিধালাভ করে। এই কর্মের প্রেরণা কর্তব্যজ্ঞান হইতে, ইহা স্বার্থপ্রণোদিত নহে। ইহা কামনারূপ কলঙ্ক লিপ্ত নহে; ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত গীতার নিষ্কাম কর্ম—অনাসক্তি ইহার মূল।

পরমহংসদেব মানুষকে সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে সকল কর্ম করিবার উপদেশ দিতেন। যদি কেহ বলিত যে, সংসারে এরূপভাবে কর্ম করা অসম্ভব, তিনি তাহার উত্তরে বলিতেন যে, ঈশ্বরে মন স্থির করিয়া সকল কর্ম করিলে নির্লিপ্তভাবে কর্ম করা হয়। অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা যায়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম। মানুষ সাধনা করিলে এইভাবে কর্ম করিবার শক্তি তাহার জন্মে এবং কেবলমাত্র এইভাবে কর্ম করিলে মানুষ শোক, দুঃখ, তাপ ও অশান্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।…

স্বামী বিবেকানন্দ এই কর্মযোগই স্বদেশে ও বিদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে ও কার্যে ইহারই উন্নত দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত সেবাধর্ম এই নিষ্কাম কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেশে এত অল্পদিনের মধ্যে এত অধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। তিনি বলিতেন —'ঈশ্বর কোথায়', 'ঈশ্বর কোথায়', বলিয়া চারিদিকে কেন তুমি বৃথা অন্বেষণ করিতেছ। তিনি তো তোমার সম্মুখেই অবস্থিত রহিয়াছেন। নিরন্নের মধ্যে, পীড়িতের মধ্যে, আর্তের মধ্যে, পতিতের মধ্যে, অজ্ঞানীর মধ্যে, অস্পৃশ্যের মধ্যে, তোমার নারায়ণ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান রহিয়াছেন। একবার জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া তাঁহাকে দর্শন কর এবং এই সকল দরিদ্রনারায়ণের পূজা ও সেবা করিয়া তোমার ইষ্টদেবের প্রিয় কার্য সাধন কর। তুমি ইহাদিগের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছ বলিয়া কখন অহংকারে স্ফীত হইও না। ইহাদিগের সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ বলিয়া আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা কর এবং এই অধিকার লাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

সেবাধর্মকে এরূপ স্বর্গের মাধুর্য ও মহিমায় অনুপ্রাণিত করিতে স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন আর কেহ চেষ্টা করেন নাই।—

বর্তমান যুগে গীতায় উপদিষ্ট কর্মযোগ প্রচার করিবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ চিরদিনই 'কর্মভূমি' বলিয়া জগতে সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বর্তমান যুগে ভারতবাসী কর্মের প্রকৃত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বার্থান্ধতা, আলস্য, অবসাদ, দীর্ঘসূত্রতা, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি তামসিক গুণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই মোহনিদ্রা হইতে স্বদেশবাসিগণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই প্রচণ্ড শক্তিমান স্বামী বিবেকানন্দের আগমন। তাঁহার উন্নত আদর্শ ও উদ্দীপনামূলক উপদেশ লাভ করিয়া দেশে জীবনের সাড়া পুনরায় দেখা যাইতেছে; দেশের লোকের তমোভাব কাটিয়া গিয়া তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোভাবের লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। দেশের লোক দেহ, মন ও আত্মার মধ্যে উপযুক্ত শক্তি লাভ করিয়া জগতে অপরাপর জাতির ন্যায় আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবন উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে মহৎ কার্যের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই সহায়তা করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, তাঁহাদের আগমন ব্যর্থ হয় নাই।…

দক্ষিণভারতে অস্পৃশ্য জাতির প্রতি হিন্দুসমাজকর্তৃক যে অবিচার ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় মর্মবেদনা বোধ করিতেন এবং ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বহু পরিমাণে সুফল প্রসব করিয়াছে। বর্তমান সময়ের 'অস্পৃশ্যতা বর্জনের' আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার উপদেশের মঙ্গল প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তিনি অস্পৃশ্যতার একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি রহস্যচ্ছলে সর্বদা বলিতেন যে, বর্তমান কালে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহার 'চৌকায়' (রান্নাঘরে) আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।*

---

* ভারতবর্ষ', ১৬ বর্ষ, ২ খণ্ড. ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃঃ ৭০৭-৭১০

সংগ্রহ : প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত ভাষা

জলধিকুমার সরকার

শ্রীরামকৃষ্ণের বলা কথা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় 'কথামৃত' গ্রন্থে, এবং সাধারণতঃ কথামৃতের বাণীগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অবিকৃত কথা বলেই ধরা হয়। তবে মনে রাখা দরকার যে, কথামৃত গ্রন্থে বাণীগুলি কলকাতার ভাষায় বর্ণিত। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন এবং বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন হুগলি জেলার এমন একটি গ্রামে যেটি বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত এবং যেখানকার কথিত ভাষা বাঁকুড়া জেলার ভাষার থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। ঐ অঞ্চলের কথাগুলির একটা বিশিষ্ট রূপ আছে এবং তার উচ্চারণেরও একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় এসে 'সভ্য' হবার জন্য সেখানকার ভাষা শিখেছিলেন এবং সেই শেখা-ভাষায় কথা বলতেন—এরূপ ভাবার কোন কারণ নেই; বরং সেরূপ করাই তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।[1] মাস্টার মশাইয়ের ডায়েরিতে দেখা যায় যে, তিনি যেভাবে ডায়েরি লিখেছিলেন, তাও কামারপুকুর অঞ্চলের ভাষায় নয়। সেটিকে ভিত্তি করে পরবর্তী কালে যখন তিনি কথামৃত রচনা করেছিলেন, তখন মাস্টার মশাই তাঁর নিজস্ব ভাষাতেই করেছিলেন, যদিও ভাবপ্রকাশের দিক থেকে বাণীগুলি অতুলনীয়ভাবে সত্য। কথামৃতে অনেক চলতি ভাষায় গ্রাম্য কথা আছে যেমন, বদ্ধজীবকে সংসার থেকে সরিয়ে আনলে "হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে" প্রভৃতি, কিন্তু সেগুলিতে কামারপুকুর আঞ্চলিক ভাষার বিশেষত্ব ফুটে ওঠে না। কচিৎ কখনও অবশ্য এই বিশেষত্বের আভাষ পাওয়া যায়, যেমন "সমুদ্র কত গভীর কে খপর দিবেক?"[2] পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন বাঁকুড়া জেলার লোক, কিন্তু তিনি পুঁথি বাঁকুড়া অঞ্চলের চলতি কথায় লেখেননি। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণও এ-বিষয়ে খুব একটা আলোকপাত করেননি। ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত ভাষা অবিকলভাবে পাওয়া যায় না। উনত্রিশতম বর্ষের (১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে) উদ্বোধনের পাঁচটি সংখ্যায় গুরুদাস বর্মনের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ'[3] শিরোনামায় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যাওয়া এবং তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়ার যে বর্ণনা আছে, তার মধ্যে কয়েক জায়গায়, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত কামারপুকুরের আঞ্চলিক ভাষা দেওয়া আছে যা পাঠকবর্গকে পরিবেশন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। 'গুরুদাস বর্মন' স্বামীজীর সহপাঠী প্রিয়নাথ সিংহের ছদ্মনাম,[4] যিনি যৌবনেই শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহলাভ করেছিলেন। উনত্রিশতম বর্ষের উদ্বোধনের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। সুতরাং প্রবন্ধে বর্ণিত ঘটনাগুলি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত ভাষা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। নিম্নে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাক্যগুলি কামারপুকুর অঞ্চলের বলে মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র সেইগুলিই এই প্রবন্ধে দেওয়া হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ গরম মিঠাই ভালবাসেন বলে দেবেন্দ্রনাথ গরম মিঠাই নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেছেন। দেখলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে একটি ফটো টাঙানো রয়েছে, যেটি আগে ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ জানালেন, ফটোটি তাঁর নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "তা কি হয়, ওরা কত যত্ন করে এখানি রেখেছে। ওখানি তো লওয়া হবেকনি। তা ছবির ভাবনা কি, অবিনাশ যে সেদিন ফটো তুলে লিয়েছে তার কাছকে পাবেক। তা তুমি তাকে

---

[1] বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৭, পৃঃ ৯১৩

[2] দু-এক স্থানে এই জাতীয় ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় পাঠক হয়তো মনে করতে পারেন যে, কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের সব ডায়ালগগুলিই (Dialogue) কামারপুকুর অঞ্চলের ভাষা। কিন্তু এবিষয়ে একটু চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন আছে।

[3] উদ্বোধন, ২৯তম বর্ষ, ১৩৩৩, পৃঃ ৬৮, ৬৯, ৯০, ১০১, ২১১, ২৬৪

[4] স্বামীজী তাকে ঠাট্টা করে 'সির প্রিজী' বলে ডাকতেন।

বোলো, সে দেবে, কিন্তু দাম লিবেক।" দেবেন্দ্র দামের জন্য কিছু আসে যায়-না জানালে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "দেখ তুমি ভবনাথকে বোলো দিকি, সে অবিনাশের কাছে তাগাদা দিয়ে আনিয়ে দিবেক। অবিনাশ একটু লেশাটা ভাংটা করে কিনা, তাকে একটু তাগাদা করতে হয়।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অবিনাশ দাঁ-এর তোলা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিই এখন ঘরে ঘরে পূজিত হয়।[৫]

অন্য একদিন দেবেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যেসব বালকরা থাকতেন, তাঁদের সেবা করতে দেখে দেবেন্দ্রেরও সেবা করার ইচ্ছা জাগল। শ্রীরামকৃষ্ণের শৌচে যাবার কালে, গাড়ুটি নিয়ে তাঁর পিছনে তিনি যেতে শুরু করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখবামাত্র যেন কতই অপ্রতিভ হয়ে জিব কেটে বললেন ঃ "অ্যাঁ। তুমি কেন লিয়ে আসছ, তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয়, তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয় গো।" দেবেন্দ্র গাড়ুটি নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন চাইলেন, রামকৃষ্ণদেব সহাস্য-বদনে তাঁকে বললেন ঃ "দেখ তোমার কিছু করতে হবেকনি। তুমি সকালবেলা আর সন্ধ্যেবেলা হাত তালি দিয়ে হরিনাম কোরো, তা হলেই হবেক।"

দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের আদর যত্ন পেয়ে ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বর যেতে আরম্ভ করলেন। একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বললেন ঃ "হাঁগা, তুমি যে এখানকে আসছো—যাচ্ছো, তা কিছু বুঝলে?" তার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ যখন জানালেন যে, তেমন কিছু হওয়া বুঝতে পারেননি, তখন রামকৃষ্ণদেব বললেন ঃ "তুমি অনেক করেছ বটে, কিন্তু (দুই হাতের অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি বন্ধ করে দেবেন্দ্রকে দেখিয়ে) খাপে খাপে লাগেনি। কি জান, যে ঘরের যে।"

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন যে, একজন স্ত্রীলোকের জন্য তাঁর মন কেমন করছে। দেবেন্দ্রনাথ তো অবাক। পরে দেবেন্দ্রকে রসগোল্লা খেতে দিয়ে বললেন "এ কে দিয়েছে জান?—অমুক দিয়েছে, সে (নিজবক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এখানকে বড় ভালবাসে।" দেবেন্দ্রের সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হল। হঠাৎ দেবেন্দ্রের কাছে চুপিচুপি বললেন ঃ "হাঁ গো, তুমি আমাকে একটি টাকা দিবে? গাড়ি না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ি করে গেলে তার (সেই মহিলার) ছেলে গাড়ি-ভাড়া দিতে মনে বড় কষ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। দিবে?" দেবেন্দ্রনাথ রাজি হলে, রামকৃষ্ণদেব হেসে বললেন ঃ "না, তা লয়, বল যে আবার লিবে? আবার লিবে তো?" দেবেন্দ্র হেসে বললেন "তা বেশ মশাই দেবেন, নেব।"

গাড়িতে চলছেন, সঙ্গে দেবেন্দ্র, মাস্টার মশাই, লাটু। পথে বারবনিতা ও মদের দোকান দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ করার কথা কথামৃতে বর্ণিত আছে। দেবেন্দ্র তখনও চিন্তা করছেন, তবে কি রামকৃষ্ণদেব মধুরভাবের সাধক? এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের হাঁটুতে ধীরে ধীরে চাপড় মেরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ "(আমি) কারুর ভাব নষ্ট করিনি, কারুর ভাব নষ্ট করিনি।" সেই মহিলার বাড়িতে পৌঁছে, বাইরের ঘরে কিছুক্ষণ বসার পর ভিতরে গিয়ে দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচ বৎসরের বালকের মতো আলুথালু হয়ে বসে আছেন, আর সেই দরিদ্র বৃদ্ধা মহিলা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে তাঁর মুখে মিষ্টান্ন তুলে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের গৃহে নিমন্ত্রণে এসেছেন। কুলপি খাওয়ার পর অন্দরে গিয়েছেন; দেবেন্দ্রপত্নী গললগ্নীবাসে তাঁর পদধূলি নিলেন। তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "দেখ, একেবারে আউলে" (অর্থাৎ পতিভক্তিতে একেবারে আত্মহারা এবং সেজন্য স্বার্থশূন্য)। দেবেন্দ্র-গৃহিণীকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে বলাতে দেবেন্দ্র বললেন ঃ "আপনি যখন অনুমতি করেছেন, তখন যাব বই কি।" শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন ঃ "হাঁ, একদিন ওখানকে লিয়ে যেও।"

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মা ও স্ত্রীকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গেছেন দুপুরবেলা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের মাকে প্রণাম করতে দিলেন না, নিজে তাঁকে প্রণাম করে বললেন ঃ "দেখ, এঁরা বড় নির্মল, বড় ভাল। তা এত রোদ্দুরের সময় এসেছ, ঐখানকে (মাতা-

---

[৫] এটি শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় ফটো। অবিনাশ 'বোর্ন এণ্ড শেফার্ড' কোম্পানীর শিক্ষানবীশ ছিলেন। অবসর সময়ে ক্যামেরা নিয়ে হাত পাকাতেন।

ঠাকুরানীর কাছে) নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে এ'রা একটু জিরুন।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গুরুদাস বর্মনের আগে উল্লিখিত প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণকথিত এমন বাক্যও আছে যা উপরি-উক্ত ধরনের গ্রাম্যভাষায় নয়। মনে হয় কলকাতার লোকের পক্ষে শ্রুতিলিপি না লিখে রাখলে, পরে শ্রুতকথাগুলি অবিকল ভাবে গ্রাম্যভাষায় লেখা কঠিন। লেখকের আর একটি বই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' যা ১৩১৬ সালে নিজেই প্রকাশ করেছিলেন এবং যার পাণ্ডুলিপি স্বামী সারদানন্দ দেখে দিয়েছিলেন। রচনাটি উদ্বোধন পত্রিকার ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ বর্ষে বিভিন্ন শিরোনামায় ৩২টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিন শত বাহান্ন পৃষ্ঠার এই বইয়ে[৬] শ্রীরামকৃষ্ণের বলা বাক্য অনেক আছে, কিন্তু লেখক কেবলমাত্র নিম্নলিখিত কথাগুলিই তাঁর গ্রাম্যভাষায় দিতে পেরেছেন, অন্য সব জায়গায় লেখক নিজস্ব ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ধমান রাজসভায় পণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হওয়াতে, মথুরবাবু সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে চাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, "মা, তুই আমার মা থাকতে বর্ধমান কি করতে যাব? মা তুই তাঁকে এখানে এনে দে" বলার পরই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। সমাধি হতে বুত্থিত হয়ে কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন ঃ "দশদিন পরে আসবেক, যেতে হবে না।"

(খ) রামচন্দ্র দত্তকে "দেখ এখানকার জন্যে যখন কিছু আনবেক, তার আগভাগ কারুকে দিও না।"

(গ) দেবেন্দ্র মজুমদারকে "আমাকে আর কি দেখবেক?"

(ঘ) বিদ্যাসাগর যখন বললেন "আপনি এলেন আর আমি যাব না? অবিশ্যি যাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আপুনি যেতে পারবেক নি।"

কিন্তু গুরুদাস বর্মন লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' গ্রন্থে খুব বেশি পরিমাণে শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রাম্য ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। তার একটি কারণ অনুমিত হয়, কলকাতাবাসী লেখক হয়তো সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিলিপির আকারে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষাকে লিখে রাখেননি। যে-সব বাক্যগুলি তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল, সেগুলিকেই পরে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। দ্বিতীয় কারণ, সেইকালে গ্রন্থে যথাযথ আকারে মুখের ভাষাকে উপস্থিত করা হবে, এটা প্রত্যাশিত ছিল না। ফলতঃ লেখক কিছুটা পরিমার্জনা করেছেন—এটা হওয়া সম্ভব। তৃতীয় কারণ, বেশ কিছু বছর কলকাতায় অবস্থানের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের অজ্ঞাতেই হয়তো কলকাত্তাই ভাষা অল্পপরিমাণে তাঁর বাচনভঙ্গিতে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু এ সবই অনুমান। শতবর্ষ পূর্বে যে মহানাটক অভিনীত হয়েছিল, তার বর্ণনা আজ কে দেবে? তবু আমরা ভাগ্যবান। অপরাপর অবতার পুরুষদের মুখের ভাষা তো দূরে থাক, তাঁদের উপদেশ পর্যন্ত সঠিকভাবে পাওয়া দুষ্কর। অন্যদিকে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা ঘটনায় কিংবা তাঁর ভক্ত-শিষ্য বা অন্যান্যদের স্মৃতিকথায় শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব উক্তি-প্রত্যুক্তি পাওয়া গেছে, তা অবতার-বরিষ্ঠের কথিত ভাষাকে অনেকটা সুস্পষ্ট আকারে ফুটিয়ে তুলেছে। কোন সন্দেহ নেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রজ্ঞার সেই উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যা মানুষের মুখোশের অন্তরালবর্তী মুখগুলিকে দেখে নেয়। ছদ্মবেশী মানুষের আবরণ উন্মোচন তিনি করেছিলেন তাঁর সেই ভাষায়, যা অননুকরণীয় এবং হয়তো ঠিকভাবে লেখাও সম্ভব নয়। সেই ভঙ্গিটুকুকেও কোন ভাষায় ধরা যায় না, শুধু মনশ্চক্ষেও ছবি এঁকে নিতে হয়। সবিস্ময়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করব, পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দও 'বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধে এই মুখের ভাষাতেই সাহিত্য রচনার কথা বলেছিলেন। গুরুর সঙ্গ তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল। এইখানেই পূর্ববর্তী অবতার-পুরুষদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাদৃশ্য। তাঁরা মুখের ভাষাতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদিও অবতার-পুরুষদের প্রচারিত ভাবই প্রধান বস্তু, তাঁদের কথিত ভাষাও বিশেষ মূল্যবান। কারণ, কথিত ভাষাতে ভাব যতটা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, অন্যভাবে ততটা পাওয়া সম্ভব নয়। নানা কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত ভাষার মূল রূপ হয়তো কিছুটা হারিয়ে গেছে। তবু যা পাওয়া গেছে. তার মূল্যই বা কম কি?

---

[৬] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—শ্রীগুরুদাস বর্মন, ১ম ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ১৮, ২৪১, ২৭৮, ৩১৭

ধারাবাহিক-নিবন্ধ

কবি সারদা

কবিতা সিংহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

"জগতের প্রত্যেকের ওপর তাঁর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।" সারদা বলেছেন।

সারদার মূল ভাব তাই মাতৃভাব। তাঁর কবিতার মধ্যেও সেই ভাবেরই প্রাধান্য। তবে তার মধ্যে যে বাৎসল্য রস সে-রস লৌকিক নয়, পারমার্থিক। লৌকিক প্রদর্শনীর বহু গভীরে সেই পারমার্থিক সম্বন্ধ বিধৃত।

তরুণ ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ (পরবর্তী কালে স্বামী বিরজানন্দ) গিয়েছেন মাতৃসন্দর্শনে জয়রামবাটীতে। সদ্য তিনি গৃহত্যাগ করে এসে যোগ দিয়েছেন বরাহনগর মঠে। মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গ চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে এসেছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাস-আশ্রমে। বেশ কয়েকদিন জয়রামবাটীতে মাতৃ-সান্নিধ্যে কাটিয়ে কালীকৃষ্ণরা ফিরছেন কলকাতায়। এরপর দেখি কালীকৃষ্ণের নিজের বর্ণনায়ঃ "মা খিড়কি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুখ ফুলিয়া লাল হইয়া গিয়াছে।... সে কি করুণ দৃশ্য! আমি কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।... আমাদের গরুর গাড়িগুলি ছাড়িল। মা-ও একটু দূরে দূরে থাকিয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ফিরিলেন না। তালপুকুর পার হইয়া গ্রামের বাহিরে বিস্তীর্ণ মাঠে পড়িলাম। গাড়ি হইতে যতদূর গ্রামের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দেখিলাম, মা তালপুকুরের ধারে আমাদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। **এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মা-ও বাসিতে পারেন? বাড়ির মাকে তো খুব ভালবাসিতাম, তিনিও কত ভালবাসিতেন। কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের—চিরকালের আপনার মা।**"

বেশ কিছুদিন পর। মঠ তখন আলমবাজারে। সারদা আছেন বেলুড়ে—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে। মঠ থেকে কালীকৃষ্ণ এসেছেন সারদাকে প্রণাম করতে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে কালীকৃষ্ণের স্বাস্থ্য তখন খুব খারাপ। সারদাকে প্রণাম করতে তিনি তাঁর দিকে চেয়ে পরম স্নেহে বললেনঃ "বাবা, তোমায় দেখে আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হলো। তোমার কেমন গোলগাল শরীরটি ছিল। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এখন কী চেহারা হয়ে গেছে। ওরা সাধু ফকির মানুষ, তোমায় কিইবা খাওয়াবে। তুমি কিছুদিন বাড়ি গিয়ে থাক। সেখানে ওষুধপত্র আর পুষ্টিকর পথ্যাদি করে শরীরটা সারিয়ে নাও।"

সারদার কথায় কালীকৃষ্ণের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। শরীরে ব্যাধি আছে ঠিকই, কিন্তু তিনি তো মহা আনন্দে মঠে আছেন। কিন্তু সারদার আদেশ—বাড়িতে যেতে হবে। হোক না সে দু-চার দিনের জন্য, কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার কথা ভেবে নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো কালীকৃষ্ণের।

তখন বর্ষাকাল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আকাশভরা মেঘ, সন্ধ্যার ভরা গঙ্গা কুয়াশায় ঢাকা। আনন্দভরা মঠ ছেড়ে বাড়ি যেতে হবে। যেন এক স্বপ্নজগৎ থেকে বিদায়। প্রাণ কাঁদছে। নৌকায় চড়লেন। নৌকা এগিয়ে চলছে। সন্ধ্যার আলো-আঁধারের মধ্যে কালীকৃষ্ণ দেখলেন—ছাদের উপর সারদা দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি নৌকার দিকে। যতক্ষণ দেখা গেল, কালীকৃষ্ণ দেখলেন একইভাবে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সারদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

এই সারদার মাতৃরূপ। এই নিষ্পলক দৃষ্টি এ তাঁর মাতৃসত্তার গভীর থেকে উঠে আসা।

সেই দৃষ্টি থেকেই সারদা বলেছিলেনঃ

আমি সত্যিকারের মা

আমি সত্যিকারের মা
গুরুপত্নী নয়
পাতানো মা নয়
কথার কথা মা নয়,

আমি সত্যিকারের মা,
আমি সত্য—সত্য জননী।

এই মাতৃস্বরূপই আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এসেছে আরেকভাবে :

পিতার কান্না

সমুদ্দুরের কি কম দুঃখু।
ব্যথায় যে ওর বুকটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে।
দেবতা আর অসুরে মিলে
যে যার লভ্যগণ্ডার জন্যে
সমুদ্দুরকে মন্থন করলে;
ওর বুকের অতলে লুকিয়ে-রাখা
ধনরত্ন, অমৃত, কত কি সব লুটে নিলে,
শেষে কিনা ওর প্রাণাধিক কন্যা কমলাকেও
কেড়ে নিলে।
পিতার এ বুক-চেরা দুঃখু
কি কম গা?
মেয়েকে একবারটি
ফিরে পাবার জন্যে
সমুদ্দুরের এত আর্তনাদ।

সারদা সঙ্ঘজননী। সারদা ভক্তজননী। ত্যাগী ছেলেরা এখানে-ওখানে ঘুরছে। তাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। দুটি অন্নের স্থায়ী সংস্থান নেই। প্রাণ কাঁদে সঙ্ঘজননীর। প্রাণ কাঁদে ভক্তজননীরও। ভক্তরা আসবে সংসারের জ্বালা জুড়াতে। কোথায় পাবে তারা তাদের জ্বালা জুড়োবার ঠাঁই? মাতৃ-হৃদয়ের সেই ব্যথায় উৎসারিত হলো এক মর্মভেদী প্রার্থনা :

আমার ব্যথা

তুমি এলে। কজনকে নিয়ে
লীলা করে আনন্দ করে
চলে গেলে,
আর অমনি সব
শেষ হয়ে গেল।
তাহলে এত কষ্ট করে
আর আসার কি দরকার ছিল?
কাশী-বৃন্দাবনে দেখেছি
অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়,
আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
সেরকম সাধুর তো অভাব নেই।
সব ছেড়ে বেরিয়ে এসে
আমার ছেলেরা দুটি অন্নের জন্যে
পথে পথে ঘুরে বেড়াবে
তা আমি দেখতে পারব না।
আমার প্রার্থনা, তাদের যেন
মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব না হয়।
ওরা সব একত্রে থাকবে
আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা
ওদের কাছে এসে শান্তি পাবে।
ওদের ঐভাবে ঘুরে বেড়ানো দেখে
আমার প্রাণ
ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সারদা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে যেসব ছেলেমেয়েরা ছিলেন, তাঁরা সব কাঁদছেন। সারদা জানতেন শুধু তাঁরাই নন, জগৎ জুড়ে রয়েছে তাঁর অগণিত সন্তান। তাঁরাও কাঁদবে যখন তিনি থাকবেন না। স্বামী সারদানন্দকে ডেকে বললেন : "শরৎ, সব রইল, তুমি দেখো।"

সারদা জানতেন তাঁর বিশ্বপ্লাবী মাতৃস্নেহের কাছে সারা বিশ্বের মানুষ একদিন অভয় আশ্রয় নেবে। তাই যাবার আগে উচ্চারণ করে গেলেন সেই অমৃতবার্তা :

আমার সকল সন্তানের জন্য

যারা এসেছে
যারা আসেনি
আর
যারা আসবে,
আমার সকল সন্তানদের
জানিয়ে দিও—
আমার ভালবাসা
আমার আশীর্বাদ
সকলের ওপর আছে।

সারদা এখানে শুধু মা-ই নন, তিনি ক্রান্তদর্শী। কালের কুয়াশা ভেদ করে যায় তাঁর কালান্তরের দৃষ্টি। তাই তিনি কবি। [সমাপ্ত]

স্মৃতিকথা

পুণ্যস্মৃতি

শান্তিময়ী ঘোষ

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দেখেছিলাম বেলুড় মঠে। আমার সাত বছর বয়স তখন। তারপর ভালভাবে দেখা—নয় বছর বয়সে। আমার শ্বশুরকুলের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের হৃদয়ের যোগ ছিল। আমার স্বামী আশুতোষ ঘোষের খুড়তুতো ভাই নবগোপাল ঘোষ। হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে এঁরই বাড়িতে স্বামীজী একদিন খোল-করতাল সহ কীর্তন করতে করতে এসে ঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আমাকে শ্রীমা 'শান্ত' বলে ডাকতেন। মায়ের কাছে যখন যেতাম, মা নিজের হাতে ঠাকুরের প্রসাদ দিতেন। মা আমাকে একটি গামছা দিয়েছিলেন। সেটি পরে ঠাকুর পুজোর ফুল তুলতাম। মা মঠে এলে মায়ের কাছে দিয়ে আসতাম। বেলুড়ের সরকার বাড়ির মেয়ে আমি। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে মা গাড়ি করে মঠে আসতেন। মাকে প্রণাম করতে মঠে যেতাম। শ্রীমা স্নান সেরে ঠাকুরকে প্রণাম করতেন। সেই সময় তাড়াতাড়ি আমি মায়ের ভিজে কাপড় শুকোতে দিতে যেতাম। ছোট মেয়ে ঠিক সামলাতে পারতাম না দেখে বড়রা কেউ আমার কাছ থেকে কাপড়টা নিতে এলে মা বলতেন, 'আহা, ওকেই দাও।' সেই কথাটুকুতে যে কি স্নেহ মিশে থাকত, তা কি করে বোঝাই!

ছেলেবেলায় আমার একটি খারাপ স্বভাব ছিল—আঙুল চোষা। বাড়িতে এর জন্যে বড়দের কাছে কত বকুনি খেয়েছি, কখনো কখনো মারও খেয়েছি। কিন্তু অভ্যাসটি যায়নি। মঠে গেলে মহারাজরাও বারণ করতেন। একদিন তাঁরা মাকে বললেন: "মা দেখুন, শান্ত আবার আঙুল খাচ্ছে।" মা সকলের সামনে তখনই কিছু বললেন না। কিন্তু পরে আলাদাভাবে খুব স্নেহভরে আমাকে ডেকে বললেন: "খেও না, হাতটা নোংরা হয়ে যাবে। ঠাকুরের ফুল তুলবে কি করে?" যা এত বকুনি, মার খেয়েও যায়নি, মায়ের ঐ সামান্য কথায় সেদিন থেকে তা একেবারে গেল।

বার বছর আমার বয়স যখন, মা চলে গেলেন। মাকে দাহ করার পর বাড়ি গেছি ভস্ম নিয়ে। ঠাকুরের ফুল তোলা তখনও বন্ধ ছিল না। ফুল তুলে রাখাল মহারাজের কাছে মঠে দিয়ে আসতাম। আমাকে তিনি বলতেন, 'বোস, আমার কাছে কাজুবাদাম, কিসমিস খা।' আমি বলতাম, 'খাব না, আমার ঠাকুরপুজো হয়নি।' তিনি বলতেন, 'নে নে খা, আগে খেয়ে নে। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে পুজো হয় না।' পরদিন ফুল দিতে গেলে দুষ্টুমি করে বলতেন: 'কিরে, কাল পুজো হয়নি তো?'

ভগিনী নিবেদিতাকে মায়ের কাছে বাগবাজারে দেখেছি। মা তাঁকে আদর করে বুকে টেনে নিতেন। অল্প স্বল্প বাঙলা বলতে পারতেন নিবেদিতা। লাটু মহারাজের কথা মনে পড়ছে। লাটু মহারাজ আমাকে দেখলেই 'মার মার' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যেতাম। তাই বলে মারেননি কখনো, চেঁচিয়ে ভয় দেখানো ছিল ওঁর মজা। বাবুরাম মহারাজ আমাদের বাড়িতে প্রায় আসতেন। কত গল্পই করতেন! তার মধ্যে মায়ের কথাই বেশি। মহাপুরুষ মহারাজের মতো ঠান্ডা মধুর মানুষ কখনো দেখিনি। কোনদিন কিছু বলেননি। মুখে কেবল মিষ্টি হাসিটুকু লেগে থাকতো।

দীক্ষা ঠিক মায়ের কাছে হয়নি। তবে তিনি মাথায় হাত দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জপ করতে বলে গেছেন। তা-ই আমার কাছে মন্ত্র। আজও সেই মন্ত্র জপ করে চলেছি। ছোটবেলা থেকে কতবার বেলুড় মঠে গেছি। মনে হয় এখনো বুঝি ওঁরা সবাই ওখানে আছেন। মা মঠে এলে গঙ্গায় হাত ধুয়ে মাকে প্রণাম করতে যেতাম। বলতেন, 'ঠাকুরকে প্রণাম করেছ? ওঁকে স্মরণ কর, ওঁকে বিশ্বাস কর। তাহলেই সব হবে।' এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। মায়ের ঐ কথাগুলিই অবলম্বন, ভরসা। তাঁর উপর ভরসা করেই এবার পাড়ি দেব। মায়ের মেয়ে মায়ের কাছে চলে যাব।

অনুলিখন: শ্রীতা মিত্র

কুম্ভযাত্রীর ডায়েরী

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি কুম্ভমেলার কথা। এক যুগ অর্থাৎ বারো বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয় কুম্ভমেলা। সেখানে হয় লক্ষ লক্ষ পুণ্য-স্নানার্থীর সমাবেশ, মিলন হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর। তাই কুম্ভমেলা দর্শনের ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল। শুনেছিলাম ১৯৮৯-এর জানুয়ারিতে প্রয়াগে আরম্ভ হচ্ছে এবারের কুম্ভস্নান। প্রয়াগে কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে। তীর্থ হিসাবে প্রয়াগের মাহাত্ম্য অপারিসীম। প্রয়াগ শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট যজ্ঞভূমি। সংস্কৃত যজ্ ধাতুর পূর্বে প্র উপসর্গ এবং অন্তে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে প্রয়াগ শব্দটি নিষ্পন্ন। যজ্ ধাতুর অর্থ যজ্ঞ করা। কথিত আছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাছাড়া ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ এবং ভরদ্বাজ, দুর্বাসা, অত্রি, মনু, পরাশর, প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করে এ-স্থানকে পবিত্র করেছেন। প্রয়াগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বেণীমাধব অর্থাৎ বিষ্ণু। এজন্য প্রয়াগ বিষ্ণুপীঠ। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এ চারটিকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে। পুরুষার্থ অর্থাৎ মানব জীবনের প্রয়োজন। তার মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তি হলো চরম লক্ষ্য। কিন্তু পূর্বের তিনটির ভোগ না হলে মানবের মন চরম লক্ষ্য মোক্ষের দিকে যেতে চায় না। প্রয়াগতীর্থে এই চারটি পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় বলে তাকে তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা তীর্থরাজ বলা হয়। অযোধ্যা, হরিদ্বার, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, পুরী এ-সকল তীর্থ কেবল মোক্ষদায়ী, কিন্তু প্রয়াগতীর্থ চতুর্বর্গদায়ী। এখানে কামনারও পূর্তি হয় পরন্তু মুক্তিও লাভ হয়।

আর ত্রিবেণী—অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—এই তিনটি পবিত্র নদীর সঙ্গমস্থল, সেখানে স্নান করলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, সঞ্চয় হয় অক্ষয় পুণ্য। ত্রিবেণীকে তিন নদীর সঙ্গম বলা হলেও সরস্বতী সেখানে অদৃশ্য। বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। গোস্বামী তুলসীদাস এই সঙ্গমকে জ্ঞান ও ভক্তির মিলন বলেছেন। গঙ্গা জ্ঞান, যমুনা ভক্তি এবং সরস্বতী বিচারবুদ্ধির প্রতীক। বিচারবুদ্ধিরূপিণী সরস্বতীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে জ্ঞানরূপিণী গঙ্গা এবং ভক্তিরূপিণী যমুনা মিলিত হয়েছেন এখানে জীবের কল্যাণের জন্যে। অনেকের মতে চতুর্বর্গলাভের উপায় জ্ঞান ভক্তি ও কর্মযোগের মূর্তপ্রকাশ এই ত্রিবেণীধারা। তাই প্রাচীনকাল থেকে ভজন-পূজন, পাঠ-প্রবচন, স্নান-দান-তপস্যাদি কর্মের জন্য এ-স্থান উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এমনিতেই হিন্দুদের কাছে কুম্ভের আকর্ষণ দুর্নিবার। আবার মহাপুণ্যভূমি তীর্থরাজ প্রয়াগে যখন সেই কুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় তখন ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর কাছে তার আকর্ষণ কী হতে পারে তা অনুমেয়।

মেলার মাস চারেক পূর্বে যখন এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম থেকে সংবাদ এল যে, মেলায় শিবির স্থাপন করা হবে এবং সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা হবে সেখানে, তখনই যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। সংবাদে উল্লেখিত ছিল যে, এবার কুম্ভে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্নানপর্ব ৬ ফেব্রুয়ারি, মৌনী অমাবস্যার দিন। তাই মৌনী অমাবস্যার স্নানপর্বে অংশগ্রহণের কথাই শিবির-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম। যাওয়ার দু-মাস আগেই আসন সংরক্ষণ করে রাখা হল ৩ ফেব্রুয়ারির ওয়ান আপ বম্বে মেলে। আমরা চারজন একসঙ্গে যাব। ক্রমশঃ যাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় কুম্ভমেলা সম্পর্কে নানা সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে। এর পৌরাণিক কাহিনী, প্রয়াগের মাহাত্ম্য, মৌনী অমাবস্যার স্নানে কত লোক হবে তার অগ্রিম হিসাব, মেলার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। মনে আনন্দও বাড়তে লাগল, আবার ট্রেনের ভিড় ও

অপব্যবস্থার জন্য অল্প-স্বল্প চিন্তাও হল।

এর মধ্যে মিশনের শিবিরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ এল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। যাক, ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করে আমরা বাগবাজারের লঞ্চঘাটে হাজির হলাম হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য। প্রচণ্ড ভিড়। অধিকাংশই কুম্ভযাত্রী। বড় একখানি লঞ্চে তিল ধরার জায়গা রইল না। মনে হল এখানেই কুম্ভ শুরু হয়ে গেল। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। থ্রি-টায়ার রিজার্ভেশন কামরায় মোটামুটি স্বাভাবিক ভিড়। আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এ ট্রেনে বহু কুম্ভযাত্রী রয়েছেন। ট্রেন রাত আটটায় চলতে শুরু করল। যথাসময়ে বার্থে শুয়ে পড়লাম। ট্রেন চলছে কখনও দুলকি চালে, কখনও ঝড়ের গতিতে। ঘুম এসে গেল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি ট্রেন একটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে। সময় ভোর ৫-৪৫ মিনিট। শীতের রাত। তখনও অন্ধকার দূর হয়নি। প্রচুর লোকের হৈ চৈ, চিৎকার-চেঁচামেচি শুনছি। আর শুনছি কামরার দরজায় দুমদাম ধাক্কার শব্দ। সব সংরক্ষিত কামরারই দরজা বন্ধ। আমাদের কামরার দরজা কে আগে খুলে দিল। কিছু লোক রিজার্ভেশন ছাড়াই এ-কামরায় উঠেছিল। তারা দরজার কাছেই বসেছিল। বোধ হয় তাদেরই কেউ দরজা খুলে দিয়েছে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে লোটা-কম্বল, বোঁচকা-বুচকি নিয়ে হুড় হুড় করে লোক ঢুকতে লাগল। এত ভিড় হল যে, পারলে একজনের মাথায় আরেকজন পা রাখে। সকলেই কুম্ভযাত্রী। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম স্টেশনটির নাম বিহারের ডেহরী-অন-শোন। তারপর দু-ঘণ্টা বিলম্বে ৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে বারোটায় ট্রেন এলাহাবাদ স্টেশনে পৌঁছল। সেখান থেকে বেলা দুটো নাগাদ আমরা পৌঁছলাম সঙ্গমে—যেখানে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মূল মেলাভূমিতে প্রবেশ করার মুখেই পড়ে শংকরাচার্যের সুদৃশ্য বিশাল মন্দির। এর নাম 'শঙ্কর বিমান মণ্ডপম্'। এই স্থানেই নাকি আচার্য শঙ্কর ও প্রসিদ্ধ মীমাংসক দার্শনিক কুমারিল ভট্টের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ বিতর্কে আচার্য শঙ্কর জয়ী হন। তারই স্মৃতিকল্পে এই বিশাল মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের সন্নিকটে যমুনার তট পর্যন্ত বিস্তৃত মোগল সম্রাট আকবর নির্মিত সুবিশাল এলাহাবাদ ফোর্ট। মন্দির ও ফোর্টের অনতিদূরেই স্থাপিত হয়েছে এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশনের শিবির। সপ্তাহ দুই আগে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল এই শিবির। আবার নতুন করে শিবির ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের স্বাক্ষর রয়ে গেছে এখনও।

গঙ্গা-যমুনার বিশাল চরে, সঙ্গমের তিন পাড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুম্ভমেলা। এবার মেলা-কর্তৃপক্ষ তিন হাজার তিনশো একর জমি নিয়ে মেলার ব্যবস্থা করেছেন। মেলা-অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে কুম্ভনগর। যে-দিকে তাকাই দেখি শুধু শিবির আর শিবির, আর সাধুদের আখড়া। মেলায় প্রবেশ করার প্রধান রাস্তার এক পাশে অল্প কয়েকটি দোকান ছাড়া মেলা-অঞ্চলে খাবার দোকানের কোন ব্যবস্থা নেই। বিস্তীর্ণ বালুকা চরে পুণ্যার্থী মানুষ সারি সারি তাদের আস্তানা করে নিয়েছে।

৬ ফেব্রুয়ারি মৌনী অমাবস্যা। এবারের কুম্ভমেলার মুখ্য স্নান। কর্তৃপক্ষের অনুমান, এদিন দেড়কোটি স্নানার্থীর সমাগম হবে। সে-অনুযায়ীই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ। অনুমান যে মিথ্যা নয় জনস্রোত দেখেই তা উপলব্ধি করলাম। পিলপিল করে জনস্রোত ঢুকছে মেলাভূমিতে। আমরা চার তারিখে পৌঁছেছি, কিন্তু তার দিন কয়েক আগে থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। ৫ ফেব্রুয়ারি সে-ভিড় চূড়ান্ত রূপ নিল। ৪ তারিখ পর্যন্ত মেলাভূমিতে যানবাহন যাওয়ার অনুমোদন ছিল। পাঁচ তারিখ থেকে স্টেশন হতে মেলাস্থলে যাওয়ার সবরকম যানবাহন বন্ধ করা হয়। ফলে ঐ দিন যাঁরা স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন, সঙ্গমে আসতে তাঁদের বিস্তর কষ্ট করতে হয়েছে।

এবার কুম্ভমেলার মুখ্য স্নানপর্বে দেহাতী লোকের আগমন ছিল সর্বাধিক। তাদের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে শহরবাসীদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র থেকে আগত দেহাতী লোকের সংখ্যাই বেশি। অবাক হয়েছি তাদের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দেখে। তিন-চার দিনের রসদ, ঘুঁটের বস্তা,

বিছানাপত্র নিয়ে ভিড় ঠেলে মাইলের পর মাইল তাঁরা হেঁটেছেন। নিচে বালি ও উপরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় শীত ও রৌদ্রকে উপেক্ষা করে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছেন কয়েকদিন। চার ও পাঁচ ফেব্রুয়ারি মেলাভূমিতে লোক আসার দৃশ্যটি অবর্ণনীয়। এই দেশে বড় বড় রাজনৈতিক সমাবেশগুলিতে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়তো বিরল নয়। কিন্তু দেড়-দুই কোটি লোকের সমাগম অবশ্যই বিরল ব্যাপার। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এই আগমনদৃশ্য আমার কাছে রীতিমতো একটি দেখার বিষয় বলে মনে হয়েছে। আর সকলেরই লক্ষ্য সঙ্গম। প্রত্যেকেরই যেন সাধ এসেই প্রথম একবার সঙ্গমে স্নান করার। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্গম কোথায় তা যাতে সহজে বোঝা যায়, সেজন্য সঙ্গমস্থলের নিকটে নির্মিত হয়েছে একটি সুউচ্চ টাওয়ার। এর নাম দেওয়া হয়েছে সঙ্গম টাওয়ার। দেহাতী এক-একটি দলের মধ্যে ৫০-৬০ জন পর্যন্ত আছে। তারা যখন সারিবদ্ধভাবে চলে তখন সারির প্রথম জনের হাতে থাকে একটি পতাকা। এটিকে লক্ষ্য করে পরস্পর কাঁধে বা কাপড়ের আঁচল ধরে দলের সবাই এগিয়ে চলে। কোন কোন দলে দেখেছি লম্বা একটি কাছি ধরে লাইন বজায় রাখা হচ্ছে। এতে একটি সুবিধা হলো ভিড়ের মধ্যে সহজে কেউ ছিটকে যেতে পারবে না। যাতে দলের কেউ হারিয়ে না যায় এ-বিষয়ে তারা খুব সচেতন। তবু হাজার হাজার লোক সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আর হারিয়ে-যাওয়া লোকেদের সন্ধান দেওয়ার জন্য ভারত সেবাদলের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে 'ভোলে ভেটকে শিবির'। ভারত-সেবাদল যুবকংগ্রেসের একটি শাখা। তারা হারিয়ে যাওয়া লোকেদের নাম-ঠিকানা অবিরাম ঘোষণা করে যাচ্ছে। কেউ কেউ ব্রাহ্মণকে গো-দান করবেন বলে দেড়-দুই বছরের বকনা বাছুর নিয়ে এসেছেন। তাঁদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে পথ চলতে—গরুরও, মালিকেরও। তবু প্রয়াগে গো-দানের পুণ্যসঞ্চয় এবং পরকালে গরুর লেজ ধরে অনায়াসে বৈতরণী পার হওয়ার বাসনায় বহু পুণ্যার্থী নির্ব্বিধায় সহ্য করছেন এ-কষ্ট।

মেলার পরিবেশটিও বেশ চমৎকার। চারিদিকেই যেন আধ্যাত্মিক আবহাওয়া বইছে। আখড়াগুলিতে ভজন, কীর্তন, পাঠ, আধ্যাত্মিক পালার অভিনয়—এসব লেগেই আছে। দিন-রাত অষ্টপ্রহর চলছে এসব। কোথায়ও নেই কোন ছায়াছবি, ভি ডি ও পার্লার বা অন্য কোনও সস্তা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। এত ভিড়ের মধ্যেও কোন জায়গায় স্থির হয়ে বসে শুনলে মন যেন অন্তর্মুখী হয়ে যায়। মনে হয় ভারতীয় জনমানসের মূলসুরটিই যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চারিদিকে।

অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে মেলাভূমি। সাধুদের প্রতিটি আখড়ার সম্মুখভাগ রুচি ও সাধ্যানুযায়ী সাজানো হয়েছে। সুন্দর আলোক-সজ্জা করা হয়েছে আখড়াগুলিতে। বিদ্যুতের যেন অভাব নেই। মেলার রাস্তা-ঘাটগুলিও উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ঝলমল করছে। রাত্রে যেন অলকাপুরীর রূপ ধারণ করে মেলাভূমি। শাস্ত্রী ব্রিজের উপর থেকে রাত্রে অপূর্ব দেখায়। বড়ই উপভোগ্য সে দৃশ্য।

কুম্ভমেলার একটি বিশেষ আকর্ষণ সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ নাগা সন্ন্যাসীরা। ছোটবেলা থেকে নাগা সাধুদের সম্পর্কে অনেক কথা শুনে এসেছি তারা নাকি খুব ক্রোধী। রেগে গেলে চিমটা দিয়ে মানুষের পেট ফুটো করে দেয় ইত্যাদি। কয়েকটি আখড়ায় এই নাগাদের দেখেছি। তবে হিংস্রস্বভাবের কাউকে দেখিনি। নাগা সন্ন্যাসী মানে যাঁরা কাপড় পরেন না। তবে এঁরা যে সবসময়ই কাপড় পরেন না এমন নয়। কেউ কেউ কৌপীন এবং কেউ কেউ স্বল্পবাস পরিহিত। যখন সাধুরা শোভাযাত্রা করে স্নানে যান তখন নাগারা সম্পূর্ণ নগ্ন থাকেন।

প্রত্যেক আখড়ার মধ্যেই প্রচুর ভক্তসমাগম হচ্ছে। ভক্তদের থাকার ব্যবস্থাও প্রায় প্রত্যেক আখড়াই করেছে। বড় বড় আখড়াগুলি প্রচুর জায়গা নিয়ে শিবির স্থাপন করেছে। সাধুদর্শনের জন্য প্রচুর লোক যাচ্ছে আখড়াগুলিতে। এত লোক কি শুধু সাধুদর্শন করতে যাচ্ছে, নাকি কৌতূহলবশতঃ—এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। কৌতূহলী দর্শক হয়তো কিছু আছে, তবে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যে গভীর তাঁর প্রমাণ দেওয়ালা বাবাকে দর্শন করার জন্য মানুষের আকুতি। গঙ্গার অপর পারে, সঙ্গম থেকে

প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে ঝুঁসি বলে একটি স্থান আছে। সেখানে সাধুদের কিছু কুঠিয়া আছে। সেখানে এক কুঠিয়ায় বাস করেন দেওরালা বাবা। বড় সাধু বলে ঐ অঞ্চলে তাঁর নাম আছে। তাঁকে দর্শন করার জন্য হাজার হাজার কুম্ভস্নানার্থী ভিড় করছেন সেখানে। আমি সেখানে যাইনি। শুনেছি, মাত্র মিনিটখানেক দর্শন দিয়েই বাবাজী ঘরে ঢুকে পড়েন। একবার দর্শন দেওয়ার কতক্ষণ পরে যে পুনর্দর্শন দেবেন তার ঠিক নেই; একঘণ্টাও হতে পারে দু-ঘণ্টাও হতে পারে। কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন না তিনি। তবু ফল-ফুল-মিষ্টি নিয়ে তাঁর দর্শন পাওয়ার আশায় হাজার হাজার লোক অপেক্ষা করেন শুনলাম।

এখন ৬ ফেব্রুয়ারির স্নানের কথা একটু বলি। এবছরের কুম্ভের মুখ্য স্নান এদিন। স্নানের জন্য সব ব্যবস্থা আগের দিনই সম্পূর্ণ হয়েছে। সমস্ত আখড়ার সাধুরা শোভাযাত্রা করে সঙ্গমঘাটে যাবেন স্নান করতে। দশনামী-সম্প্রদায়ের সব আখড়াই শোভাযাত্রা করে স্নানে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি আখড়া হল মহানির্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, নির্মলা, বড় উদাসী ইত্যাদি। বহু বৈষ্ণব আখড়াও আছে। তারা আলাদা শোভাযাত্রা করে স্নানে যায়। প্রয়াগ কুম্ভে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা মহানির্বাণী আখড়ার সঙ্গে স্নানে অংশগ্রহণ করে, আর হরিদ্বার কুম্ভে নিরঞ্জনী আখড়ার সঙ্গে। ৫ তারিখ রাত্রে খাওয়ার সময় আমাদের বলা হল যে, যাঁরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের শিবির থেকে ভোর সাড়ে চারটেয় শোভাযাত্রা করে মহানির্বাণী আখড়ায় গিয়ে জমায়েত হবেন। এই শোভাযাত্রায় ভক্তরাও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেককেই মিশনের ব্যাজ নিয়ে যেতে হবে। যথা সময়ে আমরা মিছিল করে মহানির্বাণী আখড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। একে একে সব আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর, মণ্ডলেশ্বরেরা এলেন এবং স্ব-স্ব সুসজ্জিত যানে আরোহণ করলেন। আমরা মহানির্বাণী আখড়ায় যাওয়ার এক-দেড় ঘণ্টা পরে শোভাযাত্রা আরম্ভ হল। আখড়াগুলির মধ্যে কোন্ আখড়া প্রথম স্নান করবে তা নির্দিষ্ট করা আছে। প্রয়াগ কুম্ভে মহানির্বাণী আখড়াই আগে স্নান করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকেন নাগা সন্ন্যাসীরা। প্রথানুযায়ী তাঁরাই প্রথম স্নান করবেন। পরে অন্যরা। গায়ে ভস্মলিপ্ত, গলায় পুষ্পমাল্য শোভিত, সম্পূর্ণ নগ্ন নাগা সন্ন্যাসীরা 'হর হর বিশ্বনাথ গঙ্গে, জয় অমরনাথ গঙ্গে' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। আমরাও সুর মিলিয়ে চলতে লাগলাম। মিছিল ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে। যতই সঙ্গমের নিকটবর্তী হচ্ছে, শোভাযাত্রায় বিশৃঙ্খলাও তত বাড়ছে। সঙ্গমে এসে সেই বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত রূপ নিল। নাগা সন্ন্যাসী, অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসী, পুরুষ-মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না। যে যে-ভাবে পারছে হুড়মুড় করে জলে নামছে। যারা নামছে তারা উঠতে পারছে না, উঠলেও যাওয়ার পথ পাচ্ছে না। ভয়ংকর অবস্থা। এরূপ অবস্থায় কোন প্রাণহানি ঘটা অসম্ভব নয়। তা যে ঘটেনি মা ত্রিবেণীর বিশেষ কৃপা। তবে অনেকেই কাপড়, গামছা, শীতবস্ত্র হারিয়েছেন। অনেকের অভিমত শোভাযাত্রা পরিচালনার দক্ষতার অভাবের জন্যই এমনটি হয়েছে। কিভাবে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করলে স্নানের সুবিধা হবে এ-বিষয়ে আগে কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। এবার প্রত্যেক আখড়ার সাধুদের সঙ্গে সেই সেই আখড়ার সংশ্লিষ্ট ভক্তরাও ছিল। ভক্তদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা ছিল না। অনেকের মতে সকল সাধুদের লাইন আগে এবং পিছনে ভক্তদের লাইন গেলেই কোন অসুবিধা হতো না। স্নানের ঘাটে গিয়ে ভক্তদের আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছিল না। তাছাড়া শোভাযাত্রা যে নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল তার দু-ধারে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল শোভাযাত্রা দেখতে। তাদের মধ্যে বহু লোক পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের চোখে ফাঁকি দিয়ে বেড়া টপকে শোভাযাত্রার কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। যা-হোক, কোন মতে জলে নেমে কয়েকটি ডুব দিয়ে পাড়ে উঠলাম। কিন্তু কিছুতেই উপরের দিকে এগুতে পারছিলাম না। এক পা এগুচ্ছি তো ভিড়ের ধাক্কায় দশ পা পিছিয়ে আসছি। ভয় হচ্ছিল, যদি একবার পড়ে যাই তবে পাদপিষ্ট হয়ে নির্ঘাত মৃত্যু। ভগবানকে স্মরণ করে অতিকষ্টে উপরে উঠে এলাম। ভিজে কাপড়ে অনেক দূর হেঁটে এসে কোন মতে

একটি কাপড় জড়িয়ে শিবিরে ফিরে এলাম।

স্নানপর্বের শোভাযাত্রা যদিও উষালগ্নে হয়েছে, কিন্তু অমাবস্যা আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই স্নান শুরু হয়। সারা রাতই মানুষ স্নান করেছে। ভোরের দিকেই ভিড়। খবরে পড়েছি সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত প্রতি মিনিটে দশ হাজার লোক স্নান করেছে। স্নান সারার পরেই লোকে মেলাভূমি ত্যাগ করতে শুরু করেছে। চার-পাঁচ তারিখ মনুষ্যস্রোতের আগমনের মতো বহির্গমনের দৃশ্যটিও ছিল দেখার মতো। বিছানাপত্রের বোঝা মাথায় নিয়ে জনস্রোত চলছে তো চলছেই। এর যেন শেষ নেই। যাঁরা এই কয়েকদিন উন্মুক্ত আকাশের নিচে কাটিয়েছেন, ফিরে যাওয়ার তাড়া তাঁদের মধ্যেই বেশি। এদিকে সঙ্গম ঘাটে লোক আসারও কমতি নেই। যাঁরা দূরে দূরের শিবিরে আছেন, তাঁরা এতদিন গঙ্গার বিভিন্ন দিকেই স্নান করেছেন। অন্ততঃ একবার সঙ্গমে স্নান করার জন্য তাঁরা এখন আসছেন।

যমুনা নদীতে প্রচুর নৌকা। চার তারিখ দেখেছি বহু লোক নৌকায় চড়ে সঙ্গমের মাঝখানে স্নান করেছেন। লোকভর্তি নৌকা এপার ওপার যাতায়াত করছে। পাঁচ তারিখ থেকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সঙ্গম এলাকায় যাত্রীবাহী নৌকা চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। নৌকায় চড়তে আগ্রহী অনেকে সঙ্গম থেকে চার কিলোমিটার দূরে সরস্বতী ঘাটে গিয়ে যমুনায় নৌকা চড়ে এসেছেন। ৬ তারিখ বিকালে আমরা কয়েকজন সেতু পার হয়ে অপর পারে গিয়ে কিছুক্ষণ নৌকায় চড়েছি। নৌকা থেকে মেলার দৃশ্য চমৎকার দেখায়। এই দিনই সরস্বতী ঘাটে নৌকা ডুবে দুই জনের সলিল সমাধি হয়।

৬ তারিখ রাত্রে খাওয়ার পর আর একবার মেলা দেখতে বেরুলাম। চলে গেলাম আমাদের শিবির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে শাস্ত্রী ব্রিজের উপর। গঙ্গার উপর বিশাল এই পাকা ব্রিজটি অতি প্রশস্ত। ব্রিজের দু-ধারে দুটি এবং মাঝখানে দুটি মোট চারটি ফুটপাত আছে। ব্রিজের একদিক দিয়ে গাড়ি আসে ও অপর দিক দিয়ে যায়। রাত্রে এই ব্রিজ থেকে মেলার দৃশ্য খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। উত্তর-দক্ষিণে তাকিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখি শুধু আলো আর আলো। যেন আলোর সমুদ্রে ভাসছে মেলা অঞ্চলটি। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটছি। মাঝা-মাঝি জায়গায় গিয়ে দেখি একটি মৃতদেহকে কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। নিকটে কিছু লোক চুপ করে গোঁজ পাকিয়ে বসে আছে। তাদের মুখে কোন কথা নেই। সকলে শোকস্তব্ধ। মৃতব্যক্তি স্ত্রী না পুরুষ, বৃদ্ধ না যুবা কে জানে। কোন সুদূর প্রদেশ থেকে এসেছিল অমৃত কুম্ভের স্নানলব্ধ পুণ্যবলে পরকালে অমৃতধামে গমন আশায়। পূর্ণ হয়েছে কি তার সেই বাসনা?

যে-কারণে শত শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, এমনকি মৃত্যুকে উপেক্ষা করেও লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী হিন্দু নরনারী আসমুদ্রহিমাচলের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে জীবনে অন্ততঃ একবার কুম্ভস্নান করে পুণ্যার্জনের আশায় ছুটে আসেন তার মূলে রয়েছে পুরাণ-প্রসিদ্ধ সমুদ্রমন্থন-কাহিনীর প্রভাব। সমুদ্রমন্থন-কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীহীন হন এবং সর্বসৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী স্বর্গ পরিত্যাগ করে ক্ষীর-সমুদ্রে প্রবেশ করেন। লক্ষ্মীকে ফিরে পাওয়ার জন্যে দেবতা ও দানবগণ একযোগে সমুদ্রমন্থন করতে শুরু করেন। মন্থনসময়ে সমুদ্রগর্ভ থেকে বহুবিধ রত্নরাজির সঙ্গে অমৃতপূর্ণ একটি কলসও উত্থিত হয়। অমৃত যে পান করে সে-ই অমর হয়ে যায়। দেবতারা চেয়েছিলেন অসুরদের বঞ্চিত করে শুধু নিজেরাই অমৃত পান করবেন। এর ফলে অমৃতের অধিকার নিয়ে উভয়ের মধ্যে মহাসংগ্রাম শুরু হয়। দেবাসুরগণ যখন সংগ্রামে রত, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তখন কলসিটি নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য অসুরেরা যুদ্ধে জয়লাভ করলেও যাতে অমৃতের সন্ধান না পায়। জয়ন্তকে লুকিয়ে পালাতে দেখে কয়েকজন অসুরের সন্দেহ হয়। তারা জয়ন্তের পিছনে ধাওয়া করে। অমৃতকুম্ভকে অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করতে জয়ন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে লাগলেন এবং অবশেষে পৃথিবীতে এসে পেঁছিলেন। কিন্তু এই ছোটাছুটির ফলে জয়ন্ত খুব পরিশ্রান্ত হন। বিশ্রামের জন্য পৃথিবীর চার স্থানে তাঁকে কলসি নামাতে হয়েছিল। এই

চার স্থানেই কলসি ওঠা-নামা করানোর সময় উথলিয়ে কয়েক ফোঁটা করে অমৃত পড়ে। আর অমৃতের স্পর্শে এই চারটি স্থান পবিত্র তীর্থ হয়ে উঠে। ভারতবাসীর বিশ্বাস, কুম্ভযোগে এই চারটি তীর্থে স্নান করলে পরকালে অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। স্কন্দপুরাণ মতে এই চারটি তীর্থ হল :

গঙ্গাদ্বারে হরিদ্বারে প্রয়াগে চ ত্রিবেণী-সঙ্গমে।
ধারায়াং সীপ্রা-নদীতটে গোদাবর্যান্তটে
নাসিকে তথা॥

—গঙ্গা যেখানে সমতলে অবতরণ করছে সেই হরিদ্বার, ত্রিবেণী-সঙ্গম প্রয়াগ, সীপ্রা (শিপ্রা) নদীর তট উজ্জয়িনী এবং গোদাবরী নদীর তট নাসিক। কুম্ভস্নানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আরও কিছু শাস্ত্রীয় বচন পাওয়া যায় :

অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়-শতানি চ।
লক্ষং প্রদক্ষিণং পৃথ্ব্যাঃ কুম্ভস্নানেন তৎফলম্।
সহস্রং কার্তিকে স্নানং মাঘে স্নানং শতানি চ।
বৈশাখে নর্মদা কোটিঃ কুম্ভস্নানেন তৎফলম্॥

অর্থাৎ একহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ, একশো বাজপেয় যজ্ঞ, পায়ে হেঁটে একলক্ষবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ, গঙ্গাদি পবিত্র নদীতে কার্তিক মাসে হাজার বার আর মাঘ মাসে একশো বার স্নান করলে যে ফল পাওয়া যায়, সেই রকম সব ফল একসঙ্গে পাওয়া যায় জীবনে অন্ততঃ কুম্ভযোগে একবার স্নান করলে।

একবার যেখানে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয় তার বারো বছর পর আবার সেখানে এই মেলা হয়। অমৃতের কলসী নিয়ে দেবতা ও দানবদের মধ্যে বারোদিন সংগ্রাম চলেছিল। এই বারোদিন মনুষ্যলোকের হিসাবে বারো বছর। এইজন্যই বারো বছর পর পর পূর্ণকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। কোথায় কখন কুম্ভযোগ হবে জ্যোতিষশাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে।

কুম্ভরাশি গতে জীবে যদ্দিনে মেষগে রবৌ।
হরিদ্বারে কৃতস্থানং পুনরাবৃত্তিবর্জনম্॥

—যখন কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি এবং মেষরাশিতে সূর্য অবস্থান করে তখন হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয়। যাতে স্নান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই কুম্ভের তিনটি স্নানপর্ব—শিবরাত্রি, চৈত্র-অমাবস্যা এবং মেষ-সংক্রান্তি। মেষ-সংক্রান্তি হল হরিদ্বার কুম্ভের মুখ্য স্নানপর্ব। তার তিন বছর পর, যখন বৃহস্পতি মেষরাশিতে, সূর্য মকররাশিতে অবস্থান করে তখন প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়। তখন যদি চন্দ্রও মকররাশিতে অবস্থান করে তাহলে গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। এ-সম্পর্কে শাস্ত্রবচন :

মেষরাশি গতে জীবে মকরে চন্দ্র-ভাস্করৌ।
অমাবস্যায়াং তদাযোগঃ কুম্ভাখ্যস্তীর্থ-নায়কে॥

প্রয়াগে কুম্ভ সম্পর্কে আরেকটি শাস্ত্রবচন :

মকরে চ দিবানাথে বৃষরাশি গতো গুরোঃ।
প্রয়াগে কুম্ভযোগো বৈ মাঘমাসে বিধুক্ষয়ে।

এই বচন অনুযায়ী যখন মকর রাশিতে সূর্য এবং বৃষরাশিতে বৃহস্পতি থাকে তখন মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়। এই বচনানুসারেই এ বছর ৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগে মুখ্যস্নানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কুম্ভের তিনটি প্রধান স্নানপর্ব মকর সংক্রান্তি, মাঘী অমাবস্যা (মৌনী অমাবস্যা) ও বসন্ত-পঞ্চমী। সাধারণতঃ মকর সংক্রান্তির স্নানই প্রয়াগ-কুম্ভের মুখ্যস্নান। এবার মাঘী অমাবস্যায় বৃহস্পতি বৃষরাশিতে থাকায় এবং সূর্য, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র এই চারটি গ্রহের একত্রে অবস্থান হওয়ায় এই বছরের (১৩৯৫ বাং, ১৯৮৯ খ্রীঃ) মুখ্য স্নানপর্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রয়াগ-কুম্ভের তিন বছর পর যখন বৃহস্পতি সিংহরাশিতে এবং সূর্য মেষরাশিতে অবস্থান করে তখন উজ্জয়িনীতে কুম্ভযোগ হয়। এই কুম্ভের তিনটি প্রধান স্নানপর্ব মেষসংক্রান্তি, বৈশাখী অমাবস্যা এবং বৈশাখী পূর্ণিমা। ঐ সময় হরিদ্বারে হয় অর্ধকুম্ভ। ঐ বছরই যখন বৃহস্পতি, সূর্য এবং চন্দ্র সিংহরাশিতে থাকে তখন আষাঢ় মাসে কুম্ভযোগ হয় নাসিকে। চার মাস ধরে—আষাঢ় শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিক শুক্লা একাদশী পর্যন্ত এই মেলা চলে। প্রধান প্রধান স্নানপর্ব সিংহসংক্রান্তি (শ্রাবণ মাসে পড়ে) ভাদ্র অমাবস্যা এবং কার্তিক শুক্লা একাদশী। এর তিন বছর পর প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ হয়; তখন বৃহস্পতি বৃশ্চিকরাশিতে এবং সূর্য মকররাশিতে থাকে। তার তিন বছর পর পুনরায় হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ হয়।

জয়ন্ত যখন অমৃত-কলস নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরেছিলেন, তখন তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতি, সূর্য ও চন্দ্র। কলসির যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে-দিকে তাঁরা লক্ষ্য রাখছিলেন। এজন্য এই তিন গ্রহের অবস্থানের উপর নির্ভর করেই কুম্ভযোগ স্থির হয়।

কুম্ভমেলার একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও আছে। আমাদের এই দেহই একটি কুম্ভ। সাগরোত্থিত কুম্ভে যেমন অমৃত ছিল, তেমনি আমাদের দেহরূপ কুম্ভেও রয়েছে অমৃতস্বরূপ আত্মা। এই আত্মাকে জেনেই মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ অতিক্রম করে অমৃতত্বের অধিকারী হয়। কিন্তু সেই অমৃত তো সহজে লাভ করা যায় না ; তার জন্য প্রয়োজন কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যরূপী স্বভাবজাত আসুরিকভাবগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করা, এদের প্রভাব থেকে আত্মাকে রক্ষা করা। সেজন্য প্রয়োজন হয় বৃহস্পতির মতো সদ্‌গুরুর। প্রয়োজন হয় চন্দ্রের মতো নির্মল বিবেকবুদ্ধি ও সূর্যের মতো সদাজাগ্রত ইন্দ্রিয়সমূহের —অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যাতে আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী বিষয় গ্রহণ না করে সেদিকে তাদের সতর্কতার। যদি সদ্‌গুরু না মেলে, যদি বিচারবুদ্ধি শুভ না হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ যদি বল্গাহীনভাবে বিষয়ের দিকে ছোটে, তাহলে কাম-ক্রোধাদি আসুরিক শক্তিগুলি দেহকুম্ভকে হরণ করে—অর্থাৎ এই দেহকুম্ভে যে অমৃতস্বরূপ আত্মা আছে, তা ভুলিয়ে দেয়। আর এই তিনের সাহায্য যখন আত্মজ্ঞানলাভের অনুকূল হয়, তখন জীব অমৃতত্বের আস্বাদ পেতে আরম্ভ করে। জীব দেহকুম্ভে অমৃতের আস্বাদ পেয়ে তার রসধারায় যখন অবগাহন করে তখনই জীবের অন্তরে অনুষ্ঠিত হয় প্রকৃত কুম্ভমেলা। এই কুম্ভমেলা বারো বছর পর পর নয়, এই কুম্ভমেলা নিত্য অন্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

কবে থেকে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, তা বলা কঠিন। অনেকে ঋগ্বেদ থেকে মন্ত্রোদ্ধার করে এ-মেলার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেন। পুরাণ এবং ইতিহাসেও এ মেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে কুম্ভমেলায় যে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায় তার মূলে আছে আচার্য শংকরের প্রভাব। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে হিন্দুধর্ম যখন স্তিমিত, তখন তার পুনর্জাগরণে আচার্য শংকরের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর এই হিন্দুজাগরণের প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠের দশনামী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবৃন্দ কুম্ভমেলায় মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে মত-বিনিময় করতেন। তখন থেকেই কুম্ভমেলা বৃহৎ ধর্মীয় মেলার রূপ পরিগ্রহ করে।

৭ ফেব্রুয়ারি বিকালের মধ্যেই অধিকাংশ লোক কুম্ভনগর থেকে বিদায় নিয়েছে। ইচ্ছা ছিল এদিন আমরাও কুম্ভনগর ত্যাগ করে কাশীধামে চলে আসব। কিন্তু ভিড় ও যানবাহনের অসুবিধার কথা ভেবে সে-আশা ত্যাগ করলাম। ইতিমধ্যে আকবরের ফোর্ট দেখতে গেলাম। এই ফোর্টের ভিতর অনেক দেব-দেবীর মূর্তি আছে। আর আছে প্রয়াগ তীর্থের বিশেষ মাহাত্ম্যসূচক অক্ষয় বট। কথিত আছে প্রলয়কালে একমাত্র এই অক্ষয় বটই অবশিষ্ট ছিল। তখন ভগবান বিষ্ণু বালরূপ পরিগ্রহ করে এই বটবৃক্ষে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জন্যে ফোর্টের ভিতর প্রবেশ করতে পারলাম না। অক্ষয় বটও দর্শন হল না। এদিন সকালে এক সুযোগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতি-বিজড়িত মুঠিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে এলাম। বিকালে শেষবারের মতো আর একবার মেলা ঘুরে দেখে নিলাম। ৮ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটায় তীর্থরাজ প্রয়াগক্ষেত্রকে প্রণাম জানিয়ে কাশীধামের পথে যাত্রা করলাম।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম। ভারতবর্ষের দূরদূরান্ত সব প্রদেশ থেকে, হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের, সমাজের সকল স্তরের লক্ষ লক্ষ নরনারী নানা প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করে কুম্ভমেলায় সমবেত হন। কুম্ভমেলার পশ্চাতে শাস্ত্রীয় বচন যাই থাক না কেন, এবং সকলের তা জানা না থাকলেও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে এবং শুধু ভক্তি-বিশ্বাসকে সম্বল করে সমবেত হন তাঁরা। তাই এই মেলা নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক, ভারতীয় জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক—প্রতীক জাতীয় ঐক্যের। এবারের কুম্ভে বহু বিদেশী পর্যটককেও দেখেছি। হয়তো কালে এই কুম্ভমেলা জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত মেলার রূপ নেবে।

পরমপদকমলে

ঠাকুরের কাছে দরবার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর, আপনি বলেছিলেন, গৃহদুর্গ সর্বাধিক নিরাপদ স্থান। ইচ্ছে থাকলেই সেখানে বসে সাধন-ভজন করা যায়। ভালভাবেই করা যায়। সে-গৃহ যে আর দুর্গ নেই ঠাকুর। শতবর্ষ পরে গৃহ এখন শত্রুপুরীর চেহারা নিয়েছে। গৃহ একালে সুদৃশ্য হয়েছে অবশ্যই। সাজ-সজ্জার অভাব নেই। গুণী স্থপতিরা নকশা করে দেন। শয়নকক্ষ, বসার কক্ষ, ভোজনপরিসর। প্রকৃতির ডাকে রাত-বিরেতে লণ্ঠন হাতে পুকুর পাড়ে ছুটতে হয় না। লাগোয়া স্নানাগার। অষ্টপ্রহর জলের ধারা। ডবল জানালা। বাহারী পর্দা, পেলমেট। সোফা, কার্পেট। ঢাকনা পরানো আলো। গান শোনাবার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। বাকসো বোঝাই সিনেমা। বোতাম ঘোরালেই দিল্লির প্রমোদ তরঙ্গ। রান্নাঘরে নির্ধূম অগ্নিশালায় চট-জলদি রান্নার ব্যবস্থা। শিল নোড়া নির্বাসিত। গুঁড়ো মশলা। ভারতীয় পদের সংখ্যা কমে চীনে খাবারের প্রচলন। নারীপ্রগতি যত বাড়ছে ততই বাড়ছে সংসারের রুক্ষতা। মা কোথায়? মায়েরা সব গেলেন কোথায়? শিক্ষা আর স্বাধীনতা যেন একালের পরশুরাম। মাকে হত্যা করেছে। গৃহ আছে মনোরম, গৃহদেবতা নেই। পূজা-পার্বণ নাকি কুসংস্কার। শাঁখ আর বাজে না, সন্ধ্যা আর দেখানো হয় না। ঠাকুর আপনি বলেছিলেন, টাকা মাটি। একালে টাকাই সব। টাকাই ঈশ্বর।

[illegible] আপনি বলেছিলেন, সাত্ত্বিকের সংসার হবে শিবের সংসার। একটু এলোমেলো, একটু অগোছালো, ধুলোটুলো হয় তো থাকল, কিন্তু দুখচেটে, তেলচিটে নয়। অপবিত্র নয়। অতিথি এসে অশ্রদ্ধা পেয়ে ফিরে যায় না। ভিখারি ভিক্ষা পায়, রাতে আলো জ্বলে ঘরে ঘরে। সুন্দর একটি ঠাকুরঘর থাকবে নির্জন, নিরালা, ধূপ-ধুনোর গন্ধভরা। সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ জ্বলবে আপন মনে। আমার সন্দেহ হয় ঠাকুর, একালের কটি গৃহে আপনি জলগ্রহণ করবেন। অন্নগ্রহণ। সে তো অনেক দূরের কথা। আপনি যে স্পর্শদোষ ভীষণ মানতেন। দেহলক্ষণ দেখে মানুষ চিনতেন আপনি। আপনি বলে গেছেন—"হাড়পেকে, কোটর চোখ, ট্যারা এ-রকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। 'দক্ষিণে কলাগাছ, উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল কি করব মুই।'" একালের কজনকে আপনি পা স্পর্শ করে প্রণামের অধিকার দিতেন, আমার সন্দেহ আছে। সেই ভগবতী দাসীর ঘটনা আমার মনে আছে। সে ছিল মথুরবাবুদের পুরনো দাসী। প্রথম বয়সে তার স্বভাব ভাল ছিল না। একদিন ভগবতী আপনার সঙ্গে নানা কথা কইতে কইতে সাহস পেয়ে আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন করে উঠেছিলেন, যেন বৃশ্চিক দংশন করলে। 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ' বলতে বলতে ছুটে গেলেন ঘরের কোণের গঙ্গাজলের জালার কাছে। পায়ের সেই জায়গা দুটো জল দিয়ে ধুয়ে তবে শান্তি। আজকাল আমরা ভগবতী দাসীর চেয়েও বেশি শিথিল জীবন-যাপন করি।

আমাদের চরিত্রের সব বাঁধনই প্রায় আলগা হয়ে গেছে। মানুষের বিচার একালে আর চরিত্র দিয়ে হয় না। হয় বৈষয়িক সাফল্য দিয়ে। গাড়ি, বাড়ি, অর্থ, সামাজিক পদমর্যাদা। একালে সাধুর চেয়ে ক্ষমতাশালী শয়তানই বেশি পূজনীয়। আমাদের তাহলে কি হবে ঠাকুর! আপনাকে তো ত্যাগ করতে পারব না। জীবনের সুর যে আপনি বেঁধে দিয়েছেন।

আপনি বলেছিলেন, "ঈশ্বরলাভের জন্যে সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে।" ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরতে পেরেছি কিনা জানি না, দুহাতেই কাজ করে চলেছি, অকাজ সব। অপেক্ষায় আছি, অবসর মিললেই দুহাতে তাঁর সেবা; কিন্তু তাঁকে ধরার আগেই তো রোগে ধরবে। উপার্জন কমে আসবে। আর সংসার তো ছাড়বে না। এ সংসার তো কাবুলিওয়ালার সংসার। সব সময় দেহি, দেহি। আসল দাও, সুদ দাও। পাঁকাল হয়ে পেছলাবার চেষ্টা করলে, মায়েরা আজকাল দুহাতে ছাই মেখে ধরে। আমি তো আপনার উপদেশ মতো সংসাররূপ কাঁঠালটি ভাঙ্গার আগে দুহাতে চৈতন্যরূপ তেল মাখার চেষ্টা করিনি ঠাকুর। শুধু এইটুকু মনে রেখেছিলুম—"ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যেকালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে-তৃষ্ণা এ-সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ-যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম।' স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, যদি পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে যেতে না হয় তবে যাও। তা যদি হয়, তাহলে এই এক ঘরই ভাল।' তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়িতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবে। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।" জ্ঞান যার লাভ হয়নি তার কি হবে! নিজে সোজা থাকার চেষ্টা করলেও সংসারের সদস্যরা মেরে ধনুক করে দেবার চেষ্টা করে। তাদের 'দেহি-দেহি' রব, আমার 'ত্রাহি-ত্রাহি' চিৎকার।

আপনি বলেছিলেন বিদ্যার সংসার, বিদ্যা-স্ত্রী। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম 'তুমি কি বিদ্যা-স্ত্রী?' তিনি বললেন, 'কোয়ালিফিকেশন দেখেই তো এনেছিলে!'

'সে-বিদ্যা নয়, সহমর্মী, সহধর্মী। ঢোকার কায়দা তো জানা হল, বেরিয়ে আসার কায়দা জানো?'

'সে তো মৃত্যু!'

'না। মরণ এসে ঘাড় ধরে বের করে দেবার আগেই নিজেকে তুলে নেবার কৌশল। কর্ম যখন মুক্তি দেবে তখন দুহাতে তাঁকে ধরার কথা বলেছেন ঠাকুর।'

'তখন হাঁড়ি চড়বে কিসে?'

'কেন পুত্র?'

'তার তো কোনও চাকরিই নেই। এযুগে চাকরি পাওয়া আর ঈশ্বরকে পাওয়া একই কথা!'

'তাহলে, রিটায়ার করার পর সামান্য যা কিছু মিলবে, তাইতেই না হয় ছোটো খানা!'

'মেয়ের বিয়ে? তাইতেই সব চলে যাবে?'

ঠাকুর, তাহলে কি হবে! আপনার মতো সাহস করে বলি কি করে—'রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না।'

আনন্দের সন্তান

আনন্দে খেলে গোরা

তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। বাতাসের প্রবল গর্জন। দূর থেকে ছুটে আসছেন এক মানুষ। চাঁদের কিরণ বুঝি তাঁর সারা দেহ দিয়ে গলে গলে পড়ছে। পরনের কটিবাস খসে যাচ্ছে। দুই চোখে ব্যাকুল দৃষ্টি। কই, কোথায় যমুনা? ঐতো, ঐতো যমুনা কলকল করে বয়ে যাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি উত্তাল সমুদ্রের বুকে।

ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—চৈতন্য মহাপ্রভু। অন্তরে যখন তাঁর তীব্র ভাবতরঙ্গ উঠত, যখন তা আছড়ে পড়ত দেহতটে, তখন বহির্বিশ্বের রূপ যেত হারিয়ে, আন্তর সত্যই একমাত্র সত্য হয়ে উঠত তাঁর কাছে, গৌণ হয়ে যেত প্রাকৃত গর্জনমুখর সাগর। আনন্দ-সাগরে চৈতন্য-সাগর মেশাবার সেই ধ্বনি, সেই রূপ আজও কেউ কেউ শোনেন, দেখেন, 'অদ্যাপি, সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

অধ্যাত্মলীলার সেই সর্বোচ্চ পর্যায়েই কেবল নয়, আনন্দধারা প্রবাহিত ছিল এই দেবমানবের ঘরোয়া জীবনেও। তিনি স্বয়ং পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁর নানা আচরণের মধ্যেও হাসির উপাদান মেলে। তবু তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিকটির অল্প পরিচয়ই আমরা পেয়েছি। চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলি মহাপ্রভুর অলৌকিক, ঐশ্বরিক জীবনের প্রতি আলোক নিক্ষেপ করতেই ব্যস্ত ছিল। অবতারপুরুষ আনন্দের সন্তান। তাঁর ব্যবহারিক জীবনে সেই আনন্দ-সত্তাটিকে ফুটিয়ে তোলার অল্পই প্রয়াস সেখানে লক্ষ্য করা গেছে।

বালক নিমাই মোটেই সমবয়সী অপরাপর বালকদের থেকে পৃথক ছিলেন না, বরং দৌরাত্ম্যে তাঁর সমকক্ষ কমই ছিল। তাঁর রকমারি দৃষ্টান্ত বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন—কখনো প্রতিবেশীদের ঘরে ঢুকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দুগ্ধপান, কখনো অন্নভক্ষণ। আর যার ঘরে কিছুই মেলেনি—তার হাঁড়িকুড়ি ভেঙে রেখেছেন। অপরের অনুকরণ নিমাই ভালই করতেন। তেমন একটি ঘটনা ঘটেছিল বৈদ্য মুরারিকে নিয়ে। একদিন মুরারি রাস্তা দিয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে করতে চলেছেন। নিমাই বন্ধুদের সঙ্গে খেলছেন। মুরারিকে দেখে তাঁর হাত-পা নাড়ার অনুকরণ করলেন। মুরারি রেগে অস্থির, দু-চারটে কথাও দিলেন শুনিয়ে। নিমাই চুপ। কিন্তু পরদিন শোধ নিলেন অন্যভাবে। মুরারি দুপুরে বাড়িতে খেতে বসেছেন। এমন সময় নিমাই—

'মধ্যে ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড় গেলা
থালু ভরিয়া মুত মুতিলা।'

জগন্নাথ মিশ্রও তাঁর এই কনিষ্ঠ সন্তানটিকে ভালভাবেই চিনেছিলেন। একদিন দুপুরে তিনি খাচ্ছেন। নিমাইয়ের দুষ্টুবুদ্ধি হঠাৎ জেগে উঠল। বাবার যজ্ঞসূত্র (পৈতা) আচমকা টানে খুলে নিয়ে এক ছুট। নবদ্বীপেই মামার বাড়ি, পালালেন সেখানে। পাছে মামা ভাবেন ভাগনের হঠাৎ আগমন কেন, তাই ভাগনে মামাকে বোঝালেন, 'আমি তোমা না দেখিলে ভালো না বাসি।'

ঘর থেকে বাইরে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের খ্যাতি আগেই ছড়িয়েছিল। এবার গঙ্গার ঘাটে যেসব ব্রাহ্মণেরা স্নান করতে আসেন, তাঁদের আর নির্ঝঞ্ঝাটে স্নান করা হয়ে উঠল না। নিমাইয়ের নিত্য উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা। নিমাই কারো শিব-লিঙ্গ নিয়ে পালাচ্ছেন, কারো বা বিষ্ণু-পূজার আসনে বসে নৈবেদ্য খেয়ে নিচ্ছেন। আবার কারো ক্ষেত্রে ব্যাপার আরো চমকপ্রদ। সন্ধ্যা করতে কেউ জলে নেমেছেন, নিমাই ডুব সাঁতার দিয়ে পা ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। কারোর পিঠে উঠে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছেন। গুরুগৃহে যেসব পড়ুয়ার সঙ্গে পড়তেন, তাদেরও একদিন ভালমতো জব্দ করেছিলেন।

জলের যত কলসি ছিল, সবকটি ভেঙেছিলেন, আর সেই জলে সহপাঠীদের তালপাতার পুঁথি ভেসে বেরিয়ে গিয়েছিল।

জগন্নাথ মিশ্রের প্রাণে একটি দুঃখ গভীরভাবে বেজেছিল—জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণ। এমন ধারণা তাঁর হয়েছিল—অধিক বিদ্যাভ্যাসের ফলেই বিশ্বরূপ সংসারকে 'ধোঁকার টাটি' বুঝেছেন। তাই কনিষ্ঠ নিমাইয়ের বিদ্যানুরাগে তিনি ভীত হয়ে ভাবলেন বুঝি এও সংসার ত্যাগ করে। সুতরাং নিমাইকে আর পড়তে দেবেন না ঠিক করলেন। এদিকে নিমাই ততদিনে শাস্ত্রের আস্বাদ পেয়েছেন। তাই যেভাবেই হোক বাবার কাছ থেকে পড়বার অনুমতি আদায় করবেনই ঠিক করলেন। তাতে দৌরাত্ম্য আরো বেশি বাড়ল—দ্বিগুণ-তিনগুণ হোল। সেসব বিবরণ শুনলে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। নিমাই আর এক বন্ধুর সঙ্গে (তাকেও কি বাবার কথায় পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছিল?) রাত্রিবেলা সারা শরীর কম্বলে ঢাকলেন। তারপর রাস্তা দিয়ে গুটিগুটি চললেন ঃ 'বৃষপ্রায় হৈয়া চলেন কুতূহলী'। অর্থাৎ একেবারে চার হাত-পায়ে যাচ্ছেন। একবার শুধু ভাবুন—রাত্রিবেলা কালো কম্বলে শরীর ঢেকে যদি কেউ রাস্তা দিয়ে 'বৃষ' সেজে যায়, তাহলে ভয় পাবে না এমন মানুষ আছে কে? কেবল তাই? প্রতিবেশীদের উত্ত্যক্ত করার জন্য বাইরে থেকে তাদের দরজার ছিটকিনি এঁটে দেওয়া—এও তো নিমাইয়েরই কাণ্ড।

এতেও জগন্নাথ ছেলেকে পড়াতে রাজি হলেন না। তখন অন্যদিকে নিমাই এগোলেন। মন্দিরেও তাঁর উৎপাত শুরু হলো। দেবমূর্তি উঠোনে ফেলে দিয়ে সিংহাসনে বসছেন, আবার কোন মন্দিরে গিয়ে দেবতার নৈবেদ্য খেয়ে নিচ্ছেন। কখনো মন্দিরের দরজা বন্ধ করে পায়রা বা কোকিলের ডাক ডাকছেন।

এও যথেষ্ট মনে হল না। ভাঙা ভাতের হাঁড়ি (সেকালে মাটির হাঁড়িতে ভাত হতো) যেখানে সবাই ফেলে, নিমাই গিয়ে সেই আবর্জনার স্তূপের ওপর বসে রইলেন। শচীমাতার শুচিবাই কিছু প্রবল, পুত্রকে তিরস্কার করলেন। পুত্রও তেমনই। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর জবাব দিলেন ঃ

'তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে॥
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ জ্ঞান।
সর্বত্র আমার হয়—অদ্বিতীয় জ্ঞান॥'

নিরুপায় জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পড়বার অনুমতি দিলেন।

বৈষ্ণবদের নিয়েও কম রসিকতা নিমাই করেননি। বেশ ভাল করেই তিনি জানতেন 'ফাঁকি'তে বৈষ্ণবদের বড় ভয়। 'ফাঁকি' অর্থাৎ কূটতর্ক বৈষ্ণবরা কিছুতেই করবেন না, বরং সেসবকে এড়াতে পারলেই বাঁচেন। আর নিমাই 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করবেনই। শ্রীবাসাদি সকলে তাঁকে দেখলেই 'মিথ্যা বাক্যব্যয় ভয়ে সভে পলায়ন।' একদিন এই রকম একটি ঘটনা ঘটল। মুকুন্দ গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে নিমাইকে দেখেই পালালেন। নিমাই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ ব্যাটা আমারে দেখি পালাইলা কেনে?'

পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে তাঁর সুমধুর পরিহাস শোনা গেছে। শচীদেবী একদিন নিমাইকে বললেন, রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন বিষ্ণুঘরের দুই মূর্তি রাম (বলরাম?) এবং কৃষ্ণ নৈবেদ্যের 'সন্দেশ দধি দুগ্ধ কাড়াকাড়ি' করে খেয়েছেন। নিমাই সহাস্যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুনিয়ে শচীদেবীকে বললেন—তাহলে রাম ও কৃষ্ণ খেয়ে গেছেন, অন্য কেউ নয়। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারণ,

'তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥'

'কোথা গেলে বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে'—বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ছেন তিনি, আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ছেন। ক্ষণে যাঁকে পেয়েছেন, ক্ষণে তাঁকেই হারানোর যন্ত্রণা শ্রীচৈতন্য ছাড়া সেই মুহূর্তে আর কে বুঝেছে? অমৃতসাগর এক মুহূর্তে পরিণত হয়ে যায় বিরহপাথারে। বাহ্যদশা বুঝি তখন ছিল না। অর্ধ-বাহ্যদশা থেকে অন্তর্দশায় অবস্থান—সে-ই তাঁর জীবন সত্য। চৈতন্য জীবনীকারেরা সেদিকেই বেশি করে দৃষ্টিপাত করেছেন। তবু এও ঠিক—মহাসাগরের তরঙ্গধ্বনিকে কে কবে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছে? তা পারা যায়ও না। কারণ সে যে কথার অতীত তীরে দেওয়া নেওয়া।

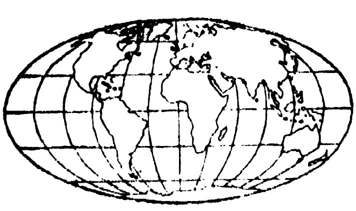

বাতায়ন

ইসরায়েল : পৌরাণিক ও আধুনিক

জেরুজালেমের পবিত্র মন্দিরের ইতিহাস

জেরুজালেমে যে জায়গাটিতে রাজা সলোমন পবিত্র মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন সেখানে পূর্বে বাস করত দুই ভাই। বড়টি অবিবাহিত এবং একাই থাকত। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এবং তিনটি সন্তান ছিল। দু-ভাইয়ের পিতৃপুরুষ হতে প্রাপ্ত একখণ্ড জমিমাত্র ছিল, আর কিছু ছিল না। দুই ভাইয়ের এমনই ভালবাসা ছিল যে, তারা জমিটিকে ভাগ করে নিতে চায়নি। নিজেরাই চাষ আবাদ করত এবং ফসল কাটা হলে ফসলের আঁটি দুই সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে তাদের নিজ নিজ তাঁবুর পাশে গাদা করে রাখত।

একবার বড় ভাই ফসল তোলার পরে তার গাদা-করা জমানো ফসলের পাশে রাত্রে শুয়েছে। কিন্তু তার ঘুম হল না, মনে চিন্তা এল 'আমার ভাইয়ের স্ত্রী ও সন্তানরা রয়েছে। তাদের খাওয়াতে পরাতে হয়; কিন্তু আমায় তো কেবল আমার পেট ভরাতে হয়। তা হলে আমি ভাইয়ের সঙ্গে ফসলের সমান অংশ কি করে নিই? আমি যা এতদিন করে আসছি, তা ঠিক নয়।' মাঝরাত্রে উঠে পড়ে নিজের ফসলের গাদা থেকে কয়েক আঁটি নিয়ে চুপি চুপি তার ভাইয়ের ফসলের গাদার কাছে গিয়ে তাতে যোগ করে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল।

সে রাত্রে ছোট ভাইয়েরও ঘুম আসছিল না। তার মনে তার দাদার চিন্তা এল। ভাবলে 'পৃথিবীতে দাদা একা। আমি যখন বুড়ো হয়ে কাজ করতে পারব না, তখন আমার ছেলেরা আমার দেখাশুনা করতে পারবে। কিন্তু দাদার বুড়ো বয়সে কি হবে? আমরা যে দুই সমান ভাগে ফসল ভাগ করে নিই সেটা ঠিক নয়।' এই ভেবে, ভোর হবার আগেই ছোট ভাই তার ফসলের গাদা হতে কয়েক আঁটি ফসল নিয়ে তার দাদার গাদায় রেখে দিয়ে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দুই ভাই দেখে যে, তাদের ফসলের গাদা রাত্রের মতোই বড় রয়েছে, আঁটি কমেনি। উভয়েই খুব আশ্চর্য হল, কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলল না।

পরের রাত্রে এবং পরের দিন সকালেও একই ঘটনা ঘটল। তৃতীয় রাত্রে দুই ভাই যখন পরস্পরের গাদায় রাখবার জন্য ফসলের আঁটি নিয়ে যাচ্ছিল, মাঝপথে তাদের দেখা হয়ে গেল। উভয়েই উভয়কে চিনতে পারল এবং পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। তারা তখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা কি ঘটছিল। যে স্থানটিতে তাদের দেখা হয়েছিল, সেইখানেই তাদের ফসলের আঁটিগুলি রেখে দিয়ে কোন কথা না বলে তারা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেল।

ভাইদের সব কিছু ব্যাপার ঈশ্বর দেখলেন এবং যেখানে তাদের দেখা হয়েছিল, সেই জায়গাটির উপর আশিস বর্ষণ করলেন। বহুদিন পরে ইসরায়েলের রাজা সলোমন ঠিক ঐ জায়গাটির উপর 'পবিত্র মন্দির' করলেন, যে-মন্দির থেকে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির বাণী সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

[News from Israel,
August 1988, p. 5]

বর্তমান ইসরায়েলের বয়স
একচল্লিশ বছর

দেশ হিসাবে এটি নূতন দেশ, তবে জাতি হিসাবে এখানকার অধিবাসী, ইহুদিজাতি অতি পুরাতন। প্রযুক্তিবিদ্যায় সামনের শ্রেণীর দেশগুলির মধ্যে ইসরায়েল এখন অন্যতম। ভারতে অবস্থিত কনসুলেট অফ ইসরায়েল থেকে প্রকাশিত, ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা 'নিউজ ফ্রম ইসরায়েল'-এ গত একশত দশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে মোজেস মন্টিফিয়রি প্রথমে ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পাক্ষিক 'হ্যাভাজেলেট' প্রকাশিত হয়; ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে 'ওয়ার্ল্ড জিয়নিস্ট অর্গানাইজেশন' বেসল সহরে প্রথম জিয়নিস্ট কংগ্রেস আহ্বান করে ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইনে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী জানায়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেন উগান্ডায় ইহুদিরাজ্য স্থাপনের প্রস্তাব করলে সপ্তম জিয়নিস্ট কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে প্যালেস্টাইনে ইহুদি ও আরবদের যৌথদাবী স্বীকৃত হয়; কিন্তু ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে লীগ অফ নেশনস কর্তৃক ইহুদিদের প্যালেস্টাইনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকৃত হলেও তাদের সেখানে প্রত্যাবর্তন অনুমোদন করেনি। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেন ইহুদি ও আরবদের মধ্যে প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব করলে আরবরা তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটেন বছরে ৭৫০০০ করে পাঁচ বছর বহিরাগত ইহুদিদের প্যালেস্টাইন আসা অনুমোদন করে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ইউনাইটেড নেশন কর্তৃক প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব হয় এবং ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে 'স্টেট অফ ইসরায়েল' ঘোষিত হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাইবেলেও জেরুজালেম ইহুদিদের দেশ বলেই বলা আছে। বর্তমানে এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ যার পার্লামেন্ট বা নেশেট (Kneset)-এ ১২০ জন প্রতিনিধি চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন পাঁচ বছরের জন্য। শিল্প উৎপাদনের জন্য দেশে কাঁচামাল তত না থাকলেও কৃষিজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক দ্রব্য, ঔষধ, যন্ত্রশিল্প ও বিদেশী টুরিস্টদের মাধ্যমে প্রচুর আয় হয়। বর্তমান ইসরায়েল জাতি ১২০টি দেশ থেকে আগত লোকের সমষ্টি হওয়ায়, দেশে বাইবেলের সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকা থাকায় এবং প্রকৃতি ও জলহাওয়া সুখকর হওয়ায় টুরিস্টদের থেকে আয় হয় প্রচুর। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে ১৫ লক্ষ টুরিস্ট এখানে এসেছে এবং আয় হয়েছে সাড়ে বারশত কোটি ডলার। দেশের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যায়ঃ

(ক) ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৬৫ কোটি ডলার।

(খ) কারখানাজাত সামগ্রী রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে সাড়ে ছয় শত কোটি ডলার, যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে হীরক।

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে টুরিস্টদের থেকে আয় জনপ্রতি ২২৬ ডলার যা পরিমাণে গ্রীস, ইটালি ও স্পেন থেকে বেশি। দশ বছর আগে বিদেশী টুরিস্টরা এখানে থাকত গড়পড়তা ১০ রাত্রি, এখন থাকে ২০ রাত্রি।

[News from Israel, April, 1988, pp. 6, 27]

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস ঃ বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার কয়েকটি দিক

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

হঠাৎই চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। শাঁখের আওয়াজ শুনে উঠে বসতে গিয়ে মনে হল টলছি। কী ব্যাপার? ভোরের ঘুমজড়ানো চোখে ভাল করে তাকাতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। কয়েক সেকেন্ড হলেও, সে আরও একবারের জন্য কাঁপিয়ে গেল আমাদের। পরের দিন সংবাদপত্রে বেরোল বিহারের মর্মন্তুদ কান্নার ছবি। আরও একবার মানুষ দেখল ভূমিকম্পের সর্বনাশা রূপ।

ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে যদিও শেষকথা এখনো বলা সম্ভব হয়নি, তবে বিজ্ঞানীরা একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ভূস্তরে যে শিলা-বিন্যাস আছে, সেই শিলা-বিন্যাসের সাময়িক কম্পনই ভূকম্পন। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের মতে আমরা যেখানে রয়েছি সেই ভূত্বক প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি শিলাস্তর, যেগুলি একে অপরের উপর সাজানো রয়েছে। হঠাৎ কোন আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কারণে ঐ স্তরের কোনটাতে ভাঙন দেখা দিলে, ওপরের স্তরগুলিতেও স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রভাব পড়ে এবং ওপরের স্তরগুলি চ্যুত হলে বা কেঁপে উঠলে আমরা ভূকম্পন অনুভব করি। এই তত্ত্ব ছাড়াও ভূকম্পন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের একটি নতুন তত্ত্ব হল ভূ-ত্বকের সৃষ্টি কতকগুলি প্লেট ও খণ্ডের দ্বারা। এই খণ্ডগুলির মধ্যে আছে সমুদ্রতল ও মহাদেশের অংশ। এই তত্ত্বকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়—প্লেটটেকটনিক্‌স। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে মহাদেশগুলি একসময়ে অখণ্ড ছিল। পরবর্তী সময়ে যে-কোন প্রাকৃতিক কারণে তা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে একটি খণ্ড অপর খণ্ড থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এভাবে স্থানচ্যুতির ফলে সরতে সরতে কোন এক সময়ে তারা আবার কাছাকাছি আসে এবং সংঘর্ষ ঘটে, এর ফলে প্লেটগুলি কেঁপে উঠে এবং ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়। তবে ম্যালেট, মিলনে, রিড্‌ প্রভৃতি ভূবিজ্ঞানীরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে ভূকম্পনের কারণটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) ভূত্বকের উপরের প্রাকৃতিক কারণ, (২) আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ, (৩) ভূস্তরের অভ্যন্তরের শিলা-বিন্যাসের আন্দোলনজনিত কারণ।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে কোন অঞ্চলে ভূমিকম্প হওয়ার আগেই ভূত্বকে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ যে-সমস্ত অঞ্চলে শিলাস্তরের ওপরের স্তরে ফাটল সৃষ্টি হওয়ায়, ঐ দুই স্তরের মধ্যে প্রবল ঘর্ষণের ফলে লম্বা ফল্ট সৃষ্টি হয়েছে সেখানে দুটি স্তরের আপেক্ষিক সরণ ঘটতে পারে। ভূকম্পনের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব কিনা এ-নিয়ে বিশ্বে বিজ্ঞানীরা ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাচ্ছেন। বিশেষতঃ রাশিয়া ও জাপান এ বিষয়ে সর্বাধিক সচেষ্ট। তারা ভূকম্পনের পূর্বে প্রাক্‌ লক্ষণগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী, বিশেষ করে ভূ-ত্বকের বিকৃতি, ফল্টের পার্শ্বীয় সরণ, ভূপৃষ্ঠ তল বা সমুদ্র তলের পরিবর্তন র‍্যাডন বিমোচন এবং চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ধর্মের বিবর্তন তাদের গবেষণার বিষয়।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আলোচনার আগে ভূকম্প-তরঙ্গ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। ভূকম্পনের সময় কম্পনের শক্তি তরঙ্গশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং গতি যুক্ত হয়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন এই তরঙ্গের দুটি অংশ আছে যাদের গতিবেগ সমান নয়। এই অংশ দুটিকে প্রাথমিক (Primary) এবং পরবর্তী (Secondary) তরঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই দুই তরঙ্গ ছাড়াও ভূগর্ভে ফাটল সৃষ্টি হলে তল

তরঙ্গেরও (Surface wave) সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক তরঙ্গ দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং এই তরঙ্গের গতির অভিমুখে ভূত্বকের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে অর্থাৎ এই তরঙ্গ হল অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal wave)। অপর দুটি তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পন হয় গতির অভিমুখের সঙ্গে লম্বভাবে, যাকে বলে তির্যক তরঙ্গ (Transverse wave)। এই তিনটি অংশের মধ্যে প্রাথমিক তরঙ্গ সর্বাধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন, অন্যগুলি সমগতিতে মন্থর। কিন্তু ভূবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন প্রাথমিক ও পরবর্তী তরঙ্গ-প্রবাহের অনুপাত প্রায় ১'৭৫। প্রতিক্ষেত্রেই এই অনুপাত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে দুই রুশ বিজ্ঞানী নারসেসভ ও সেমেনভ মধ্য এশিয়ার একটি বিশেষ অঞ্চলে একটি ভূমিকম্পের কয়েক সপ্তাহ আগে একটি নতুন ঘটনা লক্ষ্য করলেন। বিজ্ঞানীদ্বয় দেখলেন কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই অনুপাতের হ্রাস ঘটেছে। কয়েক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞানীদ্বয় দেখলেন এই হ্রাস ক্রমশঃ পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল এবং ঠিক তার পরেই ঘটলো ভূকম্পন। কিন্তু বিজ্ঞানী সমাজ নারসেসভ ও সেমেনভের পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যকে খুব বেশি গুরুত্ব দিলেন না। ঘটনাটা নতুন করে ভাবালো। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে, এই ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফার্নাণ্ডোতে এক প্রবল ভূকম্পন ঘটে। এই ভূকম্পনের আগে প্রাথমিক ও পরবর্তী তরঙ্গগতির একই আনুপাতিক হ্রাস লক্ষ্য করলেন ক্যালটেকের দুই গবেষক। বিজ্ঞানীরা তখন পূর্ব-কথিত বক্তব্যের গুরুত্ব দিলেন। বিশ্বের সর্বত্র তরঙ্গগতির দিকে লক্ষ্য রাখলেন বিজ্ঞানীরা। কিছু সময়ের মধ্যেই জাপানেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন ভূকম্পনের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে অসুবিধে হচ্ছে তরঙ্গগতির অনুপাতের এই হ্রাস সব শ্রেণীর ভূকম্পনের আগে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই এই পদ্ধতি এখনও সম্ভাবনার পর্যায়ে।

পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা চলছে। যাদের মধ্যে ভূকম্পনের পূর্বে শিলাসমূহের চৌম্বকীয় ধর্মের পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য বিষয়। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে গবেষণা করছেন, তারা লক্ষ্য করেছেন শিলাস্তরের ভাঙনের পূর্বে বল প্রযুক্ত হলে শিলার অবয়বের পরিবর্তন হয় এবং সেক্ষেত্রে শিলাচ্যুতির চারিদিকে একটি পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন চৌম্বক ক্ষেত্রের চৌম্বকমাপক যন্ত্রে এই পরিবর্তন বোঝা যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির দাবীদার হতে পারে।

সম্প্রতি জাপানে শিলাস্তরের বিচ্যুতির স্থলে ভূত্বকের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য লেসার রশ্মির ব্যবহার করা হয়েছে। টিল্টমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে মাৎসুশিরোর ভয়াবহ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়েছিলেন জাপানের বিজ্ঞানীরা।

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কল্যাণে অনেকেই 'সিসমোগ্রাফ' যন্ত্রটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সিসমোগ্রাফ ব্যবহার করা হয় ভূকম্পনের প্রাবল্য নিরূপণের জন্য। চেষ্টা করা হচ্ছে সিসমোগ্রাফের মাধ্যমে টেলিমেট্রির সাহায্যে কম্পিউটারে সংকেত পাঠানোর। কম্পিউটার এই সংকেত বিশ্লেষণ করে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারে।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস নিরূপণে অনেক দেশ জন্তু জানোয়ারদের পরিবর্তিত আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। পাখি, কুকুর, সাপ, মাছ, ইঁদুর প্রভৃতি নানা জন্তুকে এই ব্যাপারে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই গবেষণাকার্যে চীন অগ্রগণ্য, এবং তার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আরও অনেক দেশ এই ধরনের গবেষণা আরম্ভ করেছে।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলির প্রতিটিই সম্ভাবনার কয়েকটি দিক। ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি মনে হয় সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

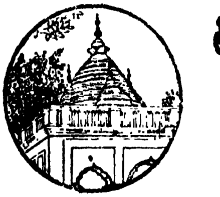

গ্রন্থ পরিচয়

যে আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে

সচ্চিদানন্দ ধর

ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা: সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা। শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০ ০৭৬। মূল্য: বত্রিশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনায় যুগোপযোগী বিশ্বকল্যাণকর যে আধ্যাত্মিক ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তারই বিস্তার হয়েছে শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনায়। শ্রীরামকৃষ্ণই স্বয়ং রূপান্তরিত হয়ে তাঁর ভাবকে প্রচার করেছেন শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে। এই ত্রিরত্নের সমবেত সাধনাই ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ ত্যাগ এবং সেবাকে যুগোপযোগী ভাবে রূপায়িত করে বর্তমান বিশ্বকে শান্তি ও কল্যাণের পথে চলার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রারব্ধ জীবকল্যাণের 'দায়' বহনের ভারকে শ্রীমা সারদাদেবীর উপর এবং তাঁর অবতরণের যথার্থ তাৎপর্য—'শিক্ষা'-দানের ভারকে স্বামী বিবেকানন্দের উপর অর্পণ করে যান। রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনই হলো শ্রীমা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের যৌথ পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের যথার্থ মাধ্যম—যার পত্তন করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মানবলীলা সংবরণের প্রাক্কালে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন প্রতিষ্ঠাকালে স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল নারীদের জন্যও অনুরূপ একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং পুরুষ-নিরপেক্ষ সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হোক—যার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ ত্যাগ এবং সেবার ভাবটি বিশ্বের নারী-সমাজকে বিশেষভাবে শান্তি ও কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করবে।

শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে গৌরী-মা, গোপালের মা, গোলাপ-মা, যোগীন-মা, লক্ষ্মী-দিদি, ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী কৃষ্টিন এবং সুধীরা-দিদি প্রমুখ মহিলাভক্ত এবং সাধিকাদের নিয়ে স্বামী সারদানন্দের দূরস্থ অভিভাবকত্বে একটি ধর্মীয় নারীসঙ্ঘের সূচনা রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনার প্রায় সমসাময়িককাল থেকেই হয়ে আসছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস ও ত্যাগব্রতের ধারাবাহিকতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিসঙ্ঘ যেরূপভাবে ধারণ ও বহন করে আসছিল—ঠিক সেইরূপভাবেই শ্রীমা সারদাদেবীর পার্শ্বচারিণী সাধিকাগণও ত্যাগ-তপস্যা এবং সেবার ভাবকে রূপায়িত করে চলেছিলেন।

শ্রীমা সারদা-কেন্দ্রিক এই ধর্মীয় নারীসঙ্ঘে দৈবনির্দেশে অতি অল্প বয়সেই আশ্রয় নিয়েছিলেন কুমারী পারুল—পরবর্তী কালে শ্রীমায়ের আদরের 'সরলা'—প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রীমা এবং স্বামী সারদানন্দের বিশেষ স্নেহধন্যা হয়ে দীর্ঘকাল শ্রীমার একান্ত সেবিকা হওয়ার সৌভাগ্য এবং নানারূপ অধ্যাত্ম-সাধনায় শিক্ষা লাভের অধিকারিণী হন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। পরবর্তী কালে শ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে 'সারদা মঠ' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইচ্ছায় এবং তদানীন্তন সঙ্ঘগুরু স্বামী শঙ্করানন্দের আদেশে এই সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষার আসনে অভিষিক্ত হন। ভারতীপ্রাণাজীর দিব্যজীবনে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের সম্মিলিত ভাবরাশি সুন্দরভাবে মূর্ত হয়েছিল। তিনি তাঁর সহজ, সরল, আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার দৃষ্টান্তে অগণিত নরনারীকে দিব্যজীবনের পথে অনুপ্রাণিত করে গেছেন, পথনির্দেশ দিয়েছেন।

'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা' সংকলন গ্রন্থটি প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার দিব্য জীবনালেখ্য মাত্র নয়: এই গ্রন্থে শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে কিভাবে এই সন্ন্যাসিনী-সংঘ রূপায়িত এবং অগ্রগতির পথে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে তার একটা তথ্যনির্ভর ঐতিহাসিক পরম্পরাও পাওয়া যাবে। শ্রীমা এবং সারদানন্দ মহারাজ কিভাবে সরলাকে ভাবী সংঘনেত্রী হবার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে ত্যাগ তপস্যায় ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, কিভাবে ভগিনী নিবেদিতা, সুধীরা-দিদি প্রমুখ শ্রীমায়ের পার্শ্বচারিণীগণ নারীসমাজের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার প্রচারকার্য আরম্ভ করেছিলেন, কিভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ এবং সংঘগুরু নারীমঠের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন—ইত্যাদির একটি সুন্দর ইতিহাস-চিত্রও এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়ে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শেই সম্পূর্ণভাবে অনুরঞ্জিতা ছিলেন এবং তিনি যে আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আধ্যাত্মিক মাতৃভাবের প্রকাশে নারীজাতির চরম আদর্শকে নিজ জীবনে রূপায়িত করে অসংখ্য নরনারীকে আধ্যাত্মিক সাধনা ও শান্তিলাভের পথে পরিচালিত করেছেন, তা এই গ্রন্থে বহু ভক্ত (ত্যাগী এবং গৃহী) ও অনুরাগীর স্মৃতিচারণায় বিধৃত হয়েছে। আদর্শগত দিক থেকে সারদা-সংঘ যে রামকৃষ্ণ-সংঘের সম্প্রসারিত অঙ্গ—এই গ্রন্থপাঠে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

গ্রন্থের পরিকল্পনা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এবং সম্পাদনা অনবদ্য। অঙ্গসৌষ্ঠব ভাবোপযোগী এবং প্রশংসনীয়। সুখপাঠ্য, দিব্য আনন্দদায়ী—এই গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাব-উপলব্ধিতে একটি অতি মূল্যবান সময়োপযোগী সংযোজন।

প্রাপ্তি-স্বীকার

(১) **ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ:** সুনীলকুমার দে। প্রকাশক: সুনীলকুমার দে, গ্রাম—নুয়াগ্রাম, পোঃ—হলদপুকুর, ভায়া—জামশেদপুর, জিলা—সিংভূম (বিহার)। মূল্য: চার টাকা মাত্র।

(২) **নর্মবীণা:** শ্রীখগেন্দ্রমোহন সেন। প্রকাশক: শ্রীখগেন্দ্রমোহন সেন, আর্ট প্রিন্টার্স, কোন্নগর। মূল্য: তিন টাকা মাত্র।

(৩) **চতুরঙ্গ:** দুর্বাসা। প্রকাশক: শ্রীরঞ্জনকুমার পাল, নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৬, বিধানসরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য: বার টাকা।

(৪) **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদ:** সংকলক—মনোরঞ্জন দাস। প্রকাশক: শ্রীমনোরঞ্জন দাস, তপোবন (শ্রীরামকৃষ্ণ ভবন), চন্ডীগড়, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগনা। মূল্য: পনেরো টাকা।

(৫) **স্বর-সমাধান:** শ্রীখগেন্দ্রমোহন সেন। প্রকাশক: শ্রীখগেন্দ্রমোহন সেন, আর্ট প্রিন্টার্স, কোন্নগর। মূল্য: পাঁচ টাকা মাত্র।

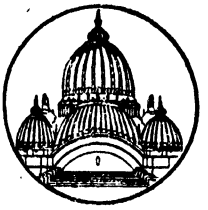

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী: রাঁচীর মোরাবাদী আশ্রমে গত ডিসেম্বর ১৯৮৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীর শেষ পর্যায়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুবদিবস, যুবসমাবেশ, যুবকদের নেতৃত্বে শিবির পরিচালনা, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কিষাণ মেলার আয়োজন এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রবন্ধ-রচনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ-উপলক্ষে 'দিব্যায়ন সমাচার' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

মাদ্রাজ মঠে গত ১৭—১৯ ফেব্রুয়ারি, যুবসম্মেলন, সাধন-শিবির, জনসভা, ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত উৎসব সম্পন্ন হয়। এ-উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল স্কুলের শিশুদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

রাজকোট আশ্রম গত ১২—১৯ জানুয়ারি এই উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। এ-উপলক্ষে আহমেদাবাদ এবং বরোদাসহ বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসব উদ্বোধনের দিন রাজকোটে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ১২ জানুয়ারির জনসভায় গুজরাটের রাজ্যপাল আর. কে. ত্রিবেদী পৌরোহিত্য করেন। ঐদিন তিনি গুজরাটী ভাষায় স্বামীজীর পত্রাবলী এবং স্বামীজীর রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন।

কলকাতার বরানগর আশ্রম এই উৎসবের শেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে ১৭১জন স্থানীয় দুস্থ ছেলেমেয়ের মধ্যে জামাকাপড় বিতরণ করেছে।

পুনে আশ্রম এই উৎসব উপলক্ষে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করেছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবৃত্তি, বক্তৃতা, প্রবন্ধ-রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং সাধনশিবির ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

তিরুভাল্লা আশ্রম (মাদ্রাজ) নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব উদ্‌যাপন করে। তাছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালের রুগীদের মধ্যে ফল ও পাঁউরুটি বিতরণ করে।

জামতাড়া আশ্রম এই উৎসব উপলক্ষে গত ১৫ জানুয়ারি এক জনসভা এবং ৫ ফেব্রুয়ারি দরিদ্র-নারায়ণ সেবার আয়োজন করেছিল।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মঠে গত ২৯ জানুয়ারি সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ১২৭তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। সকালে বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও কঠোপনিষদ্ থেকে পাঠ করা হয়। দুপুরে সহস্রাধিক ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ মুকুল রায় ও অধ্যাপক তাপস বসু স্বামীজীর জীবন ও বাণী এবং আজকের দিনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সারদাত্মানন্দ।

আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৭-৩০ মিঃ স্বামী শান্তিদানন্দের সভাপতিত্বে স্থানীয় শিশু-উদ্যানে স্বামীজীর প্রতিমূর্তির পাদদেশে এক যুব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও অনুরাগী ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে স্বামীজী সম্পর্কে একটি পুস্তিকা ও প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পূর্তির শেষপর্বের অনুষ্ঠানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা টাউন হলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরার মুখ্যসচিব আই. পি. গুপ্তা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ ঝঞ্ঝাত্রাণ : ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১৬৩টি পশমী কম্বল, ১৯১৭টি পুরনো পোশাক, ১৩৫ কিলোঃ চিঁড়া, ৭৩·৫ কিলোঃ চাল বিতরণ করা হয়েছে। গুঁড়ো দুধ থেকে তৈরি দুধ প্রতিদিন ১৬০ জন শিশুকে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ১২৫ কিলোঃ ব্লিচিং পাউডারও দেওয়া হয়েছে।

অগ্নিত্রাণ : পুরীর নিকটস্থ বিলাসপুর ও পানোরিয়া গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৭০টি পরিবারের মধ্যে পুরী মিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে বিশাখাপত্তনম আশ্রমের নিকটস্থ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত কলোনীতেও অনুরূপ ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে।

পুনর্বাসন : 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কার্যসূচী অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার গোপালপুর, লালাপল্লী এবং সন্নিহিত গ্রামসমূহে ১০৮টি বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এই অঞ্চলে আরও ১০০টি পরিবারের মধ্যে এই পুনর্বাসন কাজ সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের ছয়জন ছাত্র ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে নিম্নরূপ স্থানলাভ করেছে :

বি. এসসি. : অংকে ৪র্থ স্থান, পদার্থবিদ্যায় ১০ম স্থান এবং প্রাণিবিদ্যায় ৫ম স্থান ; বি. কম. : অংকে ৭ম স্থান ; এম. এসসি. : উদ্ভিদবিদ্যায় ১০ম ও ১২শ স্থান।

বেলুড় সারদাপীঠ বিদ্যামন্দিরের চারজন ছাত্র বি. এসসি. (অনার্স) পরীক্ষায় অংকে ২য় ও ৪র্থ স্থান এবং রসায়নবিদ্যায় ৮ম ও ১০ম স্থান লাভ করেছে।

বহির্ভারত

সেণ্ট লুইস্ বেদান্ত সোসাইটি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এবং '৪ঠা জুলাই উৎসব' উপলক্ষে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের উপর ভাষণের আয়োজন করেছিল। তাছাড়া স্বামীজীর উপর স্লাইড এবং 'বিবেকানন্দ অ্যাজ উই স হিম' নামে একটি ভিডিও-তথ্যচিত্র তোলা হয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি ১৯৮৯ বৈদিক স্তোত্র, সঙ্গীত, আলোচনাচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ঐসময় স্বামীজীর উপর একটি তথ্যচিত্রও তোলা হয়েছে।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (ক্যালিফোর্নিয়া)-তে গত মার্চ মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় এবং প্রতি শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের বাণীর উপর আলোচনা হয়েছে। আলোচনা করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। গত ৬ মার্চ ভক্তিগীতি, আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিবরাত্রি পালন করা হয়। এবং গত ৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পূজা, যন্ত্রসঙ্গীত, স্তোত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এ-উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ভাষণ দেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৯ মার্চ, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। ঐদিন দুপুরে হাতে হাতে বহু ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গত ২২ মার্চ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি ও ২৬ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী গর্গানন্দ ও স্বামী সত্যব্রতানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

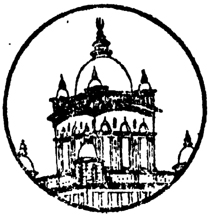

সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কটক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের আনুকূল্যে গত ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সারাদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে স্থানীয় আলামচাঁদ বাজার দুর্গামণ্ডপে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে স্বামী ভক্ত্যানন্দের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী বৈরাগ্যানন্দ, রেখা মহান্তী প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম, রাজারহাট—বিষ্ণুপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ২৯ জানুয়ারি '৮৯ এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী-পূর্তি উৎসব পালিত হয়। সকালে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিকালে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দের সভাপতিত্বে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে স্থানীয় ছেলে-মেয়েরা আবৃত্তি, বক্তৃতা, স্বরচিত প্রবন্ধপাঠ ও সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে। সভাশেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিষয়ক বই উপহার দেওয়া হয়।

সারদা-রামকৃষ্ণ সংঘ, ভদ্রেশ্বর (হুগলী) : গত ৭ ও ৮ জানুয়ারি স্থানীয় অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী-পূর্তি উৎসব পালন করে। এ-উপলক্ষে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। উভয় দিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী স্মরণানন্দ ও দ্বিতীয় দিন স্বামী সনাতনানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থদেব ঘোষ ও হুগলীর অতিরিক্ত জেলাশাসক গোপাল বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, বদরপুর : গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭তম জন্মদিবস বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে পালন করা হয়। এই দিবসদ্বয়ে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীমা সম্পর্কিত পুস্তক উপহার দেওয়া হয়। ২৯ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭তম জন্মতিথিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আশ্রমে উদ্‌যাপিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বিবেকানন্দ সেবা সংসদ (কলকাতা-৩৯)-এর উদ্যোগে ৭ ও ৮ জানুয়ারি ২ দিন ব্যাপী বিবেকানন্দ অনুধ্যান অনুষ্ঠিত হয়, তিলজলা হাইস্কুল অঙ্গনে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যদান, আলোচনা সভা—এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল। 'আজকের জনজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সভাপতিত্ব করেন অশোককুমার মাইতি। নিত্যরঞ্জন মণ্ডলের পরিচালনায় 'চিরভাস্বর বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র (আমলাচক, বেলদা, মেদিনীপুর) গত ১৫ জানুয়ারি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করে। অপরাহ্নে জনসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে প্রাক্তন বিধায়ক রাধানাথ দাস অধিকারী ও স্বামী ভূতনাথানন্দ।

কলিকাতা টালিগঞ্জবাসীদের পক্ষ থেকে গত ১৫ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণে এক

শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের ('মায়ের বাড়ী'র) তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ ও কয়েকজন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এবার ছিল এই অনুষ্ঠানের ৬ষ্ঠ বর্ষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ (রামপাড়া, হুগলী)-এর ব্যবস্থাপনায় ১৮ ডিসেম্বর '৮৮ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব নারায়ণী বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা, সঙ্গীত পরিবেশন, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের অঙ্গ। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সত্যরূপানন্দ এবং বক্তা ছিলেন প্রণবেশ চক্রবর্তী ও তরুণ গোস্বামী। গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন যথাক্রমে স্বামী নির্জরানন্দ (সভাপতি), নচিকেতা ভরদ্বাজ ও সুদীপ বসু এবং প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা (সভানেত্রী), প্রব্রাজিকা গঙ্গাপ্রাণা ও সুজাতা রাহা।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (উত্তর ২৪ পরগনা)-এ গত ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি দুই দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের সভায় সভাপতি ছিলেন স্বামী কমলেশানন্দ ও দ্বিতীয় দিন স্বামী পুরুষানন্দ।

কল্যাণী 'এ'-ব্লকস্থিত কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি গত ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর স্মরণোৎসব পালন করে। দুদিনের এই উৎসবে ভক্তিমূলক সঙ্গীত, আবৃত্তি ও স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে পাঠ প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এ-উপলক্ষে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সাহায্যকল্পে সোসাইটির তরফ থেকে কিছু অর্থ স্বামী রমানন্দের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙ্গড় (উত্তর ২৪ পরগনা) গত ১ জানুয়ারি পূজা, হোম, পাঠ, কীর্তন ধর্মালোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্পতরু উৎসব পালন করেছে। ঐদিন দুপুরে প্রায় ১৫ হাজার ভক্তকে বসিয়ে এবং প্রায় ১০ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐ দিন বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী সর্বলোকানন্দ।

জাজপুর (উড়িষ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি চার দিন ধরে তাদের চতুর্থ বার্ষিক-উৎসব পালন করেছে। উৎসবের অঙ্গ ছিল ভজন ও ধর্মসভা। প্রথম দু-দিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন সারদাপীঠ সমাজ সেবক শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দ এবং পরবর্তী দু-দিন ভাষণ দেন উদ্বোধন-এর সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার কেন্দ্র, বহড়াগোড়া (বিহার) শাখার উদ্যোগে মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে গত ১ ও ২ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ কল্পতরু উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। এ-উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঙ্ঘের শিল্পীবৃন্দ-কর্তৃক গীতি-আলেখ্য ও জামশেদপুর মিশনের উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তি উন্মোচন

২৯ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭তম পুণ্য জন্মতিথিতে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে বিবেকানন্দ ভ্রাতৃসংঘের উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর আবক্ষ মূর্তিটির উন্মোচন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক হিমাংশু কুমার শাস্ত্রী।

পরলোকে

গত ২৯ জুলাই ১৯৮৮ গুরুপূর্ণিমার দিন **খগেন্দ্রনাথ অধিকারী** ('গার্ড সাহেব') তাঁর আলিপুরদুয়ার জংশনের নিজ আবাসে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শুধু আলিপুরদুয়ার আশ্রমের সঙ্গেই নয়, উত্তরবঙ্গ ও অসমের মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রাইভেট কেন্দ্রগুলির সঙ্গেও তাঁর বিশেষ নিকট-সম্পর্ক ছিল। মঠ-মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী ও ভক্তের সঙ্গেও তাঁর অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

বিজ্ঞান সংবাদ

মনুষ্যদেহে ম্যালেরিয়া টিকার প্রথম প্রয়োগ

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বহু বৎসর ধরে পৃথিবীর বহু ল্যাবরেটরিতে টিকা তৈরির জন্য গবেষণা চলছে। কারণ, টিকা ছাড়া পৃথিবী থেকে এই রোগ দূরীকরণের আর কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। ল্যাবরেটরিতে জন্তুর দেহে ম্যালেরিয়া টিকা আগেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মানুষের দেহে হয়নি। কলম্বিয়ার বগোটাতে ইন্স্টিটিউট অব ইমিউনোলজি-র ম্যানুয়েল প্যাটারয়ো ও তাঁর সহকর্মীরা এই প্রথম সেচ্ছাসেবীদের দেহে ম্যালেরিয়া টিকা প্রয়োগ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলম্বিয়া একটি উন্নতিশীল দেশ, যেখানে সর্বপ্রথম মানুষকে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে।

ম্যালেরিয়া জীবাণু (parasite)-র জীবনবৃত্তান্ত হতে জানা যায় যে, তার জীবনচক্রের বেশির ভাগ সময় কাটে দেহকোষের মধ্যে, অল্প সময় কোষের বাইরে। দেহকোষের মধ্যে তাকে আক্রমণ করা কঠিন, সেজন্য টিকার লক্ষ্য হল দেহকোষের বাইরে থাকাকালীন তাদের আক্রমণ করা। কামড়ের মাধ্যমে মশা যে অবস্থায় ম্যালেরিয়া জীবাণু শরীরে ঢুকায় তার নাম 'স্পোরোজয়েট', যা কয়েক মিনিট রক্তে থেকে যকৃতে প্রবেশ করে। পরে যখন তারা যকৃত হতে বার হয় তাদের বলে 'মেরোজয়েট', যেগুলি লোহিত রক্তকণিকা (Red blood cell)-র মধ্যে ঢুকে বংশবৃদ্ধি করে। রক্তকণিকা হতে বার হয়ে রক্তস্রোতে আসে, কিন্তু আবার নূতন রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে। এই রকম কয়েকবার চলতে থাকে, যখন রোগীর জ্বর হয়। এই মেরোজয়েটকে আক্রমণ করাই টিকার উদ্দেশ্য। প্যাটারয়ো বানরের দেহ হতে মেরোজয়েট নিয়ে, তাদের দেহ থেকে পেপটাইড প্রোটিন বার করে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে (synthetic) অনুরূপ নকল পেপটাইড তৈরি করে, তাদের বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে টিকা তৈরি করেছেন।

কলম্বিয়ার ১৩ জন সৈনিক-স্বেচ্ছাসেবককে টিকা দেবার কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে, এই কার্যক্রম থেকে তাদের যেকোন সময় বার হয়ে আসার স্বাধীনতা আছে। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ৯ জন সৈনিককে টিকা ইনজেকসন দেওয়া হয়, ৩ জনকে তুলনার জন্য মাত্র লবণজল ইনজেকসন দেওয়া হয় এবং একজনকে ম্যালেরিয়া জীবাণু পাবার উৎস হিসাবে রাখা হয়। ৪০ হতে ৮০ দিন পরে সকলকে ১০ লক্ষ জীবাণু ইনজেকসন দেওয়া হয়। প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়, কত শতাংশ লোহিত রক্তকণিকা, জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে 0·৫ শতাংশ রক্তকণিকা জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হলেই তাকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ দেওয়া হবে। একসপ্তাহ পরে দেখা গেল যে, প্রত্যেকের রক্তকণিকা বিভিন্ন পরিমাণে জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তাই প্রত্যেককেই চিকিৎসাধীনে আনা হয়। দুদিক থেকে এই পরীক্ষাকে বিফল বলা যায় না। প্রথমতঃ যাদের টিকা দেওয়া হয়নি তাদের অবস্থা, যাদের টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের তুলনায় অনেক বেশি খারাপ হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ টিকাতে পেপটাইডের একটি অনুপাত অন্য অনুপাতের চেয়ে বেশি কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ম্যালেরিয়া টিকা সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে এখনও অনেক কাজ বাকি। গবেষকরা বলেন, যখন বহুলপরিমাণে এই টিকা তৈরি হবে, তখন তার দাম হবে খুব সস্তা।

[New Scientist, 10 March 1988, p. 33]

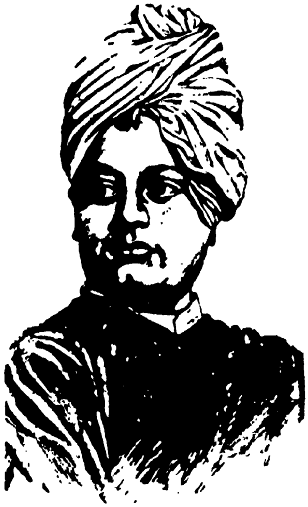

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।… ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

বিপুল জনতা দেখে যীশু পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং যখন তিনি উপবেশন করলেন, তাঁর শিষ্যেরা এসে উপস্থিত হল।

তখন তিনি উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

নম্র-আত্মারাই ধন্য—কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই মধ্যে।

শোকার্ত ব্যক্তিরাই ধন্য—কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।

অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তিরাই ধন্য—কারণ তারাই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে।

ধর্মের জন্য যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষিত, তারা ধন্য—কারণ তাদের হৃদয় পূর্ণ হবে।

করুণাগুণসম্পন্নরাই ধন্য—কারণ তারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করবে।

পবিত্র-আত্মারাই ধন্য—কারণ তারাই ঈশ্বরকে দর্শন করবে।

শান্তিসংস্থাপকেরাই ধন্য—কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে গণ্য হবে।

ধর্মের জন্য নির্যাতিত ব্যক্তিরাই ধন্য—কারণ তারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে।

তোমরা আশীর্বাদপুষ্ট—কারণ আমার জন্য লোকে তোমাদের নিন্দা ও অত্যাচার করবে এবং সব রকম মিথ্যাদোষ আরোপ করবে।

তোমরা আনন্দ কর—উল্লসিত হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার অপেক্ষা করছে। মনে রেখ—পূর্ববর্তী ধর্মাচার্যেরা একইভাবে নির্যাতিত হয়েছেন।*

যীশুখ্রীস্ট

গসপেলস অব সেন্ট ম্যাথিউ, ৫.১—১২

কথাপ্রসঙ্গে

মাদকাসক্তি ঃ সমাধান কোন্ পথে ?

সারা পৃথিবী জুড়িয়া বর্তমানে যে সমস্যাটি সকল চিন্তাশীল মানুষকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহা হইল তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক মাদকাসক্তি। দেশ ও বিদেশের নানা সূত্র হইতে যেসমস্ত সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছাইতেছে তাহা রীতিমতো ভয়াবহ। বস্তুতঃ মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি যেন একটি মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে। তিন দশক পূর্বে আমেরিকার বিত্তবান পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা যে হিপি-সংস্কৃতির জন্ম দিয়াছিল, মাদকাসক্তিরূপ ব্যাধির ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের প্রথম দায়ভাগ তাহাদেরই। হিপিরা হয়তো আজ অবলুপ্তির পথে ; কিন্তু তাহারা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফলে পুষ্ট হইয়াই চলিয়াছে এবং সমাজকে প্রায় পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় সমাজই সেই বিষবৃক্ষের প্রভাবের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

এখনকার পরিভাষায় 'মাদকদ্রব্য' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইল 'ড্রাগস্ এ্যান্ড ডোপস্' (Drugs and dopes)। 'ড্রাগস্'-এর মধ্যে পড়িতেছে সেইসব ঔষধ, যেগুলির ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়ার (habit forming-এর) ভয় থাকে এবং যেগুলির মধ্যে অধিক পরিমাণে নেশার উপাদান থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পেথিডিন, ভ্যালিয়াম, মর্ফিন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'ডোপস্'-এর মধ্যে পড়ে গাঁজা, হাসিস, চরস, হেরোইন, কোকেন, এল. এস. ডি., ম্যানড্রাকস্ প্রভৃতি। মাদকদ্রব্যগুলির মধ্যে যেগুলি ঔষধ-গোত্রীয়, সেগুলিকে যতক্ষণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা গ্রহণের বিধান দেন ততক্ষণ সেগুলিকে মাদকদ্রব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যাইবে না ঠিকই, কিন্তু তাহার ব্যত্যয় হইলে সেগুলির ব্যবহার মাদকাসক্তির মধ্যেই পড়িবে। আর, অনেক ক্ষেত্রে হইতেছেও তাহাই। সেকারণে কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন তথাকথিত চিকিৎসকের এই সর্বনাশা ব্যাধির বিস্তারে ভূমিকা কম নহে।

সাময়িক আবেশ, এক স্বপ্ন-জগতের ইশারা, অল্প সময়ের জন্য পরিবেশ ও পরিবারের দৈন্য, ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা গ্লানি হইতে মুক্তি, হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টিবিকার প্রভৃতি মাদকদ্রব্য গ্রহণের তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি। এইগুলির লোভে বা নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া মাদকদ্রব্য ব্যবহার প্রথমে শুরু হয়। তাহার পর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ঐগুলি ছাড়া আর চলে না। নিয়মিত মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে দৈহিক ক্ষতি তো হয়ই [কারণ, ঐগুলি ব্যবহারের ফলে অনিবার্যভাবেই ক্ষুধামান্দ্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, অনিদ্রা (মাদক দ্রব্য ব্যবহারে যে নিদ্রা হয়, তাহাকে নিদ্রা বলা চলে না, তাহা আচ্ছন্নতামাত্র। সুতরাং বাস্তব বিচারে তাহা অনিদ্রারই সমতুল) ইত্যাদি দেখা যায়।]; কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মানসিক ক্ষেত্রে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির স্মৃতি দুর্বল হইয়া যায়, মনঃসংযমের শক্তি হারাইয়া যায়, এবং মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অবলুপ্ত হইতে থাকে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি এইভাবে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক হইতে একটি প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যে তাহার এই দুরবস্থা সম্পর্কে কখনো কখনো সচেতন হয় না তাহা নহে, কিন্তু আসক্তির প্রভাব এমনই যে, তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত হইয়া যায়। তাহার সকল চিন্তা, সমস্ত চেতনার কেন্দ্রে শুধু ক্রিয়াশীল থাকে একটি বাসনা—মাদক-সংগ্রহ। ইহার জন্য কোন কিছুরই সে পরোয়া করে না। চুরি, ভিক্ষা, অসামাজিক বৃত্তি, জীবনের ঝুঁকি—কোন কিছুই মাদক সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ক্রমে সে হইয়া দাঁড়ায় পরিবারবিচ্ছিন্ন, সমাজবিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি—পুলিশের পরিভাষায়, 'অ্যান্টি-সোস্যাল।'

বস্তুতঃ পাশ্চাত্যে ড্রাগ এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার খুবই ভয়াবহ স্তরে পৌঁছিয়াছে। বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের মধ্যেও তাহা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পুলিশ বা পুলিশ-কুকুরের সাহায্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 'স্কুল ব্যাগ' খানাতল্লাসী করা একটি সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তো কথাই নাই, বিদ্যালয়গুলির

আশেপাশেও মাদকদ্রব্যের সওদাকারীরা অবাধে তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। সকল প্রকার শাস্তি প্রদর্শনের সরকারি ঘোষণাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাহাদের ফলাও কারবার চলিতেছে। খুবই উদ্বেগের বিষয়, এই ব্যবসাপ্রসারকারীদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ, এমনকি কিশোর। ফলতঃ তাহাদের মাধ্যমে কমবয়সীদের নেশায় আকর্ষণ করা সহজ হইতেছে।

আমাদের ভারতবর্ষের চিত্র এতখানি ভয়াবহ না হইলেও অদূরে ভবিষ্যতে যে হইবে না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না। পাশ্চাত্য যাহা করিবে, তাহার ধারা দেশে প্রবাহিত না করিতে পারিলে যে জাতে ওঠা যায় না! আমাদের এই দাসসুলভ মনোবৃত্তি আজও একইভাবে বর্তমান। ভাল জিনিস আসুক তাহাতে মঙ্গলই হইবে; কিন্তু আমরা বিশেষ নিষ্ঠার সহিত যে পরিচয়টি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া পারদর্শিতা দেখাইতেছি, তাহা মঙ্গলপ্রদ কোন প্রভাবকে গ্রহণের ক্ষেত্রে নহে, দেখাইতেছি অকল্যাণকর প্রভাবকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার প্রতিযোগিতায়। সংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতির তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিতেই যেন আমাদের বিশেষ আগ্রহ। ভারতবর্ষে সেই ডিরোজিওর সময় হইতে ইহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি। উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা যে যত দেখাইতে পারিবে, সে ততই প্রগতিশীল। কিন্তু এই তথাকথিত প্রগতিশীলতা দেখাইতে যাইয়া যে সর্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছি, তিল তিল করিয়া আত্মহনন করিয়া চলিয়াছি, ইহা নির্বোধ আমরা বুঝিতেছি না। পাশ্চাত্য হইতে অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করিয়া সেই কবেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে আমরা কর্ণপাত করি নাই।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের মতো এদেশেও প্রথমদিকে বিত্তবান পরিবারের সন্তানদের মধ্যে মাদকাসক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, মাদকদ্রব্যগুলি যথেষ্টই দামী। কিন্তু বর্তমানে সংক্রামক ব্যাধির মতো সমাজের সর্বস্তরেই মাদকাসক্তির শিকড় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শুধু তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরাই নহে, অন্তঃপুরের মধ্যেও তাহার ছোবল বিস্তৃত হইতে শুরু করিয়াছে। অবস্থা যদি এইভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে সভ্যতার অপমৃত্যু যে ত্বরান্বিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ, সেই ভবিষ্যৎকে সৃজন ও পালনের ভার যাহাদের উপর, সেই অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও যখন মাদকাসক্তির সীমানা প্রসারিত হইতে শুরু হইয়াছে—তখন ভূত অপসারণের সম্ভাবনা কি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে না? কারণ, সরিষার মধ্যেই যে ভূত বাসা বাঁধিতেছে!

এই সর্বনাশা মৃত্যুর নেশা হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার কি কোন পথই নাই? আছে। মানুষ বাঁচিতে চায়। কবি গাহিয়াছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' যাহারা মাদকাসক্ত তাহারাও তাহাদের অজান্তে বাঁচার স্বপ্নই দেখে। প্রাত্যহিক জীবনের দৈন্য, হতাশা, অবসাদ, ব্যর্থতা ভুলিবার জন্য তাহারা মাদকের আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বল্পকালের জন্য হইলেও নেশার ঘোরে তাহারা অবস্থান করে মোহময় এক কল্পজগতে। সেই কল্পলোকে অবস্থানের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করিবার উদগ্র বাসনায় তাহারা মৃত্যুতুল্য মাদকাসক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। মৃত্যুর এই নেশা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিতে হইলে সর্বপ্রথম এবং সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, শাসন দণ্ডদান প্রভৃতি নেতিবাচক পদ্ধতিতে কোন ফল হইবে না। হইলেও তাহা স্থায়ী হইবে না। কারণ, যাহারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহারা তো আর স্বাভাবিক জীবনের পথিক নহে, মাদকাসক্তি তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিবেককে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। যাহারা মৃত্যুর নেশায় মাতিয়াছে, সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আত্মহননের ফাঁদে পা দিয়াছে, তাহাদের সহানুভূতির সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে, মমতা, প্রীতি ও সহৃদয়তার সঙ্গে একবার জীবনের নেশার সঙ্গে—সুস্থ জীবনের ধারার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। মৃত্যুর নেশা সংক্রামক সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবনের নেশাও কম সংক্রামক নহে। কোন প্রকারে সেই বাঁচার নেশার তরঙ্গে তাহাদের নূতন করিয়া সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। আর যে-কোন মূল্যে তাহা করিতেই হইবে। কারণ, তাহাতেই রহিয়াছে সমস্যার সমাধান।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

Sri Ramakrishna Ashrama
Bull Temple Road,
Basavangudi, Bangalore
27. 11. 24

শ্রীমান কানাই[1],

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি ওখানে আছ এবং তোমার শরীর ও মন ওখানে ভাল আছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। থাক কিছুকাল, অন্ততঃ তিন বৎসর ওখানে স্থির হইয়া থাক, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

জিতেনের[2] কথা যেরূপ তুমি লিখিয়াছ শুনিয়া বড়ই আশা ও আনন্দ হইল—ঠাকুর তাকে ও সুরেশকে[3] খুব শক্তি দেন তাঁর কাজ করিবার জন্য, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

হাঁ, হরেনবাবুর পত্র আমি মধ্যে মধ্যে পাই—আমি তাঁকে তাঁর জামাই যাহাতে Bombay আশ্রমে মধ্যে মধ্যে যায় এবং স্বামীজীদের সঙ্গে আলাপাদি করে এবং আশ্রমে interested হয় এরূপ লিখিয়াছিলাম। মেয়েটিকে (মৃণালিনী) আমি ভুবনেশ্বরে কয়বার দেখিয়াছি, বড় লক্ষ্মী, বড় ভক্তিমতী, সুশীলা—জামাইটিও খুব ভাল। তুমি লিখিয়াছ শুনিয়া খুব আনন্দ হইল—প্রভু তাদের পরম কল্যাণ করুন।

আমি শুনিয়াছি বোম্বেতে অনেকগুলি পার্সি ও মুসলমান শিক্ষিত লোক ঠাকুরকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে। তুমি যাহা বুঝিতেছ তাহাই ঠিক কথা, ঠাকুর এবার 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' এসেছেন। তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান কোন ভেদ নাই। সেই জন্যই তিনি মুসলমান ধর্ম পর্যন্ত সাধনা করেছিলেন। উহা কেবল জগতের শিক্ষার জন্য। এখন মহাত্মা গান্ধীজীও ঠাকুরের ও স্বামীজীর ভাব কতক করিতেছেন অজানিত ভাবেও।

আমার বোম্বেতে জিতেন, সুরেশ প্রভৃতি তোমাদের এবং নূতন আশ্রম ও ভক্তদের দেখিতে পারিলে ভাল হয়। দেখা যাক প্রভুর ইচ্ছা কি হয়। বড় লম্বা জার্নি (journey)।

শর্বানন্দ আমাকে এখনও সেকথা কিছু লেখে নাই—বোধ হয় শীঘ্র লিখবে। জিতেন[4], শ্রীবাসানন্দ, চিনু[5] ক্ষিতীন্দ্র[6] ও উমেশ[7] সকলকেই তোমার কথা বলিয়াছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। প্রার্থনা করি, তোমার বিশ্বাস ভক্তি দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক এবং স্বাস্থ্য ভাল হউক। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

---

[1] স্বামী অনন্তানন্দ
[2] স্বামী বিশ্বানন্দ
[3] স্বামী যতীশ্বরানন্দ
[4] স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
[5] স্বামী চিদ্ভবানন্দ
[6] স্বামী অপূর্বানন্দ
[7] স্বামী ঈশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী এবং আমরা

কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই দাবাড়ু খেলতে বসেছে। একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, কোনদিকে লক্ষ্য নেই। মনে কেবল এক চিন্তা—কি করে প্রতিপক্ষকে কাত করে বাজিমাৎ করা যায়, কি করে নিজের বাদশাহী প্রভুত্ব বিস্তার করা যায়। খেলা চলছে পুরোদমে। এদিকে খেলতে খেলতে বেলা বয়ে গেল। নিজের রোজকার কাজ, নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত সময় নেই। এক-একটা চাল দিচ্ছে, আর ভাবছে, "আমি কত বুদ্ধিমান! আমার এই চালের পেছনে কোন্ চালাকি আছে তা বোঝার সাধ্যি ঐ বোকা প্রতিপক্ষের আছে কি? যেন-তেন-প্রকারেণ একবার অভীষ্ট-সিদ্ধিরূপে বাজিমাৎ করে দিতে পারলে হয়!" এদিকে বাজিমাৎ করতে গিয়ে যে আসল জায়গায় কাত হয়ে যাচ্ছে সেটা দেখবার চোখ নেই। আবার অন্যপক্ষ ভাবছে, "আমার বুদ্ধির বুঝি জুড়ি নেই, আমার চাল বোঝে কার সাধ্যি!" নিজের অহং-বুদ্ধি, নিজের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা দুই দলকেই বুঝতে দিচ্ছে না যে, তাদের চাল ত্রুটিশূন্য নয়। "সবাই ভাবছে—তার ঘড়ি ঠিক চলছে।" কল্পনা করুন একজন তৃতীয় ব্যক্তি, যে খেলা বোঝে সে-ই খেলার রস উপভোগ করছে, অথচ নিজে খেলছে না। সেই তৃতীয় ব্যক্তি যত সুষ্ঠুভাবে চাল বাতলে দিতে পারবে, তা অন্য দুজন খেলুড়ে পারবে না; কারণ সে খেলা দেখছে নিরপেক্ষভাবে, এই খেলার সঙ্গে তার নিজের কোন স্বার্থ, কামনা, আসক্তি বা অহঙ্কার জড়িত নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন: "দাবাবোড়ে যারা খেলে, তারা ঠিক চাল বুঝতে তত পারে না; যারা উদাসীন, কেবল বসে খেলা দেখে, তারা চাল বেশ বলে দিতে পারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমিয় বাণীকে একটু বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে পাই অনেকগুলো শিক্ষা—যা বোধ হয় বেদ-উপনিষদ বারবার পড়লেও হয় না। প্রত্যক্ষানুভূতির কথা বাদ দিলে সহজ সরল গল্প বা কথা মানুষের মনে যতটা ছাপ ফেলে ততটা বোধহয় আর কিছুতেই পারে না। এই সহজ ছোট্ট কথাটুকু আমাদের চলবার পথে অতি মূল্যবান। এই সংসারটাই তো দাবার বৃহত্তম ক্ষেত্র। সেইজন্যেই সংসারকে 'সমরাঙ্গন' বলে, যেখানে মানবকে দৃঢ়পণে যুদ্ধ করতে সদাই অনুপ্রাণিত করছে তার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতি। এখানে প্রতি পদক্ষেপে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি, লাভ-লোকসানের হিসেব, ষোল আনা নিজের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা, নিজের অহংকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ইত্যাদি তো আছেই, আবার তার মধ্যে ছোটখাট ভালবাসার খেলাও আছে। এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ পালাতে পারেনি, পারে না। এমনকি অবতারেরাও নন। যখন গুরু বশিষ্ঠের কাছে জ্ঞান অর্জন করে রাম সংসার ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন তখন বশিষ্ঠ তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন এই বলে যে, এই অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবটুকুই তো ঈশ্বরের সংসার। এর থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? কোথায় নেই এই সংসার? নগরের কোলাহল থেকে শুরু করে পর্বতে, অরণ্যে, সমুদ্রে, আকাশে কিংবা তারও বাইরে কোথায় সংসার নেই?

তবে আধিকারিক পুরুষ আর সাধারণের দাবা খেলার পার্থক্য আছে। এই খেলায় আমরা সবাই নিজের জগতের বাদশা, সকলেই চাইছি যেন-তেন-প্রকারেণ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে, প্রতিকূলকে অনুকূল করতে। এতে যেমন প্রতিপক্ষ আছে, তেমনি স্বপক্ষীয়রাও আছে। এই খেলায় আমরা এতই মশগুল যে, সময়ের হিসেব নেই কারোরই। 'বেলা যে বয়ে গেল'—খেলতে খেলতে যে জীবনতরী মৃত্যুর কিনারে পৌঁছে যাচ্ছে, খেলা অমীমাংসিত রেখেই যে পাড়ি দিতে হচ্ছে, এ খেয়াল আমাদের কারোরই নেই। কেউ খেলছে অর্থের জন্য, কেউ লোকমান্যের জন্য, কেউ বা ভোগের জন্য।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এই খেলায় সব

খেলুড়েই নিজের কাছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে নির্দোষ ব্যক্তি। নির্বুদ্ধিতা, দোষ-ত্রুটি, সে তো প্রতিপক্ষের। সেই যে ছেলেবেলার পড়া ছড়ায় আছে না,

“আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাবো মিশ্রী।”

আসলে আমাদের ‘কাঁচা আমি’ই আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে, আমাদের অহঙ্কারের তামস সত্যকে আড়াল করে রাখছে। বুঝতেই পারছি না যে, চালে ভুল করছি। যদিও বা পারছি, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আমরা সংসারের পাঁকে এমন ভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ছি যে, এর থেকে বের হবার রাস্তা আমরা বুঝতেই পারছি না। সংসারের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে গিয়েছি, ফেঁসে গিয়েছি। সেই যে ঠাকুর বলেছেন না, পাঁকাল মাছের মতো থাকতে, তা না থেকে পাঁকেই আমাদের জগতের সীমানা নির্ধারিত করে নিয়েছি। এই ‘অহঙ্কার’রূপ রিপু ডেকে আনছে অন্য রিপুগুলোকেও—কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ আর মাৎসর্য। এরাই আমাদের দাবার ঘুঁটি—এদের সাহায্যেই আমরা চাল দিচ্ছি।

তাহলে উপায়? সরষের মধ্যেই যে ভূত। এই সাঙ্ঘাতিক গোলকধাঁধা কি বারবার আমাদের ঘোরাবে? গোলোকধাম খেলায় আমাদের ওপরে উঠতে দেবে না? আমাদের ঘুড়ি কি কখনো ‘ভো-কাট্টা’ হবে না? কিন্তু তা নয়, উপায় আছে। স্মরণ করুন ঠাকুরের উল্লেখিত অমূল্য উপদেশের শেষাংশটুকু। এর থেকে বের হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজের ওপরে দাবাখেলায় তৃতীয় ব্যক্তির মানসিকতার আরোপ, অর্থাৎ নির্লিপ্ততা।

বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে বিস্তারিতভাবে যে বাণী প্রচার করেছিলেন তারই সহজবোধ্য রূপ ঠাকুরের এই বাণীর মধ্যে আছে। দাবাখেলায় দর্শকের মানসিকতা যদি নিজের মধ্যে আরোপ করি তাহলে দেখব—যতটা হওয়ার কথা আনন্দে ততটা অধীর আমরা হচ্ছি না এবং দুঃখেও ততটা বিচলিত হচ্ছি না। তখন গুটিপোকার মতো আমরা নিজেদের দুরাচার প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব। ঘা বা ফোড়া শুকিয়ে গেলে খোসা যেমন নিজে নিজে খসে পড়ে, জোর করতে হয় না, তেমনি আমাদের অহঙ্কারের খোসাও তখন সরে যাবে। বৃহৎ সত্তার সঙ্গে ক্ষণকালের জন্যে হলেও আমরা যখন একাত্ম অনুভব করব তখন আমাদের নির্লিপ্ততা পরিপক্বতা লাভ করবে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেখি, সবরকম অবস্থার মধ্যে তিনি কিভাবে নিরাসক্তভাবে জীবন কাটিয়েছেন। বুদ্ধ তো বারবার বলেছেন নির্বাসনা হতে। কিন্তু কি ভাবে? ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ” অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরূহ সাধন। এখানে যদি আমরা ঠাকুরের এই উপদেশকে জীবনে প্রয়োগ করি তাহলে বলা যেতে পারে, নির্বাসনা হতে হবে নির্লিপ্ততার মধ্যে দিয়ে। কাঁচা অবস্থায় ফোড়ার খোসা ছাড়ালে যেমন রক্তপাত হয়, ঠিক তেমনি প্রথমেই নির্বাসনা হতে গেলে একূল ওকূল দুকূলই যাবে। তাই যদি ক্রমে নিরাসক্তি আনতে পারি নিজেদের মনের মধ্যে তাহলে আপনা-আপনিই বাসনা ত্যাগ হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে পালাবে অন্য রিপুগুলোও, বিশেষ করে অহঙ্কার যা আমাদের বন্ধনে বাঁধবার প্রধানতম রজ্জু। ঠাকুর, মা সকলেই বলেছেন ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মতো থাকতে। বলেছেন, “যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন”, সেই ভাবে থাকতে। এই সব কথার শেষ সেই এক সার কথা—প্রথমে নির্লিপ্ততা, তারপর নির্বাসনা। কত ছোট্ট কথার মধ্যে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এই শাশ্বত ভাবকে প্রকাশ করেছেন। গীতাতে আছে—‘আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ” ॥ আমাদের আত্মাই আমাদের শত্রু, সে-ই আবার আমাদের উদ্ধারকারী মিত্র। শত্রু তখন যখন সে আমাদের লোভ করতে, ঈপ্সিত বস্তু না পেলে ক্রোধ করতে, পেলে তা নিয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করতে, আর অন্যে সেই জিনিস পেলে তাকে হিংসা, নিন্দা করতে শেখায়। আর মিত্র তখন যখন সে আমাদের জীবনকে দেখতে শেখায় তৃতীয় পুরুষের দৃষ্টিতে, যখন সে আমাদের বন্ধন মোচন করে।

যে পুরুষোত্তমের বাণী গীতায় ধ্বনিত, ত্রিপিটকে অনুরণিত, সেই বাণীই আবার কথামৃতের মাধ্যমে সর্বসাধারণের হৃদয়ে স্পন্দিত। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কথামাত্র নয়, তা অমৃত। জীবন থেকে উঠে আসা উপমা দিয়েই তিনি বুঝিয়ে গেছেন জীবনে সার্থকতা অর্জনের উপায়।

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নারী

জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়

নারীজাতির স্বাধিকার-বোধ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উনিশ-বিশ শতকের ঘটনা। একথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগৎ সম্বন্ধেই সত্য। বহু শতাব্দীকাল জুড়ে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত নারী উনিশ শতাব্দীতে আত্ম-সচেতন হতে শুরু করে। উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের ভাঙ্গাগড়ায় যে নতুন আর্থিক আবেষ্টন ও সামাজিক পরিবেশ উদ্ভূত হয় এবং সেই সঙ্গে নতুন মানবতাবোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ জাগ্রত হয়, তা নারীমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধীরে ধীরে আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। অগ্রসরশীল ইংল্যাণ্ডে এর প্রথম স্ফুরণ ঘটে গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে—পিছিয়ে পড়া ভারতবর্ষে তার ধাক্কা লাগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তর যুগে (১৯১৯-৩৯)।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম স্মরণীয় ব্যক্তি যিনি ভারতীয় নারীজাতির কল্যাণের জন্য বিস্তর শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী। স্বদেশের মঙ্গলসাধন ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তিনি যেমন প্রচুর ঐশ্বর্য আহরণ করেছিলেন, পশ্চিম থেকেও তেমনি। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তাঁর অন্তর ছিল উদ্ভাসিত। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করলেন যে, সমাজের অর্ধাঙ্গকে (নারীজাতিকে) উপেক্ষা করে ও অন্ধকারে রেখে গোটা সমাজের কল্যাণ অসম্ভব। তাই নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট হলেন। হিন্দুশাস্ত্র বিচার করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রকারদের মধ্যে মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য সহমরণের সমর্থন মোটেই করেননি, আর যাঁরাও বা করেছেন তাঁদের নির্দেশের গূঢ় অর্থ হলো স্বেচ্ছাকৃত সহমরণ। জোরজবরদস্তি করে সহমরণের ধর্মাদর্শ তুলে ধরে নারীকে স্বামীর চিতানলে ভস্মীভূত করা প্রকারান্তরে নারীহত্যার সামিল। তাই তিনি ঐ কুৎসিত অনাচার বন্ধ করার জন্য ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংককে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিংক আইনের বলে সতীদাহ নিষিদ্ধ করে দিলেন।

নারীমুক্তির পরবর্তী ধাপ হলো বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়ন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি এই আইন জারি করেছিলেন। সামাজিক অগ্রগতির পরবর্তী ধাপ সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট (১৮৭২) যার পিছনে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, কৌলিন্যপ্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের অবদান ইতিহাসে সর্বজনস্বীকৃত।

নারীকেন্দ্রিক যে নতুন আন্দোলন রামমোহনের সময় থেকে শুরু হয়, উনিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে তাকেই পূর্ণতর রূপ দেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। রামকৃষ্ণদেব, সারদামণি দেবী (শ্রীমা) এবং স্বামী বিবেকানন্দ (স্বামীজী) ও তাঁর গুরু-ভাইরা এই আন্দোলনকে নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষজাতির সঙ্গে স্ত্রী-জাতির সাম্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সামাজিক ও নৈতিক সাম্যের সঙ্গে এই আন্দোলনে এক নতুন আধ্যাত্মিক মাত্রা সংযোজন করলেন। নারী-আন্দোলন এটাই হলো তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান। তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বৈদিক আদর্শের 'সহধর্মিণী' পেল এক বাস্তব রূপ। তাঁর দৃষ্টিতে সকল নারীই হলো মহাশক্তির প্রকাশ। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন ধর্মীয় নেতা শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে নারীজাতির প্রতি বেশি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সাধারণ গ্রাম-বাংলার একজন মানুষ। তিনি অভিজাত বা বিত্তবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক বা যুক্তিশীল শিক্ষাও তিনি পাননি। তথাকথিত পুঁথিগত শিক্ষা—দেশী বা বিদেশী—তাঁর ছিল না বললেই হয়। তিনি ছিলেন

দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরের এক সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণ। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ইংরেজী শিক্ষিত ও অভিজাত বহু মানুষের থেকেই তিনি ছিলেন অনেক বেশি প্রগতিশীল ও উদার। তৎকালীন ভারতীয় নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। অবহেলার ধূলা থেকে তিনি তাদের টেনে তুলে তাদের ললাটে পরাতে চেয়েছিলেন গৌরবের জয়তিলক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গার্হস্থ্যধর্মকে অস্বীকার করেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বিবাহিত। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত। আক্ষরিক এবং সর্ব অর্থেই তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন। তাঁর স্ত্রী সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। যে সম্পর্ক ছিল তা দেহাতীত। সারদামণি ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্য সঙ্গিনী। তাঁর স্বীয় স্ত্রীর প্রতি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর 'কামিনী'-কাঞ্চন' বর্জনের উপদেশকে আজও কেউ কেউ বক্রদৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং এর জন্য তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে নারী-বিদ্বেষী বলেছেন। এমনকি কোন কোন ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে তাঁর দৈহিক পঙ্গুতা বা অসমর্থতার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।[১] আসল সত্য ঠিক এর বিপরীত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আধ্যাত্মিক জীবনের এমন এক উচ্চমার্গে অবস্থান করতেন যে, সাধারণ জাগতিক কামনা বাসনা তাঁর মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত না। ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব দিয়ে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনোজগতের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করা সম্ভব হলেও, অতীন্দ্রিয় ভাবদর্শনে আপ্লুত রামকৃষ্ণের দর্শন ফ্রয়েড-দর্শনের নাগালের বাইরে। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে সকল নারী মহামায়া বা মহাশক্তির প্রকাশ। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, সতী-অসতী সকলেই মহামায়ার বিভিন্ন রূপ। তিনি প্রত্যেক নারীর মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা বা ভাল ও মন্দ এই দুইটি সত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সকলের প্রতিই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। নটী বা বারবনিতা কেউই তাঁর চোখে হেয় ছিলেন না। সতী বা বারবনিতার মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি কোন পার্থক্য দেখেননি। সমাজের চোখে নটী বিনোদিনী বারবনিতা বলে গণ্য হলেও তাঁর মধ্যে তিনি চিৎশক্তিকেই দেখেছেন এবং 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন আন্তরিক শ্রদ্ধায়। বস্তুতঃ তিনি সকল পতিতা নারীকেই 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। তাদের সম্মুখীন হলে তিনি মনে করতেন যে, স্বয়ং মহামায়াই ঐ রূপ ধারণ করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি পুরুষদের আধ্যাত্মিক জীবনে নারীসঙ্গ পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, এই তথ্যটিই 'কথামৃত'-এর মাধ্যমে সর্বজনবিদিত; কিন্তু নারীদের কাছে উপদেশকালে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে পুরুষ সম্পর্কে সাবধানতার কথা একইভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—এ তথ্য তাঁর নারীভক্তদের সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু নারী মাত্রই তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে ছিল জননী। একথা স্মরণযোগ্য যে, রামকৃষ্ণ যে নারী বা পুরুষ সম্পর্কে সাবধানতার উপদেশ নারী ও পুরুষকে দিয়েছেন তার মর্মার্থ হলো ইন্দ্রিয়পরতা ও বিষয়-বাসনার প্রতি অনাসক্তি। ডঃ সুমিত সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ় মর্মার্থের কদর্থ করে বলতে চেয়েছেন যে, নারীর প্রতি রামকৃষ্ণের ভীতি ছিল এবং তার অন্যতম কারণ হল, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নারী অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, এবং দ্বিতীয়তঃ, গৃহে নারীর আবির্ভাব পুরুষ-শাসিত সমাজব্যবস্থায় পুরুষের দাপটের অবক্ষয় ঘটাতে পারে।[২] যুক্তির পোশাক পরিয়ে বিকৃত মনের ভাবোচ্ছ্বাস সমালোচনারও অযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কোন নারীভীতি ছিল না—এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ সারদাদেবীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। দেহাতীত স্তরেও নারী-পুরুষের মধ্যে যে একটা গভীর সখ্য গড়ে উঠতে পারে তার নজির রেখে গেছেন রামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবী। স্থূলবুদ্ধিতে যা সত্য বলে মনে হয় সেটাই সত্যের সবটুকু নয়।

---

[১] The Kathamrita As AText: Towards An Understanding of Ramakrishna Paramahansa—Sumit Sarkar (Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi, 1985, Unpublished), pp. 102—104

[২] Ibid, pp. 104—111

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ইংল্যাণ্ডে একজায়গায় বলেছিলেন, “Our limited experiences are not the standard for all.”*

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে নারীজাতির এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। কৈশোরে উপনয়নের সময় তিনি প্রথম ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ধনী কামারনী নামে এক নীচু জাতের স্ত্রীলোকের কাছ থেকে। এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের শতাধিক বর্ষ পরেও ব্রাহ্মণবংশজাত সন্তানের উপনয়নের সময় সাধারণতঃ মাতা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের মুখদর্শন নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ নীচু জাতির মহিলার তো নয়ই। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে বাংলার অজ্ঞাত এক গ্রামের একটি বালক কিছুটা জেদ করেই উপনয়নের প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করলেন ধাই-মাতা ধনী-কামারনীর কাছ থেকে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় এলেন এবং অব্যবহিত কাল পরেই শূদ্র রাসমণিকৃত দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হলেন। ভবতারিণী বা কালী প্রতিমার মৃন্ময়ীরূপকে তিনি চিন্ময়ীতে পরিণত করলেন তাঁর সাধনার মাধ্যমে। এই চিন্ময়ী দেবীমূর্তির মধ্যে তিনি অবলোকন করলেন মহাশক্তির প্রকাশ। সাধকরূপে পঞ্চবটীর তলে বসে সাধনায় মগ্ন থাকাকালীন তাঁর প্রথম গুরু ছিলেন এক নারী—যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী। সেই যুগে একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে এক নারীকে ধর্মসাধনার গুরু করা ছিল সত্যই বৈপ্লবিক। তাঁর প্রথম শিষ্যও ছিলেন এক নারী—স্বীয় পত্নী সারদামণিদেবী। সারদাদেবী ব্যতীত তাঁর একাধিক স্ত্রীভক্ত বা শিষ্যা ছিলেন যেমন গৌরী-মা, গোলাপ-মা, গোপালের মা, যোগিন-মা, ইত্যাদি। তাঁরা সকলেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে অগ্রসর হতে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী। তাই আধার ভেদে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের জন্যই তিনি সুনির্দিষ্ট পন্থা দেখিয়ে গেছেন। সন্ন্যাসীদের তিনি বলেছেন অর্থচিন্তা ও কামচিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে, কারণ এগুলি অধ্যাত্মসাধনার পথে বড় অন্তরায়। কিন্তু গৃহীদের সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ছিল ভিন্ন। তাদের তিনি কাম বা অর্থ সম্পূর্ণ পরিহার করতে বলেননি। কারণ এগুলি গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জন অবাস্তব ব্যাপার। এক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ হলো যতদূর সম্ভব স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অনাসক্ত হয়ে জীবন-যাপন করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণদেব স্পষ্টভাবে একথাও বলেছেন যে, একটি বা দুইটি সন্তান জন্মের পর স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে ভাই-বোনের মতো জীবন-যাপন করা উচিত যদি তারা আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হতে চায়। শারীরিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কারণের জন্য তিনি ঘন ঘন সন্তান জন্মের বিপক্ষে ছিলেন। বর্তমানকালের পরিবার-পরিকল্পনার যাঁরা পরামর্শদাতা তাঁরা ভাবলে আশ্চর্য হবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অত বছর আগেও এই বিষয়ে কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নারীর স্থান কিরূপ ছিল তা সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ করতে হলে আর একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। তৎকালীন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নটীদের তিনি কি চোখে দেখতেন? বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রঙ্গমঞ্চ যথেষ্ট প্রসার লাভ করলেও নট-নটীদের সাধারণভাবে সম্মানের চোখে দেখা হত না। সেই যুগের জনদৃষ্টিতে নটীরা, এমনকি নটরাও, অপাংক্তেয়, অশ্রদ্ধেয় ছিল। মঞ্চে সঙ্গীত, নৃত্য বা অভিনয় করাকে সাধারণ বাঙালী সমাজ একেবারেই সুনজরে দেখত না, যদিও অনেকেই গৃহে এই সকল সুকুমার শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করত। রামকৃষ্ণদেব সর্বপ্রথম বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে, বিশেষতঃ নটীবৃন্দকে, ধূলি থেকে তুলে এনে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি পতিতাদের অন্ধকারময় জীবনে আশার আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিলেন। তিনি তাদের শুধু আশীর্বাদ করেছেন তা নয়, তাদের মনে প্রাণে শ্রদ্ধাও করতেন। তাদের শিল্পকে সম্মান দেখাতেন। তাঁর উদার দৃষ্টিতে নটীরা বা বারবনিতারা মহামায়ার বিভিন্নরূপের প্রকাশমাত্র। মহামায়াই স্বয়ং কখনো সতী, কখনো অসতী, কখনো

---

* S. Radhakrishnan's article 'The Spirit in Man' in Contemporary Indian Philosophy—S. Radhakrishnan and J. H. Muirhead (London, 1958), p. 493

পতিব্রতা, কখনো পতিতা। সকলেই সেই এক শক্তির প্রকাশ। অভিনেতাদের সম্পর্কে ছিল তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মনোভাব। রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়ের শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তৎকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বহু রঙ্গমঞ্চে তাঁর ছবি টাঙ্গানো থাকত। অভিনয়ের পূর্বে শিল্পীরা তাঁর ছবিকে প্রণাম করে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। এই প্রথা শুধু যে তৎকালীন যুগে পালিত হতো তা নয়, বিংশ শতকেও বহু রঙ্গমঞ্চে এই প্রথা অনুসৃত হচ্ছে। অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সমসাময়িক কালে শুধু নয়, পরবর্তী যুগেরও বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁদের স্মৃতিচারণে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। যথার্থভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণকে কলিকাতা তথা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের 'দেবতা' রূপে আখ্যা দেওয়া যায়।[৪]

নারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ সম্মান করতেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো স্বীয় পত্নী সারদাদেবীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব ও আচরণ। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ষোড়শী পূজা। দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী কালীপূজার দিন রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে দেবী ষোড়শীর আসনে অধিষ্ঠিত করে তাঁকে পূজা করেছিলেন এবং পূজান্তে তাঁর সাধনার সমস্ত কর্মফল সারদাদেবীর চরণে অর্পণ করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে বিরল এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সারদাদেবীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হল। এর চেয়েও বড় কথা হল, এই পূজার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র নারীজাতির প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করলেন। নারীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার এ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিনব প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: "স্বীয় পত্নী সারদাদেবীকে তিনি জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, নারীমাত্রেই ছিল তাঁহার চোখে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। কামজিৎ হইয়া বিবাহিতা পত্নীকে দেবীজ্ঞান করিবার ও রমণীকে প্রথমেই গুরুত্বে বরণ করিয়া সমগ্র নারীজাতিকে উচ্চাসন প্রদানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত একমাত্র পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই।"[৫]

আধুনিক পরিভাষায় তথাকথিত ফেমিনিস্ট বা নারীহিতৈষী বা নারী-সমর্থক বলতে যাদের বোঝানো হয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ ছিলেন না। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো নারীর অধিকার রক্ষার জন্য তিনি কোন আন্দোলন সংগঠন করেননি বা সচেতনভাবে কোন দাবি পেশ করেননি। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কারও চেয়ে নারীজাতির প্রতি কম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে প্রাণে নারীজাতির মুক্তি ও প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নারী-শিক্ষার প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ডঃ সুমিত সরকারের মতে, পুরুষপ্রধান ইংরেজী শিক্ষা এবং অসম্পূর্ণ, কখনো বিপরীতধর্মী, সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টার ফলে লিঙ্গ-সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য শিথিল হয়ে যায় এবং সেই হেতু বহু পুরুষ ও নারী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। হতাশাপূর্ণ মাতৃত্বের স্পৃহা ও দুঃসহ যৌন দায়িত্ব পালন—এই উভয় কারণহেতু বহু প্রাপ্তবয়স্কা এবং তরুণী পরমহংসদেবের শরণাগত হন।[৬] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের পুরুষ বা নারী শিষ্য কেউই তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষের চেয়ে অতিরিক্ত কোন হতাশা বা ভীতিগ্রস্ত ছিলেন না। অধ্যাপক সরকারের মত একেবারেই

---

[৪] শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৮), পৃঃ ২৫৪-২৬২

[৫] 'মেগাফোন' কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত আর. পি. এম. ডিস্কে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামী অভেদানন্দের ভাষণ।

[৬] Sumit Sarkar, op. cit., pp. 99-106

যুক্তিগ্রাহ্য নয়। হতাশা বা ভীতির কারণ দেখিয়ে আর যাকেই বোঝানো যাক, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করা চলে না। সাধারণ দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অশিক্ষিত, গ্রাম্য পূজারী হলেও তৎকালীন কলিকাতার বিদগ্ধ সমাজের উপর তিনি যে কত সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। এর প্রকৃত কারণ ছিল সমসাময়িক সংস্কার আন্দোলনের অপূর্ণতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চারিত্রিক পবিত্রতা, উদারনৈতিক মতবাদ ও উচ্চ আধ্যাত্মিকতা যা মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে আন্দোলনের বীজ রোপণ করেছিলেন তা পরবর্তী কালে শুধুমাত্র বাংলা বা ভারতের নয়, পৃথিবীর নানা দেশের মানুষকে নতুন আশার আলোক দেখাচ্ছে ও তাদের জীবনকে নবরূপে গঠন করার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বর্তমানকালের নারীমুক্তি বা নারী-প্রগতির প্রশ্ন নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপাতদৃষ্টিতে চিন্তিত ছিলেন না। নারী অধিকার সংরক্ষণার্থে কোন সফল আন্দোলন সংগঠন করার প্রয়াসও তিনি নেননি। তবুও তাঁর জীবন ও বাণী নারীমুক্তি প্রশ্নের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে এবং নারী আন্দোলনকে অগ্রসর হতে প্রভূত সাহায্য করেছে। তাঁর সুযোগ্য পত্নী ও আধ্যাত্মিক জীবনসঙ্গিনী সারদাদেবী একই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নারীর চারিত্রিক পবিত্রতা, স্বয়ংনির্ভরতা ও শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে সারদাদেবী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের নেপথ্য-নেতৃত্ব দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁরই ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণ একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হলেন এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনা করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে এই আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির উপর গভীর চিন্তা ভাবনা করেন। পুরুষশাসিত সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেযুগের ব্রাহ্মনেতাদের মতো রামকৃষ্ণপন্থীরাও যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাংলাদেশে যে নারী আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদিন রামমোহনের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল তা সেই শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। নারীপ্রগতির বিষয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতারা পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও সনাতন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তৎকালীন হিন্দু নারীর অধিকার রক্ষার্থে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নারীপ্রগতিতে উৎসাহী হলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কিন্তু পাশ্চাত্য বা দেশীয় কোন ক্ষেত্রেই আন্দোলনের পুঁথিগত শিক্ষা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর নারীর অধিকার রক্ষণের জন্য ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে সমাজের অভ্যন্তর থেকে পরিবর্তন। জোর করে আইনের সাহায্য নিয়ে সমাজ সংস্কারে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। উচ্চে সরকারি ও অভিজাত স্তর থেকে নয়, নিম্নে তৃণমূল স্তর থেকে পরিবর্তন আনতে হবে। সর্বোপরি, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মনেতারা বা ডিরোজিয়ানরা নারী সমস্যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকের উপর আলোকপাত করেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দ এই আন্দোলনের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চরিত্রও সংযোজন করেছেন। শুধুমাত্র জাগতিক ক্ষেত্রে নয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাঁরা নারীর অধিকার পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন। একদিকে যেমন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন নারী সমস্যা সমাধান করে নারীপ্রগতি সাধন করতে ব্রতী হয়েছে, তেমনি অপরদিকে দেশ-বিদেশের বহু নারী এই আন্দোলনে সামিল হয়ে তাকে বহুধারায় প্রবাহিত ও প্রসারিত হতে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

নবীন তপস্বী তুমি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আকৈশোর দেখে আসছি—বাহুবন্ধ, দীর্ঘ বক্ষপট,
সংকল্পে কঠিন দৃষ্টি, মুখময় সন্ন্যাসী-দ্যোতনা,
ঋজুরেখ দৃপ্ত ভঙ্গি, আর কণ্ঠে ঘোষণা স্বাধীন :
ভারতে মিলায়ে দেবে, ধর্মের ছুৎমার্গ দেবে মুছে ।

নবীন তপস্বী তুমি, বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চ ঘুরে
তোমার তেজস্বী বাণী, পৌঁছে গেছে কানে মানুষের
শতাব্দীর আগে জন্ম নিয়েছিলে, দুঃখ পেয়ে গেলে,
আজকের সমাজ তাই পুজো করে সংঘবদ্ধভাবে ।

মানুষের জন্য

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মানুষের মুখোমুখি মানুষেরই বানানো ঈশ্বর ।
ফোলা ফোলা গাল নিয়ে সে-দারুগোপাল
সিঁড়িপথে বসে আছে
মেধা ও চৈতন্য খাবে বলে ।

দোসাদের পায়ে পায়ে চণ্ডালের হাড়ের বাতাসে
বড় দীর্ঘদিন ঘুরে ঘুরে
দক্ষিণের বাদামি ছায়ায়
তুমি তাকে রেখে এলে কন্যাকুমারীর নীল জলে ।

নির্বাণ তোমার নয় ।   মোক্ষ নয় ।
হাভাতের বেদনার রঙে
ও-বসন রাঙিয়েছ যোগী,
ধ্যানমগ্ন মহাবেলা—
তোমাতে সমানভাবে সুর তোলে
পুরবী ভৈরবী ।

বিবেকানন্দ

তরুণ সান্যাল

ধ্যানে বসেছেন রুদ্র পাটে রৌদ্র হাঁটছে খরার মাঠে,
আয় রে বৃষ্টি আয় গেরুয়া ঢল—
পাঁক বা পলি বা স্বেদ থেকে
অশ্রু আঁকের মোহর এঁকে
আয়রে বাষ্পজমাট মুক্তিজল ।
তখন শুদ্ধ পরিশ্রুত হাওয়ার টানে চলন দ্রুত,
অসম্ভবের দায় মেঘ নেয় কাঁধে,
এমনিতো হন বিপ্লবীও জীবনব্রতে বিবেকপ্রিয়
প্রকৃতি, প্রেম, বিশ্বজনের ছাঁদে ।

ঐ পুড়ছেন অলোক আঁচ এদেশ ওদেশ দশের কাজে
সোনার সোনা দুঃখে দুঃখজয়ী.
এবং তখন হৃদয় খুঁড়ে উদ্ভূত বীজ যা অঙ্কুরে—
কাল প্রতিমায় অভয়, জ্যোতির্ময়ী ।
প্রেম কি কেবল রক্তমাংসে এক জীবনের ছোট্ট অংশ
সেও তো শুদ্ধ আত্মারই যন্ত্রণা—
পাতায় ফুলে মাটির কোলে
আকাশ চাওয়া আশায় দোলে,
কিংবা লাঙল ফলায় ইচ্ছা বোনা ।

মানুষ, ওহে মানুষ, ওহে মানুষ, তোমার শরীর হয়ে
স্বপ্নসত্য সাঁকোয় এপার ওপার—
তোমার সঙ্গী ওষধি বীজ, তোমার সঙ্গী মনের খনিজ,
বিশ্ব চরাচরের সারাৎসার ।
মাথায় না-হয় গৈরিকে তাজ
কিন্তু সেতো সাগর, স্বরাজ,
ত্যাগের মধ্যে মুক্তির উৎসব—
সব শোষণের সকল ত্রাসের—নিপীড়িতের
দীর্ঘশ্বাসের
অন্তে ছিল তাঁর প্রিয় বিপ্লব ॥

আলোকতৃষ্ণা

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

সেই যে কবে দরজা খুলে দিয়ে
হারিয়ে গেছ, রইল শুধু বাণী।
আবার এসো নতুন রূপ নিয়ে
আঁজলা ভরে বাড়িয়ে দাও জল।

ওখানে এক খণ্ড অভিমানী
ভেতরে তার সবুজ অঙ্কুর
নিজের হাতে সেচন কর আসি
সফল হোক ফুটিয়ে বেলফুল।

তোমার আলো

শ্যামলকান্তি দাস

আমার কাছে আর কিছু নয়
তুমিই তো সেই—তত্ত্বমসি,
পাপহরণ তাপহরণ
তোমার চরণতীর্থে বসি।

অন্তরে তাই সুগন্ধ বয়
পুণ্য হল কলুষ-কালো,
অন্ধকারে কুড়িয়ে পেলাম
রূপে অরূপ তোমার আলো!

দেখা

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

সমর্পণ? শিখিনি কখনো
এই এখনো নিজেকেই দেখে দেখে অন্ধ হয়ে আছি।
সূর্য নেভা ঘরে একা বাঁচি।
দেহে কাদা, বিষে বাঁধা
কোথায় আমাকে নেবে? দানে?
কোথায় বসাবে স্থির—ধ্যানে?
এক হ্যাঁচকা টানে
ওগো বীর, উন্নত শির, আলোতে ফেরাও
জীবনে দেখিনি যা—দেখবো তোমাকে।

কিছু দিতে চাই

কঙ্কাবতী মিত্র

তুমি তো আমায় অনেক কিছু দিলে
তোমার কাছে আমার সারাজীবনের রয়ে গেল ঋণ
তোমার হিসেবের খবর কে রাখে?
তবু তুমি আমার চাওয়ার থেকে অনেক বেশিই দিলে।

আমার প্রথম জাগরণেই দেখলাম
তোমার দেওয়া ঝকঝকে সোনালি রোদের হাসি
তোমার ছড়ানো বাতাসেই বুঝি
ফুলের গন্ধ পেলাম প্রথম
তোমার নেশা জাগানো চাঁদের আলোতেই
বুঝি চিনলাম সুন্দরকে
এইভাবে তুমি তো আমায় একের পর এক
দিয়েই চলেছ
পরিবর্তে তোমাকে আমার দেওয়া হল না কিছুই
তবু একবার দু-মুঠো ভরে
তোমাকে দিয়ে যেতে চাই আমি।

চার স্তবক

অভী সেনগুপ্ত

নক্ষত্রের জন্য মহাকাশ ছাড়া অন্য কোনও আধার
আছে কী?
—নেই

ভিড় করে এলেও অমানুষেরা কখনো মানুষকে
মুছে দিতে পারে কী?
—পারে না

সমস্ত মুগ্ধতা কোন্ উচ্চারণের দিকে হিমালয়
দেখার মতন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে?
—হে ভারত, ভুলিও না…

জ্ঞান, পৌরুষ আর মানবাত্মাকে মিশিয়ে কার যাত্রা
অনন্তকালের দিকে?
—বিবেকানন্দের!

আবার দেখাও পথ

মানসী মজুমদার

আজ আবার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে
মানুষের দীর্ঘশ্বাসে আর আত্মহননে।
আমরা বিশ্বজনের সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে
স্বদেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি বারবার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পথ বাড়িয়ে চলেছি,
অথচ অন্তরে সত্যের কাছে পৌঁছবার পথ হচ্ছে রুদ্ধ।
এই ঘোর তমসায় মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে
আমরা আবার বাঁচতে চাইছি,
এখন কে হাত ধরবে আমাদের ?
কার আশ্বাসে জীবনের ঐশ্বর্য ফিরে পাব ?
হতাশার গভীরে যখন এমনি করে ডুবছি
তখনই, তোমার মূর্তিখানি
ভাস্বর হয়ে উঠলো হঠাৎ,
ধমনীতে আবার রক্তপ্রবাহ
জাগিয়ে তুলল চেতনাকে।
তোমার বাণী আজ বড় প্রয়োজন আমাদের।
বিভ্রান্ত, বিস্মৃত আমরা হারিয়ে ফেলেছি
তোমার দেখানো জীবনের সত্যকে,
সহজ সরল জীবনধারাকে করেছি জটিল,
বাইরে জৌলুসের মোড়কের ভিতর
হাঁফাচ্ছি, পাক খাচ্ছি অন্ধকারে,
সত্য-শিব-সুন্দরের নয়,
পূজা করি অশিব অসুন্দরকে।
আজ তুমি প্রেরণা দাও অন্তরে,
বিশ্বাস আর সত্যকে
হৃদয়ে সঞ্চারিত কর।
দীনতার ধূলি থেকে গৌরবে তুলে দিতে
তুমি ছাড়া কেউ নেই আর—
হে সন্ন্যাসী, তোমার দণ্ড নিয়ে
আমাদের সামনে আবার দাঁড়াও,
আমরা তোমাকে অনুসরণ করব—
তোমার আলোতে পথ দেখব।
তোমার বাণী সঞ্জীবিত করবে
আমাদের কল্পনা, স্বপ্ন ও জীবন।

সন্ন্যাসী প্রেমিক

প্রমোদ বসু

গেরুয়া টেনেছে প্রেম, সে প্রেমিক সন্ন্যাসীর।

দৃপ্ত চোখ, তীক্ষ্ণ স্বর, মুক্ত মন, মেধা ;
স্বপ্ন তাঁর প্রগাঢ় প্রত্যয়।

কর্মযোগে ব্যর্থ দ্বেষ, নন্দনাম, হুঁশ।
সংসার ধরেছে পা, অজ্ঞান মানুষ।

চিত্তজয়ী ভ্রাতৃপ্রেম—জয়।
মানুষের জন্যে তাঁর রামকৃষ্ণহৃদয়।

মায়ায় টেনেছে মন, সে প্রেমিক সন্ন্যাসীর।

কর্মে প্রেম, ধর্মে প্রেম, মগ্ন, সন্ধানী।
জীবনের মন্ত্রবীজ ব্যাপ্ত মনীষায়।

ভারতের ভাগ্য তাঁর বাণী।

সাঁকো পেরিয়ে

ব্রত চক্রবর্তী

অন্ধকারের ছাঁকনিতে ছোট বড় আলোগুলোকে
রোজ ছেঁকে নিই।
মাঝে মাঝে ক্লান্তি, হতাশার শিকার।
তখন আপনার কথা ভাবি। আপনি বলেছিলেন,
বিষণ্ণতার কোন ভবিষ্যৎ নেই।
দুঃখ ও যন্ত্রণাগুলো বহু ব্যবহৃত, ফলে
একঘেয়ে ইদানীং।
এখন আমি নিজেই পিচকারির রঙ থালার আবীর
ছড়াই-ছিটোই ওদের শরীরে।
কেননা সুড়ঙ্গের শেষে পৌঁছতে এখনও যতটা রাস্তা,
তা ওদের সঙ্গেই যাব। যেতে হবে।
যেতে যেতে যেতে ভাবি,
সাঁকো ঠিকঠাক পেরিয়ে কবে যে
বিবেকানন্দের দিকে যাব।

স্মৃতিকথা

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সান্নিধ্যে

স্বামী সম্ভবানন্দ

[ইংরেজী থেকে অনূদিত]

দৈবানুকম্পায় আমি রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) চরণপ্রান্তে আশ্রয়লাভ করি। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসপুত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ খুবই স্বল্পকালব্যাপী। কিন্তু দীর্ঘকাল পূর্বের এই ঘটনাটির প্রভাব আজও আমার জীবনে অম্লান এবং ক্রমবর্ধমান। বাস্তবিকই আমি এটি অনুভব না করে পারি না যে, এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁর আশীর্বাদলাভে আমার জীবন এক অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়েছে—আমি ধন্য হয়েছি।

ইংরেজী ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ মাদ্রাজে আগমন করেন এবং সেখানকার মায়লাপুরস্থ নবনির্মিত ছাত্রভবন ও মন্দিরটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। সেসময় স্বামী নির্মলানন্দজী ছিলেন ব্যাঙ্গালোর মঠের অধ্যক্ষ। তিনি মাদ্রাজ থেকে প্রায় দু-শো মাইল দূরে অবস্থিত ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে এসে কিছুকাল থাকবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধে মহারাজ ব্যাঙ্গালোরে এসে—যতদূর মনে পড়ে, সেবার জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর—এই তিনটি মাস বাস করেন।

ইংরেজী ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আমি ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করি। সুতরাং মহারাজের আগমনকালে আমি শিক্ষানবীশরূপে আশ্রমে উপস্থিত ছিলাম। সেই তিনটি মাস আমার জীবনের পরম মুহূর্ত, কারণ মহারাজের সঙ্গে আমার সেই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১০ এপ্রিল কলকাতায় মহারাজ মহাসমাধিতে লীন হন।

মহারাজের সঙ্গে সহযাত্রীদের একটি বেশ বড় দল থাকত। সেবার ব্যাঙ্গালোরে আসবার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন—স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী বরদানন্দ ও স্বামী অনন্তানন্দ, স্বামী নির্বাণানন্দ (সুয্যি মহারাজ), একজন ব্রহ্মচারী এবং আরও দু-চারজন।

মহারাজের ব্যাঙ্গালোরে আসবার প্রস্তুতির অধিকাংশ দায়িত্বই আমাকে এবং প্রায় ছয় বৎসরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অপর একটি ব্রহ্মচারীর উপর দেওয়া হয়েছিল। অতিথিরা যে ঘরগুলিতে থাকবেন সেগুলি পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ করতে আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম এবং কতকটা মানসিক উদ্বেগও বোধ করছিলাম।

আমি মহারাজের আগমন ও তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা কখনই ভুলব না। রেলস্টেশন থেকে যে যানটিতে তাঁকে আনা হয়েছিল সেটি থেকে অবতরণকালে আমার এ-কথাই মনে হয়েছিল যে, আমাদের আঙিনায় আজ একজন রাজপুত্র এসেছেন। স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজকে আমার পরিচয় দিলেন, "এ একটি নবাগত শিক্ষার্থী।" মহারাজের তখনকার সেই দৃষ্টিপাতেই আমি তাঁর সর্বব্যাপী করুণা অনুভব করতে পেরেছিলাম।

এর পরের সপ্তাহগুলিতে সেই স্নেহধারা আমি আকণ্ঠ পান করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। রোজ সকালে মহারাজকে প্রণাম করবার জন্য তাঁর ঘরে গিয়ে আমি এমন ভালবাসা পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কেবলমাত্র আমার মায়ের কাছেই পেতাম। প্রায়ই তিনি আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন যেন আমি তাঁর আপন সন্তান। কখনও বা তিনি আমাকে তাঁর সামান্য কিছু কাজ করতে দিতেন; বিনম্র ভঙ্গিতে তিনি হয়তো বললেন: "এই জানালাটা একটু বন্ধ করে দেবে কি?" আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতাম। এমন একজন মহাত্মার আমার প্রতি এমন বিনীত ব্যবহার! আমি বিগলিত হৃদয়ে উত্তর দিতাম: "মহারাজ, আমাকে আপনি এত দ্বিধার সঙ্গে কেন বলছেন?" তাঁর জন্য আমার তুচ্ছতম সেবাটুকুও তিনি এমনভাবে প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করতেন যে, যেন আমি তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছি। ভালবাসা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল; কারণ তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। প্রেম যেন শতধারে তাঁর হৃদয় থেকে প্রবাহিত হতো। যে কেউ তাঁর সান্নিধ্যলাভ করত, তার উপরই তা অকৃপণ-

ভাবেই ঝরে পড়ত। তাঁর সাহচর্যলাভে ধন্য প্রত্যেকেই অনুভব করতেন যে, তিনিই মহারাজের সর্বাধিক স্নেহাস্পদ। প্রত্যেকেরই বোধ হতো যেন তিনি মহারাজের বিশেষ অন্তরঙ্গ।

মনুষ্যেতর প্রাণীও মহারাজের ভালবাসায় সমভাবে সাড়া দিত। আশ্রমে 'জকি' নামের একটি সবার প্রিয় সুন্দর কুকুর ছিল। মহারাজ ওকে খুবই স্নেহ করতেন এবং আহারান্তে কিছু খাবার নিয়ে ওকে ডাকতেন—'জকি, জকি'! জকি সেই ডাক শুনে ছুটে আসত। মহারাজ স্বহস্তে কুকুরটিকে খাওয়াতেন। সে-সময় একথা বলা কঠিন হতো যে, দুজনের মধ্যে কে বেশি আনন্দিত। মহারাজের জকির প্রতি করুণা এবং জকির মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা বাস্তবিক দর্শনীয় ছিল। আশ্রমে কয়েকটি ভাল গরু ছিল। মহারাজ গোশালায় গিয়ে তাদের খাওয়া দেখতে ভালবাসতেন।

বিশ্রামের পর মহারাজ বাগান দেখতে বেরুতেন। ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় প্রায় প্রতিদিনই তিনি এটি করতেন। তিনি সব রকমের চারা ও গাছগুলিকে চিনতেন এবং ভালবাসতেন। সত্যি বলতে কি, উদ্যান-বিষয়ক ব্যাপারে তাঁর সত্যিকারের অভিজ্ঞতা ছিল।

ক-দিন পর মহারাজের কিছু সেবা করবার বিশেষ সৌভাগ্য আমাকে দেওয়া হয়। প্রতিদিন একটি ভক্তের বাড়ি থেকে কিছু পরিমাণ 'রসম' (তরল ও অম্লস্বাদযুক্ত দক্ষিণী খাদ্যবিশেষ) আমি নিয়ে আসতাম। ভক্তেরা নিজেদের বিবেচনানুযায়ী সুস্বাদু সামান্য খাদ্যবস্তুগুলি মহারাজকে দেবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি সেগুলি গ্রহণ করে আহার করতেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত সুদামা-প্রদত্ত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করেছিলেন বাজার থেকে আমি মহারাজের পছন্দ মতো নানারকমের শাক-সবজি কিনে আনতাম। এছাড়া ডাকঘরে গিয়ে প্রতিদিনের ডাক—যার অধিকাংশই মহারাজকে লেখা—নিয়ে আসবার দায়িত্বও ছিল আমার।

এ-সময়কার একটি ঘটনা আমাকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। মহারাজ নিজের ঘরে আরামকেদারায় উপবিষ্ট আছেন। ডাকঘর থেকে আমি কিছু চিঠি এনেছি। মহারাজকে সেগুলো দেবার পর নিকটস্থ টেবিল থেকে তাঁর চশমাটি দিতে বললেন। চশমাটি তুলে নিয়ে আমি তা পরিষ্কার করবার প্রয়োজন আছে কিনা দেখছিলাম। "হ্যাঁ, কাঁচগুলো একটু পরিষ্কার করে দাও"—মহারাজ বললেন। র‍্যাকে ঝোলানো তাঁর পশমী চাদরটির এক প্রান্ত এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার জন্য আমি সেদিকে হাত বাড়িয়েছি। "না, না! টেবিলের উপর যে মৃগচর্ম (chamois) রয়েছে, চশমার নোংরা তাতেই মোছা উচিত, শাল দিয়ে নয়।"—মহারাজ বললেন।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল যার প্রভাব আমার জীবনে আজও রয়েছে। ডাকঘর থেকে ডাক নিয়ে আসবার পথেই আমার তা বাছাই করবার কথা—যাতে আশ্রমে পৌঁছেই অতিথি ও আশ্রমবাসীদের চিঠিগুলি ব্যক্তিগতভাবে দিয়ে দিতে পারি। একদিনের ডাকে আমার নিজস্ব দু-তিনটি চিঠি ছিল। ডাকঘর থেকে ফেরবার সময় আমি সেগুলো পড়ছিলাম। আমার ব্যক্তিগত চিঠি পড়তে আমি এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম যে, প্রাত্যহিক বাছাইটুকু না করেই আশ্রমদ্বারে পৌঁছলাম। মহারাজ তখন বারান্দায় বসে মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কথোপকথন করছিলেন। তিনি তখনই তাঁর চিঠির জন্য হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। আমি অপ্রস্তুত ও হতচকিত হয়ে প্রাপকদের নামানুযায়ী সাজাবার প্রয়াসে খামগুলো হাতড়াতে লাগলাম। শীঘ্রই মহারাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বাছাইয়ের কাজটি নিজেই করবার জন্য তিনি চিঠিগুলি আমার কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিলেন। কি লজ্জিত ও দুঃখিতই যে বোধ করেছিলাম! তাঁর সেবার কাজে ত্রুটি ঘটাবার দরুন সেদিন সারাক্ষণ এক বেদনা ও লজ্জা অনুভব করেছিলাম। এবং সেদিনকার সেই কর্তব্যচ্যুতির স্মৃতি আজও আমার মনে অনুশোচনা আনে। আমাদের কাছ থেকে কে কী প্রত্যাশা করেন তার পূর্ব ধারণা করে নিয়ে সম্ভাব্য সব কিছুর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তৈরি করা যে একান্ত প্রয়োজন—সেই অমূল্য শিক্ষা ঘটনাটি সেদিন আমায় দিয়েছিল। এটি এখন আমার একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

মহারাজের সঙ্গধন্য প্রত্যেকটি ব্রহ্মচারী এবং সাধুকে মহারাজ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে

দেখতেন। তাঁর অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল, সেই কারণে তিনি প্রায়ই কারও কোন দোষ বা ভ্রম তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়প্রবিষ্ট হয়ে কোন ক্ষতি করবার পূর্বেই দেখে নিয়ে তা সংশোধন করে দিতেন। মহারাজ তাঁর সন্তানের হৃদয়ে 'অহং' ভাবের উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সজাগ ছিলেন এবং শীঘ্রই তা সবলে ও সমূলে উৎপাটিত করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ভক্তদের চিঠিতে সংবাদাদি দেবার সময় তাঁর সেবক স্বামী বরদানন্দ নিজের স্বাক্ষরের নিচে লিখতেন—'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের একান্ত-সচিব।' এইরকম একটি চিঠি মহারাজের হাতে গিয়ে পড়ে। মহারাজ তৎক্ষণাৎ কঠোরভাবেই সকলকে ডেকে বললেন ঃ "এ লোকটিকে দেখেছ? 'অধ্যক্ষের একান্ত সচিব'। কে ওকে অধ্যক্ষের একান্ত-সচিব করেছে?" মহারাজ অতঃপর স্বামী বরদানন্দকে ডেকে বহুক্ষণ ধরে কঠোর ভর্ৎসনা করেছিলেন।

মহারাজের ব্যাঙ্গালোরে বাসকালে আমি একেবারে তাঁর পাশের ঘরটিতেই ছিলাম। ভোর চারটায় উঠে তাঁর কলঘরে যাবার শব্দ শুনতে পেতাম। সাধারণতঃ এসময় তিনি কোন ভজন গুনগুন করে গাইতেন। সেই মৃদুস্বর প্রায় শোনাই যেত না, কিন্তু গানগুলি এমন ভক্তিপ্লুত স্বরে গাওয়া হতো যে শ্রোতামাত্রই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

মহারাজের আচরণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল—যার জন্য সকলেই অনুভব করত যে, তিনি প্রায়ই কোনও ঐশী শক্তি বা দিব্য-পুরুষের সাথে ভাবমুখে সম্মিলিত হয়ে থাকেন। তিনি প্রায়ই উদ্যানে একাকী পদচারণা করতেন। একটু নজর রাখলেই দেখা যেত যে মহারাজ মাঝে মাঝেই থামছেন ও যুক্তকরে নমস্কার করছেন, যেন তাঁর সম্মুখে কোনও দিব্য আবির্ভাব ঘটেছে।

মহারাজের বোধশক্তির সূক্ষ্মতাও অলৌকিক ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, আশ্রমে তাঁর উপস্থিতির কথা জেনে ব্যাঙ্গালোরবাসী ভক্তবৃন্দ মহারাজ যা বিশেষভাবে পছন্দ করতে পারেন এমন সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করার বিষয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করতেন। আহারকালে আশ্রমে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদি ছাড়াও বাইরের বহুপ্রকারের ব্যঞ্জন এবং ভোজ্যবস্তু থাকত। মহারাজ ভক্তদের তুষ্ট করবার জন্য সবকিছুই অল্প অল্প করে চেখে দেখতেন। এথেকেই তিনি বলতে পারতেন যে, স্বাদটি যথাযথ হয়েছে কিনা এবং তাতে বিভিন্ন উপাদানসমূহ (আবশ্যক সবজি ও মসলা ইত্যাদি) ঠিকভাবে নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে কিনা। পরে যখন আহার্যবিশেষের প্রস্তুতকারী কোন ভক্তকে দেখতেন, তিনি তাঁর খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। একদিন সূর্য্য মহারাজ (স্বামী নির্বাণানন্দ) মহারাজের জন্য 'রসম' তৈরি করেন। সবাই জানতেন যে, মহারাজ পেঁয়াজযুক্ত রসম পছন্দ করেন না। সেজন্য সূর্য্য মহারাজ বিশেষ যত্নসহকারেই এই বস্তুটি পরিহার করেছিলেন। কিন্তু সেদিন রসম মুখে দিয়েই মহারাজ বেশ জোরের সাথেই বললেন যে, ওতে পেঁয়াজ দেওয়া হয়েছে। সূর্য্য মহারাজ পেঁয়াজের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। কিন্তু মহারাজ বারবার ঐ একই কথা বললেন। সূষ্যি মহারাজ তখন ঐ রসম প্রস্তুতকরণের প্রতিটি পর্ব স্মরণ করলেন। তবে কি আশ্রমের পাচকঠাকুর নিজে থেকেই পেঁয়াজ দিয়েছে? না! তাহলে কি আনাজপাতি ভাজবার ঘি পেঁয়াজের সংস্পর্শে এসেছিল? তা-ও না! সবশেষে তিনি রসমে ব্যবহৃত ধনেপাতা কুচোবার জন্য যে ছুরিটি ব্যবহার করেছিলেন, সেটি পরীক্ষা করলেন। হ্যাঁ, সূর্য্য মহারাজ ব্যবহার করবার ঠিক পূর্বেই তাঁর অজ্ঞাতসারে সেটি দিয়ে পেঁয়াজ কাটা হয়েছিল।

মহারাজের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আমি দেখেছি যার উল্লেখ স্বামী প্রভবানন্দ তাঁর 'The Eternal Companion' গ্রন্থে করেছেন। সেটি হলো মহারাজের রঙ্গপ্রিয়তা ও কৌতুকবোধ। সারাটি দিন তিনি আমাদের প্রাণভরে হাসাতেন। সংবাদপত্রে 'বলশালী ব্যক্তি' নামক একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপনে ভয়ংকর মাংসপেশীযুক্ত একজন লোকের ছবি ছিল। সেই সঙ্গে এই কথাটি বলা হয়েছিল ঃ 'যদি আমার মতো হতে চাও…।' মহারাজ তাঁর পাচক অথবা সেবক ব্রহ্মচারীকে সেই পেশীবহুল মানুষটির মতো ভঙ্গিমায় দাঁড়াতে বলতেন এবং ঘোষণার সুরে বলতেন ঃ

'যদি আমার মতো হতে চাও'।"

মহারাজ স্বামী বরদানন্দের সঙ্গে শব্দের নানারকম খেলা খেলতে ভালবাসতেন। এই খেলাটিতে প্রথম ব্যক্তি এমন একটি শব্দ বা কথা ভাবতে চেষ্টা করবে যার সমছান্দিক একটি শব্দ প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে না পায়। মহারাজ হয়তো বললেন, 'গর্ব'। স্বামী বরদানন্দ ছন্দ মিলিয়ে কোন শব্দ ভেবে না বলতে পারলে তিনি সেবার হারবেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন 'খর্ব' তবে মহারাজকে আরো একটি সমছান্দিক শব্দ বলতে হবে। না পারলে তিনি হেরে যাবেন। একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ স্বামী বরদানন্দের সাথে দেড়ঘণ্টাকাল ধরে খেলতে থাকেন। স্বামী বরদানন্দ ছিলেন রান্নাঘরে এবং মহারাজ বারান্দায়। আমি ছিলাম মধ্যস্থতাকারী—অর্থাৎ শব্দগুলি নিয়ে যাওয়া-আসা করছিলাম। স্বামী বরদানন্দ শেষ অবধি ঐ খেলায় বিরক্ত হয়ে আমাকে দিয়ে মহারাজকে বলে পাঠালেনঃ "অনেক হয়েছে রাত্রি।" মহারাজ নিজের কদাচিৎ হারবার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখে দ্রুত উত্তরটি বলে পাঠালেন—"ওকে বলো তবে শুভ-রাত্রি!"

সত্যি বলতে কি, প্রায় সারাটি দিন ধরেই এই হাস্য-কৌতুক চলত। এভাবে যেন মহারাজ আমাদের অন্য সবরকম চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। আরতির পর যখন সান্ধ্য-উপাসনার সময় উপস্থিত হতো, সব কিছুই যেন পরিবর্তিত হয়ে যেত। মহারাজের তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ। তাঁর ঘরের বাতির আলো সব কমিয়ে দেওয়া হতো। তিনি যোগাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হতেন। এক সুগম্ভীর প্রশান্তি সমস্ত আশ্রমে পরিব্যাপ্ত হতো। এসময় তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার কালে সবাই অত্যন্ত সম্ভ্রমযুক্ত হয়ে থাকত। এমনকি স্বামী নির্মলানন্দও—যিনি দক্ষিণ ভারতে একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন, যিনি বহু কেন্দ্রের সংগঠক এবং একজন ক্ষমতাশালী প্রচারক এবং মহারাজের প্রায় সমবয়সী—তিনিও মহারাজের করুণাকোমল ব্যক্তিত্বের সম্মুখে একটি বালকের ন্যায় হয়ে যেতেন। আরতির পর কোনদিন ভজন গান হতো এবং মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দজীও তা শুনতেন।

মহারাজ ফুল খুব ভালবাসতেন এবং উদ্ভিদ্ ও পুষ্প-বিষয়ক অনেক তথ্য জানতেন। ভুবনেশ্বর আশ্রমে একটি চমৎকার উদ্যান গড়ে তুলবার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। তিনি আমাকে ব্যাঙ্গালোরের উদ্ভিদ্‌শালার (Nursery) কর্মচারীদের কাছ থেকে সবরকম বীজ সংগ্রহ করে ভুবনেশ্বর আশ্রমে রোপণ করবার জন্য সেখানে প্রেরণ করতে বলেন। আমি উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম এবং নানাজাতীয় পুষ্প ও বৃক্ষাদির ল্যাটিন নাম বলতে পারতাম। ব্যাঙ্গালোরে জনপ্রিয় একটি ছায়াঘন পুষ্পিত বৃক্ষ (Cythraxylon Subserratum) ছিল। সেটি ছিল মহারাজের বিশেষ প্রিয়। তিনি সুমিষ্ট মৃদু সৌরভের জন্য এর ফুল ভালবাসতেন। তিনি এর নামটিও পছন্দ করতেন কিন্তু সম্ভবতঃ তা মনে রাখতে পারতেন না। সুতরাং আমাকে প্রায়ই মহারাজের সম্মুখে এই গুরুগম্ভীর শব্দগুলি উচ্চারণ করতে হতো।

মহারাজ পালং ও অন্যান্য নানারকম শাক পছন্দ করতেন। একবার তিনি ব্যাঙ্গালোরে তরকারির বাজারে কত রকমের শাক পাওয়া যায় তা জানতে চান। আমি বললাম যে, আমি সঠিক জানি না, তবে অনেক রকমের থাকা উচিত। "বেশ",—মহারাজ বলে উঠলেন, "তুমি আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবে এবং আমরা যত রকমের শাক পাব কিনব।" কদিন পরেই মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, "আজ আমরা শাক কিনতে যাব।" মহারাজের সঙ্গে শুধু আমিই থাকব পথপ্রদর্শক হিসেবে—মহারাজ বললেন। কি মহাসৌভাগ্য আমার! আমরা প্রায় দু-মাইল দূরে অবস্থিত বাজারের দিকে পদব্রজে যাত্রা করলাম। তিনি সম্মুখে হাঁটছিলেন, পিছনে আমি। নানা দোকানে গিয়ে আমরা সবশুদ্ধ আট-দশ রকম শাক পেলাম। মহারাজ আমাকে এর প্রত্যেকটিই অল্প পরিমাণে কিনতে বললেন। যখন আমি সেই অনুযায়ী কিনতে ব্যস্ত, তিনি বাজারে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। কেনা শেষ হলে মহারাজকে আমি কোথাও দেখতে পেলাম না। ভিড়ে বাবাকে হারিয়ে ফেলা ছোট ছেলের মতোই আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলাম এবং সব জায়গায় ছুটোছুটি করে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। শেষে একটি মজুর আমাকে বলল যে, সে কিছুক্ষণ পূর্বে মহারাজকে বাজার

ছেড়ে আশ্রমের দিকে যেতে দেখেছে। ক্ষুণ্নহৃদয়ে ও সেই সঙ্গে এই আশঙ্কায় যে আমি তাঁর পথপ্রদর্শক হিসাবে কর্তব্যচ্যুত হয়েছি—আমি দ্রুত আশ্রমে ফিরে এলাম এবং এসেই সোজা মহারাজের ঘরে গেলাম। তিনি সেখানে বসেছিলেন। আমি তাঁকে হারিয়ে ফেলে কি ব্যাকুলভাবে খুঁজেছি, সেকথা বলতে মহারাজ হেসে শুধুমাত্র এটুকুই বললেন: "তুমি যে এমন করবে আমি তা ভেবেছিলাম।"

যদিও আমি রোজই মহারাজের দর্শনলাভ করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণে উদ্‌গ্রীব ছিলাম তবু আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করবার প্রার্থনা জানাতে দ্বিধাবোধ করতাম। আমার ধারণা ছিল যে, গুরু যোগ্য মনে করলে নিজেই তা বলবেন। আমার বেলায় বাস্তবিকই তাই ঘটেছিল। সুয্যি মহারাজ একদিন আমাকে বললেন, মহারাজ আমাকে ডেকেছেন। আমি তাঁর ঘরে গেলাম। দ্বিতীয় কেউই সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহারাজের পদপ্রান্তে বসলাম। তিনি আমাকে দীক্ষাদান করলেন এবং একটি জপের মালা দিলেন। মালাটি দেবার পূর্বে মহারাজ স্বয়ং কিছুক্ষণ তাতে জপ করে দেন।

আমাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেছেন বলে মহারাজের প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্লাবিত অন্তরে বিদায়গ্রহণকালে মহারাজের পদধূলি গ্রহণ করতে যাচ্ছি—জপের মালাটি আমার হাতে। "না, না,"—মহারাজ সতর্ক করে দিলেন, "জপের মালাটি মন্ত্রপূত। মালা যেন পদস্পর্শ না করে।"

এই প্রসঙ্গে মহারাজ তাঁর নিজের জপমালার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করতেন, তার উল্লেখ করছি। মহারাজ তাঁর মালাটি হাতে নেবার আগে হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর গঙ্গাজল স্পর্শ করতেন। তারপর অত্যন্ত ভক্তিসহকারে মালাটি তুলে নিতেন।

কিছুদিন পরে একদিন মহারাজ আশ্রমের প্রবীণতর ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং আমাকে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য দান করেন। যদিও তখন আমি মাত্র দশ কি এগার মাসের একজন নবাগত শিক্ষার্থী। কৌপীনটি মহারাজ নিজ-হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন।

এর অল্প কিছুকাল পরই মহারাজ ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করেন। তিনটি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। যেন আনন্দোচ্ছল তিনটি দিন। মাদ্রাজে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে মহারাজ উপস্থিত থাকবেন। অবশেষে বিদায়ের সেই নির্মম মুহূর্তটি এল। মহারাজ এবং মহাপুরুষ মহারাজ মন্দিরে গিয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। তাঁরা চলে গেলেন। সব যেন শূন্য হয়ে গেল।

১০ এপ্রিল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ মহাপ্রয়াণ করেন। শুনেছি অন্তিমকালে তিনি অমৃতসাগরের মাঝখানে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন; এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চিরসাথীরূপে দেখে তাঁর নূপুরটি তাঁকে দিতে বলেছিলেন, যেন তিনি গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতে পারেন।

আমি বেদ-পুরাণাদি ও কিছু দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু বারে বারেই আমি শাস্ত্রগ্রন্থাদির জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ মহারাজের কাছেই ফিরে এসেছি। যখনই আমি আমার চশমাটি তুলে নিই অথবা ব্যবহার করবার পূর্বে তা পরিষ্কার করি, তাঁর শিক্ষা আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। তাঁর দেওয়া জপমালাটি আমার কাছে তাঁর ও তাঁর প্রভুর শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতীকস্বরূপ। শুধুমাত্র একটি মহান আত্মাই অপরের জীবনকে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্তিত করতে সক্ষম। মহারাজের অসামান্য ব্যক্তিত্বের সেই কয়েকমাসের সান্নিধ্যলাভ আমাকে এমনভাবে পুষ্ট করেছে, জীবনীশক্তি দিয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বলা হয়ে থাকে যে, যখন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় তখন তার স্মৃতির প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে অবশেষে মিলিয়ে যায়। কিন্তু যখন মহাপুরুষেরা দেহত্যাগ করেন, কালের ব্যবধান বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের প্রভাব হয় গভীরতর। মহারাজের সান্নিধ্যে বাস করবার পর আজ চুয়াল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে; গভীর থেকে গভীরতররূপে তাঁর অসাধারণ ও অতুলনীয় ভালবাসার স্মৃতি আনন্দের জোয়ারের মতোই আমার কাছে ফিরে ফিরে আসছে।

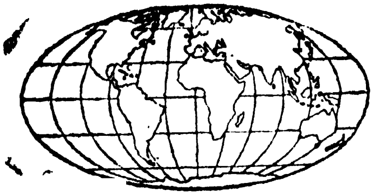

বাতায়ন

মাদকাসক্তি ও ইটালি

ইটালি দেশের স্কুল-ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের বা পুলিশের গন্ধশোঁকা কুকুরের কাছে পরীক্ষার জন্য তাদের স্কুলব্যাগ তুলে দিতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। সে দেশের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রনালয়ের এই ধরনের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেখানকার ড্রাগ বা মাদকদ্রব্য-সমস্যা কত প্রবল আকার ধারণ করেছে। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথম নয় মাসে হেরোইন (heroin) নামক মাদক বেশিমাত্রায় ব্যবহার করার জন্য ৫০০ লোক মারা গেছে; এই সংখ্যা, পুরো ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের মৃত্যু সংখ্যার চেয়েও বেশি।

কত ড্রাগ ধরা পড়েছে, তা থেকে ড্রাগ-সমস্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের হেরোইন ধরা পড়েছিল ৩২৫ কিলোগ্রাম; ১৯৮৮ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ধরা পড়েছে ৪০০ কিলোগ্রাম। কোকেন ব্যবহার, যা কেবল বিত্তশালীদের নাগালের মধ্যে ছিল, তা ১৯৮৮-তে ধরা পড়েছে ২৩৬ কিলোঃ, ১৯৮৮র সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এর পরিমাণ ৫০০ কিলোঃ ছাড়িয়ে গেছে।

ব্যবসাপ্রসারকারী (Pushers) ও যারা এর শিকার হচ্ছে—তাদের মধ্যে কমবয়সীদের দিন দিন বেশি সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে। স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধানের ফলে পুলিশের এই ধরনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হচ্ছে। রোমে একদিনের অনুসন্ধানের ফলে ১১ জন ব্যবসাপ্রসারকারীকে গ্রেপ্তার করে তাদের কাছ হতে ১০০ গ্রাম কোকেন ও ১০০ গ্রাম হেরোইন পাওয়া গেছে। ধরপাকড় করা সম্বন্ধে দেশের মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীদের হুঁসিয়ারি করে দেওয়া সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর মাসে স্কুল খোলার দিনে ইটালিতে স্কুলগেটের আশে পাশে মাদকদ্রব্য চালান করার ব্যাপারে ১১৩ জন ধরা পড়েছে।

ড্রাগ ব্যবহারকারীরা এইড্‌স (AIDS) রোগ প্রসারেও সাহায্য করছে। ২২৩৩ জন এইড্‌স রোগী নিয়ে ইটালি ইউরোপে এখন এই রোগ ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে; প্রথম হচ্ছে ফ্রান্স। বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থার মতে ইটালিতে এইড্‌স রোগীদের দুই-তৃতীয়াংশ আগে হেরোইন ব্যবহার করেছে অথবা এখনও করে। মিলান-এর মেয়রের মতে, সেখানকার টাউন কাউন্সিল শহরের রাস্তায় বা পার্কে প্রতিদিন ৩০০০—৪০০০ ব্যবহৃত সিরিঞ্জ কুড়োয়। আতঙ্কিত পিতামাতার কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে রোমে সিরিঞ্জ কুড়োনো শুরু হয়েছে, এবং এরই মধ্যে চার লক্ষ ব্যবহৃত ইনজেকশনের সুচ কুড়োনো হয়েছে, যার বেশির ভাগ পাওয়া গেছে পার্কে এবং স্কুল প্রাঙ্গণে।

ড্রাগকৃত বিধ্বংসের ব্যাপারে 'সিসিলিয়ান মাফিয়া'র (Sicilian Mafia) নাম করা হয়। এটি সারা পৃথিবীর ড্রাগ তৈরি ও ড্রাগ চালানকারবারীদের একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, এবং সারা ইটালিতে এর শাখা-প্রশাখা আছে। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইটালির প্রেসিডেণ্ট দেশবাসীকে বলেছেন যে, মাফিয়ারা সারা ইটালির এবং সকল ইটালিবাসীর সমস্যা। ইটালি সরকার এই ব্যাপারে আইন কানুন আরও কড়া করতে চায়। নূতন আইনগুলির একটি হচ্ছে—স্কুলের আশে পাশে ড্রাগ চালানকারীদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে।

[The Economist, 22-28 October, 1988, p. 54]

প্রবন্ধ

ছন্দ, সঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক জীবন

স্বামী সর্বগানন্দ

মাণ্ডূক্য উপনিষদের কবিত্বপূর্ণ সূচনা এইভাবেঃ "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্" বলে। ইদং সর্বং ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্। অর্থাৎ 'ইদং সর্বং' বলে যে নাম-রূপাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নির্দেশ করা হচ্ছে, তা 'ওম্' এই অক্ষরাত্মক। সহজ ভাষায় ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই ওঙ্কার থেকে সৃষ্ট ; এই তিন কালের অতীত যা আছে তাও ওঙ্কারই। বেদসমূহের প্রধান বা সাররূপে প্রাদুর্ভূত এই অমৃতস্বরূপ ওঙ্কারই সমস্ত শব্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি সেই কথাই সুললিত ছন্দে তুলে ধরেছেনঃ "যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সংবভূব।" অন্বয় করলে দাঁড়ায়—ছন্দসাম্ ঋষভো যঃ বিশ্বরূপঃ অমৃতাৎ ছন্দোভ্যঃ অধিসম্বভূব। এখানে ছন্দ হল বেদ। দেবতাগণ পুরাকালে যে যজ্ঞ করেছিলেন, তার বর্ণনা পাই ঋগ্বেদে। 'পুরুষ-সূক্ত'-এ এই যজ্ঞ-বর্ণনা কালে ঋষির কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল--"ছন্দাগংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ।" সেই যজ্ঞ হতে গায়ত্র্যাদি ছন্দসকল (যা বেদে আছে) উদ্ভূত হল। 'বেদপুরুষে'র যে বর্ণনা স্মৃতিকার রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্বম্' গ্রন্থে দিয়েছেন, সেখানে ছন্দকে 'বেদপুরুষে'র পদদ্বয় (গমন সংক্রান্ত) বলেছেন তিনি।

> ছন্দপাদৌ চ বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ কথ্যতে।
> জ্যোতিষাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
> শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
> তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে

অর্থাৎ বেদের ছয়টি অঙ্গ (বেদাঙ্গ) হল, ছন্দ (পদদ্বয়), কল্প (হস্তদ্বয়,) জ্যোতিষ (নেত্র) শিক্ষা (ঘ্রাণ বা নাসিকা), নিরুক্ত (শ্রোত্র) এবং ব্যাকরণ (মুখ)। গম্ ধাতু থেকেই জগৎ শব্দটিরও উৎপত্তি। অতএব বেদের অন্তর্গত এবং বেদপুরুষের পাদদ্বয়স্বরূপ গায়ত্র্যাদি বিভিন্ন ছন্দের সারভূত পবিত্রতম শব্দ এই ওঙ্কারই জগতের কারণস্বরূপ।

শাস্ত্রের এই বক্তব্য যুক্তি ও অনুভূতির দ্বারা পরিপুষ্ট হলে স্বতঃই এক মহান সত্য উদ্ঘাটিত হয়। ছন্দোবদ্ধতাই জীবনের লক্ষণ। বিশ্বপিতার এই মহান সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে কেবলই নানান ছন্দের প্রকাশ, যেন নটরাজের নৃত্যের তালে তাল মিলিয়ে চলেছে সমুদয় সৃষ্টি। ছন্দ জীবনকে সদাসর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে বলেই ছন্দের অভাব বা ছন্দপতনে আসে দুঃখ। ছন্দ্ ধাতু (আনন্দ দান করা অর্থে) থেকে ছন্দ শব্দ নিষ্পন্ন। অর্থাৎ আনন্দই ছন্দের উপাদান। এই আনন্দ জীবনের পাথেয়স্বরূপ ; কেবল মানুষেরই নয়, প্রাণিকুলেরও। আনন্দ তিন প্রকার, বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ। রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে এই ধরিত্রীকে আস্বাদন করতে মানুষ ও মানুষেতর সকল প্রাণীই সদা আগ্রহী। আনন্দলাভই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু বলাবাহুল্য—তা বিষয়ানন্দ। তার ঊর্ধ্বে ভজনানন্দ। শেষ ধাপ ব্রহ্মানন্দ। সমস্ত প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনা এই আনন্দানুসন্ধান বই তো নয় ; ভূমানন্দে বিষয়ানন্দের পর্যবসান, অসীমের লীলাঙ্গনে যাবতীয় সঙ্কীর্ণতার নিঃশেষে উৎসর্জন, অথবা পঙ্কিল জাগতিকতার মধ্য দিয়ে দিব্য অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ—যা-ই বলা হোক না কেন।

শব্দকে বলা হয়েছে নাদব্রহ্ম। স্বামীজী শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "বেদে শব্দরাশির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি হইল শাশ্বত শব্দরাশি যাহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তার অভিব্যক্তি হয় না।...যে শব্দরাশি দ্বারা অব্যক্ত চিন্তা ব্যক্ত হয় তাহাই বেদ। ...একটি শব্দই বেদ যদি আমি ঠিকভাবে তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। ঠিকভাবে উচ্চারিত

হইলে তৎক্ষণাৎ উহা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে। … কল্পান্তে এইসব শক্তির প্রকাশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রথমে কেবল শব্দে ও পরে চিন্তায় লীন হইয়া যায়। পরবর্তী কল্পে চিন্তা প্রথমে শব্দরাশিতে ব্যক্ত হয় ও পরে শব্দগুলি হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে।”[২]

খুব স্থূলভাবে চিন্তা করলেও শব্দ আমাদের নিয়ন্ত্রিত করছে। ভাষায়, গানে, ছন্দে, সুরে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনটা বাঁধা, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছন্দে ভরা এই পৃথিবী, তা সে সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব ছন্দই হোক বা মানুষের গড়া ছন্দই হোক। ধরা যাক ষট্‌বিকারের কথা। শাস্ত্রে আছে বলেই নয়, আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করি যে, প্রাণিমাত্রই এই ষট্‌বিকাররূপ ছন্দে ছন্দিত—(১) জায়তে (২) অস্তি (৩) বর্ধতে (৪) বিপরিণমতে (৫) অপক্ষীয়তে (৬) নশ্যতি (প্রাণীর জন্ম হয়, বাঁচে, বেড়ে ওঠে, পরিণতি লাভ করে, ক্রমশঃ জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে অবশেষে মৃত্যু হয় তার)। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও একই ছন্দে চলেছে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সকলের ইতিহাস এই ছন্দেরই ইতিহাস। মহাকাশে কোন এক নক্ষত্রের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, পরিণতি লাভ করে, জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসে, সঙ্কুচিত হতে হতে শেষে তার মৃত্যু হয়। এই জন্ম-মৃত্যু চক্র চলতে থাকে অনন্তকাল ধরে। আমাদের সূর্য তার যুবাবস্থা অতিক্রম করে এখন প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলেছে। কমপক্ষে আরও পাঁচশ কোটি বছর তার আয়ু। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজ এই ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টিতত্ত্ব মেনে চলেন সেই 'Big Bang'তত্ত্ব যেমন একদিকে বস্তুজগতের ক্রমবিকাশ (বা ক্রমবর্ধন) ও ক্রমসঙ্কোচের কথা শোনায়, ওদিকে ঔপনিষদিক যুগে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে একই কথা উচ্চারিত হয়েছিল—“সূর্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ” (অঘমর্ষণসূক্ত, ঋগ্বেদ) কোথাও বা “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ” (মুণ্ডক, ১।১।৭)। প্রলয়ের সময়ে বীজাকারে সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায় যা কিনা সৃষ্টির প্রারম্ভে পূর্বসৃষ্টির নির্দিষ্ট ক্রমানুসারেই বিকাশলাভ করে থাকে। এই সৃষ্টিতে তাই একটা ছন্দ আছে। আর সৃষ্টির পিছনে পরমরসিক এক বিরাট চেতন-পুরুষও বিদ্যমান। যেমন বিরাটের মধ্যে একটি ছন্দ বা সুনির্দিষ্ট স্পন্দন অনুভূত হয়, তেমনি ছন্দ আছে পারমাণবিক স্তরেও। ইংরেজীতে বললে, Macrocosmic rhythms যেমন আছে, তেমনি আছে Microcosmic rhythm। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং আরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যেসব কণা (যেমন—মেসন, কোটন, নিউট্রিনো ইত্যাদি) সকলেই একটা শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে চলেছে বা বলা যায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। একদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের অভিনব প্রযুক্তি-কৌশল শত শত মহাজাগতিক ছন্দের সংবাদ বহন করে আনছে কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানের মাধ্যমে, অন্যদিকে অত্যদ্ভুত আপেক্ষিক-তত্ত্ব অথবা কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, পারমাণবিক স্তরেও এক নিখুঁত ছন্দ বস্তুজগতকে অধিকার করে রয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ছান্দসিক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ পাই যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেনঃ “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠান্ত ইত্যাদি। অর্থাৎ এই 'অক্ষর' পুরুষের প্রশাসনে সূর্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, ভূলোক, নিমেষ, মুহূর্ত, দিবারাত্র, মাস, ঋতু, সংবৎসর ইত্যাদি সব শৃঙ্খলাবদ্ধ (ছন্দোবদ্ধ) হয়ে কাজ করে চলেছে, … ইত্যাদি। আর এই কারণেই একজন নিয়ামকের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। “তস্মাৎ সিদ্ধম্ অস্য অস্তিত্বম্ অক্ষরস্য।” কেমন সেই অক্ষর পুরুষ? চেতনাবন্তম্ প্রশাসিতারম্ অসংসারিণম্ …… ।” অর্থাৎ চেতনাময় অসংসারি সেই পুরুষ। ইত্যাদি। (বৃহঃ উপঃ ৩।৮।৯, শাঙ্করভাষ্য)

---

[১] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪১৮

আমরা নিজের দিকে তাকালেও এক বিশেষ ছন্দ অনুভব করি। দিন আসে রাত চলে যায়, আবার দিন যায় রাত আসে আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনও কেমন সেই ছন্দে ছন্দে চলছে! বিশ্বচরাচরে এই ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের অপূর্ব ধারাবাহিকতা আমাদের মধ্যে রয়েছে জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তিতে। ভোগের শান্তিতে ত্যাগ, প্রবল কর্মোন্মাদনার পরেই কেমন একটা ধ্যানমগ্নতা যেমন আসে, আবার নিষ্কর্ম অবস্থার পর্যবসান কর্মের প্রাবল্যে। সুখ ও দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া আমাদের অজান্তেই হৃৎস্পন্দনে সুনির্দিষ্ট ছন্দোপ্রাপ্ত হয়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস যদি নিয়মিত করা যায় অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ হয়, তা অধ্যাত্ম অনুভূতির এক বিশিষ্ট সোপানস্বরূপ হয়—তা পতঞ্জলি আলোচনা করেছেন। মনুষ্যকুল, প্রাণিকুল, জলচর, স্থলচর, খেচর, উদ্ভিদ্‌জগৎ ইত্যাদি সৃষ্টির যাবতীয় উপকরণ প্রত্যেকেই একটা স্বনির্বাচিত ছন্দ অনুসরণ করে চলে।

ইতিহাসেরও একটা ছন্দ আছে। মানবজাতির ইতিহাসই বলি বা সাহিত্যকলার ইতিহাস বলি বা ধর্মের ইতিহাসের কথাই বলি, সর্বত্র তা ছন্দের ইতিহাস। উত্থান, পতন, আবার উত্থান আবার পতন। যখন শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল (গীতা ৪।৭, ৮)ঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

তখনও তিনি এই ছন্দেরই দ্যোতনা করেছিলেন। 'My Master' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ 'Whenever this world of ours, on account of growth, on account of added circumstances, requires a new adjustment, a wave of power comes; and as a man is acting on two planes, the spiritual and the material, waves of adjustment come on both planes.' পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যাবে এই 'wave of adjustment' আসে বিশেষ এক ছন্দে। পৃথিবীতে যখন যখন অবতারপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তত্তৎকালে সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় পরিস্থিতির সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় এবং কালের ব্যবধানও মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে হয়ে থাকে।

মোট কথা, ভগবানের সৃষ্টিতে এই ছন্দের একটা নৈসর্গিকতা আছে। আর মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই ছন্দ নিজের জীবনে অনুভব ও বিকাশ করে চলেছে তার সাহিত্যে, তার শিল্পে, তার জীবিকার্জনের নিত্যনৈমিত্তিকতায়। সঙ্গীতশিল্পী কখনো কখনো একটি ছন্দ থেকে অন্য ছন্দে গতায়াত করেন বিনোদন-বৈচিত্র্য ব্যপদেশে। জীবনছন্দের পরিবর্তন বৈচিত্র্য-সুখ প্রদান করলেও যখনই এই ছন্দকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে, জীবনবীণায় বেসুর বেজে উঠেছে হয়তো বা বিয়োগান্তক ব্যঞ্জনায়। বুদ্ধিমান মানুষ তাই ছন্দে জেগে থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে এই ছন্দ অপরিহার্য। অত্যন্ত সাধারণ বা প্রাকৃত বুদ্ধিতে যদি ছন্দকে discipline বলি তাহলে প্রত্যক্ষতঃ এই ছন্দ দিয়েই আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু। আর ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও আজ আমাদের চোখের সামনে ছন্দের আকারেই উদ্ভাসিত হয়ে আছে। যে সংস্কৃতকে পাগলের প্রলাপ বলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেকলে প্রমুখ ইংরেজ শিক্ষাবিদেরা ব্যাখ্যা করে ইংরেজীভাষাকেই ভারতে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন, আশার কথা সেই সংস্কৃত সাহিত্যের মনোহারী ছান্দস রূপ এখন নাকি বিশ্বসাহিত্য দরবারে ক্রমশই উচ্চাধিকার লাভ করে চলেছে। উপনিষদের ঋষি যখন আহ্বান জানাচ্ছেনঃ

শৃণ্বন্তু বিশ্বেহমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়।।
(শ্বেতাশ্বতর, ২।৫, ৩।৮)

—অমৃতের পুত্র যাঁরা দিব্যধামে অবস্থিত আছেন, তাঁরা শ্রবণ করুণ ; স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত সেই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জেনেছি। তাঁকে জানলেই (মানুষ) মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে ; কারণ পরমার্থ লাভের অন্য কোন উপায় নেই। অথবা যখন অনুভূতিকে মূর্তরূপ প্রদান করেছেন ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।
(কঠ, ২।২।১৫)

—সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করেন না, এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করে না ; এই অগ্নি কি করে তা করবে। তিনি প্রকাশমান বলেই সমস্ত বস্তু দীপ্তিমান ; তাঁর দীপ্তিতে সমুদয় প্রকাশিত।

অথবা চোখ মেলে যখন দেখেছেন সবই ঈশ্বর ঃ

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি
বিশ্বতোমুখঃ।।
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।৩)

—তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী ; তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ডসহায়ে স্খলিতপদে চল এবং তুমিই জাত হয়ে নানারূপ ধারণ কর।

তখন সেই অনুভবের অভিব্যক্তি শব্দারূঢ় হয়ে সৃষ্টি করেছে অসামান্য সাহিত্য। সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা। হৃদয়ের গভীরের অস্ফুট, অব্যক্ত ভাবগুলিকে সুললিত ছন্দে উৎসারিত করার অনন্যসাধারণ শক্তিধারিণী এই ভাষা। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগে রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতে নব নব রস-সৃজনে তথা অনাবিল ছন্দের আকারে ভক্তিরস বিতরিত হয়েছিল এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। সাধকের পক্ষে সেগুলি বড়ই আদরণীয় সম্পদ। একদা দক্ষিণেশ্বরে শিবমন্দিরের সোপানে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পুষ্পদন্ত বিরচিত শিবমহিম্নঃস্তোত্র পাঠ করতে করতে যখন বললেন ঃ

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।

—নীল পর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসিপাত্র হয়, পারিজাত বৃক্ষ যদি হয় কলম, পৃথিবী যদি লেখার পত্র হয় আর সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে লিখতে থাকেন, তথাপি, হে ঈশ্বর, তোমার গুণসমূহের ইয়ত্তা করা যাবে না।

তাঁর চক্ষু বাষ্পবারি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, হৃদয়ের আবেগে ক্রমশঃ তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন, অবশেষে 'হে মহেশ্বর—তোমার মহিমা কীর্তন আমি কি করে করব' বলে চিৎকার করে ক্রন্দন করতে লাগলেন, রাসমণির মন্দিরের পুরবাসীরা ছুটে এল। গীতায় দেখতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অর্জুনকে অভয়দান করে বলছেন ঃ

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥
… ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
(গীতা, ১১।৪৮, ৫৪)

—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যলোকে চতুর্বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞবিজ্ঞান বা দান বা ক্রিয়া বা তপস্যার দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ কেউ দেখেনি। তুমিই একমাত্র এই রূপ দর্শন করলে। হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানতে ও স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে ভক্তগণ সমর্থ হয়।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে রসসৃষ্টিতে যে গভীরতা চোখে পড়ে তা যে তার অনবদ্য ছন্দের

দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করেছে সেকথা বলা বাহুল্য। সংস্কৃত সাহিত্য বরাবর অভিব্যক্তির ব্যাপারে গদ্য অপেক্ষা কাব্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। টীকা, ভাষ্য, শব্দার্থ এমনকি কথোপকথনও ছন্দের আকারে বিধৃত রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। গদ্যসাহিত্য ছিল না—তা নয়। কৃষ্ণযজুর্বেদে গদ্যাকারে অনেক কথাই লেখা আছে। মহাভারতে গদ্য অংশ দেখা যায়। তবে প্রাচীনতম উচ্চমানের গদ্য পরিলক্ষিত হয় পাণিনির ব্যাকরণের পাতঞ্জল মহাভাষ্যে এবং শংকরাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও উপনিষদ্‌ভাষ্য সমূহে।

ভক্তিরস পরিবেশনের ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ কাব্যেরই আশ্রয় নিয়েছেন আমাদের আচার্য ও সাধকগণ। শংকরও তার ব্যতিক্রম নন। শংকরাচার্যের পরবর্তী কালেও বহু সাধকেরা হৃদয় মন্থন করে যে ভাষা উৎসারিত হয়েছে, সংস্কৃত ভাষাই হোক বা আঞ্চলিক ভাষাই হোক, দেখতে পাই প্রায় সবই কাব্যাকারে, সুন্দর ছন্দে রচিত। কেবল হিন্দু সাধকই নন, মুসলমান সুফি, জৈন, বৌদ্ধ এমনকি খ্রীস্টান সাধকরাও কবিতাকারে শ্রীভগবানের চরণপদ্মে তাঁদের আর্তি নিবেদন করেছেন।

কারণ ছন্দের মধ্য দিয়েই অনেক অনেক কথা, অসীম আবেগ পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। আবার তার সঙ্গে সুরের কিঞ্চিৎ মূর্ছনা তার ব্যাপ্তিকে, তার আধারত্বকে অনন্তত্ব দান করে। মানুষের মুখে আছে ছন্দোবদ্ধ ভাষা যা তার ভাবকে ব্যক্ত করতে পারে। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর তো তা নেই। তারা তাই তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে সুরে সুরে, স্বরে-স্বরে। সেইজন্য ভাষার সঙ্গে সুর সংযুক্ত হলে যে সঙ্গীত সৃষ্টি হয়, ভাব বহন করার ক্ষমতা তার অসামান্য। আর এই স্বাভাবিক কারণেই সাধক-জীবনে সঙ্গীতের দুর্নিবার প্রাদুর্ভাব। অমৃতনিষ্যন্দিনী গীতিধারা, সাহিত্যে, শিল্পে, কর্মে, জীবনের প্রত্যেক গতির মধ্যে তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে অনিবার্যভাবেই। স্তোত্রাদি এবং সঙ্গীত যত সহজে মানুষকে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে নিয়ে যেতে পারে, অন্য কিছুতে তা পারে না। মনের যাবতীয় ক্লান্তি, বিষাদ, শিথিলতা নিমেষে দূর করে গান মনের মধ্যে তৃপ্তি, নবোদ্যম আর আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করে থাকে। গানের মধ্য দিয়ে 'গানের ওপারে'র পুরুষকে স্পর্শ করেছে মানুষ, ভারতবর্ষে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে একথা। আমরা শার্ঙ্গদেব, জয়দেব কবি, ত্যাগরাজ, মীরাবাঈ, সুরদাস, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ সাধকের জীবনে প্রত্যক্ষ করি সেকথা। ইদানীং কালে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণজীবন সঙ্গীতময়। সঙ্গীতে পূর্ণতা এবং সিদ্ধি দুই-ই তাঁর করায়ত্ত ছিল। তাঁর স্বরের যথার্থ নিখুঁত প্রয়োগকৌশল শ্রোতার মনকে এক দিব্য অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যেত। অপরপক্ষে তিনিও সামান্য বেসুর, বেতাল, বেলয় সহ্য করতে পারতেন না।

সঙ্গীতের (কণ্ঠ-সঙ্গীতের) বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। প্রধানতঃ তিনটি ভাগে সঙ্গীতকে বিভক্ত করা যায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভজন-কীর্তন বা সুগম-সঙ্গীত এবং দেশী-সঙ্গীত বা লোকগীতি। তিনটিরই আবার নানা প্রকারভেদ আছে। কণ্ঠ-সঙ্গীত শাস্ত্রীয় নিয়মে দু-প্রকার হতে পারে—অনিবন্ধ ও নিবন্ধ সঙ্গীত। অনিবন্ধ ও নিবন্ধ সঙ্গীত কাকে বলে তার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা গেলেও সহজভাবে আমরা তালহীন এবং তালবন্ধ গানের কথা ভেবে নিতে পারি। গানের বিভিন্ন ছন্দ-অনুসারে (অবশ্য কখনো কখনো কোন নিয়ম না মেনেও) বিভিন্ন তাল সঙ্গত করা হয়। চৌতাল, ধামার, ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, ঝুমরা, তেওড়া, দীপচন্দী ইত্যাদি বিভিন্ন তাল আছে। আবার হালকা গানের উপযুক্ত দাদ্‌রা, কাহারবা, আড়খেমটা, কাওয়ালী, লোফা ইত্যাদির বোলও আছে। মৃদঙ্গ বা তবলায় যখন কোন বোল বাজান হয়, মনে হয় ছন্দ-পিঞ্জরে শিল্পী যেন অসীম সময়টাকে বেঁধে ফেলতে চাইছে। বেশির ভাগ মানুষ নিবন্ধ সঙ্গীত (তালবন্ধ গান) শুনতে ভালবাসে। লবণ ব্যতীত ব্যঞ্জন যেমন বিস্বাদ বোধ হয়, তেমনি সঙ্গত ব্যতীত গান। অবশ্য সিদ্ধ শিল্পী তাঁর সাধন-লব্ধ সুরসৌকর্যে তা পুষিয়ে দেন।

অন্যদিকে সংস্কৃতেও নানা প্রকার ছন্দ আছে। পিঙ্গল তাঁর রচিত গ্রন্থে যে ছন্দ-সূত্রের অবতারণা করেছেন তাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্র বলে কথিত। (ছন্দ শেখার সঙ্গে সঙ্গে আবার বীজগণিতও শেখা যায়!) বেদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক, তূণক, প্রহর্ষিণী, বসন্ততিলক, মালিনী, শার্দূল-বিক্রীড়িত, শিখরিণী, স্রগ্‌ধরা, মন্দাক্রান্তা, অনুষ্টুভ্, গায়ত্রী প্রভৃতি বহু ছন্দের উল্লেখ আছে ছন্দঃশাস্ত্রে। কেদারভট্ট রচিত 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থে একশো ছত্রিশটি ছন্দ আলোচিত হয়েছে। পৃথিবীর সমুদয় ভাষাগুলির মধ্যে, সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যোৎকর্ষ এই কারণেই সর্বাধিক। বস্তুতঃ সঙ্গীতের তালবিজ্ঞান এই প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্রোদ্ভূত। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন তাহলে পাশ্চাত্য তালবিজ্ঞানের উৎস কি? উত্তরঃ মনুষের সহজাত ছন্দবোধ। এমনকি পশুপক্ষীরও একটি সহজাত ছন্দবোধ রয়েছে। ময়ূরের নাচ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, কোকিলের কুহুধ্বনি অথবা শুশুকের জলকেলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও অজস্র নমুনা সুলভ। মানুষের এই সহজাত ছন্দকে গণিতের ছকে ফেললে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) দুই-দুই ছন্দ (খ) তিন-তিন ছন্দ (গ) দুই-তিন ছন্দ। ভালভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে এই তিন প্রকার ছন্দই সংপৃক্ত হয়ে আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি কিন্তু এছাড়াও বহুপ্রকার জটিল তাল বা ছন্দের মাল্যচন্দনে ভূষিত হয়ে আছে। কোথাও বা সেসব বুদ্ধিপূর্বক সৃষ্টি করা হয়েছে, কোথাও বা সেই জ্ঞানের উৎস আগম বা শাস্ত্র। মৃদঙ্গী বা তবলিয়া যেমন একটি তালকে মূল ছন্দ হিসাবে রেখে তার ওপর বিভিন্ন লয়কারীতে টুকরো বা অলঙ্কার প্রয়োগ করে থাকেন, তেমনি সঙ্গীতে বা কাব্যে বা সংস্কৃত স্তোত্রাদিতেও দেখা যায়। তবে সর্বত্র স্তোত্র বা গানের ভাবের ওপরই জোর দেওয়া হয়ে থাকে। ভাবের অনুকূল তাল বা ছন্দ গানে ব্যবহৃত হলে উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়ে দেয়। এই ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের গানে। তিনি যেখানে যে-ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তাঁর কবিতার ছন্দ বা গানের তালও তদনুরূপে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্ভুলভাবে নির্বাচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধি খাটিয়ে তাল বা ছন্দ নির্বাচন করতেন বলে মনে হয় না। তাঁর প্রতিভাজাত এক স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল এ-ব্যাপারে।

সঙ্গীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেনঃ "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।" গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমাহারকেই সঙ্গীত বলা হয়। যদিও ইদানীংকালে নৃত্যের ভূমিকা বহুলাংশে খর্ব হয়েছে। যাই হোক, ইসলামী আমলে গানের কথা ও ভাবের চেয়ে সুরের ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হতো। ভাব-গাম্ভীর্যের ব্যাপারে গানের বন্দেশকার যে সচেতন থাকতেন না তা নয়। প্রত্যুতঃ গান পরিবেশনকালে গায়করা স্ব স্ব প্রবণতা অনুযায়ী সঙ্গীতকে সুরপ্রধান করে তুলতেন। এখনও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনকালে বাণী বা রচয়িতার মনোগত ভাব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। (শুনেছি ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ দু-একজন গানের বন্দেশগত ভাব ফুটিয়ে তুলতেন অনবদ্য সুর-মূর্ছনা এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা।) কিন্তু পরবর্তী কালে মীরাবাঈ, তুলসীদাস, সুরদাস, জাফর আলি, জয়দেব প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রয়াসে ক্রমশঃ গানের কথার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে শিখেছিল শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েই। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুই আত্মত্যাগী সঙ্গীত-সাধক পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর এবং পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের অবদান এ-ব্যাপারে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এদেশে মার্গ-সঙ্গীত মূলতঃ ছিল মুসলমানদের দখলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্ম-আন্দোলন এই সঙ্গীতকে হিন্দু ডৌলে আনার পটভূমি রচনা করেছিল। কথার ওপর সুরের সমতুল গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা হিন্দু সুর-সাধকদের মধ্যেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। মার্গ সঙ্গীত ছাড়া অন্য গানও জনসাধারণে বহুল প্রচলিত ছিল, বলা

বাহুল্য। লোকগীতির চল বহু পূর্ব থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপকাকারে ছিল যার মধ্যে কথার কাজ ছিল বেশি। লোকগীতিতে কথার কাজ বেশি থাকলেও, সেসব কথার কিছু ছিল দেহতত্ত্ব নিয়ে এবং তার বৃহত্তর অংশটাই দৈনন্দিন সামাজিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তাই ঐ সমস্ত সংগীত পর্যালোচনা করলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমকালীন সমাজের এক নিখুঁত চিত্র ধরা পড়ে। কীর্তন, টপ্পা, ভক্তিগীতি, রামপ্রসাদী প্রভৃতির চল ছিল বঙ্গদেশে এবং সেগুলি ভক্তিমার্গাবলম্বী মানুষের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিল। দেশী সংগীতের তুলনায় এই ধরনের গান অবশ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের নিকটবর্তী। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গীতিধারাও ক্রমে ক্রমে একটি স্বতন্ত্র স্থান দখল করে নিয়েছিল ভারতের পূর্বতন রাজধানী তথা সংস্কৃতিকেন্দ্র াতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। প্রাক্-স্বাধীনতার সংগীতে অন্য একপ্রকার বলিষ্ঠ সংগীতের প্রভাব পড়েছে। তা হল স্বদেশী সংগীত। সব কটি সংগীতধারাই (উচ্চাঙ্গ সংগীত ব্যতিরেকে) ছিল বাক্‌প্রধান। তার মধ্যে আবার সুরের সঙ্গে কথার সংপৃক্তি খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের গানেতেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সুরারোপশৈলীর কাঠামোগত অবলম্বন ছিল পূর্বোল্লিখিত ব্রাহ্ম-সামাজিক স্বতন্ত্র গীতিধারা, যার ওপর তিনি কখনো কীর্তন, কখনো বাউল, কখনো টপ্পা বা বিশুদ্ধ মার্গসংগীতের রঙ চড়িয়েছেন। আর ধর্মীয় ব্যাপারেই তাঁর রচনাকে আবদ্ধ না রেখে প্রেম বা প্রকৃতি পর্যায়ের গানও রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো বা পাশ্চাত্য ঢঙে সুরসংযোজনা তাঁর গানে বৈচিত্র্য এনেছিল। বস্তুতঃ যখন এই শতাব্দীর মধ্যভাগে, বিশেষ করে স্বাধীনতালাভের পর পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব ভারতের পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে বিস্তারলাভ করেছিল, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গানের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই বর্তমান আধুনিক গানের জন্মসূত্র। নতুবা প্রেমসম্পর্কিত বন্দেশ সাধারণ মানের—দেশী সংগীতে পরিলক্ষিত হলেও, শিক্ষিত সমাজে তা এখনকার মতো অধিকারলাভ করেনি, বরং ভক্তিরসাশ্রয়ী ভজন, কীর্তন ইত্যাদিই শিক্ষিত মানুষের কাছে সমাদৃত হতো। বলা যায় এই ভজন, কীর্তন, টপ্পা ইত্যাদি গানগুলি যেন সাধারণ মানুষের দ্বারা গীত লোকসংগীত এবং অতি উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে একটি সেতুর মতো অবস্থান করত। বঙ্গদেশের বাইরে এই সেতুর ভূমিকায় কোন গীতিধারা বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। শাস্ত্রীয় সংগীত এবং লোকসংগীতের মধ্যে সর্বত্র এক বড় ফারাক চিরকালই থেকে গেছে। পশ্চিমভারতের 'অভঙ্গ' জাতীয় সংগীত এই সেতুবন্ধনে আংশিক সাফল্যলাভ করলেও তা বৃহত্তর জন-জীবনে বড় বেশি প্রকাশলাভ করতে পারেনি। কিন্তু লক্ষণীয় হল, সমগ্র দক্ষিণভারত ও মধ্য-পশ্চিমভারতে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও আংশিকভাবে সংস্কৃত স্তোত্রাদির প্রচলন বঙ্গ বা গৌড়দেশের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

কোথাও সুরছাড়া, কোথাও সামান্য সুর যোজনা করে বিচিত্র ছন্দে অগণিত নরনারী যখন কোন নিভৃত দেবালয়ে শ্রীভগবানের স্তব করে, তখন যে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা অনুভব-প্রত্যক্ষ। মনের ওপরে যথাযথভাবে উচ্চারিত সংস্কৃত স্তোত্রাদি আবৃত্তির এক বিশেষ প্রভাব আছে। "পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুদিগকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, শব্দের এমন একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়।... অতএব বেদ হইল শব্দরাশি, যাহার উচ্চারণ নির্ভুল হইলে আশ্চর্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একটি শব্দেরও উচ্চারণ ভুল হইলে চলিবে না। প্রত্যেকটি শব্দ বিধিমত উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন।"[২] এই ধারণার সত্যাসত্য নির্ধারণ করার সুযোগ এযুগেও নিশ্চয়ই আছে। মন্ত্রের উচ্চারণবিধি সংক্রান্ত যে বিদ্যা—তাকে শাস্ত্রে 'শিক্ষা' বলা হয়েছে। ছয় বেদাঙ্গের একটি অঙ্গ এটি। বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণের জন্য এক

---

[২] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪১৮

বিশেষ সুর লক্ষ্য করা যায় সামবেদে। আধুনিককালে বহু বিদগ্ধ গুণিজনকে বিভিন্ন সংস্কৃত স্তবাদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদলে গাইতে দেখা যায়। অবশ্য কেউ কেউ আবার এক্ষেত্রে বেশি সুরের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। কারণ সংস্কৃত ভাষার যে সহজাত মাধুর্য ও ছন্দের বিচিত্র আকর্ষণ, তাকে অব্যাহত রেখে বরং উন্নততর আবেগের স্পর্শ সঞ্চারিত করার মধ্যেই সুরারোপের সার্থকতা নিহিত আছে বলে তাঁরা মনে করেন। স্তোত্রাদির ভাব অনুযায়ী সুরারোপ করলে তার মধ্যে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় যা কিনা মানুষের মনকে জাগতিক আবিলতা আর "অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ"-এর ঊর্ধ্বে এক দিব্য চেতনা প্রদান করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্কৃতপ্রীতি, আর সংস্কৃতভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, এবং রস বা ছন্দবোধ কথামৃতের অনেক স্থলেই চোখে পড়ে। তিনি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদি শুনতে ভালবাসতেন। মহিমাচরণ যখন আবৃত্তি করতেনঃ

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্।।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্বাম্।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ।। ইত্যাদি,

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ পুলকিত বোধ করতেন। স্বামীজী নিজেও পরবর্তী কালে সংস্কৃত-ভাষায় স্তবাদি রচনা করে সুরারোপ করেছিলেন। তন্মধ্যে বসন্ততিলকছন্দে লিখিত "ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ" স্তবটি বিখ্যাত। তাঁর আরও রচনা সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে—যেমন হারিণী ছন্দে "আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো" মালিনী ছন্দে "নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ" বসন্ততিলক ছন্দে "কাত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে" এই স্তবগুলির স্বকীয়তা, ভাবগভীরতা, শব্দচয়ন ও ছন্দ অনবদ্য। স্বামী অভেদানন্দ রচিত স্তোত্রগুলিও তদ্রূপ তাঁর রচিত "প্রকৃতিং পরমাং" স্তবটি পাষাণহৃদয়কেও নাড়া দেয়।

অসীমকে সীমার মাঝে অভিব্যক্ত করার জন্যই শিল্প সাহিত্য। বাইবেলে আছে, ভগবান নিজের ছাঁচে মানুষ গড়েছেন। তাই সেই পরমশিল্পী তাঁর শিল্প-চেতনার ভাগীদার করেছেন মানুষকে। শিল্পের মধ্যে ডুবে যেতে পারলে অনন্তের ছোঁয়ায় মানুষ দেবত্বে উন্নীত হয়। স্বামীজীর ভাষায়, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিকাশলাভ করে। এই দেবত্বের বিকাশকেই স্বামীজী 'ধর্ম' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেই ধর্মকে জীবনে প্রকট করার ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধ বাক্য, স্তব-স্তোত্রাদি ও ভজনসঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ছন্দোবদ্ধ স্তব-স্তোত্রাদি আবৃত্তি করলে ছন্দের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে মনের উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়ে। মন শান্ত হয়, প্রস্তুত হয় চেতনার ঊর্ধ্বায়নের জন্য। আধ্যাত্মিক জীবনে ছন্দ, সঙ্গীত প্রভৃতির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে স্বামীজী বরাহনগর মঠে তাঁর গুরুভাইদের গীতা, উপনিষদ্, চণ্ডী, চৈতন্যচরিতামৃত, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত করতেন। ভক্তি সহকারে স্তবাদি আবৃত্তিকালে সামান্য সুরসংযোজনা আরও চিত্ততৃপ্তিকর হয়ে ওঠে এবং শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিবন্ধনে সহায়ক হয়। আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় সঙ্গীতাদি বিশেষ ফলপ্রদায়ী। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির যে পথ শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগের পক্ষে নির্দেশ করেছিলেন, সুললিত ছন্দে সুরসিক্ত শ্রুতিমধুর স্তবস্তোত্রাদির আবৃত্তি সেই সাধনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

ধারাবাহিক-সঙ্কলন

সৎসঙ্গ রত্নাবলী

সঙ্কলন : স্বামী ধীরেশানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী ধীরেশানন্দ ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরকাশীতে বহু প্রাচীন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন। সেই মহাত্মাদের কথোপকথন তিনি ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। এইসব ত্যাগী ও জ্ঞানীদের মূল্যবান উপদেশাবলী 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হবে।—সংযুক্ত সম্পাদক।]

স্বামী দেবী গিরিজী

স্বামী দেবী গিরিজী জীবনের প্রায় সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর উত্তরকাশীতেই কাটাইয়াছেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই তাঁহার প্রথম দর্শন পাই ও তাঁহার আশ্রমেই তাঁহার পদচ্ছায়ায় কয়েকবৎসর বাস করিবার সৌভাগ্যলাভ করি। এরূপ বেদান্ততত্ত্ববিচারনিষ্ণাত জীবন বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। মুমুক্ষুদের শঙ্কা নিরসন করিবার কি আকুল আগ্রহই না আমরা তাঁহার দেখিয়াছি! সাধু বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন ও তত্ত্ববিচার করিতেছেন দেখিলে তিনি বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন। বহির্মুখী সাধুদের প্রতি তিনি স্বভাবতঃই উদাসীন থাকিতেন। সাধুজীবনের প্রথম কয়েক বৎসর তিনি নাগা সন্ন্যাসীর বেশে বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন ও যোগাভ্যাসাদিও করিয়াছেন। অবশেষে বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া টিহরীর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, উত্তরকাশীর স্বামী রামাশ্রমজী ও অন্যান্য সাধুগণের নিকট বেদান্তাধ্যয়ন করেন ও তদবধি উত্তরকাশীতেই বাকি জীবন বেদান্তচিন্তা, মনন ও ধ্যানাদি অভ্যাসে কাটাইয়াছেন। বহু ত্যাগী তত্ত্ববিদ্ সাধুদের কথা ও তাঁহার নিজ জীবনের কত কথা আমরা তাঁহার মুখে শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি। কেহ পড়িতে চাহিলে বেদান্তগ্রন্থ অতি আগ্রহের সহিত পড়াইতেন। কিন্তু শেষ জীবনে ব্যাধিকবলিত দেহে তাহা করিতে না পারিলেও সৎপ্রসঙ্গে তাঁহার অনুভূতি-সমুজ্জ্বল বাণী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত ও তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিত। সদা হাস্যমুখ, সুমধুর কণ্ঠ, বিদ্বত্তা, বিবেক-বৈরাগ্যোজ্জ্বল চরিত্রগুণে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণকেই তিনি তুল্যরূপে সমাদর করিতেন। তাঁহার রসিকতাপূর্ণ বাক্যশ্রবণেও আমরা সময় সময় হাসিয়া আকুল হইতাম। সদানন্দময় পুরুষ ছিলেন তিনি।

বৈষয়িক ব্যাপার তাঁহার সম্মুখে কেহ আলোচনা করিলে তিনি মনে মনে বিরক্ত হইতেন, যেন প্রাণে কষ্ট অনুভব করিতেন। কেহ বেদান্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। কত যত্নে নানা গ্রন্থ হইতে সুমধুর কণ্ঠে কত শ্লোক আবৃত্তি করতঃ বিষয়টি অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলের সন্দেহ নিরসন করিতেন। যোগবাশিষ্ঠ পাঠ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। শায়িতাবস্থায় রাত্রিকালে তিনি উহা অতি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতেন ও তাহাতে আনন্দাপ্লুত হইতেন।

স্তুতি ও নিন্দাতে তাঁহার সদা সমভাব দেখিয়াছি। মাণ্ডূক্যকারিকা, বৃহদারণ্যক, গীতা, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ যেন তাঁহার করায়ত্ত ছিল। সুদীর্ঘ মননের ফলে উঁহার যে-কোন বিষয়ের সমাধানে তাঁহাকে কখনও পুস্তকের সাহায্য লইতে দেখি নাই। তাঁহার স্মৃতিপটে উহা যেন সর্বদাই উপস্থিত থাকিত।

তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও উপদেশলাভে সকলেই পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইতেন।

কুরুক্ষেত্রের নিকট বোধগয়ার কোন শাখামঠে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন—এরূপ তাঁহার নিকট শুনিয়াছি।

প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তিনি উত্তরকাশীতেই দেহত্যাগ করেন।

(১)

মহাপুরুষ সমাগম

(উত্তরকাশী, ৪।৮।১৯৩৬ ঃ একসঙ্গে বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতে যাইতে)

'প্রতিবোধবিদিতং মতম্'—প্রতিবুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীরূপে পরমাত্মাকে জানাই হল বিচারাত্মক যোগ। ইহা উত্তম অধিকারীর জন্য। তাঁহারা চৈতন্যনিষ্ঠ হইয়া অপর সকল বস্তুতে বিচারসহায়ে মিথ্যাত্ব বুদ্ধি করেন।

আর, 'আমি শুদ্ধ বুদ্ধস্বরূপ আত্মা' এইরূপ প্রত্যয়প্রবাহনিষ্ঠ হওয়ার নাম নির্গুণ উপাসনা। ওঁকারের মাত্রার সহিত আত্মার পাদের একত্ব চিন্তন-সহায়ে লয় প্রণালীদ্বারা স্বরূপ জ্ঞানলাভ করাকেও নির্গুণ উপাসনা বলা হয়।…

দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ দরকার। মনে অনেকপ্রকার শঙ্কার উদয় হয়। দীর্ঘসাধুসঙ্গে সেসব নিবৃত্ত হয়। দেখ, আমি তেমন কিছু পড়াশুনা করি নাই বা কিছু করি নাই, কিন্তু মহাপুরুষ-সমাগম ভাগ্যে ঘটিয়াছে—তাই এখন শান্ত হইয়া বসিয়া আছি।

মোক্ষের জন্য এক মাণ্ডুক্যকারিকা অধ্যয়নই যথেষ্ট, কারণ ওখানে সব কথা পরিষ্কার বলা হইয়াছে। সারা বেদান্তই অজাতবাদ।* তবে মাণ্ডুক্যে উহা বিশেষ পরিস্ফুট।

(২)

পাঠ

(৬।৮।১৯৩৬)

বেশি বই একসঙ্গে পড়া ভাল নয়। বিশ্বেশ্বরানন্দ একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টি পাঠে যোগ দিত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারিত না। ধারণা হয় না। নিষ্ঠাসহ ও বস্তুনিষ্ঠ হইয়া একটি গ্রন্থ মন দিয়া পড়িলে তত্ত্ব আয়ত্তাধীন হয়। নতুবা কেবল শব্দ-জ্ঞানের নিকট হইতে তত্ত্ব বহুদূর। সমস্ত উপনিষদ্ পড়িয়া তারপর 'শারীরক' পড়া উচিত। তবে শুনিয়া রাখিতেছ, উহাও ভাল। (আমি ঐসময় একাধিক পাঠে যোগ দিতাম)।

(৩)

সাধু ও অর্থসম্বন্ধ

(৬।৮।১৯৩৬)

একটু খাওয়াদাওয়ার আনন্দ, উহা তো শুনি-শূকরেরও আছে। ঈশ্বরের কৃপায় দেখ এখানে সাধুর সত্র হইতে রুটি মিলছে ঠিক সময়মত। শরীর-ধারণের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। ফকিরী বড় কঠিন, বাবাজী। ফকির দেখ ব্রহ্মপ্রকাশ। আমি সকাল-সন্ধ্যা তাঁর ধ্যান করি। এরূপ পুরুষের ধ্যান করিলেও পাপ নাশ হয়। আমি নয় বৎসর ভ্রমণ করিয়াছি, তখন ও এখানে প্রথম এগারো বৎসর কোন পয়সার সম্বন্ধ রাখি নাই। কোন অভাববোধ ছিল না। ঐ সম্বন্ধ না রাখিলে সাধু নির্মল থাকে।

ভূতাকাশ, চিত্তাকাশ ও চিদাকাশ। যত পরিবর্তন, সুখ দুঃখ সবই ঐ প্রথম দুই আকাশে। চিদাকাশের অর্থাৎ বিজ্ঞানাকাশের ঐসকল সহ কোন সম্বন্ধ নাই। চিদাকাশ সদা নির্লেপ, শান্ত।

(৪)

নিজের কৃপাই আসল

(১৭।৮।১৯৩৬)

দীর্ঘকাল সৎসঙ্গ, বিচারাদি করিলে তবে জ্ঞান হয়। কৃপা কি আর কিছু? নিজের কৃপাই আসল—অর্থাৎ সৎপুরুষ সমাগম, পরমেশ্বর শরণ ও বেদান্ত বিচার, ইহাই একমাত্র অবলম্বন। আর একটি জিনিস—ঐ খান, পানের নিয়ম। জিহ্বার সংযম বিশেষ দরকার। মালপুয়া পায়েসের নামে ছুটিলে চলিবে না।

'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে…।' সারা সংসার কেবল খান, পান লইয়াই ব্যস্ত। কে পরমাত্মাকে জানিতে চায়? পাণ্ডিত্যের জন্য কেবল যে শাস্ত্রপাঠ, তাতে কি হবে? ভক্তদের চেতানো ছাড়া আর কিছুই উহা দ্বারা হইতে পারে না। তবে যদি কেহ গুরুর উপদেশ মতো কাজ করে—বিচারাদি করে ও তাঁর সহায়ের জন্য ভজন পাঠাদি করে—তাহার ধীরে ধীরে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

'প্রতিবোধবিদিতং মতম্…।' প্রতিবোধ প্রত্যয়ের সাক্ষীরূপে, প্রত্যগাত্মারূপে নিজেকে জানা, ইহাই সম্যক্ জ্ঞান, ইহাই যোগ। বড় কঠিন। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে সম্ভব হয়। [ক্রমশঃ]

---

* এবিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে।— সংযুক্ত সম্পাদক।

পরিক্রমা

মণিমহেশ

বীরেশ্বর পাল

ভ্রমণ আমার নেশা। ভ্রমণে পাই এক অনিঃশেষ আনন্দ। তার মধ্যে হিমালয়ের দুর্গম স্থান ঘুরে বেড়ানোই আমার আকর্ষণ। কেন জানি না, হিমালয় আমায় বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। সবে জুলাই মাসে দুর্গম ‘তুষারতীর্থ’ অমরনাথ’ ঘুরে এসেছি। আবার দুমাস পরেই পুজোর ছুটি। আমার পুজোর ছুটি এক মাস। এই এক মাস নিছক বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা আমার পক্ষে দুর্বিসহ। ‘মণিমহেশ’ যাবার সঙ্গী জুটে গেল। হাতে তেমন টাকা-পয়সা নেই। অফিসের এক বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে বেরিয়ে পড়লাম মণিমহেশ যাত্রায়। তিনটি কৈলাস আছে। প্রথমটি তিব্বত-হিমালয়ে—কৈলাস-মানস সরোবর, অপর দুটি ভারতবর্ষের হিমাচল প্রদেশে—মণিকৈলাস বা মণিমহেশ ও কিন্নর কৈলাস।

মণিমহেশ হিমাচল প্রদেশের একটি শৈলতীর্থ। হিমালয়ের দুর্গম স্থানে এই মণিমহেশ। উচ্চতা—১৪,০০০ ফিট। ১৫ অক্টোবর জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে যাত্রা করে দুদিন পর পাঠানকোট স্টেশনে পৌঁছালাম। উঠেছি একটি ধর্মশালায়। রাত পোহালেই যাত্রা শুরু। মণিমহেশযাত্রী আমরা চারজন। মাত্র একজনের কাছে হাতঘড়ি আছে। ভাগ্যক্রমে রাত্রে তা-ও আবার বন্ধ হয়ে গেছে। অপূর্ব কাকজ্যোৎস্না রাত্রি। রাতের প্রহরে কাকের কা-কা রবে ও পাখির কলতানে ভোর হয়ে গেছে এই সন্দেহে মাঝরাতে উঠে বসে আছি। ধর্মশালার গেট বন্ধ। যখন সত্যি সত্যি রাত পোহালো তখন দারোয়ান গেট খুলে দিল। কিছু দূরেই বাসস্ট্যান্ড। নিজের নিজের মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালাম।

বাসের টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে গেছি। আমার পিছনে এক পাহাড়ী বৃদ্ধা অপেক্ষমানা একই কারণে। বৃদ্ধাকে দেখে তাঁকে আগে টিকিট কাটার সুযোগ করে দিলাম। ঢিলা-ঢালা গরম পশমী পোষাক পরিহিতা বৃদ্ধা মহিলা। হাতে লাঠি। নাকে বেশ বড় ধরনের নথ। মুখ ও কপোল গিলে-করার মতো কুঞ্চিত। ফর্সা টকটকে রঙ। জিজ্ঞাসা করলাম—“মাতাজী কাঁহা যায়েঙ্গী?” উত্তরে তিনি বললেন—“চাম্বা যাউঙ্গী বেটা।” একই পথের যাত্রী। বৃদ্ধা এবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কোথায় যাব। আমি বললাম—“মণিমহেশ যাউঙ্গা।” বৃদ্ধা বললেন—“অভি মণিমহেশ যানা ঠিক নেহি বেটা। বিলকুল বরফসে ঢাকা হুয়া হ্যায়।”—যাত্রার প্রথমেই প্রথম ধাক্কা এখানে খেলাম। চাম্বার টিকিট কেটে বাসে উঠলাম। পাঠানকোট থেকে চাম্বার দূরত্ব ১২২ কি. মি.। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ চাম্বা পৌঁছালাম। চাম্বা ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চাম্বা রূপবতী। এখানে পৌরসভার বিশ্রাম-ভবন, ইউথ হস্টেল, ডাকবাংলো, হোটেল ইত্যাদি আছে। পৌরসভার বিশ্রাম-ভবনেই আমরা আশ্রয় নিলাম। চাম্বা থেকে মণিমহেশ ও কুকতি গিরিবর্ত্মের পথ আছে। চাম্বা শহরটি বিরাট। পার্বত্য শহর। শহরের মাঝখানে বিশাল ময়দান—চৌবাগান। চৌবাগানের চারধারে পথ। রাজপ্রাসাদ, সরকারি দপ্তর, হোটেল, দোকান-পাট ইরাবতী নদীর ধার থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো সাজানো। কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরও আছে। রাজা সাহিল বর্মার রূপবতী কন্যা চম্পাবতীর নামে চাম্বা শহর। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে চাম্বার উচ্চতা ৩০০০ ফিট। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা চাম্বায় কয়েকটা দিন কাটালে মন্দ হয় না। কিন্তু উপায় নেই, কারণ আমরা যেসময়ে মণিমহেশ যাত্রায় বের হয়েছি সেটা পুরোপুরি অফ সীজন। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মণিমহেশ যাত্রা শেষ করে নিতে পারলেই ভাল।

আমাদের একজন বন্ধুর পাহাড়ে ওঠার লাঠি ছিল না। পাহাড়ে উঠতে গেলে এক ধরনের লাঠি একান্ত প্রয়োজন। লাঠিই একমাত্র বন্ধু। যখন লাঠি কেনার কথা মনে পড়ল তখন রাত প্রায় আটটা। দোকান-পাট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দোকান প্রায় বন্ধ করে ফেলেছে—এমন সময় আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা একটা লাঠি চাইলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল—এবং তার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। তার এই কথা না বলার অর্থ কিছু বুঝতে পারলাম না। অনুমান হলো বয়সের ভারে বুঝি কানে কম শোনে। জোর গলায় কথা বলব কিনা ভাবছি। এমন সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলল—“বাবুজী, আপ লোগোকো লাঠিকা কেয়া কাম?” কথার সুরে তার বিস্ময়ের ভাব। আমরা বললাম—“মণিমহেশ যায়েঙ্গে”। বৃদ্ধ ততোধিক আশ্চর্য হয়ে বললে—“মণিমহেশ যায়োগে? আভি তো মণিমহেশকা সিজন নহি হ্যায়। বিলকুল বরফ গির গিয়া। আভি মণিমহেশ যানা বহুত খতরনক্ হ্যায়। মৎ যাইয়ে বাবুজি, মৎ যাইয়ে। আগর আপ গয়ে তো মৃত্যু অনিবার্য হ্যায়।” বৃদ্ধের কথা শুনে আমরা বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তবু তার কাছ থেকে একটা লাঠি কিনলাম। বেশ চিন্তা হলো মণিমহেশ যাওয়া ঠিক হবে কিনা। আশায় বুক বেঁধে নৈরাশ্যকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রীতিমত ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। মণিমহেশ যাত্রায় দ্বিতীয় ধাক্কা খেলাম। পরদিন সকালে রওনা দিলাম খাড়ামুখ। এখানেই বাসপথের শেষ। চাম্বা থেকে খাড়ামুখের দূরত্ব ৫০ কি. মি.। এখানে তেমন কোন আশ্রয় মেলে না। তবে পাহাড়ের গায়ে দু-একটি গুহা আছে। প্রয়োজনে সেখানে রাত কাটানো যেতে পারে।

খাড়ামুখ ভুজল নদী ও ইরাবতী নদীর সঙ্গম স্থল। খাড়ামুখ থেকে ভারমৌর গ্রামের দূরত্ব ১৬ কি. মি.। জিপ চলাচল করে। জিপের অপেক্ষায় বসে আছি। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে একটা জিপ ভারমৌর গ্রাম থেকে এসে পৌঁছালো। আর কালবিলম্ব না করে ঐ জিপে রওনা দিলাম ভারমৌর গ্রাম। পি. ডব্লু. ডি. রেস্ট হাউসে জুটল আমাদের আশ্রয়। রেস্ট হাউসটি বড় সুন্দর এবং সুসজ্জিত। বেশ আরামদায়ক পরিবেশ। এই বাড়ির কেয়ার-টেকার চয়নলাল নামে ফর্সা, মাঝারি গড়ন, সুশ্রী এক যুবক।

মণিমহেশ যাত্রার গাইড ও কুলি এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এখান হতেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। ভরসা আমাদের চয়নলাল। ভারমৌর গ্রামে চয়নলালের বেশ কিছু আধিপত্যও আছে। ভারমৌরকে কেউ কেউ ‘ভারতের সুইজারল্যান্ড’ বলে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। বহু বৎসর পূর্বে ভারমৌর চাম্বা রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমানে রাজধানী উঠে গেছে। ভারমৌর প্রবেশের মুখে একটি ঝরনা আছে। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। চাষের ক্ষেত, পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ঘর-বাড়ি, দোকান, মন্দির ও আপেল বাগান ছবির মতো সাজানো। গ্রামের কেন্দ্র চৌরাশী। এখানে ছোট-বড় চুরাশিটি মন্দির আছে। তাই চৌরাশী নামে খ্যাত। মন্দিরগুলির মধ্যে মণিমহেশ বা হরিহর, গণেশ ও নরসিংহদেব, লক্ষণাদেবী ও ব্রাহ্মণীদেবীর মন্দির বিখ্যাত। এই মন্দিরগুলির মধ্যে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের লক্ষণাদেবীর মন্দির সব থেকে প্রাচীন। মন্দিরটির কারুকার্য তারিফ করার মতো। মন্দিরটি তৎকালীন রাজা মেরুবর্মা তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে দশনামী সম্প্রদায়ের এক নাগা সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। এই গ্রামের উন্নতির মূলে নাগাবাবার দান অনেক। গ্রামের ছেলেমেয়েদের স্কুল করে দিয়েছেন। একটি চিকিৎসালয়ও করেছেন। নাগাবাবার একটি সুন্দর আপেল বাগান আছে। সন্ধ্যা হতে তখনো আধ ঘণ্টা বাকি। আমরা নাগাবাবার দর্শনে আপেল বাগানে গেলাম। অফুরন্ত আপেলের ভারে গাছগুলি মাটিতে নুয়ে পড়েছে। দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে আবার লোভও হচ্ছে আপেল খেতে। আমাদের দেখে সহাস্য বদনে নাগাবাবা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। শান্ত-সৌম্য মূর্তি। বয়স প্রায় নব্বই বছরের কাছাকাছি। ফর্সা টকটকে রঙ। শনের মতো পাকা চুল-দাড়ি। দেখলে সহজেই

ভক্তিতে মাথা নত হয়। আমরা প্রণাম করলাম। স্বামীজী আমাদের আহ্বান জানালেন আপেল খেতে। আমরা যত খুশি গাছ থেকে আপেল পেড়ে খেলাম। হিমাচল প্রদেশ আপেল চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আপেল চাষ এখানকার মানুষের অন্যতম উপজীবিকা। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাগান হতে স্বামীজীকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসে হাজির। আমরা স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের আশ্রয়ে ফিরলাম। ফেরার সময় স্বামীজী আমাদের ১০/১২ কেজির মতো এক টুকরি আপেল দিয়েছিলেন। এই আপেলগুলি আমাদের মণিমহেশ যাত্রায় বিশেষ কাজে লেগেছিল। আমরা প্রায় দু-তিন দিন আপেল খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

তখন সন্ধ্যা ৭টা। চয়নলাল আমাদের বলল—"বাবুজি কুলি নেহি মিলা।" আমরা হতাশ। নিঝুম হয়ে সকলেই বসে আছি। কারও মুখে কোন কথা নেই। মণিমহেশ যাত্রায় কুলিরাই একমাত্র ভরসা। কুলি ছাড়া এক পা-ও যাওয়া সম্ভব নয়। এ পথে এরাই গাইডের কাজ করে। চয়নলাল কিন্তু আশা ছাড়েনি। আমাদের অবস্থা বুঝে তখনই চয়নলাল গ্রামে বেরিয়ে পড়ল কুলির সন্ধানে। কুলি না পাওয়ার একটাই কারণ—অফ সীজন। আমরা বেশি পয়সার লোভ দেখিয়েও কুলি মেলাতে পারিনি। কারণ প্রাণের মায়া সকলেরই আছে। ঘরের সমস্ত দরজা, জানালা বন্ধ করে কম্বলমুড়ি দিয়ে চিন্তা করছি কি করা যায়। বেশ ঠান্ডা। কারও হাত-পা নড়ে না। মনে মনে নিশ্চয় করে নিলাম—রাত পোয়ালেই চাম্বা ফিরে যাওয়া। বড়ই দুঃখ মণিমহেশ যেতে না পারায়। এমন সময় চয়নলাল এল। তখন রাত ৯টা। একটা কিছু ব্যবস্থা না করে চয়নলাল ফেরার পাত্র নয়। এ-পথের সব চেয়ে ভাল কুলি পাওয়া গেছে শুনে আমরা সকলেই আনন্দিত। যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। নাম তার চতুরারাম। এ-ই আমাদের গাইডের কাজ করবে। আরও দু-জন কুলির ব্যবস্থা হয়েছে মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু যতবার আশায় বুক বাঁধছি, ততবারই নৈরাশ্য আমাদের মনকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। চয়নলাল একটি ঘটনা শোনাল। তাতেই ভয়ে আমাদের বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। কলকাতা থেকে আসা ছ-জনের একটি গ্রুপ মণিমহেশ গিয়েছে। গত ২/৩ দিন হলো তাদের ফেরার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের কোন খবর পাওয়া যায়নি। তাদের জন্য চয়নলালও বেশ চিন্তিত। কারণ চয়নলালই তাদের মণিমহেশ যাত্রার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

পরদিন ভোর হতেই আমরা মণিমহেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। কুলিরাও ঠিক সময়ে এসে হাজির। চয়নলাল ও চতুরারামের সাথে পাহাড়ি ভাষায় কি যেন কথাবার্তা হচ্ছিল। আমরা তাদের ভাষা বুঝতে না পারলেও তাদের হাব-ভাব, মুখ-চোখ দেখে বেশ অনুমান হলো যে উভয়েই বেশ চিন্তিত। আর কালবিলম্ব না করে ‘জয় মণিমহেশজী কি জয়’ বলে যাত্রা শুরু হলো। তখনও সূর্যের আলো ভাল ফোটেনি। কিন্তু রাস্তা দেখা যাচ্ছে। আমাদের গাইড চতুরারাম আগে আগে যাচ্ছে। মধ্যে আমরা অসহায় চারজন। পিছনে দুজন কুলি—নাম তাদের জায়সি ও হৃদেরাম। এদের ঘাড়ে আমাদের সমস্ত মালপত্র ও খাবার-দাবার আছে। ভারমৌর থেকে হাড়সার গ্রাম ১৯ কি. মি. পথ। পথ বেশ দুর্গম। পাহাড়ের গা বেয়ে সামান্য সরু পথ এগিয়ে গেছে হাড়সার গ্রামের দিকে। সমস্ত পথটাই চড়াই—উতরাই। চড়াই-এর মাত্রাই বেশি। চির ও পাইন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে নিতে চলেছি। বেলা তখন দশটা। একটি ঝরনার ধারে আমরা বসে পড়লাম। খিদেও পেয়েছে। তার থেকেও পিপাসা বেশি। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা কেউ কেউ পাহাড়ের গায়ে এলিয়ে দিল। চতুরারাম আমাদের হাতে কিছু কিছু কাজু, পেস্তা, বাদাম ও খেজুর দিল। তাই খেয়ে ও ঝরনার জল পান করে আমরা যেন নতুন ‘এনার্জি” পেলাম। এখানে বেশ কিছুক্ষণ বসতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ী পথে বেশিক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া ঠিক নয়। তাই হাঁটা শুরু করলাম।

পথে যেতে যেতে বেশ কয়েকটি ভেড়ার দল নজরে পড়ল। এক-একটি দলে কম করে পাঁচ-ছশো

করে ভেড়া আছে। তার মধ্যে বড় লোমওয়ালা ছাগলও আছে। এই সমস্ত ভেড়া ও ছাগলের লোম থেকেই পশম তৈরি হয়। সমস্ত মেষপালকেরা নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবার এরা উঠে আসবে। মেষপালনই এদের প্রধান উপজীবিকা। এদের বলা হয় গাদ্দি। আবার এ-কথাও প্রচলিত আছে যে, সমস্ত হিমালয় দেবাদিদেব মহাদেবের গদি বা বাসস্থান। এই গদিতে যারাই বসবাস করে তাদের গাদ্দি বলা হয়। এরা বেশ লম্বা। দোহারা গড়ন। ঢিলে-ঢালা পোষাক-পরিচ্ছদ—ভেড়ার লোম থেকে তৈরি। এদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কোন আড়ম্বর বা বাহুল্য নেই। এদের ভেড়ার দলে দুটি করে কুকুর থাকে। কুকুরগুলো বেশ তাগড়া। কুকুরের গলায় চওড়া টিনের পাত জড়ানো। কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বলল, কখনো কখনো শের এলে এরা শেরের সাথে লড়াই করে। তাই ওদের গলায় লোহার চাদর জড়ানো আছে। এই কুকুরগুলো গাদ্দিদের পাঁচ-ছটি ভেড়ার দলকে পাহারা দিয়ে থাকে। তাই পাহারাদার হিসাবে গাদ্দিদের কুকুর বিশেষ প্রয়োজন। এদের সঙ্গে কথা বলে কিছু সময় নষ্ট হলেও এদের জীবনের অনেক কিছু জানা গেল। পাইন গাছের ছায়ায় গাদ্দিদের সঙ্গে গল্প করে আর ইচ্ছা হচ্ছে না চড়াই পথ অতিক্রম করতে। কিন্তু উপায় নেই। সন্ধ্যার আগে আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে হবেই। তাই অবসাদ ও আলস্য কাটিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। তখন বেলা প্রায় একটা। হাড়সার গ্রাম পৌঁছাতে তখনও প্রায় চার ঘণ্টার পথ বাকি। বিশ্রাম নিতে নিতে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা নিয়ে বেলা প্রায় পাঁচটা নাগাদ পৌঁছালাম হাড়সার গ্রামে।

বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। ১০/১২ ঘর বসতি নিয়ে এই হাড়সার গ্রাম। সমস্ত ঘরগুলি কাঠের তৈরি। হালকা ধরনের পাথর দিয়ে ঘরের ছাউনি। দু-একটি দোকান আছে। প্রয়োজন হলে রাত্রে রুটি-তরকারি পাওয়া যেতে পারে। এ-পথের এই শেষ গ্রাম। এর পর আর কোন লোকালয় বা আশ্রয় মিলবে না। আশ্রয় জুটবে পাহাড়ের কোলে। কখনো বা বরফের উপর। যদি কোন গুহা মেলে তো উত্তম। মণিমহেশের পূজারী থাকেন এই গ্রামে। হাড়সার গ্রাম থেকে দুটি পথ দুদিকে গেছে। একটি কুকতি হয়ে ত্রিলোকনাথ। অপরটি মণিমহেশের দিকে। হাড়সার গ্রামের দৃশ্য দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে। জারসি ও স্বদেরাম রাত্রের আহার রুটি-তরকারি বানিয়ে ফেলল।

আমাদের মন পড়ে আছে কলকাতা থেকে আসা ছজন ছেলের প্রতি যারা এখনও পর্যন্ত মণিমহেশ থেকে ফেরেনি। পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছি··· তাদের ফেরার অপেক্ষায়। তাদের ফেরা বা না ফেরার উপর নির্ভর করছে আমাদের মণিমহেশ যাওয়া বা না যাওয়া। রাতের ঘন অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আজ আর তাদের ফেরার সম্ভাবনা নেই। কারণ পাহাড়ী পথে সন্ধ্যার পর আর হাঁটা যায় না। হাঁটা উচিতও নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে বেশি। তাতে আবার মণিমহেশের পথ খুবই বিপদসঙ্কুল। যদি তারা ফিরত তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রামে পৌঁছে যেত। খুব আশা ছিল যে হাড়সার গ্রামে তাদের দেখা মিলবে। আমাদের আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। নিশ্চয় করে নিলাম—তাদের মৃত্যু ঘটেছে। আর এক পা-ও নয়। রাত পোহালেই ফেরার পালা। দুঃখে দুশ্চিন্তায় সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোর হতে না হতেই চতুরারাম আমাদের ডাক দিয়ে তুলল। জানি না এখন চতুরারামের কি চাতুরী। আমাদের এখন এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে—না কি মণিমহেশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বুঝতে পারছি না। এখন চতুরারামই আমাদের অন্ধের যষ্ঠি। মণিমহেশ যাওয়া বা না যাওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করছে চতুরারামের উপর।

রাতের অন্ধকার তখনো খুব একটা হাল্কা হয়নি। চতুরারাম আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল মণিমহেশের দিকে। তখনো গ্রামের লোকজন ওঠেনি। পথ খুব পরিচ্ছন্নভাবে দেখা যাচ্ছে না। খুব সাবধানে মন্থর গতিতে সে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে অতি সঙ্কীর্ণ উঁচু-নিচু এবড়ো-

খেবড়ো চড়াই পথ মণিমহেশের দিকে এগিয়ে গেছে। বাঁদিকে হাজার হাজার ফিট খাদ। ঐ খাদ দিয়ে বয়ে গেছে ডানচু নদী। একটু চলার অসাবধানতা হলেই খাদে পড়ে মৃত্যু। কারও বাঁচার উপায় থাকবে না।

হাড়সার থেকে ধানছো দূরত্ব ১২ কি. মি.। কিন্তু খুব চড়াই। তাই একটু সময় লাগে বেশি। সন্ধ্যার আগে আমাদের ধানছো পৌঁছাতে হবেই। খুব সাবধানে ধীর গতিতে হেঁটে চলেছি। এ পথে বেশ কয়েকটি ঝরনা পড়ে। তখন সকাল নটা। আমরা একটি ঝরনার কাছে এসে এই প্রথম বিশ্রাম নিলাম। ঝরনার জল পান করে পিপাসা মেটালাম। সকালের রোদটা সবেমাত্র জোর হয়েছে। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগছে। শীতের কনকনানি ভাবটা কমে গিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। সঙ্গে নিয়ে আসা কিছু হাল্কা খাবার-দাবার খেয়ে নিলাম। খুব বেশি খেলে পাহাড়ী পথে হাঁটা যায় না। বিশেষ করে চড়াই পথ অতিক্রম করতে খুবই কষ্ট হয়। আবার কিছু না খেয়েও হাঁটা একেবারেই অসম্ভব। দশ মিনিটের মতো বিশ্রাম নিয়েই আবার হাঁটা শুরু হলো। হাড়সার থেকে ধানছো বেশ খানিকটা পথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ। বনস্পতি, ছোট-বড় ঝরনা, অসংখ্য ফুলের শোভা আর নানা জাতির পাখির কুজনে পথ মুখরিত। এইটুকু পথ পদযাত্রীর হাঁটার ক্লেশ ভুলিয়ে দেয়।

এবার শুরু হলো শুষ্ক পাহাড়ের গা বেয়ে হেঁটে যাওয়া। কোথাও এক বিন্দু সবুজের সন্ধান নেই। দেখা যাচ্ছে শুধু বিশাল পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি। শৃঙ্গগুলি সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। সত্যিই এক অপূর্ব মনোহর দৃশ্য। আনন্দের থেকে দুঃখ হচ্ছে বেশি। কারণ এই বরফ আমাদের যাত্রাপথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে কিনা কে জানে? ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। এগিয়ে তো চলেছি আমাদের গাইড চতুরারামের ভরসায়।

বেলা তখন এগারোটা। নজরে পড়ল—বহু দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে উপর থেকে কারা যেন নেমে আসছে। ভাল নজর হচ্ছে না। তবে কয়েকজন মানুষ আসছে বলে মনে হচ্ছে। আমরাও এগোতে শুরু করলাম। যাই হোক না কেন মাঝ পথে দেখা তো হবেই। আমরা আধ ঘণ্টায় যতখানি পথ এগিয়েছি তার থেকেও বেশি পথ ওরা নেমে এসেছে। কারণ উতরাই পথে চলার গতি বেড়ে যায়। এখন আর চিনতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তারাই আসছে যাদের আমরা ভেবেছিলাম মারা গিয়েছে। আমাদের খুবই আনন্দ হচ্ছে। জানতে পারব পথের বিবরণ। আশার আলো মনে জাগল—মণিমহেশ দর্শন করতে পারব বলে। কাছাকাছি এসেও যেন কাছে আসতে পারছি না। তথাপি চলার গতি কারও থেমে যায়নি। পাহাড়ী পথে এমনই হয়। কাছে মনে হলেও অনেক দূরে রয়ে যায় গন্তব্য। কুকুর-হাঁপানি হাঁপাতে হাঁপাতে লাঠিতে ভর দিয়ে চড়াই পথ ভেঙ্গে চলেছি। বিশ্রাম না নিয়ে আর যেন পারছি না। তথাপি এগিয়ে চলেছি অধীর আগ্রহে। যখন ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তখন কারও মুখে কোন কথা নেই। আমরা হাঁফ ছাড়তেই ব্যস্ত। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে দম ছেড়েই চলেছি। কথা বলতে পারছি না। আমাদের থেকে ওদের অবস্থা আরও খারাপ। পাহাড়ের গায়ে উভয় পক্ষই বসে পড়েছি। অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করছি পথের বিবরণ। কিন্তু ওদের মুখে কোন কথা সরে না। কথা বলতে যেন ওদের কষ্ট হচ্ছে। আমরা যখন পাঁচটা কথা বলছি ওরা তখন আস্তে আস্তে একটা কথা বলছে। চোখ-মুখে ভয়ার্ত ছাপ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় নাক ও গাল ফেটে গেছে। কারও কারও ঠোঁট ফেটে রক্তের রেখা দেখা যাচ্ছে। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে কথা বলছে। তারা শুধু একটা কথাই বলল—না যাওয়াই ভাল। আমরা মরতে মরতে বেঁচে গেছি। পথ বিলকুল বরফে ঢেকে গেছে। খুবই বিপদসংকুল পথ এবং কঠিন চড়াই। আমরা পথ ভুল করেছিলাম।

পথের বিবরণ শুনে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। কিন্তু ওরাই আবার আমাদের ভরসা দিয়ে বলল—দেখুন, বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে যদি পারেন। আর তো মাত্র একটা দিনের পথ। একটা

দিন রিস্ক নিলে যদি আপনাদের মণিমহেশ দর্শন হয়, তাহলে কেন আপনারা এই ঝুঁকি নেবেন না? আমাদের পথ ভুল হয়েছে বলে আপনাদেরও নিশ্চয়ই পথ ভুল হবে না। আপনারা অবশ্যই মণিমহেশ দর্শন করে ফিরে আসতে পারবেন। বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। তবে একটা দিনে এমন বরফ পড়বে না, যা না ফেরার কারণ হতে পারে। আমরা যখন বেঁচে ফিরেছি তখন আপনারাও পারবেন। তবে গরমের পোশাক ভাল রকম থাকা দরকার। আর সব থেকে বেশি দরকার বরফে চলার উপযোগী জুতো। আমাদের গরমের পোশাক ভালই ছিল। 'হানটার সু' সকলেরই ছিল। ছিল না শুধু আমার। আমার ছিল 'হাঁক সু।' আমার জুতো দেখে ওরা সকলেই আমাকে যেতে নিষেধ করল। তাতে আবার জুতোর গ্রিপগুলো ক্ষয়ে গেছে। বরফের উপর দিয়ে চলার সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। পাহাড়ে আসা আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। বিগত কয়েক বছর ধরেই আমি হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে ঘুড়ে বেড়াচ্ছি। ইতিপূর্বে কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী, বাসুকীতাল ও তুষার তীর্থ অমরনাথ গেছি এই জুতো পরেই। কাজেই এই জুতো পরে মণিমহেশ যেতে পারব না কখনো ভাবতে পারিনি। এত কাছে এসেও আমি মণিমহেশ যেতে পারব না। আর কি কোনদিন সম্ভব হবে মণিমহেশ আসা? দুঃখে আমার চোখে জল এসে গেল। বন্ধুরা আমায় হাড়সার গ্রামে ফিরে যেতে বলল। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বললে—"তুমি যাবে যাও। আমি কিন্তু আর এগুচ্ছি না।" আমি কিন্তু মণিমহেশ দর্শন করার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ। বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম—"আমি মণিমহেশ যাবই।" মৃত্যু তো একদিন হবেই। তবে মণিমহেশজীর উদ্দেশে এসে হিমালয়ের কোলে আমার যদি জীবনাবসান হয় তবে ক্ষতি কি? আমার জীবনের কোন পিছুটান নেই। মণিমহেশ দর্শন করতে এসে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে এটাই হবে আমার জীবনের একমাত্র শান্তি। হিমালয়ে আসা আমার ঐ বন্ধুর এই প্রথম অভিজ্ঞতা। বন্ধু আর এক পা-ও অগ্রসর হতে রাজি নয়। বলতে কি, আমিই তাকে এ-পথে একরকম জোর করে নিয়ে এসেছি। বন্ধু আর অগ্রসর হতে রাজি না হওয়ায় আমি বেশ চিন্তিত ও দুঃখিত। বন্ধু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল—"তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না। তোমরা নির্বিঘ্নে ঘুরে এসো। আমি হাড়সার গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ওখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।" কলকাতার সাথীদের সাথে বন্ধু ফিরে গেল। তার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তখন নিজেকে স্বার্থপর বলে মনে হতে লাগল। কারণ বন্ধুকে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এখন আমিই বন্ধুকে ফেলে মণিমহেশ চলেছি। আমরা যতদিন না ফিরি, বন্ধুকে ততদিন হাড়সার গ্রামে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য গ্রামের লোকজন ভাল। এ-পথে বা হিমালয়ে দস্যু-তস্করের ভয় নেই। হিমালয়ের মানুষ যত গরিবই হোক না কেন তারা খুব ধর্মভীরু এবং অতিথিবৎসল।

এখন আমরা তিনজন মণিমহেশ যাত্রী। আমাদের গাইড চতুরারামের নেতৃত্বে আমরা ক্রমশই এগিয়ে চলেছি ধানছোর দিকে। যেমন করেই হোক, সন্ধ্যার পূর্বেই ধানছোর আশ্রয়ে পৌঁছাতে হবে। বেলা ক্রমশই পড়ে আসছে। বরফের ঠাণ্ডা আমাদের কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ দেখি একটি কাল রঙের কুকুর আমাদের সঙ্গী হয়েছে। কোথাও তার গায়ে অন্য কোন রঙের লেশমাত্র নেই। গা বেশ মসৃণ। দেখতে বেশ সুন্দর। কুকুরটাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। বেলা পড়ে আসছে দেখে আমরা চলার গতি বাড়ালাম। কুকুরটা আমাদের ফেলে এগিয়ে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি কুকুরটি পাহাড়ের গায়ে চুপ করে বসে আছে। আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে যখন কুকুরটির কাছে পৌঁছলাম, তখন সে হাঁটতে শুরু করল। কুকুরটি যেন আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বিশ্রাম না নিয়ে আর পারছি না। তাই দাঁড়িয়ে একটু হাঁপ ছাড়ছি। আমরা দাঁড়িয়ে গেছি দেখে কুকুরটাও একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কুকুরটা যেন পুরোপুরি আমাদের গাইড করে নিয়ে চলেছে। তখন থেকে কুকুরটার প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়ল। আমাদের মনে প্রশ্ন

এল—তাইতো, কুকুরটা কোথা থেকেই বা এল? আমরা যে-পথ অতিক্রম করে এসেছি সে-পথে তো কোন লোকালয় পড়েনি। কোন্ ভোরে হাডসার গ্রাম ফেলে এসেছি। সঙ্গে তো কোন সময়ই কুকুর নজরে পড়েনি। তবে কোথা থেকে হঠাৎ এর আগমন? যাইহোক এ যেন দৈব যোগাযোগ বলে মনে হলো। মনে আশার আলো জাগল। আমরা যেন অকূলে কূল পেলাম। আমরা সকলে আদর করে কুকুরটার নাম রাখলাম ভুলো। মনে ভরসা পেলাম—ভুলোকে যখন পেয়েছি তখন মণিমহেশ যেতে পারবই। এখন থেকে রাস্তায় আমরা যখন যা কিছু খেয়েছি, ভুলোকে আমরা প্রথমে দিয়ে তবে খেয়েছি। এইভাবে ভুলো আমাদের সারা রাস্তা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা আর যেন হাঁটতে পারছি না। ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা নিয়ে সন্ধ্যার প্রারম্ভে আমরা ধানছো পেঁছালাম। তখনো ঝিকিমিকি আলো দেখা যাচ্ছে। কঠিন কনকনানি ঠাণ্ডায় হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে। না জানি রাত্রে আমাদের কি অবস্থা হবে। বন-বিভাগের তৈরি একটি ভগ্ন জরাজীর্ণ টিনের চালায় হলো আমাদের রাতের আশ্রয়। চারিদিক ফাঁকা। তাও আবার তুষার ঝড়ে ছাদের কয়েকখানা টিন উড়ে গেছে। এই আশ্রয়ে রাত কাটানো আর ফাঁকায় থাকা একই কথা। তথাপি এখানেই আশ্রয় নিলাম। কারণ তবু তো এটা একটা আশ্রয়। এই জায়গাটিই ধানছো, উচ্চতা ১২,০০০ ফিট। জুতো, জামা, প্যান্ট, হাতমোজা, মাথায় টুপি, তিনটি সোয়েটার, ২টি কম্বল পেতে ও দুটি কম্বল গায়ে দিয়েও রাত্রে ঘুম হয়নি। এমনই কঠিন ঠাণ্ডা। রাত যেন আর কাটতে চায় না। কুলিরা সারা রাত আগুন জ্বালিয়ে কাটিয়ে দিল। রাত্রে ভুলো মাঝে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠছে এবং আমাদের কাছ থেকে ছুটে চলে যাচ্ছে। কি জানি ভুলো কি দেখেছে। শুনেছি এখানে শ্বেত ভালুকের উপদ্রব আছে, ভয়ে প্রাণ দুরদুর করছে। যদি কোন জন্তু-জানোয়ার আক্রমণ করে তবে ভুলো একাই বা কি করবে? আমাদের কাছেও আত্মরক্ষা করার মতো কিছু নেই। ঈশ্বরের নাম নিয়ে চুপচাপ পড়ে রইলাম। যা হবার হোক।

যাইহোক, কোন রকমে তো রাত কাটলো। ভোরের অন্ধকার তখনও পরিষ্কার হয়নি। মণিমহেশ যাত্রা শুরু হলো। ধানছো থেকে মণিমহেশ ৯ কিঃ মিঃ। এই পথ একটানা চড়াই আর চড়াই। প্রচণ্ড কঠিন চড়াই। মণিমহেশ দেখে ধানছোর আশ্রয়ে ফিরে আসতে হবেই। একজন কুলি মালপত্র নিয়ে ধানছোর আশ্রয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আর একজন কুলি আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলল। আমাদের গাইড চতুরারাম আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তারও আগে ভাগে চলেছে আমাদের নতুন গাইড ভুলো। এতই কনকনে কঠিন ঠাণ্ডা যে, হাত থেকে লাঠি খসে পড়ে যাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে চতুরারাম পাহাড়ী ঘাস ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে হাতগুলো আরাম করে নেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

কিছুদূরে গিয়ে শুরু হলো মৃত্যুসম চড়াই 'বন্দর ঘাঁটি'। প্রায় আধ মাইলের মতো পাহাড়ের একটি অংশ বাঁদর চলার ভঙ্গিতে অতি কষ্টে এবং খুব সাবধানে অতিক্রম করতে হয়। বাঁদর চলার ভঙ্গিতে এই অংশটুকু পার হতে হয় বলে এর নাম বন্দর ঘাঁটি। এখানে আমাদের আর এক সঙ্গী আর উঠতে পারল না। সে ফিরে গেল ধানছোর আশ্রয়ে। সেখানে আমাদের ফেরার অপেক্ষায় সে থাকবে। খুব দুঃখ হলো তার জন্য। এখন আমরা মাত্র দুজন মণিমহেশের যাত্রী। মন ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়ছে। এখন আমাদের ভাগ্যেও কি আছে কে জানে? বন্দর ঘাঁটি অতিক্রম করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। গাইড চতুরারাম অবশ্য হাত ধরে টেনে তুলতে সাহায্য করছে। পাহাড়ের উপরে বসে ভুলো কুঁই কুঁই করছে। আমাদের কষ্ট হচ্ছে দেখে ভুলোরও যেন কষ্ট হচ্ছে। অতি কষ্টে আমরা যখন বন্দর ঘাঁটি অতিক্রম করে ভুলোর কাছে পেঁছালাম তখন ভুলোর আর আনন্দের সীমা নেই। ভুলো লেজ নেড়ে আমাদের সোহাগ জানাচ্ছে ও মুখ চেটে দিচ্ছে। আমরা ততক্ষণে বসে পড়েছি। বিশ্রাম না নিয়ে আর পারছি না। হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে ভুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে আমরাও তাকে অন্তরের ভালবাসা জানালাম।

দশ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে শুরু হল হাঁটা। কয়েক পা যাওয়ার পর যে পথ এল তা বরফে ঢাকা। জুতো খুলে হাঁটু পর্যন্ত পলিথিন জড়িয়ে, তার ওপর পশমী মোজা পরে আমার হকি কেডসটি পায়ে দিয়ে শুরু করলাম হাঁটা। জুতো প্রায় বরফে ডুবে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পা ঝাঁকুনি দিয়ে বরফ ফেলে দিচ্ছি। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। পথের নিশানা বলতে কিছুই নেই। চারদিকে শুধু ধু-ধু বরফ। চতুরারামের কথা মতো তার চলার পায়ের দাগে দাগে আমরা অতি সাবধানে পা ফেলে লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এইভাবে চলতে চলতে আমরা পৌঁছালাম গৌরীকুণ্ড। কুণ্ডে এক বিন্দুও জল নেই। সমস্ত জমে বরফ। গৌরীকুণ্ড শীতল জলের হ্রদ। এখানে পুজো দেওয়া রীতি। তারপর মণিমহেশ যাত্রা করতে হয়। এখানেই মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হয় মণিমহেশ দর্শনের জন্যে। সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে মায়ের পুজো ও বন্দনা করে পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম।

কিছুদূর চড়াই পথ ভেঙে পৌঁছালাম 'কালভৈরবজী'র কাছে। পাহাড়ের গায়ে সিঁদুর মাখানো এক শিলাখণ্ড এবং কয়েকটি ত্রিশূল। চতুরারাম বলল—"বাবুজী হিঁয়াপর ভেট চড়াইয়ে—মণিমহেশ যাত্রা সফলতা কে লিয়ে।" কালভৈরবজীকে পুজো দিয়ে আবার হাঁটা শুরু হলো। বেলা প্রায় বারোটা। তখনও অনেকটা পথ বাকি। আর যেন হাঁটতে পারছি না। হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবে যাচ্ছে। এইভাবে বরফ ভেঙে চলেছি—একের পর এক পাহাড় অতিক্রম করে। আর একটু গেলেই মণিমহেশ। কিন্তু ঐটুকু পথ যেন আর যেতে পারছি না। ভুলো অবলীলাক্রমে চলে গেল। বরফের উপর বসে পড়েছি। হাঁপ ছাড়তেই ব্যস্ত। আর বুঝি হয় না মণিমহেশ দর্শন। প্রাণ যায় যায়, চতুরারাম হাত ধরে টেনে তুলতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। লাঠিতে ভর দিয়ে কোনক্রমে টলতে টলতে কুকুর-হাঁপানি হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছালাম মণিমহেশ।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। মাঝখানে একটি হ্রদ। হ্রদের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। পাহাড়গুলি সম্পূর্ণ বরফে আচ্ছাদিত, রোদের আলোয় ঝলমল করছে। যেন রুপো গলে গলে পড়ছে। হ্রদটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনশো ফিট এবং প্রস্থে প্রায় আড়াইশো ফিট। বরফের পাহাড়ে প্রতিফলিত সূর্যকিরণে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। সব থেকে উঁচু শৃঙ্গটিই মণিকৈলাস। এর উচ্চতা ১৮০০০ ফিট। এইটিই আসল মণিমহেশ। হ্রদের ধারে একটি পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে। এখানেই মণিমহেশজীর উদ্দেশ্যে সকল তীর্থযাত্রী পুজো করে থাকেন। ক্ষণে ক্ষণে মণিকৈলাস শৃঙ্গটির রঙ পালটে যাচ্ছে। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এ কোন্ যাদুকরের ভেলকি জানি না। মন আনন্দে পরিপূর্ণ। চতুরারামের কথামতো আমরা ধূপ জ্বেলে হ্রদটি পরিক্রমা করলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ভুলোরও ব্যতিক্রম হল না। নারিকেল, খেজুর, কিশমিশ দিয়ে ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে আমরা মণিমহেশজীর পুজো করলাম। এখানে কোন পুজারী বা পাণ্ডা ছিল না। আমরা ছাড়া কোন জনপ্রাণী নেই—পাণ্ডা তো দূরের কথা। কেবলমাত্র আমরাই কয়েকজন প্রাণী সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম মণিমহেশজীর কৃপায়। হ্রদের চারধারে ভেড়ার শিং ও কাঠ কয়লা পড়ে আছে। এখানে জন্মাষ্টমী থেকে রাধা অষ্টমী পর্যন্ত প্রতি বৎসর মেলা হয়। ঐসময় সরকারি ব্যবস্থাপনায় বহু দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রী এসে থাকে। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন গ্রামের গাদ্দিরা ঐ মেলায় যোগ দেয়। মণিমহেশজীর উদ্দেশ্যে তারা ভেড়া বলি দেয়। ঐ হ্রদের ধারে তাঁবু খাটিয়ে কেউ কেউ কয়েক রাত্রি বাস করে। আগুন জ্বালিয়ে বলি দেওয়া ভেড়ার মাংস রেঁধে আহার করে। মণিমহেশ হ্রদের উচ্চতা ১৪০০০ ফিট। প্রকৃতি খুব শান্ত ও ধীর স্থির। কোন সাড়া শব্দ নেই। গাছপালা নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ। যদি এখানে কিছুই নেই, তবে কী আছে এখানে? কিসের জন্যই বা এত কষ্ট করে লোক ছুটে আসে? কেনই বা আমরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে ছুটে এসেছি এখানে? সে কি কেবল এই নির্জনতা আর অসহ্য শীতের জন্য? এর জন্য এখানে আসার প্রয়োজন কি? আছে, প্রয়োজন আছে। ঐ হ্রদের বরফগলা জলের উপর মণিমহেশজীর প্রতিবিম্ব নৃত্য

চারিদিকে বরফের পাহাড়ের উপর প্রতিফলিত সূর্যরশ্মিই মণিমহেশজীর প্রভা বা দিব্য জ্যোতিঃ। এ যেন অমরাপুরী। এই মনোমুগ্ধকর, নয়নানন্দ দিব্য জ্যোতিঃ ও অমরাপুরী দর্শনের লোভে মানুষ দারুণ কষ্টকে উপেক্ষা করে ছুটে আসে। এখানে প্রায় রোজ বিকালেই বৃষ্টি হয় বা বরফ পড়ে। ভাগ্যক্রমে তুষার বৃষ্টি বা ঝড় হয়নি। হলে আর আমাদের ফিরতে হতো না। ঘটত আমাদের তুষার-সমাধি। হ্রদের ধারে কিছু খাবার-দাবার খেয়ে আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম। অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছে। সঙ্গে নিয়ে আসা পানীয় জল ফুরিয়ে গেছে। এদিকে পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। চতুরারাম হ্রদের মাঝখান থেকে একটু বরফগলা জল এনে দিল। কিন্তু ঐ জল খায় কার সাধ্যি? দাঁত ঠেকাবার উপায় নেই। টাগরায় একটু ঢেলে কোনক্রমে পিপাসা মেটাতে হলো। প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। কয়েকটি ছবি তুলে আমরা নিচে নামতে শুরু করলাম।

খুব সাবধানে নামতে হচ্ছে। কারণ উতরাই পথে চলার গতি বেড়ে যায়। শরীরের ঝোঁক পড়ে বেশি। তাতে আবার রাস্তায় বিলকুল বরফ। একটু অসাবধান হলেই খাদে পড়ে মৃত্যু। আমাদের মন আনন্দে ভরপুর। যা সম্ভব ছিল না বা কল্পনাও করতে পারিনি তা আজ সম্ভব হয়েছে। আহ্লাদের আর সীমা নেই। এই তুষারতীর্থ মণিমহেশ দর্শনের সার্থক রূপায়ণে ভুলোর কথা কখনো ভোলা সম্ভব হবে না। ভুলোও আমাদের সঙ্গে আসছে। ফেরার পথে খুব একটা বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হচ্ছে না। বিকেল প্রায় চারটার সময় আমরা ধানছোর আশ্রয়ে পৌঁছালাম। ধানছোতে আমাদের ফেলে যাওয়া এক সাথী আমাদের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে পথ চেয়ে আছে। তার মনে দুশ্চিন্তা —কি জানি কি হয়। আমরা যখন ফিরলাম তখন তার আর আনন্দের সীমা নেই। আমাদের পেয়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন সে। বুকে জড়িয়ে ধরল আমাদের। আমরাই মণিমহেশের শেষ যাত্রী। এর পর আর কেউ এই সময়ে মণিমহেশে আসেনি। আর কোন অভিযাত্রীদলকে এ-পথে আসতে দেখিনি। আজ আমরা খুবই খুশি। বিশেষ করে আমি খুবই আনন্দিত। কারণ সকলেই আমাকে মণিমহেশ যেতে নিষেধ করেছিল। একমাত্র মনের জোরেই আমি মণিমহেশ দর্শন করে এলাম।

ধানছোতে রাত কাটানো হল। কঠিন ঠাণ্ডায় আজও ঘুম হল না। আগুন জ্বালিয়ে আমরা সকলে মিলে আগুনের পাশে বসে রাত কাটিয়ে দিলাম। ভোর হতেই শুরু করলাম হাঁটা। এখন আমরা হাড়সার গ্রামে চলেছি। সেখানে আর এক সাথীকে ফেলে এসেছি। ধানছো থেকে হাড়সার গ্রাম ১২ কিঃ মিঃ। এই পথটুকু এখন আমরা অক্লেশে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছি। কারণ পথের সবটুকুই উতরাই। বেলা প্রায় বারোটা। হাড়সার গ্রামে পৌঁছাতে আর বেশি দেরি নেই। খুব পিপাসা পেয়েছে। একটি ঝরনার ধারে বসে পড়লাম। অনেক আগেই বিপদসীমা পার হয়ে এসেছি। আর এক ঘন্টা হাঁটলেই ফেলে-যাওয়া বন্ধুকে ফিরে পাব। হাড়সার গ্রামে দারুণ উৎকণ্ঠায় সে আমাদের অপেক্ষায় দিন গুণছে। ঝরনার জল পান করে পিপাসা মেটালাম। কিছু খাবার বার করে ভুলোকে দিতে গিয়ে হতবাক্‌! কই ভুলো? এতক্ষণ তো ভুলো আমাদের সঙ্গেই ছিল। তবে কোথায় গেল? ভুলো—ভুলো। কত চিৎকার করে ডাকলাম। পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল আমাদের ডাক। না, নেই, ভুলো নেই। ভুলো আমাদের ডাকে আর ফিরে এলো না। তার জন্যে আমাদের সকলেরই মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি—ভুলোর জন্যে সেদিন সেই মুহূর্তে চোখের জল চেপে রাখতে পারিনি। ভুলোর কথা কোনদিনই ভুলতে পারব না। ভুলো আমার মানসপটে চিরদিন চিত্রিত হয়ে থাকবে। মণিমহেশজীর অনিন্দ্যসুন্দর জ্যোতিঃ যেমন কোনদিনই ভোলা যায় না, ভুলোকেও তেমনি কোনদিন ভোলা যাবে না। ভুলো আমাদের সকলকে ভুলিয়ে কোথায় চলে গেল।

ষৎকিঞ্চিৎ

"মানবসম্পদ"

স্বামী ভৈরবানন্দ

ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে সকল কর্ম, সকল চিন্তা এবং সকল প্রেরণার মূলে রয়েছে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা। সে-আকাঙ্ক্ষা হলো সত্যকে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষা। এই সত্যের উপলব্ধি এবং আত্মস্বরূপের উপলব্ধি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে সমার্থক। আমার মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজ করছেন। তাই স্বরূপতঃ আমিই স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর অনন্ত শক্তিমান। যেহেতু আমিই স্বরূপতঃ ঈশ্বর, আমার মধ্যেও রয়েছে অনন্ত শক্তি, অনন্ত সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের উপনিষদ্, ভারতবর্ষের গীতা, ভারতবর্ষের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থাদি এই তত্ত্বই স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচার করে আসছে। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য, নানক, কবীর, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সকলেই তাঁদের জীবন ও বাণীতে এই তত্ত্বটিকে উজ্জ্বল করার, পরিস্ফুট করার প্রয়াস করেছেন। ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সবকিছুর মূলে আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাই যে ক্রিয়াশীল ছিল তা ভারতবর্ষের ইতিহাস ভালভাবে অনুধাবন করলে আমাদের কাছে ধরা পড়বে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষানীতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের আত্মশক্তির যথার্থ উদ্বোধন। যদি শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে মানুষকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত না করতে পারে তাহলে সেই শিক্ষার কি মূল্য? শিক্ষা তখনই সার্থক যখন তা মানুষের সহজাত শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটায়। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সব থেকে বড় ত্রুটি এইখানে যে, এখানে মানুষের সহজাত শক্তি ও প্রতিভার বিকাশের দিকে বেশি দৃষ্টি ও গুরুত্ব না দিয়ে পুঁথিগত জ্ঞানের উপরে অধিকতর দৃষ্টি ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই; কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যে সত্যিকারের প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটছে না। ব্যাপারটি খুবই দুঃখের। উদ্বেগেরও বটে।

স্বামী বিবেকানন্দকে বিষয়টি খুবই বিচলিত করেছিল। তিনি নানাভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার দিকে। তিনি জানতেন, যদি ভারতবর্ষ তার শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী আত্মশক্তির বিকাশের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেয়, তাহলে দেশ ও জাতির জীবনে নেমে আসবে একটি চরম অবক্ষয়ের অধ্যায়। তাঁর মতে শিক্ষার সংজ্ঞা হল: "Education is the manifestation of the perfection already in man"—মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশের নাম শিক্ষা। তিনি বলতেন, মানুষের শক্তির অসাধ্য কিছু নেই। মানুষ যখন আত্মবিশ্বাসী হয়, অর্থাৎ তার অন্তর্নিহিত শক্তিতে সে আস্থাবান হয় তখন সে বাস্তবিক অন্য একটি মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে এই রূপান্তর ঘটানো।

সম্প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের নামকরণ করা হয়েছে 'মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক' (Ministry of Human Resource Development)। খুব সুন্দর নামকরণ। অভিনবও বটে। মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকার এই নামকরণ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে স্বামীজীর আদর্শের দ্বারা এবং পরোক্ষভাবে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এখন বাস্তবে দেখার, এই মন্ত্রক যথার্থভাবে ভারতীয় আদর্শ বা স্বামীজীর ভাবের অনুশীলনের উপর কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতিতে যদিও নৈতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু যথার্থ আত্মোন্নতি বা অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির বিকাশে নয়, তা সর্বতোভাবে জাগতিক উন্নতির স্তরেই

সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। এ-বিষয়ে সরকার, শিক্ষাবিদ্ এবং অভিভাবকদের বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। কারণ, এর মধ্যেই নিহিত আছে শিক্ষার মূল কথাটি।

মানবসম্পদ বিকাশের অর্থ আত্মার ঐশ্বর্যের বিকাশ। আত্মাকে অস্বীকার করে শুধু দেহে বা জাগতিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলে যাবতীয় শিক্ষা ও উন্নয়ন-প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বহু শিক্ষা-প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত প্রকল্পে ধর্মকে উপযুক্ত স্থান দেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করা হয়নি। 'ধর্ম' বলতে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে ধর্ম বলতে আমরা কোন্ ধর্মকে বুঝব। হিন্দু অথবা ইসলাম অথবা খ্রীস্টান অথবা অন্য কোন ধর্ম? ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে কোন একটি বিশেষ ধর্মকে অনুশীলন করার কথা ভাবা যায় না। সেকথা ঠিক। কিন্তু গোড়াতেই যে ভুলটি আমরা করে বসি তা হচ্ছে এই: ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় অথবা ধর্মমত-বিশেষের প্রতি অপক্ষপাতিত্ব নয়। ধর্ম বলতে ধর্মমতকে বোঝার জন্যেই এই ভ্রান্তিটি আমাদের হয়। ভারতবর্ষ যখন ধর্মের কথা বলে তখন তা ধর্মমত নয়, তা মানুষের ধর্ম—যা ব্যক্তিকে, সমাজকে, দেশকে এবং জাতিকে ধারণ করে রাখে। আর তাই হল আসল মানবসম্পদ। সেই ধর্ম কি? মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে:

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (অচৌর্য) শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। এগুলির সারমর্ম হচ্ছে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা নিঃস্বার্থপরতা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা। বস্তুতঃ এগুলিই প্রকৃত মানবসম্পদ। এই সম্পদ বা ধর্মের অনুশীলনের কথা বলা হলে কোন সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ থাকে না। কারণ এগুলি সব ধর্মেরই স্তম্ভস্বরূপ। মানবসম্পদ বিকাশ অর্থে যদি এগুলির বিকাশ সাধন হয়, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয়। অবশ্য এই গুণগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশও মানবসম্পদ বিকাশের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষ তার দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে পরম যত্নে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, জাগতিক উন্নতি ও অন্তর্জীবনের উৎকর্ষ এই দুটি ধারাকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: সে কখনও জাগতিক সমৃদ্ধিকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেনি। তার জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে সে বিশ্বাস করে এসেছে—মানুষের পূর্ণত্ব বিকাশের আশ্বাস যদি মানুষের জীবনদর্শনে না থাকে, অন্তর্জীবনের গভীরে ভূমার আনন্দকে স্পর্শ করার অঙ্গীকার যদি না থাকে, তাহলে জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছিলাম। নিরপেক্ষতা অর্থে কি বোঝায়? নিরপেক্ষতার আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় সেনাদলের মাঝখানে নিরপেক্ষ ভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বকালের মহত্তম তত্ত্ব গীতা উপদেশ দিয়েছেন। বাইরে নিরপেক্ষ ভূমি, ভিতরে নিরপেক্ষ মনোভাব আর গীতারূপ নিরপেক্ষ তত্ত্ব প্রচার। নিরপেক্ষ মানে যা কারো উপরে নির্ভরশীল নয়। যা স্বয়ংপ্রকাশ, যা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে মানুষের একমাত্র নিরপেক্ষ ভূমি, একমাত্র নিরপেক্ষ সম্পদ। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি বলছেন: "Science can de-nature plutonium, but it cannot de-nature the evil in the heart of man"—বিজ্ঞান প্লুটোনিয়ামের মতো সূক্ষ্ম ধাতুর চরিত্র পরিবর্তন করে দিতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের মধ্যস্থিত অপরাধপ্রবণতা দূর করতে পারে না। তা পারে একমাত্র ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। তাই ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাই হলো প্রকৃত মানবসম্পদ। সেই সম্পদের বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি]

এ জীবন এইভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। অতিশয় বেগবতী নদী যেমন উপলখণ্ডের বাধা মানে না, মনও সেইরূপ নিন্দা প্রশংসার বাধা মানে নাই, সামাজিক নিয়মেরও বাধা কখনও মানিয়া চলে নাই। কিন্তু একটু বিশেষত্ব ছিল—মন যাহা মনে করিত "ইহাই বিধি", প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিত। তাহা কেবল এই দিকেই লক্ষ্য থাকিত, যাহা নিয়ম তাহা যেন সর্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়। এইজন্য দীক্ষা লইবার পর পূজার্চনায় যখন মন নিবিষ্ট হইল, তখন সে এক বিষম রাজসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। পূজায় ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি ষোড়শোপচারের কোন অঙ্গহানি হইত না। পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে দিবা অবসানপ্রায় হইত। মা আমার, আমার জন্য অনাহারে প্রসাদ লইয়া বসিয়া থাকিতেন, কোনদিন একটুও অনুযোগ করিতেন না। কিন্তু আর সকলেই, এমনকি, পিতা পর্যন্ত আমার এই বিষম বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইতেন।

তবুও তো মনের সেই উৎকণ্ঠার অনলদাহ নিবিল না। তৃপ্তি কোথায়? —কিছুদিন মন মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া "একটা কিছু পাইয়াছি"—বলিয়া যেন কতক শান্ত ছিল, কিন্তু আবার যত দিন যাইতে লাগিল, "দীক্ষা লইয়া কি পাইলাম" মনে ক্রমশঃ এই বিচার উঠিতে লাগিল। পূজার্চনার নিরূপিত সময় ক্রমেই যত বাড়াই, ব্যাকুলতাও তত বাড়িয়া যায়। "কোথায় তুমি হে উপাস্য, আমার আকাঙ্ক্ষার নিধি। এ-জীবনে ধরা তো দিলে না। তবে আর এ বৃথা জীবন বহন করিয়া ফল কি? প্রতিদিন এই সকাল, এই সন্ধ্যা, এই আহার নিদ্রা নিত্যকর্ম ইহা ভিন্ন জীবনে আর কি আছে? পূজার্চনা,—সেও তো নিয়মিত নিত্য কর্ম মাত্র। এমন জীবন আর আমার সহ্য হয় না।" একদিন স্নান করিতে গিয়া মনে মনে স্থির সংকল্প করিলাম, "এ-জীবন আর রাখিব না।" দুর্দম মনোবেগ আজ আমাকে আত্মহত্যারূপ পাপের পথে প্রবৃত্ত করিল।—সাঁতার দিতে আমি মৎস্যের মতো পটু, তবে কেমন করিয়া ডুবিব? জল লইবার জন্য যে কলসী আনিয়াছিলাম, তাহাই গাত্রমার্জনী সাহায্যে দৃঢ় করিয়া গলায় বাঁধিলাম, বাঁধিয়া ধীরে ধীরে নদীতে নামিয়া নিশ্চিন্তমনে জলে ডুবিলাম। জলে ডুবিতেছি বলিয়া মনে কোনও বিশেষ ভাবের উদয় হইল না।

জলে ডুবিয়াই প্রথমে সমস্ত শরীরে কি যেন এক ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল, আমার সমস্ত লোমকূপ দিয়া তাড়িৎপ্রবাহ নির্গত হইতেছে, আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন শত শত তারা জ্বলিতেছে, পদতল হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত কি যেন এক তাড়িৎপ্রবাহ ছুটাছুটি করিতেছে। আমার নিজের অনিচ্ছাতেও গলার কলসী খুলিয়া ফেলিবার জন্য কতই চেষ্টা করিলাম। তখন জলে ডুবিয়া মরিতেছি অথবা কি করিতেছি তাহা কিছুই বোধ ছিল না; তখন সেই দুঃসহ অনির্বচনীয় যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা—ইহাই কেবল অনুভবের আয়ত্তে ছিল।

কিন্তু সে যন্ত্রণা আর অধিকক্ষণ রহিল না, তাহার পরেই যেন স্বপ্নের আবেশের মতো একটা ভাবের শীতলস্পর্শে সকল যন্ত্রণা জুড়াইয়া গেল। মনে হইল যেন অগাধ স্বপ্নসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছি। জীবনের প্রতিদিনের কত শত ঘটনা ধীরে ধীরে স্বপ্নের মতো আমার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, কোন ঘটনা সুখের রাগে রঞ্জিত ও কোনটি দুঃখাশ্রুতে অভিষিক্ত। কিন্তু সে সকল অতীত সুখ দুঃখ এখন আর মনকে স্পর্শ করিতেছে না,

অতি লঘু মেঘের মতো কেবল মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে মাত্র। কেবল এক অপূর্ব শান্তি-প্রবাহ এই সলিলপ্রবাহের মতো অথবা জননীর বাহু বেষ্টনের মতো আমার প্রাণ মন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আঃ, সে কি শান্তি! যেন আমি বহুদিনের পরিশ্রান্ত, আমার চক্ষে আজ মধুময় নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে। ক্রমশঃ সেই সুষুপ্তি-সমুদ্রে আমি একেবারে ডুবিয়া গেলাম। ডুবিয়া গিয়া এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। সে কি স্বপ্ন, না প্রত্যক্ষ দর্শন? তাহা আমি এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। স্বপ্নই হউক অথবা সত্যই হউক যাহা দেখিলাম, সোহাগা যেমন স্বর্ণের সঙ্গে একেবারে গলিয়া মিশিয়া যায়, আমার জীবনের সঙ্গে তাহা যেন একেবারে মিশিয়া গেল। যে স্বপ্ন নিবিড় আনন্দতুলিকায় চিত্রিত; এমন আনন্দ, যে, সে কেবল অনুভবের সামগ্রী. বাক্য তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

গভীর স্বপ্নে ডুবিয়া আমি যে কোথায় ছিলাম, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি জলের উপর ভাসিতেছি, গলায় কলসী কি জানি কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছে। এত দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিলাম, তাহা কেমন করিয়া খুলিল ভাবিয়া আশ্চর্যবোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, সেদিন আত্মহত্যার বাসনা একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিলাম।

তাহার পর জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমার কোন আত্মীয় কাশীধামে গিয়া কিছুদিন যোগ অভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি গৃহে আসিলে কেহ কেহ তাঁহার নিকট 'ক্রিয়া' লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। এই 'ক্রিয়া' পদার্থটি কি জানিবার জন্য আমারও মন কিছু উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা 'ক্রিয়া' লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, তাহারা যখন কেহই প্রার্থনা করিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইল না, তখন অগত্যা আমারও সেবিষয়ে ঔৎসুক্য পরিহার করিতে হইল। কিন্তু একদিন, কেন জানি না তিনি নিজেই আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,"তুমি ক্রিয়া লইবে?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাতে ফল কি হইবে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাহ্য বিষয় হইতে মন বিনিবৃত্ত হইয়া যাহাতে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, এই 'ক্রিয়া'র ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।" অনেকে প্রার্থনা করিয়াও যাহা পায় নাই, আমি শ্যামসুন্দরের কৃপায় অযাচিতভাবে তাহাই পাইলাম ভাবিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইল। যে অবধি তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলাম, নিদ্রা সেই অবধি একেবারে আমাকে পরিত্যাগ করিল। পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিদ্যার্থী যে ভাবে রজনী যাপন করে, সমস্ত রজনী 'ক্রিয়া' লইয়া আমি সেইভাবেই যাপন করিতাম। কখনও বা গুরুদেবের চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইত। রাত্রিকালে—আমি রমণী—আমার পক্ষে এরূপভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া নিতান্তই অবিধেয় ভাবিয়া মনকে সংযত করিতাম। কিন্তু আমি যে রমণী, তাহা তো সকল সময় স্মরণ থাকিত না। আমার এই ক্রিয়া লইবার কথা কেবল আমার মা ও ছোট ভাই চণ্ডী জানিতেন। মাকে বলিতাম, "মা, তুমি আমার ঘরের দরজায় শিকল দিয়া রাখিও। কি জানি হঠাৎ যদি আমি মনের ভুলে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাই, তবে লোকে তোমাদের নিন্দা করিবে।"

আমার সেসময়ের মনের অবস্থা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ঘরে আগুন লাগিলে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য লোকের যেমন আগ্রহ হয়, আমারও গৃহত্যাগ করিবার জন্য সেইরূপ মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সংসার যেন দাবানলের মতো মনে হইত; লোকে যেসকল সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিত, তাহা যেন আমার কর্ণরন্ধ্র দগ্ধ করিত। নিদ্রা তো পূর্বেই গিয়াছিল, তখন আহারেও বিষম বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। লোকের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। একবাটি ঘি আমার সমস্ত দিনের আহার ছিল, কিন্তু ঘি পুষ্টিকর দ্রব্য বলিয়া শরীর বিন্দুমাত্র দুর্বল হয় নাই। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সহসা একদিন একখানি মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটি প্রবন্ধ চোখে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধটির নাম "করমেতি বাঈ"। প্রবন্ধটি পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। ক্রমশঃ যখন পড়িলাম, কৃষ্ণের উদ্দেশে গৃহত্যাগিনী বালিকা

করমেতি আত্মীয় স্বজনের চক্ষে পড়িবার ভয়ে গলিত উষ্ট্রের উদরগহ্বরে কেবল কৃষ্ণ নামামৃত পান করিয়া তিন দিন যাপন করিলেন, তখন আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল; হাত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল, ইহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার পর আর বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না।

সাতদিন সেইরূপ অচৈতন্য অবস্থায় চলিয়া গিয়াছিল। বাবা সপরিবারে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, বাড়িতে কেবল একা আমি ছিলাম। আমি কাহারও সহিত মিশিতে ভালবাসি না বলিয়া কেহ আমার বড় একটা উদ্দেশ লইতেন না। কেবল একজন—তাঁহাকে আমি মাসিমা বলিতাম—তিনিই মাঝে মাঝে আমার খোঁজ লইতেন। সাতদিন পরে তিনিই আসিয়া আমার উদ্দেশ লইয়াছিলেন।

গৃহে আর কিছুতেই থাকিব না। এতদিনে সমুদায় দ্বিধা একেবারেই ছিন্ন হইয়া গেল। এবার কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলিলাম। সে কোথায়? কোথায় তাঁহার উদ্দেশ পাইব? তখনই মনের ভিতর হইতে উত্তর পাইলাম, করমেতি যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে—সেই বৃন্দাবনে।

শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহির হইলাম। শ্যামসুন্দর! তুমি তো এই ঘরেই ছিলে, তবে ঘর ছাড়িয়া আবার কোথায় তোমাকে খুঁজিতে চলিলাম? আমি তাহা জানি না। ঘরে যখন ছিলাম, তুমিই আমাকে গৃহে রাখিয়াছিলে; আজ যে পথে বাহির হইয়াছি, তুমিই আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ। কোথায় লইয়া যাইতেছ, তুমিই তাহা জান।

আজ আমি রাজপথে দাঁড়াইয়া আছি। আমার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, সঙ্গীও কেহ নাই। একি আনন্দ, একি মুক্তি! এই যে বিচিত্র লোকপ্রবাহ রাজপথ দিয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ, আমি একক। সঙ্গের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসঙ্গের পরিপূর্ণতায় আমার চিত্ত আজ ভরিয়া উঠিয়াছে।

আমি পথের একধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটি ছোট ছেলে আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। ছেলেটির বয়স ৬/৭ বৎসর হইবে। কি যে তাহার সুন্দর মুখখানি—যেন ভালবাসায় মাখা! আঁচল ধরিয়া টানিয়া সে আমাকে কি যেন বলিতেছিল, কিন্তু আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না, কেবল "বম্ বম্ মহাদেব জয় শিব শংকর" ধ্বনিই কানে আসিতেছিল। আমি তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি না দেখিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। অল্প দূরে দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট একখানি বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির দরজায় নিয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাবা, তুমি আমাকে এখানে আনিলে?" সে হাসিয়া বলিল, "মা তোমায় ডাকছেন, ঐ দেখ মা আসছেন।" তাহার নির্দেশ মতো চাহিয়া দেখিলাম, দরমা-ঘেরা উঠান দিয়া মা আসিতেছেন, মা-ই বটে, মুখের দিকে চাহিলেই মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। মা আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি ঐ জানালা দিয়া দেখিলাম, আপনি ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মনে হইল, যেন আপনার আজকালের ভিতর কিছুই আহার হয় নাই। তাই খোকাকে দিয়া আপনাকে ডাকাইয়াছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন কি?" আমি মায়ের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। "যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি", আশ্চর্য হইয়া ভাবিলাম, "ইনি তাহা কি করিয়া জানিলেন। রাজপথ দিয়া তো কত লোক যাতায়াত করে, কে কাহাকে দেখে, কেই বা কাহার উদ্দেশ লয়? এমন কে আছে, যে পথের লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, 'তুমি কি অনাহারে আছ?'—এই বিশাল জনতার একপার্শ্বে যে একজন গৈরিকবস্ত্রধারিণী দাঁড়াইয়া আছে, গৃহস্থবধূর তাহার দিকেই বা দৃষ্টি পড়িল কেন?"* [ক্রমশঃ]

উদ্বোধন, ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২২-২৮

রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিকতা

আশাপূর্ণা দেবী

রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে আজ পর্যন্ত এত আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে যে, আবার তার ভিতরে এরকম একটি সামান্য প্রবন্ধ লেখা, যেন সমুদ্রে এক ফোঁটা জল ফেলার মতোই অর্থহীন। আবার এও সত্যি রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। ও যেন অনন্ত অফুরন্ত। 'অনেক তো বলা হলো' বলে থেমে যাবার জিনিস নয়, আরো অনেক বলবার থেকেই যাবে। যেমন বৈষ্ণবকাব্য কখনো ফুরোবে না। কারণ বৈষ্ণবকাব্যের যে কাব্যরস, সে-রস নরনারীর পার্থিব প্রেমের নয়। তার মধ্যে রয়েছে ভগবৎচেতনা। ঠিক একই কারণে রবীন্দ্রকাব্যও কোনদিন ফুরিয়ে যাবে না। তার মধ্যে যে একটি অনির্বচনীয় ঈশ্বরপ্রেমের চেতনা আছে, তাকে যুগান্তকালের পথে বহন করে নিয়ে চলবে বহু হৃদয়ের উপলব্ধির রসধারা। বহু চিন্তাশীলের নতুন নতুন চিন্তার আলোকসম্পাতে তার থেকে দেখা দেবে নতুন অর্থ।

রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে জীবনের নানা প্রশ্নের উত্তর আছে। আছে জীবনযুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিধা, সমস্ত সন্দেহ নিরসনের অবকাশ। জীবনের এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়নি? এমন কোন্ বিষয়বস্তু আছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের অনুশীলনীশক্তি আকৃষ্ট হয়নি? আবার এমন কোন্ ভূমিকা আছে যা তিনি গ্রহণ করেননি? সৃষ্টির এমন সম্পূর্ণতা সাধারণতঃ দেখা যায় না। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্বের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যেন প্রাণ পেয়েছে তাঁর লেখনীর সঞ্জীবনী মন্ত্রে। সুখে দুঃখে বেদনায় আনন্দে মিলনে বিরহে ভোগে ত্যাগে, মানুষের মনে বোধ হয় এমন কোন ভাবের উদয় হতে পারে না, যাকে প্রকাশ করবার ভাষা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর পরিধির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ এক অলৌকিক প্রতিভা।

যে যখনই সেই বিরাট প্রতিভার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে, সে-ই বিস্মিত হবে, অভিভূত হবে। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশ এমনই বিরাট যে, তার সমগ্রতাকে যেন উপলব্ধিতে আনা যায় না।

সে প্রতিভা তো বিশেষ কোন বা বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। বিষয় নির্বিশেষে তার অপূর্ব বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন যেন এক আশ্চর্য যাদুদণ্ড হাতে নিয়ে। সেই অদ্ভুত আশ্চর্য যাদুদণ্ড যাতেই ঠেকিয়েছেন, তা-ই সোনা হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের মতো এমন অনন্ত প্রতিভার অধিকারী হয়ে জন্মানো পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও চিন্তাশীল, বিপ্লবী ও সংগঠক, সাধক ও সংগ্রামী।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমুদ্রের তীরে এসে যদি বসি, অভিভূত বিস্ময়ে ভাবতে হবে—আমরা আমাদের প্রাণের প্রণাম জানাবো কাকে? কবি রবীন্দ্রনাথকে? দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে? জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে? না বিশ্বমৈত্রীর সাধক লোকোত্তর রবীন্দ্রনাথকে?

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ভারতবর্ষকে দিয়েছে এক নতুন দৃষ্টি। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ভারতকে যে-আদর্শ দিয়ে গেছেন, সে-আদর্শ হচ্ছে ত্যাগের আদর্শ।...তাঁরা বলেছেন 'বৈরাগ্যের পথ দিয়েই আসে আনন্দ, আসে মুক্তি'।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আনন্দময় চেতনা দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছেন প্রেমের দৃষ্টিতে, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। তাই রবীন্দ্রসৃষ্ট একটি চরিত্র, তাঁর

একটি কবিতার মধ্যে পতিবিয়োগবিধুরা মৃত্যুপণকারিনী এক বিধবা নারীকে উদ্দেশ করে সহজেই বলতে পেরেছেন ঃ

ধরা ছাড়ি, কেন নারী স্বর্গ চাহ তুমি ?
···হে জননী, স্বর্গ যাঁর···
তাঁহারই কি নহে, এ ধরণীভূমি ?

আমাদের এই স্বর্গ-সাধনার দেশে, এত বড় সাহসের কথা, আর এভাবে কজন বলতে পেরেছেন ?

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরসৃষ্ট সেই ধরণীর রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণকে অবহেলা করে বৈরাগী হতে রাজি নন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন ঃ

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়।
লভিব মুক্তির স্বাদ।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার, রুদ্ধ করি যোগাসন
সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে—দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

যেদেশে অনেকে মনে করেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে ঈশ্বরের ধ্যানে বসা সাধনার প্রথম কথা—এবং শেষ কথা, সে-দেশের সামনে সাহস করে এই কথা বলা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যাঁর নিজের জীবনে এ-সত্যের প্রতিফলন হয়েছে।

এই কবিতাটিই যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ। তাঁর জীবনের এই পরম সত্যকে তাই তিনি কথায় কবিতায় গানে সুরে বারে বারে শুনিয়েছেন। বলেছেন ঃ

আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি—
অরূপরতন আশা করি।

বলেছেন ঃ

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে—
এসো গন্ধে বরণে এসো গানে।

এই হচ্ছে রবীন্দ্রদর্শন।

সুন্দরের মধ্যে, সুরের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, উপভোগের মধ্যে তাঁর জীবনদেবতার উপলব্ধি।

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর এই উপলব্ধি। জীবনদেবতাকে তিনি দেখেছেন অসংখ্য রূপে, আর অনির্বাণ প্রেমের আলোকে। নিবেদিত প্রাণের প্রেমে গড়া তাঁর সঙ্গীতগুলি যেন সত্যই দেবতার এক-একখানি নৈবেদ্য। সে-সঙ্গীত দেহবাদী সাধারণ মানুষের কাছেও যেন এনে দেয় দেহাতীত সৌন্দর্যের সন্ধান। এর স্বরূপ বোঝাতে কবির ভাষাতেই বলতে হয় ঃ

দেবতারে যাহা দিতে পারি
দিই তাই প্রিয়জনে।
প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে।
আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র, শুধুমাত্র অসাধারণ কবিত্বশক্তিরই অধিকারী হতেন, তাহলে তিনি বিশ্বকবি আখ্যা পেতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর কাব্যের এই আধ্যাত্মিকতাই বিশ্বমানবাত্মার সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘটিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা শুধুমাত্র মাটির পৃথিবীর গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকেনি। সে-চেতনা মাটির অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছে। এখানে তিনি এক বিরাট সাধক পুরুষ।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, কৃচ্ছ্রসাধনা আর কঠোর তপশ্চর্যা করে যে মোহমুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হন, রবীন্দ্রনাথের গানের সাধনায় ধরা দিয়েছে সেই মোহমুক্ত জ্ঞান। তিনি জীবনকে আর মৃত্যুকে একই চক্ষে দেখতে পেরেছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন—দিন আর রাত্রির মতোই জীবন আর মৃত্যুর অন্তহীন লীলারহস্য।

জীবাত্মাকে নিয়ে পরমাত্মার এ যেন এক বিরতিহীন লুকোচুরির খেলা। এ খেলা কবির কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁর

অভিযোগ নেই, আছে দেবতার কাছে আত্মসমর্পণের মন্ত্র ঃ

ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বামহাত হতে ডানে,
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কে বা জানে।
খুলে দাও ক্ষণতরে, ঢেকে দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারই কী ধন
কে লইল বুঝি হরে।
দেওয়া নেওয়া তব সকলি সমান
সে কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

এত সহজ ভাষায় এমন কঠিনতম তত্ত্বকে বোঝানো শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

জীবমাত্রেরই জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা দুর্বার ভয়কে কেন্দ্র করে। সে-ভয় মৃত্যুভয়। এ ভয়কে জয় করবার সাধনা কঠিন, তাই জীব এই ভয়কে চোখ বুজে অস্বীকার করতে চায়। ··· যা অলঙ্ঘ্য তাকেই লঙ্ঘন করব, যা অপ্রতিরোধ্য তাকেই প্রতিরোধ করতে চাইব, যা সবচেয়ে নিশ্চিত তাকে কিছুতেই নিশ্চিত বলে ভাবব না, এই হচ্ছে মানুষের চিত্তবৃত্তি। তাই মৃত্যুকে আমরা কিছুতেই দিন-রাত্রির মতোই সহজ বলে মেনে নিতে পারি না, তাই প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলে উন্মত্ত শোকে আত্মহারা হই।

এই উন্মত্ততাকে শান্ত করতে, এই শোকে সান্ত্বনা দিতে, কবি অনেক কথা ব্যয় করেননি, শুধু প্রশান্ত কণ্ঠে বলেছেন ঃ

ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে, ফিরে নিতে চাহি মিছে,
সে কি আমাদের ?
পলকে বিচ্ছেদে হায়, তখনি তো বোঝা যায়
সে যে অনন্তের !

মহা তত্ত্বজ্ঞানীর তত্ত্ব-উপদেশের সার অর্থ নিহিত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটির মধ্যে।

মৃত্যুর ওপারে যে অনন্ত আর এক জগৎ আছে, এ সত্য প্রমাণের কোন পথ নেই, তাই এ নিয়ে তর্কেরও শেষ নেই। কিন্তু যুক্তি তর্ক আর প্রমাণের সীমানার অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছে ধ্যানের জগৎ। সে-জগতের প্রবেশপত্র আছে শুধু অনুভূতিশীল ভাব-সাধকের কাছে। সেই ধ্যান ধারণার সত্য, সেই অজানা জগতের বাণী, তাঁরা বহন করে এনে দেন উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির মাটির জগতের কাছে। মানুষের শান্তির জন্য, সান্ত্বনার জন্য, কঠিনতত্ত্বকে সহজ করে প্রকাশ করতে চেষ্টার আর অন্ত নেই তাঁদের। রবীন্দ্রকাব্যে এমন কত কঠিন তত্ত্বই কত সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে! সেই সহজ দানের প্রসাদ পেলে, সেই অনন্ত উপলব্ধির কণামাত্রেরও আস্বাদ অনুভূত হলে, স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়, শান্ত হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, সেই দুরূহ তত্ত্ব, আপন জীবনের মধ্যে কতটা সহজ হয়ে উঠলে তবেই এত সহজে তা প্রকাশ করা সম্ভব!

'রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, আজ নেই' একথা বললে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আজও আমাদের মধ্যে আছেন। যুগ-যুগান্তকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে থাকবেন। থাকবেন আমাদের চেতনার মধ্যে, আমাদের সমগ্র সত্তার মধ্যে, আমাদের ঐতিহ্যের প্রবহমান গতির মধ্যে।

পরমপদকমলে

হাসছে কেমন!

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অতি সাবধানে চলাফেরার জায়গা এই পৃথিবী। কবে কোন্ ছেলেবেলায় সেই পড়েছিলুম—পথে বড় রিপুভয়। ছোকরা সে কথা কি শুনেছে! আলগা মুঠো থেকে 'আমি'-টা খুলে পড়ে জীবন-অরণ্যে হারিয়ে গেছে। সবাই সব কিছু শেখাবার চেষ্টা করলেন, হাতে তুলে দিলেন জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার; কিন্তু মনটাকে মুঠোয় ধরার কৌশল কেউ শেখালেন না। পথ আর বিপথ চিনতে চিনতেই—খেল খতম, পয়সা হজম।

মদের নেশার মতো জীবনেরও একটা নেশা আছে। এটা, ওটা, সেটা নিয়ে একেবারে মত্ত মশগুল। নিত্য আর অনিত্যের জ্ঞান ছাড়াই ছোটাছুটি। একশোজন প্রবীণ মানুষকে একত্র করে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'মশাই বেঁচে থেকে কি পেলেন?' প্রায় সকলেই বলবেন—'ঘোড়ার ডিম, বাতি যত পুড়ল খেলা কিন্তু তেমন জমল না। শূন্য ঝুলি, সম্বল শুধু বুলি।'

'কেন? নামের পেছনে ডিগ্রি, ডিপ্লোমার লেজ খেলছে, বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, সুন্দরী স্ত্রী, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, তথাপি এমন মনমরা কেন?'

'কি যেন একটা নেই। জীবন তরকারিতে সব আছে, হালুইকর কেবল লবণটা দিতে ভুলে গেছে। সেই লবণ হলো সুখ আর শান্তি।'

'কেন? ওই যা যা ধরেছেন, তাতে সুখ নেই?'

'যা ধরা যায়, তা আবার ধরা মুঠো থেকে পালাবার জন্যে ছটফট করে। তাকে বাগে রাখাটাই তখন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে এক মহা কোস্তাকুস্তি। আর সেই অধরা, আপনি এসে ধরা না দিলে, যাকে চেষ্টায় ধরা যায় না, সেই অধরার জন্যে মনের নির্জনে একটি আসন পাতা হল না। যাঁর কৃপার কণিকামাত্র পেলে জীবন পূর্ণ হতে পারত, সেই কৃপার সন্ধান করা হল না। যা পেয়েছি তা হারাবার ভয়েই তটস্থ। এই যে ঠাটবাট, এর জন্যে মাসে মাসে প্রয়োজন প্রায় হাজার দশেক টাকা। সেই ধুনোর জোগাড়েই সারাটা দিন উন্মাদ, আরতি আর করা হল না। শান্ত হয়ে না বসলে শান্তি কি আসে! নিজের ভুলে নাম লিখিয়েছি দৌড়-প্রতিযোগিতায়। সারাটা জীবনই এই ট্রাকে দৌড়তে হবে।'

'যদি বেরিয়ে আসেন!'

'ভয়! জীবনযাত্রার মান পড়ে যাবে। পরিবার-পরিজন ধরে চাবকাবে। প্রতিবেশীরা দুয়ো দেবে। অভ্যাসের খাঁচা খুলে এ পাখি আর কোনও দিনই বেরিয়ে আসতে পারবে না। সংসারের খাঁচায় পোষা পাখি। ওরা ছোলা দিয়ে, নেশা দিয়ে মৌতাতে রেখেছিল। শিস দিয়ে শিখিয়েছিল বুলি। জানত ডানার জোর কমে এলে খাঁচা খোলা থাকলেও বুড়ো পাখি আর উড়বে না। ঘরে ঘরে অদৃশ্য অভ্যাসের খাঁচায় কর্তাপাখি কপচাচ্ছে। পরিবার পরিজন এসে একবার করে বলে যাচ্ছে—রাধেকৃষ্ণ। কেউ আবার বলছে—বুড়ো চন্দনাটাকে অনেক দিন লাল লঙ্কা

খাওয়ানো হয়নি। অমনি শুরু হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক ঝগড়া। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, ছুটছে এদিকে ওদিকে। ওগো! তোমরা থামো! কে কার কথা শোনে! সবাই নাকি হকের কথাই বলে। ন্যায্য কথাই বলছে সবাই। বুড়ো চন্দনা আবিষ্কার করে, নতুন প্রজন্ম লায়েক হয়েছে। মন বললে, 'ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে'। আর বললে কি হবে! জীবনের এই সন্ধ্যাবেলা। ঠাকুরের সেই কথাটি মনে পড়ছে, 'কুব্জা তোমায় কু বুঝায়। রাইপক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।' আমার পক্ষে আর কেউ নেই। এ, ও আসছে যাচ্ছে, বলছে, পাখি রাধেকৃষ্ণ, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত আছে? কালই যে হাজার পাঁচেক চাই। এখন কেউ এসে বেশি ধানাই-পানাই করলেই আগেভাগে জিজ্ঞেস করি, কত চাই মানিক? শরীর নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে, মন নিয়ে, মেজাজ নিয়ে ইলিবিলি করার দরকার নেই। ঝেড়ে কাশো। অমনি তারা কেশে ফেলে। জীবন লাটাইয়ে জড়ানো পরমায়ুর সুতো অনবরতই টেনে চলেছেন মহাকাল। আর জীবন কলসীতে অর্থ যা ভরেছিলুম, সবই ঢেলে নিয়ে যাচ্ছে পরিবার পরিজন। গুঁইগাঁই করলেই বলবে ব্যাটা হাড়কেপ্পন। হাত দিয়ে জল গলে না। একেই বলে বেঁধে মারা।'

'তাহলে কি পেলেন?'

'ছোট্ট একটা জীবনদর্শন। সব ঝুট হ্যায়। সবাই খেলছে। বিভিন্ন ভূমিকায়। স্ত্রীর ভূমিকায়, স্বামীর ভূমিকায়, সন্তানের ভূমিকায়। ভাবছি, পায়ের তলায় জমি আছে, আসলে কিছু নেই। আমার আমি ছাড়া কেউ নেই; আর সেই আমিটাকে সারাটা জীবন ভুল পথ্য দিয়ে এসেছি। যে প্রেম নেই, সেই প্রেমের কথা বলেছি। যে আশ্রয় নেই, সেই আশ্রয়ের ভরসায় ফেলে রেখেছি। যার কোনও নিরাপত্তা নেই তাকে বলেছি, কোনও ভয় নেই, খাসা আছো। তাকে টিনের খাবার খাইয়েছি। যে পরমার্থরূপ পরমান্ন খাওয়ালে 'আমি' সবল হতে পারত, তা খাওয়ানো হয়নি। লাভ হয়েছে আর কয়েকটি সম্পদ—রক্তে চিনি, চোখে ছানি, হৃদয়ে ধুকপুকুনি। এখন আমি যখন হাহাকার করি লোকে বলে ওই দেখ, সফল জীবন হাসছে কেমন?

আমরা যা ধরার জন্যে পাগল, তা হলো—জীবিকা। জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই আমরা ধরতে চাই ওপরওলাকে। বিষয়ী সংসারী মানুষের ওপরওলা তো ঈশ্বর নন। ঈশ্বর হলেন কর্মস্থলের বড়কর্তা। সারা জীবন সেই পদাভিষিক্তেরই অর্চনা। যাঁর কৃপা-করুণায় প্রোমোশান ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। আমরা ধরতে চাই মুরুব্বি, যাঁর সাহায্যে ছেলেকে ভাল ইস্কুলে ভর্তি করা যায়, ভাল জায়গায় ফ্ল্যাট কি একটুকরো জমি পাওয়া যায়। যাঁকে ধরলে বেকার আত্মীয় চাকরি পায়। সারাটা জীবন নানা ধরাধরিতে ব্যস্ত। চাকরি, ফ্ল্যাট, মেয়ের বিয়ে, রেলের টিকিট, ফাংশানের পাস, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, হাসপাতালের বেড। সাফল্যের বিচার, সন্তুষ্টি, তৃপ্তি, সবই এই পাওয়া-নির্ভর। জীবন যত জজবজে, ততই তার খাতির। লোকটা করিতকর্মা। কর্মযোগী। কেমন সাজিয়েছে জীবনটাকে। এই পিঠচাপড়ানিটুকুর লোভেই মানুষ যৌবনে মেতে থাকে; তারপর হঠাৎ একদিন নেশার খোঁয়াড়ি ভাঙে। তখন ঘড়িতে কিন্তু অনেক বেজে গেছে। আর বেশি বেলা নেই। তখন মনে হতে থাকে—যাঃ, আর তো সময় নেই। সেই হাত কোথায়! সেই নিশ্চিন্ততার হাত। সেই অমোঘ বন্ধনে জড়িয়ে ধরার হাত। তিনি পাশেই থাকেন, কাছেই থাকেন। অসীম তাঁর ধৈর্য, অনন্ত তাঁর অপেক্ষা। তিনি আগেই টানেন না, অপেক্ষা করে থাকেন, নজর রাখেন। সুপুরিগাছের বালদো কাঁচায় টানলে লাগবে। আগে শুকোক, তারপর আপনিই খুলে পড়ে যাবে। একজন্ম, দুজন্ম, শতজন্ম, বাসনা না ফুরোলে অনর্থক ভণ্ডামি। সে ওই ওইরকম, স্নান সেরে, ভিজে কাপড়ে এক গোছা ধূপ জ্বালিয়ে খুব হাত ঘোরানো। সেই হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে, না ঘোরালে কোথায় পাবে! এ তো হাত ঘোরাবার ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা তো মন ঘোরাবার।

আনন্দের সন্তান

রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই

সুদীপ বসু

দুই পুরুষ। একই সময়ের পটে তাঁর আবির্ভূত। একজন শাক্ত, অপরজন বৈষ্ণব। দুজনেই পরম ধার্মিক। কিন্তু সুযোগ পেলেই এক ব্যক্তি অন্যকে ঠাট্টা করেন, তাঁর লেখা গানগুলিকে ব্যঙ্গ করে গান লেখেন। অপরজনও ছাড়েন না; জবাব ফিরিয়ে দেন গানেরই মাধ্যমে। এঁদের মধ্যে একজন সগৌরবে এখনো জীবিত আছেন ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে। দ্বিতীয়ের নাম প্রায় অবলুপ্ত। এঁরা—রামপ্রসাদ এবং আজু গোঁসাই।

আজু গোঁসাই বৈষ্ণব, সদানন্দ সরল প্রকৃতির মানুষ। অনেকে সেজন্য তাঁকে পাগল বলত। তাই রামপ্রসাদ একবার কোন একটা কথার সূত্রে গোঁসাইকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"কর্মের ঘাট, তৈলের কাঠ ও পাগলের ছাট মলেও যায় না।" গোঁসাইও তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর উত্তর দিলেন—"কর্মডোর, স্বভাবচোর আর মদের ঘোর মলেও যায় না।" রামপ্রসাদ নাকি ঈষৎ কারণ পান করতেন সাধনার সময়। একবার রামপ্রসাদ একটি গান লিখলেন ঃ

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর শূন্য নয় কখন; দু-চার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥ ইত্যাদি

আজু গোঁসাইয়ের স্বভাবই মজা করা। তিনি গাইলেন ঃ

ডুবিস নে মন ঘড়িঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥
একে তোমার কফেনাড়ী ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বর-জারি
মন যেতে হবে যমের বাড়ি ॥

গোঁসাইয়ের যেন ধনুকভাঙা পণ—রামপ্রসাদ যা বলবেন, তার উল্টোটাই তিনি গাইবেন। রামপ্রসাদ যদি লেখেন ঃ

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি ॥

গোঁসাই উত্তরে গেয়ে ওঠেন ঃ

কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্ না রে তুই,
মাঠের মাঝে মারা যাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে করতে পারিস
মাঝগাঙেতে ভরাডুবি।
বাঁশবনে গিয়ে ডোমকানা হয়, এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি ॥
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে
কি ফল নিতে কি ফল নিবি ॥

রামপ্রসাদ দেখলেন মহা মুস্কিল। গোঁসাই তাঁকে নিয়ে এইভাবে মাতাল বলে ঠাট্টা করছেন। তিনিও উত্তর দিলেন, তবে অন্যভাবে। গানেই বললেন ঃ

মন ভুলনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥
সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই কুতূহলে।
আমার মনমাতালে মেতেছে আজ
মদমাতালে মাতাল বলে ॥

ব্যস, গোঁসাইয়ের মুখ একেবারে বন্ধ। মায়ের নামে যদি কারো মন মেতে থাকে, তাহলে তিনি আর মাতাল হন কি করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও নাকি এই দুজনের তরজা-লড়াই ভালবাসতেন এবং কুমারহট্টে থাকার সময়ে দুজনের বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়ে কৌতুক দেখতেন।

রামপ্রসাদ তীর্থ-পর্যটন ইত্যাদির বিপক্ষে। তিনি মনে করেন মায়ের কৃপা যদি পাবার হয়, তাহলে এখানে বসেই পাওয়া যাবে। সুতরাং মনের এই ভাবটিকে তিনি প্রকাশ করলেন একটি গানের মধ্য দিয়ে ঃ

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি ॥

সাধ' ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্মশানবাসী॥

আজু গোঁসাই দেখলেন এই এক মহা সুযোগ। 'পেসাদ' যখন কাশী যেতে চায় না, তখন তাকে জোর করেই কাশী পাঠাতে হবে। তিনিও গেয়ে উঠলেন:

পেসাদে তোর যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথায় গিয়ে দেখবিরে তোর মেসো আর মাসী॥
ঘরে বসে থাকিস যদি, ধরবে তোরে যক্ষ্মা কাশী।
এই বেলা নে তল্পি বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি॥

কাশী না গেলে 'যক্ষ্মাকাশি' ধরবার ভয় পর্যন্ত গোঁসাই দেখিয়ে দিলেন রামপ্রসাদকে। অবশ্য শেষাবধি রামপ্রসাদ ভয় পেয়ে কাশীতে মাসী-মেসোর সঙ্গে দেখা করতে ছুটেছিলেন কিনা, সে খবর আমাদের জানা নেই।

জনশ্রুতি আছে রামপ্রসাদ কলকাতার কোন এক ধনীর বাড়িতে মুহুরীর কাজ করতেন। খেরো খাতায় তিনি হিসাবের বদলে একটি গান লিখে রেখেছিলেন:

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাণ্ডার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারী
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা,
তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।

আজু গোঁসাই ভক্তির তবিলদারীকে বাস্তব তহবিল রক্ষাকারী বলতে চাইলেন। এবং যেন রামপ্রসাদের কতই হিতৈষী, তাই বন্ধুকে সাবধান করে বললেন, তহবিল রক্ষা করা মোটেই সোজা কাজ নয়:

কেনে চাস ভাই তবিলদারী
ও কাজে আছে ঝুঁকি ভারি।
দুদিনকার মুহুরি হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি।
পেলে তবিল ভাঙতে এক তিল,
তোমার আর সবে না দেরি॥

আরে, যাঁর ধন তিনি বিলোচ্ছেন, তোমার এত হিংসে কেন? তুমি তো সামান্য এক মুহুরি হে! ('দাতা যে বিলোচ্ছে সে ধন, পেট ফুলে মরে ভাঁড়ারি॥')। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার সাধ॥

"এ সংসার ধোঁকার টাটি।"

রামপ্রসাদ সংসারকে এইভাবেই দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল "রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।" সেই বিষ মানুষ ইচ্ছাসুখে পান করে, তারপর বিষের জ্বালায় ছটফট করে মরে।

রামপ্রসাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যভাবে বিচার করেছিলেন আজু গোঁসাই। তাঁর মনে হয়েছিল:

এ সংসার মজার কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥

বিশ্বজগৎ যেখানে মহামায়ার ছায়া, সেখানে সংসার নেই কোথায়? প্রসাদও কি পেরেছেন সেই সংসার এড়াতে? যে রমণীকে তিনি 'বিষের বাটি' বলে ভাবছেন, সেই রমণীই সংসার-জীবনের পরম সহায়ক —"ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি।"

রামপ্রসাদের কালী-কীর্তনে ভগবতীর গোষ্ঠে গমন এবং গোপবধূবেশে আম্রকাননে গোচারণের উল্লেখ আছে। এ গানে হয়তো রামপ্রসাদ শ্যাম এবং শ্যামাকে এক করে দেখতে চেয়েছেন:

কাশী হইতে হইল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধমুখে রব॥

গোঁসাইয়ের কাছে রামপ্রসাদের এই গান পরম হাস্যের উপাদান হয়ে উঠল। ব্যঙ্গ করে তিনি বললেন:

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে কি ধেনু চরায় রে!
তা যদি হইত যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে॥

কিন্তু রামপ্রসাদকে যতই ব্যঙ্গ করে আজু গোঁসাই গান লিখুন, সে সবই আসলে বাইরের ব্যাপার। শ্যাম এবং শ্যামার অভেদত্ব তিনিও জানতেন। শাক্ত-বৈষ্ণবের সম্প্রদায়গত ঝগড়ার কালে আবির্ভূত হয়ে রামপ্রসাদের সঙ্গে তরজা লড়াইতে নামলেও সত্যকে অনলঙ্কৃতভাবে তিনি চিনে নিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ একবার বলেছিলেন—"কালী কেবল কালো নয়, সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনো কখনো পুরুষ হয়।" আজু গোঁসাইও ঐভাবটিকে ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন মাত্র—"শ্যামের পায় অভেদ জেনো শ্যামামায়ের চরণ দুটি।"

অ্যালার্জি

চন্দ্রনাথ সরকার

অ্যালার্জি (Allergy) কথাটা আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত, আমাদের অনেকেরই অ্যালার্জিতে কষ্ট পাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং অ্যালার্জি সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—রোগটি কি, কেন হয়, কি ধরনের চিকিৎসায় এর উপশম সম্ভব প্রভৃতি। অ্যালার্জি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বা ইমিউনিটির (immunity) একটি পরিবর্তিত রূপ। ইমিউনিটি ব্যাপারটি বুঝতে হলে অ্যান্টিজেন (Antigen) এবং অ্যান্টিবডি (Antibody) কথাদুটির অর্থ কি এবং তাদের কাজ কি তা জানতে হবে। বাইরে থেকে শরীরে কোন নতুন বা অপরিচিত পদার্থ (জীবাণু, খাদ্য প্রভৃতি) প্রবেশ করার পর যদি তার দ্বারা শরীরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় অ্যান্টিজেন ; এদের মধ্যে যারা আবার অ্যালার্জি সৃষ্টির জন্য দায়ী তাদের বলা হয় অ্যালার্জেন (Allergen)। অবশ্য অনেক সময় কোন জিনিস নিজে অ্যান্টিজেন না হয়েও শরীরের কোন অংশের/কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরোপুরি অ্যান্টিজেনের কাজ করতে পারে—তখন তাকে বলা হয় হ্যাপটেন (Hapten) ; যেমন পেনিসিলিন প্রভৃতি নানা ওষুধ।

আমাদের শরীরের কোনটি নিজের শরীরাংশ (self) এবং কোনটি বাইরের বস্তু (non-self) তা চেনার ক্ষমতা আছে। অ্যান্টিজেন শরীরে প্রবেশ করার পর যেহেতু সেটি 'সেল্ফ' নয় অর্থাৎ 'ননসেল্ফ', সেজন্য শরীরের কিছু বিশেষ ধরনের কোষ—বি-লিম্ফোসাইটস্ (B-lymphocytes) সেই অ্যান্টিজেনটিকে ধ্বংস করার জন্য বা তার ক্ষতিকারক গুণগুলি নষ্ট করার জন্য শরীরের ভিতরেই এক বিশেষ ধরনের পদার্থ তৈরি করে—যাদের বলা হয় অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিবডির কাজ হল অ্যান্টিজেনকে নিষ্ক্রিয় করা। অ্যান্টিবডির সৃষ্টি ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি অঙ্গ (Himoral Immunity)। ইমিউনিটিরই আর একটি অঙ্গ হচ্ছে সেলুলার বা দেহকোষ-ঘটিত ইমিউনিটি যেখানে অ্যান্টিবডির কোন কাজ নেই। আমাদের শরীরে বি-লিম্ফোসাইট এবং টি-লিম্ফোসাইট (T-lymphocytes) নামে দু-প্রকারের দেহকোষ আছে। প্রথমটি অ্যান্টিবডি তৈরির কাজে আসে ; শেষোক্তটি সেলুলার ইমিউনিটি সৃষ্টি করে। উভয় প্রকার ইমিউনিটিই শরীরে উপকার করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রক্রিয়া পরিবর্তিত রূপ নিয়ে শরীরের অপকারও করে যখন তাকে অ্যালার্জি বলা হয়।

অ্যালার্জি হবার আগে সেই অ্যান্টিজেনটিকে (এক্ষেত্রে অ্যালার্জেন) শরীরে অন্ততঃপক্ষে দুবার প্রবেশ করতে হবে। প্রথমবার প্রবেশের ফলে শরীরে সেই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়বার সেই আগের বারের তৈরি অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটাবে এবং যার ফলে অ্যালার্জির লক্ষণগুলির প্রকাশ পাবে। গর্ভে থাকাকালীন সন্তান যদি মায়ের কাছ থেকে কোনও অ্যান্টিবডি পেয়ে থাকে তবে অ্যালার্জেন একবার প্রবেশ করেই সন্তানের অ্যালার্জি করতে পারবে। প্রথম বার অ্যান্টিজেনটি প্রবেশ করার পরে শরীর সেই অ্যান্টিজেনটির প্রতি সেন্সিটাইজড্ (sensitised) বা সতর্কিত হয়। সেজন্য অ্যালার্জির অন্য নাম হাইপারসেন্সিটিভিটি (Hypersensitivity) বা মাত্রাধিক সতর্কতা।

অ্যালার্জিতে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীরে কয়েকটি ক্ষতিকারক দ্রব্য তৈরি হয়—যেমন হিস্টামিন (Histamine), হেপারিন (Heparin), সেরোটোনিন (Serotonin), প্রস্টাগ্ল্যানডিন (Prostaglandin) প্রভৃতি। এই নতুন দ্রব্যগুলিই মূলতঃ অ্যালার্জির লক্ষণগুলির জন্য দায়ী। হিস্টামিনের জন্য চামড়ায় লাল লাল দাগ বা গুটি (Rash) হয় যেগুলি অনেক সময় চুলকোতে থাকে। এই অবস্থাকে আর্টিকারিয়া (Urticaria) বলে। চোখের পাতা, মুখ প্রভৃতি জায়গা ফুলে

যায় ; শ্বাসকষ্ট হয় এবং রক্তচাপ হ্রাস পায় প্রভৃতি। কারও কারও হাঁপানি বা অ্যাজমা (Asthma) হয় ; কেউ কেউ আবার অজ্ঞান হয়েও যেতে পারে (অ্যানাফাইল্যাকটিক শক—Anaphylactic shock), অনেকের আবার শরীরাংশ ফুলে উঠে (অ্যাঞ্জিও-নিউরোটিক ইডিমা—Angioneurotic œdema), অনেকের নাক দিয়ে জল ঝরতে থাকে (রাইনাইটিস —Rhinitis) ; বৃক্কের প্রদাহও (নেফ্রাইটিস) হতে পারে।

লক্ষণ প্রকাশের (কিভাবে সেই অ্যালার্জি ঘটছে) উপর নির্ভর করে অ্যালার্জিকে মূলতঃ চারটি টাইপে বা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ

টাইপ-১—এক্ষেত্রে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি শরীরাংশের কোষবিশেষের সঙ্গে লেগে থেকে এবং সেখানেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য সেই অংশেই রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। এই টাইপ-১ অ্যালার্জি আবার দুরকম হতে পারে—

(ক) অ্যানাফাইল্যাকটিক প্রতিক্রিয়া (Anaphylactic Reaction), যার মারাত্মক রূপকেই অ্যানাফাইল্যাকটিক শক্ বলা হয়ে থাকে। পেনিসিলিন বা আরও কিছু ড্রাগ বা ওষুধ শরীরে প্রয়োগের পরেই রোগীর ভীষণ শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, রক্তচাপ অসম্ভবরকম হ্রাস পায় এবং ২-৩ মিনিটের মধ্যেই রোগী মারাও যেতে পারে। অনেকের নাক দিয়ে হঠাৎ জল পড়তে থাকে, প্রচণ্ড হাঁচি হয়—যে অবস্থাকে এক কথায় রাইনাইটিস (Rhinitis) বলা হয়। ডিম, বেগুন, কাঁকড়া, চিংড়িমাছ খেয়ে অনেকেরই গায়ে যে র‍্যাশ বেরোয় তা মূলতঃ অ্যালার্জির জন্যই হয় এবং উপরের সব উদাহরণগুলিই 'টাইপ-১ হাইপার সেনসিটিভিটি'র অন্তর্গত।

(খ) অ্যাটপিক অ্যালার্জি (Atopic Allergy)—এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রোগীর পূর্বপুরুষদের কারও কারও এই ধরনের অ্যালার্জি ছিল। এই রোগীরা বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিজেনের সম্মুখীন হলে সাধারণ মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি করে। হাঁপানি প্রভৃতি কিছু কিছু রোগ এই অ্যাটপিক অ্যালার্জির মধ্যে পড়ে।

টাইপ-২ বা অটো অ্যালার্জি (Auto Allergy—নিজের শরীরাংশের প্রতি অ্যালার্জি)—এই ক্ষেত্রে অ্যালার্জেন (বা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হ্যাপটেন) শরীরের প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে শরীর নিজের প্রোটিনকে চিনতে ভুল করে (তাকে 'নন-সেল্ফ' ভাবে) এবং তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে থাকে। পেনিসিলিন বা রক্তচাপ কমাবার ওষুধ 'মিথাইল ডোপা' ব্যবহারের পর রক্তকণিকা-ধ্বংস হয়ে রক্তাল্পতা রোগের (Hæmolytic Anæmia) সৃষ্টি হয়, তা এই পর্যায়ে পড়ে।

টাইপ-৩—এর নাম ইমিউন কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড রিয়্যাকসান (Immune complex mediated reaction)—এক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ পদার্থ ছোট ছোট রক্তনালীতে জমা হয়ে বিভিন্ন অসুখ ঘটায়, যেমন সিরাম সিকনেস (যা এ. টি. এস. বা অ্যান্টিটিটেনাস সিরাম এবং এ. ডি. এস. বা অ্যান্টি ডিপথেরেটিক সিরাম ইনজেকশন দেওয়ার পরে হতে পারে), বৃক্কের প্রদাহ (glomerulonephritis) প্রভৃতি। এছাড়াও পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন (যা সাধারণতঃ টি. বি. রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে), সালফোনামাইড প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ করার পরে এই ধরনের অসুখ (যার একটি হল সিরাম সিক্‌নেস) হতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, টিটেনাস টক্সয়েড (Tetanus toxoid যা আজকাল কেটে, ছিঁড়ে গেলে বেশি ব্যবহৃত হয়) ইনজেকশন্ নেওয়ার পরে অ্যালার্জি হয় না।

টাইপ-৪—এর নাম সেল মিডিয়েটেড বা ডিলেইড হাইপারসেনসিটিভিটি (Cell mediated or Delayed Hypersensitivity)। এই প্রকার অ্যালার্জিতে অ্যালার্জেন শরীরে ঢোকার অনেক পরে অ্যালার্জির লক্ষণ প্রকাশ পায় বলে একে ডিলেইড (delayed) টাইপও বলা হয়। বি-লিম্ফোসাইট যেমন অ্যান্টিজেন আসামাত্র অ্যান্টিবডি তৈরি করে তেমনি টি-লিম্ফোসাইটও অ্যান্টিজেনের সম্মুখীন হলে কিছু বিশেষ পদার্থ নির্গত করে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লিম্ফোকাইনস্ (Lymphokines)। এই পদার্থগুলি ম্যাক্রোফেজ (Macrophage) নামক

ঝাড়ুদার কোষের (Scavenger cell) কাজকে দমিয়ে দিয়ে অ্যালার্জির সৃষ্টি করে।

আমরা কনট্যাক্ট ডারমাটাইটিসের (contact dermetitis) কথা শুনেছি, যেখানে কারও কারও চামড়ায় নিকেল, ক্রোমিয়াম এমনকি পেনিসিলিন প্রভৃতি ওষুধ লাগলে সেই জায়গাটি ফুলে যায় এবং চুলকানিও হতে থাকে। এটিও এই টাইপ-৪ অ্যালার্জির মধ্যেই পড়ে।

উপরের চারটি টাইপের মধ্যে দেখা গেল যে, ওষুধ খেয়ে অ্যালার্জি বা ওষুধের জন্য অ্যালার্জি (Drug Allergy) সমস্তরকম টাইপের মধ্যেই রয়েছে, অথচ ওষুধ ছাড়া তো আমাদের চলবে না। সেজন্য কোন ওষুধে তার অ্যালার্জি আছে কিনা তা যদি রোগীর জানা থাকে তবে ডাক্তারকে আগে থেকে জানিয়ে রাখা উচিত।

তবে একই ওষুধ একজনের শরীরে অ্যালার্জির কারণ হলেও অন্যের ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। খাবার খেয়ে অ্যালার্জি বা ফুড-অ্যালার্জির ক্ষেত্রেও এই কথাটি প্রযোজ্য। তাছাড়া দেখা গেল উপরের চারটি টাইপের মধ্যে পেনিসিলিন প্রায় সমস্ত টাইপেরই অ্যালার্জি ঘটাতে পারে। কেন পেনিসিলিনের ক্ষেত্রেই এমনটি হয়, অন্যান্য ড্রাগের ক্ষেত্রে নয়—তা জানা নেই।

অ্যালার্জি হয়েছে তা কি করে বোঝা যাবে? খাবার বা ওষুধ খেয়ে যদি কারও অ্যালার্জি হয় তাহলে অনেক সময় সেই লোকটি নিজেই তা ধরতে পারে। তেমনি অনেকের আবার ধুলো থেকে শ্বাসকষ্ট হলে বা রাইনাইটিস হলে সেক্ষেত্রে একটু সচেতন হলেই অ্যালার্জির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যালার্জির কারণ কি তা ধরা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে যাকে বলা হয় প্যাচ-টেস্ট (Patch-test)। এই টেস্ট করার জন্য বিভিন্ন অ্যালার্জেন রোগীর চামড়ায় লাগিয়ে বা ইনজেকশন দেওয়ায় যদি সেই জায়গাটি ফুলে যায় বা লাল হয় তবে তার সেই বিশেষ জিনিসটির প্রতি অ্যালার্জি আছে বলে ধরতে হবে। তবে এটাও সত্যি যে, এই প্যাচ-টেস্ট করেও অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জির কারণ জানা যায় না। অ্যালার্জির চিকিৎসা কি? যদি বোঝা যায় যে ডিম বা অন্য কিছু খেয়ে কারও অ্যালার্জি হচ্ছে তাহলে সব থেকে ভাল উপায় হল ওইগুলি খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। সেইরকমই পেনিসিলিনে বা অন্য কোন ওষুধে যার অ্যালার্জি আছে তার পেনিসিলিন বা ঐ ওষুধটি না নেওয়াই ভাল।

তবে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই অ্যালার্জির উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হিস্টামিন সৃষ্ট; সেজন্য হিস্টামিন নিষ্ক্রিয়কারী ওষুধ (Anti Histaminic drugs) অ্যালার্জি রোধে খুবই ব্যবহৃত হয়।

এ-ছাড়া রোগীর অ্যানাফাইল্যাকটিক শক বা ঐ ধরনের গুরুতর কোন অ্যালার্জি হলে ডাক্তারের পরামর্শে স্টেরয়েড (Steroid), অ্যাড্রিনালিন (Adrenalin) প্রভৃতি ওষুধও ব্যবহার করা হয়। পেনিসিলিনের বা টি. বি. রোগের ওষুধের প্রতি রোগীর অ্যালার্জি থাকলেও অনেক সময় এগুলির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে সেই ওষুধগুলি খুব অল্প মাত্রায় বারে বারে রোগীর শরীরে প্রয়োগ করলে লোকটি অনেক সময় ঐ ড্রাগগুলির প্রতি অ্যালার্জির হাত থেকে রক্ষা পায়; এই প্রক্রিয়াকে ডিসেনসিটাইজেসান (Desensitisation) বলা হয়। অ্যালার্জি আছে জেনেও কোন কোন সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ ও তার সঙ্গে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ একসঙ্গে চালাতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, সন্তান প্রসবের পূর্বে মায়ের শরীরে যদি কোন ওষুধের প্রতি অ্যালার্জি থাকে তবে তা গর্ভস্থিত সন্তানের শরীরেও চালিত হতে পারে। মাকে প্রশ্ন করে ব্যাপারটি জেনে নিয়ে সন্তানকে ডিসেনসিটাইজেসন করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অ্যালার্জি একটি জটিল রোগ এবং এর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে অ্যালার্জির কারণ বার করার জন্য রোগীকেই সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করতে হবে। তবে কাজটি অনেক ক্ষেত্রে যে সহজসাধ্য নয়, তাও অতিশয় সত্য।

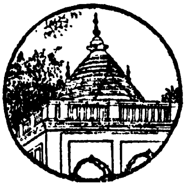

গ্রন্থ পরিচয়

গার্হস্থ্য

প্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গার্হস্থ্য গীতা : শ্রীগোপাল সেন, ২১২বি, পঞ্চাননতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০ ৫০। মূল্য ঃ দশ টাকা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পরিচিতি অনাবশ্যক। কেননা সে আপন আলোকে আপনিই ভাস্বর। বস্তুতঃ গীতা একটি কল্পলতা বিশেষ। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা স্বীয় স্বীয় মতবাদের সমর্থন কল্পে গীতার শরণাপন্ন হয়ে থাকেন এবং গীতাকে ব্যাখ্যাও করেন স্বকীয় মতবাদের আলোকে। ফলে শংকর, রামানুজ থেকে শুরু করে অরবিন্দ, তিলক, গান্ধী, রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতি অনেকেই গীতার ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। প্রত্যেক রচনাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এতদ্‌সত্ত্বেও টীকা-টিপ্পনী সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গীতার সংস্করণ এখন পর্যন্ত যে মুষ্টিমেয় নয়, তা বলা বাহুল্য। তবু গীতার নব নব রূপে প্রকাশ নিত্যই ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটতেও থাকবে। কোন দিন বোধ হয় সে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এটাই গীতার শাশ্বত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

এই কথাগুলিই মনে পড়ল গোপাল সেনের 'গার্হস্থ্য গীতা' পুস্তিকাটি হাতে আসার পর। 'গার্হস্থ্য গীতা' নামটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিষয়ের ইঙ্গিতবাহী। এটি সম্পূর্ণ গীতা নয়, সংক্ষিপ্ত গীতা। যদিও গীতার কোনও শ্লোকই অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর নয়, তবু গ্রন্থকার সমগ্র গীতা সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। নানা কাজে ব্যস্ত গৃহস্থ-সাধারণের স্বল্প সময়ে গীতার্থ অবগতির জন্য তিনি ভগবদ্‌গীতার প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সারাংশ সহজ ভাষায় বিবৃত করেছেন এবং সেই সেই অধ্যায়ের প্রতিনিধিমূলক কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। তাঁর এ প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য এবং উদ্দেশ্যও অনেকাংশে সফল হবে বলেও আশা করা যায়। এই হিসাবে পুস্তিকাটির নামকরণ সার্থক।

বইটিতে দু-একটি মারাত্মক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'গীতার নাম পরিচিতি' অংশে লেখক বলেছেন, "শান্তনুর দ্বিতীয়া পত্নী সত্যবতীর গর্ভে জন্ম হয় চিত্রবীর্য ও বিচিত্রবীর্যের। নিঃসন্তান চিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী অম্বার গর্ভে ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। নিঃসন্তান বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসের ঔরসে পাণ্ডুর জন্ম হয়।" (পৃষ্ঠা পাঁচ)

বক্তব্য তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ধৃতরাষ্ট্রের জননী অম্বিকা, অম্বা নয়। আর বিচিত্রবীর্যেরই দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকা। শান্তনু ও সত্যবতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ, চিত্রবীর্য নয়। মোট কথা মহাভারত-মতে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার সন্তান যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু।

ভরতের বংশে জন্ম বলে ধৃতরাষ্ট্র ও অর্জুন নিঃসন্দেহে 'ভারত' হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে 'ভারত' সম্বোধনে সম্বোধিত করছেন তখন তিনি অর্জুনকে কেবলমাত্র ভরতবংশীয়ই বলতে চাননি, বলতে চেয়েছেন অর্জুন 'ভা' তে অর্থাৎ আলোকে অর্থাৎ জ্ঞানে রত অর্থাৎ জ্ঞানী। অর্জুন সম্বন্ধে 'ভারত' সম্বোধনের এটাও অন্যতম তাৎপর্য।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ভাগবত ধর্ম 'ভাগবৎ ধর্ম' এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় ভাগবত জীবন 'ভাগবৎ জীবন' রূপে লিখিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মুদ্রণ-প্রমাদ থেকেও বইটি মুক্ত নয়। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অনুবাদ থাকলেও প্রত্যেক অধ্যায়ের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হলে পুস্তিকাটির সৌষ্ঠব ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত বলে মনে হয়।

ডঃ রমা চৌধুরীর 'পূর্বাভাস' এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'মুখবন্ধ' নিঃসন্দেহে পুস্তিকাটির মূল্যবান অলংকার। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মুখবন্ধে লিখেছেন ঃ "যাঁরা গার্হস্থ্য জীবনে কর্মক্লান্ত তাঁদের জন্য বইটি লেখা। তাঁরা এই বইটি পড়লে গীতার সার কথা বুঝতে পারবেন।··· গীতার মধ্যে অনেক জটিল তত্ত্ব আছে। লেখক যথাসাধ্য জটিলতা বর্জন করেছেন, কিন্তু মূল তত্ত্ব থেকেসরে যাননি। সেদিক থেকে বইখানি মূল্যবান।"

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

নতুন সহাধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ ১ এপ্রিল ১৯৮৯ থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব-উৎসব

গত ৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৫তম আবির্ভাব-উৎসব বেলুড় মঠে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুপুরে প্রায় ২০ হাজার ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্নে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ মার্চ সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনও প্রায় ২০ সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব: পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে এই উৎসবের শেষপর্ব উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রম ছাড়া পুরী জেলার ছয়টি গ্রামেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রামের অনুষ্ঠানগুলিতে দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে কম্বল, ধুতি, শাড়ি প্রভৃতি এবং গরিব ছাত্রদের মধ্যে জামা, প্যান্ট, কম্বল, বই, খাতা প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন দিনের জনসভায় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্টনায়ক, রাষ্ট্রমন্ত্রী ভূপিন্দার সিং, পুরী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বটকৃষ্ণ মোহান্তি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের বিচারপতি লিঙ্গরাজ রথ, প্রজাতন্ত্র পত্রিকার সম্পাদক ভর্তৃহরি মহতাব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাপতি অথবা মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ২৯ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ আশ্রম, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে ১২ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় যুব-সপ্তাহ পালন করে। এ-উপলক্ষে আগেই বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ছাত্রদের মধ্যে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রেই চিত্তাকর্ষক ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। প্রত্যেক শোভাযাত্রায়ই আঞ্চলিক গীত-বাদ্যের প্রদর্শন করা হয়। সভাগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপর বিভিন্ন দিক থেকে আলোচন করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ প্রমুখ।

উদ্বোধন

গত ২৬ মার্চ উতকামণ্ড আশ্রমের নবনির্মিত সাধুনিবাস এবং উপাসনা গৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ।

কুম্ভমেলায় তীর্থযাত্রীদের জন্য শিবির

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রয়াগে অনুষ্ঠিত পূর্ণকুম্ভ মেলায় তীর্থযাত্রীদের জন্য গত ১২ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি—একমাস ব্যাপী যাত্রীনিবাস পরিচালনা করে। সেখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ১২৫ জন সাধু-ব্রহ্মচারী সহ মোট একহাজার তীর্থযাত্রী সেখানে ছিলেন। এই শিবিরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হয়েছিল। সেখানে ১৭,000 রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯ জানুয়ারি এক অগ্নিকাণ্ডে শিবিরের অধিকাংশ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। বেলুড় মঠের সহায়তায় তা আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল।

চক্ষুশিবির: গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আঁটপুর আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এক চক্ষুশিবির পরিচালনা করেছিল। সেখানে ৫৯ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

ত্রাণ

অন্ধ্রপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ ঃ বিশাখাপত্তনম শহরতলীতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৭টি পরিবারের মধ্যে বিশাখাপত্তনম আশ্রমের মাধ্যমে ৪৭টি শাড়ি, ১৪১টি ফতুয়া, ৯৪টি তোয়ালে, ৪৭টি বিছানার চাদর, ৪৭টি মাদুর, ৪৭ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসন বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন ঃ উত্তর ২৪-পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের গোবিন্দকাটি ও যোগেশগঞ্জ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কার্যসূচী অনুযায়ী ৬৮টি গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৫৩৫টি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে।

বসিরহাট মহকুমার ১৮টি গ্রামেও উক্ত কার্যসূচী অনুযায়ী ১০৮টি বাড়ি তৈরি এবং ৫০টি বাড়ির মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে। ৭৩টি বাড়ি তৈরির এবং ১০টি বাড়ি মেরামতির কাজ চলছে।

বিহারের মুঙ্গের জেলায় গত ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ২৭টি ভূমিকম্প-প্রতিরোধক বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

বহির্ভারত

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে গত ৬—১০ মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম জন্মতিথি ও বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ৬ মার্চ ছিল বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্বামী অক্ষরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ জনাব কলিম শরাফী। ৭, ৮ ও ৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জাতীয় সংসদের স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, অধ্যাপক শামসুল হক, ডঃ কাজী নুরুল ইসলাম, রেবা সেন, ডঃ ফিরোজা বেগম, ডঃ মারুফী খান প্রমুখ বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি দিনে বিকালে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বধর্ম'। বিচারপতি রণধীর সেনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন বাংলাদেশের উপপ্রধানমন্ত্রী এম. এ. মতিন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভ্যাটিক্যানের চার্জ দ্য এফেয়ার্স মঁসিয়ে অগাস্টিন কাসুজ্জা, শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের, ফাদার প্রশান্ত রিবেরু, ডঃ নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। ১০ মার্চ প্রায় দশ হাজার ভক্তের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং রাত্রে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ সহ প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার শ্রোতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র, বোর্ণ এন্ড, বাকিংহ্যামশায়ার, ইংলণ্ড ঃ বিগত ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এই কেন্দ্রের পরিচালনায় এক সাধনশিবির উদ্‌যাপিত হয় এক সপ্তাহের জন্য। হলিউড বেদান্ত সমিতির প্রধান স্বামী স্বাহানন্দ শিবিরে যোগদান করেন এবং ভক্তিমার্গ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। এই শিবিরে ভজন-আলোচনাদি শ্রোতাদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

দেহত্যাগ

স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ (সুরেন) গত ৯ মার্চ রাত ১২-৫ মিঃ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি দিল্লী, ভুবনেশ্বর এবং উদ্বোধন এসকল কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। তাছাড়া জামশেদপুর, বাঁকুড়া, বাগেরহাট (বাংলাদেশ) এবং দেওঘর কেন্দ্রের প্রধান হিসাবেও সঙ্ঘের সেবা করেছেন। সরল ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ যথারীতি ধর্মালোচনা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ স্টাডি ফোরাম (৯২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭)-এর উদ্যোগে গত ২ ফেব্রুয়ারি '৮৯ বিজ্ঞান কলেজের সাহা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে 'নতুন সমাজ গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা' বিষয়ের উপর একটি বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অসীমা চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক বৈদ্যনাথ বসু। কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কলেজের মোট ২১ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের স্বামীজীর রচনাবলী পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী প্রভানন্দ। বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্তকে নিয়ে।

বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্র, পারুলিয়া (বর্ধমান): গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল প্রভাত ফেরি। দ্বিতীয় পর্বে (মধ্যাহ্নে) ছিল আলোচনা সভা। সভায় স্বামীজীর চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করেন অভিজিৎ ঘোষ, সাধনচন্দ্র সামুই এবং পাঠচক্রের সম্পাদক গোবিন্দ রায়। সমাপ্তি পর্বে পরিবেশিত হয় নানা ভক্তিগীতি। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ ও তাঁদের বাণীর এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সংঘ (ইসলামপুর, পশ্চিমদিনাজপুর): গত ২২ জানুয়ারি স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। এ-উপলক্ষে ৫০ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক স্বামী সিং এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রণজিত ঘোষ, নিত্যানন্দ সাহা ও প্রেমবিহারী ঠাকুর। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ৮ জানুয়ারি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সাণ্ডেলের বিল বিবেকানন্দ পাঠচক্র (উত্তর ২৪-পরগনা): গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭তম জন্মোৎসব পালন করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রাতে ১২৭টি শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। তারপর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। বিকালে শিশু প্রদর্শনী, কৃষিপ্রদর্শনী ও কৃষি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সর্বদেবানন্দ। পরদিন স্বামীজীর আদর্শের উপর প্রশ্নোত্তর ও গোষ্ঠী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী দিব্যানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী সুপ্রভানন্দ ও স্বামী সর্বদেবানন্দ। এদিন গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন প্রবীরবিকাশ চৌধুরী।

রানীগঞ্জ স্বামী বিবেকানন্দ ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতি স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ৫ মার্চ রানীগঞ্জ বাসন্তীদেবী গোয়েঙ্কা বিদ্যামন্দিরে এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা-চক্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী বিনয়ানন্দ, ডঃ তাপস বসু ও ডঃ রামদয়াল বসু।

গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ৫ম বার্ষিক-উৎসব চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক

প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে 'স্বামীজী দিবস' পালন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় মোট ১৩৮ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় দিন ভাবপ্রচার পরিষদের ত্রয়োদশ সম্মেলন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দুদিনের উৎসবে স্বামী গহনানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসিকা অমিতা প্রসাদ ও পৌরপ্রধান ভবানী মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৪তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে গত ১৩—১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণোৎসব পালন করে। উৎসবের চারদিনই বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন বিকালে ধর্মীয় আলোচনা করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা বিজ্ঞানপ্রাণা ও স্বামী অঘোরানন্দ। উৎসবের শেষদিনে ৫-৬ হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐদিন ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী জিনানন্দ এবং বক্তা ছিলেন স্বামী দিব্যানন্দ ও অধ্যাপক পার্থ ঘোষ। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী আশ্রম (কান্দরা, বর্ধমান): গত ২৫ ও ২৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম জন্মতিথি উপলক্ষে আশ্রমের অষ্টমবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানে রামায়ণ গান, নগর সঙ্কীর্তন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রভৃতির আয়োজন ছিল। উৎসবের প্রথম দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কমলেশানন্দ ও অধ্যক্ষ প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির (এগরা, মেদিনীপুর): গত ৯, ১১ ও ১২ মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৪তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালন করে। ৯ মার্চ ছিল বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভজন, ধর্মালোচনা ইত্যাদি। ১১ মার্চের অনুষ্ঠানে ছিল ধর্মসভা, স্থানীয় শিশুশিক্ষা মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং শিশুদের দ্বারা নাট্যাভিনয়। ১২ মার্চ ছিল শিশুশিক্ষা মন্দিরের পুরস্কার বিতরণী সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্বামী আপ্তকামানন্দজী এবং প্রধান অতিথি স্বামী নির্জরানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (দণ্ডির হাট, উত্তর ২৪-পরগনা): গত ২৫ ও ২৬ মার্চ এই সঙ্ঘ কর্তৃক শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবে পূজা, পাঠ, ধর্মালোচনা, ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা, গান এবং শেষ দিনে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী শেখরানন্দ এবং সভাপতি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, পুরুনিয়া (বাঁকুড়া): গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি এই সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, লীলাকীর্তন ইত্যাদি। ২৬ ফেব্রুয়ারি যুব সম্মেলন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (হুগলী): শ্রীশ্রীমা ও ডাকাতবাবা খ্যাত তেলো-ভেলোর চটির এই সেবাশ্রমের রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত হয় গত ১৪—১৬ মার্চ '৮৯ পর্যন্ত। শ্রীশ্রীমায়ের ঐতিহাসিক পদযাত্রা স্মরণে জয়রামবাটী থেকে তেলোর চটি পর্যন্ত পদযাত্রা করে ২৫ জন তরুণ। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল আলোচনা শিবির। শিবিরে আবৃত্তি, সঙ্গীত, বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী।

বিজ্ঞান সংবাদ

মুখভর্তি রহস্য

শিশুদের মিষ্টি খাওয়ানো দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকারক। মুখের মধ্যে যেসব জীবাণু থাকে তারা শর্করা জাতীয় দ্রব্যকে গাঁজিয়ে (ferment) তুলে যে অম্লবিষ (acid toxin) তৈরি করে তারা দাঁতের উপরিভাগের এনামেলকে (enamel) নষ্ট করে দাঁতের ক্ষয়সাধন করে। ১৯৮৮-র নভেম্বরে ওয়াশিংটনে অ্যামেরিকান ডেণ্টাল এ্যাসোসিয়েশনের যে বাৎসরিক সভা হয়েছিল, তা এরূপ মতকে সমর্থন করেছে, তবে আংশিকভাবে।

অনেক রকম খাবারই যা মিষ্টি নয়, যেমন আলুভাজা, পাউরুটি প্রভৃতি, দাঁতে গর্ত সৃষ্টি করতে পারে। মুখে এ্যামাইলেজ (amylase) নামক একরকম হজমি রস (enzyme) থাকে, যা রান্না করা শর্করাজাতীয় দ্রব্য (যেমন পাউরুটি, ভাত প্রভৃতি)-কে ভেঙে চিনিতে রূপান্তরিত করে। এই সব খাবার মুখে বা দাঁতে অনেক ঘণ্টা যাবৎ লেগে থাকে বলে তারা ভীতিজনক টফির চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক।

চিনি থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি মিষ্টিখাবার (যেগুলি যষ্ঠিমধু বা চকোলেট দিয়ে তৈরি হয়), দাঁতকে গর্ত হওয়া থেকে অনেকটা রক্ষা করে। আর এক ধরনের চিনি আছে যা গর্ত হওয়া বন্ধ করে। যেমন 'জাইলিটল' (xylitol), যা কুল, র‍্যাসবেরি, স্ট্রবেরি, ফুলকপিতে বা আখের ছিবড়া প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যে থাকে। আখের চিনি (sucrose) বা ফল হতে চিনি (fructose) এদের সমান মিষ্টি। ফ্রাকটোস অনেক টিনে ভরা খাদ্যে ব্যবহৃত হয় সস্তা বলে। যেসব জীবাণু চিনিকে গাঁজিয়ে তোলে, তাদের অনেকেই জাইলিটলকে গাঁজাতে পারে না, এবং সেজন্য মুখে এ্যাসিড তৈরি করে না। দরিদ্র দেশে একথাটা স্মরণ করা উচিত, কারণ সেখানে শিশুদের দাঁত খারাপ হয় বেশি চিনি খাওয়ার জন্য এবং দন্ত চিকিৎসকের অভাববশতঃ।

উন্নত দেশগুলিতেও চিনির ব্যবহার বাড়ছে, তবে আমেরিকা হতে রাশিয়ায় পর্যন্ত সব দেশেই ফ্লোরাইড (fluoride) ব্যবহারের জন্য দাঁতে গর্ত হওয়া অনেকাংশে কমেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা (WHO) এবং অন্যান্য গবেষণা-সংস্থা থাইল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড, কানাডা প্রভৃতি কয়েকটি দেশে গবেষণা চালিয়ে দেখিয়েছে যে, জলে ফ্লোরাইড থাকার জন্য, দাঁতের মাজনে ফ্লোরাইড ব্যবহারের জন্য, শিশুদের দাঁতে সরাসরি ফ্লোরাইড লাগানোর এবং খাদ্যে ফ্লোরাইড যোগ করার জন্য সেই সব দেশে দাঁতের গর্ত ভর্তি করার প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে গেছে। কেবলমাত্র জাইলিটল ব্যবহার করেও এরূপ উপকার পাওয়া যায়, তবে ফ্লোরাইড ও জাইলিটলের একত্র সমাবেশ আরও ভাল কাজ করে।

একটি গবেষণাতে কেবলমাত্র ফ্লোরাইড এবং ফ্লোরাই-জাইলিটল একত্র ব্যবহার করে দুই বৎসরের ফলাফলে দেখান হয়েছে যে, জাইলিটল ব্যবহারে সুফল অনেকদিন থাকে। ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের ডাক্তার নিউওয়েল দেখিয়েছেন যে, মুখে যেসব জীবাণু থাকে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিরোধক্ষমতাই ঠিক করে যে সেই ব্যক্তির দাঁতের পাশ ফুলে উঠবে (Peri-odontitis) কিনা। তিনি এই সব জীবাণু দিয়ে টিকা তৈরির উপর জোর দিয়েছেন।

কোন ব্যক্তির দাঁতের অসুখ হবার প্রবণতা আছে কিনা, জেনেটিক এনজিনিয়ারিং (genetic engineering) এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। এর জন্য সহজ পরীক্ষা-প্রণালীও বার হয়েছে। অবশ্য সেইসব পরীক্ষা-প্রণালীর সাফল্য দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা সাপেক্ষ; তবে মুখগহ্বর যে রহস্যপূর্ণ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[The Economist, 24 November,
2 December, 1988, p. 100]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

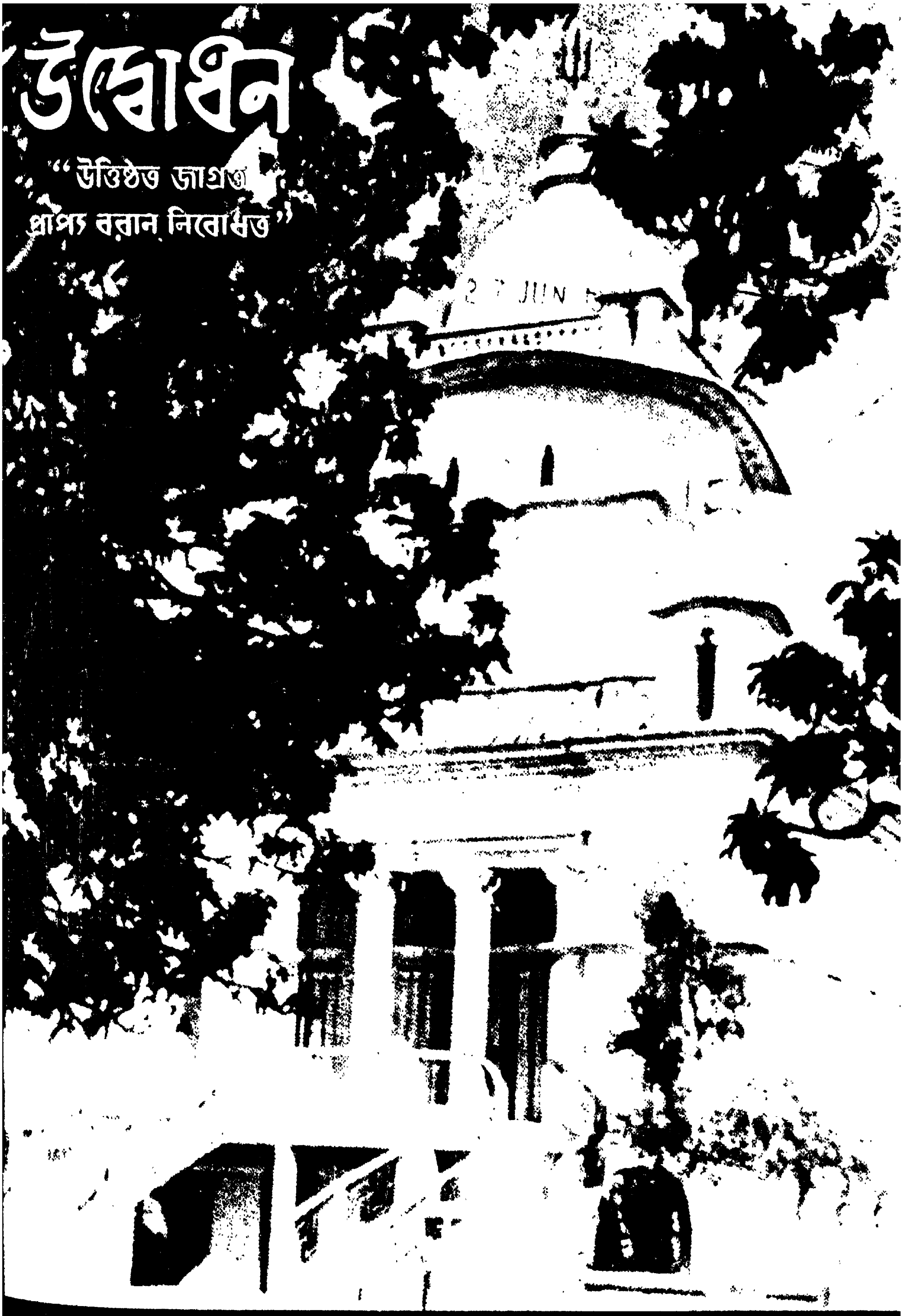

আষাঢ় ১৩৯৬ ৯১তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

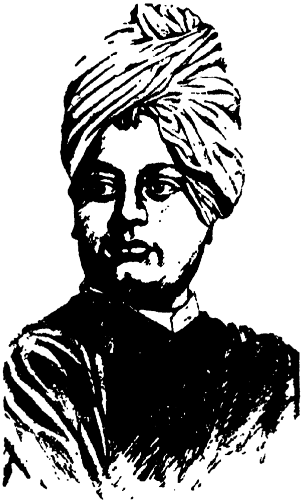

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

এবৎসর [১৯০০] খ্রীস্টাব্দ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এবৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়... ? কে তোমার নাম নেয় ? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে ? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভা-মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর...আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন। সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক-মণ্ডলীর শীর্ষ-স্থানীয় আজ জগদীশচন্দ্র বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর!

স্বামী বিবেকানন্দ

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতের প্রযুক্তিক্ষেত্রে নূতন দিকচিহ্ন

২২মে ১৯৮৯। স্থান ওড়িষ্যার চাঁদিপুর উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র। জ্যৈষ্ঠের রোদ ঝলমলে নীলাকাশ। স্থানীয় সময় সকাল সাতটা সতেরো মিনিট। ভারতের প্রথম অন্তর্বর্তী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 'অগ্নি' আকাশে উড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ভারত প্রবেশ করিল অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির স্তরে। সগর্বে স্থান করিয়া লইল সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীনের সঙ্গে একই সারিতে। বিশ্বের পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলির দৃষ্টি এই মুহূর্তে ভারতের দিকেই নিবন্ধ।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, 'অগ্নি'-র নির্মাণ হইতে উৎক্ষেপণ পর্যন্ত সমস্ত স্তরেই ভারত সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে। প্রযুক্তি, প্রযুক্তিবিদ্ এবং উপকরণ কোন ক্ষেত্রেই বৈদেশিক সহযোগিতার বিন্দুমাত্র ভূমিকা এখানে নাই। ভারতকে এখন আর 'উন্নয়নশীল' দেশ বলিয়া উপেক্ষা করা যাইবে না। সে আপন যোগ্যতায় আজ 'উন্নত' দেশগুলির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করিয়া লইয়াছে। দিবালোকের মতো এই সত্যটি আজ সুস্পষ্ট। মনে পড়িতেছে বর্তমান শতাব্দীর সূচনার প্রাক্-লগ্নে যুগাচার্যের সেই জলদগম্ভীর উদ্ঘোষণ:

"অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না ; বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে।"

"আমার বিশ্বাস—ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে।... হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণে, নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।"

যুগাচার্যের সেই ধ্যানদৃষ্টিকে আজ বাস্তবে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ভারত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ভারতবাসী হিসাবে ভারতের এই সাফল্যে আজ আমরা গর্বিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিগত বৎসরের (১৯৮৮) ২৫ ফেব্রুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা মহাকাশ-কেন্দ্র হইতে ভারত সাফল্যের সঙ্গে নূতন ধরনের প্রভূত ক্ষমতা-সম্পন্ন অন্তর্বর্তী পাল্লার 'ভূপৃষ্ঠ-হইতে-ভূপৃষ্ঠ' ('সারফেস-টু-সারফেস') ক্ষেপণাস্ত্রের একটি পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করিয়াছিল। তাহার নাম 'পৃথ্বী'। সেটিও সম্পূর্ণভাবে ভারতে নির্মিত হইয়াছিল এবং তাহার নির্মাণের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক প্রযুক্তির কোন ভূমিকা ছিল না। 'পৃথ্বী'-র উৎক্ষেপণ ও বিস্ফোরণ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে ভারত প্রযুক্তিক্ষেত্রে তাহার পারঙ্গমতার স্বাক্ষর স্থাপন করিয়া চলিয়াছে।

'পৃথ্বী'-র মতো 'অগ্নি'-র সকল কৃতিত্বের অধিকারী ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ('ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেণ্ট অর্গানাইজেশন', সংক্ষেপে ডি· আর· ডি· ও·)। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, "ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় স্বয়ম্ভর হইয়া উঠার পথে 'অগ্নি' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।" জানা গিয়াছে, 'অগ্নি' 'ভূপৃষ্ঠ-হইতে-ভূপৃষ্ঠ' ক্ষেপণাস্ত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহাকে 'ভূপৃষ্ঠ-হইতে-শূন্য' ('সারফেস-টু-এয়ার') ক্ষেপণাস্ত্রে উন্নীত করার চেষ্টা হইতেছে।

অগ্নির সফল উৎক্ষেপণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেনঃ দেশকে স্বনির্ভরতা, নিরাপত্তা এবং আত্মবিকাশের দিকে অগ্রসর করিবার জন্য এইভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াস করিতে হইবে। তবে ‘অগ্নি’ পরমাণু-অস্ত্র নহে। ‘অগ্নি’-র সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা শুধু বিশ্বকে বুঝাইয়া দিয়াছি ভারতও অত্যাধুনিক পরমাণু-অস্ত্র নির্মাণে সক্ষম। কিন্তু সেই পরমাণু শক্তি, গবেষণা ও প্রযুক্তিকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার না করিয়া ভারত স্বদেশের উন্নয়নমূলক কর্মে প্রয়োগ করিবে। বর্তমান বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলির পরমাণু-অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এই স্বেচ্ছা-সংযম তাহার জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সর্ব অর্থেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারত অহিংস দেশ। অন্য দেশ আক্রমণের অভিপ্রায় বা আগ্রহ কোনটিই ভারতের নাই। ভারত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী।

দুঃখের বিষয়, ভারতের মধ্য হইতেই অগ্নির উৎক্ষেপণ এবং দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বৃহৎ অগ্রগতির এই নজিরকে গুরুত্বহীন বলিয়া দেখার ও দেখানোর চেষ্টা করা হইতেছে। বলা হইতেছে, ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ যখন এখনও দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতার অন্ধকারে রহিয়াছে তখন পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা নিছকই বিলাসিতা। ইহার উত্তরে ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের সম্পাদকীয় নিবন্ধকে অনুসরণ করিয়া আমরাও বলিবঃ “দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য—এ সকলই ভারতের সমস্যা, মৌলিক সমস্যা। কিন্তু সেইসব সমস্যা আছে বলিয়া উচ্চস্তরের গবেষণা বন্ধ রাখিতে হইবে, ইহা পশ্চাৎমুখী অপযুক্তিমাত্র। বস্তুতঃ, এই উপদেশ মানিতে হইলে শুধু পরমাণু-বিদ্যা ও প্রযুক্তির চর্চা নহে, বন্ধ করিয়া দিতে হয় উচ্চশিক্ষার বহু আয়োজন, বিনষ্ট করিতে হয় বহু আধুনিক শিল্প। কিন্তু বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নের দীর্ঘ ইতিহাস প্রমাণ করে, শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের সাধনা ব্যতীত যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। বিজ্ঞানের অনন্তযাত্রায় অংশ গ্রহণ না করিয়া কোন দেশ আজ অবধি দারিদ্র্য ও অপুষ্টির সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পায় নাই। একটি দরিদ্র দেশ আপন প্রচেষ্টায়, বিস্তর অর্থব্যয় ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিনিময়ে যদি একটি দুরূহ বৈজ্ঞানিক কাজে কৃতিত্ব অর্জন করিয়া থাকে, তবে সেই সাফল্য তাহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিকূল হইতে পারে না। বরং তাহাই সেই সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত।”

দেশীয় সমালোচকদের পক্ষ হইতে উৎক্ষেপণকেন্দ্রের নিকটস্থ গ্রামবাসীদের সাময়িকভাবে উদ্বাস্তু হওয়ার জন্য হয়রানি, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রভৃতি কারণও দেখানো হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বৃহত্তর জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে দেশবাসীকে অল্পবিস্তর ত্যাগস্বীকার করিতেই হয়। দেশপ্রেমের ইহা একটি মৌল শর্ত। সমালোচকদের পক্ষ হইতে এমনকি এই দাবিও উঠিয়াছে যে, বাস্তবে ‘অগ্নি’-র উৎক্ষেপণ আদৌ হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা উৎক্ষেপণের মহড়া মাত্র। এই অভিযোগটি যে সর্বৈব অলীক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন। আবার, দেশের বাহির হইতেও ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণা ও কর্মসূচীর সমালোচনা হইয়াছে। সে-সমালোচনার উদ্দেশ্যও আমাদের অজানা নাই।

যাহা হউক, ঘটনা এই যে, ভারত আজ ক্রমেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাহার অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তাহাকে আরও অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তবে তাহার সেই অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় ‘অগ্নি’ একটি উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্ন সন্দেহ নাই। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য যেদিন বিশ্বসভার রানীর আসনটি অধিকার করিবে আমাদের মাতৃভূমি। এবং সমগ্র পৃথিবী একবাক্যে ভারতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিবেঃ “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।”

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

The Ramakrishna Ashrama
Basavanguddi, Bangalore City
5. 8. 21.

শ্রীমান কানাই[১],

তোমার পত্র পাইলাম। যেখানেই থাক শারীরিক ও মানসিক ভাল থাক, আন্তরিক আশীর্বাদ করি। এখানকার সব মঙ্গল প্রভুর কৃপায়।

ইতি
তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

Ramakrishna Mission
Belur P. O. Howrah Dist.
8. 11. 25.

শ্রীমান কানাই,

তোমার পত্র ও তার সঙ্গে নূতন আশ্রমের[২] ২ খানি photo পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। আশ্রমটি ঠাকুরের ইচ্ছায় ছোটখাটর উপর বেশ সুন্দর হয়েছে। ঠাকুর দয়া করিয়া নিজের আশ্রমে এতদিনে বসিলেন শুনিয়া যে কি আনন্দ হইল তাহা আর কি লিখিব!

শর্বানন্দ Bombay Town-এ lecture দিতে আরম্ভ করিয়াছে শুনিয়া খুব খুশি হইয়াছি। ঠাকুর তাকে খুব শক্তি দিন ও তার শরীরটি ভাল রাখুন।

তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়া আশ্রমবাড়িটি complete করিয়া তুলিলে এবং ঠাকুর গিয়া বসিলেন। তোমার বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি খুব বৃদ্ধি হউক এবং ঠাকুরের কাজ যথাসাধ্য কর। শরীরটা তোমার ভাল থাকুক।

আমার Bombay যাওয়া ঠাকুরের ইচ্ছা যখন হবে তখন হবে। এখন ঠাকুর দয়া করিয়া দেনাগুলো[৩] সব শোধ করিয়া দিন এবং সন্ন্যাসীরা সব নিশ্চিন্তে তাঁর ভজনসাধন ও তাঁর কাজ করিতে থাকুন।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

[১] স্বামী অনন্তানন্দ

[২] বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

[৩] বোম্বাই আশ্রমের জন্য যে দেনা করা হয়েছিল সেবিষয়ে বলছেন।—সংযুক্ত সম্পাদক

ভাষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান

স্বামী ভুতেশানন্দ

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথি। আমরা এই পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে সমবেত হয়ে তাঁর জীবনের অনুধ্যানে কিছু সময় কাটাবার চেষ্টা করছি। এই অনুধ্যান শুধু আজই নয়, যুগযুগ ধরে চলবে এবং আমাদের সকলের জীবনের চরম সার্থকতা এর ভেতর দিয়েই লাভ হবে। আমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ' বলতে কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির বা একটি কোন নির্দিষ্ট ভাবধারার কথা বলছি না। আমি ব্যাপক অর্থে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' শব্দটি ব্যবহার করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনের আদর্শরূপে যে জীবন দেখিয়ে গেছেন, যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন, তারই অনুধ্যান আমাদের কল্যাণ করবে।

ভগবানকে নিয়ে মানুষের এই খেলা বা ভগবানের মানুষকে নিয়ে এই খেলা চিরকাল চলে আসছে। তিনি সকলের মধ্যে থেকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েও এমন করে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন যে, মানুষ জন্ম জন্ম ধরে তাঁর অন্বেষণ করছে, তাঁকে খুঁজছে। তাঁর অন্ত পাচ্ছে না। আমাদের শাস্ত্রেও বলছে যে, তিনি অনন্ত, সুতরাং তাঁর অন্ত পাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। কিন্তু তাঁকে অন্বেষণ করার জন্য, তাঁকে আস্বাদন করার জন্য জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করা—মানুষের এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর নেই। আমরা জীবনে যদি কিছু সার্থকতা লাভ করতে চাই, তাহলে এইভাবে তাঁকে অন্বেষণের ভেতর দিয়ে আমাদের জীবনকে ব্যয়িত করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথা এবং কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, জীবনটাকে নিয়ে বৃথা নষ্ট করো না। জন্ম থেকে আরম্ভ করে আমাদের জীবনটা যদি খতিয়ে দেখি জীবনটা আমরা বাস্তবিক কতটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি, তাহলে আমাদের অধিকাংশকেই অনুশোচনা করতে হবে। অনেক সময় বৃথা চলে গিয়েছে, অনেক সময় আমরা বৃথা ব্যয় করছি। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ? তাঁর মানবজীবনের দিক দিয়েই যদি তাঁকে আমরা লক্ষ্য করি—একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে চলেছেন—সত্য, ত্যাগ, প্রেম, পবিত্রতা ; সর্বোপরি ঈশ্বর লাভ। তিনি বলছেন, "একটা দিন চলে গেল, মা তুই আজও দেখা দিলি না !" শিষ্য নিরঞ্জনকে বলছেন, বাবা নিরঞ্জন, দিনটা যে চলে গেল! কই এখনো তুই ঈশ্বর লাভ করলি না! আর কবে করবি ?" কবে করব তা জানি না ; কিন্তু ভগবানলাভের জন্য যে উৎকণ্ঠা, যে ব্যাকুলতা, প্রাণ ঢেলে প্রয়াস শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন তা আমাদের কাছে তাঁর জীবনের একটি খুব বড় শিক্ষা। প্রত্যয়ন্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ"- যেসব দিন চলে যায় তারা আর ফিরে আসে না। কত দিন আমরা হারিয়েছি। কিন্তু এখনও যে দিনগুলি বাকি আছে সেগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের জন্য অনুসরণ করার চেষ্টা করতে পারি না কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "আমি ছাঁচ তৈরি করে গেলাম। তোরা নিজেদের এই ছাঁচে ঢেলে নে।" এই ছাঁচটি আবার এত বিচিত্র যে, আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও সেই ছাঁচে ঢেলে গড়তে পারি। বিচিত্র এই ছাঁচ এবং সকলের পক্ষে উপযোগী। যে কেউ—সে গৃহস্থ হোক, সন্ন্যাসী হোক, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীস্টান হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি অপূর্ব ছাঁচ, এমন একটি অপূর্ব আদর্শ—যে যেভাবে ইচ্ছে নিজেকে ঢেলে নিয়ে সেই আদর্শে জীবনকে সার্থক করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই অনন্যতা আমাদের খুব ভাল করে ভাবতে হবে। আমরা অনেক সময় তাঁর দর্শন, তাঁর জীবনের মহিমার নানা দিক, তাঁর অবদান প্রভৃতি বিচার করি। কিন্তু প্রথমেই যে-কথা আমাদের ভাবতে হবে তা হল আমাদের

জীবনে আমরা কতখানি তাঁকে কাজে লাগাতে পারি। আমাদের বিশেষ করে ভাবতে হবে যে, তিনি আমাদের জন্যে শুধু নয়, আমার জন্যে এসেছেন। আমার জন্য তিনি ছাঁচ তৈরি করে গেছেন। সেই ছাঁচে নিজেকে ঢালতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সেইরকম একটি আদর্শ, যাঁর সঙ্গে আমরা নিজেদের মিলিয়ে আমাদের অপূর্ণতাগুলিকে খুঁজে পাব এবং সাধ্যমতো তা দূর করতে চেষ্টা করব। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এই-ভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োগমুখী হওয়া চাই। অর্থাৎ আমরা তা নিজেদের জীবনে যেন প্রয়োগ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, তাঁর সব কথা সব ভাব আমরা নিতে পারব না। সে-সামর্থ্য আমাদের নেই। তবু যতটুকু পারি, ততটুকু গ্রহণ করলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে, ধন্য হবে। শ্রীরামকৃষ্ণও বলছেনঃ "সমুদ্রকে কি একটা বাটিতে ভরা যায়?" ঘটি, বাটি, জালা সব পূর্ণ হয়ে যায় সেই সমুদ্রের জলে। সমুদ্র যেমন তেমনি থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরকম একটি অক্ষয় ভান্ডার। যতই নিই তা কোনদিনই কমে যাবে না। এইজন্য আজ পর্যন্ত কত মনীষী, কত সাধক, কত গবেষক তাঁর জীবন-কথা আলোচনা করছেন। পরেও করবেন। কিন্তু কেউ তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা বলতে পারছেন না।

স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের—তাঁরা সকলেই এক-একজন মহারথী—বলছেনঃ তোরা কি ভেবেছিস যে সব এক-একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সাতমন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। কারণ, সে অসম্ভব, কখনো সম্ভব হবে না। তবে তোরা কি করতে পারিস, নিজেদের তাঁর চরণে সমর্পণ করে নিজের যে ক্ষুদ্রতা, যে অপূর্ণতা, তা যথাসম্ভব দূর করবার চেষ্টা করতে পারিস।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা বলি 'যুগাবতার', 'অবতার', 'ভগবান'। ভক্তেরা এসব বলতে আরম্ভ করেছেন তিনি থাকতেই। তিনি বিদ্রূপ করে বলতেনঃ "কেউ মড়া কাটে (ডাক্তার), কেউ থ্যাটার (থিয়েটার) করে, আবার বলে অবতার! ওরা অবতারের বোঝে কি? অবতারের কথায় আমার ঘেন্না ধরে গেছে!" শ্রীকৃষ্ণ বলছেনঃ "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্" ॥—অজ্ঞান ব্যক্তিরা অবজ্ঞা করে আমাকে মানবদেহধারী বলে। আমার পরম স্বরূপ তারা জানে না। বস্তুতঃ অবতারকে খুব কম লোকেই চিনতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই জন্যে উপমা দিয়েছেন, একরকম গাছ আছে, তা দেখতে ঠিক গাছের মতো, ডালপালা ফল ফুল; কিন্তু কোন গাছের সঙ্গে মেলে না। এই জন্যে লোকে তার নাম দেয় অচিন গাছ। তাকে কেউ চেনে না। চেনবার জন্যে যে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার সেই অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। আমরা সাধারণ মানুষকে দেখেছি, সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, কিন্তু এসবের পারে যিনি, যিনি সকল সীমাকে ছাড়িয়ে গেছেন তাঁর সম্বন্ধে জানতে গেলে আমাদের বুদ্ধি অচল। আমরা আমাদের এই সীমিত বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরতে পারি না। তাহলে কি আমাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে? ব্যর্থ হবে না কখনই। কোন শুভ চেষ্টাই ব্যর্থ হয় না। এই চেষ্টা করতে করতে আমাদের কি হবে? আমাদের ক্ষুদ্র বিন্দুটি তার সীমারেখাকে হারিয়ে সিন্ধুতে পরিণত হবে। অর্থাৎ মনের শুদ্ধি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে বর্জন করব। আমাদের অপূর্ণতা, আমাদের অপবিত্রতাকে বর্জন করে আমরা পূর্ণ হব, পবিত্র হব। ক্রমে যেন হব তাঁরই মতো। সমুদ্রের বুকে যেমন তরঙ্গসকল খেলা করে, আমরাও, আমাদের ছোট ছোট ব্যক্তিরূপ তরঙ্গগুলি, যেন সমুদ্ররূপ তাঁর ভিতরে খেলা করছি। আমাদের তরঙ্গের যে সীমা, যে ক্ষুদ্রতা, সেটি যখন চলে যাবে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপ আমরা কি নাশ হয়ে যাব? তা হবে না। বিন্দু তখন সিন্ধু হয়ে যাবে। আমরা বিশাল সিন্ধুস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে ক্রমশঃ আমাদের ভিতরে যে ক্ষুদ্রতা, যে অপবিত্রতা, যে তুচ্ছতা রয়েছে সেগুলিকে পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে তাঁতে আমাদের বিলীন করতে পারব। এই হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের তাঁকে অনুসরণের সার্থকতা।

আমি জগৎকে শিক্ষা দেব—শ্রীরামকৃষ্ণ এই অভিমান ত্যাগ করতে বলেছেন। বলেছেন, তুমি কতটুকু যে তুমি জগৎকে শিক্ষা দেবে? যাঁর জগৎ তিনিই দেবেন। তুমি এতটুকু ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তুমি জগৎকে শিক্ষা দেবে কি? সত্যিই তো আমরা নিজেরা কতটুকু জানি। কথামৃতকার মাস্টার মশাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে ভাবছেন, সত্যিই তো! একি ইতিহাস না গণিত, না এরকম কিছু জাগতিক বিষয় যে আমি শিক্ষা দেব! আমি নিজে কতটুকু জানি! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। সুতরাং আমরা নিজেরা শিক্ষা দেব এই অভিমান যেন আমাদের না থাকে। আমরা তাঁর কাছ থেকে আমাদের জীবনের আদর্শ পাব। দিশারী তিনি, দেখিয়ে দিয়েছেন, কি করে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। সেই দিশা অনুসরণ করে, আমরা যত চলতে পারব তত আমাদের জীবনের সার্থকতা। শুধু আমাদের জীবনের সার্থকতাটুকু ভাবলে হয়তো মনে হবে এটা স্বার্থপরতা। তা নয়। কারণ, আমার নিজের স্বার্থ যখন শুদ্ধ হবে, তখন তা এই জগতের স্বার্থ হয়ে দাঁড়াবে। তখন আর স্বার্থের ভেতরে ক্ষুদ্রতা থাকবে না। 'স্ব' যখন অসীম, তখন স্বার্থই পরমার্থ হয়ে দাঁড়াবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই কথাই শেখাতে এসেছেন। তাঁর শিক্ষাকে কোন একটি দিক দিয়ে সীমিত করা যায় না। যেমন সমুদ্রকে ঘটির মধ্যে ধরা বাতুলতা। তাঁর অনন্ত ভাব থেকে যতটুকু পারি আমাকে নিতে চেষ্টা করতে হবে এবং ধীরে ধীরে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধি আসবে এবং তার ভিতর দিয়ে এক-একটি ব্যক্তি যদি শুদ্ধ হয় তো সমষ্টি মানে কি? ব্যষ্টি নিয়েই তো সমষ্টি। সুতরাং এক-একটি ব্যক্তি যদি শুদ্ধ হয় তো সমষ্টি আপনা আপনিই শুদ্ধ হবে। তাছাড়া এই আদর্শের অনুসরণ করে যারা চলবে, তারা দিনে দিনে যে শুদ্ধি লাভ করে, সেই শুদ্ধি তাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের ভিতরে সীমিত থাকবে না, তা চারিদিকে প্রভাব বিস্তার করবে এবং সমস্ত জগতের উত্থানে সহায়ক হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দেননি। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন তাঁর ঐ দক্ষিণেশ্বরের ঘরে। কখনো-সখনো দু-একটি ভক্তের বাড়িতে হয়েছে তাঁর শিক্ষাদানের ক্ষেত্র। কিন্তু তবু এই সীমিত ক্ষেত্র থেকেই তিনি যে-বীজ দিয়ে গেছেন, সেই বীজ আজ ক্রমশঃ মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং দিন দিন তার প্রসার হচ্ছে। এ তো মাত্র আরম্ভ। তার পূর্ণ ফলন্ত রূপ আমরা দেখিনি। কারণ এর বিশালতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের জীবনে এইভাবে যতটা নিতে পারব ততই নিজেদের জীবনকে ধন্য করতে পারব। এবং যতটা করতে পারব, তার পরিণামে জগৎকল্যাণরূপ কার্য আরও ভালভাবে সম্পন্ন হবে।

আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আমাদের কেবল একটি গবেষণার বস্তু না হন। তিনি যেন আমাদের আদর্শ হন এবং সেই আদর্শে নিজেদের রূপায়িত করবার জন্য আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন আমরা কাটাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "যারা এখানে আসবে তাদের শেষ জন্ম।" 'এখানে' বলতে কি একটা জায়গা বোঝাচ্ছে? অথবা একটি ব্যক্তি? 'এখানে' আসা অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসা, মানে তাঁর ভাবে নিজেদের জীবনকে ভাবিত করা, তাঁর ছাঁচে নিজেদের ঢালা। তাঁর ছাঁচে না ঢালতে পারলে, আমাদের জীবনকে সেইভাবে রূপায়িত করতে না পারলে আমাদের তাঁর 'ভক্ত' বলায় কোন সার্থকতা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে আজ এই পুণ্যদিনে প্রার্থনা করি, তাঁর কৃপায় যেন আমাদের এই দৃষ্টি খোলে, আমরা যেন তাঁকে জীবনাদর্শ করে আমাদের সমগ্র জীবনটি তাঁর ভাবে, তাঁর ছাঁচে পরিচালিত করতে পারি।*

---

* গত ৯ মার্চ ১৯৮৯, বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথিতে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতচিন্তা নিয়ে কেউ-কেউ বিতর্ক তোলেন। এমনকি রোমিলা থাপারের মতো ঐতিহাসিকও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন, স্বামীজী পুনরুজ্জীবনবাদী ছিলেন। এই ধরনের মন্তব্যের মূল কারণ হলো স্বামীজীর বইগুলির গভীরে প্রবেশ না করা।

এক যুগ-সন্ধিক্ষণে স্বামীজীর আবির্ভাব। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে উন্নততর করে তোলার প্রয়াসে চিন্তা ও কর্ম-জগতে তিনি আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই এই প্রবন্ধ। সংক্ষিপ্ত পরিসরের জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব।

ভারত : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

দেশবাসীকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই স্বামীজী ভারত প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সামনের দিকে এগোনোর অর্থ কি? বর্তমানে যে-অবস্থায় আছি, তারই যুক্তিসঙ্গত উন্নত পরিণতির দিকে যাওয়া। বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকেও বুঝতে হবে, আমাদের ধারাবাহিকতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। যাত্রার এই ধারাবাহিকতাকে আবিষ্কার করতে হলে জাতির মানস-ঈ বোঝা দরকার। স্বামীজী সংস্কৃতের উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ মধ্যযুগের আগে সাহিত্য, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সংস্কৃতি, রাজনীতিতত্ত্ব ইত্যাদি লিখিত হয়েছিল প্রধানতঃ সংস্কৃতেই। অতএব সংস্কৃত জানা থাকলে পাঠক সরাসরি এগুলিকে বুঝতে পারবেন, অন্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বোঝার মধ্যে যে বিপদ থেকে যায় তা এড়াতে পারবেন।

স্বামীজীর একটি বৈশিষ্ট্য—রামমোহন-দয়ানন্দের মতো বেদের ওপর জোর দিয়েও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি ; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত ; এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত ; মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য আমরা গর্বিত।"১ অর্থাৎ শুধু বৈদিক সংস্কৃতি নয়, এর পাশাপশি অ-বৈদিক তথা sub-altern ধারা সম্বন্ধেও তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলেন।

অতীতকে জানার অর্থ কি পুনরুজ্জীবনবাদী হওয়া? সেই প্রশ্নই তুলেছিলেন স্বামীজী : "পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?"২ না, নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন : "যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইওরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৩

২ ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩১–৩২

উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতা-বন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা।"[৩] অর্থাৎ স্বামীজী বলতে চেয়েছেন—অতীত সম্পদকে জানতে হবে, কিন্তু তা বলে প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়া চলবে না, নতুন সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর ভাষায়—"ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে ; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ।"[৪]

স্বামীজী অতীতের অধ্যয়নের উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু অতীতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেননি। মাটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেও ঘরের জানলা-দরজা খুলে দেবার কথা বলেছেন।

নতুন সংস্কৃতি

বর্তমানে দেশে পাশাপাশি দুটি ধারা দেখা যায়—একদল অতীত যুগের জয়ধ্বনিতে মুখর, অন্যদল অতীতকে সমূলে উৎখাত করতে ব্যস্ত। দু-দলেই তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক। প্রথম দল জন্ম দিচ্ছেন মৌলবাদের (বিভিন্ন ধর্মের নামে), দ্বিতীয় দল নিয়ে আসছেন ইয়াঙ্কি পার্মিসিভ কালচার কিংবা আপাত-সাম্যবাদী আধিপত্যবাদ। এঁরা মূলতঃ সমগোত্রীয়—উভয়েই অনুকরণপ্রিয়। ফলে মানুষের জীবনে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের শূন্যতাবাদ। প্রথমদল ঐতিহ্যকে আধুনিক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করতে পারছেন না, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যের প্রাসঙ্গিকতা দেখাতে পারছেন না। আর দ্বিতীয় দল দেশ-কালের উপযোগী করে নতুন সুস্থ মূল্যবোধের হদিস দিতে পারছেন না। এঁরা অতীতকে ভাঙ্গছেন, কিন্তু বর্তমানকে গড়তে পারছেন না, বরং পাশ্চাত্য যাকে বাতিল করতে উদ্যত সেই পাশ্চাত্য নিয়মনীতি অনুকরণে ব্যস্ত আধুনিকতার নামে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, স্বামীজী তা লক্ষ্য করেছিলেন। এবিষয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ বইয়ে। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েই তিনি চেয়েছিলেন উভয়ের ভাল দিকগুলির সমন্বয়ে এক নতুন বিশ্ব-সংস্কৃতি। ভগিনী নিবেদিতাকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ "এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার ওতে যোগ দাও। আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারতরমণীদের সমিতিকে ঐতে যোগ দেওয়াতে পার, তবে আরো ভাল হয়।"[৫] সেই যুগের তুলনায় বিরাট সাহসী চিন্তা এটি নিঃসন্দেহে। আসলে স্বামীজী চেয়েছিলেন, মানুষ নিজের দেশকে জানুক, নিজস্ব সংস্কৃতিকে বুঝুক, মাটির ভূগোল-ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হোক প্রথমে, তারপর সেই মাটির উপর দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিকতার শরিক হোক। এভাবেই তিনি জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় চেয়েছেন। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সাহায্যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন যুগ আসছে এবং এর উপযোগী নতুন সংস্কৃতি চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েই নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহমিকায় ভুগছিল। ফলে প্রাচ্যে গড়ে উঠেছিল অচলায়তন, পাশ্চাত্যে জাতি-বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদ। স্বামীজী তাই পাশ্চাত্যের কাছে তুলে ধরেছিলেন প্রাচ্যের মর্মবাণী, আর প্রাচ্যের কাছে আবাহন জানিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের প্রাণস্পন্দনকে উপলব্ধি করার।

দর্শন ও কর্ম

দর্শনের ছাত্র ছিলেন স্বামীজী। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের উত্তুঙ্গ চূড়ায় বসেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেনঃ এসবের ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা

---

[৩] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩২

[৪] ঐ, " পৃঃ ৩৪

[৫] ঐ, " ৮ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৯৭

কতখানি? দর্শন কি শুধুই নিভৃত চিন্তার ফসল, বাগ্‌বিতণ্ডা-কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক আলোচনা? জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি শুধুই জ্ঞান, কিংবা আরও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে কর্মে অবতীর্ণ হওয়া?

বেদান্তের চর্চা ভারতে বহুকাল থেকেই ছিল। স্বামীজী এখানে নিয়ে এলেন নতুন শব্দ—ব্যবহারিক বেদান্ত। দর্শন যদি মানুষকে কর্মোদ্যমী না করে, জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য না করে, তবে তা গজদন্ত মিনারে পর্যবসিত হয়, মুষ্টিমেয় এলিটের (elite) কুক্ষিগত হয়ে থাকে। স্বামীজী চেয়েছিলেন, বুদ্ধিজীবীকে activist করে তুলতে। এ শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও। আমাদের দেশে বর্তমানে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা অনেক, কিন্তু এঁদের মধ্যে arm-chair theoretician-ই বেশি। তাঁরা যে নতুন নতুন তত্ত্ব ও চিন্তা উপস্থাপিত করছেন সেগুলি যে ব্যবহার-উপযোগী তা প্রমাণ করার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদেরই। সেই দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে দর্শন পরিণত হয় বন্ধ্যা ভূমিতে।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই social committment থাকা দরকার। বিজ্ঞানী, শিক্ষক, সাংবাদিক, গবেষক প্রমুখ মননশীল মানুষেরা যদি সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকেন তবে তাঁরা নিছক ভালমানুষে পরিণত হন কিংবা শাসক দলের চাটুকারে পর্যবসিত হন। আর এই বিপজ্জনক পরিবেশেই এগিয়ে আসে পেশীশক্তি ও অর্থশক্তি, জন্ম নেয় অসুস্থ মূল্যবোধ। অতএব দার্শনিকের জীবন হবে এক নিরন্তর সংগ্রাম, তত্ত্বকে কর্মে পরিণত করে আপামর জনসাধারণকে সচেতন রাখার অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস। দর্শন শুধু নিভৃত চিন্তার ফসল নয়, সংগ্রামে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জীবনকে আবিষ্কার করা আরও বড় দর্শন।

এভাবে স্বামীজী একদিকে যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, তাঁদের দিয়েছেন গঠনমূলক পথের সন্ধান, অন্যদিকে ধর্মসাধনার মর্মবাণীকে তুলে ধরেছেন। আর পাঁচটা বিষয়ের মতো ধর্মেও আচার-অনুষ্ঠান আছে, মন্দির আছে, আছে পুরোহিত। কিন্তু এসব হল বাহ্যিক, ধর্মের মূল কথা দর্শনকে জীবনে ফলপ্রসূ করে তোলা। সব ধর্মই বলছে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কতকগুলি মূল্যবোধের কথা—সত্য, ভালবাসা, সাম্য, সেবা ইত্যাদি। লক্ষ্য হিসেবে সব ধর্মই বলছে ঈশ্বরের কথা—ঈশ্বর হও, তাঁর কাছে যাও। ঈশ্বর আদর্শের (perfection) প্রতীক। অর্থাৎ সব ধর্মেরই লক্ষ্য—আদর্শ মানব হওয়া। এই প্রাথমিক ও চূড়ান্ত বক্তব্যকে ভুলে গিয়ে বাহ্য-অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকার অর্থ নিজেকে ঠকানো, মূল কথাকে এড়িয়ে গৌণ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা। নিছক বিশ্বাস, প্রাণহীন আচার ও উগ্র গোঁড়ামী থেকে ধর্মকে মুক্ত করে স্বামীজী বললেনঃ "অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই ধর্ম।" কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া আর ধার্মিক হওয়া যে এক কথা নয়, এটি তিনি তুলে ধরলেন। একজন মানুষ তখনই ধার্মিক হয় যখন সে তার দেবত্বকে প্রকাশিত করে।

মানুষের উপর বিশ্বাস

'অন্তর্নিহিত দেবত্ব' কথাটির মাধ্যমে স্বামীজী মানুষের উপর তাঁর অগাধ আস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। আসলে সমাজে অধিকাংশ মানুষই তো ভাল, প্রকৃত অসৎ আর ক-জন? সমস্যা হলো, এই সৎ মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের শুভশক্তিকে সমাজে ক্রিয়াশীল করে তোলেন না ব্যাপকভাবে। কিন্তু তবু মানুষ বেঁচে আছে এক নতুন পৃথিবীর আশা নিয়ে—পরিবেশ রক্ষায়, ইথিওপিয়ায় খরাপীড়িত মানুষের জন্য দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে, রাশিয়ার ভূমিকম্পে, বাংলাদেশের বন্যায় সাহায্য পাঠাচ্ছে অকৃপণভাবে; অন্যদিকে অত্যাচারীর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য রাইফেল তুলে নিচ্ছে। যখন চারদিকে "কিছু নেই,

কিস্যু হবে না" বলে অসহায় আর্তনাদ, তখনো এই কাজগুলিই প্রমাণ করে যে, মানুষ এখনো ভালবাসা বুকে নিয়ে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকতে চায়। শত বাধা ও অন্যায় সত্ত্বেও ইতিহাসে মানুষের এই জয়যাত্রা স্বামীজীর চোখ এড়ায়নি। তাঁর ভাষায়—"উপনিষদ্, বুদ্ধ, খৃষ্ট এবং অন্যান্য মহান ধর্মপ্রচারকদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত নূতন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এবং নিপীড়িত-পদদলিত ও অধিকার-বঞ্চিতদের দাবীতে এই ঐক্য ও সমতার বাণীই বিঘোষিত হইতেছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিবেই।"৬ মানুষ তার দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে বারবার অতিক্রম করতে চেয়েছে, স্পর্শ করতে চেয়েছে অসীমকে। মানুষের এই মহতী ইচ্ছাকে স্বামীজী শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, বিশ্বাস রেখেছেন মানুষের উপর।

আজকে যখন হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণা-সন্দেহ ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে গৃহকোণ থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত, তখন স্বামীজীর আঁকা এই বিশ্বাসের ছবিই আমাদের রক্ষা করতে পারে, হাতে হাত রেখে নতুন অঙ্গীকার জয়লাভ করতে পারে।

সর্বাত্মক মুক্তি

ধর্মের নামে কুসংস্কার মানুষের ক্ষতি করেছিল ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে মানুষের ক্রমবর্ধমান স্বার্থপরতা ও অন্যের প্রতি উদাসীনতাও কি ভয়ঙ্কর নয়? অথচ মানুষ চেয়েছে স্বাধীনতা, চেয়েছে মুক্তি—যুগ থেকে যুগান্তরে।

এই মুক্তির ক্ষেত্রে স্বামীজী এক সর্বাত্মক ধারণা উপহার দিলেন। মুক্তির অর্থ বন্ধন থেকে মুক্তি। এই বন্ধন তিন রকমের। প্রাকৃতিক বাধা—একদিকে যেমন খরা-বন্যা-ভূমিকম্প থেকে মুক্তি পেতে হবে, অন্যদিকে অধিক ফসল ও খনিজ দ্রব্যের জন্যও চেষ্টা করতে হবে। এ-পথের সহায়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বাধা—বৈষম্য ও অবিচার। এ থেকে মুক্ত হতে হলে দরকার সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি। তৃতীয় বাধা মানুষের মনের অসংযত কামনা-বাসনা। একে জয় করা যায় আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে। এভাবে স্বামীজী বন্ধন ও মুক্তি সম্পর্কে এক পূর্ণতর হদিস দিলেন।

এজন্যই স্বামীজী সন্ন্যাসী হয়েও বারবার বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা, নিজেকে ঘোষণা করেছেন সমাজতন্ত্রী হিসাবে। এই তিনটি বিষয় পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। ব্যষ্টি ও সমাজ, উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তি পাক মানুষ। গর্বাচেভের উদারনীতি মানুষের স্বাধীনতাকে সামাজিক স্তর থেকে ব্যক্তি স্তরেও নিয়ে যাচ্ছে। কেইন্‌স্ যেমন চেষ্টা করেছিলেন ব্যক্তি-স্বাধীনতা যেন সামাজিক স্তরকে ব্যাহত না করে।

স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা আজ ক্রমশই বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। তাঁর স্বাধীনতার আহ্বান বৃটিশ ভারতে অসংখ্য বিপ্লবীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। আজ এই স্বাধীন ভারতেও দেখছি তাঁর বাণী বহু মানুষকে নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করছে, শত বিপত্তি সত্ত্বেও নতুন ভাবে দেশ গঠনে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষের গভীরতম সমস্যাগুলির সমাধানেও তাঁর চিন্তা নতুন দিঙ্‌নির্দেশ করছে।

---

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৫

আবুল কালাম আজাদ এবং ভারতীয় জীবনদর্শন

হোসেনুর রহমান

অতি সম্প্রতি আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) সম্পর্কে আমাদের মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা এতটা কেন, আদৌ কোন প্রকার আজাদ প্রবণতায় ভুগিনি। কারণটা অত্যন্ত স্পষ্ট। আজাদকে আমরা কেউ কেউ কেবলমাত্র বিরাট ক্লাসিক্যাল পণ্ডিত জ্ঞান করেছি এবং আজাদ সম্বন্ধে আমাদের সব দায়িত্ব ফুরিয়ে গিয়েছে, এই মনে করেছি। অন্য কেউ আবার আজাদকে কেবলমাত্র কূটনীতিক-রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব ধরে নিয়েছি। হ্যাঁ, আজাদ কেবল ধর্মজ্ঞ নন। তিনি একজন বিশিষ্ট জগৎ-খ্যাত ইসলামবিদ্‌ও বটেন। এসব আমাদের বহুল পরিমাণে জানা উচিত ছিল। আর একটি তৃতীয় গোষ্ঠীও আসরে প্রায়শই এসে উপস্থিত হয় এবং তারস্বরে ঘোষণা করেন আজাদ কেবলমাত্র কংগ্রেসের এক মূল্যবান শো-পিস ছিলেন। এই তৃতীয় গোষ্ঠিতে মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ই আছেন। কী বিচিত্র এই দেশ!

আসলে আজাদ যে একজন বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্‌ ছিলেন, তিনি যে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতি নির্মাতা ছিলেন—এসব আমরা বুঝতে চাইনি। কারণ ঐ একটাই। মৌলানা আজাদ আবার এত সব ছিলেন নাকি? একজন বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত সম্বন্ধেও আমাদের এই একই ধারণা।

এই নিবন্ধে আমরা দেখাতে চেষ্টা করব আজাদ আরবে জন্মগ্রহণ করে আরবীয় মা—ভারতীয় পীর পিতার সংসারে আরবি-ফার্সি-উর্দুর মধ্য দিয়ে কী করে ভারতসন্ধানে, ভারতসংস্কৃতির সন্ধানে কত সময় ব্যয় করলেন। কেনই বা করলেন। কারণ তিনি ভেতর থেকে অনুভব করলেন ভারতবর্ষের মাটিতে তিনি দ্বিতীয়বার ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। অর্থাৎ আল-হিলাল (১৯১২) আল-বালাগের (১৯১৮) যুগ শেষ, আজাদের জীবনে এক মহাসন্ধিক্ষণ। এবার তিনি গান্ধীর হাতে ভারততীর্থের সন্ধান করলেন। নবজীবনের আস্বাদন করলেন। ভারতবর্ষের মনের কাছে তিনি এগিয়ে এলেন। উপনিষদ্‌ থেকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তাঁকে টানল। তিনি যখন রাঁচিতে অন্তরীণ তখন ভারতীয় মানস কাকে বলে বুঝছেন। অন্যদিকে তিনি বেদ-উপনিষদ্‌ হৃদয়ঙ্গম করছেন। এ কথাটি বুঝতে হলে এই সময়ে তাঁর অনূদিত ও ব্যাখ্যাত কোরাণ পড়ে দেখতে হবে। দেখা যাবে সুফি, কবি, বাগ্মী আজাদ ইসলামকে ভারতীয় মানসের অতি সন্নিকটে নিয়ে আসছেন। বার বার আজাদ সত্য সুন্দর প্রেম এই ত্রি-দেবতাকে তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা বলে ঘোষণা করছেন। বার বার আনুষ্ঠানিক ধর্ম, চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থাকে বাতিল করার পক্ষে পর্বত প্রমাণ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মে আজাদ বিশ্বাস হারিয়েছেন বার বার। আবার তিনি একজন ধর্মজ্ঞ। উদাহরণ দিয়ে বলতে পারা যায়, আজাদ ঔরংজীবকে ভোট দেননি। ভোট দিয়েছেন দারা শিকোকে। মরমী সুফি সারমাদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন আজাদ—যিনি শহিদ হয়েছিলেন সম্রাট ঔরংজীবের রাজত্বকালে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে এই সুফি মহাপ্রাণকে উদ্দেশ্য করে আজাদ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। এই রচনা প্রমাণ করে আজাদ ধর্ম বলতে পিতার পীরতন্ত্র বুঝতেন না। গ্রহণ করতেন না পিতার শিষ্যমণ্ডলীর ভক্তিবাদ। বরং তিনি স্পষ্ট বিশ্বাস করতেন: "There is no conviction in my heart which the thorns of doubt have failed to pierce; there is no faith in my soul which has not been subjected to all the conspiracies of disbelief."[১]

---

[১] Azad, Memorial Volume, p. 92

অর্থাৎ, আজাদ আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করতে চান। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে চলেনঃ "I am under no obligation for guidance to any man's hand or tongue, nor to my family nor to any syllabus of education. All the guidance I have received has been from the Divine Throne."[২] এই আত্মশক্তি আজাদকে নিয়ে গেছে কোরানের কাছে স্বচ্ছন্দে। তিনি তাঁর স্বাধীনতাকে কোন কিছুর জন্যে কোনদিন বিসর্জন দেননি। দাবি করেছেনঃ প্রতিটি মানুষ স্ব-স্ব বুদ্ধি, অনুভূতি, স্বাধীনতার আলোকে কোরান বিচার করবেন। এবার দেখি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজাদ কি বলছেনঃ "We cannot take a single step towards the truth by starting from those ideas and beliefs which are actually found in the minds of the followers of any inculcated religion."[৩]

ব্যক্তিস্বাধীনতার, স্ব-বুদ্ধির, স্ব-কালের মহিমার ওপর আজাদ সর্বাধিক নির্ভর করতে চান। এসব বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরলাভও তাঁর আকাঙ্ক্ষা নয়। একথা সর্বজনবিদিত, ভারতীয় জীবনদর্শন আজাদকে আকর্ষণ করে। ক্রমশঃ তিনি গান্ধীর পথকে গ্রহণ করেন। জীবনে যা শ্রেয়, যা মঙ্গল, তাই আজাদ গ্রহণ করলেন। এবং ভারতবর্ষের জীবনদর্শনে যা সর্বাধিক মূল্যবানঃ বহুজনের বহু মত বহু পথ বহু সাধনা। কারণ সব পথই শেষ পর্যন্ত এক চূড়ান্ত ভাব, কাব্য, প্রেম, অহিংসায় সবাইকে একাকার করে দেবে। সবাই সেই এক পরমেশ্বরকে পেতে চায়। এই হলো আজাদের ভারত আবিষ্কার, ত ভারত-প্রেম কথা। যত মত তত পথ।

এই অসুখে যিনি আক্রান্ত তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কী করে নিস্পৃহ থাকতে পারেন? তিনি পাশ্চাত্যের আত্যন্তিক অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতা গ্রহণ করতে পারেননি। আবার তিনি প্রাচ্যকে সমালোচনা করেছেনঃ ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পূর্বদেশ বড় বেশি ব্যস্ত হয়েছে। এমন কি সামাজিক কল্যাণবোধকে বিসর্জন দিয়েও ভারতবর্ষে মানুষ ঈশ্বরলাভের আশায় অধীর হয়েছে। এই বিষয়টি আজাদ অনুমোদন করতে পারেননি। আবার পশ্চিম পৃথিবী—'সোস্যাল প্রোগ্রেস'-কে বড় বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। এও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পথে গিয়েই পূর্ব ও পশ্চিমের জীবনদর্শনের পার্থক্য কোথায় পরিষ্কার করে বলেছেন। তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত History of Philosophy: Eastern and Western. এই দু-খণ্ড দর্শনের ইতিহাস শিক্ষামন্ত্রী আজাদের ইচ্ছা ও বেদনার ফল। পশ্চিমের দেশগুলিতে ভারতীয় দর্শন পড়ানো হয় না। এই বেদনা। আর তাই থেকে এই ইচ্ছা যে ভারতবর্ষের দর্শনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা হোক।

এই সৃজনশীল মানুষটি তাই এই গ্রন্থের ভূমিকায় ফার্সি কবিতার চরণগুলি উদ্ধার করলেনঃ

"The universe is like an old book
Of which the beginning and ending
pages are missing.
Philosophy is the search
For these missing pages.
In the course of the quest,
It has found science;
Now science is faced with
The task of giving the world peace. [৪]

---

[২] Azad Memorial Volume, p. 81

[৩] Ibid. pp. 147-148

[৪] Abul Kalam Azad, Jan Henderson Douglas, edited by Gail Minault and Christian W. Troll, OUP p. 243

বলা বাহুল্য, এই বিশ্বশান্তি ভারতবর্ষের বহু যুগের আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম। এবার বোধ করি বোঝা যাচ্ছে আজাদ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জগৎ থেকে অনেক দূরে বাস করেননি। বিবেকানন্দ বলে গেলেন পশ্চিমের মানুষ প্রতিদিন বিজ্ঞানকে, প্রাযুক্তিক কলাকৌশলকে মানুষের জীবনদর্শনের চেয়ে বড় করে তুলছে। বিজ্ঞান ভাল। কিন্তু জীবনদর্শনহীন বিজ্ঞান ভাল নয়। তিনি বললেন ভারতবর্ষের দর্শনে মানুষের অধ্যাত্মচেতনাই সবচেয়ে বড় কথা। আজাদ বলছেন, বেদান্ত ও সুফিবাদে বার বার বলা হয়েছে, 'concept of man'-ই সবার উপরে। "By identifying man with God, the eastern concept of man elevates him to godhead. Man has therefore no other goal but to establish his identity with God."[৫]

বেদান্তের আসল সুরটি যথার্থই আজাদের কানে ধরা পড়েছিল। তিনি বললেনঃ মানুষের অনন্ত শক্তি, অসীম তার ক্ষমতা। তার শক্তির ওপর কোন সীমারেখা টানা যাবে না। আজাদ বলছেন, মানুষের শক্তি, সাধনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি—কোন কিছুকেই সীমার মধ্যে ধরে রাখা যাবে না। এই মর্মে তিনি সুফিবাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের কথা বলছেন। এই বিশ্বাসঃ "man's status of unity with God."

তিনি বললেনঃ 'Sufism, which 'elevates man to godhead', is the highest possible concept of man."[৬]

এবার দেখা যেতে পারে, বিবেকানন্দ বেদান্তের স্পিরিট আলোচনা করতে গিয়ে এপ্রসঙ্গে কি বলছেনঃ "The Vedanta claims that there has not been one religious inspiration, one manifestation of the divine man, however great, but it has been the expression of that infinite oneness in human nature; and all that we call ethics and morality and doing good to others is also but the manifestation of this oneness."[৭]

এই শাশ্বত বিশ্বাসের মধ্যেই ভারতীয় মানস বেঁচে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। এই সত্য আজাদ উপলব্ধি করেছেন মর্মে মর্মে। আজাদ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। এমনকি "sharing in the attributes of God"-এ তাঁর বিশ্বাস আছে, প্রেম আছে। এখানেই বেদান্ত ও সুফিবাদকে তিনি একাত্ম করে চিন্তা করতে পেরেছেন। বুদ্ধির ব্যবহার, যুক্তির বিস্তার করে আজাদ একথাও বলতে পেরেছেনঃ "He did say that the Quran was the word of Muhammad as well as the word from God ... "[৮]

যুক্তি, তর্ক, সন্দেহ জিজ্ঞাসা—এসব ধর্মজগতের বাইরে নয়। আজাদ তেমন ধর্মজ্ঞ যিনি কবিতাকে বাদ দিয়ে এগোতে পারেন না, দর্শনকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করতে পারেন না। দার্শনিক আজাদ বলছেন কোরানের এই প্রশ্নঃ "If you do not deny that the creation of the universe is the creation of but One Supreme Being, and that it is He who sustains it, then why do you deny that the spiritual way of life prescribed by Him is but one, has been delivered to man in but one way?"[৯]

---

[৫] Ibid, p. 243

[৬] Ibid, p. 244

[৭] The Complete Works of Swami Vivekananda Vol. I, p. 389

[৮] Ibid, p. 271

[৯] Tarjuman-Al-Qur'ān, p. 173

এবার আজাদ কোরানের আসল বক্তব্য তুলে ধরছেন ঃ "The divine truth, says the Qur'ān, is an universal gift from God. It is not exclusive to any race or any people or religious group or is not exclusively delivered in any particular language. You have no doubt, created for yourselves national, geographical and racial boundaries. But you cannot so divide Truth. Truth bears no national stamp, nor professes any racial or geographical loyalties or group affiliation "[১০]

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ? উত্তর দিচ্ছেন বিবেকানন্দ ঃ "Vedanta formulates, not universal brotherhood, but universal oneness. I am the same as any other man, as any animal good, bad, anything. It is one body, one mind, one soul throughout. Spirit never dies. ..."[১১]

আজাদের শতবর্ষে আমরা যেন বুঝতে চেষ্টা করি তিনি কতখানি বিশ্বব্যাপী চিন্তাধারা এবং কতখানি ভারতীয় জীবনদর্শনধারা নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় তিনি সন্দেহহীন বা সংকটশূন্য ছিলেন এমন কথা বলার কোন প্রেরণা আমি কখনো অনুভব করিনি। আমি বলতে চেয়েছি ঃ আজাদ বহুক্ষেত্রে আধুনিক ধর্মজ্ঞের আসন সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এবং এ কাজে ভারতীয় জীবনদর্শন, রামমোহন, রাজকৃষ্ণ বিবেকানন্দ তাঁকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক সাহায্য করেছেন।

শেষ কথা। আজাদের জীবনকালে, বা এমনকি আজ ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আজাদের দর্শনলাভে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে উঠতে পারল না। তেমন কোন আজাদের দেখা পাওয়া গেল না যিনি ধর্মাচরণে জীবনে পণ করেছেন প্রেমে প্রত্যয়ে পরম শ্রদ্ধায়। এবং তদুপরি যিনি উপনিষদ্ অধ্যয়ন করেছেন, ভারতীয় দর্শন অনুধ্যান করছেন, যিনি বেদান্তকে নিজের প্রাণের আর্তি বলে অনুভব করছেন। শতবর্ষোত্তর আজাদের কোন উত্তরসূরী পাওয়া গেল না। এ দুঃখ কোথায় রাখব ? তবু বিবেকানন্দের মত-প্রবাহকে স্মরণ করে, তাঁর একশো পঁচিশতম বর্ষ অতিক্রম করে প্রাণে প্রবল উত্তেজনা, হৃদয়ে প্রেম, জীবনে উদগ্র উৎসাহ নিয়ে বলতেই হবে—এসব নৈবেদ্য ব্যর্থ হবার নয়। আবার একদিন শতফুল ফুটবে। আবার জীবন জীবনকে চিনতে পেরে বলে উঠবে ঃ আমরা সবাই একটি ক্রমবর্ধমান ছোট্ট গ্রামে বাস করছি। আমাদের সত্যকে চাই, শিবকে চাই, সুন্দরকে চাই, জয় হোক এ জীবনের এবং এই জগতেই সেই জয় পরিপূর্ণতা লাভ করুক।

---

[১০] Ibid, p. 172

[১১] The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII,p. 129

মাধুকরী

জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ

নিবেদিতা অধ্যায়

কালিদাস নাগ

১৩০৫ সালের ১লা মাঘ পাক্ষিক পত্রিকারূপে যার জন্ম, তার 'উদ্বোধন' নামকরণ করেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। তার আগে কয়েক মাস (১৮৯৮) তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে কাটিয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পাদি অবলম্বন করে যেসব বহুমূল্য প্রবন্ধ পরে লিখেছেন, তার বিষয়বস্তু নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর এই সময়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। আরো বছর দুই আগে—অর্থাৎ ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে—দেখি স্বামীজীকে তাঁর পাশ্চাত্য ভক্ত ও বন্ধুরা এক বিদায়-সভায় সম্বর্ধনা করছেন লণ্ডনের Royal Society of Painters পরিষদে। সুতরাং শিল্পিমহলে যে স্বামীজীর অনেক অনুরাগী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। চার বৎসর ভারতীয় আদর্শ ও বৈদান্তিক ঐক্যবাদ প্রচারে প্রাণপাত পরিশ্রম করে স্বামীজী দেশে ফিরেছেন; আগাগোড়া জাহাজে এলে বিশ্রাম হতো। কিন্তু তিনি এলেন শরীর জখম করার পথ ধরে প্যারিস, মিলান, ফ্লরেন্স, রোম, নেপলস প্রভৃতি শহরের জগদ্বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহগুলি শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়ে। লণ্ডন থেকেই ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন রাস্কিন (Ruskin) পন্থী, সুতরাং স্বামীজীর সঙ্গে শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন যে কত বড় আনন্দের কারণ হয়েছিল, তা আমরা কল্পনা করতে পারি।

১৮৯৯ সালের জুন মাসে নিবেদিতাকে নিয়ে (Master as I Saw Him এই যুগের অপূর্ব সৃষ্টি) স্বামীজী শেষবার পাশ্চাত্যদেশের বেদান্তকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে বেরোন। লণ্ডন, নিউইয়র্ক হয়ে ক্যালিফর্নিয়াতে এসে সাত মাস কাজ করেন। এই সময়ে দেখি, স্বামীজীর প্রেরণায় নিবেদিতা দুটি অধুনাপ্রসিদ্ধ অভিভাষণ দেন—(১) ভারতীয় নারী, (২) প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা (New York, Aug. 1899); সঠিক সন তারিখ তখনকার স্থানীয় পত্রিকাদি ঘেঁটে নির্ধারণ করা প্রয়োজন যে, স্বামীজী ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে বক্তৃতা দিতে নিবেদিতাকে কেন উদ্বুদ্ধ করেন এবং সেদিকে কতটা সাড়া জেগেছিল। নিবেদিতার যে ফরাসী জীবনী সম্প্রতি লেখা হয়েছে, তার মধ্যে এবিষয়ে কোন নতুন তথ্য নির্ণয়ের প্রমাণ পাইনি, অথচ এই যুগেও প্রশ্নটির গুরুত্ব যে খুব বেশি, আমি তা দেখাতে চেষ্টা করব।

১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে পৃথিবীর ধর্মেতিহাস কংগ্রেস (Congress of the History of Religions) বসে। ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বামীজী উহাতে যোগ দেন এবং অন্যান্য আলোচনার মধ্যে একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন; সেটি ভারতীয় শিল্পের উপর তথাকথিত 'গ্রীক-প্রভাব' নিয়ে। ঐতিহাসিক সংযোগের ভিতর দিয়ে আদান-প্রদান হওয়া স্বাভাবিক এবং গ্রীকরাও যেমন অনেক কিছু ভারতের কাছ থেকে নিয়েছে, তেমনি ভারতীয় শিল্পীরাও গ্রীক-শিল্পীর কাছ থেকে কিছু নিয়েছে; কিন্তু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় শিল্পের প্রাণ গ্রীক-প্রভাবে কোন সময়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্বামীজীর একথা ইন্দো-গ্রীক শিল্পবাদী ফরাসী অধ্যাপক Foncher শুনেছিলেন কিনা জানি না, এসব কথা ভারত-শিল্পী-বন্ধু হ্যাভেল তখনও স্পষ্ট করে লেখেননি এবং আনন্দ

কুমার স্বামী তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশী করছেন। অথচ এত বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের গবেষণার পূর্বাভাস দিয়ে গেলেন—তার সাক্ষী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও Prof. Patrick Goddes; স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস থেকে Miss Mc Leed, নিবেদিতা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন শিল্পতীর্থ পরিক্রম (Oct.-Dec. 1900); এবার তিনি চিত্র ভাস্কর্যাদি শুধু দেখাচ্ছেন না, তুলনামূলক আলোচনা ও মন্তব্য করছেন। চোখের সামনে ভেসে চলেছে পাশ্চাত্য শিল্পধারা —Austria, Hungary, Servia, Rumania, Bulgaria-র বড় বড় চিত্রশালা তন্ন তন্ন করে দেখে স্বামীজী ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য শিল্প-নিদর্শনগুলিও পরীক্ষা করেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে শিল্পপ্রভাব কতভাবে গিয়েছে, কী আগ্রহ সেটি বুঝবার ও বুঝাবার। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্তু নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে, উদার প্রান্তরে সঙ্গীদের সে-বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ভারতের তথা এশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগেনি, কারণ সেখানে শুধু শিল্প নয়, শিল্পীও যেন অস্পৃশ্য (Untouchable)! স্বামীজী এক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ (Pioneer); অথচ তাঁকে আমরা মনে রাখি না, যখন ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ বিষয়ে আলোচনা করি।

১৯০১ সালের গোড়ায় দেখি, স্বামীজী বেলুড়ে ফিরেছেন। ১৮৯৮ সালে ঠিক তিন বছর আগে গঙ্গাতীরে জমি কিনে যখন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নিজেই স্বামীজী এক বিরাট মন্দিরের পরিকল্পনা শুধু ধ্যানে নয়, নক্সায় তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে, তাঁর অধিকার পুঁথিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। পায়ে হেঁটে ভারতের প্রধান প্রধান সব মঠ-মন্দির স্বামীজী যেমন তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন, এমন কম প্রত্নতাত্ত্বিক বা শিল্পের ঐতিহাসিকরা দেখেছেন। ১৮৮৮-১৮৯২ সালে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সব তীর্থই তিনি পরিদর্শন করেন। আবার জীবন-দীপ নির্বাণের পূর্বে শেষবার মায়াবতী থেকে কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ পর্যন্ত ঘুরেছিলেন (১৯০১-০২)। রোগে যখন প্রায় শয্যাশায়ী তখন হঠাৎ জাপানী ভিক্ষু Rev. Oda প্রাচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ চৈনিক চিত্রকলার চরম সমঝদার Count Okakura ১৯০১ সালের শেষে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হলেন। আট বৎসর আগে Chicago ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেবার পথে স্বামীজী চীন থেকে জাপানে আসেন; এবং সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সাল থেকে প্রাচ্য শিল্প ও জাপানী শিল্পীদের বিষয়ে স্বামীজী খবর রাখতেন। Oda ও Okakura এই সময় স্বামীজীকে আবার জাপানের ধর্মসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সে আশা অপূর্ণ থেকে যায়। জীর্ণ শরীর নিয়ে তবু স্বামীজী জাপানী অতিথিদেরও সেই সঙ্গে মহাবোধি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অনাগারিক ধর্মপালকে নিয়ে বুদ্ধগয়া ও কাশী পরিক্রমা শেষবার করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও সঙ্গে ছিলেন। নিবেদিতার রচনাবলী থেকে আজ ভাল করে দেখা উচিত তিনি ভারতীয় শিল্প নিয়ে এত গভীর আলোচনা করেছিলেন কোন্ প্রেরণায়।

ভগিনী নিবেদিতাই আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে আর একবার বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমায় বিহার ভ্রমণ করেন এবং জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী (১৯০১) ও Modern Review পত্রিকার সাহায্যে নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মিরূপে ভারতের নবশিল্পের প্রচারে নামেন।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায় আধুনিক ভারত-শিল্পের ইতিহাসে পরম গৌরবের স্থান অধিকার করবে বলে আমার বিশ্বাস; অথচ এই দিকে গবেষণার যে উদার ক্ষেত্র রয়েছে, সেবিষয়ে আজও অনেকে সচেতন হননি। ১৯০২ সালে

বিবেকানন্দের তিরোভাব ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বশিল্প-দরবারে আবির্ভাব ; এ মাসের Studio পত্রিকা লণ্ডন থেকে তাঁর অধুনাপ্রসিদ্ধ 'বুদ্ধ ও সুজাতা' প্রভৃতি চিত্রগুলি উপযুক্ত বর্ণবিন্যাসে প্রকাশ করে। সে যুগ থেকে ১৯১১ সালে যখন দেহত্যাগ করেন তখন পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা একা অবনীন্দ্রনাথের ও নন্দলাল প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের কত ছবির লিপি-ভাষ্য নানা প্রবন্ধে বিশেষতঃ প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার 'চিত্র পরিচয়ে' রেখে গেছেন। ভারতবাসীদের বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পিসঙ্ঘের সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ নিবেদিতার উপযুক্ত স্মৃতি স্থাপন করে ঋণ পরিশোধের কথা ভাবা উচিত।

১৯ শতকের শেষ দশকে অবনীন্দ্রনাথও আভাসে জানিয়েছেন যে, তাঁর জীবনে যেন এক বিপ্লবের ঢেউ লেগেছিল। পাশ্চাত্য শিল্পপদ্ধতি অনুসরণ করে কেরল-শিল্পী রবি বর্মা প্রচুর সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। অবনীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য রীতিতে হাত পাকিয়ে তুলেছেন, এমন সময় দেখা দিলেন মনীষী E. B. Havell. তাঁর সহানুভূতি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছিল। ক্যানভাসে আঁকা বড় বড় তৈলচিত্র বিসর্জন দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে লাগলেন 'কৃষ্ণলীলা', রূপকথার নায়ক-নায়িকা এবং ক্রমশঃ ১৯০১-১৯০৫ সালের মধ্যে বুদ্ধ ও সুজাতা, ভারতমাতা প্রভৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই বিরাট জাতীয় আন্দোলনের যুগে সংস্কৃতি-কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আবার অতিথি হয়ে এলেন Count Okakura এবং তার সঙ্গে চিত্রকর Taikwan যিনি জাপানী আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৫) আগেই প্রকাশিত হয় Okakura-র 'Ideals of the East' ; এবং ক্রমশঃ Havell সাহেবের 'Indian Sculpture and Painting' প্রভৃতি বইগুলি ছাপা হয়ে ভারতীয় শিল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজ গুণী গগনেন্দ্রনাথ শুধু নিজেদের ছবির ভিতর দিয়ে নতুন করে জাতীয় জাগরণের ইতিহাস লিখে সন্তুষ্ট হননি ; তাঁরা গড়ে তোলেন উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলী, যাঁদের মধ্যমণি হয়ে আছেন শ্রীনন্দলাল বসু। তাঁকে দেখা মাত্র ভগিনী নিবেদিতা যেন দিব্যদৃষ্টিতে চিনেছিলেন যে ভারত-শিল্পের ধুরন্ধর হবেন তিনি ; অবনীন্দ্রনাথের মানসপুত্র নন্দলালকে তাই নিবেদিতা অজন্তাগুহা চিত্রাবলী নকল করতে পাঠান (১৯১০) Lady Harringham এর সঙ্গে।

ইতিমধ্যে Indian Society of Oriental Art প্রতিষ্ঠিত হল (১৯০৭-০৮) কলিকাতায়। Justice Woodroff প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ভারত-বন্ধু ছাড়া দেখি Lord Kitchener ও পরে Lord Carmichael স্বদেশী শিল্পের বিদেশী সমঝদাররূপে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীরা নানা শিল্প-প্রসঙ্গ করেছেন, তেমনি ভগিনী নিবেদিতাও ভারত-শিল্প-সাহিত্যের মর্মকথা তাঁর অনুপম ভাষায় লিখে গেছেন প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায়। নিবেদিতা ও রামানন্দের সহযোগিতায়, সাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও নব্যভারত শিল্প কিভাবে বেড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। (Nivedita : The Civic and National Ideals, pp. 73-148) ; তার মধ্যে এসে হাজির হলেন সিংহল-ভারতের উপযুক্ত সন্তান আনন্দ কুমারস্বামী ; তিনি ছাপালেন তাঁর Art and Swadeshi, তার পর Medieval Sinhalese Art এবং তারপর, প্রায় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪৭), চল্লিশ বছর ধরে, কত বিচিত্র গভীর শিল্প-সন্দর্ভ! তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে নীরবে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে মনে পড়ল ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে যেকয় ছত্র কুমারস্বামী লিখেছিলেন ঃ

“Sister Nivedita's Untimely death in 1911 has made it necessary that the present work (Myths of the Hindus and Buddhists, 1913) should be completed by another hand. A most Sincere disciple of Swami Vivekananda who was himself a follower of the great Ramakrishna, she brought to the study of Indian life and literature a sound knowledge of western educational and Social Science and an unsurprassed enthusiasm of devotion to the peoples and the ideals of her adopted country. Through these books Nivedita became not merely an interpreter of India to Europe, but even more, the inspiration of a new race of Indian students no longer anxious to be Anglicized, but convinced that all real progress, as distinct from mere political controversy must be based on national ideals, upon inventions already clearly expressed in Religion and Art."

ভারতের ধর্ম শুধু পরকাল আর পরলোক আশ্রয় করে আছে, এ ধারণা যে কত বড় মিথ্যা, তা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগ্নিময়ী বাণীর ভিতর দিয়ে ও চরম আত্মোৎসর্গের সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যা নিবেদিতা সেই চিরন্তন ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মাধুর্যভরা ছোটখাট আচার-অনুষ্ঠানের যোগ কত গভীর, সেটি তাঁর রচনায়, তাঁর সেবায় প্রমাণ করে গেছেন। তাই নন্দলাল বসুর 'সতী' চিত্রখানির এমন গভীর ব্যাখ্যান তিনি লিখে যেতে পেরেছেন। সতী চিত্রখানি জাপানের সর্বপ্রধান শিল্পপত্রিকা Kokka-তে প্রকাশিত হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা যে এক নব যুগের আরম্ভ করেছেন, সেটি বিশ্বের শিল্প-মহলে প্রমাণ হয়ে যায়।

কালের ধর্মে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা ভিন্ন খাতে বইবে, সেটা স্বাভাবিক এবং আধুনিক ভারতের শিল্প তার নূতন ভাষা ও ছন্দ খুঁজে নেবে। কিন্তু বিবেকানন্দ-নিবেদিতার তথা অবনীন্দ্র-নন্দলালের যুগকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-ইতিহাস বিশ্বে দাঁড়াতে পারবে না। যে গভীর ভাব-স্রোত থেকে অন্তহীন রূপলহরী ভেসে উঠেছে, সেটি বুঝতে হলে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সাহিত্যসাগরে ডুব দিতে হবে।

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া—
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।'

রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ যুগের ভাব যে বাংলার শিল্পে সার্থক রূপ পেয়েছে, সে-বিষয়ে আজ কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা হারিয়েছি অকালে ; এবং তাঁর পর শিল্প-ভারতীর সার্থক ভাষা আজ পর্যন্ত আমরা কমই পেয়েছি ; শুধু অলিখিত ইতিহাসের জের টেনেই আমরা চলেছি। ভারত-শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস লেখা বাকি আছে।*

সংগ্রহঃ প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

* মাসিক বসুমতী, ৩৪শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, পৃঃ ২০৬-০৮

কবিতা

বিপরীত গতি

জয়ন্ত বসুচৌধুরী

যে মুখে তাঁর হেথা নেমে আসা,
আপন আস্বাদনে,
সেই পথ ধরে মোরা যদি চলি,
রব দূরে প্রতিক্ষণে।
বিপরীত মুখে গতি যদি হয়
দেখা পাব তারে কভু,
তাঁর নেমে আসা, মোর ফিরে যাওয়া
এ পথেই মেনে প্রভু।
আপনি অরূপ রূপ আশ্রয়ে,
বিভেদের ভাবে আসি,
মোরা রূপ ভাঙ্গি যাব সে অরূপে,
অভেদেরে ভালবাসি ॥
মুক্ত স্বরূপ স্ববশ চেতনে,
শত বন্ধনে বাঁধা,
বন্ধন ভাঙ্গা, বন্দনা-গানে
হবে বিপরীত সাধা।
গায়ক যেমন আনন্দ-মনে,
রাগিণীতে তোলে তান,
মোরা তান ধরে, রাগিণী পেরিয়ে,
আনন্দে লব স্থান ॥
পঞ্চভূতের সমাহারে তাঁর
সপ্তরঙের বিকাশে,
আমন্ত্রণের লিপি ফিরে যাওয়া
উৎসমুখের প্রকাশে।
তাঁর শুধু দেওয়া, আমাদের নেওয়া,
এই তো জীবের ভাব,
উল্টো পথের উল্টোরথেতে
শিবভাব করে লাভ।
সৎ-স্বরূপ চিৎশক্তিতে করে
আনন্দে বিচরণ,
মোরা আনন্দে চেতনা ধরিয়া
করি স্বরূপে উত্তরণ ॥
জ্ঞান-দৃষ্টি করেছে সৃষ্টি
সৃজন বৃষ্টিধারা,
অনাসৃষ্টিতে পাব যে আমরা
জ্ঞানের নয়নতারা।
জ্ঞান ও ইচ্ছা ক্রিয়ার সোপান
পথ ধরে তার নামা,
ক্রিয়া ও ইচ্ছা, জ্ঞান সিঁড়ি বেয়ে
গতির স্থিতিতে থামা ॥

পরম প্রাপ্তি

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

এসে কাছে বসে
নাই বা মোছালে আঁখি
দূর হতে শুধু জানিয়ো গো বরাভয়
হাসিব আবার, ভুলে যাব পরাজয়
শুধু চরণেতে তব এ অশ্রুরাশি
যেন অবশেষে মেশে।

প্রভু, কেন কভু
মিটিবে না কোন সাধ,
কেন হায় পোড়া মন শুধু মোর ভাবে
এবারে আশা পূর্ণ হবেই হবে-
হয় না, তবু অবসাদ
আসে না যে প্রভু।

এইটুকু আমি জানি
এ নহে ছলনা তোমার,
মোরে বঞ্চনা করনিকো তুমি
রাখনিকো দূরে দূরে,
দিয়েছ যে অবসর
গড়িতে জীবনখানি।

এস তুমি সহজ সাজে

শান্তশীল দাশ

কাছে কাছে আছ তুমি,
তবু তোমায় দেখি না-যে ;
ডাকি তোমায় আকুল হয়ে,
কী বেদনা বুকে বাজে।
এস তুমি, দাঁড়াও এসে
আমার আপন জনের বেশে ;
দেখি আমি দুচোখ ভরে
প্রতিদিনের সহজ সাজে।

যেমন করে সবার সাথে
কথা বলি, কাঁদি হাসি,
যেমন করে কাছে টানি,
যেমন করে ভালবাসি ;
তেমনি করে তোমায় আমি
পেতে যে চাই জীবনস্বামী !
এস তুমি. এস তুমি
এস আমার নয়ন মাঝে।

হেরে গেছ আমার কাছে

শিখরেশ চক্রবর্তী

জানি না তো কবে থেকে
ছুটছি আমি তোমার পাছে,
কত জনম কাটল মিছে,
শূন্য এ বুক শূন্য আছে।

আঘাত দিলে বারে বারে,
পথ হারালেম অন্ধকারে,
কান্নাভরা আশা তবু
আপন সুধায় আপনি বাঁচে।
আমি তোমায় চেয়েছি যে
এই জীবনের সুখে-দুখে,
পরাজয়ের ঊর্ধ্বলোকে
সেই কথাটি বাজবে বুকে।

যতই আমায় মারো প্রভু,
ভাল তোমায় বাসব তবু ;
যাবার আগে যাব বলে—
হেরে গেছ আমার কাছে।

তোমারেই যেন পাই

স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

জগৎ জুড়িয়া আছ তুমি তবু
তোমারে দেখি না কেন ?
যে আঁখি তোমারে না পায় দেখিতে
কেন দিলে আঁখি হেন ?
দুদিনের তরে মানযশ দিয়ে
নিজে কোথা হায় লুকাইলে গিয়ে,
পুতুল খেলায় রাখিলে ভুলায়ে,
এ-ধরায় অকারণ !

অন্তরতম তুমি নাকি শুনি,
পরিচয় কোথা তার ?
অন্তরবাণী শুনিছ বসিয়া—
শুনিছ না হাহাকার ?
ব্যাকুল হয়েছে হৃদয় আমার,
তোমা পানে ছোটে প্রাণ অনিবার,
ছেড়ে যেতে চায় মোহের আগার,
ডাকি তাই বার বার।

কত শত দিন চলি গেল, প্রভু !
দরশন নাহি পাই।
যাতনার পারে আশ্রয়তলে
কবে দিবে মোরে ঠাঁই ?
কর্ম্মের কবে হইবে বিরতি,
ভরি দিবে প্রাণে অচলা ভকতি,
মায়া পাশ হতে চির যে মুকতি—
তাই শুধু আমি চাই।
সকল বাঁধন ছিন্ন করিয়া
তোমারেই যেন পাই।

প্রবন্ধ

গুরু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

অজন্তা গুপ্ত

রামপ্রসাদের একটি গানে আছে—"এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।" বাস্তবিক মানবজন্ম হল শ্রেষ্ঠ জন্ম। বিবেক-বৈরাগ্য, বুদ্ধি-বিচার, জ্ঞান, শুধু মানব-প্রকৃতিতেই বিদ্যমান। ধর্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ শুধু মানবজীবনেই সম্ভব। দুর্লভ এই মানবজন্ম পেয়ে অবহেলায় তা ব্যয়িত হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। শৈশবে বিদ্যারম্ভের সময় আমরা সর্বপ্রথম বর্ণমালার 'অ' বর্ণ দিয়ে শুরু করি। সেই 'অ' থেকেই বুঝি অসন্তোষ মানবজীবনের চিরসাথী হয়ে থাকে। বিষয়াসক্ত, কর্মী, প্রেমিক, ধার্মিক, জিজ্ঞাসু যে-ধরনেরই মানুষ হোক না কেন সে কখনই তার নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। যা পাচ্ছি অথবা যা করছি, তার বাইরে 'আরো' কিছু আছে যা পেতে হবে অথবা যা করতে হবে—এই বৃত্তি মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। এইভাবে ধন, মান, প্রতিপত্তি, সুখ, দুঃখ, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি সমস্ত অবস্থাকে অতিক্রম করে ধাপে ধাপে মানুষকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে। লক্ষ্য সেই জ্যোতির্ময় মোক্ষ সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্বে ঋষিকণ্ঠে যা উচ্চারিত হয়েছিলঃ অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।—অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমাকে নিয়ে চল।

যে-মানুষ নিজের আরামের জন্য লালায়িত, যে-মানুষ প্রতিদিন সামান্য স্বার্থের জন্যে মারামারি কাড়াকাড়ি করছে, সেই মানুষের কানে কে এই মন্ত্র দেন যে সংসারের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এস মুক্তির পথে, ত্যাগের পথে, আনন্দের পথে? আমাদের শাস্ত্রকাররা বলছেন,—গুরু। 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, 'রু' শব্দের অর্থ নিরোধক জ্যোতিঃ। অর্থাৎ যিনি অন্ধকার দূর করে জ্যোতির রাজ্যে নিয়ে যান, অন্তস্থ চৈতন্যকে জাগিয়ে দেন তিনিই গুরু। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই চৈতন্য ঘুমিয়ে আছে। ভূতগ্রস্ত মানুষ যেমন জানে না যে সে ভূতগ্রস্ত, মায়াচ্ছন্ন মানুষ তেমনি জানে না সে মায়ামুগ্ধ। মায়ামুগ্ধ জীবকে জাগাতে হলে অপর এক ব্যক্তির প্রয়োজন যাঁর চৈতন্য জাগ্রত হয়েছে, যিনি স্বয়ং মায়ার প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠেছেন। গুরু হলেন সেই ব্যক্তি। আমাদের শাস্ত্রমতে ঈশ্বরই হলেন একমাত্র গুরু। ব্যক্তি-গুরু হলেন মানুষ-আধারে প্রকটিত ঈশ্বর-শক্তি। অর্থাৎ ব্যক্তি-গুরু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। সুতরাং গুরু হলেন অধ্যাত্ম-জগতের পথপ্রদর্শক। মানুষের তিনটি অবস্থা—বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। বদ্ধজীব সংসারে আসক্ত। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েও সেখান থেকে বেরনোর জন্য তার কোন আগ্রহ নেই, বরং সেই অবস্থাতেই সে সন্তুষ্ট। মুমুক্ষুজীব তাকে বলা হয় যার সংসারচক্র থেকে বের হবার জন্য আগ্রহ জেগেছে, সীমার বাইরে অসীমের ডাক সে শুনতে পেয়েছে, সেখানে যাবার পথ খুঁজছে মুক্তজীব বলা হয় তাকে যে জীবনের সমস্ত অবস্থাকে অতিক্রম করে চরম উপলব্ধির পথ বেয়ে পরমকে পেয়েছে। গুরু বদ্ধজীবকে মুমুক্ষুজীবে এবং মুমুক্ষুজীবকে মুক্তজীব পরিণত করেন। শিষ্যের ভিতরে যে জ্ঞান বা চৈতন্য সুপ্ত অবস্থায় আছে নিজ জীবন ও বাণীর প্রভাবে গুরু তাকে ক্রমে জাগ্রত করে তোলেন। জড়ের প্রভাবে কখনো জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না, চৈতন্যের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হয়। সেই চৈতন্যের বিকাশের জন্য গুরুর প্রয়োজন। বদ্ধ থেকে মুক্ত অবস্থায় আসা গুরু-কৃপাতেই সম্ভব। মনীষীরা বলছেন, 'গুরু বিনা জ্ঞান নাই'। অনেকে মনে করেন, বই পড়েই সব কিছু জানা যায়। আলাদাভাবে গুরুকরণের কোন প্রয়োজন নেই ; কিন্তু গ্রন্থের দ্বারা শক্তি লাভ

হয় না, বুদ্ধির বিকাশ হয় মাত্র। গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের মধ্য দিয়ে গুরুশক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেই মন্ত্র বারবার জপ করলে শিষ্যের ভিতরে শক্তির জাগরণ হয়।

ব্যক্তিগুরুর দেহাবসানের সঙ্গে গুরুশক্তির বিনাশ হয় না। ব্যক্তিগুরু তখন জগদ্গুরুর মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হন। সর্বভূতান্তর্যামী আত্মারূপে ঈশ্বর নিত্য বিরাজমান। ব্যক্তিগুরু সেই গুরুর মধ্যে বিলীন হয়ে থাকেন এবং দেহাবসানের পরেও শিষ্যকে সূক্ষ্মভাবে অধ্যাত্ম পথে পরিচালিত করেন। গুরুশক্তির উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকলে মানুষ ত্রিতাপ জ্বালা অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারে। গুরুকরণ বা দীক্ষালাভের দ্বারা মানুষ নবজীবন লাভ করে। যে অসন্তোষ জন্ম থেকেই মানুষের সাথী, সেই অসন্তোষ গুরুকৃপায় এখানে ঊর্ধ্বায়িত হয়ে মুক্তির পথে তার সহায়ক হয়। একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে সে অধ্যাত্মজগতে ক্রমেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করে। অবশেষে জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি লাভ করে ধন্য হয়, কৃতকৃতার্থ হয়।

‘গুরু’ বলতে আমরা অবশ্যই সদ্গুরুর কথাই বলতে চেয়েছি। যিনি স্বয়ং তত্ত্বদর্শী তিনিই সদ্গুরু। যেহেতু তিনি নিজে দর্শন করেছেন অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করেছেন তাই অপরকে দর্শন করাতে বা জ্ঞানলাভ করাতে তিনি সমর্থ। সদ্গুরুর কোন জাত নেই, কোন গোত্র নেই, কোন বর্ণ নেই, কোন ধর্ম নেই, কোন লিঙ্গ নেই। সদ্গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন। তাই যেভাবে তাকে পরিচালিত করলে তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেভাবেই তিনি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন।

আমাদের শাস্ত্রে গুরুর যেমন লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, শিষ্যেরও সেরূপ যোগ্যতা নির্দেশিত হয়েছে। দেখা যায় একই গুরুর শিষ্যদের মধ্যে কত পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণ গুরু এবং শিষ্য উভয়ের যোগ্যতার তারতম্য। কেউ কেউ বলেন, শিষ্য যেরকমই হোক না কেন সদ্গুরুর আশ্রয় পেলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; আবার কেউ কেউ বলেন, গুরু যেরকমই হোক না কেন শিষ্য উপযুক্ত হলে তারও আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই দুটি মতের কোনটিকেই আমরা অস্বীকার না করে বলব গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই উপযুক্ত হতে হবে। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মুমুক্ষু শ্রোতা, আর বক্তা ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব। কাজেই পরীক্ষিতের পক্ষে সাতদিনের মধ্যে পরম জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়েছিল। আবার একজন রাজার কথা শোনা যায় যিনি স্বয়ং মুমুক্ষু হলেও যে আচার্যের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি স্বয়ং তত্ত্বদর্শী না হওয়ায় রাজা জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হননি। অতএব গুরু ও শিষ্য উভয়ের যোগ্যতা যাচাই করে উভয়কে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে ধর্মপথে হতাশার সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে তার যোগ্যতা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হওয়া শিষ্যের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বর প্রত্যেককেই যুক্তি ও বিচারক্ষমতা দিয়েছেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আমরা সেই যুক্তি ও বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করি তা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। কষ্টিপাথরে আসল ও নকল সোনা যাচাই করা হয়। যুক্তি ও বিচারক্ষমতা হল সেই কষ্টিপাথর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যুক্তি ও বিচারক্ষমতা যেন আবার আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে। আমরা যেন যুক্তি ও বিচারক্ষমতার নামে আমাদের বুদ্ধিকে প্রতারিত না করি।*

---

* প্রবন্ধটি গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।—সংযুক্ত সম্পাদক

অম্বুবাচী

হরিপদ আচার্য

বিশ্বাস ধর্মের প্রাণ। বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন যুগে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মতবাদের। আর সেসকল মতবাদ বিভিন্ন ভাবধারার রসবৈচিত্র্যে অথবা মানবমনের রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে পরিপুষ্ট হয়ে রূপ নিয়েছে নানা ধর্মের নানা শাখার। এ-প্রসঙ্গে পুষ্পদন্তের বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়ঃ মানুষ নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্য হেতু সরল ও বক্র নানা পথ অবলম্বন করে।

ধর্মের সাধারণ অর্থ হলো যা ধারণ করে। ব্যক্তিকে, সমাজকে, জগৎকে ধারণ করে যা তাই ধর্ম। ধারণ করার অর্থ রক্ষা করা। মহাভারতে একটি সুন্দর কথা আছেঃ "ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মঃ রক্ষিতঃ রক্ষতি।" অর্থাৎ ধর্ম নষ্ট হলে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। আবার ধর্ম রক্ষিত হলে ধর্মই সব রক্ষা করে। ধর্মের প্রধান অঙ্গ দুটি—একটি আচরণ, অন্যটি অনুষ্ঠান। আচরণ ব্যক্তিগত আর অনুষ্ঠান সমাজগত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, ধর্মের আচরণ কর—"ধর্মং চর।" আচরণ ধর্মের প্রাথমিক কাজ।

হিন্দু সমাজেও যুগযুগ ধরে কত বিশ্বাস এবং আচরণ-অনুষ্ঠান চলে আসছে। এক সময় ধর্ম ছিল যাগযজ্ঞাদিতে, পরে এল চিন্তায়, ধ্যানে ও ধারণায়। আর এখন সাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রধানতঃ পর্যবসিত হয়েছে আচার এবং অনুষ্ঠানে এটা হওয়া অবশ্য ধর্মের কখনো লক্ষ্য নয়। অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোন তাৎপর্যও দেখা যায় না অথবা বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। তবে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের অনেকগুলিই অবৈজ্ঞানিক বা তাৎপর্যহীন নয়। অবশ্য তার মধ্যে মুখ্য একটি বিশ্বাস বা সত্যের ধারার সঙ্গে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাবধারা যুক্ত হয়ে তাকে পরিপুষ্ট করেছে এবং মুখ্য বিশ্বাসটি ধর্মের আচরণ ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়ে নিয়ে ব্যক্তি-জীবনের ঊর্ধ্বে সমাজের জীবনযাত্রার সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে, কোথাও বা সমাজজীবনকে ছাড়িয়ে ব্যক্তিজীবনে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে। এমনই একটি আচার বা অনুষ্ঠান হলো অম্বুবাচী।

'অম্বুবাচী' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হলো বর্ষণ-সূচনাকারক তিথি বা সময়। কোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে "জলবর্ষণ সূচনা করায় বা বিজ্ঞাপিত করায় যে—অম্বু তদ্বর্ষণং বাচয়তি সূচয়তি ইতি—অম্বুবাচী।" 'অবি' শব্দের সঙ্গে কর্তৃবাচ্যে 'উণ্' প্রত্যয় যোগ হয়ে অম্বু শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'অবি' শব্দের অর্থ ঋতুমতী আর 'উণ্' প্রত্যয়ের ব্যবহার হলো 'হয় যে' অর্থে। তাই অম্বু শব্দের অর্থ হলো 'ঋতুমতী হয় যে'। 'বাচী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো [বচ্+নিচ্+অণ্ (উপপদ সমাস) ঙীপ্] বলায়, সূচনা করায় বা বিজ্ঞাপিত করায় যে। সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর ঋতুমতীভাব সূচনা করায় বা বুঝিয়ে দেয় যে তিথি বা সময় তারই নাম 'অম্বুবাচী'।

বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত—এ তিনটি নিগমশাস্ত্রের অন্যতম বেদাঙ্গ হলো ছ-টি—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ। এ ষড়্‌বেদাঙ্গের অন্যতম জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যেদিন বা যেসময় সূর্য মিথুন রাশিতে গমন করেন, সে-সময়কে বলে অম্বুবাচী—

"যস্মিন্ বারে সহস্রাংশুর্যৎকালে মিথুনং ব্রজেৎ।
অম্বুবাচী ভে ং পুনস্তৎকালবারয়োঃ।"

কৃত্যতত্ত্বেও বলা হয়েছে, যেসময়ে সূর্য মিথুন রাশিতে গমন করেন সেসময়ের মধ্যে তিনদিন কুড়িদন্ড সময়কে বলা হয় অম্বুবাচী—"যদ্বারে যৎকালে মিথুনসংক্রমণং ভূতং তদ্ বারাভ্যতাবৎ কালাবধি বিংশত্যাদিদন্ডাধিকদিনত্রয়মম্বুবাচী।" আষাঢ় মাসে সূর্য মিথুনরাশিতে অবস্থান করেন। মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষার্ধ, আর্দ্রা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ এবং পুনর্বসু নক্ষত্রের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ—মোট সোয়া দুই নক্ষত্র মিথুন রাশির অন্তর্ভুক্ত মৎস্যসূক্তে বলা হয়েছে, সূর্য যখন মৃগশিরা নক্ষত্র ভোগ শেষ করে আর্দ্রা নক্ষত্রের

প্রথম একচতুর্থাংশ ভোগ করতে থাকেন তখন পৃথিবী ঋতুমতী হন—

"মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্র পাদোঽম্বুবাচী।
ঋতুমতী খলু পৃথ্বী…॥"

এ-সময়ে কি কি কাজ করা উচিত নয় অথবা কি করা উচিত তার একটি তালিকা শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করেছেন। কৃত্যতত্ত্বে বলা হয়েছে, সে-সময় অধ্যয়ন, বীজবপন করা উচিত নয় আর সর্পভয় নিবারণের জন্য দুধ পান করা উচিত—"তত্রাধ্যয়নং বীজবপনং ন কার্যম্। সর্পভয়োপশমনায় দুগ্ধং পেয়ম্।" মৎস্যসূক্তের ৫৮ পটলে বলা হয়েছে, সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম অংশে অবস্থানকালে পৃথিবী রজস্বলা হন। তাই সেদিন থেকে তিনদিন পর্যন্ত বীজবপন পরিত্যাগ করা উচিত—

"রবৌ রুদ্রাদ্যপাদস্থে ভূমেঃ সংজায়তে রজঃ।
তস্মাদ্ দিনত্রয়ং যাবৎ বীজবাপং পরিত্যজেৎ॥"

মহাতন্ত্রেও এ-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হয়েছে। সেখানে শিব পার্বতীকে বলেছেন, হে শঙ্করি, সূর্য মিথুন রাশিতে অবস্থান কালে যখন আর্দ্রা নক্ষত্র প্রাপ্ত হন, সে তিনদিন যজ্ঞাদি ত্যাগ করা উচিত। পৃথিবী ঋতুমতী থাকাকালে পূর্বসংকল্পিত না হলে কাম্য-কর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, তীর্থযাত্রাদিও করা উচিত নয়। ভূমিখনন বা বীজবপন তো করা যাবেই না, মাটিতে সূচ ফোটানোও উচিত নয়—

"কাম্য-নৈমিত্তিকঞ্চৈব যাত্রাং মন্ত্রক্রিয়ান্তথা।
ঋতুমত্যাং ন কুর্বীত পূর্বসংকল্পিতাদৃতে॥
ন কুর্যাৎ খননং ভূমেঃ সূচ্যগ্রেণাপি শঙ্করি।
বীজানাং বপনঞ্চৈব চতুর্বিংশতিযামকম্॥"

রাজমার্তণ্ড গ্রন্থে অধ্যয়ন, পূজন, তর্পণ, হলচালন, বীজবপনাদিও নিষিদ্ধ হয়েছে—

"ন স্বাধ্যায়ং বষট্কারং ন দেবপিতৃতর্পণম্।
হলানাং বাহনঞ্চৈব বীজানাং বপনং তথা॥"

প্রকৃতির ঋতুচক্রে আষাঢ় মাস বর্ষাঋতুর অন্তর্গত। আষাঢ় মাসের প্রথম দিনেই নীলগিরি পর্বতের সানুদেশে ক্রীড়ারত অপূর্ব সুন্দর চিকনকালো মেঘমালা দেখে কবিকুলতিলক কালিদাস লিখেছিলেন—

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজং প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।"

আষাঢ় মাস প্রবল বর্ষার সময়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের আকাশ তত্ত্বেও বলা হয়েছে—সূর্য যখন আর্দ্রা নক্ষত্র থেকে বিশাখা নক্ষত্র পর্যন্ত বিচরণ করেন তখন প্রবল বর্ষণের সময়—"আর্দ্রাদিতো বিশাখান্তং রবিচারণে বর্ষতি।"

শস্য উৎপাদনকারিণী পৃথিবী প্রাণশক্তি ও প্রজনন শক্তির প্রতীক রূপে অতি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃতা ও পূজিতা হয়ে আসছেন। প্রাক্-আর্য মহেঞ্জোদারো এবং হরাপ্পার খনন কার্যের ফলে যেসকল পাথরের তৈরি স্ত্রীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে একটি মূর্তির ক্রোড়ে একটি গাছ রয়েছে। এ মূর্তিটি যে মাতৃরূপিণী পৃথিবীর মূর্তি এবিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত। পৃথিবীকে মাতৃরূপে কল্পনা শুধু ভারতেই নয় অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন জার্মানদের দেবী নের্থাস মাতৃরূপিণী পৃথিবী। প্রাচীন গ্রীকদের রহ্নী (Rhea) দেবী এবং রোমানদের সিবিলি (Cybele) দেবী মাতৃরূপিণী পৃথিবী বলে স্বীকৃতা।

বৈদিকসাহিত্যে অনেক স্থানে পৃথিবীকে মাতৃরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিগণ প্রাণদায়িনী এবং অন্নদায়িনী পৃথিবীকে মাতা এবং আকাশকে পিতা রূপে স্তব করে বলেছেন ঃ

"দ্যৌ পিতা মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।"

পৃথিবীর সীমাহীন বিস্তার তার রূপবৈচিত্র্য, প্রকৃতিবৈচিত্র্য, সর্বশস্যজনয়িত্রী এবং পুষ্পফলাদিদায়িনী রূপ, সর্বোপরি পৃথিবীর অনন্ত প্রাণশক্তিই তাঁকে মাতৃদেবীরূপে সূচিত করেছে। ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, বর্ষা হলো দ্যৌরূপ, পিতার রেতঃ। দ্যৌরূপী পিতার বর্ষারূপ রেতঃ সিঞ্চনের দ্বারাই মাতা পৃথিবী তাঁর গর্ভে ধারণ করেন সর্বপ্রকারের শস্য। শুধু এখানেই শেষ নয়, বৈদিক-ঋষি ঋগ্বেদের ১২।১।৯ মন্ত্রে নিজেকেও পৃথিবীর পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন—"পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।" এ-প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত 'শ্রীদুর্গা' গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠার পাদটীকার অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে

বলা হয়েছে, "প্রকৃতির বা শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা থেকে দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছে এরকম যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অম্বুবাচীর অর্থ করেন, বৃষ্টির প্রথম জল পৃথিবীতে পড়লে কল্পনা করতে হবে ধরিত্রীদেবী ঋতুমতী হয়েছেন। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেনঃ এই যে ধারণা এটি সামাজিক মানুষের যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ; না হলে সে কখনো পৃথিবীকে দেবী জ্ঞান করে ঋতুমতী ভাবতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হলো, অম্বুবাচীর সময় হলকর্ষণ, বীজবপন, বেদাধ্যয়ন, গমনাগমন, কাম্য ও নৈমিত্তিককর্ম, রান্নাকরা আহারাদি নিষিদ্ধ করা হলো কেন ?

পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেল পৃথিবীতে প্রথম বৃষ্টিপাতকে অবলম্বন করেই অম্বুবাচীর অনুষ্ঠান। তাই একে প্রাচীনকালের বর্ষাবরণ উৎসবও বলা যেতে পারে। বর্ষা না হলে পৃথিবীর মাটি ভিজবে না, মাটি না ভিজলে তা শস্যবীজবপন বা চারাগাছ রোপণের উপযুক্ত হবে না। বৃষ্টির পর কিছুদিন জমিতে জল জমে থেকে মাটি পচে তা নরম না হলে জমি উর্বরা হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত অতিবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মূষিক, পাখি ও রাজাদের যুদ্ধযাত্রা—শস্যহানিকর এ ছটি উপদ্রবের মধ্যে অতিবৃষ্টি একটি। তাই অতিবৃষ্টির সময় বীজবপন করলে বীজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মকালের অতিরিক্ত উত্তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠের বেশ কিছুটা অভ্যন্তর পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রথম বৃষ্টিপাতের জল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের উত্তপ্ত পৃথিবী সে-জল শুষে নেয় এবং অভ্যন্তরের উত্তাপের ফলে বাষ্পের আকারে তা বের হতে থাকে। সেসময় মাটি খনন করলে বা হালচাষ করলে হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে সেই বাষ্প নির্গত হবে। এই বাষ্প স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই কোন ক্রমেই যেন মাটি খনন না করা হয়, সেজন্য এ নিষেধ-বাক্য। সেসময় অধ্যয়নাদি ত্যাগ করে গুরুর কৃষিক্ষেত্রে জল ধরে রাখার জন্য জমির আল বাঁধা প্রভৃতি কাজ করে গুরুকে সাহায্য করাই ছিল বিদ্যার্থীদের অন্যতম প্রধান কাজ। তাই সেসময় থাকত অধ্যয়নের অবকাশ। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে, মহাভারতের উদ্দালক-আরুণির কাহিনী। আরুণি গুরুর আদেশে ক্ষেতের আল বাঁধতে গিয়ে জল আটকাতে না পেরে সেখানে নিজে শুয়ে পড়ে জমিতে জল আটকিয়ে ছিল এবং গুরুর স্নেহপূর্ণ আহ্বানে জমির আল থেকে উঠে এসে (উৎ+আলক) 'উদ্দালক' নামে খ্যাত হয়ে গুরুর আশীর্বাদে সর্বশাস্ত্রে জ্ঞানী হয়েছিল।

পথকষ্ট এবং অতিরিক্ত গরমের পর হঠাৎ জলে ভিজে অসুস্থতার আশঙ্কাহেতু বর্ষাকালে ভ্রমণ নিষেধ। শুধু সেসময়ই নয়, অম্বুবাচীর পরেও সাতদিন যাত্রা নিষেধ বলে শাস্ত্রের বিধান। অত্যধিক গরমের পর হঠাৎ জলকাদায় গিয়ে ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা করেই এ-বিধান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আয়ুর্বেদে রয়েছে, অকারণে একপ্রহর বৃষ্টিতে ভিজলে পাপ হয় এবং একদিন উপবাস করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এখানেও স্বাস্থ্যরক্ষার কারণেই এ-বিধান। রোগের প্রথম অবস্থায় অথবা রোগের আশঙ্কা করলে উপবাসই একমাত্র প্রতিকার —"রোগাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যম্।" এটি স্মৃতিশাস্ত্রেরও বিধান।

প্রথম বৃষ্টির পর ভালভাবে জল গ্রহণ করে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে শীতল হলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তখন বীজবপন করলে ভাল ফসল উৎপাদন হবে বলেই প্রথম বৃষ্টির পর অম্বুবাচীর তিনদিন সময়টাকে পৃথিবীর ঋতুমতীকাল বলা হয়েছে এবং এসময় বীজবপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মাতৃস্বরূপিণী পৃথিবীতে এই রজস্বলারূপ অশুচিভাব আরোপ করে শাস্ত্রকারগণ সর্বপ্রকারে সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধনের বিধান দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে 'সংবৎসর প্রদীপ' গ্রন্থে বিষ্ণুরহস্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে—"যতী (সংযমী ব্রহ্মচারী), ব্রতী (ব্রতধারী ব্রহ্মচারী), বিধবা এবং ব্রাহ্মণ অম্বুবাচীর দিনে রান্না করে আহার করবেন না—

যতিনো ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ দ্বিজস্তথা।
অম্বুবাচী-দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥"

শ্লোকটির মর্মার্থ বুঝতে না পেরে "পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ" কথাটির অর্থ অনেকে মনে করেন নিজে রান্না করে আহার করা নিষেধ বটে, কিন্তু অপরে রান্না করে দিলে আহার করা যেতে পারে। শাস্ত্রকারগণ কিন্তু এ-প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজে রান্না করে হোক আর অন্যের রান্না করাই হোক অম্বুবাচীর সময় পক্কদ্রব্য আহার করাই নিষিদ্ধ করেছেন সংবৎসর প্রদীপঃ গ্রন্থে—

"স্বপাকং পরপাকং বা দিনে তথা।
ভক্ষণং নৈব কর্তব্যম্‌… ॥"

গ্রীষ্মের দাবদাহের পর নূতন বর্ষা এসে আবহাওয়ার মধ্যে একটা আকস্মিক পরিবর্তন এনে দেয়। ঋতুর পরিবর্তনে উত্তাপের এবং বায়ুর আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য মানুষের মধ্যে অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয়। ফলে সাময়িকভাবে স্বাভাবিক হজমশক্তি এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়। তাই শাস্ত্রকারগণ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্‌"—ধর্মসাধনের প্রথম উপকরণ শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্য ফল, মূল ও দুধ গ্রহণ করে লঘু আহারের বিধান দিলেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, এ-বিধান তবে সকলের জন্য নয় কেন ? তার উত্তর হল, সাধারণ মানুষ আসব-অরিষ্ট প্রভৃতি ভেষজ সেবনের দ্বারা হজমশক্তি এবং প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মচর্যব্রত যাঁরা পালন করেন তাঁদের আসব-অরিষ্ট জাতীয় ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। তাই তাঁদের স্বাভাবিক আহারের পরিবর্তনের দ্বারাই শরীর সুস্থ রাখতে হয়। সেজন্যই একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস অথবা খাদ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা।

পৃথিবীকে মাতৃরূপে কল্পনার পরিণতিতেই আমরা পাই ধরিত্রী-কন্যা সীতাকে। আদি কবি বাল্মীকির কল্পনায় পৃথিবীর কোলেই সীতার জন্ম। অনেকে সীতাকে আবার কৃষিসভ্যতার প্রতীকরূপেও বর্ণনা করেছেন। বৈদিকযুগে 'দ্যাবাপৃথিবী' যেদিন পিতা ও মাতা রূপে ভারতমানসে স্থান পেলেন, সেদিন থেকেই পৃথিবী মূর্তিমতী হয়ে পার্থিব সবকিছুর জনয়িত্রীরূপে মানবীজননীর মতো সৃষ্টির কাজ অব্যাহতভাবে করে চলেছেন। আর অম্বুবাচীর সময় মহদ্‌যোনি পৃথিবীর পরম মাতৃত্বকে স্মরণ করার জন্যই এ-অনুষ্ঠান প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। যতি, ব্রতী, বিধবা ও ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর প্রজননশক্তিকে স্মরণ করে দূর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শাস্ত্রকারগণ বিধবাদেরও ব্রহ্মচারীদের পর্যায়ে ফেলেছেন। বিষ্ণুসংহিতায় বলা হয়েছে, —স্বামী মারা গেলে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত— "মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং পালনীয়ম্‌।" মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচারিণীর মতো অবস্থান করবেন—"মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।" ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৩ তম অধ্যায়ে বিধবাদের নিয়ম পালনের একটি বিরাট তালিকা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে নারায়ণের সেবাব্রত নিয়ে নারায়ণের নাম স্মরণ করে দিনান্তে একবার মাত্র হবিষান্ন গ্রহণ করে দিন যাপন করবে—"একভক্তা দিনান্তে সা হবিষান্নরতা সদা।" সেজন্যই ব্রহ্মচর্য ব্রতধারিণী বিধবাগণও প্রজননশক্তির আধারভূতা পৃথিবীকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে নিজেরা সংযত জীবন যাপন করে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

উড়িষ্যায় এ উৎসবকে বলা হয় রজঃ। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাশে অবস্থিত বিমলাদেবীর মন্দির প্রভৃতিতে তিনদিন বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে। রজঃ শব্দের অর্থ স্ত্রীলোকের ঋতুচক্র এবং তার অপর অর্থ ধূলি। স্ত্রীলোকের রজস্বলা অবস্থার পর যেমন সন্তান ধারণের ক্ষমতা জন্মে, তেমনি আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টিতে পৃথিবীর ধূলিরাশি প্রশমিত হয়ে মাতৃরূপিণী পৃথিবীকে শস্যাদি উৎপাদনের উপযুক্ত করে। অম্বুবাচীতে অসমের কামাখ্যা মন্দিরে বিরাট উৎসব হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহের যোনি এই পীঠে পড়ে। কামাখ্যা মন্দির একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম শক্তিপীঠ নামে খ্যাত।

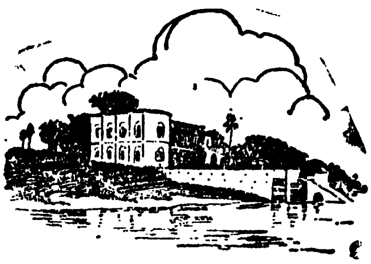

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্যামসুন্দরের এই বিচিত্র লীলার কথা ভাবিতেছি, এমন সময় শিশুর জননী আমাকে পুনরায় বলিলেন, "মা, গৃহী বলিয়া কি আপনি আমার গৃহে ভিক্ষা লইতে ইতস্তত করিতেছেন?—মা, আজ দশমী, আপনি বোধ হয় দুই-তিনদিন অনাহারে আছেন, আমি প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি এই গৃহে ভিক্ষা লইয়া কৃতার্থ করুন।" তিনি এই কথা বলিয়া জোড়হাতে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও জোড়হাত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। বলিলাম, "মা, তোমার অন্ন গ্রহণ করিলে আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি। তুমি তোমার সন্তানকে যাহা খাইতে দিবে দাও।"

বাড়ির উঠানের একপাশে ঢেঁকিশাল, সেখানে ছোট একটি উনান ছিল। শিশুর জননী অতিসত্বর সেইস্থান মার্জন করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। একটা ছোট ঘড়ায় এক ঘড়া জল, পিতলের একটি জলপাত্র, একটি মালসা, আতপ চাল, কাঁচকলা ও কিছু মাখন, রন্ধনের এই সকল উপকরণ আনিয়া দিলেন। আমি সেই পবিত্র অন্ন রন্ধন করিয়া শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিলাম। সে অন্নে যেন অমৃতের আস্বাদ ছিল। সেই অন্ন আহার করিয়া আমার শরীর ও মনের সমস্ত জড়তা দূর হইয়া গেল।

আহার শেষ হইলে গৃহস্থবধূ আবার আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "মা, যদি তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ না কর, তবে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "আমি পশ্চিমের পথে চলিয়াছি, যেদিন যতদূর পারি চলিব।"

গৃহস্থবধূ বলিলেন, "তবে মা, তুমি আজ রাত্রিটা এখানে যাপন কর। কাল আমাদের একজন পরিচিত লোক বর্ধমান যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে তুমি বর্ধমান পর্যন্ত যদি যাও, তাহা হইলে তোমার পথ চলার অপেক্ষা একটু শীঘ্র যাওয়া হইবে।"

সে রাত্রি সেই গৃহেই থাকিলাম। পরদিন যখন বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া যেখানে কাঁকরঢালা পথে চলিতেছে, সেখানে একটি আলোকস্তম্ভের কাছে আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া লোকের ব্যস্তগতি আর যাওয়া-আসা দেখিতেছিলাম। কেবলি কি যাওয়া আর আসা? আর কিছু নয়? আমাকে এখন কোথায় যাইতে হইবে? যাওয়া-আসা দেখিয়া সেকথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

দিনের আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। একজন আসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে আর একটি ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে অনেক্ষণ হইতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমি পূর্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি একটু সঙ্কোচের সহিত আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কোথায় যাইবেন?" প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য আমি প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি অনেকক্ষণ এখানে একা দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বর্ধমানে কি কেহ আপনার আত্মীয় আছেন?" আমি বলিলাম, "আমি আজ প্রথম বর্ধমানে আসিয়াছি। এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই।"

তিনি বলিলেন, "তবে আপনি রাত্রে কোথায় থাকিবেন, তাহা বোধকরি এখনও স্থির করেন নাই। যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আমি আমার কোন পরিচিতের গৃহে যাহাতে আপনি রাত্রি যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি। সেখানে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কোথায়? স্টেশন হইতে কতদূর?"

তিনি বলিলেন "বেশি দূর নয়।"

আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। যিনি "মা" বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যাইতে আমার কিছুই দ্বিধা হইল না। কিছুদূরে চলিয়া অবশেষে একটি বাড়ির নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, "এই বাড়ি" ;—বলিয়া দরজার কড়া নাড়িলে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তিনি আমাকে দুয়ারে রাখিয়া আগে ভিতরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ডাকিল, "আসুন মা, উপরে আসুন।"

আমি তাহার সহিত উপরে গিয়া দেখিলাম, দ্বিতলের বারান্দায় একখানি আসন পাতা আছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া—নিজে মাটিতে বসিল।

আমি তখন তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে দুগাছি সোনার বালা, পরিধানে একখানি রেশমী বোম্বাই শাড়ী, কিন্তু সধবার চিহ্ন সিন্দুর অথবা লোহ কিছুই নাই। দেখিয়া আমার আশ্চর্য বোধ হইল। কোন বিধবা যে এইরূপ প্রৌঢ় বয়সে অলঙ্কার ধারণ করিবেন অথবা বোম্বাই শাড়ী পরিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, অথচ এ রমণীর সধবার চিহ্ন সিঁথিতে সিদুর অথবা হাতে লোহাও নাই। এ তবে আমি কোথায় আসিলাম?

আমি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?" রমণী বলিল, "তিনি স্টেশনে কাজ করেন, তাঁহার সময় নাই বলিয়া আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ি কার?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, আপনি বর্ধমানের বামা কীর্তনীর কি নাম শুনিয়াছেন? "আমি সেই বামা কীর্তনী, এ বাড়ি আমার।"

স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিবামাত্র আমার সম্মুখবর্তী গৃহ ও গৃহসজ্জার দিকে দৃষ্টি পড়িল। আমি যে কোথায় আসিয়াছি, এতক্ষণে তাহা বুঝিলাম।

আমি বলিলাম, "মা, তোমার কল্যাণ হউক। আমি চলিলাম। তোমার গৃহে রাত্রিবাস করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইও না।" বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কীর্তনী আসিয়া আমার সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর জোড়হাত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিল, "তুমি যে আমার গৃহে একরাত্রি বাস করিবে, এ আশা আমার নিতান্ত দুরাশা। আমি তোমাকে সে অনুরোধও করিতাম না। কিন্তু মা, আমি শুনিলাম বর্ধমানে তুমি আজ নূতন আসিয়াছ, এখানে তোমার চেনা লোকও কেহ নাই। আজ একাদশী, তুমি সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছ। এইজন্য আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আজিকার রাত্রি তুমি এখানে থাকিয়া আমার গৃহ পবিত্র ও আমাকে উদ্ধার কর। মা, তুমি যাঁর পূজা কর, তিনি তো পতিতপাবন; তবে তোমার পতিতকে এত ঘৃণা কেন মা?"

কীর্তনী এমন আন্তরিকভাবে করুণস্বরে এই কথাগুলি বলিল যে, শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আমি তাহা নিবারণ করিতে পারিলাম না।

কীর্তনী আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিলাম তাহার চোখেও জল আসিয়াছে। গদ্গদ স্বরে বলিল, "মা, আমি নিতান্ত হীনা, কি দিয়া তোমার আতিথ্য সৎকার করিব জানি না। তুমি যদি দয়া করিয়া আজ এ-গৃহে থাক, তবে আমি রাত্রে তোমাকে কীর্তন গাহিয়া শুনাইয়া আমার জীবন সার্থক করিব—ইহাই আমার একমাত্র

আকাঙ্ক্ষা।"

পিপাসায় আমার প্রাণে দাবানল জ্বলিতেছে, কে তুমি মা তাহাতে শীতল বারি ঢালিবার আশা দিতেছ? আর আমি কোথায় যাইব? সেই শীতল বারান্দায় শয়ন করিয়া সারারাত্রি কীর্তনসুধা পান করিয়া শীতল হইলাম। সে যে কি মধুর কীর্তন আমি জীবনে আর ভুলিতে পারিব না। কীর্তন গাহিতে গাহিতে কীর্তনী কখনও চোখের জলে ভাসিতেছে, আবার কখনও তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুরের ঝঙ্কারে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে। ক্রমে যেন সমস্তই নিস্তরঙ্গ একাকার হইয়া গেল। কোথায় আছি তাহা আর মনে রহিল না। কোথা দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। যেন এক নিমেষে রাত্রি ফুরাইয়া গেল।

প্রভাতের অরুণালোকে চারিদিক যখন আলোকিত হইল, তখন কীর্তনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কীর্তন শেষ করিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও রোদনে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার মুখের যে কি শোভা! আমার তখন তাহাকে দেখিয়া আর মানবী বলিয়া মনে হইল না। যেন কোন ব্রজবালা ছলনা করিয়া এই বেশ ধারণ করিয়াছেন। কীর্তনী আমাকে বলিল, "মা, কাল হইতে তুমি উপবাসী আছ, আজ অনাহারে কেমন করিয়া তোমাকে বিদায় দিব। যদি কীর্তন শুনিয়া আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে দয়া করিয়া আজ এখানে অন্নগ্রহণ কর।"

কীর্তনীর কথা শুনিয়া সহসা আমার জননীর কথা মনে পড়িল। মা বার বার বলিতেন, "বেশ্যার ও বিষয়ীর অন্নগ্রহণ করিলে দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না।" মা যাহা বলিতেন তাহা আমি ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিতাম। জানিতাম—মার কথা কখনও মিথ্যা হয় না।

কিন্তু এখন আমি কি করিব? আজ যিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আমাকে এই কীর্তনসুধা পান করাইলেন, তাঁহার সকাতর অনুনয় আমি কেমন করিয়া উপেক্ষা করিব? কেমন করিয়া বলিব, "তুমি পতিতা, তোমার গৃহে আমি অন্নগ্রহণ করিতে পারিব না।" ইনি পতিতা?—একথা যে আমি মনেও ধারণ করিতে পারি না। আমার এখন মনে হইতেছে যে, ইহার পদধূলিতে সর্বাঙ্গ ভূষিত করিলে বুঝি বা আমার শ্মশান-হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমমন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে। কৃষ্ণলীলামৃতসমুদ্রে যার চিত্ত দিবানিশি মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সে কি আবার পতিতা হয়? তার কি আবার পাপ পুণ্য থাকে?

তবুও জননীর কথা বার বার মনে বাজিতে লাগিল। তাহাও ভুলিতে পারি না। মা যখন একথা বলিতেন, তখন তো কোনদিন মন দিয়া সেকথা শুনি নাই। এতদিন পরে আজ সহসাই বা কেন সেকথা মনে পড়িল! শ্যামসুন্দর, আজ তুমি আমাকে একি বিষম পরীক্ষায় ফেলিলে!

আমি যে মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছি, কীর্তনী তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া বলিলেন, "মা, তবে কি পতিতার—তোমার সেবা করিবার ভাগ্য হইবে না?" এমন করুণস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, আমার মনের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। "দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তি হইবে না," না হউক, তবুও আমি এখানেই অন্নগ্রহণ করিব। মনে এই দৃঢ় সংকল্প করিয়া বলিলাম, আমার জন্য কিছু চাল ও রন্ধন করিবার একটি নির্জন স্থান দিবে। সেখানে আমি রন্ধন করিয়া লইব।"

কীর্তনীর বাড়ির কাছে একটা পুকুর ছিল, সেখানে স্নান করিয়া আসিলাম। তাহার কাছেই একখানি ছোট ঘর। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেখানে রন্ধনের দ্রব্যাদি ও একখানি নূতন কাপড় আছে। কাপড় ছাড়িয়া সেই কাপড় পরিলাম। রন্ধন করিয়া যখন শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করতে গেলাম, তখন দেখিলাম, অন্নের ভিতর একগাছি চুল আছে। সে অন্ন আর শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করা হইল না। কীর্তনী জানিতে পারিলে দুঃখিত হইবেন জানিয়া মালসা সহিত অন্ন পুকুরের জলে ডুবাইয়া দিলাম ও তাহার পর কীর্তনীর নিকট বিদায় লইয়া তাহার বাটী হইতে বাহির হইলাম।* [ক্রমশঃ]

---

* উদ্বোধন, ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৮-৩৩

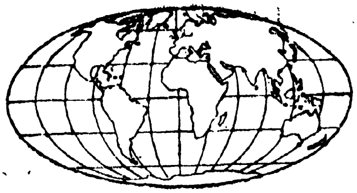

বাতায়ন

ব্যক্তিজীবনের নানা সমস্যা থেকে মুক্তির আশায়

চীনের যুবক-যুবতীরা ছুটে যাচ্ছেন চার্চে, ঈশ্বরের কাছে

চীনের গ্রামাঞ্চলের যুবক-যুবতীরা এখনো তাঁদের রবিবারের ছুটির দিনটি উপভোগ করেন কখনো কোন প্রমোদ-উদ্যানে কিংবা কোন প্রেক্ষাগৃহে। পাশাপাশি কিছু যুবক-যুবতী আবার ছুটির দিনে চার্চে যাওয়াই পছন্দ করেন।

এরকম অদ্ভুত কিছু যুবক-যুবতীর মতে, একঘেয়ে দিন যাপনের ক্লান্তি থেকে রেহাই পেতেই তাঁরা ঐ পথ বেছে নিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, মানসিক শান্তি অর্জনের জন্যই যেতে হয় চার্চে।

সম্প্রতি সাংহাই থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে আছে, পূর্ব চীনের জিয়াংসু প্রদেশে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে চার্চে যেত প্রায় ১৯ হাজার মানুষ। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে সেখানে চার্চযাত্রীর সংখ্যা ২০ হাজারের কাছাকাছি। প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মীয় কাজকর্ম করা যায় এমন চার্চের সংখ্যা দেশে ৭০টি। প্রতিটি চার্চে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ২৮০। চীন বস্তুবাদের দেশ। ধর্মের অস্তিত্ব সেখানে সন্দেহাতীত নয়। এইরকম একটি দেশে কেন মানুষ ধর্ম বা ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকছেন তার কারণটা কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম।

এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে ৩৪ বছরের এক চীনা মহিলা জানিয়েছেন, চার্চের নৈঃশব্দ আমার ভাল লাগে। চার্চে গেলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা যায়। চার্চে হিংসার কোন স্থান নেই।

৩৮ বছরের এক চীনা যুবক বললেন, নিজের মানসিক শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলতেই আমি চার্চে ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াই। ঐ ভদ্রলোকের এক আত্মীয় চীনের মুক্তিযুদ্ধে মারা গিয়েছেন, মৃতের বিধবা স্ত্রী এবং পুত্র ৪০ বছর ধরে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছেন। যুবকটি ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, রাজনৈতিক কর্মীরা এখন নিজেদের ক্ষমতার বিনিময়ে মুনাফা অর্জনেই ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে কাউকেই আর বিশ্বাস করা যায় না।

আরেকজন চীনা যুবক জানালেন, তাঁর বান্ধবীর ধারণা ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে সুন্দর থাকা যায়। ২৭ বছরের ঐ যুবকের ধারণা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে ধূমপান, মদ্যপান, চুরি প্রভৃতি নোংরা কাজ থেকে দূরে থাকা যায়। ঈশ্বর মানুষকে পবিত্র রাখেন।

সাংহাই-এর ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, চার্চে যাওয়ার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। তবে চার্চযাত্রীদের উদ্দেশ্য কিন্তু অভিন্ন। সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তিজীবনে স্বর্গীয় সাহায্যলাভের আশায় এত এত মানুষ চার্চে ছুটে যাচ্ছেন।

চার্চে আসা এইসব মানুষজন বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে ৩ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ১২ শতাংশ জুনিয়র স্কুলের ছাত্র। অবশিষ্ট ৮৫ শতাংশ মানুষই নিরক্ষর।*

---

* **জিনহুয়া (চীনা সংবাদ-সংস্থা), বেজিং, ১২মে ১৯৮৯ [বর্তমান, ১৩ মে, ১৯৮৯]।**

পরমপদকমলে

পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর আপনি কি নারী-বিদ্বেষী ছিলেন? একালের নারীমুক্তির যুগের আধুনিকারা যদি এই কথা মনে করে আপনার প্রতি অভিমানী হয় তাহলে কি করা যাবে? আপনি একদিন বললেনঃ "মেয়েমানুষের কাছে খুব সাবধান হতে হয়। গোপাল ভাব! এসব কথা শুনো না। মেয়ে ত্রিভুবন দিলে খেয়ে। অনেক মেয়েমানুষ জোয়ান ছোকরা, দেখতে ভাল, দেখে নতুন মায়া ফাঁদে। তাই গোপাল ভাব।" এই যে আপনি বললেনঃ 'মেয়ে ত্রিভুবন দিলে খেয়ে'। এই উক্তিটি শুনে মহিলারা হয়তো দুঃখ পাবেন। সংসারী জীবকে আপনি মেনে নিলেও, আদর্শ সংসার ও সংসারীর একটি ধারা আপনি বারে বারে নির্দেশ করে গেছেন। সংসার যে আদতে এক ধোঁকার টাটি, সেকথা আপনি স্মরণে রাখতে বলেছেন। সেদিন একটি সুন্দর গল্পেও বলেছিলেনঃ "গুরু শিষ্যকে একথা বুঝাচ্ছিলেন। ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। শিষ্য বললে, আজ্ঞা, মা, পরিবার এরা তো খুব যত্ন করেন; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। গুরু বললেন, ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয়। এই ঔষধ বড়ি কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে মনে করবে যে, তোমার দেহত্যাগ হয়ে গিয়াছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে—আমি সেই সময় গিয়ে পড়ব। শিষ্যটি তাই করল। বাটীতে গিয়ে বড়ি কটি খেলে। খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। মা, পরিবার, বাড়ির সকলে কান্নাকাটি আরম্ভ করলে। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সমস্ত শুনে বললেন, আচ্ছা এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে। তবে একটি কথা আছে। এই ঔষধটি আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে; তারপর ওকে দেওয়া যাবে। যে আপনার লোক ঐ বড়িটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে ওর মা কি পরিবার এঁরা তো সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, সন্দেহ নাই। তা হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে।

"শিষ্য সমস্ত শুনছে। কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা কাতর হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। কবিরাজ বললেন—মা আর কাঁদতে হবে না। তুমি এই ঔষধটি খাও, তাহলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে। তবে তোমার এতে মৃত্যু হবে। মা ঔষধ হাতে ভাবতে লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্যে ভাবছি। পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হলো—পরিবারও খুব কাঁদছিলেন, ঔষধ হাতে করে তিনিও ভাবতে লাগলেন। শুনলেন যে, ঔষধ খেলে মরতে হবে। তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার, তাতো হয়েছে গো, আমার অপগণ্ডগুলির এখন কি হবে বল? কে ওদের বাঁচাবে! আমি কেমন করে ও ঔষধ খাই? শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চলে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন—ঈশ্বর।"

পরে আর একদিন এই গল্পটাই আপনি একটু অন্যভাবে বলে আর এক কাহিনী সংযোজন করেছিলেন, সেটি আরও মারাত্মক। যেমন, "আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্যে গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করত। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে

হটযোগী ঘরে আসনে বসে আছে—এ'কেবে'কে আড়ষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, ওগো আমাদের কি হলো গো, ওগো তুমি আমাদের কি করে গেলে গো—ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো। এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

"এখন একটি গোল হলো। একে'বে'কে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে সে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে গিয়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাঠ কাটতে লাগল। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল, সে দুমদুম শব্দ শুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, 'ওগো কি হয়েছে গো!' তারা বললে, 'ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি।' তখন স্ত্রী বললে, 'ওগো, অমন কর্ম করো না গো। আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, ক'টি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দুয়ার গেলে আর তো হবে না। ওগো ও'র যা হবার তা তো হয়ে গেছে—হাত, পা ও'র কেটে দাও।' তখন হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, 'তবে রে শালী, আমার হাতপা কাটবে!' এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।"

এরপর আপনি যোগ করলেন উপসংহারঃ "অনেকে ঢং করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর আর গহনা সব খোলে খুলে বাক্সের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছড়ে এসে পড়ে আর কাঁদে, 'ওগো দিদিগো, আমার কি হলো গো'!"

ঠাকুর, মায়ার সংসারে, স্বার্থের সংসারে নারীর চিত্র! এমন দর্শন, এমন নিপুণ পর্যবেক্ষণ আপনার মতো অন্তর্যামীর পক্ষেই সম্ভব। আর সাহস! বেপরোয়া সাহস। কোন রাখঢাক নেই। রামপ্রসাদ বলেছিলেন গানে একটু নরম করেঃ 'যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥'

গিরিশকে আপনি একদিন বললেন, "দেখ না, মেয়েমানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসে আছে তখন বলি, আহা! এরা গেছে—হারু এমন সুন্দর ছেলে তাকে পেতনীতে পেয়েছে! ওরে হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল, আর হারু কোথা গেল! সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই। বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে।

"স্ত্রী যদি বলে 'যাও তো একবার'—অমনি উঠে দাঁড়ায়, 'বসো তো'—অমনি বসে পড়ে!"

একালের ভাষায় আমরা যাকে বলি জরুকা গোলাম। আপনার সেই বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ীর গল্প। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এরা সিদ্ধ হলো, লোককে যা বলবে তাই ফলবে: যে দিক দিয়ে যাবে সেই দিকেই ভয়; কেননা লোকে না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।" বীরভদ্র তাঁদের জন্যে মেয়েছেলের ফাঁদ পাতলেন। একশো বেরিয়ে গেল কেটে। বারশোর জুটলো সেবাদাসী। 'মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না, কেননা সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়।

ঠাকুর, সংসারীকে আপনি সত্যিই কি তেমন বিশ্বাস করতেন? সংসার থেকে দূরে থেকে সংসার দেখেছেন আর বলেছেন: "কেবল ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, তারপর রোগ, শোক, দারিদ্র্য। দেখে বললাম—মা, এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও। সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন—বিদ্যার সংসার, এরূপ প্রায় দেখা যায় না। তাই বলি, মা যদি কখনও শরীর ধারণ হয়, যেন সংসারী করো না।"

তাই তো বলি ঠাকুর, মায়েরা যাই ভাবুন, মলাট উলটে স্বরূপ তো আপনি দেখিয়ে দিলেন। আমরা এই শ'য়ে শ'য়ে ন্যাড়া এখন কি করি? পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। তবে এটাও ঠিক নির্বোধ উটের তো কাঁটা গাছই পথ্য। আপনি তো চেতনের সারথি। অচেতনের জন্যে 'তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস। অথবা, যাও বেশ বিল্ডিং দেখ গে।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী অম্বিকানন্দ

আমার বাবা-মা দুজনেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত। তাঁরা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। গর্ভাবস্থায় মা সঙ্কল্প করেন, প্রথম পুত্র-সন্তান হলে তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় সমর্পণ করবেন। ভগবানের কৃপায় আমিই মায়ের প্রথম পুত্র-সন্তান। যখন আমি মাত্র কয়েক সপ্তাহের মা তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে ইচ্ছা করলেন। একদিন তিনি আমাকে একটি চাদরে জড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চললেন। বাবাও সঙ্গে ছিলেন। যখন তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন তখন দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে একাকী ভাবাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমার বাবা-মাকে দেখামাত্র মাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "ওগো, আমার জন্যে কি এনেছ?" মা তখন আমাকে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে রেখে বললেনঃ "আপনাকে দেবার জন্যে এই জিনিসটি এনেছি।" শ্রীরামকৃষ্ণ আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেনঃ "বাঃ কি সুন্দর ছেলেটি! তুমি এটি আমাকেই দিচ্ছ? বেশ!" তিনি আমাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে তাঁর ডান হাতখানি আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললেনঃ "ছেলেটিকে খুব সাবধানে রেখ, এটি আমারই রইল। সময় হলেই আমি একে ফিরিয়ে নেব।" বহু বছর বাদে আমি যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিই তখন আমার মা-ই সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল— শ্রীরামকৃষ্ণই আমাকে গ্রহণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তখন মরদেহে জীবিত ছিলেন না।

ছোট বেলায় বাবা-মায়ের সঙ্গে আমি আলমবাজার মঠে যেতাম। তখন বেলুড় মঠ হয়নি। মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে) খুব রাশভারী ও কড়া মেজাজের মনে হতো। তাই আমি তাঁকে সযত্নে এড়িয়ে যেতাম। স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমি নিঃসঙ্কোচে থাকতাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর মহারাজ ও তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে যান। কিছুকাল পরে বাবার সঙ্গে আমিও সেখানে যাই। তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় থাকায় তাঁর কাছেই বেশির ভাগ সময় কাটাতাম। মহারাজ তাঁর পাশের ঘরটিতে থাকতেন। আমি তুরীয়ানন্দজীর ঘরে গিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতাম। তারপর ধীরে ধীরে মহারাজের ঘরের দরজাটি খুলে দরজা থেকেই তাঁকে প্রণাম জানাতাম। তাঁর সামনে যেতে কেমন ভয় হতো। তাই ঘরের ভেতর গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করা হতো না। আমার এই আচরণ লক্ষ্য করে একদিন তুরীয়ানন্দজী বললেনঃ "এ কি ব্যাপার! ভেতরে যা, মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, আর ওঁর পাদস্পর্শ করে আশীর্বাদ প্রার্থনা কর।" কম্পিত-হৃদয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম, উনি যেমন বলেছেন সেভাবে প্রণাম ও প্রার্থনা করে নীরবে মহারাজের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেনঃ "বাবা, আমার পা-টা একটু টিপে দে তো।" একথা বলেই, মহারাজ শুয়ে পড়লেন। প্রথমে বেশ বিব্রত বোধ করলেও আমি সসঙ্কোচে তাঁর পা টিপতে লাগলাম। তিনি বুঝতে পেরে বললেনঃ 'ভয় কি খোকা?" এরপর তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন। তাঁর এই স্পর্শে আমার ভেতর যেন একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। আমি বিবশ হয়ে অসহায়ভাবে তাঁর পায়ের উপর শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদে মহারাজ কৌতুক করে বললেনঃ "আঃ, পা টিপতে গিয়ে তুই দেখি পা দুটোকে বালিশ বানিয়ে ফেললি!" আমার মনপ্রাণ এক অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। আমি উঠে বসে বললাম : "আপনি আমাকে কিছু তুক করেছেন।" তারপর ভেতরের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে হাসতে লাগলাম। আমার ভয়

“আমি তো এই-ই চাইছিলাম।”

স্বামী প্রেমানন্দের একান্ত অনুরোধে মহারাজ বৃন্দাবন থেকে বেলুড় মঠ রওনা হন। বাবা ও আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। বেলুড় যাবার পথে মহারাজ গুরুভাই বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এলাহাবাদে একদিন থেকে যাবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু, এলাহাবাদে পৌঁছেই মহারাজ বিন্ধ্যাচলে মায়ের মন্দির দর্শনে আগ্রহী হলেন। বিন্ধ্যাচল-নিবাসী ভক্ত যোগীন্দ্র সেনকে চিঠি দেওয়া হলো ওখানে তিন দিন থাকার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা জানাবার জন্যে। পত্রোত্তরে যোগীন্দ্র সেন তাঁরই অতিথি হবার জন্যে সাগ্রহে অনুরোধ জানালেন। একদিন সকালবেলায় আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম। মহারাজ তখন তপস্যা করতেন, তাই আমাদের সঙ্গে একত্রে খেতেন না। তাঁর সারাদিনে খাদ্য ছিল মাত্র একবার দুধ-ভাত।

প্রথম রাতে মহারাজ, বাবা, আমাদের গৃহস্বামী ও আমি এক ঘরেই শুয়েছিলাম। প্রায় মাঝরাতে একটা মৃদুস্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, মহারাজ পোশাক পরে একটা মোটা কম্বলে শরীর ঢেকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে বললেনঃ “ওঠ, গরম পোশাক পরে নে। আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে।” ইতস্ততঃ না করে তাঁর কথামতো কাজ করলাম। আমরা কোথায় যাচ্ছি একথা তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করার কথাও মনে আসেনি। মহারাজ এক হাতে একটা লণ্ঠন অন্য হাতে একখানা লাঠি নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর পিছনে পিছনে আসতে আদেশ করলেন। আমরা বাইরে এলাম। সেটা ছিল অমাবস্যার রাত—ঘোর অন্ধকার। উঁচুনিচু পথে হোঁচট্ খাচ্ছি দেখে মহারাজ আমার হাতে লণ্ঠনটা দিয়ে আমাকে একহাতে ধরে চলতে লাগলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ “আমরা কোথায় যাচ্ছি?” তিনি বললেনঃ “দেবীদর্শন করতে।”

মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাম—বহু দর্শনার্থী সেখানে আগে থেকেই সমবেত হয়েছেন। কেউ বা মালা জপ করছেন, কেউ বা মায়ের নামকীর্তন করছেন। সেখানে বেশ একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। মন্দিরের দরজা তখনও খোলেনি। পূজারীরা বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মায়ের মূর্তিটি অলঙ্কার ও বেশভূষায় সাজাচ্ছিলেন। মন্দিরদ্বার খোলা হলে দর্শনার্থী ভক্তেরা দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং মাতৃদর্শনের জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় পূজারীরা মহারাজকে দেখতে পেলেন। তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা অন্য যাত্রীদের পথ বন্ধ করে মহারাজকেই প্রথম মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলেন। তিনি তখনও আমার হাত ধরে ছিলেন। মহারাজ দেবীমূর্তির সামনে গিয়ে বিস্ময়ভরে বললেনঃ “আহা! কী সুন্দর! কী সুন্দর!” পরমুহূর্তেই তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন। মন্দিরে তখন অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছিল। পূজারী ও ভক্তেরা বিস্ময়ে মহারাজের সেই ভগবদ্ভাবে ভাববিহ্বল অবস্থা দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজ ভাবাবস্থায় থেকেই আমাকে একটি মায়ের গান গাইতে বললেন। আমি গান করবার সময় তাঁর দুচোখের কোণ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। সে এক অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! আমাকে উনি আরও একটা গান গাইতে আদেশ করলেন। গানের শেষে আমরা দেবীপ্রতিমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বাইরে এলাম। মহারাজ

মন্দিরচত্বরের এক কোণে জপ করার জন্য বসলেন। আমাকেও বসতে বললেন। “আমি কি করব?” জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেনঃ “মায়ের উপস্থিতি চিন্তা কর।”

বিন্ধ্যাচলের কাছে পাহাড়ের নিচে একটা গুহামন্দির আছে। একদিন আমরা কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে এই মন্দিরের কাছে বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। ভক্তেরা কেউ তরকারি কাটছিলেন, কেউ বা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় মহারাজ আমাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন। খানিকটা পাহাড় চড়াই করে আমরা সেই গুহামন্দিরে উপস্থিত হলাম। ভিতরে খুব অন্ধকার। আমরা গুহায় ঢুকে ধীরে ধীরে বিগ্রহের কাছে উপস্থিত হলাম। চারদিক খুব নির্জন, শান্ত। এমনকি কোন পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছিল না। দেবীমূর্তির কাছে মহারাজ বসলেন, আমিও তাঁর কাছে বসলাম। খানিকক্ষণ বাদে তিনি আমাকে মায়ের ভজন শোনাতে বললেন। গান শুনতে শুনতে মহারাজ আগের দিনের মতোই ভাবস্থ হলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ একটু কেঁপে উঠল এবং শরীরের লোমও খাড়া হয়ে উঠল। তাঁর দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। এরপর তিনি একেবারে নিথর হয়ে গেলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান একেবারে ছিল না। আমি তাঁর এ ভাব দেখে চিন্তিত হইনি, কারণ আমি শুনেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এরকম সমাধিস্থ হতেন। মহারাজ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। আমরা বাইরে এলাম। কিন্তু এরপর চড়ুইভাতির জায়গায় না ফিরে গিয়ে মহারাজ পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে মহারাজ একখণ্ড পাথরের উপর যোগাসনে বসলেন। আমাকেও তিনি এভাবে বসতে বললেন। আসনে বসে ভাবতে লাগলাম, মহারাজ আমাকে বসতে আদেশ করলেন, কিন্তু আমাকে এরপর কি করতে হবে তাতো কিছু বললেন না। তাঁর কাছে গিয়ে কিভাবে কোন বিষয়টি ধ্যান করব জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেনঃ “ভগবানের যে রূপটি তোর ভাল লাগে তাই ধ্যান কর।” “আমি—রূপটির ধ্যান করব কি?” হ্যাঁ, তাই কর”—তিনি উত্তর দিলেন।

আমি খুশি মনে একটা পাথরের উপর বসে ধ্যান করতে চেষ্টা করছিলাম। আমার বয়স ছিল অল্প, তাই পাঁচ মিনিটেই চঞ্চল হলাম। কাছেই একটা ছোট ঝরনা ছিল। ধ্যান ছেড়ে উঠে পাহাড়ের গায়ে যেসব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছিল সেগুলো তুলতে লাগলাম। ফুলগুলোর চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছিল—ঠিক যেন ধূপ ও চন্দনের গন্ধ মেশানো। আমি ফুলের গন্ধ শুঁকছিলাম, মহারাজ আসন থেকে কখন তা লক্ষ্য করেছেন। চেঁচিয়ে বললেনঃ “ওগুলোর গন্ধ শুঁকিসনি; বুনো ফুলের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়বি।” আমি কতকগুলো ফুল নিয়ে তাঁকে দেখালাম। তিনি গন্ধ নিয়ে খুশি হলেন, তারপর বললেনঃ “মার পুজোর জন্যে এই ফুল একটু তুলে সঙ্গে নে।” আমি কিছু ফুল নিলাম। এরপর আমরা চড়ুইভাতির জায়গায় ফিরে গেলাম। আমাদের খাবার তৈরি করাই ছিল। আমরা খেতে বসার আগে মহারাজ আমাকে কয়েকটি ভজন শোনাতে বললেন। ভজনের পর আমাদের ভোজনপর্ব শুরু হলো।

আরও একদিন মহারাজের সঙ্গে আমরা অন্য পথে ঐ পাহাড়টির উপর চড়েছিলাম। সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখা গেল। মহারাজ তখন আমাকে এই গানটি গাইতে বলেছিলেনঃ

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন?
আয়ু-সূর্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেবতায়
ভুলিয়ে রয়েছ মোহ-মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান॥

তাঁর কথামতো গানটি গাইলাম। গান শুনতে শুনতে মহারাজ ভাবস্থ হলেন। গান শেষ হবার পরও তিনি কিছুক্ষণ এভাবে রইলেন। অন্ধকার হয়ে আসায় আমরা বাসায় ফিরে গেলাম। সেবারে বিন্ধ্যাচলে মাত্র তিনদিন থাকার কথা থাকলেও মহারাজ ওখানে দীর্ঘ একুশদিন কাটিয়ে তারপর বেলুড় মঠে ফিরেছিলেন।

সৎসঙ্গ-র

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

স্তুতিতে হর্ষ

(১৯।৮।১৯৩৬)

একটু স্তুতিতে মানুষ কত অভিমানী হয়। ইহা আমার পরীক্ষিত সত্য। তখন আমি নাগা থাকি। শুধু কৌপীন সম্বল। জ্বালাজিতে এক গাছতলায় বসিয়া আছি। খুব শীত বোধ করিতেছি। ধুনিও করি নাই। রাস্তায় এক রাজা ও তাহার উজীর যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া উজীর রাজাকে বলিল —"দেখুন রাজন্! এই বয়সে কি বৈরাগ্য! 'প্রজহাতি যদা কামান্…'—আত্মতৃপ্ত হইয়া মহাত্মাজী বসিয়া আছেন। এই শীতে নির্বিকার।" আমার বয়স তখন ত্রিশের মতো। প্রশংসা শুনিয়া শরীর গরম হইয়া উঠিল। আর শীত বোধ নাই। গায়ে ঘাম দেখা দিল। 'বগলমে* পসীনা আ গিয়া।' অত শীতেও গরম বোধ হইতে লাগিল। মনের ঐ তৃপ্তি তিনদিন ছিল। এমনি মায়া!

শিবকাঞ্চীতে এক দণ্ডী-স্বামীর নিকট থাকিতাম। দিনে উপনিষদের কথা ও রাত্রে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ সেখানে হইত। তিন মাস পর যখন স্বামীজী দেখিলেন যে, আমি তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছি তখন আমাকে ঐ নাগাগিরি ছাড়িয়া সাধারণভাবে থাকিতে বলিলেন ও এক গুদড়ি, কাপড় প্রভৃতি দিলেন। তদবধি ঐ বেশেই থাকিয়াছি। কত শুল্‌ফা, গাঁজা খাইতাম। সোয়া হাত লম্বা এক কল্কি ছিল। গোদাবরী তীরে এক মহাত্মার সঙ্গে দেখা। তিনি বেশ পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে যাইতে চাহিলাম। তাঁর কথায় নদীতীরে ঝোলাঝুলি গাঁজা সব হাতে জল লইয়া ত্যাগ করিয়া চলিলাম। এক মাস পর্যন্ত ঐ গাঁজার কথা মনে হইত। দূর হইতে কাহাকেও খাইতে দেখিলে ইচ্ছা হইত এক টান দিতে। পরে আর মনেও হয় নাই। নাগাগিরি করিয়া লাভ কি, যদি বস্তুলাভ না হয়? ভাঙ্গ খাইয়া মস্ত হইয়া পড়িয়া থাকা, লোকে মনে করে সমাধিস্থ হইয়া আছেন।

সবই পারমেশ্বরীয় মায়া। নানারূপে তাঁরই বিলাস।

(৬)

সূক্ষ্ম বাসনা

(২৪।৮।১৯৩৬)

পরমেশ্বরের কৃপায় সাধুর অনুকূল সময়, স্থান ও সৎসঙ্গ পাওয়া প্রয়োজন। এখানে সেটির কিসের অভাব? এমন বনিবনা রুটি সত্রে মিলছে যা ৫০০৲ বা ১০০০৲ টাকা রোজগার করনেওয়ালা লোকেরও সময়মত মিলে না। এতে যে নারাজ তার দুরদৃষ্ট বুঝিতে হইবে। লোকে বলে এখানে (উত্তরকাশীতে) থাকা বড় কষ্ট। কি কষ্ট? সাধুর আহারাদি সবই শরীরধারণের নিমিত্ত। রসনা পরিতৃপ্তির জন্য নহে। জ্ঞান লাভ করা কঠিন। কত সূক্ষ্ম বাসনা আছে, তা টের পাওয়া যায় না। মরণ পর্যন্ত বিশ্বাস নাই।

এক বিদ্বান বৃদ্ধ সাধুকে এক বেশ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাঁহার কাম গিয়াছে কিনা। তিনি বলিলেন: "কিছুদিন পরে বলিব"। মৃত্যু সময়ে সেই বেশ্যাকে ডাকাইয়া তিনি বলিলেন: "হ্যাঁ, এখন আমি বলিতে পারি এ-জীবনে আমি কাম জয় করিয়াছি।" মহামায়ার প্রভাব অতিক্রম করা বড় শক্ত। শরীর থাকিতে কামাদি হইবে না, এরূপ নহে। কিন্তু বিদ্বানকে রিপুসকল অভিভূত করিতে পারে না। বিদ্বান জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু নষ্টেন্দ্রিয় নহেন। শরীরে মমত্ব ও দৃশ্যে সত্যত্ব ইহাই বিপরীত ভাবনা। দীর্ঘকাল আত্মচিন্তন দ্বারা উহা তিরস্কৃত হয়। একে তো আত্মবিষয়িনী চিন্তাই লোকের হয় না—যদি বা কাহারও হয়, তবে সেই প্রত্যগাত্মজ্ঞানলাভ কত কষ্টসাধ্য! জ্ঞান যদিও বা হয় উহাতে সর্বদা স্থিত হওয়া আরও কঠিন।

(৭)

বিধানের কালব্যতীত

(৭।৯।১৯৩৬)

(দাঁতে বেদনার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করার কথায়)

ঔষধে আর কি হইবে? এ শরীর এরকমই চলিবে। এক উটের পিঠে নাকাড়া বাজানো হইত। সে এক বুড়ির ক্ষেতে ফসল খাইতে ঢুকিয়াছে। বুড়ি ভয় দেখাইবার জন্য একটা টিন বাজাইতে আরম্ভ করিল। উট হাসিয়া বলিল ঃ "উহাতে আর আমার কি হইবে? আমার পিঠে সর্বদা নাকাড়া বাজে।"

নির্বিকল্প প্রদেশে বাস করিতেছি, সংঘাতে যাহা কিছু হইতেছে তাহা দেখিতেছি, শরীরধারণোপযোগী রুটিও মিলিতেছে—কালব্যতীত হইয়া যাইতেছে।

জাবাল উপনিষদে আছে যে, মুমুক্ষুর জন্য এক মাণ্ডুক্যই যথেষ্ট। তাই মাণ্ডুক্যখানা খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছি। উহার পিছনে খুব খাটিয়াছিলাম। পড়া এমন হওয়া উচিত যে, সে-গ্রন্থের যে-কোন কথা বলিলে উহা করতলস্থিত আমলকবৎ স্পষ্ট হইবে।

(৮)

তুলসীরামের মৃত্যু (৮।৯।১৯৩৬)

তুলসীরাম আজ মারা গেল। সঙ্গে কি লইয়া গেল? দুদিনের এই যাত্রার মধ্যে কত অহংতা মমতার খেলা হইয়া গেল। তুলসীরামের এ যাত্রা পূর্ণ হইল। কি মজা দেখ। লোকে বলে কিনা —"মর্ গিয়া হ্যায়"। নিষেধমুখেও আত্মার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। "মর্ গিয়া"—আবার—"হ্যায়"। নষ্ট হবার কি উপায় আছে? আত্মার ধ্বংস কোথায়? "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

(৯)

অধিষ্ঠান ও কল্পনা (৯।৯।১৯৩৬)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক মন। স্বপ্নে মনের তমঃ, অংশ পিণ্ডাকার অর্থাৎ শরীর ও বিষয়াকার ধারণ করে, রজঃ অংশ হইতে দর্শন, চেষ্টাদি ক্রিয়া হয় ও সত্ত্বাংশ জ্ঞানাকার ধারণ করে। বস্তুতঃ সেখানে কিছুই নাই। একমাত্র বিজ্ঞানজ্যোতীরূপ অধিষ্ঠানে সব কিছু মনের কল্পনামাত্র। সেইরূপ জাগ্রতেও ঐরূপে মনের কল্পনাই সব। সুষুপ্ত হইয়া পড়িলে এই সৃষ্টি কোথায় যায়? মনের কল্পনা মনেই লয় হয়। বাস্তব কিন্তু এক পরমার্থ সত্তা বিজ্ঞানমাত্র সর্বাবস্থায় একরূপে বিদ্যমান, যাহাতে সর্ব সৃষ্টিবৈচিত্র্য দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় কল্পিত।

একদিনের বিষয় নহে, ধীরে ধীরে হইবে। "তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকঃ ধাতুপ্রসাদাৎ মহিমানং আত্মনঃ।" অক্রতুঃ—ইহামুত্রফলভোগবিরক্তচিত্ত-পুরুষ মনের স্থৈর্য, নৈর্মল্য সম্পাদনদ্বারা আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ "স্বাত্মাত্মন জানাতি"। জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপাধিবশে জীবত্বভ্রম হইয়া থাকে মাত্র।

(১০)

পুরুষাপরাধ (১০।৯।১৯৩৬)

বেশি বই পড়ে কি লাভ? আত্মা কি এত লম্বা চওড়া—শাস্ত্রে বহুভাবে যাহা বলিয়াছে? যতক্ষণ ভিতরে তাঁর সন্ধান না পাওয়া যায় ততক্ষণই লোকে বাহিরে খুঁজিয়া মরে। একবার সে-বস্তুলাভ হইলে তখন বহু বিচার, পাঠ, সব তুচ্ছ হইয়া যায়। তবে হ্যাঁ, লাঙ্গল-চষা অপেক্ষা শাস্ত্র লইয়া দিন কাটানো—উত্তম উপায়ে কালব্যতীত বলিতে হইবে। বস্তু তো অতি নিকটে, কথাও অতি সহজ, কিন্তু তবু শুনিয়াও লোকের নানা চেষ্টাদি করা ব্যতীত বিশ্বাস হয় না। এক যোগী তার সেবককে দূর দেশে তার বাড়ি যাওয়ার জন্য যৌগিক উপায় বলিয়াছিলেন যাহাতে সে অল্পকালেই বাড়ি যাইতে পারে। কিন্তু সে লোকের কথায় ও নিজের সন্দেহবশতঃ উহা জাদু মনে করিল। এবং অবশেষে বহু কষ্টে নিজের বাড়ি গেল। 'পুরুষাপরাধ'—অনধিকারীকে এক কথায় কিছু হয় না। এক ব্যক্তির বৈরাগ্য হইয়াছে, এক সাধু তাকে উপদেশ দিলেন ঃ "তুমিই নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম।" সে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে এক পণ্ডিত সাধুর নিকট গেল। তিনি তাহাকে বারো বৎসর চাক্কি পিষাইয়ের কাজ করাইয়া অবশেষে সেই উপদেশই দিয়া বলিলেন ঃ "পূর্বে সাধু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমিও তাহাই দিতেছি। বিশ্বাস হয় লও, বিশ্বাস যদি না হয়, তবে আবার চাক্কি পেষ।" তখন তাহার বিশ্বাস হইল। চাক্কি পেষাই হচ্ছে দেবোপাসনা। কৃতোপাস্তি পুরুষের এক কথাতেই জ্ঞান হয়। বড় কঠিন রাস্তা। [ক্রমশঃ]

পরিবেশ সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশ দূষণ নিয়ে উৎকণ্ঠিত আলোচনা আজ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষেও এই সমস্যা নিয়ে আমরা ভাবিত। পরিবেশ দূষণের একটা বড় কারণ হলো নিরন্তর বৃক্ষ উৎসাদন। বৃক্ষকে আমরা ভালবাসতে ভুলে গিয়েছি। প্রতি বছর 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে আলাদা পরিবেশ মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন যিনি পরিবেশ দূষণের দিকটি দেখছেন। বহু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বহু সভা-সমিতির মাধ্যমে এই সমস্যাটি সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার একটি প্রধান অঙ্গ হলো বৃক্ষ সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। পরিবেশ সম্বন্ধে একটা নতুন মূল্যবোধ ক্রমশঃ গড়ে উঠছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এই জাগরণ আসছে প্রকৃতির প্রতি প্রেমবশতঃ নয়। আমরা নতুন করে আবিষ্কার করেছি যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না রাখতে পারলে পৃথিবী এক সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। তাই নানা সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় বন-সংরক্ষণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ভূমি সংরক্ষণের ওপর এবং বৃক্ষকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে গণ্য করে। এজন্য অজস্র অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। কিন্তু এ-সত্ত্বেও বৃক্ষ উৎসাদন এবং ভূমিক্ষয় বন্ধ হয়নি। গত বৎসরের প্রচণ্ড খরা তার প্রমাণ।

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলে আশ্চর্য হব এই দেখে যে, কি প্রগাঢ় মমতায় প্রকৃতিকে তিনি নিজের জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সময় পরিবেশ সমস্যা বলে কোন সমস্যার কথা শোনা যায়নি। তাঁর কাব্যে গাছপালা এবং ফুল এক অসাধারণ মর্যাদা লাভ করেছে। প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তুগুলি যে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং অনন্তকাল ধরে মানুষকে অভিভূত করে সে-সম্বন্ধে কবি গভীর শ্রদ্ধায় উল্লেখ করেছেন তাঁর অসংখ্য কবিতা ও রচনায়। বীরভূমের রুক্ষ বৃক্ষহীন প্রান্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবুজ শ্যামলিমার বীজ বপন করলেন এবং সেখানকার ঘন সবুজ বৃক্ষের ছায়া চিত্তের শান্তি ও প্রাণের আরামের আবাসস্থল হলো। রবীন্দ্রনাথ সেখানেই প্রতিষ্ঠা করলেন 'শান্তিনিকেতন'। বীরভূমের খোয়াই ভরে উঠল গাছগাছালি ও পাখপাখালির কলগুঞ্জনে, আর তারই মধ্যে সারা জীবন গভীরভাবে আবিষ্ট হয়ে রইলেন কবি। বহুবার বিদেশে গেছেন, কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল শান্তিনিকেতনের শালবীথি ও উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে।

"আমার সেই অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল সেই সঙ্গীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে—তাদের কাছে চুপ করে বসে থাকতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে।"

তাঁর আশেপাশের যাবতীয় বৃক্ষের মৌন হৃদয়ের বাণী তাঁর কাছে বাঙ্ময় হয়ে উঠত। আজ সকলেই জানেন কোটি কোটি বৎসর পূর্বে প্রাণের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল সাগরে অতিক্ষুদ্র বৃক্ষাণুর মধ্যে যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় 'Plankton'। এরাই 'Photo-synthesis' বা সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে তৈরি করতো জীবনের উপাদান ক্লোরোফিল। এই চিন্তারই প্রতিফলন হয়েছে কবির 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায়।

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে তুমি বৃক্ষ আদি প্রাণ।"

ভূমিক্ষয় আজকের যুগের এক গুরুতর পারিবেশিক সমস্যা যার প্রধান কারণই হলো নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন। ভারতবর্ষের বনভূমির আয়তন সারাদেশের মাত্র ১৩ শতাংশ এবং এই বনভূমিও ক্রমশই

সংকুচিত হয়ে আসছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার একর জমি উষর ও আধা উষর ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এসবই গত ২৫/৩০ বছর ধরে ভয়াবহ হারে গাছ কাটার পরিণতি। পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন, কিভাবে মরুভূমির প্রসার রোধ করা যায়, কিভাবে বনসৃজন করা যায়। অথচ এসব সমস্যার সৃষ্টি হবার বহু বহু পূর্বে সুরের মূর্চ্ছনায় কবি উদাত্ত আহ্বান জানালেন:

"মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে, হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য কর করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ।"

শান্তিনিকেতনের একটি প্রধান উৎসব বার্ষিক বৃক্ষরোপণ উৎসব। আজকাল সারা দেশে প্রতিবৎসর জুলাই মাসে 'বন মহোৎসব' উদ্‌যাপন করা হয়। বন মহোৎসবের এই বর্তমান ধারণার জন্মের বহু পূর্বেই শান্তিনিকেতনে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত বৃক্ষরোপণ উৎসব বৃক্ষকে এক মহান মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। মেয়েরা নানারকম ফুলের অঙ্গাবরণে ভূষিতা হয়ে নাচ গান ও নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে গাছের চারা নিয়ে যেতেন নির্দিষ্ট জায়গায় রোপণ করবার জন্য।

অনেক যত্নে লালিত আশ্রমের নিঃসঙ্গ নারিকেল গাছটি কবির নজর এড়ায়নি। যদিও নারিকেল গাছ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলেই সাধারণতঃ দেখা যায়। শান্তিনিকেতনের গাছটির সতেজ জীবনপ্রবাহ কবির সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করেছে। দক্ষিণ সমুদ্রের বায়ুসঞ্চালনে সমুদ্র-বিরহী নারিকেলের পত্র-পল্লবের মর্মরিত বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়:

"সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রয়াস তব নারিকেল—দিনরাত্রি কাটে।
যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পার না তাহা নিজে,
দিগন্তের অতিক্রম দেখিতে চাহিছ তুমি কি যে।"

আজকের যুগের বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রয়োজন-মূল্যায়নের হাজার হাজার বছর আগেই প্রাচীন ভারতের ঋষিকবিরা প্রকৃতি ও তার অনবদ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে সুগভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁদেরই উত্তরসূরী। তাই তিনি বলেছিলেন:

"আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী। 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠ্যতে কঃ।' তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন 'কেনঃ প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্ত'। অর্থাৎ প্রথম প্রাণ তার শক্তি নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে?"

আজ কংক্রীটের জঙ্গলের অধিবাসী আমাদের একটা স্বাভাবিক আর্তি হল 'ফিরে চল গ্রামে, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।' মনে পড়বে কবির কবিতা "দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।" শহরের কোলাহল থেকে বহু দূরে গিয়ে কবির শান্তিনিকেতন স্থাপন তাই আশ্চর্য লাগে না। এখানে বৃক্ষের শান্ত শীতল ছায়ায় বসে লিখন পঠন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতিমনা এবং প্রকৃতিপ্রেমী করে তোলার জন্য কবি যে প্রযত্ন করেছিলেন সে-সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, কত বড় দূরদৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। প্রায় একক প্রচেষ্টাতেই এই কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। সেসময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বলে কিছু ছিল না। আজ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঢালাও আর্থিক সাহায্য পায় এই কমিশনের কাছ থেকে। শান্তিনিকেতন স্থাপন করতে গিয়ে কবিকে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল এবং বহুকাল ধরে আর্থিক কষ্ট পেতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দমে যাননি।

আজ পরিবেশ দূষণ জনিত সংকটের মোকাবিলায় আমরা স্মরণ করব ঋষিকবির প্রকৃতি-সচেতনতা, প্রাকৃতিক সৃষ্টির প্রতি গভীর প্রেম এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে অটুট রাখবার প্রচেষ্টায় তাঁর অপূর্ব অবদানের কথা।

প্রাক্-ইসলামীয় যুগে ইরান

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

ঐতিহাসিকদের মতে বিশ্ব-ইতিহাসের এক অপূর্ব বিস্ময় ইরানীয় সংস্কৃতি। বারবার গ্রীক, তুর্কী ও ইসলামের আক্রমণে প্রাচীন ইরান বিধ্বস্ত হলেও তার ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য ইরানীয় জাতির মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক চেতনার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে। ইরানীয় ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) প্রাক্-ইসলামীয় যুগ। (২) ইসলামীয় যুগ। (৩) সমসাময়িক যুগ। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাক্-ইসলামীয় যুগে ইরানীয় ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাক্-ইসলামীয় যুগ ঃ এরূপ বলা হয়েছে যে, হখামনীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের সূচনা হয়েছিল। ৫৪৬ খ্রীঃ পূঃ মহান সম্রাট কুরুস (Cyrus) এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব পর্যন্ত তা স্থায়ীভাবে বজায় ছিল। ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে আরবগণ (ইসলাম) সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিলোপসাধন ঘটিয়ে একাদশ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল।

ইসলামীয় যুগ ঃ এই যুগের প্রসার ঘটেছিল আরবগণ কর্তৃক ইরানে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে অদ্যাবধি (অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল) যা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপ্ত ছিল।

সমসাময়িক যুগ ঃ প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই যুগের সূচনা হয়েছিল (বলা যেতে পারে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ইরানো-রুশীয় যুদ্ধের শেষে)।

হখামনীয় সাম্রাজ্যের উত্থানের পূর্বে ইরানের ভৌগোলিক সীমারেখা একদিকে অক্সাস এবং পারস্য উপসাগর, অন্যদিকে সিন্ধু ও ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল এলাকার উভয়দিকে যে আর্যগোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করত গ্রীকরা তাদের 'মেডিস' (Medes) নামে চিহ্নিত করেছিল। ফিরদৌসীর শাহ্‌নামায় তাদের বলা হয়েছে 'পীশদাদিয়ান' (Pishdadiyan), যদিও ইরানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং খাঁটি আর্য-ঐতিহ্য ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিল। প্রাক্-ইসলামীয় যুগে ইরানের ইতিহাসকেও তিনটি পৃথক্ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; (১) হখামনীয় যুগ, (২) পার্থিয়ান যুগ, (৩) পহ্‌লবী বা পহ্লব যুগ।

হখামনীয় যুগ বা শাহ্‌নামার ভাষায় একে বলা যেতে পারে 'কাইয়ান যুগ'। খ্রীঃ পূঃ ৫৪৬ অব্দে মহান কুরুসের সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ তাঁকে ফিরদৌসী বিরচিত শাহ্‌নামা-র কাইখসরুর সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন। আলেকজান্ডারের আক্রমণে এই যুগের অবসান ঘটেছিল। তিনি হখামনীয় সম্রাটগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে ঐ সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে শেষ হখামনীয় সম্রাটের মৃত্যু ঘটেছিল। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে প্রাচীন পারসীক ভাষার ক্রমবিকাশ। বিদেশে ইরানীয় সংস্কৃতির ও রাজনৈতিক প্রভাবের প্রসার।

দ্বিতীয় যুগ হলো পার্থিয়ানদের যুগ। ফিরদৌসীর শাহ্‌নামা-য় এই যুগকে বলা হয়েছে 'আস্কানিয়ান' (Ashkaniyan) যুগ। এই যুগ বিশেষ করে উপজাতীয় সম্রাটদের শাসনের যুগ। তাছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত ছিল গ্রীক সেলুসিড এবং তৎপরবর্তী মহানায়কদের শাসন। প্রধানতঃ যারা আস্কের বংশধর সেলুসিড পরবর্তী শাসকগণ ইরানের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র রাজাদের রাজ্যও শাসন করেছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে দারিয়ুস-কোডম্যানুষ গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হলে এই যুগের সূচনা হয়েছিল। ২২৬ খ্রীস্টাব্দে অর্দেশীর কর্তৃক অর্দওয়ান ও অর্সাকের পরাজয়ে এই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। এই যুগে ইরান কিছুটা গ্রীসের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এই যুগে কোন লিখিত প্রমাণ বা বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাই এই যুগকে ইরানীয় ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়।

তৃতীয় যুগ হল পহ্‌লবী যুগ। শাহ্‌নামায় এই যুগকে বলা হয়েছে সাসানীয় যুগ। অর্দওয়ানের

পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই যুগের সূচনা হয়েছিল। ২২৬ খ্রীস্টাব্দে অর্দেশীর এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সাম্রাজ্য আরবগণের (ইসলাম) আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ৩৫১ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় ইয়জদগীরদের মৃত্যুতে ইরানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। ঐ সময়ে তুলনামূলকভাবে প্রভূত পরিমাণে প্রমাণাদি-লিখিত পুঁথি আকারে পাওয়া যায়। গ্রীক, রোমান ও আরব ঐতিহাসিকগণের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া ফিরদৌসীর শাহ্‌নামাকে ইরানীয় ইতিহাসের একটি জীবন্ত দলিল বলা যেতে পারে। ঐ সময়ে ইরানের ইতিহাস তার লোককাহিনী বা রূপকথাসমূহের মৌখিক রূপটি পরিত্যাগ করে লিখিত আকার ধারণ করেছিল।

ইরানের ইতিহাসে প্রাক্‌-ইসলামীয় যুগকে খাঁটি ইরানীয় যুগ বলা যেতে পারে। কারণ এই যুগ ইরানীয় সম্রাটগণের বংশাবলী, কুলচিহ্ন এবং ইরানীয় ভাষার আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিল। একদিকে ছিল অবেস্তা ও প্রাচীন পারসীক ভাষা, অন্যদিকে মধ্য-পারসীক বা পহ্‌লবী ভাষা।

দারায়ুসের শিলালিপি (৫২১ খ্রীঃ পূঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের কিছু অন্তর্লেখন যা কিলকাক্ষরে লিখিত—বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও অদ্যাবধি বর্তমান। উত্তর পুরুষদের জন্য জরথুস্ত্র বিরচিত গাথাও সুশিক্ষিত জরথুস্ত্রীয়গণের দ্বারা রক্ষিত হয়েছিল। এদুটি প্রামাণ্য দলিল অদ্যাবধি বিদ্যমান। ঐ সময়ে ইরানের মানুষেরা তাদের নিজস্ব স্বাধীন ধর্মের অধিকারী ছিল—যে-ধর্মকে জরথুস্ত্রীয় বা মজ্‌দায়শ্‌ন ধর্ম বলা হয়েছে। প্রাচীন ইরানে বৈদিক এবং বৌদ্ধ শিক্ষারও প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে তা ইরানের পূর্বাঞ্চলে। প্রাক্‌-ইসলামীয় যুগে প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আলেকজান্ডারের আক্রমণে। গ্রীকগণ দক্ষিণ ইরানের ইউফ্রেটিস উপত্যকা থেকে পূর্ব ইরানের রাভি নদীর তীর পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। তবে গ্রীক শাসন বা তাদের সংস্কৃতি ইরানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। কারণ ইরানীয়দের সঙ্গে গ্রীকদের ধর্মের, সংস্কৃতির ও লিপির দিক থেকে বহু পার্থক্য ছিল। গ্রীকগণ চারশত বৎসর ইরানে প্রভুত্ব করলেও প্রাচীন ইরানীয় আর্যমহিমার কোন পরিবর্তন সাধন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঐ সময়ে আলেকজান্ডারের নামে বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী ও গল্প লিখিত হয়েছিল। তবে 'ইসকন্দর-নামা' ছাড়া আর কিছুই আমাদের হস্তগত হয়নি।

তৃতীয় পর্ব বা সাসানীয় যুগকে ইরানীয়দের পুনর্জন্মের যুগ বলা যেতে পারে। ঐ সময়ে ইরানীয় সংস্কৃতি বিশেষ উৎকর্ষ ও চমৎকারিত্ব অর্জন করেছিল। আলেকজান্ডার ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণের এবং পরে পার্থিয়ানদের হস্তে জরথুস্ত্রীয় ধর্মের যে বিরাট ক্ষতিসাধন হয়েছিল তা এই সময় পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছিল। পহ্‌লবী লিপি ও ভাষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল বহু পহ্‌লবী পুস্তক ও পুঁথিলেখ আমাদের হস্তগত হয়েছে। যা থেকে ঐ সময়ে ইরানের পশ্চিমদিকে খ্রীস্টধর্মের এবং পূর্বদিকে হিন্দুধর্মের কিছুটা প্রভাব পড়েছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। ঐ সময়ে যে সাহিত্যের নিদর্শন আমরা পাই তা মূলতঃ ধর্মীয় সাহিত্য। তাতে জরথুস্ত্রীয় বা মজ্‌দায়শ্‌নে ধর্মের নীতিতত্ত্বের আলোচনা বিদ্যমান। ঐ যুগের সাহিত্যের প্রভাব বর্তমান ইরানকেও প্রভাবান্বিত করেছে। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে পহ্‌লবী সাহিত্য ইরানকে প্রভাবান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছিল। আধুনিক ফারসী ভাষার উদ্ভবই ঘটেছে পহ্‌লবী ভাষা থেকে।

ইরানীয় ইতিহাসের উৎস বিচারের দিক থেকে ফিরদৌসীর 'শাহ্‌নামা'কে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ বলা যেতে পারে। মহাকাব্যাকারে রচিত এই গ্রন্থে প্রথম দুই পর্বের রাজবংশের (পীশ্‌দাদিয়ান ও কাইয়ান) ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এবং খুব সংক্ষিপ্তাকারে তৃতীয় পর্বের আশ্‌কানিয়ানদের বা পার্থিয়ানদের কথাও বলা আছে। কবি ফিরদৌসী যথার্থই বলেছেন:

"বর্‌ আইন্‌ নামা বর্‌ উমরাহা বগজরদ্‌।
বখওয়ানদ্‌ হর্‌ অন্‌কশ্‌ কে দারদ্‌ খিরদ্‌॥"

—এই পুস্তক (শাহ্‌নামা) যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের দ্বারা পঠিত হবে।

ভারততত্ত্ববিদ্ বেণীমাধব বড়ুয়া

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী

আচার্য ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক উভয় প্রকার মননশীলতার অধিকারী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারামুক্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন, সত্যসন্ধানী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী এক মানুষ। তাঁর স্বাধীন সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারায় ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়। কোন মতবাদের প্রতি অহেতুক ও অযৌক্তিক পক্ষপাত তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। আচার্য বেণীমাধবের ধ্যাননেত্রে ভারতের যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিফলন ঘটেছে তাই তাঁর সৃষ্টিকর্মকে পূতস্পর্শ দান করেছে। জীবনব্যাপী তাঁর সারস্বত সাধনা শুধু ভারতের বিদ্বানমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেনি, বিদেশের প্রাচ্যশাস্ত্রবিশারদদেরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

অধ্যাপক বড়ুয়া ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী মহামুণি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বেণীমাধব এদেশে পালিশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যয়নের পর ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে লণ্ডন যান উচ্চতর গবেষণার জন্য। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ঐ দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হন। লণ্ডনে তিনি পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত তথা পালি টেক্সট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা টমাস উইলিয়াম রীস ডেভিডস ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী রীস ডেভিডস, এল. টি. হবহাউস, এফ. ডবলু. টমাস এবং এল. ডি. বার্নেট প্রমুখ পণ্ডিতদের কাছে তুলনামূলক ভারতীয় দর্শন বিষয়ে গভীরভাবে শিক্ষালাভ করেন। যে-বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি পান তা ছিল—"ভারতীয় দর্শন এর উৎপত্তি এবং বৈদিক যুগ থেকে বুদ্ধের সময় পর্যন্ত এর ক্রমবিকাশ।" বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন আবির্ভাবের পূর্বে ভারতে যে সমস্ত দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল তার সঠিক মর্ম উদ্ঘাটন এবং ঐ প্রসঙ্গে বুদ্ধপূর্ব যুগের দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের কি সম্বন্ধ তার বিচার ও বিশ্লেষণ তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। এর থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যাঁর যে-বিষয়ে প্রথম হতেই বুৎপত্তি তিনি সেই বিষয়েই উচ্চতর ডিগ্রির জন্য সচেষ্ট হন। আর পালিশাস্ত্রের পণ্ডিত হয়েও তিনি উপনিষদ্ ও দর্শনের উপর চিন্তাশীল গবেষণা-গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি মনে করতেন তথাগত বুদ্ধের ধর্মতত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক মতবাদ ও ধর্মীয় সাধনা এবং আচার-পদ্ধতির পরিজ্ঞান অর্জন অত্যন্ত প্রয়োজন।

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিসাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সেসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে বিধৃত করার মহতী প্রয়াসে যেসব খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, সি. ভি. রামন, মেঘনাদ সাহা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেণীমাধব বড়ুয়া, ডি. আর. ভাণ্ডারকর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এসব প্রতিভাধর মনীষিগণের মধ্যে অধ্যাপক বড়ুয়া ছিলেন অন্যতম। পালি বিভাগ ছাড়াও ভারততত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগেও তিনি অধ্যাপনা করেছেন। দীর্ঘ তিন দশক তিনি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে সগৌরবে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ তিনি কলকাতায় পরলোকগমন করেন। এই সুদীর্ঘকাল তিনি শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই সমৃদ্ধ করেননি, বহু মেধাবী ছাত্রের অন্তরে গভীর জ্ঞানপিপাসা সৃষ্টি করে প্রাচ্য গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম—প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীলঙ্কার কেলানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ালপোলা রাহুলা এবং আরও অনেকে।

আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া ছাত্রাবস্থাতেই লেখক জীবন শুরু করেন এবং আজীবন নিরলস একনিষ্ঠ সাধকরূপে বহু গ্রন্থ ও গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেন। ডি. লিট. ডিগ্রির জন্য তাঁর রচিত থিসিস 'এ হিস্ট্রি অব প্রি-বুদ্ধিস্টিক ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' নামে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই থিসিস লেখার পর বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস লেখার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ায় তিনি 'এ প্রোলেগোমেনা টু এ হিস্ট্রি অব বুদ্ধিস্ট ফিলসফি' গ্রন্থটি রচনা করেন। ভারতে অশোকের রাজত্বকাল থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্ত যত শিলালিপি বা অনুশাসনাদি পাওয়া গেছে তা এক প্রকার প্রাকৃত ভাষায় লেখা এবং ঐসব লিপিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেক। অশোক এবং অশোকের শিলালিপির উপর 'অশোক এ্যাণ্ড হিজ ইন্সক্রিপসান্স' নামে তিনি এক বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাতে ঐসময়ের শিলালিপির উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতটা তা সুস্পষ্টরূপে দেখান। বইটি পড়ে তাঁর সহকর্মী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মন্তব্য করেছিলেন অশোকের উপর ডঃ বড়ুয়ার গ্রন্থটি অনাগত কালেও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবে। তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'গয়া অ্যাণ্ড বুদ্ধগয়া' এর প্রথম খণ্ড ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের উপর তিনি নতুন আলোকপাত করেছেন। অধ্যাপক বড়ুয়া যে কেবলমাত্র শিলালিপি ব্যাখ্যাই করেছেন তা নয়। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ 'বারহুত'-এ বারহুত শিলালিপি সহ সমস্ত পাষাণোৎকীর্ণ চিত্র আছে, তিনি সেগুলির সঙ্গে বৌদ্ধগ্রন্থের সম্বন্ধ নির্দেশ করে দিয়েছেন এবং চিত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেসব জাতকের গল্প উৎকীর্ণ করা হয়েছে, সেই জাতকগুলি পালিজাতকের কোনটি তাও নির্দেশ করে দিয়েছেন। এই পালিজাতকের গল্পগুলি জানা থাকলে প্রস্তরে উৎকীর্ণ চিত্রগুলির মর্ম সঠিক উপলব্ধি করা যায়। বুদ্ধ যে-কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন নানা সম্প্রদায়-প্রবর্তক পরিব্রাজক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সব সম্প্রদায়-প্রবর্তকদের মত ও সাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রসমূহে নানা আলোচনা নিবন্ধ আছে। অনেক সম্প্রদায়ই বহু আগে লুপ্ত হয়েছে এবং তাঁদের কীর্তি ও প্রচেষ্টা বিস্মৃতির অতলগর্ভে লীন হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এই প্রতিদ্বন্দ্বী তীর্থকারদের জীবনচরিত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বিকৃতভাবে প্রতিপাদন করেছে। এই অবস্থায় অধ্যাপক বড়ুয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এইসব তীর্থঙ্করদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধনার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি আজীবিকস'-এ। সহকর্মী অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে বহু তথ্যপূর্ণ 'প্রাকৃত ধর্মপদ' গ্রন্থটি লেখেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অধ্যাপক বড়ুয়া সে দেশে যান এক আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলনে ভাষণ প্রদানের জন্য। এখানে তিনি অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা পান। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে ত্রিপিটকাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে 'সিলোন লেকচারস্' নামে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজীতে লেখা তাঁর শেষগ্রন্থ 'ফিলসফি অব প্রোগ্রেস' তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক বড়ুয়া বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে পৃথক্ ভাবে কোন বৃহৎ

গ্রন্থ লেখেননি, যদিও এবিষয়ে তিনি বহু বক্তৃতাদান ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বারোটি নিবন্ধ ডঃ বিনয়েন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় 'স্টাডিজ ইন বুদ্ধিজম' নামে ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার সারস্বত লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

বাঙলা রচনার ক্ষেত্রেও অধ্যাপক বড়ুয়ার অবদান উল্লেখযোগ্য। বাঙলায় লেখা তাঁর গ্রন্থ ও নিবন্ধাবলীর মধ্যে পালি মজ্ঝিমনিকায়ের প্রথম খন্ডের বঙ্গানুবাদ 'মধ্যমনিকায়' উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের একটি বিশ্বকোষ রচনার পরিকল্পনা নিয়ে 'বৌদ্ধগ্রন্থকোষ' প্রথম খন্ড প্রকাশ করেন। 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান' গ্রন্থে তিনি শতবর্ষব্যাপী বাঙলাভাষায় রচিত বাঙালী বৌদ্ধদের অবদানের আলোচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'লোকনীতি' (মূলসহ পালি লোকনীতির বঙ্গানুবাদ), 'মণিরত্নমালা' (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যপ্রণীত সংস্কৃত মণিরত্নমালার বঙ্গানুবাদ), 'গৃহী বিনয়' (পালি সিগালোবাদ সূত্রের মূলসহ বঙ্গানুবাদ), 'সতিপট্ঠান' (পালি মহাসতি-পট্ঠান সূত্রের মূলসহ বঙ্গানুবাদ) এবং আচার্য বুদ্ধঘোষ রচিত বিশুদ্ধিমার্গ-এর বঙ্গানুবাদ।

প্রখ্যাত দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুপন্ডিত এই মানুষটি বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো, অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স-এর তিরুপতি অধিবেশনে (১৯৪০) প্রাকৃত বিভাগের সভাপতি, ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেসের আন্নামালাই নগর অধিবেশনে (১৯৪৫) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার সভাপতি এবং ইন্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে (১৯৪৬) বিভাগীয় প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, শ্রীলঙ্কার বিদ্যালঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমন্ডলীর সদস্য, কলকাতা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলসফি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ইন্ডিয়ান কালচার, বুদ্ধিস্ট ইন্ডিয়া এবং জগজ্জ্যোতি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সম্পাদক, মহাবোধি সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্য, কলকাতা ইরান সোসাইটির সহসভাপতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালকমন্ডলীর সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, হিন্দু মিশন সহ বহু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত 'দি কালচারাল হেরিটেজ অব ইন্ডিয়া' নামে স্মারক গ্রন্থের প্রথম খন্ডে অধ্যাপক বড়ুয়া 'আরলি বুদ্ধিজম' শীর্ষক এক মূল্যবান নিবন্ধ লেখেন। (১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব কালচার ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন।)

এই মহান ভারততত্ত্ববিদ্ জ্ঞানসাধনার যে সুমহান ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা তাঁকে চিরকাল অমর করে রাখবে। সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে জন্মশতবার্ষিক বছরে তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্য।

* * *

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা

লাউয়েল পন্তে

১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মের সময় ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা এবং চীনদেশের কতকাংশে আকস্মিক উত্তাপের প্রভাবে ফসল শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ এবং চীনদেশের অন্য কয়েকাংশে ঐ সময় বন্যাস্রোতে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছিল। ঐ বৎসর ব্রিটেনে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং ক্যারিবিয়ান দেশগুলির উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে আবহাওয়ার কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ঐ রকম আশ্চর্য ব্যাপার শুধু ১৯৮৮-তেই ঘটেনি। গত দশ বৎসরে ইউনাইটেড স্টেটস-এ যে-রকম শীত পড়েছিল বা গড়পড়তা বার্ষিক উত্তাপ লক্ষিত হয়েছিল তা হাজার বৎসরে ক্বচিৎ দেখা যায়। অতীতে অন্যান্য অনেক জায়গাতেই অতি শীত বা অতি গরম দেখা গেছে। এমনকি শুষ্ক দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তুষারপাত হয়েছিল। কেন এরকম হচ্ছে? বৃটেনের আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞ হুবার্ট ল্যাম্ব-এর মতে, স্থানীয় আবহাওয়া এরকম খামখেয়ালী হলে বুঝতে হবে যে, বোধ হয় সারা বিশ্বের আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন আসছে। আমরা কি তুষারযুগের দিকে এগুচ্ছি কিংবা সারা পৃথিবীতে 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' (green house effect উদ্ভিদ্-কাচঘরের প্রভাব) হয়ে গরম হওয়ার ফলে সবজায়গায় জঙ্গল অথবা মরুভূমি হবার সূচনা হচ্ছে? এরূপ হবার অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে, কোন একটি ব্যাখ্যা থেকে পুরো উত্তর পাওয়া যাবে না।

যখন কয়লা বা খনিজ তেল জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড (carbon di-oxide) গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, আগামী দশ বৎসরে এই অতিসাধারণ গ্যাস পৃথিবীতে বিপর্যয় আনবে। কি ভাবে?

বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ঠিক গ্রীন হাউসের কাঁচের মতোই, সূর্যের আলো ঢুকতে দেয়, কিন্তু খানিকটা আলোককে উত্তাপে পরিবর্তিত করে ধরে রাখে। এর ফলে পৃথিবী গরম হয়ে উঠে। যদি কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি কয়েকটি গ্যাসকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে পৃথিবী মঙ্গল গ্রহের মতো হিমশীতল হয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকেই বায়ুমণ্ডলে এই সব গ্যাস বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি বৎসর সারা পৃথিবীতে ৫০ হাজার লক্ষ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস আকাশে উঠছে; তার উপর, গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলে বন-জঙ্গল পোড়ানোর ফলে আরো ২৫ হাজার লক্ষ টন ঐ গ্যাস উঠছে। শিকাগোর আবহাওয়া-বৈজ্ঞানিক ভি. রঙ্গনাথন দেখিয়েছেন বর্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর উত্তাপ আধ-ডিগ্রি বেড়েছে, মনে হয় ঐ গ্যাস ওঠার জন্য। যদি বায়ুমণ্ডলে ঐ গ্যাস না বাড়ে. তা হলেও, তাঁর হিসাবে. ধরে-রাখা উত্তাপ পরের শতাব্দীতে ১—৩ ডিগ্রি বাড়বে। আর যদি গ্যাস বাড়তে থাকে, তাহলে ২০৩০ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর উত্তাপ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের তুলনায় আরো ৫ ডিগ্রি বাড়বে।…আমরা যদি পৃথিবীর গরম হওয়া বন্ধ না করতে পারি, তাহলে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনে করেন, আমেরিকায় ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের মতো প্রতিবৎসর গরম পড়বে এবং আমেরিকায় ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য আরও ৫০ শতাংশ বাড়বে। অবশ্য এই 'গ্রীন হাউস এফেক্ট'-এর ফলে কোন কোন দেশ লাভবান হবে—চীন, ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বাড়বে, এবং সোভিয়েত, সাইবেরিয়া ও কানাডার শত শত মাইল জমা বরফ গলে যাবে। এর ফলে সমুদ্রের

সমতলরেখা উঁচু হবে, যার জন্য নিউইয়র্ক, লণ্ডন, বেইজিং প্রভৃতি শহরের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।…

প্রশ্ন হচ্ছে—এই রকম সাংঘাতিক অবস্থা হওয়ার কথা কতটা বৈজ্ঞানিক এবং কতটা কাল্পনিক? কোন কোন বৈজ্ঞানিক, যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া-বৈজ্ঞানিক টিম বার্নেট বলেন, "এই শতাব্দীতে যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে তা জোর করে বলা যায় না।" এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাপমাত্রা মাপার পদ্ধতিতে গলদ ছিল। তাছাড়া, বর্তমানে তাপমাত্রা মাপার স্থানগুলি শহরের উত্তপ্ত এলাকার কাছাকাছি।…

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে সমুদ্রগর্ভের উষ্ণ প্রস্রবণ বা আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে। কিন্তু এতে 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' হয় নাই; কারণ সমুদ্রের কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নেবার ক্ষমতা প্রচুর এবং সমুদ্রস্থ প্রাণিকুলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিস্ময়কর।… প্রায় ১৬ কোটি বৎসর আগে প্লাংকটন (Plankton) নামক সমুদ্রের ভাসমান একরকম ক্ষুদ্র জীব কার্বন-ডাই-অক্সাইডের গ্যাস টেনে নিয়ে তাদের চুনাপাথরের খোলস তৈরি করেছে। মারা যাওয়ার পরে এই প্রাণীগুলি সমুদ্রতলে যাওয়ায় তাদের গ্যাস ধরে রাখা খোলস জলের তলায় গিয়ে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে জমে থেকে চুনাপাথরের পাহাড় সৃষ্টি করছে। এইভাবে তারা কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ধরে রেখেছে। অন্যদিকে, গরম যত বাড়ে—প্লাংকটনদের বা ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রাণীদের তত বংশবৃদ্ধি হয়। এরা ডি. এম. এস (D. M. S—Dimethyl sulphide) গ্যাস ছাড়ে, যা ছোট ছোট জলকণা সৃষ্টি করে সূর্যকিরণকে প্রতিক্ষেপণ (reflect) করে পৃথিবীর আবহাওয়াকে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা করে।

বৈজ্ঞানিকরা জানেন যে, আগ্নেয়গিরি হতে যে-সব ধোঁয়া, ছাই ও গ্যাস বার হয়, তারা আন্তর আকাশে (stratosphere)-এ গিয়ে সূর্যকিরণকে ফিল্টার করে পৃথিবীকে ঠাণ্ডা করে।… ইলিনিয়াস ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর, পল হ্যাণ্ডলার দেখিয়েছেন যে, ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আগ্নেয়গিরি থেকে বিস্ফোরণের পরের দশ মাসে আমেরিকায় ভুট্টার ফলন বেড়ে গিয়েছিল। পল হ্যাণ্ডলার মনে করেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের পর আবহাওয়ায় ঝড় প্রভৃতি অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়।… তাছাড়া আছে সূর্যকিরণের ঔজ্জ্বল্যে হ্রাসবৃদ্ধি (magnetic sunspot) যার জন্য সূর্য মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। হিসাব অনুযায়ী ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দে সূর্যের উত্তাপ খুব বেড়ে যাবে।…

আবহাওয়ার ইতিহাসে কয়েকটি বৎসর স্মরণীয়। ১৬৫০-এর দশকে ইউরোপে যে ঠাণ্ডা আবহাওয়া এসেছিল (Little Ice Age), তাতে জমে যাওয়া টেমস নদীর উপর দিয়ে লোকে হেঁটে পারাপার হতো। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে টেমস প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল, যার পরেই ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে বিরাট অগ্নিকাণ্ড (Great London Fire of 1666) হয়।…

বিজ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধি আবহাওয়ার ভয়ংকর পরিবর্তনের বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার পথ দেখাতে পারে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমানোর জন্য আমরা দক্ষতা ও শক্তিসংরক্ষণ (energy conservation) বাড়াতে পারি; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (বিশেষতঃ ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে) বন-জঙ্গল রক্ষা করতে পারি, এবং কিলোমিটার প্রতি কম তেল খরচের মোটরগাড়ি নির্মাণ করতে পারি; সৌরশক্তি, বায়ু, নদীস্রোত প্রভৃতি হতে শক্তি (energy) আহরণ করতে পারি।… এসব যে পথ রয়েছে, সেটাও কম কথা নয়। অবশ্য এগুলিকে কাজে পরিণত করতে হবে।*

অনুবাদ (সংক্ষেপিত): জলধিকুমার সরকার

*** Reader's Digest, Feb. 1989 : 'What's Wrong with Our Weather' by Lowell Ponte.**

দেবীতীর্থ কামাখ্যা

জ্যোৎস্না রায়চৌধুরী

সত্যযুগের কথা। দক্ষরাজ বিরাট যজ্ঞ করছেন। সবাই সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত। শুধু নিমন্ত্রণ পাননি দক্ষরাজের কনিষ্ঠা কন্যা সতী এবং তাঁর স্বামী মহাদেব। বিনা নিমন্ত্রণেই সতী গেলেন পিতার যজ্ঞদর্শনে। সেখানে পিতার কথায় এবং আচরণে তিনি দেখলেন মহাদেব সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড উপেক্ষা এবং অসম্মানের ভাব। সতী অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সেসব সহ্য করছিলেন। তাতে উৎসাহিত হয়ে দক্ষ অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় শিবনিন্দা শুরু করলেন। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী সেখানেই যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। সে-সংবাদ শিবের কাছে পৌঁছলে শোকে উন্মত্ত শিব যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করলেন। অতঃপর সতীর দেহ নিজস্কন্ধে স্থাপন করে নটরাজ পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করলেন। শিবের ক্রোধ এবং তাণ্ডবনৃত্যে সৃষ্টি লয় পাবার উপক্রম হলো। তখন বিষ্ণু শিবকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য সতীর শবদেহ চক্র দ্বারা ছিন্ন করে নানা স্থানে নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। ভারতবর্ষের ৫১টি স্থানে সতীর দেহখণ্ড পতিত হয়ে এক একটি মহাপীঠ সৃষ্টি হলো। এই ৫১ পীঠের অন্যতম কামাখ্যা। কামাখ্যা যোনিপীঠ। গয়াহাটির কাছেই এই বিখ্যাত দেবীতীর্থ।

পাহাড়ের উপরে সমতল স্থানে মায়ের মন্দির। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। মন-প্রাণ ভরে যায়। এদিক ওদিকে নানারকম পাহাড়ী ফুল ও বনতুলসীর গাছ। তুলসীর পাতা আকারে প্রায় বেলপাতার মতো। এতবড় তুলসী পাতা কোথাও দেখিনি। পাণ্ডাঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চলেছি মায়ের পুজো দিতে।

প্রথমেই দর্শন হলো একটি প্রায় গোলাকার কুণ্ড। পাণ্ডাঠাকুর বললেন, "এই কুণ্ডের নাম সৌভাগ্য কুণ্ড।" এখানকার জল মাথায় নিয়ে মায়ের মন্দিরে যেতে হয়। সৌভাগ্যকুণ্ডের জল মাথায় নিলাম। মন্দিরের শেষপ্রান্তে একটি অন্ধকার গুহায় পাণ্ডাঠাকুর নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে। সেখানে মায়ের শ্রীঅঙ্গ পড়েছিল। পাণ্ডাঠাকুরের সাহায্যে মায়ের দর্শন হলো। সেখানে এক জলধারা বয়ে যাচ্ছে। পাণ্ডাঠাকুরের নির্দেশে সেই জল স্পর্শ করলাম। পাণ্ডাঠাকুর বললেন এবার মন্দির পরিক্রমা করুন। মন্দির পরিক্রমা করছি—মনে মনে মায়ের চিন্তা করছি। হঠাৎ পাণ্ডাঠাকুরের গলা শুনলাম। তিনি বললেন, "মা এখানে কুমারী কন্যারূপে ঘুরে বেড়ান।" সেকথা শুনে মনে হলো আমাদের সামনে তীর্থযাত্রীদের মধ্যেই তিনি হয়তো ছদ্মবেশে মন্দিরে পরিক্রমা করছেন। ভাবতে ভাল লাগছিল যে, তাঁর চরণস্পর্শ-পূত পথেই হয়তো আমরা হাঁটছি। মন্দিরের পাশে একটি জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দ কুমারী পুজো করেছিলেন। মন্দিরের আর একটি অংশে বলিস্থান। সেখানে পায়রা বলি হয়।

মা যে এখানে কুমারী কন্যারূপে ঘুরে বেড়ান, সে-সম্পর্কে একটি কাহিনী শুনলাম। কামাখ্যা পাহাড়ে ওঠা তখন তীর্থযাত্রীদের পক্ষে খুব কষ্টকর ছিল। সরকার তাই সেখানে একটি গাড়ি চলার রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার লোকজনসহ এসে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। পাহাড় ভাঙ্গার কাজ শুরু হতেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এক সাধু। তিনি তাদের বললেন, "এসব করবেন না। করলে আপনাদের খুব অমঙ্গল হবে।" সাধুর নিষেধ শুনে কয়েকজন সেখান থেকে চলে গেলেন, কিন্তু একজন এঞ্জিনিয়ার সাধুর নিষেধ কর্ণপাত না করে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করতে থাকলেন। তিনি বললেন, "আমি এ-কাজ করবই। আমি নাস্তিক—ওসব কথায় বিশ্বাস করি না।" কাজ চলতে থাকল। সাধু আবার এসে তাকে শাসিয়ে গেলেন, এঞ্জিনিয়ার এবারও সাধুর কথায় কর্ণপাত না করে কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ

দিলেন। কাজ চলছে, হঠাৎ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলো একটি বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটি এঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করল, "পাহাড় ভাঙছ কেন?" এঞ্জিনিয়ার বললেন, "পাহাড় ভেঙ্গে গাড়ির রাস্তা করব, তাতে যেসব তীর্থযাত্রী এখানে আসেন, তাঁদের আসার পথ সুগম হবে।" হঠাৎ দেখা গেল একটা বিরাট পাথর প্রবলবেগে নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। "আরে, মেয়েটি তো ওদিকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে! পাথরটা তো এই মুহূর্তেই তাকে পিষে ফেলবে!" এঞ্জিনিয়ার ব্যস্তসমস্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন, "শিগ্‌গির সরে যাও। পাথর চাপা পড়বে।" কিন্তু মেয়েটি সরল না। এঞ্জিনিয়ার অবাক হয়ে দেখলেন ছোট্ট মেয়েটি এক পা দিয়ে সেই বিশাল পাথরটি রুখে দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

◆

উদ্বোধন সমালোচিত

"...'চতুরঙ্গ' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যা প্রকাশিত হলো। অর্ধ শতাব্দী ধরে এই পত্রিকাটি চিন্তার যে গুণগত মান ধরে রেখেছে তা বিস্ময়কর। ...'চতুরঙ্গ'র বয়স যদি অর্ধশতাব্দী, 'উদ্বোধনে'র বয়স তবে শতাব্দীর কাছাকাছি। ৯১ বর্ষের ৪টি সংখ্যা আমরা পেয়েছি। প্রথমটিতে স্বামী ভূতেশানন্দ, শংকরীপ্রসাদ বসু, হরপ্রসাদ মিত্র ও বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ চারটি চিন্তার ও তথ্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করতে সাহায্য করবে। মেরি লুইস্ বার্কের সাক্ষাৎকারটি সুন্দর। ২য় সংখ্যায় হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের 'জাতীয় আন্দোলনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' ইতিহাস-রসে উজ্জ্বল। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলিতে রামকৃষ্ণ-উপদেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত, ৩য় সংখ্যায় অনিলবরণ রায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও জ্ঞানতত্ত্ব' রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতির সারাৎসার। কবিতা সিংহের ধারাবাহিক নিবন্ধ 'কবি সারদা' জীবনাভিজ্ঞতা ও কবিত্ব-রসের মিলনস্থল। তাছাড়া অন্যান্য সংখ্যার মতো এখানেও সেই বিশেষ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ বেলুড় মঠে—একটি মহাফেজখানা ও সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত শিষ্যগণের ব্যবহৃত পোশাক, ঘড়ি, জুতা ইত্যাদি, প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি, ব্যক্তিগত দিনলিপি, ব্যবহৃত গ্রন্থাদি, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের চরণচিহ্ন সেখানে সংরক্ষিত হবে। ৪র্থ সংখ্যায় অবশ্য মন কেড়ে নেয় স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দের 'কুম্ভযাত্রীর ডায়েরী'। এছাড়া 'অতীতের পৃষ্ঠা থেকে' তুলে আনা সরলাবালা দাসীর 'সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী'। অনবদ্য। 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যা ভক্তের আশ্রয়স্থল। সংশয়বাদীর জ্বালা ও যন্ত্রণা মুছিয়ে দেবার যোগ্য।"

বর্তমান ঃ 'এই মুহূর্তে', ১৪ মে ১৯৮৯, পৃঃ ৭

আনন্দের সন্তান

হাসির ভুবনখানি

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি হাসির জগৎকে সঙ্গে করে এনেছিলেন—যদি একথা কেউ বলেন, তা অস্বীকার করা যায় কি? তাঁর সন্তানদের জীবনেও সেই হাসির ঢেউয়ের ওঠাপড়া বারবার দেখা গেছে।—যদি বাঁচতে চাও, আনন্দের সাগরে ডুব দাও। সবচেয়ে দুর্লভ সেই বস্তুর ঢেউ জীবনে খেলতে থাকুক—এই আশীর্বাদ আমাদের উপর নেমে এসেছে।

উপস্থিত করব স্বামীজীর এক শিষ্যের কাহিনী। দীনমহারাজ—সংসার-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। পূর্বজীবনে করতেন কণ্ট্রাকটারী। এণ্টালীতে থাকতেন। সেই সময় একদিন তাঁর উকিল-বন্ধু ব্রজলাল পালিতের কাছে মেটেবুরুজের এক নবাব বৈষয়িক কোন প্রয়োজনে এসেছিলেন। চাকর সঙ্গে করে নবাবের পানের সাজ-সরঞ্জামও এনেছিল। তোলা উনুনে মুক্তো পুড়িয়ে তার ভস্ম পানের মধ্যে সেজে নবাবকে সে দিলে। উপস্থিত দীননাথ সেনকেও (দীন মহারাজ) সে একখিলি পান খেতে দিল। অন্যরা জাত যাবার ভয়ে সে পান খেতে নারাজ। দীন সেন ভাবলেন নবাবী পান তো আর কপালে জুটবে না। জাত যায় যাক, পানটা খেয়েই নি। এর পরের অংশটুকু তাঁর মুখেই শোনা যাক ঃ

'ইতিমধ্যে নবাবী তামাকও প্রস্তুত। নবাবসাহেব তা টানতে লাগলেন। আরে ভাই, সে কি সুগন্ধ, জন্মে অমন তামাক দেখিনি। আমার মনে হলো—পান খেয়ে যদি অর্ধেক জাত গিয়ে থাকে, তাহলে তামাক খেয়ে এবার পুরো জাতটাই যাক। দীন সেন না হয় দীন মহম্মদ হয়ে যাব, তবু নবাবী তামাক ছাড়া হবে না। তামাক খাবার ইচ্ছা দেখে একজন ঘর থেকে একটা ছোট কলকে এনে দিলে ও কলকেতে তামাক সেজে আগুন দিয়ে আমাকে দিলে। আমি তো বিনা পয়সার নবাব হয়ে নেব—এই ভেবে ভিতরে গিয়ে পানটা মুখে দিয়ে বারকতক চিবিয়ে বার তিনেক যেই তামাক টেনেছি—অমনি মাথার ভিতর ভোঁ হয়ে গেল, চোখে আর কিছু দেখতে পাই না, মাথা ঘুরতে লাগল।"

তারপর বাড়িতে গাদা গাদা লোকজনে এন্তার গাল পাড়তে লাগল। তারাই মাথায় তেল দিয়ে জল ঢালতে লাগল। মহা দুঃখে দীন মহারাজ জানালেন 'জল থাবড়িয়ে দেবার ছুতো করে মাথায় চাঁটি মারতে লাগল।' রবিবার ছুটির দিন, পাড়ায় হৈ-চৈ, ছেলে-বুড়ো তামাসা দেখতে চলে এল। নেশা কাটল পুরো তিনদিন পরে।

শরৎ মহারাজের একটি গল্প বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গল্পের অন্যতম। সে গল্পটি এইরকম ঃ

দুই বন্ধু, একজন মাতাল ও একজন গুলিখোর, পথে যেতে যেতে এক হালুইকরের দোকানে খাবার কিনল। হালুইকরের দোকানে তখন টাকা ভাঙানোর পয়সা ছিল না। তারা দেখল দোকানের সামনে একটি ষাঁড় শুয়ে আছে। ঐ ষাঁড়টিকেই তারা চিহ্ন স্থির করল। পরদিন আবার নেশা করে তারা বাকি পয়সা আদায় করতে এল। ঘটনাচক্রে সেই ষাঁড়টি একটা লম্বা দাড়িওয়ালা দরজির দোকানের সামনে শুয়েছিল। গুলিখোর গিয়ে দাড়িওয়ালা দরজিকে বলল, 'পয়সা দাও।' সে তো অবাক। খামকা পয়সা দেবে কেন? তখন গুলিখোর হম্বিতম্বি শুরু করল। বলল, "সে কি বাবা, দশ গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দেবার জন্য একেবারে ভোল ফিরিয়ে বসে আছ? কাল ছিলে হালুইকর, আর আজ হলে দরজি। আর বাবা রাতারাতি দাড়ি পর্যন্ত গজিয়ে ফেললে? এখনো সাক্ষী সাদা ষাঁড় শুয়ে আছে। গুলি খাই বলে মনে করো না যে আমার ভুল হয়েছে।"

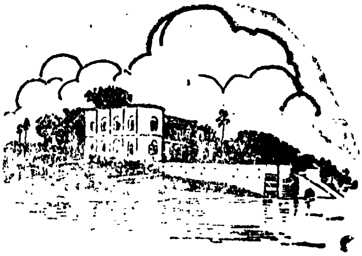

পুরাতনী

চরিত্রই সর্ববিধ কল্যাণের নিদান

স্বামী অবধূতানন্দ

ধর্মশীলতার স্বরূপ কি এবং কিভাবেই বা তা লাভ করা যায়—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব বললেন, পূর্বে রাজা দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও তোমার ভাইদের ঐশ্বর্য দেখে নিতান্ত বিমর্ষ ও সভামধ্যে উপহসিত হয়েছিল। দুর্যোধনের মনোকষ্টের কথা জেনে ও তাঁর মানসিক অবসাদ লক্ষ্য করে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বলেছিলেন, বৎস! তোমার সন্তাপের তো কোন কারণ নেই। তুমি প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী। তোমার ভায়েরা ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণ দাসের ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে রয়েছে। তুমি অতি মূল্যবান বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোজন কর। সুদৃশ্য অশ্বসমূহ তোমাকে বহন করে। কাজেই তুমি অযথা সন্তাপ প্রকাশ করছ কেন?

দুর্যোধন বললেন, মহারাজ! পাণ্ডবদের আলয়ে প্রতিদিন দশহাজার ব্রাহ্মণ সোনার থালায় আহার করে। পাণ্ডুসন্তানদের কুবের সদৃশ সমৃদ্ধি দেখে আমি যারপরনাই সন্তপ্ত হয়েছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস! তুমি যদি রাজা যুধিষ্ঠির তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্র দ্বারা ত্রিলোক জয় করা যায়। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ! কিভাবে সচ্চরিত্র হওয়া যায় তা আমাকে বলুন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস! পূর্বে মহর্ষি নারদ এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন; আমি তা বলছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে দানবরাজ প্রহ্লাদ নিজ চরিত্রবলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবন জয় করেছিলেন। ইন্দ্র স্বর্গের রাজা। রাজ্য হারিয়ে তাঁর মন বিষাদে ভরে গেল। তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে উপদেশ চাইতে গেলেন। সব শুনে বৃহস্পতি তাঁকে বললেন, দেবরাজ! মোক্ষোপযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি? বৃহস্পতি বললেন, দেবরাজ! মহাত্মা শুক্রাচার্য এ-বিষয়ে আমার অপেক্ষাও অভিজ্ঞ। অতএব তুমি তাঁর কাছে যাও।

ইন্দ্র শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে সব জানালেন। শুক্রাচার্য তাঁকে বহু উপদেশ দিলেন। ইন্দ্র সব শুনে বললেন, শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় এছাড়া আর কিছু আছে কি? তখন শুক্রাচার্য বললেন, তুমি দানবরাজ প্রহ্লাদের কাছে যাও, তিনি এ-বিষয়ে তোমাকে বলতে পারবেন।

দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শুনে অবিলম্বে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে প্রহ্লাদের নিকট গেলেন। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র প্রহ্লাদকে বললেন, দানবরাজ! আমি আপনার নিকট শ্রেয়োলাভের উপায় জানতে এসেছি। দয়া করে বলুন। প্রহ্লাদ বললেন, ব্রাহ্মণ! আমি এখন রাজকার্যে খুবই ব্যস্ত আছি। আপনাকে উপদেশ দেবার সময় আমার নেই।

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র বললেন, যখন আপনার অবসর হবে, তখনই আমাকে উপদেশ দেবেন; আমি অপেক্ষা করব। ব্রাহ্মণের আগ্রহ দেখে দানবরাজ খুশি হলেন। ইন্দ্র দানবরাজের প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। প্রহ্লাদও অবসর মতো তাঁকে উপদেশ প্রদান করতেন। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁর অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে তাঁকে প্রসন্ন রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ইন্দ্রের সেবায় ও ব্যবহারে প্রীত হয়ে প্রহ্লাদ একদিন তাঁকে বললেন, ব্রাহ্মণ! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে প্রসন্ন হয়েছি। আপনি আমার কাছে বর প্রার্থনা করুন। আপনি যা চাইবেন, তাই দেব।

ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র করজোড়ে বললেন, তাই যদি হয়, আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে

আপনার সচ্চরিত্রটি আমায় দিন। প্রহ্লাদ তাই দিলেন। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রের মনস্কামনা পূর্ণ হলো।

পরম পুলকিত চিত্তে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলেন। এদিকে বর প্রদান করার পর প্রহ্লাদ বিষণ্ণ চিত্তে বসে আছেন, এমন সময় দেখেন, জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে তাঁর শরীর থেকে একটি তেজ বেরিয়ে এল। প্রহ্লাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? তেজ বললেন, আমি চরিত্র। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেছেন; যে ব্রাহ্মণ এতদিন শিষ্যরূপে আপনার শুশ্রূষা করছিলেন, তাঁর কাছে আমাকে সমর্পণ করেছেন। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। এখন থেকে আমি তাঁর দেহেই অবস্থান করব। এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দানবরাজের দেহ থেকে আর একটি তেজ বেরিয়ে এল। প্রহ্লাদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, দৈত্যরাজ, আমি ধর্ম। যেখানে চরিত্র আমি সেখানেই থাকি। আপনার চরিত্র ব্রাহ্মণের কাছে গেছে, কাজেই আমাকেও সেখানে যেতে হচ্ছে। ধর্ম চলে গেলেন।

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ থেকে আরো একটি তেজ নির্গত হলে প্রহ্লাদ তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি সত্য। আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মের সঙ্গে চললাম, কেননা ধর্মের সঙ্গেই সত্যের স্থান। সত্য প্রস্থান করলে পর প্রহ্লাদের দেহ থেকে মহা পরাক্রান্ত তেজোময় এক পুরুষ নির্গত হলেন। প্রহ্লাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি সৎকার্য। যেখানে সত্য, সেখানেই আমি থাকি।

সবশেষে প্রহ্লাদের দেহ থেকে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গতা হলেন। প্রহ্লাদ দেবীকে দেখে কাতর কণ্ঠে বললেন, দেবি! আপনিও চললেন! যাইহোক চলে যাওয়ার আগে আমাকে বলে যান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আমার কাছে কে এসেছিলেন? দেবী বললেন, দানবরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার শিষ্যরূপে নীতিশিক্ষা করেছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য আছে তিনি তা অপহরণ করেছেন। তুমি সচ্চরিত্র ছিলে বলেই সেই চরিত্রবলে ত্রিভুবন জয় করতে পেরেছিলে। দেবরাজ ইন্দ্র সেকথা জানতে পেরে এভাবে তোমার চরিত্র অপহরণ করেছেন। তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য এখন ইন্দ্রের কাছে। ধর্ম, সত্য, সৎকার্য ও আমি —আমরা সকলেই চরিত্রবানের অধীন। এই কথা বলে দেবী প্রস্থান করলেন।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাত! চরিত্রের লক্ষণ কি এবং কিভাবেই বা তা লাভ করা যায়? ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস! সচ্চরিত্র কি এবং কিভাবে তা লাভ করা যায় সে-বিষয়ে আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি, শ্রবণ কর।

কায়মনোবাক্যে কারো অনিষ্ট চিন্তা না করা, উপযুক্ত পাত্রে দান এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন সচ্চরিত্রের লক্ষণ। যে-পুরুষকার দ্বারা কারো হিতসাধন হয় না বরং জনসমাজে লজ্জা পেতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করবে না। যে-কাজের দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায় ঐরূপ কাজই করা কর্তব্য। সংক্ষেপে আমি তোমাকে চরিত্রবান হওয়ার উপায় বললাম। কোন রাজা যদি তাঁর অসচ্চরিত্র দ্বারা কোনক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেও থাকেন তাহলে তিনি তা দীর্ঘকাল ভোগ করতে পারেন না। প্রত্যুত অবিলম্বেই সেই সমৃদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হয়। কাজেই যদি তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ কর, তাহলে আমার এই কথা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে সচ্চরিত্র হও। অনন্তর ভীষ্ম বললেন, হে ধর্মরাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্র দুর্যোধনকে এরূপ উপদেশ করেছিলেন। তুমি যদি এই উপদেশের অনুবর্তী হও, তাহলে নিশ্চয় উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হবে।

চরিত্রই শক্তির উৎস ও সর্বপ্রকার কল্যাণের নিদান। চরিত্রবলে বলীয়ান মানুষ নিজেও কল্যাণ লাভ করে, অপরেরও কল্যাণের কারণ হয়। চরিত্রবলে মানুষ সর্বত্রই জয়ী হয়।*

---

* মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১২৪তম অধ্যায়।

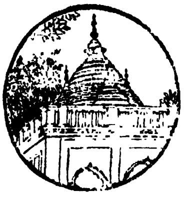

গ্রন্থ পরিচয়

ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা

সুনন্দ সান্যাল

অভিমানী নায়ক অলডাস হাক্সলে: সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। পুঁথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পঁয়ত্রিশ টাকা।

প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক অলডাস হাক্সলি (১৮৯৪-১৯৬৩) প্রথমে কবিতা লিখতেন। একবার তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি ব্রেইলে লেখাপড়া করতে শেখেন। কিছুকাল পরে তিনি আবার চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠেন, কিন্তু তখনো তিনি ব্রেইলে পড়ার শিক্ষা কাজে লাগাতেন। দারুণ ঠান্ডায় তিনি লেপের নিচে ঢুকে ব্রেইলে-লেখা বই পড়তেন। এহেন অলডাস কিছুদিন স্কুলে পড়িয়ে তাঁর মনে হয় যে, শিক্ষকের জীবন ভান-সর্বস্ব। ছাত্ররা তাঁদের দেবতুল্য ভাবলেও তাঁরা মোটেই তা নন। অলডাস দাম্পত্যজীবনে তাঁর কোন স্ত্রীকে একটিও কর্কশ কথা বলেননি। তাঁর প্রথমা স্ত্রী তাঁকে তাঁর বিরক্তিকর অনুরাগীদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেন। আর শেষ জীবনে, যখন অলডাসের ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী লরা তাঁর মানসিক আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ান।

এমন সব চিত্তাকর্ষক তথ্যের সমন্বয় সাধন করে ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন 'অভিমানী নায়ক অলডাস হাক্সলে' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তবে এই বই অলডাস হাক্সলির নিছক জীবনী নয়। এর একটি বড় অংশ জুড়ে আছে হাক্সলির উপন্যাস ও জীবন-দর্শনের ওপরে বিস্তারিত আলোচনা। এই কাজের জন্যে ডঃ বর্ধন যোগ্য ব্যক্তি। তিনি হাক্সলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের ওপরে গবেষণা করে ইতিপূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিও পেয়েছেন। ডঃ বর্ধনের পি. এইচ. ডি. থিসিসের ভিত্তিতে রচিত 'Aldous Huxley : The Philosopher Novelist' শীর্ষক বইটি সুধীসমাজে সমাদৃতও হয়েছে। তবে 'অভিমানী নায়ক' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ; এটি তাঁর ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ নয়।

প্রখ্যাত নজরুল জীবনীকার আজাহারউদ্দিন খান আলোচ্য বইটির একটি মনোজ্ঞ মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। আদতে এই বইটি খানের অনুরোধেই লেখা। সঙ্গত কারণে খানসাহেব বাংলায় হাক্সলির ওপরে আলোচনার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন: 'ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের 'হাক্সলের জীবনদর্শন ও তার নেপথ্য কাহিনী' অধ্যায়ে পাঠকরা ···নতুন আলোর নিশানা পাবেন।"

ডঃ বর্ধন প্রশ্ন তুলেছেন, হাক্সলির জীবনদর্শনে, চিন্তায় ও মননে কেন এত বৈপরীত্য? "হাক্সলির দর্শন কি অনেকটা গৌতম বুদ্ধের দর্শনের মতো?" ডঃ বর্ধনের নিজেরই উত্তর—না, তা একেবারেই নয়। বরং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে "কিছুটা মিল আছে।" "রবীন্দ্রনাথের মতো অলডাসও ইন্দ্রিয়ের দরজা বন্ধ করতে চান না ···(কিন্তু) রবীন্দ্রনাথ যেমন ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, অলডাস তা পাননি এবং গৌতম বুদ্ধ যেমন ঐ সন্ধান ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন তা-ও তিনি করতে পারেননি। বরং ঐ সন্ধানই তাঁর জীবনের যাকে বলে প্রধান ব্রত তাই ছিল।"

ডঃ বর্ধন দেখিয়েছেন যে, হাক্সলির কাছে অনাসক্তিই হলো নৈতিক বিধির প্রধান ভিত্তি, "জ্ঞান (নলেজ) ও বোধের (আন্ডারস্ট্যান্ডিং) মধ্যে এবং সাধারণ বিশ্বাস (বিলিফ) ও ধর্মীয় বিশ্বাসের (ফেথ) মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি" না করলে এ-জাতীয় বৈপরীত্যের সমাধান হবে না। কিন্তু

হাক্সলির বিশ্বাস, “বোধ ··· চেষ্টা করে লাভ করা যায় না। তা আপনা থেকেই উদয় হয়।” ডঃ বর্ধন লিখেছেন, “আমার মতে অলডাস হাক্সলির জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু এখানেই পাওয়া যায়।”

অলডাস হাক্সলি তাঁর ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পরে যে “অতিমানবীয় প্রশান্তির” পরিচয় দেন তার অন্ততঃ একটি কারণ রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় কেন্দ্রের স্বামী প্রভবানন্দের প্রভাব। এই ঘটনার অনেক আগেই জেরাল্ড হার্ড ও অলডাস হাক্সলি স্বামী প্রভবানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

ডঃ বর্ধন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। কিন্তু বাংলার ওপরে দখলও তাঁর চমৎকার। ছোট ছোট বাক্যে জটিল বক্তব্য তিনি সুন্দর বোঝাতে পারেন। কিন্তু কিছু কিছু ভুল পাঠককে পীড়িত করে—যেমন “মতদ্বৈধতা” (পৃঃ ৩৪), “স্বজ্ঞা”, “সজ্ঞা” (৫৮), Jung বাংলায় “জুয়াং” (৩৯), Leonard বাংলায় “লিওনার্ড” এবং Anthony “এ্যানথনি” ইত্যাদি। তাছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজী প্রতিশব্দ বা বাক্যরীতির প্রয়োগের সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না; যেমন, “১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের সামার টার্মের সঙ্গে” (পৃঃ ৭), “অলডাসের জীবনদর্শন সম্পর্কে প্রায় ততগুলি মত আছে যতজন তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন” (পৃঃ ৩৩)। কিছু ছাপার ভুলও থেকে গেছে, যেমন ‘হারমোনিয়াস ব্লেন্ডিং’ বদলে হয়েছে ‘হারমোনিয়াম ব্লেন্ডিং’ (পৃঃ ৩৪)।

আশা করব পরবর্তী সংস্করণে এই সামান্য ত্রুটিগুলো শুধরে দিয়ে লেখক বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে দেবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার

জ্ঞানদীপ: শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্মারক পত্রিকা। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, উত্তর বাঁ্যাটরা, হাওড়া—৭১১ ১০১। মূল্য: দশ টাকা।

পরিমলকান্তি দাস সম্পাদিত স্মরণিকাটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত: (১) প্রসঙ্গ: শ্রীরামকৃষ্ণ, (২) প্রসঙ্গ: শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, (৩) প্রসঙ্গ: স্বামী বিবেকানন্দ, (৪) প্রসঙ্গ: জ্ঞান মহারাজ এবং (৫) প্রসঙ্গ: রামকৃষ্ণ মন্দির। লেখকসূচীতে আছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ শেঠ, প্রেমবল্লভ সেন, পরিমলকান্তি দাস, নিমাইসাধন বসু, সচ্চিদানন্দ ধর, প্রণবেশ চক্রবর্তী, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, তাপস বসু প্রমুখ।

দিব্যায়ন: বার্ষিক মুখপত্র, প্রাক্তন ছাত্রসংসদ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা (উত্তর)।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত দিব্যায়ন-এর আলোচ্য সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে এঁদের রচনায়: স্বামী রমানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, হর্ষ দত্ত, বিধুভূষণ নন্দ, কৌস্তুভ গুপ্ত, মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর (বাঁকুড়া) গত ২৪—২৬ মার্চ দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। তিনদিনের ধর্মসভায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী উমানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং রাখহরি চট্টোপাধ্যায়। ২৪ মার্চ বিকালে বিদ্যালয় ও আন্তর্বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। সমাপ্তি দিবসে প্রায় দশ হাজার নরনারীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

তমলুক রামকৃষ্ণ মঠে গত ৯ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী উক্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূজা, পাঠ, হোম, ভজন, গীতি-আলেখ্য, ছায়াছবি প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এ-উপলক্ষে চারদিনই ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন স্বামী মহানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ, স্বামী ধৃতাত্মানন্দ এবং জহরলাল বেরা। উৎসবের প্রথম দিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা তমলুক শহর পরিক্রমা করে। দুপুরে প্রায় দশহাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দিল্লী আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১২ মার্চ এক জনসভার আয়োজন করেছিল। এই সভায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা পৌরোহিত্য করেন।

পুরী রামকৃষ্ণ মঠে গত ৯ মার্চ '৮৯ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম শুভজন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজাহোম সম্পন্ন হয় এবং ২১০জন রোগী-নারায়ণকে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। দুপুরে ৫৭০জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। ১১ মার্চ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুরীধামে শুভ-পদার্পণের শতবর্ষ-পূর্তির ২য় পর্ব এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী সমাপ্তিপর্ব উদ্‌যাপিত হয়। সেদিন অধ্যাপক রাজকিশোর রায়ের সভাপতিত্বে ধর্মসভার আয়োজন হয়েছিল। স্বামী নিগমাত্মানন্দ এবং স্বামী দীনেশানন্দ ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন। এই উপলক্ষে ৫০০জন ছাত্র-ছাত্রীকে পঠন-পাঠনসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ২৫০জন ছিল হরিজন ছাত্র-ছাত্রী।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

গত ১০ জানুয়ারি মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের তামিল মিডিয়াম প্রাইমারী স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। তামিলনাড়ু সরকারের মন্ত্রী থিরো কান্ডাস্বামী এই উৎসবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নতুন পত্রিকার প্রকাশ

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারার্থে 'রামকৃষ্ণ জ্যোত' নামে একটি গুজরাটী মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশিষ্ট কবি ও প্রখ্যাত গুজরাটী দৈনিক 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক হরীন্দ্র দবে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রকাশ করে শ্রীদবে বলেন, বর্তমানে সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে সংকট চলছে, তা থেকে উত্তরণের পথপ্রদর্শনকারী সাময়িক পত্রপত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। সেজন্য 'রামকৃষ্ণ জ্যোত'-এর মতো পত্রিকার প্রকাশ খুবই সময়োচিত। সভাপতির ভাষণে স্বামী আত্মস্থানন্দজী বলেন, 'রামকৃষ্ণ জ্যোত' মানুষকে তাদের চলার পথের যথার্থ সন্ধান দেবে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করলেও মানসিক শান্তির জন্য সেই পাঁচহাজার বছরের পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বারস্থ আমাদের হতে হবে।

সভার প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণে স্বামী মুমুক্ষানন্দ বলেন, স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, এ-ধরনের পত্র-পত্রিকা শুধু ইংরেজীতেই নয়, প্রধান প্রধান সকল ভারতীয় ভাষাতেই যেন প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর প্রেরণায় তাঁর জীবৎকালেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্ররূপে 'প্রবুদ্ধভারত' ও 'উদ্বোধন' নামে ইংরেজী ও বাংলায় দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অদ্যাবধি সগৌরবে প্রচলিত এই পত্রিকাদ্বয় বর্তমান ভারতের প্রাচীনতম সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

পরিদর্শন

গত ১৭ মার্চ কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ী চেরাপুঞ্জী আশ্রম এবং বিভিন্ন গ্রামে এই আশ্রমদ্বারা পরিচালিত কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

গত ৮ এপ্রিল মেঘালয় বিধানসভার অধ্যক্ষ পীটার মারবানিয়াং এবং মেঘালয় সরকারের মন্ত্রী এস. পি. সোয়ের চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধন

গত ৮ এপ্রিল, তমলুক আশ্রমের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র ও অতিথিশালার জন্য নির্মিত একটি দ্বিতল গৃহের এবং শিল্পবিদ্যালয় গৃহের নতুন বর্ধিতাংশের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

গত ১৫—১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত পূর্ব-ভারতীয় বিজ্ঞান শিবিরে আলং বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র অরুণাচল প্রদেশের প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করে। কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তারা পুরস্কৃত হয় এবং স্কলারশিপও লাভ করে।

দিল্লীস্থ ইউনাইটেড স্কুলস অর্গানাইজেশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক অনুষ্ঠিত ৩১তম অল ইণ্ডিয়া ইউ. এন. ইনফরমেশন টেস্টে এই বিদ্যালয়ের একটি উপজাতি ছাত্র ৯ম স্থান অধিকার করেছে এবং দুজন উপজাতি ছাত্র এন. সি. ই. আর. টি. কর্তৃক প্রদত্ত ন্যাশন্যাল ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ লাভ করেছে। এই স্কলারশিপ গবেষণা স্তর পর্যন্ত বজায় থাকবে। তাছাড়া আরেকজন উপজাতি ছাত্র সর্বভারতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল করার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রদত্ত পুরস্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চল শীর্ষ ট্রফি লাভ করেছে।

ত্রাণ

উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ ঃ পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ডেলাং এবং পুরী ব্লকের বিলাসপুর এবং প্যানিওরা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৭০টি পরিবারকে ২৯১৬ কিলোঃ চাল, ১৪৫৮ কিলোঃ আলু, ৭০টি শাড়ি, ৬৫টি ধুতি এবং ৭০সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে।

বিহার খাদ্যত্রাণ ঃ জামশেদপুর আশ্রমের মাধ্যমে সিংভূম জেলার গোইলকেরা ব্লকের ৬টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামের খাদ্যাভাবগ্রস্ত ৩৬৭৫জন লোকের মধ্যে ৪০০০ কিলোঃ চাল, ৫০০ কিলোঃ ডাল, ২০০০ কিলোঃ আলু, এবং ৫০০ কিলোঃ পেঁয়াজ এবং পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ৮টি গ্রামের ১৮৯৯জন রোগীর চিকিৎসা এবং মেনিনজাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন ঃ 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কার্যসূচী অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কালীতলা, গোবিন্দকাটি এবং যোগেশগঞ্জ অঞ্চলে ৪০২টি বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং ৩৩১টি বাড়ির কাজ চলছে।

উক্ত কার্যসূচী অনুযায়ী শিকড়া-কুলীনগ্রাম আশ্রমের মাধ্যমে বসিরহাট মহকুমার ৯টি অঞ্চলের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি গ্রামে ১৯২টি বাড়ি ও ৪টি কমিউনিটি হল তৈরি এবং ৭৩টি বাড়ির মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

বহির্ভারত

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া) গত মে মাসের রবিবার ও বুধবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর বক্তৃতা হয়েছে। ১৩ ও ২০মে শনিবার শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা হয়েছে।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সেণ্টার গত মে মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। ২১ মে ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণীর উপর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি শুক্রবার ও প্রতি মঙ্গলবার যথাক্রমে পাতঞ্জলযোগসূত্র এবং গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ-এর উপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

গত ৯ এপ্রিল ভারতের প্রধান বিচারপতি আর. এস. পাঠক ও তাঁর পত্নী মরিশাসস্থ ভারতের হাই কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মরিশাস কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

সাধন-শিবির

গত ২৭—৩১ মে সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির পরিচালনায় ওলেমাতে এক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাধন-শিবিরে, পূজা, পাঠ, ধ্যান, ভজন এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ছিল। ২৯মে 'পুনর্জন্মবাদ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন যাজক ডঃ পল ক্লাসপার এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী।

দেহত্যাগ

স্বামী সান্দ্রানন্দ (মানিক) গত ৩০ মার্চ ৮১ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। ঐদিন সকাল ৮-৫৫ মিঃ তাঁর শ্বাস ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সান্দ্রানন্দ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে গড়বেতা আশ্রমে যোগদান করেন। তিনি ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে চণ্ডীপুর, রেঙ্গুন, রাঁচি, বাঁকুড়া, সারগাছি এবং বেলুড় মঠের কর্মী ছিলেন। সঙ্গীতপ্রেমী এই সন্ন্যাসী কঠোর ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ (মহেন্দ্র) গত ২৫ এপ্রিল বিকাল ৪-২৫ মিঃ সারগাছি আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর দেহত্যাগ ঘটে। তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঢাকা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বারাণসী সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ, বৃন্দাবন, কনখল, করিমগঞ্জ, শিলচর এবং সারগাছি কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। সহজ-সরল ও কঠোর জীবন-যাপন এবং সদা-সন্তোষ ভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

ব্রহ্মচারী ত্রিপুরেশচৈতন্য (কিশোর) গত ২০ মার্চ কনখল সেবাশ্রমে এক দুর্ঘটনায় মাত্র ৩২ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। একটি নির্মীয়মাণ ছয় তলা বাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ব্রহ্মচারী ত্রিপুরেশচৈতন্য ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে কনখল আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্য দীক্ষালাভ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১০ মে আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি এবং ২০ মে ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও স্বামী গর্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রতি সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৫ জানুয়ারি, কল্যাণীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ প্রাঙ্গণে নদীয়া ও উত্তর ২৪-পরগনার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করিয়ে দেন মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী। সম্মেলনে স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ ও স্বামী লোকাতীতানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সমাপ্তি হয় ধর্মসভার মাধ্যমে।

২০, ২১ ও ২২ জানুয়ারি ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনে সম্পন্ন হয়। এতে পরিষদের অধিবেশন, ভক্ত-সম্মেলন, ধর্মসভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন আশ্রমে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীরাই সারা ত্রিপুরা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় ১২৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ২৬টি আশ্রমের প্রতিনিধি বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী উদ্‌গীথানন্দ, ভাষণ দেন সহ-সভাপতি স্বামী শান্তিদানন্দ।

কটক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি গত ১৯ মার্চ '৮৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উৎসবে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করে গেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ সেই মহাজীবনেরই ভাষ্যস্বরূপ। এই উৎসবে ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ভক্ত্যানন্দ, স্বামী বৈরাগ্যানন্দ ও স্বামী অজয়ানন্দ বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগদান করেন। ঐদিন মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র (পাণ্ডু, অসম)—গত ৯ ও ১৭—১৯ মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করে। ৯ মার্চ বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৭—১৯ মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী অলোকানন্দ, ডঃ পি. কে. বেরা, দিলীপ চৌধুরী, এম. আর. রঙ্গনাথ প্রমুখ। উৎসবের শেষদিনে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (বদরপুর, অসম)—গত ৯—১২ মার্চ পর্যন্ত এই আশ্রমে উক্ত উৎসব নানা অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উৎসবের প্রথম দিন স্থানীয় রেলওয়ে হাসপাতালে ফল বিতরণ করা হয় এবং শেষদিন ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে গত ২৫ ও ২৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি-বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত পাঠ, ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি। উৎসবের উভয়দিনই স্বামী অনাময়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, ডঃ বাবুরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন এবং অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ, রামপাড়া (হুগলী)—গত ৪ মার্চ এই সংঘের উদ্যোগে তোড়লপুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব

করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। বক্তা ছিলেন দেবাশিস মহন্ত ও সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির (নবগ্রাম, হুগলী)—শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৪তম জন্মোৎসব স্থানীয় সত্যভারতী নবপ্রাঙ্গণে গত ২৬ মার্চ সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে। উৎসবের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী পুরাণানন্দ ও স্বামী বিমলাত্মানন্দ। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

ডোমজুড় (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির গত ১—৩ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন প্রায় দেড়হাজার নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ পান। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন বন্দিতা ভট্টাচার্য, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা, প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ। উৎসব উপলক্ষে ৬৫ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্রদান করা হয়।

চণ্ডীতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (মানকুণ্ডু, হুগলী) গত ১ ও ২ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে পালন করে। ২ এপ্রিল অপরাহ্ণে স্বামী দেবদেবানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এ-উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে এক চিত্র প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

অশোকনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (উঃ ২৪ পরগনা): শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিতে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করা হয়েছে।

খড়্গপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি: গত ৯ মার্চ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সোসাইটি প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তনাদির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এদিন দুপুরে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এ-উপলক্ষে ২৩—২৬মার্চ ধর্মসভায় স্বামী সারদাত্মানন্দ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, ডঃ সুশীলা মণ্ডল, অধ্যাপিকা রমা মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ৫-৬ মাইল দূরে অবস্থিত দুটি গ্রাম মালাতোড় ও ভাদুল। এই দুই গ্রামের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যুগ্মভাবে গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস পালন করে। এদিন সকালে শোভাযাত্রা করে আশপাশের গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। তাছাড়া আয়োজন ছিল বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণের। ছাত্রছাত্রী ও ভক্তবৃন্দ সহ প্রায় ৫০০জনকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ছিল আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী শ্রেয়সানন্দ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলা দত্ত। এ-উপলক্ষে ৮ জানুয়ারি দুটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে

বাগবাজার নিবাসী **শ্রীপ্রভাতকুমার বিশ্বাস** গত ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৯ দুপুর ১২-৩০ মিঃ অকস্মাৎ শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর। তাঁর আদি নিবাস হুগলী জেলার হরিপাল অঞ্চলে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

ছাত্রজীবনে পড়াশোনা ও খেলাধূলা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি উজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সুবর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। কর্মজীবনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাইরেকটরেট অব অডিট অ্যান্ড এ্যাকাউন্টস অফিসার পদে তিনি দীর্ঘকাল সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। অবসর গ্রহণের পর থেকে আমৃত্যু তিনি "উদ্বোধন" কার্যালয়ের সম্পাদকীয় বিভাগের কাজে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন

ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তিঃ' নামক কবিতার ৪র্থ শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'সঃ স্বয়ং' স্থলে 'স স্বয়ং', ৭ম শ্লোকের ৪র্থ চরণে 'সঃ স্বেষ্ট-প্রসাদাৎ' স্থলে 'স স্বেষ্টপ্রসাদাৎ,' ৯ম শ্লোকের ১ম চরণে 'প্রকট্য' স্থলে 'প্রকট্‌ষ্য' এবং ১০ম শ্লোকের ৩য় চরণে 'গৌরী-নারায়ণ-পদ্মলোচনপ্রভৃতয়ঃ শাস্ত্রজ্ঞ-সাধকা' স্থলে 'গৌরীপণ্ডিত-পদ্মলোচনমুখাঃ শাস্ত্রার্থবিৎ-সাধকা-' পড়তে হবে।

বিজ্ঞান সংবাদ

বহুপ্রসূ-চাষ

যদিও আমেরিকার উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তিবিদ্যাই সারা জগতের প্রশংসা অর্জন করে আসছে, কিন্তু সে-দেশের আসল মেরুদণ্ড হচ্ছে তার কৃষি। সারাজগতে যা সয়াবীন ও ভুট্টা তৈরি হয় তার অর্ধেক হয় আমেরিকাতে ; তুলা, গম, তামাক ও উদ্ভিজ্জাত তেলের ১০ হতে ২৫ শতাংশ হয় এই দেশে। একজন আমেরিকার কৃষক নিজের পরিবার ছাড়া সেদেশের বা অন্য দেশের আরও ৭৪টি পরিবারের খাদ্যশস্য ফলায়। দেশের এক তৃতীয়াংশ কৃষিভূমিতে বিদেশে রপ্তানির জন্য ফসল ফলানো হয়।

কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগানোর জন্যই সে-দেশের কৃষির এত উন্নতি। অবশ্য এর সঙ্গে আছে চাষে লাগানোর জন্য নব আবিষ্কৃত সার এবং কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার— যার ফলে ফলন অনেক বেড়ে গেছে।

এইসব রাসায়নিক দ্রব্য শুধু যে খরচবহুল তা নয়, সেগুলি জমি ও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্য আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ এখন এমন ধরনের উদ্ভিদ তৈরি করার চেষ্টা করছেন যারা আরও শক্ত ধরনের, সারের উপর কমনির্ভরশীল, আরও ফলনশীল হবে এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণের শিকার হবে কম।

[SPAN, April 1989, p. 49]

মাংস ও লিউকিমিয়া

ফরাসীদেশের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব শিশুর পিতারা মাংস ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাদের এই রক্ত-ক্যানসার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। লিয়োর দুইশত লিউকিমিয়া রোগীকে পরীক্ষা করে তার ফল প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ জার্নেল অব ইনডাস্ট্রিয়েল মেডিসিনের এক সাম্প্রতিক সংখ্যায়। ঐ সব শিশুদের পিতারা অনেকেই কাজ করেন কসাইখানায় বা মাংসসংক্রান্ত অন্য কাজে। ফরাসী গবেষকদের ধারণা যে, গরুর লিউকিমিয়া ভাইরাস (Bovine leukaemia virus)-ই শিশুদের ঐ রোগের কারণ।

[New Scientist, 7 January 1989, p. 25]

তিক্তস্বাদ অনুভবের পদ্ধতি

মিষ্ট, নোনতা বা অম্ল স্বাদ যে-পদ্ধতিতে অনুভূত হয়, তিক্ত স্বাদ সেভাবে হয় না। জিহ্বার উপর পৃষ্ঠে মিষ্ট, নোনতা বা অম্ল খাবার পড়লে, বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিবর্তন (change in the electric potential) আনে যার ফলে স্বাদনিরূপক স্নায়ুশিরার (gustatory nerve)-র উপর প্রভাব আনে। তিক্ত দ্রব্য বিদ্যুৎ প্রবাহের সেরূপ কোন পরিবর্তন আনে না।

সম্প্রতি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইল্‌স এ্যাকাবাস এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ দেখিয়েছেন যে, জিহ্বার দেহকোষে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তিক্ত স্বাদ আনে। তাঁরা ইঁদুরের জিহ্বা হতে স্বাদনিরূপক দেহকোষগুলি (taste cells) আলাদা করে (সেগুলি যে স্বাদনিরূপক তা জানা যায় তাদের বিদ্যুৎপ্রবাহে প্রতিক্রিয়া থেকে) তাদের উপর ডিনেটোনিয়াম ক্লোরাইড (যা মানুষের কাছে অত্যন্ত তিক্ত) প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে এতে দেহকোষের মধ্যে ক্যালসিয়াম দ্বিগুণ বেড়ে যায়। দেহকোষগুলির ধারকঝিল্লী (membrane)-তে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিবর্তন হলে সংলগ্ন স্নায়ুকোষের ক্যালসিয়াম দ্বিগুণ বেড়ে যায়, যার ফলে ‘তিক্ত’, এই খবর চলে যায়। তিক্ত খাবারের ‘তিক্ত’ অংশ ঐ কোষগুলির গায়ে লেগে, অম্ল বা মিষ্ট খাবারের মতো তাড়িৎপ্রবাহের পরিবর্তন না এনে কোষের মধ্যে ক্যালসিয়াম বাড়ায়।

[New Scientist, 4 February 1989, p. 31]

বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
বরান নিবোধত"

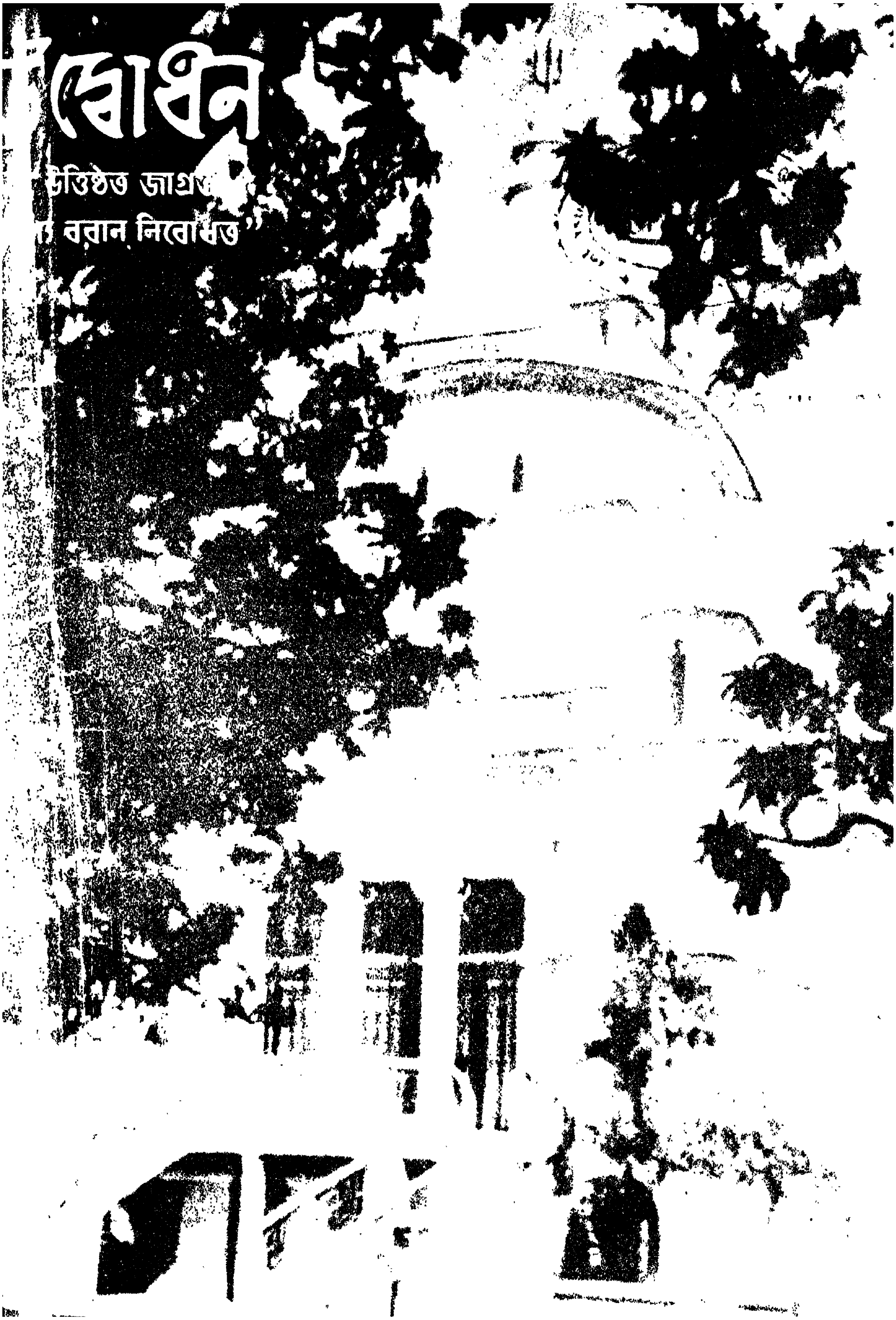

শ্রাবণ ১৩৯৬ ৯১তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ··· ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।··· এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯৬

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF
LIBRARY
CALCUTTA

দিব্য বাণী

ধ্যায়েচ্চিত্তসরোজস্থাং সুখাসীনাং কৃপাময়ীম্ ।
প্রসন্নবদনাং দেবীং দ্বিভুজাং স্থিরলোচনাম্ ॥ ১

আলুলায়িত কেশার্ধবক্ষঃস্থলবিমণ্ডিতাম্ ।
শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ২

স্বক্রোড়ন্যস্তহস্তাঞ্চ জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্ ।
শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ীং জীবপাপসন্তাপহারিণীম্ ॥ ৩

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিণীম্ ॥ ৪

জানকীরাধিকারূপধারিণীং সর্বমঙ্গলাম্
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্ ॥ ৫

স্বামী অভেদানন্দ

—তিনি প্রসন্নবদনা, তাঁর চক্ষুদ্বয় স্থির, তিনি দ্বিবাহুসমন্বিতা ; তিনি প্রস্ফুটিত হৃদয়কমলে সুখাসনে উপবিষ্টা হয়ে আছেন—এরূপে কৃপাময়ী দেবী সারদাকে ধ্যান করবে।

তাঁর আলুলায়িত কেশরাশি বক্ষঃস্থলের একপার্শ্বে শোভিত, এবং শরীরার্ধ শ্বেতবস্ত্রে আবৃত ও স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত।

তাঁর হস্তদ্বয় ক্রোড়ের উপর স্থাপিত, তিনি শুভ্রজ্যোতিতে উদ্ভাসিতা, তিনি জ্ঞান ও ভক্তি প্রদায়িনী এবং জীবের পাপ ও সন্তাপহারিনী।

তাঁর মনঃপ্রাণ একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণতেই সমর্পিত, শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম শ্রবণেই তিনি আনন্দিতা, শ্রীরামকৃষ্ণভাবেই তাঁর চিত্ত রঞ্জিত এবং তিনি জগতের মাতৃস্বরূপা।

তিনিই জানকী ও রাধিকা রূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তিনি সর্বমঙ্গল-স্বরূপিণী, চিন্ময়ী, নিত্যা, বরদায়িনী এবং মোক্ষদায়িনী।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা ঃ গুরুশক্তি

আমাদের আচার্যরা বলিয়াছেনঃ "নাস্তি মাতৃসমগুরুঃ"—মায়ের মতো গুরু আর কেহই নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবার জগৎবাসীর কানে এবং প্রাণে 'মা' মন্ত্র শুনাইয়াছেন। শুধু শুনাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, দিয়াছেন মন্ত্র-মূর্তিও। সে মূর্তির নাম সারদাদেবী। জগৎ এবার শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে মা এবং গুরু উভয়কে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে, যেখানে তিনি শিষ্যের প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারেন। জাগতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় একমাত্র মা-ই প্রকৃষ্টরূপে জানেন তাঁহার সন্তানদের রুচি ও মানসিকতার পরিচয়। সে-কারণে তিনি যাহার পেটে যেমনটি সহে সেইরূপভাবে তাহাদের আহার্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করেন। ইহাতে সন্তানদের যথার্থ স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। শ্রীমা সারদাদেবী লৌকিক অর্থে মা না হইয়াও অগণিত সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। তাহাদের কাছে তিনি ছিলেন 'সত্যিকারের মা,' এমনকি তদপেক্ষাও অধিক। এই অগণিত সন্তানবৃন্দের একটি অংশের কাছে তিনি আবার ছিলেন গুরু—পারমার্থিক দিশারী। শুধু 'একটি অংশের' কাছে বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। তিনি জগতের সকল মানুষের কাছেই ছিলেন গুরু এবং জননী। তাই তিনি সম্যক্‌রূপে জানিতেন তাঁহার সকল আশ্রিতের, সকল সন্তানের দেহ, মন ও আত্মার সকল সংবাদ।

গুরু হইলেন জ্ঞানদাতা বা জ্ঞানদাত্রী। 'গুরু' কথাটির মধ্যেই সেই তাৎপর্য নিহিত। 'গু' শব্দের অর্থ অজ্ঞান, আর 'রু' শব্দের অর্থ তৎনিরোধক জ্যোতিঃ। অতএব গুরু বলিতে তাঁহাকেই বুঝায় যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরোধ করিয়া দেন। বেদমতে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তন্ত্রমতে মানুষের মধ্যস্থিত মূলাশক্তি 'কুণ্ডলিনী শক্তি' রূপে আখ্যাত ; সেই শক্তির উদ্বোধন ও ঊর্ধ্বায়ণেই মানুষের 'জ্ঞান'-এর উন্মেষ ঘটে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গুরু, সরস্বতী এবং মূলাশক্তি কুণ্ডলিনীর বীজমন্ত্র একই—'ঐং'।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবী সম্পর্কে বলিয়াছিলেনঃ "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" বলিয়াছিলেনঃ "(ও) জ্ঞানদায়িনী।" স্বামীজীও একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেনঃ "তিনি সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা"। আবার শ্রীমা যে স্বয়ং মূলাশক্তি কুণ্ডলিনী-স্বরূপিণী ছিলেন তাহার প্রমাণ পাইতেছি স্বামী বিজ্ঞানানন্দের শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতার বর্ণনায়। তিনি বলিতেছেনঃ "আমি তখনো মাকে দেখিনি, দেখতে গিয়েছি। মা উপরে রয়েছেন, আমি নিচের তলায় বসে। আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল।" আবার শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ-কালে "একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো পা থেকে মাথা অবধি চলে গেল"—এ অনেকেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

অর্থাৎ দাঁড়াইল—শ্রীমা একাধারে গুরু, সরস্বতী এবং মূলাশক্তি। তিনে এক, একে তিন। সরস্বতী ও মূলাশক্তি রূপ তাঁহার দৈবী সত্তার ক্ষেত্র ; গুরু তাঁহার লৌকিক জগতে পারমার্থিক ভূমিকা। আবার তিনি জননীও। তাঁহার এই চারটি রূপই সত্য। এবং এই চারটি রূপকে বিভাজন করা যায় না। কারণ একটিতে অপরটি অথবা অপরগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। শ্রীমায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিয়াছেনঃ "এগুলি তাঁহার দেহমন অবলম্বনে প্রকাশিত একই অখণ্ড মহাশক্তির বিচিত্ররূপ। এই অখণ্ড শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করা চলে

না। ... (কারণ) আমাদের সসীম বুদ্ধি অসীমকে ধরিতে পারে না। আমাদের ধারণাশক্তির অক্ষমতাবশতঃ আমরা শ্রীমাকে জননী, গুরু, দেবী ইত্যাদির অন্যতম রূপে ভাবিতে চেষ্টা করি ; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, এই লোকাতীত জীবনে গুরু, দেবী ও মাতা—এই ত্রিবিধ রূপই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। যখনই আমরা তাঁহাকে জননীরূপে পাই, তখনই আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে তাঁহার অমোঘ জ্ঞানদায়িনী শক্তি ; যখনই তাঁহাকে দেখিতে চাই গুরুরূপে, তখনই তিনি মাতৃরূপে আমাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লন ; আবার গুরু ও জননীরূপে তাঁহাকে ধরিতে গিয়া দেখি তিনি সমস্তের ঊর্ধ্বে দেবীরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।" বস্তুতঃ শ্রীমায়ের গুরুশক্তির অনুধ্যানকালে তাঁহার পরম্পরাপেক্ষ ঐ ত্রিবিধ শক্তির কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

গুরুকে বলা হয় পথপ্রদর্শক। গুরু শিষ্যকে যথার্থ পথে পরিচালিত করেন। সিদ্ধগুরু তাঁহার ইচ্ছামাত্র যেকোন শিষ্যের সম্মুখে মুক্তির দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না। কারণ তাহা হইলে শিষ্যের যোগ্যতার বিকাশ হইবে না। তাই তাঁহারা কঠোর সাধনা ও তপস্যার মাধ্যমে, আপন পুরুষকার প্রয়োগের দ্বারা শিষ্যকে মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও তাহাই দেখি। শুধু ইচ্ছায় নয়, দৃষ্টিপাতমাত্র শিষ্যের জন্ম-জন্মান্তরের অজ্ঞানগ্রন্থিকে মোচন করিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষমতার প্রয়োগ তিনি করেন নাই। তাঁহার ভাব ছিল এইঃ আগে আত্মকৃপা, অতঃপর গুরুকৃপা। আগে পুরুষকার, অতঃপর দৈব। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলিতেছেনঃ "সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কভু না মিলে। চন্দন না ঘষলে কি গন্ধ বের হয় বাবা?" তবে অধ্যাত্মজীবনের শেষের কথাটি যে কৃপা—ঈশ্বরকৃপা, প্রকৃত আর্তি দেখিলে তিনি তাহা জানাইয়া দিতে ভুলিতেন না। একজন সন্ন্যাসী সন্তান তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ "কি করে ভগবান লাভ হয়? পূজা, জপ, ধ্যান—এসবে হয়?" শ্রীমা বলিলেনঃ "কিছুতেই না।" সন্তান আবার প্রশ্ন করিলেনঃ "কিছুতেই না?" শ্রীমা আবার উত্তর দিলেনঃ "কিছুতেই না।" সন্তান পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "কিছুতেই না?" এবারও শ্রীমা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেনঃ "কিছুতেই না।" তখন সন্তান বলিলেনঃ "তবে কিসে হয়?" শ্রীমার নিষ্কম্প উত্তরঃ "শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে ধ্যান-জপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা জপ ধ্যান এসব করতে হয়। [কারণ সাধনা না থাকিলে কৃপা আসে না। সাধনার ফলেই কৃপার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়।] যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।"

শ্রীমা একটি অসাধারণ কথা বলিলেনঃ "নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।" সংসারগতির মূল হইল বাসনা, বৌদ্ধ পরিভাষায় 'তন্হা'। আমাদের সকল সাধনা, সকল তপস্যার লক্ষ্য হইতেছে বাসনার ক্ষয়, বাসনার নিবৃত্তি। আর তাহা হইতেই হয় তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষলাভ। আচার্য শঙ্কর 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন ; "বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ"—বাসনার প্রকৃষ্টরূপে বা নিঃশেষে ক্ষয় হইতে আসে মোক্ষ। মোক্ষলাভ হইলে সংসারগতির নিরোধ ঘটে। শ্রীমা বলিতেছেনঃ "বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরোয় না। বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়।" তাই তাঁহার উপদেশঃ "এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়।"

এখানে তিনি আবার একটি মূল্যবান কথা বলিলেনঃ "প্রার্থনা করতে হয়।" প্রার্থনার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া থাকে যে ভাবটি তাহা হইতেছে অবনতি বা বিনয়। সাধনা, অধ্যবসায় ইত্যাদি প্রয়োজন, কিন্তু তাহাই সব নহে। তাহার পরেও কথা থাকিয়া যায়। সেই কথা—শরণাগতি। "নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু"—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি ইহার নাম দিয়াছেন 'ঈশ্বরপ্রণিধান'—

ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ। অত্যন্ত সরল ভাষায় শ্রীমা বলিলেনঃ "এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।"

সঙ্কীর্ণতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, অপরের দোষ-দৃষ্টি শুধু নিজের জীবনেই নহে, আশেপাশের সকলের এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমগ্র জগতের মানুষের জীবনে মহা অকল্যাণ ও অনর্থ ডাকিয়া আনে। আচার্য শ্রীমা তাই বলিলেনঃ "ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক একজনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা কালো, লাল নানারকমের পাখি এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকেই আমরা পাখির বোল বলি—একটাই পাখির বোল, আর অন্যগুলো পাখির বোল নয়, এরূপ বলি না।" জগতের উদ্দেশে তাঁহার অন্তিম বাণীও ছিল তাহাইঃ "যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।"

ইহা তাঁহার বাণীমাত্র ছিল না। ইহা ছিল তাঁহার আপন জীবনচর্যার মন্ত্র, তাঁহার ধ্যানের উপলব্ধি। ইহাই ছিল তাঁহার জীবন। সেই জীবনই ছিল তাঁহার বাণী।

এই জীবন তাঁহাকে জগৎগুরুদের উপলব্ধ একত্বদর্শন বা ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার সেই উপলব্ধি হইতেই তিনি বলিয়াছিলেনঃ "সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদী ডোমের মাঝেও তিনি।" সেই উপলব্ধির আকার কি ছিল তাহা তাঁহার নিজের মুখেই শুনিঃ "একটা ডেয়ো পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মারবে। দেখলুম কি তা জান? দেখলুম সেটা পিঁপড়ে তো নয়—ঠাকুর, ঠাকুরের সেই হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই।—রাধিকে আটকালুম।"

শ্রীমা ছিলেন সদ্‌গুরু। কোটির মধ্যে একটি-দুটি সদ্‌গুরু মিলে যিনি বা যাঁহারা আপন শক্তিতে সকল আশ্রিতকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্য রাখেন। শ্রীমায়ের কণ্ঠে সেই অঙ্গীকার আমরা শুনি। তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাদের তিনি আশ্রয় দিয়াছেন তাহাদের একজনেরও মুক্তি অবশিষ্ট থাকিতে তাঁহার 'ছুটি' নাই। গীতায় যেমন জগদ্‌গুরু ভগবান বলিয়াছেনঃ "ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"—আমার আশ্রিতের বিনাশ নাই। শ্রীমাও তেমনি পরম দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ "কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।" একবার দূর-দেশ হইতে একজন দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীমায়ের তখন শরীর খুব অসুস্থ। স্বামী সারদানন্দের নির্দেশে তাঁহার দর্শন বন্ধ। তাই সেবক লোকটিকে বাধা দিয়াছেন। লোকটিও নাছোড়বান্দা। ফলে উভয়ের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হইল। গোলমাল শ্রীমায়ের কানে পৌঁছিয়াছে। অকস্মাৎ অসুস্থ শ্রীমা আলুথালু-ভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বিরক্তভাবে সেবককে বলিলেনঃ "কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?" সেবক বলিলেনঃ "শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন। অসুস্থ শরীরে দীক্ষা দিলে আপনার শরীর আরও খারাপ হবে।" শ্রীমা বলিলেনঃ "শরৎ কি বলবে? আমাদের ঐ জন্যেই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।" এই দুইটি ক্ষেত্রেই তাঁহার গুরুভাব ও দেবীভাবেরই বিশেষ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

বস্তুতঃ আশ্রিতের প্রতি দয়ায়, করুণায় তিনি এইভাবেই 'আত্মহারা' হইয়া যাইতেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তখন গুরু, দেবী সকল ভাবকে ছাপাইয়া, সকল কিছুকে ছাড়াইয়া যে ভাবটি তাঁহাকে অধিকার করিত তাহা হইল তাঁহার মাতৃভাব। তিনি বলিতেনঃ "আমি গুরু নই।... আমি মা, সকলের মা।" গুরু, দেবী সকল গণ্ডিকেই তিনি তখন যেন ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতেন; তখন তিনি শুধুই মা।

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বিবাহ

ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী

অবতার-জীবনে সহধর্মিণী-প্রসঙ্গ আলোচনা করলে আমরা দেখি রাজকুমার গৌতম দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভের প্রেরণায় সুন্দরী যুবতী স্ত্রী যশোধরা ও শিশুপুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করে কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। রামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতা ভারতে আদর্শ মহীয়সী মহিলা। তিনি ছিলেন নিষ্কলঙ্কা, সতীসাধ্বী, রামৈকগতপ্রাণা। কিন্তু প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র তাঁকে অগ্নিপ্রবেশরূপ ভীষণ পরীক্ষা এবং পরিশেষে নির্বাসিতা করেছিলেন। শঙ্করাচার্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। শ্রীচৈতন্য তাঁর যুবতী-ভার্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। উত্তরজীবনে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর দর্শনেও বঞ্চিত হয়ে পাদুকাপূজা মাত্র সম্বল করে কঠোর কৃচ্ছ্রতায় জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু কি অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে? 'ত্যাগীর বাদশা' শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু যে বিবাহিত হয়েছিলেন তাই নয়, নিজে উপযাজক হয়ে পাত্রীর সন্ধানও বলে দিয়েছিলেন। "জয়রামবাটীতে রাম মুখুজ্জের মেয়েটি 'কুটো' বেঁধে রাখা আছে।" দেবোদ্দেশে সর্বাঙ্গসুন্দর ফল কুটো বেঁধে অর্থাৎ চিহ্নিত করে রাখা হয়। মাতা চন্দ্রমণি দেবী যখন জানলেন দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে কনিষ্ঠপুত্র গদাই জগৎ সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অনন্যমনে জগন্মাতার ধ্যানপূজাদিতে সদামগ্ন, তখন চিরাচরিত প্রথায় তিনি স্থির-সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিবাহবন্ধনই উন্মনা-পুত্রকে বশে আনার একমাত্র কৌশল। অতএব পাঁচ বছর বয়সের শিশুকন্যা সারদার সঙ্গে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শুভপরিণয় সম্পন্ন হলো। বিবাহের পর কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করে 'জগদম্বার বালক' গদাধর পুনরায় তাঁর মাতৃসাধনার অতলতলে অবগাহন করলেন। দিন যায় রাত্রি আসে। সে দিব্যোন্মাদ বৈরাগ্যোজ্জ্বল সাধকের বিরামবিহীন সাধনার কোন ছেদ নেই, ঃ-সংসারের কোন হুঁশ নেই। প্রায় সর্বদা গভীর ধ্যানতন্ময়তায় নিমজ্জিত থাকেন।

এদিকে কালের আবর্তনে শিশুবধূ সারদা নবযৌবনসম্পন্না হয়েছেন। জয়রামবাটীর প্রতিবেশিনীরা 'সারু'র পাগল স্বামীর কথা নিয়ে কানাকানি করে। ব্যথিতা শঙ্কিতা সারদা চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে পিতার সঙ্গে সুদীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম করে দক্ষিণেশ্বরে পদার্পণ করেন। পরম আশ্চর্যের কথা, রামকৃষ্ণ শুধু যে সারদাকে সাদর আহ্বানই করলেন তাই নয়, পরন্তু মনে হলো তিনি যেন তাঁর শুভাগমনের জন্য সাগ্রহে কতকাল ধরে প্রতীক্ষা করছিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কোন ঘটনাই তাৎপর্যবিহীন নয়। জগদম্বার অঙ্গুলিহেলনে ঘটনা-পরম্পরা অনুষ্ঠিত হয়, একথা তিনি জানতেন বলেই বহুবার বলেছেনঃ "আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হলো বল দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্য হলো? পরনের কাপড়ের ঠিক নাই, আবার স্ত্রী কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈদান্তিক গুরু তোতাপুরীজী তাঁকে বলেছিলেনঃ "স্ত্রী নিকটে থাকলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এখন জগন্মাতার ইচ্ছায় ঐ তত্ত্বের সত্যতা নিজজীবনে পরীক্ষা করতে অগ্রসর হলেন। দক্ষিণেশ্বরে সারদা উপস্থিত হলে তিনি স্বীয় পরিণীতা বধূকে পরীক্ষামানসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি আমায় সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ?" লৌকিক অর্থে শিক্ষাদীক্ষাহীনা ঐ সরলা গ্রাম্য বালিকা সগর্বে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন যে, তাঁকে সংসারের পথে টেনে নিতে তিনি আসেননি, বরং তাঁর ইষ্টপথে সাহায্য করতেই এসেছেন। এত সহজ সরল স্বার্থহীন জবাব শুনে মনে হয় ঐ অল্পবয়সেই সারদা স্ব-স্বরূপ, তাঁর অপূর্ব

দেবমানব স্বামীর স্বরূপ, জগতে কোন্ আরব্ধ আদর্শ প্রচার করতে তাঁদের যুগল আবির্ভাব—এসকল গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শয়নকক্ষেই সারদার শয়নের ব্যবস্থা হয়। প্রায় আটমাস কাল উভয়ে একশয্যায় অতিবাহিত করেও তাঁদের একক্ষণের জন্যও দেহ-ভোগলালসা বা কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়নি। সারদা এই সময়ের কথা স্মরণ করে উত্তরকালে স্ত্রীভক্তদের কাছে বলতেন ঃ "সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়। কখনো ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এইরকম, সমস্ত রাত!" নবপরিণীতা স্বামী-স্ত্রীর সারারাত এইভাবে দেহবোধ বিরহিত হয়ে অধ্যাত্মচিন্তায় অতিবাহিত করা এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। সমাজে মানুষের মধ্যে ভোগস্পৃহা যখন তুঙ্গে, নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, নারীর অবমাননা যেখানে প্রাত্যহিক ঘটনা, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর দেহভাব বর্জিত, কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমসম্পর্কের দিব্যলীলা অচিন্ত্যনীয়, অকল্পনীয়। সত্য কথা বলতে কি, তাঁদের বিবাহ অলৌকিক, অলৌকিক তাঁদের দেহভাব বিরহিত প্রেমলীলাও। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' নামক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর দিব্য প্রেমলীলার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ঘটনাটি এরূপ ঃ "জনৈক উৎকলদেশীয় পণ্ডিত শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য নিজের এক বন্ধু ডেপুটিকে সঙ্গে লইয়া জয়রামবাটীতে গমন করেন, মার পিত্রালয়ের বহির্বাটীতে বসিয়া দুই বন্ধুতে কথাবার্তা হইতেছে ; ডেপুটি প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, একথা কি আপনার বিশ্বাস হয় যে, ঠাকুরের সঙ্গে মার কোনদিন সঙ্গম হয় নাই?' উভয়ের মধ্যে বিষয়টি নিয়া আলোচনা চলিয়াছে, এমন সময় মা হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, তোমরা কি বলাবলি করছ?—ঠাকুরের সঙ্গে আমার 'সঙ্গম' হয়েছে কিনা? (হৃদয়ে হাত দিয়া দেখাইয়া) আমার সঙ্গে ঠাকুরের নিত্য, অহর্নিশ সঙ্গম হচ্ছে।"

বর্তমান যুগের সমাজদর্পণে তাঁদের পরিণয় এক বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। দেহভোগসর্বস্ব মানবসমাজে এই দেবদম্পতি দেখিয়ে গেলেন বিবাহিত জীবনে পবিত্রতা ও সংযমের পরাকাষ্ঠা।

স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে একথা আমরা আজকাল একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি! নব্য ভারত-ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্যই লোকগুরু ঠাকুরের বিবাহ, তাঁহার জীবনের সকল কার্যের ন্যায় বিবাহরূপ কার্যটাও লোককল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।" শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তিনি বিবাহিত জীবনে যে সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন, দুর্বল মানুষের পক্ষে সেটি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য বলেছিলেন, "এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস।"

দীর্ঘ আট মাসকাল একত্রে বসবাস করেও যখন তাঁদের উভয়ের মনে কোন ভাববিকার উদ্রেক হওয়া তো দূরের কথা, অহর্নিশ সমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন লীন হয়ে থাকত—তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান করলেন। নিজ পরিণীতা স্ত্রীকে সকল কল্যাণের আধার চিন্ময়ী জগন্মাতৃরূপে আরাধনা করে তাঁর সকল সাধনার ফল দেবী সারদাদেবীর চরণে সমর্পণ করলেন। সার্থক পূজক ও পূজ্যা—উভয়েই তখন সমাধিস্থ! আমরা জানি, হিমশিখর হতে গঙ্গাবতরণের সময় বিপুল জলোচ্ছ্বাসের দুর্দমনীয় বেগ একমাত্র সর্বত্যাগী মহাতপস্বী শঙ্কর ধারণক্ষম ছিলেন। সেরূপ মহাতাপস জ্বলন্ত পাবকসদৃশ শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী নিরন্তর সর্বধর্মসাধনার সুতীব্র বেগধারণের মহাশক্তি সারদাদেবীর ছিল এবং সে-শক্তি তিনি সকলের অলক্ষ্যে পরমপুরুষের সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে অর্জন করেছিলেন। যেমন কোন সুযোগ্য ভাস্কর প্রতিক্ষণের সুদক্ষ শিল্পচাতুর্যে মনোময়ী প্রতিমা গড়ে তোলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেরূপ স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ না করে তাঁর সুপ্ত দেবীত্ব উদ্বোধিত করে জগৎসমক্ষে

নারীর বাসনালেশমাত্রহীনা মাতৃভাবের সুমহান আদর্শ স্থাপন করলেন। নিভৃতে অতিযত্নে যে অপরূপা মাতৃমূর্তি তিনি তৈরী করছিলেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কে-ই বা চিনেছিল? প্রকৃত জহুরীই জহরের মর্যাদা দিতে পারেন, অন্যে পারে না।

উত্তরকালে কেবল বাংলার নয়, ভারতের নয়, সমগ্র জগতের অগণিত মানুষ সেই পূতস্বভাবা কল্যাণময়ী, স্নেহপ্রেমময়ী সারদাদেবীর ভাস্বর ভাবমূর্তি দর্শন করে বিস্ময়-বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হয়েছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবন ছিল সেবা ও ত্যাগের আদর্শে ভরা শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সন্নিকটে নহবতে বাস করেও সারদাদেবী অনেক সময় দিনের পর দিন তাঁর পুণ্যদর্শনে বঞ্চিতা থাকতেন। কিন্তু তাঁর কোন অভিযোগ ছিল না, 'নিজস্ব' বলে কোন অধিকারবোধ ছিল না। তিনি মনে করতেন, এমনকি ভাগ্য করেছি যে, রোজ রোজ তাঁর দেখা পাব? অথচ তিনি তো তাঁর স্বামী, তাঁতে তাঁরই সর্বাধিক অধিকার। এতই নিরভিমানিনী ছিলেন সারদাদেবী। শ্রীশ্রীমা একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।' স্ত্রীকে একবার অনবধানবশতঃ 'তুই' বলে অস্বস্তিতে একটি নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ! তাঁদের পরস্পরের সেই শ্রদ্ধা ও প্রেমের সম্পর্ক মলিনচিত্ত আমরা কতটুকু ধারণা করতে সমর্থ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর বিবাহ ও তাঁদের কামগন্ধহীন বিবাহিত জীবনের অপূর্ব আদর্শের আলোচনা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রীপুরুষের বিবাহিত জীবনে আজ সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হতে চলেছে। বিবাহের কয়েক মাস পরেই বিবাহের 'পবিত্রবন্ধন' বিবাহবিচ্ছেদ বা বধূহত্যায় পর্যবসিত হচ্ছে। পরিবর্তিত জটিলতর সমাজব্যবস্থা, তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতা ও ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধাপ্রেমহীনতা দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি ও অনিশ্চয়তার মূল কারণ। ক-জন দম্পতি দেহক্ষুধার সীমা অতিক্রম করে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হতে পারেন? ক-জন স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য থেকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শিক্ষা ও প্রেরণা দেবার কথা চিন্তা করতে পারেন? নারী যেন ভোগ্যপণ্য, জীবনের অন্যান্য চাহিদার মধ্যে আর একটি চাহিদা মাত্র। অন্যপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার নামে স্ত্রীরাও আজ স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিবাহ ভারতীয় আদর্শে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নয়, বিবাহ একটি পবিত্র সম্পর্কের সেতু। ভিন্ন দুটি দেহমন হৃদয় পারস্পরিক সেবা শ্রদ্ধা প্রেমের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে অভিন্নতালাভ করে, শান্তি ও আনন্দধারায় জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। বর্তমানে বিবাহের পবিত্রবন্ধন হয়েছে শিথিল, উচ্চ আদর্শ হয়েছে ধূলায় লুণ্ঠিত। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা-দেবী এযুগে বিবাহিত জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেলেন। দেখিয়ে গেলেন সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষ উভয়ের শিক্ষা ও মানসিক অগ্রগতি সমান্তরালভাবে হওয়া একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়। নারীশক্তিকে অবহেলিত পদদলিত করে গৃহে শান্তি সমৃদ্ধির আশা আকাশকুসম কল্পনামাত্র। বৃহত্তর সমাজও রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীশক্তিকে যথোচিত সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার না দিলে সমাজের পরিকাঠামো ধ্বংস হতে বাধ্য। সর্বোপরি, মনে রাখতে হবে নারী সন্তানের জননী। মাতৃহস্তে আছে সচ্চরিত্র সন্তানের ভাবীজীবনের চাবিকাঠি, পবিত্র সুসংযত দম্পতিই শৌর্যবীর্যবান, চরিত্রবান, তেজস্বী সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। বীর্যহীন সংযমহীন পিতামাতার পক্ষে সচ্চরিত্র দৃঢ়চিত্ত বলিষ্ঠ উন্নতশির পুত্রের জন্মদান সম্ভব নয়। ঐ হীনবীর্য বা অসচ্চরিত্র সন্তানসন্ততি দ্বারা গৃহে ও সমাজের কোন্ কল্যাণ সাধিত হবে?

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন নিঃসন্দেহে যুগপ্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছে বর্তমান ও ভাবী দিনের ভারত তথা পৃথিবীকে এক নতুন আদর্শের সন্ধান দিতে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারীসমাজ

ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল

পাশ্চাত্য সমাজে সর্বত্র নারীদের প্রাগ্রসর ভূমিকা দেখে স্বামীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মনে এই প্রত্যয় জাগে যে, যতক্ষণ না এদেশের নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হচ্ছে ততক্ষণ পতিত ভারতের কোন উন্নতির সম্ভাবনা নেই এবং তার জন্য প্রথম প্রয়োজন ভারতীয় নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার।

আমাদের নারীদের অশেষবিধ সমস্যা আছে। বাল্যবিবাহ, [illegible] বৈধব্যের কঠোর বিধিনিষেধ, অসংখ্য কুসংস্কারের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে থাকা, সর্বপ্রকার স্বাধীন ইচ্ছা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত চিরদাসীত্বদশা ইত্যাদি। স্বামীজীর মতে, এসব সমস্যার মূলেই আছে নারীদের শিক্ষাহীনতার সমস্যা। তাই তিনি বললেনঃ মেয়েদের শিক্ষিত কর, তাদের চিন্তা ও বিচারশক্তি জাগ্রত কর, বিশ্বসংসার ও বিশ্বের নারীসমাজের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটুক, ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তাকেও তারা আয়ত্ত করুক। তা হলেই তাদের সব সমস্যাই তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে। পুরুষদের কৃত সমাধান তাদের পক্ষে কল্যাণকর না-ও হতে পারে। তারা শিক্ষার আলোকে, জ্ঞানের আলোকে জেগে উঠুক, সব সমস্যার গিঁঠ তারা নিজেরাই খুলতে পারবে। এবং সেই সমাধানই হবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে হিতকর। তাই প্রথম কর্তব্য, নারীসমাজকে জাগ্রত করা, শিক্ষায় দীক্ষায় মুক্ত বিচারবুদ্ধির আলোকে তাদের জাগানো। তখন তারা নিজেদের পক্ষে যা সর্বাধিক শ্রেয়স্কর ও কল্যাণকর, তা নিজেরাই স্থির করবে, তার জন্য পন্থা-পদ্ধতিও নিজেরাই নিরূপণ করবে। শুধু সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের শিক্ষার আলোক দান করা।

সাধারণ নিম্নবর্গের জনগণের অভ্যুদয় সম্বন্ধেও স্বামীজী ঐ একই পন্থার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আগে তাদের শিক্ষিত করে তোল। তা হলেই জাতিভেদ ও অন্য সব সামাজিক কুপ্রথার সমাধান তারা নিজেরাই করতে পারবে। শিক্ষা তাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করুক, মনকে জাগ্রত করুক, চিত্তকে আলোকিত করুক, বুদ্ধিকে দৃঢ়নিষ্ঠ করুক; শিক্ষার সাহায্যে স্বদেশকেও যেমন, বিশ্বকেও তেমনি জানুক তারা। তখন তাদের সমস্যা নিয়ে আর কারো মাথা ঘামাতে হবে না, তারা নিজেরাই সেসব সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারবে।

ভারতের অগ্রগতির জন্য দুই পিছিয়ে থাকা অবহেলিত জনসমষ্টির—নারীসমাজ ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের--উন্নয়ন যে সর্বাগ্রে আবশ্যিক, সেকথা স্বামীজী তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী-বর্গকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উৎকণ্ঠিত নির্দেশ ছিল, এদের উন্নতি সর্বাগ্রে সুনিশ্চিত করতে হবে, এবং সেজন্য চাই এদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন। এদের সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই এবং সেজন্য সমাজসংস্কারের প্রয়াসও নিষ্প্রয়োজন। বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ বা চাপানো সংস্কার কেবল নিষ্ফলই নয়, তা সমস্যাকে জটিলতর করতে পারে। যাদের সমস্যা তাদেরকেই সমাধান করতে দাও। এদের শিক্ষিত করে তুললেই এদের সব সমস্যার এরা নিজেরাই যথোপযুক্ত সমাধান করতে পারবে। কতটা রাখতে হবে, কতটা বর্জন করতে হবে, কতটা যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত করতে হবে, তা তারাই ভাল বুঝবে। শুধু তাদের বোঝার ক্ষমতাটা, বিচারের ক্ষমতাটা জাগ্রত কর, তাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দাও। "Hands off!" বলেছেন স্বামীজী। তোমরা পুরুষেরা ও উপর-

তলায় মানুষেরা দূর হটো। ওদের কল্যাণের পথনির্দেশ করতে এস না। সেটা ওরাই সবচেয়ে ভাল পারবে। শুধু তোমাদের যা সাধ্য ও করণীয়, তাই কর। ওদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাও, ওদের শিক্ষিত, জাগ্রত করে তোল।

স্বামীজী তাঁর রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে, ভগিনী নিবেদিতার তত্ত্বাবধানে, নারীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। সেই রক্ষণশীল যুগে এ প্রয়াসের প্রভাব ও সাফল্য উল্লেখযোগ্য হলেও সুদূরবিস্তারী হয়নি। তবে পরবর্তী কালে, বিশেষ করে বৃটিশ অধীনতাপাশমুক্ত বিগত চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরে স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি হয়েছে এদেশে। স্ত্রীশিক্ষা এখনো সর্বত্রগামী না হলেও স্বাধীনতাপূর্ব যুগের তুলনায় তা যে যথেষ্ট চোখে পড়বার মতো হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন আমাদের মেয়েরা বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, ব্যারিস্টার হচ্ছেন, উচ্চন্যায়ালয়ে বিচারক হচ্ছেন, বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য, মন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রভৃতি পদেও বৃত হচ্ছেন। দশ বৎসরের অধিককাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন একজন নারী—ইন্দিরা গান্ধী। শিক্ষিত মেয়েদের জয়যাত্রা আমরা সর্বত্র নিরীক্ষণ করছি। মেয়েরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন। এটা এতই প্রত্যক্ষ সত্য যে, কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। এবং শুধু উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের সর্বস্তরে তা বিস্তার লাভ করছে এবং আর এক দশকের মধ্যেই হয়তো ভারতের নারীমাত্রের কাছেই শিক্ষার আলোক পৌঁছে যাবে। 'অশিক্ষিত নারীসমাজ' কথাটাই অবাস্তব হয়ে পড়বে।

এসবই ভাল কথা। তবু একটা প্রশ্ন থাকে। মেয়েদের মধ্যে আলোকপ্রাপ্তা শ্রেণী যখন সংখ্যায় ও গুরুত্বে আর নগণ্য নয়, তখন জিজ্ঞাস্য, তাঁরা কি নিজেদের সামাজিক সমস্যাগুলি নিজেরাই সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন? স্বাধীন ভারতে নারীসমাজের প্রায় সর্ববিধ সামাজিক বৈষম্য আইন করে দূর করা হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা, রুজি-রোজগার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, পুনর্বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ—সর্ববিধ ক্ষেত্রেই মেয়েদের অধিকার আজ স্বীকৃত ও আইনসিদ্ধ। যথেষ্ট সংখ্যক নারী এইসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণও করছেন। আমাদের সমাজে সেকারণে একটা রূপান্তরও যে ঘটছে, তাও লক্ষ্যগোচর। কিন্তু স্বামীজী যেমন বলেছিলেন, মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠলেই তাদের নিজেদের সমস্যা তারা নিজেরাই সর্বোত্তমরূপে সমাধান করবে, তার কতদূর কি দেখছি?

এই যে সব নরনারীর অধিকারসাম্যের আইন, যা স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নিবদ্ধ হয়েছে এবং যা মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সর্বপ্রকার স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করেছে—তা কি মেয়েরা নিজেরাই সংবিধানে সুব্যবস্থিত করেছেন? নিশ্চয়ই নয়। আমাদের সংবিধান-রচয়িতাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই বা ততোধিক ছিলেন পুরুষ। এবং এই পুরুষরাই নারীর জন্য এইসব সার্বিক স্বাধীনতা ও প্রগতির ব্যবস্থা আইনের বিধানে সংরক্ষিত করে বহুযুগবাহিত নানা অবিচার ও অসাম্য থেকে তাদের মুক্তি সুনিশ্চিত করেছেন। মেয়েরা নিজেরা এসব সুব্যবস্থিত করেননি বটে, তবে নারীরাও এই নববিধানরাজির সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করে, তাঁদের জীবনকে নূতন ছাঁচে ঢেলে সাজাচ্ছেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ যে হারে বাড়ছে তা থেকেই প্রমাণিত যে, মেয়েরা এইসব নূতন বিধানের সাহায্যে পুরনো সামাজিক প্রথা ভাঙতে ও নূতন পারিবারিক বিন্যাস স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহী। এখনো পুরনো দিনের কিছু কিছু সংস্কার রয়ে গেছে—তবে তা ক্রমেই অপসৃয়মাণ। শীঘ্রই যে নূতন ভাবনায় দীপ্তিময়ী, নূতনতর সমাজবিন্যাসে উৎসুক আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় নারী অন্য যেকোন প্রগতিশীল দেশের নারীসমাজের মতোই সর্বক্ষেত্রে সামর্থ্যবতী হয়ে উঠবেন—এটা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু ভারতীয় নারীরা শিক্ষিতা হয়ে তাদের নিজেদের সব সমস্যার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর রূপে সমাধান করবেন—স্বামীজীর এই আশা ও বিশ্বাস

ফলবতী হবার লক্ষণ কি আজও যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর? এই যে এদেশে এত নারীমুক্তির আয়োজন হয়েছে সে-সবই তো প্রায় পুরুষের দ্বারাই ব্যবস্থিত। নারীরা তা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তা পরিণামে তাদের পক্ষে কল্যাণকর না হতেও পারে। হয়তো পুরুষের সঙ্গে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে সর্বপ্রকারে সাম্যবিধানের প্রয়াসের মধ্যে পুরুষ বৈধানিকদের একঝোঁকা স্বভাবই প্রতিফলিত হয়েছে—যে-সামঞ্জস্য ও নমনীয়তা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ হয়তো তার অভাবই এর মধ্যে সূচিত হচ্ছে। কিন্তু আজকের শিক্ষিত নারীসমাজ কি এই আত্যন্তিক সাম্য ও স্বাধীনতার ঢালাও দানসাগরের মধ্যে কিছু কি বর্জনীয় বা পরিবর্তনযোগ্য মনে করছেন? সর্বাঙ্গীণ নারীকল্যাণ এসবের দ্বারা কতটা সাধিত হতে পারে এবং কতটা সাধিতব্য নয়, হয়তো বা ক্ষতিকরই, তা কি তাঁরা অনুধাবন বা বিবেচনা করছেন? হয়তো এই সাম্যের কাঠামো ভারতীয় নারীর পক্ষে মূলতঃ অকল্যাণকরই, এরূপ কোন সন্দেহে কি তাঁরা আলোড়িত হচ্ছেন?

কথাটা যে তুললাম তার কারণ আছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর The Master as I Saw Him গ্রন্থে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গে স্বামীজীর কিছু অন্তরঙ্গ ভাবনা তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের 'Woman and the People' শীর্ষক বিংশতিতম পরিচ্ছেদে তাঁর এইসব ভাবনাচিন্তার উল্লেখ আছে। নারী ও নিম্নবর্ণীয়দের ক্ষেত্রে সমাজসংস্কারের নির্দেশ দিতে স্বামীজীর অনীহা ছিল। তিনি বারবার এই কথাই জোর দিয়ে বলেছেনঃ "Only let the women and the people achieve education! All further questions of their fate they would themselves be competent to settle". আগে তাদের শিক্ষিত করে তোল, তাহলে তারা নিজেরাই তাদের ভাল-মন্দ সব প্রশ্ন সমাধান করতে পারবে। কিন্তু নারীদের আদর্শ-শিক্ষার কোন রূপরেখা স্বামীজী ছকে দিয়ে যাননি। তবে, নিবেদিতা বলেছেন, ভারতীয় নারীর চিরন্তন কিছু আদর্শকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, এবং সে আদর্শের অপহ্নব বা বিলুপ্তির সম্ভাবনা তিনি চিন্তাও করতে পারতেন না। এরকম একটি আদর্শ, হিন্দু নারীর সতীত্বের আদর্শ। এক্ষেত্রে কোন dilution বা তরলীকরণ তিনি কল্পনাতেও সহ্য করতে পারতেন না। নিবেদিতা বলেছেন যে, আধুনিকাদের মধ্যে ঐ আদর্শের প্রতিচ্ছবি কোথাও দেখলে তিনি খুব খুশি হয়ে উঠতেনঃ "A modernized Indian woman ... in whom he saw the old-time intensity of trustful and devoted companionship to the husband, with the old-time loyalty to the wedded kindred was still to him 'the ideal Hindu wife'." নিবেদিতা স্বামীজীর ভাবনাকে আরও প্রোজ্জ্বল করেছেন তাঁর এই উক্তির দ্বারাঃ "True womanhood, like true monkhood, was no matter of externals. And unless it held and developed the spirit of true womanhood, there could be no education of woman worthy of the name."

কাজেই ভবিষ্যতের নারীশিক্ষার কোন ছক এঁকে না দিলেও স্বামীজীর মনে তাদের শিক্ষার একটা parameter বা ধ্রুবক ছিলই। সে শিক্ষার অঙ্গ প্রত্যক্ষ যা-ই হোক, তার আদর্শ যেন ভারতীয় নারীত্বের পবিত্র আদর্শের প্রতিবাদী না হয়, এটাই তাঁর একান্ত অভিলষিত ছিল। ভারতীয় বিধবার আদর্শের মধ্যেও তিনি সেই পবিত্র নারী-আদর্শের বিগ্রহ দেখেছেন। নিবেদিতা বলছেনঃ "With all his reverence for individuality, he had a horror of what he called the unfaithful widow. 'Better anything than that!' he said and felt." হিন্দুবিধবার ব্রতনিষ্ঠ আনুগত্যের আদর্শটি স্বামীজীর কাছে ত্যাগ ও পবিত্রতার প্রতীকরূপে চিহ্নিত ছিল। পাশ্চাত্যেও তিনি বলেছেন যে, হিন্দুর সমাজ ও পরিবারের আদর্শ হলো ত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গপরায়ণতা। হিন্দু বিধবা সেই ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের আদর্শের প্রতিমা। সেই আদর্শের বিসর্জন

বা ব্যভিচার স্বামীজীর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ঙ্কর ছিল। ভারতীয় নারী শিক্ষায় দীক্ষায় ব্যক্তিত্বে আধুনিক ভারতের নারীদেরও অতিক্রম করুক মনেপ্রাণে স্বামীজী চাইতেন, কিন্তু তারা ভারতীয় নারীর ত্যাগ সংযম ও পবিত্রতার আদর্শ বিস্মৃত হবে এটা তিনি ভাবতে পারতেন না। নিবেদিতার কথায়, "The white unbordered sari of the lovely wife was to him the symbol of all that was sacred and true. Naturally then, he could not think of any system of schooling which was out of touch with these things, as 'education'." ভবিষ্যৎ নারীশিক্ষা যে রূপ নিক, তা ঐ ত্যাগ, সংযম ও পবিত্রতার আদর্শের পক্ষে বৈনাশিক হবে না, এইরূপ নির্দেশই স্বামীজী দিয়ে গেছেন। "The frivolous, the luxurious and the denationalized, however splendid in appearance, was to his thinking not educated but rather degraded."—স্বামীজীর শিক্ষা-ভাবনা সম্পর্কে এও নিবেদিতার উক্তি। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে এজাতীয় চপলমতি, বিলাসিনী, জাতীয়-চরিত্র-ভ্রষ্ট বেশ কিছু নমুনা চোখে পড়ছে বলেই, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজীর যে ধ্রুবক তা কোনমতেই ভারতীয় নারীত্বের ত্যাগ, সংযম পবিত্রতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না। এই কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

স্বামীজী আরও চেয়েছিলেন যে, হিন্দুনারী, সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও, ধ্যান-নিবিষ্ট হবার সহজাত ক্ষমতা যেন না হারায়, তার সহজ ধ্যানপরায়ণতা থেকে সে যেন ভ্রষ্ট না হয়। নিবেদিতা বলেছেন : "He could not foresee a Hindu woman of the future, entirely without the old power of meditation. Modern science women must learn but not at the cost of ancient spirituality."

নিবেদিতা বলেছেন, বিবেকানন্দ-অভিপ্রেত আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য সোজাসুজি চাপ দেবে না, তবে তা ভাবীযুগের নারীর মধ্যে অতীত যুগের মহীয়সী নারীদের মহিমা বিকশিত করে তুলবে : "He saw clearly enough that the ideal education would be one that should exercise the smallest possible influence for direct change in the social body as a whole. It would be that which should enable every woman, in time to come, to resume into herself the greatness of all the women of the Indian past."

চিরকল্যাণময়ী সর্বংসহা স্নেহকোমল ভারতীয় মাতৃহৃদয়ের সংগে বীরের দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি সংযুক্ত হবে, ভাবীযুগের ভারতীয় নারীর মধ্যে, এই স্বপ্ন দেখতেন স্বামীজী। বৈদিক যজ্ঞবেদী হতে উদ্ভূতা সাবিত্রীর পবিত্র স্থৈর্য ও নির্ভীকতার সঙ্গে মিলিত হবে দক্ষিণের মলয়সমীরের কোমল মাধুর্য : "The mother's heart, in the woman of the dawning age, must be conjoined with the hero's will. The fire on the Vedic altar, out of which arose Savitri, with her sacred calm and freedom, was ever the ideal background. But with this woman must unite a softness and sweetness as of the south winds themselves."

নারীর শক্তিসামর্থ্যের বিকাশ ও বিস্ফার ঘটুক। "Woman must rise in capacity, not fall." ব্যায়াম, বাগানের কাজ, গৃহপালিত পশুর যত্ন-পরিচর্যা তার শিক্ষার অংগ হোক। কিন্তু ধর্মানুশীলন ও অন্তরের ঐকান্তিক ঊর্ধ্বমুখিতা—এটাই যেন নূতন শিক্ষা-নীতির মর্মবস্তু ও প্রেক্ষাপট হয়। "Religion and an intensity of aspiration . . . were to be the heart and background of this new departure."—স্ত্রীশিক্ষার এই নববিদ্যালয়গুলি যেন প্রতি শীতকালের শেষে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে এবং বছরে ছয় মাস হিমালয়ের কোলে বসে পাঠ গ্রহণ করে। তা হলেই, বিবেকানন্দের মতে, "a race of woman would be created who should be nothing less than the

"Bashi-Bazonks of Religion". And they should work out the problems for women." নব্যশিক্ষিতা ভারতীয় নারী কিরূপ শিক্ষার দ্বারা ইস্পাতের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা লাভ করবে এবং ধর্ম ও নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের মূর্তিমতী বিগ্রহস্বরূপ হয়ে নারীর সমস্যা সমাধানের ভার নেবে—এখানে তার আভাস মেলে। এই জাতীয় নারীরাই কি বর্তমানে নারীসমাজের সমস্যাদি সমাধানে নিযুক্ত আছেন? অথবা আছেন স্বামীজী যাদের 'de-nationalised' ও 'frivolous' মনে করতেন, তাদেরই উত্তরসূরীরা?

যারা নারী-প্রগতি ও নারী-অধিকারের নামে দল বাঁধে, চিৎকার করে, পুরাতন সমাজবিধিকে ভাঙবার জন্য উত্তেজিত বিক্ষোভের আশ্রয় নেয়, স্বামীজী কিন্তু ঐজাতীয়াদের নেতৃত্ব কল্যাণকর মনে করেননি। নিবেদিতা বলেছেনঃ "The growth of freedom of which he dreamt would be no fruit of agitation, clamorous and iconoclastic. It would be indirect, silent and organic." যে পরিবর্তন শুভ ও স্থায়ী, তা হবে নীরবে, পরোক্ষ এবং সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে, কালাপাহাড়ী বিক্ষোভ আন্দোলনের মাধ্যমে নয়।

জাতীয় জীবনের প্রবহমান ধারাটি স্বামীজীর আর্য দৃষ্টিতে সর্বদা স্বচ্ছ প্রতিভাত ছিল। তিনি বলতেন, পুরাতন প্রথাকে সম্মান করেই নূতনের অভিমুখে এগোতে হবে। পুরাতনের মধ্যে বহু মূল্যবান সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা বিস্মৃত হলে চলবে না। পুরাতনের আশীর্বাদপূত হয়েই নূতনের আবির্ভাব ঘটা চাই।

নবযুগের শিক্ষিতা নারীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাশা কিরূপ ছিল এবং ভারতীয় নারী-শিক্ষার parameter বা ধ্রুবক সম্পর্কে তাঁর অনুশাসন বিষয়ে নিবেদিতার স্মৃতিচারণে যে সুস্পষ্ট আভাস মেলে, এতক্ষণ তা-ই বিশদীকৃত করা গেল। এখন বিচার্য, নবযুগের ভারতীয় নারী—স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সার্বিক অধিকার-সাম্যে গৌরবান্বিতা, শিক্ষা ও জীবিকার অজস্র সুযোগধন্যা আধুনিক আলোকপ্রাপ্তাগণ—স্বামীজীর প্রত্যাশা কতটা পূরণ করছেন। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ কি স্বামীজীপ্রোক্ত নারী-শিক্ষার ধ্রুবকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? স্বামীজী যে আশা করেছিলেন, উচ্চশিক্ষিতা ভারতীয় নারী মনে প্রাণে—শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আরও ভারতীয় হবে এবং সমাজসংস্কারের জন্য অতিব্যগ্র হয়ে চিৎকার বিক্ষোভ ও আন্দোলনের পন্থানুসারী হবে না—তাই বা কতদূর সার্থক হয়েছে? এবং যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যে-সনাতন হিন্দুবিধবার ত্যাগ, বৈরাগ্য সংযম ও সতীত্বের আদর্শের কোন অপহ্নব স্বামীজী কল্পনাও করতে পারতেন না, সেই আদর্শ কি শিক্ষিতা ভারতীয় নারীসমাজের কাছে এখনো সুত্য এবং সমাদৃত? আধুনিক শিক্ষিতারা কি এখনো সেই চিরন্তন ত্যাগ তিতিক্ষা তপশ্চর্যার আদর্শে শ্রদ্ধাবান আছেন? অথবা যে-আদর্শ তাদের চিত্ত থেকে উন্মূলিত এবং নারীত্বের কোনরূপ আদর্শের প্রতিই তাঁরা এখন আর শ্রদ্ধাবান নন?

স্বামীজী বলেছিলেন, ভারত যদি তার ধর্মের নোঙর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তার চিরন্তন স্বভাবের হয়ে আধ্যাত্মিকতাকে তার জীবনধর্মরূপে আর গণ্য না করে, এবং রাজনীতি বা ঐরূপ কোন কিছু পাশ্চাত্য জীবনাদর্শকেই তার জীবনধর্মরূপে গণ্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে তা পরিণামে নিয়ে আসবে জাতীয় মৃত্যু ও ধ্বংস। আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় জনজীবনে স্বামীজীর সেই সাবধান-বাণীর প্রতি আমরা কতটা মর্যাদা দিচ্ছি, কিংবা একেবারেই দিচ্ছি না? বিজাতীয় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে, রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদিকেই একান্তরূপে আঁকড়ে ধরে দিগ্‌ভ্রষ্ট উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমরা কি সর্বনাশের দিকেই এগিয়ে চলছি না?

এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন। নারীর মধ্যেই সমাজের উচ্চতম আদর্শগুলি সঞ্জীবিত ও সংরক্ষিত থাকে। তারাই তাকে লালিত বর্ধিত করে সমাজদেহে চিরজাগ্রত রাখে। আমরা পুরুষেরা জাতীয় আদর্শ বিস্মৃত হয়ে, নারীদেরও সেই আদর্শহীনতা দ্বারা কি সংক্রামিত

করছি না? নারীস্বাধীনতা আমরা সুনিশ্চিত করেছি, খুব ভাল কথা। কিন্তু নারীশিক্ষার কোন বিশেষ আদর্শ, কোন স্বতন্ত্র আদর্শ, যা ভারতীয় ঐতিহ্যসম্মত এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য বহু মনীষী ও মহাপুরুষ দ্বারা অভিলষিত ও আভাসিত, সেরূপ কিছু কি আমরা সুব্যবস্থিত করেছি? আদৌ সেরূপ কিছু কি নির্ধারিত করেছি আমরা? অথবা, বিন্দুমাত্র চিন্তা ব্যয় না করে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে গা ভাসিয়ে দিয়েছি? এটাই কি বিষণ্ণ সত্য নয়? পাশ্চাত্য আদর্শই এখন বিশ্বের সর্বত্র গৃহীত সর্বদৈশিক আদর্শ!

কিন্তু পৃথিবীর আর সকলে সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করেছে বলেই আমরাও যদি তাই করি, তাহলে আমরা কি স্বামীজী-উচ্চারিত সাবধানবাণী বিস্মৃত হয়ে আত্মঘাতী মূঢ়তায় ভারত-আত্মার বিনাশেই উদ্যত হচ্ছি না? এই মারাত্মক প্রশ্ন, জাতি হিসাবে বাঁচা-মরার এই প্রশ্ন, আজ মিশরীয় উপকথার স্ফিংস-এর মতোই আমাদের কাছে উত্তর দাবি করছে। আমরা কি আমাদের ও সর্বমানবজাতির কল্যাণের জন্য আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি বাঁচিয়ে রাখব, কিংবা বিজাতীয় 'Strange Gods', পাশ্চাত্য সংস্কারের মোহে পড়ে, বিজাতীয় ভাবধারায় আবিষ্ট হয়ে, জাতি হিসাবে 'হারাকিরি' করব?

মেয়েরা আজ সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান হবার প্রয়াসে পুরুষের জীবিকা ও কাজকর্ম যেমন গ্রহণ করছে, তেমনি পুরুষের পারুষ্যও তাদের স্বভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে। পুরুষের আদর্শই বহুগুণিত হয়ে সমাজে যদি নারীত্বের আদর্শকে নির্জিত ও আচ্ছন্ন করে ফেলে তাহলে তা ব্যক্তি বা সমাজ কারো পক্ষেই কল্যাণকর হতে পারে না। এই অকল্যাণের চেহারা আজ পাশ্চাত্যের সর্বত্রই কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। আত্মিক ও মানসিক অবক্ষয় ও অশান্তি, কুৎসিত কুরুচি ও মত্ততার অভিপ্রকাশ, গন্তব্য-বিস্মৃত গতিবেগ-মাত্রের উন্মাদনা—এইতো পাশ্চাত্যসমাজের নগ্ন চিত্র। যদি আমরা ভারতীয়রা, আমাদের মহাপুরুষদের বাণী ও নির্দেশ স্মরণ করে নারীত্বের মহত্তর ও সুন্দরতর আদর্শটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি, তাহলে তা পরিণামে সমস্ত বিশ্বেরই আত্মিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সহায়ক হতে পারবে। কিন্তু আমরাও যদি নারীত্বের আদর্শ ও মহিমা বিস্মৃত হয়ে পাশ্চাত্য-অনুসৃত গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে নিরয়গামী হই, তাহলে মানবসমাজকে কেই বা আলোকবর্তিকা দেখাবে, অধ্যাত্মজীবনের মার্গদর্শন করাবে?

স্বামীজী বলেছেন, ভারতীয় নারীর চিরকালীন আদর্শ হলো, ত্যাগ সংযম সেবা ও ব্রতনিষ্ঠা। শ্রী ও সৌন্দর্যের সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধনলব্ধ তেজের দীপ্তি তাদের মণ্ডিত করবে। অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ও ধ্যানপরায়ণতার মহিমা তাদের ঘিরে থাকবে। তারা হবে কল্যাণের প্রতিমা। আজ আমাদের ব্যবস্থিত শিক্ষার চতুঃসীমায় এইসব আদর্শের কোন বাষ্পলেশও কি বিদ্যমান? নারীদের সামনে শিক্ষার যে দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, তা তাদের কোন্ আদর্শের স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে? সে তো কেরানি বা অফিসার বা উকিল ডাক্তার এঞ্জিনীয়র হয়ে টাকা রোজগারের সুমসৃণ পথ। মেয়েরা টাকা রোজগার করে উপকরণবহুল ভোগসর্বস্ব জীবনে দীক্ষিত হচ্ছে। এটাই কি ভারতীয় নারীর আদর্শ? চাকুরে মেয়েরা প্রায়শঃই অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ হচ্ছে। তাদের অনেকেই আজ স্বামী এবং একটি-দুটি সন্তান নিয়ে ছোট ছোট সংসার রচনা করে, অন্য আত্মীয়স্বজন পরিজনের প্রতি সব দায়-দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে শুধু নিজেদের আরাম ও আমোদকেই পরমার্থ মনে করে। গৃহরচনা, সন্তানলালন, আত্মীয় পরিজনের প্রতি স্নেহমমতাশীলতা, সেবাপরায়ণতা—এসব অনেক নারীর কাছেই আজ গৌণ ও নগণ্য হয়ে পড়েছে। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ এইসব নারীর চেতনায় কোথাও কি অস্তিত্বশীল? সে-আদর্শ কি তাদের কদাপিও চঞ্চল করে? উত্তর, 'না'।

ইংরেজ-শাসনের আমলে আমাদের শাসকরা সর্বদাই আমাদের সব জাতীয় আদর্শকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। নিন্দা-ধিক্কারে লাঞ্ছিত

করেছে—যাতে আমরা জাতীয় গৌরবের চেতনায় গর্বিত না হই, সর্বদা হীনম্মন্যতায় ভুগি। তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা তা প্রায় সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছিল। স্বামীজী বলেছেন, ঐ শিক্ষার সবচেয়ে বড় দোষ ছিল, তা আমাদের অতীত ও ঐতিহ্যের প্রতি সব শ্রদ্ধা নির্মূল করে দিত। স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলে এদেশবাসীর চরিত্র ক্লীবত্বে পর্যবসিত হতো এবং তাই পরানুকরণ ও পরপদলেহনই হয়ে উঠত তাদের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। এই শিক্ষাদর্শের আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এবং তিনি ভারতীয় নারীসমাজের জন্য যে শিক্ষাদর্শের স্বপ্ন দেখতেন, তা নিবেদিতার স্মৃতিচারণ থেকে আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু আমরা কি এখনো সেই ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি ধরেই চলছি না? অবশ্যই চলছি। অন্যের লেখায় দাঁগাবুলানো অবোধ শিশুর মতোই অন্ধভাবে তা অনুসরণ করে চলেছি। এবং তার ফল হচ্ছে ঠিক আগের মতোই, বর্তমান শিক্ষার ফলেও, ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে অশ্রদ্ধা আর বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্যরূপ কোন সদর্থক মনোভাব জাগ্রত হচ্ছে না। এর ফলে আমরা যে কেবল আত্মবিস্মৃতই হয়ে আছি তাই নয়, চরমহীনম্মন্যতায় এখনো আমরা আবিষ্ট। এর চেয়ে বড় পাপ আর নেই। এবং এজন্যই আমরা সর্বক্ষেত্রে কেবলই ব্যর্থ হচ্ছি।

বর্তমানে ভারতীয় নারীদের শিক্ষার কাঠামো পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় নর-নারীর অধিকারসাম্যের যুক্তিতেই হয়তো—তাদের অনেকেই আজ ঐ শিক্ষালাভের ফলশ্রুতিতে, ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। এবং এক বিজাতীয় ইহসর্বস্ব ভোগবাদে তারা দীক্ষিত হয়ে পড়ছে। এই শিক্ষিতা আধুনিকাদের ছবি আমরা যেমন আধুনিক গল্পে, উপন্যাসে, সিনেমার পর্দায় দেখতে পাচ্ছি, তেমনি দেখছি বাস্তব জীবনেও। ভোগসর্বস্ব উপকরণবহুলতাই এদের জীবনের মর্মকথা, আরাম ও আমোদ ছাড়া আর কিছু কাম্য নেই এদের। অহঙ্কার তৃপ্তি আর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, এরই দ্বারা এরা নিরন্তর তাড়িত। ত্যাগ সংযম নিষ্ঠার কোন মূল্য নেই এইসব মেয়েদের কাছে। এরা শ্রদ্ধাহীন, তাই কোন গভীর উপলব্ধিও এদের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজীর আদর্শের মানদণ্ডে এরা একেবারেই শিক্ষিত নয়, বরং তার বিপরীত। ভগিনী নিবেদিতা যা লিখেছেন, তা স্মরণীয় : "The frivolous, the luxurious and the denationalized, however splendid in appearance, was to his (i.e. Swamiji's) thinking, not educated, but rather degraded." আজকাল আমাদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষার ফসল অনেক নারীই কি 'frivolous, luxurious' আর 'denationalized' নয়? অবশ্য শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও কথাটি একইভাবে প্রযোজ্য। আমেরিকা এখন আমাদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং সেখানকার ভোগ্যপণ্য আহরণসর্বস্ব বিলাসবহুল জীবনের আকর্ষণ আমাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কাছেই দুর্নিবার হয়ে উঠছে। ভারতীয় জীবন ও আদর্শ এদের কাছে সব অর্থই হারিয়ে ফেলেছে। তাহলে এখন কঃ পন্থাঃ? কথা অনস্বীকার্য যে, গোটা সমাজটাই আজ বহুলাংশে আদর্শভ্রষ্ট এবং ভোগবাদী হয়ে পড়েছে। আমাদের আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থাই সেজন্য অনেকখানি দায়ী। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামীজী যে parameter বা ধ্রুবকের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আমরা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে, স্ত্রীশিক্ষার আয়োজনের কালে তার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি। আমরা চিন্তাভাবনা না করে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকেই আরো ব্যাপকতর করার আয়োজন করেছি। ফলে আমরা এক সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়েছি। এই আদর্শবিচ্যুতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যতা যে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের রূপ নিতে পারে, সে সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ-উচ্চারিত সাবধানবাণী কি এখনো আমরা স্মরণ করব না?

ক্রমবিকাশবাদ ঃ ডারউইন ও বিবেকানন্দ

সুমণি মিত্র

॥ ১ ॥

'ক্রমবিকাশবাদে'র সর্বপ্রথম বিকাশ ডারউইনে নয়—আমাদের যোগ ও সাংখ্যদর্শনে। পাতঞ্জল-দর্শনের 'কৈবল্যপাদে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে 'জীবতত্ত্ববাদ' ও 'ক্রমবিকাশবাদে'র সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। স্বামীজী তারই ভিত্তিতে 'ক্রমবিকাশবাদে'র এক অপূর্ব সৌধ খাড়া করেছেন, অবশ্যই নিজের অভিজ্ঞানের দ্বারা সঞ্জীবিত করে। 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ' ও বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা মারফত তিনি পাশ্চাত্যের কাছে এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করে গেছেন। পাশ্চাত্য পরিণামবাদীরা 'ক্রমবিকাশ' (evolution) বোঝেন, 'ক্রমসঙ্কোচ' (involution) বোঝেন না। তাঁরা অভিব্যক্তিকে স্বীকার করেন—অন্তর্নিহিতত্বকে করেন না ; ফলে, জীব বা জড়ের মধ্যে যা ইতিপূর্বে ছিল না, তার ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেদের অর্বাচীনতা জাহির করেছেন। অসৎ থেকে সৎ-এর আবির্ভাব—এই হলো পাশ্চাত্য 'অভিব্যক্তিবাদে'র সিদ্ধান্ত। কিন্তু যার 'আছে' তার 'নেই' হয় না, যা 'নেই' তার 'আছে' হয় না—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" এই সত্যটা পাশ্চাত্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পারায় তার 'ক্রমবিকাশবাদে'র বিকাশ বিশ্রীরকম ব্যাহত হয়েছে—ফলে পরিত্যক্তও হয়েছে। হবেই।

পাশ্চাত্য 'পরিণামবাদী'রা বলেন—সমস্ত প্রাণীর শরীর অভিন্ন। ক্ষুদ্রতম কীট-পতঙ্গ থেকে মহত্তম মানব পর্যন্ত সকলেই প্রকৃতপক্ষে এক একটি অপরটিতে পরিণত হতে হতে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণতা লাভ করছে। তাঁদের মতে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা', 'প্রাকৃতিক ও যৌন নির্বাচন' এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর ধারণ করতে বাধ্য করে। ডারউইন বলেন—জীবমাত্রই নিজের নিজের যৌনসঙ্গী নির্বাচন করে নেয় (sexual selection) এবং 'জীবনসংগ্রামে' (struggle for existence) 'যোগ্যতম'ই শুধু টিকে থাকে (survival of the fittest)। এ-মত স্বামীজীর দ্বারা চূড়ান্তভাবে খণ্ডিত হয়েছে। স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন—ঐ দুটো প্রক্রিয়া যদি প্রগতির পক্ষে অপরিহার্য হয়, তাহলে বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য প্রভৃতির স্থান কোথায় ? তাঁরা পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নয়—পরকে আপন করেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা,' 'জীবনসংগ্রাম' ও 'যৌন নির্বাচন' প্রাণের নিম্নস্তরে কতকটা প্রযুক্ত হলেও এসবের দ্বারা মানুষের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা চলে না। মানুষের বিকাশ শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রেমে, স্বার্থ-ত্যাগে ; পরিপূর্ণ বিকাশ—পরার্থে সর্বস্ব ত্যাগে।

মহাযোগী পতঞ্জলিও জীবের ক্রমবিকাশের কথা বলে গেছেন। তাঁর 'যোগসূত্রে' এক জাতির অন্য জাতিতে পরিণত হওয়ার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে—'জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ' (যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ২য় সূত্র) অর্থাৎ প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি অপর জাতিতে পরিণত হয়। তবে জার্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতদের সঙ্গে মতভেদটা কোনখানে ? আছে—'জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ' 'জীবনসংগ্রাম' বা 'যৌন নির্বাচনে' নয়, প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা একজাতি অন্য জাতিতে বিবর্তিত হয়। এই 'প্রকৃতির আপূরণ' ব্যাপারটা কি ? তিনিই তাঁর পরবর্তী সূত্রে এর ব্যাখ্যা করেছেন—'নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।' (যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ, ৩য় সূত্র) অর্থাৎ—সৎ ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, ওগুলো তার বাধাভঙ্গকারী নিমিত্তমাত্র—যেমন কৃষক জলের গতিপথে বাধা বাঁধ ভেঙ্গে দিলে জল নিজের স্বভাববশেই ক্ষেতে প্রবাহিত হয়।

পাশ্চাত্য 'পরিণামবাদী'রা বলেন—জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত হতে হতে একদিন খ্রীস্টরূপে পূর্ণত্ব লাভ করে। স্বামীজী একথা অস্বীকার করছেন না। তবে তিনি বলছেন—উনুনে যে-পরিমাণ জ্বালানি দেবে, তার কাছ থেকে সেই পরিমাণ কাজই আদায় করতে পারবে—

"If the Buddha is the evolved amœba, the amœba was the involved Buddha also."[১] অতএব সাদা বাঙলায়—প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকেই অনন্ত বলশালী আত্মা। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। বাঁদরের সঙ্গে আমাদের, আমাদের সঙ্গে ডারউইনের, ডারউইনের সঙ্গে বিবেকানন্দের তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কিরকম? না, 'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—কৃষক যেমন তার ক্ষেতে জলসেচন করে। চাষা জল আনবার জন্যে কোন নির্দিষ্ট জলাশয় থেকে একটা প্রণালী কেটে, সেই প্রণালীর মুখে একটা দরজা তৈরি করে—পাছে জলাশয়ের সব জলটা প্রবলভাবে ঢুকে তার ক্ষেত প্লাবিত করে দেয়। জলপ্রবেশের শক্তিবৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই—জলাশয়ের জলে সে-শক্তি বরাবরই আছে। সেইরকম আমাদের সকলের মধ্যেই অনন্ত বীর্য, অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞানের প্লাবন নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে সর্বদা উন্মুখ হয়েই রয়েছে, কেবল আমাদের দেহ-বুদ্ধির দরজাটা প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে না। এতে পাশ্চাত্যের 'জীবনসংগ্রাম' মতবাদ চূড়ান্তভাবে খণ্ডিত হচ্ছে। ভারতীয় 'ক্রমবিকাশবাদে'র মূল কথা এই, অনাদি অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া। এই পূর্ণত্ব সসীম উপাধির দ্বারা বাধিত হয়ে রয়েছে এবং সেই অনন্ত প্লাবন আত্মপ্রকাশের জন্যে অধীর। 'জীবনসংগ্রাম', 'যৌন নির্বাচন'—এসব হচ্ছে জীবনের ক্ষণিক, অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত ব্যাপার, যার হেতু হচ্ছে আমাদের অজ্ঞান। ওগুলো না থাকলেও আমাদের ক্রমবিকাশ বা অগ্রগতি কোনদিন ব্যাহত হবে না, যেহেতু আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণস্বভাবই আমাদের পদে-পদে পরিপূর্ণ হতে প্ররোচিত করবে। অতএব 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বা 'সংগ্রাম' প্রগতির পক্ষে অপরিহার্য—এটা বিশ্বাস করা মারাত্মক। প্রেরণা বা গতিবেগ বাইরে থেকে আসে না—ভেতর থেকেই আসে। এই অন্তর্নিহিতত্বকে স্বীকার করলে তবেই পাশ্চাত্য 'ক্রমবিকাশবাদ' বিকাশলাভ করতে পারে—জীবতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও মীমাংসা পাওয়া যায়।

॥ ২ ॥

আসলে প্রখ্যাত ইংরেজ জীববিজ্ঞানী ডারউইনের এই 'অভিব্যক্তিবাদ' ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের অভিব্যক্তি নয় তো? সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে—পণ্ডিতেরা ভেবে দেখবেন। তাঁর 'দি অরিজিন অফ স্পিসিজ', 'ফার্টিলাইজেসন অফ অর্কিড্স', 'ভেরিয়েশন অফ প্ল্যাণ্ট্স এ্যাণ্ড এ্যানিম্যালস আফটার ডোমেস্টিকেশন', 'ডিসেণ্ট অফ ম্যান' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করলে এব্যাপারে একটু খটকা থেকেই যায়—বিশেষ করে তাঁর বহুবিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অফ স্পিসিজ' পড়লে। এই গ্রন্থেই তিনি 'ক্রমবিকাশবাদে'র বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন, যার মোদ্দা কথা হলো—বাঁচবার জন্যে প্রাণী ও উদ্ভিদকে নানারকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়—বিশেষ করে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে। এই নির্মম সংগ্রাম একই প্রজাতি কিংবা বিভিন্ন প্রজাতি বা বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে হতে পারে। 'জীবনসংগ্রামে' যারা যোগ্য, তারাই বেঁচে থাকে—অযোগ্যরা অবলুপ্ত হয়। তাঁর সমসাময়িক ওয়ালেস এই মতবাদকে আরও সুদৃঢ় করেন। তাহলে গায়ের জোরে আমেরিকা আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অযোগ্য দেশকে গিলে ফেলা কি এই 'অভিব্যক্তিবাদে'র স্মারক হিসাবে কিংবা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনে'র (survival of the fittest) জ্ঞাপক বলে নির্ণীত হবে? ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী তাই হওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে একটা বিরাট গর্ত চোখে পড়ে—যাতে বেসামাল না হয়ে নিস্তার নেই। ভারতবর্ষেও সেই 'যোগ্যতা' প্রমাণের চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি হয়নি। তার জড়-ঐশ্বর্যকে ব্রিটিশরা লুব্ধ লুণ্ঠকের মতো লুটেপুটে ভেবেছিল, এইবার সারা জাতটাকে খ্রীস্টান করে আত্মসাৎ করতে পারলেই কাজ

---

[১] Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III (1973), p. 407.

হাসিল—ওরা fittest বলে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল fittest সেখানে fit for nothing—কোন কম্মের নয়। সমস্ত জাতটাকে খ্রীস্টান বানানোর পরিকল্পনাটা ফেঁসে গেল। ভেবেছিল, এদের ভিখিরি বানাতে পারলেই কার্যোদ্ধার হবে। কিন্তু তা হয়নি—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। ভারতবর্ষ বুড়ো জাত। সে তার জড়-ঐশ্বর্যকে খেলনা মনে করে। খেলনা চুরি গেলে বড়রা কাঁদে না। কিন্তু তার আসল ঐশ্বর্যে কেউ হাত বাড়ালেই সে মরিয়া হয়ে ওঠে—কোত্থেকে হঠাৎ ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ আন্দোলন প্রভৃতি গজিয়ে উঠে তাদের সমস্ত ওস্তাদি বানচাল করে দেয়। তাই আজেবাজে সব লুটেপুটেও আমাদের আসল জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রায় বিশবছর ধরে 'বৃটিশ মিউজিয়ামে' 'ফসিল' নিয়ে গবেষণার পর এই 'অভিব্যক্তিবাদ' প্রথম ধাক্কাতেই প্রচণ্ড ভাবে জখম হলো। বিজ্ঞেরা মনে মনে ভাবলেন, বিশবছর 'ফসিল' নিয়ে গবেষণা করে ডারউইন সাহেবের মস্তিষ্ক কি 'ফসিল' হয়ে গিয়েছিল! আশ্চর্য নয়—'যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়' শুনেছি। এই বৈপ্লবিক বিজ্ঞের দলে প্রথমে একজনই ছিলেন—নিঃসঙ্গ বিবেকানন্দ। পরে তাঁর 'জ্ঞানযোগে'র জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে অনেকেরই চোখ ফোটে—যার ফলে এখন দুনিয়ায় কারুরই প্রায় আর 'অভিব্যক্তিবাদে' অভিরুচি নেই। তাছাড়া, সাদা চোখেই তো দেখা যাচ্ছে, আমাদের যতটা 'অযোগ্য' বলে মনে করা হয়েছিল, আমরা ততটা অযোগ্য নই—বরং 'সারভাইভ' করার যোগ্যতায় শুধু ব্রিটেন কেন—তামাম দুনিয়াকে টেক্কা দিতে পারি। ব্রিটেন আজ বিগতশ্রী, তার দ্বৈপায়ন অস্তিত্ব নিয়ে কোনক্রমে টিকে আছে—তার পুনর্মূষিকতাই আজ তার দাম্ভিক Evolution Theoryকে ভেঙচি কাটছে।

॥ ৩ ॥

তাহলে survive করার fitness-এর চাবিকাঠিটা কোথায়—এবার একটু সন্ধান করে দেখা দরকার। আমরা যখন একটার পর একটা বাঘা-বাঘা বৈদেশিক আক্রমণে এখনো অক্কা পাইনি, দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে আছি—তখন সেটা 'অভিব্যক্তিবাদে' নিশ্চয়ই নেই—অন্যত্র সন্ধান করতে হবে। আর ওরাও যখন আজ নিজেদের survival-এর জন্যে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে আমাদের ভাঁড়ারে উঁকি-ঝুঁকি মারছে—তখন মনে হচ্ছে ওটা আমাদের দেশেই আছে। ব্রিটিশ মনীষী টয়েনবির ইঙ্গিতও তাই ঃ "This catholic-minded Indian religious spirit is the way of salvation for human beings of all religions … if we are not to destroy ourselves." (The Observer, Oct. 24, 1954) অর্থাৎ, 'যদি আমরা আত্মঘাতী না হতে চাই, এই উদার ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষেরই মুক্তির পথ।' সাদা বাংলায়—'যত মত তত পথ।'

ওরা যেটাকে 'evolution' (ক্রমবিকাশ) বলছে, সেটা আসলে 'involution' (ক্রমসঙ্কোচ). 'কলি যুগ' ক্রমবিকাশের যুগই নয়—ক্রমাবনতির যুগ। স্বামীজী বলছেন ঃ "Our struggle for higher life shows that we have been degraded from a high state. It must be so."[২] … আমাদের উন্নত জীবনযাপনের প্রচেষ্টাই প্রমাণ করে, আমরা সেই অবস্থা থেকে অধঃপতিত—নিশ্চয়ই তাই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—আমাদের এই যুগবিভাগে ক্রমসঙ্কোচেরই ইঙ্গিত। ওরা (পাশ্চাত্য) বলে—"আমার জীবনসংগ্রামে বাহুবলের যোগ্যতায় বর্তমান সভ্যসমাজে বিবর্তিত হয়েছি।" আমরা বলি—"কর্মবিপর্যয়ে তোমরা হীন থেকে হীনতর অবস্থায় উপনীত হয়েছ—আত্মস্বরূপ ভুলে গিয়ে বর্বর বনে গিয়েছ—যথার্থ স্বরূপে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা কর। এই হচ্ছে ক্রমবিকাশের রাস্তা।"

ওরা সৃষ্টির 'আদি' কল্পনা করাতেই যত অনাসৃষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। জড়বাদী সভ্যতার ক্ষণিক চাকচিক্যে চৈতন্য হারিয়ে ও-দেশের দার্শনিকরা 'ক্রমাবনতি'কেই 'ক্রমবিকাশ' বলে ভুল করেছেন—জ্ঞান হারালে যা

---

[২] Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II (1976), p. 174.

হয়! আমাদের 'বীজাঙ্কুর ন্যায়'-এ দুয়েরই আলোচনা আছে—তবে 'ক্রমসঙ্কোচ'ই প্রাধান্য পেয়েছে 'ক্রমবিকাশে'র মহান আদর্শকে তুলে ধরে। আমাদের মতে সৃষ্টির 'আদি-অন্ত' নেই—এই সৃষ্টিপ্রবাহ অলাতচক্রের মতো অনন্তকাল ঘুরেই চলেছে। 'আদি' বললেই আকস্মিক উৎপত্তি বোঝায়—যা 'ক্রমসঙ্কোচ'কে আড়াল করে 'ক্রমবিকাশে'র মোক্তারি করে। 'সঙ্কোচ' ও 'বিকাশ'-রূপ, উন্নতি ও অবনতিরূপে প্রবাহাকারা সৃষ্টি না-মানলে অন্ধ জড়শক্তির উদ্দেশ্যহীন 'ক্রমবিকাশে'র কোন তাৎপর্যই থাকে না: "... how can you insist that it is always from the lower upwards, and never from the higher downwards? ... the series, is repeating itself in going up and down. How can you have evolution without involution?"[৩] (তুমি কি করে সিদ্ধান্ত কর যে, কেবলই নিম্নতর প্রাণী থেকে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জন্মাচ্ছে, উচ্চতর প্রাণী থেকে নিম্নতর প্রাণী জন্মাচ্ছে না? সৃষ্টি একবার নিচে থেকে ওপরে যাচ্ছে, আবার ওপর থেকে নিচে নামছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হচ্ছে। 'ক্রমসঙ্কোচ' ছাড়া 'ক্রমবিকাশ' কি করে সম্ভব?)

আমাদের ঋষিরা বলেছেন—চৈতন্য থেকেই জীবজগতের অভিব্যক্তি এবং মানবসমাজ আত্মার ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তাঁরা এই আত্মাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। সেই সচ্চিদানন্দ দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নামরূপ অবলম্বন করে দ্রষ্টা ও দৃশ্য হয়ে নিখিল বিশ্বে বিরাজ করছেন। এখন জীবের যথার্থ স্বরূপ যদি নির্লেপ আত্মাই হয়, তাহলে ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানবজীবন যে সেই আত্মার স্বরূপবিচ্যুতি—এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার ওপর এটা আবার 'কলিযুগ'—মানে, মানবসভ্যতা অবনতির শেষ ধাপে উপনীত। তাই বিকারের ঘোরে চৈতন্যকে জড় বলে ঠাওরাচ্ছি—involution-কেই evolution বলে হৈ-হৈ করছি। ওরা বলে 'জড়' ক্রমবিকশিত হতে-হতে চৈতন্যে পরিণত হয়। একে মনোবিকারজনিত পাশ্চাত্য প্রলাপ বলে অনায়াসেই উড়িয়ে দেওয়া চলে; কেননা তাহলে মানতে হয়, বালি থেকে বটগাছ হওয়া সম্ভব—যা অতিবড় জড়-বিজ্ঞানীও প্রমাণ করতে পেছপা হবেন। 'জড়' ও 'চৈতন্য' যদি পৃথক সত্তা হয়, তাহলে একে অন্যের দ্বারা সাময়িকভাবে অভিভূত হলেও কোনদিন একীভূত হতে পারে না—অনাদি পৃথকত্ব থেকেই যাবে। তা সত্ত্বেও যদি 'জড়' ও 'চৈতন্য'কে দুটো পৃথক সত্তা বলা হয়, তাহলে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে খুরে দণ্ডবৎ। অবশ্য, পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের ভৈরব গর্জনের পর পশ্চিম অনেকটা পূবে এগিয়ে এসেছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে ওদের জড়বিজ্ঞানের 'ক্রমবিকাশ' অনুধাবন করে এব্যাপারে নিঃসংশয় হতে পারেন। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ অবধি পাশ্চাত্যে অবিশ্রান্ত বেদান্ত-বর্ষণের পর স্বামীজী কিন্তু তখনই নিঃসংশয়ে বলতে পেরেছিলেন: "I say deliberately, millions in every civilised land are waiting for the message that will save them from the hideous abyss of materialism ..."[৪] (আমি নিশ্চিত করে বলছি, প্রতিটি সভ্যদেশ বেদান্তের এই বাণী শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব—যা তাদের বস্তুবাদের নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করবে।) মার্কসের 'বৈজ্ঞানিক জড়বাদে' (Scientific Materialism) আস্থা হারিয়ে পাশ্চাত্যের অনেক হোমরাচোমরা মনীষীরা স্বামীজীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন—তার মধ্যে প্রথম সারির দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক ও সমাজতন্ত্রবাদীর অভাব ছিল না। স্বামীজী বলেছেন: "I have been told by several leaders, who used to attend my lectures, that they required Vedanta as the basis of the new order of things."[৫] (সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকেই, যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে আসতেন, আমায় বলেছেন—নূতনভাবে সমাজ গঠন করতে হলে বেদান্তকে

---

[৩] Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II (1976), p. 174.

[৪] Ibid., Vol. IV (1972), P. 316.

[৫] Ibid., Vol. V (1973), P. 213.

ষ্ঠিত করতে হবে।) ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে জোর গলায় তিনি বললেন: "I may make bold to say, that the only religion which agrees with, and even goes a little further than modern researches ... is the Advaita' and that is why it appeals to modern scientists so much."৬ (আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি—অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে শুধু যে মেলে তাই নয়, তার চেয়েও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর সেই কারণেই অদ্বৈতবাদ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অন্তর এতটা স্পর্শ করেছে।)

উনিশ শতকের শেষে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে (খেয়াল রাখতে হবে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বেদান্তবর্ষণ) জে. জে. টমসন প্রমাণ করেন যে, ইলেকট্রন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পদার্থ হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে সহস্রগুণ ক্ষুদ্র তড়িৎশক্তিপূর্ণ কণিকা দিয়ে গঠিত। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রাদার ফোর্ড-এর 'প্রোটন' আবিষ্কার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি পরমাণু যেন এক-একটি সৌরজগৎ—কেন্দ্রে 'প্রোটন' ও 'ইলেক্ট্রন' গুলি তার চতুর্দিকে যেন ঘূর্ণায়মান গ্রহ। সেই থেকে 'পদার্থবিজ্ঞান' সজ্ঞানে 'বেদান্তে' প্রবেশ করল—বিজ্ঞানের সুর পাল্টাল—"All things are the manifestations of one force." প্রায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এখানে পাশ্চাত্যপন্থীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, 'পরমাণু-তত্ত্বে'র আবিষ্কার পাশ্চাত্যে নয়—ভারতেই এবং হাজার-হাজার বছর আগে। কত হাজার বছর আগে—কে জানে! 'সাংখ্য-দর্শনে' মহর্ষি কপিল বলেছেন—পরিদৃশ্যমান জগৎ তিনটি গুণযুক্ত পরমাণুর দ্বারা গঠিত। পাশ্চাত্যে এই ৩নং পরমাণুটি আবিষ্কৃত হয় এই সেদিন—১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে। 'নিউট্রন'। মহর্ষি কণাদ এই পরমাণুবাদের একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা—যেকারণে শঙ্কর 'পরমাণুবাদ'কে 'কণাদসিদ্ধান্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। এর শেকড় কিন্তু বেদে। আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞান আজ এতকাল পরে বেদান্ত-সিদ্ধান্তে দাগা বোলাচ্ছে, আশ্চর্য, একই ভাষায় কথা বলছে। বলছে, 'Sorry, Matter Matter নয়—Spirit, এক চৈতন্যসত্তারই ঘনীভূতরূপ (bottled up energy)। মন ও জড়পদার্থের পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না। একটা পাথরেরও মন আছে—তাকে ধরবার উপায়টা খুঁজছি। ক্রমবিকাশের আদিও নেই—অন্তও নেই। মানুষের আদর্শ, মূল্যবোধ সবই আপেক্ষিক। লক্ষ্য কি তা ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও আমরা সবাই সেই একদিকেই ('একে'র দিকেই?) ছুটছি। মানুষ তার পরিপার্শ্বকে জয় করে তার ওপর প্রভুত্ব করতে চায়—কারণ সবকিছু নিয়েই সে। সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞানের আজ একই প্রশ্ন: 'সেই মিয়াটা কে?' বেদান্ত বলছেন, সেই 'এক এবং অদ্বিতীয়' চৈতন্যময় সত্তা থেকেই জীবজগতের অভিব্যক্তি—অর্থাৎ, আমরা সেই অদ্বিতীয় সত্তার 'ক্রমাবনতি'।

॥ ৪ ॥

না হয় ধরেই নিলাম জড় চৈতন্যে রূপান্তরিত হতে হতে ক্রমবিকশিত হচ্ছে। দেখাই যাক না, এতে 'ক্রমবিকাশবাদ' না 'ক্রমসঙ্কোচবাদ' কোনটা ধোপে টেকে। 'জীবনসংগ্রামে' (struggle for existence) লড়াই করতে করতে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (survival of the fittest) হয় কিনা দেখতে দোষটা কি? 'অযোগ্য' কে, এবং সে জীবনের আঙিনা থেকে সরে পড়ে কিনা—একটু খতিয়ে দেখাই যাক না। যদি পড়ে, তাহলে 'সাম্রাজ্যবাদীমনোভাবসম্পন্ন' 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনবাদ'ই অবিশ্যি 'সারভাইভ' করবে।

ঐ প্রখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর (ডারউইনের) 'প্ল্যান্ট্স' ('Plants') অর্থাৎ উদ্ভিদ থেকেই শুরু করা যাক। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন-তত্ত্ব'কে (survival of the fittest) মেনে নিতে বাধা নেই, কিন্তু কে 'যোগ্য' কে 'অযোগ্য'—সেবিষয়ে প্রথম থেকেই আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে হবে—'তর-তম' পরের ব্যাপার, পরে

---

৬ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. II p. 138.

আসবে। দুর্বল নিরীহ 'উদ্ভিদ' আমাদের কুঠারাঘাতে প্রতিঘাত করতে জানে না—বিনা বাক্যব্যয়ে অপঘাত বরণ করে। আমরা বিকাশপ্রাপ্ত মানুষ জঙ্গল কেটে শহর বানিয়ে 'যোগ্যতা'র প্রমাণ দিই—মনে করি আমরা উদ্ভিদের চেয়ে 'যোগ্যতর'। কিন্তু এই যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গিয়ে আমরাই আত্মঘাতী হই যে—খাদ্য, ওষুধ-বিসুধ, অক্সিজেন, জলভরা মেঘ কিছুই পাই না। এ আমার কথা নয়—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানেরই কথা। আর যদি 'অযোগ্যদের' সঙ্গে 'ভোক্তা-ভোগ্য' সম্বন্ধ পাতাতেই হয়, তাহলে 'যোগ্যতরে'র কাজ হবে তাকে উচ্ছেদ না করে নিজের গরজেই তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। ডারউইন ও ডারউইনকল্পরা এটা ভুলে গেলেন কেন যে, 'অযোগ্যদের' সঙ্গে কেবল 'ভোক্তা-ভোগ্য' সম্পর্ক পাতালে 'ভোক্তা'কেই অভুক্ত থেকে অক্কা পেতে হয়। আমাদের বিষাক্ত 'কার্বন'টাই বা আত্মসাৎ করবে কে? সে হিসাবে তো আমরাও ওদের 'ভোগ্য'—ওরা 'ভোক্তা'। আসলে 'যোগ্য-অযোগ্য', সবল-দুর্বল সকলেই সকলের 'ভোগ্য' ও 'ভোক্তা'। সুতরাং এ ছোট, ও বড়, এ সাদা, ও কালো, এ সবল, ও দুর্বল—এসব হাস্যকর হিসাবের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা কি? আগে আকাশ, পরে পৃথিবী, তারপরে উদ্ভিদ, তারও পরে কীট-পতঙ্গ-জীবজন্তু, সবশেষে মানুষের আবির্ভাব। এইতো আমাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তাহলে সোজা হিসাব—যারা আগে আসছে তারা পরবর্তীদের ভোগ্য। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই মার বুকে দুধের যোগান থাকা চাই। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—আগে 'ভোগ্য', পরে 'ভোক্তা', আগে মা, পরে ছেলে। জীববিজ্ঞানী ডারউইন সাহেবের এতে অমত থাকতে পারে না। তাহলে তিনি যাকে 'অযোগ্য' বলে বাতিল করছেন—সেই তো সমধিক যোগ্য। অতএব ভোগ্যকে যে জিইয়ে রাখে, সে কি 'যোগ্যতর' প্রমাণিত হচ্ছে না? তাই কি আজ বৈজ্ঞানিকদের 'বনসংরক্ষণ', 'পশুসংরক্ষণ', 'অধিকফলন' ইত্যাদির হিড়িক পড়ে গেছে? মোটমাট আমরা এতদূর ফসিলমস্তিষ্ক হয়ে যাইনি যে, struggle for existence ও survival of the fittest মতবাদে চোখ বুজে 'ডিটো' মারতে হবে। নিজেদের 'যোগ্যতা' প্রমাণ করতে গিয়ে গর্তে পড়ে আজ ওদের নিজেদেরই স্বার্থদুষ্ট ও যন্ত্রপুষ্ট মতবাদের বিরোধিতা করতে হচ্ছে। হচ্ছে না? বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবী (Toynbee) কেন তাহলে পাশ্চাত্যের survival-এর জন্যে 'Indian ending' কামনা করছেন? শ্রীরামকৃষ্ণের 'harmony of religions'-এর দিকে হাত বাড়াচ্ছেন কেন?৭

মানুষ আবার মানুষের মধ্যেই—এ সাদা, ও কালো, এ পালোয়ান, ও দুর্বল, এ অভিজাত, ও মেথর ইত্যাদি হাজার রকমের বৈষম্যের পাঁচিল তুলে স্বার্থসিদ্ধির ফিকির খুঁজছে কোন যুক্তিতে? তুমি কার্পেটমোড়া শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রাসাদকক্ষে থাকতে পার, কিন্তু ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা বা কঞ্চি নিয়ে ড্রেন পরিষ্কার করতে পার কি? তার জন্যে সমাজে বেঁচে থাকা যাদের সবচেয়ে জরুরী, তাদের আধমরা করে রাখলে তোমরা কি তার ধাক্কা সামলাতে পারবে? প্লেগ এবং কলেরায় ভুগে তারা মরবে না? মুচি জুতো তৈরি করে দিলে তুমি সেই জুতো পর, ছিঁড়ে গেলে আবার তারই দ্বারস্থ হও—অথচ এই আত্মঘাতী অপবুদ্ধিটা আসে কি করে যে, তুমি সমাজজীবনে তার চেয়ে অনেক বেশি 'যোগ্য'! 'অযোগ্যদের' মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও কসুর কর না। বলি, তুমি একপাটি জুতোই কি বানাতে পার বা ছিঁড়ে গেলে মেরামত করে নিতে পার? তা যখন পার না, তোমার যোগ্যতার ভিত্তিটা কিসে? সে-ই বা সমাজজীবনে তোমার চেয়ে 'অযোগ্য' কিসে হলো? শূদ্রশক্তি কি খামকা মাথা চাড়া দিয়েছে? ইউরোপের মনীষীদের সঙ্গে একমত হয়ে এঙ্গেলস (Engels) মার্কসের 'ক্যাপিটাল'কে 'Bible of the working class' বলেছেন। তাহলে বিবেকানন্দের 'বাইবেল' বা 'শূদ্র-গীতার' কিয়দংশ শোনাইঃ "তোমরা উচ্চবর্ণের কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ

---

৭ Sri Ramakrishna and His Unique Message—Swami Ghanananda, Foreword, p. viii.

দশহাজার বছরের মমি! ... তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। ... এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না ... । অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমাদের উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"[৮]

কি নিঃসংশয় অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্দৃষ্টি! তোমরা যাদের 'অযোগ্য' বলে পেছনে ফেলে যাচ্ছ—সেই একদিন তোমাদের ধাক্কা মেরে এগিয়ে যাবে। সেইরকম উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, যারা মিটিং করে আন্দোলন বা প্রতিবাদ করতে জানে না—তারা বদলা নেবে অন্যভাবে—তোমাদের জীবনীশক্তি হরণ করে। তবে পাশ্চাত্যের 'যোগ্যতা' যে একেবারেই নেই তা বলছি না। 'যোগ্যকে' 'অযোগ্য' মনে করার যোগ্যতায়, 'পারমাণবিক যুদ্ধে' নিজেদের কবর খোঁড়ার যোগ্যতায়, যোগ্যতার অন্তিম স্মারক হিসাবে 'তারকা যুদ্ধে' জীবজগতের অস্তিত্ব বিলোপ করার যোগ্যতায়, তোমরা অবশ্যই 'যোগ্যতম'।

আমরা 'এ্যামিবা' থেকে 'যৌন নির্বাচন', 'জীবন-সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনে' উদ্বর্তিত হতে হতে মানুষ হইনি। 'জাত্যন্তর-পরিণাম' ওসবের দ্বারা সাধিত হয় না। পাশবিক স্তরে ওটা আংশিক সত্য বলে মনে হলেও, মানবসমাজের 'ক্রমবিকাশ' ওর দ্বারা নির্ণীত হতেই পারে না। এমনকি নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যকারও এব্যাপারে আমাদের ভোট দিয়েছেন, বলেছেন—'ত্যাগ, তপস্যা, সত্যজ্ঞান, সংযম, দান, তিতিক্ষা—এসবের দ্বারাই মানবসমাজের 'ক্রমবিকাশ'—সেখানে 'জীবন-সংগ্রাম' বা 'যৌন নির্বাচনে'র কোন স্থানই নেই। তাছাড়া ডারউইনের এই মতবাদ আজ তাঁর জাতভাই ও জ্ঞাতিদের কাছেই প্রায় পরিত্যক্ত।

॥ উপসংহার ॥

'যোগ্যতমে'রা, বলে রাখি—গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু থেকে শুরু করে দুনিয়ায় কেউই অযোগ্য নয়, ছোট-বড়, সাদাকালো বলে কিছু নেই। বেদ উপনিষদ বলছেঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'সর্বভূতে সেই প্রেমময়।' 'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যোগ্য-অযোগ্য' বলে কিছু নেই—সকলেই যোগ্য কিংবা 'যোগ্যতম'। এই দৃষ্টিতে 'যোগ্যতমে'র উদ্বর্তনবাদ প্রবলের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হবে না—সকলের 'উদ্বর্তন' যাতে হয় সেদিকে মনোনিবেশ করে সর্বত্যাগের আনন্দে হিল্লোলিত হবে। তখন সুখাসুখ, লাভালাভ, ছোট-বড়, সাদা-কালো, প্রিয়াপ্রিয়জ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না—তখন তুমি আগা-পাশ-তলা 'যোগ্যতম'। এবং তখনই তোমার কণ্ঠস্বর প্রণয়াবেগে স্বামীজীর মতো সঙ্গীতময় হয়ে উঠবে—

"Everything that you see, feel, or hear, the whole universe, is His creation, or to be little more accurate is His projection, or to be still more accurate, is the Lord Himself. ... It is all He. He it is that gets envolved in the minute cell and evolves at the other end and becomes God again. He it is that comes down and becomes the lowest atom, and slowly unfolding His nature, rejoins Himself. This is the mystery of the universe. ... In one word, we are born of Him, we live in Him, and unto Him we return."[৯] (যা কিছু দেখ, শোন বা অনুভব কর, সবই তাঁর সৃষ্টি—ঠিক বলতে গেলে, তাঁর পরিণাম—আরও ঠিকঠিক বলতে গেলে বলতে হয়, স্বয়ং তিনি। সবই তিনি। তিনিই 'ক্রম-সঙ্কুচিত' হয়ে অণু হন, আবার 'ক্রমবিকশিত' হয়ে ঈশ্বর হন। তিনিই নিচে নেমে এসে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু হন, আবার, ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশ করে স্বরূপে পুনর্মিলিত হন। এই হচ্ছে বিশ্বের রহস্য। এক কথায়, আমরা তাঁতেই জন্মগ্রহণ করি, তাঁতেই জীবিত থাকি, আবার তাঁতেই প্রত্যাবর্তন করি।)

---

[৮] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১ম সং) পৃঃ ৮১-৮২

[৯] Complete Works, Vol. II, p. 211

বেদনার রঙ বদলায়

নিমাই মুখোপাধ্যায়

কতদিন পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি।
কখনো বিস্ময়ে তাকিয়েছি
কখনো বা ভয়ে।
এতবড় বাড়িটার মধ্যে একটা যজ্ঞ দেখলাম।
দেখলাম যন্ত্রণায় কাতর মানুষের মুখে দুঃসহ
বেদনার রঙ,
দেখলাম যন্ত্রণামুক্ত মানুষের দল হাসতে হাসতে
বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।
জন্মমৃত্যুর লীলাখেলার সাক্ষী
এই প্রকাণ্ড বাড়িটা।
আর যারা দিবারাত্র নিজেদের সুখ, দুঃখ,
জ্বালা, যন্ত্রণা, সব ভুলে গিয়ে
এর ভেতরে বসে সেবা করে যাচ্ছে
তাদের দেখে মনে হলো হিমালয়ের
গুহার মধ্যে বসে এরা তপস্যা করছে।
দিনরাত প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে,
মানুষের মুক্তির জন্যে।
এরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে
অন্যদের জীবন গড়ে দিতে।
বেদনার রঙ কেউ ভাল করে দেখেনি
তা রক্তের মতো লাল।
এদের তপস্যার ফলে বেদনার রঙ বদলায়।

মুছে যায়

সন্তোষকুমার মাজী

আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ফাটে বুক। দুচোখের থেকে
মুছে যায় জলছবি—ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা।
অরণ্যের ছায়া যত দীর্ঘ হয়
তৃষ্ণা ও তিতিক্ষা বাড়ে তত
আধবাটি পায়েসের মতো
জেগে থাকে জরাক্লিষ্ট চাঁদ।
বনপথ জুড়ে থাকে মহাজাগতিক তালি
মহাশূন্যজুড়ে শুধু কলহাস্য কথার কাকলি
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ফাটে বুক।

আলোক-সরণি

সমরেশ মণ্ডল

কবি তুমি শব্দ চাও, মনন প্রবাহ
অথচ ধ্যানের ভিতর তুমি
জাগাতে চাও না তৃতীয় ভুবন
যেখানে আলোর প্রজাপতিদল
উড়ে যায়
সকাল হয়ে থাকে সারাটা দিন
বছর মাস দিনগুলো সব
সবুজে সবুজ।

সাদা হয়ে আছে দুধের সাগর
কোন মন্ত্রে কোন যন্ত্রেই তাকে
ধূসর করে তোলে না কখনো।

কবি তুমি জাগো তোমার ভিতরে
প্রণব নাদের ভিতর
অন্য আকাশ, অন্য বাতাস,
অন্য পৃথিবীর সব আলো জল
অলীক কুয়াশা
সব একাকার হয়ে আছে

তুমি শুধু ধ্যানের ভিতরে ছুঁয়ে ফেল
সেই শুভ্র আলোক-সরণি।

সন্ধানী

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

চলে যায় দিন, উৎসাহহীন।
থাকে শুধু দিন যাপনের গ্লানি।
সন্ধানী মন আমার পায় নাকো সত্যের সন্ধান!
আলোর দিশারী কেউ দেবে না কি পথের সন্ধান
যে পথ মিশে যায় শাশ্বত কালের কিনারায়?
পার্থিব চিন্তার ভার শুধু পিছু টানে,
নিত্য নব আকাঙ্ক্ষার ঢেউ নিয়ত মেলায়
সময়-হারা মাঝপথে।
সত্যের জিজ্ঞাসা নিয়ে তবু আমি আছি অবিচল
সত্যকে পেতে হবে জীবনের একমাত্র পণ।

ধারাবাহিক-প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা

জীবন মুখোপাধ্যায়

সাধারণভাবে ভারতবর্ষে সৎ, সাধ্বী ও পতিব্রতা নারীদেরই 'সতী' বলা হয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যথার্থ সাধ্বী বা পতিব্রতা রমণীর গুণাবলী বিবৃত করে বলা হচ্ছে, "যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্র-বদন-দর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্মচারিণী ও সাধ্বী।... পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। নারীর পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।"[১] মহাভারতের অন্যান্য স্থানেও পাতিব্রত্যধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে স্ত্রীকে পতিপরায়ণা হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[২] মনুর মতে, যে নারী কায়মনোবাক্যে সংযত থেকে নিজ পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের প্রসঙ্গ করে না, সে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করে এবং সাধুগণও তাঁকে সাধ্বী বলে প্রশংসা করে থাকেন। মৎস্যপুরাণে পতিব্রতা মহিলাদের দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতে বলা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণের 'কপোততীর্থবর্ণন' অধ্যায়ে কপোতী কপোতকে বলছে যে, "স্ত্রীজাতির সব কিছুই হলো তার স্বামী। স্বামী সন্তুষ্ট হলে সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট হন। তুমিই আমার দেবতা, আমার প্রভু, বন্ধু, পরম আশ্রয়, ব্রত, আমার স্বর্গ ও মোক্ষ তুমিই।"[৩] সাধ্বী নারীর সংজ্ঞা দিয়ে হারীত বলেন ঃ "আর্তাতে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পতৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।"—অর্থাৎ পতি ব্যথিত হলে যে স্ত্রী ব্যথিতা, হৃষ্ট থাকলে যিনি হৃষ্টা, বিদেশে গেলে যিনি মলিনা ও কৃশা এবং পতির মৃত্যুতে যিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনিই সাধ্বী। ব্রহ্মপুরাণ বলছে, "যে নারী পতির দুঃখে দুঃখী, পতির আনন্দে আনন্দিত ও পতি প্রবাসে গেলে মলিন ও কৃশ হয় এবং পতির মৃত্যুতে সহমৃতা হয় তাকেই পতিব্রতা বলে।"[৪]

এই সব সৎ, সাধ্বী, পতিব্রতা পতিপরায়ণা মহিলাদের থেকেই 'সতী' কথাটি এসেছে। ক্রমে স্বামীর মৃত্যুতে যেসব নারী স্বামীর চিতার প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন তাঁদেরও 'সতী' বলা হতো এবং এই ঘটনাটিকে 'সতীদাহ' বা 'সহমরণ' বলা হয়ে থাকে।

কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতেই নয়—সাধারণভাবে বিশ্বের সব প্রাচীন ধর্ম ও জাতির মধ্যেই স্বামীর চিতায় পত্নীর আত্মাহুতি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়া, গ্রীস, থ্রেস, সিথিয়া, মিশর, অ্যাসিরিয়া, লিডিয়া, ব্যাবিলন, চীন, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিবর্গের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক কাণের মতে, প্রাচীন গ্রীক, জার্মান, স্লাভ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রচলিত ছিল।[৫] অধ্যাপক আলটেকর মনে করেন, প্রাচীন বিশ্বে এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। গল, গথ, কেল্ট প্রভৃতি ইন্দো-ইওরোপীয় এবং সিথিয়ান ও চীনদেশে

---

[১] মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অনুশাসন পর্ব, ১৪৬তম অধ্যায়, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃঃ ১৭০। (অতঃপর 'মহাভারত' বলে উল্লিখিত হবে)

[২] ঐ, ১২৩তম অধ্যায়, পৃঃ ১৪৯–৫০ ; বনপর্ব, ২৩৩তম অধ্যায়, পৃঃ ২৪৬

[৩] ব্রহ্মপুরাণ, ৮০তম অধ্যায়, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ১৫৪

[৪] ঐ, ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ৩৪৬

[৫] History of the Dharmasastra, P. V. Kane, Vol. II, Part I, p. 625

এই প্রথা ছিল সাধারণ নিয়ম।[৬] অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসামও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।[৭]

এই প্রথার উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য আছে। তবে একথা ঠিকই যে, সূচনাপর্বে পুরোহিত-সম্প্রদায় কোন অনিচ্ছুক নারীর ওপর বলপূর্বক এই প্রথা চাপিয়ে দেননি। প্রথমতঃ মনে করা হতো যে, মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি নয়। তাই মৃত ব্যক্তির পূর্ব-জীবনে যেসব জিনিস ব্যবহার করত, পরবর্তী জীবনেও সেই সব জিনিসের প্রয়োজন আছে। এই কারণে মৃত রাজা, মন্ত্রী ও অভিজাতদের সঙ্গে তাঁদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস দিয়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয়তঃ অনেকে মনে করেন যে, রাজন্য ও যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং সূচনাপর্বে এই প্রথা কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, যুদ্ধে পরাজিত রাজন্যবর্গের স্ত্রীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ত এবং তাঁদের নানা নির্যাতন ও অসম্মানের শিকার—এমনকি তাঁদের বিজয়ীদের উপপত্নী ও ক্রীতদাসীতেও পরিণত হতে হতো। এমতাবস্থায় নারীদের আত্মাহুতি দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। এই কারণে রাজস্থান ও পাঞ্জাবে কেবলমাত্র পতির চিতায় পত্নীই নয়, ভ্রাতার চিতায় ভগ্নী এবং পুত্রের চিতায় মাতাও প্রাণ-বিসর্জনে বাধ্য হয়েছেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায় যে, গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে, যুদ্ধে কুলক্ষয় হয়, কুলক্ষয়ে চিরাচরিত কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং কুলধর্মলোপে সমগ্র কুল অনাচাররূপ অধর্মে অভিভূত হয়। অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুললক্ষ্মীগণ দুষ্টা হন এবং কুললক্ষ্মীগণ দুষ্টা হলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয় (গীতা, ১/৩৯-৪০)। অর্থাৎ নিহত রাজন্যবর্গ ও সৈনিকদের স্ত্রীরা বিজেতা পরপুরুষ গ্রহণে বাধ্য হয় এবং এর ফলে বর্ণসংকর ঘটে। অর্জুন বলছেন যে, কুলের সংমিশ্রণ হলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয় এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাঁদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন (গীতা, ১।৪১)। সুতরাং এমতাবস্থায় বর্ণসংকর ও কুলনাশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো নারীদের আত্মবিনষ্টি বা সহমরণ। মনু যুদ্ধের সময় সৈনিকদের অন্যান্য বস্তু লুণ্ঠনের সঙ্গে নারী লুণ্ঠনের (ক্রীতদাসী হিসাবে) সম্মতি দিয়েছেন (মনু সংহিতা, ৭।৯৬)। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ মহারাজ হর্ষবর্ধনের মাতা সহমরণদ্যোতা যশোমতী পুত্র হর্ষের কাছে স্বামী প্রভাকরবর্ধনের রাজত্বকালে তাঁর গৌরব ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ "কারাগারে বন্দিনী শত্রুপত্নীরা চামর দুলিয়ে আমাকে বাতাস করেছে।"[৮] তৃতীয়তঃ প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ডাইওডোরাস সিকুলাস ও স্ট্রাবো মনে করেন, প্রাচীনকালে অভিজাত পরিবারের নারীরা নানা কারণে নিজ স্বামীদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করত। এই কারণে স্বামীর জীবনের নিরাপত্তার জন্যই নাকি স্ত্রীদের—এমনকি দাস-দাসী ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মৃত ব্যক্তির চিতায় প্রাণবিসর্জনের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। চতুর্থতঃ এই প্রথার প্রবর্তন ও প্রসারে বিভিন্ন ধর্মীয় কারণ (স্বর্গলাভ, সতীর গৌরব অর্জন), স্বামীর মৃত্যুর পর পত্নীর জীবনধারণে অনীহা, বিধবাদের শোচনীয় অবস্থা, বিধবা প্রতিপালনে [illegible]দের আপত্তি এবং বিধবার নৈতিক অধঃপতনের ফলে পারিবারিক কলঙ্ক প্রভৃতিরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সতীদাহের প্রচুর উদাহরণ আছে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্রে এই প্রথার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এই মন্ত্র দুটির অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। সুতরাং ঋগ্বেদের যুগে ভারতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহাতীতরূপে কিছু বলা সম্ভব নয়। ঋগ্বেদে বলা হচ্ছেঃ

---

[৬] Position of Women in Hindu Civilization—A. S. Altekar, 1956, p. 116

[৭] The Wonder That was India—A. L. Basham, Orient Longman, 1963, p. 187

[৮] হর্ষচরিত, ৫ম উচ্ছ্বাস, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ১৩৪

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং
বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো
যোনিম্ অগ্নেঃ।' (১০।১৮।৭)

অর্থাৎ এই সব নারীগণ যাঁরা অবিধবা ও সুপত্নী, তাঁরা অঞ্জন ও ঘি নিয়ে চিতায় প্রবেশ করুন। অশ্রুশূন্য, দুঃখশূন্যা সেই স্ত্রীগণ উত্তম রত্ন-ভূষিতা হয়ে অগ্নিতে আরোহণ করুন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইলসন, ম্যাক্সমূলর ও কাউয়েল উপরোক্ত মন্ত্রের একটি শব্দে আপত্তি জানিয়েছেন। এই শব্দটি হলো 'অগ্নেঃ'। তাঁদের মতে 'অগ্নেঃ' স্থলে 'অগ্রে' শব্দটি আনলে সমগ্র শ্লোকটির অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁরা মনে করেন যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে 'অগ্রে' স্থলে 'অগ্নেঃ' করা হয়েছে এবং এইভাবে কয়েক শতক ধরে ভারতে নারীহত্যা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই শ্লোকটিকে লক্ষ্য করে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বলছেনঃ "This is perhaps the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands of lives been sacrified, and a practical rebellion threatened on the authority of a passage which was mangled, mistranslated and misapplied." রমেশচন্দ্র দত্তও মন্তব্য করছেনঃ "There is not a word in the above relating to the burning of widows. But a word in it *agre* was altered into *agne,* and the text was mistranslated and misapplied in Bengal to justify the modern custom of the burning the widows."

ঋগ্বেদে এর পরের মন্ত্রটিতে বলা হচ্ছেঃ

"উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং
গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং
পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥"
(১০।১৮।৮)

অর্থাৎ—হে নারী! সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত মন্ত্র দুটিতে কখনই একথা প্রমাণিত হয় না যে, ঋগ্বেদের যুগে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল—বরং 'নিয়োগ' প্রথা ও বিধবা বিবাহের অস্তিত্ব সতীদাহের অনুপস্থিতি প্রমাণিত করে।

সতীদাহ প্রথার সমর্থনে অনেকে (যথা রাধাকান্ত দেব) নারায়ণীয় উপনিষদের ৮৪-তম অনুবাকের অক্ষয় শাখায় উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় সংহিতার দুটি মন্ত্রের কথা বলেন। এই মন্ত্র দুটিতে অগ্নি-দেবতার কাছে জনৈকা বিধবা প্রার্থনা করছেঃ

হে অগ্নি, তুমিই সমস্ত ব্রতের অধিপতি, তাই তোমার নাম ব্রতপতি। স্বামীকে অনুসরণ করার ব্রত পালনের জন্য আমি মনস্থ করেছি। তা সম্পূর্ণ করার জন্য তুমি আমার সহায় হও।

হে অগ্নি, এই অনুষ্ঠানে আমি তোমায় প্রণাম জানাই। তোমার কৃপায় আমি আজই স্বর্গধামে পৌঁছাতে চাই। হে বেদের উৎস, আমার আহুতি দেওয়া ঘৃতে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে সহমরণে যাওয়ার শক্তি দাও ও আমাকে স্বামীর কাছে নিয়ে চল।

বলা বাহুল্য, নারায়ণীয় উপনিষদের প্রামাণিকতা ও রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। বলা হয়ে থাকে যে, এই উপনিষদ পরবর্তী কালের এবং উল্লিখিত অনুবাকটির উল্লেখ অন্যত্র কোথাও মেলেনি। সুতরাং তৈত্তিরীয় সংহিতা ও নারায়ণীয় উপনিষদ সংক্রান্ত বক্তব্য আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়।

অথর্ববেদে দুটি মন্ত্রে সতীদাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ

এই পুরোবর্তিনী স্ত্রী সহধর্মচারিণী বলে পতির অনুষ্ঠিত যাগাদি কর্মের ফলরূপ স্বর্গাদি লোক বরণ করতে চায়। হে মরণশীল মানুষ, এই স্ত্রী ভূলোক থেকে নির্গত তোমার কাছে অনুমরণের জন্য পুরাতন ধর্ম অনুপালনের জন্য যাচ্ছে। অনুমরণে গমনশীল এই স্ত্রীর জন্য

জন্মান্তরেও ভূলোকে পুত্রপৌত্রাদি ও ধন দাও। (১৮।৩।১)। দ্বিতীয় শ্লোকটি (১৮।৩।২) ঋগ্বেদের ১০।১৮।৮ শ্লোকের হুবহু পুনরাবৃত্তি যাতে সহমরণদ্যোতা নারীকে জীবলোকে ফেরার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

উপরিউক্ত মন্ত্র দুটিতে দুটি কথা বলা হচ্ছে। (১) সহমরণ 'পুরাতন ধর্ম', কিন্তু তা কত পুরাতন? (২) বিধবাকে জীবলোকে ফেরার আহ্বান জানানো হচ্ছে, কিন্তু কে সেই আহ্বান জানাচ্ছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথমে আলোচনা করা যাক। অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হচ্ছে যে, মৃতব্যক্তির ভাই, নিকট আত্মীয়, ছাত্র অথবা বিশ্বস্ত বৃদ্ধভৃত্য উক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করে বিধবাকে চিতা থেকে তুলে আনবে (৪।২।১৮)।

তাহলে বিষয়টি এরকম দাঁড়াচ্ছে যে, বৈদিক যুগে সহমরণ বাধ্যতামূলক ছিল না। নারী সহমরণে উদ্যোগী হতেন এবং আত্মীয়-বন্ধুদের অনুরোধে ফিরেও আসতেন। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর স্বাধীনতা ছিল। দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যে, এই যুগে সমাজে 'নিয়োগ' প্রথা ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং সহমরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, বৈদিক যুগে এই প্রথা অজ্ঞাত না হলেও বহুল প্রচলিত ছিল না।[৯] ঐতিহাসিক আলটেকর মনে করেন, এই প্রথা আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু নানা কারণে তারা পরে এই প্রথা ত্যাগ করেছিল। তাঁর মতে, মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা নারীর শয়ন এবং বন্ধুদের অনুরোধে তার জীবলোকে প্রত্যাবর্তন ছিল প্রাচীন প্রথার নিছকই পুনরাবৃত্তি মাত্র।[১০] বিশিষ্টভারততত্ত্ববিদ্ ডঃ এ. এল. ব্যাসাম মনে করেন, ঋগ্বেদের সহমরণদ্যোতক মন্ত্রটি (১০।১৮।৮) রচিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ নারী প্রকৃতই যখন সহমরণে যেত, এই মন্ত্রটি সেই যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১১]

এখানে প্রশ্নঃ ভারতে সহমরণ প্রথা কত প্রাচীন? আর্যদের পূর্বেও কি এই প্রথা প্রচলিত ছিল? সিন্ধুসভ্যতার লোথালে কয়েকটি সমাধিতে একই সঙ্গে একটি পুরুষ ও একটি নারীর কঙ্কাল শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেছে। হয়তো বা এগুলি প্রাগ্বৈদিক ভারতের সহমরণের ইঙ্গিত।

ঐতিহাসিক আলটেকর মনে করেন, আনুমানিক ৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ভারতে এই প্রথার কোন নজির পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃপূঃ—আঃ ৭০০ খ্রীঃপূঃ) এর কোন উল্লেখ নেই। গৃহ্যসূত্রগুলিতে (আনুমানিক ৬০০ খ্রীঃপূঃ—আঃ ৩০০খ্রীঃপূঃ) নানা প্রাচীন সংস্কার ও প্রথার কথা বলা হলেও সতী সম্পর্কে কিছু উল্লিখিত হয়নি। অশ্বলয়ন গৃহ্যসূত্রে (৪।২।১৮) বলা হচ্ছে যে, স্বামীর ভাই, নিকট আত্মীয়, ছাত্র অথবা বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য স্বামীর চিতা থেকে বিধবাকে ফিরিয়ে আনবে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৬।১) বলা হচ্ছে যে, বিধবা যখন চিতা থেকে ফিরে আসবে তখন সে মৃতের হাত থেকে সোনা, ধনুক বা রত্ন নিয়ে আসবে। এসময় এ আশাও করা হতো যে, বিধবা তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুখী ও সমৃদ্ধময় জীবন-যাপন করবে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূর্বে মৃতব্যক্তির বর্ণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের চিতায় যথাক্রমে সোনা, ধনুক ও রত্ন রেখে দেওয়া হতো। বিধবা চিতা থেকে উঠে আসার সময় তা নিয়ে

---

[৯] "The safe conclusion would be that the practice, even if known, was not widely prevalent."—The vedic Age, Ed. R. C. Majumdar, Bombay, 1957, p. 390 ; "So it appears that this custom was not very prevalent during the Vedic age."—Ibid. p. 454

[১০] Position of Women in Hindu Civilization, A. S. Altekar, 1956, p. 118

[১১] "This practice must look back to a time long before the composition of the hymn, when the wife was actually burnt with her husband."—The Wonder That was India, A. L. Basham, p. 187

আসত। ঋগ্বেদে (১০।১৮।৯) বলা হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির হস্ত থেকে ধনু গ্রহণ করলাম, এতে আমাদের তেজ ও বল লাভ হবে। বৌদ্ধ সাহিত্যেও সতী সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। এই যুগে সতী প্রচলিত থাকলে বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করতেন। মেগাস্থিনিস বা কৌটিল্যের রচনাতেও এর কোন উল্লেখ নেই। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে আনুমানিক ১০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন ধর্মসূত্রেও এর উল্লেখ নেই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ (আনুমানিক ১০০ খ্রীঃ—আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ) মহিলা ও বিধবাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে বিশদভাবে নানা কথা বললেও কোথাও সতীদাহের কথা বলেননি। মনুর মতে, বিধবা নারী কায়মনোবাক্যে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করবে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, পতিহীনা নারী পিতা-মাতা-পুত্র-ভ্রাতা-শ্বশুর বা মাতুলের সঙ্গে বাস করবে—নতুবা সে নিন্দনীয় হবে। ভৃগুর মতে, সাধ্বী ও পুত্রহীনা নারীরাও স্বামীর মৃত্যুর পর সংযমী তপস্বিনীর মতো জীবনযাপন করলে তারা স্বর্গারোহণ করে। বৃহস্পতির মতে, কঠোর আত্মসংযম, প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তি ও ভোগবাসনা পরিহারে অটল থাকলে অপুত্রক বিধবাও স্বর্গে যেতে পারে। তাঁর মতে, স্মরণ কীর্তন মনন কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বুলাদি ত্যাগ করে অনন্যচিত্তে মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবনাতিবাহনই বিধবার প্রশস্ত ধর্ম। শ্রবণ মননাদি দ্বারা জীবের ব্রহ্মলাভ হয়। সুতরাং ব্রহ্মলাভের হেতু এই দেহ, তা কোনক্রমেই স্বেচ্ছায় নাশ করা বিধেয় নয়। কাত্যায়নের মতে, কঠোর আত্মসংযমীর মতো জীবনযাপন করে বিধবারা অরুন্ধতীর সমান পুণ্য অর্জন করে স্বর্গে বাস করতে পারে। হারীত এপ্রসঙ্গে বিধবার কৃচ্ছ্রসাধনার কথা বলেছেন।

পরবর্তী কালে সমাজে বিধবা নারীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লে এবং বিধবা বিবাহ নিন্দিত হতে শুরু করলে ধীরে ধীরে সতীদাহ প্রথা বিস্তৃত হতে থাকে। ৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে এর কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের অধিকাংশই এসময় রচিত এবং সেখানে এই প্রথার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিকই যে, এযুগে সতীদাহ কোন সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়নি।

রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী কুন্তী 'শ্রেষ্ঠ ধর্মফল' লাভের জন্য সহগমনের কথা বললে 'স্বামী সহবাসে অপরিতৃপ্ত' মাদ্রী স্বামীর চিতায় প্রাণ-বিসর্জনের দাবি জানান। তিনি বলেন, (১) "আমি স্বামীসহবাসে পরিতৃপ্ত হইনি। অতএব আমিই স্বামীর সহগমন করব।" (২) "মহারাজ আমাতেই আসক্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। সেকারণে যমভবনে তাঁর অনুগমন করে তাঁর অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম এবং আমার অবশ্য-কর্তব্য।" (৩) তিনি নিজ পুত্র ও সপত্নী-পুত্রদের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারবেন না। তার ফলে "ইহকালে লোকনিন্দায় ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হতে হবে ; অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।"[১২]

বলা বাহুল্য, মাদ্রী-প্রদত্ত যুক্তিগুলি কখনই সহমরণের পক্ষে ধর্মীয় যুক্তি নয়। এছাড়া, এই ঘটনায় দেখা গেল যে, পতির মৃত্যুতে সকল পত্নী সহগমনে যাচ্ছেন না।

শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁর চার পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেন।[১৩] শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুসংবাদ হস্তিনাপুরে পৌঁছালে তাঁর পাঁচ পত্নী রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী ও জাম্ববতী চিতারোহণ করেন এবং "সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ" কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য বনে গমন করেন।[১৪] [ক্রমশঃ]

---

[১২] মহাভারত, আদিপর্ব, ৯৫তম ও ১২৫তম অধ্যায়, পৃঃ ১৩১

[১৩] ঐ, মৌসলপর্ব, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ৬

[১৪] ঐ, পৃঃ ৮

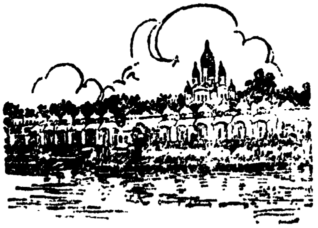

মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর পরীক্ষা শিষ্যে, শিষ্যের পরীক্ষা গুরুতে। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ; আর ইংরেজী-শিক্ষিত নবযুবকদের মধ্য হইতে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা নরেন্দ্রনাথকে জানি, চিনি, সেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও বুঝি, তাই ভগবান রামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ। একবার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাঁহার একটা বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতেছিলাম, সে আমাদের মুখে হাত চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছিল, "তোরা যদি অমন কথা বলবি তো আমি দাঁড়াব কোথা ? কার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সখ্যের সাধ মিটাইব !"—উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "দেখ দাদা, শলুই চিনতে পারলে জাত সাপের পরিচয় অনেকটা জানতে পারা যায়। আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের মহত্ত্ব চেনবার চেষ্টা করছি। তাঁহাকে তো দুইবারের অধিক দেখি নাই। তোমার মতো সামগ্রী যাঁহার কৃপায় তৈয়ার হইতে পারে, তিনি যে কৃপার সাগর—সর্বনিধির আধার।" বিবেকানন্দ আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠে

"আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি,
পাছে তারা-হারা হ'য়ে থাকি।"

এই গানটি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে অপূর্ব ভাব মিশাইয়া গাহিলেন।

বিবেকানন্দ কৃপাসিন্ধু। তাহার ইংরেজী বিদ্যার বহর জানিতাম। পরে আমেরিকা ও ইওরোপে যাইয়া সে যে-বিদ্যার ও যে-তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব লীলা দেখিয়াছিলাম। ভগবান রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়াইয়া বাঙ্গালার যে উর্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভাল হইবে কেন! তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া-বোয়ার ভার পড়িয়াছিল। এ-কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়োদর্শনজাত যেটুকু স্পর্ধার প্রয়োজন, সে-সকলই বিবেকানন্দের পূর্ণ মাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দে ইওরোপের তেজস্বিতা, মানবতা এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পুরামাত্রায় ছিল। সে জল-বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শুখা-রুখায় পুড়িয়া যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছে, যখন দেবতার কৃপায় পুরা ফসল হইবে, ক্ষেতভরা ধান হইবে, তখন বাঙ্গালী বুঝিবে—কত বড় পুরুষ-সিংহ তাহাদের জন্য কি কাজ করিয়া গিয়াছে। ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়—ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরিব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে ; সবাই এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছেন। যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসী বাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায় না, বসন্ত রোগী দেখিলে সংকুচিত হয় না, উত্তাল

তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর-সঙ্গমে ঝম্প প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করে না, সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! সংসারের সুখ অপেক্ষা, ঘর-বাড়ি স্ত্রী-পরিবারের আয়েস অপেক্ষা বৃহত্তর, প্রগাঢ়তর, প্রবলতর একটা সুখ, আনন্দ, উন্মাদনা না পাইলে মানুষ কি সহজে এ দুনিয়ার চাকচিক্য ভুলিতে পারে? যে গুরু এমনভাবে শিষ্যকে ভুলাইতে পারেন সে গুরু সত্যই তো ঈশ্বর—ঈশ্বরের অবতার।

বিবেকানন্দ গুরুগিরি করিতে আসেন নাই—কেবল ভাব বিলাইতে আসিয়াছিলেন। তেমন সরল হাস্যময় মিত্র, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর আর কখনো দেখি নাই। তাহাকে ফাঁকি দিবার জো-টি ছিল না, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনও অভিমান ছিল না। আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বড় বক্তা, মিত্র-সংসর্গে এ-ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না। বিবেকানন্দ একজন বড় দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সে ভাব চাপিয়া রাখিতেন। একবার ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সামলাইতে পারিব না। আমার যে কাজ, সে কাজ এখন তো শেষ হয় নাই। ও দিকটা ফুটাইও না—আমি পাগল হইব।" গান গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দ এক এক সময় সত্যই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন আমার কন্যাকে লইয়া "তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ দেখি শ্যামা" এই গানটি গাহিতে গাহিতে চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে নাচাইতে বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর মেয়েটিও তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থির ধীর নিস্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ এই ভাব প্রায়ই চাপিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "দ্যাখ্, এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে এমন মদ নেই যাকে ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙ্গালী চারশো বছর মাতাল হয়ে ছিল। আর ও মদ চালানো ঠিক নয়।" তাই বিবেকানন্দ কর্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।

সে চলিয়া গিয়াছে, গুরুদত্ত বীজ ছড়াইয়া, গুরুর গৌরব-ডঙ্কা বাজাইয়া, সর্বসামঞ্জস্যের মহামন্ত্র বাঙ্গালীর কানে বজ্রগম্ভীরনাদে উচ্চারণ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এখন তো তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসে নাই। তাই স্মৃতিসুখে সুখী হইয়া আর একজনের আশা-পথ চাহিয়া আছি। এস তুমি, ডাকার মতো ডাকিলে নাকি তুমি আসিয়া থাক, তাই তোমায় ডাকিতেছি! তুমি অন্যরূপে আসিয়া অবতীর্ণ হও। তোমার কর্ম পূর্ণ কর।*

প্রবাহিণী, ২২ ফাল্গুন, ১৩২০

ধারাবাহিক-সঙ্কলন

সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

(১১)

চন্দ্রেশ্বরের মৌনী

(১০।৯।১৯৩৬)

হৃষিকেশ চন্দ্রেশ্বর মন্দিরে এক মৌনী উপস্থিত। গাছতলায় বসিয়া থাকেন। যাত্রিগণ তাঁহার সামনে টাকা পয়সা ইত্যাদি ভেট দিল। সে উহা গ্রাহ্য না করিয়া অন্য স্থানে যাইয়া বসিল। মোহন্তরা লালচি হয়। চন্দ্রেশ্বরের মোহন্ত সে টাকা উঠাইয়া লইল ও তাহার জন্য ভাল কুঠিয়া এবং দুধ প্রভৃতি খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। যাত্রী আসিলে মৌনীর নিকট পাঠাইয়া দিত ও ভেটাদি মোহন্ত গ্রহণ করিত। মোহন্তরা একটু লোভী হয় তো! আমাকে সেখানে রাখিয়া মোহন্ত কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গেলেন। আমি মৌনীজীর দুধ আদি খাবার একদিন রাত্রে তার ঘরে লইয়া যাইয়া দেখি যে, সে ঘুমাইতেছে। কিন্তু আমার যাইবার শব্দ পাইবামাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চোখ বুজিয়া আসন লাগাইয়া বসিয়া গেল। আমি দেখিয়াই বুঝিলাম ব্যাপার কি। পরদিন বলিলামঃ "মৌনীজী! খানপানের জন্য সাধু হওয়া উদ্দেশ্য নহে। আদর্শের দিকে লক্ষ্য কর।" ক্রমে ৫।৭ দিন পর সে আমাকে বলেঃ "মহারাজ! আমাকে দয়া করিয়া কিছু পড়াও।" ব্রাহ্মণ-শরীর তাহার। লেখাপড়া কিছুই জানে না। অক্ষর পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া 'আত্মবোধ', 'তত্ত্ববোধ', 'অপরোক্ষানুভূতি'—এসব বই পড়িল। আশ্রমের কাজকর্মে লাগিয়া গেল। অবশেষে স্বতন্ত্র কুঠিয়া তৈরি করিয়া সাধন-ভজনে রত হইল। বড় ভাল লোক ছিল। আমি উত্তরকাশী আসার পর তাহার দেহ যায়। কত বিপথে ঘুরিয়া তবে মানুষ যথার্থ পথে আসে॥

(১২)

প্রকরণ গ্রন্থ

(১০।৯।১৯৩৬)

ভাষ্যকার প্রস্থানত্রয়-ভাষ্য রচনা করিয়া পরে 'সিংহাবলোকন ন্যায়ে' পশ্চাতে তাকাইয়া ভাবিলেন, 'ওহ্, এতো বড় গম্ভীর ভাষ্য হইয়াছে। ষড়্দর্শনের জ্ঞান ব্যতীত সাধারণ লোকের ইহাতে প্রবেশ দুঃসাধ্য।' তাই তখন লোক-কল্যাণার্থ আত্মবোধ, তত্ত্ববোধ, অপরোক্ষানুভূতি, উপদেশসাহস্রী পর্যন্ত প্রকরণগ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন। সর্বজ্ঞ পুরুষ কিনা! জানিতেন পরে কি প্রকার সব অধিকারী আসিবে।

(১৩)

জ্ঞানীর ব্যবহার

(১০।৯।১৯৩৬)

জ্ঞানীর দেহাভিমানের এত অভাব হইয়া যায় যে দেহযাত্রাদি ব্যবহার স্বভাববশে আপনা আপনি সাধিত হয়। পূর্বে যে কর্মাদি করিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানের পরও সেই পূজা, ধ্যান, স্নান আহার সব স্বভাববশে করিয়া যান।

আলমোড়ায় এক ব্রাহ্মণ পাগল হইয়া যায়। সে কাশীতে ৩০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিল। পাগল হইবার পর সে শৌচে বসিয়াই হয়তো বেদ পাঠ করিত। পূর্বাভ্যাসবশতঃ আপনা আপনি এইরূপ হইত। যেরূপ, বড়লোক ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বেড়ায়। বাবু হয়তো গাড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু ঘোড়া চিরঅভ্যাসবশতঃ গাড়ি ঠিক বাড়ির সামনে লইয়া উপস্থিত। বিদ্বানের মনও এরূপ ঘুমাইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মস্থিত থাকে, কিন্তু তাঁর শরীর ইন্দ্রিয়াদি স্বভাববশে কার্য করিয়া যায়।

(১৪)

বিচার

(১০।৯।১৯৩৬)

বিচার দীর্ঘকাল বুদ্ধিপূর্বক করিতে হয়। এক সাধুর চেলা ঘোড়া চরাইত। গুরু শিষ্যকে বলিলেন, 'আরে বেটা! তু ক্যা করতা হ্যায়? কুছ বিচারভী করনা।' শিষ্য গুরুর আজ্ঞায় ঘোড়া চরাইবার সময় বিচার করিতে লাগিলঃ 'ঘোড়া একহী মুহ্সে পানী, দানা দোনোভী

খাতা হ্যায়। পেটমেঁ ভী এক হোতা হ্যায়, লেকিন্ বাহর নিকলনে কী বখত্ অলগ অলগ ক্যাসে হোতা হ্যায়?'—ছয়মাস পর গুরু পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুছ বিচার করতা হ্যায়?' শিষ্য বলিলেন, 'হাঁ মহারাজ।'—তাৎপর্য এই যে, এরূপ বিচারে কি হইবে?

যোগ্যতা চাই, তারপর গুরুর মুখ হইতে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর আত্মবিচার করিলে কালে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(১৫)

হোসিয়ারপুরের জ্ঞানী

(১০।৯।১৯৩৬)

হোসিয়ারপুরের নিকট 'দুন' নামে এক স্থানে নদীর তীরে এক সাধু দেখিয়াছি। তার মুখে এক বুলি—'বাহ্‌জী বাহ্।' আমি তাহাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু ঐ একই উত্তর, 'বাহ্‌জী বাহ্, আচ্ছা স্বাঙ্গ দিখায়া।' এক অশ্বারোহী সৈনিক একদিন তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু ঐরূপ উত্তরে প্রার্থিত জবাব না পাইয়া সাধুকে এক চাবুক মারিয়া চলিয়া গেল। সাধু রাগ না করিয়া সেই কথাই বলিলেন, 'বাহ্‌জী বাহ্, আচ্ছা স্বাঙ্গ দিখায়া।' পরে দুর্ঘটনায় ঐ ব্যক্তি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হইয়া লোকের নিকট ঐ সাধুর উচ্চ অবস্থার কথা শুনিল। তখন সে অনুতপ্ত হইয়া সাধুর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলে তখনো সাধুর মুখে সেই বুলি—'বাহ্‌জী বাহ্, আচ্ছা স্বাঙ্গ দিখায়া।'—তাৎপর্য এই যে, সাধু স্বাঙ্গী আত্মাকে সর্বদা দেখিতেছেন কিনা, তাই সুখ-দুঃখে সদা সমভাব। এক পরমাত্মাই বিভিন্ন বেশে নানা লীলা করিতেছেন।

(এই প্রসঙ্গকালে উপস্থিত স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজী মহারাজ আর একটি ঘটনা বলিলেন—)

লাহোরে এক বৃদ্ধ ধার্মিক লোহার ছিল। তাহার দোকানের নিকট কয়েকটি মেয়ে সুতাকাটা তাকলি লইয়া খেলা করিতেছিল। একজনের তাকলিটি খারাপ হইয়া যায়। অপর সকলের কথামত সে মেয়েটি ঐ লোহারের নিকট তার তাকলি মেরামত করিতে গেল। 'বাবা, মেরী তাকলি সুধা কর দে' মেয়েটির এই আহ্বানে বৃদ্ধ লোহার মাথা তুলিয়া দেখিল সম্মুখে এক অপূর্বা সুরতওয়ালী বালিকা। লোহার বলিয়া উঠিল, 'বাহ্‌জী বাহ্'। বালিকা অন্যভাব মনে করিয়া চটিয়া গেল। বালিকা বলিল, 'তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার আক্কেল নাই?' বৃদ্ধ বুঝিল বালিকা তাহাকে সন্দেহ করিতেছে। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে দুইখণ্ড লৌহশলাকা আপন চক্ষে প্রদান করিয়া বৃদ্ধ বলিল, 'বেটি, যদি আমি তোর দিকে অন্যভাবে তাকাইয়া থাকি তবে আমার চোখ অন্ধ হইয়া যাইবে।' কিন্তু বৃদ্ধের অক্ষতচক্ষু দেখিতে পাইয়া বালিকা মুগ্ধ হইয়া গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, তবে তুমি ওরূপ বলিলে কেন?' বৃদ্ধ বলিল—'মা যাঁর প্রকাশে, যাঁর দীপ্তিতে তোর এ কান্তি, এ মাধুরিমা, আমি তাঁহাকে দেখিয়া ঐরূপ বলিয়াছি।' বৃদ্ধের উপদেশে বালিকা তত্ত্বের সন্ধান পাইল। বাড়ি ফিরিয়া গিয়া বালিকা বলিল, 'আমি আমার খেলার তাকলি ও অন্তরের তাকলি দুটাই সুধা করিয়া লইয়া আসিয়াছি।'

(১৬)

অজাত হইয়াও জগৎ দুঃখদায়ী।

(১০।৯।১৯৩৬)

এক ব্রাহ্মণ তার বালিকা কন্যাকে একেলা ঘরে রাখিয়া বিশেষ কার্যব্যপদেশে অন্যত্র গমন করিল। সন্ধান পাইয়া রাত্রিতে সিঁদ কাটিয়া ঘরে চোর ঢুকিয়াছে। টের পাইয়া বালিকা ভাবিল যে, এখন চিৎকার করা বৃথা, তাহা হইলে চোর তাহাকে মারিয়াই ফেলিবে। সে তখন স্বপ্নের ভান করিয়া বলিতে লাগিল—"আমার বিবাহ হইবে, যথাসময়ে তিনটি পুত্র হইবে। তাহাদের নাম রাখিব 'টিকা', 'মানস' ও 'চোর'। তাহারা যখন দূরে খেলা করিতে যাইবে তখন খাবার জন্য তাহাদের জোরে জোরে ডাকিব তাহাদের নাম ধরিয়া।"—এই বলিয়া বালিকা ঐ তিন নামে চিৎকার করিতে লাগিল। তখন 'টিকা' ও 'মানস' নামক দুই প্রতিবেশী ছুটিয়া আসিল ও চোর ধরা পড়িল।

চোর বলিল, 'এই মেয়েটির অনুৎপন্ন পুত্ররাই আমাকে ধরিল, কি আশ্চর্য! ছেলে জন্মিলে না জানি কি হইত!' তাৎপর্য এই যে, মায়িক জগতও এরূপ না হইয়াই সকলকে ফাঁসাইতেছে। [ক্রমশঃ]

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ

সুশীলকুমার রুদ্র

আধুনিকতার প্রসঙ্গটি বহুবিচিত্র, জটিল এবং সুদীর্ঘ। এদেশে ইংরেজ আগমনের পর থেকেই সমাজের নানা স্তরে ধীর অথচ সুনিশ্চিতভাবে আধুনিক চিন্তাভাবনা দেখা যাচ্ছিল। তবে অবশ্যই পুরনো মূল্যবোধ এবং জীবনরীতির সঙ্গে ইংরেজ-আগমন পরবর্তী বাঙালি জীবন-ভাবনার সংঘাত বেধেছিল। এই ভাব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী কালে নবজাগরণের ক্ষেত্রটিও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য তখন থেকেই নবজাগরণের সমার্থক হিসাবে 'আধুনিক' শব্দটি প্রচলিত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে—এই আধুনিকতার ভাবনাটি হয়ে উঠেছিল স্পষ্টতর ও বিচিত্রধর্মী। ঐ শতকের গোড়াতেই এদেশে বাবু, ডিরোজিয়ান ও ধর্মীয় মৌলবাদী—এই দিশেহারা শহরভিত্তিক ত্রিধাখণ্ডিত সমাজের ভিতর থেকেই স্বতন্ত্র মননের একটি ধারা উদ্গত হয়েছিল। এর প্রথম ধারক রাজা রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ভগীরথের মতো রামমোহন এসেছিলেন মুক্তচিন্তার স্রোতে ইতিহাসের আবর্জনারাশিকে ভাসিয়ে দিতে। মধ্যযুগের অবরুদ্ধতায় এদেশে চিন্তার স্রোত গিয়েছিল শুকিয়ে। ধুলোর মধ্যে পোকায় কাটা পুঁথির স্তূপে চিন্তার তেজ পড়েছিল চাপা। নিশ্চল আচার পুঞ্জ, নিরর্থক আনুষ্ঠানিকতা ও মননহীন লোকব্যবহারের ছোট ছোট গণ্ডিতে সমাজ ছিল বহুধাখণ্ডিত। ঠিক এই পরিবেশ থেকে রামমোহন বেরিয়ে এসে মুক্তচিন্তার স্রোত প্রবাহিত করতে চাইলেন। মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা প্রচণ্ড নাড়া খেল। শুধু বাংলাদেশে নয়, বহির্ভারতেও সেসময় মুক্তচিন্তার স্লোগান উঠেছিল। ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়ে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার স্লোগান উঠেছে। একদিকে যেমন নতুন নতুন উপনিবেশ তৈরি হচ্ছে, সেই সঙ্গে আমেরিকায় উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি ঘটেছে, ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতা শিল্পবিপ্লব ত্বরান্বিত করেছে। টমাস পেইন শোনাচ্ছেন চিন্তার মুক্তির কথা; কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলছেন ভলতেয়ার ; মিল, বেন্থাম, হিউম, রিকার্ডো বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাকে প্রভাবিত করছেন এবং ইংল্যান্ডের পার্লামেণ্টে বার্ক, ব্যাথাম, ফক্স বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই অভিঘাতগুলি এদেশেও এসে পৌঁছচ্ছে। বহুদিনের আবদ্ধতায় হাঁপিয়ে ওঠা এদেশের মানুষের মনে পরিবর্তনকামিতার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে জেগে উঠেছে। স্পষ্টতই এই পরিবর্তনকামিতার মধ্যেই আধুনিকতার ব্যাপারটি প্রকটিত। সাহিত্যে শিল্পে আধুনিকতার একটি সুস্পষ্ট ছাপ প্রকাশ পেয়েছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে সেকালীন আধুনিকতার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত। তাঁরও পূর্বে ১৮৫২ খৃস্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে' সচেতনভাবে বাঙলাকাব্যের পুরনো বক্তব্য-বিষয় ও আঙ্গিক-প্রকরণকে নস্যাৎ করে দিয়ে নতুন ভাব-ভাবনা ও আঙ্গিকের অবতারণার কথা ঘোষণা করেছেন। নারী-স্বাধীনতা, নব-মানবতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সুরুচি—সেকালীন সমাজের নবজাগরণের যেমন বৈশিষ্ট্য, তেমনি বাঙলাকাব্য-আধুনিকতার-ও বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রমননে আধুনিকতার ব্যাপারটি অবশ্য অন্যরূপ নিয়েছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা সে-বিষয়টিই আলোচনা করব।

রবীন্দ্র-মানসে আধুনিক ধারণাটি সাহিত্যের মূল আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাহিত্যের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে চিরকালীন হয়ে ওঠা। যুগের, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ—সাহিত্যিক বা শিল্পীর সেটা অভিপ্রেত নয়। আবার এও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যুগজীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের আধুনিকতা সূচিত হয়। সেই কারণে প্রধান প্রধান কবি, সাহিত্যিকরা সৃষ্টিলগ্নে খেয়াল রাখেন,

বিশ্বের উপর তাঁর হৃদয়ের অধিকার কতখানি প্রসারিত হয়েছে এবং এটাও স্মরণে রাখার চেষ্টা করেন, স্থায়ী আকারে তাঁর কাব্য কতখানি ব্যক্ত হয়েছে। এ-দুয়ের মিলনেই বড় কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব। কবির কল্পনা-সচেতন মন যতই বিশ্ববিহার করতে পারবে, ততই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের উপর পাঠকদের মন আকৃষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মূল লক্ষণ হিসাবে এই ব্যাপারটিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ঐ-সময় সাহিত্যের প্রাণ হিসাবে চিরন্তনত্বকে বুঝিয়েছেন। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-কথায় স্পষ্টাকারে বলেছেনঃ "যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে সাধারণতঃ তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানা প্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবাৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান যব গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি ; কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টায় মানুষের প্রিয় চেষ্টা। অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায় তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এই জন্যই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।"

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আধুনিকতা বলতে তার চিরকালীন আবেদনকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। সমসাময়িক কালকে নিয়ে কবি-সাহিত্যিক কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু চিরকালীন মানুষ ও সমাজই তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সুগভীর দৃষ্টি দিয়ে পাঠক ও শিল্পীর রুচিবোধকে লক্ষ্য করেছেন। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাকালে তিনি বলেছেন, সাহিত্যিক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমসাময়িককালের চিন্তা-ভাবনা, মানসিক গতি-প্রগতিকে লক্ষ্য রেখে কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করেন, অপরদিকে পাঠকের মনে তৎসাময়িক বা তৎস্থানিক বিষয়ই স্থান করে নেয়। বলাবাহুল্যে সেই সাহিত্য যুগ বা কালকে অতিক্রম করতে পারে না। আবার সাহিত্যের বিচারকদেরও বর্তমান কালকে সাক্ষিগণনা করে সাহিত্যের বিচার করতে নিষেধ করেছেন। কবি এই ধরনের চিন্তা করেছেন ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের দিকে।

আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েই। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে আধুনিকতা সম্পর্কে তিনি যে মত বা ধারণা পোষণ করতেন ১৯১০-এ তার পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এর-ও পরে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে আধুনিকতা সম্পর্কে 'বাঙলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে যে-ধারণা পোষণ করেছেন তাতেও কিছু নতুন বক্তব্য রয়েছে। সেখানে বাঙলা-সাহিত্যের গতিবেগকেই আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের অন্তরাত্মা বলে অভিহিত করেছেন। বাঙলা-সাহিত্যের আধুনিকতা যে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল সেকথাও সেখানে তিনি বলেছেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে লেখা 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে তিনি আধুনিকতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা বহু পরিচিত ও বহুশ্রুতঃ "পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন। বাঙলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" লক্ষণীয়, কবি কালের ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের ধর্মকে মিশিয়ে ফেলেননি। কালের উপরে স্থান দিয়েছেন ভাবকে বা চেতনার পরিবর্তনকে। নদী সোজা পথে চলার সময় তার গতি এক থাকে, কিন্তু যেই বাঁক নেয় অমনি তার গতি পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি লক্ষণীয়। সাহিত্যধারাও এমনি সোজা পথে চলতে চলতে গতি পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনকেই বলে সাহিত্যের আধুনিকতা। সাহিত্যের এই পরিবর্তনের পিছনে অবশ্যই কিছু কারণ থাকে যেমন থাকে নদীর। শুধু নদী কেন, সকল ধরনের পরিবর্তনের পিছনে

কিছু কিছু কারণ থেকেই থাকে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, স্থূল বা সূক্ষ্ম হতে পারে। জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের রূপান্তর ঘটে; আর এর মধ্যেই রয়েছে সাহিত্যের আধুনিকতা।

আধুনিক শব্দটির ব্যুৎপত্তি করলে দাঁড়ায় অধুনা+ষ্ণিক্ অর্থাৎ বর্তমানকে ঘিরেই এর অর্থ ব্যঞ্জিত। আধুনিক শব্দটি উচ্চারণ করার সময় আরও কয়েকটি সমার্থক শব্দ আমাদের মনে ভেসে ওঠে, যেমন—সমসাময়িক, সাম্প্রতিক প্রভৃতি। (এই তিনটি শব্দের অভিধেয়ার্থের দিক থেকে পার্থক্য আছে)। ইংরেজিতে শব্দগুলিকে এইভাবে বিন্যস্ত করা যায়—Modern, Contemporary, এবং Current। সমসাময়িক বা সাম্প্রতিকের কালসীমার চৌহদ্দি থাকে, কিন্তু আধুনিকতার তা থাকে না। সাম্প্রতিকতার সঙ্গে ক্ষণভঙ্গুরতার একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে। যে-মুহূর্তে তার অস্তিত্ব অনুভবে সত্য হয়ে ওঠে, তা আতঃ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। চলমান সময়ের সাক্ষী বা কালের প্রবহমানতাকে বার্গসন ডিউরি বলেছেন সাম্প্রতিকতা যা সমকালীনতার মধ্যে অনুভব করা যায়। একে আধুনিকতার পূর্বসূত্র বলা যেতে পারে; পুরোপুরি আধুনিকতা বললে সঠিক বলা হবে না। কারণ সমকালকে আমরা সাক্ষিচৈতন্যের মতো লক্ষ্য করে যাই, সেখানে আমাদের নির্বাক ভূমিকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করতে হয়। ঘটমানতার দুরন্ত স্রোতে মন স্বাভাবিকভাবেই কোন কিছুকে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সমকালে যা ঘটছে তাকে অনেকে আধুনিক বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিকতা বলতে ঠিক এ ধারণা পোষণ করেননি। তাঁর মতে, আধুনিকতা কোন কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমসাময়িক কালের সাহিত্য অনেক সময় কালোত্তীর্ণ হতে পারে না, তার টিঁকে থাকা সময়-সীমার মধ্যেই। আর সাম্প্রতিক সাহিত্যও প্রায়শই একটি বিশেষ কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ, কালকে অতিক্রম করার শক্তি খুব অল্পই থাকে। অপরদিকে আধুনিক সাহিত্যের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। গত শতাব্দীর কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টি আজও আমাদের মনের কাছে আবেদন রাখতে পারে, আবার বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকের এমন অনেক কবি আছেন যাঁরা আধুনিককালে লেখনী ধরেও প্রাচীনের সামিল হয়েছেন; আধুনিক মনের খোরাক জোগানোর সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। এঁরা কিছুটা পরিমাণে সংরক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাদী—যেমন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বাগচী প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কালোত্তীর্ণ; সেকারণের আধুনিক। পাশ্চাত্যের গ্যেটে, কিপলিং, ইয়েটস—এঁরা সকলেই বহু পিছনের কালের কবি, কিন্তু এঁদের সাহিত্যের আবেদন আজও পাঠকের অন্তরে রয়েছে। এঁরা এযুগেও আধুনিক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিকতার বিচারে কালের মাপকাঠি সবসময় যথোপযুক্ত পরিমাপক-যন্ত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেশ-কাল-পাত্রকে অস্বীকার করতে বলছেন না। তাঁর বক্তব্য, দেশ-কাল-পাত্রকে গ্রহণ করে, ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই শিল্পী-সাহিত্যিককে আধুনিকতার সৃষ্টি করতে হবে। মাইকেল মধুসূদন ঠিক এই জিনিসটি করেছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ দেশ-কাল-ঐতিহ্যের পটভূমিকায় কবি মধুসূদন কী নতুন ভাবনা-চিন্তার আমদানী করলেন, তা-ই ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গদর্শনে লেখা 'সাহিত্য-সৃষ্টি' প্রবন্ধে বললেন। আধুনিকতার স্বরূপ বিচারে মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি স্মরণীয়ঃ

"মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটি বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহার শাসন

ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই।"

মেঘনাদবধ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক লক্ষণগুলি দেখেছেন তা হলো ঃ প্রথমতঃ এ কাব্যে তিনি যুগের পটভূমিতে ভাব ও রসের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন ; অবশ্য তা বিষয়কে ঘিরেই। এই পরিবর্তন কবির সচেতন মনের প্রয়াসের ফলেই সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাব্যের মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছে কবির বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই। বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? পুরাতন সংস্কার ও ধর্মভাবনার বিরুদ্ধে কবির এই বিদ্রোহ। আর এই বিদ্রোহের মধ্যেই নতুন সুর ধ্বনিত। এই সুর একই সঙ্গে বিষয়-ভাবনায় এবং প্রকাশে। বিষয়ের দিক থেকে পুরনো মূল্যবোধ ও সংস্কারকে নস্যাৎ করেছেন বলিষ্ঠ আঘাতে ; আর প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃত্রিম পয়ারের বন্ধন ভেঙে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অমিত্রাক্ষরের জয়যাত্রা শুরু করিয়েছেন। মধুসূদনের কাব্যের আধুনিকতা প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ডানিয়েল লার্নার-এর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি প্রগতিশীল আধুনিকতার পিছনে ভৌগোলিক সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বি গতিশীলতাকে লক্ষ্য করেছেন।

লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে আধুনিকতা বলতে বিদ্রোহ ও অভিনবত্বকেই মনে করতেন। পুরনো ভাবনা, আদর্শ ও সংস্কারকে পরিত্যাগ করে তার জায়গায় নূতন জীবনবোধের সূচনাকে আধুনিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আর এই আধুনিকতার পিছনে গতিশীলতা ও পরিবর্তন রয়েছে সেকথাও পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলেছেন। তিনি আধুনিকতার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট হিসাবে ইংরেজি-সাহিত্যের প্রভাবকেও নির্দেশ করেছেন ঐ প্রবন্ধে। বলেছেন ঃ "ইওরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে ; ইওরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎ-ঘটিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে, এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণ-কথার একটি নূতন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল।"

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে (৪ মাঘ ১৩৪১) রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে গতিবেগকে আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের প্রাণ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ মধুসূদন যে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিলেন সেকথাও বলেছেন ঃ "নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি সেই নবপ্রভাতে উদ্বেলিত হলো অমনি প্রতিভা তখনকার বাঙলা ভাষার পায়ে চলার পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করল না ... বাঙলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতার দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের বাঙলা-সাহিত্যের আধুনিকতার পিছনে সমকালীনতাকেই বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করেছেন। মধ্যযুগীয় পরলোক সর্বস্বতার জায়গায় ঐ শতাব্দীর সাহিত্য ও তিতে ঐহিক হিতবাদ, বিজ্ঞান-মনস্কতা এবং প্রশ্ন-মনস্কতাকে লক্ষ্য করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মে, বঙ্কিম ও মধুসূদনের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এরই যথার্থ পরিচয় মেলে। এছাড়া নবযুগের মধ্যে উদ্ভাসিত হতে দেখেছেন আশার আলোক, গীতিধর্ম ও বৈচিত্র্যকে এবং এগুলিকে জীবন ও সাহিত্যের আধুনিক লক্ষণ হিসাবে ধরেছেন। এর পরে ভারত-ইতিহাসের আবার পরিবর্তন ঘটেছে ; রবীন্দ্রনাথ সে ইতিহাসও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। উনিশ শতকের পর যখন বিশ শতক এল রবীন্দ্রনাথ তখন প্রৌঢ়।

সেকালে লক্ষ্য করলেন, ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সর্বত্র একটা রাষ্ট্রিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, সন্ত্রাস এবং চাপা বিদ্রোহ। রুশ-জাপান যুদ্ধ, বুয়র যুদ্ধ, রুশদেশে জারতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত, কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মনোমালিন্য, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রভৃতি। এসবের ঘনীভূত উত্তাপ কবি রবীন্দ্রনাথের মনে লেগেছিল এবং এ থেকেই তাঁর মনে স্বাদেশিক চেতনার উদ্ভব, যা আধুনিকতার অন্যতর লক্ষণ। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশও এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। রবীন্দ্রকাব্যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় প্রায় সর্বত্র। এমনকি খোদ ভক্তিরসের কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও এর আভাষ সূচিত হয়েছে। গীতাঞ্জলির 'ভারততীর্থ', 'দীনের সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতায় কবির মানবতাবাদ ও দেশাত্মবোধ সুতীব্র আকার ধারণ করেছে। 'অপমানিত' কবিতায় তিনি পতিত জাতিগুলির উপর উচ্চ বর্ণের হিন্দু-সমাজের সামাজিক লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে জানিয়েছেন তীব্র অগ্নুৎগার।

কবির স্বদেশচেতনার সঙ্গে অন্বিষ্ট ছিল বিশ্বভাবনা। এই বিশ্বভাবনা তাঁর অতি আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্ভূত। আবার এই উৎপত্তি সুগভীর কালসচেতনতা থেকেই। আধুনিক কালের সমস্যা তাঁর কাব্য নাটক উপন্যাসে ব্যঞ্জিত হয়েছে। গোরা, চার অধ্যায়, প্রভৃতি উপন্যাসে, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা প্রভৃতি নাটকে এবং তাঁর গোধূলি পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে যে আধুনিক সমস্যা শিল্পাকারে ব্যক্ত হয়েছে তা তাঁকে অতি আধুনিকের কাছে এনে দাঁড় করিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এসবকে ছাড়িয়ে তিনি এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তায় বিলীন হয়ে যেতে পেরেছেন। সেখানে তিনি আধুনিকতাকে চিরকালীনতার সঙ্গে এক করে দিতে পেরেছেন। সমকালীনতা তাঁর কাব্যকে স্থূল করে দিতে পারেনি। বরং দেশকালকে অতিক্রম করে সাহিত্যের নিত্য স্বরূপটি বিরাট একটি মূল্য নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়ে থাকে। এখানেই তাঁর শিল্পীসত্তার সার্থকতা।

রবীন্দ্র-চেতনায় আধুনিকতার স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে আর একটি দিক অনুধাবনযোগ্য তা হলো তাঁর বিজ্ঞান-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শেই এই চেতনা সংক্রামিত হয়েছিল রবীন্দ্রমানসে। বিশেষ করে বিশ শতকীয় আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি কবিকল্পনাকে আলোড়িত করেছিল প্রভূত পরিমাণে। অবশ্য এসবই ঘটেছিল রবীন্দ্রকল্পনার শেষ পর্বে। কিন্তু প্রথম পর্বে যে একেবারেই এর ছোঁয়া লাগেনি তা নয়। তাঁর যৌবনকালের পৃথিবীপ্রীতি বিষয়ক রচনায় মাঝে মাঝে পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ অথবা গ্রহরূপে পৃথিবীর প্রথম আবির্ভাবের ভৌগোলিক ছবিও প্রসঙ্গক্রমে স্থান পেয়েছে। অপরদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কবির কল্পনাকে কেবল পরিপুষ্টই করছে না, তা তাঁর চৈতন্যে নতুন কল্পনাক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছে। অবশ্য এটা ঘটছে বিশ শতকে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনার প্রকাশ শুধুমাত্র কাব্যসম্ভারেই ঘটেনি, নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে তাঁর এই চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কল্পনারাজ্যে অধিষ্ঠান করলেও, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের দান সুপ্রতিষ্ঠিত হোক তা তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তা ও কর্মে, বিভিন্ন ভাষণে, কৃষিকাজের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সপক্ষতায়, এবং জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আনন্দিত ও পুনঃপুনঃ উৎসাহদানে। রবীন্দ্র-জীবৎকালের প্রায় সবটুকু ব্যাপ্ত করেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ ও বিস্তার। এই সময়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে তথা মহাকাশ পর্যবেক্ষণের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। শক্তির অবিনাশিতা ও রূপান্তর তত্ত্ব ব্যাপকভাবে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমগ্র বিশ্বে। আলোর গতি ও তরঙ্গ প্রকৃতি নির্ণীত হয়েছে, নীহারিকা ও জ্যোতিষ্কালোককে নিয়ে চলছে বৈজ্ঞানিকদের নিরবচ্ছিন্ন আবিষ্কার। মহাকাশ গবেষণা ও আবিষ্কারের অধ্যায়টি কবিকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য, শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'বিশ্ব-পরিচয়' লিখেছিলেন।

আধুনিক রবীন্দ্র-মানসের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিষাদময়তা (Melancholy) যা উদ্ভূত হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে। বলাবাহুল্য এ বৈশিষ্ট্য রোমান্টিক কবিদের চিন্তাচেতনার সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিষ্ট। রোমান্টিক কাব্যের মূল সুরই বিষাদময়তা। রবীন্দ্রনাথ জাত-রোমান্টিক। সুতরাং তাঁর কাব্যে এর সুর প্রতিধ্বনিত হবেই। তাঁর কবি-জীবনের প্রথম থেকে শেষ লগ্ন পর্যন্ত এ সুর যেন নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। অবশ্য এর গভীরতা ও ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যাবে মানসী, চিত্রা, গীতালী, গীতিমাল্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অভ্যন্তরে। পূর্ণতালাভের জন্যই এই বিচ্ছিন্নতা এবং বিষাদ। কবির চিন্তা পূর্ণতালাভের জন্যই ভাব হতে ভাবান্তরে ফেরে। আর এই ভাবান্তরে যাবার কালেই তাঁর যত দুঃখ, যত ব্যথা। এই ভাব থেকে ভাবান্তরে যাওয়ার কালে কবি-মনের একটি দুর্দমনীয় গতি সক্রিয় থাকে। এই গতিময়তায় রবীন্দ্রকাব্যকে বারে বারে আধুনিক করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন আধুনিকের আধুনিক।

◆

উদ্বোধন পর্যালোচিত

'উদ্বোধন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আবিশ্ব মাদকাসক্তির ব্যাপক প্রসারে আশঙ্কা প্রকাশ করে 'কথাপ্রসঙ্গে' সুচিন্তিত সম্পাদকীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—'এই সর্বনাশা মৃত্যুর নেশা' থেকে বেপথুদের আবার 'জীবনের নেশায়' ফিরিয়ে আনতে পারে শাসন নয়, একমাত্র সহানুভূতি। 'শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নারী' প্রবন্ধে জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়ের' আলোকসম্পাতী বিশ্লেষণ মনোগ্রাহী। তাঁর মন্তব্যঃ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন ধর্মীয় নেতা শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে নারীজাতির প্রতি বেশি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করতে পারেননি—পাঠকদের অনুসন্ধানী হতে ইন্ধন যোগাবে। বীরেশ্বর পালের রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী 'মণিমহেশ' পাঠে অনায়াসে তীর্থযাত্রার ফলশ্রুতি মিলবে। জাগতিক জীবনে কি করে ছন্দোময়তা, সুর ও আধ্যাত্মিক আচরণ প্রয়োগ করে স্বর্গীয় প্রশান্তি অর্জন করা যায় তার চমৎকার সূত্র নির্দেশ করেছেন স্বামী সর্বগানন্দ তাঁর সুখপাঠ্য প্রবন্ধে। এই সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক শুরু হলো প্রাচীন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলোচনা-ঋদ্ধ স্বামী ধীরেশানন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ডায়েরী 'সৎসঙ্গ-রত্নাবলী'। স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেনঃ 'নবীন তপস্বী তুমি … / শতাব্দীর আগে জন্ম নিয়েছিলে, দুঃখ পেয়ে গেলে,/আজকের সমাজ তাই পূজা করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে।' ভাল লাগে ব্রত চক্রবর্তীর 'সাঁকো পেরিয়ে'ঃ 'অন্ধকারের ছাঁকনিতে, ছোট বড় আলোগুলোকে/রোজ ছেঁকে নিই।/মাঝে মাঝে ক্লান্তি, হতাশার শিকার।/তখন আপনার কথা ভাবি। আপনি বলেছিলেন/বিষণ্ণতার কোন ভবিষ্যৎ নেই।'

বিবেকানন্দের মতো তাঁর প্রবর্তিত পত্রিকাটিও বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য দূরীকরণে সঞ্জীবনী প্রয়োগ করার সেই ট্র্যাডিশন সমানে বজায় রেখে চলেছে।

বর্তমানঃ 'এই মুহূর্তে', ১১ জুন ১৯৮৯, পৃঃ সাত

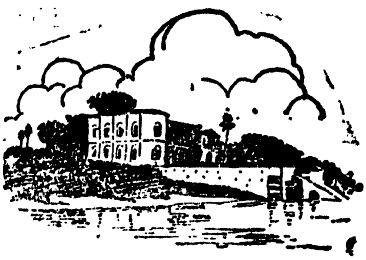

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৪ ॥

গেরুয়া কাপড় পরিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। গেরুয়া রঙ দিয়া ছোপানো কাপড়খানিকে আমার বর্ম বলিয়া মনে হইত। পথে বাহির হইয়া শত শত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে কখনো নিমেষের জন্য মনে যদি কোন সঙ্কোচ উপস্থিত হইত, পরিধানের গেরুয়া কাপড়খানির দিকে দৃষ্টি পড়িলে, সেই মুহূর্তেই সকল সঙ্কোচ কাটিয়া যাইত। এই সংসারের সঙ্গে পূর্বে আমার যে সম্বন্ধ ছিল, এখন তো আর সে সম্বন্ধ নাই। যেদিন আমি গেরুয়া কাপড় পরিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার নিকট জগৎ ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়াছে। এখন আর ভাই বোন স্বামী পুত্র পিতা-মাতা কিছুই আমার নাই, এখন জগৎ আমার নীলমণিময়! মায়ের কি আর সন্তানের কাছে সঙ্কোচ থাকে? মনে আছে, গেরুয়া পরিবার বহুদিন পরে, একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, স্বামী আসিয়াছেন। স্বামী যেন কত দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য আমি দিবানিশি কাঁদিয়াছি, আজ বহুদিন পরে তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার খুবই আনন্দ হইতেছে, কিন্তু গেরুয়া কাপড় যে পরিয়াছি, তাহাও বেশ মনে আছে। একবার ভাবিতেছি, স্বামী তো আসিয়াছেন, এখন কি আবার আমি হাতে বালা পরিয়া, সেই বৌ বৌ খেলা করিব?—তাহা তো কিছুতেই হইবে না। তাই স্বামীকে—খুব যেন আমি জ্ঞানী—এই রকম ভাবের বড় বড় কথা বলিতেছি। বলিতেছি—"তুমি এসেছ বলে যে আবার হাতে বালা পরিয়া বৌ হইব, তাহা তো আর হবে না, আমি যে এখন মা। আমার তো স্বামী পুত্র পিতা ভ্রাতা নাই, সকলেই আমার সন্তান। তোমাকে আমি তো আর কিছুই ভাবিতে পারিব না!" বলিতে বলিতে আবার লজ্জাও করিতেছে, তিনি আমার মুখে এই সব বড় বড় কথা শুনিয়া কি না জানি ভাবিতেছেন!—দেখিলাম, তিনি যেন আশ্চর্য হইয়া নির্বাকভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার মুখ যেন বড়ই ম্লান। বোধ হয়, তিনি মনে দুঃখ পাইয়াছেন, দেখিয়া আমারও দুঃখ হইল। কিন্তু কি করিব, উপায় তো নাই! গেরুয়া কাপড় যখন পরিয়াছি, আর কি আমি ঘর-সংসার করিতে পারি? এখন মনে হয়, সে যেন খেলার ঘর! তা আমি কিছুতেই পারিব না। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখি—তাঁহার মুখ আর ম্লান নাই, তিনি যেন হাসিতেছেন। তাঁহার হাসি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঘর-সংসার পাতিয়া খেলা করার, আর তাঁরও ইচ্ছা নাই।

এখন অনেকবার মনে হয়, এ গেরুয়া কাপড়ের বিড়ম্বনা কেন? পথে বাহির হইলে যখন "মাতাজী" বলিয়া কেহ নির্দেশ করে, কেহ "ভৈরবী" বলে, কেহ বা আসিয়া প্রণাম করে, তখন গেরুয়া কাপড়ের উপর রাগ হয়; কিন্তু তবুও আমি এই গৈরিক বস্ত্র বড় ভালবাসি, এ আমার বর্ম! আমার রাগ বিরাগ, শোক দুঃখ কিছুই মনে আসিয়া বাজিতে পারে না, আমি যে গেরুয়া কাপড়ের বর্ম পরিয়া আছি!—আজ পথে বাহির হইয়া কি যেন অভাব মনে হইতে লাগিল। পথ যে গৃহ নহে—পথ,—এ বোধ তো এতক্ষণ ছিল না; এখন যেন পথে বাহির হইয়া সহসা আপনাকে দিশাহারা মনে হইল। নিমেষের জন্য যেন খেই হারাইয়া গেল; কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। এক নিমিষ-

মাত্র! তাহার পরেই পথে চলিলাম। এমন সময় দেখি—কীর্তনী আমার গেরুয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। "মা, তুমি কাপড়খানি ফেলিয়া আসিয়াছ" বলিয়া সে আমার হাতে কাপড় দিল। তাই বটে! আমার পরিহিত বস্ত্রখানি তো গেরুয়া কাপড় নয়! আবার আমি কীর্তনীর গৃহে গিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসিলাম।

স্টেশন কোন্ দিকে, তাহা মনে ছিল না ; কিন্তু পথে দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই, তাহারা স্টেশনের পথ দেখাইয়া দিল। কিন্তু স্টেশনে কেন আসিলাম? আসিয়াই এই কথা আমার মনে হইল। স্টেশনে যাত্রীরা সকলেই ব্যস্ত, পোঁটলা পুঁটলি, স্ত্রী পুত্র লইয়া উদ্বিগ্ন, ও ট্রেন ধরিতে পারিবে না—এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত। পশ্চিমে যাইবার হাঁটা পথ কোন্ দিকে, দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বিশেষ কোন উত্তর দিল না। তাহারা যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে তাহাদের পক্ষে উত্তর দিবার সময়ও ছিল না। আমি আর বেশি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না ; কেননা, সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে ; অন্ধকার রাত্রি, হয়তো পথ চিনিয়া চলিতে পারিব না। বরং এখানেই কোন এক স্থানে বসিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া ভোর হইলেই পথ চলিতে আরম্ভ করিব। আবার ভাবিলাম, অনর্থক বসিয়া রাত্রি কাটানো অপেক্ষা চলিলে বরং অনেকটা পথ চলা হইবে। যদি বাঁধা রাস্তা হয়, পথে গর্ত না থাকে, অন্ধকারে চলিবার আর বিশেষ কি ব্যাঘাত হইবে? এত কথা যে মনে হইল, ইহার কারণ এই যে, অস্থির মন চলিবার জন্যই ব্যগ্র, কিন্তু শরীর—মনের সে কথায় কিছুতেই সায় দিতে চাহে না। আচ্ছা, এই দেয়ালের কাছে হেলান দিয়া একটু বসি, ভিড় কমিলে কাহারো নিকট পথ জানিয়া লইব। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া, স্টেশনের কোণের দিকে যেখানে বেশি লোক-চলাচল নাই, সেখানে গিয়া দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র পিঠের কাছে কি একটা শক্ত জিনিসের মতো বোধ হইল, আঁচলে যেন কি বাঁধা আছে। খুলিয়া দেখিলাম, কয়েক আনা পয়সা!

শ্যামসুন্দর, আমি যে আর চলিতে পারিতেছি না, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিয়াছ!

মনে হইল—এই ট্রেনেই উঠিয়া চলিয়া যাই ; কিন্তু কোথায় যে টিকিট কিনিতে হয়, জানি না। তখন প্রথম ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে, ট্রেন ছাড়িবার আর বেশি সময় ছিল না। টিকিটের ঘর খুঁজিতে খুঁজিতেই গাড়ি চলিয়া গেল, সে ট্রেনে আর যাওয়া হইল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পশ্চিমের গাড়ি আবার কিছুক্ষণ পরে আসিবে। যেখানে টিকিট বিক্রয় হয় খুঁজিয়া লইলাম, সেখানে গিয়া সেই কয়েক আনা পয়সা দিলাম। টিকিট-বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথাকার টিকিট?" বলিলাম, "এই পয়সায় পশ্চিমের পথে যে স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া হয়, তাহারই একখানি টিকিট দাও।" শুনিয়া সে কিছু আশ্চর্য হইয়া আমার দিকে চাহিল ; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া আমার হাতে টিকিট দিয়া স্টেশনের একজন লোককে ডাকিয়া বলিল,—"ভিড় কম এমন একটা গাড়ি দেখে এঁকে উঠিয়ে দিস।"

যে গাড়িতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে একটিও লোক ছিল না। ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় একদল ছেলে আসিয়া উঠিল। তাহাদের বয়স উনিশ, কুড়ি, বাইশ, তেইশ এই রকম হইবে। তাহাদের সঙ্গে বোঁচকা বুঁচকি কিছুই ছিল না ; কাহারো হাতে ছড়ি, কাহারো হাতে ছাতা, একজনের সঙ্গে হুঁকা আর তামাক সাজিবার সরঞ্জাম ছিল। সে ট্রেনে উঠিয়াই তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। আমি এক পাশে গিয়া বসিয়াছিলাম ; আমাকে প্রথমে তাহারা দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া "বাঃ রে বাঃ! এ যে দেখছি ভৈরবী ঠাকরুন" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গীরা 'হো হো' করিয়া শিয়ালের মতো সেই চিৎকারে যোগ দিল। তাহার পর খুব জোরে হাততালি পড়িতে লাগিল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া কোণে বসিয়া তাহাদের এই কাণ্ড দেখিতেছি, আর মনে মনে "তৃণাদপি সুনীচেন" "তৃণাদপি সুনীচেন" ঘন ঘন জপ করিতেছি। আগ্নেয়গিরি

যেমন ফাটিয়া যায়, তেমনি আমার মনের ভিতর রাগ ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে—আমি "তৃণাদপি সুনীচেন" মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে থামাইয়া রাখিতে চাহিতেছি। কিন্তু শুধু শিয়ালের মতো চেঁচাইয়াই তাহারা নিরস্ত হইল না। একজন তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে করিয়া "ভৈরবী ঠাকরুন! তামাক ইচ্ছে করুন" বলিয়া আমার হাতে দিতে আসিল। যথাসম্ভব সংযতভাবে উত্তর দিলাম, "আমি ভৈরবী নই।" কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তাহাতে সংযম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে একজন যখন আমার গৈরিক বস্ত্রাঞ্চলে হাত দিল, তখন "তৃণাদপি" মন্ত্র স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল!—আমি তাহাদের কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাহারা খুবই রাগিয়া গিয়াছিল। একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তোর তো বড়ই সাহস দেখছি, আমরা এগারো জন, আর তুই একা—তোর গার্জেন কে আছে? যদি আমরা তোর উপর অত্যাচার করি, কে তোকে রক্ষা করতে পারে?" এই কথা শুনিবামাত্র আমার সমস্ত শরীর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, সম্মুখে নৃমুণ্ডমালিনী অট্ট অট্ট হাসি মুক্তকেশা রণরঙ্গিণী কালী-মূর্তি। আমার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল, চুল খুলিয়া গিয়াছিল, কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। কেবল মনে পড়ে—দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—"আমাকে কে রক্ষা করিবে? আয়, তোরা আয়। দ্যাখ্, আমি তোদের কত জনকে খেতে পারি"? ইহার পর যে কি হইয়াছিল, তাহা আমার কিছুই মনে পড়ে না।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম,—আমি বেঞ্চের উপর শুইয়া আছি। একজন আমার মাথায় জল দিতেছে, আর একজন বাতাস করিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিবামাত্র "মা! মা! মা!" বলিয়া সেই এগারটি ছেলে আমার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। কক্ষের যে বাতাস কিছু আগে অশ্রাব্য বাক্যের দুর্গন্ধে দূষিত হইয়াছিল, তাহাই আবার "মা! মা! মা!" এই স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুরভিতে পরিপূর্ণ হইল। আমি যে কোথায় আছি, কিছুক্ষণ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই "মা, মা, মা" ধ্বনিতে কান ও প্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল।—ঠাকুর, কি শীতল জল দিয়াই তুমি কি দাবানল নিবাইলে! এ জল না হলে তো সে আগুন কিছুতেই নিবিত না! তাহারা আমার পায়ে পড়িয়া আছে, আমি তখনো কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।—জোড়হাতে তাহারা কেবল বলিতেছে—"মা! ক্ষমা কর;—মা, অধম সন্তানের দোষ ক্ষমা কর।" আমি বলিলাম, "উঠ বাবা গোপাল, আর আমার তোমাদের উপর রাগ নাই।" কিন্তু আমার শরীর এত দুর্বল যে, আমি যেন পড়িয়া যাই, কোন রকমে কাঠে ভর রাখিয়া বসিয়া আছি। তাহারা বলিল, "মা, এই তুমি—তোমার কি মূর্তিই দেখেছিলাম! কালীমূর্তি দেখেছি, কিন্তু কালী যে কেমন, তাহা আজ জীবন্ত দেখেছিলাম। তোমার সে ভয়ঙ্করী মূর্তি এখনও ভাবতে ভয় হচ্ছে। তোমার সে মূর্তি দেখে আমাদের আর জীবনের আশা ছিল না।" এইরকম তাহারা কত কথা বলিল। শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শ্যামসুন্দর আমার, আজ মা কালী হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। মা নহিলে আর কে সন্তানকে রক্ষা করে? মা, মা, মা! শক্তিরূপা মায়ের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম!*

[ক্রমশঃ]

---

* উদ্বোধন, ১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৯২-৯৭

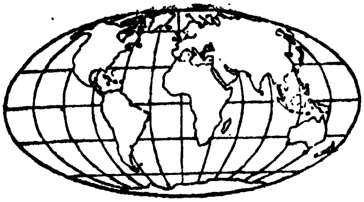

বাতায়ন

পেরেস্ত্রোইকা ও ইসলাম

'সোভিয়েত সমীক্ষা'র ধর্মবিষয়ক প্রতিবেদন

উদ্বোধন-এর গত শ্রাবণ ১৩৯৫ সংখ্যায় (পৃঃ ৪৫৩—৪৫৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী-পরিষদের ধর্মবিষয়ক পর্ষদের সভাপতি কনস্তানতিন খারচেভের লেখা 'সোভিয়েত রাষ্ট্র ও চার্চ' নামে একটি প্রবন্ধ 'সোভিয়েত সমীক্ষা' থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

—সংযুক্ত সম্পাদক

সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশ অর্থডক্স চার্চের অনুগামীর সংখ্যার পরই ইসলামের অনুগামীরা সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বলে স্বভাবতই এদেশের জীবনে ইসলাম এক বিরাট ভূমিকা নেয়। সেজন্যই পেরেস্ত্রোইকা ও গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় ইসলামের প্রতি সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মনোভাবের বদল হয়েছে কিনা, এই প্রশ্নটি অনেকের কাছেই আগ্রহের বিষয়।

বদ্ধাবস্থার আমলে "বিভেদ সৃষ্টি করে শাসনের" পুরনো নীতি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য ছিল, যেমন উজবেকিস্তানে করা হতো। ক্রিশ্চানদের ইস্টার পরব কিংবা মুসলমানদের পরবগুলোর সময় তাসখন্দে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেত প্রচণ্ডভাবে। মসজিদ, গীর্জা ও গোরস্থানসমূহের প্রবেশপথ পুলিশ দিয়ে আটকানো থাকত যাতে ধর্মবিশ্বাসীদের বিপুল জমায়েত না হতে পারে। রুশ পুলিশদের পাঠানো হতো মুসলমানদের গোরস্থানে আর উজবেক পুলিশদের পাঠানো হতো অর্থডক্স কবরখানায়। এতে স্বভাবতই ধর্মবিশ্বাসীদের মনে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকত। এ-ধরনের আদেশ যাঁরা দিতেন, আজ সেরকম প্রায় সমস্ত কর্মকর্তাকেই তাঁদের পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং কোন ধর্মীয় পরব উপলক্ষেই আর পুলিশ পাঠানো হয় না।

অল্পবয়সী ধর্মানুরাগীদের ক্ষেত্রেও অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের মুসলিম বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফখান শাকিরভের বক্তব্য অনুযায়ী আগে যেখানে কমসোমল, বিদ্যালয় পরিষদ ও যুবসমাজের অন্যান্য গণসংগঠনের প্রধান চেষ্টাই ছিল তরুণ-তরুণীদের ইসলামের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা, এখন সেখানে তারা অবাধে নামাজ পড়তে যেতে পারে এবং সেজন্য তিরস্কৃত হওয়ার কোন ভয় আর তাদের নেই। আগের তুলনায় মসজিদে এখন তরুণদের অনেক বেশি সংখ্যায় দেখা যায়।

নতুন চালু মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে। গত কয়েক বছরে মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানে ইমাম পরিচালিত মসজিদের সংখ্যা ৩০টিরও বেশি বেড়েছে এবং এ-রকম মসজিদের সংখ্যা ২০০এরও বেশে। তুর্কমেনিয়ার রাজধানী আশখাবাদ, প্রাচীন সমরখন্দ, তাজিকিস্তানের উরা-তিউব ও অন্যান্য শহরে নির্মিত হয়েছে নতুন নতুন মসজিদ। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দের মুসলিমদের ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে এখন এরকম ১৭টি গোষ্ঠী আছে। ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষভাগ থেকে দুঝিজাকে (উজবেকিস্তান) মুসলিম গোষ্ঠীর কাজকর্ম পুনরায় শুরু হয়েছে ; জেলা কর্তৃপক্ষ সেখানে যে মসজিদটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের মুসলিম বোর্ডের প্রতিনিধিরা আশা করছেন যে এখন থেকে এটাই নিয়মিত রেওয়াজ হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৫০০। কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত সংখ্যা বোঝা যাবে না, কেননা রেজিস্ট্রি করা নয় এমন অনেক নামাজ পড়ার জায়গা আছে। বন্ধাবস্থার আমলে অনেক জেলা ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ উচ্চতম নেতৃত্বকে খুশি করার বাসনায় তাঁদের জানিয়েছিল যে, ধর্মবিশ্বাস থেকে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মবিশ্বাসীরা ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থার কাছে তাদের ধর্মীয় গোষ্ঠীকে রেজিস্ট্রি করার আবেদন জানালে তা নাকচ করে দেওয়া হয়, যদিও সেটা আইনবিরুদ্ধ কাজ। সেজন্য তারা বাড়িতে বা খোলা জায়গায় ধর্মাচরণে বাধ্য হয়।

মসজিদের সংখ্যা বাড়ায় স্বভাবতই মৌলবীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রসঙ্গ আসে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহে এই প্রশ্নের অনুকূল মীমাংসা হয়েছে এবং ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তি করার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এর জন্য বুখারার মির-আরব মাদ্রাসায় ২০০ ব্যক্তি এবং তাসখন্দের ইমাম আল-বুখারি ইনস্টিটিউটের ১০০ ব্যক্তি থাকার মতো আধুনিক ছাত্রাবাস নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলি তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

ইসলামের প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোভাব বদলাতে দেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলমানরা সোভিয়েত সমাজে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রটিকে নবরূপ দান করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং পেরেস্ত্রোইকা প্রক্রিয়ায় নিজেদের অবদান রাখার প্রয়াস করছেন, শেখ ইউসুফখান শাকিরভ মনে করেন, নিষ্ক্রিয়, দেখি-কি-হয় মনোভাব নিয়ে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করা অনৈতিক কাজ হবে।*

*** সোভিয়েত সমীক্ষা (প্রকাশক: ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা-বিভাগ, কলকাতা), ২৪তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৯, পৃঃ ৫৯**

পুরুষ সাবধান

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পুরুষদের বিশ্বাস করতেন না বলেই ঠাকুর নারীর সঙ্গে সম্পর্কে অতটা কঠোর হতে বলেছিলেন। পুরুষই ভোগবাসনায় নারীকে টেনে নামিয়ে আনে জগন্মাতার আসন থেকে ভোগের সংসারে। দ্বিতীয় দর্শনের দিনে শ্রীম-র সঙ্গে তাঁর কথোপকথন অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে ঠাকুরের মনোভাব।

ঠাকুর॥ দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল। আমি কপাল, চোখ এসব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?

মাস্টার॥ আজ্ঞে ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

ঠাকুর অমনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আর তুমি জ্ঞানী?

মাথা হেঁট করে মাস্টার মহাশয় ভাবতে লাগলেন, জ্ঞান কাকে বলে আর অজ্ঞান কাকে বলে আমার জানা হয়নি। এতকাল জেনে এসেছি, লেখাপড়া শিখলে, বই পড়তে পারলে জ্ঞান হয়। না, তা নয়। মহাপুরুষের সংশ্রয়ে এসে সেই ভুল আজ ভেঙে চুরমার। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই কিছু নয়। ভাবনা যখন চলছে তখন আবার পড়ল ঠাকুরের প্রশ্নের চাবুক—"তুমি কি জ্ঞানী?"

মাস্টার মহাশয়ের অহঙ্কার কুঁকড়ে গেল। কে জ্ঞানী?

যে-পথ সাধনের পথ, যে-পথের শেষে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, সেই পথের পথিক হতে হলে দু-নৌকোয় পা রাখা চলবে না। গাছেরও খাব, তলারও কুড়ব, সে আবার কি? ইয়ারকি না কি? মুখে বলি হরি কাজে অন্য করি! 'নিক্তি'র সাধনা। 'নিক্তি'ই হলো আদর্শ। ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলছেন, "নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন—উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। বস্তু বিচার করবে। মেয়েমানুষের শরীরে কী আছে—রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুঁড়ি, কৃমি, মূত, বিষ্ঠা এইসব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?"

এর মানে এই নয়, যে বিয়ে করে সংসার-টংসার হয়ে যাবার পর বউকে ধরে পেটাও, কি আমার বৈরাগ্য এসেছে গো, আমি সংসারে নেই, তোমরা এবার চরে খাও। আমার ঠাকুর অত সোজা ছিলেন না। ফাঁকিবাজি, ওপরচালাকি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রারব্ধ তোমাকে ক্ষয় করতেই হবে।

প্রতাপচন্দ্র হাজরার ভাই এসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কিছু দিন ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীমকে বলছেন, "প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নেই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগ-ছেলে সব শ্বশুর-বাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলে-পিলে হয়েছে; তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগ-ছেলেদের আরেকজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বকলুম আর কাজকম্ম খুঁজে নিতে বললুম।"

এই হলেন ঠাকুর! সংসারী, সংসারের কর্তব্য পালন করবে না, তা হবে না। সেখানে ধর্মের দোহাই পাড়লে চলবে না। সেখানে কামিনী ত্যাগ, কাঞ্চন ত্যাগের বাহানা হলো আলস্য। অলসদের ঠাকুর সুন্দর একটি বিশেষণ দিয়েছিলেন, 'কুমড়োকাটা বঠ্‌ঠাকুর'। বললেন, "এক একজন পুরুষ থাকে—মেয়েছেলে নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাইরের ঘরে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক

খায়, নিষ্কর্মা বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনো গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বঠ্‌ঠাকুরকে ডেকে আন—কুমড়োটা দু-খানা করে দেবেন। তখন সে কুমড়োটা দু-খানা করে দেয়। এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে ‘কুমড়োকাটা-বঠ্‌ঠাকুর’।”

এরপরেই ঠাকুর বলছেন, “ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর।” অলস হয়ে গাল-গল্প, কি তাসপাশা খেলে জীবন কাটিও না। কর্ম আর ধর্মকে মেলাও। দু-পাল্লায় দুটি চাপাও, তবেই নিক্তির নিচের কাঁটা আর ওপরের কাঁটা টায়টায় মিলবে। বলছেন, “আর যখন একলা থাকবে তখন ভক্তিশাস্ত্র-শ্রীমদ্ভাগবত বা চৈতন্য-চরিতামৃত—এই সমস্ত পড়বে।”

ঠাকুর, ‘টাকা মাটি’ বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কাঞ্চন। সংসারী মানুষের ক্ষেত্রে সেটা হবে বাড়াবাড়ি। ঠাকুর বলতে পারেন, “রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না।” তিনি পারেন বুক ঠুকে এমন কথা বলতে ; কারণ তিনি ছিলেন অবতার। মায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণে কোনও ফাঁকি ছিল না। ‘টোটাল সারেণ্ডার’। সংসারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। শ্রীম-র মনে সংশয় ছিল। একদিকে হিন্দি দোঁহা—‘যাঁহা রাম তাহাঁ নাহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম।’ রাম আর কাম কি একসঙ্গে হয় ?

ঠাকুর বললেন, “কর্ম সকলেই করে—তাঁর নাম গুণগান করা ; এত কর্ম ; সোহংবাদীদের ‘আমি সেই’ এই চিন্তাও কর্ম ; নিঃশ্বাস ফেলা এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার যো নেই। তাই কর্ম করবে—কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।”

শ্রীম সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, “আজ্ঞে, যাতে অর্থ বেশি হয় এ চেষ্টা কি করতে পারি ?”

ঠাকুর বললেন, “বিদ্যার সংসারের জন্যে পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে, কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নেই।” ঠাকুর শ্রীমকে বললেন না যে, তুমিও আমার মতো ‘টাকা মাটি’ বলে পরিবার পরিজনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাও। শ্রীম তখন জিজ্ঞেস করলেন, “আজ্ঞে, পরিবারদের উপর কর্তব্য কতদিন ?”

ঠাকুর বললেন, “তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার নেবার দরকার নেই, পাখির ছানা খুঁটে খেতে শেখার পর আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে।” স্ত্রীর মধ্যে ঠাকুর যেসব ভাবের সমাবেশ দেখেছিলেন, তা হলো শান্তভাব, নিষ্ঠা। “সে জানে আমার পতি কন্দর্প। দাস্য—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে, যশোদারও ছিল। সখ্যভাব—অর্থাৎ বন্ধুর-ভাব। এস, এস, কাছে এসে বস। বাৎসল্য—স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুরভাব।” অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাবের আকর নারী। এই ভাবে আশ্রয় করেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। নারীর এইভাব সহজাত। মুখটা একটু ঘোরাতে পারলেই ঈশ্বর। তাহলে কে আগে পাবে ! পুরুষ না নারী !

ঠাকুর বলছেন, “কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখনি বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে ? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।” ঠাকুরের মূল কথা হলো, “যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে, রাজা, দুষ্টলোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হতে পারে।”

ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, “ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা নিয়ে দুজনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি।”

ঠাকুর, আপনাকে বোঝা অত সহজ নয়। নারীতে জগন্মাতাকে অবতীর্ণ করাতে যাঁরা জানেন না, তাঁরা সাবধান! ঠাকুরের কৃপা থেকে তাঁরা অনেক দূরে।

কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন

বিশ্বনাথ ভড়

অঘটন আজও ঘটে। বারবার চার বছর চেষ্টার পর সুযোগ এল কৈলাস ও মানস সরোবর ভ্রমণের। সবই কৈলাসপতির কৃপায় হয়েছে এটা আমি বিশ্বাস করি। পুরুষকার এবং ভাগ্য—এ নিয়ে নানা তর্কাতর্কি হয়, তবে আমি বিশ্বাস করি দুটোই সত্যি। নিজেকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং ওপরওয়ালা একজনের কৃপা হলেই তবে সফলতা আসবে। মেডিকেল কলেজে আমার একজন অধ্যাপক স্বর্গতঃ তুলসীদাস কর বলতেনঃ “Scientists are better believers in God than lay people.” আমি লেখক নই। আমার পেশা চিকিৎসা। তবে বন্ধুদের অনুরোধে লিখে ফেললাম আমার অভিজ্ঞতার কথা যদি তা কারও কাজে লাগে এই ভেবে।

২৫ মে, ১৯৮৭ আমার এবং আমার এক বন্ধু ডাঃ বিভূতি মান্নার নামে একই টেলিগ্রাম

দুজনেই প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছি এ-বছরের দ্বিতীয় ব্যাচের কৈলাস ও মানস যাত্রার জন্য। আমাদের টেলিগ্রামে জবাব দিতে হবে—যাব কিনা এবং গেলে প্রত্যেককে ৫০০ টাকার ড্রাফ্‌ট পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৬ জনের মধ্যে। আমরা দুজনে নির্দেশমতো কাজ করলাম। সাতদিন বাদে বিরাট খামে করে বিস্তারিত চিঠি পেলাম—“কৈলাস ও মানস সরোবর যাত্রা—১৯৮৭” সম্পর্কিত। আর এমন শুভ যোগাযোগ, ঠিক তার দুদিন বাদে সুনীলকৃষ্ণ ঘোষ, যাঁর সঙ্গে আমি এবং আমার স্ত্রী ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে আন্দামান গিয়েছিলাম, তিনি আমার বাসায় এসে হাজির—তাঁর লেখা সদ্য প্রকাশিত বই—‘বাস্তবে স্বপ্নের কৈলাস-মানস’ আমাকে একখণ্ড উপহার দিতে। তাঁর কাছ থেকে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা শুনলাম এই যাত্রাপথের। বিশেষ করে যাত্রার নানা খুঁটিনাটি ও অন্যান্য সমস্যার কথা আলোচনা করলাম তাঁর সঙ্গে। বইখানি বারবার ভাল করে পড়ে মনে সাহস পেলাম এই যাত্রায় অগ্রসর হবার।

এবারে একটু পুরনো কথায় আসি। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে ভারত-চীন যুদ্ধ হওয়ার পর কৈলাস-মানসযাত্রা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জনতা সরকারের আমলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী চীন সরকারের সঙ্গে পুনরায় আলাপ-আলোচনা করে এই যাত্রাপথের রাজনৈতিক বাধা দূর করেন। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম যান [illegible]ম স্বামী ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের আগে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না। ঐ সময় প্রবোধকুমার সান্যাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে তাঁদের নিজেদের ব্যবস্থায় সারাপথ পায়ে হেঁটে, সঙ্গে গাইড হিসাবে শেরপাদের নিয়ে বহু কষ্ট করে কৈলাস ও মানস পরিক্রমা করে ফিরে এসেছেন। সেসব কাহিনী আমরা বই এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে পড়েছি।

আজকের কৈলাস ও মানসযাত্রা, বলাবাহুল্য, ভারত ও চীন সরকারের যুগ্ম ব্যবস্থাপনার ফলেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাধারণতঃ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক থেকে সমস্ত বড় বড় কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেয় এই যাত্রা সম্বন্ধে। যারা যেতে ইচ্ছুক তারা সাদা কাগজে দরখাস্ত করবে নাম, ধাম, বয়স, পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা এবং পাসপোর্টের বিবরণ দিয়ে। শুনেছি হাজার হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে আর তার ভেতর থেকে মাত্র দুশো-জনের মতো আবেদনকারীকে নির্বাচন করা হয় সাতটি ব্যাচ-এর নির্দিষ্ট একটিতে যাওয়ার জন্য। নির্বাচিত ব্যক্তিকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেওয়া হয় কবে, কোন্ সময়ে বিদেশ মন্ত্রকের সাউথ ব্লকের সেক্রেটারিয়েটে রিপোর্ট

করতে হবে। সঙ্গে পাসপোর্ট ছাড়াও দু-কপি ফটো (চীনা ভিসার জন্য) এবং একটি ইনডেমনিটি বন্ড ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে এফিডেবিট করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এতে নিজেকে বলতে হবে যে এই যাত্রায় কোনরকম বড় দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটলে কেউ দায়ী থাকবে না। সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া থাকে। কারণ ভারত সরকারের উত্তর প্রদেশ ট্যুরিজম অফিস (কুমায়ুন মঙ্গল বিকাশ নিগম)-কে দিতে হয় ৩০০০ টাকা, চীন সরকারকে ৩৮০ ডলার (কিম্বা ৫০০০ টাকা), এবং চীনা ভিসা-ফি বাবদ দিতে হয় ৭০ টাকা। এছাড়া যাঁরা ঘোড়ায় চড়ে যাবেন, তাঁদেরকে প্রত্যেকদিন ১০০ টাকা করে, চীনা বর্ডার পর্যন্ত যেতে ৯দিন এবং ফিরতে ঐ পথটাই ৭ দিন—এই মোট ১৬ দিনের ঘোড়া-খরচ বাবদ ১৬০০ টাকা দিতে হবে। দিল্লী যাওয়া-আসা এবং ওখানে কয়েকদিন থাকার খরচ তো আছেই।

আমরা নির্দিষ্ট দিন, ২৩ জুন যথারীতি ভারত সরকারের বৈদেশিক কার্যদপ্তরে রিপোর্ট করি। ওখানে আমাদের কাগজপত্র দেখে নির্দেশ দেওয়া হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতাল-এ যেতে। ওখানে সাধারণভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াও বুকের এক্স-রে এবং ই. সি. জি. তুলে মেডিকেল বোর্ড-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাত্রীটি ১৮,৫০০ ফুট উচ্চে যাওয়ার উপযুক্ত কিনা। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আমাকে 'উপযুক্ত' বলে ছেড়ে দিলেও আমার বন্ধু ডাঃ মান্নাকে 'অনুপযুক্ত' বিবেচনা করা হলো তার হাই ব্লাড প্রেসার (১৭০।১০০)-এর জন্য। এতে আমার মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। স্থির করেছিলাম, আমি এ-যাত্রায় যাব না। শেষ পর্যন্ত ডাঃ মান্নার অনুরোধে আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। সহযাত্রী হিসাবে আরো ৩২জনকে পেলাম, যার মধ্যে ৬জন মহিলা। এর ভেতর সবচেয়ে বেশি বয়স আমারই (৬৮) আর সবচেয়ে কম ২৯ বছরের এক গুজরাটী ইঞ্জিনীয়ারের। দলে বাঙালীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি—নয়জন। তারপর গুজরাটী আটজন, কর্নাটকের ছয়জন, অন্ধ্রপ্রদেশের চারজন, মহারাষ্ট্রের তিনজন এবং দিল্লীর তিনজন। আমাদের সকলকে নির্দেশ দেওয়া হলো ২৫ তারিখে সকাল নটার সময় সাউথ ব্লকে আসার জন্য। ঐদিন কৈলাস-মানসযাত্রা সম্বন্ধে তিনজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের ওয়াকিবহাল করলেন। তাছাড়া চীনা ভিসা ফর্ম ভর্তি করে পাসপোর্টের সঙ্গে ৭০ টাকা করে জমা দিতে হলো।

পরদিন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে ৪৮০ ডলার করে আমরা পেলাম টাকার বিনিময়ে এবং তখনই চীনা ভিসা দিয়ে দেওয়া হলো, পাসপোর্টও ফেরৎ পেলাম। ২৭ জুন তারিখ বিশ্রাম ও কেনাকাটার জন্য রইল। ২৮ জুন ভোর পাঁচটায় যাত্রা শুরু করা হলো ইউ. পি. ট্যুরিজম অফিস, ৩০ জনপথ রোড থেকে। একটি লাক্সারী কোচ এবং একটি ট্যাক্সিতে করে আমরা ৩৩জন যাত্রী এবং একজন গাইড রওনা দিলাম। আমরা ঐদিন দিল্লী থেকে বাগেশ্বর, পরদিন বাগেশ্বর থেকে ধরচুলা এবং তার পরের দিন ৩০ জুন ধরচুলা থেকে তাওয়াঘাট পৌঁছলাম মোট ৬৩৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। এখান থেকেই পাহাড়ে ওঠা শুরু—পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে। ভারত-চীন সীমান্তে 'লিপুলেক পাস' যেতে সময় লাগবে নদিন, দূরত্ব তাওয়াঘাট থেকে ৭১ কিলোমিটার। পথে যে যে জায়গাগুলো পড়ল, তা হলোঃ তাওয়াঘাট, সোসা, সিরকা, গালাঘাট, মালপা, বুধি, গুনজি, কালাপানি, নাভিদাং, লিপুলেক পাস। লিপুলেক পাস পার হয়ে আমরা চীন অধিকৃত তিব্বতে এসে পড়লাম ৮ জুলাই। ওখান থেকে প্রথমে পায়ে হেঁটে তারপর ঘোড়ায় চড়ে ৬ কিলোমিটার রাস্তা পার হয়ে আবার ট্রাক এবং লাক্সারী বাসে করে তাকলাকোট চায়না বেস ক্যাম্পের পুলান গেস্ট হাউসে পৌঁছলাম। এখানে কাস্টম চেকিং, ইমিগ্রেশন, ডলার ভাঙিয়ে 'ইয়েন-এ রূপান্তরিত করা ইত্যাদি হলো। থাকবার জায়গা এখানে খুবই

সুন্দর, কিন্তু শৌচব্যবস্থা খুবই খারাপ। চীনা খাবার-দাবার যা দেওয়া হতো তা খুব মুখরোচক না হলেও পুষ্টিকর নিঃসন্দেহে। যেমন বাঁশের গোড়া, ব্যাঙের ছাতা, ক্যাপসিকামের তরকারি, বার্লির রুটি ইত্যাদি।

গেস্ট হাউসে দুরাত্রি কাটাবার পর ১০ জুলাই ভোরবেলা আমাদের সকলকে নিয়ে বাসে করে ৮০ কিলোমিটার দূরে কৈলাস বেস ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। জায়গাটার নাম 'দারচেন'। বাসটি যখন কৈলাসের দিকে যাচ্ছিল, বাঁদিকে রাবণ হ্রদ (রাক্ষস তাল) এবং ডানদিকে মানস হ্রদ আমরা দেখলাম। আমাদের মধ্যে যে ১৬ জন আগে কৈলাস পরিক্রমা করবে বলে মত দিয়েছিল তারা এখানেই নেমে পড়ল আর বাকি ১৭ জনকে নিয়ে বাস চলল মানস বেস ক্যাম্প অভিমুখে। পরের তিনদিন কৈলাস ও মানস পরিক্রমা করার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কৈলাস পরিক্রমা (৫২ কিলোমিটার) করতেই তিনদিন লাগে। ১৮,৫০০ ফুট উঁচুতে দোলমা পাস—এ-পথের সবচাইতে কঠিন ও দুর্গম পথ। আর মানস পরিক্রমা করা হয় দুদিনে, বাড়তি তৃতীয় দিনে যাত্রীরা নেয় বিশ্রাম। এই পরিক্রমা পথ ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এইবার যে যাত্রীদলের কৈলাস পরিক্রমা হয়ে গিয়েছে তাঁদের মানস ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। আর মানস দর্শনকারীদের দেওয়া হয় কৈলাস দর্শনের সুযোগ। তারপর আরো তিনদিন বাদে সকলকে পুনরায় তাকলাকোট পুলান গেস্ট হাউসে ফিরিয়ে আনা হয় বাসে করে। মানস পরিক্রমা করবার জন্য ১৪ টি ঘোড়া এবং কৈলাস পরিক্রমা করবার জন্য ১৪ টি জোব্বা (Yak)-এর ব্যবস্থা চীন সরকার রেখেছিল। ফেরার পথে তাকলাকোটে আমরা তিন রাত্রি থাকি ; মাঝখানে একদিন আমাদের কেজিয়া বা খেচরনাথের গুম্ফায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ২০ জুলাই ভোর তিনটায় তাকলাকোট থেকে বাসে করে রওনা দিয়ে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ লিপুলেক পাস-এ পৌঁছলাম এবং সেটা খুবই কষ্ট করে পার হয়ে ভারতে ফিরে এলাম। ওখান থেকে সাত দিন ট্রেকিং করে এবং দুদিন বাসে চড়ে দিল্লী পৌঁছে গেলাম ২৯ জুলাই।

ভারতীয় ভূখণ্ডে যাত্রাকালীন আমাদের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ইউ. পি. ট্যুরিজম অফিস ৩০০০ টাকার বিনিময়ে। এর মধ্যে বাস-যাত্রা, ক্যাম্প, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি পড়ে এবং এগুলির বন্দোবস্ত ছিল বেশ ভাল। তাছাড়া আমাদের মালপত্র ২৫ কেজি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। উত্তর প্রদেশ সরকারের একটা মেডিকেল টিম কালাপানি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল ; তারপর ছিল কুমাউন রেজিমেন্টের মিলিটারি মেডিকেল সার্ভিস। তাছাড়া চারজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী সবসময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একজন যাত্রীকে তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তিব্বতের অংশে চীন সরকার ৩৮০ ডলার (বা ৫০০০ টাকা)-এর বিনিময়ে বাস, ঘোড়া, জোব্বা (Yak) এবং বেস ক্যাম্পে থাকা-খাওয়ার বেশ সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। তাকলাকোটে যাওয়ার সময় দুদিন এবং আসবার সময় তিন দিন আমাদের চীনা খাবার দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র আমাদের নিজেদের রান্না করে খেতে হয়েছে, তবে কেরোসিন স্টোভ এবং রান্না করার জিনিসপত্র কর্তৃপক্ষই সরবরাহ করেছিল।

ভারতীয় ভূখণ্ডে যাত্রা চলাকালীন পথের কিছু কিছু বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। পূর্বেই বলেছি তাওয়াঘাট থেকে আমরা পায়ে হেঁটে, বা কেউ কেউ ঘোড়ায় চেপে যাত্রা শুরু করি ৩০জুন। ওখানকার উচ্চতা ৯১৪ মিটার (৪৫০০ ফুট)। ঐদিন ধৌলিগঙ্গা নদীর ওপর ব্রীজ পার হয়ে থানিঘাট (১৯২০ মিটার)-এ এসে একটু চা খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করি। এসময় পাংগু গ্রাম পার হয়ে সোসা গ্রামে পৌঁছলাম মোট ১৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এখানেই রাত্রিবাস। খাওয়া খুবই ভাল ছিল—ভাত, রুটি, ডাল, দুটি তরকারি, চাটনি ও পাঁপড় ভাজা। রাত্রে ভাতের বদলে পোলাও এবং সঙ্গে আরো মিষ্টি ছিল।

৪র্থ দিন সোসা থেকে সির্‌ঘা—৫ কিলোমিটার পথ, উচ্চতা ৩৩৪০ মিটার। সোসা থেকে ডানদিকে একটা পথ শ্রীনারায়ণস্বামী আশ্রমে গেছে। সেটা ঘুরে যেতে আরও তিন কিলোমিটার পথ হাঁটতে হলো। এপথে এলে আশ্রমটি প্রত্যেকের দেখা উচিত। মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন ফুলের বাগান খুব সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে। এখানে আমাদের চা-জলখাবার খাওয়ানো হলো এবং দর্শনী হিসাবে আমরা কিছু টাকাও দিলাম। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীনারায়ণস্বামী জমি কিনে এই আশ্রমের নির্মাণকার্য শুরু করেন। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার, পরে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। শিল্পপতি মোদী এ্যান্ড কোম্পানীর অর্থানুকূল্যে এটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে।

৫ম দিন সির্‌ঘা থেকে গাল্লাঘার গ্রাম, পথের দূরত্ব ১৪ কিলোমিটার, উচ্চতা ২৩৭৮ মিটার শুরুতে ২ কিলোমিটারের মতো নেমে তারপর গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে সুউচ্চ খাড়াই পথ ধরে রাঙলিং টপ-এ (৩০৪৮ মিঃ) উঠলাম। এরপর আবার সোজা নেমে সিমখোলাগার্ড হয়ে গাল্লাঘার গ্রামে পৌঁছলাম। রাত্রিবাস এখানেই। এই বছর থেকেই এই রেস্ট ক্যাম্পটি চালু হয়েছে। আগে এখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে জিপটিতে রেস্ট ক্যাম্প ছিল।

পরদিন (৬ষ্ঠ দিন) গাল্লাঘার থেকে জিপটি হয়ে মালপা। পথের দূরত্ব ১১ কিলোমিটার, উচ্চতা ২০১৮ মিটার। সমস্ত পথের মধ্যে খুব কষ্টকর রাস্তা শুরু হলো জিপটি থেকে—কেবলই উতরাই কালীনদী পর্যন্ত। এখানে কালীনদী পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ভীষণ গর্জন করে সাপের মতো বয়ে চলেছে। একটু পরেই অপূর্ব নাজুং জলপ্রপাত দৃষ্টিগোচর হলো। প্রায় ১০০ ফুট উঁচু থেকে উচ্ছল ভঙ্গিমায় নেমে আসছে। এরপর আবার কিছুটা চড়াই এবং উতরাই পার হয়ে মালপা পৌঁছলাম।

৭ম দিন—মালপা থেকে বুধি। ৮ কিলোমিটার পথ। উচ্চতা ২৭৪০ মিটার। মালপা থেকে উঁচুতে ওঠা শুরু; দুটি বড় জলপ্রপাত তিন-চারশ ফুট উঁচু থেকে নেমে আসছে দেখলাম। এরপর অত্যন্ত পিচ্ছিল পথে খানিকটা চড়াই ভাঙ্গার পর বুধিতে উপস্থিত হলাম। রাতের আশ্রয় এখানে তাঁবুতে।

৮ম দিন বুধি থেকে গুনজি। ১৭ কিলোমিটার পথ, ৩৫৫০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট। শুরুতেই বেশ খাড়াই এবং রাস্তাটা খুবই সরু। দু-কিলোমিটার যাওয়ার পর ছায়ালেক গ্রাম পেলাম ৩৩০০ মিটারে। এখানে একটি মন্দির দেখলাম; এখানে নানা ধরনের পাহাড়ী ফুলের সমারোহ। অপূর্ব! এরপর বেশ খানিকটা পিচ্ছিল পথ পার হয়ে গার্বিয়াং গ্রামে পৌঁছলাম। শুনেছি এ গ্রামটা নাকি ক্রমশই মাটিতে বসে যাচ্ছে। ওখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এবং চা খেয়ে আমরা আবার রওনা দিলাম। কিছুদূর গিয়ে কালীনদীর সঙ্গে টিস্কর নদীর সঙ্গমস্থান দেখলাম। আরো কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম কালীনদীর সঙ্গে কুটিগঙ্গা এসে মিশেছে। প্রকৃতির অনাবৃত ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে একসময় গুনজি এসে পৌঁছলাম।

৯ম দিন গুনজি থেকে কালাপানি। ১০ কিলোমিটার পথ, উচ্চতা ৩৩৭০ মিটার। কালীনদীর ধার দিয়ে পাইনগাছের সারির মধ্য দিয়ে এই পথটুকু দারুণ উপভোগ্য। এপথে একটি নয়নাভিরাম ঝরনা দেখতে পেলাম যা কালীনদীতে এসে মিশেছে। একসময় আমরা কালীনদীর উৎসমুখে পৌঁছে গেলাম, যার নাম 'কালাপানি'। এখানে চমৎকার একটি কালীমন্দির আছে যেখানে আমরা পূজা দিলাম। কালাপানি আসবার পথে গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবণও দেখলাম।

১০ম দিন কালাপানি থেকে নাভিদাং। ৯ কিলোমিটার পথ, উচ্চতা ৩৯৮৭ মিটার। কালাপানি থেকে সোজা খাড়াই উঠে যে উপত্যকা

সামনে পড়ল, সেখানে নানা পাহাড়ী ফুলের সমাবেশ ; তবে শুনলাম এই ফুলগুলি বিষাক্ত।

১১শ দিন নাভিদাং থেকে লিপুলেক পাস, ৫ কিলোমিটার পথ, উচ্চতা ৫৩৩৪ মিটার। সোজা খাড়াই উঠে লিপুলেক আসতে খুব কষ্ট হলো। এখানে ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ আমাদের লিপুলেক পাস পার হতে বিশেষ সাহায্য করেছে। এখান থেকে পথটা একেবারে নেমে গেছে, আর বেশিরভাগ সময়ই বরফে ঢাকা থাকে বলে খুবই পিচ্ছিল। এই পথটা সকাল নটার পূর্বে পার না হলে তুষার-ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম ব্যাচের যাত্রীরা সাড়ে-আটটা থেকে ন-টার মধ্যে তিব্বত (চীন) থেকে লিপুলেক পাস পার হয়ে ভারতে ফিরে এল এবং আমাদের খুবই উৎসাহ দিল। এরপর আমরা একে একে তিব্বত ভূখণ্ডে প্রবেশ করলাম। এখানে দুজন চীনা লিয়াজ' অফিসার—একজন মহিলা ও একজন পুরুষ, আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এবার কিছুটা পায়ে হেঁটে, কিছুটা ঘোড়ায় চড়ে এবং পরে ট্রাক ও বাসে করে তাকলাকোট পুলান গেস্ট হাউসে পৌঁছলাম—একথা পূর্বেই বলেছি। ওখান থেকেই দুদিন পরে কৈলাস ও মানস পরিক্রমা করা হয় তার কথাও উল্লেখ করেছি।

কৈলাস পর্ব্বতের উচ্চতা **২২,০২৮** ফুট, তবে শিখরে কাউকে উঠতে দেওয়া হয় না। পরিক্রমা করা হয় সর্বোচ্চ দোলমা পাস অতিক্রম করে। সাধারণতঃ 'জোব্বা' বা 'ইয়াক'-এর পিঠে চেপে অনেক তীর্থযাত্রী পরিক্রমা করেন। কৈলাস পর্বত সবসময় তুষারাবৃত থাকে এবং মানস হ্রদে তার প্রতিবিম্ব পড়ে অপূর্ব দেখায়। কৈলাস পরিক্রমা করবার সময় **১৮,৪০০** ফুট উঁচুতে গৌরীকুণ্ড দেখা যায়। শুনেছি এটা বিশ্বের অন্যতম বিশুদ্ধ জলের হ্রদ এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিস্ময়কর সুন্দর। **১৫,০০০** ফুট উচ্চতায় বিশাল 'মানস হ্রদ' অবস্থিত, গভীরতা প্রায় ৩০০ ফুট, পরিধি ৮৬ কিলোমিটার, এপার থেকে ওপার পর্যন্ত দূরত্ব ২৫ কিলোমিটারের মতো। হ্রদের উত্তরভাগ দক্ষিণভাগ অপেক্ষা অনেক বড়। মানসের বুকে বেশ উঁচু ঢেউ দেখা যায়। জল অতি স্বচ্ছ, কিছু দূরে সবুজাভ, আরো দূরে নীলাভ। মানসের অপরূপ সৌন্দর্য যে দেখেছে সে-ই জানে কী বস্তু সে দেখেছে। বেলা বাড়লে এখানে হাওয়াও খুব বাড়ে। সেজন্য সকাল নটা-দশটার মধ্যেই স্নানপর্ব মিটিয়ে ফেলতে হয়।

কৈলাস-মানসের পথ খুবই কষ্টকর এবং দুর্গম। কিন্তু হিমালয়ের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিশাল মানস হ্রদ, তুষারাবৃত অপূর্ব কৈলাস পর্বত দেখা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আর যখন ভাবি ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বের যাত্রীদের কথা, তখন মনে হয় তাঁদের তুলনায় কষ্ট তো কিছুই নয়। আমরা তো সকল প্রকার সহযোগিতা পেয়েছি উভয় দেশের সরকারের পক্ষ থেকে। সবচেয়ে বেশিবার (৩৩ বার) যিনি এপথের পথিক হয়েছেন এবং একবার ষোলমাস একনাগাড়ে কৈলাস-মানস অঞ্চলে থেকেছেন তিনি স্বামী প্রণবানন্দ। ওখানকার নানারকম তথ্য সংগ্রহ করে 'Kailas Manasarovar' নামে যে অসাধারণ বইটি তিনি লিখেছেন, সেটি কেবল কৈলাস এবং মানসযাত্রীদের কাছেই নয়, যে-কোন হিমালয়-প্রেমিকের কাছেই মূল্যবান সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

আনন্দের সন্তান

আনন্দের তুফানে যাঁরা ভাসেন ও ভাসান

সুদীপ বসু

তাঁরা জানতেন চারপাশের মানুষদের, যারা পোশাকের রঙে, সাজানো-গোছানো জীবনে, মুখের হাসিতে কেমন উচ্ছল! অথচ ভেতরে জমে থাকা অনেক দুঃখ সারাক্ষণ কুরেকুরে খাচ্ছে। চলার নেশায় তারা পথ চলে অন্ধের মতো। তারপর নেশা যখন ছুটে যায়, তখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখে বিস্বাদ জীবনটাকে। সব থেকেও কি যেন একটা নেই!

তাঁরা তখন হাসছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন এরা কি সত্যিই বাঁচতে চায়? নাকি বাঁচার নাম করে মরণের দিকে ছুটে চলাই এদের নিয়তি? সব হারানো এই মানুষদের দিকে তাকিয়ে ওঁদেরই একজন, রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর এক শিষ্যকে বলোছলেনঃ "কি বলো পুলিন, ভবসাগরটা তো তরতে হবে—অনায়াসে—হেসে খেলে—হেসে খেলে—মহানন্দে।"

ব্রহ্মানন্দ যেমন পূর্বজীবনে, তেমনি সন্ন্যাস-জীবনে সর্বদাই মজায় থাকতেন। তিনি তিন রকম 'পড়ায়' অভ্যস্ত ছিলেন—বসে পড়া, শুয়ে পড়া, ঘুমিয়ে পড়া। ভয়ঙ্কর রকম তাঁর নাক ডাকত। বন্ধুরা মনে করতেন তাঁর পাশে শোয়া আর চিড়িয়াখানায় বাঘের ঘরে শোয়া একই জিনিস। ওড়িয়া চাকরকে ভয় দেখানো থেকে আরো বহু কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। অনেক রকম গল্পও তাঁর স্টকে ছিল। নানা সময়ে সেসব পরিবেশন করতেন। গাঁয়ের লোকে মাছের পোলাও খেয়ে কিরকম চেঁচামেচি করেছিল, তিনি রসিয়ে রসিয়ে বলতেনঃ "মাগো! কি গন্ধি ভাত, পচা হলুদ দিয়ে রেঁধেছে, আবার তাতে মাছ দিয়েছে! আরে ছি! ভাতে কখনো তেল দেয়?" কলকাতার সন্দেশ পাতে পড়তে তারা বেশি চেঁচিয়েছিলঃ "আরে রাম, ময়রা ঠকিয়েছে, সন্দেশে মিষ্টি দিতে ভুলে গেছে।" তারপর সেই সন্দেশে তারা গুড় মেখে খেল।

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি ব্রহ্মানন্দের কোন অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞা ছিল না। তাদের দুঃখের অংশ নিজে নিয়ে তা মুছিয়ে দেবার চেষ্টাই তিনি করেছেন। একটি সদ্য পত্নীহারা যুবক একবার তাঁর কাছে ভুবনেশ্বর মঠে এসেছিল। তার অবস্থা দেখে মহারাজ গল্পের ভাঁড়ারটি খুলে দিলেন। হেসে হেসে সে মাটিতে গড়াগড়ি খেত, গল্প আর শুনবে কি করে? মহারাজ বলে উঠতেনঃ "এত হাসলে বলি কি করে?" "না, আপনি বলুন, আমি হাসব না"—কিন্তু তারপরেই হেসে মাটিতে লুটোপুটি।

এক একজনের গল্প বলার স্টাইল এক এক ধরনের। স্বামী সারদানন্দ একটি মুটের গল্প বলেছিলেন। সেখানে কৌতুকের সঙ্গে করুণার সমন্বয় ঘটেছিল। দারুণ গরমিকাল। চারিদিকে আগুনের হলকা বইছে। রাস্তায় পা দিলে পা পুড়ে যায়। একটি মুটে মোট ঘাড়ে বেরিয়েছিল। একটু ছায়া দেখে মোট নামিয়ে হাঁপাতে লাগল। বললেঃ "আল্লা যদি দিন দেন তো রাস্তায় গদি বিছাইয়া মোট বইমু।" বেচারি জানতো না—যেদিন রাস্তায় গদি বেছানোর অবস্থা তার হবে, সেদিন আর মোট বইবার দরকারই হবে না।

একটি গ্রাম্যলোক (যাকে বলে 'গাঁইয়া') কলকাতায় এসেছে। কিন্তু মোটেই সে বাড়ির বাইরে বেরোয় না। জানলা দিয়ে দেখা যেত সে খালি অঝোরে কেঁদেই চলেছে। কৌতূহলী হয়ে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল—"কি ব্যাপার বাপু? এত কাঁদছ কেন?" শুনে সে আরো জোরে জোরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল—"রাস্তা দিয়ে অত গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে। ওরা যদি ছিটকে ঘরে ঢুকে পড়ে, তাহলে আমার হাত-পা ভেঙে যাবে, আমি মারা যাব, আমার দেশে ফিরে যাওয়া হবে না।"

যাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর মনে হয়, সেই কালী মহারাজও (স্বামী অভেদানন্দ) কি কম রসিক ছিলেন! বাইরের আবরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে সরস কথাবার্তা তাঁর বেরিয়ে আসত। কাশীতে গেছেন, পরিব্রাজক, সঙ্গে আরো দু-একজন রয়েছেন। শুনলেন নব্বই-উত্তীর্ণ এক কুলীন ব্রাহ্মণের কাহিনী। তাঁর একমাত্র পেশা বিয়ে করা। পাছে স্ত্রীদের নাম ভুলে যান, সেজন্য খাতায় লিখে রাখতেন। যতদিন পেরেছেন শ্বশুরবাড়ি ঘুরে ঘুরে দিন কাটিয়েছেন। এখন আর সে অবস্থা নেই। কেবল শ্বাসটুকু মাত্র আছে। চোখ চলে না, হাত-পা তো নয়ই। আত্মীয়রা রোজ সকালে রোদে বের করে দেয়। কালী মহারাজ অশেষ কৌতূহল নিয়ে সেই প্রায়-মৃতকে দেখতে গেলেন। হাজির হয়ে ভাবলেন বুড়োর তো আর কোন ব্যাপারে সাড় নেই। কিন্তু বিয়ের কথা উঠলে কি করে দেখা যাক। চেঁচিয়ে বললেন, "একটা বে করবে? ভাল সম্বন্ধ আছে।" একথাটা কিন্তু বৃদ্ধের ঠিক কানে গিয়ে পেঁছিল। সারাজীবনের পেশা ঐটেই ছিল কিনা। ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "কত দেবে?" অন্যরা খানিকটা গালিগালাজ করে চেঁচিয়ে বললেন, "খাট দেবে, কাঠ দেবে, প্যাঁকাটি দেবে।" সেসব কিছুই বুড়োর কানে গেল না। বারবার বলতে লাগলেন, "কত দেবে? কত দেবে?" বাকিরা বলতে লাগলেন, "দেবে—অনেক কিছু দেবে, খাট, কাঠ, প্যাঁকাটি, আগুন—।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের খুব অভিজ্ঞতা ছিল সমাধি কাকে বলে, বিশেষ করে তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানদের, যাঁরা নিজেরাও ছিলেন সমাধিমান পুরুষ। আলমবাজার মঠে এঁদের কাছে জনৈক ব্যক্তি সমাধি দেখাতে গিয়েছিলেন। সে বড় মজার ব্যাপার। বেলা আড়াইটে-তিনটের সময় উক্ত ব্যক্তি এসে হাজির। গায়ে আলপাকার জামা, বুকে ঘড়ি, চেন এবং হাতে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ। শিবানন্দ স্বামী, গুপ্ত মহারাজ এবং আরো কয়েকজন কালী-বেদান্তীর ঘরের সামনের বারান্দায় বসে। ভদ্রলোক এসে শিবানন্দ স্বামীকে প্রণাম করে দু-একটি কথা বলে গুপ্ত মহারাজের নামটি শুনে নিলেন। তারপরেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "গুপ্ত, আমার জামাটা ধর, আমার সমাধি আসছে।" এই বলে তাড়াতাড়ি ব্যাগটি রেখে জামা, ঘড়ি ও চেন খুলে গুপ্ত মহারাজকে দিয়ে সমাধিগ্রস্ত। গুপ্ত মহারাজও মজা দেখার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগিনেয় হৃদয়ের ভূমিকা নিয়ে তার পেছনে দাঁড়ালেন। সমাধি যখন ভাঙব, ভাঙব—তখন লোকটি মুখে 'ব্রেরং ব্রেরং' আওয়াজ করতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে সকলে অতিকষ্টে হাসি সামলে দাঁড়িয়ে। অবশেষে সমাধি ভাঙল, বাহ্যিত হবার পর লোকটির বিষয়-বুদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল। বলে উঠলেন, "গুপ্ত, আমার চশমাটা দাও, আমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন ও ব্যাগটা দাও।" ব্যাগটা আবার সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলেন, পাছে গুপ্ত মহারাজ ইতিমধ্যে কিছু সরিয়ে ফেলেছেন কিনা। তারপর অতিব্যস্তে চলে গেলেন। চলে যাবার পরেই উপস্থিত সকলের ঘন ঘন সমাধি হবার লক্ষণ দেখা গেল। সকলেই হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, "গুপ্ত, আমার চশমাটা ধর, ব্যাগটা ধর, আমার সমাধি আসছে।"

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

প্রকৃতির আজব খনিজদ্রব্য—হীরক

রবার্ট পার্কার এবং বিনোদ কুরিয়ান

১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের শেষে নিউইয়র্কের বিখ্যাত নিলাম বাড়ি 'ক্রীস্টি'তে বিক্রি হলো ছোট্ট একটি ঘন লাল রঙের হীরা (ওজন এক ক্যারাটেরও কম) আটলক্ষ আশি হাজার ডলারে (অর্থাৎ ক্যারাট প্রতি ৯ লক্ষ ২৬ হাজার ডলার মূল্যে)। হীরা ওজনের একক হচ্ছে ক্যারাট (carat), যা ৩ ১/৬ গ্রেন বা ১ ১/৩ রতির সমান। হীরকটির এত দাম উঠবার কারণ এর ঘোর লাল রঙ।

আশি দশকের সূচনার তুলনায় বর্তমানে হীরার অসম্ভব রকমের চাহিদা বেড়েছে। হীরা যেন এখন প্রেমের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের আমেরিকার ৭৫ শতাংশ ভাবী বর তাদের ভাবী বধূর জন্য হীরার আংটি কিনেছে ; জাপানেও ওইরকম। জাপানী ভাষায় হীরার কোন প্রতিশব্দ নাই, ওরা বলে ডায়মন্ডো (Diamondo)। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের সারা পৃথিবীতে ৪৯০ লক্ষ হীরকখণ্ড বিক্রয় হয়েছিল, যার দাম হলো ২৪৬ মিলিয়ন ডলার।

৩০০ কোটি বৎসর ধরে পৃথিবীর গভীর স্তরে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ ও চাপের দ্বারা খাঁটি অঙ্গার (carbon) প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা শক্ত বস্তু হীরকে রূপান্তরিত হয়েছে। সব হীরকই কিম্বারলাইট (kimberlite) অথবা ল্যামপ্রোইট (lamproite) নামক পাথরের খাড়া নলের মধ্যে তৈরি হয়ে কালক্রমে ভূগর্ভ থেকে চাপে উপরে চলে আসে।

খ্রীস্টপূর্ব যুগে ভারতবর্ষেই প্রথম খনি হতে হীরা তোলা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একজন ফরাসী, জিন ব্যাপ্টিস্তে তাভারনিয়ের (যিনি ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর রাজপরিবারে হীরামুক্তা সরবরাহ করতেন) উটের সাহায্যে মরুভূমি পার হয়ে পারস্য ও ভারতবর্ষ থেকে হীরা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন রাজপরিবারে হীরা আড়ম্বর ও বিলাসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যখন ভারতবর্ষের খনিগুলি থেকে হীরা নিঃশেষ হয়ে গেল, পর্তুগীজ দুঃসাহসীরা ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রেজিলের খনিতে হীরার সন্ধান পেলেন, এবং প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে সেখানকার নদীগর্ভই সারা বিশ্বকে নূতন হীরা জুগিয়েছে। তারপরে, ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে ইরাসমাস জেকবস নামে এক কৃষকপুত্র দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর কাছে একটি উজ্জ্বল পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিল, যেটি পরে ২১.২৫ ক্যারাট হীরা বলে প্রমাণিত হয়। তখন হতে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিগুলিই সারা পৃথিবীতে আকর্ষণীয় হীরা জুগিয়ে আসছে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে সেখান থেকে তোলা বৃহত্তম অপরিশোধিত হীরা, কাল্লিনান (৩১০৬ ক্যারাট), ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে তাঁর ৬৬তম জন্মদিনে উপহার দেওয়া হয়েছিল। এটি থেকে যে দুটি বড় হীরা, স্টার অফ আফ্রিকা ও সেকেন্ড স্টার অফ আফ্রিকা বার করা হয়েছিল, সেগুলিই রাজপরিবারের রত্ন হিসাবে টাওয়ার অফ লন্ডনে প্রদর্শিত হয়।

হীরকের কাজে সারা পৃথিবীতে কুড়ি লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। কুড়িটি দেশে খনি থেকে হীরা তোলা হয় এবং তিরিশটি দেশে হীরা কাটা ও পালিশ করা হয়। আফ্রিকার বৎসোয়ানায় ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে কালাহারি মরুভূমিতে হীরক-অনুসন্ধানকারীরা উইঢিপির ভিতর থেকে (৩০ মিটার নিচে) হীরককণামিশ্রিত কিম্বারলাইটের সন্ধান পেয়েছিল। এর ফলে হীরা সেই দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় আবিষ্কার সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে এই দেশ ৩ কোটি ক্যারাট

হীরা তুলেছে। পশ্চিম আফ্রিকার গিনিতেও বড় বড় হীরা আবিষ্কৃত হয়েছে।

সারা বিশ্বে নতুন হীরার ৮৫ শতাংশ বিক্রয়-কেন্দ্র লন্ডনের সেন্ট্রাল সেলিং অর্গানাইজেশন (সি. এস. ও, বা C. S. O.)-এ আসে। এর কেল্লার মতো অট্টালিকায় ৬০০ লোক বাছাই করার (sorting) কাজে নিযুক্ত। তারা কম শক্তির (low power) মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে স্বচ্ছতা, বর্ণ ও আকৃতি অনুযায়ী হীরা-খণ্ডগুলিকে ৫০০০ শ্রেণীতে ভাগ করে। স্বচ্ছতা (clarity) অর্থে, প্রায় প্রত্যেক হীরায় যে জন্মগত দাগ থাকে, সেই বিষয় বোঝায়। এই অংশ যত কম হবে হীরার দাম তত বেশি হবে। নিখুঁত (flawless) হীরা সেটি, যেটিতে দশগুণ শক্তির (ten power) মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেও কোন দাগ ধরা পড়ে না। রত্ন হিসাবে ব্যবহারের জন্য, বরফের মতো সাদা থেকে সামান্য হলদে হীরাগুলিকে ডি (D) থেকে জেড (Z) পর্যন্ত বর্ণ (alphabet) দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যাদের দাগ বেশি বা অন্যান্য খুঁত আছে, সেই সব হীরাকে 'রাফ' (rough) বলা হয়। বেশির ভাগ 'রাফ' হীরা কল-কারখানার কাজে ব্যবহৃত হয়।

উপরে বর্ণিত সি. এস. ও. রাফগুলিকে কাগজের মোড়কে ভরে খরিদ্দারদের (যাদের সাইট-হোল্ডার বা দর্শক বলা হয়) কাছে দেয়। বেশির ভাগ খরিদ্দার বিশ্বের সর্বাপেক্ষা হীরে-কাটা ও হীরে পালিশের জায়গা—বোম্বাই, টেল-এভিভ, অ্যান্টওয়ার্প ও নিউইয়র্ক থেকে আসে। পরিদর্শন-দিনে (sight days—যা বৎসরে দশদিন) তাদের হীরক-মোড়ক (কাগজে মোড়া বিভিন্ন ধরনের হীরা) দেখতে দেওয়া হয় দাম বলবার জন্য। দাম সাধারণতঃ সাত-অঙ্ক আমেরিকান ডলার। বেশির ভাগ হীরাকে পালিশ করার জন্য প্রথমে চেরা (cleave) হয়। এই কাজ করা হয় অলিভ তেল ও হীরকচূর্ণ মাখানো ফসফর-ব্রোঞ্জ-এর তৈরি কাগজের মতো পাতলা দাঁতহীন করাতযুক্ত মিনিটে ১৫ হাজার বার আবর্তনকারী মেশিনে। চেরক (cleaver) লেসাররশ্মি বা অন্য হীরার সাহায্যে প্রথমে একটি দাগ কেটে নেয়; তারপর পাতলা ছুরি বসিয়ে হাতুড়ির একটি মাত্র ঘা মারে; ভাগ্য ভাল হলে পছন্দমতো টুকরো হয়; তা না হলে ছোট ছোট টুকরো হয়ে যায়। অ্যান্টওয়ার্পের একজন ভাল মিস্ত্রির হাতে ৪০।৪৫ শতাংশ রাফ হীরা মনোমত রত্নে রূপান্তরিত হয়। বোম্বাইয়ের হীরক ব্যবসায়ীরা অ্যান্টওয়ার্প থেকে রাফ হীরা কিনে তাদের কারখানায় রত্নস্তরের হীরা বানায়।

রত্ন হিসাবে হীরকের ব্যবহার ছাড়া কল-কারখানায় এর চাহিদা খুব। উৎকৃষ্ট রেকর্ড প্লেয়ারের সূচীমুখ নির্মাণে, মার্বেল ও কংক্রিট কাটার কাজে, ভূগর্ভে তৈল সন্ধানের ড্রিলে, চক্ষু অপারেশনের যন্ত্রে, মহাকাশগামী যানে ও কম্পিউটারে হীরার ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য।

হীরা ও ভারত

হীরাকে সাধারণের নাগালে আনার কাজে ভারতের অবদান অনেক। এখানকার শ্রম সস্তা। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে প্রায় ৭ লক্ষ লোক এই কাজে নিযুক্ত। ১৯৮৭-৮৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রায় সাড়ে চার কোটি ক্যারাট 'রাফ' হীরা আমদানি হয়েছে, যার মূল্য ২০০০ কোটি টাকা এবং ভারত রপ্তানি করেছে ৮৫ লক্ষ ক্যারাট পালিশ-করা হীরা যার দাম ২৫০০ কোটি টাকা। যেকোন দেশের চেয়ে ভারতে বেশি হীরা পালিশ হয় এবং এখান থেকে বেশি রপ্তানি হয়। ভারতে কিছু কারখানা আছে যেখানে কেবল হীরা চেরা হয়; এতে নিযুক্ত আছে ২৫০০০ কর্মী। ভারতে হীরক-ব্যবসায়ে মেকেবল (Makeable) হীরা (যেগুলি রত্ন হবার ও কল-কারখানায় ব্যবহারের মাঝামাঝি) মেরুদণ্ড বিশেষ। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান এগুলিকে অলঙ্কারে বসানোর যোগ্য করে তোলে। শুধু বোম্বাইয়ে নয়, কাশ্মীর ও কেরলেও নানা আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সেখানে উন্নত শ্রেণীর যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক হীরক ব্যবসায়ে গুজরাট (বিশেষত পালনপুর) অগ্রণী। *

*** Reader's Digest, January 1989: Diamonds—Fire in Ice** অবলম্বনে।

গ্রন্থ-পরিচয়

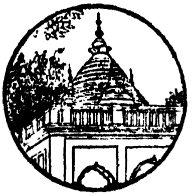

ভাবনার কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ

তারকনাথ ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের হোমকুণ্ড বরাহনগর মঠ: স্বামী বিমলাত্মানন্দ। ১৯৮৬। বরাহনগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি, ১২৫/১ প্রামাণিক ঘাট রোড, কলকাতা ৭০০০৩৬। তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনাঞ্জলি: ফণিভূষণ সান্যাল। ১৯৮৮। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। বারো টাকা।

বাঙালীর—কেবল বাঙালীর কেন, ভারতবাসীর তথা বিশ্বজনের—ভাবনালোকে শ্রীরামকৃষ্ণ এক ব্যক্তিপুরুষ নন, তিনি এক ভাবসত্তা। এক জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডলে তাঁর আবির্ভাব ও প্রকাশ। অভেদস্বরূপিণী শ্রীমা সারদাদেবী, কয়েকজন ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী এবং গৃহী সন্তানবৃন্দ ঐ ভাবমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

স্বামী বিমলাত্মানন্দ বরাহনগর মঠের তথা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পূর্ব ইতিহাস-সহ যে বর্ণনা করেছেন তাতে কয়েকটি তরুণ ত্যাগব্রতীর সুতীব্র আধ্যাত্মিক আকুতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণময়তার পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূচনার উল্লেখ করে লেখক বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহস্পর্শ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার কথা স্মরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর তাঁর ত্যাগী সন্তানরা প্রথমটা বিছিন্ন হয়ে পড়লেও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ গৃহীভক্তদের আর্থিক আনুকূল্যে কিভাবে বরাহনগরে প্রথম মঠে সমবেত হয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন, সে-সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য গ্রন্থটিতে সমাবেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণ তরুণ সাধকদের কঠোর সাধনা ও তিতিক্ষা, পরস্পরের প্রতি প্রেম ও গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ জীবনের বর্ণনা। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা কিভাবে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়ে কালে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে তার আভাস এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়।

'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনাঞ্জলি' গ্রন্থটি সাতটি খণ্ডে বিভক্ত—'ডুব দে রে মন রামকৃষ্ণ নামে', 'করুণাময়ী মা', 'ভক্তি ও ভক্ত', 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্', 'পরমপ্রেমরূপা' 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু', এবং 'আলোকের ঝরনাধারা। প্রতি খণ্ডে অনুধ্যানাত্মক ছোট ছোট কয়েকটি রচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে। সহজ সরল ভাবগম্ভীর সুমধুর ভাষায় ভক্তিসিদ্ধ ভাবনার পুষ্পাঞ্জলি! প্রত্যেকটি রচনায় গদ্যে লেখা সনেটের মতো এক-একটি সুর বেজে উঠেছে। 'ভূমিকা'য় গজেন্দ্রকুমার মিত্র বলেছেন: 'এর মধ্যে ফণীবাবুর নিজস্ব অনুভূতিও আছে, আর আছে সে অনুভূতির প্রকাশ।' ভক্ত ও অনুরাগী মাত্রেই গ্রন্থটি পাঠ করে তৃপ্ত হবেন।

বরেণ্য কথাসাহিত্যিকের বন্দনা ও বিশ্লেষণ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যে বনফুল: রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬। পঁচিশ টাকা।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে এক সব্যসাচী লেখক। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ—সব ক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার। বিহারের মণিহারিঘাটের মুখুজ্জে পরিবারে তাঁর

জন্ম। ছাত্রজীবন বিহারে ও কলকাতায়। ডাক্তারি করেছেন বাংলার হাসপাতালে। তারপর ভাগলপুরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবনের সিংহভাগ সেখানেই কাটিয়েছেন। জীবন-সায়াহ্নে কলকাতায় চলে আসেন। এখানেই তাঁর জীবনে ছেদ পরিণত বয়সে।

তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন কলকাতার 'সাহিত্যতীর্থে'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। বনফুল এই সংস্থার তীর্থপতিও হয়েছিলেন। বনফুল নামক একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব—লেখক ও সামাজিক-ব্যক্তিত্বকে রমেন্দ্রনাথ খুব কাছের থেকে দেখেছেন। এ বই এই ঘনিষ্ঠ দেখার ফলশ্রুতি। এটি ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা নয়, স্মৃতিচারণ নয়, দুই-ই। বিশ্লেষণ ও বন্দনা, দু-ই এখানে পাই। বনফুলকে রমেন্দ্রনাথ যে কতভাবে দেখেছেন তার ইঙ্গিত পাই অধ্যায়-শিরোনামাগুলিতে। প্রারম্ভিকায় বনফুল, তীর্থপতি বনফুল, স্মৃতির বৃন্তে বনফুল, প্রণতি-প্রকাশিত বনফুল, শ্রদ্ধায় সুরভিত বনফুল, সাহিত্যসাজিতে বনফুল, নাট্য-নান্দনিক বনফুল, গল্পগুচ্ছে বনফুল, রম্যরাজিতে বনফুল, প্রবন্ধ-বন্ধনে বনফুল, কবিতাকলিতে বনফুল। আরো গ্রথিত হয়েছে রমেন্দ্রনাথকে লিখিত বনফুলের একগুচ্ছ চিঠি। প্রথম পত্রের তারিখ ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ। শেষ পত্রের তারিখ ১৯৭৮। প্রথম পত্রে সংক্ষেপে ভদ্রতা ও ধন্যবাদজ্ঞাপন। সম্বোধন—প্রীতিভাজনেষু, পত্রশেষে পাঠ—ভবদীয় শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। শেষ পত্রে সম্বোধন—কল্যাণীয়েষু, পত্রশেষে পাঠ—শুভার্থী বলাইদা।

বিশ বছরের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতায় রমেন্দ্রনাথ বনফুলের লেখক-সত্তা ও সামাজিক-সত্তাকে গভীরভাবে জেনেছেন। এ-বই সেই গভীর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের স্বাক্ষরবাহী।

রমেন্দ্রনাথের বইখানি প্রথম পাঠে এসব কথা মনে হয়। দ্বিতীয় পাঠে বইয়ের আন্তর-মূল্য জানা যায়। ঠিক কেতাদুরস্ত অ্যাকাডেমিক আলোচনা নয় বলেই এখানে বনফুল-সন্দর্শনে আছে সজীবতা।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পেয়ে যাই 'বনফুলের ছোট গল্প' বইটির লেখকের ভূমিকা থেকে কয়েকটি বাক্য ঃ

"খুব ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার বয়স তখন পাঁচ-ছ বছরের বেশি নয়। আমাদের বাড়িটা ছিল গ্রামের একেবারে এক প্রান্তে। আশেপাশে বনজঙ্গল। সাপ, বুনো-শুয়োর, খরগোস, নানারকম পাখি এরাই ছিল প্রতিবেশী আর ছিল ছোট-বড় নানারকমের গাছ, নানা ধরনের ফুল-ফল লতাপাতা। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে সরু একটি পায়ে-চলা পথ ছিল ... মনে মনে সেই সরু পথটি বেয়ে চলে যেতুম স্বপ্নলোকে ... ।" (পৃঃ ২৯৩)

এই উদ্ধৃতি থেকে স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পী বনফুলকে চিনে নিতে আমাদের দেরি হয় না। পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রাম বনফুলের জন্মস্থান। এই গ্রাম ও তার পরিবেশ সারাজীবন লেখক বনফুলকে 'হন্ট' করেছে। তাঁর গল্পে উপন্যাসে মণিহারীতে দেখা অনেক চরিত্র এসেছে ঈষৎ কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে। তার স্বীকৃতি 'মণিহারী' গল্পসংকলনে লেখকের নিবেদন থেকে রমেন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছেন। (পৃঃ ২৮০)। এটুকু জানলেই অনেকটা জানা হয়। অনুভব করা যায়, বনফুলের কথালোকে আলো এসে পড়ল।

রমেন্দ্রনাথের লেখার এটাই গুণ। খুব গভীর দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা কার্যে তিনি প্রবৃত্ত হননি। কিন্তু খুব যত্ন নিয়ে অনুরাগের সঙ্গে বনফুল-সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। সাহিত্যতীর্থের অধিবেশনে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তীর্থপতিরূপে যেসব ভাষণ (পদ্য-গদ্য) দিয়েছিলেন, সেগুলির আলোচনা পাই, 'তীর্থপতি বনফুল' অধ্যায়ে। সেগুলির আলোচনা থেকে আমরা বনফুলকে নতুন করে চিনি। যেমন, সঙ্গীতশিল্পী অতুলপ্রসাদ সেন সম্পর্কে বনফুলের শ্রদ্ধানিবেদনমূলক রচনা (পৃঃ ২৯) থেকে আমরা শিল্পী অতুলপ্রসাদের প্রতি শিল্পী বনফুলের প্রাণের প্রণতি পাই। তা আমাদের মুগ্ধ করে। সব মিলিয়ে বইটি উপভোগ্য।

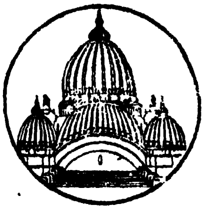

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

মালদা আশ্রম সারা বৎসরব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালন করেছে। শোভাযাত্রা, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক, আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয় ছিল অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্গত। এ-উপলক্ষে কিছু-সংখ্যক দুঃস্থ ছাত্রকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লী আশ্রম এই উৎসবের শেষ-পর্যায় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে গত ৩০ এপ্রিল এক জনসভার আয়োজন করে। ঐ সভায় 'স্বামী বিবেকানন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়' বিষয়ে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ।

কালাডি (কেরল) আশ্রমে ভগবান শঙ্করাচার্যের ১২০০তম জন্মজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। গত ২৩ এপ্রিল উৎসবের উদ্বোধন করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শঙ্করদয়াল শর্মা সভায় পৌরোহিত্য করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ই. কে. নায়নার। গত ১০ মে এই আশ্রমে শঙ্কর-জয়ন্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেরলের শিক্ষামন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখরন সম্মেলনে বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

নতুন শাখাকেন্দ্র

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আমতলী (আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা) বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়েছে। শাখাকেন্দ্রটির নাম হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ, বিবেকনগর। গত ২৯মে, ১৯৮৯ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। ঐ দিন বহু সন্ন্যাসী, ভক্ত ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে এক জনসভায় তিনি আমতলী সেবাশ্রম সভাপতির নিকট থেকে আশ্রমের গৃহ ও জমি-সংক্রান্ত দলিলপত্র গ্রহণ করেন। ঐ দিন পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ আমতলীতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবং আগরতলার ধলেশ্বরে একটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিকিৎসা কেন্দ্রের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। উল্লেখ্য, উপরি উক্ত কার্যাবলী আগরতলাস্থ মিশনকেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হবে। ঐদিন পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার। তাছাড়া ত্রিপুরা সরকারের অন্য চার-জন মন্ত্রী এবং মুখ্যসচিব আই. পি. গুপ্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন

কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলের অধীনে একটি মিনি জুটমিল স্থাপিত হয়েছে। গত ১৩মে '৮৯ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মিলটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত।

গত ৩মে বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের নবনির্মিত রামকৃষ্ণ মঠ শতবার্ষিকী ভবনের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

গত ৩মে মাদ্রাজ মঠের দাতব্য চিকিৎসালয়ে একটি আলট্রা-সাউন্ড স্ক্যানার উৎসর্গ করেন তমিলনাড়ুর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ কে. দেইবসিগামনি।

মধ্যপ্রদেশের নারায়ণপুরে রায়পুর আশ্রম-কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিবেকানন্দ আরোগ্যধামে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আন্তর্বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। গত ১৫মে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মতিলাল ভোরা

বিভাগটির উদ্বোধন করেন। এ-উপলক্ষে তিনি বিবেকানন্দ বনবাসী যুব-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং মধ্যপ্রদেশের উপজাতিদের বিষয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

পরিদর্শন

গত ৭মে কাঞ্চী শৃঙ্গেরী মঠের পীঠাধিপতি অভিনব বিদ্যাতীর্থ স্বামীগল কালাডি আশ্রম পরিদর্শন করেন।

গত ২৭ এপ্রিল বিহারের রাজ্যপাল জগন্নাথ পাহাড়িয়া রাঁচি মোরাবাদী আশ্রম পরিচালিত কৃষিগবেষণাকেন্দ্র 'দিব্যায়ন' পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ

বাংলাদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ ঃ ঢাকাকেন্দ্রের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ জেলার সাতুরিয়া গড়পাড়া এবং বালিয়াটি অঞ্চলের ১৬০০টি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৪০০ কিলোঃ চাল, ৫৬০ কিলোঃ চিঁড়া, ১৫০ কিলোঃ গুড়, ১১০০ শাড়ি, ৭০০টি ধুতি, ১৫০০ লুঙ্গি, ১০০০টি শিশুদের পোশাক, ১২০টি লণ্ঠন, ৪০০৫টি বাসনপত্র, ৫টিন বিস্কুট, ১টিন কেরোসিন দেওয়া হয়েছে। একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

বাগেরহাট কেন্দ্রের মাধ্যমে ঐ জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৮০০ কিলোঃ চাল, ২১২০টি শাড়ি, ২০৫৫টি লুঙ্গি, ১০০৫টি ধুতি, ২২০টি কম্বল এবং ২৩০০ শিশুদের পোশাক দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল ৪৬৮৯ জন ঝঞ্ঝাহত রোগীর চিকিৎসা করেছে।

পুনর্বাসন

উত্তর ২৪-পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের গোবিন্দকাটি ও যোগেশগঞ্জ অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কার্যসূচী অনুযায়ী ৫৫০টি বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। তাছাড়া আরও ১৮৩টি বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

বসিরহাট মহকুমার ৩০টি গ্রামে উক্ত কার্যসূচী অনুযায়ী শিকড়া-কুলীনগ্রাম আশ্রমের মাধ্যমে ১৯২টি বাড়ি, ৪টি কমিউনিটি হল এবং ৭৩টি বাড়ি মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ মিশন, সিঙ্গাপুর ঃ গত ২৯ এপ্রিল থেকে ২মে চারদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেছে। ২৯ এপ্রিল উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। তিনি 'বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে মূল ভাষণ দেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনাবলীর বিশেষ সংস্করণের প্রকাশ করেন। এ-সভায় স্বামী বিবেকানন্দের উপর লিখিত প্রবন্ধাদি সম্বলিত একটি স্মারক-পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করেন কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্বামী সম্প্রজ্ঞানন্দ। সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়ান ফাইন আর্টস সোসাইটির শিশুশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধ্যান এবং আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সাধন-শিবিরের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার অডিটরিয়াম'-এ সর্বধর্মসমন্বয় সভা স্বামী প্রভানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন সিঙ্গাপুরের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের দ্বিতীয় মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লী সিয়েন লুঙ। মৌলবী এম. এইচ. বাবু সাহেব ইসলাম ধর্ম, আর. জ্ঞান সীহ বৌদ্ধধর্ম, ডঃ রবার্ট পি. বালেটচেট খ্রীস্টধর্ম, স্বামী সম্প্রজ্ঞানন্দ হিন্দুধর্ম, মেহেরবান সিং শিখধর্ম এবং বি. আর. ভকিল জরথুস্ত্রীয় ধর্মের উপর বক্তব্য রাখেন।

১মে উৎসবের তৃতীয় দিনে তিনটি অধিবেশন হয়। প্রথমটি ছিল প্রশ্নোত্তর অধিবেশন। বিষয়বস্তু ছিল 'দৈনন্দিন জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রয়োগ'। উত্তর দিয়েছেন কে. ষম্মুগম, স্বামী সম্প্রজ্ঞানন্দ এবং

সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এস. গোপালন। দ্বিতীয় অধিবেশন 'হিন্দুধর্মে আচার-অনুষ্ঠান' বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটাস অধ্যাপক আর. কনগসুন্থরম এবং স্বামী সম্প্রজ্ঞানন্দ। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও নারীসমাজ' বিষয়ে আলোচনা হয় তৃতীয় অধিবেশনে। শ্রীমতী সৌন্দর্য সুকুমার, কুমারী রেরিটা রায়, সরোজা পরাণ এবং ডঃ উমা রাজন বক্তব্য রাখেন। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ, বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের হাইকমিশনার ওয়াই. এম. তেওয়ারী। শ্রীমতী তেওয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের উপর আয়োজিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

উৎসবে শেষ দিন আলোচনার বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ'। স্বামী প্রভানন্দ এবং ডঃ এস. ভাসু ছিলেন যথাক্রমে এই অধিবেশনের সভাপতি ও প্রধান অতিথি। বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত যুবক-যুবতীবৃন্দ বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলিতে দূতাবাসসমূহের সদস্যবৃন্দ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটিঃ গত জুন মাসের রবিবারগুলিতে এই বেদান্ত সোসাইটি এবং তার দ্বারা পরিচালিত সান্তা বারবারা, ট্রাবুকো ক্যানিয়ন, স্যানদিগো ও সাউথ প্যাসাডেনা-র শাখাগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার বেদান্ত সোসাইটিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উপর ক্লাস হয়েছে।

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটিঃ গত জুন মাসের রবিবার গুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর ভাষণ হয়েছে। প্রতি শনিবার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং রবার্ট রীড। ৭ ও ২১ জুন স্বামী প্রপন্নানন্দ রাজযোগের উপর এবং ১৪ জুন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উপনিষদের উপর ক্লাস নিয়েছেন। তাছাড়া ২৯ জুন পূজা, ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং সন্ধ্যায় আলোচনার মাধ্যমে স্নানযাত্রা উৎসব পালন করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার ঃ গত জুন মাসের প্রতি রবিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি শুক্রবার পাতঞ্জল যোগসূত্র এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব রামকৃষ্ণ'-এর উপর ক্লাস নিচ্ছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী বোধময়ানন্দ (গিরিধারী) গত ২৬ মে সকাল ৮-৪৫ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পেটের গোলমালে ভুগছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি কিডনি-সংক্রান্ত উপসর্গ দেখা দেওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসায় তাঁর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি।

স্বামী বোধময়ানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি আসানসোল আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় দীর্ঘ পনের বছর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রয়াত সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন। পরে তিনি কনখল, কাঁথি, বাঁকুড়া এবং বারাণসী সেবাশ্রমের কর্মী ছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে কঠোরতা তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ স্বামী গর্গানন্দ সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

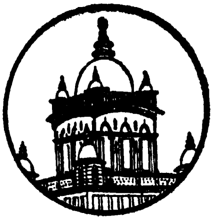

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, উত্তর ব্যাঁটরা (হাওড়া): গত ৯ এপ্রিল '৮৯ অপরাহ্ণে আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০তম এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ-উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ঐ দিনের ধর্মসভায় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন এবং স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর উপর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘ, জয়নগর-মজিলপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাব উৎসব গত ৯, ১২ ও ২৬ মার্চ ১৯৮৯, আশ্রম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিনে সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করে ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দ, ডঃ তাপস বসু, অধ্যাপক সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রমুখ।

উত্তর ২৪ পরগনার রাখালচণ্ডী রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৪তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এদিন সকালে পল্লী-পরিক্রমা, দুপুরে পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণ এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক নর-নারীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অজিত দত্ত ও অসীম দত্ত। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ কর্তৃক 'রানী রাসমণি' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ২৩ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ময়লাপুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে পূজা, ভক্তিগীতি পরিবেশন, প্রসাদ-বিতরণ এবং অপরাহ্ণে স্বামী কমলেশানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভান্তে লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া-কুলটুকারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): গত ২৬ মার্চ এই আশ্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এ-উপলক্ষে প্রভাতফেরি, কথামৃত পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ দিন সকাল ১০টায় শ্রীশ্রীমা সারদা চিকিৎসালয় ও নিবেদিতা বিদ্যাপীঠ নামে নার্সারী স্কুলের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী আদিত্যানন্দ। বিকালে ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সর্বলোকানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী অকল্মষানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংঘ (রামপাড়া, হুগলী): গত ১ এপ্রিল এই সঙ্ঘের উদ্যোগে হোসেনপুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভৈরবানন্দ এবং বক্তা ছিলেন ডঃ তাপস বসু ও অরিন্দম দাস। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ, দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ পুণ্য আবির্ভাব উৎসব পালিত হয় আশ্রম প্রাঙ্গণে। প্রথম তিন দিন সন্ধ্যায় শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন এবং বাণী নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধাপ্রাণা, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য; স্বামী বিনয়ানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, ডঃ হোসেনুর রহমান, ডঃ তাপস বসু প্রমুখ। অন্তিম দিনে ভাগবত পাঠ ও গানে অংশ নেন ডঃ বাসন্তী চৌধুরী।

বিজ্ঞান সংবাদ

ন্যাটা হওয়ার সমস্যা

সাধারণ জীবন যাপনে, ন্যাটা (ল্যেটা বা left-handed)-দের বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়—তা সে দরজার হাতল ঘোরানোর ব্যাপারেই হোক, মোটর গাড়ি চালানোর ব্যাপারেই হোক বা স্ক্রুতে প্যাঁচ লাগানোর ব্যাপারেই হোক। কারণ পৃথিবীতে সবকিছু তৈরি হয় সংখ্যাধিক্য ডান-হাত ব্যবহারীদের জন্য। ন্যাটা কেন হয় তার কারণ জানা নেই। তবে ন্যাটাদের দুই-তৃতীয়াংশই পুরুষ। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে যে, মা বাবা দুজনে ন্যাটা হলে প্রায় অর্ধেক শিশু ন্যাটা হয়। কথিত আছে যে, কের (Kerr) নামে স্কটিশ-আইরিশ পরিবারে এত ন্যাটার জন্ম হয়েছিল যে, ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দে সেই পরিবারের নবনির্মিত অট্টালিকার ঘোরানো সিঁড়ি উল্টোদিকে ঘুরিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তবে কেবল জন্মসূত্র (heredity) ধরলেই ন্যাটা হওয়ার সব কারণ মেলে না ; কারণ ন্যাটাদের ৮৪ শতাংশের বাবা মা কেউ ন্যাটা নন। সমপ্রজনন সূত্রধারী (Genetically identical) যমজদের ১২ শতাংশের মধ্যে এক জোড়া ন্যাটা হয়, অন্যরা নয়। অনেকের মতে, কেন কেউ কেউ ন্যাটা হয় সেটা সমস্যা নয়, বরং সমস্যা হচ্ছে, কেন অত কম লোক ন্যাটা হয়। শিম্পাঞ্জি হতে ইঁদুর জাতীয় চিনচিলাস পর্যন্ত প্রায় সব প্রাণীর অর্ধেক ন্যাটা। এর কারণ খুঁজতে বৈজ্ঞানিকগণ, ন্যাটা ও অ-ন্যাটা (অর্থাৎ ডান হাত ব্যবহারকারী)-দের মধ্যে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী নিয়ে গবেষণা করছেন।

মানুষের মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) মধ্যে যে স্নায়ুপথগুলি আছে, তাদের অধিকাংশ মাঝ পথে বিপরীত দিকে চলে যায় (cross), যার ফলে মস্তিষ্কের বাম দিক শরীরের ডান দিককে চালিত করে এবং ডান দিক বাম দিককে। ৯৫ শতাংশ অ-বাম বা সাধারণ লোকের কথা ও ভাষার কেন্দ্র মস্তিষ্কের বাম অংশে, কিন্তু ১৫ শতাংশ ন্যাটাদের ঐ কেন্দ্র হচ্ছে ডান মস্তিষ্কে। শিকাগো ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ববিশেষজ্ঞ জেরি লেভির মতে ৭০ শতাংশ ন্যাটাদের কথা-ভাষা পরিচালিত করে বাম মস্তিষ্ক, ১৫ শতাংশ করে উভয় ধারের মস্তিষ্ক।

দেখা গেছে ন্যাটাদের মানসিক রোগ বেশি হবার কারণ ডান ও বাম ধারের মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর বিভিন্নতা। ডান দিকের মস্তিষ্ক আবেগ ও মেজাজ এবং বাম মস্তিষ্ক পাওয়া-খবরের যুক্তি নিয়ে বাছবিচার করে। ন্যাটারা অনেকে ওষুধে বেশি সেনসিটিভ এবং এদের ডায়াবেটিস, বাত ইত্যাদি বেশি হয়। ন্যাটাদের আবার ভাল দিকও আছে। আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ক্যামিলা বেনবো দেখিয়েছেন যে, অঙ্কে যারা খুব ভাল তাদের কুড়ি শতাংশ ন্যাটা ; এটা জনসাধারণের মধ্যে, ন্যাটাদের অনুপাতের দ্বিগুণ। আই, কিউ. (IQ) পরীক্ষা করেও এরূপ তথ্য পাওয়া যায়। হয়তো বা বাম মস্তিষ্ক বেশি যৌক্তিক এবং ডান মস্তিষ্ক শিল্প ও স্বজ্ঞামূলক (Intuitive)—এর জন্যই এরূপ হয়। যুদ্ধেও নাকি ন্যাটাদের বেশি কৃতিত্ব—আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার, যোয়ান অফ আর্ক, নেপোলিয়ন (ও তাঁর স্ত্রী জোসেফিন), এঁরা সবাই ন্যাটা ছিলেন। ক্রিকেট খেলাতেও গ্যারি সোবার্স, এ্যালান ডেভিডসন, এ্যালান বর্ডার—এরা ন্যাটা। টেনিস ও বাস্কেটেও এদের প্রাধান্য।

তবে লোককে হয় ন্যাটা, নয় অ-ন্যাটা (Either/or)—এভাবে ভাগ করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটি হচ্ছে, এ যেন একটি বর্ণালীর (spectrum) বিস্তার ; অর্থাৎ কেউ বাম হাতে ভাল, কেউ ডান হাতে ভাল, আবার কেউ কেউ উভয় হাতেই ভাল হতে পারে।

[Reader's, Digest Nove. '89, pp. 74-78]

কলকাতার তিনশততম বর্ষে
পদার্পণ উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা

উদ্বোধন

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”

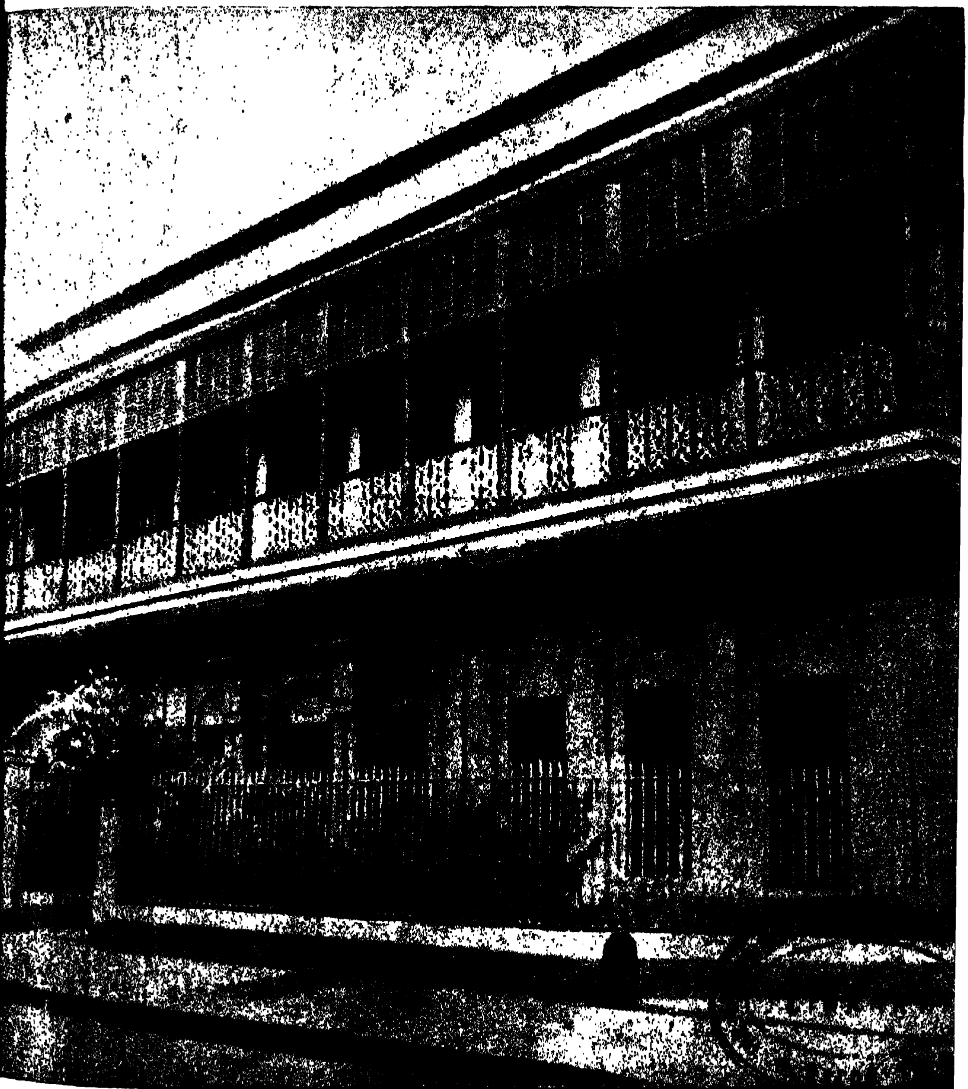

2 8 AUG 1989

[illegible]

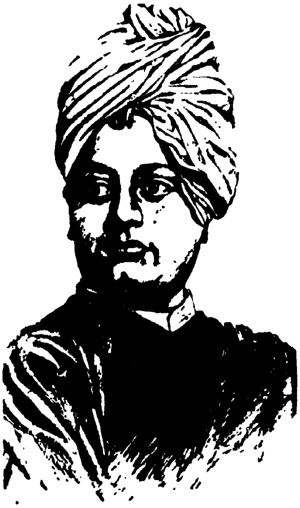

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা·
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনায় উপমা কলকাতা

আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে, মানুষের ভিতর তিনি বেশি প্রকাশ। মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত থাকে ; তাহাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর মাছ, কাঁকড়া জমে থাকে। মাছ, কাঁকড়া খুঁজতে গেলে ওই ঘুটীর ভিতর খুঁজতে হয় ; ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়।...

আগে কলকাতায় যাও তবে তো জানবে, কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এশিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক!

২২ ডিসেম্বর ১৮৮৩

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তার সঙ্গে আলাপ করতে চায় ; প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশি হয় তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে তাহলে গড়ের মাঠ, সোসাইটি —সবই দেখতে পায়।

কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন করে আসি!

২৫ জুন ১৮৮৪

আমি একবার (কলকাতায়) মিউজিয়ামে গিছলুম ; তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গিয়েছে। দেখলে সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তা-ই হয়ে যায়।

৯ মার্চ ১৮৮৪

শ্রীরামকৃষ্ণ

কথাপ্রসঙ্গে

কলকাতার তিনশো বছরে পদার্পণ প্রসঙ্গে

২৪ আগস্ট ১৬৯০। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় কুঠিসমূহের শাসনকর্তা জব চার্নক বহু পরিশ্রম ও প্রয়াসের পর ঐ দিন সুতানুটিতে ইংরেজদের প্রথম কুঠি স্থাপন করেন। কলকাতায় ইংরেজ ইতিহাসকারগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণে বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণও ঐ দিনটিকে কলকাতার জন্মদিন বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তদনুসারে ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট কলকাতা তিনশো বছরে পদার্পণ করিল। কলকাতা শুধু বঙ্গদেশ বা ভারতের নহে, বিগত প্রায় তিনশো বছর ধরিয়াই বহির্ভারতের প্রেক্ষাপটেও অতি বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শুধু ইংরেজ-সাম্রাজ্যের এককালের রাজধানীই নহে, কলকাতা ছিল একসময় সমগ্র প্রাচ্যদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র এবং ভারতের নবজাগরণের মুখ্য পীঠস্থান। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাচীনতা, ঐতিহ্য ও কৌলীন্যের বিচারে ভারতবর্ষের অনেক নগরের তুলনায় বিশ্ববিখ্যাত কলকাতা নেহাতই অর্বাচীন। কারণ ইহার গোড়াপত্তন হইয়াছে মাত্র তিনশো বছর পূর্বে। সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি সন্নিহিত গ্রাম লইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে একটি সমৃদ্ধ জনপদ গড়িয়া উঠিতে শুরু করে। স্বল্পকালের মধ্যে সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নাম দুটি চলিয়া যায় বিস্মৃতির অন্তরালে, রহিয়া যায় শুধু কলকাতা। এবং ঐ নামটি বহন করিয়া সম্মিলিত জনপদটি কালে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নগর তথা রাজধানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। দেখা যাইতেছে, সুতানুটিতে জব চার্নকের কুঠি স্থাপনের সময় হইতেই ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম বিশিষ্ট, ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ নগরের বনিয়াদ স্থাপন যেমন হইয়াছিল, তেমনই সেই দিন হইতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উষালগ্নটিও সূচিত হইয়াছিল। কথাটি কতখানি যথার্থ তাহা ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন।

বর্তমানে পণ্ডিতদের মধ্যে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে এবং সঙ্গতভাবেই উঠিতেছে যে, জব চার্নকই কি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা—যেমনটি কলকাতার ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন? কলকাতার আধুনিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে জব চার্নকের ভূমিকা অনস্বীকার্য, কিন্তু জব চার্নককি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা এবং সুতানুটিতে তাঁহার কুঠি স্থাপনের তারিখকে কলকাতার জন্মলগ্ন হিসাবে চিহ্নিত করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তাহা অবশ্যই গবেষণার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে জব চার্নকের মৃত্যু হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতাকে আত্মসাৎ করিয়া এককভাবে কলকাতার আত্মপ্রকাশ চার্নক দেখিয়া যান নাই। তাহা আরও পরের ঘটনা। যে-সমস্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক জব চার্নককে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, জব চার্নকের কুঠিস্থাপনের পূর্ব হইতেই কলকাতা (বা কলিকাতা) নামে একটি গ্রাম ছিল। তবে তাঁহাদের বর্ণনায় তাহা ছিল অস্বাস্থ্যকর, নিতান্ত অনগ্রসর, পাণ্ডব-বর্জিত নিকৃষ্ট একটি পল্লীমাত্র। সুতানুটি, গোবিন্দপুরও তাহার অতিরিক্ত কিছু ছিল না এবং চার্নক-উত্তর কাল হইতেই শুরু হইল আলোকবিস্তারের অধ্যায়। ইংরেজ ইতিহাসবিদগণের রচনায় ইহা লইয়া বহু মসী ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু চার্নক-পূর্ব রাজনৈতিক নথিপত্র এবং দেশীয় সাহিত্য হইতে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দাবি মোটেই সমর্থিত হয় না। উপরন্তু সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, চার্নকের বহু পূর্ব হইতেই কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল নিতান্ত অখ্যাত ছিল না এবং কলকাতা স্বনামেই সুপরিচিত ছিল। সম্রাট আকবরের (শাসনকালঃ ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দ-১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ) সচিব এবং মোগলযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২) প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ হইতে

জানা যায় যে, অন্ততঃ ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার নাম তৌজিভুক্ত ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে কলকাতা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) 'সরকার'-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত। আকবরের রাজস্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মন্ত্রী টোডরমল (মৃত্যুঃ ১৫৮৯) ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যকে আঠারোটি 'সুবায়' বিভক্ত করেন। বঙ্গদেশ ছিল আঠারো সুবার অন্যতম। বঙ্গদেশকে আবার আঠারোটি 'সরকার' এবং ছয়শো বিরাশিটি 'মহল'-এ বিভক্ত করা হয়। ঐ সরকারগুলির অন্যতম ছিল সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম এবং সাতগাঁও-এর অধীনস্থ তিপান্নটি মহলের অন্যতম ছিল কলকাতা। আবুল ফজল এবং টোডরমল উভয়ের নথিতেই কলকাতা 'কলকত্তা' বলিয়া উল্লেখিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কাশ্মীর হইতে বিহার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মানুষ আজও কলকাতাকে 'কলকত্তা'ই বলে।

এবার আসি দেশীয় সাহিত্যের উপাদান প্রসঙ্গে। পঞ্চদশ শতকের বাঙালী কবি বিপ্রদাস পিপিলাই (বা পিপলাই) তাঁহার 'মনসা-বিজয়'-এ কলকাতার উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁথিটির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেনঃ

ডাহিনে কোতরঙ বাহে কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষুড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পুজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥
কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পূজিয়া।
চূড়াঘাট বাইয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (জন্মঃ আনুমানিক ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দ) 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বিপ্রদাসের বর্ণনারই যেন প্রতিধ্বনি শুনিঃ

ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালুঘাট এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥

'চণ্ডীমঙ্গল'-এর রচনাকাল কাহারও মতে ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ, আবার কাহারও মতে ১৫৯৪ হইতে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। সুতরাং জব চার্নকের কুঠি স্থাপনের অন্ততঃ দুশো বছর পূর্বে কলকাতার স্বনামে এইরূপ পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট হইতে কলকাতার জন্ম হিসাব করিলে তাহা অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট হয়। তাহা ছাড়া, কোন নির্দিষ্ট তারিখকে এরূপ একটি শহরের জন্মদিন হিসাবে চিহ্নিত করা আদৌ যায় কি?

অতঃপর কলকাতার নামকরণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের (মৃত্যুঃ ১৬১২ খ্রীঃ) সমসাময়িক কবিরামের 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' গ্রন্থে যে 'কিলকিলা' নামক জনপদের উল্লেখ আছে, কেহ কেহ মনে করেন কলিকাতা বা কলকাতা তাহারই অপভ্রংশ। কাহারও কাহারও মতে, প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে 'কোলে' উপাধিযুক্ত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। সাধারণতঃ তাহাদের লোকে 'কোলে কৈবর্ত' বলিত। তাহাদের বাসভূমি ('খাতা') বলিয়া অঞ্চলটি প্রথমে 'কোলেখাতা' এবং তাহা হইতে কালক্রমে কলকাতা বা কলিকাতায় পর্যবসিত হইয়াছে। অন্যমতে, কালীর স্থান হইতে কলকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কলকাতায় প্রাচীনকাল হইতেই কালীঘাটের কালী পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং কালীবাড়ি বা কালীমন্দির সুদূর অতীতেও এখানে ছিল। গ্রামাঞ্চলে বাড়িকে এখনো 'কোঠা' বলা হয়। 'কালীর কোঠা' বা 'কালীকোঠা' হইতে 'কালীকোটা' এবং ক্রমে অপভ্রংশে কলিকাতা বা কলকাতা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, টমাস কিচেন তাঁহার মানচিত্রে (১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ) কলকাতার নাম 'কালীকোটা' লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া কলকাতার নাম 'কালীকোটা' বলিয়া কোন কোন

ভ্রমণকারীর বিবরণেও লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এখানে বল্লালসেনের সময়েও (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত এবং ইহা তখন 'কালীক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল। 'কালীক্ষেত্র' হইতে 'কলিকাতা' নামটি আসিয়াছে বলিয়াও কাহারও কাহারও ধারণা। 'কালী কলকত্তাওয়ালী' কথাটি আমরা সকলেই শুনিতে অভ্যস্ত। তবে কখন হইতে ইহার প্রচলন হইয়াছে তাহা জানা যায় না। বিপ্রদাস-মুকুন্দরামের উপাদানের ভিত্তিতে অনায়াসেই বলা যায় যে, পাঁচশো বছর পূর্বেও কালীঘাটের কালী সুপরিচিতা ছিলেন। সুতরাং কালীর স্থান 'কালীকোটা' হইতে কলিকাতা বা কলকাতা নামটির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব না হইতেও পারে, কলকাতার দেশীয় ইতিহাসকারগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন। এবং এই মতটি যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্যও বটে। আবার 'কালীঘাট' হইতে 'কালীঘাটা' এবং তাহা হইতে অপভ্রংশে 'কলিকাতা' হইয়াছে এরূপও কেহ কেহ বলেন। কিন্তু এই রূপান্তরটি যে কষ্টকল্পনা তাহা সহজেই বোঝা যায়।

ইংরেজীতে কলকাতা বা কলিকাতার জগৎ-প্রসিদ্ধ নাম Calcutta—ক্যালকাটা। ইংল্যান্ড ভিন্ন ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষের উচ্চারণে ক্যালকাটা হইয়াছে ক্যালকুত্তা বা কালকুত্তা। কলিকাতা বা কলকাতা ইংরেজদের উচ্চারণে ক্যালকাটা হওয়া বিচিত্র নহে এবং তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব তাহা জব চার্নকের সময় হইতেই হইয়া থাকিবে। কুঠি-স্থাপনের সূচনাকাল হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ জানাইয়াছেন যে, তিনি কোম্পানীর নথিপত্রে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে 'ক্যালকাটা'র উল্লেখ পান নাই। ইহা ঠিক হইতে পারে না। কারণ, কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম দুর্গনির্মাণ (পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম) শেষ হয় ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতাকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী বলিয়া ঘোষণা করে। ইতিমধ্যেই কলকাতায় জেটি, ব্যারাক, হাসপাতাল ও গীর্জা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ১৭০৭-এর পূর্বেই যে 'ক্যালকাটা' নাম প্রচলিত হইয়াছিল সিবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলকাতার 'ক্যালকাটা' নামকরণ লইয়াও নানা মত ও কাহিনী রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, সেগুলির অধিকাংশই উদ্ভট। দুই-একটির উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। অনেকে অনুমান করেন, 'মারাঠা খাল' কাটানোর পর 'খাল কাটা' শব্দ হইতে 'ক্যালকাটা' নামটি আসিয়াছে। অনুমানটির কোন যৌক্তিকতা নাই। কারণ মারাঠা খাল কাটানো হয় ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্গী (মারাঠা) আক্রমণের সময়। ইংরেজরা নগররক্ষার জন্য পুরানো সার্কুলার রোড বরাবর এই পরিখা খনন করিয়াছিল। কিন্তু কলকাতার 'ক্যালকাটা' নামান্তর ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই যে হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখিত। কাহারও মতে, 'Gal Gata' বা 'গল গাটা' শব্দদুটি হইতে 'Calcutta' নামের উৎপত্তি। যীশুখ্রীস্টের বধ্যভূমির নাম গলগাথা (Galgatha)। সেকালে কলকাতায় প্রতি বছর বহু লোক নানা ব্যাধিতে মারা যাইত। তাই ইহাকে স্থানীয় মানুষেরা শ্মশানভূমি বলিয়া মনে করিত। ইংরেজরা সেকারণে প্রথম দিকে এই অঞ্চলকে 'গলগাথা' (Galgatha) বলিত। Galgatha হইতে 'Gal Gata' এবং অবশেষে তাহা 'Calcutta'-য় দাঁড়ায়। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের Gentleman's Magazine-এ একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহাতে কলকাতা 'Gal Gata' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেঃ "১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ অক্টোবর গঙ্গার মুখে ভয়ানক ঝড় উঠিয়া উত্তর মুখে বহুদূর পর্যন্ত আসিয়াছিল। তাহার সহিত অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিকম্প হওয়ায় গঙ্গার উভয় পার্শ্বের অপর্যাপ্ত ক্ষতি করিয়াছে। 'Gal Gata'-য় দুশো অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, ইংলিশ চার্চের [প্রাচীন সেন্ট জনস চার্চের] মহোচ্চ চূড়া না ভাঙিয়া এককালে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ... Gal Gata-র পূর্বে একটি লবণ হ্রদ (বাদা)

আছে ; তাহা পূর্বে অত্যন্ত গভীর ছিল—ঐ ভূমিকম্পে হঠাৎ উচ্চ হইয়া উঠিল। শহর ও পল্লীগ্রামের নানা স্থানে মাটি ফাটিয়া নর্দমার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য পশু ও প্রায় তিনলক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার পর পুষ্করিণী ও নর্দমায় মৃতদেহ ও উদ্ভিদসকল পচিয়া দেশে মহামারী উপস্থিত করিয়াছে।" [দ্রঃ কলিকাতার ইতিবৃত্ত, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ১৯৮৯, পৃঃ ৫-৬ ; ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় প্রকাশিত কলকাতার প্রাচীনতম দেশীয় ইতিবৃত্তকার শরচ্চন্দ্র দেবের 'কলিকাতার ইতিহাস' রচনাতেও এই বিবরণটির উল্লেখ আছে। দ্রঃ কলকাতার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৬৩-১৬৪]। কলকাতার দেশীয় ইতিবৃত্তকারদের অন্যতম প্রাচীন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এসম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া ঠিকই লিখিয়াছেন যে, "১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দের Gentleman's Magazine মধ্যে Gal Gata দেখিয়া যাঁহারা এই স্থানের ঐ নাম ইংরেজেরা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং উহা হইতে ক্রমে ক্যালকাট্টা হইয়াছে অনুমান করেন, তাঁহাদের ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। ... [বস্তুতঃ] বৈদেশিক নূতন স্থানের নাম না জানায় এবং পত্রলেখক সাবধান হইয়া স্থানের নাম না লেখায় [বিলাতের] পত্রিকা-প্রকাশকেরা ভ্রমক্রমে C দুইটিকে G করিয়াছেন মাত্র। কর্নেল ইউল বলেন, পূর্বের সমস্ত চিঠিপত্রাদিতে সুতানুটি ও গোবিন্দপুরেরই নাম প্রদত্ত হইয়াছে, Documentary Memoirs of Job Charnock পুস্তকে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বরের পত্রে 'কলিকাতার' উল্লেখ দেখা যায়" (তদেব, পৃঃ ২৭-২৮, ৭)। আমাদের মনে হয়, কলিকাতা বা কলকাতা বা কলকত্তা ইংরেজদের উচ্চারণেই 'Calcutta' বা 'ক্যালকাটা' বা 'ক্যালকাট্টা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে, যেমন দিল্লী হইয়াছে 'Delhi'-তে, লক্ষ্ণৌ 'Lucknow'-তে, বারাণসী 'Benares'-এ, ঢাকা 'Dacca'-য় অথবা শ্রীহট্ট 'Sylhet'-এ।

গবেষণার দ্বারা কলকাতার প্রাচীন সমৃদ্ধির ইতিহাস কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হইলেও জব চার্নকের সময় কলকাতা ও তাহার সন্নিহিত সুতানুটি ও গোবিন্দপুর যে তিনটি সমৃদ্ধ গ্রামমাত্র ছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা সম্মিলিত হইয়া কিভাবে পৃথিবীর এক বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক নগরে পরিণত হইল তাহা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়াইয়া ভাবিতে অবাক লাগে নিশ্চয়ই। একথা অনস্বীকার্য যে, কলকাতার পরিবর্তিত রূপ, তাহার মর্যাদা, তাহার গুরুত্বের মূলে রহিয়াছে ইংরেজদের অবদান। এই কলকাতা শহর তাঁহাদেরই হাতে গড়া এবং ইহার প্রতি তাঁহাদের এক গভীর মমত্ববোধও ছিল। কলকাতার ইতিহাস রচনার ব্যাপারেও তাঁহারাই প্রাগ্রসর ছিলেন এবং দেশীয় ইতিহাসকারগণের পশ্চাতে তাঁহাদেরই অনুপ্রেরণা কাজ করিয়াছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা বলিবঃ কলকাতা-প্রেমিক ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং তাঁহাদের দেশীয় অনুগামীদের কলকাতা-চর্চার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন ও ভাবিতে ভালবাসিতেন এবং লিখিতেনও যে, জব চার্নকের সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের দিনটি হইতেই কলকাতার ইতিহাসের তথা কলকাতার গোড়াপত্তনের সূচনা। এই দিনটির অর্থাৎ ২৪ আগস্ট ১৬৯০ কলকাতার ইতিহাসে গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু সেইসংগে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইতিহাসে আকস্মিকতার কোন স্থান নাই। চার্নকের আসার অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্বেও কলকাতা ছিল। কলকাতার ত্রিশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন-লগ্নে সকলকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি সমস্যাদীর্ণ কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সদাগতিমান এই মহানগরীর কথা, যাহার উদার দাক্ষিণ্যে শুধু ভারতবর্ষই নহে, সমগ্র পৃথিবী নানা ভাবে, নানা অর্থে প্রভূত ঐশ্বর্যবান হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা

নিশীথরঞ্জন রায়

গদাধরের (১৮৩৬—১৮৮৬) বাল্য এবং কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছিল পল্লীর শান্ত পরিবেশে। বাইরের জগতের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্কিত পরিবেশ। সেই অঞ্চলে বহিরাগত বলতে বোঝাত তীর্থযাত্রীর দল, সাধু-সন্ন্যাসী, বৈরাগী-বাবাজী, ফকির-দরবেশ, ভ্রাম্যমাণ যাত্রা আর কথকতার গায়ক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের স্ত্রী-বিয়োগের (১৮৪৯) পর একদিকে মানসিক সন্তাপ, অপরদিকে সংসার চালনার জন্য অধিক অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন—এই দুটি কথা ভেবে রামকুমার চতুষ্পাঠী স্থাপনের উদ্দেশ্যে কামারপুকুর ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায় (১৮৫০)। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর সেই সময় গ্রামেই থেকে গেলেন। কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যখন অগ্রজকে জানালেন যে, পড়াশুনার দিকে গদাধরের তেমন ঝোঁক নেই তখন রামকুমার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ঝামাপুকুরে (১৮৫৩)। একটানা প্রায় সতের বছর গ্রামীণ আবহাওয়ায় কাটিয়ে গদাধর পদার্পণ করলেন কলকাতায়।

কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে—অজ পাড়াগাঁ থেকে রাজধানী শহরে। গদাধর চতুষ্পাঠী আর ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করবেন, আর সেই সঙ্গে টোলে পাঠাভ্যাসও করবেন—এই ছিল কনিষ্ঠের কাছে রামকুমারের প্রত্যাশা। কিন্তু তা পূরণের কোন লক্ষণ নেই। আতপতণ্ডুল, কাঁচকলা আর ফলমূলের ছাঁদা বাঁধার উপযোগী বিদ্যার প্রতি গদাধরের অনীহা যথাপূর্বম্। সুতরাং পরিবেশ নতুন হলেও, ঝামাপুকুর তাঁর জীবনে রচনা করতে পারেনি কোন নতুন অধ্যায়। নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হলো আরো পরে।

গদাধরের ঝামাপুকুর বাস শুরু হবার তিন বছর পর (১৮৫৫) জানবাজারের স্বনামধন্যা রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করলেন গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে জগৎ-বিখ্যাত কালীমন্দির। রামকুমারের উপর ন্যস্ত হলো নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যথাবিহিত পূজার্চনার দায়িত্ব। রামকুমার এই দায়িত্বভার গ্রহণ করায় গদাধর ঝামাপুকুর ছেড়ে মন্দির প্রাঙ্গণেই বসবাস শুরু করলেন। এখানেই তাঁর দিব্যজীবনের প্রকাশ। এক বছর পরে রামকুমার লোকান্তরিত হলে একুশ বছর বয়সে গদাধর গ্রহণ করলেন ভবতারিণীর পূজার দায়িত্ব (১৮৫৭)। এখানেই ঘটে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে গদাধরের সাধক-জীবনের উত্তরণ। ক্রমে তাঁর ঈশ্বরভক্তি আর জীবপ্রেমের খ্যাতি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের আর একটি আকর্ষণের বিষয়বস্তু হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাবাসী বহু গণ্যমান্যব্যক্তি।

রামকুমারের দেহত্যাগের বছরে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সূচনা। বিদ্রোহ দমনের শেষে ইংরেজ-প্রভুত্ব আরও জাঁকাল হয়ে দেখা দিল। ততদিন প্রায় গোটা দেশ জুড়ে ইংল্যাণ্ডের সার্বভৌম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা—লণ্ডনের পরেই যার স্থান। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের নরনারী; তাছাড়া ছিল বিদেশাগত বহু নরনারী।

সেদিনকার কলকাতার বাঙালীসমাজের কৃষ্টি নতুন স্রোতে বইতে শুরু করেছে। উনিশ

শতকের তিন দশক থেকে ইংরেজী চালচলনের অন্ধ অনুকরণের যে প্রবল ঢেউ বাঙালী-মানসিকতার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল তা ততদিনে থিতিয়ে এসেছে। বাঙালী আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন, নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কেও শ্রদ্ধাশীল। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যপন্থীদের মধ্যে যে সংঘাত একদিন কলকাতার বিদ্বজ্জনসমাজকে পরস্পর-বিরোধী দুটি শিবিরে বিভক্ত করেছিল তাদের মধ্যেও ফিরে এসেছিল সমঝোতা। সমাজজীবন থেকে অনাচার অসাম্য দূর করার যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন, সেই আন্দোলন তখনো গতিসম্পন্ন ছিল। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ এবং পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সমাজসংস্কার-কামী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও ছিল গতিশীল ; যদিও রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন নরমপন্থী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে নরমপন্থীদের নেতৃত্বের দুর্গে ফাটল ধরতে দেখা যায়।

একদিকে বহু সাধনপদ্ধতির অনুশীলন, অপরদিকে নিজের অন্তর্নিহিত অপার্থিব ঐশ্বর্য অবলম্বন করে ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে গদাধরের যখন রূপান্তর ঘটছে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে, তখন কলকাতার বৌদ্ধিক-জীবনের চেহারাটি একটি স্থিরচিত্রে পর্যবসিত হয়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রাবল্য। কিছুটা আশাভঙ্গ, আবার সেইসঙ্গে নতুন আশার আলো। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে অগ্রগতি। প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীলতার চিরকালীন দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসার, ইংরেজ সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসাম্য। পুঁজিবাদীদের প্রাধান্য। শিক্ষিত এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনসমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান, সামাজিকজীবনে সংস্কার-আন্দোলনের সীমিত সাফল্য। সর্বোপরি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে একদিকে অশিক্ষা, অপরদিকে দারিদ্র্যের ভয়াবহ প্রসার—সব মিলিয়ে উনিশ শতকের তিন দশক থেকে শুরু করে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—এই সময়-সীমাটিতে কলকাতার জীবনে নানা বিষয়ে আদর্শগত বিরোধ এবং নতুন ও পুরাতনের মধ্যে চিরকালীন সংঘাত কলকাতার সমাজজীবনে সৃষ্টি করেছিল একদিকে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, অন্যদিকে সেই অস্থিরতা থেকে পরিত্রাণের উপায়-সন্ধান।

সামাজিক এবং ধর্মীয়জীবনের দ্বন্দ্ব আর অস্থিরতার চিত্রটিই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ইংরেজ-সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'—এই কথাটি নির্বিবাদে মেনে নেওয়া হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেযুগে কিছু কিছু দাবি-দাওয়া অবশ্যই ছিল। কিন্তু এইসব দাবি-দাওয়ার মধ্যে উগ্রতা ছিল না। তখনো বিশ্বাস ছিল গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত ইংল্যান্ডের সরকার ভারতীয়দের কিছু কিছু অধিকার মেনে নিতে অসম্মত হবে না। এই অবস্থায় ভারতীয় জনগণের দৃষ্টির বেশির ভাগ দখল করে নিয়েছিল ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজবিষয়ক সমস্যা এবং তাদের সমাধানের প্রশ্ন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে খ্রীস্টধর্মের প্রচার জোরদার করতে গিয়ে মিশনারী সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। রামমোহন স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রবর্তনের প্রয়াসী না হলেও পরবর্তী কালের ব্রাহ্মনেতারা তাঁদের ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলে হিন্দুধর্মের ঐক্য কিছু পরিমাণে হলেও ব্যাহত করেছিলেন। ইসলামধর্মের অনুগামীরাও ক্রমশঃ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। আবার হিন্দুধর্মের প্রবক্তারাও জনসমক্ষে যেসব ব্যাখ্যা তুলে ধরছিলেন তার মধ্যেও ছিল নানা অসঙ্গতি এবং পরমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা। বাংলার পল্লীবাসীরা এতে বিচলিত হননি, তাঁরা নিজ নিজ বিশ্বাস এবং সংস্কার অনুযায়ী যে ধরনের জীবনযাপন করছিলেন তা নিস্তরঙ্গই ছিল, অশান্ত হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু রাজধানী শহর কলকাতার কথা স্বতন্ত্র। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে এখানে অজস্র প্রশ্ন, বহু বাদবিতণ্ডা, তর্কযুদ্ধ, পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা। সব মিলিয়ে এখানে দেখা দিয়েছিল দ্বন্দ্ববিদীর্ণ এক অস্বস্তিকর পরিবেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর-বাসের প্রথম কটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল কঠোর অধ্যাত্মসাধনায়। তখন তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল মন্দিরে সমাগত দর্শনার্থী আর রম্‌তা সাধুসন্তদের মধ্যে। বাইরের জগতের সম্পর্ক তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। আত্মানুসন্ধান আর ঈশ্বর-উপলব্ধির দুশ্চর সাধনায় তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে, তাঁর বাহ্যজ্ঞান অনেক সময় লোপ পেয়ে যেত। ক্রমে দর্শনার্থীরা শুধু বিগ্রহ দর্শনেই ক্ষান্ত থাকতেন না, তাদের দৃষ্টি ক্রমে আকৃষ্ট হলো ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদ, আত্মপর অভেদ-দৃষ্টি, সহজ সরল ভাষার উপদেশামৃতবিতরণকারী এই আত্মভোলা, নিরভিমানী সাধকপ্রবরের প্রতি। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকে পরিণতি লাভ করলেন ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী—ভক্তরূপে। ক্রমে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃততর হতে লাগল। কলকাতা থেকে আগত দর্শনকামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনেকে আসতেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন নিয়ে, কেউ আসতেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সদুত্তর লাভের উদ্দেশ্যে, পার্থিব সমস্যার সমাধানের জন্যও কেউ কেউ খোলাখুলিভাবে তুলে ধরতেন তাঁদের ব্যাকুলতা সর্বত্যাগী এই অবতারপুরুষের কাছে। তাঁর দর্শনে মনের দুঃখভার দূর হবে, লাভ করবেন অপার্থিব শান্তি—এমনি বিশ্বাসও তাঁদের পৌঁছে দিত মন্দির অঙ্গনে। রকমারী দর্শনার্থী, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের ভিড় লেগে থাকত তাঁর ঐ ঘরটিতে।

এই সময়কার কলকাতার সমাজজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা পাই না। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী অর্ধশতকের তুলনায় ছয় থেকে আট দশকের মধ্যে শহরের জনসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোম্পানীর আদি যুগে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রথমে স্বাধীন ব্যবসায়ী, পরে কোম্পানীর কোলাবরেটর (Collaborator)। সেই সময়কার কলকাতার সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাজা নবকৃষ্ণের মতো অব্রাহ্মণও সেদিন ছিলেন সমাজপতি অথবা দলপতি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সমাজচিত্র ভিন্নতর হতে থাকে। ততদিনে বড় মাপের ব্যবসাবাণিজ্য গুটিয়ে অনেকেই জমিদারির মালিক হয়ে নিশ্চিন্ততর জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকেছেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা বাড়ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ ও যুবকরা উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল বেশি মাত্রায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই উত্থান কলকাতার সমসাময়িক সমাজজীবনে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মানুষদের ক্রমবর্ধমান ভিড় এখানকার জনসমাজের চেহারা দ্রুতগতিতে পাল্টে দিতে শুরু করেছিল। কলকাতায় গড়ে উঠেছিল এক মিশ্রসমাজ—বহু ভাষাভাষী মানুষের এক মিলনক্ষেত্র। ধর্মাচরণের দিক থেকেও এদের মধ্যে ছিল লক্ষণীয় মাত্রায় বৈচিত্র্য। একই নগরের অধিবাসী—এই পরিচয়টুকুই ছিল তাদের পরস্পরকে এক সূত্রে ধরে রাখার উপাদান, এক কথায় Urban বা শহুরে মানসিকতা। তবু তাদের সমস্যা ছিল। জনবিস্ফোরণের সমস্যা এবং এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত নাগরিক জীবনের উপযোগী স্বাচ্ছন্দ্যভোগের অপ্রতুলতা, প্রগতিবাদী বনাম রক্ষণশীলদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য, নানা ধরনের সামাজিক অনাচার আর সর্বোপরি ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সঞ্চার। হিন্দুধর্মের মধ্যে আচারসর্বস্বতা এবং একাধিক-

ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের বিভিন্নতা সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি করে চলেছিল বিভ্রান্তি এবং অসহিষ্ণুতা। সমাজ-সংস্কারবাদীদের মধ্যেও ছিল মতের বিভিন্নতা। এই অনভিপ্রেত পরিবেশের অবসান ঘটানোর জন্য রামমোহন চেয়েছিলেন পৌত্তলিকতার অবসান। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মনেতারা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের বিধি-বিধানকে কঠোরতর করে তুলতে। এমনি অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের দিব্য-জ্ঞানের অধিকারী সাধকপ্রবর শোনালেন অভয়বাণী। সাধারণ মানুষের মনে তখন বিভ্রান্তির অন্ত নেই। "কস্মৈ দেবায় ?"—এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাচ্ছিলেন না তাঁরা। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করেছিলেন তাঁরাও যেমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক সুধীজনরাও ঘটাতে পারছিলেন না তাদের সংশয়ের অবসান।

কলকাতাবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথায় ফিরে আসি। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত হবার পর ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কিছু কিছু অধিকার দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা সত্ত্বেও তাদের প্রবেশ অধিকার অব্যাহত ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের জাতিবৈরের সহজ শিকার ছিল ভারতীয় প্রজারা। শোষণ আর অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল নিরর্থক। অথচ ইংরেজদের সার্বভৌম আধিপত্য বল্গাহীনভাবে বেড়ে চলেছে। এ সবই ছিল অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র—কোথাও ছিল না স্বাচ্ছন্দ্যবোধের লেশমাত্র সুযোগ।

কলকাতা শহরের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। কিন্তু যতটুকু ইতিহাস আমরা জেনেছি তাতে বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে এখানকার শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত 'হোয়াইট টাউন'। ইংরেজী সূত্রে দিশী পাড়ার বিবরণ প্রায় অনুপস্থিত। ইংরেজ-বাসিন্দাদের পরেই কলকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ছিলেন second class citizens। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে ছিল তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের একটি প্রতিবেদনে এই শ্রেণী-বিভাগের উল্লেখ রয়েছে। এই গণনায় কলকাতার নাগরিকদের তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে স্থান লাভ করেছেন ৭, ২৮, এবং ৪০ জন শহরবাসী। এই তালিকা দেখে মনে হয় যে, বংশগৌরব অপেক্ষা কাঞ্চনগৌরবই ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিয়ন্তা। প্রথম শ্রেণীর সাত জনের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন রাজবল্লভ, নন্দকুমার-পুত্র গুরুদাস—এঁদের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরা প্রায় সকলেই ছিলেন কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্যের তল্পি-বাহক, সাহেব আদমীদের দেওয়ান হিসাবে হোমরাচোমরা। তৃতীয় শ্রেণী বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের জীবন শুরু হয়েছিল হয় কোম্পানীর মাঝামাঝি স্তরের কর্মচারী কিম্বা অর্থশালী ব্যবসায়ী রূপে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনটি তালিকারই—বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে ব্রাহ্মণেতার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা।

অনুমান করা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করতেন কোম্পানীর অনুগৃহীত অথবা স্বাধীন ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ভারতীয় পরিবার যাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ অধিকতর স্বীকৃতি পেতে থাকে। তাঁরা সরকারি চাকুরিসূত্রে অথবা চিকিৎসক, আইনজীবী এবং মাঝারি ধরনের ব্যবসায়ী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শুরু করেন।

রামকৃষ্ণদেবের খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখনও কলকাতার সমাজজীবনে এই ধারাটিই অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই সময় কলকাতা থেকে যাঁরা তাঁর কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের পূর্ণ তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী অধরলাল সেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এবং 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির গৃহশিক্ষক এবং 'রামকৃষ্ণ পুঁথির' লেখক অক্ষয়কুমার সেন, নাট্যাচার্য এবং বহু নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিক্ষকপ্রবর 'রামকৃষ্ণ কথামৃতের' লেখক স্বনামধন্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'মাস্টার' নামে পরিচিত)। অভিজাত জমিদারবংশের সন্তান পরম বৈষ্ণব বলরাম বসু, সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের করণিক মনোমোহন মিত্র, চিকিৎসক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত'-এর লেখক রামচন্দ্র দত্ত। ঠাকুরের 'রসদ্দার' হিসাবে পরিচিত রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস—প্রমুখ বিচিত্র ব্যক্তিত্ব যাঁরা গ্রথিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রতি অহেতুকী ভক্তিতে। শ্রীরামকৃষ্ণকে সমর্পিতপ্রাণ আর যেসব গৃহীশিষ্য দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন 'সাধু নাগমহাশয়' নামে সুপরিচিত দুর্গাচরণ নাগ, গায়ক নীলকণ্ঠ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নবগোপাল ঘোষ, বিপিনবিহারী ঘোষ, প্রমথনাথ কর, শম্ভুচরণ মল্লিক, চুণীলাল বসু, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ভাই ভূপতি, কিশোরীমোহন রায়, অ্যাটর্নী দীননাথ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীলেখক শশিভূষণ ঘোষ, মহিম চক্রবর্তী, জয়গোপাল সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এবং সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। 'রামকৃষ্ণ কথামৃতের' লেখক লিখেছেন—"ঠাকুরের ভক্তরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব।"

কলকাতার সে-যুগের বনেদী পরিবারের অধিকাংশই বসবাস করতেন উত্তর কলকাতায়—পুরনো আমলের সুতানুটি অঞ্চলে। বাগবাজার, বেলগাছিয়া, শ্যামপুকুর, চিৎপুর, কুমারটুলি, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, আহিরীটোলা, শ্যামপুকুর, শোভাবাজার, পোস্তা, সিঁদুরিয়াপটি, বৌবাজার, তালতলা, সিমলা, ঝামাপুকুর, কাঁকুড়গাছি, বাদুড়বাগান,—এসব অঞ্চলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অবারিত গতি। এছাড়া ছিল দক্ষিণ কলিকাতায় কালীঘাট, ভবানীপুরে গৌরী মা-র মাতুলালয় এবং বেলতলায় মধুসূদন ভট্টাচার্যের বাড়ি। তাছাড়া ছিল চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়ামসহ গড়ের মাঠ। ঠাকুর যেমন ভক্তদের টানতেন দুর্বার শক্তিতে, তেমনি ভক্তরাও আকর্ষণ করতেন ঠাকুরকে। এদের অনেকের বাড়িতেই ঠাকুর যেতেন। তাছাড়া সেদিনকার কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে দূরত্ব রচনার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মাইকেল মধুসূদন—এঁরা সকলেই ছিলেন ঠাকুরের দর্শনধন্য।

এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পরমহংসদেবের কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর উপর স্থাপন করেছিলেন অচলা ভক্তি, তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরিণতি লাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর ত্যাগী শিষ্যরূপে। তাঁদের কেউ কেউ জন্মেছিলেন শহর কলকাতায়, কেউ কেউ শহরতলীতে। এঁদের অনেকেরই বাল্য এবং কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবেশে।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে—একদিকে ঠাকুরের অধ্যাত্মসাধনা এবং সেই সাধনার উপলব্ধ ফল বিতরণের প্রচারধর্মিতার অভাব সত্ত্বেও তার ব্যাপকতা এবং গভীরতা, অপর দিকে কলকাতা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু আলোচিত রেনেসাঁস আন্দোলন পরস্পরের

পরিপোষক বলে গণ্য হতে পারে। সামগ্রিক বিচারে রামকৃষ্ণদেবের গুরুত্ব এবং প্রভাব শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা পরিব্যাপ্ত ছিল ভারতবর্ষের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মধ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনে সার্থকতার সন্ধান। আবার আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অতি-সচেতনতা আমাদের একশ্রেণীর কলকাতাবাসীর মনে যে ধারণাটিকে বদ্ধমূল করে তুলেছিল তা অন্ধ গোঁড়ামির নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য এই দুটি—বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার সাধু প্রচেষ্টাও এই যুগের অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহন এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতারা। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যত মহানই হোক না কেন, জনমানসে তা ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁরা যতটুকু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, অধ্যাত্মক্ষেত্রে তা ততটুকু গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। হয়তো বা হিন্দুধর্মের উপাস্য দেবদেবীর মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারেননি। কলকাতায় যখন পরস্পর-বিরোধী এইসব শক্তির মধ্যে সংঘাত চলছিল তখনই আবির্ভাব ঘটল রামকৃষ্ণদেবের। সব কটি প্রধান ধর্মের বিধি-বিধান তিনি নিজে আচরণ করলেন, এই পরম সত্যটিই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, "যত মত, তত পথ।" সব ধর্মমতের লক্ষ্যই ঈশ্বর-উপলব্ধি এবং যে আচরণবিধি মেনেই তাঁর উপাসনা করা হোক না কেন, লক্ষ্য এবং উপাস্য এক এবং অদ্বিতীয়। জনগণের কাছে তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যটিকে তুলে ধরলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে, সহজবোধ্য ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করতেন জটিল ধর্মতত্ত্ব যার সারবত্তা অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জনেরাও মেনে নিতে বাধ্য হতেন। ঈশ্বরোপলব্ধির এই সাধনার ক্ষেত্র ব্যবহারিক জীবন পর্যন্ত প্রসারিত—এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজসেবার আদর্শ—জীব ও শিবের মধ্যে অভিন্নতা, অর্থাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানে জীবের সেবা। তাঁর মতবাদের মধ্যে এই কারণেই কলকাতার তৎকালীন চিন্তানায়করা খুঁজে পেলেন প্রকৃত পথের নির্দেশ। রামকৃষ্ণদেব প্রচারিত সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সেযুগের যাবতীয় প্রশ্ন আর সংশয় সমাধানের নির্ভুল ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া গেল।

উনিশ আর বিশ—এই দুই শতকের ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আলোড়ন এবং আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটির সূচনা কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ঠাকুর ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ অধ্যাত্মাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকাশ যেখানেই হতো, সেখানেই ঘটতো জ্যোতির বিচ্ছুরণ। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এমনি ঘটতে দেখা গেছে বিভিন্ন যুগে। এঁদের প্রত্যেকের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। তবু ইতিহাসের বিচারে মহাবীর, বুদ্ধ, নানক এবং চৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল তা তুলনাহীন। এঁরা প্রত্যেকেই পর্যটনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরের অধিবাসীদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লোকশিক্ষাদাতার ভূমিকায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সাড়ে তিনশো বছর পরে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি প্রচারধর্মী ছিলেন না ; পর্যটনের পথটিকেও তিনি বেছে নেননি। তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল এমনই একটি স্থান যেখানে মিলিত হয়েছিল গোটা দেশের বিভিন্ন মানুষের প্রতিনিধিবর্গ এবং যা ছিল উনিশ-বিশ শতকের যাবতীয় চিন্তা এবং কর্মধারার উৎস। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঠাকুরের বাণী যাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছিল সেই তদানীন্তন কলকাতার শিক্ষিত মানুষ এবং যে স্থানটি ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র—কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর এবং মূল কলকাতা—ফসল উৎপাদনের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত অনুকূল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাতীর্থ কলকাতা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

ষোল-সতের বছরের পিতৃহীন এক অজ পাড়া-গাঁয়ের ছেলে। পড়াশুনা বেশিদূর এগোয়নি। শুভংকরীতে ঘুরে যেত তাঁর মাথা। তবে হাতের লেখা সুন্দর ; বেশ কয়েকটি পুঁথি নকল করেছেন। অসাধারণ স্মৃতি-মেধাসম্পন্ন কিশোরটি যাত্রা-কথকতায় অংশগ্রহণে শাস্ত্র-ব্যাখ্যানে বিশেষ পারঙ্গম। পারদর্শী গন্ধর্ব-বিদ্যায়ও। সহজাত শিল্পবোধ প্রখর-প্রতিমা-শিল্পীদের কাছে তাঁর ডাক পড়ত 'দেবচক্ষু' অঙ্কনে। সমবয়সীদের নিয়ে নৃত্য-ছন্দে আনন্দে দিন কাটত তাঁর। উন্মুক্ত কালো আকাশে সাদা বকের সারি দেখে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ। পুজো-অর্চনায় একাত্ম হয়ে যেতেন পূজ্যের সঙ্গে। সেই কিশোর আবাল্য স্মৃতিজড়িত গ্রাম ত্যাগ করে প্রাণপ্রিয় স্বীয় জননীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জ্যেষ্ঠ অগ্রজের সঙ্গে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

এ প্রায় ১৩৭ বছর আগেকার কথা। এ তাঁর প্রথম কলকাতায় আসা। সময় ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ। কলকাতা তখন ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী। কলকাতা নব্য সভ্যতার পীঠস্থান। বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকাল। প্রায় ১৬২ বছরের ইংরেজ শাসনের দৌলতে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য কলকাতার বুকে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। গ্রাম্য ঐ কিশোরটি কিন্তু হারিয়ে গেলেন না, স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিলেন এই বিপরীত পরিবেশে। দাদার সঙ্গে কিশোরটি বাস করতে লাগলেন আহিরীটোলার নাথের বাগানে। এখানে তাঁর দাদার এক চতুষ্পাঠী ছিল। কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী উঠে এল ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চ্যাটার্জীর বাড়িতে। এই কিশোরটি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আর তাঁর দাদা রামকুমার।

এ-সময় থেকে কলকাতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হলো, তা ছিল তাঁর মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত। খোদ কলকাতায় তিনি থেকেছেন বছর তিনেকের মতো। (ঝামাপুকুরে ১৮৫৩—১৮৫৫, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে (১৮৮৫—১৮৮৬) যদিও সে-সময়ে কাশীপুরকে কলকাতার মধ্যে ধরা হত না) রামকুমারের নির্দেশে ঝামাপুকুরে কয়েকটি বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করতেন। গোবিন্দ চাটুজ্জের গৃহ-দেবতা রাধাকৃষ্ণের পূজকও ছিলেন কিছুকাল। কলকাতার প্রথম বাঙালী শেরিফ রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি ছিল ঝামাপুকুরে। এখানেও তাঁদের বিগ্রহ নারায়ণের পূজাও করতেন তিনি। যে কলকাতায় লোকে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসত, যে কলকাতা রুজি-রোজগারের একমাত্র স্থান ছিল, সেই কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় তাঁর দাদাকে বলেছিলেন, "চাল-কলাবাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না ; আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের উদয় হয়ে মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।" এই মন্ত্রদর্শীটি কিশোর রামকৃষ্ণ এই কলকাতা থেকেই রামকুমারের মাধ্যমে জগৎবাসীকে শুনিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের অনেকটাই অতিবাহিত করেছেন কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বরে। সেখান থেকে তিনি বহুবার এসেছেন কলকাতায়। বিশেষ করে বাগবাজার অঞ্চলে। এটি ছিল তাঁর কলকাতার আড্ডা। বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে (বর্তমানে 'বলরাম মন্দির' নামে পরিচিত) তাঁর শুভাগমন হয়েছিল শতাধিকবার। রাত্রিবাসও করেছেন এখানে। বলরামের 'শুদ্ধ অন্ন' গ্রহণ করতেন তিনি। রথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তসঙ্গে কত লীলাবিলাস হয়েছে বলরাম মন্দিরে। এখানে এসেই তিনি ডেকে পাঠাতেন তাঁর তরুণ-যুবক ভক্তদের।

ঘোড়ার গাড়ি করে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘুরে বেড়িয়েছেন কলকাতার রাস্তায়—কাশীপুর রোড, বাগবাজার, শ্যামবাজার, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, বড়বাজার, মেছুয়াবাজার, নিমতলা স্ট্রীট, সার্কুলার রোড, চিৎপুর রোড প্রভৃতি। সঙ্গে অবশ্যই থাকতেন ভক্তরা। যখন সদলে রাস্তায় হাঁটতেন ছেলে-ছোকরার দল বলত 'পরমহংসের ফৌজ' যাচ্ছে। কলকাতার বহু মন্দিরে, চার্চে, মসজিদে, নানান স্থানে, বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে তিনি গিয়েছেন। তার রস-ঘন বর্ণনা কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল বরাহনগরে তাঁতিপাড়ায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-পার্ষদ ভাগবতাচার্য শ্রীরঘুনাথ উপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পাঠবাড়িতে। (বর্তমানে বরাহনগর কলকাতার মধ্যে বলে ধরা হয়েছে)। এই অঞ্চলে দেশবন্ধু রোডে বর্ধমানের এক ভাগবত পণ্ডিতের কাছে আসতেন ভাগবত পাঠ শুনতে। বরাহনগর বাজারের ঝুলনতলায় সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে, প্রামাণিক ঘাট রোডে ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরে, হরকুমার ঠাকুর স্ট্যাণ্ডে ভক্ত জয় মিত্র প্রতিষ্ঠিত কৃপাময়ী কালীমন্দিরে তিনি এসেছিলেন। কাশীপুরে দশমহাবিদ্যা মন্দির ও 'বড় জাগ্রত' সর্বমঙ্গলার মন্দির দর্শনে তাঁর আগমন হয়েছিল। দশমহাবিদ্যা মন্দিরে ভোগের জন্য মাসিক বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন মথুরবাবুকে বলে। জোড়াসাঁকো হরিসভায় এসেছিলেন কীর্তন শুনতে। কাঁসারীপাড়ায় হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার বার্ষিক উৎসবে শুনেছিলেন মনোহর সাঁই-এর পালাগান। কলুটোলা হরি-সভার চৈতন্যাসনে বসে ভাবস্থ হয়েছিলেন। মহাতীর্থ কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করেছিলেন কয়েকবার। তাঁর দিব্য উপস্থিতিতে ভক্তদের আনন্দ হয়েছিল—ঠনঠনিয়ার মা সিদ্ধেশ্বরী, বাগবাজারে মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী, জগন্নাথ ও অন্নপূর্ণা মন্দিরে। তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন গরানহাটায় ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করতে এবং মানিকতলায় কাঁছিবাগানে নবরসিক সম্প্রদায়ের আখড়ায়। পাথুরিয়াঘাটার ভক্ত যদুলাল মল্লিকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল বিশেষ সম্পর্ক। তাঁর কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবী সিংহবাহিনী দর্শন করে ভাবে বিভোর হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁদের গৃহদেবতা রাধাশ্যামসুন্দরজীউরও মূর্তি দর্শন করেছিলেন তিনি। মল্লিকবংশের এক শরিকের বাড়ি ছিল চাষাধোপা পাড়ায়। সেখানে যখন সিংহবাহিনী ছিলেন, দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অতি মধুর সম্পর্ক। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রিয়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের ('চিরঞ্জীব শর্মা' বলে যিনি কথামৃতে পরিচিত) স্বরচিত সময়োচিত সুললিত গানের মাধুর্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মগ্ন হতেন ভাব-সমাধিতে। কেশব সঙ্গীদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তেমনি সদলে শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিকবার গিয়েছিলেন কেশবের কলুটোলার পৈতৃক বাড়িতে ও রাজাবাজারে 'কমলকুটীরে'। কেশবের অসুখ হলে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছিলেন। বলেছিলেনঃ "কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব?" ব্রাহ্মপাড়া লেনে শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতেও এসেছিলেন তিনি। জোড়াসাঁকোতে ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছিলেন মথুরবাবুকে নিয়ে। ব্রাহ্মসমাজ ভাগ হওয়ার পরও তাঁর যাতায়াত ছিল সর্বত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নরেনকে একবার দেখতে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আদি ব্রাহ্মসমাজে ধ্যানস্থ কেশবকে দেখেছিলেন। মেছুয়াবাজারে নববিধান ব্রাহ্মসমাজেও বহুবার গিয়েছেন তিনি। ব্রাহ্মদের বাৎসরিক উৎসবে ভক্তসঙ্গে যোগদান করতেন তিনি। এভাবে তাঁর পদার্পণ হয়েছিল সিমলার জ্ঞান চৌধুরী ও রাজমোহন বসু, নন্দন বাগানের কাশীশ্বর মিত্র ও শ্রীনাথ মিত্র, বড়বাজারে মাথাঘসা গলির জয়গোপাল সেন, সিঁদুরিয়া পট্টির মণিলাল মল্লিক ও সিঁথির বেণী পালের ব্রাহ্মোৎসবে।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের বৈঠকখানা পাড়ায়

প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের লং সাহেবের গির্জা 'হোলি ট্রিনিটি চার্চ'-এ মথুরবাবুর সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন। তালতলায় বৃটিশ প্রোটেস্টান্টদের মেথডিস্ট চার্চে 'ম্যাস' দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মধ্যকলকাতায় গেঁড়াতলার (কলাবাগান) মসজিদে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিলেন মুসলমান ফকিরের সঙ্গে। এ-দৃশ্যের সাক্ষী তাঁর ভাইপো রামলাল ও ভক্ত মন্মথনাথ ঘোষ। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন রাধাবাজারে বেঙ্গল ফটোগ্রাফ স্টুডিওতে। উদ্দেশ্য ফটো তোলার কলা-কৌশল দেখানো। তারপরে তাঁর দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ অবস্থার ফটো তোলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন ইডেন গার্ডেনস ও ফোর্ট উইলিয়ামে। গড়ের মাঠে গাছে হেলান দেওয়া ইংরেজ-কিশোরকে দেখে তাঁর উদ্দীপন হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের। পার্ক স্ট্রীটে এশিয়াটিক সোসাইটি, যাদুঘরে দেখেছিলেন তার দিয়ে বাঁধানো মানুষের কঙ্কাল, ইঁটের পাথর ও জানোয়ারের ফসিল। গড়ের মাঠে বেলুন ওড়ানো ও উইলসন সার্কাস দেখতে ভোলেননি তিনি। চিড়িয়াখানায় সিংহ দর্শন করে দেবীর বাহনের কথা মনে পড়েছিল তাঁর।

প্রায় তিনবছর কলকাতায় অবস্থান ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক ছিল প্রায় দীর্ঘ সাতাশ বছর (১৮৫৫-৫৮, ১৮৬০-৬৭, ১৮৬৮-৮৬)। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা ও তার বাসিন্দাদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো ব্যক্ত করেছেন সরস মন্তব্য, কখনো কটু, কখনো কঠোর, কখনো বা ব্যঙ্গোক্তি। বলছেন, “তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই!... কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে। বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে! আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। এইরকম। ... কলকাতার লোকদের বলবার জো নাই 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর' ... সেদিন কলকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম, জীব সব নিম্নদৃষ্টি —সব্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে! সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে।” পরেই প্রশংসা করে বলছেন, “তবে দুই-একটি দেখলাম, ঊর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।” কঠোর মন্তব্য করে বলছেন, “তোমাদের ওই এক। কলকাতার লোকগুলো বলে, 'ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ'। কেননা, তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর-একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।” “হাঁ কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে 'ঈশ্বর নাই'? বাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, এক পা ফেলে আর-এক পা ফেলতেই 'উঃ পাশে কি হল' বলে অজ্ঞান। ডাক ডাক ডাক্তার ডাক!—ডাক্তার আসতে আসতে হয়ে গেছে। অ্যাঁ। এরা বলেন ঈশ্বর নাই!” কলকাতার মালাজাপকদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য মোটেই সুখকর নয়।—“তুমি কলকাতায় যাও না—দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে—খানকী পর্যন্ত।” কলকাতার ছোকরারাও রেহাই পায়নি তাঁর কাছ হতে। তাঁর তির্যক সরস মন্তব্য খুবই উপভোগ্য—“দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামা পরা। চলবার যে ঢঙ। প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয়—আবার এদিক-ওদিক চায়—কেউ দেখছে কিনা। চলবার সময় কাঁকাল ভাঙা।”

কলকাতার ডাক্তারদের একহাত নিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। হোমিওপ্যাথিক বহু চিকিৎসক তাঁকে চিকিৎসা করেছেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল ভাদুড়ী, রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রভৃতি। কবিরাজী মতে চিকিৎসাও প্রচলিত ছিল। কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন, সিঁথির মহেন্দ্র পাল, বরাহনগরের ঈশানচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কবিরাজরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, শশীভূষণ ঘোষ, ত্রৈলোক্য বসু প্রভৃতি এ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররাও তাঁর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার হলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের

চিকিৎসা করেছিলেন হোমিওপ্যাথিক মতে। তাঁর শাঁখারীপাড়ার বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন। ডাক্তার-পুত্র অমৃত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পদাচিহ্ন পড়েছিল গঙ্গাপ্রসাদ সেন, ঈশান মজুমদার, বউবাজারের রাজেন্দ্র দত্ত, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে বিহারী ভাদুড়ী, শ্যামবাজারের ডাঃ কালীর বাড়িতে। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে মখমলের কোমল পাদুকা উপহার দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র দত্ত, যা অদ্যাবধি বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে। তবুও ডাক্তারদের প্রতি কঠোর মন্তব্য করতে তিনি পিছপা হননি—"আমার কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শম্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্বাধিকারী) বলে, ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা! তারপরই শম্ভুর দেহত্যাগ হলো!"

জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে সহজবোধ্য করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার বহু বস্তুকে টেনে এনেছেন উপমা হিসাবে—বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক, হনুমান পুরী, হাসপাতাল, ফুটপাতের চারা গাছ, কালীঘাটে দান করা গ্যাসের বাতি, ফোর্ট উইলিয়ামের কলমবাড়া রাস্তা, টেলিগ্রাফের তার।

কলকাতার বাবু-কালচারের প্রতি কটাক্ষ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলেছেন, "যে কালোপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে ; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick) এইসব এসে জোটে।" কলকাতার বাবুদের চিত্র এঁকেছেন, "ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটা আঙটি। বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোন বড় মানুষের ছবি। বাড়িটি চুনকাম করা, যেন কোনখানে একটু দাগ নেই। নানা রকমের ভাল পোশাক। চাকরদেরও পোশাক।" তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল চাদরের উপর রেকাবিতে মিষ্টি ও পান দেওয়া, হাত ধোবার জন্য পিকদানি ব্যবহার করা—এগুলি ছিল বাবু-কালচারের অঙ্গ। বাবু-কালচারের কুফলও তিনি উল্লেখ করেছেন। লোকেরা হবে গাঁজাখোর, মাতাল, ইত্যাদি। আর থাকবে ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা।

কলকাতার বাবুদের বাগানবাড়ি থাকত আশে-পাশে। বরাহনগরে ঠাকুরদের নৈনানের প্রমোদ কাননে (বর্তমানে যেখানে Indian Statistical Institute) তিনি সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে। সুসজ্জিত কোম্পানীর বাগান দেখতে গিয়েছিলেন বিডন স্কোয়ারে। ভক্ত রামচন্দ্র কাঁকুড়গাছিতে বাগান কিনেছিলেন নির্জনে সাধনার জন্য। ভক্ত সুরেন্দ্রও তাই। এঁদের বাগান-বাড়িতে ভক্তদের নিয়ে আনন্দ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সংঘটিত হয়েছিল তাঁর অন্ত্যলীলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার কলকাতায় জ্যামে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। বড়বাজারের মল্লিক স্ট্রীটের মারোয়াড়ী বাড়িতে অন্নকূট উৎসবে যোগদান করতে ভক্তসহ শ্রীরামকৃষ্ণ আসছিলেন গাড়ি করে। ব্যাস! জ্যামে পড়ে গেলেন তিনি—"লোকে লোকারণ্য—গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি জমা হইয়া রহিয়াছে।...ঠাকুর গাড়িতে বসিয়া, গাড়ি আসিতে পারিতেছে না।"

উৎসব-প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার ছুটে এসেছেন কলকাতায় উৎসব উপভোগ করতে। মথুরবাবু যতদিন সশরীরে ছিলেন, প্রতিবছর দুর্গোৎসবে তাঁকে নিয়ে গেছেন জানবাজারের বাড়িতে। রামচন্দ্র ও সুরেন্দ্রের বাড়িতেও এসেছেন দুর্গোৎসবে। মাঝে মাঝে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজাতে কলকাতায় আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এক কোজাগরী পূর্ণিমাতে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে নৌকাবিহার করে কয়লাঘাট থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরে। তখনকার কলকাতার রাস্তার অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীম—"গাড়ি চলিতে লাগিল। ইংরেজটোলা। সুন্দর রাজপথ। পথের দুইদিকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, অট্টালিকাগুলি যেন বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে বিশ্রাম করিতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়াম, পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মহিলারা গান করিতেছে।" শ্যামাপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর কাছেই থাকতেন। কিন্তু কলকাতার

দেওয়ালিও তিনি দেখেছেন। কলকাতার দেওয়ালি দেখতে হলে যেতে হবে বড়বাজার এলাকায়। শ্যামাপূজার দুদিন পর এক দেওয়ালি উৎসব দেখেছিলেন তিনি বড়বাজারের ১২ মল্লিক স্ট্রীটে এক মারোয়াড়ী ভক্তের বাড়ি থেকে দক্ষিণেশ্বর ফেরার পথেঃ "বড়বাজার দিয়া গাড়ি চলিতেছে। —দেওয়ালির ভারী ধুম। অন্ধকার রাত্রি কিন্তু আলোয় আলোকময়।... আলোবৃষ্টি ও পিপীলিকার ন্যায় লোকে লোকাকীর্ণ। লোকে হাঁ করিয়া দুই পার্শ্বের সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী দর্শন করিতেছিল।... দোকানদারগণ মনোহর বেশ ধারণ করিয়া গোলাপপাশ হস্তে ধরিয়া দর্শকবৃন্দের গায়ে গোলাপজল বর্ষণ করিতেছিল। ঠাকুর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় রোশনাই দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। চতুর্দিকে কোলাহল। ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন আরও এগিয়ে দেখ, আরও এগিয়ে!' বলিতে বলিতে হাসিতেছেন।" জগদ্ধাত্রী পূজাতে সুরেন্দ্র ও মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আনন্দ করতেন। আবার সুরেন্দ্রের অন্নপূর্ণা পূজাতেও তিনি উপস্থিত থাকতেন।

কলকাতার কয়েকটি খাদ্যবস্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল খুব প্রিয়। কুলপি বরফ খুব আনন্দের সঙ্গে খেতেন। আবার কলকাতার ভক্তদের বলতেন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে। জিলিপি ভরাপেটে অম্লানবদনে গ্রহণ করতেন। উপভোগ করতেন লেমনেড। নবীন ময়রার রসগোল্লা তাঁর খুব পছন্দের ছিল। মালপো, খইচুর, সরভাজা, লাল পানতোয়া, মোহনভোগ, ক্ষীর, সন্দেশও তিনি খেতেন আনন্দের সঙ্গে।

কোন কোন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় যাতায়াত করতেন নৌকা করে। ফলে কলকাতার কয়েকটি ঘাট আজও তাঁর পবিত্র স্মৃতি বুকে নিয়ে আছে—বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাট, জগন্নাথ ঘাট, সরকার বাড়ির ঠাকুর ঘাট ও বরাহনগর ঘাট।

শ্রীরামকৃষ্ণের সময়ে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন 'father of native stage'। তিনি একাধারে অভিনেতা, নাটক রচয়িতা, নাট্য-নির্দেশক ও থিয়েটার স্থাপনকর্তা। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল বহু নাটক। শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে। তখনো নাটুকে গিরিশ পরিণত হননি ভক্ত গিরিশে। চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নটী বিনোদিনী। তাঁর অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"আসল নকল এক দেখলাম।" তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল বিনোদিনীর উপর, "মা, তোমার চৈতন্য হোক।" সে আশীর্বাদ সমগ্র বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের উপর, তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। নতা-অভিনেত্রীদের তিনিই প্রথম সম্মান জানালেন। তিনি হয়ে উঠলেন রঙ্গমঞ্চের দেবতা। তাঁর প্রদত্ত একটি রৌপ্য মুদ্রা স্টার থিয়েটারে রক্ষিত ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। অবশ্য এর আগে কেশবচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অভিনীত 'নব বৃন্দাবন' নামে এক অপেশাদারী নাটক দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের রঙ্গমঞ্চে। স্টার থিয়েটারে তিনি আরও তিনটি নাটক দেখতে এসেছিলেন—'নিমাই সন্ন্যাস,' 'বৃষকেতু' ও 'প্রহ্লাদচরিত্র'। মেছুয়াবাজারে বীণা থিয়েটারেও শুভাগমন হয়েছিল তাঁর।

কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে কখনো দক্ষিণেশ্বরে, কখনো আবার তিনি নিজেই কলকাতায় গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, যেগুলি পরবর্তী কালে কয়েকটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার বলে বিবেচিত হয়েছে। বাদুড়বাগানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা অতুলনীয়। শোভাবাজারে ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়িতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ অনবদ্য। পটলডাঙ্গায় ভূধর চ্যাটার্জীর বাড়িতে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে। বাগবাজারে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের বাড়িতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতেও গিয়েছেন তিনি।

কলকাতার প্রায় একশটির মতো স্থানে

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। কলকাতার লোকেরা তাঁর পুণ্য সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে। এর মধ্যে আবার বাগবাজারের লোকের সংখ্যাই সর্বাধিক। এখানকার অনেক ভাগ্যবান ভক্তের বাড়িতে তাঁর এক বা একাধিক বার পদার্পণও ঘটেছে। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানে অনুষ্ঠিত হতো রীতিমত উৎসব। তাঁর আসার সংবাদ ভক্ত-মহলে জানাজানি হয়ে যেত। ফলে সমবেত হতেন ভক্তেরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত ভগবৎ প্রসঙ্গ। গৃহকর্তারা আয়োজন করতেন কীর্তনের। মনোহর সাঁই, নরোত্তম, বৈষ্ণবচরণ, কেশব, বানোয়ারী, বিধু প্রভৃতি কীর্তনীয়াদের কীর্তন শ্রবণে সমাধিস্থ হতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কখনো তিনি নিজেই আখর দিতেন। নৃত্য করতেন ভক্তদের সঙ্গে। আবার কখনো তাঁর দেবদুর্লভ কণ্ঠের সঙ্গীতে মন্ত্রমুগ্ধ করতেন সকলকে। ভক্ত গায়কদের অপূর্ব সুর ব্যঞ্জনায় সৃষ্টি হতো স্বর্গলোক। সর্বশেষে কোন কোন গৃহকর্তা আয়োজন করতেন ভূরিভোজের। বহু স্থানের ও ব্যক্তির নাম আগেই উল্লেখিত হয়েছে। বাকিদের নামঃ ঝামাপুকুর লেনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; বাগবাজারে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দীননাথ ও কালীনাথ বসু, পশুপতি ও নন্দ বসু, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, চুণীলাল বসু, দীননাথ মুখুজ্জে ; পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎ ঘোষ ; শ্যামপুকুরে কালীপদ বসু, মোটা বামুন প্রাণকৃষ্ণ, কাপ্তেন ; সিমলার স্বামীজী ও তাঁর মাতামহী, মহেন্দ্র গোস্বামী ; তেলিপাড়ার ছোট নরেন ; ঠনঠনিয়ার স্বামী সুবোধানন্দ, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র মিত্র ; কলুটোলায় মাস্টার মহাশয় ও নবীন সেন ; নিমু গোস্বামী লেনে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ; বাদুড়বাগানে নবগোপাল ঘোষ ; রামদুলাল সরকার রোডে নীরদ গোস্বামী ; বেলতলার মধুসূদন ভট্টাচার্য ; কাশীপুরে মহিমা চক্রবর্তী, উলোর বামনদাস মুখোপাধ্যায় এবং বরাহনগরে ‘ঠাকুরদাদা’ নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।

শ্রীমা বলেছিলেন, “ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ লীলাস্থল কলকাতা।” কথাটি খাঁটি সত্যি। প্রায়-যুবক গদাধরের কলকাতায় প্রথম আগমন। কলকাতা ছিল তাঁর মধ্য ও অন্ত্যলীলার স্থান। কলকাতা থেকেই তিনি নির্বাচন করেছিলেন তাঁর ভাবী সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিষ্যদের। কলকাতাই জুগিয়েছিল তাঁর অন্তরঙ্গ গৃহী শিষ্যদেরকে। তাঁর পবিত্র স্পর্শে কলকাতার কত লোকের জীবন কতভাবে পরিবর্তন হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তিনি আজও কলকাতার মানুষের ঘরে ঘরে ফিরছেন ; আর বলছেন, “ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।”

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে মুদ্রিত ছবিটি বলরাম মন্দিরের (৭ গিরিশ অ্যাভেনিউ, কলকাতা ৭০০০০৩)। দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, “মা কালীর কেল্লা”, আর বলরাম মন্দির “মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা”। বলরাম বসুর বাগবাজারের এই বাড়িতে (তখন ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীট) শ্রীরামকৃষ্ণের অগণিতবার পদার্পণ ঘটেছে। এখানে অবস্থান ও অন্নগ্রহণ করেছেন তিনি। পরবর্তী কালে শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সকল অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদগণও এখানে অবস্থান করেছেন। এই বাড়িতেই ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে এই বাড়িটির ভূমিকা অসামান্য। শ্রীরামকৃষ্ণের এই “কলকাতার কেল্লা” সম্পর্কে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রয়াত দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বলেছেনঃ “ঠাকুর বলতেন, এ বাড়িটা মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা। আমরা বলি, এটা ঠাকুরের দ্বিতীয় লীলাভূমি। যেমন দক্ষিণেশ্বর, তেমনি বলরাম মন্দির। বলরাম মন্দিরও কম নয়। এখানে এত আধ্যাত্মিক কথা, কীর্তন ও নাম হয়েছিল যে, বলরাম বাবুর বাড়ি আর ‘বলরাম ভবন’ থাকল না, ‘বলরাম মন্দির’ হয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বরের মতই এই জায়গাটাও মা কালীর একটা কেল্লা—দ্বিতীয় কেল্লা। দক্ষিণেশ্বর ছিল ঠাকুরের দেওয়ান-ই-খাস, আর বলরাম মন্দির ছিল দেওয়ান-ই-আম।” ‘কথামৃত’-এ দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ এসেছেন। কথামৃত-এ বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণের সেটিই প্রথম উল্লেখ। তার আগেও নিশ্চয়ই বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে এসেছেন।

প্রচ্ছদের ছবি ও ব্লক বলরাম মন্দিরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

পুরনো কলকাতার পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

নির্মলকুমার রায়

সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও ধর্মচেতনার সহায়করূপে সংবাদপত্র বা মননশীলতায় পূর্ণ দৈনিক পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকার স্থান অনস্বীকার্য। ন্যায়নিষ্ঠ পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকৃতপক্ষে জাতির আত্ম-উন্মীলনের উৎকৃষ্ট যন্ত্র, যা যুগে যুগে মানবসভ্যতার মহাযজ্ঞে সতত পূজারী। আনন্দের কথা, পরাধীন ভারতের সেই পুরনো দিনগুলি থেকেই আমাদের দেশে এরকম যুগব্রত সাধনার মাধ্যমরূপে পত্র-পত্রিকার প্রচলন ছিল এবং আজও তার ধারা প্রবহমান। এ-বিষয়ে ‘উদ্বোধন’-পত্রিকা একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমাবস্থায় সর্বসাধারণের কাছে বিশেষ স্বীকৃতি পাননি; কারণ, দক্ষিণেশ্বরে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর দৈব-পরিচিতি তখন অধিকাংশ লোকের কাছেই ছিল অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য কেশবচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম তাঁর প্রবর্তিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী প্রচারে উদ্যোগী হন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্রের মিলনের পর থেকেই তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় এবং ক্রমশঃ দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট বসে। যে পত্রিকাগুলিতে তাঁর দিব্য জীবন-কাহিনী বা তাঁর উপদেশাবলী প্রথম প্রচারিত হতে থাকে, সেই সব পত্রিকাগুলি তখন ভারতের রাজধানী এই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো।

কেশবচন্দ্রের ‘Indian Mirror’—ইংরেজী পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮ মার্চ সর্বপ্রথম ‘A Hindu Saint’ শীর্ষক প্রতিবেদনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর পরেই তাঁর ‘ধর্মতত্ব’—বাংলা পত্রিকায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মে সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় ‘শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস’ প্রবন্ধটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে দীর্ঘ ও বিশদ পরিচয় প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্র জীবনধারা সম্পর্কে জানার আগ্রহ ক্রমশঃ জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায় সেই সময়ে যে ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকাটি প্রকাশ করা হতো তাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে নানা কথার উল্লেখ থাকত। ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ছোটদের ‘সখা’ পত্রিকাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁর ‘তত্ত্বমঞ্জরী’ পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল (তারিখ অনুযায়ী সাজানো):

The Indian Mirror—28 March, 1875
ধর্মতত্ত্ব—১৪ মে, ১৮৭৫
The Indian Mirror—20 February, 1876
The Sunday Mirror—16 April, 1876
The Indian Mirror—11 February, 1877
ধর্মতত্ত্ব—২৮ জানুয়ারি, ১৮৭৮
ধর্মতত্ত্ব—৩১ জুলাই, ১৮৭৮
ধর্মতত্ত্ব—২৮ জানুয়ারি, ১৮৭৯
ধর্মতত্ত্ব—২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯
The Indian Mirror—15 June, 1879
ধর্মতত্ত্ব—১ অক্টোবর, ১৮৭৯
ধর্মতত্ত্ব—১ নভেম্বর, ১৮৭৯
The Theistic Quarterly Review—October-December, 1879
The Sunday Mirror—2 November, 1879
ধর্মতত্ত্ব—২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০
The New Dispensation—26 May, 1881
The New Dispensation—7 July, 1881
সুলভ সমাচার—৩০ জুলাই, ১৮৮১

The New Dispensation—9 September, 1881
The Indian Mirror—9 October, 1881
The New Dispensation—14 October, 1881
সুলভ সমাচার—২৯ অক্টোবর, ১৮৮১
The Indian Mirror—11 December, 1881
সুলভ সমাচার—১৭ ডিসেম্বর, ১৮৮১
The New Dispensation—8 January, 1882
The New Dispensation—26 February, 1882
ধর্মতত্ত্ব—২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২
সুলভ সমাচার—২৯ এপ্রিল, ১৮৮২
The New Dispensation—30 July, 1882
The New Dispensation—3 September, 1882
ধর্মতত্ত্ব—১৪ জানুয়ারি, ১৮৮৪
(৮ জানুয়ারি কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর)
The Indian Mirror—26 July, 1884
ধর্মপ্রচারক—৬ আগস্ট, ১৮৮৪
তত্ত্বমঞ্জরী—জুলাই, ১৮৮৫
ধর্মতত্ত্ব—২৮ জানুয়ারি, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—২৮ এপ্রিল, ১৮৮৬
পরিচারিকা—জুলাই, ১৮৮৬

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেন। তাঁর দেহরক্ষার সংবাদ 'পরিচারিকা', 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'Indian Mirror' পত্রিকায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। এমনকি, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম শোভাযাত্রা ও দাহকার্যের যে নিখুঁত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা একটি ঐতিহাসিক দলিলরূপে গ্রহণযোগ্য। দেহরক্ষার পর যেসব পত্র-পত্রিকায় তাঁর কথা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হলো:

পরিচারিকা—আগস্ট, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—১৬ আগস্ট, ১৮৮৬ ✓
The Indian Mirror—19 August, 1886
The Indian Mirror—21, August, 1886
সুলভ সমাচার—২৭ আগস্ট, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—৩১ আগস্ট, ১৮৮৬ ✓
The Indian Mirror—10 September, 1886
ধর্মতত্ত্ব—১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬
তত্ত্বমঞ্জরী—আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—১ অক্টোবর, ১৮৮৬
ধর্মতত্ত্ব—২৮ জানুয়ারি, ১৮৮৭
বেদব্যাস—অক্টোবর, ১৮৮৭
বেদব্যাস—ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮
সখা—নভেম্বর, ১৮৮৮ ✓

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'সখা' পত্রিকাটি ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত হলেও ১৮৮৮ নভেম্বরের সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধটির রচয়িতা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কীয় সংবাদগুলি তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল উদাহরণস্বরূপ কিছু এখানে উদ্ধৃত হলো।

ধর্মতত্ত্ব—১৪ মে, ১৮৭৫: "**রামকৃষ্ণ পরমহংস।** জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিংবা একাদশ, তখন হইতে ইঁহার মনে অসাধারণ ধর্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল।... অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দৃষ্টান্তের কথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায়, সে-সকল কথা তিনি অম্লানবদনে বলিয়া থাকেন।... একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে, রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মতো একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই।"

(আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙলা পত্রিকায় এই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা প্রচারিত হয়।)

সুলভ সমাচার—৩০ . . ১৮৮১ঃ **"দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।** পাঠকগণ উপরি-উক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রানী রাসমণির কালীবাটীতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চজীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে। আমরা যেমন ঘর, বাড়ি, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন।..."

ধর্মপ্রচারক—৬ আগস্ট, ১৮৮৪ঃ **"মহাত্মা রামকৃষ্ণ।**... মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলিয়া বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস।... তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাঁহাকে কেহই কখন শত্রু ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু; তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণ-প্রার্থীমাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী।..."

পরিচারিকা—আগস্ট, ১৮৮৬ঃ **"দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস।**... এই সাধুপুরুষ এইক্ষণ আর ইহলোকে নাই। তিনি গত ৩১শে শ্রাবণ নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ের ঘোর বিলাসিতা, নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার মধ্যে ইঁহার পবিত্র জীবন মুমুক্ষু নরনারীর আশাস্থল ছিল।..."

বেদব্যাস—অক্টোবর ১৮৮৭ঃ **"পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।**... রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়াও চিনিল না, হাতে পাইয়াও হেলায় হারাইল। রামকৃষ্ণ সূত্র অভ্যাস করেন নাই, তন্ন তন্ন করিয়া ভক্তিতত্ত্বেরও বিচার করেন নাই। ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি একেবারে 'নিরক্ষর' ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর সেরূপ ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণ যেরূপ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহস হয় না। এই মহানুভব ভক্তির অবতার রামকৃষ্ণকে যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি যেকোন ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন, রামকৃষ্ণের অমানুষী ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়াছেন।..."

সখা—নভেম্বর, ১৮৮৮ঃ "আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইঁহার ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ সহজ কথায় কঠিন ধর্মকথা-সকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তিসকল ঈশ্বর-সাধকদিগের বড় আদরের বস্তু।... অনেকের বিশ্বাস, মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী ও ধার্মিক হইতে পারে না। পরমহংস-চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।"

কলকাতার তিনশো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে, আজ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি সেইসব কলকাতাবাসী গুণগ্রাহীদের, যাঁরা প্রথম পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপী অপ্রতিহত অনন্ত-সত্তার সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁদের তৎকালীন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে।

শ্রীশ্রীমা ও কলকাতা

জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার অখ্যাতপল্লী (অধুনা তাঁর জন্ম ও লীলাভূমি হিসাবে একটি অতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র) জয়রামবাটী কলকাতা থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে। সম্প্রতি রাস্তাঘাট ও যানবাহনের প্রভূত উন্নতি হওয়াতে কলকাতা থেকে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই জয়রামবাটী যাওয়া যায়। কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্বে জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় যাতায়াতের পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসংকুল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহে বর্তমান থাকতে দেশ থেকে কলকাতা আসার সময় পায়ে হেঁটেই শ্রীমা যাতায়াত করতেন। স্বামী সারদানন্দ একবার শ্রীমায়ের জন্য আম পাঠিয়েছেন। মা তখন কোয়ালপাড়ায় আছেন। শ্রীমা বলছেনঃ "এই দেখ না, রাসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে পেঁৗছে গেল! আমরা তখন কত হেঁটে, কত কষ্ট করে তবে দক্ষিণেশ্বরে গেছি।"[১]

শ্রীমার প্রথম কলকাতা আগমনের পর এক হাসির ঘটনার কথা পরবর্তী কালে শ্রীমা আমাদের শুনিয়েছেনঃ "প্রথম যখন কলকাতায় আসি, আগে জলের কল-টল তো কিছু দেখিনি, একদিন কলঘরে গেছি। দেখি কল সোঁ-সোঁ করে সাপের মতো গজরাচ্ছে, আমি তো ভয়ে একছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বলছি—'ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস, সোঁ সোঁ করছে।' তারা হেসে বললে—'ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয়।' আমি তো তখন হেসে কুটিপাটি।"[২] কলকাতার একটি মেয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ "অমুকের বউ ঘড়িতে দম দিতে জানে।"[৩] এক ভক্তের বালীগঞ্জের বাড়িতে শ্রীমা গেছেন। সঙ্গে গোলাপ-মা, রাধারানী, নলিনীদিদি এবং আরও কয়েকজন আছেন। গ্রামোফোনে গান হচ্ছে। 'কলের গান' শুনে মা খুব খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেনঃ "কি আশ্চর্য কল করেছে!"[৪] গান শুনে বালিকার মতো আনন্দ করছেন। শ্রীমা সাধারণতঃ ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করতেন। সেদিন ফেরার সময় বালীগঞ্জ থেকে বাগবাজার মোটরে এসেছিলেন। সেই প্রথম তাঁর মোটরগাড়িতে চড়া কিনা তা বলা যাচ্ছে না। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের অতি ক্ষুদ্র ঘরে তাঁর থাকার কষ্টের কথা আমরা জানি। সে-প্রসঙ্গে মা বলছেনঃ "কলকাতা হতে সব মোটা-সোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা কি ঘরেই না আমাদের সতীলক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!"[৫]

শেষ অসুখের সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে ৫৫এ শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং দিন কয়েক পর শ্রীমা সেখানে এসে তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ শ্রীমায়ের কলকাতায় থাকা সেই প্রথম। এর আগে তিনি অন্ততঃ দু-বার কলকাতা এসেছিলেন। প্রথমবার এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বলরাম বসুর অসুস্থ স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীকে দেখতে দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজারে বলরামভবনে (বর্তমান বলরাম-মন্দিরে)। দ্বিতীয়বার তিনি যোগীন-মার মুখে গোলাপ-মার একটি কথা শুনে শ্যামপুকুরে এ[illegible] ঠাকুরের কাছে। এটি ঠাকুরের

---

[১] শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ,কলকাতা, ৬ষ্ঠ সং (১৩৭২), পৃঃ ২০৬

[২] শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, কলকাতা, ১১শ সং (১৩৮৩), পৃঃ ৫৯

[৩] শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলকাতা, ৩য় সং (১৩৬৯), পৃঃ ৬১৫

[৪] শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৫-৫৬

[৫] শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১০১

শ্যামপুকুরে আসার দু-একদিন পরের ঘটনা।

কলকাতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বরের শুভ দিনটিকে। এই দিনটি বাগবাজারে ১৬ বোস পাড়া লেনে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' বইখানিতে লিখেছেন, শ্রীমা ঐদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিনীদের এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেনঃ "আমি প্রার্থনা করছি যেন এই বিদ্যালয়ের উপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।[৬] অভিভূত নিবেদিতা সেদিন বলেছিলেনঃ "ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভলক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।"[৭] ঐদিন স্বামীজীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামপুকুরবাটীতে শ্রীঠাকুরের শরীরের উন্নতি না হওয়ায় ১১ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনিও কাশীপুরে আসেন এবং ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত ও সেবার ভার গ্রহণ করেন। কাশীপুর তখন অবশ্য মূল কলকাতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের ঘোরে একদিন শ্রীমাকে বলেনঃ "দ্যাখো, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"[৮] পরবর্তী কালে দেখা যায় কলকাতার অগণিত মানুষ শান্তির আশায় মাতৃসমীপে ছুটে এসেছে এবং শ্রীমাও তাঁদের প্রত্যেককে অভয় আশ্রয় দিয়েছেন, কাউকেই ফিরিয়ে দেননি।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এসে শ্রীমা বাগবাজারের ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরামভবনে ওঠেন। এর পর থেকে ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা' বলরাম বসুর আবাসে তিনি বহুবার অবস্থান করেছেন। অবশ্য কলকাতায় মাস্টার মশায়ের বাড়িতেও তিনি থেকেছেন। বলরাম বসুর বাড়িতে থাকার সময়কার কথা বলতে গিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী রাজলক্ষ্মী বসু বলেনঃ "শ্রীশ্রীমার বাড়ি তখন তৈরি হয়নি। শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এসে ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে থাকতেন। বাড়িতে হৈ হৈ পবিত্র আবহাওয়া। কি আনন্দের দিনই গেছে!"[৯] কলকাতার বাগবাজার স্ট্রীটে শ্রীমায়ের ভাড়াবাড়িতে ছিল বাস্তবিক এক আনন্দনিকেতন। সেখানে উপস্থিত থাকতেন বাবুরাম মহারাজের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা, গোপালের মা, নিবেদিতা, বলরামজায়া, শ্রীম-গৃহিণী, অসীমের মা, মেনীর মা এবং আরও অনেক উত্তর কলকাতার ভক্তপরিবারের গৃহিণী।[১০]

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি শ্রীমা কলকাতায় এসে 'নগা' নামক জনৈক ভক্তের গৃহে ওঠেন। পরদিন তিনি নিমতলাঘাটে গঙ্গাস্নান করেন এবং কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করেন। নিত্য গঙ্গাস্নানে শ্রীমায়ের বিশেষ অনুরাগ ছিল, ঘাটের ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু দান করা এবং বটগাছের মূলে জল দেওয়া ছিল তাঁর রীতি। 'সারদা-রামকৃষ্ণ' বইটি থেকে জানা যায় কাশী মিত্রের গঙ্গার ঘাটের পাশে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর নাম রামদয়াল চক্রবর্তী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে বলরাম বসুর যোগাযোগ স্থাপনে তিনি সহায়তা করেছিলেন। শ্রীমা স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, এবং তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে এই ব্রাহ্মণের কুটিরে যান এবং তৃপ্তির সঙ্গে অন্নগ্রহণ করেন। শ্রীমাকে ব্রাহ্মণ একখানি গরদের বস্ত্র নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীমা পরবর্তী কালে বাগবাজার মাতৃভবনে অবস্থানকালে প্রায়ই নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ঘোড়ার গাড়িতে ছুটির

---

[৬] ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, ২য় সং (১৯৬০), পৃঃ ১৩৫

[৭] ঐ

[৮] শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১৬০

[৯] সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সং (১৩৬৮), পৃঃ ২০২

[১০] নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম খণ্ড—শংকরীপ্রসাদ বসু, কলকাতা, ১ম সং (১৩৭৫), পৃঃ ২১৮

দিনে গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কালীঘাট ইত্যাদি ঘুরে আসতেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে শ্রীমা যখন বরানগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেছিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র তাঁর শিশুপুত্রের আগ্রহে প্রথম শ্রীমাকে দর্শন করেন। এই দর্শনের একটি বিরাট তাৎপর্য আছে। এর পূর্বে ভক্তগণ শ্রীমায়ের দর্শন পেতেন না, নিচে প্রণাম করে চলে যেতেন।

গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ অথবা অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে শ্রীমা কলকাতায় থিয়েটার দেখেছেন। ১৯০৪ অথবা ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে একরাত্রে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় দেখতে যান। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে 'পাণ্ডবগৌরব' অভিনয় দেখতে দেখতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন বেলুড় মঠে 'জনা' নাটকাভিনয় এবং বিজয়া দশমীর রাত্রে 'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ' দেখেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ৮ সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের উৎসাহে শ্রীমা 'কিন্নরী' নাটক দেখতে যান। আশুতোষ মিত্র লিখেছেন, শ্রীমা 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখেছিলেন ; কিন্তু তিনি সময়ের উল্লেখ করেননি। গিরিশবাবুর পরলোক গমনের পর শ্রীমা মিনার্ভায় 'রামানুজ' নাটক দেখতে যান। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রামানুজের ভূমিকায় অভিনয় করে সেই বেশে তারাসুন্দরী প্রণাম করতে এলে শ্রীমা "আয় মা, আয়" বলে তাঁকে আদর করেন।[১১] 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীমা বলরামভবনে 'দক্ষযজ্ঞ' পালা দর্শন করেন। এইভাবে কলকাতার রঙ্গমঞ্চ তথা নটনটীরা শ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্য ও আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাগবাজারে ৫৯।২ রামাকান্ত বসু স্ট্রীটে শ্রীমা শরৎ সরকারের বাড়িতে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থান কালে একদিন আমেরিকা থেকে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি শুনে বলেনঃ "নরেন হলো ঠাকুরের হাতের যন্ত্র।" ঐ বছর মে মাসের শেষে তিনি বাগবাজারে গঙ্গার ধারে সরকার বাড়ি লেনে 'গুদাম বাড়ি'তে উঠে আসেন। এই বাড়ির একতলায় হলুদের গুদাম ছিল বলে লোকে বাড়িটাকে 'গুদাম বাড়ি' বলত। দ্বিতল ও ত্রিতল বাসোপযোগী ছিল। গোপালের-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তদের নিয়ে শ্রীমা ত্রিতলে বাস করতেন। সেখান থেকে বেশ গঙ্গাদর্শন করা যেত। এই গুদাম বাড়িতে ঠাকুর ও মায়ের পরমভক্ত নাগমহাশয় আসেন। শ্রীমা তাঁকে শালপাতায় করে প্রসাদ দিয়েছিলেন এবং ভক্তির আতিশয্যে নাগমহাশয় পাতাসুদ্ধ প্রসাদ খেয়ে ফেলেন। পরবর্তী কালে উদ্বোধনে নাগমহাশয়ের ছবি দেখতে দেখতে মা একদিন বলছেনঃ " কত ভক্তই আসছে ; কিন্তু এমনটি আর দেখছি না।"[১২] ধন্য কলকাতার 'গুদাম বাড়ি'—যা এক অপূর্ব পরাভক্তির সাক্ষী!

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমে শ্রীমা বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে আসেন এবং সেখানেই বাস করতে থাকেন। এখানে গোলাপ-মা ও যোগীন-মা শ্রীমায়ের সর্বদা দেখাশুনা ও সেবা করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ২/১ বাগবাজার স্ট্রীট এবং ৫২/২ বোস পাড়া লেনেও শ্রীমা সাময়িকভাবে বাস করেছেন। শ্রীমা বলতেনঃ "গোলাপ-যোগীন না থাকলে (আমার) কলকাতা থাকা হবে না।"[১৩] এই বাড়িতেই স্বামীজী বিদেশ থেকে ফেরার পর মাকে প্রণাম করতে এসেছিলেন (১৪ মার্চ, ১৮৯৮)।

বাগবাজারে কেদারনাথ দাস নামে এক খড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ঠাকুরবাটী নির্মাণের জন্য ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুলাই বাগবাজারে গোপাল নিয়োগী লেনে তিন কাঠা চার ছটাক জমি বেলুড় মঠকে দান করেন। স্বামী সারদানন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় এখানে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' ও উদ্বোধন কার্যালয় (বর্তমান ১ নং উদ্বোধন লেনে) নির্মিত হয় এবং

---

[১১] শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলকাতা, ১০ম সং (১৩৯৩), পৃঃ ১৫২ (পাদটীকা)

[১২] শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ২০১

[১৩] ঐ, পৃঃ ২৪৭

আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩.মে শ্রীমা এখানে পদার্পণ করেন। এটিই তখন থেকে কলকাতায় মায়ের স্থায়ী আবাস। এই বাড়িতেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন (২১ জুলাই ১৯২০)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীমা সাধারণতঃ কলকাতায় থাকলে কলকাতার ভাষা ব্যবহার করতেন, দেশে থাকলে দেশের ভাষা ব্যবহার করতেন।

বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলি বুলের মতো মনস্বিনী বিদেশিনীরা শ্রীমার সান্নিধ্য পেয়েছেন। কলকাতার বাগবাজারে নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের আবাসে তোলা হয়েছে তাঁর বিখ্যাত প্রথম আলোকচিত্র। সেটি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের ঘটনা। মিসেস ওলি বুল ও নিবেদিতার আগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় হ্যারিংটন নামে এক সাহেব ফোটোগ্রাফার এই ঐতিহাসিক আলোকচিত্রটি তোলেন। নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীমায়ের বিখ্যাত ছবিটিও ঐসঙ্গে তোলা হয়। শ্রীমায়ের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বছর। উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ছবি তোলার সময়েও তাঁর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। শ্রীমায়ের উপস্থিতি কলকাতাকে কোন্ মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছিল তা বিদেশিনী দেবমাতার ভাষায় বলে শেষ করবঃ "আমার কলকাতা ভ্রমণ ছিল তীর্থযাত্রার মতো। কলকাতার অদূরে গঙ্গার তীরে রয়েছে সেই মন্দিরটি যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছেন ও ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। গঙ্গার অপর তীরে কিছু দক্ষিণদিকে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় মঠ। সর্বোপরি রয়েছে বাগবাজারের সেই অনাড়ম্বর বাড়িটি, যেখানে বাস করতেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধিকা। তাঁর নাম সারদামণি দেবী। কিন্তু সচরাচর তিনি শ্রীশ্রীমা বা মাতাদেবী বলেই পরিচিত। তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্যই বাংলাদেশে আমার এই তীর্থযাত্রা।"[১৪]

---

[১৪] শতরূপে সারদা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৮৫, পৃঃ ৭৬৭

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

আদিভবনে প্রত্যাবর্তন

গত ১৬ জুলাই (১৯৮৯) গদাধর আশ্রম, তার অস্থায়ী নিবাস মঞ্জুশ্রীভবন, ৪বি গোপাল ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-২৫ থেকে আদিভবনে (৮৬-এ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-২৫) প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই উপলক্ষে ঐদিন সকালে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তমণ্ডলী এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। আদিভবনে বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ সকাল থেকেই শুরু হয়। মধ্যাহ্নে বেলুড় মঠের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত দুশোর বেশি সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ৩৫00 ভক্ত ও স্বেচ্ছাসেবক প্রসাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরের পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি যাতে বাইরে সমবেত ভক্তরা দেখতে পান সেজন্য ক্লোজড সার্কিট টি. ভি. বসানো হয়েছিল। সকাল ও সন্ধায় যথাক্রমে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। অপরাহ্নে বহু ভক্ত-সমাবেশে মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ আশীর্বাণী দেন। ভক্তরা কিভাবে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবেন, সে-বিষয়ে তিনি উপদেশাদি দান করেন। সভার প্রারম্ভে গদাধর আশ্রমের বিগত সত্তর বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আশ্রমের সাম্প্রতিক সংস্কার-বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী প্রভাকরানন্দ। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী ও অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত ভবানীপুরস্থ এই পুরনো আশ্রমটি শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিক সন্তানের পদার্পণ-ধন্য।

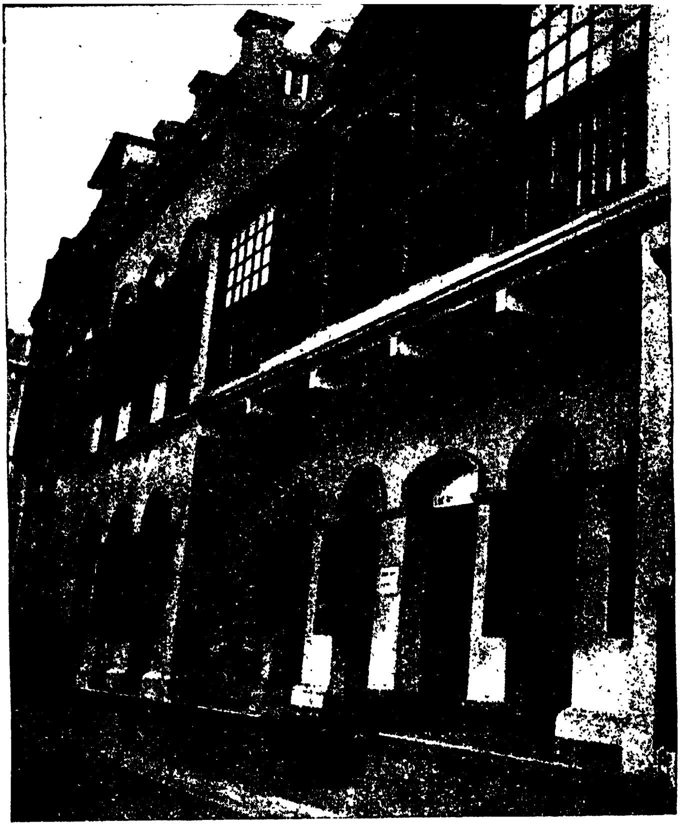

সারদাদেবীর অবস্থানধন্য বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'
(১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা ৭০০০০৩)

শোভাবাজার রাজবাড়িতে (৩৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৫) স্বামীজীকে প্রদত্ত কলকাতা

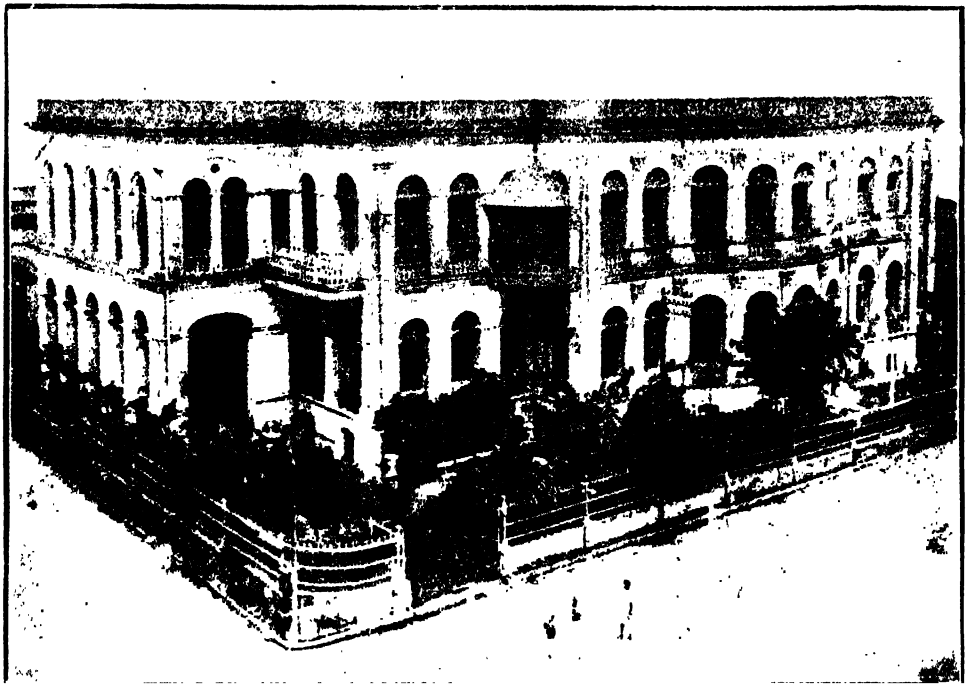

শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণধন্য যদুলাল মল্লিকের ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের (কলকাতা ৭০০০০৬) বাসভবন
(যদুলাল মল্লিকের প্রপৌত্র রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের সৌজন্যে)

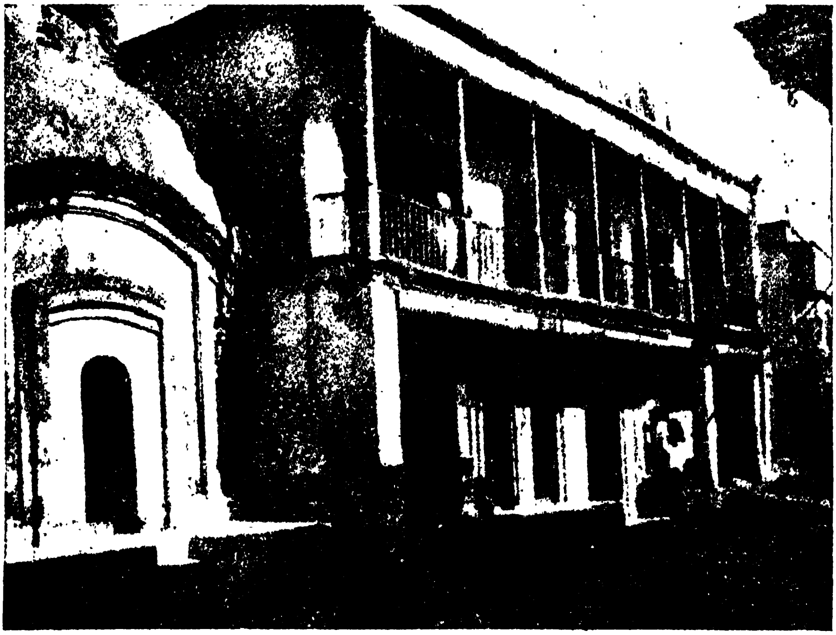

শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানধন্য শ্যামপুকুর বাটী (৫৫এ শ্যামপুকুর স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৪)

বিবেকানন্দ : 'এই কলকাতারই ছেলে'

তাপস বসু

১৯০২ খ্রীস্টাব্দ। 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ঐ গ্রন্থে স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতার আহিরীটোলা ঘাটে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবন্ধ করেছেন। সেদিনের তারিখ অনুল্লেখিত। এরপর মাত্র একবারই স্বামীজীর (স্বামীজীর তিরোধান হয় ৪ জুলাই ১৯০২) সঙ্গে শরচ্চন্দ্রের দেখা হয়েছিল এবং সেটি বেলুড় মঠে ১৯০২-এর জুনের শেষ সপ্তাহে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে কলকাতায় এই সাক্ষাৎ জুনেরই কোন একদিনে। সাধারণতঃ শরচ্চন্দ্র প্রতি সপ্তাহেই স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে বিবেকানন্দের কলকাতায় শেষ পদার্পণের ঐতিহাসিক সাক্ষী শরচ্চন্দ্র। বড় মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি তা লিখে গেছেন। খেলা শেষের সুর তখন বেজেছে বিবেকানন্দের কণ্ঠে। ১৮।৪।১৯০০-তে মিস ম্যাকলাউডকে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ

"লড়াইয়ে হারজিৎ দুই-ই হলো—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু। ... আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালকভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধিমাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সংকার মৃতেরা করুক (সংসারের ভালমন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়!'—যাই প্রভু, যাই!

"...আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশি ; এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশি ; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশি, আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না ; অথবা এমন বন্ধনও আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরনো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না।

"শিক্ষাদাতা, নেতা, গুরু, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চির পদাশ্রিত দাস!

"...আহা, কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতিদূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর, অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যা-কিছু দেখছি, শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে!... কেবল শান্তি, শান্তি!... ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই প্রভু, যাই!"

সেই আহ্বানের কথা শরচ্চন্দ্রও সেদিন স্বাম মুখে শুনেছিলেন তা যেন তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি লিখেছেনঃ

"গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া (স্বামীজী) কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে

দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌঁছিল। স্বামীজী তখন আপনমনে গান ধরিয়াছেন—

'(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা,
আসামাত্র সার হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলা ঘরের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো'।"

'কলকাতার' ছেলে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়েছেন, ভাব এবং আন্দোলনের জনকরূপে হয়েছেন বিশ্ববন্দিত। সেই ভাব-আন্দোলনের সূত্রপাত এই কলকাতা থেকেই। বিবেকানন্দের প্রভাবে কলকাতা তথা বাংলাদেশে যে মুক্তি-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার প্রতি শ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেনঃ

"বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা ডেকেছে মানুষের আত্মাকে, আঙুলকে নয়। বিবেকানন্দের বাণীতে সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলে কর্মের মধ্য দিয়ে ত্যাগের মধ্য দিয়ে, মুক্তির পবিত্র পথে প্রবৃত্ত করেছে আমাদের যুবকদের। তাঁর সে বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে দেখাল অসীম মুক্তির পথ।"১ ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে সমগ্র মানবসমাজে বিবেকানন্দ যখন মুক্তির অগ্রদূত রূপে চিহ্নিত হয়ে যান তখন রোমাঁ রোঁলা উচ্চারণ করেনঃ 'চল্লিশের পূর্বেই এই মহাবীর চিতাশায়িত। কিন্তু আগুন জ্বেলেছেন কয়েক বছরেই। সে অগ্নি নির্বাপিত নয় আজও। তাঁর চিতাশয্যা থেকে উত্থিত হয়েছে ভারতের বিবেক, পুরাণ-প্রাচীন ফিনিক্স পাখির মতোই। উত্থিত হয়েছে ভারতের বিশ্বাস—সেই মহান সত্যবাণীতে, বৈদিক যুগে যার জন্ম ঋষিদের অন্তশ্চেতনায়, বিবেকানন্দে যার অমেয় উচ্চারণ। সে বাণীর হিসাব দিতে হবে ভারতবাসীকে অবশিষ্ট মানবজাতির নিকট—বিবেকানন্দের দায় বহন করে।'২ রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রোঁলার এই উচ্চারণের পর আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি বিবেকানন্দ শুধু ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, বিবেকানন্দ একটি ভাবের নাম, আদর্শের নাম, একটি আন্দোলনের নাম, একটি কর্মযজ্ঞের নাম, ত্যাগ-সেবায় আত্মোৎসর্গের নাম। এবং অবশ্যই তা বিশ্বজনীন।

এই ভাব, আদর্শ, আন্দোলন, কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত কলকাতা থেকেই। বিবেকানন্দ যদি বিশ্বনাগরিক হন তবে নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই কলকাতার। ১৮৬৩-তে উত্তর কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করার পর থেকে জীবনের সিংহভাগই তাঁর অতিবাহিত হয়েছে কলকাতায়। নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দে পৌঁছনোর পথটুকুও কলকাতাকে ঘিরে। তারপর ভারত পরিক্রমা, পাশ্চাত্যে গমন, প্রত্যাবর্তন, বিপুলভাবে সংবর্ধিত হওয়া, সবক্ষেত্রেই কলকাতার প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অটুট। আসলে বিবেকানন্দ 'জন্মের দাগ' মুছে ফেলতে চান না, তাই কলকাতা থাকে তাঁর জীবন-জুড়ে। 'কলকাতার ছেলে' বলে গর্ববোধও করতেন তিনি। আমরা এখন দৃষ্টি ফেরাব কলকাতার বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দের কলকাতার দিকে।

॥ ২ ॥

শৈশবে, কৈশোর, যৌবনের দুরন্ত দিনগুলিতে নরেন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় হেঁটে বেড়িয়েছেন, খেলে বেড়িয়েছেন—সেই কলকাতা ছিল সিপাহী বিদ্রোহ-উত্তর ভারতের রাজধানী। সেই কলকাতায় তখন স্বাদেশিকতার টানে খানিকটা সটান সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ও সংস্কার বিরোধীদের মধ্যে সংঘাত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মধ্য-শিক্ষিতদের জীবিকার সন্ধান, সওদাগরী অপিসে চাকরি গ্রহণ, 'কাম-কাঞ্চন' আসক্ত বাবু সমাজ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে

---

১ ডাঃ সরসীলাল সরকারের পত্রের সূত্রে ৯ এপ্রিল ১৯২৮ তারিখের লেখা পত্র এবং স্বামী অশোকানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (কিশোর বাংলা, পৌষ, ১৩৪৮)।

২ ঋষি দাস অনূদিত রোমাঁ রোঁলা লিখিত বিবেকানন্দ জীবনীর সূচনাংশ থেকে।

উত্থিত জমিদারদের অর্থ দিয়ে খেতাব কেনার ধুম। বিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ, আচারনিষ্ঠ হিন্দুসমাজ এবং নব্য হিন্দু আন্দোলনের মাঝখানে দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত নবযুগের দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণ। কলকাতার নাগরিক বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ তৎকালীন কলকাতার উত্তাপ বুকে বহন করেছেন। শিক্ষা, রুচি, সংগীত, মেধা—সব দিক থেকে পরিণত নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসভার সংগে যুক্ত হয়েছিলেন জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে। প্রয়োজনীয় সদুত্তর তিনি পাননি, ঘোচেনি সংশয়। তাই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটে যাওয়া। নবচেতনার উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে সে-চেতনার বাহক বিবেকানন্দের মিলন হলো এই শহরে। এর পূর্ব পটভূমি শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে নরেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। এবং অবশ্যই তা কলকাতায়। [৩]

পরবর্তী দিনগুলিতে পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ কলকাতার নির্মম যে ছবি এঁকেছেন আপন অনুভবকে প্রতিফলিত করে তার সংগে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা দেখব বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে পরিকল্পনার অভাবে বেহিসেবী শোষণে দারিদ্র্য, বেকারি, সমাজজীবনে হতাশা, নৈরাশ্যবোধ কতটা তীব্র হয়েছিল। মূল্যবোধ নষ্ট হয়েছে, পারস্পরিক বিশ্বাসের দুয়ার হয়েছে রুদ্ধ: "মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে ছিন্নবস্ত্রে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অফিস হইতে অফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরংগ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখে দুঃখী হইয়া কোনদিন সংগে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ংগম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুইদিন পূর্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই-একজন বন্ধু সেদিন সংগে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি। শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হওয়ায় ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে নে, চুপ কর! ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকট ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে; আমারও একদিন লাগিত। কঠোর বোধ হইতেছে'।"[৪]

সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যংগ বলিয়া

স্বামীজীর বেদনাঘন অনুভবে গত শতাব্দীর আশির দশকের কলকাতার যে নির্মম, প্রেমহীন ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তার সংগে আজকের কলকাতারও মিল খুব বেশি। একশো বছর পরে সেই ছবি আরো স্পষ্ট হয়েছে। আজও বেকার কোন শিক্ষিত তরুণ যখন ক্লান্ত পদক্ষেপে হেঁটে যায় কলকাতার পথে, নিরীক্ষণ করে মনুমেণ্টের শীর্ষভাগ—তখন সে তার অজ্ঞাতে ছুঁতে পারে স্বামীজীর যন্ত্রণাকে।

---

[৩] ১৮৮১-র নভেম্বর মাসে সিমলার সুরেন মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

[৪] যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ১৩৪৮, পৃঃ ১৪৫-১৪৬

॥ ৩ ॥

হতাশাই শেষ কথা নয়, ব্যর্থতাও শেষ পর্যন্ত জীবনের অলঙ্কার হয়ে ওঠে—উত্তরকালে স্বামীজী নিজের জীবন মেলে ধরে তা প্রমাণ করে গেলেন। সন্ন্যাসীর গৈরিক বসনে, নগ্ন পায়ে ভারত পরিক্রমা করে স্বামীজী ভারত-আত্মার মর্মবাণী হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে। পৃথিবীর সব মানুষই অমৃতের সন্তান—এই বোধকে যখন স্বামীজী সম্প্রসারিত করে দেন পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে। কলকাতার যুবকের কণ্ঠে বিশ্ববাণীর উন্মোচনে তাঁর প্রত্যাবর্তনে চমকে ওঠে পৃথিবীর মানুষ। যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন সচকিত হয়েছিল কলকাতা। আনন্দে, উন্নত অহঙ্কারে আত্মহারা হয়েছিল কলকাতার মানুষ। সেকালের সংবাদপত্রগুলি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭-এ মাদ্রাজ হয়ে স্বামীজীর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের যে সংবাদ প্রকাশ করেছিল তা পাঠ করে প্রত্যক্ষ করা যায় সেদিনের কলকাতার জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনার ছবিটি—"গত শুক্রবার সকালে সুমহান হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা ও ইউরোপে দীর্ঘকাল কাটাবার পরে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন শিয়ালদহের রেল-স্টেশন উৎসবদিনের রূপ ধরেছিল।...শিয়ালদহের স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে, সংলগ্ন স্থানে, নিকটবর্তী সকল রাস্তায়, এক কথায় স্টেশনের চতুর্দিকে বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। প্রায় কুড়িহাজার লোক সমবেত হয়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষজন এসেছিল স্বামীজীকে সম্মান ও হৃদয়ের অভ্যর্থনা জানাতে। সমস্ত পথটি পতাকা, পত্রপুষ্প এবং বিজয়তোরণে সজ্জিত ছিল, যার উপরে স্বাগত বাণী লিখিত। পথিপার্শ্বে সকল বাড়ির বারান্দা, ছাদ, নরনারী-শিশুতে বোঝাই। ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে স্বামীজী এবং তাঁর কয়েকজন ইউরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে স্পেশাল ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে। চতুর্দিকে তখন উৎসাহ-উদ্দীপনার অবধি নেই, সবাই উদ্গ্রীব, কিভাবে এগিয়ে গিয়ে তাদের প্রিয় স্বামীজীর কাছাকাছি যাওয়া যায়। বিস্তৃত প্ল্যাটফর্মেও জনতার এমন প্রচণ্ড চাপ যে, অতি কষ্টে নিজস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে-দৃশ্য অতি গরিমাময়, যা সেখানে আগে কখনো দেখা যায়নি ; ব্যতিক্রম কেবল ঐ স্টেশনে লর্ড রিপনের আগমনের সময়ের ঘটনা। ঐ মহান ও জনপ্রিয় ভাইসরয়কে অসাধারণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। স্বামীজীর জন্য অনেক জায়গাতেই বিজয়তোরণ নির্মিত হয়েছিল। ঐ সব তোরণের উপরে নহবত বসেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় মঙ্গলরাগিণী। স্টেশন থেকে রিপন কলেজ পর্যন্ত পথ পত্র-পুষ্পমাল্যে সজ্জিত। সঙ্গীতও সেইসঙ্গে সর্বত্র। কনসার্টে নির্বাচিত সুরবিস্তার মোহিত করেছিল সকলকে। কয়েকটি সংকীর্তনের দলও উপস্থিত। স্বামীজী কামরা থেকে অবতরণ করা মাত্র বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমিতি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে একটি ফিটনে নিয়ে গিয়ে তোলেন। স্বামীজীর সঙ্গী এক ইউরোপীয় দম্পতিকেও গাড়িতে তোলা হয়। স্বামীজী এবং তাঁর বন্ধু ও শিষ্যদের মাল্যভূষিত করা হয়। তারপর তাঁদের নিয়ে ফিটন যখন ধীরে ধীরে বিরাট জনমণ্ডলীকে ভেদ করে অগ্রসর হলো, তখন হর্ষধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। স্বামীজীর পশ্চাতে চলল বাদকদল ও সংকীর্তনদলগুলি। তারপর গাড়ির স্রোত। সারা পথে উচ্চ উল্লাস-ধ্বনি।"[৫] ইণ্ডিয়ন মিরর পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের মতো অমৃতবাজার পত্রিকা, স্টেটসম্যান, বেঙ্গলী ও ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকাতেও সেদিনের উদ্দীপনার ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল। শুধু সংবাদপত্র নয় প্রত্যক্ষদর্শীর নানা বিবরণও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এঁদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ, তারকনাথ রায়, কুমুদবন্ধু সেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। কুমুদবন্ধু ছিলেন ঐদিন স্বেচ্ছাসেবক। পরবর্তী কালে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁর প্রথম যৌবনের স্মরণীয় সেই দিনটির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে : "ভোর

---

[৫] Indian Mirror, 21 February 1897

পাঁচটার সময় স্টেশনে পৌঁছাই স্বেচ্ছাসেবকরূপে—তখন দেখি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করা দায় —এত বিরাট জনতা এবং হ্যারিসন রোডে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির নিকট থেকে সমস্ত বাড়ির অধিবাসীরা ফুল পতাকা লতাপাতা দিয়ে সাজিয়েছিল। এদিকে সংকীর্তনের দল, নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীর দল এবং বিরাট জনতা।...যখন স্বামীজীর স্পেশাল ট্রেন এল, তখন মাননীয় আনন্দ চার্লু ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে পড়েই গেলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা কোনরকমে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। তখন চারুচন্দ্র মিত্র মশায় আমাদের আদেশ দিলেন, তোমরা স্বামীজীকে বেষ্টন করে আমরা যে রাস্তা দেখাচ্ছি সেই রাস্তা দিয়ে আমাদের অনুসরণ করে যাবে। আমরা তদনুসারে স্বামীজীকে ঘিরে ঘিরে চললাম। স্বামীজী পৌঁছানোমাত্রই চারিদিকে স্বামীজীর জয়ধ্বনি। চারুবাবু নির্দেশ দিলেন কোচম্যানকে ঘোড়া খুলে দিতে, এবং আমাদের গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে বললেন। স্বামীজী তাতে আপত্তি করলেন। কিন্তু চারুবাবু বললেন—আমরা আপনাকে সংবর্ধনা করছি, আপনার আপত্তি টিকবে না। এরা রিপন কলেজ পর্যন্ত অনায়াসে আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে।... আমরা জয়ধ্বনি করতে করতে পশুপতি বোসের বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি টেনে নিয়ে গেলাম। সেখানেও পুষ্পসজ্জিত বিরাট তোরণ।"৬

স্বামীজী সেদিন কলকাতার সর্বস্তরের মানুষজনের উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সাতদিন পর অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭-তে শোভাবাজার রাজবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপনকালে স্বামীজী ভাষণ দিতে উঠে বলেছিলেন—"তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসীভাবে উপস্থিত হই নাই, ধর্মপ্রচারক রূপেও নয়, তোমাদের নিকট পূর্বের ন্যায় সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের মতো সরল প্রাণে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি।"৭

সেদিনের নাগরিক সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতা সহ বাংলা এবং বহির্বাংলার বহু বিশিষ্ট মানুষ। ৩ মার্চ ১৮৯৭-এ 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিস্তৃত তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কে ছিলেন না সেই সভায়! রাজা, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সন্ন্যাসী, ফকির, সাধারণ নাগরিক এবং অবশ্যই যুবকেরা। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে এসম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছেঃ "ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক নগরীতে এর থেকে বড় বিশিষ্ট ব্যক্তিসমাবেশ হয়নি।" উপস্থিত যুবকদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায়নি তা। তাই সেদিনের ভাষণে স্বামীজী বারেবারেই কলকাতার যুবকদের সম্বোধন করে দেশসেবায়, মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেনঃ "কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগো, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে। ... উঠ, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। ...তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে স্মরণ রাখিও, আমি একসময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও একসময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমা-অপেক্ষা কত অধিক কার্য করিতে পারো। উঠ, জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্যস্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান।"৮ শেষের বাক্যটিতে স্বামীজী সারা দেশের মধ্যে কলকাতার যুবকদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, কর্মোন্মাদনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধের

৬ উদ্বোধন পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃঃ ৭০-৭২

৭ বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, (১৩৭১) পৃঃ ২০৫

৮ ঐ ঐ পৃঃ ২১৬

শুরুতে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে বাংলার বিপ্লবী যুবকদের জীবনে বিবেকানন্দের অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে সেই উদ্দীপনারই প্রকাশ উল্লিখিত।

কলকাতার বুকে স্বামীজীর উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ঐ একই বছরের ১ মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে। ঐদিন অপরাহ্ন ৩টের পর বলরাম বসুর বাড়ির দ্বিতলে সমবেত ভক্ত, শুভানুধ্যায়ীজনের সামনে মিশন প্রতিষ্ঠা, তার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলেছিলেনঃ “নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।...আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে ও কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একাজে সহায় হোন।”[৯]

॥ ৪ ॥

আজ সারা পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত। সেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা এই কলকাতা শহরে—এটা তিনশো বছরের এই নগর কলকাতার গর্ব করার মতো অন্যতম একটি বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামীজীর পদসঞ্চারে কলকাতা ধন্য হয়েছে। এই সূত্রে বিশ্বজন মাঝে কলকাতা পেয়েছে সাদর স্বীকৃতি। স্বামীজী ‘কলকাতারই ছেলে’ বলে গর্ববোধ করতেন। আসলে এই গর্ববোধ এই শহরের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ; সর্বোপরি এই কলকাতাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাতীর্থ। বিদেশ থেকে কিংবা এদেশের নানা স্থান থেকে স্বামীজী যখন চিঠিপত্র লিখেছেন তখন তিনি কলকাতার কথা নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বাংলা রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তর কলকাতার ‘ককনি’ ভাষা ব্যবহার করেছেন। কলকাতার কথ্যভাষা সাহিত্যরূপ পেয়েছে স্বামীজীর হাত ধরে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অগ্রগতি কলকাতা ও মাদ্রাজকে কেন্দ্র করেই ক্রমে প্রসারিত হবে সারা দেশে এবং বিশ্বে—সেকথা জোরের সঙ্গে স্বামীজী একাধিক চিঠিতে[১০] উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন কলকাতার কিছু কিছু মানুষের বিরোধিতার ও সঙ্কীর্ণতার মুখোমুখিও হতে হয়েছে স্বামীজীকে। সেই বিরোধীরা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়েছে, কালের যাত্রায় স্বামীজী হয়ে চলেছেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। ইতিহাস তারই সাক্ষী।

‘বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা’ যাঁর মধ্যে মিলেছিল, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন তাঁর গ্রামীণ ‘আইডেনটিটি’ হারাননি, তেমনি তাঁরই প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ ত্যাগ করেননি নিজস্ব পরিচয়। ইতিহাসের এ এক বিস্ময়—গুরু এবং শিষ্য দুজনে ভারতবর্ষের গ্রামীণ এবং নাগরিক দুই সভ্যতাকে বহন করে দাঁড়িয়ে আছেন। শতাব্দীর অধিক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আজ আমরা সঠিক জানি না শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে লোকজীবনের সঙ্গে কিভাবে পরিচয় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা জেনেছি বিবেকানন্দ সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজস্ব ভূমিকে কখনো ত্যাগ করেন না ; নগর কলকাতা তার ক্লেদ, মালিন্য আবার ঐশ্বর্য—সব নিয়েই তাঁর ভালবাসায়, তাঁর অহঙ্কারে স্থান পেয়েছে। তবু একটা গোপন ইচ্ছা মনের মধ্যে লালন করতে ভাল লাগে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর এখানে ঘটেছিল এবং পরবর্তী বহু মুহূর্ত অবতারবরিষ্ঠের সান্নিধ্যে তিনি এখানে কাটিয়েছিলেন। এই জন্যেই কি এই শহরের প্রতি বিবেকানন্দের এত ভালবাসা ?

---

[৯] বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১

[১০] পত্রাবলী (১৯৭৭), পত্রসংখ্যা—১২৬, ১৫১, ১৮৬, ৩২৪, ৩৩৬, ৩৪২

প্লেগের কলকাতায় নিবেদিতা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্লেগ! "মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।" কথাটা আক্ষরিক সত্য। সেই মৃত্যুশ্মশানের মধ্যে জীবনের বার্তা বহন করে বিবেকানন্দের দুই সন্তান কিভাবে বিচরণ করেছিলেন, সে কাহিনী বিচিত্র কাহিনীভরা কলকাতার ইতিহাসেও পরমাশ্চর্য-জনক। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, কলকাতার পৌরবিবেকের প্রথম সর্ববৃহৎ প্রকাশ দেখা গিয়েছিল বিবেকানন্দের দুই শিষ্য নিবেদিতা ও সদানন্দের মধ্যে।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্লেগের প্রথম আবির্ভাব। প্লেগ এমন মহামারী যা হাজারে হাজারে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে সামান্য সময়ে। মহারাষ্ট্রে প্লেগ-মহামারীর বীভৎস কাহিনী-গুলো কলকাতার বাতাসকে ভারি করে তুলেছিল। নিবেদিতা ৪ মে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে একটি লেখায় (লেখাটি এখনো অপ্রকাশিত) কলকাতার প্লেগ দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখেছিলেন, তার একাংশে আছেঃ

"সাধারণ মানুষ উদ্বেগে উন্মত্ত।...তাদের স্নায়ু-শিরা ছিঁড়ে যাবার মুখে—রুদ্ধ আক্রোশে তারা ফেটে পড়বে যেন—পাছে প্লেগের প্রতিষেধক-ব্যবস্থা চালু হয়ে অন্তঃপুরের গোপনীয়তা নষ্ট হয়, মাতা ও পত্নীদের মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়।"

একদিকে দাঙ্গা অন্যদিকে অগণিত মানুষের জ্ঞানশূন্য পলায়ন। সমকালীন সংবাদপত্রে সেই বিবরণের কিছু অংশঃ

"কয়েকদিন ধরে কলকাতায় ভয়ানক বিভীষিকার অবস্থা চলেছে।...আট লক্ষ লোকের বিরাট জনসমুদ্র যেন সহসা ভয়াবহ আকারে সংক্ষুব্ধ, আলোড়িত। শহরের বাইরে পালাবার জন্য প্রচণ্ড ব্যস্ততা।...ট্রেনে, স্টীমারে, পথে—শুধু দেখা যায় প্রবাহিত বিপুল জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের মধ্যে ২ লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে চলে গেছে। ধনী পর্দানসীনা মহিলাও পর্দা-বন্ধন সরিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটেছেন—মারাত্মক শহর থেকে বাঁচবার জন্য।" [মারাঠা, ৮ মে ১৮৯৮]।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্লেগ দ্রুত বিদায় নিয়েছিল—পুনরাগমনের সম্ভাবনাকে পিছনে রেখে। পরবর্তী আক্রমণের কালে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা কী দাঁড়াবে সে-বিষয়ে স্বামীজী নিবেদিতা প্রভৃতির সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন।

অপেক্ষমাণ প্লেগ ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। "কী ভয়ঙ্কর," নিবেদিতা ২৩মার্চ চিঠিতে লিখলেন, "চারিদিকে মানুষ মরছে অথচ কিছু করার নেই!"

না, কিছু করতেই হবে—স্থির করলেন "কলকাতার ছেলে" বিবেকানন্দ। ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বললেন "বাংলা দেশ সফর করে তিনি সকলকে উদ্দীপ্ত করবেন।...এই প্লেগ-সেবার কাজে যার মরণ হবে সে হয়ে দাঁড়াবে আমাদের আদর্শের স্তম্ভ।"

বিবেকানন্দের ইচ্ছার মর্যাদা রাখতে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে নিবেদিতা এগিয়ে এলেন। তারপর সেই ঘটনাটি ঘটল, কলকাতা-পুরাণের অন্তর্গত অপূর্ব কাহিনীটি—প্লেগ-রোগাক্রান্ত এক বালককে কোলে নিয়ে নিবেদিতা বসে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—যতক্ষণ না তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। আবির্ভূতা হলেন 'লোকমাতা'।

অন্তরঙ্গ মহল যখন নিবেদিতার ধন্যধ্বনিতে পূর্ণ তখন কিন্তু স্বামীজী কঠিন ভাষায় নিবেদিতাকে এই ধরনের আতিশয্যের কাজ থেকে নিবৃত্ত করলেন। কেউ প্লেগে আক্রান্ত হলে তার মৃত্যু হয়েছে ধরে নিতে হবে। তার শুশ্রূষার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় কাজ প্লেগের নিবারণ-ব্যবস্থা। স্বামীজী নিশ্চয় ভেবেছিলেন, অকারণ অ্যাডভেঞ্চারে নিবেদিতার মতো মহামূল্য জীবনের বিনাশ অনুচিত। তাছাড়া ভারতবাসীর জন্য প্রাণ দেওয়ার দায়িত্ব ভারতবাসীরই—বিদেশাগত এক নারীর নয়।

বস্তি পরিষ্কারই হবে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ—

স্বামীজী নির্দেশ দিলেন। সে-কাজ আরম্ভ হলো ৩১ মার্চ, গুডফ্রাইডের দিন। স্বামীজী নিজে এসে দরিদ্র পল্লীতে বাস করতে লাগলেন—জনগণের মনোবল বাড়াতে ও কর্মীদের উৎসাহ দিতে। সংগঠনী কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক একত্রে নিবেদিতা ; কার্যাধ্যক্ষ—স্বামী সদানন্দ, সহকারী—স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ।

প্লেগে আক্রান্ত বস্তির বর্ণনা দিয়ে সাহায্যের আবেদন জানালেন নিবেদিতা—ইংলিশম্যান ও স্টেটসম্যান পত্রিকায় দীর্ঘ বর্ণনামূলক চিঠি লিখে (৬ এপ্রিল)। কয়েকদিনের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন যা করেছে তার কথা সংবাদপত্রের চিঠিতেই নিবেদিতা বলেছিলেন ঃ "কয়েক মাইল দীর্ঘ গলি ও নর্দমা—তিন দিন আগেও যা ছিল জঘন্য নোংরা—আজ তার এমন চেহারা যে, ইংরেজ মহিলা পর্যন্ত সেখান দিয়ে নির্বিকারভাবে হেঁটে যেতে পারবেন।"

ঠিক আগের দিন (৫ এপ্রিল) নিবেদিতা এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেন, "একেবারে ভোর থেকে সদানন্দ বীরের মতো তার ঝাড়ুদার-বাহিনীর তত্ত্বাবধান করছে। তার কল্যাণে এখানকার বস্তি ও গলির নতুন চেহারা। গতরাত্রে প্লেগ সম্বন্ধে প্রচারপত্রগুলি এসে গেছে। আজ হবে সেগুলির বিতরণ—সেইসঙ্গে জীবাণুনাশকের বিতরণও।"

৭ এপ্রিল স্বামীজী হাজির হলেন নিবেদিতার আবাসে—প্লেগ-ব্যাপারে আলোচনার জন্য। স্বামীজীর ঐ দিনকার এক অসামান্য কথাচিত্র নিবেদিতার চিঠিতে ঃ

"...তিনি [স্বামীজী] ফেটে পড়লেন—কুসংস্কারের একটি কথাও নয় [নিবেদিতা স্বামীজীর কোষ্ঠীর কথা তুলেছিলেন]। কুসংস্কার তাড়িয়ে তার জায়গায় বসাতে হবে নির্ভেজাল অদ্বৈতকে।...ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝার মতো স্বামীজীর চেহারা—'কাজ চাই—কাজ, কাজ। এ সপ্তাহে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হোক। তুমি বক্তৃতা দেবে, আমি সভাপতি। সারা কলকাতার ছাত্ররা আসবে। তারা ঘর ছেড়ে বেরুবে, নিজের হাতে পরিষ্কার করবে শহর। তাদের ধরাতে হবে মৃত্যু-জ্বর। তার মানে বুঝতে পারো? গতকাল সারাক্ষণ নিজেদের ছোকরাদের সেই কথাই বোঝাচ্ছিলুম। তারা এখন চাবুক-খাওয়া শ্বাপদের মতো'।" (৮ এপ্রিলের চিঠি)।

পরিকল্পিত সভা হলো ২২ এপ্রিল শনিবার, বীডন স্ট্রীটের ক্লাসিক থিয়েটারে, খুব অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী এসেছিলেন। তিনি বেশি বলেননি—যেটুকু বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণ সত্যবচন এবং ধিক্কার—বাঙালীর বচন-সর্বস্বতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে ঃ

"...স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্রদের মনে অবিলম্বে সুস্পষ্টভাবে কাজ করার প্রয়োজনের কথা গেঁথে দেন। তিনি বলেন, এ-পর্যন্ত ঝুড়ি-ঝুড়ি তত্ত্বকথা মিলেছে, কিন্তু বাঙালীরা প্লেগ নিবারণের জন্য কোন কাজের কাজ করে উঠতে পারেনি। এক ইংরেজ সংবাদদাতা সম্প্রতি বাঙালীদের বিরুদ্ধে যে কঠিন সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন তাতে বাঙালীরা ক্ষেপে অস্থির। কিন্তু যতক্ষণ না তারা আলসেমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাস্তব কাজের দ্বারা নিজেদের মানুষ বলে প্রমাণ করছে—যতক্ষণ না তারা প্রমাণ করছে যে, তারা কাঁচের আলমারিতে ঢাকা সাজানো পুতুল নয়—ততক্ষণ তারা তাদের গায়ে ছিটানো কলঙ্ক দূর করতে পারবে না—স্বদেশের উপরে চাপানো গ্লানির মোচনও হবে না।" (ইংলিশম্যান, ২৪ এপ্রিল)।

নিবেদিতার ভাষণ একেবারে আগুন-ঝরা। সভাটি ছিল ছাত্রদের জন্য। "বিপুল সংখ্যায় ইউনিভার্সিটি-ছাত্রগণ, কিছু ইউরোপীয় মহিলা ও পুরুষ, বিভিন্ন কলেজের বেশ-কিছু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন।" সভার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা, এবং প্লেগ-প্রতিরোধ কার্যাবলীর কর্মী সংগ্রহ করা। নিবেদিতা বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরূপে এক্ষেত্রে আমাদের মনোভাব—যদি অন্য কিছু করতে নাও পারি—মানুষের বিপদে অংশ তো নিতে পারি।" ইতিমধ্যে কি কাজ আরম্ভ করেছেন সে-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—বাংলাদেশের নারীরা এই ভয়ঙ্কর মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে

এগিয়ে এসেছেন—সেখানে পুরুষেরা পিছিয়ে থাকবে? "ছাত্রগণ, তোমাদের মা ও বোনেরা দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে বিপন্নের করুণ ডাকে সাড়া দিতে হয়—সেখানে তোমরা সাড়া দেবে না?" বস্তিবাসীদের দুর্বিষহ জীবনরূপ বর্ণনা করেছিলেন তিনি—তার কিছু অংশঃ

"৩১ মার্চ স্বামী সদানন্দ ও তাঁর ঝাড়ুদার-বাহিনী বস্তি পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ করেন। আগে যা ভেবেছিলাম তারো চেয়ে জঘন্য অবস্থা। নর্দমাগুলি এমনই ভটভটে নোংরা যে, তাদের বর্ণনা অসাধ্য—সেদিকে কারো কোন নজর নেই। অনেক জায়গাতে সেগুলি বুজে বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ সংস্কার করা হয়নি—ফলে কাদা পাঁকের পুকুর—তা এগিয়ে এসেছে ঘরের দরজা পর্যন্ত যেখানে ছেলে-মেয়েরা খেলছে। একটি বিরাট বস্তির মধ্যে একটি পুকুর এমনই পূতিগন্ধময় যে, মাছগুলি মরে ভেসে উঠেছে।... এই বস্তিতে নর্দমার কোন বালাই নেই। একটা কোণের দিকে দেখা যায় আট-দশটা বীভৎস নালার মতো ব্যাপার। তিরিশ ফুট দীর্ঘ পাঁকের স্তূপের দুই প্রান্তে দুটি ঘর উঠেছে। এমন বস্তিতে প্লেগের সত্বর আগমন কি কোন প্রশ্নের বিষয়? জায়গাটা আমরা যথাসাধ্য পরিষ্কার করেছি, যদিও স্থায়ী কাজ কিছু করা সম্ভব হয়নি। আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি, অনেক ফুট উঁচু ময়লার ডাঁই—কত মাস বা কত বছর তাতে হাত পড়েনি কে জানে?... অসহ্য দুর্গন্ধ। শুনলাম, এই বিরাট বস্তিটিতে কয়েকদিন অন্তর একটি মেয়ে-ঝাড়ুদার আসে, তাকে আলাদা করে পয়সা দিতে হয়—কয়েক ঘণ্টায় সে যতটুকু পারে কাজ করে যায়। সর্বত্র দেখলাম, সব রকমের জঞ্জাল দরজার সামনে ফেলা হয়েছে ; আর প্রায়ই দেখা যায়—দুটি বাড়ির মাঝখানকার রাস্তাটি সাধারণ ডাস্টবিন। কাজ আরম্ভ করার সময়ে আমাদের বলা হয়েছিল, সব কিছুই আমাদের বিরুদ্ধে যাবে। এক ভদ্রলোক ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, 'নেটিভদের তুমি কদাপি পরিষ্কার করতে পারবে না।' এই ঘৃণাকে যুক্তিযুক্ত মনে করার কারণ কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখেছি, জনসাধারণ পরিচ্ছন্নতা-ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। হিন্দুদের ভিতর-বাড়ির পরিচ্ছন্নতা যিনি দেখেছেন তিনি কখনই ধরে নেবেন না যে, বাইরের নোংরা অবস্থা তাদের 'ইচ্ছার বস্তু।"

তবু বাড়ির বাইরে নোংরা জড় করা হয়—কেন? নিবেদিতার মতো, অবরোধপ্রথাই এর জন্য দায়ী। মেয়েরা ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারে না, সেইসঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দেওয়াও হয়নি। স্বার্থপর মালিকপক্ষের কাছ থেকে নিবেদিতা শুনেছেন, আবর্জনা পরিষ্কারের খরচের দায় বস্তিবাসীদেরই। রোষে বিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন, "ও-রকম কথা কেউ বলতে পারে? শুনে আমি স্তম্ভিত। বস্তির এই গরিব মানুষগুলি—দুবার টাকা দিচ্ছে, প্রথমতঃ বস্তি-মালিকের কাছে, দ্বিতীয়তঃ সুদখোর মহাজনের কাছে—তারা এমন গরিব যে, দুবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না—তারা পৃথিবীর প্রধান এক শহর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার নেবে?" তারপর অতি ভয়ানক ধিক্কার তাঁরঃ

"ধিক্ সেই ধনী লোকগুলিকে, যারা এইসব বস্তির মালিক। ধিক্ সেই পৌর-কর্তৃপক্ষকে, যারা ঐ সব মালিককে শাস্তি দেয় না।"

বক্তৃতার শেষে নিবেদিতা তরুণদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছিলেনঃ

"এই শহরে যারা নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয় এমন প্রতিটি মানুষের সাহায্য আমরা চাই। বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই এগিয়ে এস—প্রয়োজনীয় কাজ এখনই স্বহস্তে শুরু করে দিই। এই ধরনের কাজ লজ্জাজনক? না, এর গৌরব আমরা দেখিয়ে দেব জনসাধারণকে। কেবল এইভাবেই জনগণ জীবনসত্যের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের পতনের রূপ উপলব্ধি করবার মতো সবল মন অর্জন করবে। এক ধর্মোত্থানের মধ্যে রয়েছি আমরা। প্রেম ও বিশ্বাস এখন স্পষ্ট পরিস্ফুট আমাদের মধ্যে—এসেছে চরম আত্মত্যাগের আহ্বান। প্রভেদ করতে হবে বিশ্বাসের সঙ্গে

বিশ্বাসের—মৌখিক বিশ্বাসের সঙ্গে রক্তগত বিশ্বাসের। দুঃসাহস ও আত্মত্যাগের প্রহরেই সত্যকার বিশ্বাসের জন্ম হয়। কলকাতার ছাত্রবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে কতজন আছ যারা আমাদের ভ্রাতৃগণের জীবনের এই মহা দুর্দৈবের কালে বিশ্বাসের জ্বলন্ত শক্তি নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারবে? আমাদের মধ্যে এখানে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সগর্বে ভাবেন—আমরা যতই যা-কিছু করি না কেন কদাপি সেই পরম গুরুর [শ্রীরামকৃষ্ণের] দৃষ্টান্তের তুল্য কিছু ঘটাতে পারব না যিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও গভীর রাত্রে মেথরের বাড়ি গিয়ে নিজের মাথার চুল দিয়ে তার পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন। সে-ধরনের সেবা সাধারণ তপস্যা নয়—তপস্যার শিরোরত্ন। সে কাজ সম্ভব নয়। তবু তোমাদের মধ্যে কতজন আছ বল যারা বস্তি পরিষ্কারের কাজে এগিয়ে আসবে? এক্ষেত্রে যদি উঠে দাঁড়াতে হয়—একসঙ্গে উঠব; যদি লুটিয়ে পড়তে হয়—একসঙ্গে পড়ব। বিপদের দিনে যে-মানুষ নিজের ভাইকে ত্যাগ করে, অচিরে দুর্ভাগ্য গ্রাস করে তাকে। দরিদ্রের প্রয়োজনই আজ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন—এস, বাস্তব কাজের দ্বারা আমরা তা প্রমাণ করি।"

প্লেগ সম্বন্ধে নিবেদিতা অনেকগুলি চিঠি এবং একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আমরা লক্ষ্য করব—বস্তি-পরিষ্কারের কাজের উদ্দেশ্য সামাজিক চেতনাসৃষ্টির প্রয়াস পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। ঐ কাজের মধ্য দিয়ে স্বামীজী এবং নিবেদিতা উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে ব্যবধান কিছুটা দূর করার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। উচ্চ ও নিম্নের মধ্যে ব্যবধান এমনই বেশি যে, নিবেদিতা একদিক থেকে প্লেগকে আশীর্বাদ বলেও মনে করেছেন। 'প্লেগ' নামক একটি রচনায় ('স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইসটার্ণ হোম' গ্রন্থে সঙ্কলিত) তিক্ত বিষাদের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন, প্লেগের ঝাড়ুদার মেথর প্রভৃতি লোকের দারুণ দাম; মেথরদের ছোট-ছোট ছেলেরা এখন পূর্ণবয়স্কের মজুরি পাচ্ছে—তাদের সহযোগিতা পাবার জন্য সকলে ব্যস্ত। "সুতরাং প্লেগের অন্যতম, সেইসঙ্গে সর্বোত্তম দান হল, নিম্নবর্ণের মানুষদের মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া!!...এই ধরনের মহামারীও তাহলে ভারতে বৃটিশ শাসনের চূড়ান্ত অভিপ্রায়কে ত্বরান্বিত করছে—ভারতীয় জনগণের গণতন্ত্রলাভ!!!"

এই প্রবন্ধে বস্তির আরও ভয়াবহ বর্ণনা ছিল। সে বস্তুবাদী সাহিত্যের বিবরণ এখানে স্থগিত থাক। কিন্তু লক্ষ্য করতেই হয়, বস্তিতে কাজ করার সময়ে সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতার মনের চিন্তাভাবনার রূপটিকে। বস্তিবাসীদের চেহারায় নিবেদিতা কোন অনার্যলক্ষণ দেখতে পাননি—অথচ উল্টোদিকে, ভারতীয় জাতিভেদ যে কর্মভেদ থেকে আসেনি, তা এসেছিল রক্তভেদ থেকে—এই কথাটা বোঝাবার জন্য ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকদের উৎসাহের সীমা ছিল না। উৎসাহের কারণ—জাতিভেদ যদি রক্তভেদ থেকে আসে তাহলে ভারতে অগণ্য জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায় এবং অখণ্ড জাতীয়তার দাবিকে নস্যাৎ করা সহজতর হয়।

নিবেদিতা অগ্রসর হয়েছিলেন জাতীয়তার প্রশ্নে। স্বামীজীর মতোই তাঁর বক্তব্য—ভারতের দুর্বলতার মূলে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের প্রতি অত্যাচার। পতিতকে উত্থিত করার উপরেই ভারতের নবজন্ম নির্ভর করছে। তিনি বললেনঃ "Surely one of the great secrets of the weakness of India lies in the fact that the Motherland has never in the past found means to voice in any special way her love of the feeble and the outcast and the disinherited amongst her children. Let us pray that we, of the new generation, may live to see the beginning of a different state of things. We mean to hold on to the priceless traditions of our national past, but we mean to create others too, just as good, to feed our national future."

নিবেদিতার নানা উক্তির কথা জানলাম। কর্তব্য

সম্বন্ধে অনেক উপদেশ-নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। সকলের সঙ্গে নিজে কাজও করেছেন। তবু ছবিটা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তা সম্পূর্ণ করবার জন্য বিখ্যাত মানবতাবাদী চিকিৎসক ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর-এর বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করতেই হচ্ছে সব শেষেঃ

“একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম—দ্বারপথে ধূলিধূসর কাষ্ঠাসনে একজন ইউরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। তাঁহার পরিধানে গৈরিকবাস [নিবেদিতা ক্রীম রঙের গাউন পরতেন], গলদেশে রুদ্রাক্ষমাল্য, আননে দিব্য দীপ্তি। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা—একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন।

“সেইদিন প্রাতে বাগবাজারের কোন বস্তিতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম নিষ্ঠুর ব্যাধি পূর্বেই শিশুকে করিয়াছিল। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। তাঁহার প্রতি কথায় ব্যাকুল করুণা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন। বাগদীবস্তিতে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা সম্ভব তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র জীর্ণ কুটিরে, নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন—তিনি স্বীয় আবাস ত্যাগ করিয়া সেই কুটিরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। গৃহ পরিশোধিত করা প্রয়োজন—তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া গৃহে চুনকাম করিতে লাগিলেন। ঔষধ-পথ্য সবই তিনি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুই দিন পরে মাতৃহীন শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহতপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।”

বিজ্ঞান সংবাদ

কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে সাম্প্রতিক গবেষণা

ভাইরলজি বিভাগঃ বসন্ত ও জাপানীজ এনকেফালাইটিস-এর ক্ষেত্রে এই গবেষণার অবদান সর্বজনস্বীকৃত। সম্প্রতি ভাইরাল হেপাটাইটিস, যার ফলশ্রুতি জন্ডিস, তার গবেষণায় জানা গেছে যে, কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হেপাটাইটিস ‘এ’, ‘বি’, ‘না এ না বি’ ও ‘ডেল্টা ভাইরাস’ সমানভাবে ক্রিয়াশীল। এতৎ অঞ্চলে যকৃতের ক্যানসার ও উদরীরোগ (cirrhosis of liver)-এর পশ্চাৎপটে হেপাটাইটিস্ ‘বি’ ভাইরাসের কার্যকারিতাই প্রধান। এও দেখা গেছে কলকাতা ও তার সংলগ্ন পরিবেশে আপাতসুস্থ জনসমাজের ৩.৮% শতাংশ অজান্তে রক্তের মাঝে ‘বি’ ভাইরাস বহন করছেন। পরিণামে তাঁরা অজান্তে তাঁদের স্ত্রী এবং গর্ভস্থ সন্তানকে এই রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আবার তাঁরা রক্তদান করে গ্রহীতাকে এই রোগ দিচ্ছেন। এখানে ‘ডেল্টা ভাইরাস’-এর অবস্থিতিও নিশ্চিতভাবে ধরা পড়েছে। গ্রাম বাংলায় অতীতে বিভিন্ন সময়ে জন্ডিস-এর যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তার মূলে ছিল হেপাটাইটিস ‘এ’।

‘এইড্‌স’ রোগের ভাইরাস গবেষণায়, পশ্চিমবঙ্গে ‘এইড্‌স’ হতে পারে এরকম জনগোষ্ঠীতে সমীক্ষা চলছে। পাঁচ হাজারেরও বেশি রক্ত পরীক্ষায় মাত্র পাঁচজন সংক্রামিত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন আফ্রিকান ছাত্র, দুজন ভারতীয় নাবিক ও একজন মুমূর্ষু রোগী, যিনি দীর্ঘদিন আফ্রিকায় কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ব্যাকটেরিওলজি বিভাগঃ ভিব্রিও প্যারাহিমোলিটিকাস নামে একটি নূতন জীবাণু আগে সমুদ্রের জলে পাওয়া গিয়েছিল। এখন এটিকে পুকুর ও নদীর জলেও পাওয়া গেছে। এরা সকলের পেটের অসুখ করায় এবং মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। কলেরা জীবাণু ছাড়া আরও আটটি জীবাণু পাওয়া গেছে যারা কলেরার মতো রোগ সৃষ্টি করে।

কবিতা

সঙ্গে আছি

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা তুই কোল পেতে যেই ডাকলি সেদিন
গ্রামের তরুণ বাউণ্ডুলে হুলস্থুলু এল ছুটে
তোর বাহারি রূপের আঁচে ঝলসে উঠে
গাণ্ডেপিণ্ডে প্রাণের খিদের আশ মেটালো।

নানান চোখের পর্দা জুড়ে নানান রকম
মূর্তি দেখে চমক লাগে ও মোহিনী
কণ্ঠনালীর মধ্যে চলে যন্ত্রদানব
বছর ভরেই অসুস্থ তুই ? কি জ্বালাতন
হরেক জাতের ডাক্তারেরা বুকের উপর
কাটছে এবং ছিঁড়ছে তোকে নিজের মতন
হায় জ্বালাতন, হায় জ্বালাতন, ব্যোমভোলা মন।

এখন বড়ই বিষণ্ণ আর গোমড়ামুখো
গুমসে আছি—কিচ্ছুতে আর ভাল্লাগে না।

সর্বনাশী! সর্বনাশে ডুবলি নাকি ?
কি দশা এই দেহের হা—হা—কি দশা রে!

তবু আমার প্রিয় রে তুই প্রাণহারিণী
তোর রন্ধ্রে বাঁচি, গন্ধে বাঁচি—ছন্দে নাচি
লক্ষ-হাজার অভাবে তোর সঙ্গে আছি ॥

এ নহে নয়নের ভুল

মানসী বরাট

বন্ধু, এ নহে মোর নয়নের ভুল,
কখনো সখনো হেথা—
ফুটে থাকে বসন্তের
প্রত্যূষের হেমন্ত-শিশিরে—
পলাশ, শিমুল।
কখনো সখনো হেথা
দেখা যায় বাসন্তী-দখিনা বাতাস
শোনা যায় হেমন্তের রিক্ত হুতাশ্বাস ॥
বর্ষার ঢল নামে সূর্যের চোখে,
পৃথিবী-শরীর কাঁপে
কান্নার ঝোঁকে।
হিমেল হাওয়ার দিনে
ঝরে পড়া গানের বকুল—
বেদনার বারিধারে ভরে দেয়
গঙ্গার একূল ওকূল।
চার্নকের স্বপ্ন দিয়ে গড়া—
এ নগরী অনেকের
সুমহান স্বপ্ন দেয় গড়ে।
আবার আঁধার ম্যাঝে,
মিলনের বাঁশি বাজে,
হেথা নিত্য
খরশান-বৈশাখী-ঝড়ে ॥

কলকাতা

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তোমার মধ্যে কলমীলতা জন্মে আছে
ইঁট পাথরের শরীর তবু একটি ডগা
সাঁতরে বেড়ায়। ট্রামলাইনের লোহার
চুড়ি, গলায় তোমার গঙ্গানদী
হারের মতো। ইতিহাসের রক্ত তোমার
আলতা পায়ের। সবুজ শাড়ি,
হলুদ পাখি, চক্ষে তোমার শিশির
ছুঁয়ে। ময়দানটা বিবেক তোমার
পরম আয়ু সবার মধ্যে।
তা সত্ত্বেও নিন্দে তোমার ভাগ্য
জুড়ে। নিন্দে মন্দ পরমানন্দ সবই
সমান। তোমার কাছে সবই সমান।
কলমীলতা যখন আছে শরীর
জুড়ে। টানতে পারো গঙ্গাফড়িং
এবং মানুষ ; সকল মানুষ টানতে
পারো সবুজ টানে। নিরাকার এই
কলমীলতা ছুঁয়েই থাকে
দিনরাত্তির ছুঁয়েই থাকে।

তিনশো বছর ধরে তুমি

নিমাই মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, তোমার তিনশো বছর বয়স হলো।
এখন আর তোমায় রাস্তায়
জল দিয়ে স্নান করাতে হয় না,
এখন তুমি নিজেই স্নান কর মানুষের পায়ের ধুলোতে।
ফার্স্ট ট্রামের মিষ্টি আওয়াজে যখন ঘুম ভেঙে যেত
শুনতে পেতাম রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ।
বৈশাখের তপ্ত দুপুরে চীনা ফেরিওয়ালারা হাঁক দিত
বাসনওয়ালারা ঠং ঠং আওয়াজ করে
যেত হেঁটে
সন্ধ্যায় বেল জুঁয়ের মালা আর কুলফী বরফ বিক্রি করতে আসত সেই লোকটা,
—কোথায় সব হারিয়ে গেল!
কত মহাপুরুষের পায়ের শব্দ তুমি শুনেছ,
দেখেছ তোমার বুকে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষ করছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই।
এক একটা শতাব্দী অতিক্রম করেছ
ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নাম লিখে,
কত শহীদের রক্তে তোমার রাস্তা লাল হয়ে গেছে—
তুমি সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ।
তিনশো বছর বড় দীর্ঘ সময়
তুমি বোধহয় জীর্ণ হয়ে পড়েছ।
তাই তোমায় সাজানোর ব্যবস্থা
উঁচু উঁচু বাড়ি দিয়ে, ফ্ল্যাইওভার দিয়ে।
কিন্তু এখনো তুমি সেই তো আছ!
গঙ্গার ধারে এখনো প্রতিদিন ভোরে
উচ্চারিত হয় মন্ত্রধ্বনি,
সন্ধ্যায় এখনো কোন কোন ঘরে বাজে শাঁখ,
এখনো সেই পুরনো ট্রাম লাইন ধরে ধিক ধিক করে যায় হেঁটে।
অন্যদিকে তুমি কত আধুনিকা!
তোমার বুকের ভিতর দিয়ে গেছে মেট্রো রেল
কত নতুন নতুন জিনিস তুমি অম্লান হাসিতে করেছ গ্রহণ।

বুকের ভেতর একরাশ ভালবাসা নিয়ে
জন্মেছিলে তুমি কলকাতা।
তিনশো বছর পরেও তা কমেনি একটুও।
তুমি এখনো সবাইকে তোমার বুকে টেনে নাও
ফিরিয়ে দাও না কাউকেই,
তুমি জান না ফিরিয়ে দিতে।

রূপ ও রূপান্তর

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

গঙ্গার গ্রামীণ কূল পূর্বস্থলী পলিতে পেলব—
অদূরে সুন্দরবন, ওপাশে তো রাজবংশী সব,
এ পাশে যে তন্তুজীবী আর বৈশ্য বিচিত্র বেসাতি
কালী-পীঠে শাক্তশক্তি—ব্রাহ্মণাদি বৈষ্ণব সুমতি।

জঙ্গলের জমিজমা, মেঠোবাড়ি, ডোবা—মশামাছি,
কয়েকটা পাকাকোঠা, কয়েকটা খোড়ো চালে বাঁচি—
যোগসূত্র অগণিত বছরের নাগরিক কত
প্রজন্মের ব্যবধানে নগরের দৌলতে আপাতত।

পেছনে রয়েছে সব, গঙ্গায় জাহাজ যত ভেড়ে
পাতাল বা চক্ররেল দ্বিচক্রযানে যে ভিড় বেড়ে—।
আকাশ অসীম ছোঁয়া ক্রমেক্রমে বহুতলবাড়ি
তেলের আলোর থেকে গ্যাস নয় বিজলী সম্ভারী!

সিঁড়ি নয়—ঊর্ধ্বগতি অনায়াস নিমেষে স্থাপন,
দূরভাষ কথা কানে, বেতার বা দূরদর্শী হন।
মহামনীষীর বহু মিছিলের স্মৃতিতে সোনালী
কালের গঙ্গার ধারা নিরবধি বিপুলা বিশালী।

কলকাতা ঃ কাব্য, কবিতা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনে

সঙ্কলক ঃ পলাশ মিত্র

ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক সমাজতত্ত্ববিদের চোখ দিয়ে যে-কলকাতাকে আমরা এযাবৎ দেখেছি বা দেখে আসছি, তার সঙ্গে কবির চোখ দিয়ে দেখা কলকাতার পার্থক্য অবশ্যই আছে। নানা মানুষের নানা বিশেষণে কলকাতা কখনো নন্দিত, কখনো নিন্দিত। কিন্তু কলকাতা—রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'কলকাতা সেই আছে কলকাতায়।'

এবং কবিরা? সেই কবে থেকে কলকাতা নিয়ে কত কবি কত কবিতা লিখেছেন। আজও তার বিরাম নেই। কলকাতা নিয়ে বা কলকাতাকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক কাব্যপঙ্‌ক্তি প্রবাদ-প্রবচনের মতোই জনমানসে প্রাণময়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেড়শো বছর আগে যেমন লিখেছিলেন 'রেতে মশা দিনে মাছি, এই তাড়য়ে [তাড়িয়ে] কলকাতায় আছি'; এ কালের এক উজ্জ্বল আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ তেমনি লিখলেন 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।'

কলকাতা আদৌ তিলোত্তমা হয়েছে কিনা বা ভবিষ্যতে কতখানি হবে, সে-বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়, কলকাতার জন্য কবিদের একটা আলাদা মমতা আছে। কলকাতা নিয়তই হাতছানি দিচ্ছে কবিকে।

এখানে কলকাতা সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ের বেশ কিছু কবিতা সংকলিত হলো। পঞ্চদশ শতকের কবির কবিতা দিয়ে এই রচনামালার শুরু।

যেসব কবিতা এখানে সঙ্কলিত হলো, তার কোনও শিরোনামা প্রদত্ত হলো না। অনেক কবিই শিরোনামা দেননি, আবার অনেকের শিরোনামা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অন্য বিষয়ের বর্ণনার সূত্রেই এসেছে কলকাতা-প্রসঙ্গ। উদাহরণতঃ বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম ও দীনবন্ধু মিত্রের কবিতার কথা বলা যায়। এখানে তাই নতুন শিরোনামা দিয়ে খোদার ওপর খোদকারি করা হয়নি।

সঙ্কলিত কবিতাগুলি মূল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এর বাইরে আরও উল্লেখযোগ্য কবিতা থাকা সম্ভব। এগুলি আমাদের গোচরে এলে সংযোজন পর্যায়ে ভবিষ্যতে তা প্রকাশের বাসনা রইল। এবিষয়ে সুধী পাঠকবৃন্দের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ, দাদাঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন এবং তার পরে সুকান্ত ভট্টাচার্য ও তরুণ কবিরা কলকাতা নিয়ে কবিতার মাধ্যমে নিজেদের যে-অনুভূতি তুলে ধরেছেন, ঐতিহাসিক ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকেও তার গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়াও আছে লোককবির কবিতা ও গান। এই সব লোককবির প্রতিবাদী চরিত্র কলকাতা-বিষয়ক কবিতাকে আরও জীবন্ত ও উজ্জ্বল করেছে।

বিশ্ব জয় করেও স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে বলতেন 'কলকাতার ছেলে।' ভালমন্দে-গড়া, সমস্যাজর্জর অথচ আশা ভালবাসায় উদ্বেল কলকাতাকে নিয়ে আমাদের তাই স্বপ্নের শেষ নেই।

বিপ্রদাস পিপলাই

মূলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর।
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর॥
চাপদানি ডাহিনে বামে ইচ্ছাপুর।
"বাহ" "বাহ" বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর॥
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষুড়ি পশ্চিমে॥
চিতপুরে পুজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশি দিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥
কালীঘাটে চাঁদরাজা কালিকা পুজিয়া।
চূড়াঘাট বাইয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥

বিপ্রদাস পিপলাই বা পিপিলাই পঞ্চদশ শতকের কবি। চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের কাছে বাদুড়িয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কবিদের অন্যতম ইনি। এ যাবৎ তাঁর যে দুখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে মনে হয় ১৪৯৫ খ্রীঃ তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। 'মনসাবিজয়' কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য উপলক্ষে বিপ্রদাস যেসব পথঘাটের কথা বলেছেন, সেখানে কলকাতার পথঘাটও বাদ যায়নি। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, তিনিই বোধ হয় প্রথম বাঙালী কবি, যাঁর কাব্যে কলকাতা উল্লেখিত।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায় ॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥
ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥
বালুঘাট এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন ॥

মুকুন্দরামের আবির্ভাব ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে। মঙ্গলকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনশিল্পী তিনি। মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে একখানি কাব্য সঙ্কীর্ণ ধর্মগত প্রয়োজন ছাড়িয়ে সার্বভৌম রসস্বীকৃতি লাভ করেছে, তা মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চন্ডী'। এ-মন্তব্য কবিকঙ্কণ-চন্ডীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে বলে গৃহীত হয়েছে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার অংশে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের বিবরণ উদ্ধৃত কবিতায় বর্ণিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

গিয়াছিনু কলিকাতা যা দেখিনু গিয়ে তথা
কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা এই হলো শেষে
ভদ্রলোকের ছেলে যত কদাচারে সদা রত
সুরাপানে অবিরত,
কত মত কৃচ্ছ্র দেশে দেশে
কাঙালী বাঙালী ছেলে, ভুলেও না বাঙলা বলে
ম্লেচ্ছ কহে অনর্গল,
তেড়িয়া হয়ে পথ চলে,
কাছ দিয়া গেলে বলে
গো টো হেল।
পেন্টুলন জাকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে
সদাই চাবুক করে, মুখে বোল ইয়েস বেরি ওয়েল
এবে করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেই ক্ষণ,
করিলাম নিরীক্ষণ
কোন্ ধামে নব্য ভব্য বাবু কতজন। (অংশ)

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন। "ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist।" লোককবিদের গুরুস্থানীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি ও কাব্যকবিতার আসরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর 'রেতে মশা দিনে মাছি, এই তাড়য়ে কলকাতায় আছি'—লাইন দুটি প্রবাদ-প্রবচনের মতো আজও অম্লান। আলোচ্য কবিতায় কলকাতার সভ্যতাকে নির্মম ব্যঙ্গে চিত্রিত করেছেন তিনি।

রূপচাঁদ পক্ষী

ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর
পশ্চিমে জাহ্নবী দেবী দক্ষিণে গঙ্গাসাগর।
পূর্বে বাদা চিংড়িহাটা পদ্মানদী তদুত্তর ॥
হেস্টিংস ব্রীজ বাগবাজার, এই আয়তন তার
সারকিউলার রোড, পোরমিট ধার, চতুঃসীমা সার ॥
অতুল্য মর্ত্য-ভুবনে বৈকুণ্ঠ যায় হার মেনে,
হেরে টেলিগ্রাফ, বলে বাপ, লাজে লুকায় পুরন্দর,
তারেতে তার, বর্ণ বিস্তার,
ধন্য শিল্পী কারিগর ॥

উড়িষ্যার চিল্কার মহাপাত্র বংশে রূপচাঁদের (১৮১৫—১৮৮৮) জন্ম। আসল নাম রূপচাঁদ দাসমহাপাত্র। বাংলার প্রচুর গান লিখেছেন ইনি। বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনার জন্য এঁর খ্যাতি ছিল। কলকাতায় আগমনের পর ছাতুবাবুর সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব হয়। নানা ধরনের গান ইনি রচনা করতেন ও গাইতেন। 'রূপচাঁদ পক্ষীর দল'-এর গান তখন কলকাতাকে উল্লসিত করত। এখানে উদ্ধৃত কবিতাটির মূলের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা শতাধিক। কালীঘাটের কালীমাতা, বাগবাজারের

মদনমোহন থেকে স্বর্ণময়ী, রানী রাসমণি, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর, হাইকোর্ট, টাউন হল, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট—কত কিছুই না এই কবিতার বিষয়! রূপচাঁদের 'কলিকাতা বর্ণন' কবিতা থেকে আমরা প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে ধরলাম।

দীনবন্ধু মিত্র

এই বেলা একবার তুলিয়ে শরীর,
দেখ গঙ্গে, অপরূপ শোভা নগরীর ;
জ্বলিতেছে দীপপুঞ্জ, দুলিতেছে পাখা,
গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা ;
মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যায়,
ঝরা-তারা-গতি যথা আকাশের গায় ;
অনুমান, কলিকাতা করিয়াছে সাজ,
পরিয়াছে হীরা মণি পান্না পেসোয়াজ,
নাচিতেছে তব কাছে ভঙ্গিমায় ভরি,
শচীর সমীপে যথা উর্ব্বশী সুন্দরী।
নগরী-ভিতর মাতা অতি চমৎকার,
মন্দাকিনী-রূপ ধরে দেখ শোভা তার ;
কত বাড়ি কত বর্ত্ম সংখ্যা নাহি হয়,
নিবসে বিবিধ-দেশ-মানব নিশ্চয়।
ভাল জল লালদীঘি হিম সরোবর,
চারিধারে ফুলবন শোভা মনোহর,
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর সোপান,
চৌদিকে লোহার রেল শূলের সমান ;
তার পর রাজপথ অতি পরিসর,
তার পরে হর্ম্যমালা দীর্ঘ কলেবর,
চারিদিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর,
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর।

দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০—১৮৭৩) নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, জামাই বারিক তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকটি দীনবন্ধুকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁকে 'রঙ্গালয়ের স্রষ্টা' বলে নমস্কার করেছেন। ইতিহাস-সৃষ্টিকারী স্বনামখ্যাত নাট্যকার হয়েও কবিতা রচনা থেকে তিনি বিরত থাকেননি। তাঁর 'সুরধুনী কাব্য'র পরিচিতি আছে। এ ছাড়াও দ্বাদশ কবিতা, বিবিধ কবিতা, কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন তিনি। সুরধুনী কাব্যের [১ম ভাগ ১ম থেকে ৮ম সর্গ জীবনের শেষ দিকে ১৮৭১ খ্রীঃ এবং ২য় ভাগ ৯ম থেকে ১০ম সর্গ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত] দশম সর্গের ছশো ছাব্বিশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে হুগলী চন্দননগর বৈদ্যবাটী শ্রীরামপুর-সহ কলকাতার নানা স্থান মানুষ ও কীর্তিকথা স্থান পেয়েছে। আমরা কিছু অংশ তুলে ধরছি।

বলদেব পালিত

অবশেষে কলিকাতা উদিত নয়নে
ভারতের রাজধানী ইংরাজ শাসনে।
সম্মুখে নিরখি শুধু মাস্তুলের বন
জাহাজে জাহাজে ঢাকা তোমার বদন।
উপরে উন্নত হর্ম্ম্য শোভে সারি সারি
সংখ্যা করি কভু আমি ফুরাতে কি পারি ?
যেদিকে ফিরাই আঁখি করি দরশন
নূতন নূতন ধারা ইষ্টক ভবন।

বলদেব পালিত (১৮৩৫—১৯০০) উনিশ শতকের গীতিকবি। এখানে উদ্ধৃত কবিতাটি কবির কাব্যমঞ্জরী (১২৭৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। কবিতাটির নাম 'গঙ্গার প্রতি।'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলির সহর কলকাতাটির পায়ে নমস্কার
যার জাঁকজমকে ভাগীরথীর দুধার গুলজার,
যার কোলের কাছে ঘাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান
যার মাঠের ধারে বাড়ির বাহার দেখলে জুড়োয় প্রাণ,
যার পাথর ইঁটে পথ বাঁধানো 'ফুটপথ' দোধারি
যার পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি,
যার তিন দিকে জল সহর ঘেরা উত্তরে বাহালি
আহা বাগবাজারের খালের সীমা অগ্নিকোণে কালী
আর অজ্‌ দখীনে আদি গঙ্গা টালির নাল হালি।

বৃত্রসংহারের কবি হেমচন্দ্র (১৮৩৮—১৯০৩) কথ্যভাষায় লঘু ছন্দে সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বহু সরস ও উপভোগ্য কবিতাও লিখেছেন। এখানে মুদ্রিত কবিতাটি 'হুতোম প্যাঁচার' গান বা 'কলির সহর কলকাতা' নামে ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পুরো কবিতাটি ছিল ছেচল্লিশ পঙ্‌ক্তির।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রানী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে, পয়সা দেবে না।
ঠোঙা করে শালপাতাতে
চাট দেবে হাতে হাতে
তেলমাখা মটর ভাজা মোলাম বেদানা।

কলকাতার মানুষের জীবন, বিশেষ করে তাদের রক্ত-মাংসের জীবনের কামনা-বাসনা গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪—১৯২২) নাটকে যেভাবে জীবন্ত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ নাট্যশালাকে ধনীর জলসাঘর থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন গিরিশ। কলকাতা তার হাসি-কান্না নিয়ে গিরিশের নাটকে ধরা পড়লেও, গিরিশের নাটক কলকাতার কণ্ঠস্বর—এমন যথার্থ উক্তি শোনা গেলেও, মহাকবি গিরিশচন্দ্র কিন্তু কলকাতা নিয়ে কবিতা লিখেছেন বলে জানা নেই। তবে 'প্রফুল্ল' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে একটি গানের মাধ্যমে কলকাতার যে-ছবি তিনি এঁকেছেন, এখানে সেটি তুলে ধরা হলো। 'প্রফুল্ল' প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে, ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৬ বৈশাখ।

অজ্ঞাত কবির ছড়ায় ও প্রবাদ-প্রবচনে কলকাতা

১। কালির অক্ষর নেইক পেটে চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।

২। কলকাতার ছিষ্টি গুড়ে নেই মিষ্টি, তেঁতুলে নেই টক কলকাতার ঢপ।

৩। মিথ্যে কথার কিবা কেতা আজব শহর কলিকাতা।

৪। যার নেই পুঁজিপাটা সে যায় বেলেঘাটা।

৫। ময়রা মুদি কলাকার এই তিন নিয়ে বাগবাজার।

৬। বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা গুলির কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা চণ্ডুর বৌবাজারে।
এই সব মহাতীর্থ যে চোখে না হেরে,
তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।

৭। মাটি বাটি মিথ্যে কথা এই তিন নিয়ে কলকাতা।

৮। দেখো মেরি জান, কোম্পানি নিশান
বিবি গৈয়ে দমদমা উড়ি হৈ নিশান।
বড়া সাহেব ছোটা সাহেব বঙ্কা কাপ্তান
দেখো মেরি জান লিয়া হৈ নিশান।

৯। কালী গৈয়ে কলকাত্তাকি যিনকে পুজা ফিরিঙ্গি কিন্,
বাঙ্গালিকো মুলুক ধনদৌলত দখল করলিন।

১০। আজব সহর কলকেত্তা।...
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির ফাঁদ পাতা।

বহু অজ্ঞাতনামা কবি ও ছড়াকার কলকাতা নিয়ে নানা স্বাদের রচনা লিখেছেন এখানে তারই কিছু নিদর্শন। তবে প্রথমটি বাঙলা প্রবাদ হিসাবেই প্রচলিত এবং প্রবাদগ্রন্থ থেকে এটি সংকলিত। দুই ও তিন নম্বরটিও প্রবাদ-প্রবচন। আট নম্বর ছড়াটি প্রকৃতপক্ষে গান। ক্লাইভের শিশুসন্তানকে দোলনায় শুইয়ে মুসলমান ধাত্রী এই গানটি গাইতেন। নয় নম্বরটিও ছড়া নয়, গান। পলাশী যুদ্ধের পরের ঘটনাঃ ইংরেজরা মহানন্দে ক্লাইভকে নিয়ে যাত্রা করল কলকাতার দিকে। কালীমায়ের মন্দিরে পুজা দিতে এসে হিন্দুস্থানী সেপাইরা গেয়েছিল এই গানটি।

এবং সব শেষে (১০ সংখ্যক) 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' থেকে বাউলের সুরে কলকাতার চরিত্র-বিষয়ক একটি গান। 'হুতোম প্যাঁচা' ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০—১৮৭০) জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। বহু গুণের আধার এই জমিদারসন্তান মাত্র তিরিশ বছরের জীবন-সীমায় বাঙলা সাহিত্য ও সমাজজীবনে অভাবিত আলোড়ন তুলেছিলেন। নিজে ঐশ্বর্যের কোলে জন্ম নিয়েও ধনিকসমাজের কদাচারকে কশাঘাত করতে কার্পণ্য করেননি। তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সেকালের ধনী মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের হুজুগপ্রিয় মানসিকতা ও অনাচার-কদাচারের জীবন্ত দলিল। 'নক্সা'র প্রথম খণ্ড ১৮৬২ খ্রীঃ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একসঙ্গে ১৮৬৫ খ্রীঃ-তে প্রকাশিত হয়। এখানে উদ্ধৃত গানটি কলকাতার বারোয়ারি পুজা-মণ্ডপে গীত এক বাউলের গান। 'হুতোম' পরে লিখছেন, 'গানটি শুনে সকলেই খুশি হলেন। বাউলে চার আনা পয়সা বকশিশ পেলে ; অনেকে আদর করে গানটি শিখে ও লিখে নিলেন।' এখানে গানটির শেষ ছয় পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়ে প্রথম অংশ মুদ্রিত হলো।

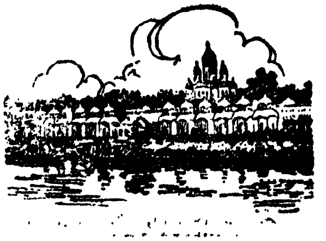

মাধুকরী

পুরনো কলকাতা

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁদের নথিপত্র দেখবার নিয়মাবলীর আমূল পরিবর্তন করেছেন: অতঃপর ভারতীয় নথি-শালায় (ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে) ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সকল বিভাগের সমস্ত কাগজপত্র ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই নথি-শালা খবরের খনিবিশেষ। আজ পর্যন্ত ইতিহাস রচনার বহু মালমশলা এখান থেকে নানা উপলক্ষে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ভাঁড়ারের ঐশ্বর্যের তুলনায় সে যে কতটুকু এবং কত অনাবিষ্কৃত তথ্য যে এইসব পুরনো কাগজের পৃষ্ঠায় সঞ্চিত আছে তার ব্যাখ্যা এক রকম অসম্ভব।

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি কলকাতায় মহরমের মিছিল উপলক্ষে এক অদ্ভুত ঘটনার উদ্ভব হয়। এই ঘটনায় শ্রীগৌর পোদ্দার ও শ্রীরাদু দত্ত নামক দুটি সাধারণ বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়। এদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাভুক্ত হবার মতো না হলেও, তাদের ভাষণে সামাজিক অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা গণ-ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য।

কোন অজ্ঞাত লোক এক পরোয়ানা জারি করে যে, মহরমের সময়ে কলকাতা শহরে পাল্কি, গাড়ি চড়া নিষিদ্ধ এবং এই খবর শহরের চারিদিকে ঢেঁড়া পিটে প্রচার করা হয়। নিমতলা থেকে শুরু করে মানিকতলা এবং ওল্ড কোর্ট হাউস পর্যন্ত কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে খবর প্রচার হয়। আসলে হুকুমনামা শহরতলীর উদ্দেশে জারি করা হয়েছিল কিন্তু হয় ভুলক্রমে নয় স্বেচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে কলকাতা শহরে এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়। ফলে, যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়, তা সম্ভবতঃ কলকাতা কেন, বাংলাদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। এই উপলক্ষে শহরে দোকান-পাট লুট এবং মারপিট হয়। এবং এই আক্রমণ থেকে তখনকার কালের ইংরেজ বাসিন্দারা বাদ পড়েনি। সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে যে একখানা পরোয়ানা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। উপরন্তু চারিদিকে পরস্পর-বিরোধী গুজব রটে। কোথাও শোনা যায় যে, পুলিশের বড়কর্তা এই পরোয়ানা জারি করেছেন, কোথাও বা শোনা যায় যে, নবাব সাদাৎ আলি, আবার কোথাও বা শোনা যায় যে, স্বয়ং শাসনকর্তা ফোর্ট উইলিয়ম থেকে এই আদেশ জারি করেছেন। অতএব সর্বত্র একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শেষে গভর্নর-জেনারেল খুব চটে যান এবং পুলিশকে কড়া হুকুম দেন এ-সম্বন্ধে গভীর তদন্ত করে আসল তথ্য তাঁর কাছে পেশ করবার জন্যে।

এই উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সামনে অনেককে জবানবন্দী দিতে হয়েছিল। তার মধ্যে গৌর পোদ্দার ও রাদু দত্তের বিবৃতির বাঙলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো। জবানবন্দী ইংরেজীতে লেখা, কিন্তু উভয়ের বাঙলায় নাম স্বাক্ষর আছে। গৌর পোদ্দারের জবানবন্দী এই রকম:

> সে শপথ গ্রহণ করে বলছে যে, গত শুক্রবার ২৯ জানুয়ারি ছিল এবং মুসলমান ছুটির শেষ দিন। সে সেদিন বৈঠকখানায় (বৈটককোনা) তার দোকানে থাকায় দেখেছিল যে, প্রায় পাঁচ-শ লোকের একটা প্রকাণ্ড দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা সবাই মুসলমান ছিল। তারা তার দোকানের কাছ দিয়ে যাওয়াতে সে দেখতে পেয়েছিল যে, তাদের সঙ্গে একটি হাতী এবং একটি ঘাওরা অথবা হুসেনের শবাধারের অনুকৃতি ছিল। সে শুনেছে যে, এই ঘাওরাটি গভর্নর-জেনারেলের তাঁবে বহাল ভোলা জমাদারের।

সে আরো বলে যে, তারা তার দোকানের কাছ দিয়ে ঘাওরা নিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোকদের (জেন্টু) মারধর করেছিল, যদিও ভদ্রলোকেরা কোন রকম অন্যায় কাজ করেছিল বলে তার জানা নেই। এবং উক্ত মুসলমানরা ভদ্রলোকদের গলা থেকে হার (কবচ বা মাদুলি?) খুলে নিয়ে চারিদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই হার বাংলাদেশের ভদ্রলোকেরা ধর্মবিশ্বাসে পরে। সাক্ষীর চোখের সামনে তারা অনেক ভদ্রলোককে মেরেছিল, এবং অনেক দোকান লুট করেছিল। মুসলমানদের বলপ্রয়োগ দেখে সে দোকানে থাকতে ভয় পেয়েছিল এবং আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে গিয়েছিল। সে যখন তিন ঘণ্টা পরে আবার দোকানে ফিরে এসেছিল তখন তালা লাগানো বড় সিন্দুকটি নিরাপদে ছিল। কিন্তু তার হাতবাক্সটি থেকে ৭৫টি সিক্কা টাকা ১টি আধা সিক্কা টাকা (আধুলি), একটি সিকি সিক্কা টাকা এবং ৫২টি আর্কট টাকা ও দু-আনা, উপরন্তু সাড়ে পাঁচ সিকি ওজনের একটি সোনার হার, তার দাম হবে ৮৮ আর্কট টাকা, খোয়া গিয়েছিল। তা ছাড়া, ২৭ আর্কট টাকা চোদ্দ আনা দামের ৪ থলি কড়ি, ২ আর্কট টাকা চার আনা দামের ১টি পিতলের ঘটি, জামা তৈরি করবার দু-টুকরো কাপড়, ১ আর্কট টাকা চোদ্দ আনা, একখানি দুলয় কাপড়, ৪ আর্কট টাকা আট আনা, একখানি গামছা, ৭ আর্কট আনা খোয়া গিয়েছিল। তার দোকান থেকে টাকা, কড়ি ও জিনিসে সর্বসমেত ৩০৬ টাকা ১ আনা ৬ পয়সা লোকসান ঘটে। সে শুনেছিল যে, তার আশপাশের দোকানদারেরও যথেষ্ট লোকসান ঘটে। শহরের দূরবর্তী অন্যান্য অংশেও গোলযোগের খবর সে শুনেছিল। কথিত ভোলা জমাদারকে সে চক্ষে দেখেনি, কাজেই সে বলতে পারে না যে, ভোলা ঘাওয়ার সঙ্গে ছিল কিনা। স্বাক্ষর—শ্রীগৌর পোদ্দার।[১]

গৌর ব্যবসায়ী লোক, কিন্তু কিসের দোকান তার তা বোঝা যায় না। সোনার হার পেতলের ঘটি, টাকা, কাপড়, ছিট, গামছা, কড়ির খবর পাওয়া গেলেও তার বড় সিন্দুকটিতে কি ছিল তার সন্ধান মেলে না। কিন্তু যার মাত্র হাতবাক্স ও তার আশপাশ থেকে ৩০৬ টাকা দামের জিনিস পাওয়া যায়, তার সিন্দুকে অবশ্যই যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। গৌর যে দোকান ফেলে তিন ঘণ্টা পালিয়েছিল তাতে তার ভীরুতার প্রমাণ হয় না। কারণ আকস্মিক গোলযোগের ফলে শান্তিপ্রিয় লোকের মনে নানারকম অবস্থার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক এবং অজ্ঞাত আশংকা বিরাট ভয়ে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিজেরা লাভবান হবে বলে মুসলমানরা লুটতরাজ করেনি। তা নইলে সোনার হার গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দেবে কেন এবং পোদ্দারের সিন্দুকই বা অটুট থাকবে কেন! তা ছাড়া গৌরের বর্ণনায় এমন কোন প্রমাণ নেই যে, মারামারির ফলে রক্তপাত ঘটেছে। তাহলে গোলযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি একথা স্বভাবতই মনে আসে। কিন্তু এর কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

রাদু দত্ত আদালতের বিচারপতিদের সামনে ২ ফেব্রুয়ারি যে বিবরণ দেয় সেটি এই:

এই সাক্ষী যথারীতি শপথ গ্রহণ করে বলছে যে, সে শুক্রবার আদালতে উপস্থিত ছিল। কতকগুলি মুসলমান তাদের উৎসবের দিনে সেখানে ভীষণ দাঙ্গা (riot) করেছিল। জেলা কাছারির পিওনদের জমাদার শেখ পুনজুকেএই উপলক্ষে খুব কর্মতৎপর দেখেছিল। আদালত-বাড়িতে এবং যেসব লোক আদালতের আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকেও শেখ অনেক ইট ছুঁড়েছিল। তা ছাড়া, যেসব দাঙ্গাকারী ফিরে যাচ্ছিল তাদের এবং বিশেষ করে ঢেঁড়াদারদের শেখ ডেকে ফিরিয়ে এনেছিল এবং আদালতের দরজার সামনে ঢেঁড়া-পেটাবার হুকুম দিয়েছিল। শেখ পুনজুকে ডেপুটি শেরিফ মিস্টার স্টার্ককে অসভ্য ভাষায় গালাগালি করতে শুনেছিল। মিস্টার স্টার্ককে লম্বা লোকটা বলে ডাক পেড়েছিল এবং বলেছিল যে মিস্টার স্টার্ক তাকে ও তার দলের লোককে আদালতের সামনে গোল বন্ধ করে চলে যাবার হুকুম দিয়েছিল বলে আমি তাকে খুন করব। স্বাক্ষর—শ্রীরাদু দত্ত[২]

বৈঠকখানা ও আদালতের সামনে ঘটনার পার্থক্য অনেক। পোদ্দারের বর্ণনায় বিভীষিকার পরিচয় আছে, কিন্তু দত্তের ভাষণে প্রতিবাদ

---

[১] Home Dept. Public Cons. 13 May 1779, No. B. B.

[২] Home Dept. Public Cons. 13 May 1779, No. C. C.

জানানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈঠকখানায় লুটপাট, মারধর হয়েছে, কিন্তু আদালতের সামনে ঢিল ছোঁড়া, ঢেঁড়া-পেটানো এবং শেরিফকে গালিগালাজ করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত শেরিফকে খুন করা হবে বলে শাসানো হয়েছে—এই পর্যন্ত প্রমাণ হয়। বৈঠকখানায় আকস্মিকভাবে সবটা ঘটেছে কিন্তু আদালতের সামনে বারণ করবার পরে জোর প্রতিবাদ হয়েছে। অতএব স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে দুই জায়গায় একই দিনে ঘটনার বৈপরীত্ব ঘটেছে।

তবে শেখ পুনজু যে ভোলা জমাদারের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তি, শৌর্য ও বীর্যে উচ্চদরের লোক তা তার সূক্ষ্ম ধরনের কাজ দেখে অনুমান করা যায়। আদালতের আশপাশে যেসব লোক উপস্থিত ছিল, শেখ বা তার দলের লোক তাদের মারপিট করেনি, গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেয়নি এবং ইট ছোঁড়ার ফলে কেউ যে আহত হয়েছে তার প্রমাণ মেলে না। বস্তুতান্ত্রিক পোদ্দারের বর্ণনায় তার ঘটি, গামছা, টাকাটা সিকেটার বিস্তৃত বিবরণ আছে কিন্তু দত্তের বর্ণনায় কয়েকটি মনোজ্ঞ ভাবের পরিচয় আছে। যেমন, গোলযোগের সময়ে শেখকে তিনি খুব কর্মতৎপর দেখেছিলেন। কোন আকস্মিক ঘটনার মধ্যে কোন বিশেষ লোকের তৎপরতাকে লক্ষ্য করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি নয়। ঘটনা অতীত হলে যে-মন পূর্বঘটনা যথাযথভাবে মনন ও প্রকাশ করতে পারে, এ বর্ণনাভঙ্গীতে রাদু দত্তের সেই মনের পরিচয় মেলে। দত্তের ভাষণে আর একটি কথা আছে। শেখ শেরিফকে লম্বা লোক[৩] বলে ডাক দিয়েছিল। বাঙালী দৈর্ঘ্যে কম বলেই কি তার এই বক্রোক্তি? না এটা শেখের রসজ্ঞানের পরিচয়? রসজ্ঞান জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। অতএব শেখ গৌর পোদ্দার বা ভোলা জমাদার জাতের লোক নয়। রাদু দত্তের অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গিতে শেখের চরিত্রের বিশেষ কয়েকটি লক্ষণের পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তাঁর নিজের রুচির ও সভ্যতাজ্ঞানের আন্দাজ করা কঠিন নয়। তা নইলে শেখ অনেক অসভ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল বলে শেষ করতেন না।

অতঃপর এবিষয়ে বিশদ বিবরণ এবং ঢেঁড়া-পেটার কাহিনী কলকাতার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট চার্লস স্টাফোর্ড প্লেডেলের জবানবন্দীতে পাওয়া যায়।

২৭ ফেব্রুয়ারি প্লেডেল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম আদালতে বলেন যে, ১ ফেব্রুয়ারি তিনি চিৎপুরের ফৌজদার মীর কমলুদ্দী হোসেন এবং সেখানকার দারোগা শেখ মহম্মদ মকিমকে দুখানা চিঠি লিখে খবর পাঠান যে, তিনি তাদের সঙ্গে পরের দিন দেখা করবেন। কারণ তিনি গুজব শুনেছিলেন যে, হোসেন অথবা মকিম অথবা নবাব সাদাৎ আলির হুকুমে কলকাতা শহরের মধ্যে এই বলে ঢেঁড়া-পেটানো হয়েছিল যে, মহরম মিছিলের সময়ে শহরে কি ইংরেজ কি হিন্দু কেউই পালকিও চড়তে পারবে না। চিঠি পেয়েই হোসেন ও মকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং বলেছিল এই হুকুম তারা দেয়নি তবে নবাব দিয়েছেন কিনা তাও জানে না।

এমন সময়ে ৩ ফেব্রুয়ারি গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে এবিষয়ে কঠোরভাবে অনুসন্ধান করবার জন্যে হুকুম এল। কারণ তখন গুজব রটেছে যে, স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল বা নবাব এই পরোয়ানা জারি করেছেন। কাজেই প্লেডেল সাহেব তাঁর তাঁবে পুলিশের কাজে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারী গোপী নাজিরকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেন এবং সত্য আবিষ্কারের জন্য সব রকম পন্থা অবলম্বন করবার ক্ষমতা দেন। ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি গোপী নাজিরের কাছ থেকে একখানা কাগজ পান, বিশ্বাস, সেখানা মীর কমলুদ্দী হোসেনের রচিত ফার্সি পরোয়ানার প্রতিলিপি। এর ইংরেজী অনুবাদ তিনি পেশ করেন।

এই পরোয়ানা হস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে হোসেন প্লেডেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করে স্বীকার করে যে, এ পরোয়ানা জারি সে-ই নিজের মতলবে করেছে, নবাব এবিষয়ে কোন আদেশ দেননি। তবে এই হুকুমনামা কলকাতা শহরের

---

[৩] লম্বু, ঢ্যাঙা, লম্বোদর প্রভৃতি ঠাট্টা এবং সময়ে সময়ে বিদ্রূপাত্মক

বাইরে কেবল মাত্র পঞ্চবন গ্রাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল।

অতঃপর প্লেডেল সাহেব গোপী নাজিরকে এই ঢেঁড়া-পেটানো সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করবার আদেশ দেন। তার ফলে, তিল্লোকরাম শা, হরিকিষণ চৌধুরী, সীতারাম তেওয়ারী এবং উদয়সিং দয়াল নামক চারজন লোক পুলিশ-কাছারিতে উপস্থিত হয়ে ঢেঁড়া-পেটা সম্বন্ধে বিবৃতি দেয়। এগুলি আদালতে পেশ করেন।

তারপর তিনি বলেন যে, কলকাতায় যখনই ঢেঁড়া-পিটে কোন হুকুম জারির দরকার হতো তখন যথাসময়ে পুলিশের কাছে দরখাস্ত করে অনুমতি নিতে হতো। কিন্তু তিনি মহরম উপলক্ষে ভদ্রলোক এবং ইংরেজদের পালকি চড়া নিষিদ্ধজ্ঞাপক কোন আবেদন পাননি। উপরন্তু কলকাতায় যে গুজব রটেছিল, যে নবাব সাদাৎ আলির হুকুমে এবং প্ররোচনায় এই ঘটনা ঘটে, প্লেডেল সাহেবের গভীর অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় তা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁর বিশ্বাস নবাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবিষয়ে কোন নির্দেশ দেননি। এবং তিনি নিজে কিংবা তাঁর কোন কর্মচারী এ হুকুমনামা জারি করেননি।

পরিশেষে প্লেডেল সাহেব বলেন যে, তিনি ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে কলকাতার অধিবাসী। ২৮ বছর বাংলাদেশে বাসের মধ্যে মাত্র ৬ বছর তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন। চার বছর আন্দাজ তিনি জমিদারি আদালতের হাকিম ছিলেন এবং ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে কলকাতার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এতদিনে কলকাতাকে তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন। কিন্তু বর্তমান হুকুমনামা কোন পদস্থ লোকের কাজ বলে তিনি মনে করেন না।[৪]

এখন দেখা যাচ্ছে যে, পরোয়ানার প্রতিলিপি হস্তগত হবার পরেই মীর কমলুদ্দী হোসেন প্লেডেল সাহেবের কাছে এসে স্বীকার করে যে, পরোয়ানা তারই প্রস্তুত, কিন্তু কলকাতার সীমানার বাইরে পঞ্চবন গ্রাম সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য। কিন্তু যে কারণেই হোক, পরোয়ানা পঞ্চবন গ্রামে জারি না হয়ে কলকাতায় হয়েছিল। যদি ভুলক্রমেই ঘটে থাকে তাহলে চিৎপুরের ফৌজদার এবং জমাদার উভয়েই এবিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার কারণ কি? এবং প্রথমবারে যখন প্লেডেল সাহেব তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান, তখন তারা পরোয়ানা সম্বন্ধে কিছুই জানে না, একথা বলার কারণ কি? পরিষ্কার না হলেও আন্দাজ করা যায় যে, এরা দু-জনে পরামর্শ করে এ কাজ শুরু করে থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য কি? দুঃখের বিষয়, আদালতে এদের কোন জবানবন্দী নেই। থাকলে, অবশ্যই সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য হতো।

কিন্তু গোপী নাজিরের কেরামতি অপূর্ব। গোপী সম্ভবতঃ তখনকার কালের গোয়েন্দা। সে যে পদস্থ ব্যক্তি তা প্লেডেলের ভাষণেই জানা যায় এবং শিক্ষিতও যে ছিল, সেবিষয়ে তার কার্য-কলাপ বিচার করলে সন্দেহ থাকে না। তার ক্ষমতার ওপর প্লেডেলের যথেষ্ট আস্থা ছিল।

যে পরোয়ানা নিয়ে এত গোলযোগ, অতঃপর সেটি বিচার করে দেখা যাক। পঞ্চবন গ্রাম কোথায় ছিল, তার বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য কৌতূহলোদ্দীপক সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে।

পরোয়ানার প্রতিলিপি[৫]

পঞ্চবন গ্রাম পরগনার থানাদার মানাবর মির মুফিজউল্লা নিরাপদে থাকুন।

কলকাতা শহরের বাইরে পঞ্চবন গ্রামের অন্তর্গত ইটালী, শিয়ালদা, বেগমারি এবং শুঁড়া এবং বালিয়াঘাট এবং ফুলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইহা ঘোষণা করা যাবে যে, মহরম উপলক্ষে দশ দিনের

---

[৪] Home Dept. Public Cons. 13 May 1779, N. F.

[৫] Home Dept. Public Cons. 13 May 1779, No. F.

শোকের সময়ের এই কটি দিন আরক (মদ্য) বিক্রেতারা তাদের দোকান বন্ধ রাখবে এবং বারবনিতারা কাকেও তাদের ঘরে আসতে দেবে না। এই ঘোষণার পর যদি কেউ মদ্য পান ও বিক্রি করে, উপরন্তু বারবনিতা এবং তাদের গৃহে যারা যাতায়াত করে তাদেরও ধরে আনা হবে এবং শাস্তির দ্বারা সংশোধিত করবার জন্য'।

২০ আষাঢ়ে মহরমের পবিত্র
মাসের ষষ্ঠ দিনে লিখিত।

পরোয়ানার শিল—
"মির কমুল-উদ্-দিন্-হুসেন
চিৎপুরের ফৌজদার"

এই শহরতলীতে আগেও গোলযোগ ঘটে না থাকলে এরকম পরোয়ানা জারির সার্থকতা কি? অসংযমের পরিণামে চিরকাল সর্বত্রই গোলযোগ ঘটে থাকে এবং এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। দেড়শো বছর আগে কলকাতায় বা শহরতলীতে মদ্য ও দেহ-ব্যবসা সচল ছিল। অনুমান করা যায়, অন্ততঃ শহরতলীতে শাসন-ব্যবস্থা ভালই ছিল। এই পরোয়ানা জারি করার ফলে ১৬২ বছর আগে কলকাতায় যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় তা অভিনব। এই উপলক্ষে শহরের হিন্দু অধিবাসীদের চেয়ে ইংরেজরা যে বেশি উৎপীড়িত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।*

সংগ্রহ ঃ সুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

---

* **প্রবাসী**, ১৩৪৯, বৈশাখ পৃঃ ৮৩-৮৬

বিবিধ সংবাদ

সিঁথি বেণী পালের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদী

উত্তর কলকাতায় সিঁথি বেণী পালের বাগানে
দেবের পদরজঃপূত পুণ্য-বেদীটি বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ নিঃশর্ত দানরূপে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বেদীর প্রাঙ্গণে (১৩ সি সমর সরণি, কলকাতা-৫০) প্রতি ইংরেজী মাসের দ্বিতীয় শনিবার সন্ধ্যায় স্বামী পুরাণানন্দ ও তৃতীয় রবিবার সন্ধ্যায় স্বামী নিত্যরূপানন্দ যথাক্রমে অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করছেন। অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থাপনায় ও আনুষঙ্গিক কাজে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগিদের একটি সংস্থা "সিঁথি বেণীপাল উদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ" সহায়তা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসমাধি উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যদুলাল মল্লিকের ৬৭ পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রীটের ঠাকুরদালানে সিংহবাহিনীদেবীর অষ্টধাতুর মূর্তি দর্শনান্তে ১৮৮৩-এর একুশে জুলাই ভাবসমাধিমগ্ন হন। তারই স্মরণে পাথুরিয়া ঘাট যদুলাল মল্লিক স্মৃতি সমিতি গত শুক্রবার ২১ জুলাই ১৯৮৯ (৫ শ্রাবণ ১৩৯৬) অপরাহ্ণে সেই পবিত্র পীঠে অন্যান্য বছরের মতো একটি সভার আয়োজন করে। সভার প্রারম্ভে যদুলাল মল্লিকের প্রপৌত্র রমেন্দ্রনাথ মল্লিক-রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বোধন' গীতি-বিচিত্রা প্রদ্যোৎকুমার মিত্রের পরিচালনায় পরিবেশন করে আন্দুল রাজবাড়ির পূর্বাচল সংস্থা। সর্বধর্ম সমাবেশের সপ্তম অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর আলোচনা আহ্বান করা হয়। আলোচনার সূচনা করেন স্বামী নির্জরানন্দ। বিভিন্ন ধর্মাচার্যের বাণীর আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' বাণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন এস. এ. মাসুদ, ডি. পি. রায়চৌধুরী, গণেশ লালওয়ানী প্রমুখ।

কলকাতার প্রাচীন বৌদ্ধসংস্থা

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী

কলকাতার প্রথম বৌদ্ধবিহার ধর্মাঙ্কুর বিহার, প্রতিষ্ঠাতা কৃপাশরণ মহাথের (১৮৬৫-১৯২৬)। অবশ্য কলকাতার সমৃদ্ধির কাল থেকে বাঙালী বৌদ্ধদের একাংশ পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম থেকে জীবিকা অর্জনের জন্য এসে প্রধানতঃ মধ্য কলকাতায় বসবাস করতেন। এঁরা এই অঞ্চলে ভাড়াবাড়িতে তিনটি অস্থায়ী বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেছিলেন—ওয়ারিসবাগানে (মেটকাফ স্ট্রীট) আদি বিহার, মিঞাজান গলিতে (বো স্ট্রীট) মহানগর বিহার ও গুরিয়ামাথানায় (মলঙ্গা লেন) নবীন বিহার। সেসময় এঁদের ধর্মীয় কার্যাদি পরিচালনার জন্য স্থায়িভাবে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন না। তরুণ ভিক্ষু কৃপাশরণ চট্টগ্রাম থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুন কলকাতায় আগমন করেন। তারপর থেকে তাঁর মৃত্যুদিন (৩০ এপ্রিল ১৯২৬) পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ চারদশক কাল কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে তিনি এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। কৃপাশরণ কলকাতায় এসে প্রথমে ৭২।৭৩ নং মলঙ্গা লেন স্থিত নবীন বিহারে ওঠেন এবং এই বিহারে তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি ২১।২৬ নং বো স্ট্রীট স্থিত মহানগর বিহারে বসবাস আরম্ভ করেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি পূর্বোক্ত তিন বিহারের উপাসক-উপাসিকাদের সংগঠিত করে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে (বুধবার ২১ আশ্বিন ১২৯৯, ৫ অক্টোবর ১৮৯২) বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রতিষ্ঠা করে কলকাতা তথা ভারতে বুদ্ধবাণী-চর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমানে এই সভা বাঙালী বৌদ্ধদের প্রাচীন ও প্রধান সংস্থারূপে স্বীকৃত।

কঠোর পরিশ্রমী কৃপাশরণ ১৯০০ খ্রীস্টব্দে সাড়ে চার হাজার টাকার বিনিময়ে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলে ললিতমোহন দাস লেনে (বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট) পাঁচ কাঠা পরিমাণ জমি ক্রয় করে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ধর্মাঙ্কুর বিহারের নির্মাণকার্য শুরু করেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন ধর্মাঙ্কুর বিহারের শুভ উদ্বোধন হয়। এরপর ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে কৃপাশরণ বুদ্ধবাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে (আষাঢ় ১৩১৫) তাঁর পরিচালনায় এবং গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও শ্রমণ পূর্ণানন্দের যুগ্মসম্পাদনায় 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং অচিরেই এই পত্রিকা কলকাতার বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হয়। 'জগজ্জ্যোতি'-ই কলকাতা থেকে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা। এই সালেই কৃপাশরণ ধর্মাঙ্কুর বিহারে ত্রিপিটকসহ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধগ্রন্থাদি সংগ্রহ করে এক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তী কালে গুণালঙ্কার লাইব্রেরী নামে পরিচিতি লাভ করে। কৃপাশরণ তৎকালীন কলকাতার অনেক সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—স্যার আশুতোষ মুখার্জী, বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে, ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, আইনবিদ্ ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বগুড়ার নবাব আবদুল শোভাহান চৌধুরী প্রমুখ।

কৃপাশরণের আগ্রহাতিশয্যে স্যার আশুতোষ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষায় উচ্চশিক্ষা

ও গবেষণার্থে সরকারি বৃত্তি প্রদানের জন্য ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। তৎকালীন শিক্ষাসচিব হারকোর্ট বাটলার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঐ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে বেণীমাধব বড়ুয়া (উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩৯৬, ৯১তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি ডি. লিট. লাভের গৌরব অর্জন করেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারেও কৃপাশরণের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ধর্মাঙ্কুর বিহারে তিনি প্রথম বৌদ্ধ মহিলা সম্মেলন আয়োজনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এতে পৌরোহিত্য করেন বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল মিস এ. এল. জেনো। তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান—১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করা। ধর্মাঙ্কুর বিহার সংলগ্ন নালন্দা পার্কে বিভিন্ন বৌদ্ধপ্রধান দেশসমূহের সঙ্ঘনায়কবৃন্দের উপস্থিতিতে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কৃপাশরণের মহাপ্রয়াণের পর ধর্মাঙ্কুর সভা ও বিহারের অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত হয়। তবে বিগত দু-দশক কৃপাশরণের সার্থক উত্তরসূরী ধর্মপাল মহাথের-এর সুদক্ষ পরিচালনায় এর বহুমুখী কর্মধারা কলকাতাবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

কলকাতার প্রাচীনতম বৌদ্ধসংস্থা মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ৩১মে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩০)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতীয় ধর্মজীবনে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল এবং এতে যেসব বিদেশী মনীষী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিসেস অ্যানি বেসান্ত, কর্নেল অলকট, ভগিনী নিবেদিতা, মাদাম হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভাৎস্কির সঙ্গে অনাগারিক ধর্মপালের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জন্মসূত্রে ধর্মপাল ছিলেন সিংহলী বৌদ্ধ। মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরের বৎসর (১৮৯২) জুন মাস থেকে তিনি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'দি মহাবোধি' প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে নির্মিত হয় কলকাতার দ্বিতীয় বৌদ্ধবিহার—শ্রীধর্মরাজিক চৈত্য বিহার। এই বিহারের ভিত্তি স্থাপন করা হয় ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর, আর এর শুভ উদ্বোধন হয় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২০ নভেম্বর। ধর্মপাল ও কৃপাশরণের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মহাবোধি প্রতিষ্ঠাকালে ধর্মপাল অনেক অনুষ্ঠানাদি যৌথভাবে ধর্মাঙ্কুর বিহারে সম্পন্ন করতেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে এক মহৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃপাশরণ ধর্মপালকে সম্বর্ধিত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও অনাগারিক ধর্মপালের যোগাযোগও নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অধ্যাপক বিনয় সরকার লিখেছেনঃ "ধর্মপাল আর বিবেকানন্দ দুজনেই ভারতীয় কর্মনিষ্ঠার প্রচারক, ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি।" ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের পর থেকে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ঐ মহাসম্মেলনের পর কলকাতায় ফিরে এসে ধর্মপাল তাঁর বহু বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বহু প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে সে-সম্পর্কে তাঁর এক পত্রে ধর্মপালকে (১৮৯৪) লেখেনঃ "আশা করি আপনার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যিনি বহুজনহিতায় ুখায় এসেছিলেন, আপনি তাঁর উপযুক্ত দাস।" স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মপালের পত্রিকা 'দি মহাবোধি'-র একজন আগ্রহী পাঠক ছিলেন স্বামীজীর ঐ পত্র থেকে জানা যায়।[1]

---

[1] স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে ধর্মপাল মঠেও এসেছেন। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে, বেলুড় মঠ সবে তৈরি হচ্ছে। প্রিয়নাথ সিংহের 'স্বামীজীর স্মৃতি'তে ধর্মপালের মঠে আসার ঘটনা জানা যায় [উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ (১৩১২), ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫৭-২৫৮]।

কিংবদন্তীর কলকাতা

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার কথা লিখতে গেলে সপ্তগ্রামের কথা এসে পড়ে। সপ্তগ্রাম ছিল সেকালের একটি বিশিষ্ট বন্দর। দেশ-বিদেশের অর্ণবপোত সরস্বতী নদীর তীরে এই সপ্তগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়ত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে সরস্বতী নদীতে এমন চড়া পড়তে শুরু করল যে, সপ্তগ্রাম ক্রমে হারিয়ে ফেলল তার নাব্যতা। সেখানকার সম্পন্ন বস্ত্র ব্যবসায়ী শেঠ ও বসাকরা তাই সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে এলেন আরও দক্ষিণে গঙ্গাতীরের একটি গ্রাম সুতানুটিতে। এ-ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে। 'সুতা নুটি' অর্থাৎ সুতার গোছা—ইংরেজদের ভাষায় 'ইন্ডিয়ান কটন'—সেকালে তার খুব চাহিদা। সম্ভবতঃ এ থেকেই সুতানুটি নামটি হয়েছে। গঙ্গাতীরবর্তী কাছাকাছি আর একটি গ্রাম গোবিন্দপুর।[1] সপ্তগ্রামের বস্ত্র ব্যবসায়ী মুকুন্দরাম শেঠ তার চারজন সঙ্গী সহ এই গ্রামে এসেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই। কথিত আছে তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নামানুসারেই নাকি মুকুন্দরাম গোবিন্দপুরের নামকরণ করেছিলেন। তারপর ইংরেজরা সুতানুটি ও গোবিন্দপুর থেকেই কিনতে লাগল ইন্ডিয়ান কটন। তার বহুদিন পর জব চার্নক এলেন সুতানুটিতে—১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নবাবের কাছ থেকে কিনে নিলেন সন্নিহিত তিনখানি গ্রাম—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা। আরও পরে এই তিনখানি গ্রাম মিলে গড়ে উঠল নগর কলকাতা।

তাহলে কলকাতা কতদিনের পুরনো শহর? প্রধানতঃ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আমাদের জানিয়েছেন, ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট কলকাতার জন্ম। অর্থাৎ কলকাতার বয়স তিনশো বছর। সময়ের বিচারে তিনশো বছর খুব কম নয়। এর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহু পরিবর্তন ঘটেছে; ভল্গা-গঙ্গা-শ্যেনের জল একত্রে মিশেছে। একদা সমগ্র ভারতবর্ষের, এখন ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী এই শহরের বহিরঙ্গে এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নানা বদল ঘটেছে সময়ের সঙ্গে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। বহু কর্মকাণ্ডের সাক্ষী, নানা ভাষা-ধর্ম-বর্ণের আশ্রয় কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাই বিচিত্র কিংবদন্তীর প্রচলন থাকা খুবই স্বাভাবিক।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য পাঁচালী ও মঙ্গল-কাব্য প্রধানতঃ কিংবদন্তী-আশ্রয়ী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা-বিজয়' এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে যথাক্রমে চাঁদসদাগর এবং ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় কলকাতা এবং কালীঘাটের উল্লেখ আছে। দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে কলকাতার এই উল্লেখ নিঃসন্দেহে কলকাতা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর বাতাবরণ এনে দিয়েছে।

কলকাতার নামকরণ নিয়েই কত কিংবদন্তী! কোন এক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী নাকি এখানে বহু মড়ার মাথার খুলি দেখতে পান। তাই জায়গাটিকে তিনি 'গলগাটা' Galgata, (অর্থাৎ Galgatha বা শ্মশানভূমি) বলে উল্লেখ করেন। সেই 'গলগাটা'-ই নাকি বিবর্তিত হয়ে পরে

---

[1] এই মতটি গৌরদাস বসাকের। ষোড়শ শতাব্দীর ভূগোলবেত্তা কবিরাম তাঁর 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন: "গোবিন্দ দত্ত (গোবিন্দশরণ দত্ত) নামক এক রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থ থেকে যাবার পথে রাত্রে কালীর একটি স্বপ্নাদেশ পান। স্বপ্নে কালী তাঁহাকে বলেন, গঙ্গার পূর্বতীরে 'বাদররসা' নামক চরের তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করে একটি গ্রাম স্থাপন করে সেখানে বসবাস করতে। দেবীর সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারে গোবিন্দ দত্ত গৃহাদি নির্মাণ করেন এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিকে সেই গ্রামে বাসের জন্য আমন্ত্রণ জানান। নিজের নাম অনুসারে তিনি গ্রামের নাম দেন গোবিন্দপুর। গোবিন্দ দত্তের আদি নিবাস সপ্তগ্রাম, গোবিন্দপুরে আসার আগে চান্দোলে বা পারীন্দ্র গ্রামে, বর্তমান আন্দুলে তিনি বাস করছিলেন। অপর একটি মতে, গোবিন্দরাম মিত্র নামে একজন বঙ্গসন্তান পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে জব চার্নকের সঙ্গে এখানে এসে বাস করেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে গ্রামের নাম রাখেন গোবিন্দপুর।

'কলকাতা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। আর একটি কিংবদন্তী কলকাতার ইংরেজী নাম 'ক্যালকাটা-'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এক ঘেসুড়ে গঙ্গাতীরে ঘাস কেটে আঁটি বেঁধে রেখেছিল। একজন ইংরেজ নাবিক জাহাজ থেকে নেমেই তার ছড়িটি ঐ ঘাসের আঁটির উপর ঠেকিয়ে ঘেসুড়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ "এই স্থানের নাম কি?" ঘেসুড়ে ইংরেজ নাবিকের কথা বুঝতে না পেরে উত্তর দিয়েছিল 'কাল কাটা।' ঘেসুড়ে ভেবেছিল সাহেব ঘাস কবে কাটা হয়েছে তা-ই জানতে চেয়েছে ; তাই সে বলেছিল (গত) কাল কাটা হয়েছে। সাহেব বুঝলে, ঘেসুড়ে তাকে জায়গাটির নাম 'কাল কাটা' বলেছে। সেই 'কাল কাটা' থেকে 'ক্যালকাটা' বা 'কলকাতা' কথাটি এসেছে বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। আবার কলিচুন ও কাতা-দড়ির আড়ৎ থাকার জন্য 'কলি' ও 'কাতা' যুক্ত হয়ে 'কলিকাতা' নামটি এসেছে—এও শোনা যায়।

কলকাতার কাহিনী বলতে গেলে প্রথমে কালীঘাটের কথাই বলতে হয়। কারণ, অনেক পণ্ডিতের মতে 'কালীঘাট' থেকেই 'কালীঘাটা' এবং তার অপভ্রংশ হিসাবে 'কলিকাতা' নামের প্রচলন হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, কালীর মন্দিরের জন্য লোকে স্থানটিকে বলত, 'কালীকোটা' যার অপভ্রংশ হলো 'কলিকাতা' বা 'কলিকাতা'। আবার এই কালীঘাটকে নিয়েও নানা কিংবদন্তী ও গল্প-কাহিনী প্রচলিত। তারমধ্যে দু-একটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভবানীদাস চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে শাঁখারি ছিলেন। একদিন তিনি গঙ্গাতীর দিয়ে শাঁখা বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন। এক সধবা ব্রাহ্মণী শাঁখা পরতে চাইলে ভবানীদাস তাঁকে কালীঘাটের বর্তমান কালীকুণ্ডের তীরে শাঁখা পরিয়ে শাঁখার মূল্য চাইলেন। ব্রাহ্মণী 'স্নান করে আসি' বলে ঐ কুণ্ডে নামলেন। বহুক্ষণ পরেও ব্রাহ্মণী না আসায় ভবানীদাস ভাবলেন যে, ব্রাহ্মণী বোধ হয় জলমগ্ন হয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করার জন্য কুণ্ডে নামতে যাচ্ছেন, এমন সময় জলের ভিতর থেকে ব্রাহ্মণী শুধু তাঁর হাতটি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। সেই সময় দৈববাণী হলো, "আমি কালী, এই হ্রদতীরে তুমি আমার পূজার প্রচার কর। "তুমি গৃহে ফিরে যাও, সেখানে অমুক স্থানে একটি কৌটোর মধ্যে আমি আছি।" ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে কথিত স্থানে একটি কৌটো দেখতে পেলেন। সেটি খোলা মাত্র সূর্যের মতো জ্যোতি ঝলসে উঠল। অতঃপর তিনি দেখলেন, কৌটোর মধ্যে একটি পদাঙ্গুলি রয়েছে। এটি আসলে সতীর দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলি। পদাঙ্গুলিটি মস্তকে ধারণ করে ভবানীদাস বর্তমান কুণ্ডতীরে এসে দেবীর মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। সেই থেকে কালীঘাটে দেবীর পূজার সূচনা' কেউ কেউ মনে করেন ভবানীদাস নামানুসারেই ভবানীপুরের নাম হয়ে থাকবে। ভবানীদাসকে কেন্দ্র করে কালীঘাটের কালীর পূজা-প্রচার সংক্রান্ত কিংবদন্তীটি 'কালীক্ষেত্রদীপিকা'য়· পাওয়া যায়। কালীর সেবাইতদের উপাধি হালদার। তাঁদের আদিপুরুষ ভবানীদাস। কথিত আছে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সহ কালীঘাটে আসেন এবং মন্দিরের সেবাইতদের দেবোত্তর দান ও হালদার উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশ্য এসম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। একমতে বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের আদিপুরুষ কেশব রায়চৌধুরীর পুত্র সন্তোষ রায়চৌধুরী, অন্যমতে যশোরের রাজা বসন্ত রায় কালীঘাটের কালীর পূজা ও প্রচারের সঙ্গে সংযুক্ত এবং দেবোত্তর দান ও হালদারদের নিয়োগ করেছেন। মনে হয়, বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী-পরিবার সম্পর্কিত মতটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

জনশ্রুতিতে আরও আছে যে, পোস্তার দক্ষিণে যে জায়গাকে 'পুরাতন পোস্তা' বলে সেখানে একটি কালীর মন্দির ছিল এবং সেইটিই নাকি কালীঘাটের আসল কালী। পরবর্তী কালে কোন এক সময়ে সেই মন্দির ভেঙে সবকিছু চাপা পড়ে যায়। ওখানেই হাট বসত বলে কালীঘাটের নাম লুপ্ত হয়ে স্থানটি 'পোস্তার হাট' বলে পরিচিত হয়। বহুকাল

পরে একদল কাপালিক-সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগরে যাবার পথে ঐ মন্দিরের ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে চারটি ছিদ্র সংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ডে দেবীর মুখমণ্ডল পান। ঐটি কালীঘাটের কালী বলে তাঁরা চিনতে পারেন। তখন চৌরঙ্গী ছিল গভীর জঙ্গল। চৌরঙ্গী থেকে আদিগঙ্গার ধার পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলে কাপালিকেরা কুটীর নির্মাণ করে তন্ত্রমতে কালীর উপাসনা করতে থাকেন। পরে সেইটি সর্বজন সমক্ষে কালীঘাটের কালী বলে পরিচিত হয়। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরও একটি কিংবদন্তী আছে। সেটি হচ্ছে এইঃ নরবলির উপকরণ না পাওয়ার জন্য কাপালিকেরা পাথরে খোদিত দেবীর মুখমণ্ডল চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে দিয়ে চলে যান। এদিকে জঙ্গলের ভেতর থাকতেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম ছিল চৌরঙ্গী গিরি। কেউ বলেন, তিনি শৈব, কেউ বলেন তান্ত্রিক। হঠাৎ একদিন তিনি অভূতপূর্ব একটি দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন জঙ্গলের ভিতর একটি গরু দাঁড়িয়ে। সেই দুগ্ধবতী গরু একটি জায়গায় বারবার দুধ দিচ্ছে। এই অভাবিত দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসী বড় কৌতূহলী হলেন। দুধসিক্ত সেই জায়গাটি খুঁড়ে ফেললেন তিনি। তারপর মাটির তলা থেকে আবিষ্কার করলেন কাপালিকদের লুকিয়ে রাখা মায়ের সেই মুখমণ্ডল। মাকে পেয়ে সন্ন্যাসী চৌরঙ্গী নতুন করে পুজো আরম্ভ করেদিলেন। পরে তিনি যখন গঙ্গাসাগরে চলে যান, তখন তাঁর শিষ্য জঙ্গল গিরির ওপর মায়ের পুজোর ভার দিয়ে যান। চৌরঙ্গী গিরির নামানুসারেই বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলের নাম হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। জঙ্গল গিরির কাছ থেকেই কেশব রায়চৌধুরী বা সন্তোষ রায়চৌধুরী মাকে জনসমাজে নিয়ে এসে পরিচিত করে দেন। বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার শ্যামরায়ের পুজো যেমন জাঁকজমক করে সম্পন্ন করতেন, সেইরকম জাঁকজমকেই শ্যামামায়ের আরাধনাও তাঁরা শুরু করলেন। (শ্যামরায়ের দোল উৎসবে দীঘির জল লাল হয়ে উঠত বলে, তার নাম হয়েছিল লালদীঘি')। পাঁঠার মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে রসিক কবি ঈশ্বরগুপ্তের মনে পড়ে গিয়েছিল কালীঘাটের হালদারদের কথাঃ

প্রতি কোপে যত পাঁঠা বলিদান করে।
দেবী বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায়॥

এ ছাড়াও আছে পুরনো কলকাতার চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী সম্পর্কে কিংবদন্তী। বাগবাজারের গঙ্গার ধারে কে বা কারা কোন সময়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঠিক বিবরণ নেই। শোনা যায়, চিতে ডাকাতের দল সাড়ম্বরে মায়ের পুজো করত। চারিদিক ছিল গভীর জঙ্গল, খাল-খোঁদালে ভরা। নদীতে জোয়ার এলে এক প্রহর বেলা থাকতে অন্ধকারের ছায়া নামত মায়ের মন্দির ঘিরে। চিতে ডাকাতের দল মশাল জ্বালিয়ে মায়ের সামনে নরবলি দিত। তারপর নররক্তে কপালরাঙিয়ে তারা বের হতো ডাকাতি করতে। নিশুতি রাতে তাদের উল্লাসে অঞ্চলটি উঠত কেঁপে কেঁপে।

কলকাতার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয় দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে বৃহৎ ব-দ্বীপ অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আজকের কলকাতার। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত বহু ঝড়, বন্যায় বিধ্বস্ত, জঙ্গলাবৃত একদা পরিত্যক্ত যে-ভূখণ্ড পরবর্তী কালে 'কল্লোলিনী কলকাতা'তে রূপান্তরিত, তার সম্পর্কে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানস্বরূপ নানা গল্প-কাহিনী-জনশ্রুতি কিংবদন্তী যে প্রচলিত থাকবে এবিষয়ে আর আশ্চর্য কি! সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কলিকাতা-পরিচয়' কবিতায় যে-কলকাতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় তিনি করিয়েছেন সে-কলকাতা নিতান্তভাবে কিংবদন্তীরই কলকাতা।

এই কলিকাতা-কালিকা-ক্ষেত্র,
কাহিনী ইহার সবার শ্রুত,
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়
মহেশের পদধূলে এ পূত।
ধাত্রী ইহার ভাগীরথী-ধারা,
সতী-পঞ্জর বুকে এ বহে,
পুরাণ-স্মৃতির জড়োয়া জড়িত
এ ঠাঁই কখনো হেলার নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমসাময়িক কলকাতার থিয়েটার

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

"কালকাতায়, আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি, বড় শিয়ালের উৎপাত ছিল। সর্বত্র এঁদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শিয়ালের উৎপাত ছিল। এমনকি রাতে আমাদের উপরের ঘরে গিয়া তক্তপোষের নিচে থেকে হাঁড়ি চুরি করিয়া লইয়া পলাইত। হাঁড়ি মাথায় করিয়া দুপায়ে তাকে ধরিয়া বেশ সতর্কে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইত। পরদিন কানাচে খালি হাঁড়ি পাওয়া যাইত। কখনো কখনো ছোট ছেলেকেও লইয়া যাইত। ভাদ্রমাসে হন্যে শিয়াল হইত এবং দু-একজনকে কামড়াইয়াছে প্রায় শোনা যাইত।

"কলিকাতার চারদিকে নালা, পগার ও নর্দমা ছিল এবং চারিদিকে বাঁশঝাড়, কেলে হাঁড়ি ও আবর্জনা পড়িয়া থাকিত। গর্মিকালে বিশেষতঃ আমের সময় মাছি খাইয়া প্রায় বমি হইত ..."

বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতি! এরও বছর পঁচিশ আগে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে একদিন কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন সতের বছরের তরুণ গদাধর। অবশ্য তাঁর কাছে এই কলকাতাই তখন রীতিমত আধুনিক শহর।১ কলকাতা তখন আখড়াই, হাফ্‌আখড়াই, তরজা ছেড়ে থিয়েটারের পথে এগিয়ে চলেছে। এই পথটা প্রথম দেখিয়েছিল ইংরেজরাই। তাদের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শ্বেতাঙ্গশাসকদের চিত্তবিনোদনের জন্য লালবাজারে 'দি প্লে হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্লে হাউস'কে অনুসরণ করে 'দি নিউ প্লে হাউস' অথবা 'দি ক্যালক্যাটা থিয়েটার' নামে আরও একটি ইংরেজী মঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। এসব মঞ্চ পুরোপুরি ইংরেজ-নিয়ন্ত্রিত। শ্বেতাঙ্গরাই সেখানে অভিনয় করত, অভিনীত হতো ইংরেজী নাটক এবং দর্শকরাও কেবলমাত্র ইংরেজ। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পুরুষরাই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে চৌরঙ্গীর একটি বাড়িতে শ্রীমতী ব্রিস্টো প্রাইভেট থিয়েটার খুলে অভিনয় শুরু করেন। তিনি প্রথম ইংরেজ-ললনা যিনি কলকাতার মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মঞ্চে প্রথম বাঙলা নাটক অভিনয়ের কৃতিত্বও একজন বিদেশীর। ইনি রুশ দেশীয় পর্যটক হেরাশিম লেবেডফ। কলকাতার ডোমতলায় মঞ্চ বেঁধে ইনি এম. জডরেলের 'দি ডিসগাইজ'-এর বাঙলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় করান। এতে কিন্তু মেয়েরাই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সম্ভবতঃ ঝুমুর, যাত্রা দল থেকে এইসব অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়েছিল।

ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-কলেজে কিছু কিছু ইংরেজী নাটক অভিনীত হতে থাকে। ক্রমশঃ কলকাতার বাবু-শ্রেণীও নাট্যসচেতন হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের উদ্যোগে ইংরেজী বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ তাঁদের বাড়িতে বাঁধা মঞ্চে অভিনীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বছর কলকাতায় পদার্পণ করেন (১৮৫৩) সেই বছরই ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের স্কুলগৃহে মঞ্চ তৈরি করে শেক্সপীয়ারের 'ওথেলো' নাটক মঞ্চস্থ করে। মঞ্চের নাম হয় ওরিয়েন্টাল থিয়েটার। এই ষষ্ঠ দশকেই একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, মেট্রোপলিটন থিয়েটার। 'নাট্যশালা' বা 'রঙ্গমঞ্চ' নাম হলেও এগুলি কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। কোন বিশেষ ধনী ব্যক্তির উৎসাহে তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে বা বৈঠকখানায় দু-একটি নাটক অভিনীত হতো। নাটক সম্পর্কে উৎসাহ জেগেছে অথচ অভিনয় করার উপযোগী নাটক নেই—খাঁটি নাট্যকারেরও আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং রাজা বা জমিদার শ্রেণীর কেউ কেউ নাটকরচনায় পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতেন। এই ষষ্ঠ দশকেই

---

১ মহেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ। তাঁর শৈশব বলতে ৮ থেকে ১০ বছর বয়স অনুমান করে নিতে পারা যায়। সুতরাং ১৮৭৭ বা তার পরবর্তী কালের বর্ণনা বলেই মনে করা যেতে পারে।

কুাড়গ্রামের জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরী ঘোষিত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটক লিখে ৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। বলতে গেলে, এইসময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। রামনারায়ণ এরপর আরও কয়েকখানি নাটক লেখেন। তাঁর ‘রত্নাবলী’ নাটকটি যখন বেলগাছিয়া মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো তখন শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের সুবিধার্থে (বাবুদের আত্মীয় বন্ধুরাই তখন দর্শনের অধিকার লাভ করতেন এবং স্বভাবতই বন্ধুদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা কম ছিল না।) ইংরেজী সংক্ষিপ্তসার রচনার জন্য একজন ইংরেজী অনুবাদকের প্রয়োজন হয়। রাজাদের বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর সংক্ষিপ্তসার অনুবাদের ভার দেওয়া হয়। তিনি নাটকটি পড়ে রীতিমত হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং এরকম চ্যালেঞ্জ নিয়েই স্বয়ং বাঙলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত পণ্ডিত—সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসরণ করেই তিনি নাটক লিখতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদনের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং সেই প্রথম পাশ্চাত্যরীতিতে মৌলিক বাঙলা পৌরাণিক নাটক রচিত হলো ‘শর্মিষ্ঠা।’ পরপর তিনটি নাটক (শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী) ও দুটি প্রহসন (একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ) লিখে মধুসূদন বাঙলা নাট্যসাহিত্যে কালান্তর আনলেন। সপ্তম দশকের গোড়াতেই আবির্ভাব শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের। একে একে মনোমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের আবির্ভাবে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও নাটক দেখার স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু তাদের সে সুযোগ তখনো আসেনি। ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ব্যবস্থাপকরা কিছু কিছু সাধারণ দর্শককে নাটক দেখার অধিকার দেবার কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। প্রথম দিকে এই দর্শনের অধিকার লাভ করার জন্য পূর্বাহ্নে নিজের যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে ব্যবস্থাপকদের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হতো। দরখাস্তের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র যোগ করতে হতো যাতে দরখাস্তকারীর অধিকার সাব্যস্ত হয়। ব্যবস্থাপকরা আবেদনকারীদের গুণাগুণ বিচার করে কিছু লোককে নির্বাচিত করে তাদের অনুমতি-পত্র দিতেন। সে পত্র পাওয়া তখনকার দিনে এতখানি গৌরবজনক ছিল যে, তাঁরা এই-রকম অনুমতি-পত্র পেয়ে প্রত্যেক লোককে দেখিয়ে বেড়াতেন এবং কিভাবে সেটি লাভ করেছেন তার কাহিনী শোনাতেন।

সাধারণ দর্শকের এই দুঃখমোচন হলো ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায়। এই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার একটা পটভূমিকা আছে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েকজন যুবক বাগবাজারে একটি দল তৈরি করে ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের যাত্রাপালা শুরু করেন। যখন পালা বেশ সুখ্যাতি অর্জন করল তখন তাঁদের থিয়েটার করার শখ হলো ; কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জার জন্য যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। সে অর্থ সংগ্রহ করা বা নিজেদের উপার্জন থেকে দান করা সম্ভব নয় বলে তাঁদের চেষ্টা সহজে ফলবতী হওয়া সম্ভব ছিল না। সেই সময় দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক নাটক—দৃশ্যপটের বাহুল্য নেই, পোশাক-পরিচ্ছদও সাধারণ। সকলের চেষ্টায় তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হলো এবং ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে শারদীয়া পূজার সময় বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ‘সধবার একাদশী’ অভিনীত হলো। সম্প্রদায়ের নাম হলো ‘বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার’। পরপর কয়েকটি অভিনয় হলো সাফল্যের সঙ্গে। ‘সধবার একাদশীর’ পর ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ (দীনবন্ধু মিত্র) অভিনয় করেও এঁরা সুখ্যাতি লাভ করেন। প্রীত জনসাধারণের তাগিদে ‘লীলাবতী’ নাটক মঞ্চস্থ হলো এবং থিয়েটারের নাম পরিবর্তিত করে রাখা

হলো 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার।' 'লীলাবতীর সাফল্যে উল্লসিত সম্প্রদায় টিকিট বিক্রি করে রীতিমত অভিনয় করার কথা চিন্তা করতে শুরু করল। এই নিয়েই মতান্তর ঘটল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্র টিকিট বিক্রি ও নামকরণ দুটোতেই আপত্তি জানালেন। কারণ তাঁর মতে, সামান্য পুঁজিতে শ্রীহীন দৃশ্যপট ও অন্যান্য যা ব্যবস্থা করা যাবে তাতে সেই থিয়েটারকে জাতীয় নাট্যশালারূপে (ন্যাশন্যাল থিয়েটার) অভিহিত করা জাতীয় দৈন্য প্রকটিত করার সামিল। শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে এনিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শোনাও যেতে পারে আর এরই জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু নয়। গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে স্টেজ বেঁধে সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন হলো—টিকিটের মূল্য ২৲, ১৲ ও আট আনা। স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হলো পুরুষরা। ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীর আবির্ভাব মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে। মধুসূদনের ইচ্ছানুসারেই বেঙ্গল থিয়েটার নারী চরিত্রে স্ত্রীলোকের অভিনয়ের সূত্রপাত করে এবং এই শর্তেই মধুসূদন অসুস্থ অবস্থায় তাদের জন্য 'মায়াকানন' নাটক রচনা করেন ; কিন্তু তিনি স্বয়ং বাঙলামঞ্চে স্ত্রীলোকের অভিনয় দেখে যেতে পারেননি—বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটনের আগেই ২৯ জুন ১৮৭৩ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৮৭২ থেকে যেমন সুরু হয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়ের জয়যাত্রা, ১৮৭৩ থেকেই তেমনি বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দুর্যোগ। সেকালে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা মঞ্চে অভিনয় করবেন এটা অবাস্তব কল্পনা, সুতরাং তাদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল পতিতা-শ্রেণী থেকে। সমকালীন অভিজাত শ্রেণী এব্যবস্থা সুচক্ষে দেখেননি। তাঁরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং নানা বিপত্তির মধ্যে দিয়েই বাঙলার থিয়েটারকে তখন এগোতে হয়েছে। সেকালে আর এক মারাত্মক ব্যাধি ছিল দলাদলি। এক ন্যাশন্যাল থিয়েটারই ভেঙেছে বেশ কয়েকবার। এর সঙ্গে থিয়েটারের অর্থ জোগানদারদের ব্যক্তিগত খামখেয়ালও সংযুক্ত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের পথ অমসৃণ করে তুলেছিল।

॥ ২ ॥

বর্তমানকালের বিলাসবহুল, সুসজ্জিত, সুমার্জিত থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে বসে সেকালের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কোন ধারণা করা যাবে না। তখন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কলকাতাতেই নেই। রাস্তায় রেড়ির তেলের আলো জ্বলে—থিয়েটারে গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত। আবহসৃষ্টির অনুকূল কোন ব্যবস্থাই নেই। স্থির মঞ্চ—প্রতি দৃশ্যের পর পর্দা ফেলে দৃশ্যপট পাল্টাতে হয়। অভিনয় রীতি ছিল বিশিষ্ট শিল্পিকেন্দ্রিক এবং উচ্চগ্রামে বাঁধা। শব্দ প্রক্ষেপণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাবে সব শিল্পীকেই কণ্ঠের উপর নির্ভর করতে হতো। দর্শকশ্রেণীর রুচি তখনও যাত্রাপালায় অভ্যস্ত। সুতরাং ঢালাও নাচগান এবং স্থূল ভাঁড়ামি ছাড়া থিয়েটার জমত না। তখন কলকাতায় জনসংখ্যা কম, তদুপরি অভিনেত্রীদের যোগদানের ফলে একটি শ্রেণী থিয়েটার থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় সেকালের মঞ্চ-সফল নাটকেরও একটানা ২০।২৫টির বেশি অভিনয় হতো না। মঞ্চের প্রতি বিতৃষ্ণা খানিকটা কমে গিয়েছিল ১৮৮৪-তে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের পর। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ধর্মীয় জগতের মানুষের থিয়েটার কিছুটা কৌলীন্য লাভ করে।

থিয়েটার হতো শনিবার ও রবিবার অথবা বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনে। রাত নটায় সুরু হয়ে ছ-সাত ঘণ্টা অভিনয় চলত। কর্পোরেশনের নতুন আইনে যখন রাত্রি একটার পর অভিনয় নিষিদ্ধ হলো তখন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের রীতিমত মাথায় হাত। প্রতিবাদের ঝড় উঠল, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ কিছু হয়নি। সত্যই চার ঘণ্টায় থিয়েটার শেষ করা তখনকার কালে দুরূহ ব্যাপার ছিল। রাত আটটার আগে অভিনয় আরম্ভ

করারও প্রশ্ন নেই, কারণ যে ক্ষুদ্র দর্শক-শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তাঁরা সারাদিনের কাজকর্ম সেরে তবে থিয়েটারে আসার ফুরসৎ পেতেন। তা ছাড়া মেয়েরা তাঁদের রান্নাবান্না প্রভৃতি কাজকর্ম সেরে আহারের পাট চুকিয়ে তবেই থিয়েটারে আসার সুযোগ পেতেন। মেয়েদের বসার ব্যবস্থা ছিল দোতলায় চিকের আড়ালে। তাঁদের সঙ্গে আনীত শিশুদের শয়নের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট রাখতে হতো—রাখতে হতো শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত পরিচারিকা। রাত ১২টার পর থিয়েটার শেষ হলে যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি—তারও সংখ্যা সামান্য। সুতরাং দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় যারা থিয়েটার দেখতে আসত তারা শেষ অঙ্কের মাঝামাঝি সময়েই উঠে পড়ত। দোতলার পরিচারিকাকে খবর দিলে সে মেয়েদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করত 'অমুক জায়গার অমুক বাড়ির মেয়েরা উঠে এস—তোমাদের বাড়ির লোক ডাকছে।' একবার এই রকম সংবাদ পেয়ে এক মহিলা শিশুকক্ষে গিয়ে নিজের শিশুটিকে কোলে নিয়ে স্বামীর (বা বাড়ির লোকের) সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরেই থিয়েটার ভাঙতে অন্য এক মহিলার আর্তনাদ, কান্নাকাটি। সেই মহিলার শিশুটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি শিশু তখনো অবশিষ্ট আছে বটে এবং সেই মহিলার সন্তানটির মতোই তাকে দেখতে, কিন্তু তার গলায় রয়েছে একটা মাদুলি—যা তাঁর ছেলের ছিল না। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন—তাঁরা গিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করারও চেষ্টা করতে লাগলেন—ভুল করে যে ছেলে নিয়ে গেছে, সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। এইভাবে প্রায় একঘণ্টা কাটল—থিয়েটারের কেউ বাড়ি যেতে পারছে না—স্বামী ভদ্রলোকও ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছেন—এমন সময় বহুদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেল—দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। অবশেষে সত্যই সেই ঘোড়ার গাড়িতে এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এলেন—তাঁর কোলে একটি শিশু। উভয় মহিলা অশ্রুভারাক্রান্ত হাসিমুখে স-মাদুলি ও নির্মাদুলি শিশু বিনিময় করলেন। কর্তৃপক্ষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

তখনকার শিল্পীরা বেতনভোগী হলেও তাদের বেতন ছিল আজকের তুলনায় হাস্যকর। ভ্রাম্যমাণ ন্যাশন্যাল থিয়েটার ছেড়ে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন মাত্র পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের একধরনের হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠত। একবার থিয়েটার শেষে দেখা গেল বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে—দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে যেতে পারছেন না। তাঁদের চিত্ত বিনোদনের জন্য অর্ধেন্দু মুস্তাফি মুখে মুখে নাটক তৈরি করে ফেললেন এবং নাচ গান সব-মিলিয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন। বৃষ্টি থামল—নাটকও শেষ হলো।

॥ ৩ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো বাবু-থিয়েটারে গিয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তখন তাঁর সাধনার কাল—তাঁর পরিচয়ও বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। সুতরাং যেখানে কেবলমাত্র বাবুদের বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদেরই নিমন্ত্রণ হতো সেখানে তাঁর উপস্থিতি ঘটেনি বলেই মনে হয়। ১৮৭২-এ যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সুরু হয়েছে এবং তাঁর খ্যাতিও ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছে, ভক্ত সমাগমও আরম্ভ হয়েছে তখনই একমাত্র তাঁর থিয়েটারে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে—কিন্তু সেটাও ঘটেছে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বারো বছর পরে। তার আগে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে কেশবচন্দ্রের 'লিলিকটেজে' ধর্মমূলক নাটক 'নববৃন্দাবনে'র অপেশাদারী মঞ্চাভিনয় দেখেন। এখানে নরেন্দ্রনাথও অভিনয় করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেটিই তাঁর প্রথম থিয়েটার দর্শন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪—স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলায়'। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।[২]

---

[২] ঊনিশ শতকের শেষাংশে ও পরবর্তী কালে কলকাতার নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থ এবং 'বাঙলা নাট্যসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা' প্রবন্ধ ('উদ্বোধন'-ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৮৭) দ্রষ্টব্য।

কলকাতার ভাষা

উদয়কুমার চক্রবর্তী

কলকাতার ইতিহাস কতদূর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে আমাদের? ১৬৯০-তে ইংরেজরা কলকাতায় এসেছিল প্রথম। তারও আগে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে (আনুমানিক) এসেছিল আর্মেনিয়ানরা। কোন্ মুহূর্তে কলকাতার জন্ম? কোন্ মুহূর্ত থেকে বাঙলাভাষা কলকাতাকে কেন্দ্র করে তার একটি ভাষাবৃত্ত রচনা করল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। কোন পাথুরে প্রমাণ কিংবা অন্য কোন নিদর্শন এখনো আমরা পাইনি, যা দেখে সহজ সূত্রের মতো বলা যাবে এসব কথা। তবু অনুমানের উপরই নির্ভর করতে হবে আমাদের। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে একসময়ে যে গঙ্গারিডি জাতি বাস করত, এখন যাকে কলকাতা বলছি সেই অঞ্চলে তারাও হয়তো একদা বিচরণ করত। কিংবা তারও আগে নিগ্রোবটু সম্প্রদায়। এরই মধ্যবর্তী সময়ে হয়তো আর্যদের আর এক শাখা নোম্যাডিক এরিয়ান এসেছিল নিম্নবঙ্গে। কলকাতার আদি বাসিন্দা যারা তারা হয়তো অস্ট্রিক কি নোম্যাডিক এরিয়ান প্রভৃতি জাতির লোক। ইতিহাস-পূর্ব যুগে হয়তো এরাই নিজস্ব গোষ্ঠীতে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করত এবং ভাষার স্বাভাবিক গতিশীলতায় এই ভাষা বিবর্তি হয়েছে, তৈরি হয়েছে ভাষাগতমিশ্রণ কিংবা ধীরে ধীরে অন্য একটি শক্তিশালী ভাষা—আর্যভাষা—এসে গ্রাস করে নিয়েছে তাদের। তবে একথা ঠিক, ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ এবং তারপর অবহট্‌ঠ এবং তার পরবর্তী স্তর হিসাবে প্রাপ্ত প্রত্ন-বাঙলা, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো কলকাতাতেও ব্যবহৃত হতো। কলকাতার ভাষা মূলতঃ এই বাঙলা ভাষা। বর্তমানে দেখা যাবে কলকাতায় বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর লোক বসবাস করে। এই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোক আসলে আগন্তুক ভাষা-গোষ্ঠী। দেশগত বিভাজনে ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী এবং বহির্ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী এই দুটি ভাগে ভাগ করা যাবে। আর ভাষাগোষ্ঠীগত বিভাজনে আর্য গোষ্ঠী এবং অন-আর্যগোষ্ঠী—এই দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যাবে। ভাষাগত এই সূক্ষ্ম বিভাজনে না গিয়ে আমরা এখানে কলকাতায় ব্যবহৃত বাঙলা ভাষার যে নমুনা মূলতঃ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাই সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

কলকাতার মূল বাসিন্দা কারা, অন্ততপক্ষে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কারা কলকাতায় থাকতেন, সেকথা জানতে পারলে বোঝা যায় তাদের ভাষা কি ছিল। ১৭৫২-তে হলওয়েল কলকাতার মোট লোকসংখ্যা বলেছিলেন চার লক্ষ ন-হাজার। অবশ্য এই হিসাব অতিরঞ্জিত। পরবর্তী একশো বছরেরও বেশি সময়ে এই লোকসংখ্যা দু-লক্ষের মতো বেড়েছে। আমরা এখানে পরপর কয়েকটি বছরের জনসংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, কলকাতার জনসংখ্যায় তেমন হেরফের ঘটেনি।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ	মোট	জনসংখ্যা	৬,১১,৭৮৪
১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ	,,	,,	৬,৮৪,০৫৮
১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ	,,	,,	৬,৮১,৫৬০
	(+৩১,৪২৩+২৮,১৬১)		
১৯০১	,,	,,	৮,৪৩,১৮৪

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ-এর জন্ম কলকাতাতেই। বাকি অর্ধেকের জন্ম বাংলারই নানা জায়গায় এবং সাতভাগের একভাগ এসেছে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে। বাংলার অন্যত্র যাদের জন্ম, তাদের পাঁচভাগের একভাগ চব্বিশ পরগনার লোক এবং বাদবাকি সব মেদিনীপুর, হুগলী, পাটনা, কটক ও গয়া অঞ্চলের। এথেকে একথাই প্রমাণিত হয় কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে বাংলা বা অন্যত্র থেকে আগত বাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীর মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ভাষা প্রধানতঃ চব্বিশ পরগনা, হুগলী, মেদিনীপুরের ভাষাকে এসময়ে গ্রহণ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় প্রায় সাতান্নটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হতো। এর মধ্যে একচল্লিশটি ভাষা এশিয়ার অন্তর্গত এবং ষোলটি এশিয়ার বাইরের ভাষা। ভাবতে অবাক লাগে, এই সময়ে কলকাতায় অবস্থিত জনসাধারণের মধ্যে বাঙলাভাষী এবং হিন্দীভাষীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। ১৯০১-এ গৃহীত ভাষা-ব্যবহারকারীর সংখ্যা আমরা এখানে লক্ষ্য করব।

বাঙলায় কথা বলে মোট	৪,৩৫,০০০ জন
হিন্দীতে কথা বলে মোট	৩,১৯,০০০ জন
ওড়িয়া ভাষায় বলে মোট	৩১,০০০ জন
ইংরেজীতে কথা বলে মোট	২৯,০০০ জন
উর্দুতে কথা বলে মোট	২৪,০০০ জন
অন্যান্য ভাষায় বলে প্রায়	৫,০০০ জন

এই হিসাব থেকে সহজেই বোঝা যাবে, পরবর্তী কালে বেশ একটি বড় রকমের মিশ্রণ ঘটেছিল। বিশেষতঃ, বাঙলাভাষার ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার প্রভাব তার শব্দভাণ্ডার লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যাবে। আর উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা ভাষায় যে বিশাল সংখ্যক কৃতঋণ শব্দ দেখা যায়, তার মিশ্রণ এবং গ্রহণ কলকাতাতেই সম্ভবতঃ হয়েছিল। তার কারণ, কলকাতাতেই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর পাশাপাশি অবস্থান ছিল। সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে একমাত্র কলকাতাতেই উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের একত্র অবস্থান ঘটেছিল।

কলকাতায় ব্যবহৃত বাঙলাভাষা মূলতঃ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-কৈবর্ত-সুবর্ণবণিক ও কামারদের ব্যবহৃত ভাষা হলেও সম্পূর্ণতঃ নয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে প্রাপ্ত এই হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, কলকাতায় উচ্চবর্ণের লোকজনদের আগমন একটু বেশি মাত্রায় হয়েছিল। সাহিত্য ও অন্যান্য লিখিত নিদর্শন এই উচ্চবর্ণের ভাষাকেই ধরে রেখেছে। যা ধরে রাখেনি, তা সাধারণ নিম্নবর্ণের বাঙলাভাষা ব্যবহারকারীর ভাষা। অথচ একসময় কলকাতা তাদেরই ছিল।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের সেনসাস রিপোর্ট থেকে কলকাতার লোকেদের কর্মভিত্তিক ও জাতিভিত্তিক একটি দীর্ঘ তালিকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই হিসাব থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কলকাতার কথ্য বাঙলাভাষা মূলতঃ নিম্নবর্ণের মুখের ভাষাই ছিল। কেরির 'কথোপকথন' গ্রন্থে এই নিম্নবর্ণের মুখের ভাষার অনেকখানিই ধরা আছে। আছে ভদ্র সমাজের কথাও। এখন দেখা যাক কলকাতায় প্রতি বছরই নানা গ্রাম এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যারা আসতেন তাঁরা কারা? কলকাতা ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজোদ্দৌল্লা ইংরেজদের হাত থেকে কেড়ে নেবার পর ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের তা পুনরুদ্ধার করেন। ঐবছরই পলাশীর প্রাঙ্গণে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হবার পর কলকাতা ইংরেজদের ব্যবসার মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এর পরবর্তী কালে গ্রাম থেকে বিতাড়িত কিংবা ভাগ্য অন্বেষণের আশায় আগতদের সংখ্যায় কলকাতা ভরে যায়। নানা গ্রামের নানা ভাষা ব্যবহার কলকাতার ভাষায় মিশে গেছে। কলকাতা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এখানে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ব্যবসায়ী। সুতরাং সদগোপ, ডোম, বাগদী, কেওট, নমঃশূদ্র-রা হয়তো কলকাতার মূলে বাসিন্দা ছিল। অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতিদের মধ্যে কিছু হয়তো কলকাতাতেই থাকত, বাকিরা এসেছিল নানা অঞ্চল থেকে। কলকাতার কক্‌নি এদেরই মিশ্রিত ভাষা যা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বা 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে ধরা আছে।

গ্রিয়ারসন ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থে জানান কলকাতায় কেন্দ্রীয় বা মান্য বাঙলা বলে প্রায় ৩,৭৫,৫২৮ জন লোক। কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও হাওড়ার ভাষা নিয়ে তৈরি এই কেন্দ্রীয় বাঙলাভাষা। গ্রিয়ারসন এই ভাষার চরিত্র সম্বন্ধে জানালেন যে, এটি সংস্কৃত অনুসারী কোমল ভদ্রভাষা। কলকাতার সাধুভাষার যে নমুনা তিনি দিয়েছেন, তা অবশ্য মুখের ভাষা নয়। এখানে সেই উদাহরণের কিছু অংশ লক্ষ্য করা যাকঃ

> “কোন এক ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটি তাহার পিতাকে কহিল, পিতঃ বিষয়ের যে অংশ আমার প্রাপ্য তাহা আমাকে দিন।”

পাশাপাশি মেয়েদের চলিতভাষার যে নমুনা তিনি দিয়েছেন, তা অবশ্যই মেয়েদের মুখের ভাষা। যেমন,

“একজনের দুই ছেলে ছেল। তাদের যে ছোট সে তার বাপকে বল্লে, ‘বাবা, আমার ভাগে যা পড়ে তা আমাকে দাও।’ বাপ তার বিষয় আশয় তাদের মধ্যে বেঁটে দিলে।”

ছেলেদের মুখের ভাষা এরই কাছাকাছি ছিল। এখানে বিশেষভাবে মেয়েদের মুখের ভাষায় ব্যবহৃত কিছু শব্দ যা উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হতো তা এখানে দেওয়া হলো।

জিনিসপত্তর, বদখেয়ালি, সোর চরাতে, খাচ্চে, যাচ্চে, করিচি, যুগ্যি, কর্তে লাগল, নাচা গাওনা, জিগগেস কর্লে, ব্যাওরাখানা (=ব্যাপারখানা), স্যাবা (=সেবা) ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাক্য গঠন বর্তমান কথ্য বাঙলার মতো ছিল। যেমন,

তোমার বাপের বাড়িতে ক-জন ছেলে আছে ?
ওর পিটে জিন দাও।
তার ভাই তার বোনের চেয়ে ঢ্যাঙা। ইত্যাদি।

সবশেষে আমরা কলকাতার লিখিত বাঙলার কিছু নিদর্শন যা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীসন্ধিতে বাংলা লিখিত ভাষার এক নর্ম (norm) তৈরি করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে, তার উল্লেখ করব। মনে রাখতে হবে, কলকাতার ভাষা নিয়ে এই আলোচনা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা এখানে লক্ষ্য করছি।

ইউরোপীয়দের লিখিত গদ্য কলকাতা-হুগলী-শ্রীরামপুর-চন্দননগর-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গদ্যকেই অবলম্বন করেছে। বিখ্যাত কর্ণওয়ালিশ কোড—থেকে আমরা উদ্ধৃতি গ্রহণ করতে পারি তাদের ভাষার নমুনা হিসাবে।

“শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের তাবৎ আইন, তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল।” [১৭৯৩, টাইটেল পেজ, H. P. Forster কৃত অনুবাদ]

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে কেরির ‘কথোপকথন’ গ্রন্থটি। নানা শ্রেণীর নানা ধরনের কথোপকথন তিনি সেখানে সংগ্রহ করেছেন।

কলকাতার লিখিত ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দেখা যায় ফারসী-বাহুল্য এবং তার পাশাপাশি সংস্কৃতবহুল গদ্যভাষা। পাশাপাশি দুটি উদ্ধৃতি রাখলেই এই বাহুল্য বোঝা যাবে।

“তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায়ক্রমে বিমর্ষ হইয়া হজুর এত্লা কারণ বেত্তরা পুরস্যারে আরজদাস্ত করিলে বাদশাহ মহারোষান্বিত সেনাতে সাজনিঘোষণ ডঙ্কা দিতে হুকুম করিলেন” [রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ১৮০১, রামরাম বসু, পৃঃ ২২]।

“দৈবলোকিকোভয় সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল” [বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার]।

বলা বাহুল্য, কলকাতায় এইভাবে শিষ্ট গদ্য ভাষার যে পথপরিক্রমা শুরু হয়েছিল, তাতে ফারসী-বাহুল্য কমে গিয়েছিল অনেক, সংস্কৃত আতিশয্যও। বাঙলাভাষার মধ্যে গৃহীত হয়েছিল ইওরোপীয় শব্দ। তবুও লিখিত ভাষার মধ্যে মৌখিক ভাষাও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। যেমন,

“হ্যাদে দেখ্ লেতাই, ফ্যার্ ঝদি কালকুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড় গা,” [সম্বাদ প্রভাকর, অগ্রহায়ণ-১, ১২৬১ সাল, পৃ-৬, ঈশ্বর গুপ্ত]।

এই ধরনের উক্তি অবশ্য নিম্নশ্রেণীর মানুষদের।

কলকাতার মুখের ভাষা বিশেষভাবে প্রহসন ও নাটকের সংলাপে লক্ষ্য করা যাবে। কোথাও কোথাও মুখের ভাষার ব্যবহার কুণ্ঠিতভাবে হলেও, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন,

“তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জানতিস, তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্লে মূর্খতার সম্মান করা হয়।”

[সধবার একাদশী, ১৮৬৬, দীনবন্ধু মিত্র]।

সামাজিক নকশা জাতীয় রচনার নিদর্শন হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি থেকে নিদর্শন উপস্থাপিত করে আলোচনা শেষ করব।

> "আমি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেত্না ফিকির, কেত্না পেঁচ—কেত্না শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়।"

[আলালের ঘরের দুলাল, ১৮৫৮, প্যারীচাঁদ মিত্র]।

> "ঘরকন্নার কর্ম কিছু থা পাইনে—হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাসনমাজা হয়নি ওদিকে ঘর নিকন হয়নি, তারপর রাঁদা বাড়া আছে—" [ঐ]

> "সেপাই পাহারা" "আসা সোটা" ও "রাজা খেতাপ" ইন্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত রাস্তায়, পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলো।"

[হুতোমপ্যাঁচার নকশা, ১৮৬৪, কালীপ্রসন্ন সিংহ]।

> "রঘুর তিন পাত উলটেই ভিটেতে ঘুঘু চরাবার কতকগুলির ইয়ার এসে জুটলো। তাহাদিগের সহবাসে নববাবু বিলক্ষণ কৌতুকামোদী হোয়ে পোড়লেন।" [আপনার মুখ আপনি দেখ, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়]।

অজস্র লেখায় এইভাবে কলকাতার ভাষা তার নিজের পরিচয় তুলে ধরেছে। তার সব উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা এখানে সম্ভব নয়।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থিকে বাঙলার সঙ্গে ফারসী ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মিশ্রণ শুরু হয়েছে। ১৮৩৮-এর পর থেকে ফারসীর মিশ্রণ বন্ধ হয়েছে। কলকাতা ইংরেজদের অধীনে আসার পর থেকে মূলতঃ তাদেরই স্বার্থে যে ব্যাপক গদ্যচর্চা শুরু হয়েছিল তার ফলে বাঙলা গদ্যসাহিত্যে বিধৃত হয়েছে কলকাতার ভাষা, আর কলকাতার ভাষা হয়েছে অন্য স্থানের বাঙলাসাহিত্য রচনার আদর্শস্বরূপ।

কলকাতার মৌখিক ভাষার নির্দশন আমরা এই আলোচনায় পেয়েছি প্রধানতঃ তিনটি সূত্র ধরে।

ক. নানা শ্রেণীর লোকের মুখের কথাবার্তা সংগ্রহ গ্রন্থ। যেমন কথোপকথন।
খ. নাটক-প্রহসন-এর সংলাপ। উপন্যাস-নকশার ভাষা।
গ. চিঠিপত্র-সংবাদপত্র।

আর এর সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক-এর গবেষণামূলক সংগ্রহ, যেমন গ্রিয়ারসন কর্তৃক সংগৃহীত ভাষা নিদর্শন।

এর পাশাপাশি কলকাতায় যে গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়েছে তার ভাষাগত আদর্শ যেসব অঞ্চলের ভাষা নিয়ে তৈরি হোক না কেন, এই গদ্যভাষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একদিকে তা যেমন ফারসী ও সংস্কৃত বাহুল্য অতিক্রম করে নতুন পথ নির্মাণ করছিল অন্যদিকে তেমনি সমগ্র অঞ্চলের বাঙলাসাহিত্যের ভাষায় একটি নির্দিষ্ট রূপ তৈরি করেছিল।

যাকে শিষ্ট চলিত বাঙলা বলা হয়, তাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিখিত ভাষায় মার্জিত স্বভাব থেকে এসেছে—একথা বলাও বোধহয় অনুচিত হবে না। শিক্ষিত সমাজের মার্জিত স্বভাব এবং ব্রাহ্মদের মার্জিত মানসিকতা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলকাতার ভাষার গ্রাম্যতা দোষ কাটাতে সচেষ্ট হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা কলকাতার ভাষায় 'ভাতার' শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের মার্জিত রুচি এই শব্দটির উচ্চারণে কুণ্ঠা বোধ করেছে। 'ভাতারখাকি' না বলে তিনি 'ভর্তৃখাদিকা' বলেছেন।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই কিন্তু কলকাতার ভাষা তার অমার্জিত রূপ নিয়ে সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ব্যবহৃত হতো। এই ভাষার স্থিতিশীল কোন রূপ ছিল না। কারণ নানা অঞ্চলের নানা ধরনের ভাষা-ভাষীর লোকজন আসার ফলে ভাষাগত বৈচিত্র্যও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে কলকাতার ভাষা একটি স্থিতিশীল রূপ নেবার চেষ্টা করতে থাকে। আর এই রূপ নেবার ক্ষেত্রে সাধারণের মুখের ভাষাকে অপসারিত করতে থাকে অভিজাত পরিবারগুলি এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষা-বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের রচনার অবদানে কলকাতা ও ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষা সাহিত্যে তার সুনিশ্চিত আসন গ্রহণ করেছে। আর সৃষ্টি করেছে একটি বিশাল সাহিত্যধারা।

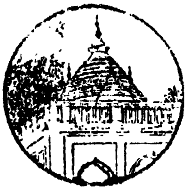

গ্রন্থ পরিচয়

পুরনো কলকাতার কথা

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথাঃ মহেন্দ্রনাথ দত্ত। দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৩ নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬। মূল্যঃ ছয় টাকা।

জর্জ অরওয়েল এক জায়গায় লিখেছিলেনঃ "And above all, it is your civilisation, it is you. However much you hate it or laugh at it, you will never be happy away from it for any length of time. ... Good or evil it is yours, you belong to it." তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন লন্ডন শহর সম্পর্কে। কথাগুলি আমাদের কলকাতা সম্পর্কেও আশ্চর্যরকম সত্যি। 'আনন্দ নগরী' বা 'মুমূর্ষু নগরী' যাই হোক না কেন এ শহরের বিরহ আমাদের কাছে অসহনীয়। কলকাতা তার সবটুকু ভাল-মন্দ নিয়েই আমাদের মজ্জায় মিশে গেছে। কাজেই কলকাতার পরকাল নিয়ে আমাদের যেসব ভাবনার শেষ নেই তেমনি এর পুরাকাল সম্পর্কেও আমাদের আগ্রহের অন্ত নেই। আসলে ~~কোন কিছুরই অতীতকে না জেনে~~ বর্তমানের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই তিনশো বছরের আলোয় কলকাতাকে নতুন করে হৃদয়ঙ্গম করতে শহরের প্রাচীন বৃত্তান্তের পাঠ আমাদের কাছে আদরণীয়।

আলোচ্য গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত সহজ সরল ভাষায় পুরনো কলকাতার রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও সমাজচিত্র তথ্যনিষ্ঠ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো লেখক এখানে সামাজিক প্রথা বা রীতি-নীতি নিয়ে কোন ব্যঙ্গরচনা বা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবতারণা করেননি; বরং অনেকটা ঐতিহাসিক তথ্য বা সংবাদ পরিবেশনের ধাঁচেই সেইসব কাহিনী বিনা মন্তব্যে বা নামমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সহ হুবহু বর্ণনা করেছেন। চমৎকৃত হতে হয় লেখকের পর্যবেক্ষণশক্তি দেখে। তখনকার দিনে বাহিরমহল ও অন্দরমহলের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় না থাকলেও মহেন্দ্রনাথ নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন, 'দুপুরবেলা মেয়েদের একসঙ্গে হওয়া'র কাহিনী, 'মেয়েদের মাথা ঘসা', 'উলুধ্বনি', 'সিন্দুর চুপড়ি ও কাজল', 'চিরুনি ও আরশি', 'চুল বাঁধা', 'আঁতুর ঘর' প্রভৃতির বর্ণনা। একালের নারী জাগরণের যুগে তখনকার নারীসমাজের এই চিত্র যেন সংরক্ষণযোগ্য এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল। প্রাচীন কলকাতায় প্রথম চা-পানের প্রচলন হলো কিভাবে তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। তখন চীন থেকে চা আসত। তাঁর ভাষাতেই বলিঃ "আমরা যখন খুব শিশু তখন একরকম জিনিস শোনা গেল—চা। ... একটা কালো মিন্‌সে (কালো কেটলী) মুখে একটা নল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর কুঁচো পাতার মতন কি দিলে, গরম জল দিলে, তারপর ঢাললে ~~একটু দুধ চিনি~~ দিয়ে খেলে। আমরা তো দেখে আশ্চর্য।" (পৃঃ ২১)

কলকাতার আয়তন তখন ছোট ছিল বলে তার সমাজের পরিধিও ছিল সীমিত। কাজেই তখনকার সংস্কৃতি যথার্থভাবে লোকপ্রিয় ছিল। তারই উজ্জ্বল উদাহরণ গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা, কেষ্ট যাত্রা, নোকো ধোপার যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, তরজা, পুতুলবাজি, হাটখোলার বারোয়ারি প্রভৃতি। আধুনিক আর্ট ফিল্ম বা প্রতীকী নাটকের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে এগুলি যে বিচ্ছিন্ন ছিল না তাও স্পষ্ট বোঝা যায়। সামাজিক প্রথা ও সাংস্কৃতিক বিনোদনের পাশাপাশি লেখক বিভিন্ন পূজা-পার্বণ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনা রয়েছে বিভিন্ন গুল্ম-বৃক্ষের পূজার ইতিবৃত্ত বিষয়েও।

শারদীয়া সংখ্যা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

আশ্বিন ১৩৯৬ ৯১তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

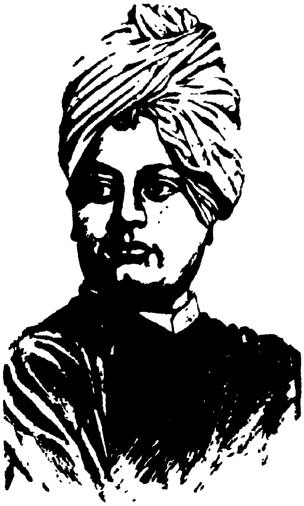

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ··· ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।··· এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

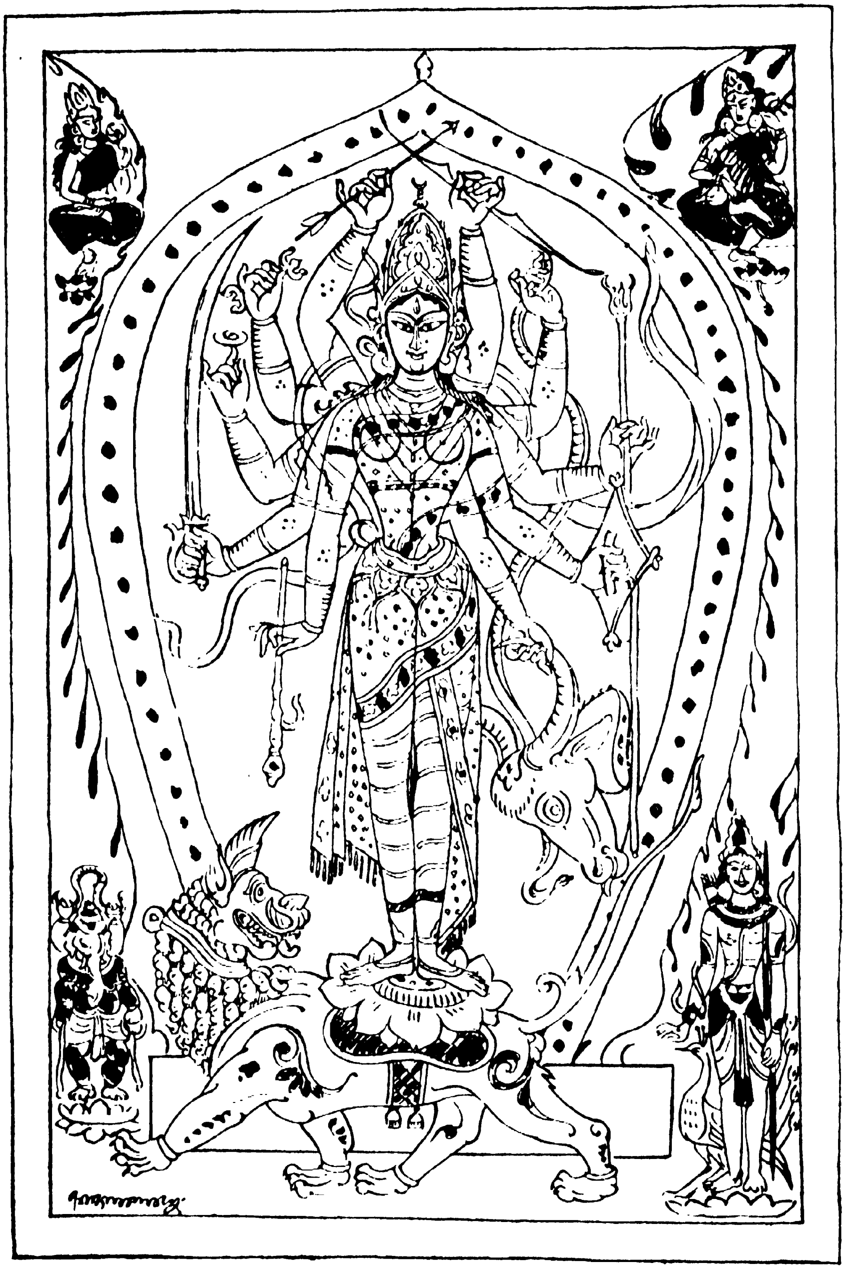

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র ।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২২

শিল্পী : নন্দলাল বসু

উদ্বোধন

আশ্বিন, ১৩৯৬ ৯১তম বর্ষ—৯ম সংখ্যা

তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং
বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্ ।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং
হরঃ সংক্ষুদ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিবিধম্ ॥

*

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা।
তথা হি ত্বৎপাদোদ্বহন-মণিপীঠস্য নিকটে
স্থিতা হ্যেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমু(ম)কুটাঃ ॥

*

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী
তবেত্যাহুঃ সন্তো ধরণিধররাজন্যতনয়ে।
ত্বদুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ
পরিত্রাতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ ॥

শঙ্করাচার্য (সৌন্দর্যলহরী)

জননি! ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্মস্থিত অল্পমাত্র ধূলি সংগ্রহ করিয়া (অর্থাৎ পরমাণু লইয়া) তদ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন। পরে বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা ত্বদীয় (পাদপদ্ম-পরাগবিনির্মিত) সেই জগৎ ধারণ করিতেছেন। প্রলয়কালে হর স্বীয় তেজোদ্বারা এই জগৎ (দগ্ধ ও ভস্মাবশিষ্ট) বিচূর্ণিত করিয়া নিজ অঙ্গে সেই ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন।

*

হে শিবে! তোমার চরণকমল অর্চনা করিলে ত্রিগুণজনিত দেবত্রয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়, তাঁহাদিগের আর স্বতন্ত্র পূজার অপেক্ষা থাকে না। কারণ, তোমার চরণকমলের আধার মণিপীঠের নিকটে নিরন্তর অবস্থিত এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর করপুটে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক তোমার পাদপদ্মদ্বয় নিজ নিজ মুকুটের ভূষণস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন।

*

হে ধরণিধররাজন্যতনয়ে! জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে, তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা এই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে এই বিশ্বকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয়, তোমার নয়ন নিমেষ-পরিশূন্য হইয়া রহিয়াছে।

প্রসঙ্গ ঃ ঈশ্বরের মাতৃরূপ

বলিতেন, প্রত্যেক নারীই জগজ্জননীর অংশস্বরূপিণী। নারীর মধ্যে তিনি মা আনন্দময়ীকে দেখিতেন—সে নারী যে জাতির, যে ধর্মের, যে চরিত্রের হউক না কেন। তিনি বলিতেন, মাতৃভাব জগতের সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও কল্যাণকর ভাব। তাঁহার সর্বপ্রধান শিষ্য এবং সর্বোত্তম বাণীবাহক ও ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, নারীর সর্বোচ্চ আদর্শ জননী। তিনি বলিতেন, "যে হস্তদ্বয় শিশুকে দোল দেয়, তাহাতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ।" পৃথিবীর প্রথম আলোক দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মানব যাঁহাকে প্রথম দর্শন করে তিনি তাহার জননী। তাই বোধহয় মানবশিশুর কণ্ঠ-উৎসারিত প্রথম শব্দও 'মা'। একমাত্র মায়ের সঙ্গেই মানবের নাড়ীর সম্পর্ক। ইহা যেমন জৈবিক (biological) অর্থে সত্য, তেমনি সত্য মানসিক (mental), মনস্তাত্ত্বিক (psychological) এবং আধ্যাত্মিক (spiritual) অর্থেও। সর্ব অর্থেই মানুষ মায়ের সঙ্গেই সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত। সেকারণে জন্মলগ্ন হইতেই মানবচরিত্রের উপর মায়ের প্রভাব জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকে। মায়ের উপরেই মানবশিশুর সর্বাধিক নির্ভরতা, মা-ই তাহার পরম বিশ্বস্ত জন। যখন সে ভয় পায় তখন সে মাতৃঅঙ্কেই আশ্রয় খোঁজে; যখন তাহার আনন্দ হয় সে সর্বপ্রথম সেই আনন্দের ভাগীদার করিতে চায় মাকেই। দুঃখে অথবা আনন্দে মায়ের মঙ্গলহস্তই তাহাকে দেয় পরম স্বস্তি অথবা বাঞ্ছিত তৃপ্তি। মায়ের সঙ্গে মানবের এই সম্পর্কের জন্যই দেখা যায় মা যখন শিশুসন্তানকে দুষ্টামির জন্য প্রহার করেন তখন চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে, আঘাতে জর্জরিত হইতে হইতে মাকেই সে জড়াইয়া ধরে। কারণ, জন্মলগ্ন হইতেই তাহার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, যে হাত তাহাকে আঘাত করিতেছে সেই হাতই আবার পরক্ষণে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিবে, যে চোখ এবং মুখ সে এতক্ষণ ক্রোধে জ্বলিতে দেখিয়াছিল সেই চোখই কয়েক মুহূর্ত পরে জলে ভাসিবে এবং সেই মুখই তাহার অশ্রুলিপ্ত মুখকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দিবে। বস্তুতঃ মানুষ যাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে, অথবা যাহাকে সর্বাধিক ভালবাসা বা শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে চায় তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ সে অজ্ঞাতসারে নিজের মাকেই দেখিতে চায়। ইহাই মানুষের সহজাত মনস্তত্ত্ব। মানব-ইতিহাসের উষালগ্নে মানব যখন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিল তখনো তাহার ভাবনায় এই মনস্তত্ত্বটি ক্রিয়াশীল ছিল।

ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা কি বলিবে জানি না, তবে আমাদের মনে হয়, মানুষ যখন উচ্চতর বা উর্ধ্বতর কোন অ-লৌকিক অথবা অতি-প্রাকৃত শক্তির প্রথম কল্পনা করিয়াছিল তখন তাহাকে নারী হিসাবেই সে ভাবিয়াছিল। মানব-ইতিহাসে ঈশ্বর-ধারণার সেই সূচনা। বলা বাহুল্য, মানুষের নয়ন-সম্মুখে নারীর যে রূপটি তখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহা ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাহার আপন গর্ভধারিণীরই মহত্তর রূপকল্প। অর্থাৎ, মানুষের চিন্তায় ঈশ্বর সম্ভবতঃ মাতৃরূপেই প্রথম কল্পিত হইয়াছেন।

আমরা যে নিছক কল্পনায় পক্ষবিস্তার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি তাহা নহে। মানবসভ্যতার প্রাচীনতম সাহিত্য বা মানবের প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ ইতিহাস ঋগ্বেদে আমরা ইহার সমর্থন পাইতেছি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের একশ-পঁচিশতম সূক্তটি 'দেবীসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। মানবসভ্যতার পূর্বাহ্ণে উচ্চারিত এই সূক্তে আমরা ঋষি অম্ভৃণের কন্যা ঋষি বাকের উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হই। ঋষি বাক্ উপলব্ধি করিয়াছেন ঃ জগৎপ্রপঞ্চের পশ্চাতে জগৎকারণরূপে যিনি অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার অঙ্গুলিহেলনে বা ইচ্ছানুসারে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার প্রভাব ব্যতিরেকে রুদ্র জ্যা-রোপণে অসমর্থ, ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর মধ্যে যিনি ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত এবং তদতিরিক্ত হইয়া বিদ্যমান তিনি একজন নারী। তিনিই জগতের ঈশ্বরী—আদ্যাশক্তি। সর্বদেশে সর্বকালে সুরনরাদি তাঁহারই আরাধনা করে। দেবীসূক্তের পর 'রাত্রিসূক্ত'। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের একশ সাতাশতম সূক্তটিই বিখ্যাত রাত্রিসূক্ত। এই সূক্তে তৎকালীন মানুষের যে পরিচয় আমরা পাইতেছি সে-মানুষ হিংস্র প্রাণী ও দুর্ধর্ষ দস্যুদের পীড়নে আর্ত এবং সন্ত্রস্ত, শত্রু

(অসুর ?) কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কায় সদা-উদ্বিগ্ন। শঙ্কাহীন নিরুদ্বেগ জীবন ও শত্রুনাশের জন্য সে তাই ব্যাকুলভাবে প্রার্থনাপর। স্মরণাতীত কালের আমাদের সেই অগ্রজদের প্রার্থনা কাহার কাছে? কাহার উদ্দেশে তাহারা নতজানু? রাত্রিসূক্তের ঋষি কুশিকের ভাষায়, তিনি হইলেন সর্বব্যাপিনী, মৃত্যুঞ্জয়ী, তমোনাশিনী, শত্রুমর্দিনী, বিশ্ববিধাত্রী, বিশ্বত্রাত্রী, বিশ্বপ্রসবিত্রী জগৎপ্রকাশিকা আদ্যাশক্তি। ঋষি তাঁহাকে 'রাত্রি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'রাত্রি' শব্দের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে, অভীষ্টদাত্রী (রাতি=দদাতি অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ।)। শুধু ঋগ্বেদেই নহে, সামবেদেও 'রাত্রিসূক্ত' রহিয়াছে। সামবিধান ব্রাহ্মণের তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টম অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তটি সামবেদোক্ত রাত্রিসূক্ত। সেখানেও সকল শক্তির সমষ্টিভূতা মহামায়ারূপে তিনি বর্ণিত হইয়াছেন; তাঁহারই প্রভাবে সূর্য, বায়ু, বরুণ, পৃথিবী স্ব-স্ব ভূমিকা পালন করে। অসুরবধার্থে পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ হইয়া তিনি জগৎকে রক্ষা করেন। সামবেদের ঋষি সেই আদ্যাশক্তির করুণা ভিক্ষা করিতেছেন।

শুধু বৈদিক যুগেই নহে, প্রাক্-বৈদিক যুগেও মানুষ ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনা করিত। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ হইতে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার যে-সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, "দেবীই ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসিগণের প্রধান দেবতা।" পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিচার করিলেও ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনা করিবার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবণতাটি মানবমনে এমনই সহজাত যে, অদ্বৈতবেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা আচার্য শঙ্করও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিখ্যাত 'সৌন্দর্যলহরী' স্তোত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। স্তোত্রটিতে জগৎজননী আদ্যাশক্তির সমুচ্চ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন আচার্য। সেই মহিমার কী রূপ তাহা বুঝাইবার জন্য উদাহরণস্বরূপ একটি স্তবক উপস্থাপন করা হইলঃ

> জগৎ সূতে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে
> তিরস্কুর্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ স্থগয়তি।
> সদাপূর্বঃ সর্বং তদিদমনুগৃহ্ণাতি চ শিব-
> স্তবাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োর্ভ্রূলতিকয়োঃ॥

[(হে জননি!) তোমার সামান্য ভ্রূসঙ্কেত দ্বারা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা এবং রুদ্র (যথাসময়ে) তাহা লয় করেন। ঈশ্বর (যথাসময়ে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্ব-স্ব কার্য হইতে বিরত করিয়া নিজ দেহে অর্থাৎ তত্ত্বে আত্মসাৎ করেন এবং সদাশিব (যথাসময়ে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরকে পুনরায় অনুগৃহীত করেন অর্থাৎ সৃজন, পালন, সংহার ও তত্ত্বে ধারণরূপ কার্যে নিয়োগ করেন।]

আচার্য স্তোত্রটির সূচনায় বলিতেছেনঃ

> শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
> ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
> অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
> প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

(হে জননি!) শিব যদি শক্তিযুক্ত হন তবেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া তাঁহার কার্য করিতে সমর্থ হন, অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও অসমর্থ। এই হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি সকল দেবতা তোমার আরাধনা করেন। (এই পরিপ্রেক্ষিতে) আমার মতো অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে বা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?] এইক্ষেত্রে কেন উপনিষদের উমা-হৈমবতী প্রসঙ্গটি স্মরণীয়।

আচার্য শঙ্করের সমগ্র জীবন ও কর্মসাধনা অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনকিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিতেন না। কথিত আছে, পরে তিনি শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্যলহরী প্রভৃতি নানা স্তব-স্তোত্রাদি সেই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন যে, শক্তি বা অন্যান্য দেবদেবীর স্তব-স্তোত্রাদি শঙ্করের রচনা নহে, উহাদের রচয়িতৃত্ব তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এই মত সত্য হইলে 'শক্তি ব্যতিরেকে শিব বা ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি সমুদয় কর্মে অসমর্থ'—সৌন্দর্যলহরীতে আচার্য-কথিত শক্তির এই সমুচ্চ মহিমা নিরর্থক হইয়া যায়। কিন্তু যাহার রচয়িতৃত্ব লইয়া কোন সন্দেহ নাই সেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও যে আচার্য ঐ একই অভিমত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন! "নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তে।"—শক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধ হয় না। কারণ শক্তিরহিত পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কর্মে প্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।৪।৩)।

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা
২৮।২।১৯২৭

পরমকল্যাণীয়

তোমার ২৬শে তারিখের পত্র পাইলাম। ধ্যান করিতে করিতে জপ করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। উহাতে জপের সংখ্যা অধিক না হইলেও ক্ষতি নাই। নিত্য অভ্যাসের ফলে এবং সংসারের অনিত্যতা যত হৃদয়ঙ্গম হইবে তত মন লক্ষ্যে স্থির হইবে। কাহাকেও মন্ত্র দিবার কিছুদিন পরে আমি তাহাকে কি দিয়াছি তাহা ভুলিয়া যাই ; কারণ, লেখা থাকে না। বোধহয় শ্রীশ্রীঠাকুরের নামের পূর্বে তোমাকে "ক্লীং" বীজ দিয়াছিলাম। যাহা হউক, সেটা আমাকে জানাইও এবং যে বীজই দিয়া থাকি তাহার পূর্বে "হ্রীং" বীজটি যোগ করিয়া লইও। কারণ, "হ্রীং" বীজটি তুমি তোমার স্বপ্নদৃষ্ট মন্ত্রে পাইয়াছিলে। জপ করিতে বসিয়া প্রথম আচমন, তাহার পর চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর গুরুর ধ্যান, তাহার পর ইষ্টমূর্তির ধ্যান ও জপ—এইরূপ ক্রমে করিও। দীক্ষাপ্রাপ্ত বীজ লিখিবার পরে উহার অর্থ তোমাকে লিখিব। দীক্ষাপ্রাপ্ত নামেই সকল সময়ে জপ করিবে, তবে তাহার পূর্বে "হ্রীং" বীজ যোগ করিয়া লইও। আমার আশীর্বাদ জানিবে। শ্রীমান গুরুদাস, হরিপদ, পতিতপাবন প্রভৃতি সকলকে জানাইও। আমার শরীর ভাল আছে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
২১।৩।১৯২৭

কল্যাণবরেষু

তোমার ২০শে মার্চের পত্র পাইলাম। মন্ত্রের অর্থ :

হ্রীং — (হ্+র্+ঈ+ং)
হ্ = মহাদেব বা পরমপুরুষ
র্ = পরমাপ্রকৃতি
ঈ = বিশ্বপ্রসবিনী
ং = দুঃখহরণ
ক্লীং — (ক্+র্+ঈ+ং)
ক্ = কালী
র্ = মহাদেব
ঈ = বিশ্বমাতা
ং = দুঃখহরণ

হে রামকৃষ্ণ! তুমিই পরমপুরুষ, তুমিই পরমাপ্রকৃতি, তুমিই কালী, তুমিই পরমশিব—তোমা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি আমার সকল দুঃখ হরণ করিয়া আমাকে শুদ্ধ জ্ঞান, (শুদ্ধা) ভক্তি ইত্যাদি দাও।

তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং গুরুদাস, হরিপদ, পতিতপাবন প্রভৃতি সকলকে দিবে। আমার শরীর ভাল আছে। এখানকার কুশল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

---

* পত্রদুইটি পঞ্চানন রায়কে (বর্তমান সং পৃঃ ৬২৬ দ্রষ্টব্য) লিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

ঠাকুরকে যখন প্রথম ভালভাবে দেখি তখন আমার বয়স বছর চৌদ্দ-পনের। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়িতে খেলা করছি। এমন সময় আমাদের আর এক বন্ধু এসে বললেঃ "তোরা একজন পরমহংসকে দেখতে যাবি?"

আমরা জিজ্ঞাসা করলামঃ "তিনি কোথায় থাকেন?"

সে বললঃ "এই তো কাছের দেওয়ান-বাড়িতে তিনি এসেছেন।"

আমাদের ধারণাই ছিল না পরমহংস কাকে বলে বা পরমহংস কি। যাই হোক আমরা তিনজনে দেওয়ান-বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

যখন আমরা দেওয়ান-বাড়িতে ঢুকছি কানে এল সমবেত সঙ্গীতের লহরী। আমরা এক আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হলাম। বেশ কয়েকজন ভক্ত গান করছেন। ঠাকুর সকলের মাঝখানে দণ্ডায়মান, চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে যেন তাঁর কোন বোধই নেই। তাঁর মুখমণ্ডলে যেন স্বর্গীয় দ্যুতি, ঠোঁটে ভুবন-ভোলানো হাসি। চোখদুটি যেন অপার্থিব কিছু দেখছে। তাঁকে দেখে মনে হলো যেন আনন্দের সমুদ্রে ডুবে আছেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও মায়ের নাম-গান করলেন। গাইতে গাইতে তিনি তাঁর ভাবসমুদ্রে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। আমার যেন মনে হলো বিশ্বমাতাকে তিনি গান শোনাচ্ছেন। গান শেষ হবার পর তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের দেওয়ানমশাই দোতলায় নিয়ে গেলেন। আমরা যে-যার বাড়ি ফিরে গেলাম। মণি মল্লিকের বাড়িতে আর একবার ঠাকুরকে দেখেছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার সহপাঠী শরৎ (পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ)। বেশ কয়েকবছর পার হয়ে গেল। তখন সতের-আঠার বছর বয়স হবে—কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলাম ঠাকুরকে দেখতে। সময় দ্বিপ্রহর, কয়েকজন ভক্ত তাঁর ঘরে বসে আছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এক কোণে বসলাম। একটি ছোট খাটে বসে তিনি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কথা বলছেন। শরীরগঠনের দিক থেকে একজন সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু তাঁর হাসিটি স্বর্গীয়। যখন তিনি হাসছেন যেন আনন্দের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। সে আনন্দতরঙ্গ তাঁর চোখ-মুখ ছাড়িয়ে যেন সমস্ত দেহের অঙ্গ-ভঙ্গে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই হাস্য-বিভা তাঁর সামনে বসে থাকা সমস্ত মানুষকে সমস্ত দুঃখ চিন্তা যেন দূরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। তাঁর চোখ দুটি নয়নাভিরাম—উজ্জ্বল অথচ কোমল এবং স্নেহভরা।

আমি অনুভব করলাম ঠাকুরের ছোট ঘরটি যেন ঘনীভূত শান্তির মাধুর্যে ভরপুর। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর কথামৃত ঈশ্বরকথা ও উপদেশ স্থির নিস্পন্দ হয়ে শুনছেন। তিনি কি বলছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। কিন্তু যে শাশ্বত আনন্দ-স্পর্শের ছোঁয়া সেদিন পেয়েছিলাম, তা যেন আমার কাছে চিরনতুন হয়ে আছে। অনেকক্ষণ সেখানে বসেছিলাম তাঁর দিকে সমস্ত মন-প্রাণকে কেন্দ্রীভূত করে। তিনি সোজাসুজি আমাকে কিছু বলেননি বা আমিও তাঁকে কোন প্রশ্নও করিনি। একের পর এক ভক্তরা সবাই চলে গেলেন। আমি একলা বসে আছি। ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে আছেন। বুঝলাম এইবার যেন আমারও চলে যাওয়া উচিত। সেইজন্য তাঁর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে তিনি বললেনঃ "কিগো লড়াই করতে পার। এস কাছে এস, দেখি কেমন লড়ুয়ে।" এই বলে তিনি যেন আমায় ধরবার জন্য কাছে এলেন।

তাঁর এই ধরন-ধারণে একটু আশ্চর্য হলাম। মনে মনে ভাবলাম এ কিরকম মহাপুরুষ। যাই হোক বললাম ঃ "হ্যাঁ, আমি লড়তে জানি।" হাসতে হাসতে তিনি কাছে এসে আমার কাঁধ দুটো ধরে বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। তখন আমি পূর্ণ যুবক, গায়ে বেশ জোর। তাঁকে দেওয়ালের দিকে একটু ঠেলে দিলাম। তখনো তিনি হাসছেন, আর আমাকে জোর করে ধরে আছেন। মনে হলো যেন তাঁর হাতদুটো থেকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিদ্যুৎশক্তির মতো আমার সমস্ত শরীরে প্রবেশ করছে। সেই স্পর্শ যেন আমার সমস্ত শরীরকে অবশ করে দিল। এক দিব্য আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। শরীরের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি আমায় ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ "বেশ বেশ, তুমিই তো জিতলে।" এই বলে তাঁর খাটে গিয়ে বসলেন। আমার মুখ দিয়ে তখন কোন কথা বেরুচ্ছে না। সমস্ত সত্তা যেন আনন্দের সমুদ্রে ভাসমান। এক অনির্বচনীয় শক্তির স্পর্শ যেন আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর উঠে এসে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন ঃ "এখানে মাঝে মাঝে আসবে।" আমাকে কিছু মিষ্টি প্রসাদ দিলেন। কলকাতা ফিরে গেলাম। বেশ কয়েকদিন সেই দিব্যভাবে পরিপূর্ণ ছিলাম। বেশ বুঝলাম তিনি আমার মধ্যে কৃপা করে অধ্যাত্মশক্তি চালনা করে দিয়েছেন। মনে হলো তিনি আমায় সব দেবেন। ভাবলাম কত দয়া তাঁর!

আমরা কে কেমন আছি তার খবরাখবর সব তিনি রাখতেন। বেশ কিছুদিন তাঁর কাছে না গেলে অন্যদের জিজ্ঞাসা করে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ভক্তদের খোঁজখবর নিতেন। একবার বেশ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। একদিন লোক দিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে ঢুকতেই নালিশ-মাখানো স্নেহভরা স্বরে বললেন ঃ "কিগো কেমন আছ! তোমাকে অনেকদিন দেখিনি কেন? কি খবর তোমার?"

সত্য কথাই বললাম ঃ "আমার আসতে ইচ্ছা হয়নি।" ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন ঃ "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেশ বেশ, তা তুমি ধ্যানের অভ্যাসটা রেখেছ তো?" বললাম ঃ "চেষ্টা তো করি, কিন্তু হচ্ছে কই!" ঠাকুর আমার কথায় আশ্চর্য হয়ে বললেন ঃ "সে কি তুমি ধ্যান করতে পারছ না? নিশ্চয়ই চেষ্টা করলে পারবে।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তিনি কিছু বলবেন বলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। লক্ষ্য করলাম তাঁর মুখাবয়ব ও চোখের ভাবের পরিবর্তন হলো। আমার দিকে একদৃষ্টে তিনি চেয়ে আছেন। আরো কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ "এস, কাছে এস।" তাঁর কাছাকাছি গেলে জিভ বের করতে বললেন। জিভ বের করলাম। তিনি জিভের উপর আঙ্গুল দিয়ে কি যেন লিখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরে একটা প্রচণ্ড কম্পনের সৃষ্টি হলো। অনুভব করলাম আমার সমস্ত সত্তা ও বোধের মধ্যে এক অনির্বচনীয় আনন্দ খেলা করে চলেছে। তারপর তিনি বললেন ঃ "যাও পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যান কর।" তাঁর আদেশানুযায়ী সেই স্পর্শের আনন্দধারায় মাতালের মতো টলতে টলতে কোনরকমে পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যান করতে বসলাম। সমস্ত বহির্জগৎ আমার কাছে লুপ্ত হয়ে গেল। জানি না কতক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক জগতে মন ফিরে এসেছিল। চোখ মেলে দেখলাম ঠাকুর পাশে বসে আছেন। অতি স্নেহের সঙ্গে আমার দেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর ঠোঁটে এক স্বর্গীয় হাস্যচ্ছটা! তখনো আমার ধ্যানের নেশা কাটেনি।

বললেন ঃ "কি গো কেমন ধ্যান হলো!" বললাম ঃ "এইবার খুব হয়েছে।"

বললেন ঃ "এবার থেকে ধ্যান খুব জমবে। কিগো কিছু দেখলে-টেখলে?"

বিস্তারিতভাবে যতটা পারি সব বললাম।

তারপর তাঁর পেছন পেছন তাঁর ঘরে গেলাম। ঘরে আর কেউ ছিল না। সেইদিন তিনি আমার সঙ্গে কত কথা বললেন, অনেক আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলেন। অপার তাঁর দয়া, যার কোন তুলনা হয় না। তাঁর বিরাট ভালবাসার কথা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

কিছুদিন পর কলকাতা থেকে পাটনায় গেলাম। এক রাত্রে যেন স্পষ্ট মনে হলো তিনি আমার সামনে দণ্ডায়মান। ঠিক বুঝতে পারলাম না হঠাৎ কেন তাঁকে এইভাবে দেখলাম। পরের দিন সকালে খবর পেলাম তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

একবার ঠাকুর একটা ইংরেজী বইয়ের পাতা খুলে আমাকে পড়তে বললেন—"সর্বদা সত্য বলবে। সঞ্চয় করবে না, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ কর।" শুনে খুবই খুশি হলেন। কোন কথা না বলে এমন একটি ভাব প্রকাশ করলেন যে, স্পষ্ট বুঝলাম এই তিন সত্য পালন করলে ঈশ্বর অনুভব করা যায়। ঠাকুরকে আমি কোন বই পড়তে দেখিনি বা পড়তেও কখনো বলেননি। তিনি চাইতেন ঈশ্বরকে অনুভব করে যেন আমরা আনন্দসাগরে অবগাহন করি।

ঠাকুর ছিলেন সত্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। তিনি ছিলেন শিশুর মতন সরল। তাঁর কাছে গেলেই এই বোধ হতো যে, মানুষ বহির্জগতের আনন্দকে কেন আঁকড়ে ধরে, যখন সে-ই পারে শাশ্বত আনন্দকে খুঁজে নিতে! তিনি মনে করতেন, মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানকে পাওয়া এবং সেই চিন্তায় ও ভাবে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া। এই মায়াময় জগৎ থেকে মানুষ যদি মনকে সরিয়ে নিতে পারে তবেই তার সত্যদর্শন হয়। সে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতেই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের বিভূতিকে দেখতে পায়। মানুষ সবসময়ই কামনা-বাসনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ঝলসিয়ে দিচ্ছে। ভগবৎ শক্তিকে সে ভুলে যায়। কারণ, তার কামনা-বাসনা বহির্জগৎকেই কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়। কামনা ও বাসনাকে মোড় ঘুরিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে হয়।

তিনি সব সময়েই ঈশ্বরীয় আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাই এই পৃথিবীর কোন কালিমা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তাঁর হৃদয় নিয়তই ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ থাকত, আর সেই নেশায় তিনি সর্বদাই মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। তিনি বেদনা পেতেন এই ভেবে যে, সকলকে এই ব্রহ্মানন্দের অপার্থিব বোধ কোন কিছু বিচার না করে ছড়িয়ে দিতে পারছেন না, যদিও তিনি চাইতেন এই আনন্দের অংশীদার হোক প্রত্যেকে। ব্রহ্মানুভূতির আনন্দের কাছে জগতের যতকিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ সমস্তই যেন একমুঠো ধুলোর মতো মনে হয়। ঠাকুর সবকিছুর মধ্যে সেই অনাদি ব্রহ্মের প্রতিভাত রূপ দর্শন করতেন। অন্যদিকে আমরা পৃথিবীকে দেখি শুধুমাত্র চোখে দেখার দৃষ্টি নিয়ে।

ঠাকুরকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম ঃ "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ "তিনি সাকার-নিরাকার দুই-ই। আবার সাকার-নিরাকারের পারেও।" বললাম ঃ "সবই যদি ঈশ্বর হন তবে এই খাটটাও কি তিনি?" ভাবের অনুভবে তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ গো এই খাটটাও তিনি। এই যে ঘরে কাঁচ, বাসন, দেওয়াল দেখছ, এইসবও তিনি। সবকিছুই তিনি, সবকিছুতেই তিনি আছেন।"

এই কথাগুলি যখন তিনি বললেন তখন যেন আমার মনে হলো আমার হৃদয় এক মুহূর্তে ভাব-জগতের উচ্চাবস্থায় চলে গেল, সেখান থেকে যেন দেখতে পেলাম সবকিছুতেই সেই ব্রহ্মের আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সর্বক্ষেত্র এবং সর্ববিষয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ এক অতুলনীয় সত্তা। তাঁর যে তিনটি ছবি আছে তার প্রত্যেকটাতেই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের চরমাবস্থার ভাব বিচ্ছুরিত হয়ে আছে। মনে হয় তিনি যেন শাশ্বত অনাদি সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবে আছেন। যখনই তাঁর ছবির দিকে তাকাই তখনই আমার হৃদয়ে নানারকম অধ্যাত্মবোধের অনুভূতি হয়। স্বামীজী ও রাজামহারাজেরও এমনটি হতো। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ করতেন না। একদিন ঠাকুর তাঁর একটি পট দেখিয়ে বললেন ঃ "এঁকে ধ্যান করবে। আমি এর মধ্যে আছি।"

যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন তিনি তাঁদের সকলকে রক্ষা করবেন। তিনি তাঁদের জন্য সবকিছুই করবেন।

একদিন ঠাকুরের পদসেবা করছি। এমন সময় কোন্নগর থেকে এক ভদ্রলোক এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেলেন। ঠাকুর বললেন ঃ "জানিসরে, মানুষের ভেতরটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। কাঁচের আলমারির মধ্যের সব জিনিস যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি দেখতে পাই।" মনে মনে ভাবলাম তাহলে তো আমার ভেতরটায় কি আছে না আছে সবই তিনি জানেন। এ তো বড় অদ্ভুত মানুষ! তিনি কখনো কারুর মন্দটা দেখতে পারতেন না, ভালটাই তাঁর চোখে পড়ত। আমরা তাঁর মধ্যে অতীতের সমস্ত পূর্ণসত্তার সমন্বয় অনুভব করেছি। প্রথম যখন শুনেছিলাম তিনি বলছেন ঃ "যে রাম যে কৃষ্ণ সে-ই এবারে রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন।" তখন কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। মনে মনে ভেবেছিলাম, এসব বাজে কথা। তবে এটা ঠিক যে—তিনি একজন সাধু, সজ্জন ও সৎ ব্যক্তি।

বেশ কিছুকাল পর—তখন কলেজে পড়ি। ঠাকুর অত্যন্ত গম্ভীর ও গভীর হয়ে বলছেন ঃ "যখন কৃষ্ণরূপে এসেছিলাম, রাখাল আর গোপীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কত খেলা করেছি।" তখনো ঠাকুরের কথা মনে এতটুকু বিশ্বাসের রেখাপাত করেনি। তিনি যেন আমার সন্দেহকে বুঝতে পেরে গোপীদের উচ্চভাবের কথা সবিস্তারে ভাবস্থ হয়ে বলতে লাগলেন। গোপীরা কেমনভাবে প্রিয় সখা কৃষ্ণকে তাদের মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা—সমস্তই কোন কিছুর হিসাবনিকাশ না করে সমর্পণ করেছিল। বলতে বলতে হঠাৎ তিনি বাক্যহারা হয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। আমিও যেন তাঁর জ্যোতির্বৃত্তের, শক্তিবলয়ের অন্যতম একটি ভাব হয়ে এক অপার আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। এই প্রথম বুঝলাম, গোপীপ্রেম কাকে বলে। সমস্ত সন্দেহ দূর হলো। ঠাকুর যখন সাধারণ অবস্থায় ফিরে এলেন, তখন তিনি যেন এক শিশু। তাঁর মুখে যেন বালগোপালের হাসি। বাস্তবিক, তিনি ছিলেন এক চিরন্তন শিশু। যেখানে কোন মহৎ সত্তা বিরাজমান সেখানে যেন একটি অধ্যাত্মশক্তির পরিমণ্ডল তাঁকে ঘিরে থাকে। যে সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে আসে, সে সেই সত্তায় উজ্জীবিত হয়। সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে যে, বিদ্যুৎশক্তির মতো এক সত্তা বা শক্তি তার অন্তরে প্রবেশ করে তার ভাবলোককে এক উচ্চগ্রামে নিয়ে চলেছে। এ এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি। একবার আমি যখন স্বামীজীর পাদস্পর্শ করি তখন যেন সেই স্পর্শ বিদ্যুৎস্পর্শের অনুভূতি দিয়েছিল। মহারাজেরও (স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও) ক্ষমতা ছিল অন্যের মধ্যে অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চালিত করার। একদিন তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন, আমি তাঁর কাছে বসে আছি। অনুভব করলাম এক আনন্দ-শক্তি যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করছে, আমি ধ্যানানন্দে বিভোর হয়ে গেলাম। অন্যের অজ্ঞাতেই এইরকমভাবে যিনি অধ্যাত্মশক্তি বিতরণ করতে পারেন তিনি এক উচ্চাতি-উচ্চ জ্ঞানসত্তা। রাজামহারাজ ছিলেন এক দিকে অধ্যাত্মশক্তির এক প্রকাণ্ড আধার, আবার অন্যদিকে হাস্যরসের পরম রসিক। স্বামীজী ও মহারাজ ছিলেন অন্তর্মনের দুটি আকর্ষক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁরা অন্যদের আকর্ষণ করতেন তাঁদের প্রচণ্ড মাধুর্যময় ভালবাসার মাধ্যমে। তাঁদের অধ্যাত্মপরিমণ্ডলের কাছাকাছি যাঁরা আসতেন তাঁরা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে উন্নীত হতেন।

স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে একজনকে অন্যজনের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। নিজ নিজ অধ্যাত্মানুভূতির ক্ষেত্রে তাঁরা এক-একজন রাজাধিরাজ। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মকে মহারাজ বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। স্বামীজী জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু অন্তরে তাঁর ছিল চরম ভক্তি। মহারাজ ভক্তি ও উপাসনার কথা বলতেন। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন পূর্ণ জ্ঞানী। স্বামীজীর হৃদয় ছিল কোমল ও স্নেহে পরিপূর্ণ। আমাদের সকলের জন্য, সকল গুরুভাইদের জন্য, বিশেষ করে মহারাজের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। কী গভীর ভালবাসা! মহারাজের প্রতি স্বামীজীর ভাব ছিল—'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।'

বেলুড় মঠে একটি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আমি তার তদারক করছি। বেশ গরম পড়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি। লক্ষ্য করলাম দোতলার বারান্দায় বসে স্বামীজী সরবত পান করছেন। আমারও ইচ্ছা হলো কিছু

ঠাণ্ডা সরবত পান করার। যেই আমার মনে এই ইচ্ছা জাগলো, ফিরে দেখলাম এক সেবক মারফত স্বামীজী এক গ্লাস সরবত পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুব খুশি হয়ে গ্লাসটি মুখে দিতে গিয়ে দেখি পাত্রটি একেবারেই খালি, মাত্র কয়েক ফোঁটা সরবত গ্লাসের নিচে পড়ে রয়েছে। স্বামীজী আমার সঙ্গে এই সময়ে এমন ধরনের রসিকতা করছেন ভেবে মনে খুব কষ্ট পেলাম। যাই হোক ভাবলাম একজন মহাত্মা যখন তাঁর প্রসাদ পাঠিয়েছেন, সে যত অল্পই হোক না কেন গ্রহণ করা উচিত। এই ভেবে সেই কয়েকফোঁটা সরবত পান করলাম। কি আশ্চর্য! সেই কয়েকফোঁটাতেই আমার সমস্ত তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে গেল। দিনের শেষে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো বললেন, সরবত পাঠিয়েছিলাম খেয়েছ? উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, তাতেই আমার তেষ্টা মিটেছিল। উত্তর শুনে স্বামীজী খুব খুশি।

একবার আমার মনে একটি সন্দেহ জেগে উঠল। ঠাকুর আমাদের বলতেন, সাধুরা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবে না, এমনকি তাদের ছবিও দেখবে না। বিশেষ করে তিনি আমায় বলেছিলেন, ভক্তিমতী হলেও কোন নারীর মুখের দিকে চাইবে না। স্বামীজী কিন্তু সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, বিদেশে মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছেন। এই নিয়ে ভাবতাম স্বামীজী কি ঠাকুরের পথ ধরে চলছেন, না চলছেন না। একদিন তিনি ঘরে একলা রয়েছেন, সেই সুযোগে আমার সন্দেহের কথা তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনতে শুনতে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন: "পেসন, যত সোজা ভাবো, শ্রীরামকৃষ্ণ অত সোজা নয়। জানো তিনি আমার অন্তর থেকে সমস্ত ভেদাভেদ ধুয়ে মুছে শেষ করে দিয়েছেন! তাঁর কৃপায় বুঝেছি, আত্মার কোন ভেদ নেই। সবচেয়ে বড় কথা তিনি সকলের জন্য এসেছিলেন। তিনি কি শুধু পুরুষদের উদ্ধার করবার জন্য এসেছিলেন? তাঁর কৃপা জাত-পাত বিচার করেনি। তোমাকে তিনি যা বলেছেন তা তুমি বর্ণে বর্ণে মানবে। কিন্তু আমায় তিনি অন্য ভাব দিয়েছেন। তিনি শুধু আমায় শিক্ষাই দেননি, এখনো আমার হাতটাকে মুঠো করে ধরে চালাচ্ছেন। তিনি যা করেন—তা-ই আমি করি।"

স্বামীজীর প্রতি আমার সন্দেহ হয়েছিল বলে অনুতপ্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। স্বামীজী একটু হেসে বললেন: "মাতৃশক্তিই হচ্ছে সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। এই শক্তিরই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে এই দেশেই হোক বা অন্য দেশেই হোক। দেখছ না শ্রীশ্রীমা সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য এসেছেন! এ তো সবে শুরু! সমস্ত পৃথিবীতে এই মাতৃশক্তি কালে এক বিরাট রূপ নেবে।"

বেলুড় মঠে আমি দোতলায় যে ছোট ঘরটিতে থাকতাম, রাত্রে শোবার সময় বারান্দার দিকে দরজা খুলে রাখতাম। স্বামীজী মাঝে মাঝে বারান্দায় গভীর রাতে পায়চারি করতেন। এক রাতে তিনি বারান্দার এদিক থেকে ওদিক দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করছেন আর গান করছেন: "আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে।" বারবার এই গানটি গাইছেন আত্মভোলা হয়ে। মাঝে মাঝে স্থির হয়ে ভাবানন্দে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। দুগাল বেয়ে আনন্দাশ্রু বেয়ে পড়ছে। ভোর হওয়া অবধি তাঁর এই গান চলল। আনন্দধারায় আমারও সমস্ত মনপ্রাণ প্লাবিত হয়ে গেল।*

---

* Vedanta Society of Southern California থেকে প্রকাশিত Vedanta and the West, March-April 1955 সংখ্যায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের 'With My Master, Swamiji and Maharaj' লেখাটির বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন রমানাথ ঘোষ।

ভাষণ

দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়

স্বামী ভূতেশানন্দ

ধর্ম বিষয়টি এত গভীর ও ব্যাপক যে, সুসংবদ্ধভাবে বলা সহজ নয়। ধর্মকে আমরা বিভিন্নভাবে বুঝি। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য যতই থাকুক একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে যে, সকলেই এমন একটা কিছু চান যাতে তাঁদের সংসারজীবন শান্তিপূর্ণ হয়। অনেকেই বলেন, 'বড় অশান্তি, শান্তি পেতে চাই।' বলা বাহুল্য সংসারকে আমরা যেমনভাবে দেখছি তাতে সেখানে শান্তির আশা করা দুরাশা মাত্র। গীতায় ভগবান বলছেন ঃ "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" (৯।৩৩)—জগৎ অনিত্য এবং দুঃখময়; এখানে এসে আমার ভজনা কর। প্রশ্ন হতে পারে—তাঁর ভজনা করলে অনিত্য সংসার কি নিত্য হয়ে যাবে, না দুঃখময় সংসার সুখময় হয়ে উঠবে? ভগবান পরিষ্কার করে তা বলে দেননি। তিনি শুধু সংসারের বর্ণনা করলেন দুটি কথায়—অনিত্য এবং দুঃখময়। আর বললেন, এখানে এসে আমার ভজনা কর। কেন? কারণ, ভগবানের ভজনা করলে সংসার আর অনিত্য বা দুঃখময় থাকবে না। তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি নিত্য, তাঁকে চিন্তা করলে মানুষ আনন্দময় হয়ে যায়, নিত্য হয়। কথাটি আংশিকভাবে সত্য। তাঁকে চিন্তা করলে মানুষ বদলে যায়। মানুষ যেমন আছে সেই অবস্থায় সে নিত্য হবে এটা কল্পনাতীত। কাজেই সেইভাবেই নিত্য হওয়া সম্ভব নয়। জগৎটার রূপ বদলাবে না, অনিত্যই থাকবে। আর দুঃখময় এই জগৎ কি সুখময় হবে? অন্ততঃ আমাদের সুখের কল্পনা অনুযায়ী সুখময় হবে না। অথচ এরকম কল্পনা আমরা করি, না করে পারি না। দুঃখ কেউ চায় না, সকলেই সুখ চায় এবং চিরকাল বাঁচতে চায়। কেউ কেউ দীর্ঘজীবী হন, অনেকদিন বাঁচেন। কিন্তু তাঁদেরও তো একদিন মৃত্যু হয়। আবার অনেকদিন বেঁচে থাকতেও আনন্দ হয় না, বরং অনেকেই দুঃখ পান। কেউ পৃথিবীতে চিরজীবী হয়ে কখনো থাকে না, থাকতে পারবে না। পুরাণ-কিংবদন্তী অনুসারে কয়েকজনের নাম জানা যায় যাঁরা 'অমর'। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? আমরা তো তাঁদের দেখতে পাচ্ছি না। যদি তাঁরা থাকেন তাহলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবেন, তা যদি না থাকেন তাহলে থাকা আর না থাকা আমাদের পক্ষে সমান। চিরজীবী সংসারে কেউ নেই। অনেকে বলবেন, আমরা সংসারী, আমরা কি সংসারের অনিত্যতা অত ভাবতে পারি? ভাবতে পারি বা না পারি যা সত্য তাকে তো স্বীকার করতে হবে! বুদ্ধ ও সন্তানহারা জননীর কাহিনীটি তো সকলেই জানে। বুদ্ধের পরামর্শমতো মৃত্যুশোকহীন বাড়ি থেকে একমুঠো সরষে আনার জন্য পুত্রশোকাতুরা মা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দিনের শেষে বুদ্ধের কাছে এসে প্রণাম করে বললেন, 'ভগবান, আমি আর পুত্রের পুনর্জীবন চাই না। দেখছি আমি একা নই, জগতের প্রত্যেকেই মৃত্যুশোক পেয়েছে। তাহলে আর আমি আপনার কাছে কি প্রতিকার চাইব?' মহাভারতে আছে—যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্মকে বলছেন ঃ

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ॥

(বনপর্ব, ২৬৭তম অধ্যায়, শ্লোক, ৮৩)

—প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে দেখেও অন্যান্যরা ভাবছে আমাদের কোনদিন মৃত্যু হবে না। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে?

আমরা যখন বাড়ি করি বাড়িটা যাতে অন্ততঃ একশো বছর টেকে এইরকম করে তৈরি করি। অর্থের সঞ্চয় করি যাতে পরবর্তী দু-এক পুরুষ পর্যন্ত চলে যেতে পারে। এইভাবে আমরা আমাদের অস্তিত্ব কায়েম করবার চেষ্টা করি। কেন? না, আমাদের বাঁচবার ইচ্ছা প্রবল।

মহারাজ যযাতি খুব ভোগী ছিলেন। দীর্ঘকাল ভোগ করে বৃদ্ধ হলেন। দেখলেন আর ভোগের শক্তি নেই। তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন,

'আমার এখনো ভোগ করবার ইচ্ছা, আমাকে উপায় করে দিন।' ভগবান বললেন, 'তোমার যৌবন শেষ হয়েছে, এখন আর কি করে ভোগ করবে? তবে কেউ যদি তোমাকে যৌবন ধার দেয় দেখ। তাহলে তার যৌবনের বিনিময়ে তুমি ভোগ করবে, আর সে তোমার বার্ধক্য বহন করবে।' যযাতি সকল প্রিয়জনদের বললেন। সকল পুত্রকে বললেন। কেউ রাজি হলো না। অবশেষে পুত্র পুরু তাঁর যৌবন পিতাকে দিলেন। ছেলের যৌবন নিয়ে যযাতি সুদীর্ঘকাল ভোগ করলেন। তারপর যযাতি বিচার করে দেখছেন, আমার যৌবন, আমার ছেলের যৌবন ভোগ করলাম। কিন্তু ভোগের আকাংক্ষা তো তৃপ্ত হচ্ছে না। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভোগের দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। আগুনে ঘি দিলে তা যেমন আরও জ্বলে ওঠে সেইরকম ভোগাকাঙ্ক্ষায় যদি ভোগ্যবস্তু আহুতি দিই তাহলে তা আরও বেড়ে যায়, কমে না। কেউ কেউ বলেন, ভোগ করতে করতে বিতৃষ্ণা এসে যায়। কথা ঠিকই, কিন্তু তার কারণ অন্য। একটা বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে আবার অন্য পাঁচটা বিষয়ে তৃষ্ণা জেগে ওঠে। তাহলে উপায়? উপায় আমাদের শাস্ত্র বলেছেন। কিন্তু যা বলেছেন তা আমাদের কাছে রুচিকর নয়। বলছেন, শান্তি ভোগে নয়, ত্যাগে। শুধু ত্যাগেই তৃষ্ণার ক্ষয়।

আমরা সন্ন্যাসী বলে অনেকেই আমাদের কাছে এসে বলেন, 'শান্তি পেতে চাই'। আমরা বলি, 'শান্তির উপায় ত্যাগে। অশান্তি হয় কেন? হয় কামনার জন্য। যদি কামনা ত্যাগ করতে পার তাহলে শান্তি হবে।' শুনে তাঁরা ঘাবড়ে যান ঃ 'এ আবার কি কথা! কামনা ত্যাগ করে শান্তি চাই না। আমরা চাই ভোগ করব, তার ভিতরে শান্তিও পাব।' এ যেন গরমের দিনে গায়ে আগুন ঢেলে শীতল হতে চাওয়ার অবস্থা! এ তো অসম্ভব। যা সম্ভব নয় তাকে আমরা সম্ভব করবার চেষ্টা করছি। কেন করছি তারও মূলে একটা দার্শনিক তত্ত্ব আছে। আমরা না জানলেও আমাদের সত্তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। একটি হচ্ছে সত্তা নিত্য। সেইজন্য আমরা নিত্যকে চাই। অর্থাৎ আমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি, তাকে ফিরে পেতে চাই। আমার স্বরূপ হলো আমি নিত্য, দুঃখাদি থেকে মুক্ত; আমি কল্যাণ ও আনন্দস্বরূপ। সেইজন্য আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোথায় খুঁজব তা না জেনে চারিদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। যদি জানতাম, যা খুঁজছি তা আমাদের ভিতরেই আছে, তাহলে এমনভাবে খুঁজে বেড়াবার প্রশ্ন আসত না। জানি না তাই বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হিন্দীতে একটি কথা আছে ঃ "মিরিগকে পাস কস্তুর সুবাস—খুঁজই খুঁজই ঘাস"—কস্তুরী-মৃগের নাভিতে কস্তুরী আছে, সেই কস্তুরীর গন্ধ বেরোলে হরিণ মাতাল হয়ে যায়। কোথা থেকে গন্ধ আসছে খুঁজে বেড়ায়। সে যে-ঘাস খায় ভাবে ঘাসেই বুঝি আছে। তাই ঘাসে খুঁজে বেড়ায়। গন্ধ যে তার নিজের ভিতর থেকেই আসছে তা সে বুঝতে পারে না। আমরাও সেইরকম। যে নিত্য আনন্দ অন্তরের বস্তু, বিপরীত দৃষ্টির জন্য তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। যেখানে আমি নেই সেখানে আমাকে খুঁজছি। এই খোঁজা কোনদিন শেষ হবে না। বাইরে কখনো নিত্য আনন্দ পাব না। পরমেশ্বর নিত্য-সত্ত্বাবিশিষ্ট। তিনি নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্য-আনন্দস্বরূপ। সেই ঈশ্বরকে বাইরে খুঁজলে তো আমরা পাব না। কারণ, তিনি যে আমাদের অন্তরেই বসে আছেন। কঠ উপনিষদে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর আমাদের এই দৃষ্টি বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা বাইরে তাঁকে খুঁজি। নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরাই না।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের গান আছে—'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।' অশান্তির হাত থেকে রেহাই পেতে চাই, কোথায় পাব বলে ঘুরছি। অথচ নিজের ভিতরেই রয়েছে শান্তির আকর। খুঁজতে খুঁজতে অবশ্য তাঁকে পাব। কারণ, তা-ই হচ্ছে যে আমার স্বরূপ।

শাস্ত্র বা সন্ত-সাধকগণ যাঁরা ধর্মপথের নির্দেশ দেন তাঁরা বলেন, 'এইভাবে খোঁজ, এইভাবে চেষ্টা কর।' সেইভাবে চেষ্টা করলে চেষ্টা সফল হবে। তবে গোড়াতেই জেনে রাখা ভাল যে, ধর্ম এই জগৎকে আমাদের ইচ্ছা-কল্পনা মতো করে গড়ে দেবে না। আমাদের দৃষ্টিকে পরিষ্কার রাখতে হবে, আর যাঁকে খুঁজছি তাঁকে ঐকান্তিকভাবে খুঁজতে হবে। শাস্ত্র

যা বলেছেন, মহাজনরা যা বলেছেন সেভাবে যেতে হবে। তবে, তাঁদের কথার ভাব গ্রহণের সামর্থ্য চাই। যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পথের সন্ধান দিয়েছেন তা শুনে লোকে ভয় পায়ঃ "ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না। যতই খোঁজ ত্যাগ ছাড়া বস্তুলাভ হবে না।" 'ত্যাগ' মানে কি ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে হবে? তা নয়। জঙ্গলেও তো নিজের মনকেই নিয়ে যাব, যে-মনে সংসার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। সকলকেই বাড়িঘর সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে একথা হাস্যকর। শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা বলেননি, তাঁর উপদেশ—এক হাতে তাঁকে ধরে অন্য হাতে সংসার কর, তাহলে সংসার এত জ্বালাময় বোধ হবে না। তখন এ সংসার ধীরে ধীরে 'তাঁর' সংসার হবে। এই একটি কৌশল তিনি শিখিয়ে দিচ্ছেন। যা আমরা করি তা-ই করতে পারব; কিন্তু এইগুলোকে 'আমার' বলে মনে না করে 'ভগবানের' বলে মনে করতে হবে। তাহলে আর কিছু ছাড়তে হবে না। তিনিই দৃষ্টি বদলে দেবেন। এখন জগৎকে যেভাবে আস্বাদন করছি তখন সেইভাবে করব না। তখন ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ সবকিছুতেই তাঁকে দেখতে পাব। জগৎ বদলে যাবে না, শুধু আমার দৃষ্টিটা বদলে যাবে। যেখানে দুঃখ অকল্যাণ মৃত্যু দেখছি সেখানেও কল্যাণস্বরূপকে দেখব। চৈতন্যদেবের মতো অবস্থা হবেঃ "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

ভাগবতে (১০।১৩) আছে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্য একদিন বাছুরগুলিকে মায়ার দ্বারা অন্যত্র স্থাপন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বনভোজন করছিলেন গোপবালকদের নিয়ে। বাছুরগুলোকে না দেখে চঞ্চল হলেন। তখন সঙ্গীদের সেখানে বসতে বলে বাছুরগুলিকে নিয়ে আসার জন্য গেলেন। কিন্তু কোথাও বাছুরগুলিকে না দেখে যমুনাপুলিনে ফিরে এসে দেখেন রাখালবালকরাও সেখানে নেই। কোথাও তাদের খুঁজে না পেয়ে দিব্যদৃষ্টিতে তিনি সহসা জানতে পারলেন যে, তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য বাছুর ও গোপবালকদের ব্রহ্মা মায়াদ্বারা অপহরণ করেছেন। তখন তিনি মনে মনে হেসে আবার নতুন করে স্বয়ং রাখাল এবং বাছুর হলেন। যেমন খেলা চলছিল তেমনি খেলতে লাগলেন। এক বছর এইভাবে কাটাবার পর ব্রহ্মার খেয়াল হলো, দেখি তো কি হচ্ছে? গিয়ে দেখেন রাখাল এবং বাছুররা সব সেখানে। ব্রহ্মা বললেন, এ কি হলো? আমি যাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি তারা সত্য, না এই যাদের দেখছি সামনে এরা সত্য? তিনি যখন এইরকম বিভ্রান্ত তখন ভগবানেরই কৃপায় তাঁর দিব্যদৃষ্টি এল। তিনি দেখলেন সকলের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ। দেখে ব্রহ্মা ভীত হলেন। ভাগবতে বর্ণনা আছে যে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁসের উপর থেকে তিনি পড়ে গেলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তিনি স্তব করতে শুরু করলেন।

ঠিক এইরকম—ভক্ত যখন ভগবানের কৃপায় দিব্য-দৃষ্টি লাভ করবে তখন সে ভালমন্দ সব কিছুতে তাঁকে দেখতে পাবে। তখনও এই জগৎ যেমন তেমনই থাকবে, কিন্তু সুখ দুঃখে মনের চাঞ্চল্য আসবে না। সর্বত্র ইষ্টকে দেখা যাবে। দুঃখ দূর হবে। সর্বত্র ভগবানকে দেখলে আর দুঃখ থাকে কোথায়? এইভাবেই আমরা দুঃখকে পরিহার করতে পারি, অন্য কোনভাবে নয়। এটি একটি কৌশল যার দ্বারা আমরা দুঃখের পারে যেতে পারি। শাস্ত্র, মহাপুরুষ, অবতার এঁরা তাঁর সন্ধান আমাদের দিয়ে যান। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও আমরা তা ধরতে পারি না। শুধু তাই নয়, পরিষ্কার বলি—এইরকম আনন্দ আমরা চাই না। বলি, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।' বন্ধনের মধ্য দিয়েই মুক্তি চাই। অন্ধকার দিয়ে কি আলোকে পাওয়া যায়? না, তা কখনই সম্ভব নয়। তাঁর কৃপায় যদি আমরা বুঝতে পারি তত্ত্বটি কি, ধর্ম আমাদের কি শেখাতে চাইছে, মহাজনরা আমাদের সামনে কি দৃষ্টান্ত রেখেছেন এবং সেই আদর্শে নিজেদের গড়ে যদি সাধনা করি তাহলে উপায় হবে। তা না হলে উপায় নেই।

শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, তাঁর কৃপায় যেন আমাদের সেই দিব্যদৃষ্টি আসে, যাতে আমরা সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই এবং পরিণামে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হই।*

---

* গত ২৩ মার্চ ১৯৮৮ ইম্ফল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ।

প্রবন্ধ

দুর্গা : রূপ থেকে রূপান্তরে

সুশীলকুমার রুদ্র

দুর্গাপূজা কবে থেকে শুরু, এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে তার চেয়ে মহান ও শক্তিমানকে পূজা করে আসছে। উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা ও জগৎকল্যাণ। মানব-সমাজের প্রাথমিক পর্বে প্রকৃতি তথা সূর্যের উপাসনাই ছিল মানুষের একমাত্র হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করার সামগ্রী। ক্রমশঃ তাকে ঘিরে পূজা শুরু হলো যজ্ঞবেদী ও অগ্নিতে। দেবতারা যে সকলেই সূর্য অথবা সূর্যের অভিন্ন রূপ অগ্নি থেকে বিকশিত হয়েছেন পূজার শেষে হোমাহুতির ক্রিয়াকাণ্ডই তার স্পষ্টতর প্রমাণ। অনেক পণ্ডিত অবশ্য প্রকৃতি উপাসনা (Nature-worship) থেকে দেবতাদের উৎপত্তি—একথা মানতে রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য, দেবতারা সকলেই মানুষ থেকে সৃষ্ট হয়েছেন। মানুষ প্রথমে আচার্য হিসাবে আদৃত হয়, তারপরে অপর মানুষের দৃষ্টিতে তারা দেবতার আসনে স্থান পায়। অপরদিকে কোন কোন পণ্ডিত প্রকৃতিপূজা ও শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা থেকে দেবতাদের বা দেব-দেবী পূজার উৎপত্তি—একথা বলে থাকেন। মনে হয়, বৈদিক সূর্যপূজা থেকে বৃক্ষপূজা, স্তম্ভ, স্তূপ বা যূপপূজা ও পরে প্রতিমা বা মূর্তিপূজার উদ্ভব। দুর্গাপূজার উৎপত্তি ঐ পথ ধরেই। দুর্গাপূজায় বিল্ববৃক্ষের পূজা, নবপত্রিকা ও কলসপূজা সূর্যপূজার নিদর্শন বলেই মনে হয়। কলস বা ঘটকে দেবীর প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়। কলসের গায়ে সিন্দুরের পুত্তলিকা, মাথায় সরা ও নারিকেল, ঘটে তীর্থজল ও ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব—এ সমস্তই বৈদিক সূর্যদেবতার পূজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেব-দেবীসকলের কল্পনা বা তাঁদের বাস্তব মূর্তি মানুষের সমাজে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে সূর্যই ছিলেন মানুষের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। সূর্যকে সর্বশক্তির আধাররূপে কল্পনা করতেন প্রাচীন মানুষ। বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের স্থলে যে তিনিই—এই গভীর বিশ্বাস তাঁদের চেতনার সঙ্গে অন্বিষ্ট ছিল। ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতের মানুষও সূর্য থেকে সমস্ত দেবতার উৎপত্তি—একথা বিশ্বাস করেন। আমাদের মনে ঈশ্বর বা আদ্যাশক্তির ধারণা সর্বশক্তিসম্পন্ন সূর্যদেবতা থেকে সংক্রামিত হয়েছে। সূর্য থেকে দেবী দুর্গার রূপেরও কল্পনা করা হয়েছে। দেবীর 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা' ও 'জটাজূটসমাযুক্তা' মহিমময়ী মূর্তি সহস্রাংশু সূর্যদেবতার কথাই মনে আনে।

অপরদিকে, দেবী দুর্গাকে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবেও পূজা করা হতো—একথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। এবং তার নিদর্শন হিসেবে অকালবোধনের কাহিনীটি তুলে ধরেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।২৪) দুর্গা যে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হতেন তার উল্লেখ আছে। দেবীমাহাত্ম্যে উল্লিখিত শাকম্ভরী যে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই শাকম্ভরী দেবীই অন্নপূর্ণা বা দুর্গা, একথাও অনেকে বলেন।

দেবী অন্নপূর্ণার পূজা বাংলাদেশে চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়, আর শরৎকালে দেবী দুর্গার। দুর্গোৎসবের অন্য নাম শারদোৎসব। বাঙালীর প্রিয় উৎসব এই শারদোৎসব। যেখানেই বাঙালী সেখানেই এই পূজো। বাংলার বাইরে বহু বাঙালী স্থায়িভাবে বাস করছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এবং সুদূর বহির্ভারতেও তারা নানা কারণে সেসব জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছে—কেউ বৃত্তি, কেউ ব্যবসা, আবার কেউ বা নাগরিক হিসেবে সেসব জায়গায় রয়েছে। মানসিক তাগিদে খুলেছে যেমন ক্লাব—নানা সংগঠন, তেমনি তারা শুরু করেছে দুর্গা পূজাও। এবং একথা উল্লেখযোগ্য যে, সেসব পূজা খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

শক্তির আরাধনা তথা মাতৃপূজা শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিচিত্র রূপে ও বিভিন্ন নামে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ শক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দুর্গা ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিতা হয়ে থাকেন।

কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে 'অম্বা' ও 'অম্বিকা' নামে, গুজরাটে 'হিঙ্গলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে, কান্যকুব্জে 'কল্যাণী' নামে এবং কুমারিকা প্রদেশে 'কন্যাকুমারী' নামে দেবী দুর্গা পূজা পেয়ে থাকেন। নেপাল, ভুটান ও তিব্বত দেশের বৌদ্ধরাও দেবীর পূজা করে থাকেন। এছাড়া চীন, জাপান, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশেও ভিন্ন নামে দুর্গার পূজার্চনা হয়ে থাকে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবী দুর্গাকে 'বৈরোচনী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দুর্গাকে সেখানে সূর্য বা অগ্নির কন্যা বলা হয়েছে। তাছাড়া অগ্নির উদ্দেশে যে মন্ত্র (১০।১৭) উচ্চারণ করা হয়েছে সেখানে দুর্গী, কাত্যায়নী ও কন্যাকুমারী নামের উল্লেখ আছে। হরিবংশে দুর্গাকে 'অপর্ণা' নামে অভিহিত করে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দুর্গার এক নাম গৌরী। পুরাণে অনেক জায়গায় গৌরীকে বরুণের সহধর্মিণী বলা হয়েছে। এই গৌরীই অম্বিকা, ভদ্রকালী, মহাকালী, মহেশ্বরী ও দুর্গা। আবার, গৌর শিবের পত্নী হিসেবে পার্বতীর নাম গৌরী, এও হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্যে' মহিষমর্দিনী, চণ্ডী, চণ্ডিকা অম্বিকা, চামুণ্ডা, কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামগুলিও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুর্গারই নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র। শাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে দুর্গার 'ভদ্রকালী' নামের উল্লেখ আছে (২।১৫।১৪)। কোন কোন পণ্ডিত অবশ্য এই ভদ্রকালীকে দেবী দুর্গার সঙ্গে এক করতে চান না। মহাভারতে দেবী দুর্গার অসংখ্য নাম পাওয়া যায়ঃ কুমারী, কালী, সিদ্ধসেনী, মন্দারবাসিনী, কপালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, চণ্ডী, চণ্ডা, তারিণী, করালী, বিজয়া, জয়া, কৌশিকী, উমা, শাকম্ভরী, দুর্গা, স্বাহা, স্বধা, সরস্বতী, সাবিত্রী, মহাদেবী, মোহিনী, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, নারায়ণী, মহিষমর্দিনী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি।

দুর্গার এক নাম অপরাজিতা। মৎস্যপুরাণে (১৬৯।১৩) অপরাজিতাকে মাতৃকাগণের অন্যতমা বলা হয়েছে। অন্ধকাসুরের রক্তপানের জন্য মহাদেব এই অপরাজিতা মাতৃকাকে সৃষ্টি করেছিলেন। কোন কোন পুরাণ ও মহাভারতে অপরাজিতাকে মহাশনি নামক দৈত্যের পত্নী বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৫।৩) অপরাজিতা ব্রহ্মার পুরীর নাম—"তদপরাজিতা পুর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্ ।"

দুর্গা 'কাত্যায়নী' নামেও পরিচিতা। দেবীর নাম কেন কাত্যায়নী ?—এ সম্পর্কে পুরাণে নিম্নোক্ত ধরনের বর্ণনা আছেঃ মহর্ষি কাত্যায়ন নামে একজন ঋষি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করতেন। একদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁর আশ্রমে এসে মহিষাসুর বধের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দেহ থেকে শক্তি বিচ্ছুরিত করে এক দেবীকে সৃষ্টি করলেন। সেই দেবীকে মহর্ষি কাত্যায়ন প্রথম পূজা করেন। এবং সেজন্যই দেবী দুর্গার নাম কাত্যায়নী। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে এই দেবী উদ্ভূতা হয়েছিলেন এবং শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কাত্যায়নের দ্বারা পূজিতা হয়েছিলেন এবং দশমীতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।

দেবীর এক নাম নারায়ণী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গণেশখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে এই দেবী সম্পর্কে স্বয়ং নারায়ণ বলেছেনঃ "সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা / মম তুল্যা চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥" এইভাবে অসংখ্য নাম দেবী দুর্গার নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও দুর্গা নামের প্রচলনই সর্বাধিক।

শরৎকালে দুর্গার পূজানুষ্ঠান কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্রের অকালবোধনের অনুসরণ বলে কিংবদন্তী। চৈত্রমাসে বসন্তঋতুতে বাসন্তী-দুর্গা ও আশ্বিন বা কার্তিক মাসে শরৎঋতুতে শারদীয়া দুর্গা—এই দুই পূজানুষ্ঠানই এখন অনুষ্ঠিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে শারদীয়ার আকর্ষণ অনেক বেশি। মনে হয়, বৈদিক যুগ থেকে এ উৎসব চলে আসছে। শরৎকালে কেন এই পূজার অনুষ্ঠান হয়? বৈদিক যুগে 'ইষ' বলতে আশ্বিন মাস বোঝাত আর 'উর্জ' অর্থে কার্তিক মাস। বৈদিক ঋষিরা শরৎঋতু বলতে এই 'ইষ' ও 'উর্জ' তথা আশ্বিন ও কার্তিক মাসকে বুঝতেন। বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৪।১৬) আছেঃ "ইষশ্চোর্জশ্চ শারদাবৃতু।" তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪।৪।১১।১), শতপথ ব্রাহ্মণ (৮।৩।২।৬) প্রভৃতিতেও এই ধরনের কথা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২৬।১৯।২) বলা হয়েছেঃ "শারদেন ঋতুনা দেবাঃ" অর্থাৎ শরৎকালেই দেবতাদের অর্চনা করা প্রশস্ত। দেবী দুর্গার অপর একটি নাম

অম্বিকা। অম্বিকা বলতে শরৎঋতু বোঝায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৬।১০।৪) আছে ঃ "এষ তে রুদ্রভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ। শারদা তস্যাম্বিকা স্বসা, যো বা এষ হিনস্তি যং হিনস্তি তয়ৈবনং সময়তি।" সুতরাং শরৎঋতুর পূজা করার অর্থই দেবী অম্বিকার পূজা করা, আর এজন্যে শরৎকালই পূজার প্রশস্ত কাল।

দেবীর পূজার্চনায় প্রধানতঃ বৈদিক নিয়মাচার অনুসৃত হয়ে থাকে। একারণে অনেকে মনে করতে পারেন, দুর্গাপূজা শুধুমাত্র আর্যসমাজেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা নয়। আর্যেতর সমাজেও এই দেবী অন্যরূপে অন্যনামে পূজিতা হয়ে এসেছেন তার অজস্র প্রমাণ আছে। আর্য-আর্যেতর মিলনের ফলে দেবী দুর্গা উভয় সম্প্রদায়েরই উপাস্য হয়ে উঠেছেন। আবার হরিবংশ ও বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে ঃ দেবী দুর্গা কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্যজাতির উপাস্য দেবী। একারণে কেউ কেউ দুর্গোৎসবকে শবরোৎসবের সঙ্গে এক করে ফেলেন। বিন্ধ্যাচলের অধিবাসী অনার্য শবরজাতির মধ্যে দেবী দুর্গার আরাধনা হতো। বোধহয়, সেই কারণেই দুর্গার 'পর্ণশবরী' নাম। তিনি শবরজাতিদের পর্ণ বা পত্র-পরিহিতা দেবী। দুর্গা গোপ বা গোয়ালাজাতিরও কুলদেবী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দেবী দুর্গা আর্য, আর্যেতর অনার্য সকলেরই আরাধ্যা জগজ্জননী।

দেবী দুর্গার বর্তমান যে-মূর্তি লক্ষ্য করা যায় তা কিন্তু অতি প্রাচীন বা বৈদিক মূর্তি নয়। এই মূর্তি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। কবে কোথায় এই আধুনিক মূর্তি নির্মিত হয়েছিল তা বলা মুস্কিল। এসম্পর্কে নানা জনের নানা মত। কেউ কেউ বলেন, দেবী দুর্গার বর্তমান রূপ ও মূর্তির প্রথম প্রচলন করেছেন রাজসাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। অন্যমতে, স্মার্ত রঘুনন্দনই বাংলার দেবী দুর্গার বর্তমান এই রূপের স্রষ্টা। আসলে এঁরা দেবীর পুরাতন রূপেরই নবীকরণ বা আধুনিকীকরণ করেছেন। এঁদের কেউই স্রষ্টা নন। প্রাচীনকাল থেকেই দেবীর পূজা হয়ে আসছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় ভদ্রকালী ও অম্বিকা-দেবীর নিত্যপূজার উল্লেখ আছে।

দেবী দুর্গা বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়-কারিণী। তিনি মহামায়া, আদ্যাশক্তি। সমগ্র জগৎ তাঁর লীলার প্রকাশ। নিখিল মানবজাতি তাঁর সন্তান। বাৎসল্য-দৃষ্টিতে মা সন্তানদের লালন-পালন করেন, আপদে-বিপদে রক্ষা করেন। আবার তিনি করালিনী, ভয়ঙ্করীও; তখন তিনি মানবজাতির শত্রুমর্দন করেন। মানুষ রুদ্ররূপিণী মায়ের পূজা করেছিল অমিতশক্তিকে আপন অন্তরে পাওয়ার বাসনায় এবং সেইসঙ্গে বিজয়াভিলাসও ছিল। পরবর্তী কালে সাধকেরা শক্তির সঙ্গে ঋদ্ধি, সিদ্ধি, বীর্য ও বিদ্যা লাভ করার জন্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশকেও আবাহন করলেন। সংসারের সমস্ত কিছুর মধ্যে জগজ্জননী মহামায়াকে তাঁরা করলেন জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে স্বর্গের দেবী মর্ত্যে নেমে এলেন পারিবারিক স্নেহ-মমতার বন্ধনে। পিতৃগৃহ, শ্বশুরালয়, মাতা-পিতা, কন্যা-জামাতা, মিলন-বিচ্ছেদ—এসব ভাবের সম্পর্কও মানুষ একে একে দেবীর উপর আরোপ করলেন। বাংলার সাধককবিরা দেবীর ঐ লৌকিক স্বভাবের পরিচয় রাখলেন তাঁদের অসংখ্য ভজন ও সঙ্গীতে। শাক্তসাহিত্য ও দর্শনে লক্ষ্য করা যায়, পার্বতী উমার একটি ধারা, অপরদিকে অসুরনাশিনী দুর্গার আর একটি পৃথক ধারা। সম্ভবতঃ পৌরাণিক কাল থেকেই এই দুই ধারার মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে। অবশ্য এই দুই রূপের মধ্যে বাঙালী কবিরা মায়ের মধুর ও ভয়ঙ্করী রূপের মধ্যে মধুর রূপকেই মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে যে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে, তা চণ্ডীর অসুরনাশিনী দেবীর পূজা-মহোৎসব হলেও, আসলে বাঙালী-মন দেবীর মধ্যে খোঁজে তাদের মা ও মেয়েকে। বাঙালী যে-দেবীর কল্পনা করে, সে-দেবী স্বামী-গৃহ কৈলাস ছেড়ে বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে ছেলে-মেয়ে সঙ্গে করে পিতৃগৃহে আসেন, অথবা মা আসেন তাঁর সন্তানদের গৃহাঙ্গনে। সেখানে তিনদিন তাঁকে ঘিরে উৎসব-আনন্দ। তার পরেই অন্ধকার নবমীনিশি। পরের দিন বিজয়াদশমী—তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তন। এই ধারণা আমাদের মনে শৈশবকাল থেকেই ঠাঁই করে নিয়েছে। মা দুর্গার আগমনী ও বিজয়ার সঙ্গে বাঙালী-মনের নিরন্তর যোগ। তাই দুর্গোৎসবের মুহূর্তগুলি বাঙালীর পরম আকাঙ্ক্ষিত, তাদের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগ।

দুর্গানামের রহস্য সন্ধানে

হরিপদ আচার্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খুব প্রিয় একটি গান ছিল ঃ

> শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার।
> দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার ॥[১]

ঠাকুরের নির্দেশে কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ অনেকবার এই গানটি গেয়েছেন। ঠাকুর নিজেও কীর্তনীয়ার সঙ্গে কখনো কখনো তন্ময় হয়ে সুর মিলিয়েছেন। দুর্গানাম গাইতে গাইতে দুর্গতিনাশিনীকে প্রত্যক্ষ করে সমাধিস্থ হয়েছেন বারবার। কখনো তাঁর কণ্ঠে কীর্তনের সুরে শোনা গিয়েছে ঃ

> আমি দেহ বেচে ভবের হাটে
> দুর্গা নামটি কিনে এনেছি।[২]

সেই দুর্গানামের রহস্য সন্ধানে এই পরিক্রমা।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখের সকল প্রকার কারণকে সমূলে উৎপাটিত করে সর্বাঙ্গীণ শান্তিতে মনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই মহানন্দে বলা যায়—"আনন্দম্, আনন্দম্, আনন্দকেবলম্।" ব্রহ্মময়ীর কৃপায় সদানন্দ পুরুষ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান এবং পরমানন্দে কাল কাটান। জগতের সমস্ত দুঃখকে দূর করে যিনি মানবকে নিত্যানন্দময় করে তোলেন, তিনিই দুর্গা। মহাভারতে ব্যাসদেব বলেছেন ঃ সকল প্রকার দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ কর বলেই হে দেবি, তুমি দুর্গা নামে পরিচিতা—"দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।"[৩] যে চিরকল্যাণময়ী শক্তির বলে মানুষ সকল প্রকার অশুভ শক্তিকে—আসুরিক শক্তিকে বিনাশ করে দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে শুভশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে বিশ্বের কল্যাণ করতে পারে, সেই মহাশক্তিই দুর্গা।

দুর্গা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কোষগ্রন্থে নানাভাবে করা হয়েছে। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'দুর্গা' শব্দের দ-কার দিয়ে বুঝায় দৈত্যনাশকারিণী, উ-কারের অর্থ সর্ববিঘ্ননাশিনী, রেফ্ দ্বারা বুঝায় সর্বরোগবিনাশিনী, গ-কারের অর্থ পাপনাশিনী আর আ-কার দিয়ে বুঝায় সর্বভয় ও শত্রুনাশিনী ঃ

> দৈত্য নাশার্থবচনো দ-কারঃ পরিকীর্তিতঃ।
> উ-কার বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদ-সম্মতঃ ॥
> রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
> ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ ॥[৪]

কোথাও আবার দুর্গা শব্দের নানারূপ অর্থ করে হন্তৃবাচক অ-প্রত্যয় যোগ করে দুর্গা শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। সেখানে দুর্গা শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঃ দুর্গনামে দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, খারাপ কাজ, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, কঠিন রোগ। এসকল বিপদ দূর করে যিনি মানুষকে রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা নামে পরিচিতা ঃ

> দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
> শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥
> মহাভয়ে অতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
> এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা ॥[৫]

দুর্গাপুজোয় অবশ্যপাঠ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে দুর্গাকে কখনো বলা হয়েছে ভবসাগরে নৌকাস্বরূপা—"দুর্গাসি ভবসাগর-নৌরসঙ্গা",[৬] কখনো বা দুর্গম নামক অসুরের বধকারিণী—"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।"[৭] দেবী পুরাণে বলা হয়েছে, দুর্গেশ্বরী অর্থাৎ দুর্গের রক্ষাকারিণী—"দুর্গেষু দুর্গেশ্বরি"[৮]

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৮।১ ২ ঐ, ৩।৯।১

৩ মহাভারত, বিরাট পর্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

৪ শব্দকল্পদ্রুম, ২য় ভাগ (চৌখাম্বা), ১৯৬৭, পৃঃ ৭২৮

৫ ঐ ৬ চণ্ডী, ৪।১১ ৭ ঐ, ১১।৪৯

৮ দেবীপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪, ৮৩।৬৩

দেবীভাগবতে বলা হয়েছে, নগর রক্ষাকারিণী—"রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্যা-সর্বদা নগরস্য হ।"৯

শক্তিতত্ত্বের ধারণা মানবমনে সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। মানুষ যেদিন থেকে বিশ্বপ্রকৃতির ভীষণ বা উন্মাদয়িতৃ রূপ দেখে অবাক হয়ে এবং নিজের বুদ্ধিতে সে-রহস্য বুঝতে না পেরে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির প্রবল শক্তির কাছে মাথা নত করে তাঁদের স্তব-স্তুতি শুরু করল ঋক্‌মন্ত্রে আর সাম গানে, সেদিন থেকেই তার সূচনা। যেদিন দক্ষকন্যা অদিতিকে বৈদিক ঋষিগণ সকল দেবতার মাতার আসনে বসালেন সেদিনই হলো দেবী-আরাধনার সম্যক উদ্বোধন। ভারতীয় সংস্কৃতির তথা ধর্মদর্শনের অক্ষয় ভাণ্ডার বেদরাশি থেকে আধুনিককালের গ্রন্থাদিতে পর্যন্ত দুর্গার কল্পনা প্রায় একই ভাবে চলে আসছে। এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে শক্তিবাদ তো বেদে স্বীকৃত হলো, কিন্তু দুর্গার কল্পনা বা দুর্গা নামটির উল্লেখ বেদে ছিল কি?

বৈদিক সাহিত্যে দুর্গা

সমগ্র বিশ্বে মানবজাতির ইতিহাসের সুবিন্যস্ত লিখিত প্রাচীন তথ্যবহুল একমাত্র গ্রন্থ ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের নিরানব্বই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে 'দুর্গা' নামটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনি আমাদের সকল দুঃখ থেকে পার করেন—"স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা।" তারপর অণ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ বর্গের পরিশিষ্টে বহুস্তবপ্রিয়া আশ্রয়দায়িনী দুর্গাকে স্তব করা হয়েছে—"স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াং সহস্রসংমিতাং দুর্গাম্।" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবীসূক্তে দেবীকে সমস্ত দেবতার মাতা এবং শক্তিদাত্রী বলা হয়েছে। দেবী নিজেকে সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, অন্তর্যামিনী, ধনদাত্রী, ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং হিংস্রপ্রকৃতি অসুরদের বধের জন্য রুদ্রের ধনুতে জ্যা-সংযোগকারিণী বলেছেন। শুধু কি তাই—"জনায় সমদং কৃণোম্যহম্"—আমি ভক্তজনের রক্ষার জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করি—এই ঋক্‌মন্ত্রের প্রতিধ্বনি শোনা যায় চণ্ডীতেঃ "অবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্"১০ —আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুদের ধ্বংস করব। তাছাড়া ঋগ্বেদে আরো কয়েকবার দুর্গানামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন—বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা, অগ্নিদুর্গা প্রভৃতি। এঁরা মনে হয়, যথাক্রমে স্থলাধিষ্ঠাত্রী, জলাধিষ্ঠাত্রী এবং অগ্নির অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পিতা হয়েছেন। এমনকি কোথাও অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বনদুর্গা নামটিও পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদের (১০।১।৭) দুর্গাগায়ত্রী "কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ" এখনো কাত্যায়নী দুর্গাপূজার বিশেষ মন্ত্র। উপনিষদের বিষয়বস্তু যদিও ব্রহ্মতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্বর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবু তারই মাঝে মাঝে শক্তির বিভিন্ন রূপ কল্পনার অস্তিত্ব বিদ্যমান। উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে 'উপনিষদ্ দর্শন' গ্রন্থে ১১২টি উপনিষদের এক বিরাট তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে শাঙ্করভাষ্য-সংবলিত এগারটি প্রধান উপনিষদ্ বাদ দিয়ে বাকিগুলির মধ্যে শক্তিবিষয়ক উপনিষদ্ হলো অন্নপূর্ণা, বহ্বৃচ, ত্রিপুরতাপিনী, ত্রিপুরা ও দেবী উপনিষদ্ প্রভৃতি। শক্তিবিষয়ক উপনিষদ্গুলিতে তো দেবীর রূপ-গুণ বর্ণনা আছেই; এমনকি, প্রধান উপনিষদ্গুলির মধ্যে ও মুণ্ডকোপনিষদে কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচী, চঞ্চলজিহ্বা প্রভৃতি দেবীর নামের উল্লেখ পাই। কেনোপনিষদের হৈমবতী উমার উপাখ্যান তো সর্বজনবিদিত। পরব্রহ্মই রূপ পরিগ্রহ করে সেখানে উমা নামে পরিচয় দিয়েছেন। এ হৈমবতী উমাই পরবর্তী কালে গিরিরাজ ও মেনকার আদরের দুলালী উমারূপে আগমনী সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। নারায়ণ উপনিষদে আমরা অনেকবার দুর্গা নামের সন্ধান পাই। তাদের মধ্যে একটি দুর্গাগায়ত্রী ও একটি প্রণামমন্ত্র উল্লেখযোগ্য। গায়ত্রী মন্ত্রটির সঙ্গে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, হে দুর্গে তুমি কন্যা ও কুমারী, স্বীয় পিতার ভোগ ও মোক্ষদাত্রী,

---

৯ দেবী ভাগবত (বঙ্গবাসী সংস্করণ), ৩।২৪।৬

১০ চণ্ডী, ১১।৫৫

আমরা তোমাকে জানি, তোমার ধ্যান করি, তুমি তাহাতে আমাদিগকে প্রেরণ কর—"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।"[১১] প্রণাম মন্ত্রটিও অপূর্ব সুন্দর। সেখানে বলা হয়েছে, অগ্নিবর্ণসদৃশী, সন্তাপের দ্বারা আমাদের শত্রুবিনাশিনী পরমাত্মাদৃষ্টা স্বর্গ-পশু-পুত্রাদিলাভের নিমিত্ত উপাসকগণ কর্তৃক সেবিতা দুর্গাদেবীর শরণাপন্ন হলাম। হে সংসারতারিণি, তুমি আমাদের সংসারসমুদ্র থেকে উত্তরণ করাও। হে দেবি, সেজন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কার করছি—

তামগ্নিবর্ণাং তমসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাদেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ ॥[১২]

অথর্ববেদীয় দেবী উপনিষদেও অনুরূপ একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। সেখানে দেবতাগণ মহাদেবী দুর্গার স্তব করেছেন, সুখতারণকারিণী অজ্ঞানান্ধকারনাশিনী সেই দুর্গাদেবীর আমরা শরণ নিচ্ছি—"দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তমঃ ॥"[১৩] সেখানে দুর্গা নামের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছেন, দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন বলেই দেবী দুর্গা নামে অভিহিতা হয়ে থাকেন—"দুর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাৎ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে ॥"[১৪] কালিকা উপনিষদেও বলা হয়েছে—

"দুর্গা মনোর্বা সর্বস্য দুর্গা মনোর্বাহম্ ॥"[১৫]

মহাভারতে দুর্গা

মহাভারতের দুজন প্রধান পুরুষ যুধিষ্ঠির ও অর্জুন দুর্গতি থেকে পরিত্রাণের জন্য দুবার দুর্গাদেবীর স্তব করেছেন। বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চপাণ্ডব বারবছর বনবাসের পর এক বছর অজ্ঞাতবাসের জন্য বিরাটরাজার পুরীতে প্রবেশের আগে নির্বিঘ্নে অজ্ঞাতবাস কাটাবার জন্য ঋষিদের উপদেশ অনুসারে ভাইদের সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির দুর্গাদেবীর স্তব করেন—"শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে।"—হে শরণাগতপালিকে, ভক্তবৎসলে দুর্গে, আমি আপনার শরণাগত, আমাদের রক্ষা করুন। পাণ্ডবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী ভগবতী দর্শন দিয়ে তাঁদের বর দিলেন, "হে পাণ্ডবগণ, আমি প্রসন্না হয়ে বলছি, তোমরা বিরাটনগরে থাকাকালে কেউই তোমাদের চিনতে পারবে না এবং অচিরকাল মধ্যে কৌরবদের পরাজিত করে তোমরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করবে।"

দ্বিতীয় স্তবটি পাই ভীষ্মপর্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধে জয়লাভ কামনা করে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে রথ থেকে অবতরণ করে পবিত্রচিত্তে সংগ্রামের অভিমুখে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নতজানু হয়ে দুর্গার স্তব করেন—হে স্কন্দজননি, কান্তারবাসিনি, ভগবতি দুর্গে! তোমার অনুগ্রহে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা আমার জয় হউক—"স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনি। জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্ রণাজিরে ॥" দুর্গা অর্জুনের ভক্তিযুক্ত স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "হে বীর! নারায়ণ তোমার সহায়। তুমি অল্পসময়ের মধ্যেই শত্রুগণকে পরাজিত করবে।" দেবীর এই বরলাভ করে অর্জুন নিজের বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রথে আরোহণ করে শঙ্খধ্বনি করলেন।

রামায়ণে দুর্গা

দুর্গাপূজার অপর নাম অকালবোধন। বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে দেবীর বোধনমন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ পুরাকালে অকালে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধন হয়েছিল—"অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা।"[১৬] এ মন্ত্র থেকেই মনে হয় 'অকালবোধন' কথাটি নেওয়া হয়েছে। এ অকালবোধন হয়েছিল রাবণবধের জন্য আর রামের প্রতি দেবী দুর্গার অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য—"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।"[১৭] কৃত্তিবাসী

---

[১১] নারায়ণ উপনিষদ্, ১।৩৪

[১২] ঐ, ২।২

[১৩] উদ্ধৃত ঃ ভারতের শক্তিসাধনা—অমূল্যনাথ চক্রবর্তী, ১ম খণ্ড, ১৩৬৯, কলিকাতা, পৃঃ ৮০

[১৪] ঐ, পৃঃ ৮২

[১৫] ঐ, পৃঃ ৮৭

[১৬] দ্রঃ পুরোহিতদর্পণ, দুর্গাপূজা, বোধন

[১৭] ঐ

রামায়ণে পাওয়া যায় শ্রীরামচন্দ্র নিজে অকালবোধন করে একশ আট নীল পদ্ম দিয়ে দুর্গাপুজো করেছিলেন এ কাহিনী কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণে নেই। তবে বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে তিরাশি-অধ্যায়ের চৌত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে পাওয়া যায় ধনুষ্পাণি রঘুনন্দন রামচন্দ্র জয়লাভের জন্য ব্রহ্মার বিধান অনুসারে মায়াযোগ অর্থাৎ মহামায়া দুর্গার পূজা করেছিলেন ঃ

স সম্প্রাপ্য ধনুষ্পাণি মায়াযোগমরিন্দমঃ।
তস্থৌ ব্রহ্মবিধানেন বিজেতুং রঘুনন্দনঃ॥

যদিও শ্লোকটির অর্থ রহস্যান্বিত তবু বাল্মীকি রামায়ণে একটিমাত্র সূত্রই পাওয়া যায়।

পুরাণে দুর্গা

আঠারটি মহাপুরাণ এবং আঠারটি উপপুরাণের মধ্যে দেবীভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ এবং কালিকাপুরাণে দুর্গাবিষয়ক তত্ত্ব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দেবীভাগবতে যেমন দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা মুখ্য হলেও স্থানবিশেষে অন্যান্য তত্ত্ব স্থান পেয়েছে, তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকীর্তন প্রধান উদ্দেশ্য হলেও প্রসঙ্গতঃ যোগমায়ার আবির্ভাব এবং ব্রজমণ্ডলে গোপাঙ্গনাদের কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী দুর্গার আরাধনা প্রভৃতি দেবী বিষয়ক অনেক কথা স্থান পেয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অংশটি শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে খ্যাত এবং দুর্গাপূজায় অবশ্যপাঠ্য। দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ অনুযায়ীই সাধারণতঃ দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অতএব এসকল পুরাণে যে দুর্গামাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

তন্ত্রে দুর্গা

বৈদিককাল থেকে দুর্গাতত্ত্বের যে-ধারাটি চলে আসছিল, সে-ধারাটিরই পরিপূর্তি সাধিত হয়েছে তন্ত্রে। তন্ত্রে এক অখণ্ড মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী ব্রাহ্মী, বিষ্ণুময়ী বৈষ্ণবী, শম্ভুময়ী শাম্ভবীদেবী সর্বময়ী শুদ্ধব্রহ্ম স্বরূপিণী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। চৌষট্টিপ্রকার তন্ত্র-সাধনায়ই দেখা যায় মহাশক্তি মহামায়া সকল দেবতা এবং সকল উপাসনা-তত্ত্বগুলিকে এক সমন্বয়সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। তন্ত্রের মূল কথাই অনেকে বলেন, সকলপ্রকার ইষ্টমন্ত্রেরই অধিষ্ঠাত্রীদেবতা হলেন দুর্গা—"সর্বেষাম্ ইষ্টমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।"[১৮]

উপসংহার

সর্বৈশ্বর্যময়ী দুর্গতিনাশিনী দুর্গাই পরবর্তীকালে বাঙালীর মনের মতো হয়ে সিদ্ধিরূপী গণেশ, ঋদ্ধিরূপিণী লক্ষ্মী, বিদ্যারূপিণী সরস্বতী, তেজরূপী কার্তিককে সঙ্গে নিয়ে অকল্যাণরূপী অসুরকে ধ্বংস করেন। এভাবে মহাশক্তি মহামায়া দুর্গতিনাশিনী রূপে মর্ত্যধামে এসে সন্তানের প্রাণের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। অকল্যাণ বিনাশের অলক্ষ্যেই যে শিব অর্থাৎ কল্যাণ বর্তমান থাকে সে-কথাটিও কিন্তু বাঙালী ভোলেননি। তাই দুর্গার মূর্তি কল্পনায় সকলের অলক্ষ্যে এবং সর্বোপরি শিবকে অর্থাৎ কল্যাণকে স্থান দিয়েছেন তাঁরা।

বাঙালীর কাছে দুর্গা এখন আর শুধু মাতৃদেবী নন। তিনি এখন আদরের দুলালী কন্যা হয়ে তিন দিনের জন্য হরের ঘর ছেড়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন আর দশমীর দিন সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যান। সেইসঙ্গে বাঙালী নরনারী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন পরের বছর পুনরায় আসার জন্য ঃ

গচ্ছ দেবি পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥[১৯]

---

[১৮] উদ্ধৃত ঃ ভারতের শক্তিসাধনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৪

[১৯] পুরোহিতদর্পণ, দুর্গাপূজা, দশমী

দক্ষিণ বঙ্গের একটি প্রাচীন দুর্গাপূজা

দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়

সরস্বতী নদীর উত্থান-পতনের পথ বেয়ে হাওড়ার দক্ষিণস্থ প্রাচীন জনপদ শিবপুরের অভ্যুত্থান কিছু কিছু ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুপ্রাচীন শিবমন্দিরের সংখ্যাধিক্যহেতু ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ এই অঞ্চল অতীতকাল থেকেই শিবের পুরী ‘শিবপুর’ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডীরও একটি পীঠস্থান যে এটি ছিল তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে শিবপুরের আদি ভূখণ্ড বেতড়ের (অধুনা ব্যাতাইতলার) ঐতিহ্যবাহী মা বেত্রচণ্ডিকা বা মা ব্যাতাইচণ্ডীর মন্দির। বহু শতাব্দী জুড়ে যে বেতড় বন্দর তার বিজয়কেতন উড়িয়ে ছিল তারই প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা ছিলেন মা ব্যাতাইচণ্ডী। চণ্ডীর আরাধনাই মূলতঃ দুর্গাপূজা এবং বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার ইতিহাসে দক্ষিণ বঙ্গের শিবপুর প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। আজ থেকে তিনশো চার বছর আগে ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন শিবপুরের জমিদার রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী তাঁর পারিবারিক দুর্গাপূজায় প্রদত্ত দশমীর শ্বেতছাগ বলিদান বেত্রচণ্ডিকার মন্দিরেই সম্পন্ন করেছিলেন। সেই থেকে আজও ‘সাজার আটচালা’র পুজোর এই বলিদানটি প্রতি বিজয়া দশমীর দিন সকালে এই মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়। শিবপুর তথা দক্ষিণ হাওড়া ও মেদিনীপুরে দুর্গাপূজার হোতা এই প্রাচীন জমিদার পরিবার কিনা তা গবেষকরা বলতে পারবেন।

দুর্গাপূজার প্রবর্তক পঞ্চদশ শতকের গৌড়েশ্বর গণেশ অথবা ষোড়শ শতকের উত্তর বঙ্গের তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ—তা নিয়ে বিতর্ক আছে। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ সপ্তদশ শতকে মধ্যবঙ্গের মাটিয়ারিতে যে দুর্গাপূজা শুরু করেন, সম্ভবতঃ ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ রুদ্রের আমলে সেটি স্থানান্তরিত হয় কৃষ্ণনগরে। প্রায় সমসাময়িক কালেই ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে নিম্নবঙ্গে বেত্রচণ্ডিকার পীঠস্থান শিবপুরে দশভূজা দেবী দুর্গার আরাধনার সূচনা করেন শিবপুরের রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী। ত্রিকোণাকৃতি চালচিত্রে মহাদেব এবং কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী পরিবেষ্টিতা ডাকেরসাজে সুসজ্জিতা দুর্গার ঐ পূজাটিই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম দুর্গাপূজা। রায়চৌধুরীরাই শিবপুরের প্রথম জমিদার।

সরকারি নথিপত্র অনুসন্ধান করেও পাওয়া যায় যে, ১০৯০ বঙ্গাব্দে (১৬৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দে) ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী (মুখোপাধ্যায়) চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর-মণিরামপুর থেকে পৈতৃক জমিদারির এগারোটি গ্রাম (শিবপুর, ব্যাতাইতলা, ডাঁসি, সলপ, নিবড়া, নিতাঙ্কুর, চামরাইল, মাঝের হাট, দেবীপাড়া, বাঁকড়া ও বেতড়) ভাগে পেয়ে শিবপুর গ্রামে চলে এসে নতুন করে ভদ্রাসন স্থাপন করেন। ভদ্রাসনের সম্মুখে দীঘি খনন করে তার পাড়ে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভদ্রাসনের পিছনে বিশাল একটি ফুল ও ফলের বাগান গড়ে তোলেন, যেটি সুখের বাগান বা শখের বাগান নামে দীর্ঘদিন পরিচিত ছিল। সেখান থেকে ফুল তুলে এনে রাজা রামব্রহ্ম নিত্য মন্দিরে মহাদেবের পূজা-অর্চনা করতেন। তাঁর শিশুকন্যা ঐ বাগানেই প্রত্যহ সকালে বিকালে খেলাধুলো করত। তার সঙ্গী ছিল সমবয়সী একটি মেয়ে পদ্মা। মেয়ের মুখে পদ্মার নানান বর্ণনা শুনে রাজার তাকে দেখবার কৌতূহল হয়। মেয়েকে বলেন বান্ধবীকে একদিন রাজবাড়িতে নিয়ে আসতে। পদ্মাকে সেকথা বললে সে কিছুতেই আসতে রাজি হয় না। অগত্যা রাজাকেই একদিন যেতে হয় শখের বাগানে পদ্মাকে দেখতে। খেলার ফাঁকে একসময় কন্যা তার পিতাকে বাগানে ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু পদ্মাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বাগানের মাটিতে শুধু পদ্মার কতকগুলি পায়ের ছাপ দেখিয়ে কন্যা পিতাকে পদ্মার উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত করে। অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পারেন যে ঐ নামে পাড়ায় তাঁর কোন কর্মচারীর কোন কন্যা নেই। বিহ্বলচিত্তে নিদ্রাকালে সেই রাত্রেই রাজা স্বপ্নাদেশ পান যে, পদ্মা আসলে

মহামায়া। তাঁকে দর্শন করতে হলে আগামী আশ্বিনে তাঁর পুজার্চনার ব্যবস্থা করতে হবে। পরদিন ছিল ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী। হাতে সময় খুবই অল্প। তাই বাধ্য হয়েই তাড়াতাড়ি দুর্গাপুজোর জন্য সত্বর আটচালা নির্মাণ করিয়ে জমিদার রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী দেবীর পুজোর ব্যবস্থা করেন। এটি ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। পরবৎসর থেকে পাকা দরদালান সংলগ্ন দুর্গাবাড়িতে পুজো হতে থাকে। সম্মুখভাগে নহবৎখানাও স্থাপিত হয়। তথাপি আজও ঐ পুজোপ্রাঙ্গণটি 'সাজার আটচালা' নামেই সুপরিচিত হয়ে আছে।

পরবর্তী কালে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রচলন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির পুজোগুলি ধীরে ধীরে ম্লান হয়েছে। আবার পঞ্চাশের দশকে জমিদারি প্রথা বিলোপের ফলে বেশ কিছু বাড়ির পুজো বারোয়ারি পুজোয় রূপান্তরিত হয়েছে। রায়চৌধুরী বাড়ির ঐতিহ্যনির্ভর আচার-অনুষ্ঠান, পুজা-পদ্ধতি, প্রতিমার গঠনরীতি ইত্যাদি বজায় রেখে 'সাজার আটচালা'র পুজোটিরও এখন খরচ চলে শিবপুর বাজারের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে। পুজোটি নিষ্পন্ন হয় শরিকী পরিবারসমূহের যৌথ দায়িত্বে। পুজোদালানের প্রাঙ্গণে এখন স্থাপিত হয়েছে একটি হাইস্কুল—শিবপুর শিক্ষালয়। আগে নবম্যাদি কল্পারম্ভ থেকে শুরু করে একটানা পনেরদিন ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরে হাঁড়ি চড়ত না কারো বাড়িতে। অন্নসত্র বা সদাব্রত ভিন্নও আটচালা প্রাঙ্গণে ঐ কদিন উৎসবের অঙ্গহিসাবে থাকত যাত্রাগানের অনুষ্ঠান, বসত গানবাজনার আসর। বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণ মতে হতো ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ পক্ষের নবমীতে বোধন, বোধনের পূর্বে কল্পারম্ভ, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী আর মহানবমীর সন্ধিক্ষণে ছাগ-বলিদান (তৎকালে ১০৮টি)। পুজোপচারও সংগৃহীত হতো একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শাস্ত্রমতে। দান-ধ্যানের আতিশয্যও কিছু কম ছিল না। এক কথায় সার্বজনীন আনন্দোৎসবের অঙ্গহিসাবে সেদিন শিবপুরের এই আদি জমিদার বাড়িতে শুরু হয়েছিল শারদোৎসব পালন। তৎকালীন কোন কোন জমিদার পরিবারে যেমন, বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী, চোরবাগানের মিত্রদের বাড়িতে সাবেককালের এই দুর্গোৎসব পালনের রীতি চালু থাকলেও ভাগীরথীর পশ্চিম পারে শিবপুরের অধীনস্থ বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের শারদোৎসব অনুষ্ঠান সেই প্রথম। রায়চৌধুরী বাড়ির পাশে সর্বস্ব পালের বাড়ির দেবী অভয়ার যে পুজো আজও প্রচলিত আছে সেটিও প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। কথিত আছে, অভয়া পদ্মার ভগ্নীরূপে স্বপ্নাদিষ্টা। আর সেই কারণেই দিদির প্রাপ্য সম্মানার্থে আজও সাজার আটচালার ঢাকের বাদ্যি আগে শুনে পরে ঢাকে কাঠি পড়ে পাল-বাড়িতে। মহিষ বলিদান পালবাড়ির পুজোর আজও বিশেষ আকর্ষণ। তবে সাজার আটচালায় আগে বলিদান হয়, তারপর হয় পালবাড়িতে। তেঁতুলতলার ভট্টাচার্য পরিবারের পুজো শুরু হয় ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে জমিদারের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমিতে নির্মিত ভদ্রাসনে। এইভাবে শিবপুরে বেশ কয়েকটি বনেদী পুজোর উৎসাহদাতা ছিলেন রামব্রহ্ম রায়চৌধুরীর পরিবার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে দিল্লীর বাদশা ফারুকশিয়ারের ফরমান মোতাবেক গঙ্গার পশ্চিমতীরের পাঁচটি গ্রামকে (শালিখা, হাওড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, বেতড়) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলেন তখন তৎকালীন জমিদার রাজা শুকদেব রায়চৌধুরী নবাবের সহায়তায় তার বিরোধিতা শুরু করলেন। বিরোধটি চলে চার দশকেরও অধিক সময় ধরে (১৭১৭-১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে মীরকাশিম বাংলার নবাব হয়ে হাওড়াকে বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত করে বৃটিশ এলাকায় পরিণত করেন। তার ফলে কোম্পানীর রোষদৃষ্টিতে পড়ে ঐ রায়চৌধুরী পরিবার। সেকালের অনেক জমিদার ও অভিজাত ব্যক্তি কোম্পানীর কাছে নিজেদের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে কোম্পানীর কাছ থেকে উপাধি ও অনুগ্রহ অর্জনের মাধ্যম হিসাবে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করতেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উৎসব উপলক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠত প্রজাপীড়ন। ব্রিটিশের মনোরঞ্জনে বেড়ে চলত পুজোর ব্যয়। দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্বক সংগৃহীত হতো উপঢৌকন। রায়চৌধুরীদের এই পুজো ছিল এসবের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

'সাজার আটচালা'র দুর্গাপুজো সময়ের প্রেক্ষিতে

আজ পিছিয়ে পড়েছে জাঁকজমক ও জৌলুষের নিরিখে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে প্রাণের অভাব আজও হয়নি, হয়নি অন্তরের আবেদনেরও। আর সেখানেই এই পূজার সার্থকতা। দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করে তৎকালীন শিবপুরের জমিদার রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী এক নতুন সামাজিক চেতনার অভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সম্প্রীতি ও সমন্বয় ভাবনার বোধ প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে সেই বোধ ধর্মের গণ্ডিকেও অতিক্রম করেছিল। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়, সেই সময় 'সাজার আটচালা'র দুর্গাবাড়িতে বহু মুসলমান নিশ্চিন্তে আশ্রয় লাভ করেছিল। সাম্প্রতিক কালেও ঐ পরিবারের বংশধরগণ সেই চেতনাকে অম্লান রাখার চেষ্টা করে চলেছেন; অম্লান রাখার চেষ্টা করে চলেছেন তাঁদের আদি পুরুষের প্রবর্তিত দুর্গাপূজার মহান ঐতিহ্যকে।

দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ

নির্মলকুমার রায়

শারদীয়া দুর্গাপূজা—বাঙালীর আনন্দোৎসব, প্রাণের উৎসব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিলসিত শরৎকাল বাঙালীর মানস প্রকৃতিতে এক বিশেষ নান্দনিক প্রভাব সত্যই বিস্তার করে। বসন্তকে ঋতুরাজ বলা হয়। কিন্তু এই উৎসবের জন্য ঋতুসম্রাটের ভূমিকা শরতের। তাই বসন্তের পরাজয় ঘটেছে শরতের কাছে। আকাশে বাতাসে অফুরন্ত খুশির মাঝে শুরু হয় শরতের অনিরুদ্ধ প্রসন্নতা আনন্দময়ীর আগমনে। উৎসবপ্রিয় বাঙালীর হৃদয়মন উচ্ছল হয়ে ওঠে আনন্দে, আড়ম্বরে আর উচ্ছ্বাসে—মধুর হয়ে ওঠে ভক্তিতে, প্রীতিতে আর নিষ্ঠায়। প্রকৃতিও যেন নতুন করে সাজে। বর্ষার মেঘের কালিমা ঘুচিয়ে উজ্জ্বল নীলাকাশ ঝলমল করে সোনালী রোদে—আকাশে সাদা সাদা হাল্কা মেঘরাশি, নদীতীরে সাদা কাশের গুচ্ছ, গাছে গাছে শেফালীর অফুরান সম্ভার। সাধারণ জীব আমরা—দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-ব্যথা-অভাব ভুলে তাই আনন্দের সজীব আকর্ষণে সবাই মেতে উঠি—মেতে ওঠেন আনন্দের পূজারী সাধককুলও। তাই অধ্যাত্মরসে বিসিঞ্চিত, আনন্দের সচল বিগ্রহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও আমরা দেখতে পাই এই দুর্গোৎসবের আনন্দসাগরে তাঁর অধ্যাত্মরাগরঞ্জিত মনোরম অবগাহন! যেখানেই আনন্দ, সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ, সেখানেই আনন্দ। আনন্দময়ীর পবিত্র পূজামণ্ডপে আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাই স্বাভাবিক। অধ্যাত্মচেতনায় আনন্দময় সত্তার স্বরূপ আস্বাদন করাও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

এবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের দুর্গাপূজা দর্শনের কথা স্মরণ করব।

ঢাক বেজে উঠেছে দুর্গাপূজার মণ্ডপে—আনন্দের ঢাকও বুঝি বেজে উঠল সচ্চিদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মহারা অন্তরে! দেবী এসেছেন—দশপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, সিংহবাহিনী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয় আর কার্যসিদ্ধিকারী গণপতি। এই চিত্র স্মরণ হতেই বুঝি বা দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির থেকে চলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বরেরই বাচস্পতিপাড়ায় বিত্তশালী ভক্ত নবীন নিয়োগীর বাড়ির দুর্গাপূজা মণ্ডপে। সার্থক হলো পূজা, প্রতিমা ও ভক্তদর্শন! পিতা-পুত্রের দুর্গা আরাধনা দেখে পরবর্তী কালে নিজ ভক্তদের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিঃ "নবীন নিয়োগী—তারও যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। দুর্গাপূজার সময় দেখি, বাপ-ব্যাটা দুজনেই চামর কচ্ছে।"[১]

* * *

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাস। দুর্গাপূজার সময় কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে ফিরছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। পথিমধ্যে বাঁকুড়া জেলার কোতুল-

---

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৮।৩

পুর গ্রামের মধ্য দিয়ে আসার সময় দুর্গাপূজার আরতির ঢাক নিশ্চয়ই তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাই কোতুলপুর গ্রামের ধনীপরিবার ভদ্রদের বাড়িতে দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন এবং দেবীর আরতি দর্শনও করেছিলেন।[২]

* * *

ভাগ্নে ও সেবক হৃদয়ের শিহড়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব। হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা, সেই পূজায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদান করুন। বাদ সাধলেন রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন* বিশ্বাস। তাঁর কলকাতার জানবাজারের বাড়িতে সেবার দুর্গোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যাবেনই ভক্ত মথুরামোহন। আশাহত হৃদয় যখন ক্ষুণ্নমনে দক্ষিণেশ্বর থেকে শিহড়ে যাত্রা করেন, তখন হৃদয়ের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে ঠাকুর তাঁকে ভরসা দিয়ে বলেনঃ "তুই দুঃখ কচ্ছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখতে যাব। আমাকে অপর কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু তুই পাবি।" ঠাকুরের আশ্বাসে হৃদয় মহানন্দে দেশে ফিরে পূজার আয়োজন করেন।

এসম্পর্কে পরবর্তী তথ্যঃ "সপ্তমীবিহিত পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবারকালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।'"[৩]

কলকাতার জানবাজারে মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়িতে দুর্গোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যোগদান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ "সেবারে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঠাকুর তাঁহার (মথুরামোহনের) গৃহে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্তা জগদম্বা দাসীর (মথুরাবাবুর স্ত্রী) দ্বারা পুরনারীর ন্যায় বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যারতির সময়ে চামরহস্তে দেবীকে বীজন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহে সে সময়ে প্রকৃতিভাব এত সুব্যক্ত হইয়াছিল যে, মথুরবাবু পর্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।...সে যাহা হউক, পূজা সেবারে খুব জমিয়াছিল এবং মথুরবাবু আনন্দে ভাসিতেছিলেন। এদিকে বিজয়া দশমীর নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন চলিতে লাগিল। তাই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইলেন, 'বাবুকে নিচে এসে প্রণাম-বন্দনাদি করে যেতে বল।' মথুরের নিকট সংবাদ পৌঁছিলে আনন্দচিন্তায় মগ্ন তিনি প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন ভাবিলেন, 'না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙতে পারব না। মাকে বিসর্জন! মনে হলেও যেন প্রাণ কেমন করে ওঠে!' তথাপি পুরোহিতের আহ্বান বারবার আসিতে থাকায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি মাকে বিসর্জন দিতে দেব না। যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনি পূজা হবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হবে—খুনোখুনি পর্যন্ত হতে পারে।' এই বলিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। একে একে বাটীর গণ্যমান্য অনেকেই তাঁহাকে বুঝাইতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তিনি তখনো অটল। অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ধারণা করিয়া বসিলেন যে, বাবুর মাথা খারাপ হইয়াছে। অথচ হঠকারী মথুরের ভয়ে কেহ অন্যরূপ করিতেও সাহস পাইলেন না। অবশেষে মথুরগৃহিণী ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর যাইয়া দেখেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর কাছে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি মাকে বিসর্জন দিতে পারিবেন না—প্রাণ

---

[২] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।১।৩ পাদটীকা

[৩] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—১ম ভাগ, ১৩৭৭, সাধকভাব, পৃঃ ৩৩৮

* মথুরের প্রকৃত নাম মথুরমোহন, মথুরামোহন বা মথুরানাথ নয় (দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৯তম বর্ষ, পৃঃ ৫৫২)।—সংযুক্ত সম্পাদক।

থাকিতে নয়। ঠাকুর তখন তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'ওঃ! এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে? এ তিনদিন বাইরের দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।' সে অদ্ভুত মোহিনীশক্তিতে মথুরবাবু অচিরে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং প্রতিমা-বিসর্জনও নির্বিবাদে হইয়া গেল।"[৪]

* * *

ভক্ত অধরলাল সেনের কলকাতার বেনেটোলার বাড়িতেও দুর্গাপূজায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যোগদানের কথা জানা যায়। অধরলালের বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের ভাবান্তর হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ আছে: "দুর্গোৎসবে ঠাকুর ভক্তসহ অধর-ভবনে যাইতেন এবং প্রতিমার সম্মুখে ভাবমগ্ন হইতেন; আর সমাধিভঙ্গে বলিতেন, 'এমন হাস্যময়ী প্রতিমা আর দেখা যায় না।' আবার ঠাকুর চলিয়া গেলে সে আনন্দনিকেতনও শ্রীযুত অধরের নিকট নিরানন্দ মনে হইত।"[৫]

অধরলালের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় ঠাকুর দেবীপ্রতিমার সামনে দিব্যভাবারূঢ় অবস্থায় নিজের **'স্বরূপ'** যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সে-সম্পর্কে কথামৃতকারের অপূর্ব বর্ণনা: "শ্রীযুক্ত অধরের বাড়িতে নবমীপূজার দিনে ঠাকুর-দালানে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীদুর্গার আরতি দর্শন করিতেছেন। অধরের বাড়ি দুর্গাপূজা মহোৎসব, তাই তিনি ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

"আজ বুধবার, ১০ অক্টোবর ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ, ২৪শে আশ্বিন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে বলরামের পিতা ও অধরের বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্‌স্পেক্টর সারদাবাবু আসিয়াছেন। অধর প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেকে আসিয়াছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যার আরতি দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুরদালানে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া মাকে গান শুনাইতেছেন।…শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ির দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া বসিয়াছেন। ঘরে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন। বলরামের পিতা ও সারদাবাবু প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর এখনো ভাবাবিষ্ট। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'ও বাবুরা, আমি খেয়েছি; এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও।'

"অধরের নৈবেদ্য পূজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার আবেশে বলিতেছেন, 'আমি খেয়েছি, এখন তোমরা প্রসাদ পাও?'

"ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, 'মা আমি খাব? না, তুমি খাবে? মা কারণানন্দ-রূপিণী।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে এক দেখিতেছেন? যিনি মা, তিনিই কি সন্তানরূপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাই কি ঠাকুর 'আমি খেয়েছি' বলছেন?"[৬]

* * *

এবার ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে দুর্গোৎসবে ঠাকুরের ভাবনেত্রে দুর্গাপূজা দর্শনের কথা স্মরণ করে প্রসঙ্গ শেষ করব।

কলকাতার সিমুলিয়া-পল্লী-নিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বাড়ির অধিকাংশ উৎসবেই ঠাকুরকে নিয়ে যাবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে দুর্গাপূজার সময় ঠাকুর কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে শ্যামপুকুরে অবস্থান করায়, সেবারে অসুস্থ ঠাকুরকে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ির দুর্গোৎসবে নিয়ে যেতে পারেননি; তাই তাঁর অন্তরে ছিল প্রচণ্ড দুঃখ। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর ভক্তের অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করে ভাবাবস্থায় জ্যোতির্ময় পথে সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে কেমনভাবে পূজা উপভোগ করেছিলেন, তার একটি সুন্দর বর্ণনায় পাওয়া যায়:

"ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—

---

[৪] শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—২য় ভাগ, (১৩৭১), পৃঃ ১৪৫-১৪৭

[৫] ঐ, পৃঃ ২৪৫

[৬] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।১০।১

যাঁহাকে তিনি কখন কখন 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। ...শরীরের অসুস্থতাবশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ।

"সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন।···

"ঐরূপ প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জমজম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে-সাতটা বাজিয়া গেল।···ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেইজন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! সন্ধিক্ষণের কথা না জানিয়া সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্পবিচিত্র নহে!' প্রায় অর্ধঘন্টা পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল··· ।

"ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বলিতে লাগিলেন—'এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও! তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।'

"অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে ঠাকুর যে-স্থানে বসিয়াছিলেন, সেস্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন সমাধি হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে 'মা' 'মা' বলিয়া প্রায় একঘন্টাকাল বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।"[৭]

নবমীর দিনও অনুরূপ ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ, কথামৃতের বর্ণনায় এর পরের ঘটনা এইরূপ ঃ "শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীতে আছেন। শরীর অসুস্থ—কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। ···সুরেন্দ্রের বাটীতে দুর্গাপূজা হইয়াছিল। ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই সুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে।

সুরেন্দ্র—বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে)—তা হলেই বা। মা হৃদয়ে থাকুন।

সুরেন্দ্র 'মা' 'মা' করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন। মাস্টারের দিকে তাকাইয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিতেছেন, 'কি ভক্তি! আহা এর যা ভক্তি আছে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাল ৭টা ৭৷৷টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু-জায়গার মাঝে বইছে!—এ বাড়ি আর তোমাদের সেই বাড়ি!

সুরেন্দ্র—আমি তখন ঠাকুরদালানে 'মা' 'মা' বলে ডাকছি, দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠল, মা বললেন, 'আমি আবার আসব'।"[৮]

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত বেলুড় মঠের দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের অতীন্দ্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে আজও আমরা সংশয়কণ্টকিত জীবনে শাশ্বত সত্তা, আধ্যাত্মিক শক্তির দ্যোতনা এবং আনন্দঘন ঐশ্বর্যের সন্ধান লাভ করে কৃতার্থ হই, একথা বলা বাহুল্যমাত্র।

---

[৭] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—১ম ভাগ, ১৩৭৭, সাধকভাব, পৃঃ ১৬৭-১৬৮

[৮] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২০।১

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

পূজা

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

হৃদয়ের সরসভাব হইলেই প্রকৃত পূজা সম্ভব। কিন্তু হৃদয় তো সরস হয় না—উহা সদাই মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করিতেছে—কদাচ কখনো ওয়েসিসের মতো উহাতে সরসভাব দেখা দেয়। তাই পূজাপদ্ধতির সৃষ্টি—তাই অনুষ্ঠানের বাহুল্য সকল ধর্মসম্প্রদায়ে। যাঁহারা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিৎকার করেন, তাঁহারা হয় সর্বপ্রকার ধর্মসাধনের বিরোধী, নয় নূতন নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতির পক্ষপাতী। আর এক অবস্থায় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চিৎকার দেখা যায়। যখন মানুষ বারবার অনুষ্ঠান করিয়াও হৃদয়ের সরসভাব জাগাইতে পারিতেছে না—এমন হয়, তখন তাহার প্রাণ ক্ষণকালের জন্য যেন সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠে—তখন সে খানিকক্ষণের জন্য সব অনুষ্ঠান ছাড়িয়া উহার মূল ভাবটি ধরিবার জন্য ছুটফট করিতে থাকে—কিন্তু যখন সে কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ে ভাবোদ্দীপনে কৃতকার্য হয়, তখন আবার তাহার সেই হৃদয়গত ভাব পুরাতন বা নূতন কোন অনুষ্ঠান-বিশেষেরই আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সর্বভাবাতীত সমাধি অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে, সর্বানুষ্ঠানের অতীত হওয়া যাইতে পারে না।

আবার একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অপরের পক্ষে তাহা কৃত্রিম। একজনের ভিতরে যে ভাবের প্রকাশ হইল, যদি অপর দশজনে তাহা স্বায়ত্ত করিতে যায়, তবে তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় উহা যে অল্পবিস্তর কৃত্রিম-ভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকেই 'ভাব আরোপ করা' বলে। এই ভাবের আয়ত্তিকরণ আবার দ্বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে। উক্ত ভাবসম্পন্ন পুরুষের বাহ্য কার্যকলাপ আচার-ব্যবহারাদির অনুকরণ-চেষ্টা, অথবা চিন্তা দ্বারা ভিতরের ভাব ধারণার চেষ্টা। ইহাতে সদাই বিপদাশঙ্কা এই যে, এই জগতে—এই মায়ার রাজ্যে—তমোগুণ বা নিশ্চেষ্টতার এতই প্রাবল্য যে, যতই উচ্চভাব হউক না কেন, উহার চিরকালই নিরর্থক বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উহা নিবারণ করিবার একমাত্র উপায়—নিজ ধর্মজীবনকে সতেজ ও সরস রাখিবার অবিরাম চেষ্টা—সদাই মনে রাখিবার চেষ্টা—আমরা জড়যন্ত্রমাত্র নহি—আমরা চিন্তাশীল মানুষ। তাই বলি, শুধু অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলেও হয় না, আবার কেবল নিয়মিতভাবে জড়যন্ত্রের মতো অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও হয় না। চাই জীবন—চাই ভাব—চাই আমৃত্যু অহরহ কঠোর চেষ্টা।

যাহা হউক, আমরা আজ এই শারদীয়া পূজার দিনে পূজার তত্ত্ব একটু-আধটু আলোচনা করিতে চাই। আমাদের বাংলাদেশে যে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহাতে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক—তিন ভাবেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটস্থাপনাদির মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ বৈদিক—অন্যান্য স্থলেও নানা বৈদিক মন্ত্র সংগৃহীত হইয়া পদ্ধতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। পূজার প্রণালীটি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক—পূজা করিতে গেলেই কয়েকটি বিশিষ্ট ক্রিয়া করিতে হয়, সংক্ষিপ্ত পূজায় এই ক্রিয়াবিশেষের সংখ্যার অল্পতা ও বিস্তারিত পূজায় আধিক্য—এইমাত্র। অদ্বৈতবাদ এই তান্ত্রিক পূজা-প্রণালীর দার্শনিক ভিত্তি। আবাহন করিতে হয় হৃদয় হইতে, বিসর্জন করিতে হয় হৃদয়ে। প্রথমে মানসপূজা, তারপর বাহ্যপূজা। আবার ভূতশুদ্ধি নামক ক্রিয়ার তো মূল তাৎপর্যই অদ্বৈতভাবনা—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব মূল শক্তিসহ নিজ কারণ পরমাত্মায় বিলীন হইল—ইহাই ঐ স্থলে মূল ভাবনার কথা। সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূল কথা—শুদ্ধি। এই শুদ্ধিকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—মন্ত্রশুদ্ধি, দেবতা-শুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি। প্রত্যেক ক্রিয়ার খুঁটিনাটি তাৎপর্য না বুঝিতে পারিলেও এটুকু বেশ বোধ হয় যে, সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূলেই ভাবনা—সুতরাং সে-গুলিকে এক প্রকার যোগেরই বিভিন্ন অঙ্গ বলা যাইতে পারে। এই ভাবনার প্রধান সহায়ক মন্ত্র—অন্যান্য স্থূল দ্রব্যাদি আনুষঙ্গিক। পূজাপদ্ধতির মধ্যে যে পৌরাণিক উপাদানের কথা বলিয়াছি, উহা ভক্তি-রসাত্মক। এই অংশের মধ্যেই আগমনী, বিজয়াদির

উদ্ভব—এই অংশেই ভক্ত দেবীকে সম্বোধিয়া বলে—. 'সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।' ভক্ত চিরকালই ভগবানকে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী প্রভৃতি সাংসারিক সম্বন্ধের কোন একটিতে বাঁধিতে চায়—সে তত্ত্বের ধার ধারিতে বড় চাহে না—হৃদয়—হৃদয়কেই সে বড় করিয়া দেখে। সংসারে সে যেসকল সম্বন্ধে পরম সুখ বোধ করে, ঈশ্বর বাস্তবিক আমাদের সহিত সেই সম্বন্ধে সম্বন্ধ—ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই ভক্ত শারদীয়া পূজার আগমনের সূচনায়ই মায়ের আগমনী গাহিতে ও শুনিতে বড় ভালবাসে। সে সেই জগজ্জননীকে কখনো মাতৃভাবে, আবার কখনো কন্যাভাবে ভাবিয়া সুখ পায় আর যদি কেহ রামপ্রসাদ বা শৈলেশ্বরের মতো অকপট ভক্ত হয়, তবে সত্যসত্যই মা আসিয়া তাহার বেড়া বাঁধিয়া দেন বা বলেন ঃ

'বাপ নন্দীরে গিরিমন্দিরে যেতে
আমার আর নাই বাসনা।
আর এক পিতামাতা আছে কাঁদিবে তারা দুজনা।
তারা তারা বলে তারা, হয়ে আছে দিশেহারা।
এখন যদি যায় না তারা, তারা-নাম
আর কেউ লবে না।'

তাই বলি হে ভক্তসাধক, আর কিছু না পার, তাঁহাকে একবার এই শুভ মুহূর্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার চেষ্টা কর। বল—মা, আমি শাস্ত্র জানিনে, জপ, তপ জানিনে, ভজন-পূজন জানিনে—আমি পুণ্য পাপ চাইনে, শুচি অশুচি চাইনে, জ্ঞান অজ্ঞান চাইনে—দে মা, তোর চরণে শুদ্ধা ভক্তি। কোথায় পাব মা প্রতিমা, কোথায় পাব উপকরণ দ্রব্যবাহুল্য, তুই মা নিজগুণে হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হয়ে হৃদয়ান্ধকার দূর করে দে।

যাহা হউক, পূজার কথা বলিতেছিলাম। শাস্ত্রে বলে ঃ

'অর্চকস্য তপোযোগাৎ দ্রব্যস্য চাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি ॥'

বৈধী পূজায় তিনটি ব্যাপারের একান্ত আবশ্যকতা। অর্চক—যিনি পূজা করিবেন—তাঁহার তপস্বী হওয়া প্রয়োজন। যিনি নিজ ইন্দ্রিয়মনাদি সংযত করিতে না পারিয়াছেন—তিনি হৃদয়-দেবতাকে জাগাইবেন কি করিয়া—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।' যাঁহার ভাবনার অভ্যাস হয় নাই, তিনি শুধু উপর উপর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জানিলে বা মন্ত্র মুখস্থ করিলে বা উহার অর্থ বুঝিলেই, যথার্থ পূজকপদবাচ্য হইতে পারেন না। এই পূজকবৃত্তি যেন ব্যবসাদারি হইয়া না দাঁড়ায়—যতই ব্যবসাদারি দাঁড়াইবে, ততই আর মূলভাবের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না। বুঝিতে হইবে, পূজায় সকলের অধিকার। শুধু ব্রাহ্মণ নহেন, স্ত্রী, শূদ্র সকলেরই অধিকার—যদি তাহার তপোযোগ থাকে। তপস্যা চাই, মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ চাই—তবেই সে পূজার যথার্থ অধিকারী। পৌরোহিত্যব্যবসায়িগণ যদি নিভৃতে বসিয়া, পূজাকালীন নিজের কি গুরুতর দায়িত্ব, একবার ভাবিয়া দেখেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা উহাতে অধিকারী হইবার জন্য আরও সচেষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। যথার্থ অর্চকই প্রতিমার যথার্থ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন—নতুবা কতকগুলি মন্ত্র আওড়ানোই সার হয়।

তারপর প্রতিমাখানি সুদৃশ্য হওয়া চাই। প্রতিমাখানি এমন হওয়া চাই,—যেন দেখিলেই সেই জগজ্জননীর স্মৃতি আপনিই স্মরণপথে উদিত হয়। সুতরাং যে সে কুম্ভকার-নির্মিত হইলেই প্রতিমা হয় না। প্রতিমা-নির্মাতা যদি সাধক হয়, তবেই প্রতিমাখানি যথার্থ পূজার উপযোগী হইবে। এখনো এমন এক একজন সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি স্বয়ং প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। প্রতিমা সাধক-হৃদয়ের ভাবময়ী প্রতিমারই বহিঃপ্রকাশমাত্র। সুতরাং সাধক ব্যতীত ঠিকঠিক ভাবপ্রকাশক প্রতিমা কে গঠন করিতে পারে? অবশ্য ইহাতে সাধকের কুম্ভকারবৎ শক্তি থাকারও প্রয়োজন এবং সর্বস্থলে সকল সাধকের তাহা থাকা সম্ভব নহে, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিমা গঠনে সমর্থ না হইলেও অন্ততঃ তাহার কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন ও তাহাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করিতে পারেন। নতুবা ফাঁকি দিয়া সব কাজ সারিতে গেলে, আসল কাজের সময় নিজেকেও ফাঁকে পড়িতে হয়।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্যবাহুল্য। অবশ্য এই সকল বাহ্য পূজা প্রধানতঃ রাজসিক গৃহস্থ ব্যক্তিরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া এই দ্রব্যবাহুল্যের কথা বলা হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি পূজার আয়োজনে কখনো যেন বিত্তশাঠ্য না করেন। দেবানিবেদিত দ্রব্যে সর্বসাধারণের—বিশেষতঃ

যথার্থ অভাবগ্রস্ত সকলেরই অধিকার ; সুতরাং দ্রব্য-বাহুল্যে যে অধিক সংখ্যক দরিদ্ররূপী নারায়ণের তৃপ্তি, ইহা নিঃসন্দেহ। তবে আজকালকার মতো পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে বণ্টনের জন্য দ্রব্যবাহুল্যে বিশেষ কোন ফল দেখা যায় না। ইহার আর একটা দিক আছে ;—দ্রব্যবাহুল্যের সহিত একটা মহান ভাবের—প্রকাণ্ড ভাবের যোগ আছে বিশেষতঃ, যদি ঐ দ্রব্যাদি সজ্জায় কিঞ্চিৎ শিল্পের পরিচয় থাকে। এইরূপ শিল্প যে ভক্তিভাব-বৃদ্ধির সহায়ক, তাহা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে পূজায় বলিদান সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। সমগ্র শাস্ত্রের যথার্থ মর্মানুশীলনে বুঝা যায়—এই বলিদান বা জীবহিংসা পূজার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ নহে। 'কামক্রোধৌ বলিং দদ্যাৎ'—ইহাই যথার্থ সাত্ত্বিক বলি। তবে একথাও বলা আবশ্যক, যাঁহারা অন্য সময়ে মাংসাদি ভোজনে অবিরত, অথবা অন্য প্রকারে সদা-হিংসাপরায়ণ, তাঁহাদের দেবোদ্দেশে বলিদানের বিরুদ্ধাচরণ হাস্যজনক ব্যাপার। একবার এইরূপ জনৈককে বলিদানের বিরুদ্ধে বলিতে শুনিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই।

পূর্বে দরিদ্রনারায়ণ পূজার কথার সামান্য উল্লেখ করিয়াছি। ইহাই বর্তমান কালের উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। ভগবান কপিল তদীয় মাতা দেবহূতিকে উপদেশ দিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অপর প্রাণীতে দ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মতো—তাহাতে বিশেষ ফল হয় না। তুমি জীবন্ত নরনারীকে ভগবানের প্রতিমা বলিয়া ভাবিয়া তাহাদের সেবা করিতে পার না, তুমি আবার মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ীকে আবাহন করিবে কিরূপে ? ভালবাসাই পূজার মূল—সবাই সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি। শুধু কাঙালী বিদায় বা 'কাঙালী ভোজন' নহে, প্রকৃত 'দরিদ্রনারায়ণ'-সেবা। এখানেও ভাবই মুখ্য—বাহিরের অনুষ্ঠান যে-রূপই হউক, কিছু আসিয়া যায় না, অথবা সংখ্যাতেও কিছু আসে যায় না—মূল কথা হইতেছে ভাব—সেই ভাবটি হৃদয়ে আনয়নের চেষ্টাই আসল কথা। নতুবা লক্ষ কাঙালী বিদায় করিয়া বা স্তূপাকার চন্দন, বিল্বদল, ফলমূল নৈবেদ্য ভোগরাগাদি দিয়াও তোমার পূজা সিদ্ধ হইবে না। অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য—বেদান্ত বলেন, ক্রিয়া দুই প্রকারে হইতে পারে—অজ্ঞানপূর্বক ও জ্ঞানপূর্বক। অজ্ঞানপূর্বক কর্মানুষ্ঠানেও ফল হয়—তবে জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানে উহা পরিবর্তিত হয়। তাই বলি, ভাই, এস, আমরা প্রথম এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এতাবৎকাল যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা একেবারে বৃথা নহে ; আমরা তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথানুসরণ করি, কিন্তু আরও উত্তমরূপে, আরও শ্রদ্ধার সহিত, আরও অনুরাগের সহিত যেন আমরা পূজাদির অনুষ্ঠানে অগ্রসর হই ; আর প্রতিমুহূর্তে যেন পূজার চরম উদ্দেশ্য আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে যে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে সমগ্র বিশ্বের সহিত আপনাকে এক করিয়া ফেলিতে হইবে সমগ্র বিশ্বের সহিত, বিশ্বেশ্বরের সহিত, তাদাত্ম্যলাভ করিতে হইবে।

দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন আমরা যে পরস্পরকে, এমনকি, শত্রুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকি, উহা যেন কেবল বাহিরের একটা লৌকিক ব্যাপারেই শেষ না হয়; উহা যেন হৃদয়ের প্রত্যক্ষানুভূতিজনিত প্রেম-সম্ভূত হয়। যেন হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারে— ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি

ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

যেন দেবীকে সর্বত্র সাক্ষাৎকার করিয়া বলিতে পারে—সর্বস্বরূপে। সর্বেশে। সর্বশক্তিসমন্বিতে! যেন বৈদিক ঋষির সুরে সুর মিশাইয়া গাহিতে পারে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ॥

যেন সর্বশেষ শান্তিজল গ্রহণের সময় হৃদয়ে যথার্থই শান্তির আবির্ভাব হয়।*

উদ্বোধন, ১৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২০, পৃঃ ৬৪১

মায়ের সোনার বরণ দেখি

শেখ সদরউদ্দীন

মায়ের সোনার বরণ দেখি
সোনা রোদে ঝরছে, ভাই।
শস্যময়ী মা-শ্যামলী, তুলনা তার নাইরে নাই ॥
নয়ন মেলে দেখি মায়ের কী যে রূপের মহিমা—
বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়ী আমার মা!
আলোয় ভরা চাঁদনীরাতে
মায়ের হাসি দেখতে পাই।
মায়ের সোনার বরণ দেখি
সোনা রোদে ঝরছে, ভাই ॥
মায়ের গানে মুখর সদাই গুলবাগিচার বুলবুলি—
মায়ের গায়ের সুবাস মেখে
ফুটছে গাছে ফুলগুলি!
মায়ের অশেষ আশিস-ধারায়
তরতরিয়ে নদী বয়—
ঝরনা নেচে কলকলিয়ে মায়ের গানের কথা কয়।
সবার সাথে সুর মিলিয়ে জগন্মাতার গাথা গাই।
মায়ের সোনার বরণ দেখি
সোনা রোদে ঝরছে, ভাই ॥

সাঁকো

জয়নাল আবেদীন

আমার যা আছে তার সবটাই
তোমাকে দিয়েছি মুঠোভরে
এবার ভাসিয়ে মোর ভেলা
ছুটেছি যে, উজানে বেঘোরে।

ফিরব না আমি আর যতই
আমাকে তুমি ডাকো
উজানে পেরিয়ে যাব সব
বেঁধেছি তোমার সাথে সাঁকো।

তোমার ছায়া খেলে আমার ভেতর
তুমিই আমার পরিচয়
আসুক না যত বাধা সম্মুখে আমার
নেই পেরোবার ভয়।

জাগরণ

প্রবীর মিত্র

হঠাৎ চমকে জাগি
আপন সত্তারে হেরি
আপনারই মাঝে।
বিস্ময়ে আনন্দে বাজে প্রাণ
সুষুপ্তির আঁধার প্রান্তে
আলোকের দুরন্ত আহ্বান।
পলকে ভাসিয়া যায় শুভ্র মেঘরাজি
অনন্তেরে নীলিমায় ঘিরি
কে সাজালো বসন্তের সাজি?
তোমার সৃষ্টিরে ঘিরি
শুনিয়াছি অরূপের ভাষা
শ্রবণের মাঝে মাঝে
জাগিয়াছে বারে বারে গ্লানির কুয়াশা।
তাই বুঝি প্রশ্ন জাগে মনে
তোমার প্রহর জেগে
তব দেওয়া দুঃখে কেন কাঁদি?
তোমার ভাণ্ডার ভরা
অনন্ত সম্ভারের ডালি
কার তরে বহ তুমি
কেমনে করিবে এরে খালি?
দুঃখে কাঁদি, আঘাতের ব্যথা
বেদনারে সম্মুখে আনে টানি।
অশ্রুতে আপ্লুত আঁখি
সংঘাতে রক্তাক্ত অন্তর
ক্ষণিক হারায়ে খোঁজে
অনন্ত প্রেমের নির্ঝর।
অসীমের আসনে বসি
তব প্রেম হাসি
সকল রিক্ততা ভরি বাজাইল বাঁশি।
পথে যেতে হলো মোর দেরি
তব রূপে মম রূপ হেরি।
অমৃতের পাত্র হাতে
সত্যের প্রদীপখানি জ্বালি
দাঁড়াইলে যবে বাতায়নে
মর্ত্যের শূন্যতা মম
পূর্ণ হলো স্বর্গের আহ্বানে।

আমি শুধু চেয়েছিলেম

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

আমি শুধু চেয়েছিলেম
কৃপার একটি বিন্দু।
তুমি দিলে উজাড় করে
হে করুণাসিন্ধু।
তোমার যত কৃপা ছিল
যত ছিল বিত্ত।
বিন্দু চেয়ে সিন্ধু পেলাম
পূর্ণ হলো চিত্ত।

কত কৃপা আছে তোমার
তারই হিসেব করতে
নুনের পুতুল আমি কি যাই
সমুদ্রকে মাপতে ?

আমবাগানে আম কত, আর
কয়টি আছে পাতা ?
হিসেব কষতে ফুরিয়ে যায়
জীবনখাতার পাতা।

চেয়েছিলেম তোমার কাছে
বিশ্বাস এবং ভক্তি।
বলেছিলেম, 'তোমাকে চাই,
চাইনে আমি মুক্তি।'

তুমি বললে, 'ওরে পোদো!
নেই কেন তোর নিষ্ঠা ?
হৃদ্‌কমলে মার্জনা নেই!
চামচিকেরই বিষ্ঠা!'

মূর্খ আমি। বাচাল আমি।
কাঁচা আমি, অন্ধ।
দুয়ারে তুমি দাঁড়ায়ে—তবু
আমার দুয়ার বন্ধ।

কেমন করে খুলব দুয়ার ?
নেই যে আমার শক্তি।
হে দয়াময়, দাও গো আমায়
নিষ্ঠা এবং ভক্তি।
সার্জেনসাব, কৃপা করে
তোমার হাতের দীপটি
ফেরাও তুমি নিজের দিকে
দেখি তোমার মুখটি।

বালকস্বভাব। বললে তুমি,
'এই নিয়ে যা কৃপা!'
হৃদ্‌কমলে বাড়িয়ে দিলে
তোমার কোমল দু-পা!

কর মাগো লয়

মণিময় গুপ্ত

তমসাবিজয়ী তুমি জ্যোতির্ময়ী
এসো গো প্রাণের দুয়ারে।
আলোকজোয়ারে উছলিয়া দাও
সাগর কিনারে কিনারে।
হৃদি বেদীমূল উজলিয়া দাও
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া
শিবসুন্দরী সুরে মরমের
বীণাখানি দাও বাঁধিয়া॥

মৃত্যু হইতে অমৃতের পথে
অন্ধতা হতে আলোকে।
লয়ে চল তুমি জগৎবাসীরে
মঙ্গললোক দ্যুলোকে॥
চিত্তের যত অসৎ কালিমা
নাশগো তামসনাশিনী।
জরা-ব্যাধি-ভয় কর মাগো লয়
চিদ্‌শতদলবাসিনী॥

অশেষ পুরুষ

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ রস গন্ধ বর্ণের অকূল মোহানা থেকে
উঠে এল আলোক সামান্য এক অমেয় পুরুষ।
বৈরাগ্যের সুপ্রাচীন ধারায় অবগাহনের শেষে,
চেতনার সৌম্য অবয়বে, পৌঁছে গেল সে
মোহানা ছাড়িয়ে দূরে সমুদ্র সংসারে।

চৈতন্যের হিমগিরি থেকে উৎসারিত হলো
আবার মানুষ হবার উদাত্ত আহ্বান।
সেই অনন্ত ঘোষণা দূরাগত প্রতিধ্বনির মতো
মন্দ্রিত হলো গিরিপর্বতে. সমুদ্রকল্লোলে.
মর্মরিত বনভূমে. মানুষের হৃদয়কন্দরে।
আমরা আকুল প্রার্থনা জানালাম সেই
অশেষ পুরুষকে,
'আমাদের উত্তীর্ণ করো চৈতন্যের আলোয়।'

নীল আকাশ

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরের আকাশ নীল
ঈর্ষাকাতর মেঘ তাই খেয়ে বাঁচে.
নীল, নীল তবু নীল, বেঁচে আছে,
যেমন আমরা বাঁচি নীল আশ্রয়ে।
নীলমণি বেঁধে রাখি মনে
নীলকণ্ঠ পাখি রাতদিন
নীলপরী সখীসব নূপুর বাজায়।

এমন নীল সাগরেও দীর্ঘ ফণা ফোঁসে
ফেনার উচ্ছ্বাস থাকে. চোরা-বালি, নুন
পোকারা পাপড়ি কাটে
যুক্তি আঁটে ঘুণপোকা
লোফালুফি খেলা খেলে মানুষের মন।

এসব চাই না, তবু এই সব আছে ;
এই মেঘ জল দেবে
পরাগের সুতো বেঁধে দেবে যত কীট
সমুদ্র জীবন দেবে চির নীলাকাশ।

বিবেকানন্দ

দেবী রায়

জন্মাবধি শুনে আসছি প্রেম ভালবাসা
শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য-র পথে
যুগযুগ ধরে মানুষের এই চিরন্তন আসা-যাওয়া
নিছক শূন্য, অর্থ শূন্য, শূন্যের পিছনে শূন্য
—হে মূঢ়-জীবন, কিছু কি দাঁড়ায় ?
শেখানো তোতাপাখির-গলায়
নকল ত্রিশিরা কাঁচ, তত্ত্ব, বাহারি-বুলি
যার বোঝা বইতে হয় তাকে-ই—
এক পাহাড়-ব্যথা !
শিখিয়েছো তুমি-ই। উগ্রপন্থীরা উন্মাদ
মাথায় রক্ত-ওঠা ভয়ংকর রকমের উন্মাদ,
ধর্মান্ধ. ওরা কার পতাকা ওড়ায় ?
—মানুষের কোন কল্যাণে আসে,
সর্বনাশা এই ফাঁদ ?
না কাউকে চরম আঘাত, না কোন অন্যায়
বিভেদের মাঝে ঐক্য, স্বীকৃতি-ই একমাত্র ধর্ম—
এ তোমারই বাণী।
মানো এই বৈচিত্র্য, মেনে নাও ভিন্নতা
আমার রুক্ষ এ জীবনে-মরণে
সর্বত্যাগী তুমি-ই সেই বিবেক, ধ্রুবতারা
যার অন্য নাম, আরেক পরম অর্থে—
বলা যায়, ধর্ম !

রাজার রাজা

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

এখন আমি অন্য রকম আছি
খুব সাধারণ ছন্দ ধরে বাঁচি,
পথের বাধা, বিষয়-বিষের কাঁটা—
উপড়ে ফেলে হাল্‌কা করি গা-টা
হাল্‌কা করি, হাল্‌কা করে বাড়ি
পথ চিনে কি ধ্যানে বসতে পারি ?
পারি বলেই—শক্তি, সাহস ধরে
ক্ষুৎ-পিপাসা দিয়েছি ত্যাগ করে
জীবন ভরে তাঁকেই শুধু চিনি
সবার উপর রাজার রাজা যিনি॥

নমো হে নির্জনতা

সোফিওর রহমান

রঙীন বাড়ির সব কোলাহল রেখে
এসেছি পেছনে
এখানে সবুজ অন্ধকার,
চিরসবুজ নির্জনতা—
আমার তুঁত স্বাধীনতার নাভি থেকে জেগে ওঠে
তিক্তফল, অহিংস ময়ূর, শব্দের সাতরঙ

নির্জনতা ধাত্রীর প্রজ্ঞায় সরোদে হাত দিলে
রঙীন বাড়ির সব কোলাহল পুড়ে,
বিসর্জনের উৎসব
যে বসত ছেড়ে এসেছি, আমি নিশ্চিত
তার কাছে ফিরব না কোনদিন। কোনদিনও।

রামকৃষ্ণকে খুঁজতে গিয়ে

ব্রহ্মচারী সৈকতেশ

রামকৃষ্ণকে খুঁজতে গিয়ে সূর্য হয়ে ওঠেনি
এমন মানুষ চোখে পড়ে না,
এমন নুনের পুতুল পাওয়া যাবে না
যা সমুদ্রে পড়ে সমুদ্র হয়ে যায় না।
প্রদীপের তলা থেকে মাথা সরে গেলে
ছায়া প্রলম্বিত হয়
ছায়া স্নিগ্ধ করে, দৃষ্টির স্বচ্ছতা কমায়
অথচ
অন্ধকারে কার প্রত্যয়ী হাত
কণ্টকিত ক্যাকটাসে শপথ জাগায়।
রক্তের বাইরে সাঁতার দিলে
উজান কাছে আসে
অথচ
হৃৎপিণ্ডে গেঁথে থাকা একখণ্ড কাচ
ক্রমাগত যন্ত্রণা ঝরায়...
রামকৃষ্ণকে খুঁজতে গিয়ে যন্ত্রণায় নীল হয়ে
ওঠেনি এমন মানুষ চোখে পড়ে না,
এমন মানুষ পাওয়া যাবে না
যে মানুষকে ভালবেসে রামকৃষ্ণময় হয়ে যায়নি।

কয়েক টুকরো

ব্রত চক্রবর্তী

ইঁট চাপা হলুদ ঘাস তো প্রত্যেকেই।
কেউ কম, কেউ একটু বেশি।

আখড়া ভেঙে গেলে বৈষ্ণবীর কথাও বৈষ্ণব শুনতে
চায় না। সুতরাং ততক্ষণ কথাবার্তা,
যতক্ষণ না আখড়া ভেঙে
মাটিতে মাটি ধুলোয় ধুলো হয়ে পড়ছে।

কে তেল জোগাড় করেছে, কে সলতে পাকিয়েছে,
কে পিলসুজটাকে ঘষে-মেজে ঝকঝকে করেছে,
এসব নিয়ে মাথা
ঘামিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।
প্রদীপ জ্বলছে এটাই সবচেয়ে
দামি ও দরকারি কথা।

চড়ুই পাখি থেকে একজন মানুষ, অন্য কিছু
বুঝুক-না-বুঝুক, ভালবাসা বোঝে।

বেদনা ও প্রার্থনা

পলাশ মিত্র

আমার পরিক্রমা শুধু সংক্ষিপ্ত বৃত্তেঃ
পরিধিও প্রসারিত নয়।
সুতরাং প্রত্যাশিত দ্বিধা সংঘাত এবং সংশয়
নিয়ে এই যন্ত্রণাকাতর মন
হয়েছে বিব্রত
অন্ধ তমিস্র রাতেঃ
আমি তো প্রার্থনা করেছি সতত
আলো আনো দীপ্ত আলো
ছিন্ন করো এই আচ্ছাদন
অমৃতের বার্তা এনে

বিষাদের পতন রোধ কর
এস, এস হে জ্যোতির্ময়
আমার এই দেহখানি
কল্যাণে-নিবেদনে তুলে ধর।

সর্ব সমর্পণ

শান্তশীল দাশ

তোমার যা-কিছু আছে, সব দিতে হবে
নিস্পৃহ অন্তরে ; চাইবে না কিছু তুমি,
শুধু দিয়ে যাবে যা-কিছু তোমার আছে
সর্বস্ব তোমার—চাই সর্ব সমর্পণ।
তবে তুমি কৃপা পাবে অজস্র ধারায়,
নেমে আসবে সেই কৃপা ঊর্ধ্বলোক হতে—
পূর্ণতার অমেয় সম্পদ।
আলোকে-আলোকে
উদ্‌ভাসিত হবে চারিধার—
সব-পাওয়া শেষ সেইখানে।

দাও তুমি, সব দিয়ে দাও।
এ বিশ্বাস থাকে যদি অন্তরে তোমার ;
নামবেই সে-কৃপা আলোক,
যখন তোমার সেই সর্ব সমর্পণ—
পূর্ণ হবে—সেই ক্ষণে, সেই মহাক্ষণে
নামবেই সে-দিব্য আলোক
পরিতৃপ্ত প্রসন্ন আধারে।

শুধু খুঁজে ফেরা

নিভা দে

সারাটা জীবন জুড়ে অন্ধকার ছিঁড়ে
শুধু খুঁজে ফেরা উজ্জ্বল মুহূর্তের সন্ধিক্ষণ—
উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি—জীবনের নকশি কাঁথায়
যেন হীরের চুমকিজ্বলা তারা সব—
অমাবস্যা ঘেরা রাতে—দপদপ জ্বলে ওরা
জীবনের পাড়খানি আলোময় আনন্দে ভরে—
এইটুকু পেতে চাই—খুব একান্ত আপন করে—
ছুটে চলি তাই জীবনের বাঁকে বাঁকে—
চূড়া উপত্যকা ছুঁয়ে আরো কোন দূরের দিকে—
কেউ কেউ পেয়ে যায় অযাচিত বৃষ্টিবেগে
অজস্র মুক্তামুহূর্ত—
কেউ কেউ চেয়ে থাকে অন্তহীন দিগন্তের দিকে—
অনিমেষ চোখে
কখন কালো মেঘ ফেটে আসবে নেমে
অলৌকিক দীপ্ত সেই
উজ্জ্বল আলোর মুহূর্ত উৎসব।

এক টুকরো আলোর সামনে

কঙ্কাবতী মিত্র

কোন এক অন্ধকারে কালো আকাশের নিচে
মনে হলো চারিদিকে বিষাক্ত সাপের ছড়াছড়ি।
ভয়ার্ত বুকে, যন্ত্রণার দাপাদাপি দেহের তন্ত্রীতে
সমস্ত আক্রোশ যেন তাই উদ্দাম বেগে
আমার দিকে ধাবমান ক্ষিপ্র গতিতে।
প্রবঞ্চনার বেড়াজালের বাইরে থাকার
চেষ্টা তো তাই বৃথা।
আমি কান পাতি মাসের বুকে—
শব্দ শুনি জলের
হঠাৎ যেন তোমার মুখের প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে
কী আশ্চর্য শান্তির সুর শুনতে পাই
কোণেতে ছড়ানো বেদনারা তাই নিঃশব্দে সব
হার মেনে চলে যায়
চারিদিকের অন্ধকার ঠেলে এক টুকরো
আলোর সামনে
যেন দেখতে পাই
তোমার দেওয়া পথের নিশানা দাঁড়িয়ে আছে
আমার সামনে।

পরশমণি

রতনকুমার নাথ

হে ঈশ্বর!
এক রাশ করুণার সাথে
তুমি আমায় একটা
পরশমণি দিয়েছিলে—

যার সর্বাঙ্গে প্রশান্তির দ্যুতি,
যার গভীরে বিশ্বাসের আলো,
যার অবয়বে একবুক ভালবাসা,

হে ঈশ্বর!
পৃথিবীর স্বার্থপর বাজারে
আলু-পটল-চাল-ডালের
সওদা করতে করতে
কখন হারিয়ে ফেলেছি
সেই অমূল্য পরশমণি,
নিজেই তা জানি না।

প্রত্যয়

সংযুক্তা মিত্র

তোমারে পাইনি বলে
কেন এ ক্রন্দনধ্বনি কেন হাহাকার ?
আলোকে বাতাসে তুমি
শতরূপে রয়েছ জড়ায়ে—
প্রাণে প্রাণে তোমার মধুর স্পর্শ
আসেনি কি কতরঙে বারবার
জীবনে আমার ?
নতুন ঊষার আলো অস্ফুট শৈশবে
আধো ভাষে আধো বেদনায়—
মাতৃস্নেহরূপে তুমি দিয়েছ পূর্ণতা
ঘুচায়ে কত না দীনতা মোর, কত সফলতা।
রঙীন যৌবনে তুমি কুসুম-সুবাসে
জড়ায়েছ বারেবারে কত না প্রণয়ে
রামধনু এঁকেছ মোর মাধবী মায়ায়
কত চাঁদজ্বলা রাতে আর
পাখিডাকা সোনালি সকালে
তুমিই কি দাওনি ভরে মোর চেতনায় ?
তবে পথপ্রান্তে এসে কেন এ সংশয় ?
ধরা দাও প্রভু মোর হৃদয় আসনে
আমার অতৃপ্তি যত যত অপূর্ণতা
ধূপের মতন জ্বলে ঝরে যাক তব পদতলে
কামনার ফুলদলে গাঁথা হোক তব জয়মালা
রিক্ত চিত্ত ঝঙ্কারিত হোক নিত্য
তোমারে পাওয়ার স্তবে তোমার বন্দনে॥

আর আমি মিশে যাই

শান্তিকুমার ঘোষ

পাথরের সিঁড়ি—
একটার পর একটা,
গেছে উঠে ব্রহ্মার মন্দিরে।
উপরে টানে নহবতের বাঁশি ;
উপচে ওঠে আমার ভিতরে
ভালবাসা আর প্রণতি।
না হয় জিরিয়ে নিই এখানে তরুমূলে.
চোখ ভরে দিক মুগ্ধ সরোবর ;
যতক্ষণ না স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করে
আরতির ঘোর ঘণ্টাধ্বনি।
আর আমি মিশে যাই
ছন্দে-তালে নৃত্যরত ভক্তের ভিড়ে।

মানসিক

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

সমতলে আর সমানে সমানে
আমার চলায় স্বাভাবিক গতি।
আমার স্বভাব সেখানে স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ,
আমি চলতে পারি অবিশ্রাম,
বিশ্রাম নিতে পারি ইচ্ছে হলেই।
বেপরোয়া নয় একেবারে ঘরোয়া
সমতলে আর সমানে সমানে।
সে কি সংবরণ ?
যখন নিচে নামি, নিচুর কাছে যাই
তখন আমার বুক থাকে প্রসারিত,
চলার-ভারসাম্যে মাথা পিছনে হেলানো।
তর্ তর্ করে যত খুশি নেমে যেতে পারি
নিডর অহঙ্কারে। ততই যেন গতি বাড়ে
যত নামি উপেক্ষায়, আত্মগর্বে
যখন নিচে নামি, নিচুর কাছে যাই।
সে কি সন্তর্পণ ?
উপরে—উঁচু পাহাড়ে, প্রাজ্ঞতার কাছে
আমি পরাজিত, আমার বুক কাঁপে।
কেন জানি না, যতই উচ্চতায় এগোতে থাকি
আমি সামনে ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ি।
প্রশান্ত নির্বাক, মাথা তুলতে কষ্ট, গতি স্থির—
ক্রমশঃ শৈশবের হামাগুড়ি, অবশেষে প্রণতঃ
উপরে—উঁচু পাহাড়ে, প্রাজ্ঞতার কাছে।
সে কি সমর্পণ ?

দ্বিতীয় প্রমিথিউস

অচিন্ত্য বিশ্বাস

স্বপ্নেরা শায়িত থাক মৃত্যুর কফিনে,
এইবার চলে যেতে হবে।
শৈশব থেকে বার্ধক্য—জীবন তো কিছু নয়—
জীবন এক কল্পিত নদী।
স্থিরতার প্রাচীরে তাই তাকে বাঁধিনি কখনো ;
কিন্তু লালিত স্বপ্নেরা কেন অভিমন্যু হয় ?
মৃত্যুর তামসনীলে সে কেন হারায় মিছে মিছে ?
কিছুই হয় না জানা। পৌষালী হিমের মতো
নিহিত সত্তায় নামে শতকিয়া বিপন্নতা,
নিষিদ্ধ আলোর দিকে চোখ রেখে
আমি হেঁটে যাই
শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের কারাগারের দিকে।

পাদদেশে অপেক্ষায়

অনিলেন্দু ভট্টাচার্য

তোমার প্রতীক্ষায়
কতদিন কেটে গেছে এখানে
ধুলো-মাটির পবিত্রময় উদ্যানে
দিন-রাত্রির দেওয়া-নেওয়ার কোলাহলে।

চেয়ে চেয়ে দেখলাম
সকাল বিকেল দুপুরের তরঙ্গ-মধুর রূপ
নিশাপূর্ণ রাত্রির তপস্যা-স্তব্ধ মৌনতা।
অধরা অরূপের অন্তরালে জ্যোতির্ময় বর্ণসুষমা
অদৃশ্য সত্তার তৎপরতা রঙে ও রেখায়
ছবি আঁকে ;
গাছ-গাছালির চারু-চিক্কন সবুজে মসৃণতায়
নিবিড় হয়ে মিশে থাকে।
বুলবুলি ময়না দোয়েল পাপিয়ার
উদ্দাম ডানার চপলতা শান্ত হয় ;
নিদাঘ দুপুরের নিঃশব্দ ছায়ায়
উদাস চোখে গল্প শোনে নিমগ্ন হয়ে।

লাবণ্যের বিশাল প্রবাহে তুমি এত নিপুণ
ভীষণ প্রলয়কালেও শিল্পীর মতো
সংকল্প স্বরূপ!
বুকের মধ্যে জয়-পরাজয়ের শঙ্কা জাগিয়ে
অভিজ্ঞতা দাও আমায়।
জীবনের মুখে বিহ্বল করা মৃত্যুকে পেতে রেখে
হাসি ও কান্নার সহজাত অভ্যাসে
প্রাণ-মুখর হবার উদ্দীপনা
সঞ্চার করো আত্মপ্রত্যয়ে।

পাহাড়-বনানী নির্ঝরিণীর
অনিঃশেষ সম্পদ সামগ্রীতে
সাগর-মরুভূর পরিমাপহীন পরিধির মধ্যে
জীবন ধারণের দিনগুলো স্বপ্নের মতো
চঞ্চলতায় চলতে থাকে নেশায়।
কোন কিছুর চিরকালীন স্বত্বাধিকারী নই আমি
এ সকল অনিত্যের মধ্যে একাকী
মন বোঝে তোমার অস্তিত্ব।

দুয়ার খুলে অধীর আকুলতায়
অপেক্ষা করেছি তোমার জন্যে।
রক্ত-ধমনীর প্রতি স্পন্দনে
তোমার অনুপস্থিতি ছিল বেদনায় পূর্ণ
নিত্যক্ষণের বিরহে বিশৃঙ্খল।

অন্বেষিত শান্তির পাদদেশে তাই
আমিই তোমার কাছে এগিয়ে যেতে থাকি।

যেটুকু জীবন

সন্তোষকুমার অধিকারী

যেটুকু জীবন, স্পর্শ ততটুকু অনন্ত জ্যোতির।
মৃত্যুর সাগরে ঢেউ অগণিত,
হৃদয়ে স্পন্দন বাজে কালপ্রবাহের,
আঁধারবলয়ে দীপ্ত, জ্যোতির্ময় আলোকের শিখা
ধ্বংস নয়, প্রলয়প্রবাহে
জীবন অমৃত হয়ে জেগে থাকে আদিঅন্তহীন।

মৃত্যুকে করি না ভয়, আমি উজ্জীবিত।
দেহে কাঁপে আকাঙ্ক্ষার শিরা,
চোখে স্বপ্ন আকাশ জয়ের,
প্রেম দীপ্ত শিখা হয়ে জ্বলে অনির্বাণ,
গেঁথে যায় চলার ভৈরব রাগে
সঙ্গীতের মালা।
রক্তে রক্তে ব্যাকুলস্পন্দন জীবনের—
যতটুকু বেঁচে আছি, স্বাদ পেতে চাই ততটুকু
অনন্ত জ্যোতির।

যাওয়া নেই আসা নেই

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

'যাই'—এই শব্দটি তুমি যত নিঃশব্দেই বলো, নৈঃশব্দ্য
থাকে না। সংসার নিমগ্ন থাকে, পাখি ওড়ে, কখনো মেঘ,
কখনো নির্মেঘ আকাশ, অথচ তুমি এই
উদাসীন কর্মকাণ্ডের মধ্যে খণ্ডিত একটি উদাসীন শব্দ—
'যাই', উচ্চারণ করো।
পা টিপে টিপে হাঁটো যেন কেউ তোমার যাবার শব্দ না পায়
দরজার খিল খোলো যেন তাতেও রক্তমাংসের মমতা
তোমার অস্তিত্ব
যা এসংসারে দাগ রেখেছে গাঢ়
তাকেও জানাতে চাও না—
তুমি যাচ্ছ!
যাবার সময় প্রণাম করার নিয়ম, কাকে প্রণাম করবে—
মাটিকে? মাটিতো তোমাকে যেতে বলেনি অথচ;
তাহলে তুমি যাচ্ছও না আসছও না
নীল পাহাড়ে শীত এবং গ্রীষ্মে একই ফুল ফোটে।

সব পেয়ে গেছি

নিমাই মুখোপাধ্যায়

একবার সারারাত জলের ধারে বসেছিলাম
পদ্ম ফোটা দেখব বলে।
ভোর হয়ে এল, দেখলাম সব পদ্ম ফুটে গেছে
পদ্ম ফোটা আর দেখা হলো না।

একবার সারাদিন জলের ধারে বসেছিলাম
জল বাষ্প হওয়া দেখব বলে।
সারাদিন বসে বসে দেখা গেল না
বিকেলে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল।

একদিন বাতাসকে ধরব বলে বেরোলাম
বাতাস ধরা আর হলো না
উড়ে পালিয়ে গেল।
আমিই বা সব ধরতে চাই কেন?

একদিন সব ছাড়ব বলে বেরিয়ে পড়লাম
কিছুই ছাড়া হলো না।
একদিন ধরা আর ছাড়ার বাইরে চলে গেলাম
দেখলাম সব পেয়ে গেছি
পাবার কিছুই বাকি নেই।

মা, তোমাকে

মধুসূদন পাল

মা, তোমাকে দিইনি কিছুই—চারপাশ ঘিরে
আছে গাঢ় অন্ধকার—হয়তো সম্পূর্ণা তুমি—
নিজস্ব সম্পদে
তবুও তো কথা ছিল, জনশ্রুতি মিশে আছে
প্রবাদে ধাঁধায়—দিতে হয়, আভূমি প্রণাম রেখে
তুলে নিতে হয় মায়ের আশিস—
কিছুই হলো না মাগো, সময়ের চক্রান্ত
কিংবা অর্থহীন কোন এক ক্ষুদ্র অঙ্গীকারে,
যে-মানুষ প্রাণপণ যুদ্ধ করে মুঠো ভরে
ধরেছিল মাটির মমতা,
সেও চলে গেল দুঃখহীন মৃত্যুর ওপারে—
আমি তো সন্তানস্নেহে পেয়েছি প্রশ্রয় শুধু
খ্যাতি আর অখ্যাতির ভিড় থেকে ডেকে নিয়ে
মাগো, শক্তি দাও যেন সারাদিন হেঁটে হেঁটে
ক্লান্ত হয়ে দিগন্তের কুড়োনো কিংবা অর্জিত
সঞ্চয় সবটুকু তোমাকেই তুলে দিয়ে
বলে যেতে পারি তোমার পূর্ণতায় হোক
উৎসর্গ জীবন

আর তোমার লালিত আজীবন শিশুর অন্তরে
যে-সুর ওঠে আচম্বিতে ভেসে
পারি যেন তার পূর্ণ রূপ দিতে।

প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ নাম ও নামসাধনা

স্বামী চেতনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে একটি বিস্ময়। 'রামকৃষ্ণ' নামটি এখন বিশ্বের অগণিত মানুষের মুখে প্রতিদিন উচ্চারিত হচ্ছে। কেউ তাঁর নাম জপ করছে; কেউ তাঁর কথা বলে বা শুনে আনন্দ পাচ্ছে; কেউ বা নামের পিছনে যে-মানুষটি রয়েছে তাঁকে জানবার চেষ্টা করছে। রোমাঁ রোলাঁ বেশ সুন্দরভাবে রামকৃষ্ণের জীবনের উপসংহার করেছেন ঃ "মানুষটি আর নেই। কিন্তু তাঁর আত্মা মানুষের সমষ্টিগত জীবনের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হবার জন্য যাত্রা করেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নামযশকে ঘৃণা করতেন, প্রচারের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁর দিব্যজীবন যাপন করেই খুশি ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী মনোমোহন মিত্র বলেছেন ঃ "সমবেত ভক্তগণকে লইয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় কয়েকজন ভক্তসহ কেশববাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ আলোচনার পর কেশববাবু ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিলেন ঃ 'যদি আদেশ দেন তাহা হইলে আপনার কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিই। তাহাতে বহুলোকের উপকার হইবে। আপনার কথা যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল।' ইহাতে ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্বক দৃঢ়স্বরে কহিলেন ঃ 'এর মধ্যে যেভাব আছে, যে-শক্তি আছে তাহা এখন প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। একে বক্তৃতা বা খবরের কাগজের দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে না। যখন বাহির হইবার সময় হইবে, তখন আপনা-আপনি তাহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। শত শত হিমালয় পাহাড়ের দ্বারা চাপা দিলেও এর শক্তি, এর ভাব কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না'।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি অমর, অম্লান পুষ্প। এ পুষ্পে রূপ আছে, রঙ আছে, গন্ধ আছে, মধু আছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে গেছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে রামকৃষ্ণ-মধু পান করতে। এ মধুতে অমৃতের আস্বাদ পেয়ে মানুষ বলেছে, "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।" কথামৃতকার শ্রীম সদা রামকৃষ্ণ-সুধা পান করে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে সমবেত ভক্তদের সেই নামামৃত বর্ষণ করতেন। তিনি আপন কল্পনায় প্রিয়তম গুরুর ছবি আঁকতেন ঃ "ঠাকুর যেন একটি ফুল—A beautiful flower, তার স্বভাবই হচ্ছে ফুটে গন্ধ ছড়ানো। তিনি যেন Bonfire—জ্বলন্ত আগুনের গোলাবিশেষ, আর তাই থেকে অন্যান্য ছোট পিদ্দিম জ্বালানো হয়েছে। ঠাকুর যেন একটি পাঁচ বছরের ছেলে, সদাই তাঁর মা-র জন্যে ব্যস্ত। তিনি যেন একটি স্বর্গীয় বীণা, আপন মনে মা-র গুণগানে সদা মত্ত। তিনি যেন একটি বড় মাছ, মহানন্দে সচ্চিদানন্দ সাগরে মহাসুখে সাঁতার দিচ্ছেন। ঝড়ের সময় পাখির মতো সব আশ্রয়স্থল ভেঙে যাওয়ায় তিনি যেন অনন্তের দ্বারে বসে আপন সুখে অনন্তের গুণগান করে দোল খাচ্ছেন।"[২]

রামকৃষ্ণ নামের অর্থ

শব্দের বা নামের সঙ্গে অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। অর্থ দুই প্রকার—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। 'রামকৃষ্ণ' নামের শব্দার্থ রামকৃষ্ণরূপ দেহধারী মানুষবিশেষ। ইনি ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির পুত্র, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পূজারী ইত্যাদি। আর 'রামকৃষ্ণ' শব্দের মর্মার্থ, তিনি 'সচ্চিদানন্দ', 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর', 'অবতারবরিষ্ঠ'।

নাম জপকালে অর্থের বোধ হলে নামের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি হয় এবং ভিতরে আনন্দও হয়। কাশীর এক খ্যাতনামা পণ্ডিত-সন্ন্যাসী স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি শ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী উপলক্ষে 'রামকৃষ্ণ' নামের গূঢ়ার্থ উল্লেখ করেন ঃ

"এই 'রামকৃষ্ণ' নাম সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে শুনিতে ছোট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিচারদৃষ্টি

---

[১] ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ৫৮-৫৯

[২] উদ্বোধন, ৩৯তম বর্ষ, পৃঃ ৪৫২

দ্বারা দেখিলে ইহাতে বড়ই রহস্যভরা রহিয়াছে দেখা যায়। যথা—‘রমন্তে যোগিনোঽস্মিন্নিতি রামঃ, কর্ষতি ভক্তানাং দুঃখং পাপং মনো বেতি কৃষ্ণঃ’—যোগিজন যাঁহাতে রমণ করেন তিনিই রাম এবং যিনি ভক্তগণের দুঃখ বা পাপ আকর্ষণ করিয়া নষ্ট করিয়া দেন, অথবা স্বীয় ভক্তগণের মন নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া স্বীয় ভক্তিতে তল্লীন করিয়া দেন, তিনিই কৃষ্ণ। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ভূ-ভার দূর করিবার জন্য তৎ তৎ যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই একত্র সমাবেশ ইদানীং এই (রামকৃষ্ণ) নাম হইয়াছে।

“‘রাম’ নামে বহু রহস্য আছে। যখন রাজা দশরথের গৃহে রাম অবতাররূপে ধারণ করিলেন তখন রাজা কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, ‘হে গুরো, এই বালকের নামকরণ করুন।’ বশিষ্ঠজী ‘রাম’ এইরূপ ছোট একটি নাম রাখিয়া দিলেন। তখন দশরথ ও মন্ত্রিগণ বলিলেন যে, এ তো অতি ক্ষুদ্র নাম, কোনও ‘ডবল’ নাম হওয়া চাই, যে নাম রাজচক্রবর্তীর পুত্রের যোগ্যতানুযায়ী হইতে পারে। বশিষ্ঠজী বলিলেন, ‘হে রাজন্, “রাম” নামের মহিমা আপনি জানেন না। শুনুন—“রাম” শব্দে যে “রা” অক্ষর আছে তাহা হইল “নমো নারায়ণায়” এই সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবমন্ত্রের প্রাণ। ইহা হইতে “রা” অক্ষর পৃথক করিলে “নমো নায়নায়” এইরূপ হইয়া যায় (রেফ্-র-এর জন্য ‘ণ’ হইয়া থাকে, ইহা ব্যাকরণের নিয়ম)। ইহার অর্থ হয়—“রূপরসাদি বিষয়কে নমস্কার।” এরূপ অনর্থ “রা” অক্ষরের পৃথক করণ দ্বারা হইয়া যায়। এই প্রকার “রাম” শব্দের ম-কারও “নমঃ শিবায়” মন্ত্রের জীবন। রাম-এর ম-কার “নমঃ শিবায়”-তে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। “নমঃ শিবায়” হইতে “ম” পৃথক করিলে অর্থের অনর্থ হইয়া যায়। “নমঃ শিবায়” মন্ত্রের অর্থ হইল—কল্যাণস্বরূপ শিবের জন্য প্রণাম। কিন্তু ম-কার বাদ দিলে “ন শিবায়”-এর অর্থ হইয়া যায়—কল্যাণের জন্য নহে অর্থাৎ দুঃখ বা অশিবের জন্য। এই প্রকারে বশিষ্ঠজী “রাম” নামের রহস্য বুঝাইয়া দিলেন, তখন দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ঐ “রাম” নাম শ্রীরামকৃষ্ণের নামের মধ্যে রহিয়াছে।

‘কৃষ্ণ’ পদের আধ্যাত্মিক অর্থ—‘কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥’ কৃষ্ ধাতুর অর্থ ত্রিকালারাধ্য-স্বরূপ ব্রহ্ম; ন প্রত্যয়ের অর্থ সুখ—আনন্দ সদ্‌রূপ ব্রহ্ম। সৎ এবং আনন্দের যে অভেদ সদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহাই হইল ‘কৃষ্ণ’ শব্দের অর্থ। যে সদ্‌রূপ ব্রহ্মকে বাদ দিলে কোনও বস্তুকে ‘অস্তি’ (আছে) এইরূপ বলাই চলে না, যে আনন্দকে বাদ দিলে আমরা কোনও বস্তুকে চাহিতেই পারি না—সেই ‘সৎ’ ও ‘আনন্দ’ (সুখ)-ই হইতেছে ‘কৃষ্ণ’ শব্দের অর্থ। ঐ ‘কৃষ্ণ’ যে ‘রামকৃষ্ণ’ নামে প্রবিষ্ট রহিয়াছে তাহার মহত্ত্ব বর্ণনাতীত।”[৩]

যে নামকে অবলম্বন করে জীবন কাটাতে হবে, সে নামের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এতে ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়। কর্ম, উপাসনা জপ ও ধ্যানের দ্বারা আমরা যাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাইছি, তিনি কে, কিবা তাঁর স্বরূপ—এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকলে জীবনে রসানুভূতি হয়। শরীরত্যাগের দুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলেছিলেন, “সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।” স্বামী তুরীয়ানন্দ ঠাকুরের এই বিখ্যাত উক্তির ব্যাখ্যা করে বলেন: “এর অর্থ এই যে, বেদান্তের অদ্বৈতমতে বলিয়া থাকে যে, জীব ব্রহ্ম এক। ইহার অর্থ কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, সকলেই রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি; তাঁহাদের বিশেষত্ব নাই। তাই পাছে স্বামীজী মনে করেন যে, সেইভাবে ঠাকুর বলিতেছেন, ‘যে রাম, যে কৃষ্ণ সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ।’ সেইজন্য ঠাকুর উল্লেখ করিলেন, ‘তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।’ অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরচৈতন্য, জীবচৈতন্য নহে। অদ্বৈতমতে জীব সাধন, ভজন, সমাধি প্রভৃতির দ্বারা অজ্ঞান দূর করিয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না। ঈশ্বর যিনি তিনি চিরদিনই ঈশ্বর। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া জীবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ঈশ্বরই থাকেন, কখনো জীব হন না।”[৪]

---

[৩] উদ্বোধন, ৩৮তম বর্ষ, পৃঃ ৫০১-৫০২.

[৪] স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ৩২৭

নাম ও রূপ

বেদান্তমতে "অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্। আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥"—সত্তা, প্রকাশ, আনন্দ, রূপ ও নাম এই পাঁচটি অংশ দেখা যায়। তন্মধ্যে পূর্ব তিনটি ব্রহ্মের স্বরূপ; নাম ও রূপ এই দুইটি জগতের স্বরূপ। (বাক্যসুধা ২০ শ্লোক) ব্রহ্মই সত্য 'অর্থাৎ' তিনকালে বিদ্যমান। নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা বা মায়িক। সুতরাং রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি নাম ও রূপ মিথ্যা। অতএব এদের অবলম্বন করা অর্থহীন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই, নির্বিকল্প সমাধির প্রাক্কালে তিনি জ্ঞান অসি দিয়ে তাঁর আরাধিতা দেবী মা-কালীর রূপ কেটে ফেললেন।

শাস্ত্র বলেন নাম-রূপের পারমার্থিক সত্তা নেই, তবে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে গুরু, শিষ্য, মন্ত্র, ও অজ্ঞান মিথ্যা বা অবিদ্যমান। কিন্তু মিথ্যা গুরু মিথ্যা শিষ্যের মিথ্যা অজ্ঞান মিথ্যা মন্ত্রের দ্বারা নষ্ট করে দেন। ঠিক তেমনি মিথ্যা ডাক্তার মিথ্যা রোগীর মিথ্যা ব্যাধি মিথ্যা ঔষধের দ্বারা নিরাময় করেন। সত্য বলতে কি, ব্রহ্মই সব হয়েছেন। তিনিই সাপ হয়ে দংশন করেন এবং রোজা হয়ে বিষ তুলে নেন। এসব তাঁর লীলা-খেলা।

নাম-রূপের আশ্রয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মই নামরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' এবং দ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে 'যথা যথা নেত্র পড়ে, তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে।' আমরা নাম-রূপের রাজ্যে বাস করি। এখন আমাদের এমন নাম-রূপ অবলম্বন করতে হবে যার দ্বারা আমরা এই মায়ার রাজ্য পার হতে পারি। রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা নাম-রূপহীন ব্রহ্মে পৌঁছবার দ্বার। উপনিষদে শব্দব্রহ্মকে অপরা-বিদ্যা বলা হয়েছে। "শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি"—অর্থাৎ অপরা বিদ্যাতে কুশল হলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বামী শিবানন্দ লিখেছেনঃ "এই রামকৃষ্ণ-নাম, এই রামকৃষ্ণ-রূপই তাহার সেই নামরূপাতীত শান্তিময় অবস্থাতে লইয়া যায়।"[৫]

নাম ও নামী অভেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "নাম ও নামী অভেদ।" এ কথাটা দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। "বাগার্থৌ সম্পৃক্তৌ" অর্থাৎ বাক্যের সঙ্গে অর্থ সদা যুক্ত। তেমনি নামের সঙ্গে নামী সদা যুক্ত। প্রথম নাম প্রকাশিত হন শব্দব্রহ্ম ওঁকার রূপে—ইহাই সৃষ্টির প্রথম স্পন্দ। নাম নামীতে উদ্ভূত, প্রতিষ্ঠিত ও বিলীন হয়। নামী কিছুদিন লোকচক্ষে থাকেন, কিন্তু নাম অবিনাশী। ইহা চিরন্তন। ইহাই অদৃশ্যতাকে দৃশ্য করে তোলে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেনঃ "খুব বিশ্বাস কর—নাম আর ভগবান। নাম-নামী এক করে ফেল। ভগবানই নাম হয়ে ভক্ত-হৃদয়ে বাস করেন। নাম কর, নাম শোন। নাম না করে যা-কিছু করবে, তাতে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে।"[৬]

কোন ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করলে তার মুখখানা চক্ষুতে বা মানসপটে ভেসে ওঠে। লৌকিকে দেখা যায় রামকে ডাকলে রামই সাড়া দেয়, শ্যাম সাড়া দেয় না। তেমনি কোন দেবতাকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। অবশ্য ঠিকমতো ডাকতে হবে। "যদি কেউ দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়, তার নাম ধরে ডেকে দরজায় ঘা দিলে যেমন সে জেগে উঠে সাড়া দেয় ও দরজা খুলে দেখা দেয়, তেমনি সরল বিশ্বাসে ও ভক্তির আবেগে ইষ্টমন্ত্র জপ ও সাধন করলে সর্বজীবের হৃদয়শায়ী ইষ্টদেবতা জাগ্রত হয়ে হৃদয়মন্দিরের দরজা খুলে দেন এবং সাধককে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন।"[৭]

বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রে নামের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছেঃ "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি ॥ হর্ষে প্রভু কহে শোন স্বরূপ রাম রায়। নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥" একবার জনৈক গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন, "নামেতেই হবে। কলিতে নামমাহাত্ম্য।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে

---

[৫] মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পৃঃ ২৫৩

[৬] ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ১৫৯-১৬০

[৭] পরমার্থ-প্রসঙ্গ—স্বামী বিরজানন্দ, ১৩৬০, পৃঃ ১৪৬

বলেন, "হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?"[৮]

অনেকে প্রশ্ন তোলেন ঃ আমরা সাধারণ মানুষ। ভগবানকে দেখিনি, তাঁর স্বরূপও জানি না। তিনি কোথায় থাকেন তাও জানি না—তবে কি করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব? ঋষি পতঞ্জলি বলছেন, "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় কর। কিভাবে আশ্রয় করব? "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" অর্থাৎ প্রণব (ওঁকার বা ইষ্টমন্ত্র) ভগবানের বাচক বা প্রকাশক। কিভাবে নাম জপ করব? "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" অর্থাৎ প্রণব জপ বা ইষ্টমন্ত্র জপের সময় সেই মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, "চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্। ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপাদপি।।" অর্থাৎ মন্ত্রকে চৈতন্যময় বা অনুভূতিময় না করিয়া লক্ষ কোটিবার জপ করিলেও প্রকৃত ফললাভ হয় না। কেবলমাত্র বর্ণ উচ্চারণ করা হয়।

মন্ত্রচৈতন্যের সাধন

পৃথিবী অগণিত মানুষ রাম, কৃষ্ণ, কালী, যীশু, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী বা অবতারের নাম জপ করে। গুরু-প্রদর্শিত পথে জপ-ধ্যান করা অবশ্যই কর্তব্য। অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করে মনে মনে ভাবে—যথেষ্ট।

তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রকে চৈতন্যময় করবার নানাবিধ সাধন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অধিকাংশ শিষ্যগণ ঐ সব সাধন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে পূজাকালে "রং" মন্ত্র উচ্চারণ করে বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করতেন, তখন দেখতেন তাঁর চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করে অগ্নির প্রাচীর তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মন্ত্রকে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা দেখতে পেতেন। অথচ আমরা চোখ বুজে ধ্যান-জপ করি আর চারিদিকে অন্ধকার দেখি। কখনো মনে হতাশ ভাবও আসে। তাই গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রচৈতন্যের প্রক্রিয়া জেনে নিয়ে সাধন করলে জপ-ধ্যানে আস্বাদ পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্রচৈতন্য প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "মন্ত্রবাদের সমর্থকদের বিশ্বাস—কতকগুলি শব্দ গুরু বা শিষ্যপরম্পরায় চলে এসেছে। এই সকল শব্দের বারবার উচ্চারণে ও জপে একপ্রকার উপলব্ধি হয়। 'মন্ত্রচৈতন্য' শব্দের দু-রকম অর্থ করা হয়। এক মতে—মন্ত্র জপ করতে করতে জাপকের সামনে তার ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়। 'ইষ্ট' হচ্ছেন মন্ত্রের বিষয় বা মন্ত্রের দেবতা। আর একটি মত এই ঃ যে গুরুর উপযুক্ত শক্তি নেই, তাঁর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিলে—সেই মন্ত্রে চেতনা সঞ্চার করতে হলে দীক্ষিতকে কতকগুলি অনুষ্ঠান (পুরশ্চরণাদি) করতে হয়, তখন সেই মন্ত্র-জপের ফল পাওয়া যায়।"[৯]

মন্ত্রচৈতন্য কি? এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ "সব মন্ত্রই হচ্ছে বর্ণের সমষ্টি। বর্ণের সমষ্টি হচ্ছে পদ। যে-পদের শক্তি থাকে, তাই সার্থক, নইলে শক্তিহীন পদ নিরর্থক। এই শক্তিজ্ঞান গুরুর নিকট হতে লাভ হয়। এই শক্তিজ্ঞান লাভ হলে, তখন মন্ত্রোচ্চারণ করলে সেই জ্ঞানের স্মরণ হয়। তখন মন্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুর জাগরণ ঘটে। এরই নাম মন্ত্রচৈতন্য সাধন। যেমন 'গো' পদ শ্রবণ করলে তখন পূর্বদৃষ্ট গো-সকলের স্মরণ হয় এবং তারপর 'গো' পদের অর্থজ্ঞান হয়। কিন্তু গো পদের দ্বারা যে গো-পদার্থকে বোঝায় শিশুকে তা তার বাপ-মার কাছ থেকে শিখতে হয় এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দ্বারা 'গো' এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র পূর্বজ্ঞানের স্মরণ হয় এবং পরে গো-পদার্থের শাব্দবোধ হয়। সেইরূপ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু গুরুর কাছ থেকে শুনতে হয়। কিন্তু একবার শুনলেই যে বোঝা যায়, তা নয়, কারণ সাধারণতঃ আমাদের বুদ্ধি মলিন। সেইজন্য পুনঃপুনঃ শ্রবণ অভ্যাস করতে হয়।...পুনঃপুনঃ শুদ্ধ শাব্দবোধের স্মরণ করতে করতে চিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক হয়ে যায়। এরই নাম মন্ত্রচৈতন্য।"[১০]

[৮] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।২।৫

[৯] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১৯

[১০] অন্তরাগে আলাপন—স্বামী বাসুদেবানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৮৭-৮৮

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ লিখেছেন ঃ “সৃষ্টির ধারাতে পরা বাক্ হইতে পশ্যন্তী, তার পর মধ্যমা বাকের আবির্ভাব হয়। সকলের শেষে বৈখরী বাক্ প্রকাশ পায়। আমরা যে বাকের প্রয়োগ করি, যাহা মুখ দ্বারা উচ্চারিত হয়, যাহা কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে বায়ুর সংঘর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা বৈখরী বাক্।…গুরুশক্তির প্রভাবে অথবা তীব্র অভ্যাসের ফলে বৈখরী শব্দ ক্রমশঃ সংস্কৃত বা শোধিত হয়। আমরা যে শব্দ উচ্চারণ করি তাহা মলিন—তাহাতে আগন্তুক মল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মল দূর না হইলে মধ্যমাতে প্রবেশ করা যায় না। শব্দের পুনঃপুনঃ আবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে শব্দগত মল ক্ষীণ হয়। তখন একদিকে শ্বাসবায়ু ইড়া-পিঙ্গলা মাঝ হইতে সরিয়া সুষুম্নাতে প্রবেশ করিতে থাকে। সুষুম্নাটি মধ্যমার্গ—নির্বিকল্প জ্ঞানে যাইবার রাজমার্গ। কিন্তু ইহা অত্যন্ত গুপ্ত পথ। এই পথটি নিম্নদিকে এক প্রকার নিরুদ্ধপ্রায় রহিয়াছে।…বৈখরীতে জপ (যথাবিধি) করিতে করিতে ক্রমশঃ কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—এদিকে সুষুম্নাপথ অল্পে অল্পে খুলিয়া যায়। তখন বায়ু ও মন সূক্ষ্ম হইয়া সুষুম্নাপথে প্রবিষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাদের অভ্যুত্থান হয়। নাদের উদয়ই মন্ত্রচৈতন্যের পূর্বাভাস।”[১১]

মন্ত্রচৈতন্য বিষয়টি বড় কঠিন। সাধন ছাড়া জানা যায় না। বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে মন্ত্রচৈতন্যের বোধ হয় না। সেজন্য বিভিন্ন সাধকের সাধনার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জানতে হবে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখেছেন ঃ “সাধনায় সত্য সত্য সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্য অধিকারে আসা চাই। মন্ত্রচৈতন্য না হইলে সাধনা পণ্ডশ্রম। সত্য-প্রতিষ্ঠায় একদিক দিয়া যেমন আস্তিক্যবোধ, আশ্রয়-আশ্রিতবোধ, আত্মীয়বোধ, আত্মবোধ স্ফুটতর হইতে থাকে, অন্যদিকে তেমনই মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়।…মন্ত্র, গুরু ও দেবতার একীকরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য। পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন ভাববোধক শব্দবিশেষ মনন করিলে সেই শব্দকে মন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়।…মন্ত্র বলে—ঐরূপ শব্দবিশেষকে, আর গুরু বলে—সেই শব্দগত অর্থকে বা জ্ঞানকে। শব্দ উচ্চারণে যে অর্থ মনে ফুটিয়া উঠে, সেই অর্থটি সেই শব্দের গুরু। গুরু অর্থে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদাতা। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ আলোকে যিনি লইয়া যান তাঁহাকে গুরু বলে। আর দেবতা বলে—সেই জ্ঞানের অনুভূতিকে। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় আত্মার বিশিষ্টতাগুলিকে দেবতা বলে। অনুভূতি উদয়কেই দেবতার আবির্ভাব স্থূলতঃ বলা যায়। আর মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে তাহার অর্থ ও অনুভূতি যদি একসঙ্গে ঘটে, তবেই মন্ত্র, গুরু ও দেবতা এক হইয়াছে বলা হয়। স্থূলতঃ ইহারই নাম মন্ত্রচৈতন্য।

“দৃষ্টান্ত দেই—মনে কর, তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ যে, তোমার বাড়ির নিকটস্থ বৃক্ষে ভূত আছে। ভূত আছে, এই কথাটা শুনিয়া অবধি তুমি মনে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাহার স্মরণ করিতেছ। আর ভূতের অর্থ তোমার জানা আছে যে, ভূত বলিলেই বিভীষিকাপ্রদ কোন জীববিশেষকে বুঝায়। তারপর তুমি রাত্রে সেই বৃক্ষতলে কার্যবশতঃ যেমনি হঠাৎ গেলে, অমনি তোমার মনে পড়িয়া গেল সেই শব্দটা—'ভূত'। আমি সেই গাছের ভূত সত্তাটি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তোমার মনে আঁকিয়া দিয়াছিলাম। তুমি বৃক্ষতলে যাওয়ামাত্র তোমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, গলা শুকাইয়া যাইতে লাগিল, বুকের ভিতর কেমন সব জড়াইয়া আসিতে লাগিল, তুমি সভয়ে বৃক্ষের দিকে চাহিতে গিয়া দেখিলে, যেন সত্যই ভূত বৃক্ষে আবির্ভূত। ভয়ে—হয় পরিত্রাহি চিৎকার করিয়া উঠিলে, অথবা মূর্ছিত হইয়া পড়িলে। এই হইল তোমার ভূতানুভব বা 'ভূত' মন্ত্রে চৈতন্যযুক্ত হইবার ফল। ভূত শব্দটি যেন মন্ত্র, তৎসম্বন্ধে যে বর্ণনাদি করিয়াছিলাম, তাহা গুরু আর এই 'যেন সত্যই ভূত বৃক্ষে উপবিষ্ট', এই অনুভূতিটিই ভূত মন্ত্রের দেবতা।”[১২]

জপের প্রণালী ও লক্ষণ

দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যকে জপ-ধ্যানের প্রণালী বলে দেন যা অবশ্য-পালনীয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হলে সাধক এগোতে পারে না। ধ্যান হওয়া বড়

---

[১১] পরমার্থ প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২-৬৩

[১২] ঋতম্ভরা, পৃঃ ২৪১-২৪৬

কঠিন। চিন্তাধারা মনের চঞ্চলতাহেতু কেটে কেটে যায়। তাই প্রথমে খুব করে জপ করে নিতে হয়। পুনঃপুনঃ নামের স্মরণের দ্বারা ভগবানকে বুদ্ধিতে ধরে রাখবার চেষ্টার নাম জপযজ্ঞ। ভগবান গীতায় বলেছেন: "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।"

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মুখে একটি অভিযোগ—"মন চঞ্চল। কী করব?" শাস্ত্রের সরাসরি উত্তর: "অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ কর।" শ্রীশ্রীমা বলতেন যে, ১৫।২০ হাজার জপ প্রতিদিন করলে মন অবশ্যই শান্ত হয়। স্বামী শিবানন্দ একখানি পত্রে লেখেন (১৬।৬।১৯২২): "মনকে স্থির করিবার একমাত্র প্রধান ও সহজ উপায় এই—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তির সম্মুখে বসিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার নাম জপ করা এবং এই মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা চাই যে, ঠাকুর তোমার দিকে দেখিতেছেন ও তুমি যে তাঁহার নাম জপ করিতেছ তাহা শুনিতেছেন এবং তোমায় কৃপা করিবার জন্য বসিয়া আছেন। এইরূপ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে, প্রভুতে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে এবং শান্তি পাইবে।"[১৩]

ভগবানের নামজপ নানাভাবে করা যেতে পারে—যেমন বাচনিক অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ করে, উপাংশু বা আস্তে আস্তে শব্দ উচ্চারণ করে যা কেবল জাপকের কর্ণগোচর হয়, এবং মানসিক। কেউ মালা বা কর সহযোগে সংখ্যা রেখে জপ করেন। কেউ বা চক্রে চক্রে (ষট্‌চক্র ধরে) জপ করেন। অপরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ করেন। শাস্ত্র বলেন মানুষ অহরহ অজপা জপ করে। শ্বাসগ্রহণ কালে 'সো' শব্দ হয় এবং প্রশ্বাস ত্যাগ কালে 'হং' শব্দ হয়। উভয়ে মিলে "সঃ অহং" (তিনিই আমি) এই মন্ত্র সর্বদা জপ হয়। এই সঃ অহং (বা সোঽহং) মন্ত্র —বিপরীতে হংস মন্ত্র হয়। তাই একে হংস বা অজপা গায়ত্রী বলে। "সোঽহং হংস পদেনৈব জীব জপতি সর্বদা।" ইহাই জীবের স্বাভাবিক জপ।

মনকে কি করে ভগবানে ধরে রাখা যায়—এর জন্য বহু সাধক বিভিন্নভাবে সাধন করেছেন এবং তাঁদের সাধনলব্ধ ফল শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন চক্রে জপের দ্বারা মনকে দ্রুত অন্তর্মুখী করা যায়। মনুষ্যশরীরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা নামে ছয়টি চক্র আছে। এবং সর্বোপরি সহস্রার—যেখানে পরমশিব রয়েছেন এবং মূলাধারে মা কুণ্ডলিনী শক্তি রয়েছেন। সাধক মূলাধার পদ্মে মন স্থির করে ইষ্টমন্ত্র জপ করে স্বাধিষ্ঠানে উঠবেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক চক্রে চক্রে জপ করতে করতে সহস্রারে উঠবেন, এবং সেখানে দ্বিগুণসংখ্যক জপ করে প্রত্যেক পদ্মে পদ্মে জপ করতে করতে মূলাধারে নামবেন। এইরূপে জপ করতে করতে ওঠানামা করবেন। একেই ষট্‌চক্রভেদ বলে। তন্ত্র বলেন: "মূলাধারে বসেৎ শক্তি সহস্রারে সদাশিবঃ। তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে।।" অর্থাৎ মূলাধার পথে যে শক্তি আছেন, তাঁকে সহস্রারস্থ শিবের সঙ্গে মিলন করানোকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলে। এ যোগ। (আত্মসমর্পণযোগ, ৯০-৯১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়লে মনে হয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জ্ঞাত বা শাস্ত্রানুমোদিত যত রকম সাধন আছে প্রায় সব রকমই করেছিলেন। আবার অনেক নূতন নূতন সাধনও করেছিলেন, যেমন ভক্তদের বলতেন, "ধ্যান করবার সময় ভাববে, যেন মনকে রেশমির রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখছ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে।"[১৪] চঞ্চল মনকে বশে আনবার জন্য অনেকে জপের সঙ্গে মূর্তিকে যোগ করে দেয়। যেমন মনকে বলা হলো—তুমি কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি দেখে একশত বার জপ কর। তারপর জয়রামবাটীর শ্রীমায়ের মূর্তিতে একশত বার, দক্ষিণেশ্বরের কালী একশত বার, কৃষ্ণ একশত বার, শিব একশত বার, ঠাকুরের ঘরে একশত বার, নহবতে মায়ের সামনে একশত বার, পঞ্চবটীতে একশত বার, কাশীপুরে একশত বার, এবং বেলুড়মঠে ঠাকুরের সামনে একশত বার জপ করলে এক হাজার বার জপ হয়ে যাবে। চঞ্চলমন খেলতে ভালবাসে। এও তেমনি জপ নিয়ে ঠাকুরের নানাবিধ রূপের সঙ্গে খেলা।

দীক্ষাকালে গুরু উপদেশ দিয়ে বলেন, "সকাল সন্ধ্যায় নিত্য নিয়মিত জপধ্যান করবে।" জপকে

---

[১৩] মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, পৃঃ ২২৭-২২৮

[১৪] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৭৭), গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৮১

কার্যকরী করতে গেলে নিষ্ঠা, নিয়ম ও ক্ষণ রক্ষা করতে হয়। ক্ষণ রক্ষাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেমন কোন ব্যক্তি সকাল সাতটায় ব্রেকফাস্ট খায়, বেলা একটায় লান্চ এবং রাত আটটায় ডিনার খায়। গত ৪০।৫০ বছর ধরে সে ঐভাবে রুটিন পালন করছে। ঐ তিন সময় তার পাকস্থলী খাদ্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। ঠিক তেমনি, সময় ঠিক করে জপ করলে মন ভগবানের সান্নিধ্যের জন্য তৈরি থাকে। গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন ঃ "ক্ষণ রক্ষা মানে আপনি একটা নিয়ম করে নিলেন জপ করার জন্য—(ভোর) চারটার সময় বসব—ঠিক চারটার সময় বসতে হবে। চারটার সময় যদি আপনার লক্ষ টাকাও যায় তাহলেও আপনাকে চারটার সময় বসতে হবে। যদি নাও বসতে পারেন তাহলে 'বাবা বসতে পারলাম না' বলে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু সেই এক মিনিটের জন্য চিন্তা করতে হবে। ক্ষণ রক্ষা করা বড় কঠিন জিনিস। ক্ষণ রক্ষা করতে পারলে ভগবানকে নিয়ে আসা যায়।··· অন্য সময় বেশিক্ষণ বসুন কিন্তু সেই ক্ষণটিকে ভুলবেন না। মুসলমানরা যেমন করে, যখন রাস্তা দিয়ে চলে নামাজ পড়বার সময় হলে ঐখানেই বসে পড়ে, সেখানে কোন মসজিদের দরকার করে না, কিছু দরকার করে না। ক্ষণকে রক্ষা করতে না পারলে দশ ঘণ্টা বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করলেও কিছু হয় না। কত রকমের প্রতিবন্ধক আসে, সেসব এসে পড়ে। ক্ষণে তা হয় না—ক্ষণটা হচ্ছে কালের নাশক।"[১৫]

যোগদর্শনে পতঞ্জলি বলেছেন ঃ "ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্" (৩।৫২)। অর্থাৎ "বিভাগ হয় না এরূপ সূক্ষ্ম কালাবয়বকে ক্ষণ বলে। উহাতে এবং উহাদের অবিচ্ছেদে পৌর্বাপর্য প্রবাহে সংযম করলে বিবেকজ বা সমস্ত বস্তুর অসংকীর্ণরূপে সাক্ষাৎকার হয়।" এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য পড়লে বোঝা যায় ক্ষণ রহস্য কী দারুণ ব্যাপার।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বৃন্দাবনের এক সিদ্ধাত্মার প্রসঙ্গে বলেন ঃ "তখন আমি ও হরি মহারাজ এক সঙ্গে ছিলাম। আমরা নিয়মিতভাবে খুব ধ্যান-জপ করতাম। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা নেহাৎ প্রয়োজন না হলে একেবারেই হতো না। রাত্রি আটটার পর মাধুকরীর রুটী দু-একখানা যা থাকত তা-ই খেয়ে শুয়ে পড়তাম। আবার রাত ঠিক বারটার সময় উঠে মুখহাত ধুয়ে জপে বসতাম। জানি না সেদিন কেন একটু বেশি ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ একটি বিষম ধাক্কা খেয়ে আমার ঘুম ভাঙল। কে যেন বললে, 'বারটা বেজে গেছে, জপে বসবে না?' নিদ্রার ঘোর তখন সম্পূর্ণ যায়নি আমার। ভাবলাম ঘুমুতে দেখে হরি মহারাজ আমায় বোধহয় জাগিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি জাগাননি। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে জপ করতে বসছি, সামনের দিকে চেয়ে দেখি এক বাবাজী নিবিষ্ট মনে জপ করছেন। হঠাৎ বাবাজীকে দেখে বেশ একটু ভয় হলো। জপ করি আর মাঝে মাঝে তাঁর দিকে দেখি। যতক্ষণ বসেছিলাম বাবাজীও ততক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে জপ করছিলেন। তারপর নিত্যই দেখতাম তিনি ঐভাবে জপ করছেন।"[১৬]

নামে রুচি

আমরা ভগবানের নাম জপ করি অথচ ভগবৎ-রসের আস্বাদ পাই না। সকাল-সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে বসি এবং যন্ত্রবৎ মালা ঘোরাই। আনন্দ পাই না তাই ঠাকুরঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বলেছেন, "স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" অর্থাৎ দীর্ঘকাল সদা-সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সঙ্গে (যোগারূঢ় হবার) চেষ্টা করলেই অভ্যাস দৃঢ় হয়। জপের দ্বারা অন্তর্জগতে ঢুকতে হলে ধৈর্য দরকার। সিনেমা শুরু হবার পর কেউ যদি সিনেমা হলে ঢোকে সে চারিদিকে অন্ধকার দেখে। তখন কেবলমাত্র কয়েকটা দরজার উপরে Exit-এর ক্ষীণ লাল আলোগুলি মাত্র থাকে। ভিতরে খানিকক্ষণ থাকলে পর চেয়ারের সব সারিগুলি আস্তে আস্তে চোখে ভাসে এবং গাইড এসে টিকিট দেখে বসিয়ে দেয়। তেমনি হৃদয়ের অন্ধকার নাম-জপের দ্বারা আলোকিত হয়, তখন আনন্দাস্বাদ হয়। তুলসীদাস বলেছেন, ধর্মের

---

[১৫] পরমার্থ প্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২-৫৩

[১৬] ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃঃ ১৬১

প্রবেশপথে প্রদীপ রাখলে যেমন ভিতর-বার আলোকিত হয়, তেমনি জিহ্বায় 'রাম' নাম জপ করলে অন্তর ও বাহির জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠে।

অনুরাগ ছাড়া সাধন-ভজন আলুনি তরকারির মতো বিস্বাদ হয়। খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয় হয়, তেমনি অনুরাগের সঙ্গে নাম করলে রুচি হয়। শাস্ত্র বলেন, পিত্তদোষ হলে জিহ্বায় চিনি ভাল লাগে না, তেতো লাগে। কিন্তু ঔষধসেবনের ন্যায় প্রতিদিন কিছু কিছু করে চিনি খেলে পিত্তদোষ কেটে যায় এবং চিনিতে রুচি হয়। এইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তির ভগবানের নাম ভাল লাগে না; কিন্তু সে যদি প্রতিদিন একটু করে নামকীর্তন বা জপ করে তবে তার মায়ামোহ কেটে যায় এবং সে ভগবৎরস আস্বাদন করতে পারে। অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে জিভের স্বাদ চলে যায়। মুখে কিছুই ভাল লাগে না। তখন ভাত তরকারির সঙ্গে একটু তেঁতুলের আচার মিশালে একটু স্বাদ বোধ হয়। ভগবৎ অনুরাগই তেঁতুলের আচার। মাতালের মদের কথা শুনতে ভাল লাগে, তারপর মদের বোতল দেখে মন নেচে উঠে, কর্ক খোলামাত্র গন্ধেতে গোলাপী নেশা শুরু হয়ে যায়, অবশেষে মদ পান করে আনন্দে মশগুল হয়ে সে জগৎ ভুলে মেঝেতে বা রাস্তায় পড়ে থাকে। নাম করতে করতে সাধকদের 'গোলাপী নেশা' হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, "সিদ্ধি-সিদ্ধি করলে হবে না। সিদ্ধি আনো, সিদ্ধি ঘোঁট, সিদ্ধি খাও। তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে।"[১৭]

লৌকিকে দেখা যায়, আমরা যাদের দুচক্ষে দেখতে পারি না, তাদের নাম শুনলে বিরক্তি বোধ হয়; আবার যাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ তাদের কথা শুনতে ভাল লাগে। এই আত্মীয়বোধ থেকে রুচি হয়। প্রিয়তমের কথা বলতে ও শুনতে আনন্দ হয়। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে রূপ গোস্বামী লিখেছেনঃ "কে জানে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদুটি কত সুধা দিয়ে তৈরি। এক মুখে কৃষ্ণ নামে তৃপ্তি হয় না; প্রবল ইচ্ছা হয় বহুমুখে কীর্তন করার। কানে একবার শুনলে ইচ্ছা জাগে অনেক কানে শোনবার এবং মনের অঙ্গনে একবার সে নাম এলে সমস্ত ইন্দ্রিয় মূর্ছিত হয়ে পড়ে।"

বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'নামগানে সদা রুচি'ঃ একটা বিশেষ সাধন। প্রেম সাধনার বিভিন্ন ধাপ আছে, যেমন প্রথম শ্রদ্ধা, তারপর ক্রমে সাধুসঙ্গ, ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, ভগবানে আসক্তি, ভাব ও প্রেম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সোজা ভাষায় বলেছেন, "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন। ইহা বই ধর্ম নাই শুন সনাতন।।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নামসাধনা

পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য এসে নামসাধনা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগবানের নামে সকলের অধিকার। ভক্তের মধ্যে ধনী-নির্ধন, বিদ্বান-অবিদ্বান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভৃতি কোন ভেদ নেই। চৈতন্যদেবের জপমন্ত্র ছিলঃ "রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।।" এ ছাড়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"—এই বত্রিশ অক্ষরযুক্ত ষোল নাম বৈষ্ণব-সমাজে সুবিদিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের নামসাধনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেনঃ "মনকে যে ভূতটি পেয়ে বসেছে, সেই ভূতকে ছাড়াতে হলে অর্থাৎ সমল মনকে বিমল করতে হলে ভগবানের নামের শরণ লওয়া একটি সহজ উপায়। অবিরত সরল প্রাণে ভগবানের নাম করতে করতে সমল মন বিমল হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলেছেন, নামের অপার মহিমা। নামই বীজ, নামই গাছ, নামই ফল। নামের ভিতরেই ভগবান নিজে আছেন। কথায় বললে মানুষ সহজে নেয় না, তাই রামকৃষ্ণদেব জীবশিক্ষার জন্য নিজে প্রাতঃ-সন্ধ্যা করতালি দিয়ে তালে তালে নাচতে নাচতে ভগবানের নাম নিতেন, নামে উন্মত্ত হয়ে যেতেন। তারপর নামোন্মত্ততা গভীর সমাধিতে পরিণত হতো। এতে ঠাকুর জীবকে দেখাচ্ছেন ও বলছেন, যে-সমাধি জন্ম জন্ম বিবিধ কঠোর সাধনার ফল, সেই সমাধি নামের বলেও পাওয়া যায়।··· নামের শরণাপন্ন হওয়া, নাম শ্রবণ, নাম কীর্তন করাকেই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মতে

---

[১৭] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।পরি।২

নারদীয় ভক্তি বলে। কলিকালে ভগবানলাভের এই নারদীয় ভক্তিই প্রশস্ত।"[১৮]

যেমন ব্যাণ্ডের শব্দ হতে থাকলে আমরা পরস্পরের কথাবার্তা শুনতে পাই না, তেমনি উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্তন করলে মনের কামনা-বাসনা অভিভূত হয়ে পড়ে। লোকে বলে, নাম কামকে খেয়ে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী যোগানন্দকে কামের প্রতিষেধক হিসাবে হরিনাম করতে বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে নাম করতেন সে-প্রসঙ্গে রামলালদাদা বলেন: "'জয় গোবিন্দ জয় গোপাল, কেশব মাধব দীনদয়াল। হরে মুরারে গোবিন্দ, বসুদেব দেবকীনন্দন গোবিন্দ। হরে নারায়ণ গোবিন্দ হে। হরে কৃষ্ণ বাসুদেব।' ঠাকুর সকাল ও সন্ধ্যায় এইটি বলে কখনো কখনো নৃত্য করতেন।"[১৯] শ্রীমও এই প্রসঙ্গে বলেন: "ঠাকুর রোজ সন্ধ্যার পর একটি মন্ত্র বলতেন, 'ব্রহ্ম-মায়া জীবজগৎ'। এটি জপ করলেও সিদ্ধ হওয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হয়। বলতেন, 'এসব খুব গুহ্য মন্ত্র'।"[২০]

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলকাতায় বলরাম ভবনে বা কোন ভক্ত বাড়িতে নাম করতেন, তখন অনেকে কৌতূহলবশতঃ আসত। ফিরবার সময় বলতে বলতে যেত, "কী মা নাম করে রে পরমহংস! একেবারে বুকের মধ্যে কড় কড় করে কেটে ঢুকে যায়।"[২১]

কথামৃতের বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পাই ঠাকুর কিভাবে বিভোর হয়ে নানা দেবদেবীর নাম করতেন:

কৃষ্ণ হে দীনবন্ধু! প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ! হা কৃষ্ণ। হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! বুদ্ধি কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ।

প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন।

সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! সচ্চিদানন্দ! কারণানন্দদায়িনী! কারণানন্দময়ী।

হরিবোল, হরিবোল, হরিময় হরিবোল, হরি হরি হরিবোল।

রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম।

জয় জয় দুর্গে, জয় জয় দুর্গে।

সহজানন্দ, সহজানন্দ।

ওঁ কালী, ওঁ কালী।

কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।

মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।

ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব, ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী।

শরণাগত, শরণাগত। নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।

হরি ওঁ। হরি ওঁ। ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ… ওঁ কালী।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সচ্চিদানন্দ।

ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ, গোপী! গোপী, রাখাল-জীবন কৃষ্ণ।

নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোবিন্দ।

শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রীমন্নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

জগন্নাথ, দীনবন্ধু, জগবন্ধু।

ওমা, ওমা, ব্রহ্মময়ী।

মা, মা, রাজরাজেশ্বরী!

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো একঘেয়ে ছিলেন না। তিনি অনুভূতির দ্বারা জেনেছিলেন—একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম। যেকোন একটি নামকে ধরে এগোলে লক্ষ্যস্থল ঈশ্বরে পৌঁছান যায়। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে একদিন বসে বসে 'গৌর, গৌর' নাম করছেন গুন্-গুন্ করে। একজন বললেন: 'আপনি মায়ের নাম করুন। 'গৌর', গৌর' করছেন কেন?" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন: "কি আর করি বাপু বলো? তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকাকড়ি কিন্তু আমার এই এক অবলম্বন। তাই কখনো গৌর বলি, কখনো মা, কখনো রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, এই করে সময় কাটাই।"[২২]

ভবরোগের ঔষধ—নাম। দুঃখকষ্টই ভবরোগ। ঠাকুর ভক্তদের এই দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য গান গেয়ে শোনাতেন: "ওগো, আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না", "নামের ভরসা কালী করি গো তোমায়",

---

[১৮] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা, পৃঃ ১৩২-১৩৩

[১৯] শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫

[২০] শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১

[২১] স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ৪১

[২২] শ্রীম-দর্শন, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি, আখেরে এ দীনে
না তারো কেমনে, দেখা যাবে গো শঙ্করী।"

একবার জনৈক ভক্ত শ্রীমকে মনের আন্তরিকহীনতা ও বিষয়োন্মত্ততা সম্বন্ধে উপদেশ চাওয়ায় তিনি বলেনঃ "তাঁর (ঠাকুরের) নিকট ব্যাকুলতার জন্য প্রার্থনা করুন।" ভক্ত—"প্রার্থনা করতে যে ইচ্ছা করে না।" শ্রীম—"বেশ তো, গুরুমন্ত্র জপ করুন। চিত্ত একাগ্র না হলেও দশ-পনের হাজার জপ রোজ করুন দিকিন। 'নাম নিতে নিতে হবে অনুরাগ, ক্রমে হবে বিষয়ে বিরাগ, ক্রমে কুণ্ডলিনী হবে সজাগ'।" ভক্ত—"নাম জপ করতেও যে ইচ্ছা করে না।" শ্রীম—"তাহলে case serious, বাঁচবার আশা কম। নামে রুচি হলো শেষ চিকিৎসা। নামে রুচি থাকলে আর ভয় নেই। ধীরে ধীরে সব হবে।"[২৩]

নামসাধনার ফল

পৃথিবীর সকল মানুষ খুঁজছে শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি। এ তিনটি পরস্পর পৃথক নয়। তিনে এক—একে তিন। সাধারণ মানুষের মন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, দুঃখ-অশান্তিতে ভরা। নামসাধনা করলে মনের ময়লা কেটে যায়, রিপু দমন হয়, বুদ্ধি স্বচ্ছ ও দৃঢ় হয়, শরীরে স্ফূর্তি আসে। স্বামী শিবানন্দ বলতেনঃ "রামকৃষ্ণ নাম এযুগের মন্ত্র। যে এখানকার শরণ নেবে, তারই কল্যাণ হয়ে যাবে।··· খুব অনুরাগের সঙ্গে তাঁর নাম করে যাও। না করলে কিছুই হবে না। তাঁর নামেই সব শক্তি নিহিত আছে।"[২৪]

ভগবান যুগে যুগে নানা নামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ-যুগে তিনি 'রামকৃষ্ণ' নামে আবির্ভূত। "এ নামের অদ্ভুত মহিমা। বিপদে এ নাম ভরসা; ব্যাধিতে এ নাম ঔষধ; অন্ধকারে এ নাম আলো; সম্পদে এ নাম আনন্দ; মৃত্যুর পর এ নাম অমৃতলোকে নিয়ে যায়; সংঘর্ষে এ নাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করে; ধ্যানে এ নাম চিত্তকে তাঁতে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন করে তোলে।"[২৫]

নামসাধনার মুখ্য ফল নামীর দর্শন বা মুক্তি; আর অবান্তর ফল দৈহিক ও মানসিক শান্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ "ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"[২৬] "ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনো না কখনো এর ফল হবেই হবে।"[২৭] আবার কখনো তিনি বলতেন যে, হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করলে দেহ থেকে পাপ পাখি উড়ে যাবে। কথিত আছে রাজা দশরথ এক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপে তিনটি ব্রহ্মহত্যার কারণ হয়েছিলেন। সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি মহামুনি বশিষ্ঠের কাছে যান। মুনি বাড়িতে না থাকায় তাঁর পুত্র বামদেব দশরথকে তিনবার 'রাম' নাম করতে উপদেশ দেন। এবং পরে পিতাকে তা বলেন। বশিষ্ঠ ক্রোধে পুত্রকে বলেন, "তুই চণ্ডাল হবি। যে নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করলে এমন পাপ ত্রিভুবনে নেই, যা থেকে জীব পরিত্রাণ পায় না, সেই নাম তিনবার উচ্চারণ করতে বলায় তুই নামের মহিমা খর্ব করেছিস।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় মজা করে ভক্তদের কাছে নামমাহাত্ম্য খ্যাপন করতেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি জনৈক ভক্ত ঠাকুরের জন্য এক চাঙারি জিলিপি আনেন। তিনি সানন্দে একটু জিলিপি ভেঙে খেয়ে ভক্তদের বললেনঃ "দেখছো, আমি মায়ের নাম করি বলে—এইসব জিনিস খেতে পাচ্ছি!" সবাই হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেনঃ "কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না, তিনি অমৃত ফল দেন—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য।"[২৮]

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখতে যান। কথামৃতের বর্ণনাঃ "নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ-কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে আসিয়াছেন, অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সাদরে উপরে লইয়া গেলেন।··· ঠাকুরকে দক্ষিণ-পশ্চিমের বক্সে বসানো হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাস্টার বসিলেন। ··· নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ। নিচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপসিন দেখা যাইতেছে। অনেক-

---

[২৩] উদ্বোধন, ৮১তম বর্ষ, পৃঃ ৫২২

[২৪] শিবানন্দ বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৬

[২৫] অন্তরাগে আলাপন, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩১

[২৬] কথামৃত, ১।২।৬

[২৭] ঐ, ১।৩।২

[২৮] ঐ, ৪।১।১

গুলি বক্সে লোক হইয়াছে। এক এক জন বেহারা নিযুক্ত, বক্সের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিতে গিরিশ বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন। ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, সহাস্যে)—বাঃ এখান বেশ! এসে বেশ হলো। অনেক লোক একসঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

মাস্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখানে কত নেবে?

মাস্টার—আজ্ঞা, কিছু নেবে না। আপনি এসেছেন ওদের খুব আহ্লাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মার মাহাত্ম্য।[২৯]

এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ নামসাধনার ফল দেখিয়ে গেছেন। তিনি টাকা ছুঁলেন না, সঞ্চয় করলেন না, ঘরবাড়ি বানালেন না। মার নাম করে মহানন্দে জীবন কাটিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের নামমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বলেছেনঃ "ঠাকুর এইটি আমাকে বলেছিলেন, 'যে তাঁর নাম নেয়, তার কোন দুঃখ থাকে না।' এটি তাঁর নিজের মুখের কথা।"[৩০] "ঠাকুর বলতেন, 'আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট থাকে না'।"[৩১] "ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে'।"[৩২] মানুষ দুঃখকষ্ট পায় নিজের কর্মের জন্য। এ ব্যাপারে অপরকে দোষারোপ করা বৃথা। শ্রীশ্রীমা বলতেনঃ "কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপতপ করলে কর্ম অনেকটা খণ্ডন হয়।"[৩৩]

"আপনি কে?"

শ্রীরামকৃষ্ণরূপ নামধারী ব্যক্তিটিকে বোঝা বড়ই মুস্কিল। স্বামীজী, গিরিশ প্রভৃতি ভূয়োদর্শী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পর্যন্ত ধাঁধার মধ্যে পড়েছেন। একদিন গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেনঃ "মহাশয়, আপনি কে?" প্রত্যুত্তরে ঠাকুর বলেনঃ "আমায় কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ। আমি এইখানেই থাকি।"[৩৪] যোগীন-মার দিদিমা কেশবচন্দ্র সেনের পত্রিকায় পরমহংসদেবের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের বেশভূষার জাঁকজমক ছিল না, গেরুয়াও পরতেন না, মালাতিলক কোন চিহ্নই ছিল না। তাই বুড়ি দিদিমা না জেনে ঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা করেনঃ "হাঁগা, এখানে কোথায় পরমহংস আছেন বলতে পারো?" ঠাকুর উত্তরে বললেন, "কি জানি বাপু! কেউ বলে—পরমহংস। কেউ বলে—ছোট ভটচায। কেউ বলে—গদাধর চাটুজ্যে। কেউ বলে—পাগলা বামুন। দ্যাখো, জিজ্ঞেসপড়া করে কোথাও হবে।"[৩৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মগোপন করে থাকতেন। নিজের নাম জাহির করবার প্রবৃত্তি তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। ভক্তদের কখনো ঠারেঠোরে কখনো বা সুস্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে নিজের প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ করতেনঃ "অচিন গাছ," "বাউলের দল", "দীনহীন কাঙালের বেশে ঘুরছে জীবের ঘরে ঘরে", "ভক্তের নেমন্তন্ন খেতে আসেন", "সচ্চিদানন্দ এঁর (নিজের শরীর) ভিতর থেকে বের হয়ে বললেন, 'আমি যুগে যুগে অবতার হই'।" (নরেন্দ্রকে বললেন) "এঁর (ঠাকুরের) ভিতর থেকে এইসব (বিশ্ব) বের হয়েছে।" "একদিন মা নানা অবতারের রূপ দেখালেন। তার ভিতর এটিও (নিজের রূপ) দেখলাম।"[৩৬] এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন।"[৩৭]

অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে কসুর করেনি। তিনি প্রতিবারই সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হাসতে হাসতে বলতেন, "এখনো অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর—পাকা করে ধর্—যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং (নিজের

---

[২৯] কথামৃত, ২।১৪।৫

[৩০] শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৩

[৩১] ঐ, পৃঃ ১৫৩

[৩২] ঐ, পৃঃ ৭৩

[৩৩] ঐ, পৃঃ ১১৫

[৩৪] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১০

[৩৫] রামকৃষ্ণ-সারদামৃত—স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ১৬

[৩৬] শ্রীম-দর্শন, ৯ম খণ্ড, পৃ ১৪৩

[৩৭] কথামৃত, ৪।২৪।৩

শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর—তবে এবার গুপ্তভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য-পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম।”[৩৮] লীলাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঠাকুরের আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন উক্তি আছে। যেমন “সরকারী লোক—তাঁহাকে জগদম্বার জমিদারির যেখানে যখনই কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে সেইখানেই তখন গোল থামাইতে ছুটিতে হইবে।”[৩৯] “যার শেষ জন্ম সে-ই এখানে আসবে। যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।”

“যাহার শেষ জন্ম—যাহার সংসারে পুনঃপুনঃ আগমনের ও জন্ম মরণের শেষ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই এখানে আসিবে এবং এখানকার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে।”

“দ্যাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি?—এখানকার উপর তোদের বিশ্বাস আছে কিনা। একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে।”

“তোমার ইষ্ট (উপাস্য দেব) (আপনাকে দেখাইয়া) ইঁহার ভিতরে আছেন, ইঁহাকে ভাবলেই তাঁহাকে ভাবা হইবে।”

“একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে—এইজন্যে বলছি।”

“আমি যেরূপে বলিতেছি সেইরূপে যদি চলিয়া যাস তাহা হইলে সোজাসুজি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া যাইবি।”

“তুমি আমার নাম করবে”

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ‘আমি’ ‘আমার’ এ দুটি শব্দ ক্বচিৎ শোনা গেছে। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ‘এর’, ‘এর ভিতর’, ‘এখানকার’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নিজের বিষয় ইঙ্গিত করতেন। আমি ও আমার হচ্ছে মায়ার বেড়াজাল। তিনি ঐ বেড়াজাল চিরদিনের মতো ছিন্ন করে অনন্তের সঙ্গে বিরাজ করতেন। স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গের গুরুভাব পূর্বার্ধে ‘ভাবমুখ’ ব্যাখ্যাকালে ঠাকুরের ‘আমি’-র রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি ‘আমি’ বা অহং-এর চারটি স্তর দেখিয়েছেন। ঠাকুর যখন নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হতেন, তখন তাঁর ‘আমি’ নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যেত। তারপর এক ধাপ নিচে এসে সেই আমি “বিশ্বব্যাপী আমি বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়ে নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হতো।” তখন কল্পতরুর মতো হয়ে তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করতেন, “তুই কি চাস?” আর এক ধাপ নেমে তিনি ‘সন্তান আমি’, ‘ভক্ত আমি’, ‘দাস আমিকে’ দীনের দীন রূপে মা জগদম্বার যন্ত্ররূপে লোকশিক্ষা দিতেন। একেই তিনি বলতেন ‘পাকা আমি’। ইহাই বিদ্যা-আমির শেষ স্তর। এর নিচের ধাপ ‘অবিদ্যা-আমি’ বা ‘কাঁচা আমি’। কাঁচা আমির উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলতেন, “অমুকের ছেলে আমি, ব্রাহ্মণ আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি।” এ আমি বন্ধনের কারণ। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঠাকুরের ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ হইয়াছিল।”[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী তুরীয়ানন্দকে গানের মাধ্যমে ভক্ত হনুমানের উক্তি শুনিয়েছিলেন: “ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব? ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?” ঠাকুর অনেক সময় কৃপা পরবশ হয়ে কোন কোন ভক্তকে বলতেন, “আমাকে তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?” চতুর্থ দর্শনকালে শ্রীমকে এই প্রশ্ন করায়, তিনি উত্তরে বলেন, “ ‘আনা’ একথা বুঝতে পারছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমাভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদারভাব কখনো কোথাও দেখি নাই।” ঠাকুর হাসলেন। তারপর শ্রীমকে বললেন, সে যেন বলরামের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। শ্রীম প্রণাম করে বিদায় নিলেন। তারপর সদর ফটক থেকে আবার ফিরে এসে তিনি ঠাকুরকে বললেন, “আজ্ঞা, বোধ হয় বড়-মানুষের বাড়ি—যেতে দেবে কিনা;

---

[৩৮] লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৭৭), গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৭৫

[৩৯] ঐ, ২য় ভাগ (১৩৭৯), পৃঃ ২০৭

[৪০] ঐ, পৃঃ ১০৬

তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব। তা হলেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।"[৪১]

"তুমি আমার নাম করবে, তাহলে কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।"—এটি বড় আশার কথা। কেবল শ্রীমকে নয়, সংসারের দিশেহারা সব মানুষকে ঠাকুর ভগবৎ পথের সন্ধান করে দিচ্ছেন। তাঁর নাম করলে সর্বত্র দ্বার মুক্ত হয়ে যাবে—সে ধনীর প্রাসাদই হোক বা সংসারের গোলোক ধাঁধাই হোক। যেমন রাজপুত্রের রাজপ্রাসাদের সর্বত্র অবাধ গতি এবং দ্বারীরা সসম্মানে অভিবাদন করে রাজপুত্রের জন্য দ্বার খুলে দেয়; তেমনি মহামায়া অবতারের আত্মীয় বা অন্তরঙ্গদের স্বেচ্ছায় সাগ্রহে মুক্তির দরজা খুলে দেন। কারণ অবতার মায়াধীশ।

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমকে ঠাকুর বলেন, "ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো! হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ। তারা ও-কথা বলে না। তাদের দুটি জিনিস জানলেই হলো; প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে? তারপর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? তুমি এই শেষ থাকের।"[৪২] অবতারের সঙ্গে একবার সম্বন্ধ পাতাতে পারলে মনুষ্যজীবন সফল হয়, সংসারের যাতনার অবসান হয়, মৃত্যুভয় দূরীভূত হয়। "আমি রামভক্ত"—এই রামনামের জোরে মহাবীর হনুমান সর্বত্র জয়ী হতেন এবং অসম্ভব সম্ভব করতেন।

১ জানুয়ারি ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে কল্পতরু হয়ে সমবেত ভক্তদের 'চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্র দত্ত নবগোপাল ঘোষকে বলেন: "মশায়, আপনি কি করছেন? ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।" শুনে নবগোপাল দ্রুত ঠাকুরের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন, "প্রভু আমার কি হবে?" ঠাকুর একটু নীরব থেকে বললেন, "একটু ধ্যান-জপ করতে পারবে?" নবগোপাল: "আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?" ঠাকুর: "তা একটু একটু জপ করতে পারবে না?" নবগোপাল: 'তারই বা অবসর কোথায়?" ঠাকুর: "আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?' নবগোপাল: "তা খুব পারব।" ঠাকুর তখন বললেন: "তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"[৪৩]

দয়াল ঠাকুর ভক্তদের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানলাভের সোজা সরল পথ দেখিয়ে দিতেন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন: "যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করতে না পার, তাহলে অভ্যাসযোগ প্রয়োগ কর। তা যদি না পার তবে ভগবৎকর্মপরায়ণ হও; তা যদি না পার তবে আমার যোগপরায়ণ ও সংযতাত্মা হয়ে সর্বকর্মের ফল ত্যাগ কর। এরূপে কৃষ্ণ ভগবানে মন নিবিষ্ট করবার নানাবিধ উপায় দেখিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি "কাকেও বলতেন—তুমি মা-কালীর ঘরে তিনদিন কিছু জপ কর; কাকেও বলতেন—যদি তিনদিন না পার, একদিন কর। কাকেও বলতেন—তুমি যদি অন্য জপ-ধ্যান করতে না পার, এখানের (অর্থাৎ ঠাকুরের) স্মরণ মনন রেখো; কাকেও বলতেন—তোমার কিছু করতে হবে না, এখানে এলে গেলেই হবে—এই আজ এসেছ, আর দুদিন এস; কাকেও বলতেন—তুমি একদিন মঙ্গলবারে কি শনিবারে এস; তা হলেই হবে। কখনো কখনো ভালবেসে বলতেন, এখানে এসে সরলপ্রাণে যে বলবে, 'হে ঈশ্বর, তোমার তত্ত্ব বা তোমাকে কি করে জানব!' সে নিশ্চয়ই তাঁর তত্ত্ব পাবে পাবে পাবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা, পৃঃ ৬৪) কারুকে জিহ্বায় লিখে দিতেন। আবার কারুকে বলতেন "আমাকে চিন্তা করলেই হবে, আমাকে ধ্যান করলেই হবে।"[৪৪]

---

[৪১] কথামৃত, ১।২।৬, [৪২] ঐ, ৪।১৪।১

[৪৩] শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৭৮

[৪৪] শ্রীম-দর্শন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬, ৫৮, ১৪০

রামকৃষ্ণ নাম ছড়াচ্ছে

প্রদীপের নিচে অন্ধকার, আর সেই আলো দূরে আলোকিত করে। শ্রীম একবার কামারপুকুরে যান। সেখানকার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীমর পরিচয় জেনে বলেন, "ও গদায়ের ভক্ত তুমি? কি করে তার ভক্ত হলে অত পড়াশুনা করে? ও কোন শাস্ত্র পড়ে নাই। মূর্খ।" শ্রীম ঐ পণ্ডিতকে ঠাকুরের কয়েকটি উপদেশ শোনালেনঃ চিল-শকুন খুব উঁচুতে উঠে কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে; পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল হবে, কিন্তু টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না; বাজনার বোল মুখে বলা সোজা কিন্তু হাতে আনা কঠিন। পরে ঐ পণ্ডিত অনুতপ্ত হন।[৪৫]

প্রত্যক্ষদর্শী অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেনঃ "মহাপুরুষদের কাছের লোকেরা তাঁকে দেখতে পায় না, দূরের লোকেরা তাঁর ভাবে মুগ্ধ হয়।··· একদিন দক্ষিণেশ্বরে গ্রীষ্মকালে পঞ্চবটীর শীতল ছায়ায় রামকৃষ্ণদেবের কাছে তাঁর কতকগুলি ভক্ত বসে আছেন। নানা রকমের ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, এমন সময় কথায় কথায় এঁড়েদহ, দক্ষিণেশ্বর ও বরাহনগরের লোকদের কথা উঠল। ঠাকুরের উপর এঁদের জটিলা-কুটিলার ভাব; তাই একটি ভক্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দূর-দূরান্তরের লোক এসে এখানে শান্তিলাভ করে যাচ্ছেন, আর এঁরা আসেন না কেন?' ঠাকুর মুখে কোন জবাব না দিয়ে, একটি গাই দড়াবাঁধা ছিল, সেই গাইটিকে দেখিয়ে দিলেন। গাইটি গঙ্গার গর্ভে চরায় দড়াবাঁধা ছিল; এখন গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে ছটফট করছে। গাইটি দেখে কথার জবাব তখন কেউ বুঝতে পারলেন না। রামকৃষ্ণদেবের কি মহিমা! এমন সময় আর চার-পাঁচটি ছাড়া গরু এসে গঙ্গার জলে নেমে গিয়ে ইচ্ছামত জল খেয়ে ডাঙ্গায় উঠলো। তখন ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন যে, ঐ গাইটির ভারি তৃষ্ণা পেয়েছে, কিন্তু বাঁধা রয়েছে, তাই এত কাছে জল তবু খেতে পাচ্ছে না; আর ঐ গরুগুলি ছাড়া ছিল, তাই তৃষ্ণা পাবামাত্র জল খেয়ে গেল। এখানকার লোকেরা বাঁধা আছে, তাই আসতে পারে না।"[৪৬]

ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় দূরে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাণী উত্থিত হয়েছিল, তা এখন ছড়িয়ে পড়ছে সাগরপারে—দেশ-দেশান্তরে। একথা খুবই সত্য যে "নাম মানুষকে জাঁকাইয়া তোলে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে।" কিছুদিন আগে Thomas Merton ঃ A Monk বইখানি পড়ছিলাম। টমাস মার্টন একজন বিখ্যাত লেখক ও ট্রাপিস্ট সন্ন্যাসী। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের স্মৃতিকথা নিয়ে ঐ বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। একদিন ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। Thomas: "If you love another person, it's God's love being realized. One and the same love is reaching your friend through you, and you through your friend." David: "But isn't there still an implicit dualism in all this?" Thomas: "Really there isn't, and yet there is. You have to see yours will and God's will dualistically for a long time. You have to experience duality for a long time until you see it's not there. In this respect I am a Hindu. Ramakrishna has the solution."[৪৭]

কয়েক বছর আগে ক্যানসাস সিটিতে একটি জাপানী রেস্টুরেন্টে খেতে গেছি তিনজন আমেরিকান ভক্তসহ। একটি জাপানী পরিচারিকা আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলঃ "Are you from India?" আমি বললামঃ 'Yes'। মেয়েটি আনন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলঃ "I know Ramakrishna". আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলামঃ "How do you know Ramakrishna?" সে বলল, ক্যালিফর্নিয়ার Costa Mesa Yoga Centre-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় পড়েছে। এখনো সেই জাপানী মেয়েটার জাপানী accent-এর উক্তি—"I know Ramakrishna" কানে বাজছে।

---

[৪৫] শ্রীম-দর্শন, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১-১৪২

[৪৬] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা, পৃঃ ৪৫

[৪৭] Thomas Merton: A Monk, Sheed and Ward, Inc., New York, 1974, p. 88-89

স্বামী বিবেকানন্দঃ একটি পত্র ও বর্তমান ভারতবর্ষ

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠারশো তিরানব্বই খ্রীস্টাব্দের ১০ জুলাই লেখা একটি পত্রে জাপানের ইয়কোহামা থেকে স্বামীজী মাদ্রাজী বন্ধুগণের উদ্দেশে তাঁর যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে দিতে জাপানের সঙ্গে তুলনা করে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে এসে বলছেন যে, হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচারে শক্তিক্ষয় করে সে রূপ আহম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ভারত নামক দেশটা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং কেবলই ইংরেজের চর্বিতচর্বণ ও বদহজম করে প্রাণমন তিরিশ টাকার কেরানির দিকে ঝুঁকে পড়ছে, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছে। স্বামীজীর মতে এই হচ্ছে ভারতের তৎকালীন যুবকদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। অথচ তাদের চারিদিকে তাদের একপাল বংশধর 'খাবার দাও' বলে চিৎকার [illegible] হ, সেদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না! স্বামীজী ঐ পত্রেই আহ্বান [illegible] ভারতবর্ষের যুবকদের প্রতি। তেজস্বী অগ্নিগর্ভ ভাষায় লিখিত এই পত্রটি তাঁর চিন্তার সারমর্মের এক অসাধারণ বাণীরূপ হয়ে উঠল। দেশের জন্য কি করতে হবে, যুবকদের কি আদর্শ হবে, কিভাবে তারা লক্ষ্যে অগ্রসর হবে, স্বামীজী তার আহ্বান জানালেন।

"এস, মানুষ হও। দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো শুধরাবে না। তাদের হৃদয়ের কখনো প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব। আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।"

এই প্রসঙ্গে ঐ পত্রে স্বামীজী মাদ্রাজের যুবকবৃন্দের সামনে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা রেখেছিলেন যার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর সেবাধর্মের স্বরূপটি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেনঃ "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান ... যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।" স্বামীজী জানতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর মূল ও প্রধান সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্য নির্মম ও শোচনীয়। এব্যাপারে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সচেতন হতে হবে এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে যারা প্রতিদিন পিষ্ট হচ্ছে, তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে, নিরন্নকে অন্ন দিতে হবে, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করতে হবে। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দিয়ে কিছুদিন তার প্রাণরক্ষা সম্ভব, কিন্তু চিরকাল লঙ্গরখানার মাধ্যমে অন্নদান সম্ভবপর নয় এবং তা উচিতও নয়। তাই প্রথম দরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ। দারিদ্র্য দূর করার উপায় স্বামীজীর মতে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। আর এই শিক্ষা যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তার দ্বারা কুসংস্কার যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণও সম্ভব হয়। আবার, কেবল এসবেই দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভবপর নয়, যদি দেশবাসীর মধ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ না হয়। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের নামই হচ্ছে শিক্ষা। মনুষ্যত্বের দীক্ষা সম্পূর্ণ না হলে সবই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকালে একথার পূর্ণ রূপ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। আমরা সমাজতন্ত্রের, কমিউনিজমের তত্ত্ব

মগজের মধ্যে গ্রহণ করেছি। ফলে দেশের দরিদ্র আর থাকা উচিত নয়, কেউ দরিদ্র থাকবে না, সব মানুষকেই সমান ভাবে দেখতে হবে ইত্যাদি ভাবভাবনা আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে উদিত হয়। এমনকি বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে ক্ষুধার্তের মুখে অন্নদানের ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। দেশ জুড়ে শিক্ষা-কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করে ঘরবাড়ি চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সাজিয়ে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের মতো বৃহৎ কর্মকাণ্ডও শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের স্বাধীনতালাভের বিয়াল্লিশ বছর পরেও, এত ইজমের ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং দরিদ্রের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি সত্ত্বেও দরিদ্র আরও দরিদ্রই হয়েছে। আজও অগণিত মানুষ দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না। ভারতবর্ষের কুড়িকোটি লোক আজ অপুষ্টিতে ভুগছে এবং এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে প্রায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। শিক্ষার এত বড় মহান যজ্ঞ করেও এখনো শতকরা আশিভাগ ভারতবাসী নিরক্ষরতার অন্ধকারে রয়েছে। স্বামীজী তাই যখন বলেনঃ "বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত ডুবিয়ে ফেলতে পার না?" তখন বুঝতে পারা যায় এই ধিক্কার আমাদের যথার্থভাবেই প্রাপ্য। তার কারণ ঐ পত্রেই স্বামীজীর নির্দেশঃ "আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে" তা আমরা পালন করিনি। স্বামীজী এই কথায় বলতে চেয়েছিলেন, আমরা যা-ই করি না কেন আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ না হয়, আমাদের মধ্যে মানুষ হবার প্রেরণা না থাকে, তাহলে আমরা দেশকেও যেমন ভালবাসতে পারব না, দেশের মানুষকেও ভালবাসতে পারব না। আর তা না হলে স্বামীজীর নির্দেশমতো দরিদ্রের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আসবে না—আর আসলেও তা হবে নিছক মৌখিক বা কপট সহানুভূতি, ক্ষুধার্তের মুখে অন্নদান করার আকাঙ্ক্ষা জাগবে না—আর জাগলেও তা হবে আত্মম্ভরিতার প্রকাশমাত্র। ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কেবল ভণ্ডামি আর বাগাড়ম্বরে পরিণত হবে। আর, যাদের আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা পশুপদবীতে উপনীত করেছি তারা যুগ যুগান্তর ধরে ঐ পদবাচ্যই থেকে যাবে। এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় স্বামীজী ঐ পত্রেই উল্লেখ করেছেনঃ

"ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান।" এই সহস্র যুবকেরা কি করবে স্বামীজী ঐ পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়ে দু-পঙ্‌ক্তিতে তা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেনঃ "ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে, নাম-যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"

আজ অনেক কিছু করেও কোন কিছুই যে সম্ভবপর হচ্ছে না তার কারণ স্বামীজীর চিঠির ঐ 'পুনশ্চের' মধ্যেই নিহিত আছে। আমরা ধীরভাবে কাজ করি না। নিস্তব্ধতা আমাদের জীবন হতে অন্তর্হিত, কাজ করি বা না করি ঢাক-ঢোল পেটানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আর দৃঢ়তা আমাদের জীবনে নেই বললেই চলে। স্বামীজী 'খবরের কাগজের হুজুক' থেকে আমাদের দূরে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু আজ খবরের কাগজই আমাদের বাঁচায়, মারে আর ডোবায়। পত্রের পুনশ্চে স্বামীজী লিখেছিলেনঃ "সর্বদা মনে রাখবে, নাম-যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।" বর্তমান ভারতবর্ষে আমরা সর্বদাই মনে রাখি যে, কাজ নয় নাম-যশই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই প্রায় একশো বছর আগে স্বামীজী তাঁর ধিক্কারবাণীতে যে অন্তর্ভেদী প্রশ্ন আমাদের সামনে রেখে গিয়েছিলেন তা আজকের বর্তমান ভারতের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্যঃ

"শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি?"

এই প্রশ্নের কে উত্তর দেবে?

স্মৃতিসন্দর্ভ

মারাঠী সাহিত্যিক মামা ওয়ারেরকর ও তাঁর 'বিবেকানন্দ-স্মৃতি'

স্বামী বিদেহাত্মানন্দ

॥ ১ ॥

মামা ওয়ারেরকর প্রসঙ্গ

মারাঠী সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভার্গবরাম বিঠ্‌ঠল ওরফে মামা ওয়ারেরকরের জন্ম ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের চিপলুণ গ্রামে। তাঁর বাবা সেখানে ডাকবিভাগে চাকরি করতেন। ছেলেবেলায় স্কুলের পড়াশুনোয় তাঁর মন বসত না। দারিদ্র্যের জন্য মাত্র চোদ্দ-পনের বছর বয়সেই তাঁকে অর্থোপার্জনে লেগে যেতে হয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি রত্নাগিরির সিভিল হাসপাতালে চাকরি পান। সেখানে ডাঃ কীর্তিকরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। আগে থেকেই তাঁর নাটক পড়া ও দেখার শখ ছিল। এখানে এসে ডাঃ কীর্তিকরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে অনেক ইংরেজী গল্প-নাটক-উপন্যাস পড়ার সুযোগ তিনি পেলেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ডাকবিভাগে চাকরি করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২ জুলাই ভারতে আকাশবাণীর জন্ম হলো। তখন থেকে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি এর সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন।

মামা ওয়ারেরকরের রচিত সাহিত্যের পরিমাণ বিরাট। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর প্রথম নাটক ও ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস লেখেন এবং পরবর্তী অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্যিকজীবনে তিনি প্রায় ৩৬টি নাটক, ২৬টি উপন্যাস, ২৫টি রহস্যকাহিনী-গ্রন্থ, ৪ খণ্ডে আত্মকথা, ৪টি গল্প-সংগ্রহ, ৬টি একাঙ্ক-নাটক-সংগ্রহ এবং ১০০টির মতো প্রবন্ধ লিখেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। তিনি শরৎচন্দ্রের ২১টি উপন্যাস ও ৩টি গল্প, বঙ্কিমচন্দ্রের ১২টি উপন্যাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৩টি উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু গল্প, প্রবন্ধ ও নাটকের মারাঠী অনুবাদ করেন। ইংরেজী কিছু নাটকের অনুবাদও তিনি করেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১৭৬টি গ্রন্থ তিনি মারাঠীতে লিখেছেন। কিছুকাল তিনি 'দুনিয়া' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর কিছু গ্রন্থ হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মামা ওয়ারেরকর মারাঠী সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক নাট্যকার বলে পরিগণিত। তাঁর পূর্ববর্তী অধিকাংশ মারাঠী নাটকই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত হতো। কিন্তু তিনি সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর এই অবদানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ মারাঠী লেখক আচার্য আত্রে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এই কালকে মারাঠী নাট্যসৃষ্টির 'গড়করী-যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। মারখোলকার তাঁকে মহারাষ্ট্রের পুরোগামী লেখকদের মধ্যে অগ্রণী বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান করেন। রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যপদও তিনি অলঙ্কৃত করেছেন। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর বিরাশি বছর বয়সে দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মামা ওয়ারেরকর তাঁর জীবনের ঊষালগ্নেই স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিষয়টি খুব কম লোকেরই জানা। কিন্তু ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতাব্দী উপলক্ষে ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ

আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয় যার অনুলিখন 'ত্রিপথগা' ও 'কাদম্বিনী' দুটি মাসিক হিন্দী পত্রিকার 'মে' ১৯৬৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই স্মৃতিকথাতে স্বামীজীর আলমোড়া বাস (১৮৯৮) সম্পর্কে কিছু অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা স্মৃতিকথাটির সম্পূর্ণ বাঙলা অনুবাদ এখানে উপস্থিত করছি।

॥ ২ ॥

মামা ওয়ারেরকর-এর 'বিবেকানন্দ-স্মৃতি'

"আমার বাল্যকাল থেকেই যখন কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করত, তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও, তখন আমি বলতাম যে, মুনসেফ কিংবা বড় অফিসার হবার চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়াই আমার বেশি পছন্দ। আমাদের বাড়িতে কয়েকজন সন্ন্যাসীর যাতায়াত ছিল। আমার বাবার কাছে যেসব সন্ন্যাসী আসতেন, তাঁদের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার পাঁচ বছর বয়স থেকেই হয়েছিল। তাঁদের দেখে সন্ন্যাসের প্রতি আমার মনে একটা তীব্র আকর্ষণ জন্মেছিল এবং আমার জীবনে এই আকর্ষণ কখনো আমাকে ত্যাগ করেনি।

গোণপদাচার্যের আসনের জন্য যে স্নাতকদের নেওয়া হতো, তাদের মধ্যে আমিও একজন। স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী আমাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর মঠের ভবানী ভট্ট সুখঠণকরজী আমার গুরু। কিন্তু আমার মা আমাকে সন্ন্যাসী হতে দিলেন না। মায়ের নিষেধে আমাকে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। এতে আমি খুব নিরাশ হয়েছিলাম।

পরে আমি ডাকবিভাগে চাকরি পেলাম। অতঃপর আমার বাবা আমার বিয়ে দেওয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু আমি বিয়ের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। অথচ বাবা কথা দিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর কথা রাখার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে বিয়ে করতে হলো। এটাই হলো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় হতাশা। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে ছুটি নিয়ে আমি বাড়ি ছাড়লাম। আমার এক বন্ধুর ভাই নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের পূজারী ছিলেন। তিনি বাড়িতে এসেছিলেন। যখন তিনি নেপালে ফিরে গেলেন আমি তাঁর সঙ্গ নিলাম। সেখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যারজন্য আমাকে নেপাল থেকে পালাতে হলো। এই সময় স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামীজীর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। স্বামীজী তখন (মে-জুন, ১৮৯৮) আলমোড়ায়। পাটনা থেকে আমি আলমোড়ায় পৌঁছালাম. অনেকদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হলো, যখন স্বামীজীর পাদপদ্মে মাথা রাখলাম, তখন হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। তিনি আমাকে হাত ধরে উঠিয়ে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আমার নাম ও চাকরির কথা বললাম। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য (সন্ন্যাস) জানালাম না। স্বামীজীর সান্নিধ্যে আমি আনন্দে এত আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার মুখ থেকে একটি কথাও বেরোচ্ছিল না। স্বামীজীও মৌন রইলেন। তিনি আমাকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করেননি।

আলমোড়া আশ্রমে সন্ন্যাসী পরিমণ্ডলে নির্ভাবনায় দিন কাটাতে লাগলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও স্বামী স্বরূপানন্দ—এই মহাত্মাগণ ছাড়াও আরো চারজন বিদেশিনী[১] সেখানে থাকতেন। তাঁরা স্বামীজীরই শিষ্যা। খেতড়ির রাজসাহেবের (অজিত সিংহ) সঙ্গে আগেই (নৈনীতালে) এসে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছে। মিস মার্গারেট নোবল, যিনি পরবর্তী কালে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে বিশ্ববিখ্যাত হন তিনিও সেখানে ছিলেন। স্বামীজী তাঁর বিদেশী শিষ্যাদের ভারতীয় ইতিহাসের পুণ্য কাহিনীগুলি শোনাতেন। তাঁর নিজের অদ্ভুত শৈলীতে সেকথাগুলি বর্ণনা করতে করতে স্বামীজী এতই তন্ময় হয়ে পড়তেন যে, শ্রোতাদের অন্তর্পটে কাহিনীগুলি সজীব হয়ে উঠত।

---

[১] এঁরা হলেন ঃ মিসেস সেভিয়ার, মিসেস ওলিবুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং কলকাতায় আমেরিকান কনসাল জেনারেলের স্ত্রী মিসেস প্যাটারসন। তাঁরা সবাই অবশ্য স্বামীজীর 'শিষ্যা' ছিলেন না।

বর্তমানের সর্বকিছু বিস্মৃত হয়ে সকলের মন দূর অতীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত। এই কাহিনীগুলি আমার জানা ছিল। বাল্যকাল থেকেই আমার বাবা আমাকে মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত এবং ‘রামবিজয়’, ‘পান্ডবপ্রতাপ’ ইত্যাদি প্রাকৃত গ্রন্থগুলি নিয়ম করে পড়িয়েছিলেন। এইজন্য এই সমস্ত কাহিনীগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় তবুও স্বামীজীর মুখে এগুলি শুনতে শুনতে আমার এসব নতুন মনে হতো। অন্যান্য আশ্রমবাসীদের মতো আমিও আশ্রমবাসীর জীবন কাটাচ্ছিলাম। এইখানেই আমার বাঙলাভাষার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

বিদেশী ভক্তদের সঙ্গে ীজী ইংরেজীতে কথা বলতেন। কিন্তু সন্ন্যাসি-ভাইদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বাঙলাভাষাই ব্যবহার করতেন। শুনে শুনে আমিও বাঙলা বুঝতে লাগলাম। তাঁদের ভজন গাওয়ার সময় আমিও সঙ্গে সঙ্গে গাইতাম। যদিও তখন আমার গলা গাইবার মতো ছিল না। স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ। মারাঠী রঙ্গমঞ্চের মোররাও কোলহাটকরজীর মতো তাঁর আওয়াজ জোরালো ছিল। কিন্তু স্বামীজীর গলা মন্দ্র সপ্তকের ষড়জ অবধি নামত। ভারতের অনেক মহান গায়কদের আমি দেখেছি ও তাঁদের সঙ্গীত শুনেছি। কিন্তু আওয়াজের সেই যাদু আমি কারো ভেতরে পাইনি। স্বামীজীর সঙ্গীত-সাধনার আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল। তবলাবাদনেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। আজকালকার ওস্তাদ তবলিয়াদেরও তাঁর তুলনায় বালখিল্য মনে হয়। সেকালের বাংলাদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসার হয়নি। খেয়াল, ধ্রুপদ ও ঠুংরী গায়নের বিশেষ চল ছিল ; টপ্পাগান বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হতো। ভজনও বেশিরভাগ ভগবান রামচন্দ্রের স্মৃতিতে গাওয়া হতো। “আমি কি দুঃখেরে ডরাই, তবে দুঃখ দাও মা আর কত চাই”—রামপ্রসাদের এই গানটি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ভোরবেলা উঠেই সকল সন্ন্যাসী ধ্যানে বসতেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতাম, কিন্তু ধ্যানস্থ হবার তুলনায় আমি স্বামীজীর মনোহারী ধ্যানস্থ-মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতেই বেশি ভালবাসতাম। স্বামীজী প্রায় দুঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীজীর ধ্যানভঙ্গ না হতো ততক্ষণ অন্য সন্ন্যাসিগণও ধ্যানস্থ থাকতেন।

তাঁদের এই ধ্যানধারণা আমাকে বিস্মিত করত কিন্তু আকর্ষণ করত না। (কেন না) আমি আমার সমস্যাগুলি—সমাধানের জন্য ব্যগ্র ছিলাম। তখনো পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা করার সুযোগ আমার হয়নি। একদিনের কথা। ধ্যানভঙ্গের পর স্বামীজী একাই বাইরে বেরোলেন ; আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। আমি সন্তর্পণে যাওয়া সত্ত্বেও স্বামীজী ঠিক টের পেয়ে গেলেন। তিনি চলতে চলতে থামলেন এবং পিছন ফিরে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, মমতার সঙ্গে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, “Well, my boy, what do you want?” (বল বাবা, কি চাও?) আমি আমার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করলাম—সন্ন্যাসী হওয়া আমার মহৎ আকাঙ্ক্ষা। শিকাগো সর্বধর্মসম্মেলনের বর্ণনা আমি সংবাদপত্রগুলিতে পড়েছিলাম, তখন থেকেই আমার প্রাণে স্বামীজীকে দর্শন করার তীব্র অভিলাষ জেগে উঠেছিল।

আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছিলাম। আজ আমার জীবনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি পেয়েছি। আমি মাথা নুইয়ে স্বামীজীর চরণ স্পর্শ করলাম এবং দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করলাম। স্বামীজী একটি গাছে ঠেস দিয়ে বসলেন, আমিও তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। তিনি আমার সমস্ত সমাচার অবগত হলেন। আমি বিবাহিত জেনে স্বামীজী আমার মাথায় হাত রেখে কোমলস্বরে বললেনঃ “বৎস, সন্ন্যাস সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু সেটা তোর কপালে নেই। তোর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, এখন সন্ন্যাসী হওয়া তোর চলবে না।”

আমি যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লাম। প্রাণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা একেবারে চুরমার হয়ে গেল। আমি হু-হু করে কাঁদতে লাগলাম। তখন স্বামীজী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেনঃ “তোর

কপালে সন্ন্যাস লেখা আছে। তোর যৌবনকালে সন্ন্যাসের অবস্থা আসবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, তোর দ্বারা মহান কার্য হবে। এখন তুই বাড়ি ফিরে যা, চাকরি কর। কিন্তু চাকরি তোর জন্য নয়। তুই মুক্ত, স্বাধীন। আমি কাশ্মীরে যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরে এসে বিদেশ-যাত্রায় যাব। বিদেশ থেকে ফিরে এলে কলকাতায় আমার সঙ্গে আবার দেখা করিস। ভুলিস নে। ভুললে অনুতাপ করবি।"

স্বামীজী আমাকে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত না করায় আমি নিরাশ হয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এলাম। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের শেষে আমি আবার বেলুড় মঠে যাই। (ইতিমধ্যে) বাবা দেহরক্ষা করেছেন। সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি যখন বেলুড়ে পৌঁছালাম তখন স্বামীজী সাঁওতাল মজুরদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এই মজুররা অস্পৃশ্য। কিন্তু বিবাহিত হলে তারা আবার অন্যের ছোঁয়া খাবার খেত না। আমাদের স্পর্শকরা লবণও তাদের নিষিদ্ধ ছিল। সেজন্য বিনা-নুনের দই এবং অন্যান্য জিনিস নিজের হাতে তৈরি করে স্বামীজী তাদের খাওয়ালেন। পরম আগ্রহের সঙ্গে তাদের পরিবেশন করতে করতে তিনি বলেছিলেনঃ "আজ সাক্ষাৎ নারায়ণ আমার নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন।" মঠের সন্ন্যাসীদের স্বামীজী তাদের ভজন-পূজন ত্যাগ করে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার নির্দেশ দিলেন। বললেনঃ "ভগবানের এই সন্তানরা আমাদের ছুঁৎমার্গের শিকার হয়ে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।"

তখন স্বামীজীর শরীর ভাল ছিল না। আমি আবার আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি বললেনঃ "বাবা, এই রামকৃষ্ণ আশ্রমকেই নিজের বাড়ি মনে কর। সন্ন্যাসী হবার দরকার নেই। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) তোকে মন্ত্রদীক্ষা দেবেন। ওটাই সন্ন্যাস মনে করবি। আজকে আমি গিরিশ ঘোষকে ডেকে পাঠিয়েছি। তাঁর কাছে তোকে সঁপে দেব।"

গিরিশচন্দ্র মঠে এলে স্বামীজী আমাকে ডেকে পাঠালেন। স্বামীজী তাঁকে বললেনঃ "একে নিজের ছেলে মনে করে আপন করে নাও। তোমার পরম্পরা এরপরে এ-ই চালাবে, এই ছেলের জন্ম হয়েছে তোমার পরম্পরা অখণ্ডিত রাখার জন্য। একে আমি তোমার জিম্মায় দিলাম। একে তুমি তোমার উত্তরাধিকারী কর।"

গিরিশবাবু আমাকে নিজের ছেলে মনে করে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন।[২]

স্বামীজীর শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে (চীনের ভারত-আক্রমণ) তাঁর একটি প্রাসঙ্গিক উপদেশ আমার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেনঃ "খোল-করতাল পিটিয়ে কি লাভ? ঝাঁঝ-খোল বাজিয়ে নেচে দেশটা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি গ্রামে খোল-করতালেরই ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েলী সুর শুনে এটি নপুংসকদের দেশ হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে বেশি পতন আর কি হতে পারে? এখন আমাদের রণভেরী, রণশিঙ্গা, ডমরু বাজানো দরকার। ঢাকের দুন্দুভিনাদ আমাদের আজ আবশ্যক। 'হর হর মহাদেব' গর্জনে আমাদের গগন-ভেদী নির্ঘোষ তুলতে হবে। আমাদের যেসব গীত ও বাদ্য কোমল ভাবনা-সমূহ উদ্রেক করে, তাদের পরিত্যাগ করা আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। টপ্পা-ঠুংরী বন্ধ করে দাও। ধ্রুপদের স্বর-লহরী লোকেদের কানে প্রবেশ করুক। বৈদিক মন্ত্রের মেঘগর্জনে প্রাণের আহুতি দিয়ে চতুর্দিকে বীরত্বের তূর্য-মহিমা জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ষাট বছরের বেশি হয়েছে। কিন্তু এখনো বীরত্বের মহিমায় দেদীপ্যমান এবং তেজস্বিতার শিখায় প্রদীপ্ত তাঁর মূর্তি আমাদের অন্তর্পটে অঙ্কিত আজও রয়েছে। তাঁর সেই ঘোষণা এখনো আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছেঃ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এবং আমি তাঁকে নতমস্তকে বারবার প্রণাম জানাচ্ছি।

[২] পরে অনেকবারই মামা ওয়ারেরকর কলকাতায় গিরিশবাবুর বাড়িতে থেকেছেন।

॥ ৩ ॥

মামা ওয়ারেরকর-এর নাটকে বিবেকানন্দ

পূর্বোল্লিখিত বিবরণটি হলো মামা ওয়ারেরকরের 'বিবেকানন্দ-স্মৃতি'। স্বামীজীর ভাব নিয়ে কিছু সাহিত্যসৃষ্টিও তিনি করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে স্বামীজীর প্রভাব একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা তাঁর শুধু একটি নাটক 'সন্ন্যাশাচা সংসার' ('সন্ন্যাসীর সংসার') নিয়ে একটু আলোচনা করব, কেননা এ-সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেনঃ "স্বামীজীর যে স্বল্পকালীন সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে তখন আমার যে কথা হয়েছিল তারই ব্যবহার এই নাটকে আমি করেছি। তিনি পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু স্বধর্মাভিমানী ছিলেন। তাঁর স্তুতি দিয়েই আমি এই নাটকের সূচনা করেছি এবং ভাগ্যবশতঃ এতে অভিনয়ের জন্য যাঁকে পেয়েছিলাম, তাঁরও স্বামীজীর সঙ্গে খুব সাদৃশ্য ছিল।"[৩]

যে স্তুতি দিয়ে তিনি আলোচ্য নাটকটি শুরু করেছেন তার ভাবানুবাদ নিচে দিলামঃ

জয় জয় নরোত্তম নরেন্দ্র গুরুবর
ধর্মধরার দিগন্তে সত্ত্ব অংশুকর,
স্বধর্মাভিমানী পরধর্মসমভাবী
জগতে সাম্য-প্রকাশক সুধীর
(জয় জয় জগজীবন)
এসেছেন নবরবি নটবর কলিযুগে
দুর্জনজনে করিতে সংযত
যে হর উদাসীন, মগ্ন থাকেন হরি-ধ্যানে
সেই বীর নরবেশে এলেন ধরায় নামি
প্রাচ্য-প্রতীচ্যে করি বিচরণ
সাম্যরসে গাঁথিলেন দোঁহে।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র, ভারতের প্রাচীন সন্ন্যাস পরম্পরার প্রতীক দক্ষিণ ভারতের একজন শঙ্করাচার্য। একজন বাঙালী সন্ন্যাসীর ভাবের সংস্পর্শে এসে জীবন ও ধর্মের সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি লাভ করেন এবং তিনি সেই সন্ন্যাসি-প্রবর্তিত সেবাধর্মরূপী সন্ন্যাসীর অভিনব ধর্মকে স্বীকার করেন। সন্ন্যাসী বলছেন, আমাদের দরিদ্র ও পদদলিত হিন্দুভায়েরা যাঁরা উচ্চবর্গের স্নেহ ও সহানুভূতির অভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তাঁদের আবার প্রেম ও মমতা দিয়ে হিন্দু-সমাজে নিয়ে আসতে হবে। এটাই হলো নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, এসবই স্বামীজীরই কথা, তাঁরই ভাব।

ওয়ারেরকরের স্মৃতিকথাতে আমরা দেখেছি যে, তিনি যেদিন বেলুড় মঠে পৌঁছেছিলেন, সেদিন স্বামীজী সাঁওতালদের নারায়ণজ্ঞানে খাইয়েছিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' সেইদিনের স্বামীজীর কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। সেখানে আমরা দেখি স্বামীজী বলছেনঃ " 'পরহিতায় সর্বস্ব-অর্পণ'—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। ইচ্ছা হয়—মঠফঠ সব বিক্রি করে দিই, এইসব গরিব দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পারছে না। আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ...ওদেশে ধর্মপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি। ... এই দ্যাখ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে খ্রীস্টান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে।"[৪]

'সন্ন্যাসীর সংসার' নাটকে প্রায় এই কথাগুলিই ওয়ারেরকর শঙ্করাচার্যের মুখে বসিয়েছেন। অন্যত্র তিনি নিজেই লিখেছেন, আমার মূল কল্পনা ছিল যে স্বামী বিবেকানন্দ যদি শঙ্করাচার্য হতেন, তাহলে তিনি কি করতেন, কেমন দেখাতেন।

এখন মূল নাটক থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উপস্থিত করছি—(দক্ষিণ ভারতের সেই অঞ্চলে ভীষণ বন্যার প্রকোপ হয়েছে। মঠের একজন সদস্য সুব্রহ্মণ্যম এসে শঙ্করাচার্যকে এই সংবাদ

---

[৩] মাঝা নাটকী সংসার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫

[৪] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৩৫

দিয়ে প্রশ্ন করলেন।)

সুব্রহ্মণ্যম॥ তাহলে আজকে আমাদের কি করা উচিত?

শঙ্করাচার্য॥ যাও, বন্যায় ভেসে যাওয়া দরিদ্রদের বাঁচাও। যাও, ধনীদের কাছ থেকে পাদ্যপুজোর জন্য আমরা যে ধনসংগ্রহ করেছি, তা নিয়ে দরিদ্রদের অন্নদানে ব্যয় কর। শঙ্করাচার্যের সিন্দুককেও সন্ন্যাস দিয়ে দাও।

সুব্রহ্মণ্যম॥ সিন্দুক ফাঁকা করে দিলেও আমরা মিশনারীদের সামনে দাঁড়াতে পারব না।

শঙ্করাচার্য॥ তাহলে এককাজ কর, এই মুকুট বিক্রি কর। চমকে উঠছ কেন? নাও এই মুকুট বিক্রি কর। এই মূল্যবান বস্ত্র বিক্রি কর, (খুলে রেখে দিলেন) দেখ এখন আমি একটা কলেজের ছাত্রের মতো দেখাচ্ছি কিনা। এই রুপোর খড়ম বিক্রি করে দাও। সিংহাসন বেচে দাও, হাতি বেচে দাও, হাওদা বেচে দাও, ঘোড়াগুলিও বিক্রি করে দাও। শুধু এইটুকু কেন, পুজোর সোনা-রুপোর বাসন বিক্রি করে দাও। মন্দিরের সোনা-রুপোর প্রতিমা বিক্রি করে দাও, এখন থেকে পুজোয় শুধু এক বাণেশ্বর ও সারদাম্বার মূর্তি ছাড়া সোনার যেন একটা কণাও না থাকে, জরির একটা সুতোও যেন না থাকে। এতেও যদি টাকা কম পড়ে তাহলে এই বাড়ি ভেঙে এর প্রতিটি পাথর বিক্রি করে দাও। যখন বাইরে এত দরিদ্র ও বুভুক্ষু মানুষ মরছে তখন এই মার্বেল পাথর গলায় জড়িয়ে শঙ্করাচার্য কোন্ স্বর্গে যেতে পারেন?

নাটকের এই কথোপকথনের মধ্যে স্বামীজীরই ছায়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নাট্যকার তাঁর আত্মকথাতে লিখেছেনঃ "শঙ্করাচার্যের বৈভবত্যাগের পরের বেশভূষা বিবেকানন্দের অনুরূপ করার পরিকল্পনা করেছিলাম এবং তার জন্য আমি কলকাতায় গিয়ে বেলুড় মঠে স্বামীজীর যে পোশাক রাখা আছে তার মাপ নিয়ে বাঙালী দর্জিদের কাছে তৈরি করিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। সেই পোশাক আমার মনের মতো হয়েছিল।"৫

এই নাটকের শেষে আমরা দেখছি যে, শঙ্করাচার্য 'শঙ্কর মিশন'-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এই সংবাদ পেয়ে বোম্বাই-এর সব ধর্মের ধনী ব্যক্তিরা টেলিগ্রাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। শঙ্কর মঠের আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। সেখানকার সমস্ত ঐশ্বর্য বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। পুজোর আড়ম্বরের জায়গায় সরল অনাড়ম্বর নিরাকার ঈশ্বরের পুজো এবং সেবাধর্মের সূচনা হয়েছে। হাজার হাজার ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করে মঠে আবেদন জানিয়েছেন।

শঙ্করাচার্যের শেষ কথাঃ "দেবদত্ত, যদি আমি সংসারী হয়ে গিয়ে থাকতাম তাহলে আমি নিজের কুটুম্ববাৎসল্যের জন্য বিশ্বের এই অনন্ত বিস্তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম। কিন্তু দেখ আজ আমার সংসার কত বিরাট! আমার এই 'সন্ন্যাসীর সংসার' কি বিষয়ীদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থময় সংসারকে লজ্জা দেবে না?"

এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় বৃহস্পতিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বের ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে। ললিত কলাদর্শ নাটকমণ্ডলীর সদস্যরা অভিনয় করেন। লোকমান্য তিলক তখন বোম্বেতে ছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নাটক দেখতে এলেন। নাটকের কুশীলবেরা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্টেজে নামলেন। নাটকের তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবার আগে তিলকের একটি ছোট বক্তৃতা হয়। প্রায় দেড়শো-দুশোজন অতিথি এই প্রদর্শনী নাট্যাভিনয় দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তবুও প্রায় সাড়ে আটশ টাকার টিকিট বিক্রি হয়। এই সমস্ত টাকা লোকমান্য তিলকের হাত দিয়ে পুনার অনাথ বিদ্যার্থিগৃহ-কে দান করা হয়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রামকৃষ্ণ বুয়া যিনি স্বামীজীকে তাঁর সঙ্গীত-গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন, তিনি এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন।

---

৫ মাঝা নাটকী সংসার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর একটি গল্প

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

পৃথিবীর অনেক ঘটনা আছে গল্পের মতো। আজ যে-গল্পটি মনে পড়ছে, অনেকদিন থেকে সে-গল্পের কাহিনী মাথায় ঘুরছে। কিন্তু এতদিন পরে লিখতে লিখতে গল্পটি দুটি গল্পে পরিণত হয়ে গেছে। প্রথম গল্পটি শুনেছিলাম একদা উদ্বোধন-কার্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজীর কাছে। তখন তিনি 'উদ্বোধন' থেকে 'চেরাপুঞ্জী'তে কার্যভার নিয়ে গেছেন। কোন এক গরমের ছুটিতে তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে চেরাপুঞ্জীর উদ্দেশে রওনা হবার পথে দমদম এয়ারপোর্টের এক মধ্যবয়সী কর্মচারীর সঙ্গে দেখা। স্বামী নিরাময়ানন্দজী বললেন, "এই সেই ভদ্রলোক। আজ রাতে এঁর কোয়ার্টারেই আমরা থাকব।" ভদ্র বিনীত শান্তমূর্তি ভদ্রলোকটিকে দেখে আশ্বস্ত হলাম। কিছু লোকের সঙ্গে নিমেষে আত্মীয়তা হয়—তেমনি চেহারা।

সেবারের চেরাপুঞ্জী-যাত্রার প্রথম শুভচিহ্ন এই সরকারি আবাসনে রাতের অতিথি হওয়া থেকে শুরু হলো। বাসায় গিয়ে দেখলাম গৃহিণীও তেমনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী। বিশেষতঃ সন্ন্যাসি-অতিথিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোয় তাঁদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। রাতের খাবারের তালিকায় একরাশ মাছের রান্না দেখে পূজনীয় নিরাময়ানন্দজী বললেন, "একি? মা, সারাদিন কষ্ট করে এত রান্না করেছেন? এ আমি খাব না।" আমি অবশ্য রান্নার কষ্টের থেকে খাওয়ার আনন্দই বড়ো করে দেখলাম। কিন্তু কেন এ 'কষ্ট' করার কথা, সেকথা বুঝলাম পরে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বৈঠকখানা-ঘরে সমবেত হয়ে যখন বসলাম, তখন কথা উঠল দেওয়ালে টাঙানো স্বামীজীর ছবিটি নিয়ে। মহারাজ বললেন, "এই তো সেই ছেলের বাঁধানো স্বামীজীর ছবি—তাই না?" কর্তা-গৃহিণী মৌন থেকে মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানালেন। প্রথম দর্শনে সাধারণ ক্যালেণ্ডারের ছবির থেকে বেশি কিছু পার্থক্য ধরা পড়েনি। পুরো কাহিনী শোনার পর বোঝা গেল ব্যাপার।

কর্তা-গিন্নীর একমাত্র ছেলে। ইস্কুলে উপরের দিকে উঠছে ক্রমে। অনেক আশা-ভরসা তাকে নিয়ে। একদিন ছেলে একখানা ক্যালেণ্ডার নিয়ে এল বাড়িতে। তাতে ছাপা রয়েছে স্বামীজীর ছবি। তখন চারদিকে স্বামীজীর শতবার্ষিকীর আয়োজন চলেছে। ছেলেও শুনেছে সেকথা। নিজের মতো সে বুঝেছে স্বামীজীর আবির্ভাবের তাৎপর্য। তার বাবা-মাও জানেন স্বামীজীর কথা। কিন্তু ছেলে যেমনভাবে স্বামীজীর জন্য আগ্রহ বোধ করেছে, বাবা-মা তখনো এতটা স্বামীজীর অনুরাগী হননি। ছেলে বললে, "এই একটি লোক জন্মেছিল এ দেশে। ওঁকে কেউ এখনো চিনতে পারেনি। এই ছবিটি আমায় বাঁধিয়ে দাও।"

বাবা-মা সানন্দে ছবি বাঁধিয়ে দিলেন। ছেলে শুরু করল নানাভাবে স্বামীজী সম্বন্ধে পড়াশুনো। তার কাছে শুনতে শুনতে বাবা-মাও স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী হয়ে পড়লেন। স্বামীজী ছাড়া ছেলের মুখে আর কোন প্রসঙ্গ নেই। আদর্শবান, বুদ্ধিমান, পিতৃমাতৃভক্ত ছেলের প্রভাবে বাবা-মা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অভিষিক্ত হতে লাগলেন।

এমন সময় একদিন ছেলের শরীর খারাপ হলো। সামান্য অসুখ, ক্রমে দুঃসাধ্য হয়ে চিকিৎসার বাইরে চলে গেল। জীবনের সব থেকে বড় আশা ও আনন্দ হারিয়ে বাবা-মা এক শূন্যতার জগতে পড়ে রইলেন। ঘরের দেওয়ালে রইল সেই স্বামীজীর দৃপ্তভঙ্গির ছবি। ক্রমে ছেলের ফেলে-যাওয়া বইপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে স্বামীজীর বইগুলিই তাঁদের সান্ত্বনার অবলম্বন হয়ে উঠল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনালোকে তাঁরা যত অগ্রসর হতে লাগলেন, তত আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাবার জন্য কোন্ নিশ্চিত আশ্রয়ের

জন্য ব্যাকুল হলেন।

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ তখন স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। তিনি যখন এঁদের কথা শুনলেন, দীক্ষার জন্য এঁদের আর্তির কথা জানলেন, তখন বিশেষভাবে তাঁদের কাছে এনে অভয়মন্ত্র দিয়ে ধন্য করলেন। সেই থেকে স্বামীর কাজ হলো শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবা। নানাভাবে সেই সেবাব্রতে স্বামীকে স্ত্রী সাহায্য করে চলেছেন। আজ তাঁদের ছেলে এ-জগতে নেই। কিন্তু সঙ্ঘের একাধিক সন্ন্যাসি-সন্তান পুত্রহীনার 'মা'-ডাক শোনার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছেন।

চেরাপুঞ্জীর জন্য প্লেন আকাশে উঠল। আমি মনে মনে এক স্বর্গলোক থেকে আর এক স্বর্গলোকে যাবার জন্য তৈরি হলাম।

গল্পটির উপসংহার অনেকদিন পরের আর এক গল্পে। এই দম্পতিরই একমাত্র কন্যা আমেরিকায় স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন। অর্থ, সম্মান, সৌভাগ্য—সবই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পুত্রহারাদের অবলম্বন সেই কন্যা এবং তার সন্তানরা। সন্তানদের নিয়ে নিজের গাড়িতে সেই মেয়ে রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে বিরাটকায় এক লরির তলায় গাড়িসহ পিষ্ট হয়ে গেলেন। মায়ের সঙ্গে সন্তানেরাও পরপারে চলে গেল। খবর পৌঁছাল কলকাতায়। একটু দূরে মফস্বল শহরে সেই পুত্রহারা দম্পতিকে যাঁরা খবর দিতে এলেন, তাঁরা সঙ্গে ডাক্তার এনেছিলেন, পাছে সংবাদ শোনার পর ওষুধপত্রের দরকার হয়। কিন্তু যে অভয়মন্ত্র তাঁরা পেয়েছেন, তারই বলে এই দুর্জয় শোক তাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। আজও মানবকল্যাণের সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা সেবায়, সাধনায় নিজেদের মধ্যে ডুবে আছেন। এমন দুঃখ আছে যা অমৃতের সন্ধান দেয়।

এ-দুটি গল্পেরই মূলে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর প্রেরণা। আর, গল্পদুটি গল্প নয়।

সুখ বা দুঃখের আশা-আশঙ্কায় কম্পমান মানবজীবনে আমরা কত সামান্য কারণে বিচলিত হয়ে থাকি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সব বেদনাকে এমন নীরব স্বীকৃতি দিয়ে জীবন-সাধনায় অবিচলিত থাকা—কবির ভাষায় 'লাখে না মিলয়ে এক।'

প্রবন্ধ

দীন-ই-ইলাহী ও ব্রাহ্মধর্ম : আকবর ও রামমোহন

সুমণি মিত্র

॥ ১ ॥

আমাদের দেশে প্রগতিপন্থীদের প্রগল্‌ভ পাশ্চাত্যপ্রিয়তা ও প্রাচীনপন্থীদের মর্মান্তিক ধর্মান্ধতা যখন চরমে, সেই দুর্যোগে রাজা রামমোহন রায় তাঁর সুশাণিত বুদ্ধির কাঁচি দিয়ে এই দুই বিরুদ্ধ আদর্শকে কেটে-ছেঁটে সাময়িক কাজ চালানোর মতো একটা সমন্বয়ী-ধর্ম খাড়া করলেন। এটা, আজ বুঝেছি, সমন্বয় নয়—সার সঙ্কলন—যা অসার হতে বাধ্য। আর সঙ্কলনধর্মী ধর্ম বোধহয় ধর্মও নয়—অন্য কিছু—যেমন ফুলের তোড়া ফুলগাছ নয়। আপাতচটকদার হলেও দুদিনেই শুকিয়ে যায়, অফুরন্ত সম্ভাবনার উৎস হতে পারে না। একজাতীয়করণের উদ্দেশ্যে এই যে সঙ্কলন—তার মূলধন হচ্ছে 'মেধা'। সমন্বয়ের মূলধন কিন্তু 'বোধি'। বুদ্ধি বা মেধা নিজেই শৃঙ্খলিত বলে তার কাজই হচ্ছে বড়কে ছোট করা এবং নতুন ধর্মসৃষ্টির পেছনে ধর্মবুদ্ধি নয়—ক্ষুদ্রতর কোন উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। নিম্নতর লক্ষ্যের কাছে মহত্তর কিছুর আশা করা চলে না। এসব ধারণা আমাদেরও ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ না এলে আমরাও 'সঙ্কলীকরণ'কেই 'সমন্বয়' বলে হৈহৈ করতাম—অ-জীবন্তকেই জীবন্ত বলে ঘরে তুলতাম। 'সমাজের সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার' না করে, তার বিশেষ কোন একটি অঙ্গের পুষ্টিসাধন যে সমন্বয় নয়—এটা আজ বুঝেছি। তাই প্রয়োজন হয়েছিল সমন্বয়পন্থী এক বলিষ্ঠতর নেতৃত্বের। কিন্তু সেকথা পরে।

রামমোহনপন্থীরা যাই বলুন, রামমোহনের 'ধর্মসংস্কারে'র পেছনে 'সমাজসংস্কারে'র উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রচ্ছন্ন কেন—প্রকটই। রামমোহন নিজেই তা স্বীকার করেছেন। "রাষ্ট্রনৈতিক সুখ-সুবিধে" আদায়ের জন্যেই তাঁর 'ব্রাহ্মধর্মে'র পরিকল্পনা।

আশ্চর্য! আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী'র পরিকল্পনাও ঐ একই উদ্দেশে—রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থেই। সে-হিসেবে আমি যদি রামমোহনকে আকবরী মনোভাবের আধুনিক প্রতিনিধি বলি, তাহলে বোধহয় মিথ্যে কথা বলা হবে না। আমার মতে 'ধর্মসংস্কারে' রামমোহন সজ্ঞানে আকবরকে অনুসরণ করেছেন, অথচ আকবরের নামগন্ধও করেননি। এবং আরও পরিতাপের বিষয়, এ-পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক এ-ব্যাপারে আলোকপাত করা দূরে থাক—বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশও করেননি।

আকবর প্রবর্তিত 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মের পিছনে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলঃ "It might be that Akbar's political aim of establishing an All-India Moghul Empire had some influence on his religious policy, as political factors largely influenced the religious settlement of his English contemporary Queen Elizabeth."[১] ("সর্বভারতীয় মোগল সাম্রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ আকবরের ধর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছিল, যেমন তাঁরই সমকালীন ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের ধর্মসংস্কার রাজনৈতিক কারণেই প্রভাবিত হয়েছিল।") তিন খণ্ডের এই বহুবিখ্যাত গ্রন্থের তিনজন রচয়িতা—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত। তিনজনই এযুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। সুতরাং এঁদের কথা উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। আবার সবটাই গোগ্রাসে গিলে ফেলাও চলবে না। চলবে না, এঁদের সংশয়িত মন্তব্যের জন্যেই।

সাড়ে তিনশো বছর আগে আকবর যে-উদ্দেশ্যে যে-ধরনের ধর্মসংস্কার করতে চেয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক রানী এলিজাবেথের পদ্ধতিতে, আশ্চর্য, রামমোহনেরও ঐ একই উদ্দেশ্য—একই পদ্ধতি! তাই মনে হয়, 'জবরদস্ত্ মৌলবী' আকবর 'দীন-ই-ইলাহী'র (পরমেশ্বরের ধর্ম) দলিল-পত্র সামনে রেখেই ধর্মসংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। যদি বলি, 'ব্রাহ্মধর্ম' 'দীন-ই-ইলাহী'র জলছবি, তাহলে বোধহয় আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না। আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' ও রামমোহনের 'ব্রাহ্মধর্মের' নথিপত্র পাশাপাশি রাখলেই এর পরিচয় পাওয়া যাবে। অথচ 'ব্রাহ্মধর্ম' সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে—এই অনুকরণ বা অনুসরণের ব্যাপারে কেউ কোন আভাস দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। এমনকি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যিনি ঐতিহাসিক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের তোয়াক্কা করেন না এবং রামমোহনের একজন নির্ভীক সমালোচক, তিনিও তাঁর সুবিখ্যাত 'Renascent India' এবং 'On Rammohan Roy' গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে মৌন। তিনি রামমোহনের 'ব্রাহ্মধর্ম'কে 'tiny plant' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা যে একটা প্রাক্তন-প্ল্যান্টের শাখা—এরকম কোন আভাস দেননি। অথচ 'মিডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়া'র ওপরে তাঁর দাপটের কথা আমরা সবাই জানি।

মতে—"Din-i-Ilahi was a new religion compounded, taken partly from Koran, partly from the scriptures of the Brahmans, and to a certain extent, as far as suited to his purpose, from the Gospel of Christ."[২] (দীন-ই-ইলাহী একটা নতুন পাঁচমিশালী ধর্ম যার কতক কোরান, কতক

---

[১] An Advanced History of India—R. C. Mazumdar, H. C. Roychaudhuri & K. K. Dutta, MacMillan & Co. Ltd., London, Pt. II, 2nd ed. 1951, p. 458.

[২] Ibid, p. 459.

ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র এবং কার্যসিদ্ধির জন্যে পছন্দমাফিক কিছু অংশ খ্রীস্টের বাণী থেকে নেওয়া) রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মও তাই এইরকমই পাঁচমিশালী ধর্ম এবং তারও উপাদান নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে যথাক্রমে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীস্টানশাস্ত্র থেকেই নেওয়া। কেশবচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন: "He went through the Hindu, Mohammedan and Christian Scriptures ... and set forth the unity of God."৩ তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টানশাস্ত্রাদি পড়েছিলেন এবং ঈশ্বরের একত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

সিংহাসনে বসার পঁচিশ বছর পরে আকবর দেশের গণ্যমান্য লোকেদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন। এস. ওয়াজেদ আলি লিখেছেন: "সেখানে আকবর ধর্ম নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে বিদ্বেষ এবং বিভেদ জাতীয়-জীবনকে বিষাক্ত করে রেখেছিল, তার উল্লেখ করে দায়িত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য সাধন করা।... আমাদের প্রবর্তিত পন্থার মধ্যে সব ধর্মেরই সার থাকবে, অথচ সবই বিরাটতর এক ঐক্যের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে; প্রত্যেক ধর্মের যা-কিছু সাময়িক অথবা সীমাবদ্ধ, তাকে বর্জন করা হবে। এই পন্থা অবলম্বন করে **সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি আনয়ন করব—রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করব**।"৪ (উদ্ধৃতিসমূহে (স্থূলাক্ষর/বক্রলিপি প্রবন্ধ-লেখকের)

এরপরে আমরা 'Advanced History of India'-র 'It might be' ও 'some influence' কথাটা নিশ্চয়ই বাদ দিতে পারি।

এর সাড়ে তিনশো বছর পরে, ১৮ জানুয়ারি, ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে রামমোহনের বহুবিখ্যাত মন্তব্য: "I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling. ... It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least *for their political advantage and social comfort*."৫ (প্রচলিত হিন্দুধর্ম রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী। বিশেষতঃ জাতিভেদ-প্রথা, অসংখ্য শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দুদের দেশপ্রেম থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছে। তাই আমি মনে করি, তাদের ধর্মে কিছু পরিবর্তন দরকার—অন্ততঃ **তাদের রাজনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সুখ-সুবিধের স্বার্থেই**।)

অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেন, রামমোহন "যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে-মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনায় নয়।"৬ যেখানে স্বয়ং রামমোহন বলছেন "রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনের জন্যেই" তাঁর ধর্মসংস্কার, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মতামত গ্রহণযোগ্য কি? এইভাবেই কি তিলে তিলে 'রামমোহন মীথ' (Rammohan Myth) গড়ে উঠেছে?৭

যে যাই বলুন, আকবরের মতোই রামমোহনের 'ধর্মসংস্কারের'র মূল উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার এবং তা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যেই। 'ব্রাহ্মসমাজে' কিভাবে উপাসনা করা হবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে রামমোহন যে সুবিখ্যাত ট্রাস্ট ডীড তৈরি করেন, তাতে আকবরের সঙ্কলনধর্মী 'একেশ্বরবাদে'র আদর্শই প্রতিবিম্বিত। রামমোহন তাতে লিখেছেন: "প্রথম কথা, উপাস্য কে? ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা,

---

৩ Indian Mirror, 1 July, 1865.

৪ আকবরের রাষ্ট্রশাধনা—এস. ওয়াজেদ আলি, ১ম সংস্করণ, পৃ: ১২৫-১২৬

৫ রামমোহন রচনাবলী, ১ম সংস্করণ, (১৯৭৩), পৃ: ৪৬২

৬ চারিত্রপূজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৯৬৪), পৃ: ৪৬৩

৭ এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদারের On Rammohan Roy, (1972), p. 19-49 দ্রষ্টব্য

অনাদি, অনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় **পরমেশ্বরই উপাস্য।** কিন্তু **কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাহার উপাসনা হইতে পারিবে না।** দ্বিতীয় কথা, উপাসক কে? যেকোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহার জন্য উপাসনার দ্বার উন্মুক্ত। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ, এ-সকলের কিছুই বিচার নাই। যেকোন সম্প্রদায়, যেকোন ধর্ম, যেকোন অবস্থার লোকই হউন না কেন, এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে সকলের সমান অধিকার। তৃতীয় কথা, উপাসনা-প্রণালী কি? **কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি ব্যবহৃত হইবে না।** কোন প্রাণিহিংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার, পান হইবে না। ... যেকোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায়ের উপাস্য, এখানকার বক্তৃতা বা সঙ্গীতে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণার সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। এ-সকল অ-ভাবপক্ষে। ভাবপক্ষে এই যে, যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।”[৮]

॥ ২ ॥

এইবার ‘দীন-ই-ইলাহী’র নিয়মাবলীর উল্লেখ করা দরকার।

“দীন-ই-ইলাহী অর্থাৎ ‘পরমেশ্বরের ধর্ম’। এই ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে **ঈশ্বরের একত্ব।** এ-আদর্শ তিনি ইসলাম থেকেই গ্রহণ করেছেন। পন্থার ক্রিয়াকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি কতক হিন্দুধর্ম থেকে, কতক পারসিক ধর্ম থেকে, কতক জৈন ধর্ম থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। যে-ব্যক্তি এ-ধর্ম পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবে তাকে ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করতে হবে, আর... নিজস্ব আনুষ্ঠানিক ধর্মত্যাগ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। শিষ্যপদপ্রার্থীকে একটি ‘একরার নামা’ বা ‘অঙ্গীকার-পত্রে’ স্বাক্ষর করতে হতো, তাতে লেখা থাকত—‘আমি অমুক, অমুকের পুত্র, ... স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক ও গতানুগতিক রূপ, যা পিতামহদের আমল থেকে চলে আসছে, আজ ত্যাগ করলুম এবং আকবর শাহের প্রবর্তিত ‘দীন-ই-ইলাহী’ গ্রহণ করলুম’।”[৯]

‘ব্রাহ্মধর্মে’ও ঐ ‘একরার নামা’ বা ‘অঙ্গীকার-পত্র’ হয়েছিল—মহর্ষির আমলে।

“...যখন ‘সমাজে’ লোকের সমাগম, তখন মনে হইল যে, লোক বাছা আবশ্যক ... কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, **যাহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ** হইবে, তাঁহারাই ‘ব্রাহ্ম’ হইবেন। ... যাহাতে পৌত্তলিকতার পরিবর্তে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হয়, আমি তাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের একটি ‘প্রতিজ্ঞাপত্র’ রচনা করিয়াছিলাম।”[১০]

স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দও ঐরকম ‘প্রতিজ্ঞাপত্রে’ স্বাক্ষর-করা ‘ব্রাহ্ম’ ছিলেন। রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: “সেই বিশ্বজনীন ধর্মকে জীবনে পরিণত করিবার জন্য তিনি (রামমোহন) ‘ব্রাহ্ম-সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। **এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনাই উক্ত সমাজের উদ্দেশ্য।** বেদ, বাইবেল ও কোরানের যাহা সাধারণ মত,

---

[৮] মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫ম সংস্করণ, (১৯২৮), পৃঃ ৩০৯-৩১০। মূল ইংরেজী রচনার জন্য রামমোহন রচনাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৫০৬ এবং Biography of a New Faith, Prasanta Kumar Sen, Vol. I, 1933, Appendix VI, ‘pp. 383-384 দ্রষ্টব্য

[৯] আকবরের রাষ্ট্রসাধনা, পৃঃ ১২৬

[১০] আত্মজীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩য় সংস্করণ, (১৯২৭), পৃঃ ৮২-৮৩

অসাম্প্রদায়িক মত, তাহাই 'ব্রাহ্মসমাজে'র মত। সমাজের 'ট্রাস্ট ডীড' পত্রে, রাজা সেই সাধারণ অসাম্প্রদায়িক মত সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া গিয়াছেন।"[১১] এ-ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে রামমোহনের কোন মতানৈক্য নেই। কেশবচন্দ্র 'ব্রাহ্মসমাজ' সম্বন্ধে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই 'Indian Mirror'-এ যা লিখেছিলেন, তার সারমর্ম একই: "রামমোহন অক্লান্ত অধ্যবসায়-এর সঙ্গে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীস্টানশাস্ত্র মন্থন করে ঈশ্বরের একত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং অসাধারণ দক্ষতায় বহুদেবতাবাদ খণ্ডন করেন।'

॥ ৩ ॥

রামমোহনের জীবনে ইসলামধর্মের প্রভাব সর্বজনবিদিত। তাঁর 'একেশ্বরবাদ' যে মূলতঃ ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিপুষ্ট একথা রামমোহন-অনুগামী বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রীও স্বীকার করেছেন। বাল্যকাল থেকেই রামমোহন নিরঙ্কুশ 'একেশ্বরবাদে'র দ্বারা প্রভাবিত। প্রথম জীবনে 'তুহফাতুল মওয়াহিদ্দীন'-এ (যার ভূমিকা আরবীতে লেখা) 'একেশ্বরবাদ' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি 'কোরান' থেকে প্রচুর বিবৃতি উদ্ধার করেন। তাঁর সমাজ-উন্নয়নের পরিকল্পনা যে যথাক্রমে কোরান, মহম্মদের জীবনী, মোতাজেলা দর্শন ও সুফী-সাহিত্য থেকে নেওয়া—এ-ব্যাপারে মতদ্বৈধ নেই। তাই মুসলমানরা আজও তাঁকে 'জবরদস্ত্ মৌলবী' বলে গর্ববোধ করেন। মনস্বিনী লেখিকা বেগম শাম-সুন-নাহারের মতে "রামমোহনের প্রতীক-উপাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ... ইত্যাদি বিষয়ের জন্যে তিনি ইসলামের কাছেই সবচেয়ে ঋণী।"[১২] মিস সোফিয়া ডবসন কোলেট লিখছেন—"তিনি (রামমোহন) কখনোই মহম্মদের পক্ষে বলার সুযোগ ছাড়তেন না। মহম্মদের একটি জীবনী লিখতেও শুরু করেছিলেন, যদিও শেষ করে যেতে পারেননি।"[১৩] ঐ প্রসঙ্গেই অ্যাবে গ্রেগরি লিখছেন: "রামমোহন আরবী ন্যায়শাস্ত্রকে সর্বোত্তম বলে মনে করতেন এবং তার সাহায্যেই নিজের জীবন গড়ে তুলেছিলেন"[১৪] ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলছেন: "এই 'জবরদস্ত্ মৌলবী' কোরান, মুসলিম আইন ও আইনের বিজ্ঞান, তেষট্টি রকম মুসলিম মতবাদের বিতর্কমূলক ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, বুদ্ধিবাদী ও একেশ্বরবাদী মুসলিমদের স্বাধীন চিন্তা ও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি (যথাক্রমে অষ্টম শতকের 'মোতাজেলা' ও 'মওয়াহিদ্দীন') রাজার মানসিক বিকাশে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এবং তাঁর প্রথম দিককার কিছু কিছু 'একেশ্বরবাদ' ও মূর্তি-পূজাবিরোধী রচনা ফারসীতে লেখা।"[১৫]

এ-প্রসঙ্গে এতটা বিশদ আলোচনা করলাম এই কারণে যে, মুসলমান-শাস্ত্রজ্ঞ ও মুসলিম পারঙ্গম রামমোহন মোগল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ আবুল ফজলের বহুবিখ্যাত 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' কিংবা ইয়ানেতুল্লা ও সিরহিন্দির 'আকবর-নামা' পড়েননি—এটা মেনেনেওয়া শক্ত! অর্থাৎ আকবরের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে 'জবরদস্ত্ মৌলবী' রামমোহন একেবারে অজ্ঞ ছিলেন এটা ভাবাটাই অজ্ঞতা। ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত রচনায় তিনি যেমন এব্যাপারে তাঁর অগ্রগামী আকবর ও তাঁর 'দীন-ই-ইলাহী'র নাম উল্লেখ করেননি, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে 'বাল্য-বিবাহ', 'সতীদাহ'-প্রথা রদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রনায়ক আকবরের নাম অনুচ্চারিত।

॥ ৪ ॥

বহুদিক থেকে আকবরের সঙ্গে রামমোহনের মিল আছে। দুজনেই অসাধারণ শারীরিক ও

---

[১১] মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পৃঃ ৬২৬

[১২] Rammohan Centenary Commemoration Volume (1933), Pt. II, Sec. C, p. 280.

[১৩] Ibid. Sec. B, p. 162. [১৪] Ibid. [১৫] Ibid.

মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। আকবর নিরক্ষর হলেও ছিলেন "intelligent to an uncommon degree,"১৬ রামমোহনও ছিলেন "জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত।"১৭ তবে রামমোহন আকবরের মতো নিরক্ষর ছিলেন না, ছিলেন দশটি ভাষায় সুপণ্ডিত। আকবর একেশ্বরবাদী 'দীন-ই-ইলাহী'র প্রবর্তক, রামমোহন একেশ্বরবাদী 'ব্রাহ্মধর্মের' প্রবর্তক। দুজনেই নতুন ধর্মের প্রবর্তক হয়েও বলপূর্বক কাউকে ধর্মান্তরিত করেননি। আকবরের জীবিতকালে 'দীন-ই-ইলাহী'র সভ্যসংখ্যা আঠারো জনের বেশি ছিল না, রামমোহনের জীবিতকালে তাঁর মতবাদে বিশ্বাসীর সংখ্যাও ছিল প্রায় তা-ই, কিছু বেশি। দুজনেই জাতিভেদ-প্রথা, বাল্য-বিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার বিরোধী। দুজনেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য আনার জন্য সুপ্রচলিত ধর্মের সার-সংকলন করে এক 'সর্বজনীন ধর্মের' প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন আকবরের মতো 'ধর্মসভাগৃহ' (ইবাদৎখানা) প্রতিষ্ঠা করে তাঁরই মতো নিয়মিত ধর্মালোচনায় যোগদান করতেন। আকবর যেমন ছিলেন "most modest among men,"১৮ রামমোহন রায়ও "অত্যন্ত বিনীত ছিলেন।...তাঁহার ন্যায় সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই।"১৯ আবার, আকবর ও রামমোহন-দুজনেই স্বধর্ম ত্যাগ করে নিজেদের প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করেননি। আকবর কখনো কোরানের মাহাত্ম্য বা গুরুত্ব অস্বীকার করেননি, অস্বীকার করেননি কোরানের অভ্রান্ততার অনুশাসনও ঃ "He (Akbar) never denied the authority of the Koran, not even in the so-called Infallibility Decree".২০ রামমোহনও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হিন্দু ছিলেন, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করতেন এবং "তাঁহার মৃত শরীরে যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল।"২১

হিন্দুধর্ম যেমন বৌদ্ধধর্মের কাছে ঋণী, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের কাছেও ঋণী। পশ্চিম থেকে যখন নাস্তিকতা ও বিজাতীয় ধর্মের প্রবল তরঙ্গ আমাদের ধর্মবুদ্ধিকে তছনছ করে দিচ্ছিল, সেই সময় রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে আমাদের পাশ্চাত্য মোহকে রোধ করেছিলেন বেদান্তের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর 'ব্রাহ্মসমাজ' ধর্মের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনকে যুক্ত করে আমাদের জাতির চরিত্রকে ভদ্র, সভ্য, শান্ত ও সংযত করেছিল। ব্রাহ্মসমাজই শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ-ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধদের উপহার দিয়েছিল। শিযোক্ত ভক্তেরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের হৃদয়-ক্ষেত্রকে বীজ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করেই দিয়েছিলেন। এবং সেই কারণে ব্রাহ্মসমাজ-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব। আবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ব্রাহ্মধর্মের অপসৃতি।

॥ ৫ ॥

কেন অপসৃতি? একটি প্রধান কারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত 'নব-বেদান্ত।' ইতিহাসই তা বলছে। স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ "The Brahmo Samaj spread in Calcutta for a certain time and then died out. It has done its work—viz social reform. If (Pratapchandra) Mozumder thinks I was one of the causes of its death he errs. I am even now a great sympathiser of its

---

১৬ An Advanced History of India, Pt. II, p. 458.

১৭ চারিত্রপূজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৯৬৪), পৃঃ ৬৪

১৮ An Advanced History of India, Pt. II, p. 458.

১৯ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পৃঃ ৭৩০ ও ৭৩৩

২০ An Advanced History of India, Pt. II, p. 460.

২১ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পৃঃ ৪৯৩

reforms—but the 'booby' religion could not hold its own against the old vedanta, what shall I do?"[২২] (ব্রাহ্মসমাজ কিছুকালের জন্যে কলকাতায় ছড়িয়েছিল—তারপরই অপসৃত হয়ে গেল। তার যে ভূমিকা সে তা পালন করেছে—সমাজ-সংস্কার। যদি [প্রতাপচন্দ্র] মজুমদার মনে করেন, আমি ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যুর অন্যতম কারণ—তাহলে তিনি ভুল করবেন। আমি এখনো তার সংস্কারকার্যের পক্ষপাতী। কিন্তু ঐ দুর্বল ধর্ম প্রাচীন বেদান্তের কাছে দাঁড়াতেই পারল না—আমি কি করতে পারি?)

আকবর ও রামমোহন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সাকারবাদীদের যদি ছাতা-জুতো-লাঠির সঙ্গে পকেট থেকে গুরু ও ইষ্টের ফটো, জপের ঝুলি-মালা ইত্যাদি দরোয়ানের কাছে জমা দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়, তাহলে পরমত-অসহিষ্ণু এই নিদারুণ অনুদার অনুগ্রহ ঘটা করে ঢাক পিটিয়ে রটাবার কি দরকার? আকবরের হুকুম—"নিজের আনুষ্ঠানিক ধর্মত্যাগ করে ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করতে হবে।" রামমোহনের ঐ একই ফতোয়া—"ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা অনাদি অনন্ত অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই উপাস্য—কোন রকম সাম্প্রদায়িক নামে তাঁর উপাসনা হইতে পারিবে না।" প্রতীক ও মূর্তির মাধ্যমে উপাসনাকে সরাসরি অর্ধচন্দ্র দিয়ে কোনদিন 'বিশ্বজনীন ধর্মে'র উদ্ভব কি সম্ভব? পরমতকে অস্বীকার করে 'পরমত-সহিষ্ণুতা'? ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাই আকবরের দীন-ই-ইলাহীকে দম্ভ ও স্বৈরাচারিতার পরিণতি বলেছেন।[২৩] আকবর অভিনব ধর্ম-প্রতিষ্ঠার মোহে যে ভুলটি করেছিলেন, তাঁর সাড়ে তিনশো বছর পরে এসেও রামমোহন সেই একই ভুল করে বসলেন—ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলেন না! আসলে 'বুদ্ধির' সমন্বয়ে এইসব গোলমেলে ব্যাপার থাকবেই। বুদ্ধি সমন্বয়ের আদর্শে আমাদের প্রলুব্ধ করে ঠিকই, কিন্তু তার নিজের মধ্যেই এমন একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব থাকে—যা নিজেই নিজের সিদ্ধান্তকে বিনাশ করে। 'সমন্বয়' বুদ্ধির এলাকার বাইরে। বুদ্ধির ওপরে বা ওপারে যেতে না পারলে সমন্বয় হয় না—সমন্বয়ের অভিনয় হতে পারে। সেই কারণেই দীন-ই-ইলাহীর দ্বারা "বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য-সাধন করা সম্ভব হয়নি", ব্রাহ্মধর্মের পক্ষেও সম্ভব হয়নি "সকল ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত" করার প্রয়াস।

॥ ৬ ॥

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি কি করলেন? তাঁর বাণী—'যত মত তত পথ'। তিনি বললেন ল্যাজা-মুড়ো-বাদ দেওয়া সমন্বয় সমন্বয়ই নয়। তাই আকবর ও রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথমেই মতের অমিল এই সার-সঙ্কলনের ব্যাপারে। তাঁর মতে, প্রচলিত ধর্মের পছন্দমাফিক অংশ কেটে নিয়ে আহার্য প্রস্তুত করলে তা সুস্বাদু হয় না—অনেকের পরিপাকেরও হয় পরিপন্থী। তাতে যে ধর্মের উদ্ভব হয়, সেও চলেফিরে বেড়াতে পারে না—সব কাটা অংশ জোড়া লাগানো যে! দ্বিতীয় মতানৈক্য—ধর্মের সারতত্ত্ব নিয়ে। প্রতিটি ধর্মের সারাংশটা তার কোন অংশে থাকে? ওপরে, নিচে, সামনে, পাশে, না পেছনে? তত্ত্বের গর্তে, না আচার-অনুষ্ঠানের খোলা উঠোনে? বিধি-নিষেধের আগাছায়, না বিধিবহির্ভূত অমূর্তে—ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে? সংক্ষেপে, শ্রীরামকৃষ্ণের সত্য যাবতীয় ধর্মের সর্বাঙ্গে জড়ানো—কড়ে আঙুলেও। অতএব প্রতিটি ধর্মের সর্বাংশ গ্রহণ করলেই তার মর্ম বা সার বেরিয়ে আসবে।

সংক্ষেপে, শ্রীরামকৃষ্ণের সার-তত্ত্বে অসার বলে কোন তত্ত্বই নেই। তাই সার-সঙ্কলনে তাঁর প্রবল অরুচি। তাই তাঁর সমন্বয়ের বাণীর আজ জগতে এত চাহিদা, এত সমাদর।

---

[২২] Swami Vivekananda in America : New Discoveries—Marie Louise Burke, 1st ed., p. 407.

[২৩] An Advanced History of India, Pt. II, p. 459.

রামপ্রসাদের গানে আর্থসামাজিক ভাবনা

তাপস বসু

॥ ১ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্যে যে ধারাটি সংযোজিত হয় তা হলো শাক্ত পদাবলী। বাঙালী-চিত্তে বহুকাল ধরে যে শাক্ত ভাব ও ভাবনা প্রবাহিত হয়েছে তারই বাণীরূপ এই শাক্ত-পদাবলী। উৎস ও আঙ্গিকের দিক থেকে শাক্ত পদাবলী বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর মধ্যে বাঙালী হৃদয়ের বাঙালী সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে আমরা এমনটি লক্ষ্য করি না। তাই বৈষ্ণব পদাবলী 'বৈকুণ্ঠের গান'-রূপে চিহ্নিত হয়েছে আর শাক্ত পদাবলী হয়েছে 'সমাজের গানরূপে'। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপর্যস্ত সমাজের ছবি এই শাক্ত প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু শতাব্দীজোড়া ভাঙনের ছবিই তফালত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে এই ভাঙনজনিত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ, কৃষিজীবী মানুষ বরাভয়দাত্রী, আদ্যাশক্তি, অশুভনাশিনী দেবীর কাছে তাদের ক্ষোভ-দুঃখ-বেদনার অকুণ্ঠ প্রকাশ করে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে চেয়েছে। সুতরাং সেই ক্ষোভ, দুঃখ এবং উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা শাক্ত পদাবলীতে

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু মানুষ শাক্ত পদ রচনা করেছেন। শাক্ত পদ রচনায় কোন বিধি-নিষেধ না থাকায় হৃদয়ের গভীর আর্তি দেবীর কাছে পৌঁছে দিতে সমাজের নানা স্তরের মানুষ শাক্ত পদ রচনায় এগিয়ে এসেছেন। শাক্ত পদাবলীর প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদ সেন ১৭২০-২১ খ্রীস্টাব্দে হালিশহরে (তৎকালীন কাঞ্চনপল্লী, কুমারহট্ট) জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যবংশোদ্ভূত রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ খুব প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। রামপ্রসাদের শৈশব, কৈশোরের দিনগুলি কেটেছিল প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে। যৌবনে কলকাতার এক জমিদারের বাড়িতে মুহুরির কাজ করতেন তিনি। এই কাজ করার সময়েই তিনি হিসাবের খাতায় তাঁর বিখ্যাত 'আমায় দাও মা তবিলদারি' গানটি লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন সাধক কবি। বহু শাক্ত সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন এবং সুরারোপে তা গেয়েছেন। আজ সেই গানগুলিই রামপ্রসাদী গানরূপে চিহ্নিত। উত্তরকালে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তবুও দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী ১৭৮১-তে তিনি দেহরক্ষা করেন।

রামপ্রসাদ সেনের গানগুলিতে শাক্ত তত্ত্ব যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপর্যস্ত কৃষিজীবনের ছবিও হয়েছে বিশেষভাবে। রামপ্রসাদ ছিলেন কৃষিনির্ভর গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে যুক্ত। তাই তিনি কৃষিকাজে অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকজীবন, পাশাপাশি কৃষকশোষণের ফলে ফুলে-ফেঁপে ওঠা অভিজাত মানুষজনের নিটোল ছবি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভা রামপ্রসাদের ছিল না, ছিল সহজ, সরল চিত্তে দুঃখের প্রতপ্ততাকে অনুভব করা ও তা প্রকাশ করার ক্ষমতা। ভারতচন্দ্রের মতো তিনিও ফারসী-সংস্কৃত যুগে-পরিবেশেই মানুষ। তবে রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃতাশ্রয়ী যে-সাধনা ও ঐতিহ্য সক্রিয় তা স্বভাবতই সমকালীন কবি ভারতচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র। রামপ্রসাদের জীবনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃত শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব ও প্রভুত্ব ভারতচন্দ্রের মতো ছিল না ; ছিল না নাগরিক ও রাজকীয় পরিবেশ। কোন বৈষয়িক উচ্চাশা ও অর্থসমৃদ্ধ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। তাই মহাজনের হিসেবের খাতায় টাকা-কড়ি জমা-খরচ লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে দিনের পর দিন কেবল 'কালী', 'তারা'র নামই লিপিবদ্ধ করেছেন। জমিদারের তবিলদারিতে নিযুক্ত হয়েও সব সময় সেই জগজ্জননী মায়ের তবিলদারির জন্যই তিনি ছিলেন ব্যাকুল।

॥ ২ ॥

রামপ্রসাদ প্রথম যৌবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিপর্যস্ত কৃষিজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন গভীরভাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ-অর্থনীতির পট পরিবর্তন, বিপর্যস্ত কৃষিজীবনের ছবিটি ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণগুলি আমরা ইতিহাসের নিরিখে পরখ করতে পারি।

১. আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে (১৭০৭ খ্রীঃ) কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্যে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন।

২. কেন্দ্রীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং শাসনকার্যে বেপরোয়া মনোভাব।

৩. প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, দরবারী চক্রান্ত, আত্মকলহ ও বিলাসপরায়ণতায় আচ্ছন্নতা।

৪. রাষ্ট্রশক্তির শিথিলতায় ইংরেজ বণিকশক্তির প্রভাব বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।

৫. মারাঠা উপদ্রব বা বর্গীদের ক্রমাগত অত্যাচার।

৬. অত্যাচারী সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি।

৭. সামগ্রিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশের নানাস্থানে দেশী-বিদেশী দস্যু ও তস্করদের অত্যাচার।

অত্যাচারী সামন্ত শাসকদের বেহিসেবী প্রজা শোষণ ও অত্যাচারের ফলে সমাজ-অর্থনীতির ছবিটি করুণ হয়ে উঠেছিল। সেই ছবিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য কবিদের সঙ্গে রামপ্রসাদ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং গানে-কবিতায় তা তুলে ধরেছেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্ববর্তী শাসক মীরজুমলার সময়ে স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের দমন করার জন্য ও রাজস্ব আদায়ের একটা নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কৃষকদের তাতে কোন উপকার হয়নি। কৃষকদের যাবতীয় জমি 'খালসা' জমি অর্থাৎ রাষ্ট্রের জমি বলে ঘোষণা করে সেই জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছিল ইজারাদারদের উপর। ইজারাদাররা মোটা টাকা জমা রেখে রাজস্ব সংগ্রহ করত এবং এই কাজের জন্য তারা নিয়মিত বেতন পেত। এরা আবার কৃষকদের অগ্রিম দাদন (তাকাবি) ঋণস্বরূপ দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই হজারাদাররাহ কৃষ্ণকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত। রাজস্ব আদায় ও ঋণ দেবার অধিকারী হওয়ায় ইজারাদাররা কৃষকদের শোষণ করার সুযোগ পেয়েছিল নতুনভাবে। রাজকোষ থেকে প্রাপ্ত ও কৃষক শোষণের ফলে আদায় করা অর্থবিত্তের বিনিময়ে ইজারাদাররা পূর্বের জমিদারি কিনে নিয়ে রাতারাতি 'হঠাৎ নবাব' হয়ে বসল। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে অভিজাত ভূস্বামীদের দ্রুত অপসারণ এবং তাদের স্থানে বিত্তবান অথচ শিক্ষাদীক্ষাহীন ইজারাদারদের জমিদার বনে যাওয়ায় কৃষ্ণকজীবনে দেখা দিয়েছিল সংকট। নাটোর, দীঘাপতিয়া, নড়াইল, তাহেরপুর, পুঁটিয়া, বর্ধমান, নদীয়া, ঘোড়াঘাট; মুক্তাগাছার জমিদাররা প্রধানতঃ ইজারাদার বা অন্য বিভাগের রাজকর্মচারী ছিলেন। প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করে এবং মুর্শিদকুলি খাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে এঁরা জমিদার হয়ে শোষণের মাত্রাটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাজকোষে অর্থপ্রেরণ, নবাবের আনুকূল্যলাভ ও নিজেদের অপরিসীম বিত্ত সঞ্চয়ের জন্য এঁরা কৃষকের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতেন। সেই চাপের মুখে পড়ে কৃষিজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কৃষকের অমানুষিক পরিশ্রমে জমিতে ভাল ফসল ফললেও তাতে কৃষকের অধিকার থাকত না। সমকালে শিবকে কেন্দ্র করে রচিত 'শিবায়ন' কাব্যের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য সেই কথাই তুলে ধরেছেন ঃ

গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বার কর্যা সকল আনয়ে লয় রাজা ॥

রাজস্ব-সংগ্রহ ও বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দী খাঁ মুসলমান

অপেক্ষা হিন্দু কর্মচারীদের উপর বিশেষ নির্ভর করতেন। তাই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এমনকি মোদক সম্প্রদায়েরও কেউ কেউ জমিদারি কিনেছিলেন। এইসকল হঠাৎ বনে যাওয়া জমিদারদের সম্পর্কে রামপ্রসাদ ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন—"ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারে দিলে জমিদারি।" নবোত্থিত জমিদাররা সগর্বে 'রাজা' উপাধি ধারণ করতেন এবং অনেকক্ষেত্রে নবাবের কাছ থেকে 'রায় রায়ান' উপাধিও লাভ করতেন। এঁরা নবাবের সুনজরে থাকার জন্যে রাজস্ব সংগ্রহের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে অনেকক্ষেত্রে বেশি রাজস্ব আদায় করতেন। আর এজন্য তাঁরা কৃষকদের উপর চালাতেন নানা অত্যাচার। কৃষকপ্রজাদের আপত্তি সত্ত্বেও অনাবাদী জমিকে আবাদী ধরে নিয়ে উচ্চ হারে রাজস্ব আদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হতো। সাধক কবি রামপ্রসাদের দৃষ্টি তা এড়ায়নি।

॥ ৩ ॥

একদিকে গ্রামীণ কৃষিজীবনের সঙ্গে সংযোগ ও ব্যক্তি-জীবনের প্রথম পর্বে নানা দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন, অন্যদিকে মহাজন, জমিদার প্রভৃতি কৃষি-সংশ্লিষ্ট উপরতলার মানুষজনের কাছে চাকরি—এই দুয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রামপ্রসাদ বাংলাদেশের [illegible] ও কৃষকজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সময়টা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী। একদিকে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ, অন্যদিকে একশ্রেণীর শোষকদের হাতে কৃষকেরা লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হচ্ছিল। সারা শতাব্দী জুড়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল তাদের জীবন। কৃষিকাজ সুস্থিরভাবে না হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তুলতে পারেনি কৃষকরা। পরিবেশ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করেছে বিত্তশালী মানুষেরা। এইভাবেই তাদের জীবনে নেমে এসেছিল দুঃসহ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুক চিরেই সাধককবি রামপ্রসাদ লিখেছেন এবং গেয়েছেন একের পর এক গান ; মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনার কথা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন আরাধ্যা দেবীর কাছে। কারণ তিনিই তো ত্রাণকারিণী তারা, জগজ্জননী শঙ্করী। রামপ্রসাদ গাইলেনঃ

মাগো তারা, ও শঙ্করী
কোন বিচারে আমার পরে করলে
দুঃখের ডিক্রী জারি ?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা,
বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে বিষ
খাওয়াইয়া প্রাণে মারি॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে
নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি
তারে দিলে জমিদারি॥
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিসমিসো তার
আশ্রয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি,
যে রূপেতে আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥

আমরা বুঝতে পারি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপর্যস্ত পরিবেশে—উত্থিত বিষ সাধককবি পান করেছেন। বিষের তপ্ত জ্বালার অনুভূতি থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি তিনি। সে জ্বালারই বাণীরূপ উপরি উদ্ধৃত শাক্তপদটি। এই পদটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপর্যস্ত জীবনের ছবি নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। মুকুন্দরাম পেয়াদাদের অত্যাচারে গ্রামছাড়া হয়েছিলেন ; রামপ্রসাদকেও সহ্য করতে হয়েছিল পেয়াদাদের অত্যাচার। রামপ্রসাদ তাই অত্যাচারী পেয়াদাদের মৃত্যু কামনা করেছেন আন্তরিকভাবে। সামগ্রিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে স্থানান্তরিত হতে চেয়েছেন তিনি ; কিন্তু অস্থিরতামুক্ত কোন স্থানই তিনি খুঁজে পাননি। আরাধ্যা দেবীর কাছে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন সাধককবি। সে-আশ্রয় পরম আশ্রয়। রামপ্রসাদ যখন গাইলেনঃ

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানবজমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।

তখন তিনি সমকালীন কৃষকদের আর্তিকেই ধ্বনিত করেছেন। এ আর্তি নিঃসন্দেহে করুণ। চোখের সামনে, পায়ের নিচে জমি আছে, তাতে 'আবাদ' করলে প্রচুর ফসল জন্মাত অথচ সে জমিই 'পতিত' রয়ে গেছে। কেন রয়েছে? এর উত্তর অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপর্যস্ত কৃষকজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে। সাধককবির এই পদটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষকজীবনের সেই মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কথাই উঠে এসেছে। যদিও পদটির পরের অংশে আছে আধ্যাত্মিক উত্তরণের কথাঃ

কালীনামে দেও রে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্তবেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥

*

এখন আপন ভেবে যতন করে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে,
ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।

'পতিত' জমিতে কিভাবে আবাদ করলে সোনা ফলানো যাবে তার উপায়ও তিনি জানেন। গুরুদত্ত বীজ বপন করে, ভক্তিবারি সিঞ্চন করে, কালীনামের বেড়া দিয়ে আবাদ করলে সোনা ফলবেই ফলবে। কিন্তু ফসল ফলানোর যে বিস্তর বাধা! আধ্যাত্মিক সাধনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রামপ্রসাদ সেই প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ উন্মোচন করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—অন্তর্লোকের এই ছয়টি অদৃশ্য রিপুই মানবজমিনের দখল কেড়ে নিতে চায়। সাধককবি রামপ্রসাদ এদের বিরুদ্ধেই তৈরি করেন অধ্যাত্ম-প্রতিরোধ। মানবজমিনের ক্ষেত্রে ষড়্‌রিপু প্রসঙ্গটি অহল্যা-ভূমির উপর নেমে আসা মহাজনের অত্যাচারের আদলেই কবিচিত্তে আঁকা হয়ে যায়।

বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সদ্যসংযুক্ত যে দেহ সেই দেহের সামগ্রিক অবস্থানকে বাদ দিয়ে নিছক আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে বৃত হননি রামপ্রসাদ। তাই জীবন ও সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পরিবেশকে বিশ্বস্তভাবেই তিনি তুলে ধরেন। জীবনের আশ্রয় যে বস্তুতান্ত্রিক জীবিকা তার মধ্যেও নিয়ে যান নিজেকে। যদিও বারেবারেই জীবিকার আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তিনি ; তবুও মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন জমির মালিকদের অনুগ্রহজীবী হয়েই তাঁকে দিনযাপন করতে হয়। আর তাই 'মানবজমিন' পতিত থাকে। আর এই কারণে আপন অস্তিত্বে অনুভব করতে পারেন মাটির জমিতে নেমে আসা বিপর্যয়কে। বাস্তবে শস্যবীজ, জলসেচের যন্ত্র আর বেড়ার উপকরণ যাঁর অধিকারে নেই তাঁকে গুরুদত্ত বীজ, ভক্তিবারি আর কালীনামের বেড়ার উপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু এই আশ্রয়ে থেকেও জমিকে ভুলে থাকা যায় না, ভুলে থাকা যায় না দুঃখের ডিক্রী জারি করনেওয়ালা উচ্ছেদকারীদের প্রবঞ্চনাকে। তাই বিষপ্রয়োগে তাদের হত্যা করতে ইচ্ছা জাগে। আর উৎপীড়কদের যিনি প্রভু, যোগ্যের বাস্তুচ্যুতি ঘটিয়ে যিনি আনন্দিত হন ব্যক্তিটি—"যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারে দিলে জমিদারি"—তার বিরুদ্ধে জমা হয় ক্ষোভ। এই ক্ষোভ সোচ্চারে প্রকাশিত হয় দেবীর কাছেঃ

করুণাময়ি, কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, আমার এম্নি দশা,
শাকে অন্ন মেলে কৈ॥
কারে দিলে ধন জন মা হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে
দিয়েছিলাম মই॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষোভ প্রতিকারহীন। সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার প্রতিটি কৃষকের সত্তার সঙ্গে এই ক্ষোভ যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, কালান্তরেও কৃষকজীবনে এই ক্ষোভ প্রবাহিত হয়েছে।

সমকালে বা পূর্ববর্তী কালে বৈষ্ণবকবিরা সেই ক্ষোভের কথা জেনেও তা কাব্যের মধ্যে তুলে ধরতে পারেননি। আসলে তাঁরা চাননি। সেই ক্ষোভ, ব্যর্থতা, হাহাকার, শূন্যতা রাধার আর্তির মধ্যেই সীমায়িত হয়েছে। তাই রাধাকে বলতে শুনিঃ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে
পুড়িয়া গেল।
অমিয়সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।

এ হাহাকার আর্তি শুধু কি রাধার ? কবিজীবনের নয় ?

রামপ্রসাদ অভিজ্ঞতার অভিমুখে পেঁাছতে পেরেছিলেন। তাই তিনি শুধু ক্ষোভই জানাননি, প্রতিকূলতা জয় করে স্থিতিশীল পরিবেশে কৃষিকাজে অংশ নেবার কথা ঘোষণা করেছেন। যদিও সেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। প্রতিকূলতাকে জয় করে কৃষিকাজের আন্তরিকভাবে অংশ নেবার কথা আছে এই গানগুলিতেঃ

১. এবার আমি করব কৃষি।
ওগো, এ ভবসংসারে আসি ॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে
বসে দেখ রাজমহিষী
দেহজমির জঙ্গল বেশি,
সাধ্য কি মা সকল চষি। ...

২. আমি মায়ের খাসে আছি বসে,
আসল সারে জমি।
এবার তোমার নামের জোরে, থাকব ধরে,
নিষ্কর করে লব ভূমি ॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি,
নাইকো রুখি কড়া কমি।...

৩. আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে,
নাই মহালে শুকা হাজা।

এইভাবে রামপ্রসাদের লেখা শাক্তপদগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপর্যস্ত কৃষি ও কৃষকজীবনের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। শুধু জমিদারদের উৎপীড়ন নয়, খরা-মন্বন্তর-অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিজীবন যে বিপর্যস্ত হতো তারও উল্লেখ করেছেন রামপ্রসাদ শেষের গানটিতে। অনাবাদী জমির প্রসঙ্গ এবং রাজস্বের বিষয়টি আছে অন্য দুটি গানে। এই সূত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে সমাজ-অর্থনীতি প্রসঙ্গ। নগর পুড়লে দেবালয় যেমন এড়ায় না, তেমনি শাক্ত-সাধনার স্তরে নিজেকে নিয়ে গেলেও যুগের বিপর্যয় থেকে সাধক মানুষটি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি।

॥ ৪ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের বহু গান নানা সময়ে গেয়েছেন। সেইসব গানে শক্তিতত্ত্ব, দেবীর স্বরূপ যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি যুগ-যন্ত্রণার বিষয়টিও উন্মোচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাকে জীবনে সহজচিত্তে গ্রহণ করার শক্তি রামপ্রসাদ অর্জন করেছিলেন, তাই গেয়েছিলেনঃ

আমি কি দুঃখেরে ডরাই,
দুঃখে দুঃখে জন্ম গেল,
আর কত দুঃখ দাও দেখি তাই।

সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা, শোষণ, বঞ্চনার অবসান কালীনামের উচ্চারণে—রামপ্রসাদ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর গানে সেই অনুভবই বাঙময় হয়ে উঠেছেঃ

কালীর নামে দেওরে বেড়া
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।...

পরিক্রমা

উত্তরকাশীর নচিকেতা-তাল

স্বামী অচ্যুতানন্দ

সেদিন কঠ উপনিষদের পাঠ শেষ হওয়ার পর ছত্রে যখন ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছি—এমন সময়ে একজন প্রবীণ সাধু বললেনঃ “জানেন মহারাজ, উত্তরকাশীর এই যে ‘বারণাবত’ পাহাড় দেখছেন এই পাহাড়েই কঠ উপনিষদের ঋষি নচিকেতার আশ্রম ছিল। এখনও সেই স্থানটিতে তাঁর নামে একটি জলাশয় আছে, নাম তার ‘নচিকেতা-তাল।’ স্থানটি যদিও দুর্গম—অরণ্যময় তবুও সেখানে একান্তবাসী দু-চারজন সাধু-মহাত্মা এখনও তপস্যাব্রতী হয়ে বাস করছেন।” কথাটি শুনে আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগল সেই আত্মজ্ঞানপিপাসু বালক-ঋষির তপোভূমি দর্শন করবার জন্য। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সেই স্বামীজীকে জানালাম আমার ইচ্ছার কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেনঃ “বেশতো কালই চলুন। আমারও দেখবার ইচ্ছা ছিল বহুদিন থেকে; সঙ্গীর অভাবে এতদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি।” ছত্র থেকে ফেরার পথেই বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে পরদিনের প্রথম বাসের সময় জেনে নেওয়া গেল।

ইংরেজী ১৯৮৬-র ৮ জুলাই বুধবার, সকালে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার নাম স্মরণ করে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দুজনে পৌঁছলাম। এপথের বাস অনেক-দূর যায়—লম্বগাঁও পর্যন্ত। বাস ছাড়ার তখনো বেশ দেরি আছে। ক্রমে যাত্রীতে ভরে গেল বাস। বাসে মানুষ, ছাগল, মুরগী—সব ওঠে, বাসের মাথাতেও লোক বসে যায়। সাতটায় বাস ছাড়লো। যাত্রীবোঝাই বাস হেলেদুলে চলেছে। গঙ্গার ঝোলা-পুল পেরিয়ে জ্ঞানসু হয়ে বাস ক্রমশঃ পাহাড়ে উঠতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই ডানদিকে পার হয়ে গেলাম নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং। সুন্দর সুন্দর ছবির মতো বাড়ি-ঘর সব। ক্রমে বাঁদিকে ছেড়ে এলাম হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট-এর কলোনি ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। পাক খেয়ে খেয়ে বাস ওপরে উঠছেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডান-দিকে দেখা গেল উত্তরকাশীর পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপিত প্রাচীন দুর্গাস্থান—কুটেতি দুর্গা-মন্দির। এখান থেকে গোটা উত্তরকাশী শহর ও শীতকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরের গঙ্গোত্রীর বরফের পাহাড়ও দেখা যায়। শহরের দৃশ্য সবসময়ই দেখা যায়। অতি সুন্দর সে দৃশ্য। দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। পথের একদিকে খাড়া পাহাড়—সবুজ পাইন, দেওদার গাছে ঢাকা। আর একদিকে গভীর খাদ, তাও সবুজে ভরা, নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণকায়া এক স্রোতস্বতী—কেদারঘাটের কাছে গঙ্গায় পড়েছে। এতক্ষণে আমরা সূর্যদেবকে দেখতে পেলাম। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা থাকায় উত্তরকাশীতে তাঁর দর্শন দেরিতেই পাওয়া যায়।

নীল আকাশের গায়ে সবুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী থালার ঝিকমিকি দেখতে দেখতে কখন কেটে গেছে দু-ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট সময়। বাস আমাদের নামিয়ে দিল একটা পাহাড়ী রাস্তার চৌমাথার কাছে। দুপাশে ঢালু পথ নেমে গিয়েছে। আমরা উত্তরকাশী থেকে এসেছি উনত্রিশ কিলোমিটার দূরে। পথের ধারের মাইল-পোস্ট দেখে বুঝতে পারলাম এখানকা'র উচ্চতা ২৩১০ মিটার। জায়গাটার নাম ‘চৌরঙ্গী’। রাস্তার ধারে একটা ঝুপড়ির মধ্যে চা ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিসের একটা ছোট দোকান। সেখানেই পাহাড়ী কয়েকজন লোক চা খাচ্ছিল। পথের সন্ধান জানবার জন্য আমরাও তাদের পাশে বসে পড়লাম। দু-চার কথার পরেই জানতে পারলাম—এখান থেকে তিন কিলোমিটার রাস্তা হাঁটতে হবে আমাদের ‘নচিকেতা-তালে’ পৌঁছতে। আর সেই রাস্তা বরাবর ছয় ফুটের

মতো চওড়া। এই শেষের কথাটিতে আমরা তত মন দিইনি—ভেবেছিলাম পাহাড়ী লোকদের হিসাব কত আর নিখুঁত হবে।

ভগবানের নাম নিয়ে পথে হাঁটা শুরু করলাম। শুধু আমরা দুজনই যাত্রী—দুজনের হাতেই লাঠি, কাঁধে একটা করে ঝুলি—তাতে কিছু খাবার, জপের মালা, আর দু-একটা বই। অন্য হাতে কমণ্ডলু। কিছু দূর যাওয়ার পরেই ডানদিকে বেশ ভাল পায়ে চলার মতো একটা পথ পেয়ে সেই পথ ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা নিচের দিকে নামতে লাগলাম। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই দেখা গেল সে পথ ক্রমশঃ আরও নিচের দিকে নামছে—সম্ভবতঃ দূরের কোন গ্রামের রাস্তা এটি। আমাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল—ফিরে এলাম আবার সেই পথ ধরেই—এসে দেখলাম—উল্টো দিকে প্রায় ছয় ফুটের মতো একটা রাস্তা দেখা-যাচ্ছে—কিন্তু সেটিতে লোক চলাচলের বিশেষ চিহ্ন নেই। তবে তার আরো একটু উপর দিকে আরেকটা ঐরকম পথ দেখা গেল যেটিকে পায়ে চলার পথ বলেই মনে হলো। আমরা এই পথ ধরে আবার এগোতে লাগলাম। ডানদিকে ঘুরে পথটা একটু চওড়া হয়েছে। কিন্তু কপালে আছে দুর্ভোগ। তাই কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল এই পথও ক্রমশঃ সরু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘাসের জঙ্গলে। তার ওপর শুরু হয়েছে দুপাশে অন্যান্য গাছের গভীর জঙ্গল। বুঝলাম—আমরা আবার পথ হারিয়েছি। সামনে কোন রাস্তার চিহ্নই নেই। কাছে দূরে কোন লোকালয় নেই। কোন জনমানুষের সাড়া-শব্দও নেই। বড়ই প্রমাদ গনলাম। ঐ দেশের রেওয়াজ মতো অনেক ‘ওঁ-ও” করে চিৎকার করেও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে হতাশ হয়ে যখন পেছন দিকে ফিরবার উপক্রম করছি ঠিক তখনই সঙ্গী মহারাজ একটু উপরের দিকে গাছের ফাঁকে একটা পথের রেখা দেখতে পেলেন। নিজের জুতো খুলে ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে অতিকষ্টে তিনি গাছের ডালপালা ধরে দশ-পনের ফুট খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে পড়লেন। সেখান থেকে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমায় বললেন ঃ “মহারাজ, এই সেই ছয় ফুটের রাস্তা এখানে, চৌরঙ্গীর পাশ থেকেই যেটাকে উপেক্ষা করে আমরা অন্য পথ ধরে নিচে নেমেছিলাম।” চায়ের দোকানের পাহাড়ী যাত্রীদের ছয় ফুট রাস্তার হিসাব এবারে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম। সঙ্গী মহারাজ উপর থেকে সাবধানে নেমে এসে আগে আমাদের দুজনের ঝোলাদুটো ওপরে রেখে এলেন। অবশেষে আমাকেও প্রায় টেনে হিচড়ে ওপরে তুলে নিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি ঐ পথ বেয়ে। কিছুটা এগিয়ে দেখা গেল একটা নতুন বাড়ি তৈরি' হচ্ছে, মনে হলো যাত্রীনিবাস-জাতীয় কিছু হতে পারে। তবে কোন লোক আমরা সেখানে দেখতে পেলাম না। সেখানে একটু বিশ্রাম করে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। এখানে বলে রাখা ভাল যেখানে রাস্তা ভুল করেছিলাম সেখান থেকেই দুপাশে গভীর জঙ্গল। দেওদার, চীর গাছ এবং নানা লতাগুল্মের ঝোপ মিলিয়ে বেশ ঘন বন। সেখানে কোন বন্য জীব-জন্তু থাকাও বিচিত্র নয়। আমরা সেই যমজয়ী বালক তত্ত্বদর্শী নচিকেতার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ক্রমশঃ জঙ্গলের বুক চিরে উপরের দিকে চড়াই বেয়ে উঠতে লাগলাম। এবারও নিচের দিকে আর একটি পায়ে চলা পথের চিহ্ন পেলেও এবার পূর্বের ভুলের পুনরাবৃত্তি করিনি। কারণ সে পথ ছয় ফুটের পথ নয়, এইভাবে শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারিদিকে তাকিয়ে কিন্তু হতাশ হতে হলো। কোথায় তাল (হ্রদ) ? চারপাশে থাকে থাকে ঘিরে আছে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। কোন তালের চিহ্নমাত্র নেই। তবে বাঁদিকে দেখলাম এই পথই ক্রমে নিচে নেমে গেছে। কিছুটা এগিয়ে, পথে আরও একটি নির্মীয়মাণ ঘরের দেখা পেলাম। মনে আশার সঞ্চার হলো। এবার হয়তো ঠিক পথেই যাচ্ছি। ক্লান্তিবশতঃ একটু পিছিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ সঙ্গী স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ “তাল পেয়ে গেছি। এসে গেছি ঠিক জায়গায়!” কি আনন্দ!! কি আনন্দ!!! এত

কষ্ট সার্থক—একটু এগিয়ে দেখলাম পাহাড়ের গায়ে কিছুটা সমতল জায়গা—তার মাঝে ছোট্ট একটা হ্রদের মতো—এদেশে বলে 'তাল'। ঘড়িতে তখন ঠিক সোয়া এগারোটা। পথে আমাদের রাস্তা হারানো ও ধীরে ধীরে চলার জন্য প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে।

প্রায় দৌড়েই আমরা তালের কাছে পৌঁছে গেলাম। সুন্দর জল। তাতে চারিধারের পাহাড় ও গাছপালার ছায়া পড়ে সবুজ দেখাচ্ছে। তালের একপাশে একটি ছোট্ট মন্দির—বেশ পুরনো বলে মনে হলো। তার উল্টোদিকে একটি ঝুপড়ি, তাতে একজন প্রাচীন মহাত্মা আছেন। কিছুদূরে দুটি পাকা চালাঘর দেখা যাচ্ছে—একটি মনে হলো অপেক্ষাকৃত নতুন। অন্যটি বেশ পুরনো। এক ঝলক সবকিছু দেখে নিয়ে, তালের জল একটু মাথায় ছিটিয়ে আমরা মন্দিরের দ্বার খুলে ভিতরে প্রবেশ করলাম। বেশ পরিষ্কার ছোট্ট গর্ভগৃহ। মাঝখানে শিবঠাকুরের পাথরের একটি ছোট লিঙ্গ। আর একপাশে ধ্যানমগ্ন সাধক নচিকেতার পাথরের মূর্তি। আর কিছু নেই মন্দিরের মধ্যে। মৃত্যুপতি যমরাজের দেওয়া পার্থিব অনন্ত ঐশ্বর্যকে যিনি হেলায় তুচ্ছজ্ঞান করে অমৃতত্ব প্রার্থনা করেছিলেন, শত প্রলোভনেও বিষয়ভোগে আকৃষ্ট না হয়ে যমরাজের কাছে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতিলাভের উপায় যিনি জানতে চেয়েছিলেন. এবং যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, বিচিত্র ত্যাগ ও আন্তরিক জিজ্ঞাসার কাছে পরাভূত হয়ে যমরাজ সানন্দে যাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করে কৃতার্থ হয়েছিলেন—সেই বালক-ব্রহ্মর্ষির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালাম। তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে তালের দিকে ফিরে গেলাম।

কঠ উপনিষদ--বৈদিক যুগের কোন্ কালে সৃষ্ট হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতেরা মাথা ঘামান। আমি শুধু নচিকেতা-তালের জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মগ্ন হয়ে সেই বালক-ঋষি নচিকেতার কথাই ভাবতে লাগলাম, এই সেই স্থান যেখানে মৃত্যুপুরী প্রত্যাবৃত্ত ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী নচিকেতা তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। হয়তো এখানেই তাঁর পিতা বাজশ্রবাতনয় উদ্দালকেরই আশ্রম ছিল—এখানেই তিনি হয়তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেছিলেন। আর সেই যজ্ঞে তাঁকে শীর্ণকায়া, বৎস প্রসবে অসমর্থা, রুগ্না গাভীদের দক্ষিণা হিসাবে দান করতে দেখে অষ্টমবর্ষীয় বালক নচিকেতার মনে চিন্তার উদয় হয়েছিল। তার পরের কাহিনী সুবিদিত। তাঁকে যেতে হয়েছিল যমালয়ে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য। কিন্তু সত্যসন্ধ আত্মতত্ত্বলাভেচ্ছু সেই ঋষিতনয়ের কাছে যমরাজের সব কুহেলিকার মায়াজাল অপসৃত হয়ে সত্যতত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছিল। "মহারাজজী থোড়া কৃপা করকে ইসমে তো বিরাজিয়ে"—চিন্তাস্রোত ছিন্ন হলো। পিছন ফিরে দেখি সামনের কুঠিয়ার প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটি বস্তা হাতে নিয়ে এসে তাতে বসবার জন্য অনুরোধ করছেন। জনশূন্য পাহাড়ে জঙ্গলের মাঝে এই প্রাচীন তপোভূমিতে বৃদ্ধ তাপসের সস্নেহ আহ্বানে অভিভূত হয়ে তাঁর দেওয়া বস্তাখানিতে বসে তাঁর কাছে এই তীর্থ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলাম। অন্তর্যামীর মতো সেই দীর্ঘদেহী জটাধারি-সন্ন্যাসী হিন্দীতেই বললেন, "ইস লিয়ে ম্যায় ক্যা কহুঁ—কঠ উপনিষদ্ তো আপ্ জরুর পাঠ কিয়া হ্যায়, ম্যায় প্রাচীন সাধুয়োঁকে পাস শুনা হ্যায় কি ইস স্থানপর উয়ো উপনিষদ্‌কা আবির্ভাব হুয়া নচিকেতাজীকে হৃদয় মেঁ। ইয়ে তাল বহুৎ প্রাচীন। শুনা হ্যায় কি উসি সময়সে ইয়ে তাল আভিতক এ্যায়সাই হ্যায়।" তার পরে যে কথাটি তিনি বললেন সেইটি আমার বড় ভাল লাগল, তিনি খুব আবেগের সঙ্গে বললেন ঃ "আমি জানি না এই তাল কতদিনের পুরনো, তবে যখনই মনে হয় নচিকেতাজীর নাম দিয়ে যে তালের নাম. সে-জল স্পর্শ করলে আমিও কি সেই আত্মবিশ্বাস লাভ করব না—যার সাহায্যে এই জীবন-যন্ত্রণার পারে পরমামৃত লাভ করে জীবনধারণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? সেই আশাতেই এই গভীর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে একাই পড়ে আছি। কোন ভাবনাচিন্তা আমার নেই।

নিচের গ্রাম থেকে মাধুকরী করে আনি—একবেলা তাতেই চলে যায়। বেশ আনন্দেই আছি।” সদানন্দময় এই বৃদ্ধ সাধুটির উজ্জ্বল মুখ দেখে, তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সম্পর্কে আমার স্থির বিশ্বাস হলো তিনি সত্যই আনন্দে আছেন। তিনি বললেন কঠ উপনিষদ থেকে কিছুটা পাঠ করে তাঁকে শোনাতে। আমার ঝুলি থেকে বইখানি বার করে নিয়ে এসে কিছুক্ষণ কঠ উপনিষদ পাঠ করে তাঁকে শোনালাম।

ইতিমধ্যে সঙ্গী স্বামীজী বললেন তালেই স্নান করবেন। আমার কেন জানি না এই জলে পা দিতে ইচ্ছে হলো না। তাই কমণ্ডলুতে করে জল তুলে মাথায় দিয়ে মাথা ধুয়ে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে শিবজী আর নচিকেতাজীকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা খিচুড়ি নিবেদন করে সেই প্রসাদ পেতে বসলাম। শিশুর মতো সরল বৃদ্ধ সাধুজীকেও আমাদের সঙ্গে বসতে অনুরোধ করায় তিনি এক-কথায় রাজি হয়ে গেলেন। খুব আনন্দ করে সেই 'বাঙ্গালী খিচুড়ি' তিনি খেলেন। তাঁর ভেতরের আনন্দ তাঁর কথাবার্তা-হাবভাবে যেন উপচে পড়ছিল। আহারান্তে ঐ তালের জলই পরম তৃপ্তি-ভরে আকণ্ঠ পান করে উঠে এলাম। কাছাকাছি দুটি আশ্রয়-ছাউনি যেগুলির উল্লেখ আগেই করেছি। পুরনো ছাউনিটিতে একজন সাধুকে দেখা গেল। এতক্ষণ তিনি বাইরে আসেননি। আমরা দু-একবার 'ওঁ—ওঁ' করাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আগেই শুনেছিলাম এঁর বাঙালী শরীর। তিনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপের আগ্রহ দেখালেন না। দুটি একটি কথা বলে আবার অন্য দিকে চলে গেলেন। দুই সাধুর দুই স্বভাব—একজন সদানন্দ, অন্যজন গম্ভীর।

আবার ফিরে এলাম নচিকেতা-তালের পাশে। এখানে এই তালই মুখ্য দর্শনীয়—পবিত্রতীর্থ। তাই সেখানে আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম। বেশ মাছ খেলে বেড়াচ্ছে, স্বচ্ছ জলে। চারিপাশে পরিক্রমাও করা যায়। সাধুরা পরিক্রমা করেন বোঝা গেল, ক্ষীণ পদচিহ্নের নিদর্শন দেখে। পনের মিনিটেই প্রদক্ষিণ শেষ। নচিকেতাজীর উদ্দেশে আবার প্রণাম জানালাম। এবার ফেরার পালা। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে করজোড়ে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' জানিয়ে আমরা চৌরঙ্গীর পথে এগিয়ে চললাম—পেছনে পড়ে রইল প্রাচীন উপনিষদের এক তেজস্বী ব্রহ্মজ্ঞানী বালক-ঋষির স্মৃতি বুকে নিয়ে নচিকেতা-তাল। রয়ে গেলেন এযুগের দুই প্রাচীন সংসার-বিরাগী আত্মতত্ত্বলাভেচ্ছু সন্ন্যাসী তাঁদের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব নিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে কেবলই মনে হচ্ছিল—আত্মতত্ত্ব যেমন দুর্বিজ্ঞেয়, সকলের জন্য নয়, উপযুক্ত অধিকারীর কাছেই তা প্রকাশ্য—এই নচিকেতা-তালও তেমনি গভীর অরণ্যের মধ্যে এক রহস্যক্ষেত্র। সুগম রাস্তার অভাবে সকলের কাছে তা সহজগম্য নয়। বহুর কাছেই তা অজানাও। কোন চটকদার মন্দির নেই, দর্শনার্থী যাত্রীও এপথে বিরল। চড়াই উতরাই পথে রওনা হয়েছিলাম সোয়া একটায়। ঠিক দুটোর মধ্যেই চৌরঙ্গীতে এসে পৌঁছলাম—অর্থাৎ মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই ফিরে এসেছি। নামার পথ সব জায়গাতেই সহজ। এখন এপথে বাস নেই। আসবে অনেক দেরিতে। তাই চলতি একটা লরি পেয়ে তিনটে পঁয়তাল্লিশে যাত্রা করে সোয়া পাঁচটায় ফিরে উত্তরকাশীর বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছলাম। লরিতে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম এক নাগা সাধুকে। তাঁর সঙ্গে আসার যে অভিজ্ঞতা সে আর এক কাহিনী!

অবতরণের পটভূমিকা

তারকনাথ ঘোষ

॥ ১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ গম্ভীর হয়েছেন, যেন কী গুহ্য কথা বলবেন।

মাস্টারকে (শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) বলছেন ঃ "এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন—হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি—(দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, 'আমি যুগে যুগে অবতার'।"

পরে আবার বলছেন ঃ "দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" (কথামৃত, ৩।১২।৩)

এই অবতারত্ব যে কী তা কার্যতঃ সাধারণের বোধগম্য নয়। ঈশ্বরতত্ত্বই বোধের অতীত। শাস্ত্রকথা ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী অথবা মহাজনের আপ্তবাক্য অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সমুচ্চ ভাবগর্ভ কিংবা প্রাঞ্জল বাগ্‌বিন্যাসে যথার্থ উপলব্ধি হয় না—অস্পষ্ট একটা ধারণা হয় এইমাত্র। অধ্যাত্মসাধনমার্গে যাঁরা উচ্চ অধিকারী তাঁরাই যথাক্রতু বোধে বোধ করেন। সাধারণের প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা হয় না—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে সংশয়ী মন বিচরণ করে, সুকৃতিবশে বিশ্বাসের দিকেই ঝোঁকটা বেশি হতে পারে এই মাত্র।

অবতার প্রসঙ্গে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে (৬।৮) ভগবান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কথা বলেছেন সেটাই প্রমাণবাক্য বলে মেনে নেওয়া হয়। তিনি বলছেন ঃ "আমি জন্মহীন, অব্যয়াত্মা আর ভূতগণের অধীশ্বর হয়ে আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মমায়াযোগে সম্ভূত হই। হে ভারত! যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে (অবতাররূপে) সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য আর ধর্মসংস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে সম্ভূত হই।"

প্রথম শ্লোকটি অবতরণ-প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক সংকেত; পরের দুটিতে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা প্রয়োজনে বর্ণনা।

চণ্ডীতেও প্রায় অনুরূপ ভাবনা আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দেবকুলের স্তুতিতে প্রসন্না হয়ে দেবী অসুরবিনাশের জন্য তাঁর কয়েকটি আবির্ভাবের উল্লেখ করে পরিশেষে যেন প্রতিজ্ঞাই করেছেন ঃ "যখনই যখনই এই রকম দানবোত্থা বাধা সমুপস্থিত হবে তখনই তখনই অবতীর্ণা হয়ে আমি অরিসংহার করব।" (১১।৫৪-৫৫)

শাস্ত্রদৃষ্টিতে শ্রীভগবানের এবং ভগবতীর অবতরণের দুটি মুখ্য কারণ। একটি ধর্মের গ্লানি-মোচন—দুষ্কৃতকারীদের, দানব অর্থাৎ যারা আসুরী প্রকৃতির তাদের বিনাশও এই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। আর একটি—ধর্মসংস্থাপন—সাধুদের পরিত্রাণ যার একটি অঙ্গ। দেবীর উক্তিতে স্পষ্ট করে বলা না হলেও দেবসমাজ অর্থাৎ দৈবীপ্রকৃতির যাঁরা অধিকারী তাঁদের সংরক্ষাও ঐশী অবতরণের অভিপ্রেত।

অবশ্য দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের চেয়ে সাধুদের পরিত্রাণের গুরুত্বই বোধ হয় বেশি। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে ঃ "অসুর-সংহার অনুষঙ্গ প্রয়োজন।" (আদিলীলা, ৪) পৌরাণিক কাহিনীতে দৈত্য-দানব-অসুর-রাক্ষস ইত্যাদি বিনাশের বর্ণনা আছে। কিন্তু সে কেবল যাঁরা সদাচারী সাধুপ্রকৃতি ধর্মনিষ্ঠ অথবা ধর্মপথিক তাঁরা যাতে বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দে সাধনব্রতে নিরত হতে পারেন সেইজন্য। পৌরাণিক কাহিনীর মূলে ইতিহাস থাকা সম্ভব, কিন্তু তাতে কল্পকাহিনী আর রূপকও প্রচুর পরিমাণে মিশে আছে। এর মধ্যে কোনটির পরিমাণ যে কতটা তা বলা যায় না। তবে মানুষের প্রকৃতিতেই দেব আর অসুর মিলেমিশে আছে। যখন আসুরভাব প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষ অসুরের পর্যায়ে নেমে আসে। তাদের সংখ্যা বেশি হলে সমাজের সর্বস্তরে বিকৃতি দেখা দেয়, সুস্থ

জীবনচেতনা হারিয়ে যায়, মহৎ জীবনের আদর্শ বিড়ম্বিত হয়। তারই নাম ধর্মগ্লানি। সেই গ্লানি, সেই অবক্ষয় দূর করার জন্য বিশেষ বিশেষ মানুষকে অবলম্বন করে দেবভাবের—সুস্থ সবল মহৎ জীবনচেতনার অভ্যুদয় হয়। যেসব মানুষকে কেন্দ্র করে ঐ চেতনার ব্যাপক বিকাশ হয় তাঁরা অবতারতুল্য—চৈতন্যচরিতামৃতের ভাবানুসারে তাঁরা "শক্ত্যাবেশ-অবতার" (আদিলীলা, ১) বলা যেতে পারে। তাঁরা যখন ব্যষ্টিগতভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন তখন তাঁদের গুরুর ভূমিকা (কেবল আধ্যাত্মিক ভাবে নয়)। যখন তাঁরা সমষ্টিগতভাবে সমাজকে শিক্ষা দেন তখন তাঁরা আচার্য পদবীর অধিকারী হন। যাঁদের অসামান্য পুরুষপ্রভাব আর জীবনসাধনা বৃহত্তর লোকসমাজকে উদ্দীপ্ত করে তাঁরা মহামানব বা মহাপুরুষরূপে চিহ্নিত ও বন্দিত হন। এঁদের মধ্যে যাঁদের প্রভাব বিশেষতঃ ধর্মপ্রেরণা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে মানবসমাজে শক্তিরূপে সঞ্চারিত হয়, ভারতীয় ভাবদৃষ্টিতে তাঁরাই অবতারপদবাচ্য। ধর্মসংস্কৃতিগত ভাবনা অনুসারে স্বয়ং ঈশ্বরই মানবকায় পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ হন, কেননা সাধারণ মানুষ তার সীমিত সামর্থ্যে সর্বাতিশায়ী মহাশক্তির অধিকারী হতে পারে না।

অবতারের আবির্ভাবে (গীতার ভাবানুসারে যা ঐশী সম্ভূতি) মানবসমাজে সর্বোদয়ের সূচনা হয়। মানুষের অন্তর্মুখ সমস্ত শক্তির মধ্যে ধর্মের প্রেরণাই প্রবল বলে ধর্মকে কেন্দ্র করেই অবতারপুরুষ অথবা অবতারকল্প মহাপুরুষের প্রভাব সক্রিয় হয়। যাঁরা অধ্যাত্মসাধন পথিক তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যেতে থাকে—গভীরতর সত্যের সন্ধানী হওয়ার অনুপ্রেরণা তাঁদের অন্তরে জাগে। যাঁরা বীর্যবান পুরুষ, তাঁরা লোককল্যাণের জন্য অথবা সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে মহনীয় কোন সৃষ্টির জন্য দুঃসাধ্য কর্মে উদ্যোগী হন। সাধারণ মানুষ সমভাবাপন্ন হয়ে সুষম জীবনাচরণে উৎসাহী হয়। দুষ্কৃতির প্রবৃত্তি চিরতরে বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব না হলেও অবনমিত (অবদমিত নয়) হয়। সামগ্রিকভাবে 'অধর্ম-বিনাশ' সম্ভাব্য নয় (তত্ত্বদৃষ্টিতে 'অবিদ্যা' বা 'অজ্ঞান' সমূলে বিনষ্ট হলে সৃষ্টিই থাকে না); ধর্ম-অধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতেই মানুষের জীবন (ব্যষ্টি সমষ্টি দুই-ই) এগিয়ে চলে। "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা।" অধর্ম যখন প্রবল হয়, তখন সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সবেতেই অবক্ষয় দেখা দেয়; আর ধর্ম অধর্মকে ছাপিয়ে উঠলে—সর্বময় শ্রীবৃদ্ধি।

অবতার বা মহামানব যাঁরা তাঁরা পুরাতন যা-কিছু সব ধ্বংস করে নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে আসেন না। তাঁরাও বিপ্লবী, তবে প্রচলিত অর্থে নয়। মহাবিপ্লবী যাঁরা, তাঁদের প্রক্রিয়াই আলাদা। যীশুখ্রীস্টের একটি কথা মনে পড়েঃ "আমি ভেঙে দিতে আসিনি, এসেছি পূর্ণ করে দিতে।" মানুষের ব্যষ্টি বা সমষ্টিজীবনে যেখানে যে অভাব দেখা দেয় সেটি সম্পূরণ করে দেওয়ার জন্যই তাঁদের আবির্ভাব—সেই তাঁদের জীবনসাধনা, জীবনবাণীও। যতদিন তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে ততদিনই মানবসমাজের ক্রম-অভ্যুদয়।

॥ ২ ॥

ধর্মনিষ্ঠ এবং অধ্যাত্মমুখী জীবনসাধনার ইতিহাসের ধারা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত চয়ন করা যেতে পারে

কিভাবে মানুষের অন্তরে ধর্মচেতনার উন্মেষ হয়েছিল তা নিয়ে শ্রমশীল গবেষকদের বিদগ্ধজনোচিত আলোচনার অনুধাবন বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। কেবল এইমাত্র লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, সুপ্রাচীন কালেই ধর্মভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দেবকল্পনার উদ্ভব হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং গ্রীসে দেবকল্পনার সঙ্গে নানা কাহিনী রচিত হয়েছে, পৌরাণিক সাহিত্য কেবল ধর্মীয় প্রেরণা নয় জাতীয় প্রেরণাও সঞ্চার করেছে। মূর্তিশিল্প আশ্রয় করে পৌরাণিক দেব-দেবী বিশিষ্ট আকারে রূপায়িত হয়ে জাতির সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় আর্যসংস্কারে (ব্যাপকভাবে ইন্দো-ইরানীয় আর্য সংস্কৃতিতেও বলা যায়) দেবকল্পনা থাকলেও মূর্তিচিন্তা ছিল না। দেবতার বিভিন্ন ক্রিয়ার বর্ণনায় (যা মুখ্যতঃ রূপকাশ্রয়ী বা সঙ্কেতময়) মানবিক বৃত্তির আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু সে-দেবতাকে বিশিষ্টরূপে মূর্ত না করে যেন বিমূর্ত সত্তারূপেই ভাবনা করা হয়েছে। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁদের স্বভাবে যে সৃষ্টির প্রেরণা ছিল তা মুখ্যতঃ

রূপের পরিবর্তে বাক্‌কে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে সমুদ্ভূত হয়েছে বৈদিক মন্ত্রসাহিত্য, যা চিরায়ত ধ্রুবসাহিত্যরূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। নিছক প্রাচীনত্বের জন্য নয়—ওতপ্রোত ভাবস্পন্দ আর উপলব্ধির গভীরতাই ঐ বিপুল সাহিত্যের (বিশেষতঃ সংহিতা আর উপনিষদের) অমেয় সম্পদ।

ভারতীয় সংস্কারে বেদমন্ত্র অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষবিশেষের প্রযত্নে রচিত হয়নি। ঋষিরা মন্ত্র দর্শন করেছেন—শাশ্বতী বাণী তাঁদের কাছে আবির্ভূত হয়েছে, তাঁরা সেটিকে প্রকাশ করেছেন। অলৌকিক বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় ঠিক তা নয়। বেদমন্ত্র আর আর্যসাধনা সম্পর্কে অনির্বাণের সূত্রাকারে নির্দেশ অনুধাবনযোগ্য। 'বেদমীমাংসা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাঁর মননীয় উক্তি ঃ "মন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'মীমাংসা'। দুটি সংজ্ঞা একই ধাতু থেকে এসেছে। মন্ত্র দেবাবিষ্ট মননের স্বতোবিচ্ছুরণ, আর অভ্যাসের দ্বারা তাকে বুদ্ধিগত করবার প্রচেষ্টা হলো মীমাংসা। মন্ত্রের রহস্যকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে তার প্রতিপাদ্য কর্মচোদনা ও জ্ঞানপ্রেরণাকে সুসংবদ্ধ রূপ দেবার স্বাভাবিক চেষ্টা হতে ব্রাহ্মণগুলির আবির্ভাব।" ('প্রাক্‌কথন')

গভীর ধ্যানে দেবতার যে ভাবরূপ অন্তরের অন্তস্তলে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার বাঙ্ময় উৎসারণই মন্ত্র। মন্ত্র রচনামাত্র নয়, আবির্ভাব। শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদ্ভব ও প্রকাশও প্রায় একই প্রক্রিয়ায় হয় বলে সে কাব্যপাঠের আনন্দকে আলঙ্কারিকরা বলেছেন ঃ 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'। মন্ত্রদ্রষ্টার হৃদয়ে যে ভাবরূপ প্রকাশিত হয়, যিনি অন্তর্মুখ ও তন্ময় হয়ে সে-মন্ত্র ধ্যান করেন তাঁর অন্তরেও তার প্রতিরূপ ফুটে ওঠে। নিয়ত অভ্যাসযোগে মন্ত্রকে মননসহায়ে বোধরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য যে বহিরঙ্গ-প্রক্রিয়ার সহায়তা নেওয়া হয় তা-ই 'যজ্ঞ'।

আদিতে মননের সহযোগী মাত্র হলেও কালক্রমে অন্তর্মুখ ধ্যানের প্রেরণা যখন কমে এসেছে, তখন সেই অনুপাতে বহিরঙ্গ উপকরণের সম্ভার বেড়ে গেছে, আনুষ্ঠানিকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রকৃতিই এই ঃ "স্বয়ম্ভু বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে মেরে (যেন) রেখেছেন, তাই (দ্রষ্টা) বাইরেটাই দেখে, অন্তরে আত্মস্বরূপকে দেখে না।" (কঠ উপনিষদ্, ২।১।১)। মন্ত্রপাঠ থেকে শুরু করে আচার-অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধ নিয়ে শাস্ত্র রচিত হয়েছে। কিন্তু মন্ত্র যে মননের বিষয়, ধ্যানেই যে তার মর্মবোধ, এ চেতনা ক্রমে হারিয়ে গেছে। শুধু দু-চারজন মনীষী অন্তর্মুখ সাধনার ধারাটি রক্ষা করেছেন—সমভাবুক অধিকারী শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে সেটিকে প্রবাহিত রেখেছেন।

এর মধ্যে সমাজের গড়ন পালটাতে শুরু করেছে। বিত্ত আর প্রতাপ ক্ষত্রিয়সমাজে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ব্রাহ্মণের মর্যাদা অবশ্য অবনমিত হয়নি, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের গরিমা ক্রমবর্ধমান হয়েছে। প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বেড়েছে। সুতরাং স্বভাবে সংস্কারে ধর্মপ্রাণ বিশেষতঃ আর্যসাধনায় শ্রদ্ধাশীল হলেও সে-সাধনায় স্বয়ংপ্রবৃত্ত হওয়ার অবকাশ তাঁরা পেতেন না। স্বাভাবিক বিকল্প ছিল যজ্ঞশালা নির্মাণ করে প্রতিনিধিরূপে সুদক্ষ যাজ্ঞিকদের বরণ যা বাস্তবিকপক্ষে নিয়োগই। সে-দৃষ্টান্ত আদর্শবৎ লোকসমাজে সঞ্চারিত হয়েছে, ক্রমশঃ জটিল জীবনে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ পারিবারিক ধর্মাচরণের সঞ্চালক নিয়োগ করেছেন—যার ফলে পুরোহিততন্ত্রের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, অতঃপর সামাজিক বিধানে প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।

পুরোহিতকুলের প্রভাবে (কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও তাঁদের স্বার্থগত প্রয়োজনেও) ধর্মসাধনায় আচার-আচরণ অথবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণে প্রকার-প্রকরণই মুখ্য হয়ে উঠেছে, ধ্যানযোগ বা দেবভাবনার আদর্শ অন্তরালে চলে গেছে। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিত্য নূতন অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়েছে, প্রাণের আবেগ বা হৃদয়ের আকুতির স্থান নিয়েছে জটিল থেকে জটিলতর পদ্ধতি—যার প্রয়োগে পুরোহিতসমাজেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। পুরোহিতরাই ছিলেন যজমানের (যিনি স্বয়ং যজন করে চলেছেন ব্যুৎপত্তিগত এই অর্থে নয়) ঐহিক ও পারত্রিক হিতসাধক ও সুফলদানের বিধাতা।

যাঁদের অন্তরে ধর্মপ্রেরণা বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য আকুলতা প্রবল এই বকলমে ধর্মসাধনার বিধিব্যবস্থায় তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। বৈদিক যুগ থেকেই যজ্ঞক্রিয়াযোগের সঙ্গে সঙ্গে নিরালম্বন অন্তর্মুখ সাধনার ধারা প্রবাহিত আসছে,হয়ে

সংহিতার অনেক মন্ত্রেই তার পরিচয় আছে। সদানুভবোৎসুক সাধনার আদর্শ সুনির্দেশ্য আকার নিয়েছে উপনিষদে, অন্তর্ময় উপলব্ধির 'আদেশ' বা সংকেতই যার মর্মকথা। ধর্মাচরণ যখন উপকরণবহুল অনুষ্ঠানসর্বস্ব (বিশেষতঃ ব্যয়সাধ্য) হয়ে পড়েছে, ঔপনিষদ-সাধনার ধারা প্রক্ষীণ হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সাধকগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়েছে, তখন ঐ বহির্মুখ ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম-পথিকদের একটা বড় অংশ ত্যাগব্রতী হয়ে কঠোর তপস্যা ও তিতিক্ষার পথ বেছে নিয়েছেন। ভোগময় জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আর অনুষ্ঠানসর্বস্ব নিষ্প্রাণ ক্রিয়াকর্মে শ্রদ্ধার অভাবও ছিল তার সহযোগী কারণ। সম্ভবতঃ সুপ্রাচীন যোগসাধনার আদর্শ ঐ যতি-সাধকদের অন্যতম (মুখ্যও হতে পারে) প্রেরণা ছিল। এই সাধনপথ অবলম্বন করে ক্রমে গভীরতর উপলব্ধিতে উপনীত হয়ে ঐতিহাসিক যুগে আবির্ভূত হয়েছেন ভগবান বুদ্ধ, কবি জয়দেব দশাবতারস্তোত্রে যাঁকে নবম অবতাররূপে বন্দনা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের 'বিদ্রোহী সন্তান' বলেছেন। ঐ বিদ্রোহ সমকালের সমাজে প্রচলিত ধর্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে—নিষ্প্রাণ নির্মম আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে। যা মানুষকে মুক্তি দেবে তা-ই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিষ্পেষিত করছিল। বুদ্ধদেব ধর্মের যে-আদর্শ প্রচার করলেন তা ভারতের চিরায়ত ধর্মসাধনারই বিশিষ্ট রূপ। মজ্ঝিম পন্থা—মধ্য পথ—ভোগের প্রাচুর্য নয়, আবার দেহকে নিষ্পেষিত করে কঠোর তিতিক্ষাও নয়; সুমিত জীবনযাপন—বৈদিক ঋষিদের জীবনে যার আদর্শ আছে। পঞ্চশীল—নৈতিক বিধিনিষেধ, মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা, ব্রহ্মবিহার। ভারতের চিরন্তন সাধনাদর্শকে জীবনাচরণের সঙ্গে মিলিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপনা। বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন সন্ন্যাসী, তাঁর শিষ্যরা ছিলেন ভিক্ষু। তিনি ত্যাগব্রতই প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রভাবে সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতি উজ্জীবিত হয়েছিল। তাঁর আবির্ভাবের পর কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতের যে সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি হয়েছিল, পরবর্তী কালে গুপ্তযুগ ছাড়া আর কখনো তা হয়নি।

সীমিত অর্থে খ্রীস্টধর্মকেও ইহুদীধর্মের বিদ্রোহী সন্তান বলা যেতে পারে। ইহুদীধর্মের মূল কথা—একতম ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সম্ভ্রম, নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপন। কালক্রমে ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্চনায় রূপান্তরিত হয়ে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত হয়েছে—জেরুজালেমে জাঁকিয়ে উঠেছে ধর্মব্যবসা। লোভী পুরোহিত ধর্মধ্বজী আর স্মার্ত পণ্ডিতরা ধর্মবিশ্বাসী লোকসাধারণকে শোষণ করেছে, অবকাশ পেলে নিপীড়ন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। নীতির স্থান নিয়েছে আচারের অজস্র বিধিবিধান, জাতির জীবনকে যা পঙ্গু করে ফেলেছিল, যীশু এলেন প্রেমের বাণী নিয়ে। ধর্মজীবনের সার দুটি কথা বললেন—মনপ্রাণ সবকিছু দিয়ে ভালবাস বিশ্বভুবনের নিয়ন্তা ঈশ্বরকে (যাঁকে তিনি হৃদয়ের গভীর অনুভব থেকে পিতৃসম্ভাষণ করেছেন); আর ভালবাস তোমার প্রতিবেশীকে—আত্মবৎ ভালবাস, পর ভেবে নয়। মানবপুত্র মানুষকে প্রেমের ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে চাইলেন। সমকাল যে বিপ্লবের বাণীর মর্ম বুঝল না, তাঁকে সইতে না পেরে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করল। তবুও সত্যের যে উপলব্ধি তাঁর অলোকসামান্য জীবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল, দেশকাল অতিক্রম করে তা দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিন্নতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন হজরত মহম্মদ। ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে তিনি বন্দিত। ধর্মগ্লানি দূর করার জন্য তরবারি ধারণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। তাঁর পৌরুষময় প্রেরণায় আরবজাতির প্রাণশক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। কয়েক শতকের মধ্যে ইসলাম যে কিভাবে অমিত পরাক্রমে নিজেকে বিস্ফারিত করে দেশে দেশে সুপ্রতিষ্ঠ করেছে সভ্যতার ইতিহাসে সে এক বিস্ময়।

শঙ্করাবতার বলে বন্দিত হলেও আচার্য শঙ্করকে ঈশাবতাররূপে গণনা করা হয় না—আধিকারিক পুরুষ তিনি। স্বয়ং মুক্তিলাভ করলেও বিশেষ অধিকারে তাঁর আচার্যের ভূমিকা। ভারতভূমিতে ধর্মগ্লানি দূর করে ব্রাহ্মণ্যধর্ম দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য তাঁর আবির্ভাব। ভারতে আর্য অর্থাৎ বৈদিক সাধনার মতোই শৈব-শাক্ত সাধনা আর বৈষ্ণব-সাধনা সুপ্রাচীন। পরে বৌদ্ধ আর জৈনধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে। আচার্য শঙ্কর যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন,

ভারতের ধর্মসাধনপ্রণালী তখন বহুধাবিভক্ত, অধ্যাত্মসাধনার প্রেরণা নিস্তেজ। বিশেষতঃ শৈব বা শাক্ত সাধনার বীরাচারী সাধনপদ্ধতি (সাধারণভাবে যেটিকে তান্ত্রিক সাধনা বলা হয়) বিকৃত আকারে বিভিন্ন ধর্মাদর্শে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, বিশেষতঃ ভারতে একদা সুবিস্তৃত বৈরাগ্যনির্ভর উদার বৌদ্ধধর্মের প্রাণশক্তি হরণ করেছিল। ধর্মভাবনার ধর্মসাধনার সেই নৈরাজ্যের যুগে আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তের সমুচ্চ আদর্শ নিয়ে এসেছেন, জ্ঞানাশ্রয়ী বিচারমার্গের প্রবর্তন করেছেন। আশ্চর্য ধীশক্তিবলে তিনি সমকালের মুখ্য প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক আশ্রয় শাণিত দার্শনিক বিচারে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। উত্তরকালে অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্ব অবশ্যই সর্বজনগৃহীত হয়নি, তাঁর থেকে স্বতন্ত্র ধারায় অথবা তাঁকে আক্রমণ করে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মদর্শনের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু আচার্য শঙ্কর ধর্মচিন্তা ও ধর্মাদর্শকে যে বৌদ্ধিক স্তরে সমুন্নীত করেছিলেন তার প্রভাবে প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিই সুমার্জিত আকারে প্রকাশিত হতে পেরেছে। যাঁরা ভক্তিমার্গী তাঁরাও জ্ঞানমার্গীদের মতোই কূট দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

॥ ৩ ॥

সম্প্রদায়বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই আচার্য শঙ্করের প্রবর্তিত ধারায় সন্ন্যাসী। সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধানে তাঁরা যখন অবতীর্ণ হয়েছেন তখন জাতির সঙ্কটকাল। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে বহিরাগত মুসলমানরা প্রায় তিনশো বছরে বাংলায় কেবল রাষ্ট্রিক শাসন নয়, আগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করেছে—কয়েক শতাব্দীর অবক্ষয়ে বাংলার হিন্দুসমাজ তখন সংহতি হারিয়ে ফেলে বিপর্যস্ত। নবদ্বীপ বা আরো কোন কোন সমৃদ্ধ স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকুল বিদ্যাগরিমায় অসাধারণ হলেও সমাজের যথার্থ নেতা হওয়ার মতো শক্তির অধিকারী ছিলেন না। আঠারো-আনা আচার-পরায়ণ অপিচ দেবার্চনায় নিষ্ঠাবান হলেও গভীর আধ্যাত্মিক আকুতি তাঁদের ছিল না। মুসলমান আক্রমণকে তাঁরা উৎপাত বলেই যেন মেনে নিয়েছিলেন, প্রতিঘাত তো দূরের কথা প্রতিরোধের চেষ্টাও তাঁরা করেননি।

শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে দুভাবে উজ্জীবিত করেছেন। তাঁর সমবেত নামসঙ্কীর্তন প্রচার হিন্দুসমাজকে সুসংবদ্ধ করেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান করে তিনি সেকালের বৃহত্তর হিন্দুসমাজকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী করে তুলেছেন। নবদ্বীপে কাজীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নগরকীর্তনে যে 'সত্যাগ্রহ'-আন্দোলনের সূত্রপাত, তার প্রভাব ক্রমে ক্রমে সারা দেশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এর পর বাংলায় মুসলমান শাসন ব্যাপ্ত হলেও হিন্দুসমাজ ঘোর বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্টতম ভূমিকা প্রেমাশ্রিত ভক্তিসাধনার আদর্শ প্রচার। প্রেমাভক্তির আদর্শ তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছিল। সেই সজীব আদর্শ দেখে সমকালের সাধকরা প্রেরণা পেয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় ধর্ম আর সংস্কৃতির নবজাগরণ হয়েছে। ঐকালের বাতাবরণে রাষ্ট্রিক চেতনার বিকাশ সম্ভবপর ছিল না, অন্য সব ক্ষেত্রেই অভ্যুদয় সাধিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্ট পার্ষদদের কয়েকজন তাঁর অনুপম সাধনাদর্শকে সুনির্দিষ্ট আকার দিয়ে ভারতের ধর্মদর্শনের ইতিহাসে নব অধ্যায় সংযোজন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছেন তখন বাংলা রাষ্ট্রিক, আর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—জীবনসাধনার সব দিক দিয়েই বিপর্যস্ত—তার উপর তেজীয়ান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাত, জাতির বৃহত্তর অংশের শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি দৈন্যগ্রস্ত। সমাজনেতারূপে বন্দিত ব্রাহ্মণসমাজের একাংশ স্বকেন্দ্রিক, অপরাংশ (এঁরাই সংখ্যায় বেশি) নিস্তেজ নির্বীর্য। ইংরেজীশিক্ষিত নব্য সমাজ পথের সন্ধান না পেয়ে দিশাহারা। কয়েকজন উৎসাহী উদ্যোগী পুরুষের সমাবেশে সহযোগে পরিপুষ্ট হলেও ব্রাহ্মসমাজ সুবৃহৎ জাতির মর্ম স্পর্শ করতে পারেনি।

এই যুগসঙ্কটকালে ভারতের চিরন্তন সাধনার বিগ্রহরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। শাস্ত্রনিবদ্ধ বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর মধ্যে যে সার-সত্য আছে এটি তিনি নিজে সাধনা করে প্রমাণ করলেন। খ্রীস্টান

আর ইসলামী সাধনপ্রণালী অনুসরণ করে তিনি সর্বধর্মেই যে সার-সত্য আছে এটি প্রতিপাদন করলেন। তাঁর 'যত মত তত পথ' বাণী ও উপলব্ধি আধুনিক যুগের উপযোগী ধর্মীয় সহাবস্থানের মূল সূত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈপ্লবিক অপর দুটি বাণী—"ঈশ্বরলাভই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য" আর "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। প্রথমটি সমকালের এবং উত্তরকালেও মানুষের ভাবনাকে অন্তর্মুখ হতে প্রেরণা দিয়েছে, দিয়ে আসবে। মানুষের জীবন-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু যে ঈশ্বরচেতনা—এই সত্যটিই সংক্ষোভতাড়িত মানুষকে আত্মবিশ্বাসী আর আত্ম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বাণীটিকে রূপায়িত করার জন্য প্রাণপাত করে বরণীয় এক আদর্শে মানবসমাজকে উদ্দীপ্ত করেছেন। আঠারো-উনিশ শতকের পাশ্চাত্য মানবতাবাদ এই ভাবদৃষ্টির প্রেরণায় সমুচ্চ ভূমিতে উন্নীত হয়েছে।

রামচরিতমানস অনুসারে

রামচন্দ্রের বনবাসে ভরতের দুঃখ

স্বামী পুরাণানন্দ

রামচরিতমানসকার গোস্বামী তুলসীদাস মঙ্গলা-চরণে দেবাদির বন্দনা সমাপনান্তে ভরত-বন্দনামুখে একটি চোপাইয়ে তুলসীদাস ভরত-চরিত্রের অনুপম মাধুর্য কীর্তন করেছেন।

"প্রনবউঁ প্রথম ভরত কে চরণা।
জামু নেম ব্রত জাই ন বরনা ॥
রাম চরণ পঙ্কজ মন জামু।
লুবুধ মধুপ ইব তজই ন পামু ॥" (বালকাণ্ড* ৩৩)

—প্রথমে আমি ভরতের চরণ বন্দনা করি—যিনি স্বীয় চরিত্রে সুনীতি ও ব্রতনিষ্ঠার যে দুঃসাধ্য মানসিক বলিষ্ঠতা বিকশিত করেছেন, তা অবর্ণনীয়। (শুধু তাই নয়) শ্রীরামচন্দ্রের চরণ যেন দিব্য সৌরভময় এক প্রস্ফুটিত কমল, যার প্রতি ভরতের চিত্ত যেন সদালুব্ধ এক মধুকর। মধু ভিন্ন অন্য রসে মধুকরের যেমন নিতান্ত অনীহা, ভরতের চিত্তভ্রমরও তেমনি হরি-পাদপদ্মের রসাস্বাদন ছেড়ে বিষয়রস নিয়ে কখনো বিলাস করে না।

রামচন্দ্রাদি চার ভাইয়ের বিবাহান্তে সকলে মিথিলা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। দিকে দিকে যেন আনন্দ-সমীরণ বইছে। এমন সময় রাজা দশরথ একদিন কুলগুরু বশিষ্ঠ সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর দীর্ঘকালের অভিলাষ জ্ঞাপন করে বললেন: "হে নাথ, রাম সকল প্রকারে যোগ্য হয়েছে, পুরবাসীরাও তাকে প্রাণপ্রিয় জ্ঞান করে। এই অবস্থায় আপনার প্রসন্ন অনুমোদন পেলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা করতে পারি।" রাজগুরু বশিষ্ঠ পৃষ্ট বিষয়ে সানন্দসম্মতি দিয়ে বললেন: "হে রাজন্, শ্রবণ করুন—যাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে, অতিক্রান্ত ব্যর্থ সময়ের জন্য মানুষ পশ্চাত্তাপ করে, যাঁর ভজন বিনা ত্রিতাপজ্বালা নিবারণের উপায়ান্তর নেই, সেই বিশ্বপিতাই আপনার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে আপনার পুত্রত্ব স্বীকার করেছেন জানবেন। অতএব কালবিলম্ব না করে শীঘ্র রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন করুন।" দশরথ যখন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের জন্য উদ্যমী হন, তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে ছিলেন। অনন্তর দশরথের আদেশে মন্ত্রী সুমন্ত্র রাজ্যাভি-ষেকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করলেন। ক্রমে এই শুভসংবাদ শুনে প্রজাবৃন্দ অত্যন্ত পুলকিত হলেন এবং অধীর অপেক্ষায় এই সর্বজনবাঞ্ছিত

---

* উদ্ধৃতিগুলো ৺সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত এবং খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রামচরিতমানসের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে গৃহীত। 'ণ', 'ষ', 'শ'-স্থলে তুলসীদাস প্রায়ই 'ন', 'জ' এবং 'স'-এর ব্যবহার করেছেন।

অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় একদিন রামচন্দ্র ও সীতার দেহে ভাবী মঙ্গলসূচক অঙ্গস্ফুরণ হলে তাঁরা ভাবলেন, শীঘ্রই তাহলে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ভরতের প্রতি রামচন্দ্রের মমতা কত গভীর ছিল বোঝাতে গিয়ে তুলসীদাস বলেছেন ঃ

রামহিঁ বন্ধুসোচু দিনরাতি।
অণ্ডনহি কর্মঠ হৃদয় জেহি ভাতী॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৮)

—অর্থাৎ তটে স্থাপিত স্বীয় ডিম্বগুলির জন্য জলে বিচরণরত কচ্ছপের যেমন সর্বদা এক মমতাপূর্ণ ও উৎকণ্ঠিত চিন্তা থাকে, শ্রীরামচন্দ্রও তেমনি সুগভীর মমতায় সর্বদা ভরতের কথা ভাবতেন।

শ্রীরামচন্দ্রের আসন্ন রাজ্যাভিষেকের শুভ ও প্রীতিজনক সংবাদে সকলে যখন আহ্লাদিত, সেই সময় সুরপুরে দেবতারা প্রমাদ গণলেন; ভাবলেন, ভগবান রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হলে তো তিনি অযোধ্যাতেই থাকবেন—তাহলে তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য প্রয়োজন রাবণ-বধ কি করে সিদ্ধ হবে? কি করেই বা দেবতাদের ও পৃথিবীর দুঃখ দূর হবে? অযোধ্যা পুরবাসীর মহানন্দের অবকাশে দেবতারা গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হলেন। দেবতাদের এই মানসিকতার ওপর তুলসীদাসের মন্তব্য একদিকে যেমন সরস তেমনি সুতীক্ষ্ন। তিনি বলেছেন ঃ

...চোরহিঁ চাঁদিনি রাতি ন ভাবা।

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১২)

—অর্থাৎ মেঘনির্মুক্ত আকাশে পূর্ণচন্দ্রোদয় হলে তার স্নিগ্ধবিমল জ্যোৎস্নাধারায় সকলেই পরমানন্দিত হয়, কিন্তু চোরের পক্ষে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি দুঃখকরই হয়ে থাকে।

অতঃপর দেবতাদের অনুরোধে দেবী সরস্বতী অযোধ্যায় এসে কৈকেয়ীর দাসী মন্থরাতে আবিষ্ট হয়ে তার বুদ্ধির বিভ্রম ঘটালেন। কুটিল বুদ্ধির আবেশে মন্থরা তখন কৈকেয়ীকে রামচন্দ্রের প্রস্তাবিত আসন্ন রাজ্যাভিষেকের কথা জানিয়ে বলল ঃ সত্যিই যদি তা হয় তবে তাঁর (কৈকেয়ী) মহাদুর্দিনও আগতপ্রায়। রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনে কৈকেয়ী অত্যন্ত পুলকিতা হয়ে বললেন—সূর্যবংশের তো এই রীতি; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজসিংহাসনে বসেন এবং অন্য ভাইয়েরা তাঁর সেবা করেন। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে মন্থরা, তুমি যা চাইবে তাই দেব। কৈকেয়ী আরও বললেন ঃ দেখ মন্থরা, রামের স্বভাব কি অলৌকিক সৌজন্যপূর্ণ; কৌশল্যার মতো সকল মায়েদের প্রতিই রাম সমভাবে অনুরাগপূর্ণ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

কিন্তু দেবতাদের চক্রান্তে অচিরেই কৈকেয়ীর রাম-বাৎসল্য প্রজ্বলিত কর্পূরের ন্যায় উবে গেল। মন্থরার পরামর্শানুসারে চলাতেই তাঁর কল্যাণ সুনিশ্চিত—কৈকেয়ীর এমন ধারণা হলো। মন্থরা তখন কৈকেয়ীকে আরও বলল ঃ "তোমার অকল্যাণ আমার পক্ষে অসহনীয় বলেই প্রস্তাবিত রামরাজ্যাভিষেকরূপ তোমার এই আশু বিপদের প্রতিবিধানের উপায় আমি ভেবে রেখেছি। তুমিই তো আমায় বলেছিলে, রাজা দশরথ প্রসন্ন হয়ে অতীতে তোমাকে দুটি বর দিতে চাইলে তুমি তাঁকে বলেছিলে প্রয়োজনমতো পরে চেয়ে নেব। এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে—দুটি বরের একটিতে রামের চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস এবং অপরটিতে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করবে। আর, তুমি এখন গোসাঘরে চলে যাও।"

এদিকে রাজা দশরথ অত্যন্ত প্রসন্ন হৃদয়ে রাম রাজ্যাভিষেকের শুভসংবাদ দিতে দিনান্তে কৈকেয়ীর ঘরে এলেন। এসে যখন শুনলেন কৈকেয়ী কোপভবনে গিয়েছেন তখন অত্যন্ত ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে গেলেন। কৈকেয়ীর কোপ শান্ত করবার জন্য দশরথ অনেক অনুনয়-বিনয় করেও ব্যর্থ হয়ে শেষে বললেন ঃ "রামের শপথ নিয়ে বলছি, কৈকেয়ী, তুমি যা চাইবে তাই দেব, তুমি প্রসন্ন হও।" কৈকেয়ী তখন উপযুক্ত অবসর বুঝে দশরথের পূর্ব-প্রতিশ্রুত বর দুটির একটিতে ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং অপরটিতে চৌদ্দ বছরের জন্য রামের বনবাস চাইলেন।

এই অচিন্তনীয় প্রার্থনায় দশরথ মর্মান্তিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। প্রাণপ্রিয় রামের বনবাস তাঁর কাছে নিতান্তই অকল্পনীয় ও অসহনীয় ছিল। বারবার তিনি কৈকেয়ীকে অন্য কিছু চাইতে বললেন, কিন্তু কৈকেয়ী শুনলেন না। রামের বিরহে তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব জেনেও, সত্যনিষ্ঠ দশরথ কৈকেয়ীকে বলতে পারলেন না যে, রাম-বনবাসের প্রার্থনা পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব

নয়। এই পরিণতির কথা জ্ঞাত হয়ে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য সানন্দে বনে গেলেন—সীতা ও লক্ষ্মণের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁদেরও সঙ্গে নিলেন। এদিকে রাজা দশরথ রামবিরহে 'রাম, হে রাম' বলতে বলতে দেহত্যাগ করে স্বর্গে গেলেন ঃ

রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।
তনু পরিহরি রঘুবরবিরহঁ রাউ গয়উ সুরধাম ॥
(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫৬)

অনন্তর রাজগুরু বশিষ্ঠ ভরতের মাতুলালয়ে দূত পাঠিয়ে দুভাইকে অযোধ্যায় ডেকে পাঠালেন; তবে দশরথের স্বর্গারোহণের কথা গোপন রাখতে আদেশ দিলেন। এদিকে যেদিন থেকে দেব-চক্রান্তে অযোধ্যায় এই অনর্থ শুরু হলো সেদিন থেকে মাতুলালয়ে ভরত নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখছিলেন। রাতে তিনি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখতেন আর প্রভাতে জেগে নানা আশঙ্কায় চিন্তামগ্ন থাকতেন। বাবা-মা, ভাই, পরিজন প্রভৃতি সকলের কুশল কামনা করে ভরত ব্রাহ্মণভোজন, দান, শিবপুজো ও প্রার্থনা ইত্যাদি করছিলেন। এমন সময় অযোধ্যা থেকে দূত এসে বশিষ্টদেবের আহ্বান জানাল।

গভীর এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আচ্ছন্ন ভরত ও শত্রুঘ্ন বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অযোধ্যাভিমুখে চললেন। এক নিমেষকাল সময় ভরতের কাছে বর্ষসম দীর্ঘ ও দুর্বহ ভারতুল্য মনে হচ্ছিল। অযোধ্যার কাছাকাছি এসে ভরত দেখলেন সমস্ত প্রকৃতি যেন শ্রীহীন হয়ে আছে—পশুপাখি সব যেন কি এক গভীর বেদনায় ম্রিয়মান; যেন সকলের যথাসর্বস্ব ধন অপহৃত হয়েছে। নগরে প্রবেশ করবার পর নানা দুর্লক্ষণ দেখলেন—মনে হলো সবকিছু যেন দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

এদিকে কৈকেয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্তনের সংবাদে পুলকিত অন্তরে এগিয়ে গিয়ে দ্বারদেশে ভরতের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলেন। ভরত দেখলেন সমস্ত পরিবার দুঃসহ শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে—যেন সৌরভপূর্ণ এক মনোরম পদ্মবন অকস্মাৎ তুষারপাতে বিধ্বস্ত হয়েছে। ভরতকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে কৈকেয়ী পিতৃকুলের কুশল জিজ্ঞাসা করলে ভরত মাতুলালয়ের কুশল জানিয়েই মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা, বাবা কোথায়? মায়েরা কোথায়? প্রাণপ্রিয় রাম, সীতা ও লক্ষ্মণই বা কোথায়?" পুত্রের এই আশঙ্কা ও স্নেহব্যাকুল প্রশ্ন শুনে কৈকেয়ী কপট অশ্রু বিসর্জন করে যা বললেন, তা ভরতের কাছে মর্মঘাতী তীক্ষ্ণ শূলাঘাতের মতো অসহনীয় মনে হলো। কৈকেয়ী বললেন ঃ "বাছা, মন্থরার সাহায্যে সব কাজ আমি প্রায় গুছিয়ে এনেছিলাম, কিন্তু বিধাতা একটু বিঘ্ন উৎপন্ন করেছেন—তোমার বাবা আর ইহলোকে নেই।" একথা শুনেই ভরত শোকাবেগে বিহ্বল হয়ে "পিতা, হে পিতা" বলতে বলতে ভূমিতে পড়ে গেলেন। গতাসু পিতার উদ্দেশ্যে বিলাপ করে ভরত বললেন ঃ "হায়, আপনাকে শেষ সময়ে দেখতেও পেলাম না—আর আমাকে শ্রীরামপদে সমর্পণ না করেই আপনি চলে গেলেন!" পরে ভরত মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা, বাবার এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ কি?" উত্তরে কৈকেয়ী সকল কথা খুলে বললেন। শুনে ভরত স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে রইলেন। প্রাণপ্রিয় ভাই বনে গিয়েছেন এবং স্বয়ং তিনি (ভরত) তার উপলক্ষ—এই ভেবে ভরত পিতৃবিয়োগের শোক ভুলে গেলেন। পুত্রকে শোকবিহ্বল দেখে কৈকেয়ী তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললেন ঃ "পিতার জন্য দুঃখ করো না, এখন রাজকর্ম করতে হবে তোমায়।" মায়ের এই কথায় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভরত ভাবলেন তাঁর জননী সূর্যবংশের সর্বনাশ করেছেন। তীব্র তিরস্কারে গর্জে উঠে ভরত মাকে বললেন ঃ "এই কুৎসিৎ, জঘন্য ইচ্ছাই যদি তোমার মনে ছিল, তবে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই কেন আমায় মেরে ফেলনি? মূলোৎপাটিত বৃক্ষের পাতায় জলসিঞ্চন করে তুমি সেই গাছকে বাঁচাতে চাও? জলহীন পরিবেশ সৃষ্টি করে তুমি মাছ বাঁচাতে চাও? হে নীচহৃদয়া জননি, তোমার মনে যখন এই জঘন্য চিন্তার উদয় হলো, তখনই কেন তোমার হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল না? এমন অনর্থকর বর চাইবার সময় তোমার কষ্ট হয়নি? জিহ্বা গলে যায়নি? মুখে পোকা পড়েনি? এই জগতে জীবজন্তু—সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে শ্রীরাম প্রাণতুল্য প্রিয় নন? সেই জগৎবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের তুমি শত্রুতা করতে পারলে?" বল, সত্য বল, তুমি কে? হায়, বিধাতা আমায় সূর্যবংশে জন্ম দিয়েছেন,

দশরথের মতো পিতা লাভ করেছি, ভাইও পেয়েছি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে ; আর তুমি, হে দুষ্টহৃদয়া, তুমি কিনা হলে আমার জন্মদাত্রী জননী। বিধির একি বিচিত্র বিধান।"

তারপর ভরত জননী কৌশল্যার নিকট গেলেন। গিয়ে দেখেন কৌশল্যা মলিনবসনা, বিবর্ণা, দুঃখভারে স্তব্ধ ও কৃশতনু হয়েছেন—যেন বনের স্বর্ণবর্ণা কল্পলতা আকস্মিক তুষারপাতে বিধ্বস্ত হয়েছে। ভরতকে দেখেই কৌশল্যা বাৎসল্যাবেগে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। জননীর এই অবস্থা দেখে ভরত শীঘ্র তাঁকে উঠিয়ে তাঁর চরণে প্রণত হলেন এবং শোকের বিহ্বলতায় বললেন ঃ "মা, পিতা কোথায় দেখিয়ে দাও, কোথায় সীতাদেবী ও কোথায় আমার প্রাণপ্রিয় ভাই শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ? মা, কৈকেয়ীর কেন জন্ম হয়েছিল ? এমন নারীর জন্ম যদিই বা হলো, তিনি বন্ধ্যা কেন হননি ? কৈকেয়ী থেকেই তো কুলকলংক, অপযশভাজন এবং প্রিয়জনদ্রোহী আমার জন্ম হয়েছে। আমার মতো হতভাগ্য ত্রিভুবনে আর কে আছে মা ? তোমার আজ যে এই দশা, তাও তো মা আমারই জন্য ! পিতা গত হলেন, রঘুনাথ বনে—আমিই তো এই সব অনর্থের হেতু।"

জননী কৌশল্যা ভরতের কথা শুনে সাশ্রুনয়নে তাঁকে কোলে টেনে নিলেন। তাঁর মনে হলো যেন প্রাণপ্রিয় ধন স্বয়ং শ্রীরামই ফিরে এসেছেন। ভরতের চোখের জল মুছিয়ে কৌশল্যা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ "বাছা, ভরত, অধীর হয়ো না। কুসময় জেনে শোক পরিত্যাগ কর ; কাল ও কর্মের গতি দুর্বার জেনে ধৈর্য ধারণ কর। কাউকে দোষ দিয়ো না। বিধি সর্বপ্রকারেই আমার প্রতি বাম হয়েছেন। দেখ না, এই অসহনীয় দুঃখের মধ্যেও আমায় জীবিত রেখেছেন। জানি না, আর কি তাঁর মনে আছে।"

"হে পুত্র, পিতৃআজ্ঞায় শ্রীরাম রাজভূষণ ও বস্ত্র ত্যাগ করে বল্কল ধারণপূর্বক বনে গেল। কিন্তু ওতে তাঁর না ছিল বিষাদ না হর্ষ ! তাঁর মুখকমলের স্বাভাবিক প্রসন্নতাও ম্লান হয়নি। বরং, ব্যাকুল অপর সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে রাজ্য ও সুখভোগ ছেড়ে বনে গেলেন। রামচরণানুরাগিণী সীতা রামগতপ্রাণ লক্ষ্মণও সঙ্গে গেলেন। আমি সঙ্গেও গেলাম না, আমার প্রাণও দেহবিমুক্ত হলো না। হায়, আমার হৃদয় যেন বজ্রের মতো কঠোর ! কিন্তু দেখ, তোমার পিতা জানতেন কোন্ অবস্থায় প্রাণধারণে সার্থকতা আছে এবং কোন্ অবস্থায় নেই।"

ভরত কৌশল্যাকে বললেন ঃ "মা, যদি এই হীন কর্মে আমার কোন ভূমিকা থাকে তাহলে মাতাপিতা, পুত্র, গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং বালকবধে যে পাপ হয়, মিত্র ও রাজাকে বিষদান করলে যে পাপ হয়, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা অন্যান্য আরও যে পাপানুষ্ঠান সম্ভব—সেসবই যেন আমার হয়, যদি এই হীন ষড়যন্ত্রে আমার সম্মতি থাকে শ্রীহরির উপাসনা না করে ঘোর ভূতগণের ভজনা করলে যে দুর্গতি হয়, সংসারে যে লোভী ও লম্পট—পরধন ও পরস্ত্রীর প্রতি যার দৃষ্টি—এমন নীচ ব্যক্তির যে দুর্গতি হয়, আমারও যেন সেই গতি লাভ হয়। যদি মা, এই নীচ চক্রান্তে আমার হাত থেকে থাকে, সাধুসঙ্গে যারা অনুরাগহীন, যারা সংসার-স্বপ্নে আচ্ছন্ন থেকে মোক্ষপথবিমুখ, দুর্লভ নরজন্ম পেয়েও যারা শ্রীহরির ভজনা করে না, বেদবিহিত হিতপথ ত্যাগ করে যারা অশাস্ত্রীয় পথে চলে, যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নির্দ্বিধায় অপরকে প্রতারণা করে, তাদের যে নিরতিশয় দুঃখজনক গতি লাভ হয়, ভগবান শংকর যেন আমায় সেই গতি দেন।"

ভরতের এই নিষ্কপট, অকৃত্রিম কথা শুনে কৌশল্যা বললেন ঃ "বৎস ভরত, আমি জানি তুমি কায়মনোবাক্যে রামানুরাগী। চন্দ্র বরং বিষবর্ষণ করতে পারে, বরফ থেকে তাপ বিকিরণও বরং সম্ভব, জলচর প্রাণীর জলে অনীহা হলেও হতে পারে, এমনও বরং সম্ভব যে, জ্ঞানোদয় হয়েছে অথচ মোহনাশ হয়নি, কিন্তু, ভরত, আমি জানি তোমার পক্ষে রামের প্রতিকূলতা একান্তই অসম্ভব।" এই কথা বলে কৌশল্যা পরম স্নেহে ভরতকে বুকে টেনে নিলেন। সাংসারিক দিক থেকে বলতে গেলে, যে ভরত কৌশল্যার বৈধব্য ও প্রাণপ্রিয় পুত্রের বনবাসের উপলক্ষ, সেই ভরতের জন্য কৌশল্যার এই অলৌকিক স্নেহপূর্ণ মমতাবোধ তাঁর চরিত্রকে এক দিব্য সুষমায় মণ্ডিত করেছে।

অতঃপর রাজপদ গ্রহণ করবার জন্য বশিষ্ঠ কৌশল্যা প্রভৃতি সকলের সস্নেহ ও সাগ্রহ অনুরোধ

শুনে ভরত বললেন ঃ "পিতা স্বর্গে গিয়েছেন ; রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ বনে, আর আপনারা আমাকে বলছেন রাজপদ স্বীকার করতে। বলছেন এতেই আমার ও প্রজাদের কল্যাণ হবে! কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে জানি শ্রীরামচন্দ্রের সেবাতেই আমার মঙ্গল নিহিত, যদিও জননীর ঘৃণ্য কুটিলতা আমায় সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। নিরাবরণ অঙ্গে ভূষণ যেমন ব্যর্থ বোঝা, বৈরাগ্যবান না হয়ে ব্রহ্মবিচার যেমন অর্থহীন, নানাপ্রকার ভোগ রুগ্নব্যক্তির পক্ষে যেমন মূল্যহীন, শ্রীহরিতে প্রীতিহীন মানুষের পক্ষে জপ ও যোগ যেমন ব্যর্থ, অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত, কিন্তু নিষ্প্রাণ দেহের যেমন মূল্য নেই, তেমনি রঘুপতি বিনা আমারও যে সবই ব্যর্থ! সুতরাং প্রার্থনা করি শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে যেতে আপনারা আমায় অনুমতি দিন।

"শ্রীগুরুদেব (বশিষ্ঠ) জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী মহাপুরুষ, যাঁর কাছে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড করামলকবৎ সুপরিজ্ঞাত ; তিনিও আমায় রাজতিলক দিতে চান, হায়! বিধি বিমুখ হলে সকলেই প্রতিকূল হন দেখছি। সংসার আমায় কি বলবে তা নিয়ে আমি ভাবি না—পরলোকের চিন্তাও নেই আমার। আমার হৃদয়ে শুধু এই এক দুঃসহ দাবানল জ্বলছে যে, আমারই জন্য আবাল্যসুখে লালিত রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে এখন বনবাসজনিত নিদারুণ দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়েছে। লক্ষ্মণেরই জীবন ধন্য, কেননা তিনি সর্বত্যাগ করে রাম-সীতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আপনাদের কাছে তাই আমি সবিনয়ে বলছি যে, রঘুনাথের চরণদর্শন না করলে আমার অন্তর্জ্বালা দূর হবে না। অনুমতি করুন আগামীকাল প্রভাতেই আমি শ্রীপ্রভুদর্শনে রওনা হব। যদিও কুমাতার গর্ভে আমার জন্ম, যদিও আমি সর্বদা দোষযুক্ত, তবুও আমি তো তাঁরই—তিনি আমায় ত্যাগ করবেন না, এ ভরসা আমার আছে।"

ভরতের কথা শুনে সকলেই অভিভূত হলেন এবং সকলেই ভরতের সঙ্গে রামদর্শনে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ভরত ভাবলেন, নগরের যাবতীয় সম্পত্তি রঘুনাথের—এসবের সুব্যবস্থা করে না গেলে আমি রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হব। তাই তিনি যাবতীয় সম্পত্তির দেখাশোনা করবার ভার বিশ্বাসভাজন সজ্জনের উপর ন্যস্ত করলেন। পরে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে বললেন ঃ "আমরা রাজ্যাভিষেকের সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে বনে যাব এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ বনেই শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।"

অধীর আগ্রহে বিনিদ্র রজনী শেষ হতেই সকলে রওনা হলেন। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী রথারোহণে সর্বাগ্রে চললেন। তপস্বী ও তেজসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা তারপর রওনা হলেন। মাতৃবৃন্দ তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট সুখাসনযুক্ত পালকিতে গমন করলেন। পুরবাসিগণ নানাপ্রকার যানে আরোহণ করে চললেন। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ সর্বসুখ ছেড়ে বনে রয়েছেন ভেবে ভরত ও শত্রুঘ্ন পদব্রজে চললেন। দুই ভাইকে হেঁটে যেতে দেখে নগরবাসীরা ঘোড়া, হাতি, রথ প্রভৃতি বাহন থেকে নেমে হেঁটে যেতে লাগলেন তখন কৌশল্যা ভরতের কাছে এসে বললেন ঃ "বৎস, তুমি যদি এভাবে চল তবে কেউ আর কোন বাহন ব্যবহার করবে না ; সকলেই শোকমগ্ন, হাঁটবার শক্তিই বা কার আছে বল?" তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন রথে উঠলেন।

ক্রমে ভরত সদলবলে শৃঙ্গবেরপুরের সন্নিকটে এলেন। রামসখা নিষাদরাজ গুহক ভরতের আগমন সংবাদে ভাবলেন, ভরত কেন বনে আসছেন? নিশ্চয়ই তাঁর মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে, নইলে সঙ্গে সেনা কেন? মনে হয় লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রকে হত্যা করে ভরত তাঁর রাজ্য নিষ্কণ্টক করতে চান। তবে ভরতের এই ভাব বিস্ময়কর নয়—কারণ বিষবৃক্ষে তো আর অমৃতফল ফলে না। ভরত যাতে গঙ্গা পার হয়ে শ্রীরামের কাছে যেতে না পারেন সেজন্য গুহক তাঁর আত্মীয়দের বললেন ঃ "সকলে সাবধানে থাক, সমস্ত নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে ঘাট বন্ধ করে দাও। কুটিল ভরতের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধও করতে হতে পারে—মৃত্যুর জন্য সকলে প্রস্তুত হও। প্রাণ থাকতে ভরতকে গঙ্গা পার হতে দেব না।" জনৈক বৃদ্ধ তখন গুহককে পরামর্শ দিলেন ভরতের অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা অনুচিত। সুতরাং গুহক ভরতের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। দূর থেকে বশিষ্ঠকে দেখে কাছে এসে গুহক নিজ পরিচয় দিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করলেন। গুহককে রামসখা জেনে বশিষ্ঠ তাঁকে শুভাশীর্বাদ দিয়ে ভরতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভরত তখন গভীর প্রেমাবেগে গুহকের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভরতকে দেখে গুহক দণ্ডবৎ প্রণাম করলে ভরত তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর মনে হলো যেন লক্ষ্মণের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছে। সুগভীর প্রীতির জন্য ভরতের অঙ্গে পুলক হলো এবং তিনি সপ্রেমে গুহকের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। ভরতের স্বভাব-মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে গুহক তাঁর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন এবং তাঁর বিরোধিতা করার সংকল্প করছিলেন বলে তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হলেন।

ক্রমে শৃঙ্গবেরপুর নয়ন পথে পতিত হলে, প্রেমাবেগে ভরতের সর্বাঙ্গ শিথিল হলো। তিনি নিষাদরাজের স্কন্ধে হাত রেখে চলছিলেন—যেন বিনয় ও অনুরাগের চলমান মূর্তি। ভরত গুহককে সাগ্রহে বললেন: "আমাকে ঐ স্থানে নিয়ে চল যেখানে শ্রীরাম, সীতা, এবং লক্ষ্মণ বনগমনের পথে রাতে শয়ন করেছিলেন।" বলতে বলতে তাঁর নয়নে প্রেমাশ্রু দেখা দিল। গুহক তাঁকে সেই শিশুগাছের কাছে নিয়ে গেলেন, যার শীতল ছায়ায় রামচন্দ্র বিশ্রাম করেছিলেন। ভরত সশ্রদ্ধভাবে সেই বৃক্ষকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে শয়নস্থানে এলেন এবং রামচন্দ্রের ব্যবহৃত কুশশয্যা দেখে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন এবং শ্রীরামের পদচিহ্নের ধূলি নিয়ে নিজের চোখে লাগালেন। তখন সুগভীর মর্মবেদনার সঙ্গে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভরত গুহককে বললেন: "হায়, যে রামচন্দ্র রঘুকুলশিরোমণি, যিনি সুখ ও আনন্দের নিদান, তাঁকেও কুশশয্যায় শয়ন করতে হয়েছে! দেখ গুহক, বিধাতার বিধান কেমন অপ্রতিরোধ্য! দুঃখ-ক্লেশের কথা তিনি কখনো শোনেননি—পিতা দশরথ কত স্নেহে, কত যত্নে তাঁকে পালন করেছেন, পালক যেমন অতন্দ্রভাবে নয়নকে রক্ষা করে, সাপ যেমন সর্বপ্রযত্নে তার মণিকে রক্ষা করে—জান গুহক, মায়েরা তেমনিভাবে রামচন্দ্রকে সর্বদা রক্ষা করতেন। হায়, তিনিই এখন কেবল ফলমূলাহারী হয়ে পদচারণে বনে বনে ঘুরছেন। সমস্ত অমঙ্গলের মূল কৈকেয়ীকে ধিক্, আর সকল বিড়ম্বনার হেতু আমাকেও শত ধিক্!"

রামচন্দ্রের প্রেমে ও ধ্যানে বিভোর ভরত সে-রাত শৃঙ্গবেরপুরে কাটিয়ে পরদিন নিষাদরাজসহ সদলবলে যাত্রা করে অপরাহ্নে তীর্থরাজ প্রয়াগে এসে পৌঁছলেন। পরে ত্রিবেণী দর্শন ও স্নানান্তে করজোড়ে প্রার্থনা করলেন: হে তীর্থরাজ, আপনি সকল কামনা পূর্ণ করেন, আমি ক্ষত্রিয় হয়েও স্বধর্ম ত্যাগ করে আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি—

> অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহউঁ নিরবান।
> জনম জনম রতি রামপদ য়হ বরদানু ন আন॥
>
> (অযোধ্যাকাণ্ড, ২০৫)

—অর্থ, ধর্ম বা কোন কাম্যবিষয়ে আমার রুচি নেই—নির্বাণ-গতিও চাই না আমি। জন্মে জন্মে শুধু শ্রীরামচরণে যেন আমার অনুরাগ থাকে, অন্য কোন বাঞ্ছা নেই আমার। ভরত আরও বললেন: "স্বয়ং রামচন্দ্রও না হয় আমাকে কুটিল মনে করুন, অন্যান্য সকলে না হয় আমাকে গুরুদ্রোহী ও প্রভুদ্রোহী ভাবুন, কিন্তু হে তীর্থরাজ, আপনার অনুগ্রহে রাম-সীতার চরণে আমার প্রীতি যেন দিন দিন বর্ধিত হয়।"

ভরতের এই প্রার্থনায় ত্রিবেণী থেকে এক স্নিগ্ধ-মধুর দৈববাণী শ্রুত হলো: "হে ভরত, তুমি যথার্থই সাধু, রামচরণে তোমার অনুরাগ সুগভীর। কেন তুমি বৃথা দুশ্চিন্তায় কাতর হচ্ছ? জানবে, তোমার মতো প্রিয় রামচন্দ্রের আর কেউ নেই।" ত্রিবেণী-উদ্ভূত এই দৈববাণী শুনে ভরতের শরীরে পুলক হলো ও মন বিষাদমুক্ত হয়ে প্রফুল্ল হলো। "ভরত তুমি ধন্য, তুমি ধন্য" বলে দেবতারা তখন পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

অতঃপর ভরত মুনিবর ভরদ্বাজের আশ্রমে এসে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতেই মুনিবর ভরতকে সস্নেহে উঠিয়ে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদদানে আপ্যায়িত করে বসতে আসন দিয়ে বললেন—"ভরত শোন, আমি সবই জেনেছি; বিধির বিধান অলঙ্ঘ্য জেনে ধৈর্য ধারণ কর এবং এই অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্য গর্ভধারিণীর উপর বিরূপ হয়ো না। দেব-চক্রান্তেই তাঁর বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটেছিল। তবে তুমি যে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অভিলাষে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছ—এ অতি উত্তম কথা। এমন আচরণ শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব।"

তারপর রামচন্দ্রের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ। মর্মস্পর্শী সেই অপূর্ব কাহিনী। বারান্তরে তা উপস্থাপনের অভিলাষ রইল।

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে বরাহনগর মঠের ভূমিকা

স্বামী প্রভানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ পর্যালোচনার জন্য বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে দশ হাজার প্রাণচঞ্চল তরুণ-তরুণী, কলকাতা গোলপার্কের ঝলমলে পরিবেশে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করছে দেশ-বিদেশের সুধীজন, উত্তরকাশীতে গঙ্গার তীরে কুঠিয়াতে তন্ময় হয়ে সাধনভজন করছে সাধু-ব্রহ্মচারী, ইটানগরের হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করছে চির-অবহেলিত গিরিজন, নিউ ইয়র্কের চোখ-ধাঁধানো হাই-টেক সমাজে বেদান্ত প্রচার করছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী—ভাবলে অবাক হতে হয় ক্রমপরিব্যাপ্ত এ-সকল কর্মসূচীর উৎসমুখে রয়েছে অজ্ঞাতপ্রায় কিন্তু চিরপ্রেরণাপ্রদ বরাহনগর মঠ। বরাহনগর মঠই শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব। এখানেই রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ আশ্রয় করে আদর্শোদ্দীপ্ত একদল ত্যাগী তরুণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা সেই মহৎ ভাবাদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে ধারণ করেছিলেন, গোষ্ঠীজীবনে তাকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তপস্যা-কর্ষিত বরাহনগর মঠে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, এক উজ্জ্বল মহিমায় ভবিষ্যৎ সূচিত হয়েছিল।

ইতিহাসের বিচারে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বরাহনগর মঠ। লৌকিক-অলৌকিক ঘটনার সমবায়ে উদ্ভূত বরাহনগর মঠের শুভারম্ভ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর। ভারতের রাজধানী কলকাতার উপকণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে শাশ্বত ভারতীয় তপস্যাধারার একটি নতুন আবর্ত। খরস্রোত এই আবর্ত সৃষ্টি করে প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি; ততোধিক অফুরন্ত অনুপ্রেরণা। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে আবর্তটি সরে যায় আলমবাজারে। এই সাড়ে পাঁচ বছর কাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে অনন্য। এই সময়েই রচিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-সৌধের পীঠিকার প্রথম বিন্যাসটি। একালের তপস্যাই গড়ে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ।

ঘটনার পশ্চাতে থাকে ভাব। বাহ্য ইতিহাসের আড়ালে থাকে ভাবের ধারা। সে-ধারার দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে কাশীপুর বাগানবাড়িতেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পূর্ণ উদ্যোগ হয়েছিল, মঠ-জীবনের ভাবটি দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল। বোধ করি এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ কাশীপুর বাগানবাড়ি সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ।" অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘ বারো বছরের কঠোর সাধনা সাঙ্গ করে 'যোগদৃষ্টিসহায়ে' উপলব্ধি করেছিলেন কয়েকটি ভবিতব্য সত্য। তাদের একটি হচ্ছে তাঁর জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষ অধিকারী একটি নতুন সম্প্রদায় তাঁকেই প্রবর্তন করতে হবে। শ্রীজগদম্বার উপর সদা-নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ এ-বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আহ্বান করেছিলেন, আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জগদম্বা-চিহ্নিত ব্যক্তিদের তিনি চিনতে পেরেছিলেন, শ্যামপুকুরে থাকাকালীন সর্বত্যাগে উপযুক্ত যুবকদের বাছাই করে নিয়েছিলেন, কাশীপুরে তিনি মনোনীত যুবকদের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের এগারোজনকে গেরুয়া কাপড় দিয়েছিলেন, এঁদের নেতা হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন সকলের সেরা নরেন্দ্রনাথকে; তাঁকে সর্বোচ্চ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়ে দিয়ে লোকশিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন; তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ত্যাগী তরুণগোষ্ঠীর দায়িত্ব এবং গোষ্ঠীর সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব অনুসরণের। এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গড়ে তুলেছিলেন ভবিষ্য-সঙ্ঘের বীজ। এবং সেটি সমর্পণ

করেছিলেন তাঁরই নির্বাচিত নেতা নরেন্দ্রনাথের হাতে। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানগণ জমি প্রস্তুত করেছিলেন, বীজ রোপণ করেছিলেন ও তার পরিচর্যা করেছিলেন। পরিণতিতে নবোদ্গত সবুজ অংকুর এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত করেছিল। মহৎ ভাবের এই বীজ রোপণ ও অংকুর উদ্গমনের কাহিনী নিয়েই বরাহনগর মঠের ইতিকথা।

স্বামী শিবানন্দের অভিমত, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসাধনায় ব্রহ্ম-কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটেছিল। এই জাগরণের ফলে, মহাশক্তিশালী স্প্রিং-এর মতো সম্প্রসারণোন্মুখ রামকৃষ্ণ-আন্দোলন বিকাশের তাগাদায় বরাহনগর মঠ, আলমবাজার মঠ, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানস্থিত মঠের খোলস একটির পর একটি ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার মূলকেন্দ্রটিকে বেলুড়ের বর্তমান প্রাঙ্গণে সংস্থাপন করেছে। বিশ্ব জুড়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে আন্দোলনের বিকাশের ধারা রয়েছে অব্যাহত। আর ওয়েবার (Weber) প্রমুখ সমাজ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ charisma—শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমায় অসাধারণত্ব, স্বতঃস্ফূর্ততা, শক্তি ও সৃজনীপ্রতিভা তাঁর তরুণ অনুগামীদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। পরিণতিতে তরুণদের মধ্যে ভাবনা, অনুভূতি, কর্মশক্তি এবং পরস্পরের মধ্যে নিকটসম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। চোখের সামনে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে স্বাভাবিক কারণেই এঁদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানী বলবেন শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে উত্তরণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ-উপলব্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠানীকরণ (institutionalization) ঘটেছে সমবেতভাবে বৌদ্ধিক স্তরে, ধর্মবিশ্বাসের স্তরে এবং সাংগঠনিক স্তরে। এই তিনটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনাদি ঘটেছিল এবং পরিণতিতে সঙ্ঘজীবন কতকটা দানা বেঁধেছিল বরাহনগর মঠেই। দানা বাঁধতে বিশেষ সাহায্য করেছিল আঁটপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সার্বিক ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ এবং বরাহনগরে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিকমতে সন্ন্যাসগ্রহণ। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ। অব্রাহ্মণের সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের দ্বারা একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। যাহোক Routinization of charisma বা রামকৃষ্ণমহিমার প্রথাবদ্ধকরণ প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটেছিল বরাহনগর মঠেই।* এই প্রক্রিয়ায় কাশীপুর পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা মুখ্য, অপরপক্ষে বরাহনগর পর্যায়ে নরেন্দ্রনাথই প্রধান। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা সম্যগ্‌ভাবে ধারণা করতে হলে বরাহনগর মঠের ইতিহাস অবশ্য বিচার্য।

বরাহনগর মঠের নাম 'রামকৃষ্ণ মঠ' কখনো হয়নি। একটি প্রমাণ তুলে ধরা যাক। ১৫ এপ্রিল ১৮৮৯ তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের লেখা একটি চিঠির ঠিকানা :

'পরমকল্যাণীয়/শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী/বাবাজীবন নিরাপদেষু।/বরাহনগর পরামানিক ঘাট রোড/মুনসীর পুরাতন বাটী/আত্ম-উন্নতি সভা।' অবশ্য ইতোপূর্বে বলরাম বসুর জীবিতকালে মঠবাসিগণের চিঠিপত্র তাঁর ঠিকানাতেই যেত। আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরের পাঁচ বছর পরেও নাম-নির্বাচন হয়ে ওঠেনি। ১৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন : "মঠের নাম কি হইবে, একটা স্থির তোমরাই কর।" অর্থাৎ মঠের না ছিল কোন সুস্পষ্ট নাম ও ঠিকানা, না ছিল স্থানীয় সমাজের স্বীকৃতি। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের অনেকেরই মঠের প্রতি ছিল দ্বিধা, অনীহা, এমনকি মৃদু প্রতিবাদও। মুরুব্বী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ত্যাগী ভক্তদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে খোঁটা দিয়ে বলতেন : "তাঁকে দর্শন করেছি। আবার সাধন কি ?" কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অনুগামীদের কাউকে "সন্ন্যাসীর বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিতে অনুরোধ করেননি।" এ-সকল বাধা অগ্রাহ্য করে মঠবাসিগণ ত্যাগ ও তপস্যার হোমাগ্নিতে নিজেদের আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

দীর্ঘকালের সোপান বেয়ে নেমে এসে প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ধারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল উনিশ শতকের ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ইংরেজ-শাসিত ভারতের রাজধানী কলকাতাতে। সে-সাধনার ধারা শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর ও গভীর তপস্যায় পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর সাধনার ফসল সমসাময়িক

জটিল সমাজে প্রাসঙ্গিক বলে গৃহীত হয়েছিল এবং তদানীন্তন বিপুল বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ সত্যসমূহ প্রত্যক্ষীকরণ ও স্বাত্মীকরণের জন্য মঠের ত্যাগী তাপসগণ সাধন-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ত্যাগ ও তপস্যায় সমুদ্ভাসিত তাঁদের দিনচর্যা।

তপস্যার জয়গানে মুখরিত ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র। তপ্ ধাতু থেকে তপস্যা। তপ্ ধাতুর মুখ্যার্থ সন্তাপ, দাহ, অনুতাপ, শারীরিক ক্লেশ, পুণ্য অর্জন ইত্যাদি। তপস্যার অপর একটি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ অর্থ আলোচনা বা জ্ঞান-বিচার। আচার্য শঙ্কর মুণ্ডক ও তৈত্তিরীয় ভাষ্যে তপঃ শব্দের অর্থনির্ণয়ে জ্ঞান-বিচার, ইন্দ্রিয়মনের একাগ্রতা, প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে তপস্যা খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "খুব তপস্যা চাই"; "তাঁকে লাভ করতে গেলে তপস্যা চাই"। "শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপস্যার দরকার"; "তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না"; ইত্যাদি। তপস্যার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে কৃচ্ছ্রতার ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন"; "ভগবতী নিজে পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন"। তপস্যার শক্তি প্রচুর। তপস্যার শক্তিতে অসাধ্য সাধিত হয়। তপস্যার বলেই যেন তাপস ভগবানের কৃপা আদায় করে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্ম নেন।" আমাদের আলোচ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি উক্তি ঃ "সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয়, তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল 'মা' 'মা' বলে ডাকতাম, কাঁদতাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্তানদের বলতেন, তিনি নিজে ষোল' টাং করেছিলেন, তাঁদের এক টাং করলেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই মঠের তাপসগণের সাধন-ভজন। তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরদর্শন। যীশুখ্রীস্ট বলেছেন সাধকের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের কথা। বলেছেন ঃ "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven।" এই আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্যই সাধন-ভজন। মঠের তাপসগণের অনুসৃত উপায় ছিল প্রবল পুরুষকার ও ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভরতার সার্থক সমন্বয়। যতক্ষণ না ঈশ্বরের কৃপা-বাতাস বইছে ততক্ষণ সাধকের আয়াস-প্রয়াস করতেই হবে। আবার কৃপা-বাতাসের সুযোগ গ্রহণ করতে হলেও প্রয়োজন পাল তোলার, প্রয়োজন পুরুষকারের। তাপসগণের লক্ষ্যে কৃচ্ছ্রতা ছিল না। অবশ্য কৃচ্ছ্রতা, দারিদ্র্য ইত্যাদির ভয়ে তাঁরা কখনো পেছপা হননি। ভোগবিলাসের প্রতি প্রত্যেকের ছিল অনীহা, উপস্থিত ভোগ্যবস্তুর প্রতি ছিল উপেক্ষা। তাঁদের তপস্যার ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁরা সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যা ছিল সাত্ত্বিক তপস্যা।

স্বামী শুদ্ধানন্দের মতে ত্যাগের বহিঃপ্রকাশই তপস্যা।[১] ত্যাগই প্রধান সাধন। "ত্যাগ এব হি সর্বেষাং মোক্ষসাধনমুত্তমম্।" আরও বিস্তারিত করে বলেছেন শাস্ত্রকার ঃ 'সুখত্যাগে তপোযোগং সর্বত্যাগে সমাপনম্।" অর্থাৎ বিষয়-সুখ ত্যাগই তপস্যা এবং সার্বিক ত্যাগরূপ নিঃশেষত্যাগে যোগ সমাপ্ত হয়। এই ত্যাগ আশ্রয় করেই দীর্ঘকাল নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত সাধন-ভজনে লিপ্ত হয়েছিলেন মঠের তাপসগণ। পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ সম্মুখে রেখেই তাপসগণ ভিক্ষাটন, জপ-ধ্যান, পূজা-ভজন, পাঠ-বিচার ইত্যাদিতে মেতে উঠেছিলেন। সে-সময়কার মঠ-জীবন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায় নেতা নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকে ঃ

"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত জপ-ধ্যান করতুম। তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান করে, কেউ না করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপ-ধ্যানে ডুবে যেতুম।

---

[১] উদ্বোধন, ১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩

তখন আমাদের ভিতর কি বৈরাগ্য ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না।… এমন দিনও গেছে যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫ টা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপ-ধ্যান থেকে তুলে দিত।…এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হলো তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ, নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলেছে! আহা, সেসব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি!"

খাওয়া-পরা-থাকার অভাব-অনটন-অস্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করে মঠের তপস্বিগণ লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চলেছিলেন। কয়েকদিন এঁদের মধ্যে বাস করে কথামৃতকার লিখেছেন তাঁর নিজস্ব স্মৃতিঃ "আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ।"

বরাহনগরে সাড়ে পাঁচ বছরের মঠজীবনে যে ভাবপুঞ্জ বিকশিত হয়েছিল এবং যা মঠজীবনকে ধরে রেখেছিল, সে-সম্বন্ধে ধারণা করা যায় পরবর্তী কালের মঠজীবন লক্ষ্য করলে। যেমন বলা হয়ে থাকে—"ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব" অর্থাৎ ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয়, যেমন ফল দেখে পূর্ব সংস্কারের অনুমান করা হয়। পরবর্তী কালের মঠজীবনের পরম্পরায় বরাহনগর মঠের যে ভাবমূর্তি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সেটি কঠোর তপস্বীর রূপ। সেখানে দেখা যায় কৃচ্ছ্রতায় ঘেরা পরিবেশে তাপসগণের আত্মমোক্ষের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। দিন-রাত্রির হিসাব নেই সেখানে। তাপসগণের অন্তরে ব্যাকুলতার ঝড়, তাঁদের অনুরাগ ও আবেগের পরাক্রমে সুখ-দুঃখ সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সকলের মুখে এক কথা—ঠাকুর যা করেছেন, যা আমাদের বলেছেন তা করতে পারলাম কৈ? ভগবান-দর্শন হলো কৈ? নানান দিব্যদর্শনের আস্বাদ পেয়েও তাঁরা তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। সুদূর লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে তাঁরা সাধনসাগরে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

তাপস শশীর সাধন ছিল ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করে। শ্রীরামকৃষ্ণকে মায়িক দেহে তিনি যেভাবে প্রাণমন ঢেলে সেবা করতেন পটস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবন্ত জ্ঞানে তেমনি সেবা করতেন। ঠাকুরের সেবাপূজা শশীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়গুণে হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। স্বাভাবিক কারণেই ঠাকুরঘরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল মঠজীবন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাপূজাই ছিল মঠবাসিগণের একমাত্র বাধ্যতামূলক কর্ম। মঠবাসিগণের শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল অপরের দৃষ্টান্তস্থল, সেইসঙ্গে ঠাকুরঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অভিপ্রকাশে তাঁদের উপলব্ধি ছিল সকলের প্রেরণাপ্রদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমান সন্ন্যাসীদের মঠজীবনের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে মঠের ঠাকুরঘর ও শশীর ঠাকুরের সেবাপূজা যে সাহায্য করেছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সত্যোপলব্ধির তীব্র আকাঙ্ক্ষা মঠবাসিগণের তপস্যার হোমাগ্নি উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল। সে অগ্নিতে তাপসগণের ব্যক্তিচিত্তের মালিন্য দগ্ধ হয়, চিত্তলোহা ইস্পাতে পরিণত হয়, গড়ে ওঠে তেজসম্পন্ন চরিত্র। এসকল চরিত্র সম্বন্ধে পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটি কেন্দ্রের মতো।"[২] আবার সে-অগ্নি যৌথ মানসে অঙ্কুরিত করেছিল যে অনুপম প্রীতি, তা মঠবাসীদের এক অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে সংঘবদ্ধ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রত্যাশাবিহীন ভালবাসার বাঁধনে তরুণ তাপসদের বশীভূত করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁর সহমর্মী তাপসদের ভালবাসার স্বর্ণসূত্রে বেঁধেছিলেন। এঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার স্বরূপটি ব্যাখ্যা করে প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেনঃ "এইরূপ জমাট ভালবাসা কখনো দেখি নাই। একজনের গায়ে চিমটি কাটিলে

---

[২] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ২৪৮

অপরজনে উহুঁ করিয়া উঠে।”[৩] এঁরা একে অপরের গুণগ্রাহী ছিলেন। নেতা নরেন্দ্রনাথের গুণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অপর সকলেই। কথামৃত-সূত্রে পাই রাখাল সারদাপ্রসন্নকে বলছেনঃ “কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ-ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মতো লোকের সঙ্গ। এ-ছেড়ে কোথায় যাবি?”

সন্ন্যাস জীবনের ছন্নছাড়া ভাবটি অতিক্রম করে সংহতির যে-সূত্রটি তাপসদের সঙ্ঘজীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল সেটি নির্দেশ করে কেউ বলেছেন আশ্চর্যপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গে তাপসগণের সহবাসের প্রেরণাপ্রদ স্মৃতি, কেউ বলেছেন তাপসগণের পরস্পরের মধ্যে অসাধারণ ভালবাসা, কেউ বলেছেন নরেন্দ্রনাথের অনুপম নেতৃত্ব, কেউ বা বলেছেন তাপসগণের আদর্শের প্রতি আনুগত্য ও আত্মবলি। আমাদের মনে হয় এ-সকল উপাদানের প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর কাজ করেছে।

বরাহনগর পর্যায়ে যাঁরা মঠবাসী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, শশী, তারক, কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন, সারদাপ্রসন্ন, লাটু, বুড়োগোপাল, যোগীন, হরি, সুবোধ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, তুলসী ও হরিশ। একমাত্র শশী ভিন্ন তাপসগণের সকলেই আলোচ্যকালের বেশ কিছু অংশ চিরাচরিত পরিব্রজ্যার আকর্ষণে বা অধিকতর নির্জনস্থানে সাধন-ভজনের আকাঙ্ক্ষায় বা তীর্থদর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ঘুরে ফিরে মঠে এসে জুটতেন। মঠের বাইরে বসবাসের সময় তাপসগণের ধারণা স্পষ্টতর হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিক্ষা অতুলনীয়। বাইরের অভিজ্ঞতার আলোকে ঘরের মর্যাদা বেড়ে গেছিল। হৃষীকেশ থেকে শরৎ লিখেছিলেন বলরামবাবুকেঃ “বাহিরের ভাব দেখিলে তিনি যে কি ছিলেন তাহা কতকটা বুঝা যায়।” নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছিলেনঃ “এ-দুনিয়া ঘুরে দেখেছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই ভাবের ঘরে চুরি।” বিভিন্ন স্থান থেকে ভাল রীতি-নীতি সংগ্রহ করে তাঁরা বরাহনগর মঠে প্রবর্তন করেছিলেন।

আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ ছিলেন আনন্দের সন্তান। এঁদের কেউই গোমড়ামুখো তপস্বী ছিলেন না। এঁরা একসময়ে যেমন জপ-ধ্যানের অতলে তলিয়ে যেতেন, আবার অপর সময়ে একক সঙ্গীতে ও বাদ্যে, সমবেত ভজন-কীর্তনে, যৌথ নৃত্যে মেতে উঠতেন। দিনচর্যার ফাঁকে ফাঁকে হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, মঠের অঙ্গদের পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। শিবরাত্রির পরবর্তী সকালে কথামৃতকার দেখছেন যেন সেখানে আনন্দের হাট বসেছে। সাধন-ভজনের দুস্তর দীর্ঘ পথে এ-ধরনের আমোদ-প্রমোদ পথশ্রমকে সহনীয় করে তুলতে, প্রত্যাশিত অগ্রগতিতে ব্যর্থতার বেদনাকে লঘু করতে এবং নতুন উদ্যমে তাপসদের লক্ষ্যাভিমুখে চলতে সাহায্য করেছিল।

তপস্যার অঙ্গ হিসাবে শাস্ত্রপাঠ হতো, বিচারের আসর বসত। শাস্ত্রপাঠে কালীপ্রসাদের ছিল গভীর প্রীতি। বিচারের আসরে নরেন্দ্রনাথের শাণিত বুদ্ধির ঝলক সকলকে বিস্মিত করত। পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য নবেন্দ্রনাথের ১৯ নভেম্বর ১৮৮৬ তারিখে লেখা চিঠির একটি অংশঃ “প্রত্যুতঃ এ-মঠে সংস্কৃতশাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে।··· এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করিবার অভিলাষ।” শাস্ত্রচর্চাদি ছাড়াও তাপসগণের সৃজনীমূলক প্রতিভা বিভিন্নভাবে স্ফুরিত হয়েছিল। কালীপ্রসাদ অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচনা করেছিলেন ‘লোকনাথশ্চিদাকারো’ স্তোত্র যার শেষাংশ ‘নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং’ ইত্যাদি ভক্তমহলে অতি পরিচিত। এ-কালেই নরেন্দ্রনাথ ‘নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্কসুন্দর’ গানটির রচনা ও সুরদান করেছিলেন।

তাপসগণের নিজেদের অসুখ-বিসুখে কথাই নেই, গৃহী ভক্তগণেরও রোগমুক্ত করবার জন্য তাপসগণের সেবাশুশ্রূষা তাঁদের সেবার ভাবটি স্ফুরিত করেছিল। এ-বিষয়ে শরচ্চন্দ্রের ভূমিকা ছিল অগ্রণীর।

---

[৩] শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (১৩৫৫), পৃঃ ৩০

পরবর্তী কালে সংঘজননীরূপে সমাদৃত শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা কিছু ছিল কি? তিনি বরাহনগর মঠে কখনো পদার্পণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী গোলাপ-মা, গৌরী-মা, গোপালের-মা প্রভৃতি স্ত্রী-ভক্তদের মুখে শুনে তাপস-সন্তানগণের কঠোর জীবন সম্বন্ধে তিনি পরিচিত ছিলেন। সন্তানদের খাওয়া-পরা গৃহাচ্ছাদনের জন্য তিনি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিলেন। বোধগয়াতে সেখানকার মঠের ঐশ্বর্য দেখে তিনি আকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে তাঁর সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইতোমধ্যেই তাপসদের কেউ কেউ একটি বিশ্বাস আশ্রয় করেছিলেন, আর যাই হোক তাঁদের একজন 'মা' আছেন। বিপদে-আপদে অনুভব করতেন 'শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!'

নতুনকে গ্রহণ করতে ভারতীয় সমাজ চিরকালই দ্বিধাগ্রস্ত। বরাহনগরের সন্ন্যাসীদের মঠকে সমাজ ভাল চোখে দেখেনি; অবজ্ঞা পরিহাস এমনকি অত্যাচার[৪] পর্যন্ত করেছিল। বাংলাদেশে বৈদিক সন্ন্যাস প্রায় অপ্রচলিত ছিল। উপরন্তু প্রচলিত শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করে অব্রাহ্মণ তাপসগণের বিদ্বৎ-সন্ন্যাসগ্রহণকে গোঁড়া সমাজপতিগণ মেনে নিতে পারেননি। 'রামক্রীশ্চান', 'পরমহংসের ফৌজ' ইত্যাদি অভিধায় সম্বোধন, পাড়ার ছোকরাদের 'প্যাক দেওয়া' ইত্যাদি তাপসগণকে বিব্রত করতে পারেনি। রামচন্দ্র দত্তের গোষ্ঠী, নিত্যগোপালের অনুরাগীর দল বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাংচি[৫] তাঁদের দমিত করতে পারেনি। এমনকি 'বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘের' আক্রমণও তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি।[৬] বরং এসকল বাধা-বিপত্তি তরুণ তাপসগণের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করেছিল, তাঁদের মহৎ সংকল্পকে বাস্তবরূপায়ণে প্রকারান্তরে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এর ফলে কয়েকবছরের মধ্যেই মঠবাসিগণের মহৎ ভাবের অনিবার্যতা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্রমে বিপরীত দিকে স্রোত বইতে শুরু করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার অমোঘ শক্তি অনেক শিক্ষিত তরুণের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। মনে রাখতে হবে তখনো স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতাতে প্রায় অপরিচিত। তখনো স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠতে দেরি রয়েছে। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই দেখা গেল বেশ কিছু যুবক বরাহনগর মঠে নিয়মিত যাতায়াত করছে। 'কলেজ-পার্টি' ও 'স্কুল-পার্টি' বলে পরিচিত দুটি দলের ডজন খানেক তাজা তরুণ এই নতুন ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের অনেকেই ক্রমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন।

তাপসগণ নিজেদের বলতেন দানা-দৈত্য। কোন কিছুতেই তাঁদের ভয়ডর ছিল না। কোন সঙ্কল্পরূপায়ণই যেন তাঁদের অসাধ্য ছিল না। নেতা নরেন্দ্রনাথ কয়েকবছর পরে একটি চিঠিতে তাঁদের মনের ভাবটি প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন: "কূর্মস্তারকচর্বনং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।" কাম-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠার বাসনা কাকবিষ্ঠার মতো ত্যাগ করে রামকৃষ্ণদাস তাপসগণ দুর্জয় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সমবেত চর্যায় সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় রামকৃষ্ণ মহিমার 'প্রথাবদ্ধীকরণ' (Routinization) অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল; অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জাগরিত ব্রহ্মকুণ্ডলিনী-শক্তি ত্যাগী তাপসগণকে আশ্রয় করে একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন শক্ত্যাধার সৃষ্টি করেছিল, গড়ে তুলেছিল রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের নিউক্লিয়াস (nucleus)।

সামগ্রিক বিচারে তপস্যাদীপ্ত বরাহনগর মঠকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছিল একটি অনন্তধারার কুণ্ড, তুলনায় কতকটা কাবেরী-উৎস থলু-কাবেরীর মতো। তপস্যা-সমুদ্ভূত ভাবামৃত সঞ্চিত হয়েছিল এই কুণ্ডে; এখান থেকেই উৎসারিত হয়েছিল প্রাণদ, বলদ একটি ভাবধারা, যা একশ-বছরের মধ্যেই আবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে সর্বজনসমাদৃত শক্তিশালী রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন।

---

[৪] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দশম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ১৬৪

[৫] Swami Vivekananda: Patriot-Prophet—B. N. Dutta, 1954, p. 186

[৬] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ১৪৪

মাধুকরী

দুর্গাপূজা

হরপ্রসাদ

দুর্গাপূজা বাঙালীর মহা-মহোৎসব। এখনো খাঁটি হিন্দুর ঘরে পূজা দেখিলে মনে ভক্তির উদয় হয়। আরতির সময় পুরোহিত-ঠাকুর প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া পরে পানিশঙ্খ লইয়া, তারপর কাপড় লইয়া, নির্মাল্য লইয়া, তারপর কর্পূরের আলো, ধুনুচি লইয়া, দেবীর আরতি করিতেছেন, তাঁহার চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতেছে। ধূপ ও ধুনার ধোঁয়ায় প্রকাণ্ড দালান অন্ধকার। কর্তা চামর দুলাইতেছেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দাস-দাসী, প্রতিবেশীতে দরদালান ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে উঠানে লোকে লোকারণ্য ; তাহার মাঝে ঢুলিরা মাথা চালিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইতেছে ; সকলের উপর চড়িয়া সানাই বাজাইতেছে। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা তো আছেই। কর্তা এক-একবার উচ্চৈঃস্বরে মা-মা বলিয়া ডাকিতেছেন ; সে স্বর তাঁহার নাভি-কমণ্ডলু হইতে হৃদয়ের মর্মস্থল স্পর্শ করিয়া উঠিতেছে। সে স্বরে সকলেরই মন ভক্তিতে ভরিয়া যাইতেছে। গৃহিণী ও তাঁহার কন্যারা, পাড়ার আর-আর স্ত্রীলোকদের লইয়া, একপাশে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। ক্রমে গৃহিণী পুরোহিতের নিকটে আসিলেন ও আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন। পুরোহিত তাঁহার মাথার উপরে আগুনের সরা বসাইয়া দিলেন ও ক্রমাগত ধুনা দিতে লাগিলেন, আবার ধুনার ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল। কন্যা বা পুত্রবধূ আসিলেন। তিনি কর্পূরের সরা মাথায় তুলিয়া লইলেন, পুরোহিত-ঠাকুর সেটি জ্বালাইয়া দিলেন। যতক্ষণ সে কর্পূর না নিভিল, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। আরতি শেষ হইল ; ঢাক-ঢোলের বাদ্য থামিল ; সকলেই মাটিতে লুটাইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন এবং দেবীর প্রণামের মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এক এক করিয়া সকলেই উঠিল, কর্তার মন্ত্রও শেষ হয় না, প্রণামও শেষ হয় না, তিনি উঠেনও না। তাঁহার যেন ভাব লাগিয়াছে। অনেক পরে তিনি উঠিলেন। আরতির পর্বশেষ হইল, এখন দেবীর বৈকালির আয়োজন।

এই যে আরতির মুহূর্ত, যে-মুহূর্তে যত লোক উপস্থিত সকলেরই মনে অন্য কোন চিন্তা নাই, কেবল মহামায়ার চিন্তা, আত্মহারা হইয়া আত্ম-পর-জ্ঞানশূন্য হইয়া কল্পনার অতীত মহামায়াকে আত্মসমর্পণের মহামুহূর্ত—এ বড়ো গম্ভীর মুহূর্ত। এ-মুহূর্তে শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ঈর্ষা-দ্বেষ, অন্ততঃ একদণ্ডের জন্যও, অন্তরিত হয়—এজন্য এ বড়ো মধুর মুহূর্ত। বৎসরে একদিনের জন্যও যদি এ-মুহূর্ত ফিরিয়া আসে, লোকে এক মুহূর্তের জন্যও পৃথিবীতে স্বর্গসুখ অনুভব করে।

একবছর, অষ্টমী পূজার রাত্রি, পরদিন সাতটার পূর্বেই সন্ধিপূজা করিতে হইবে। বাড়ির কর্তা সমস্তদিন নিমন্ত্রিত ইতর-ভদ্র সকলেরই আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানো-দাওয়ানো ইত্যাদিতে ক্লান্ত হইয়া, রাত্রি ১টার পর নিস্তব্ধ হইলে, সদর দরজাটি বন্ধ করিয়া সিঁড়ি দিয়া শুইবার ঘরে যাইতেছেন ; শুনিলেন দুইজনে কথাবার্তা করিতেছে, দুটিই স্ত্রীলোক। এত রাত্রিতে এ-বাড়িতে কে কথাবার্তা কয়—জানিবার জন্য কর্তা নামিয়া আসিলেন ; দেখিলেন দালানের এককোণে বসিয়া গৃহিণী স্বহস্তে কোষাকুষি, পুষ্পপাত্র, তাম্রকুণ্ড মাজিতেছেন। এ কাজটি আর কাহারো মনে পড়ে নাই। কিছু পরেই সন্ধিপূজার জন্য এসব চাই ; তাই গৃহিণী নিজেই মাজাঘষা আরম্ভ করিয়াছেন, আর প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। কর্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "ও গিন্নি, কার সঙ্গে কথা কহিতেছ?"

গিন্নি। কেন জান না? যাঁকে তুমি এত এরেবরে (আড়ম্বরে) বাড়িতে আনিয়াছ?

কর্তা। তিনি কে?

গিন্নি। জান না? ঐ দেখ! দালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তুমি তো একবার দালানে উঠিলেও না। তাই আমি মাকে বলিতেছি যে, তাঁর কাছে তো আমাদের সবই অপরাধ। তিনি যেন আমাদের সেসব অপরাধ না লয়েন। আর ক্ষমা-ঘেন্না করিয়া তিনি যেন বছর বছর এমনই করিয়া আসেন।

কর্তা। (একটু লজ্জিত হইয়া) কি করি গিন্নি? অনেকগুলি ভদ্রলোক পায়ের ধুলা দিয়াছিলেন। তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করাও তো আমার কাজ। তাতেই বড় ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে একবারও আসিতে পারি নাই।

গিন্নি। তুমি তো বাবু-ভাইদের লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু তুমি কি জান না কাঁকে তুমি বাড়িতে লইয়া আসিয়াছ? তাঁর চেয়ে বড় কে আছে? তুমি তাঁর দিকে একবার চাইলেও না। বাবুদের লইয়াই মাতিয়া রহিলে! উনি কি আর তোমার বাড়ি এমন করিয়া আসিবেন মনে করিয়াছ?

কর্তা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী কিন্তু সারারাতটি কেবল মহামায়ার কাছে এই কথাই বলিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের অপরাধ লইও না। আবার যেন এস।"

আজ বিজয়া। প্রতিমা দালান হইতে উঠানে নামিয়াছেন। আজ আর পুরোহিত নাই; বাজে লোক নাই; শুধু বাড়ির মেয়েছেলে ও নিতান্ত আত্মীয়স্বজনের মেয়েছেলে। পুরুষেরা উঠানে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গিন্নি নূতন কাপড় পরিয়া, বরণডালা মাথায়, উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে মেয়ে, বৌ, বাড়ির আর-আর মেয়েছেলে। সকলে আসিয়া মাকে নমস্কার করিলেন। অধিবাসের যত জিনিস ছিল, গিন্নি সকলগুলিই এক এক করিয়া মায়ের মাথায় ছোঁয়াইয়া বরণ-ডালায় রাখিতেছেন; এক-একবার ছোঁয়াইতেছেন আর তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতেছে। ক্রমে সব মেয়েদেরই চোখে জল আসিল। পুরুষেরাও আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্য সময় এ দুর্বলতাটুকু যাঁহারা দেখাইতে চান না, এখন তাঁহাদের সেভাব রহিল না। কারণ, এ শোকে লজ্জা নাই। বরণ আরম্ভ হইল। বিশ-ত্রিশজন স্ত্রীলোক মহামায়াকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, একবার, দুইবার, তিনবার, ক্রমে সাতবার প্রদক্ষিণ হইল। তাহার পর সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন। পরে কর্তা এক পূর্ণপাত্র আনিয়া প্রতিমার সম্মুখ হইতে—গৃহিণী প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার অঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন। গৃহিণী এই 'কনকাঞ্জলি' লইয়া সংবৎসর মায়ের শোক নিবারণ করিবেন।

এসব তো হইয়া গেল। তাহার পর কিছু মিষ্টান্ন আসিল। গৃহিণী একটি মিষ্টান্ন লইয়া মায়ের মুখে দিলেন, আর-একটি মায়ের হাতে দিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়ানো হইল ও পথের সম্বলস্বরূপ কিছু হাতেও দেওয়া হইল। ইহার পর বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল!!!

এই দুর্গোৎসবের ব্যাপারটা কি? হৈমবতী বিবাহের পর মহাদেবের সঙ্গে কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। মেনকা ক্রমাগত গিরিরাজকে মেয়ে আনিবার জন্য জিদ করিতেছেন। শেষে, গিরিরাজ কৈলাসে লোক পাঠাইলেন, অনেক কষ্টে মহাদেব, পার্বতীকে তিনদিনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন, স্বীকার করিলেন। যে তিনদিন হৈমবতী গিরিরাজের বাড়িতে ছিলেন, সেই তিনদিন গিরিরাজপুরে মহা-মহোৎসব হইল। তাহার পর দশমীর দিন হৈমবতী পুনরায় কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। এখন বুঝিলেন, দুর্গোৎসবের ব্যাপারটি মেয়ে আনা ও মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার। কর্তা স্বয়ং

গিরিরাজ, গৃহিণী স্বয়ং মেনকা, আর মহামায়া তাঁহাদের কন্যা। মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার যে দেখিয়াছে, সে-ই 'বিজয়া'র অর্থগ্রহণ করিতে পারে। ভক্তরা বলেন, বিজয়ার সময় মহামায়ারও চোখের কোণে জল দেখা যায়। ভালবাসা তো শুধু বাপ-মায়ের নয়, মেয়েরও তো ভালবাসা আছে। যখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই কাঁদিয়া আকুল, মহামায়া কি তা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়।

নদীতে হউক, পুষ্করিণীতে হউক, হ্রদে হউক, বিলে হউক, মায়ের বিসর্জন হইয়া গেল। জগৎকারণ যে মাটি, সেই মাটি হইতেই মহামায়ার মূর্তি গড়া হইয়াছিল, মাটিরই সাজসজ্জায় তাঁহাকে সাজানো হইয়াছিল। যিনিই মাটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই মাটির মূর্তিতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে সজীব করিয়াছিলেন, তাহাকে 'পরাশক্তি' করিয়াছিলেন, তাহাকে সকলের চেয়ে বড় করিয়াছিলেন—এখন তিনি আর নাই—যে মাটি সে আবার মাটিই হইয়া গেল, জলে মিশিয়া গেল। যতলোক দেখিতে আসিয়াছিল,এ-ব্যাপার সকলেই স্বচক্ষে দেখিল। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, আপন আপন ঘরে ফিরিল। যাহার দালানে দুর্গা আসিয়াছিলেন, তাহার কথাতো দূরে যাউক, দেশসুদ্ধ লোক দেখিতে লাগিল—সব শূন্য!! সবাই শূন্য মনে বাড়ি ফিরিল!!! তাহারা এতক্ষণ যে এক অমানুষী শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল, সে-শক্তির আজ অন্তর্ধান হইয়াছে; তাই তাহাদের আবার আত্মীয়স্বজন মনে পড়িয়াছে—মনে পড়িয়াছে এ-শক্তি ক্ষণকাল আমাদের নিকটে আসিলেও আমরা এ-শক্তি হইতে ভিন্ন, এ-শক্তির অনেক নিচে, এখন আমাদের যাহা আছে, যাহা লইয়া আমাদের ঘর করিতে হইবে, যাহা লইয়া আমাদের চিরকাল থাকিতে হইবে, তাহাদের সম্মান, সম্ভাষণ, পূজা করাই আমাদের আবশ্যক। তাই ছেলে আসিয়া বাপের পায়ে গড়াইয়া পড়িল, বাপ তাকে কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহার মস্তকের ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বড় ভাই তাহাকে কোল দিলেন। যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, সকলেই পরস্পর সম্মান ও সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। যিনি সকল সম্পর্কের অতীত, তিনি যতদিন উপস্থিত ছিলেন, ততদিন এ-সকল পার্থিব সম্পর্ক তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন আবার সেসম্পর্ক জাগিয়া নূতন হইয়া উঠিল। গৃহিণী শূন্য দালানে আসিয়া সব শূন্যময় দেখিলেন, তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া তো আকুল। কর্তারও অবস্থা তা-ই। তবে তিনি পুরুষ। তিনি গৃহিণীকে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন, "ভয় কি? মা আবার এক বৎসর পরে আসিবেন।" সেই আশায় বুক বাঁধিয়া, সকলে আবার সংসারধর্মে মন দিল॥*

সংগ্রহ: অমিত কুণ্ডু ও সংহতি চৌধুরী

*** নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭**

কলকাতার দুর্গাপূজা

বঙ্গদেশের প্রধান পর্ব শারদীয়া মহোৎসব সাঙ্গ হইয়াছে, কয়েক দিবস এই কলিকাতা রাজধানী ও বঙ্গদেশের সকল স্থান আনন্দ কোলাহল পরিপূর্ণ হইয়াছিল, শোভাবাজারে স্বর্গীয় মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকেতনেই এবারে নাচের সভা হইয়াছিল, উত্তমোত্তম গায়ক, গায়িকা ও নর্তক, নর্তকীগণ তথায় নিযুক্ত হইয়াছিল, অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বিবি এবং বিস্তর এতদ্দেশীয় মহৎ ও মান্য ব্যক্তি তথায় সভাস্থ হইয়াছিল।...শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এ-বৎসর পীড়িত থাকাতে তাঁহার ভবনে নৃত্যগীতাদির আমোদ-প্রমোদ হয় নাই।...বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তথা বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু খেলাৎচন্দ্র ঘোষ,

বাবু গিরীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু গোরাচাঁদ দত্ত, বাবু রাখালদাস মিত্র মহাশয়গণ পূজার কয়েক দিবস পাথুরিয়াঘাটা ও ঠনঠনিয়া প্রভৃতি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় এবৎসর নূতন দালানে পূজা করিয়া বিস্তর দানাদি করিয়াছেন। ... যুগলসেতু নিবাসী সুপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মাতা পীড়িতা থাকাতে বর্তমান বর্ষে সিংহবাবুদিগের ভবনে নাচের ব্যাপার হয় নাই।...সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি কাংশকার পল্লী-নিবাসী পরম ধার্মিকবর দানশৌণ্ড শ্রীযুত বাবু তারকনাথ প্রামাণিক কয়েক দিবস দানার্থ আপনার ভাণ্ডারদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বসিয়াছিলেন ... অন্যান্য ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ভবনে মহাপূজার মহা সমারোহ হইয়াছিল, প্রস্তাব বাহুল্য হয়, একারণ আমরা সমুদয় লিখিতে পারিলাম না ... *

*** ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের (১২৭০ বঙ্গাব্দের) ৯ অক্টোবর সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত।**

সংগ্রহ : সংহতি চৌধুরী

আনন্দের সন্তান

'ন চাযুক্তস্য ভাবনা'

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

১৯৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দের কথা। মঠে”সকালে চায়ের ঘণ্টা পড়েছে। চা মানে এক কাপ চা আর এক ফালি শুকনো পাঁউরুটি অথবা এক মুঠো মুড়ি। সাধারণতঃ সাধুরা ধ্যান-জপ সেরে, বিভিন্ন মন্দিরে ও মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম সেরে চায়ের ঘরে সমবেত হতেন। সবাই না, শুধু যাঁরা চায়ে অভ্যস্ত। ১৫ মিনিট থেকে আধঘণ্টার মধ্যে চায়ের পাট শেষ করতে হতো, কারণ সবার নানা রকমের কাজ। কোন প্রবীণ সাধু হয়তো দেরি করে ফেলেছেন। চায়ের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বলছেন—'সন্তোষ, চা দাও। ন চাযুক্তস্য ভাবনা।' সংস্কৃত শব্দগুলি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৮ নম্বর শ্লোকের এক অংশ। ওখানে শব্দগুলির অর্থ, যে অযুক্ত অর্থাৎ যে যোগ অভ্যাস করেনি, যার মন চঞ্চল, তার পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা করা অসম্ভব। যে সাধুটি এই কথাগুলি ব্যবহার করছেন, তিনি চায়ের কি উপকারিতা তা বোঝাতে চাচ্ছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন, যে চা খায়, তার আর কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা থাকে না। সে খুব সুখী। যেন এই কারণেই তিনি খেতে এসেছেন। আর 'সন্তোষ' হচ্ছেন সন্তোষ গাঙ্গুলি। তাঁর পরিবার রামকৃষ্ণগতপ্রাণ। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত। রেলে কাজ করেন। অফিস কলকাতায়। রোজ সাধুদের চা খাইয়ে ছুটে বাড়ি চলে যান, তারপর নাকে-মুখে ভাত খেয়ে কলকাতায় অফিস করতে যান। বছরের পর বছর এই কাজ করে এসেছেন। অবসর গ্রহণ করার পরেও সাধুদের সেবা করেছেন—একেবারে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত।

এই চায়ের আসরটি ছিল ধোঁকার টাটি, আবার মজার কুটিও। এখানে যেমন নানা রকমের ফষ্টি-নষ্টি চলতো, তেমনই বেদ-বেদান্তের কথাও হতো। এই আসরের মধ্যমণি ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। তিনি সবচেয়ে প্রবীণ, মঠ-মিশনের

সাধারণ সম্পাদক। গম্ভীর কিন্তু রসে ভরা। বেদান্তের পণ্ডিত। সাধারণতঃ স্বল্পভাষী, কিন্তু পেটে কোন কথা থাকে না। চায়ের আসর থেকেই তার সূত্রপাত হতো। মঠে একটা কথা চলত যে, যদি কোন কথা তাড়াতাড়ি সবাইকে জানাবার প্রয়োজন থাকে, তাহলে সেটা স্বামী শুদ্ধানন্দকে আগে ফিসফিস করে বলতে হবে, সেইসঙ্গে এটাও বলতে হবে—“দখুন, এটা গোপনীয়, কেউ যেন জানতে না পারে।” এটুকু বললেই যথেষ্ট। এরপর দেখা যাবে স্বামী শুদ্ধানন্দ জনে জনে সবাইকে ডাকছেন, আর ঐ কথাটি বলছেন। শুধু তা নয়, তার সঙ্গে তিনি এটাও যোগ করে দিচ্ছেন—“দেখো. কাউকে যেন বলো না।”

স্বামী শুদ্ধানন্দের ভূতের ভয় আর এক কিংবদন্তী। তিনি ঘরে একা শুতে পারতেন না। দরজা-জানালা বন্ধ থাকলেই ভাল। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মুখে শুনেছিলাম একবার স্বামী শুদ্ধানন্দেরই বন্ধু এক সাধু কিভাবে তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন। এক দুপুরবেলা স্বামী শুদ্ধানন্দ একা মঠের মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে যে লম্বা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দের বন্ধু-সাধুটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি নানা রকমের অঙ্গভঙ্গি করে বিকট গলায় বললেন—“শুদ্ধানন্দ, তুমি ভাবছ আমি তোমার বন্ধু, তা নয়। আমি ভূত, তোমার বন্ধুর রূপে এসেছি। তোমাকে একা পেয়েছি, এবার আমি তোমার ঘাড় মটকাব।” স্বামী শুদ্ধানন্দ এই শুনে আর্তনাদ করতে লাগলেন—“ভূত! ভূত! আমাকে বাঁচাও!” চারিদিক থেকে সাধুরা এসে পড়লেন। ভূত-সাধুটি তখন হাসতে হাসতে পালিয়ে গেলেন। আমি একবার স্বামী শুদ্ধানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—“আপনি একজন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী, এরকম ভূতের ভয় করেন কেন?” তিনি বলেছিলেন—“কি করব, ছোটবেলা থেকে ভূতের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার মাথায়। এমন ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, যুক্তি-তর্ক যতই করি. ভয় কিন্তু যায় না।”

একদিন সন্ধ্যায় ব্রিটিশ কম্যান্ডার-ইন-চিফের স্ত্রী ও মেয়ের মঠে আসার কথা। ট্যান্টিন (মিস ম্যাকলাউড) তখন মঠে আছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক অভিজাত ইংরেজ পরিবারের যোগাযোগ ছিল। তাঁরা ওঁকে খুব সম্মান করতেন এবং মঠে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলতে চাইতেন। ট্যান্টিন তখন তার ব্যবস্থা করে দিতেন। এইভাবে স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ দুই বিশিষ্ট অতিথিকে মঠের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করবেন আমরা শুনতে পেলাম। কিন্তু সেদিন সকাল বেলা চায়ের আসরে যখন স্বামী শুদ্ধানন্দ এলেন তখন দেখা গেল তাঁর মুখে একগাল দাড়ি। তিনি সপ্তাহে একদিন কামাতেন। নিজে কামাতেন না, উদ্বোধন থেকে বলরাম মহারাজ এসে কামিয়ে দিয়ে যেতেন। কিন্তু বলরাম মহারাজের আসার তখনো একদিন বাকি। সুতরাং স্বামী শুদ্ধানন্দ দাড়িমুখেই অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু স্বামী গঙ্গেশানন্দ আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন—“দেখুন প্রভু! ঐ দাড়ি নিয়ে আপনি মেম সাহেবদের সামনে দাঁড়ালেই তাঁরা ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবেন। এর ফলে আমাদের প্রেসিডেন্ট বৃদ্ধ মহাপুরুষ মহারাজের হাতে হাতকড়ি পড়বে। এ আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।” এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বামী শুদ্ধানন্দকে কেউ কেউ ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করতেন—কেন জানি না। স্বামী গঙ্গেশানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের সেক্রেটারি হিসেব কাজ করতেন। কাজেই তাঁর মহাপুরুষ মহারাজের জন্যে চিন্তা করা স্বাভাবিক। তবে সর্বোপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঠোঁটকাটা বেপরোয়া মানুষ। স্বামী গঙ্গেশানন্দ যখন এইভাবে স্বামী শুদ্ধানন্দকে খোঁচাতে লাগলেন, তখন অন্যান্য প্রবীণ সাধুরাও তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐ দাড়ির জন্যে মঠ-মিশনকে কি খেসারতি দিতে হতে পারে, তার এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরতে লাগলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ নির্বিকার। আমরা সব মজা পাচ্ছি, অপেক্ষা করছি স্বামী শুদ্ধানন্দ কি বলেন বা করেন।

আসর একেবারে জমজমাট। আবার ভাবছি স্বামী শুদ্ধানন্দ চটে যাচ্ছেন না তো! অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পর স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামী গঙ্গেশানন্দের দিকে গালটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"এতই যদি মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি দরদ হয়ে থাকে তবে দাও না দয়া করে আমার দাড়িটা কামিয়ে।" বলেই হাসিতে ফেটে পড়লেন। স্বামী গঙ্গেশানন্দ বললেন—"ঐ শ্রীমুখের দাড়ি কামাতে যাব আমি? সে স্পর্ধা কি আমার আছে? তা পারব না।" স্বামী শুদ্ধানন্দ বললেন—"তাহলে কথা বলো না।" স্বামী গঙ্গেশানন্দ তখন বেশ অভিনয়ের সুরে বললেন—"দেখুন প্রভু! আপনার দাড়ি কে কামাবে তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। তবে বেলুড় মঠের পুণ্য প্রাঙ্গণে মাতৃজাতির অমর্যাদা হয় এবং তার ফলে আমাদের দেবতুল্য মহাপুরুষ মহারাজকে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়, এমন এক দুর্ঘটনা আমরা কিছুতেই ঘটতে দেব না—একথা আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে রাখলাম।" পরে দেখা গেল স্বামী শুদ্ধানন্দ দাড়ি কামিয়েছেন এবং বেশ সেজেগুজে মহামান্য অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করছেন।

শুধু রসিকতাই নয়, মঠের এই চায়ের আসর আবার হয়ে উঠত গভীর কোন বিষয়ের আলোচনাচক্রও। একবার বুদ্ধ-জয়ন্তীর পরের দিনের কথা মনে পড়ছে। আগের দিন রাত্রে বুদ্ধদেব নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা হয়ে গেছে। যেমন, বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন, কি ছিলেন না? তিনি কি এক নতুন ধর্ম প্রচার করে গেছেন? স্বামীজী বলেছিলেন, তিনি বেদান্তবাদী ছিলেন, সেটা কি ঠিক? ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদিন চায়ের আসরে বুদ্ধদেবই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সব প্রবীণ সাধুরা আলোচনায় যোগ দিলেন। এমনকি যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় কম বলে পরিচিত, তাঁরাও। একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে—গোঁসাই মহারাজের কথা। তিনি খুব পান-তামাক খেতেন, আর তবলা বাজাতেন। বিশেষ যে কোন কাজ-কর্ম করতেন, তা মনে পড়ে না। তাঁর বয়সও অনেক। হঠাৎ দেখা গেল বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত জ্ঞান! অনেকের তর্ক-যুক্তি তিনি খণ্ডন করে দিলেন বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। তর্ক-বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন হেলতে দুলতে স্বামী শুদ্ধানন্দ চায়ের আসরে আবির্ভূত হলেন। "এই যে প্রভু এসেছেন, এইবার সব সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে"—এই বলে সরস ভঙ্গিতে কেউ কেউ তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। যাঁরা এই মন্তব্য করছেন, তাঁরা কিন্তু তাঁর অত্যন্ত অনুগত। স্বামী শুদ্ধানন্দের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি গিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। আলোচনা একটু স্তিমিত হয়েছিল, আবার সোৎসাহে শুরু হলো। স্বামী শুদ্ধানন্দ এক মনে চা খাচ্ছেন, শুনছেন কি শুনছেন না বোঝা গেল না। আলোচনা যখন শেষ পর্যায়ে তখন দেখা গেল, যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বিতর্কের বিষয় তা হচ্ছে বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন কিনা। সবাই চান এই বিষয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ কিছু বলুন। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি তিনি কি বলেন শোনার জন্যে। কিন্তু তিনি মুখ খুলতে নারাজ। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর 'নাস্তিক' কথাটার কি অর্থ তা তিনি বোঝাতে লাগলেন। নাস্তিক কে? তিনি বললেন, যে শাস্ত্র মানে না সে-ই নাস্তিক। এই অর্থে বুদ্ধদেব নাস্তিক কিনা তা বলা যায় না। তিনি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তার মত প্রচার করেননি। এই কারণে করেননি যাতে মানুষ বিভ্রান্ত না হয়। 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্'। বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষের জন্যে এসেছিলেন! গভীর তত্ত্বের কথা না বলে যা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নিতে পারে যা তার ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগবে—এইসব কথাই বলেছিলেন। এইভাবের কয়েকটি কথা বলে স্বামী শুদ্ধানন্দ বিতর্কের যবনিকা পাত করলেন। বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ কিন্তু তার পরেও কয়েকদিন চলেছিল। বাস্তবিক, চায়ের আসরটি যেমন ছিল রঙ্গরসে ভরপুর, তেমনিই আবার ছিল শিক্ষার আগার।

প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে নেহরু পরিবার

প্রণবেশ চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের সঙ্গে নেহরু পরিবারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সুদীর্ঘ চার-পুরুষব্যাপী পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু থেকে যার শুরু, আপাতত ইন্দিরাপুত্র রাজীব গান্ধী পর্যন্ত যা প্রসারিত। এই প্রভাব যেমন সুদূরপ্রসারী, তেমনি অন্তর্নিহিত। প্রকৃতপক্ষে এলাহাবাদ আনন্দভবনের নেহরু-পরিবার ভারতীয় রাজনীতির উত্থানপতন এবং ভারতীয় সমাজজীবনের গতিপথ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মৃত্যুপণ সংগ্রামের সেই দিনগুলি থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের দুশ্চর সাধনার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যন্ত—নেহরু-পরিবার ভারতের ইতিহাসে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র।

লক্ষ্য করার বিষয়, এই পরিবার-পরিমণ্ডলের চিন্তা ও চেতনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব মতিলাল নেহরুর সময় থেকেই ছিল সক্রিয়। ইন্দিরা গান্ধীর জীবনে তা হয়ে উঠেছিল মূর্ত। এবং রাজীব গান্ধী পর্যন্ত সেটা পরিব্যাপ্ত। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যুব-প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকেই ভারতের জাতীয় যুবদিবসরূপে ঘোষণা করেছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পিতা মতিলাল নেহরু সরাসরি কোন বক্তৃতায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ নিয়ে হয়তো কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁর পত্নী স্বরূপরানীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যে একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন সূত্র থেকেই পাওয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীনতম সন্ন্যাসী পূজনীয় ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দের) কাছ থেকে তা অনেকবার শুনেছি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর উদ্যোগে এলাহাবাদে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বরূপরানী রামকৃষ্ণ মিশনের এলাহাবাদ কেন্দ্রেও আসা-যাওয়া করতেন। এ-ব্যাপারে যদি মতিলাল নেহরুর সমর্থন না থাকত, তাহলে তাঁর পত্নীর পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো না।

মতিলাল নেহরু নিজেও অন্ততঃ একবার বেলুড় মঠে এসেছিলেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে যোগ দিতে মহাত্মা গান্ধী সদলবলে বেলুড় মঠে আসেন এবং স্বামীজীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন। এ-সম্পর্কে ১৩২৮ সনের বৈশাখ মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে জানা যায়, “স্বদেশ সেবক মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক এই দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রী যুক্ত মতিলাল নেহরু, মৌলানা মহম্মদ আলি এবং অপরাপর দেশনায়করা আগমন করেন।”

প্রকৃতপক্ষে ভারতের নবজাগরণের ভাববাহী অগ্রদূত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালকে বিরাট ও ব্যাপকভাবে [illegible] করেছিল এবং এই অপ্রতিরোধ্য প্রভাব থেকে সে-যুগের কোন দেশনায়কই মুক্ত ছিলেন না। মুক্ত থাকা সম্ভবও ছিল না। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতে ফিরে এলেন এবং তাঁর প্রদীপ্ত-ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়েই অপমানে-ম্রিয়মাণ পরাধীন ভারতবাসী প্রথম ফিরে পেল তাদের

অপহৃত আত্মবিশ্বাস, ফিরে পেল মাথা তুলে দাঁড়াবার আত্মিক শক্তি। স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম এদেশের সুপ্ত মানুষের লুপ্ত চেতনাকে সুতীব্র কশাঘাতে জাগিয়ে দিয়ে বললেনঃ পরাধীন জাতির কোন ধর্ম থাকতে পারে না। তার একমাত্র ধর্ম হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন।

স্বামীজীর এই অমোঘ আহ্বান যেমন যুবচিত্তকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল, তেমনি দেশনায়কদেরও করেছিল অনুপ্রাণিত। আচার্য বিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর উপর স্বামীজীর প্রভাব প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ে বিবেকানন্দের বিশেষ দান হইল—তিনি অদ্বৈতের সহিত দরিদ্রনারায়ণকে যুক্ত করিলেন। 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি বিবেকানন্দের বিশেষ সৃষ্টি। ... দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি লোকমান্য তিলকের নিকট খুবই প্রিয় ছিল ; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন ; আর মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতের প্রতি গৃহে বহন করিয়া লইয়া যান এবং ইহার অনুসরণে গঠনমূলক কাজ শুরু করেন।"[১]

বস্তুতঃ মতিলাল নেহরু যেমন গান্ধীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি স্বরাজ্যদল গঠনের সুবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তাই, স্বামীজীর প্রভাবে যখন মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন তার প্রভাব যে মতিলালের ওপরেও বহুলাংশে গিয়ে পড়বে, সেটা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ, পারিবারিক সূত্রে এবং রাজনৈতিক জীবনের সম্পর্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ছায়া মতিলাল নেহরুর জীবনেও হয়েছিল প্রলম্বিত।

॥ ২ ॥

মতিলালের পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং কন্যা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের জীবনেও সেই প্রভাব সুস্পষ্ট চেহারা ধারণ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলিতে নেহরু পরিবারের প্রায় সকলকেই ব্রিটিশের কারাগারে যেতে হয়েছে। সেইসময়, অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ খ্রীস্টাব্দে মাঝে মাঝেই এলাহাবাদের আনন্দ ভবনে নেমে আসত বিরাট শূন্যতা। জওহরলাল নেহরু জেলে বন্দী, বন্দিনী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও। ইন্দিরা গান্ধী তখন বছর এগার-বার-র কিশোরী।

এই পরিবেশে জওহরলালের পত্নী কমলা নেহরু বেলুড় মঠে ছুটে আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজের) কাছে। তিনি ছিলেন কমলার গুরু। তাঁর কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বসে তিনি নানা প্রসঙ্গে কথা বলতেন, ধর্ম-প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। মহাপুরুষের সান্নিধ্যে তিনি মনে শান্তি পেতেন, শক্তি পেতেন। সেইসময় কিশোরী ইন্দিরা থাকতেন ভরত মহারাজের কাছে। সেই থেকে ইন্দিরার যাতায়াত রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে।

তখন কিশোরী ইন্দিরা ভরত মহারাজের সঙ্গে বাগানে বেড়াতেন। কখনো কখনো তিনি আপন মনে খেলা করতেন মঠ-প্রাঙ্গণে। কখনো কখনো আবার করতেন দুরন্তপনাও। আবার মহাপুরুষ মহারাজের কাছেও কখনো কখনো ছুটে যেতেন। প্রণাম করতেন মা-ঠাকুমার সঙ্গে। এসব কাহিনী লেখক পূজনীয় ভরত মহারাজের কাছেই শুনেছেন।

নেহরু পরিবারের আধুনিকতা এবং চালচলনের সঙ্গে সব সময় খাপ খাওয়াতে পারতেন না কমলা নেহরু। কখনো কখনো মনের অশান্তি ও অস্থিরতা নিজের মনেই গোপন করতেন। তখন তাঁর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় ছিলেন স্বামী শিবানন্দজী। এক্ষেত্রেও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, পণ্ডিত নেহরু প্রচলিত অর্থে ধর্মে বিশ্বাস না করলেও তিনি তাঁর পত্নীকে কোনদিন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে যেতে বাধা দেননি। পত্নীর সঙ্গে তাঁর নয়নের মণি ইন্দিরাও যে 'ধর্মীয়' প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে ভরত

---

[১] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সপ্তম খণ্ড (১৯৮৮), পৃঃ ৫৭

মহারাজের স্নেহচ্ছায়ায় জড়িত হয়ে পড়েছেন, তা জওহরলাল লক্ষ্য করেছিলেন এবং এর পিছনে তাঁর সস্নেহ-প্রশ্রয়ও ছিল। নেহরুজীরও এই দুর্বলতার ব্যাপারটি আমরা পরবর্তী অনেক ঘটনার মাধ্যমেই জানতে পারি।

কমলা নেহরুকে যখন চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি সেই সুদূর বিদেশ থেকেই ভরত মহারাজকে নিয়মিত চিঠি লিখে অনুরোধ করতেনঃ ইন্দু থাকল, ওকে দেখবেন। ফিরোজ আমার ছেলের মতো, ওকেও দেখবেন। এইসব চিঠি যখন কমলা নেহরু লিখতেন, তখনো কিন্তু ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে ইন্দিরার বিয়ে হয়নি। ইন্দিরার বিয়ে হয়েছিল কমলা নেহরুর মৃত্যুর পর।

এরকম কত কাহিনী শুনেছি ভরত মহারাজের কাছে। তিনি আপনমনে বলতেনঃ “কমলার মধ্যে বিরাট শক্তি, আর অদ্ভুত তেজ ছিল দেখেছি। সেটাই ইন্দিরা পেয়েছিল। কমলার যক্ষ্মা হয়েছিল। সে-যুগে যক্ষ্মা সারত না। সেটা কমলাও জানতেন। তার উপর সংসারেও ছিল নানা কারণে অশান্তি। কিন্তু কোনদিন কমলা ভেঙে পড়েননি। ভিতর থেকে একটা শক্তি পেতেন তিনি। ঈশ্বরের উপর ছিল তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস এবং তার ফলেই নিজের মধ্যে তিনি অনুভব করতেন একটা প্রচণ্ড শক্তি ও দৃঢ়তা। ইন্দিরা মায়ের কাছ থেকে এই বিশ্বাস এবং শক্তি পেয়েছিল। ইন্দিরার মধ্যে ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি। তাই সে অত বড় হতে পেরেছিল।”

॥ ৩ ॥

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও যে স্বামী বিবেকানন্দের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা তাঁর বিভিন্ন লেখাতেই প্রমাণিত। তিনি লক্ষ্য করেছেন গান্ধীজীর ওপর স্বামীজীর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবও। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের মে সংখ্যায় বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত লিখেছেনঃ “ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তার ভিত্তিগঠনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবই সম্ভবতঃ সর্বাধিক শক্তিশালী। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ ও শিক্ষার মধ্যে বহু সমধর্মী জিনিস পাওয়া যাবে—তাদের কতকগুলি, এমনকি বাহ্যিক চরিত্রের দিক থেকেও, প্রায় সমগোত্রীয়। ঈশ্বরমুখী ধর্মগুলির ভাবৈক্য, তাদের নিঃস্বার্থ ফলাকাঙ্ক্ষাহীন মানবসেবাকে—যা ঈশ্বরসেবারই নামান্তর—চরম মূল্যদান, সকলপ্রকার দাসত্ব ও বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ভর সংগ্রাম, সকলের প্রতি ভালবাসা, এমনকি শত্রুর প্রতিও—এইগুলি হলো স্বামীজী ও মহাত্মাজীর মধ্যে মূলগত যেসব প্রত্যয়ে ঐক্য ছিল, তারই কয়েকটি। বিবেকানন্দ ভয়হীন, স্বার্থবোধহীন সেবার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা যেন মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উভয়েই দরিদ্রনারায়ণের পূজারী ; মানবসেবার দ্বারা ঈশ্বরসেবা করা হয়, এইকথায় তাঁরা বিশ্বাস করতেন ; উভয়েই কুসংস্কার ও ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন ; এবং তাঁরা নিজ নিজ দেশবাসীর মধ্যে আত্মমর্যাদার ভাব ও সুমহান ভবিষ্যতে আস্থার ভাব জাগিয়ে তোলায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।...এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতের সামাজিক ভাবনার অংশে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।”[২] অবশ্য সে-যুগে কার ওপরেই বা এই প্রভাব ছিল না!

পণ্ডিত নেহরুর জীবনে পিতা মতিলালের প্রভাব যেমন প্রত্যক্ষ ছিল, তেমনি তাঁর জীবনে গীতা ও উপনিষদের প্রভাবও ছিল সুস্পষ্ট। তিনি সরাসরি প্রচলিত অর্থে ধর্মের কথা না বললেও তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে, “কথিত হয়, ভারতবর্ষ সর্বোপরি ধর্মের দেশ।” নেহরু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যখন

---

[২] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭-৫৮.

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও সমাজবিবর্তনের গতিপ্রকৃতিকে অনুসরণ করেছেন, তখন নিশ্চিতভাবেই তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম তথা জাতীয় জাগরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের প্রভাব। তার ওপর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে রোমাঁ রোলাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হওয়ার পর এব্যাপারে তাঁর আগ্রহ অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর পারিবারিক জীবনে স্ত্রী কমলা নেহরু ও কন্যা ইন্দিরার সূত্রে এই ভাব-আন্দোলনের অনেক কাছাকাছি তিনি এসে গিয়েছিলেন। আর এসবের অনিবার্য ফল হিসেবেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে আরও গভীরভাবে অনুশীলন করতে আগ্রহী হন। তবে ১৯৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দে কারাগারে লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ খুব সামান্যই লক্ষ্য করি এবং বলতে দ্বিধা নেই, যেটুকু দেখা গেছে, সেটুকুও ভ্রান্ত দর্শন বলেই চিহ্নিত হবে। কিন্তু তাঁর অমর গ্রন্থ 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'তে দেখি 'রিফর্ম অ্যান্ড আদার মুভমেন্টস অ্যামং হিন্দুজ অ্যান্ড মোসলেমস্' শীর্ষক অধ্যায়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনকথা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই দুই মহাজীবনের কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে তাঁর রচনায় বিবেকানন্দ প্রসঙ্গই বেশিমাত্রায় পরিব্যাপ্ত এবং গভীরতর। তিনি বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছেনঃ “দারুণ সুন্দর পুরুষমূর্তি”, “আত্মবিশ্বাসে ভরপুর”, “গতিশীল ও অগ্নিময় প্রাণশক্তিতে পূর্ণ”, “একবারও যদি কেউ এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে দেখে থাকেন তাঁর পক্ষে ওঁকে এবং ওঁর বাণীকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন।”

এখানে বেশি উদ্ধৃতি দেওয়ার সুযোগ নেই, পরিসর সংক্ষিপ্ত। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা তাঁর বিভিন্ন ভাষণ থেকেই জানা যায়। বিশেষ করে ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের বর্তমান ভবন উদ্বোধন করতে এসে তিনি যেভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাছাড়া দুর্গতদের সেবায় এবং শিক্ষাবিস্তারে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি আগাগোড়া খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কন্যা ইন্দিরার ওপর ভরত মহারাজের স্নেহের সূত্রে তিনিও ভরত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ একটি বন্ধুত্বের ভাব পোষণ করতেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা অবশ্যই সঙ্গত হবে। এই ঘটনাগুলি আমি শুনেছিলাম পূজনীয় ভরত মহারাজের কাছেই।

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন দিল্লীতে ফ্ল্যাইং-ক্লাবে প্লেন চালাতে গিয়ে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু হলো দুর্ঘটনায়। সেই মৃত্যু ছিল আকস্মিক বজ্রপাতের মতোই অভাবিত। খবরটি পাওয়ার পর সেদিনই সন্ধ্যায় আমি গিয়েছিলাম বেলুড় মঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছিল। মঠ অফিসের সামনে স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র স্মৃতিপূত আমগাছের কাছে একটি চেয়ারে নীরবে বসে ছিলেন ভরত মহারাজ। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে চুপচাপ তাঁর পদতলে বসলাম। আরতি শেষ হওয়ার পর তিনিই প্রথম কথা বললেন, প্রশ্ন করলেনঃ “কি খবর?” আমি সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সম্ভবতঃ অতীতের নানা ঘটনা মনের চোখে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। একটু পরে বললেনঃ “সঞ্জয় বরাবরই দুরন্ত, রাজীব তুলনামূলকভাবে শান্ত। ইন্দু যখন আমার কাছে আসত ছোট ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে, তখন রাজীব চুপচাপ বসে থাকত; কিন্তু সঞ্জয় সবসময় ছটফট করত। ও বরাবরই চঞ্চল।”

একটু থেমে তিনি আবার বললেনঃ “একবার দিল্লীতে গিয়েছি। ইন্দিরা এসে নিয়ে গেল তিনমূর্তি ভবনে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। একটা ঘরে বসে আমি ইন্দিরার সঙ্গে কথা বলছি, আর

পাশের ঘরে জওহরলাল নেহরু রাজীবকে নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় দুরন্ত গতিতে সঞ্জয় এসে ঘরে ঢুকল। স্কুলে খেলনা-প্লেন চালাবার একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সঞ্জয় সেই প্রতিযোগিতায় মডেল-প্লেন চালিয়ে প্রথম হয়েছে। সেই খবরটা নিজের মা-কে দিয়েই সে ছুটল দাদুর কাছে। খবরটা শুনে দাদুও দারুণ খুশি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঞ্জয়কে পুরস্কার হিসেবে এক হাজার টাকার একটা চেক দিলেন। আর পাশের ঘরে আমাকে এসে শোনালেন সেই আনন্দ-সংবাদ।"

এই কাহিনীটি বলেই ভরত মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেনঃ "সেদিন মডেল-প্লেন চালিয়ে সঞ্জয় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। আর আজ প্লেন চালাতে গিয়েই মৃত্যুকে সে বরণ করে নিল।" এই ঘটনাটি পরদিন যুগান্তরে 'প্রথম পুরস্কার' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এরকম কত কাহিনী শুনেছি!

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যু হলো। পরদিন খুব ভোরে বেলুড় মঠে ফোন এল নয়াদিল্লী থেকে। অসহায়কণ্ঠে করছেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভরত মহারাজকে। স্বামীর মৃত্যুতে ইন্দিরা ভীষণরকম ভেঙে পড়েছেন. একা একা বন্ধ ঘরে বসে আছেন ; কিছু খাচ্ছেনও না. কারো সঙ্গে কথাও বলছেন না। তাই ভরত মহারাজকে দিল্লী আসার সবিনয় অনুরোধ জানালেন বিচলিত নেহরু। নেহরুর আশা, আর কারুর কথা না শুনলেও ভরত মহারাজের কথা শুনবেনই ইন্দু। সেদিন বেলুড় মঠে বিশেষ কিছু কাজ ছিল। তাই সেদিনই ভরত মহারাজ দিল্লী যেতে পারেননি। গিয়েছিলেন পরদিন সকালে।

নয়াদিল্লীর তিনমূর্তি ভবনে গিয়ে পৌঁছাতেই এগিয়ে গেলেন বিমর্ষ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তিনিও তখন অসুস্থ। ভরত মহারাজকে দেখে যেন অকূলে কূল পেলেন। বললেনঃ "আপনি এসেছেন স্বামীজী, আমি এখন নিশ্চিন্ত। ইন্দু কিছু খাচ্ছে না। কারো সঙ্গে কথাও বলছে না। আমার অনুরোধও সে শোনেনি। তবে আমি জানি আপনার কথা ইন্দু ফেলবে না। আপনি ইন্দুকে দেখুন।" শেষ পর্যন্ত পিতৃপ্রতিম ভরত মহারাজের কাছে এসে কন্যাসমা ইন্দিরা পাষাণপ্রতিমার মতো দাঁড়ালেন। ভরত মহারাজ এগিয়ে দিলেন এক গ্লাস ফলের রস। এবার আর ইন্দু অস্বীকার করতে পারলেন না। হাতে তুলে নিলেন সেই ফলের রস। পরবর্তী কালে সারা দেশের কাছে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তখনো ভরত মহারাজের কাছে তিনি সেই ছোট্ট মেয়ে 'ইন্দু'।

আর একদিন। সেদিনও বেলুড় মঠে তাঁর অফিসের সামনে উঠোনে একটা চেয়ারে বসেছিলেন ভরত মহারাজ। বরাবরের মতো আমি বসে আছি তাঁর পদপ্রান্তে। ধীর শান্ত কণ্ঠে কথা বলছিলেন তিনি। বলছিলেনঃ "একদিন যেমন মা কমলার সঙ্গে ছোট্ট ইন্দু আসত আমার কাছে, পরে আবার মা ইন্দুর সঙ্গেই আমার কাছে আসত তার দুই ছেলে রাজীব এবং সঞ্জয়।"

দিল্লীতে মঠ-মিশনের শাখাকেন্দ্রে যখন যেতেন ভরত মহারাজ, তখন ইন্দিরা আসতেন তাঁকে প্রণাম করতে, তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। কলকাতায় ইন্দিরা এলে ভরত মহারাজের সঙ্গে একবার দেখা করতেনই। ইন্দিরার মৃত্যুর কিছুদিন আগে বিহারের জামশেদপুরে একটা টি.ভি. রিলে সেণ্টার উদ্বোধন করতে এসে তিনি সেখান থেকে সোজা চলে এলেন বেলুড় মঠে। কলকাতায় অন্য কোন কর্মসূচী ছিল না। সেদিন ইন্দিরাজী বেলুড় মঠে এসেই বলেছিলেনঃ "জামশেদপুরের এই অনুষ্ঠানে আসাটা তেমন কোন জরুরি ছিল না, কিন্তু এলাম কেন জানেন? সেখান থেকে একবার বেলুড় মঠে আসা যাবে, আপনাকে প্রণাম করতে পারব।" বেলুড় মঠে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে যেমন তিনি শক্তি পেতেন, তেমনি ভরত মহারাজের পদপ্রান্তে

বসেও ভরসা পেতেন। গোটা জীবন ধরে এই ছিল ইন্দিরার অনুভব।

ভরত মহারাজের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সময় ইন্দিরা সেদিন বলেছিলেনঃ "দেশ এক ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সামনে রয়েছে বিপদ—তাই আশীর্বাদ চাইতে এসেছি।"

সেই তাঁর শেষ আসা। তবে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আসন্ন ও অনিবার্য বিপদের সম্ভাবনা? তাই শিশুর মতোই তিনি এসেছিলেন ভরত মহারাজের কাছে আশীর্বাদ চাইতে। মেয়ে যেমন পিতৃগৃহে এসে আশ্বস্ত হয়, ইন্দিরাও তাই হতেন। সেদিন ভরত মহারাজ কাছে বসিয়ে তাঁকে প্রসাদ দিয়েছিলেন, সঙ্গে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের একটি প্রসাদী শাড়ি। রামকৃষ্ণ মিশনের পল্লীমঙ্গলের ব্যাপক ও সর্বাত্মক কর্মসূচীর কথা তিনি সাগ্রহে শুনেছিলেন মঠ-মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দের কাছে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন অন্যতম সহকারী সম্পাদক, বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দও। ভরত মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে পরম তৃপ্তি নিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন ইন্দিরা। কিন্তু সেদিন কি তিনি জানতেন, বেলুড় মঠ ও ভরত মহারাজকে এই তাঁর শেষ দর্শন? বারবার ইন্দিরা ফিরে ফিরে দেখছিলেন বন্ধ মন্দিরের দিকে। ভরা গঙ্গার পুণ্যস্রোতের দিকেও একবার পূর্ণায়ত নয়নে তাকিয়েছিলেন তিনি। এই লেখক তখন সেখানে উপস্থিত।

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে একবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন ইন্দিরা গান্ধী। ঝড়ের গতিতে তিনি সফর করছেন। আরামবাগে এলেন জনসভা করতে। আরামবাগের কাছেই বালি-দেওয়ানগঞ্জে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের ভয়াবহ বন্যার পর রামকৃষ্ণ মিশন এক ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করে, সেই সুবাদেই বন্যায় গৃহহীন মানুষের জন্য ঐ অঞ্চলে নতুন চারটি গ্রাম তৈরি করে রামকৃষ্ণ মিশন। সেখানেই জননী সারদাদেবীর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সুন্দর ভবনও তৈরি করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী সফরে এসে আরামবাগ থেকে এলেন ঐ বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন করতে। স্কুলভবনে ঢোকার মুখেই জননী সারদার একটি অপূর্ব প্রতিমূর্তি। আত্মগত ইন্দিরাজী সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন নীরবে—নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন তিনি। কতক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালেন গোটা স্কুলবাড়ি। স্বামী আত্মস্থানন্দ তাঁকে নিয়ে এলেন খাবার টেবিলে। সবিস্ময়ে দেখছিলাম, সন্ন্যাসীদের কাছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা কত সহজ, কত সরল! তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নন, তখন তিনি মঠের ইন্দু। নিজেই চেয়ে নিলেন একটা নিমকি। আপনজনের সঙ্গে আপনমনে কথা বললেন। তারপরই সেখান থেকে চলে গেলেন পুরুলিয়া। পুরুলিয়ায় গিয়ে সরকারি ব্যবস্থাকে এড়িয়ে তিনি গিয়ে সোজা হাজির হলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে। লেখক সেই যাত্রায় ছিলেন তার সাক্ষী।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে যেমন তাঁর আত্মিক যোগ ছিল, তেমনি অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গেও। ভরত মহারাজ ছিলেন তারই যোগসূত্র। আগেই বলেছি, নেহরু পরিবারের চার পুরুষের সঙ্গেই গ্রথিত এই যোগসূত্রটি। এলাহাবাদ, দিল্লী যখন যেখানেই নেহরু পরিবার থাকুন না কেন, বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্কে কখনো ছেদ পড়েনি। মায়ের সঙ্গে শৈশব থেকেই আসতেন ইন্দিরা। এলাহাবাদের আশ্রমেও গেছেন। তখন সেখানে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। ইন্দিরা তাঁরও আশীর্বাদধন্যা।

ভরত মহারাজ বলেছেন একটি ঘটনা। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার দুই নায়ক ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন এসেছেন নয়াদিল্লীতে। ভরত মহারাজ ও কয়েক জন বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী তখন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে উপস্থিত ছিলেন। খবর পেয়ে ইন্দিরা এসে হাজির দিল্লী আশ্রমে। মোগল উদ্যানে রাশিয়ার দুই নায়ককে যে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল তাতে উপস্থিত থাকার জন্য ইন্দিরা ভরত মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের

গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীরা সেখানে সম্মানিত অতিথি। জওহরলাল নেহরু একে একে সকল সম্মানিত অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে এলেন ভরত মহারাজদের কাছে। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁদের সঙ্গে। ক্রুশ্চেভ-বুলগানিনকে নেহরু শ্রদ্ধানম্র চিত্তে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা বললেন, বললেন রামকৃষ্ণ মিশনের উদার মানবতাবাদী বিপুল কর্মকাণ্ডের কথা।

এরকম কত মধুর স্মৃতি; কত অশ্রুভারাক্রান্ত কাহিনী শুনেছি ভরত মহারাজের কাছে। স্বভাবগম্ভীর এই প্রবীণ সন্ন্যাসী কথা বলেন খুব কম, তবু যখন বলেন, তখন অবাক হয়ে শুনতে হয়। একদিন বললেনঃ "দেখ, ইন্দু সাধারণ মেয়ে নয়, ওর মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তাই ইন্দু এত বড় হয়েছে।"

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ জুন সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু হলো। তারই কিছুদিন পরে ইন্দিরা এলেন বেলুড় মঠে। সেদিন তিনি বিষাদ-প্রতিমা। ভরত মহারাজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। তারপর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে বসে পুত্রহারা শোকার্তা জননী কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এটাই ছিল তাঁর চোখের জল ফেলার একান্ত নিরাপদ, নির্ভয় আশ্রয়।

॥ ৪ ॥

একটু লক্ষ্য করলেই মনে হবে, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর চিন্তা ও কর্মে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব রয়েছে। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় নয়, এই প্রভাব নানাভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারিকে ভারতের জাতীয় যুবদিবসরূপে ঘোষণা করে তিনি যেমন আধুনিক ভারতীয় যুবকদের সামনে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ তুলে ধরেছেন, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি যেন স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তাকেই বরণ করে নেবার আগ্রহ দেখিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত "Challange of Education" শীর্ষক শিক্ষাপরিকল্পনাটি সম্বন্ধে অনুধাবন করলে বহুক্ষেত্রে মনে হবে এসব যেন স্বামীজীরই কথার প্রতিধ্বনি। সমগ্র দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত নেহরু যুবকেন্দ্রগুলি স্বামীজীর জন্মদিনে ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস ও যুবসপ্তাহ উপলক্ষে যে কর্মসূচী ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে গ্রহণ করেছেন, তার মূলে রয়েছে রাজীবের প্রেরণা। জওহরলাল নেহরুর দৌহিত্র, ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজীব গান্ধী বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হিসাবে শিক্ষা-মন্ত্রকের স্থলে ব্যাপকতর অর্থে যে 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক' গঠন করেছেন, তার মূলে যে স্বামীজীর চিন্তার প্রভাবই ক্রিয়াশীল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষই জগতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তায় মানুষ গড়ার বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। স্বামীজী তাঁর 'একমাত্র উপাস্য' বলেছেন মানুষকেই। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণবিকাশই স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষাভাবনায় তা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, স্বামীজী বারবার সেকথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছর পরে আজ আমরা তার প্রয়োজন মর্মে মর্মে অনুভব করছি। মোট কথা, ভারতবাসীকে যাঁরা ভালবাসেন এবং যাঁরা ভারতের দুঃখে বেদনা বোধ করেন, ভারতের গৌরবে হন উন্নতমস্তক, তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের দুর্জয় এবং অপ্রতিরোধ্য প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না এবং পারেননিও। সম্ভবতঃ সেই কারণেই নেহরু পরিবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলনের সঙ্গে আত্মিক সূত্রেই বিজড়িত। এবং মতিলাল-স্বরূপরানীর সময় থেকে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত স্বামীজীর প্রভাবের বিস্তৃতি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে নেহরু পরিবারের সম্পর্কেরই অনিবার্য পরিণতি। জওহরলাল নেহরুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একথা আমরা স্মরণ করছি।

বাতায়ন

আমেরিকার 'ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি'র শতবার্ষিকী

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য 'ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি' (National Geographic Society) বা জাতীয় ভৌগোলিক সমিতি, সংক্ষেপে এন. জি. এস. স্থাপিত হয়। মনে হয় সারা পৃথিবীতে এটি সবচেয়ে বৃহৎ অ-লাভজনক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৩০০০ অনুসন্ধান ও গবেষণাকে সাহায্য করেছে এবং পৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে। আজ এই সমিতির কর্মীসংখ্যা ২৩০০ এবং সারা পৃথিবীতে চাঁদা দেয় এরূপ সদস্যের সংখ্যা এক কোটি পাঁচ লক্ষ। সমিতির মুখপত্র 'ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক'-এর পাঠকসংখ্যা তিন কোটি। এই-ভাবে এই সংস্থা একটি বিশ্বপ্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এন. জি. এস.-এর সামান্যভাবে সূচনা হয়েছিল ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে। তেত্রিশ জন জনহিতৈষী লোক ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে একত্র হয়ে এই সমিতি স্থাপন করেন। মূলনীতি-নির্ধারক ছিলেন বস্টনের আইনব্যবসায়ী গার্ডিনার গ্রীন হুবার্ড এবং তিনিই সমিতির প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ঐ বছর অক্টোবর মাসে 'ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। হুবার্ড চেয়েছিলেন যে, পত্রিকাটি এমন হবে যা বুদ্ধিজীবী ও ভূগোল-বিশারদ উভয়কেই আকৃষ্ট করবে; কিন্তু তাঁর স্বপ্ন মূর্ত হবার আগেই তাঁর দেহাবসান হলো। এরপরে সম্পাদক হলেন হুবার্ডের জামাই এবং টেলিফোনের আবিষ্কারক গ্রাহাম বেল, যিনি পত্রিকাকে উচ্চস্তরে তুলবার জন্য তাঁর বিরাট মেধাকে কাজে লাগালেন। বেল তেইশ বছর বয়স্ক স্কুলমাস্টার গিলবার্ট এইচ. গ্রসভেনরকে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করলেন। গ্রসভেনর এই পত্রিকাকে শুধু ভৌগোলিক বর্ণনার বাহক না করে এতে পৃথিবীর ঘটনাবলীর জীবন্ত এবং সত্য বর্ণনা দিতে লাগলেন। এক বৎসরে সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল এবং এতে এমন সব প্রবন্ধ বের হতে লাগল যা পড়ে সাধারণ পাঠকরা আনন্দ পায়। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যায় ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী তিব্বতের আজগুবি শহর লাসার নানা আলোকচিত্র প্রকাশ, যাতে বর্ণনা অংশ ছিল মাত্র একটি অনুচ্ছেদ। তিনি ভেবেছিলেন যে, অভূতপূর্ব এত অধিকসংখ্যক ছবি দেওয়ার জন্য তিনি পাঠকদের গালাগালি খাবেন; কিন্তু এর বদলে তিনি পেলেন রাস্তায়, বাজারে অজস্র অভিনন্দন। এর পাঁচবছর পরে হাতে রঙকরা আলোকচিত্র দেওয়ায় ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক আলোকচিত্র-সাংবাদিকতায় অগ্রণী হয়ে দাঁড়াল। আজ পত্রিকাটি আমাদের এই গ্রহ এবং এই অধিবাসীদের সম্বন্ধে নির্ভেজাল খবর সংগ্রহের আকর হিসাবে চিহ্নিত। এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত করছে এবং তাতে লোকের জ্ঞানের পরিসীমা বিস্তৃত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা আনায় সাহায্য করছে। ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক-এ পাওয়া যাবে আফ্রিকার অধিবাসী, আমেরিকার 'আওয়া' স্টেটের কৃষক, মাউন্ট এভারেস্ট-এর উচ্চতা ও গ্র্যান্ড কেনিয়নের গভীরতা, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, ফুলের নিঃশব্দ প্রস্ফুটন, সমুদ্রগর্ভে অদ্ভুত প্রাণীদের প্রথম আবির্ভাব এবং নীল আকাশে উড্ডীয়মান ঈগল। ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি এই সঙ্গে দূরদূরান্তের নানা স্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন অভিযানের ব্যবস্থা করছে। ১৮৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম অভিযান যায় দক্ষিণ আলাস্কা ও কানাডার অজ্ঞাত সীমানা ধরে; এই সংস্থার আর্থিক সাহায্য রবার্ট. ই. পিয়ারিকে উত্তর মেরু পৌঁছতে এবং রিচার্ড বার্ডকে দক্ষিণ মেরু পৌঁছতে সাহায্য করেছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির সহযোগিতায় এন. জি. এস. সুসম্বদ্ধভাবে নৈশ আকাশের আলোকচিত্র-মানচিত্র তৈরি করেছে যার ফলে একলক্ষ আলোক বর্ষ দূরত্বের দ্রব্য এবং লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই সমিতির আর্থিক সাহায্যে লিকি পরিবার আফ্রিকায় কাজ করে মানবজাতির

সুদূর-অতীতকে অনাবৃত করেছে এবং ডোনাল্ড সি. জোহানসন সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে পূর্ণাবয়ব মানব-কঙ্কালকে খুঁড়ে বের করেছেন। তিনজন গবেষক শ্রেষ্ঠ স্তন্যপায়ীদের নিজস্ব বাসভূমিতে গবেষণা চালিয়েছিলেন—জেন গুডল শিম্পাঞ্জির ওপর, বিরুট গল্ডিকাস ওরাং ওটাং-এর ওপর এবং প্রয়াত ডায়ান ফসে গোরিলার ওপর।

বহুদিন থেকেই সমিতি প্রকৃতি সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত আছে। যখন বাধাহীন গাছকাটার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার সিকোইয়া গাছ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে নিশ্চিহ্ন হবার সামিল হয়েছিল, এই সমিতি ও তার সভ্যবৃন্দ এক লক্ষ পাউণ্ড দান করেছিল ৯০০ হেক্টর 'সিকোইয়া ন্যাশন্যাল পার্ক'-কে রক্ষা করার জন্য। এদেরই প্রচেষ্টায় ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'ন্যাশন্যাল পার্ক সার্ভিস' আইন পাস হয়, যার ফলে 'গভর্নমেন্ট ব্যুরো' স্থাপিত হয়েছে ইউনাইটেড স্টেট্স-এর ন্যাশন্যাল পার্কগুলির উন্নতিসাধন করার জন্য।

সমিতির ভৌগোলিক জ্ঞানবিস্তারের বহু উপায়ের মধ্যে একটি হলো পুস্তক প্রকাশন। এর 'বুক সার্ভিস' এবং বিশেষ প্রকাশন-বিভাগ এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে। এতে থাকে প্রাচীন গ্রীস-রোম ও আধুনিক চীন থেকে মহাকাশ অভিজ্ঞান-এর বিষয়বস্তু। এন. জি. এস.-এর মানচিত্র অঙ্কনকারীরা মানচিত্রের উচ্চমানের জন্য বিখ্যাত। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে সমিতি আমেরিকার ৫০টি রাষ্ট্রের মানচিত্র এবং ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ভূ-গোলক তৈরি করেছিল। সমগ্র জগতে এগুলিই আদর্শ বলে স্বীকৃত।

ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি ভূগোলকে নীরস বিষয় থেকে পৃথিবীর অদ্বিতীয় দর্শনবস্তুতে রূপান্তরিত করেছে।*

* **SPAN— June. 1989, pp. 46-49**

প্রবন্ধ

বাঙলা সাহিত্যে গঙ্গা

উদয় চক্রবর্তী

গঙ্গা—ভাগীরথী—জাহ্নবী। গোমুখ থেকে উৎপন্ন, বঙ্গোপসাগরে সঙ্গত এই দীর্ঘ জলধারা ভারতবর্ষের প্রাণপ্রবাহিনী। যুগে যুগে তার তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন জনপদ। তার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। পলিমাটিতে সে যেমন ভরিয়ে দিয়েছে, তেমনি আবার নেমেছে ধ্বংসলীলায়। খাত পরিবর্তনের ফলে কত শস্যশ্যামলা ভূমি নষ্ট হয়ে গেছে, আবার কত জনপদ ভাসিয়ে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সে। নতুন জনপদও সেইসঙ্গে সৃষ্টি করে চলেছে। এই নদীই গঙ্গা, প্রাণময়ী বসুধারা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে গঙ্গার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ধর্মজীবন, কর্মজীবন এবং সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে এই গঙ্গা। সাহিত্যে কখনো তাই গঙ্গাকে দেখা যায় জনপদের আশ্রয়দাত্রী হিসাবে, কখনো তার প্রবাহ বেয়ে বাণিজ্যতরী ভাসে, কখনো ভাসে রণতরী, কখনো মন্ত্রোচ্চারণে তাকে দেবীরূপে বরণ করা হয়েছে, কখনো বা পুরাণে, লোককথায় তাকে নায়িকা হিসাবে দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যে গঙ্গা প্রতিবেশ হিসাবেও দেখা দিয়েছে। আমাদের এই আলোচনার মূল লক্ষ্য বাঙলা সাহিত্যে গঙ্গা। কিন্তু তার আগে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে গঙ্গার ভূমিকা সংক্ষেপে বলে নেব।

কিংবদন্তী অনুযায়ী গঙ্গার তিন রূপ। স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতী। ঋক্‌বেদে গঙ্গাবন্দনা সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যিক নমুনা হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। এর পরবর্তী যুগে নানা পুরাণে, মহাভারত-রামায়ণে বারবার গঙ্গা-প্রসঙ্গ এসেছে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে গঙ্গার সহস্র নাম পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে, বিন্ধ্য শৈলশ্রেণী (রাজমহল-সাঁওতালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম শৈলমূল)-গাত্রে প্রতিহত হয়ে ব্রহ্মোত্তর (উত্তর রাঢ়) বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্ত (সুহ্ম) দেশের ভিতর দিয়ে ভাগীরথী প্রবাহিত হতো।

বায়ুপুরাণেও (৪৭ অধ্যায়) এই গঙ্গাপথের কথা জানা যায়।

ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈবচ।
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্॥

এছাড়াও ভবিষ্যপুরাণ, রঘুবংশ, পাণ্ডববিজয়, পবনদূত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে (১৫৯৬-৯৭), মির্জানাথনের বিবরণীতে (১৬৬৪), সিহাবুদ্দিন তালিস (১৬৬৬)-এর লেখায় গঙ্গার গতিপথের বিবরণ আছে।

অনুমান করা যেতে পারে লোকসমাজে আদিমতম সংস্কারপ্রসূত কাহিনীগুলি পরবর্তী কালে পুরাণ-কাহিনীতে প্রবিষ্ট হয়েছে। আমরা তাই পুরাণে বর্ণিত গঙ্গার কাহিনীগুলিকে 'মিথ' হিসাবেই লক্ষ্য করতে পারি। আদিম মানবের মনে যে প্রতীকগুলির উদ্ভব হয়েছিল, তা কখনই শিশুসুলভ নয়—এমন একটি অভিমত আধুনিক সমালোচকগণ করে থাকেন। আর তার ফলেই মিথ কাহিনীগুলির বিশেষ গুরুত্ব বর্তমানকালে দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে মিথগুলি অবশ্য অন্যান্য সাংস্কৃতিক রূপের মধ্যে বিধৃত ছিল। গঙ্গা প্রসঙ্গেও তাই দেখা যাবে, নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঙ্গা-আরাধনা চলেছিল। গঙ্গাপূজা, গঙ্গাজল পূজায় ব্যবহার করা, গঙ্গাতীরে শবদাহ করা, গঙ্গাজলে অস্থি বিসর্জন দেওয়া, গঙ্গাতীরে অন্তর্জলী যাত্রা, দশহরা, মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি বিশেষ পুণ্যতিথিতে গঙ্গাস্নান প্রভৃতি নানা ধরনের আচার আমরা পালন করে থাকি। পুজো-আর্চার সময়, জলশুদ্ধির অনুষ্ঠানে কল্পনা করা হয় ব্যবহার্য জলের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী সপ্তনদীর উপস্থিতি এবং লক্ষ্য করার বিষয়, এই পুণ্য সপ্তনদীর মধ্যে প্রথম নদীই হলো পুণ্যতোয়া গঙ্গা।

গঙ্গা সম্বন্ধে রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে যে কাহিনীগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে পড়ে তার জন্মের বা উৎপত্তির কাহিনীগুলি, অন্য ভাগে পড়ে তার বিবাহ বা সংসারের কাহিনী।

কিছু কাহিনীর মধ্যে কতকগুলি সমান্তরাল বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। গঙ্গার জন্ম স্বর্গে, সেখানে মহাদেবের গান মূলে উদ্দীপনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বিষ্ণুর দ্রবীভূত হওয়া। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা। এছাড়া বিষ্ণুর দেহ থেকে বিষ্ণুর পায়ের আঘাতে গঙ্গার জন্ম বলেও কথিত। কিছু কাহিনীতে আছে গঙ্গার মর্তে আগমন, শিবের জটায় আবদ্ধ হওয়া, জহ্নুমুনির গণ্ডূষে গঙ্গাশোষণ, ভগীরথের তপস্যা এবং গঙ্গার মুক্তি। কিছু কাহিনীতে দেখা যায় গঙ্গা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণ অথবা গঙ্গা এবং মহাভিষ বা প্রতীপ বা শান্তনু বা জহ্নু পরস্পর প্রেমাসক্ত। গঙ্গা-মিথগুলি লোকসমাজে প্রচলিত নানা প্রাচীন কাহিনী থেকে নানা মিশ্রণের মধ্যে পুরাণ-সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

পুরাণে গঙ্গাকে কখনো নদী হিসাবে কখনো বা নারী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। কখনো তারা পৃথক কাহিনী, কখনো বা এই দুই কাহিনী মিশে গেছে। মিশে যাবার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যাবে জল থেকে উঠে আসছে এক নারী এবং তাঁকেই গঙ্গা বলা হয়েছে। যেমন, প্রতীপ ও শান্তনুর কাহিনী। যেসব কাহিনীতে গঙ্গা নারীমূর্তিতে উপস্থিত সেসব কাহিনী আদিম মানবগোষ্ঠীর নদীতীরবর্তী প্রচলিত মিথ বা লোককথা হিসাবে প্রথম পর্যায়ে ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে পুরাণগুলিতে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। নদী হিসাবে স্বর্গে ও মর্তে তার উপস্থিতি। স্বর্গ-গঙ্গাকে ছায়াপথ বলা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাক্ষ্য নিলে দেখা যাবে আরও দুটি গঙ্গার নদীরূপ স্বর্গে রয়েছে, বিষ্ণুগঙ্গা ও শিবগঙ্গা। ছায়াপথ কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশের দুটি ভিন্ন অবস্থানে দেখা যায়।

"কার্তিক মাসে দেখি মহাকালের (কালপুরুষের) মাথার উপর দিয়া সুরগঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিয়া গিয়াছে। মহাকাল গঙ্গাধর হইয়াছেন। এই গঙ্গা শিবগঙ্গা।"[১] "বৈশাখ মাসের সুরগঙ্গা ছিন্ন-বিছিন্ন। ইহাতে মাথার উপরে পাঁচটি তারায় কর্ণ-সদৃশ শ্রবণা নক্ষত্র, দক্ষিণে বৃশ্চিক। বিষ্ণু শ্রবণার অধিপতি। ঋক্‌বেদের ঋষিগণ কর্ণস্থানে শ্যেন পক্ষী দেখিতেন। শ্যেন পক্ষী পুরাণের গরুড়, বিষ্ণুর বাহন। এই গঙ্গা বিষ্ণুগঙ্গা।"[২] "এই বলয়ার্ধের উত্তর সীমার একটু দূরে ধ্রুবমৎস্য নক্ষত্র।

---

[১] পূজাপার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৩৫৮), পৃঃ ৪৭

[২] ঐ, পৃঃ ৪৭

ইহার চারিদিকে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক। এই হেতু গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা।"৩

যোগেশচন্দ্র রায়-এর বক্তব্য মেনে নিলে মিথ কাহিনীগুলির কিছু অংশ মিলে যায়। গঙ্গা কেন বিষ্ণুর পা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন এবং গঙ্গাকে বিষ্ণুপদী বলা হয় তা বোঝা যাবে। বোঝা যাবে গঙ্গা প্রথমে কেন বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন, পরে শিবের পত্নী হন এবং গঙ্গা কেন শিবের জটায় প্রথমে আবদ্ধ ও পরে মুক্ত হন। মহাদেবের গান—বিষ্ণু বা রাধাকৃষ্ণের দ্রবীভূত হওয়া ইত্যাদি কাহিনীবৃত্ত উপলব্ধ হয়। গঙ্গার সঙ্গে সরস্বতীর ধারণা পরবর্তী কালে দুই পৃথক নারীতে পরিণত হয় এবং তাঁরা দুজনেই বিষ্ণুর পত্নী হিসাবে পুরাণে পরিচিত হন। গঙ্গার জলস্পর্শে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র স্বর্গে তারকায় পরিণত হয়। ছায়াপথের এই ষাট হাজার তারকা মর্ত্যের কাহিনীকে স্বর্গের সঙ্গে গ্রথিত করেছে।

গঙ্গার বাহন মকর। বাস্তবের কোন জীব নয় এটি। পৌরাণিক জীব এবং রাশি হিসাবে পরিচিত। পুরাণ অনুযায়ী এর মাথা ও সামনের দুই পা কৃষ্ণসার হরিণের মতো, এবং দেহ ও লেজ মাছের মতো। অনেকের মতে শৃঙ্গবিশিষ্ট মাছের মতো।৪ কামদেবের ধ্বজচিহ্ন। মকর কামনার প্রতীক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। গঙ্গার মিথ কাহিনীগুলিতে তাই কামাসক্ত নারীর কথা দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গার পৌরাণিক কাহিনী মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে (যথা মনসামঙ্গলে) নানাভাবে এসে পড়েছে।

বাঙলা সাহিত্যে গঙ্গার কাহিনীগুলি প্রথমে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যাচ্ছে যে, স্বামী শান্তনুর কাছ থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়ে দেবে এই শর্তে দেবতাদের যজ্ঞে রান্নার জন্য গঙ্গাকে শিব নিয়ে আসার পর ঠিক সময়ে ফিরিয়ে দিতে না পারায় শান্তনু গঙ্গাকে প্রত্যাখ্যান করেন। শিব গঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বল্লুকার তীরে ধর্মের তপস্যা করতে থাকেন। ধর্ম শিবকে দেখা দিতে আসেন। কিন্তু শিব ঘরে না থাকায় গঙ্গাকে দেখা দিয়ে ধর্ম চলে যান। গঙ্গা ধবলমুখী হন। দেবতারা গঙ্গার স্তুতি করেন। শিব গঙ্গাকে ভক্তিভাবে মাথায় ধারণ করেন।

গঙ্গার মাহাত্ম্য নিয়ে মধ্যযুগে কিছু কাব্য লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিদ্যাপতি রচিত 'গঙ্গাবাক্যাবলী', গণপতি ঠাকুর রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। মাধব আচার্যের নামে গঙ্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে উনবিংশ শতাব্দীতে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামে কাব্য রচনা করেন। জয়রাম প্রণীত 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যটির কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নদী হিসাবে গঙ্গার কথা বর্ণিত আছে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাগীতিতে—"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।" দোহাকোষে পাওয়া যায়—"এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গামাতারু।" কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অংশে গঙ্গা প্রসঙ্গে আছে ঃ

বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর।।
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে।

রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধপর্ব গ্রন্থে আত্মপরিচয় অংশে গঙ্গার বর্ণনা আছে।

যুবনাশ্ব যখন মাতাকে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দেখাতে চায় তখন গঙ্গাস্নান প্রসঙ্গ এসেছে—

গঙ্গাস্নান করিবে মাতা হবে বড় ধর্ম।

এবার গঙ্গাপথ নিয়ে এবং গঙ্গাপ্রসঙ্গ নিয়ে রচিত কয়েকটি বাঙলা কাব্য ও নাটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সুরধুনী কাব্য'। কাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে এক থেকে আট সর্গ এবং দ্বিতীয় ভাগে নয় ও দশ সর্গ রয়েছে। কাব্যটিতে গঙ্গার মর্তে আগমন ও তার প্রবাহপথের বর্ণনা। এখানে গঙ্গা মেনকা-দুহিতা। পতির সঙ্গে অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের জন্য চলেছেন প্রবলবেগে।

প্রণতি জননীপদে জাহ্নবী যুবতী
চড়িল প্রপাতরথ মনোরথ গতি।
মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী তোরণ,
অযুত জীমুত শব্দে প্রপাত পতন,
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহির,
বেগবতী স্রোতস্বতী কম্পিত শরীর।

---

৩ পুজাপার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৩৫৮), পৃঃ ৬৬
৪ পৌরাণিক—অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, (১৯৭৯,) পৃঃ ১১১

এরপর যাত্রাপথে প্রাচীন ও অর্বাচীন স্থান ও মনীষীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এবং সবশেষে কাব্য শেষ হয়েছে এইভাবে,

মলিন হৃদয়ে গঙ্গা চলিতে লাগিল,
গঙ্গাসাগরেতে পরে আসি উত্তরিল,
পরি তথা শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন,
হাস্যমুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন।

এই কাব্যের প্রথমভাগ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত। গোপাল হালদার এই কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: "গঙ্গার উৎপত্তি থেকে সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত যাত্রাটি নানা দিক থেকে কাব্যের বিষয় হতে পারে—তাতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, এমনকি নৈসর্গিক, সামাজিক—নানা উপাদানই সুলভ।"[৫]

নানা টুকরো কবিতায় গঙ্গাবন্দনা নানাভাবে বিধৃত আছে বাঙলা সাহিত্যে। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করেছেন গঙ্গাতীরের—'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।' শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত গঙ্গাস্তোত্রকে মনে পড়তে পারে এই প্রসঙ্গে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন:

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি,
ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগনগরী তীর্থ হইল তব
চুম্বি চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা
তব সলিলে অবগাহি।

কালিদাস রায়ের কবিতাতেও গঙ্গাস্তুতি পাওয়া যাবে

তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী, ধারারূপ ধরি মধুস্রবা,
সুরলোক হতে পরিবহ-পথে কল্লোলময়ী ক্ষণপ্রভা!
নারদ-বীণার রণনে ক্ষরিতপূত প্রেমাশ্রুধারায় পীনা,
হরের অট্টহাস্যে ফেনিলা কভু বা পিঙ্গজটায় লীনা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন:

বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল।
গোলোকে হলো না ঠাঁই শিবজটা বাহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।।

এ-কাহিনীতে নবপুরাণ সৃষ্টি করেছেন কবি। গঙ্গাকে বিশ্বের ক্রন্দনে ব্যথিত নারায়ণের নেত্রজল বলে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য কাব্য-নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিপিনবিহারী দে রচিত 'জাহ্নবীবিলাস' (১৮৬৯), মানসী ও মর্মবাণীর বিশিষ্ট লেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯) রচিত কবিতার বই 'সুরধুনী' (১৯৪১), সুধীরকুমার কর রচিত 'সুরধুনী' (১৯২৭) কবিতাগ্রন্থ। অবশ্য, বাঙলা সাহিত্যে গঙ্গা নিয়ে গঙ্গা প্রসঙ্গ এসে পড়েছে এমন বহু কাব্যের কথাই অনুল্লেখিত থেকে গেল। আমরা এবার উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রবিষ্ট হব।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রতিবেশ-এর বিশেষ ভূমিকা আছে। নদীকে অবলম্বন করে, কখনো বা নদীকে পটভূমিকায় রেখে উপন্যাসে প্রতিবেশ সৃজন করা হয়। প্রতিবেশ হিসাবে নদী উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে থাকলে সেই উপন্যাসে আঞ্চলিকতা-ধর্ম এসে উপস্থিত হয়। সেইসব ক্ষেত্রে প্রতিবেশ হিসাবে নদীর গুরুত্ব বিশেষ করে বেড়ে যায়। উপন্যাসে তখন স্থানীয় বর্ণালী (Local colour) ফুটে উঠতে থাকে।

বাঙলা সাহিত্যে নদী নিয়ে লেখা হয়েছে নানা ধরনের উপন্যাস। পদ্মা-মেঘনা-গঙ্গা-যমুনা-ইছামতী-কর্ণফুলী-ময়ূরাক্ষী-ঝিলাম-তিতাস-তিস্তা প্রভৃতি নানা নদী নানা উপন্যাসে এসে উপস্থিত হয়েছে। যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', প্রমথনাথ বিশীর 'সিন্ধু নদের প্রহরী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রভৃতি উপন্যাস।

গঙ্গা নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গা যমুনা' (১৩৪০), কালিকানন্দ অবধূত রচিত 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', কালকূটের লেখা 'মুক্তবেণীর উজানে', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর জাহ্নবী', নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'অস্তি ভাগীরথী তীরে', 'ভাগীরথী বয়ে চলে', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' প্রভৃতি উপন্যাস এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান আলোচনায় আমরা সমরেশ বসু রচিত 'গঙ্গা' উপন্যাসটি সংক্ষেপে উল্লেখ করে নিবন্ধটি সমাপ্ত করব।

---

[৫] দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন (১৯৭৩), ভূমিকা, পৃঃ ২১

শারদীয় ‘জন্মভূমি’ পত্রিকায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ সালেই আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশের পর চৈত্র মাসে দ্বিতীয় মুদ্রণ আর তার পরবর্তী তিন বছরে তিনটি মুদ্রণ এই উপন্যাসের প্রচারগত দিকটি আমাদের কাছে তুলে ধরে। কাহিনী তৈরি হয়েছে নিবারণ সাঁইদারের পুত্র বিলাস এবং তার খুড়ো পাঁচুকে নিয়ে। এরাই মালোপাড়ার মালোজাতির লোক—গঙ্গার মাঝি—গঙ্গাপুত্র। আর স্বাভাবিকভাবে এসেছে গঙ্গার প্রবাহ। এই গঙ্গা সমুদ্রগামী—সারা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার প্রবাহ প্রতিবেশ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

এই গঙ্গায় মাছমারারা যে যেখান থেকে পারছে সব এসে জমা হচ্ছে। এখানে গঙ্গার ঘোলা ও মিঠে জল। “সব মৎস্যজীবীর ভাত-কাপড় যার কাছে আছে বাঁধা” (পৃঃ ৪)।[৬] “খাল বিল নালা দিয়ে এসে, গঙ্গায় পড়ে, কেউ থাকবে কলকাতার তল্লাটে। দক্ষিণে থাকবে কেউ। কেউ আসবে উত্তরে, বারাকপুর-বরানগরের তল্লাটে, এপারে ওপারে সেই চন্দননগর-জগদ্দল, হুগলী-নৈহাটী, দূরে ত্রিবেণী পেরিয়ে।” (পৃঃ ৪)

গঙ্গার এই প্রতিবেশে মাছমারাদের জীবনচিত্র পাঁচু এবং বিলাস-এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু দক্ষিণ যখন টান দেয়, মাছমারারা অনেকেই যায় সমুদ্রে। কেউ ফেরে কেউ আবার ফেরে না। যেমন নিবারণ মালো, গুণীন, “সাত বছর আগে সেই মানুষ গেল দক্ষিণে। আর ফিরল না।” (পৃঃ ৯)

গঙ্গার রহস্যময়তার সঙ্গে, তার প্রবাহের সঙ্গে মানবজীবনের দর্শনকে মিলিয়ে দেখেছেন সমরেশ বসু।

“জোয়ার টানছে উত্তরে। পার ঘেঁসে গেলে, আবার দক্ষিণে টান ধরে যাবে। ওটা জোয়ারের লীলা। কিছুটি থেমে নেই এ-সংসারে। সব চলছে ফিরছে দিবানিশি। ওই তোমার শেষ থামাটা এমনি করে নাড়া দিয়ে যায় মাঝে মাঝে।” (পৃঃ ৮৫)

সমরেশ বসু এই উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের জীবনচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেছেন ঃ “সংসারে দুঃখের ভাগ বেশি। সুখ কম। দুঃখ আসবে। তাতে দিশেহারা হলে, দুঃখ তোমার বাড়বে বেশি। চেয়ে দেখো, সেইজন্য সংসারে অনাচার বেশি। বেশি মনের পাগলামি।” (পৃঃ ৯১)

গঙ্গার হিমালয় থেকে নানা দেশ ঘুরে সমতলভূমি পার হয়ে নিম্নবঙ্গের উপর দিয়ে সমুদ্রে যাত্রা মানবজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন লেখক। আর এখানেই তিনি অন্যান্য লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র।

‘বাঙলা সাহিত্যে গঙ্গা’ আলোচনা কখনোই সম্পূর্ণ হবে না যদি স্বামী বিবেকানন্দের ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থের উল্লেখ না করা হয়। অল্প কিছু কথায় স্বামীজী ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থে গঙ্গার একটি অপূর্ব চিত্র উপহার দিয়েছেন, সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন গঙ্গা ভারতবর্ষ ও ভারতীয় হিন্দুদের কোন্ গভীর বিশ্বাসভূমিকে স্পর্শ করে আছে তাও ঃ “হিন্দুর সঙ্গে (গঙ্গা) মায়ের সঙ্গে একি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি ? হবে। গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর-দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন করে রাখে, পালপার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়া ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় করে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায় ; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মালটা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিন্দুর হিন্দুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি। বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে সে কোটি কোটি মানবের উম্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বি-সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই ‘হর্ হর্ হর্’, দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—‘হর্ হর্ হর্’ !!”[৭]

---

[৬] সমরেশ বসুর উদ্ধৃতিগুলি বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত (১৩৬৯) ‘গঙ্গা’ থেকে গৃহীত।

[৭] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৬২

ফরাসী বিপ্লবের দুশো বছর

তরুণ সান্যাল

এক এক দেশের জাতীয় মর্মবস্তু এক এক ধরনের, বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে তিনি বলেছেনঃ "রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসীজাতির মেরুদণ্ড… কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, এইটিই ফরাসী-চরিত্রের মূলমন্ত্র।…[ফরাসীদের ভাব] 'রাজ্যশাসন সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার'।"[১]

এই মূল্যায়নটি ফরাসী চরিত্রবিষয়ে বিশেষভাবে সত্য হয়ে উঠেছে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে পারী শহরের সবচেয়ে নিপীড়িত ও জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র মারমুখী আক্রমণে বাস্তিল দুর্গের পতনের দিন থেকেই ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত। এ-বছর সে-বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী। পৃথিবীর নানা দেশে ঐ বিপ্লবের তাৎপর্য ও উত্তরাধিকার নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। খোদ পারী শহরে খুব জাঁকজমক করে ঐ বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমাদের দেশেও নানা সভাসমিতির আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী প্রভৃতি দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ যে 'রাজনৈতিক' ও 'সামাজিক স্বাধীনতা'র কথা বলেছেন, সে-বিষয়ে অর্থাৎ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উপর আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্ব পড়ছে বেশি করে।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কার্যতঃ ঐ বিপ্লবের যুগ। আবার তার প্রতিক্রিয়া ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সম্রাট হওয়া, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের পতন—এই পুরো সময়টা জুড়েই ঐ বিপ্লবের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার নানা ফলাফল প্রত্যক্ষগোচর হয়েছিল। আর, ফরাসীরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে-জনশক্তির সামর্থ্য বুঝতে পেরেছিল, তার নানা প্রকাশ ঘটেছে ফ্রান্সে ১৮৩০, ১৮৪৮, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের নানান পর্যায়ের বিপ্লবে। (১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপের নানা দেশে, বিশেষভাবে বহুবিভক্ত জার্মানীতে বহু ব্যর্থ বিপ্লবও ঘটে।) ফরাসীজাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এমনই অদম্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে দখলদার নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লেখক-শিল্পী-কবির পাশাপাশি প্রতিরোধ-সংগ্রামে সাধারণ শ্রমিক, কৃষক অস্ত্রধারণ করেছে। কোন কোন ইতিহাসকার মনে করেছেন, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে পারীতে যার সূত্রপাত, সেই বিপ্লবের প্রাণশক্তি সীমান্ত পার হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে। অসমাপ্ত ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের বাবুকপন্থীদের 'সাম্যবাদী' বিপ্লব পূর্ণতায় নিষ্পন্ন করেছে রুশদেশ রাশিয়ার পেট্রগ্রাদে, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ নভেম্বর। সে বিপ্লবের প্রভাব-প্রক্রিয়া এখনো চলেছে দেশে দেশে মানুষের সামাজিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী অর্জনের সংগ্রামে।

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেছেন ফরাসী-বিপ্লবের কোন উত্তরাধিকারই নেই। যেমন ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার। তাঁর মতে ফরাসী-বিপ্লব শুধু মনে পড়িয়ে দেয় সন্ত্রাসের কথাই, রক্তপাতের কথা, তার বেশি কিছু নয়। তিনি হয়তো মনেই রাখেননি, ব্রিটেনের অলিভার ক্রমোয়েলের নেতৃত্বে পিউরিটান বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা। 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি' বলে দাবি করেছিলেন সামন্ত প্রভুদের প্রতিনিধি প্রথম চার্লস। ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল পার্লামেন্ট। সে গৃহযুদ্ধেও যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছিল। এমনকি শেষপর্যন্ত রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর্বে যুদ্ধে পরাস্ত পার্লামেন্ট-বাহিনীর নেতা ক্রমোয়েলের কঙ্কাল কবর থেকে তুলে এনে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রীরা ফাঁসিতে লটকেছিল প্রতিশোধস্পৃহায়। তবে, শেষপর্যন্ত পার্লামেন্টেরই প্রাধান্য মেনে নিতে হয়েছিল ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে 'গৌরবান্বিত বিপ্লবে'; যা ছিল না সামন্ত প্রভুদের গৌরবের, অথবা যা ছিল না বিপ্লবও। এমনকি ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের মার্কিন স্বাধীনতা-যুদ্ধেও কম রক্তপাত হয়নি।

রক্তপাত বা সন্ত্রাসের দিকটিই বিপ্লবের মূল বিষয় নয়। এবং বিপ্লব ও রক্তপাত সমার্থকও নয়। শুধু এইটুকুই মনে করিয়ে দেওয়া, ফরাসী বিপ্লবের আগেও

---

[১] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ১৫৯

রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটেছে, রক্তপাত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবও সেই পথের পথিক। তবে তার গুণগত তাৎপর্য আরও অনেক গভীর ও ব্যাপক। কেননা, ফরাসী-বিপ্লবের পথান্বেষণ ছিল নিছক মার্কিনদেশের মতো পররাজ্যের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা অর্জন নয়, বা ব্রিটেনের ক্রমোয়েলপন্থীদের মতো সামন্ত আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া নয়। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—লিবার্টি-ইকোয়ালিটি-ফ্রাটারনিটির দাবি, মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেবার দাবি। আর কে না জানে, ফরাসী বিপ্লবই বোধ এনেছিল জাতীয়তার, আধুনিক জাতিগঠনের—যার প্রভাব গোটা মহাদেশীয় ইউরোপে ছড়িয়ে গেছে। ছড়িয়ে গেছে দেশে-দেশান্তরে। স্বামীজী লিখেছেন “প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারী নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে। সেইদিন হতে ইউরোপের নূতন মূর্তি হয়েছে। ‘এগালিতে, লিবার্তে ফ্রাতের্নিতে’র (Egalite, Liberte, Fraternite—সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের) ধ্বনী ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স অন্যভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপে অন্যান্য জাত এখন সেই ফরাসীবিপ্লব মক্স করছে।”[২]

॥ ২ ॥

ফরাসী-বিপ্লবের আগে, ফরাসীসমাজটি ছিল তিনটি বর্গে বিভক্ত—প্রথম বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ ও তৃতীয় বর্গ (First Estate, Second Estate, Third Estate)। প্রথম বর্গ ছিল ক্যাথলিক যাজকেরা। দ্বিতীয় বর্গ ছিল ভূম্যধিকারী সামন্ত-প্রভুরা। তৃতীয় বর্গে ছিল উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা পেশার মানুষ, কারখানার মালিক, শহুরে মজুর, গ্রামীণ চাষী, কারখানার মজুর প্রভৃতি। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গেরই ছিল সামাজিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা। তৃতীয় বর্গ থেকেই রাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করত। রাজা ষোড়শ লুই সাত বছরের যুদ্ধ, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতির জন্য প্রবল ঋণগ্রস্ত, প্রবল মুদ্রাস্ফীতি যখন ফ্রান্সে, তখন ঐ তিন বর্গের প্রতিনিধিদের সভা ডেকেছিলেন। ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দের পর সেই প্রথম সভা ডাকা হলো। একসঙ্গে তিন বর্গ যাতে না মিলতে পারে, সেজন্য পৃথক পৃথক বর্গের পৃথক পৃথক অধিবেশনের নির্দেশ দিলেন রাজা ষোড়শ লুই। কিন্তু তৃতীয় বর্গের নেতা মিরাবো রাজদূতকে বললেন: “আপনার প্রভুকে বলবেন, জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি, কেবল বেয়নেটই আমাদের নড়াতে পারবে, অন্য কিছু নয়।” শেষপর্যন্ত তৃতীয় বর্গ জাতীয় সভা গঠন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের কিছু প্রতিনিধিও তাতে যোগ দেয়। কিন্তু রাজার প্রয়োজন কর-হার বৃদ্ধি। যাজক বা মঠপ্রভুরা বা সামন্তদের ওপর কর না বসিয়ে তৃতীয় বর্গের ওপর কর বসাবার জন্য অর্থমন্ত্রী নেকর-এর উপর রাজাজ্ঞা এল। জনপ্রিয় মন্ত্রী তাঁর অক্ষমতা জানালেন। এদিকে কোষাগার শূন্য, কিন্তু রাজা, রানী বা সভাসদদের বিলাস-ব্যসনের কমতি নেই, দেশে খরার ফলে খাদ্য উৎপাদন কম, রুটির দর হয়েছে আকাশছোঁয়া, মজুরদের কাজ নেই। পারী শহরে তখন সংকটের পর্ব চলছে। রাজা, যাজক ও অভিজাতশ্রেণীর ওপর গরিব-গুরবোদের রাগ উঠল চরমে। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বাস্তিল কারাদুর্গ আক্রমণ করে কয়েদীদের মুক্ত করে দেয়, কারাপ্রধানকে হত্যা করে, যে কারারক্ষীরা তাদের উপর গুলি চালিয়েছিল তাদের হত্যা করে। অবশ্য বন্দীদের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দী কেউ ছিল না। তবে বাস্তিল ছিল আগে রাজবন্দীদের নিপীড়ন করার কারাগার। তারিখটা ছিল ১৪ জুলাই, ১৭৮৯। এরপর দ্রুত পালা বদলের নাটক। ৪ আগস্ট জাতীয় সভা সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাল। আড়াই কোটি ফরাসী জনগণের আশি শতাংশের বাস ছিল গ্রামে। তারা মুক্তির নিঃশ্বাস নিল। ২০ আগস্ট ‘মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র’ জাতীয় সভা গ্রহণ করল। ফরাসী দেশে সর্বজনের ‘মান’ ও ‘হুঁশ’-এর সম্মান জানানো হলো তাতে। ধর্মের ‘যত মত তত পথ’ স্বীকৃত হলো, ক্যাথলিক মঠপ্রভুদের হাত থেকে ‘স্বর্গের চাবিকাঠিটি কেড়ে নেওয়া হলো। অক্টোবরে রাজারানীকে কার্যতঃ বন্দী করে এক বিশাল ভুখা মিছিল ভার্সাই প্রাসাদ থেকে পারীতে এল। নভেম্বরে মঠের সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হলো। ‘অভিজাত’ ব্যাপারটাই আইন করে তুলে দেওয়া হলো। যাজকদের যেসব

---

[২] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১৪

বিশেষ অধিকার ছিল তা বাতিল হলো। বলা হলো পোপ বা রাজার নির্দেশে নয়, দেশবাসীর সাধারণ ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের চলতে হবে। রাজতন্ত্র ও পোপতন্ত্র বাতিল হলো ফ্রান্সে। নতুনভাবে নির্বাচিত হলো জাতীয় সভা। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি রাজার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো, ২১ জানুয়ারি সেই দণ্ডাদেশ কার্যকর হলো। দেশে গড়ে উঠল সাধারণতন্ত্র। ইউরোপের নানান রাজবংশ বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ভালমির রণাঙ্গনে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিপ্লবীবাহিনী বিদেশী রাজাদের সৈন্যবাহিনীকে 'লা মার্সাই' সঙ্গীত গাইতে গাইতে পরাভূত করল। পরদেশী রাজকীয় বাহিনীর প্রধান ব্রানসউইক লিখেছিলেনঃ "ওরা কি মানুষ? আমাদের কামানের গোলায় কাতারে কাতারে ওরা মরছে, আর ঐ শবদেহগুলি মাড়িয়ে অকুতোভয়ে ওরা গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে লড়াই করতে।" কার্লাইল লিখেছিলেনঃ "এ কি গান!... মানুষের শিরায় শিরায় রক্ত ফুটতে থাকে এই গানে।... চোখে জল আর আগুন নিয়ে গান গাইতে গাইতে বেপরোয়া মানুষ স্বৈরাচার, পাশবশক্তি এমনকি মৃত্যুকেও জয় করে নেবে।" কার্লাইল কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না।

বিদেশী রাজাদের আক্রমণই ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ ফরাসীদের দেশের অভ্যন্তরের অন্তর্ঘাতের শক্তির বিরুদ্ধে নির্মম করে তোলে। বিপ্লববিরোধীরা বিদেশী রাজশক্তিকে সহযোগিতা দিতে চোরাগোপ্তা খুনখারাবি চালাতে থাকে। ঘরে-বাইরে প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করার জন্য ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ গড়ে উঠল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বিপ্লবী ট্রাইবুনাল। বিপ্লব-বিরোধী সন্দেহে বহু নিরপরাধীও অভিযুক্ত হয়। দণ্ড হয় চরম—মৃত্যু। ভঁদে প্রভৃতি জায়গায় প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ দেখা দিল। জাতীয় সভায় দুটি গোষ্ঠী তখন ক্ষমতা দখলের জন্য তৎপর। জিরদাঁরা ছিলেন নরমপন্থী। ধনী ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি এমনকি ভূম্যধিকারীদের পক্ষ নিয়ে তাঁরা কথা বলতেন। দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন চলুক, সরকারের বাজেয়াপ্ত করা জমি চাষী ন্যায্য দামে কিনে নিক, জমিদারেরা ক্ষতিপূরণ পাক, উৎপাদন সঙ্কটে মজুরদের মজুরি হ্রাস ঘটানো হোক, বিপ্লবী সন্ত্রাসের তেমন প্রয়োজন নেই, এমন সব কথা এঁরা বলতেন। অন্যদিকে জ্যাকোবিনপন্থীরা সপাটে সুযোগসন্ধানীদের নিকেশ করার কথা বলতেন। মজুরের মজুরি কমানো চলবে না, বাজারের দরদাম বেঁধে দিতে হবে এবং ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণের কথাই ওঠে না, তাঁরা বলতেন। এঁদের পাশে ছিলেন পারীর জনতা। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের সংবিধান বিচার, আইন ও প্রশাসন বিভাগ আলাদা করলেও বিপ্লবীশক্তির প্রাধান্য তিন ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হলো। বিপ্লবের পর জনতার তৎপরতায় রোবসপীয়র জননিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হন। জনতা বিপ্লববিরোধীদের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস' ঘোষণা করে। বিপ্লবী ন্যায়পরায়ণতার গিলোটিনে শেষপর্যন্ত প্রাণ দিলেন দাঁতো, এমনকি শেষপর্যন্ত রোবসপিয়রও। তবে ইতিমধ্যে স্বীকার করা হয়েছে 'যুক্তিবাদ'। ফরাসী উপনিবেশগুলি থেকে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হলো। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বিপ্লবী চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য শক্তিগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরে বিপ্লবের অছি পরিষদের শুরু। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথমে নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করলেন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ—এই দশ বছর প্রথম ফরাসী বিপ্লব আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়েছে, পিছিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানে সে-বিপ্লব পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চিন্তার পরাজয় ঘটেনি। তা দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে।

॥ ৩ ॥

ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ঐতিহাসিকরা ধরেছেনঃ জাতিসৃজন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি। আবার এসবের সঙ্গে কেউ দেখেছেন 'সমাজতন্ত্র' বিষয়েও মনোভাবের বিকাশ। মেট্রিক হিসাবনিকাশের দিকটিও ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকার। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব কার বা কাদের উত্তরাধিকারী? মহাদেশীয় ইউরোপ পঞ্চদশ শতকের মাঝখান থেকেই নতুন নতুন ভাবধারার বিকাশের দিক লক্ষ্য করা যায়। এই সময়টার নাম রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। ইটালীর কিছু কিছু নগর-রাষ্ট্রে

ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মের বহুবিধ কুসংস্কার ও প্রথা, তথা ধর্মীয় কর্তাদের নির্দেশিত জীবনচর্যাবিষয়ে প্রশ্ন উঠে। খ্রীস্টীয় মঠ-প্রভুদের কাছে ধর্মীয় লেখক ছাড়া অন্যান্য লেখকদের রচনা অপবিত্র জ্ঞান করা হতো তখন। কিন্তু ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে'র পূর্বাঞ্চলের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল শহর তুর্কীদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হবার পর, বহু মনস্বী ব্যক্তি পুরনো গ্রীক-চিন্তার বাহন বই-পত্র নিয়ে ইটালীর ফ্লোরেন্স, পিসা প্রভৃতি নগরে আশ্রয় নেন। নতুন করে ক্লাসিক্যাল গ্রীক ন্যায়শাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়নের সূত্রপাত ঘটে। বিশেষভাবে ফ্লোরেন্সের ধনী মেদিচি পরিবার সেই নতুন বিদ্যাচর্চার আনুকূল্য দিতে থাকে। ক্রমে বাইবেলকেন্দ্রিক ধর্মীয় সন্ন্যাসীদের বিশ্ববিশ্লেষণ অবাস্তব গণ্য হতে থাকে। ব্যক্তিসাপেক্ষতা, ঐহিকতা বিষয়ে আগ্রহ, পরলোক নয় ইহলোকেই সুখলাভের ইচ্ছা এবং গ্রীক মডেলে সৌন্দর্যের ধারণার উদ্ভব পুরনো প্রথাপীড়িত উদ্ভিদপ্রতিম সমাজের গোড়া ধরেই টান দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন ঃ "প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প বর্বরাক্রান্ত ইটালিতে প্রবেশ করলে··· প্রাচীন ইটালী নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগল। এর নাম রেনেসাঁস (renaissance)—নবজন্ম। কিন্তু সে নবজন্ম হলো ইটালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম।··· ইটালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগল বলবান অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে।··· ইউরোপের সৌভাগ্য এই নূতন ফরাসীজাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগল, সে একধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগল।"[৩]

এই নবজাগরণেরও দুটি ধারা ছিল। এক, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উচ্চমূল্য দেওয়া ; দুই, যৌথ জীবনচারণাকে উচ্চমূল্য দিয়ে ভূস্বামী ও মঠপ্রভুদের খাজনালাভের শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার উৎসাদন। ধর্মসংস্কারের লুথারীয় আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামে শহীদ হলো জার্মানীর কৃষক-বিদ্রোহের ধর্মীয় নেতা টমাস মুনৎজার। মুনৎজারের সংগ্রামের অঞ্চল জার্মানির থুরিঙ্গিয়া প্রদেশটি ছিল ফরাসী সীমান্তে। তাছাড়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও চলেছে ধর্মসংস্কার বনাম প্রতিধর্মসংস্কারের মধ্যে রক্তাক্ত লড়াই। যেসব দেশে বিশেষভাবে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডে, প্রোটেস্টান্ট মত জয়ী হয়, সেসব দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তিলাভের বুর্জোয়া আশা যথেষ্ট চরিতার্থ হতে থাকে। জাতীয় রাষ্ট্রের ভাষা বৃদ্ধি পায়। কার্যতঃ ক্যাথলিক ধর্মের প্রথা ও সংস্কারের বাইরে বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিকশিত হবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু গ্রামে চাষী ও শহরের গিল্ডগুলির মজুরদের কোন সুরাহা এসব দেশে ঘটেনি। ব্রিটেনে বরং গ্রাম থেকে চাষী উৎখাত হয়েছে এসময়। চাষের জমিতে বেড়া দেবার আন্দোলন ও সাধারণ চাষীর গোচারণ দখল প্রভৃতি গ্রাম থেকে চাষী উৎসন্ন করতে থাকে এবং শহরে উঞ্ছজীবীদের ভিড় বাড়তে থাকে। ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমোয়েলের লড়াই নিছকই বুর্জোয়া বনাম সামন্তবাদের লড়াই ছিল। তবে ভূস্বামীরাও পুঁজিপতি হচ্ছিল বলে শহরের উঞ্ছজীবীদের সঙ্গে বা গ্রামের উৎখাত চাষীদের সঙ্গে বুর্জোয়া বাহিনীর খুব একটা যোগ ছিল না। ব্রিটেনে ঐ লড়াইয়ের ফল হিসাবে আইনের শাসন স্থিরীকৃত হয়। আইনসভা, বিচারবিভাগ ও প্রশাসন কর্তৃত্ব আলাদা আলাদা হয়ে পরস্পরকে বিকাশ ঘটাতেও যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি নিজ নিজ বিভাগের স্বাধীনসত্তা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাবিভাজন ভিত্তিক আইনের শাসনকে কার্যকর রেখেছে।

কিন্তু ফ্রান্সে তেমনটি ছিল না। রাজা চতুর্দশ লুই ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। তিনি ক্ষমতার বিভাজনে বিশ্বাসই করতেন না। বরং বলতেন 'আমিই রাষ্ট্র'। ভূস্বামী ও যাজকদের তিনি নিজ পক্ষপুটে রাখতেন। ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের শোষণ করত চরমভাবে, আর যেকোন বিক্ষোভকে দমিয়ে দেবার কাজ ছিল মঠপ্রভুদের। বাইবেলে বলা আছে, 'সীজারের পাওনা সীজারকে দাও, ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে'। সেটা ভাঙিয়েই তারা চাষীকে লেখাত এই রাজা তোমাদের ইহলোকের কর্তা, ঈশ্বর যেমন স্বর্গের কর্তা। ঈশ্বরভজনার অর্থ, ধর্মাচরণের

---

[৩] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯২-১৯৩

অর্থ রাজ-ভজনাও বটে। আর ঈশ্বর-ভজনাতো অবশ্যই মঠ-ভজনা।

রাজকোষ সর্বস্বান্ত করে চতুর্দশ লুই মারা যান। তিনি অবশ্য বলেছিলেন: "আমার পরেই আসবে প্রলয়।" ইতিমধ্যে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব হয়েছে, পৃথিবীর দেশে দেশে চলেছে ব্রিটেনের পণ্যবাহী পোত। শিল্পবিকাশের জন্য যা জরুরি, সেই পুঁজির সঞ্চার, পণ্য বনাম টাকার বিনিময় ব্যবস্থা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাজন, ফ্রান্সে তখন অনুপস্থিত, বরং পুঁজি গঠন না ঘটিয়ে রাজা, মঠ ও সামন্ত প্রভুরা জাতীয় সঞ্চয় নয়-ছয় করছিল। কৃষকদের কেনবার ক্ষমতা অতি খাজনায় বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাজার ব্যবস্থাও তেমন গড়ে ওঠেনি। আর অনড় সামাজিক বর্গের অস্তিত্ব শ্রমবিভাজন ও উৎপাদন উপকরণের সচ্ছন্দ সঞ্চালন অনুপস্থিত রাখে। রুশো ও ভলতেয়ার, দিদেরো ও দেকার্ত প্রমুখ দার্শনিকগণ নতুন যুক্তিবাদের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁরা নিপীড়িতও হয়েছেন। রুশো বললেন, মানবিক নিপীড়ন রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের অধিকার রয়েছে। ভলতেয়ার ধর্মের সংসারশূন্যতা ও অভিজাতদের তথাকথিত আভিজাত্যকে হাস্যকরভাবে চিত্রিত করে, তাঁর 'কাঁদিদ' (Candide) গ্রন্থে এক সমসমাজের দেশ এলদোরেদোর স্বপ্ন তুলে ধরেন। দেকার্ত প্রমুখ দার্শনিকেরা দেখালেন, ঈশ্বরের প্রশাসনিক নিয়ম এবং রাষ্ট্র প্রশাসনিক নিয়ম এক নয়। ফলে কথায় কথায় ধর্মীয় প্রধানেরা রাষ্ট্রশাসনে নাক গলাবেন ঈশ্বর, খ্রীস্টীয় ধর্ম ও শয়তানের ভয় দেখিয়ে, তা চলবে না। বরং রাষ্ট্রের জনগণের সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী হতে হবে তাদেরও। বিশপ বা উচ্চশ্রেণীর ধর্মযাজকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাত পরিবারের। কিন্তু নীচুতলার পাদ্রীদের বড় অংশই এসেছিলেন সমাজের নীচুতলা থেকে। তাঁরা অনেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। ক্ষমতা বিভাজনের তত্ত্বে তাঁদের অনেকেই সমর্থক ছিলেন। ফলে ফরাসী বিপ্লবের ভগীরথ ছিলেন নানা শ্রেণী ও শ্রেণী-অংশ। ফলে, বিপ্লবের পর্যায়ে বিপ্লবের গতিপথ নিয়ে টানাপোড়েনের অন্ত ছিল না।

মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন: "ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই খ্রীস্টানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহদ্বারা। আজ যদি ইউরোপে খ্রীস্টানীর শক্তি থাকত, তবে 'পাস্তের' (Pasteur) এবং 'কক' (Koch)-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত। এবং ডারউইন-কল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইউরোপে খ্রীস্টানী আর সভ্যতা—আলাদা জিনিস। সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু খ্রীস্টানীর বিনাশের জন্য পাদ্রীকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয় সকল কেড়ে নিয়ে কটিবন্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে খ্রীস্টানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হতো না এবং সমূলে উৎপাটিত হতো। কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই খ্রীস্টানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু।"[৪]

কার্ল মার্কস 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' বইতে এহেন কৃষকদের 'এক বস্তা আলু'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং শহরের শ্রমিক বা প্রোলেতারিয়েতদের সত্যিকারের বিপ্লবী গণ্য করেছিলেন। যাজকদের প্রচারিত ধর্মকে মার্কস বলেছিলেন "জনগণের আফিম"।

বলা বাহুল্য, মধ্যযুগীয় গসপেল অনুসারী মৌলবাদ জনগণকে করেছিল মূঢ়, শোষণের কাছে আত্মনিবেদিত। স্বামী বিবেকানন্দের এই মূল্যায়ন কতখানি সত্য তা বোঝা যাবে, যখন দেখি চাষীদের কিছুটা জমির সমস্যা মেটবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকেই তারা বিপ্লবী কার্যকলাপে হাত গুটিয়ে বসেছে। এমনকি ফ্রান্সের দক্ষিণে তাদের একাংশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিল।

॥ ৪

ফরাসী বিপ্লব ঘটানোর পিছনে ছিল শহুরে গরিবেরাই। এমনকি 'প্রাকাম' ফ্রাঁসোয়া নোয়েল ব্যাবুক, দার্মে, মারসেল প্রভৃতি নেতারা সঁ কুলোত গরিবগুরবো ও জ্যাকোবিনদের একাংশ নিয়ে সমসমাজ গড়ার জন্য দক্ষিণপন্থী ডিরেক্টরদের সরিয়ে আবার

[৪] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৩

এক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছিলেন ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে। সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ধ্যাবুক গিলোটিনে গেলেন, তবে বিপ্লবের ধারায় স্পষ্ট হলো: একদল চায় বিপ্লবকে বুর্জোয়া শাসনের প্রয়োজনে, অন্যদল চেয়েছে নিপীড়িতদের প্রয়োজনে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি রেনেসাঁসেরও ছিল ঐ দুটি ধারাই। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বলা যায়, ফ্রান্সের বিপ্লব শেষপর্যন্ত ক্ষত্রিয়শাসনকে হারিয়ে দিয়ে বৈশ্যশাসন আনল আবার। বৈশ্যশাসন শূদ্রশাসনের স্বপ্নকেও আপাতভাবে হারিয়ে দিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরাসী-বিপ্লবের পর অ্যানার্কিজম, সিন্ডিক্যালিজ্ম, নানা কল্পনামূলক সোশ্যালিজমের চিন্তানায়কদের উদ্ভব হয়েছে ঐ ফ্রান্সেই। মার্কস নিজেও শিক্ষা নিয়েছেন ঐ ফরাসী-বিপ্লব ও ফরাসী-সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ থেকে। লেনিন বলেছিলেন মার্কসবাদের আছে তিন উৎস: ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল ইকনমি, জার্মান দর্শন ও ফরাসী সমাজবাদী চিন্তা।

তাহলে ফরাসী-বিপ্লবে রেনেসাঁসের দুটি ধারার জড়াজড়ি করে থাকা রূপ ছিল। দুটি ধারার প্রতিটিই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিকে জয়ী দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ বুর্জোয়া রাষ্ট্রই শেষপর্যন্ত সে-দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে তারা নিয়েছে ‘লা মার্শাই’—গরিবগুরবোদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গান। কিন্তু সে-দেশ হয়ে উঠল এক সময় ধনবাদী—সাম্রাজ্যবাদী। এই সেদিনও তার উপনিবেশ ছিল বিস্তৃত। কিন্তু ফরাসী গরিবদের বিপ্লবের স্বপ্ন শেষ হয়নি। তা সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে এবং দেশের পক্ষে বহুবিধ আন্দোলন ও সংগ্রামে রূপ পেয়েছে। শেষ লড়াই এখনো বাকি।

ভারতে উনিশ শতকের রেনেসাঁসেরও মোটামুটি দুটি ধারা ছিল। এক দিকে ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, বুদ্ধিবাদী ও নানান সংস্কারমুখী ধারা। অন্যদিকে ছিল বহুবিধ কৃষকবিদ্রোহ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মে ও দর্শনে বুদ্ধিবাদীদের জ্ঞান ও বিদ্যা, আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন দরিদ্র মানুষের সমসমাজের সাধনা। ভারতে তিনিই ছিলেন প্রথম সোশ্যালিস্ট, যিনি শূদ্র-প্রাধান্যের ঐতিহাসিক বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর আদর্শ বিকশিত হয়ে গণ-আন্দোলনের তাৎপর্যে ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-আন্দোলনেও সমাজতান্ত্রিক মাত্রা যুক্ত করেছিল। ভারতের সেই সম্ভাবিত সমাজের দেহটি ভেবেছিলেন তিনি জাত-পাত উত্তীর্ণ ইসলামীয়, এবং সর্বমানুষ একই উৎস থেকে উত্থিত বলে তারা হবে অন্তরে বৈদান্তিক। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফরাসী-বিপ্লবের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে জনশিক্ষা ও জনসেবায় সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, একদল দায়বদ্ধ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দিয়ে। ভারতে সর্বত্যাগীদের কল্যাণমুখী আবেদন এখনো যথেষ্ট। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবের সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি তিনি আগে গড়তে চেয়েছিলেন। মার্কস বলেছেন, ভাবাদর্শও বস্তুগত শক্তির তুল্য। এবং সে-বিচারে সত্যিকারের সমাজবিপ্লবীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও সংগঠনের বিরোধ থাকার কথা নয়। রুশো ও ভলতেয়ার, মন্তেস্কু ও দিদেরোর মতো স্বামীজীর স্বপ্নেও ছিল ‘মুচি-মেথর’ যারা ‘এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে’ সমর্থ, সেই সঁ কোলেত বা আধুনিক-ভাষায় ‘সাবালটার্ন’দের দেশ। তাঁর ব্রতও কি ভারতে আমরা সফল করতে পেরেছি?

⁂

অন্তর্দৃষ্টির কবি হপকিনজ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভিক্টোরিয় যুগের যে-ইংরেজকবি বিংশ শতাব্দীর ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে জেরাড ম্যানলি হপকিনজ (Gerard Manley Hopkins)। এত উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যের খুব বেশি কবি লিখতে পারেননি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবিদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বললেও বোধ হয় করা হবে না। জন্মসূত্রে না হলেও অন্যান্য নানা কারণে তিনি আধুনিক কবি। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়নি বললেই চলে। তাঁর কবিতাগুলির ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁর কবিবন্ধু রবার্ট ব্রিজিজ। হপকিনজের মৃত্যুর পরে ব্রিজিজ সেগুলির স্বল্প কয়েকটি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে, আরও কয়েকটি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে এবং মোটামুটি সম্পূর্ণ কবিতাবলী ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এর সংস্করণে কয়েকটি নতুন কবিতা সংযোজিত হয়। এই তিরিশের দশকের এবং পরবর্তী কালের অনেক ইংরেজ ও মার্কিন কবি পূর্বসূরীর কবিতাগুলি পড়ে মুগ্ধ ও অভিভূত হন এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর প্রধান কারণ, হপকিনজ শুধু মহান কবিই নন, ভাবে ও ভাষায় তিনি ভাবীকালের সুরের এক সার্থক পূর্বসাধক। এমনকি আঙ্গিক ও শৈলীতেও তিনি আধুনিকতার জনক। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, আধুনিক কবিরা তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পাবেন এবং তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরেও এ-প্রেরণার স্রোত রুদ্ধ হয়নি। একাধিক অর্থে হপকিনজ 'কবির কবি' (the poet's poet)।

গত দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত এলিজাবেথ জেনিংসের 'Growing Points' কাব্যগ্রন্থটি উত্তরসূরীদের ওপর হপকিনজের অবিচ্ছিন্ন প্রভাব আর একবার প্রমাণ করল। হপকিনজের অনুকরণে এখানে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির পরীক্ষামূলক কবিতা লেখা হয়েছে। শুধু বহিরঙ্গ নয়, ভাবের দিক থেকেও হপকিনজের কবিতা ইংরেজী সাহিত্যে এখনো নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করছে। এপ্রিল ১৯৩১-এর 'দ্য ক্রাইটিয়ারিয়ন' পত্রিকাতে হার্বার্ট রীড হপকিনজ-সম্পর্কে লিখেছিলেন: "He has left us only ninety poems—but so essential that they will colour and convert the development of English poetry for many decades to come."

("তিনি মাত্র নব্বইটি কবিতা রেখে গেছেন, কিন্তু সেগুলি এতই অপরিহার্য যে, তা আগামী বহু দশক ধরে ইংরেজী কবিতার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।") এই উক্তিতে আমরা প্রখ্যাত সমালোচকের গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাই।

এসেক্সের অন্তর্গত স্ট্র্যাটফোর্ডে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুলাই হপকিনজের জন্ম হয়। ১৮৬৬-তে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন লিভারপুল ও গ্লাসগোতে পাদ্রীর কাজ করেন। বাকি জীবন তিনি স্টোনিহার্স্ট কলেজ ও ডাবলিনের ইউনিভার্সিটি কলেজে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি টাইফয়েড-জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ঐ বছরের ৮ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

নিসর্গপ্রীতি ও অধ্যাত্মচেতনার টানাপোড়েনে বোনা হপকিনজের কবিতা। তাঁর গোড়ার দিকের কবিতায় প্রকৃতি, 'মানুষ ও ঈশ্বরের সংমিশ্রণ সুন্দরভাবে ঘটেছে। তাঁর পরের দিকের কবিতা, বিশেষতঃ অনবদ্য 'terrible' বা 'রুদ্র' সনেটগুলি, ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু কিছু কম আকর্ষক নয়। এখানে তাঁর সংশয়-বিক্ষুব্ধ ও দ্বন্দ্ব-বিদীর্ণ হৃদয় তিনি অনাবৃত করে দিয়েছেন। খ্রীস্ট এখানে দূরদিগন্তের কোন ছায়ামূর্তি নন ; তিনি কবির মুখোমুখি হয়েছেন এবং কবি তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ চলিত ভাষায় কথা বলেছেন। এ-যেন কৃষ্ণার্জুন-কথোপকথনের

এক অভিনব রূপ যা কৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের উক্তি মনে করিয়ে দেয়—'সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি'' ("সখা মনে করে 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা' ইত্যাদি যেসব হঠকারী উক্তি তোমার প্রতি আমি করেছি'')।

হপকিনজের কবিতার একটা সহজ আকর্ষণ থাকলেও সে-কবিতা মোটেই সহজবোধ্য নয়। সে-কারণে হপকিনজ কখনো পাঠকসাধারণের কাছে খুব জনপ্রিয় হননি। সহৃদয় ও বিদগ্ধ পাঠকই শুধু সে-কবিতার পূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। তাঁর ভাব ও ভাষা কোনটাই খুব সরলভাবে তিনি কবিতায় উপস্থাপিত করেননি। কোলরিজের চেয়ে তিনি কিছু কম 'subtle-souled' (সূক্ষ্মাত্মা) মনস্তত্ত্ববিদ নন। ভাবাবেগ ও মনস্তত্ত্বের জটিলতার বিশ্লেষণে তাঁর রচনা বিশিষ্ট। ঈশ্বরের সঙ্গে যখন তিনি 'মল্লযুদ্ধে শায়িত' তখন তাঁর সেই মর্মবেদনা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার শক্তি আছে। শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দ তিনি অভিনবভাবে প্রয়োগ করেন। তাই তাঁর কবিতার সামগ্রিক আবেদনে একটা চমক আছে। 'দি উইন্ডহভার' (ছোট বাজপাখি) কবিতাটির দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। (Sprung rhythm-এ লেখা হপকিনজের এটি শ্রেষ্ঠ সনেট ; তাঁর নিজের ভাষায়, "আমি যা লিখেছি তার মধ্যে সেরা।'') উঁচুতে-ওড়া যে-একধরনের বাজপাখির অন্য ইংরেজী নাম কেস্ট্রেল তার চিত্রময় রূপ এ-কবিতায়। এখানে 'বায়ুতে সঞ্চরমান' কেস্ট্রেলটি 'inscape' বা 'অন্তর্দৃশ্যের উৎস'। এই ইংরেজী অভিধাটি হপকিনজের উদ্ভাবন। কোন বিশিষ্ট 'অনন্য' রূপ কিংবা কোন প্রাকৃতিক জিনিসের 'স্বকীয়তা' বোঝাবার জন্য তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেন। যে-অস্তিত্বশক্তির প্রভাবে কোন কিছু বিধৃত থাকে এবং যে-সহজাত চাঞ্চল্য 'অন্তর্দৃশ্যের' নিয়ামক তার নাম কবি দিয়েছেন 'instress' বা 'অন্তর্বেগ'। কতকটা একেই শেলি তাঁর 'অ্যাডোনেইস'-কাব্যে বর্ণনা করেছেন 'The one Spirit's plastic stress' ("অনন্য ঐশী-স্বরূপের নির্মাণক্ষম অভিঘাত'') বাক্যাংশে। 'অন্তর্বেগ' হচ্ছে 'অন্তর্দৃশ্যের সংবেদন'—সৃষ্টির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা ও ঐক্য আছে তার গভীরে কোন অন্তর্দৃষ্টি কিংবা কোন আলোকোজ্জ্বল মরমিয়া অনুভূতি। তাঁর দিনলিপিতে কবি হপকিনজ এই অভিধাগুলি বারংবার ব্যবহার করেছেন।

কেস্ট্রেল বা শ্যেনবিহংগম 'দ্য উইন্ডহভার' কবিতায় খ্রীস্টচেতনার অভিব্যক্তিরূপে এসেছে। কবির সংগোপনে থাকা হৃদয়কে এ সম্বোধন করছে এবং তার কাছে খ্রীস্টের শক্তি ও মহিমা উদ্ঘাটিত করছে। এখানে এমন-সব পঙ্‌ক্তি আছে যা কবির চমকপ্রদ শৈলীর উদাহরণ ; যেমন,

"I caught this morning morning's minion,
kingdom of daylight's dauphin, dapple
dawn-drawn Falcon......"

("ধরেছিলাম আজ প্রভাতে প্রভাতের প্রিয়, দিবসরাজ্যের যুবরাজ, বর্ণময়ী-উষা-বাহিত সেই শ্যেনবিহঙ্গম'')। এইসব পঙ্‌ক্তিতে আমরা 'sprung rhythm'-এর ব্যবহার পাই এই ছন্দটির প্রথম প্রবর্তক হপকিনজ না হলেও অভিধাটি তাঁর দেওয়া। মধ্যযুগের পরে তিনিই প্রধানতঃ এই 'লাস্য'ছন্দ বা 'উল্লম্ফিত ছন্দের' পুনরায় প্রবর্তন করলেন। এই ছন্দ কথ্য ভাষায় স্বাভাবিক ছন্দের কাছাকাছি এবং বিভিন্ন প্রকারের ছন্দোবন্ধ পদের এখানে সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্বরন্যাসযুক্ত একক সিল্যাবলের এখানে প্রাচুর্য। অনেক সময় প্রয়োজন মনে করলে কবি নিজেই স্বরন্যাসের চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছেন, যেমন "As kingfishers catch fire, dragon-flics dráw fláme'' ("যেমন মাছরাঙার আছে আগুন, বজ্রকীটের আছে বহ্নি'') কবিতায়।

অনুপ্রাসের ব্যবহারে হপকিনজ সিদ্ধহস্ত এবং অনুপ্রাসের অলঙ্কারে হপকিনজের ছন্দের মাধুর্য বেড়েছে। তাঁর ছন্দের প্রভাব এলিঅট, ডিলান টমাস এবং টেড হিউজের কবিতায় বিশেষভাবে দেখা যায়। সমাসবন্ধ পদের প্রয়োগ এবং শব্দচয়নেও প্রবণতা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন হপকিনজ। মেঘ তাঁর কাছে 'silk-sack' (রেশম-ছালা), ঘোড়ার নাল যে তৈরি করে সেই ফীলিক্স-

র‍্যান্ডল 'hardy-handsome' (বলিষ্ঠ-সুদর্শন)।

দৃশ্যমান বহির্জগতের বৈসাদৃশ্য এবং বিপরিণাম যে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তা হপকিনজের কবিতা পড়লে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ডোরা-ডোরা ও ছাপ-ছাপ সব জিনিস তাঁকে মুগ্ধ করে ; 'পাইড বিউটি' ('বর্ণবহুল সৌন্দর্য') কবিতার ভাষায় বলা যায়ঃ

> "All things counter, original, spare
> strange ; Whatever is fickle, freckled
> (who knows how ?)"

["সব-কিছু বিপ্রতীপ, মৌলিক, রিক্ত, বিচিত্র, যা-কিছু ভঙ্গুর তিলকিত (কে জানে কেমনে ?")] 'ইন্‌ভার্সনেড্‌', 'ফীলিক্স-র‍্যান্ডল', 'রিবলস্‌ডেল' প্রভৃতি চিত্রবহুল বর্ণনাত্মক কবিতার তুলনা ইংরেজী সাহিত্যে বিরল।

'ডয়েটশ্‌লান্ডের ধ্বংস' এই দীর্ঘ কবিতাটি আমেরিকাগামী একটি জার্মান জাহাজের জলমগ্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে লেখা। যাঁরা ডুবে যান তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ফ্রান্সিস্কান-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী ছিলেন যাঁরা জার্মানী থেকে বিতাড়িত হয়ে মার্কিনদেশে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন। এই কবিতার দুটি মুখ্য বিষয়ঃ ঈশ্বরের মহিমা নিরীক্ষণ করে সম্ভ্রম ও ভক্তি, এবং ঈশ্বরের সেই বিচিত্র বিধানে বিস্ময় যাতে নিরপরাধিনী সন্ন্যাসিনীদের প্রাণবিসর্জন দিতে হয় যাঁরা ইতিপূর্বেই তাঁদের ভগবদ্ভক্তির জন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসে কবি সান্ত্বনা পেয়েছেন যে, এঁদের অনেক আগে তো আরও মর্মন্তুদ আত্মবিসর্জন খ্রীস্টকে দিতে হয়েছে ; আর এঁরা এবং আমরা সকলেই যেন "the heaven-haven of reward" ("পুরস্কারের স্বর্গ-আশ্রয়") থেকে বঞ্চিত না হই।

'ঐশী-মহিমা' কবিতাটিতে দিব্য বিভূতি দৃপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে ; 'গীতার' বিশ্বরূপদর্শনের ভাষায় বলা যায়ঃ আমরা তাঁকে দেখছি যাঁর

> "নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
> ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ..."

("আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বর্ণবহুল ও প্রসারিত মুখমণ্ডল এবং দীপ্যমান বিশাল নেত্র ...")

ঈশ্বরের মহিমা সমস্ত প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত রয়েছে, কিন্তু আজকের শিল্পোন্নত জগতে সভ্যতার কালিমা তাকে কলঙ্কিত করেছে—ব্যবসা-বাণিজ্য-শ্রমে পৃথিবী বিপর্যস্ত। নিসর্গের আনন্দ কিন্তু অনিঃশেষ ; ঐশীচেতনা এখনো পৃথিবীর ওপর ঘূর্ণায়মান এবং দিব্য স্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ স্বপ্রকাশ। শব্দ ও চিত্রকল্পের উপযুক্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়েও কবি তাঁর নিজের পছন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেনঃ ঐশী-মহিমার প্রতিরূপ 'shook foil' (সুবর্ণ তবক) আর শিল্প-ব্যবসায়ের কুশ্রী দিকের জন্য রয়েছে "bleared... smeared... smudge... smell" ("ধূসরিত ...প্রলিপ্ত...প্রলেপিত...পূতিগন্ধ...")।

চতুর্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে হপকিনজ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন। তাঁর নিঃসঙ্গ, অস্থির, উচ্চাভিলাষী ও আত্মবিচারশীল চিত্ত শান্তির জন্য ব্যাকুল, সহিষ্ণুতার জন্য উন্মুক্ত। সবচেয়ে যে বড় মুক্তি তাঁর কাম্য সেটা নিজের কাছ থেকে—যাতে সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবে যায়। রবীন্দ্রনাথ যে-প্রার্থনায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—যা-কিছু জীর্ণ দীর্ণ জীবনহারা তা যেন ঈশ্বরের সুরের শ্রাবণ-ধারায় সঞ্জীবিত হয়, সে-প্রার্থনা হপকিনজের অন্তর থেকে উৎসারিতঃ

> "Birds build—but not I build ; no,
> but strain,
> Time's eunuch, and not breed one
> work that wakes.
> Mine, O thou lord of life,
> send my roots rain.'
> ('Thou art indeed just, Lord')

["...সব পাখি বাসা বাঁধে—আমি তো বাঁধি না ;
পারি শুধু চেষ্টা করা,
কাল-ক্লীব আমি, পারি না তো জন্ম দিতে
জাগরণী ক্রিয়া,
জীবনদেবতা ওগো, জীবনের মূলে মোর
ঢালো বৃষ্টিধারা।"
('নিশ্চয় জানি তুমি সমদর্শী, প্রভু')]

রম্যরচনা

জুলুম

স্বামী গোপেশানন্দ

মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলতে বলেছেন। "আহা, কি দেখিলাম, জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না"—এই রকম কিছুতো এখনো দেখিনি। এখন বলব কি? যাইহোক অভিজ্ঞতা নিয়ে আরম্ভ করছি। শেষ কোথায় জানিনে।

আহ্লাদ হলো ভক্তবাড়ি যাব। ভাব দেবার জন্যে নয়, ভাব পাবার জন্যে। কারণ চাপরাশ তো পাইনি। বাসে না ট্যাক্সিতে যাই ভাবছি। শুনেছি এ ভক্ত ভি.আই.পি. ছাড়া ট্যাক্সিভাড়া দিতে আলমারির চাবি খুঁজে পায় না। ঝুঁকি না নিয়ে কিছু রাস্তা রিক্সায়, তারপর বাস, তারপর ট্রাম এবং বাকিটুকু গেলাম হণ্টনে। তারপর তিনতলায় পৌঁছে বোতাম টিপে দিলাম। একাধিকবার টিপবার পর দরজা খুলেই কে যেন চলে গেল। কেউ ভিতরে আসতেও বলে না, বসতেও বলে না। ফিরে আসা তো চলে না! কিছু গ্রহণ না করলে ভক্তের উপর অবিচার করা হবে। জীবনে অনেক অবিচার করেছি। আর কেন? ভাগবত—ভক্ত—ভগবান—তিনই এক। অনাহূতের মতো ভিতরে ঢুকলাম।

.... খোলা ঝোলানো বারান্দায় ঠাকুমা ও সাত বছরের নাতি শ্রীমান নিপুর সংগ্রাম চলছে। নিপুর মাথা রেলিং-এর বাইরে রাস্তার দিকে ঝুলছে। চক্ষু রক্তবর্ণ, পা দুটো মেজে থেকে ছাড়ি-ছাড়ি করছে। ঠাকুমা পাদুটো শক্ত করে ধরে টেনে রেখেছেন। নিপুর হুঙ্কার—ঘুড়ি কিনবার পয়সা না দিলে রাস্তায় ঝাঁপ দেব। ঠাকুমা পাও ছাড়বেন না, পয়সাও দেবেন না। কখন কি হয়—অন্যান্যরা আতঙ্কিত! ভক্তের নাতির গায় হাত দেব কিনা—দুই-এক ঘা বসাব কিনা ভাবছি এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুমা প্রসন্না হলেন। নিপু পয়সা পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হলো। জয় মা—তুমি পরাজিতা!

জুলুমে কি না হয়! আশা করি আপনারাও সুবিধামত জুলুম করেছেন। কোন সময় জিতেছেন, আবার হয়তো কোন সময় হেরেছেন। সত্য কথাটা বলতে কি—এই জগৎটাই জুলুমের। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখার কিছু অংশ আপনাদের শোনাই:

"ব্রাহ্মণ গৃহস্থ একদিন বাড়ি ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্য উপনীত বালকপুত্রের উপর নারায়ণের সেবার—পায়সান্ন ভোগ দেওয়ার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। বালক যথারীতি ভোগ নিবেদন করিয়া, বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু নারায়ণ খাইতে আসিলেন না। তাহার মনে ভয় হইল, তাহার কোন ত্রুটি হইয়াছে, অথবা তাহাকে বালক দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়া ঠাকুর বাহির হইলেন না। অনেক কান্নাকাটি সাধ্য-সাধনাতেও তাঁহার আবির্ভাব হইল না দেখিয়া নিরুপায় বালক অবশেষে লাঠি বাহির করিল। তখন নারায়ণ-শিলার মধ্য হইতে বালগোপাল হামাগুড়ি দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন—মাথায় তাঁহার ময়ূরপুচ্ছ, হাতে সোনার বাজু, নূপুরের ধ্বনিতে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে পায়স খাইয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন। আর, সেই শালগ্রামশিলা তদবধি বালগোপাল বিগ্রহে রূপান্তরিত হইল।" (রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫২) —এই গল্পটা গল্প বলে উড়িয়ে দিলেও এই ধরনের সত্য ঘটনা আপনাদের খুব ভালভাবে জানা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে দর্শন করবার জন্যে কতই না সাধ্য-সাধনা, প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করেছেন।

ঠাকুর জীবনে যত কেঁদেছেন পৃথিবীর কোন মানুষ তত কাঁদেনি। আপনারা বলতে পারেন আমি শুধু কান্নাটাই দেখলাম, আনন্দটা দেখলাম না। আমি তো মানুষের মধ্যে রাজহংস নই। আশা করি শ্রীশ্রীঠাকুর যত মানুষকে কাঁদাবেন, তত মানুষকে অন্য কোন অবতার কাঁদাননি। যাই হোক, কান্নাকাটিতে কিছু লাভ হলো কি? যখন কান্নাকাটিতে কিছুই হলো না তখন শ্রীশ্রীঠাকুর 'প্রেসার' দিলেন—শ্রীহস্ত রামদার দিকে এগিয়ে দিলেন। এইবার শ্রীশ্রীমা নিরুপায় হয়ে দর্শন দিলেন। জুলুম চাই—'প্রেসার' দেওয়া চাই। এতো গল্প নয়—এ যে সত্যি ঘটনা।

যাঁরা এটাকে গল্প বলে উড়িয়ে দেন, তাঁরা মন্দের ভাল। যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বড়ই বিপদে পড়েন। তাঁরা মনে করেন অথবা মনে করে শান্তি পেতে চান যে, শুধু ঠাকুরকেই মা এইভাবে দর্শন দিয়েছেন। আমরা যদি অমনি করি, তাহলে মা আমাদের মুণ্ডুটা এক হাতে রাখবেন আর দেহটা শিবা-টিবাকে দিয়ে দেবেন। 'টেস্ট টু ডেসট্রাকশান' কে চায়? যদি আমরা চাইতাম তাহলে এত রামদা-র দরকার হতো যে, সমস্ত 'স্টীল প্ল্যান্ট'-ও বোধহয় অত লোহার যোগাড় দিতে পারত না এবং সরকার বাহাদুরকে এত জনসংখ্যার চাপে বিব্রত হতে হতো না। যাই হোক আপনারা ঐ কাজ করতে গিয়ে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেবার জন্যে আমাকে শ্রীঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন না।

এখানে বরাহনগর মঠের একটা ঘটনা 'কথামৃত' থেকে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি।

“রাখাল শুইয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন।

একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্যভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের অদর্শনে বড় কাতর হইয়াছেন—'ওরে আমায় একখানা ছুরি এনে দে রে! আর কাজ নাই! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।'

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে)—ওইখানেই আছে, হাত বাড়িয়ে নে। (সকলের হাস্য)।”

সত্যি কথা বলতে কি—শ্রীভগবান ছুরি কাটারি নিয়ে আমাদেরকে সাধন করতে বলেননি। তিনি শ্রীমুখে বলেছেন—“এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস!”

আমাদের চোখের এক ফোঁটা জলই ঈশ্বরলাভের জন্যে যথেষ্ট। অবশ্য সেটা নির্জনে, সিনেমা নাটকের মতো নয়। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ঈশ্বর বাদে অন্য কিছুর জন্য জীবনে কাঁদেনি। কাঁদতে আমরা জানি, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কাঁদতে পারি না। প্রশ্ন হচ্ছে—ভগবদ্দর্শনের প্রয়োজনবোধ আমাদের হয়েছে কি? যার যা অভাব আছে সে তা পাবার জন্যে চেষ্টা করছে এবং যেমন যেমন অভাববোধ পাল্টাচ্ছে তেমন তেমন এটা ছেড়ে ওটার জন্যে ছাতিফাটা তৃষ্ণা নিয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। কি যে খুঁজছি তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভুখা পেটে অর্থাৎ দিনরাত খাই খাই করলে ধর্মলাভ হবে কি করে?

রক্তমাংসের পেটকে কিছুক্ষণের জন্যে যদি বা শান্ত করা যায় কিন্তু নানা রকম দুষ্টা ক্ষুধা 'ল অব ফিজিক্যাল সায়েন্স'-কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যত খায় ততই বেড়ে যায়। এ এক উৎকট ফাঁদে আমরা আটকে আছি। যতদিন আমাদের বিন্দুমাত্র বাসনা থাকবে ততদিন ঈশ্বরের জন্যে চোখ দিয়ে বিন্দুমাত্র জলও পড়বে না—পড়বে না। তাই আমাদের রাতদিন বিচার করতে হবে কি আমাদের সত্যি সত্যি প্রয়োজন এবং কেন আমরা ঈশ্বরের জন্যে কাঁদতে পারছি না। কাঁদবার মতো সহজ সরল ব্রহ্মাস্ত্র আমাদের সকলের থাকলেও 'টারগেট' না জানার জন্যে এলোপাতাড়ি কান্না প্রয়োগ করছি। তাই ঠাকুর বারবার বলেছেন—মোড় ঘুরিয়ে দে, মোড় ঘুরিয়ে দে।

তিনিই ধন্য যিনি ভগবানের জন্যে কাঁদেন। তিনিই জুলুমের অধিকারী পুরুষ—আর কেউ নয়।

বিপ্লব আন্দোলনের আদিপর্ব ও কলকাতা

জীবন মুখোপাধ্যায়

ইংরেজের সীমাহীন শোষণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং বিভিন্ন বৈদেশিক প্রভাবের ফলে ভারতে বিপ্লবী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। একদা মনে করা হতো যে, সুদূর বোম্বাই থেকে বাংলায় বিপ্লব-চেতনার আগমন ঘটেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। বাংলার মাটিতেই বিপ্লববাদী রাজনীতির বীজ নিহিত ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার সুবাদে বহু বিষয়ের মতো বিপ্লববাদী রাজনীতির ধ্যান-ধারণা ও কর্ম-কৌশলগত নানা দিকেই মহানগরী কলকাতা ছিল সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইটালী স্বৈরাচারী অস্ট্রীয় শাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন করে। আই. সি. এস.-এর স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে বিতাড়িত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সময় দেশসেবায় নিয়োজিত হয়ে কলকাতায় ইটালীয় ঐক্যের প্রাণ-পুরুষ ম্যাৎসিনী ও তাঁর দল 'ইয়ং ইটালী'-র ভাবধারা প্রচারে সচেষ্ট হন। তাঁর প্রচারের ফলে ম্যাৎসিনীর আদর্শ কলকাতায় প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং 'কারবোনারি' নামে গুপ্ত সমিতির আদর্শ কলকাতার ছাত্রসমাজকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন: "কারবনরাইদের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মিলিয়া তাহারা কারবনরাইদের অনুকরণে নিজেদের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গুপ্ত সমিতি (বা Secret Society) গড়িবার চেষ্টা করেন।"[১] তাঁর মতে, স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ধরনের বেশ কয়েকটি গুপ্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন। বলা বাহুল্য, নামে গুপ্ত সমিতি হলেও, এই সমিতিগুলির বিশেষ কোন রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল না বা সমিতির সদস্যরা গুপ্তহত্যা বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না।[২] এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোন সাল-তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

'জাতীয়তার পিতামহ' রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির যুবকদের নিয়ে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার বুকে গড়ে ওঠা গুপ্ত সমিতিকেই বাংলার প্রথম গুপ্ত সমিতি বলা যায়। এই সমিতির নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা'। গুপ্ত ভাষায় তাকে বলা হতো 'হাঞ্চু পামু হাফ্'। এই সমিতির অধিবেশন বসত এক পোড়ো বাড়িতে। অধিবেশনের কার্যবিবরণী লেখা হতো গুপ্ত ভাষায়। সমিতির প্রধান নিয়ম ছিল মন্ত্রগুপ্তি। সমিতির অনুষ্ঠানে রহস্যের ত্রুটি ছিল না। ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথা, খোলা তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ একদা এখানে ভারত উদ্ধারের দীক্ষা নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সমিতির সদস্যদের বোমা-পিস্তলের রক্ত-রাঙা পথে অগ্রসর হতে হয়নি —তাঁরা উত্তেজনার আগুন পুইয়েই দেশ-উদ্ধারের কাজ শেষ করেছিলেন।

বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা ও হেয়ার স্কুলের শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে 'স্বাধীনতার সাধক দল' বলে একটি গুপ্ত দল গড়ে তোলেন এবং এক বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশিষ্ট দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল সহ মোট ছজন তরুণকে অগ্নিমন্ত্রে

---

[১] সত্তর বৎসর—বিপিনচন্দ্র পাল (১৩৬২), পৃঃ ২২১-২২২

[২] Memories Of My Life And Times—B. C. Pal (1973), P. 200

দীক্ষিত করেন। দীক্ষাগ্রহণকারীকে তলোয়ারের সাহায্যে নিজের বুক চিরে রক্তের সাহায্যে যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো তাতে লেখা থাকত, একমাত্র স্বায়ত্তশাসনই বিধাতা-নির্দিষ্ট শাসন। দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হলেও তাঁরা কখনই সরকারের দাসত্ব স্বীকার করবেন না। এই প্রতিজ্ঞাপত্রের অন্যত্র ছিল, নিজেদের ও দেশবাসীর স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্যবৃদ্ধির জন্য তাঁরা ব্যায়ামচর্চার প্রচার করবেন। নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা অভ্যাস করবেন এবং দেশের মধ্যে যাতে এই সব বিদ্যার বহুল প্রচার হয় তার চেষ্টা করবেন।[৩] বিপিনচন্দ্র লিখছেন, শিবনাথ শাস্ত্রীই “আমাদের স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন।”[৪]

এরপর দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় আর কোন গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়নি। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের গৃহে রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র শিকদার, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ দাশ প্রভৃতি ছাত্রদের উদ্যোগে ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও সন্নিহিত এলাকার পথে-ঘাটে ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার, অশ্লীল গালিগালাজ ও বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও নিজেদের মানসিক উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী ও ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডীর জীবনীপাঠের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, অসিচালনা প্রভৃতির শিক্ষাও এখানে চলত। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই সমিতি যথার্থ বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করে।[৫]

কেবলমাত্র ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ই নয়—ভীরু বাঙালীর কলঙ্ক দূর করার জন্য কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসময় বিভিন্ন স্থানে ‘আখড়া’ তৈরি করেন। সেখানে ডন বৈঠক, মুগুর, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। ছাতুবাবু, লাটুবাবু, অম্বু গুহ, ক্ষেতু গুহ-র আখড়া, পাড়ায় পাড়ায় জিমন্যাস্টিকের দল গঠন এবং এ-প্রসঙ্গে গৌর মুখার্জী, নারায়ণ বসাক প্রভৃতির উদ্যোগের কথা স্মরণীয়। এসময় সোহংস্বামী, প্রফেসর বোস, কৃষ্ণ বসাক প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালীর উদ্যোগে কিছু সার্কাস পার্টিও গড়ে ওঠে। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত গৌরহরি মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতার বেশ কয়েকটি কলেজেও তখন ব্যায়ামচর্চার আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্কটিশ চার্চ কলেজেও এই ধরনের একটি ব্যায়াম-কেন্দ্র ছিল। এই ব্যায়াম-কেন্দ্রটিই পরে বিপ্লবী ‘অনুশীলন সমিতি’-তে রূপান্তরিত হয়।

সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘অনুশীলন তত্ত্বের’ আদর্শে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের দোল পূর্ণিমার দিন (সোমবার, ২৪ মার্চ) হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১ নং মদন মিত্র লেনে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘অনুশীলন সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) ছিলেন এই সমিতির প্রথম সভাপতি। ইতিমধ্যে বরোদা রাজকলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় বিপ্লবী সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুচর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান। তিনি ১০৮ সি, আপার সার্কুলার রোডে তাঁর আখড়া গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য হেতু দুই প্রতিষ্ঠান এক হয়ে যায় এবং ‘অনুশীলন সমিতি’ নামেই পরিচিত হয়। এই যুগ্ম দলের সভাপতি হন প্রমথনাথ মিত্র, সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন ঠাকুর। সমিতির সদস্যরা নানা ধরনের ব্যায়ামচর্চা, লাঠিখেলা, অসিচালনা, অশ্বারোহণ, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এবং গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করতেন। ‘আত্মোন্নতি সমিতি’-র সদস্যরাও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে

---

[৩] সত্তর বৎসর, পৃঃ ২২২-২২৫

[৪] নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল (১৯৬৪), পৃঃ ১২৬

[৫] বিস্তৃত আলোচনার জন্য : নিঃসঙ্গ—সতীশচন্দ্র দে (১৯৫৬) ; ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৮৩), এবং বাংলায় বিপ্লবী প্রচেষ্টার বিস্মৃত অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড (১৯৬৭) দ্রষ্টব্য।

যান।[৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরানী 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' ও 'বীরাষ্টমী ব্রত' প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে এবং বিভিন্ন স্থানে শরীরচর্চার আখড়া তৈরি করে বাংলার যুবসমাজের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির বিস্তারে সাহায্য করেন।[৭]

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে বাংলার যুবসমাজ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। স্বদেশী বয়কট ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ বাংলার যুবসমাজকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কলকাতার দর্জিপাড়া, পটলডাঙ্গা, গ্রে স্ট্রীট, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া কলকাতার নানা পল্লীতে অসংখ্য সমিতি ও সংঘ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এইসব সমিতিগুলির মধ্যে বলরাম বসু স্ট্রীটের 'এ্যাথলেটিক ক্লাব', হোগলকুড়িয়া লেনের 'রায়বাগান ক্লাব', জগন্নাথ সেন লেনের 'বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব', নয়নচাঁদ দত্ত লেনের 'যুবক সমিতি', ছিদাম মুদি লেনের 'মডেল এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশন,' মল্লিক লেনের 'আর্যকুমার সমিতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই সমিতির কার্যকলাপ একেবারে নিরীহ ছিল না। সরকারি রিপোর্টে বলা হচ্ছে ঃ "In these clubs youngmen and boys went through a course of physical training, drill and discipline and set to work to train themselves in *lathi* exercise and wrestling. The members of these clubs were called National Volunteers, and the idea seems to have been that they would form a trained body able to resist force by force, and available for purposes of offence and defence."[৮]

'অনুশীলন সমিতি' ও সার্কুলার রোডের বিপ্লবকেন্দ্রের জন্য ধনবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে টাকা সংগ্রহ করা হতো। হেমচন্দ্র মল্লিক, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন হালদার, সুরেন ঠাকুর, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করতেন। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখছেন ঃ "যতীনদা কয়েকজন মাতব্বরের টাকারই ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেননি।"[৯] এই কাজ করার জন্য বারীন্দ্রের শিক্ষক সখারাম গণেশ দেউস্কর ও অন্যান্য আরও দু-তিনজনসহ বারীন্দ্রকুমার সকাল-সন্ধ্যে দু-বেলা গঙ্গার ধার, হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার এবং কলকাতার বিভিন্ন পার্কে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা জুড়তেন। উৎসাহী যুবকদল জমত মৌমাছির চাকে এবং সেখান থেকেই সংগ্রহ করা হতো আগামী দিনের বিপ্লবকর্মীদের। এছাড়া, বিপ্লবীকর্মীসংগ্রহের উর্বরক্ষেত্র ছিল স্কুল, কলেজ, হস্টেল, খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার।

ইতিমধ্যে অনুশীলন সমিতির অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যরা পি. মিত্রের "নীরব শরীরচর্চার নীতি"-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। তাঁরা বিপ্লববাদী রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এই দলে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রমুখ যুবকেরা। এ-কাজে তাঁদের বিশেষভাবে উৎসাহ দেন অরবিন্দ ঘোষ ও সখারাম গণেশ দেউস্কর। বারীন্দ্রকুমার লিখছেন ঃ " 'যুগান্তর' বলে খোলাখুলি বিপ্লবপন্থী কাগজ বের করার প্রস্তাব শুনে পি. মিত্র মশাই ঘোর আপত্তি তুললেন। বন্ধুবান্ধব ও কর্মীমহলে ঠাট্টা করে

---

[৬] বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ অনুশীলন সমিতির ইতিহাস—জীবনতারা হালদার (১৯৭৭) ; বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৯৮২) ; ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতাসংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৮৩)।

[৭] বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ জীবনের ঝরাপাতা, সরলা দেবীচৌধুরানী (১৩৮২) এবং জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী—যোগেশচন্দ্র বাগল (১৩৬১), পৃঃ ৪-৭।

[৮] উদ্ধৃত ঃ জাগরণ ও বিস্ফোরণ—কালীচরণ ঘোষ. ১ম খণ্ড (১৩৭৯), পৃঃ ১১৮।

[৯] বারীন্দ্রের আত্মকথা—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উদ্ধৃত ঃ যুগনায়ক অরবিন্দ—জীবন মুখোপাধ্যায় (১৯৭২), পৃঃ ৮৪।

বলেছিলেন, বারীন দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ভারত উদ্ধার করবে। আমি পাল্টা জবাবে বলেছিলাম, পি. মিত্র সাহেব বাঁশের লাঠি ঘুরিয়েই দেশ উদ্ধারের পালা সারবেন।"[১০]

মাত্র তিনশ টাকা মূলধন নিয়ে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩ মার্চ ২৭ নং কানাই ধর লেন থেকে প্রকাশিত হলো বাংলার প্রথম বিপ্লববাদী পত্রিকা 'যুগান্তর'। 'যুগান্তর' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং তার দাম ছিল এক পয়সা। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস থেকে পত্রিকার নামটি নেওয়া হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন ঃ "শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল।[১১] ভয়-ভীতি ত্যাগ করে 'যুগান্তর' দেশবাসীকে সরাসরি বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিল। তার ছত্রে ছত্রে ছিল বিপ্লবের ধ্বনি। বলা হয়, বিপ্লবই ছিল এই পত্রিকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন ঃ "'যুগান্তরে'র সুর এত চড়া ছিল যে, তৎকালের অন্য কোন পত্রিকাই ইহাকে হারাইতে পারে নাই।"[১২] এই চড়া সুরের কল্যাণেই "হু হু করিয়া দিন দিন যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল।"[১৩] এত সংখ্যা বিক্রির পরেও কিন্তু হকারদের ঠেকিয়ে রাখা দায় হতো। শোনা যায় যে, মাত্র এক পয়সা মূল্যের একটি পত্রিকা এক টাকা দামেও বিক্রি হতো।

ইতিমধ্যে সরকারি দমননীতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। সরকারি অত্যাচারে জনসাধারণ ও যুবসমাজ প্রবল ক্ষুব্ধ। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্', 'নবশক্তি' প্রভৃতি স্বদেশী সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে সরকার একের পর এক মামলা দায়ের করে সম্পাদকদের জেলে পাঠাতে লাগলেন। 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, এভাবে বৃথা শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। বাক্যবাণে বিদ্ধ করে সরকারকে ধরাশায়ী করা যাবে না। সুতরাং "এতদিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। এই সংকল্প হইতেই মানিকতলা বাগানের সৃষ্টি।"[১৪] বিপ্লবী নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন ঃ "দেশকে দেশের যুবকমণ্ডলীকে 'যুগান্তর' অগ্নিদীক্ষা দিল প্রায় দু-বৎসর ধরে। তারপর যুগান্তরের দল যখন স্থির করল যে, এবার আর 'প্রচার' নয়, এখন দরকার 'প্রয়োগ' তখনই স্থাপিত হলো মুরারিপুকুর বা মানিকতলা।"[১৫]

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অরবিন্দ ঘোষের নির্দেশে তাঁর পৈত্রিক বাগানবাড়িতে শুরু হলো বিপ্লব-সাধনার কাজ। তৎকালীন কলকাতার অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে এই বাগানটি স্থাপিত ছিল। 'যুগান্তর'-এর পুরনো সদস্যরা সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য মানিকতলার বাগানে চলে গেলেন, আর অপেক্ষাকৃত নতুনদের হাতে রইল পত্রিকাটির দায়িত্ব। একদলের কাজ হলো সশস্ত্র বিপ্লবের বাণী প্রচার করে মৃতপ্রায় জাতির মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানো, আর অপর দলের কাজ হলো ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োগ। প্রাচীন ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, গীতা-উপনিষদের শাশ্বত বাণীর যথার্থ অনুগামী, ত্যাগব্রতী এই বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ না করলে চরিত্রগঠন হয় না, আত্মবিশ্বাস আসে না, শত্রুর কামানের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে

---

১০ অগ্নিযুগ—বারীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৩৫৫), পৃঃ ১৪৩

১১ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৮৩), পৃঃ ২৫

১২ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় (১৯৬১), ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা

১৩ নির্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৩), পৃঃ ৪

১৪ ঐ, পৃঃ ১৪৮

১৫ স্মৃতির পাতা—নলিনীকান্ত গুপ্ত, ১ম খণ্ড (১৩৭০), পৃঃ ৪৯

সাহস হয় না। তাই বাগানের দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মপদ্ধতির মধ্যে অবশ্য করণীয় ছিল—ধ্যান, গীতা, চণ্ডী ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী এবং বিপ্লবাত্মক সাহিত্য পাঠ। ধর্মজীবনে পথনির্দেশ করার জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ ও দেবব্রত বসু (পরবর্তী কালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ভারতের বহু তীর্থস্থানে ভ্রমণ করলেন।

'যুগান্তর' গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য ছিল এক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ব্যাপক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান—সন্ত্রাসবাদ নয়। নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন: "পূর্বে এই টেররিস্ট কর্মধারায় আমাদের আস্থা ছিল না।"[১৬] কারণ এতে হিংসা ও প্রতিহিংসা চলে অন্তহীন ধারায়—সমস্যার কোন সমাধান হয় না। তাই বিপ্লবীরা একটি নতুন সেনাদল গঠন করে ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপনে সচেষ্ট হলেন। মানিকতলার বাগানে শুরু হলো পিস্তল ছোঁড়া ও রাইফেল চালানোর মহড়া—চলতে লাগল বোমা প্রস্তুতির কাজ। 'যুগান্তর' দলের উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরির জন্য নিজের বাড়িতেই একটি ছোটখাট ল্যাবরেটরি তৈরি করেন এবং একদিন বোমা তৈরি করতেও সক্ষম হলেন। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস বোমা তৈরির কৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে প্যারিসে যান এবং ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এবারে প্রশ্ন: বিপ্লব আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা কোথা থেকে আসবে? বিপ্লবীরা প্রথমে দেশহিতৈষী ও ধনবান ব্যক্তিদের দানের ওপর নির্ভর করতেন, কিন্তু তার পরিমাণ ছিল নগণ্য। ফলে বিপ্লবীরা পরে ধনবান ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি, সরকারের ক্যাশ লুঠ প্রভৃতির পথ বেছে নেন। কিন্তু ডাকাতি করা কি যুক্তিসঙ্গত? অরবিন্দ ঘোষ বললেন, মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কোন কাজই নীতিবিরুদ্ধ নয়। সুতরাং বাংলার বুকে শুরু হলো রাজনৈতিক ডাকাতি। অবশ্য ডাকাতির পরে বিপ্লবীরা ধনবানদের জানিয়ে দিতেন যে, স্বাধীনতা অর্জন করে সার্বভৌম সরকার সুদ-সহ তাঁদের সব লুণ্ঠিত অর্থ ফেরত দেবেন। এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ডাকাতি করা সম্পর্কেও বিপ্লবী সমিতিতে যথেষ্ট কঠোর বিধিনিষেধ প্রচলিত ছিল এবং তা ভঙ্গ করলে বিপ্লবীদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো।[১৭]

সরকারি দমননীতির ব্যাপকতার ফলে জাতীয় জীবন যখন দারুণভাবে উৎকণ্ঠিত তখন "বাগানের কর্মগতির মুখ ঘুরে গেল। Military Organization-এর পরিবর্তে হলো Terrorist Organization.।"[১৮] এপ্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "পুলিশের হাতে এক তরফা মার খাইয়া দেশশুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। যাহার কাছে যাও, সেই বলে—'নাঃ এ আর চলে না। ক-বেটার মাথা উড়িয়ে দিতেই হবে।' তথাস্তু।"[১৯] নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন: "দেশের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আকুতি জেগে উঠল—এই অত্যাচার উৎপীড়ন একদিকে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এর উত্তর কেবল নিঃশব্দে সহ্য করা? প্রত্যুত্তরের আয়োজন চলল তাই। প্রথমতঃ এতে সাধারণের মধ্যে সাহস বেড়ে যায়—যদিও অত্যাচারের মাত্রা কমে কিনা তাতে সন্দেহ থাকে। দ্বিতীয়তঃ লোকেরা পায় তৃপ্তি।"[২০]

গোলা-গুলি-বোমা এবং দেশপ্রেমিকের বলিষ্ঠ সাধনা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিপ্লববাদের পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল। বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য হলেন বাংলার ছোটলাট বঙ্গভঙ্গ পরিচালনার অন্যতম পুরোহিত সার এণ্ড্রু ফ্রেজার। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁর ট্রেন উড়িয়ে দেবার জন্য চন্দননগরের কাছে রেল লাইনে কয়েকটি ডিনামাইট কার্তুজ রেখে দেওয়া হয়। কার্তুজ ফাটার শব্দ হলো ঠিকই,

---

[১৬] স্মৃতির পাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫

[১৭] বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায় (১৯৮৩), পৃঃ ৮৮-৮৯

[১৮] স্মৃতির পাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫

[১৯] নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃঃ ১৭

[২০] স্মৃতির পাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫

কিন্তু তাতে লাটসাহেবের ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটল না। ঐ বছর ৬ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে আবার ট্রেন উড়াবার চেষ্টা হলো। এবার বোমা ফাটল, ট্রেনটাও বাঁকল, ইঞ্জিনও জখম হলো, কিন্তু গাড়ি উড়ল না। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. এ্যালেনকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। মারাত্মকভাবে আহত এ্যালেন সাহেব প্রাণে বেঁচে যান। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ মার্চ গুপ্তচর সন্দেহে কুষ্ঠিয়ার পাদ্রী হিকেনবোথামকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ এপ্রিল চন্দননগরের ফরাসী মেয়র তার্দিভেলের গৃহে বোমা পড়ে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের কার্যকলাপ বিপ্লবীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তিনি প্রাণভয়ে বিহারের মজঃফরপুরে বদলী হয়ে যান, কিন্তু 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর নির্দেশে বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে যাত্রা করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে তাঁরা বোমা ছোঁড়েন। গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু তাতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। নিহত হন দুই নিরপরাধ মহিলা। ১ মে ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ১১ আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়। ২ মে বিহারের মোকামাঘাট স্টেশনে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। বলা বাহুল্য, মজঃফরপুরের ঘটনা সমগ্র জাতির প্রাণে এক নতুন শিহরণ এনে দেয়। মানিকতলা বাগান ও বিপ্লববাদী রাজনীতির ইতিহাসে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

মজঃফরপুরের ঘটনার সূত্র ধরে ২ মে ভোর হবার আগেই ৩২ নং মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়ি-সহ কলকাতার মোট আটটি স্থানে ব্যাপক খানাতল্লাস হয়। এছাড়া, কলকাতার বাইরে অন্যান্য স্থানেও খানাতল্লাসের পর শেষ পর্যন্ত ছত্রিশজন আসামীর বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যুদ্ধযাত্রা ও নরহত্যার অভিযোগ এনে শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। ইতিহাসখ্যাত এই মামলায় সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের সুবিখ্যাত কৌঁসুলি নর্টন সাহেব। আসামী পক্ষের মোকদ্দমা পরিচালনা করতে থাকেন সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। টাকার অভাবে তাঁকে ধরে রাখা গেল না। অতঃপর চিত্তরঞ্জন দাশ আসামীদের পক্ষে এগিয়ে এলেন। এই মামলায় আসামীর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন, সাক্ষী ছিল ২০৬ জন। দলিলপত্রের সংখ্যা ছিল ৪০০০ এবং প্রামাণ্য বস্তু হিসাবে ৫০০০ বোমা-পিস্তল-রিভালভার-গোলা-গুলি ও অ্যাসিড আদালতে হাজির করা হয়।

আলিপুর জেলে বন্দী বিপ্লবীদের কাছে আদালতে যাওয়া ছিল মজার ব্যাপার। আদালতে যাওয়ার পথে গাড়িতে উঠে তাঁরা গান ধরতেন ঃ

“আও মর্দানা জঙ্গী জোয়ানা
জলদি লেও হাতিয়ার।
গোরে তুম পর জুলুম কর্তে হ্যায়
দিন পর দিন দুনিয়া ভার ধরতি হ্যায়
সারে রুপিয়া তুমসে লেকর—আব বনে
সাত্তকর।...”

আবার কখনো বা গাইতেন ঃ

“স্বদেশের ধূলি স্বর্গরেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞানে।।”

আদালতে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত নানা বিষয়ে আলোচনা হতো, কিন্তু বিপ্লবীরা এসম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিজেদের মধ্যে হৈ-হট্টগোল ও গল্প-তামাসা করতেন। ওতে আদালতের কাজের ব্যাঘাত ঘটত। বিচারক অরবিন্দ ঘোষকে অনুরোধ করতেন বিপ্লবীদের থামাবার জন্য। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেট সামসুল আলমের ওপর বিপ্লবীরা ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাঁকে দেখলে তাঁরা গান ধরতেন ঃ

“ওগো সরকারের শ্যাম, তুমি আমাদের শূল
তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু—
তুমি দেখবে চোখে সর্ষে ফুল।”

কারাগারের অভ্যন্তরে গান-হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব ও রঙ্গ-রসে তাঁদের সময় কাটত। অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন ঃ “ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বঙ্গে নূতন যুগ

আসিয়াছে।...এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্যকালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন সেই নির্ভীক চাহনি, সেই তেজঃপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য। এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা, ভাবনা বা সন্তাপের অভাব, সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির, নূতন কর্ম-স্রোতের লক্ষণ।"[২১] এক কথায়, কারাভ্যন্তরে মৃত্যুভয়হীন চিত্তে আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই তাঁরা দিন কাটাতেন।

ইতিমধ্যে আলিপুর বোমার মামলায় বন্দী শ্রীরামপুরের জমিদার-সন্তান নরেন গোঁসাই পুলিশের কাছে দলের গোপন তথ্যাদি ফাঁস করে দিতে থাকেন। এতে দলটির সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে জেলের অভ্যন্তরে পিস্তল সংগ্রহ করে চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। কারাভ্যন্তরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরাধীনে রক্ষিত বিশ্বাসঘাতককে হত্যা সমগ্র বিশ্বের বিপ্লববাদের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। নরেনের মৃত্যুতে ইউরোপের বিপ্লবীরাও বাহবা দেন। প্যারিসের সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট মুখপত্র 'Humanite' লিখেছিল, ভারতীয় বিপ্লবীরা শত্রুপুরীর মধ্যে রক্ষিবেষ্টিত স্বদেশদ্রোহীকে যেভাবে হত্যা করেছে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তা প্রথম। একটি ব্রিটিশ পত্রিকা সেদিন কানাইলাল ও সত্যেন বসুকে গ্রীক ইতিহাসের বিখ্যাত হারমোডিয়াস ও এরিস্টগিটন-এর সঙ্গে তুলনা করে।"[২২]

নরেন গোঁসাইকে হত্যার অভিযোগে কানাইলাল (১০ নভেম্বর, ১৯০৮) ও সত্যেন্দ্রনাথের (২১ নভেম্বর, ১৯০৮) ফাঁসি হয়। বলা বাহুল্য, তাঁরা বীরের মতো ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করে জীবনের জয়গান গেয়ে যান।'[২৩] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বামী বিবেকানন্দের শৌর্যদীপ্ত আদর্শ ও গীতোক্ত আত্মার অমরত্ববাদ কানাইলাল তথা বাংলার বিপ্লবীদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।[২৪]

৬ মে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলার রায় বের হয়। অরবিন্দ ঘোষ-সহ সতেরো জন মুক্তিলাভ করেন। অনেকে নানা মেয়াদের কারাদণ্ড পান, অনেকের দীপান্তর হয় এবং কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হয়। বিপ্লবীরা হাসিমুখে দণ্ডাজ্ঞা মেনে নেন।[২৫] আসলে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্বের ওপর যবনিকা পাত হয়—যদিও মামলা চলাকালীন একাধিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ নভেম্বর ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজারের ওপর কলকাতায় গুলি চলে, ৯ নভেম্বর পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ১০ ফেব্রুয়ারি আলিপুর কোর্টের অভ্যন্তরে সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস নিহত হন এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সামসুল আলম কলকাতা হাইকোর্টে নিহত হন। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় বিপ্লববাদের মধ্যমণি অরবিন্দ ঘোষের অনুপস্থিতিতে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আলিপুর বোমার মামলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় বিপ্লব আন্দোলনের আদি পর্বের অবসান ঘটে ও দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।[২৬]

---

২১ কারাকাহিনী—অরবিন্দ ঘোষ (১৯৭৩), পৃঃ ২৯২

২২ যুগনায়ক অরবিন্দ—জীবন মুখোপাধ্যায় (১৯৭২), পৃঃ ১৮৩

২৩ বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল—শ্রীমতিলাল রায় (১৯৬৭), পৃঃ ৫-৬ ; মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই—সুধীরকুমার মিত্র (১৩৫৪), পৃঃ ১০৯-১২ এবং ফাঁসির সত্যেন—ব্রজবিহারী বর্মন, পৃঃ ৯৪-১১১

২৪ দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (১৯৮৮), প্রস্তাবনা।

২৫ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯-৪০

২৬ বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার বিস্মৃত অধ্যায়—সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৮-৭৭

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কালে কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চা

দেবিদাস বসু ও জলধিকুমার সরকার

ইংরেজী অভিধানমতে বিজ্ঞান (science) বলতে বোঝায় systematised knowledge বা প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। বিস্তারিতভাবে—knowledge of facts, phenomena, laws of proximate cause gained and verified by observation, experiment and correct thinking। বাঙলা অভিধানমতে বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা নিয়মিত গবেষণার ফলে ক্রম-অনুসারে লব্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞানের এই ব্যাপক সংজ্ঞায় ব্যাকরণ, সঙ্গীত, হোম সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স প্রভৃতি অনেক কিছুই 'বিজ্ঞান' পর্যায়ে পড়ে।[১] বর্তমান প্রবন্ধে 'বিজ্ঞান' কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার সীমিত অর্থে—গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি 'কুলীন' বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ, তার আগে যে ভারতবর্ষে ও কলকাতায় এসব বিষয়ে কোন চর্চা বা গবেষণা হতো না, তা নয় ; তবে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সেসবের আলোচনা এখানে বিশেষ অর্থপূর্ণ হবে না। ভারতে ও কলকাতায় আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ যে ইংরেজশাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত,এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কলকাতা ছিল গত শতাব্দীতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল। ফলে তখনকার ইংরেজ মনীষীদের চিন্তাধারা কলকাতায় প্রথম মূর্ত হবার সম্ভাবনা ছিল সর্বাধিক। ভারতে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য যেসব ইংরেজ কর্মচারী পাঠানো হতো, তাঁদের মধ্যে এমন কিছু মনীষী এসেছিলেন যাঁরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ভারতবাসীকে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে ব্যগ্র হয়েছিলেন। মনে হয় এটি তাঁরা করেছিলেন খানিকটা তাঁদের উদারমনা স্বভাববশতঃ, খানিকটা নবগঠিত সাম্রাজ্য-শাসনকাজের বনিয়াদকে শক্ত করার জন্য। অবশ্য এদেশে সেই জ্ঞানকে গ্রহণ করার জন্য বা তার প্রসারের জন্য উপযুক্ত লোক তাঁরা পেয়েছিলেন—সেটিও একটি কারণ। সে যাইহোক, কলকাতার শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা নেবার সুযোগ নিতে এগিয়ে এলেন, যার ফলে বিজ্ঞান-চেতনার স্ফুলিঙ্গ এখানে-ওখানে দেখা দিতে লাগল।

কলকাতায় বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার (arts) প্রথম প্রচেষ্টা হলো ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোনস কর্তৃক 'বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন। প্রতিষ্ঠানটির পরে নামকরণ হয় 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' এবং বর্তমানে যেটি 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। এর উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া মহাদেশের মানুষ এবং প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন। ধীরে ধীরে সোসাইটি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনুশীলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল। বহু ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক ভারতে এসে এখানকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সম্ভাবনা বুঝতে পারলেন। কারণ, এদেশে রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র (বিশেষতঃ শল্যবিদ্যা) প্রভৃতির মহান ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটিও ঐসব বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রকাশ করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে লাগল।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মেকলের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হলো। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পারদের উপর গবেষণার ফল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হলো। জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এখানেই তিনি তাঁর বেতারে সংবাদপ্রেরণের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, যার জন্য কৃতিত্ব

---

[১] উদ্বোধন, ৮২তম বর্ষ, পৃঃ ৪৭৪

পেয়েছিলেন অবশ্য ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি। জগদীশচন্দ্র 'হার্টজিয়ান অসিলেটর'কে (Hertzian Oscillator) উত্তেজিত করে এমন ধরনের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন যা তারের বা অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতীত শূন্য বা ফাঁকা জায়গার (space) ভিতর দিয়েও যেতে পারে। সেই তরঙ্গকে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কলেজ স্ট্রীটের অন্য একটি বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। এই তরঙ্গ আলোক-গতির সমান বেগে যায়। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ হচ্ছে পর্যায়ান্বিত (alternating) ইলেকট্রিক ও ম্যাগনেটিক এলাকার তরঙ্গরাশি (Field Quantities) যেগুলি শূন্যে আলোর বেগে ধাবিত হয় এবং যেগুলিকে ডিটেক্টর-সাহায্যে একমুখী করলে তবে ধরতে (রেকর্ড করতে) পারা যায়। জগদীশচন্দ্রকে রেডিও ও টেলিভিশনের জনক বলা যেতে পারে। কাজটি দুভাবে যুগান্তকারী—প্রথম, তারের সাহায্য না নিয়ে সংকেত পাঠানো; দ্বিতীয়, পর্যায়ান্বিত এলাকার তরঙ্গরাশিগুলিকে খনিজ ও স্ফটিক (এক্ষেত্রে 'গ্যালিনা ক্রিস্টাল'—(Galena crystal)-এর সাহায্যে একমুখী করা। দ্বিতীয় আবিষ্কারকে ট্রানজিস্টার (যা অর্ধশতাব্দী পরে বার্ডিন ও তাঁর সহকর্মীরা আবিষ্কার করেছিলেন)-এর জনক বলা যেতে পারে। আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের অভাবে জগদীশচন্দ্র এই কাজে অগ্রসর হতে পারেননি, যা মার্কনি পরে করেছিলেন। মার্কনি প্রথমে ইংল্যান্ড ও পরে আমেরিকা গিয়েছিলেন সাহায্যের জন্য, যাতে তিনি বেতারে সংবাদ প্রেরণের কাজকে সম্পূর্ণ করতে পারেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কনি নোবেল প্রাইজ পেলেন, বার্ডিন পেয়েছিলেন ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে। জগদীশচন্দ্র খানিকটা হতাশ হয়ে পদার্থ-বিদ্যায় গবেষণা ছেড়ে, উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে তা প্রমাণ করার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। এর জন্য তিনি সূক্ষ্মভাবে প্রতিক্রিয়াশীল (sensitive) নানা ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার সাহায্যে উদ্ভিদের জীবনধারাসংক্রান্ত অনেক কার্যকলাপ পরিমাপ করতে পারা যায়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক ফিসিক্স কংগ্রেসে পঠিত তাঁর প্রবন্ধের নাম 'জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনাপ্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা'। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল তাঁর 'রেসপন্সেস ইন দি লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং' গ্রন্থে (১৯০২) পাওয়া যায়। তিনি ধাতু, উদ্ভিদের ও প্রাণীর পেশির উপর নানা পরীক্ষা দ্বারা দেখালেন যে, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় ঐ তিন ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ একই ভাবে সাড়া দেয়।[২] তিনি পরে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'বোস ইন্স্টিটিউট' স্থাপন করেন।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'সায়েন্স ফ্যাকালটি' স্থাপন করার আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য কোন বিজ্ঞান গবেষণা হয়নি। (সায়েন্স কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে।) অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই একটি কলেজে (যেমন প্রেসিডেন্সী কলেজ) বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা ভালভাবেই চলত।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও কথামৃতে সুপরিচিত মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতায় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে এর নামকরণ হয় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স'। এটি স্থাপিত হয়েছিল ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রীটে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি যাদবপুরে অবস্থিত। মহেন্দ্রলাল সরকার এই সংস্থা করেছিলেন 'রয়েল ইনস্টিটিউশন অফ গ্রেট ব্রিটেন'-এর ধাঁচে—যেখানে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু সি.ভি. রমন ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এতে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত এই অ্যাসোসিয়েশনে আশানুরূপ গবেষণা হয়নি। রমন এখানেই কাজ করে নোবেল পুরস্কার পান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন মহেন্দ্রলাল সরকারকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

আলোচ্য সময়ে কলকাতায় আয়ুর্বেদ বা কবিরাজী (ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্র), হাকিমী (গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

---

[২] সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, পৃঃ ১৬০

এবং বোধহয় মুসলমান আমলে ভারতে প্রচলিত) এবং হ্যানিমান (১৭৫৫-১৮৪৩) আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথি (রোগসৃষ্টিকর বিষদ্বারা রোগচিকিৎসা-প্রণালী) চিকিৎসা চালু থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্যে অ্যালোপ্যাথির (রোগলক্ষণ-বিরোধী ঔষধ-দ্বারা চিকিৎসাপ্রণালী। হোমিও-চিকিৎসকগণ তাঁদের চিকিৎসাশাস্ত্র হোমিওপ্যাথি হতে তফাৎ করার জন্য 'অ্যালোপ্যাথি' নামটি চালু করেন।) শিক্ষণকার্য তখন ভালভাবেই শুরু হয়ে গেছে। তবে এখন যেমন অ্যালোপ্যাথির প্রাধান্য, তখন প্রাধান্য ছিল কবিরাজীর। কলকাতার হিন্দুসমাজে মনে হয় হাকিমী ততটা জনপ্রিয় ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্যানসার চিকিৎসা ব্যাপারে মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রতাপ মজুমদার, রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসককে যদিও দেখা যায়, তাঁর অসুখ-বিসুখে বেশিরভাগ সময়ে কবিরাজদেরই ডাকা হয়েছে। একমাত্র অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের চিকিৎসার জন্য কাশীপুরে ডাকা হয়েছিল, তিনি হলেন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, ডাঃ জে. এম. কোটস; কিন্তু ডাঃ কোটস, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ 'গরম' হতে পারে বলে, হোমিও চিকিৎসাই চালাতে বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার ব্যাপারে অনেক কবিরাজের নাম পাওয়া যায়—তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগকে সর্বপ্রথম 'রোহিণী' (ক্যানসার) বলেন (১৮৮৫, সেপ্টেম্বর); ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও (যিনি অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে এসেছিলেন) একই রোগনির্ণয় করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের দেশের লোকদের চিকিৎসা কবিরাজ-হাকিমদের উপর ছেড়ে দিতে চাইলেন না। ইংল্যান্ড থেকে চিকিৎসক আনা শুরু হলো। সেই চিকিৎসকরা কিছু এদেশী লোককে মোটামুটি শিক্ষা দিয়ে 'নেটিভ ডক্টর' হিসাবে সেনাবাহিনী এবং অসামরিক কেন্দ্রে নিযুক্ত করতেন। পরে উন্নততর শ্রেণীর 'নেটিভ ডক্টর' তৈরি করার জন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। এতে ২০জন করে ছাত্র নিয়ে তিন বৎসর শিক্ষা দেওয়া হতো। কলকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতে অনূদিত চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানো হতো; উর্দুতে অনূদিত ক্লাস চলত কলকাতা মাদ্রাসায়। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক নেটিভ স্কুলের শিক্ষণ ও কাজকর্ম পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটির সুপারিশে নেটিভ মেডিকেল স্কুল তুলে দিয়ে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি। এটিই ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ (ঠিক নাম—মেডিকেল কলেজ, বেঙ্গল)। প্রথম ব্যাচে ৫০জন ছাত্র ভর্তি হন এবং তিন বৎসর পরে প্রথম ব্যাচের চারজন পাশ করেন। চারজনই সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন হিসাবে সরকারি কাজে যোগদান করেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি এবং কলেজের অধ্যাপকগণ ও অধ্যক্ষকে নিয়ে গঠিত 'কলেজ কাউন্সিল'-ই পরীক্ষায় পাশ করার সার্টিফিকেট দিতেন। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় যিনি ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে শবব্যবচ্ছেদ করেন। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে মেডিকেল কলেজে ২০টি শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি হয়। বর্তমান থামওয়ালা বড় হাসপাতালটির ভিত্তি স্থাপন হয় ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর। ডাক্তারিতে প্রথম মহিলা ছাত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ভর্তি হন ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে; ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম যে দুজন মহিলা ডাক্তারি পাশ করেন তাঁরা হলেন বিধুমুখী বোস ও ভার্জিনিয়া মেরি মিটার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়ে মেডিকেল ডিগ্রি দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। কৃতী ছাত্রদের দেওয়া হতো এল. এম. এস. ডিগ্রি ও অনার্স পাওয়া ছাত্রদের দেওয়া হতো এম. বি. ডিগ্রি।[৩]

মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনের পাঠকরা সুপরিচিত।[৪] তিনি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে এল. এম. এস.

---

[৩] (মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলীর জন্য **Commemorative Volume on the occassion of Golden Jubilee Re-union and Terjublee Year of Medical College, Bengal (1984), pp, 17**

[৪] উদ্বোধন, ৭৩তম বর্ষ, পৃঃ ৪৯৮ এবং ৯০তম বর্ষ, পৃঃ ৫৯৯

ডিগ্রী এবং ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে এম. ডি. ডিগ্রী পেয়েছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে নিজস্ব সম্পাদনায় ‘ক্যালকাটা মেডিকেল জার্নাল’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য হিসাবে লেখা ছিল—“মেডিকেল ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা।” তবে পত্রিকার প্রথম বারোটি সংখ্যা দেখে মনে হয়, হোমিওপ্যাথির বিপক্ষ-যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করাই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এর এপ্রিল মাসের সম্পাদকীয়তে দেখা যায় যে, তখন কলকাতার প্রায় ছশো কবিরাজ ছিলেন এবং তাঁর মতে এইসব কবিরাজদের মধ্যে পাঁচজনও আয়ুর্বেদশাস্ত্র ঠিকমতো জানেন কিনা সন্দেহ। সেজন্য কবিরাজ ও হাকিমদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করানোর প্রস্তাবকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। জুন মাসের সম্পাদকীয়তে তিনি কলকাতার আবর্জনা এবং পায়খানা ও ড্রেন নিঃসৃত ময়লাকে (প্রতিদিন প্রায় ২০০ টন) সরাসরি ‘সল্ট ওয়াটার লেকে’ ফেলার প্রস্তাবকে বাধা দিয়ে প্রস্তাব করলেন, প্রথমে এই সব ময়লাকে রোগবীজশূন্য (disinfected) করে তবে ফেলা উচিত। আগস্ট মাসের সম্পাদকীয়তে হিন্দুদের মৃত্যুর আগে গঙ্গাযাত্রা (যাঁর ইংরেজী তিনি করেছেন ‘ghat-murder’) প্রথা সম্বন্ধে অভিমত দিয়েছেন, এঁদের জন্য গঙ্গার ধারে উদ্যানযুক্ত ভাল গৃহনির্মাণ দরকার; ব্যবস্থা এমন ভাল হবে যে, অবিশ্বাসীদেরও মৃত্যুর আগে এইরকম জায়গায় প্রাকৃতিক শান্ত পরিবেশে আসতে ইচ্ছা হবে।

এই সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—রবার্ট কক কর্তৃক আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে মেডিকেল কলেজে তাঁর পূর্ব-আবিষ্কৃত কলেরা জীবাণুর অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা এবং আনুমানিক ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান পি. জি. হাসপাতালের এলাকায় একটি গৃহে রোনাল্ড রস কর্তৃক মশার দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিবর্তিত অবস্থা দেখানো।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইতিহাস বলতে গিয়ে একটি কথা মনে আসে। স্বামী বিবেকানন্দের ‘রাজযোগ’ গ্রন্থে ডাক্তারি শাস্ত্রে ব্যবহৃত অনেক নাম পাওয়া যায়, যেমন সেন্ট্রাল ক্যানাল, প্লেক্সাস প্রভৃতি। তাছাড়া এমন কিছু তথ্য সেখানে আছে যা এখনকার অ্যানাটমি বইয়ে নেই, কিন্তু তখনকার বইয়ে ছিল। স্বামী সারদানন্দ বলেছেন,[৫] স্বামী বিবেকানন্দ (তৎকালীন নরেন) মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য মেডিকেল কলেজে ফিজিওলজির ক্লাস করতে যেতেন। প্রশ্ন জাগে, ঐ কলেজের ছাত্র না হয়েও কিভাবে ক্লাস করার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন? তখনকার দিনে, যেকোন ব্যক্তিকে মেডিকেল কলেজের ক্লাসে যেতে দেওয়া হতো বলে মনে হয় না। এই ব্যাপারে একটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের বোনের (পিসতুতো?) ছেলে চন্দ্রনাথ ঘোষ স্বামীজীদের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ বাড়িতে থেকেই মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতেন। অনেক বছর পরে কৃষ্ণনগরে প্র্যাকটিস শুরু করার আগে পর্যন্ত স্বামীজীদের বাড়িতেই তিনি থাকতেন। চন্দ্রনাথের মেডিকেল কলেজ থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখা যায়, তিনি ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে কলেজে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। চন্দ্রনাথের জীবিত পৌত্রদের[৬] কাছে উপরের তথ্যগুলি ছাড়া আরও জানা যায়, স্বামীজী তাঁকে ‘চন্দ্রদা’ বলে ডাকতেন এবং দুজনের মধ্যে খুব ভাব-ভালবাসা ছিল, যদিও তাঁদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেক। অনুমান করা যেতে পারে যে, স্বামীজীদের বাড়িতে বসবাসকারী এই ডাঃ চন্দ্রনাথ ঘোষের সাহায্যেই স্বামীজী মেডিকেল কলেজে ফিজিওলজি ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীতে কলিকাতায় বিজ্ঞানসংস্থার সংখ্যা অনেক, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সময়ে কলিকাতার বৈজ্ঞানিকদের ও বিজ্ঞানসংস্থাগুলির যেমন সারা ভারতে প্রাধান্য ছিল, এখনো সেরূপ আছে বলে জোর করে বলা যায় না।

---

[৫] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ (১৩৭৯), ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২১৯

[৬] কলিকাতা টালিগঞ্জ গল্‌ফ ক্লাব রোড নিবাসী অশোকনাথ ঘোষ ও অজিতনাথ ঘোষ

দেশান্তরের পত্র

শিকাগো দেখে এলাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

এদেশে আসার পর এই প্রথমবার আমার শিকাগো যাবার সুযোগ হলো। গত সাড়ে তিন বছরে আমেরিকায় আমাদের সব আশ্রমগুলিই আমার দেখার সুযোগ হয়েছে ; বাকি ছিল শিকাগো। বলতে কি শিকাগো দেখার—যে-শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মকে সারাজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—আমার একটা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা এতদিন আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গত এপ্রিল (১৯৮৯) মাসে সেই ইচ্ছা প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ণ হলো শিকাগো বেদান্ত সোসাইটির 'মিনিস্টার' স্বামী ভাষ্যানন্দজীর একটি আমন্ত্রণপত্রে। শিকাগো থেকে ১৩০ মাইল দূরে লেক মিশিগানের পূর্বকূলে বেদান্ত সোসাইটির একটি শাখাকেন্দ্র আছে। ১০৬ একর বিস্তৃত বনভূমিতে নানাপুষ্প ও ফলাদিবৃক্ষে সুসজ্জিত 'গ্যাঞ্জেস টাউনে' অবস্থিত এই মনোরম আশ্রমটির নাম 'বিবেকানন্দ মন্যাস্ট্রি এ্যান্ড রিট্রিট'। এখানে গত ২১-২৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী 'Hindu-Buddhists Dialogue' (হিন্দু-বৌদ্ধ বার্তালাপ) নামে একটি 'সেমিনার' হয়ে গেল। ঐ অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মের একজন প্রতিনিধিরূপে যোগ দেবার জন্য আমায় তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বস্টন থেকে সকালের 'ফ্লাইটে' রওনা হয়ে শিকাগোর O'hare এয়ারপোর্টে যখন পেঁছলাম তখন প্রায় দুপুর ১২টা। স্বামী ভাষ্যানন্দজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন জনৈক ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে যিনি আমাদের 'ড্রাইভ' করে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেদিন শিকাগোর আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল বলে 'ডাউন টাউনের' গগনচুম্বী উঁচু বাড়িগুলি সব দেখা যাচ্ছিল না। এদেশের 'ডাউন টাউন' হলো business area, আমাদের কলকাতার ডালহৌসির মতো। ব্যাঙ্ক, ইনসুরেন্স কোম্পানির বাড়িগুলি খুব উঁচু। শিকাগোর Sears Building (১১০ তলা) পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি—বলা বাহুল্য আমার দৃষ্টি ছিল ঐ বাড়িটির দিকে। যাহোক, প্রায় ১টা নাগাদ আশ্রমে পেঁছে, ঠাকুর প্রণাম করে 'লাঞ্চ টেবিলে' হাজির হলাম। আশ্রমের সন্ন্যাসি-কর্মী ও ভক্তসহ প্রায় ৮।১০জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়াদি হলো। তাঁদের দু-একজন আমার পূর্বপরিচিত।

বেলা প্রায় আড়াইটে নাগাদ স্বামী ভাষ্যানন্দজীর সঙ্গে রওনা হলাম গ্যাঞ্জেস টাউনের উদ্দেশে। সঙ্গে দুজন ভক্ত—একজন পোর্টোরিকো থেকে এসেছেন, অপরজন কানাডা থেকে এক ভারতীয় ছাত্র। তাঁরা উভয়েই 'সেমিনারে' যোগ দিতে এসেছেন। শিকাগো আশ্রমের নতুন গাড়িতে যাচ্ছি। গাড়িটি জনৈক ভক্ত দান করেছেন। এদেশের রাস্তা খুবই সুন্দর। 'এক্সপ্রেস ওয়ে'তে গাড়ি ঘণ্টায় ৭০।৭৫ মাইল বেগে প্রায় সকলেই চালায়, যদিও ৬৫ মাইল নির্ধারিত 'স্পীড লিমিট' লেখা রয়েছে। আমাদের দেশের মতো এখানেও রাস্তায় Toll post রয়েছে মাঝে মাঝে, বিশেষ করে কোনো বড় শহরে ঢোকার আগে। রাস্তা ভালভাবে মেরামত ও দেখাশোনার জন্য এই ব্যবস্থা। তবে দেশের Collection box-গুলি অধিকাংশই স্বয়ংক্রিয়, ৪০ বা ৫০ সেন্ট বাক্সে ফেলে দিলেই বন্ধ গেট খুলে যাবে।

ক্রমে আমরা শিকাগো তথা ইলিনয় স্টেট পার হয়ে ইন্ডিয়ানাতে পড়লাম। চারিদিক ধোঁয়ায় ভরা লেক মিশিগানের পার্শ্ববর্তী বড় বড় স্টীল ফ্যাক্টরির উঁচু চোঙগুলি আবছা দেখা যাচ্ছে। কয়েক মাইল জুড়ে এই ধোঁয়ার রাজ্য। এখানে সূর্য সবসময় ধোঁয়ার মেঘে ঢাকা। ইন্ডিয়ানা পার হয়ে মিশিগান স্টেটে ঢোকার আগে আমাদের বিশ্রামের স্থানটি এসে গেল। শিকাগো গ্যাঞ্জেসের মধ্যে এটি প্রায় মধ্যস্থল—Parking area। 'এক্সপ্রেস ওয়ে'তে মাঝে মাঝে এরূপ বিশ্রামের

ব্যবস্থা আছে। সুন্দর সাজানো গোছানো জায়গা—সবুজ ঘাসে ভরা 'লন' যেখানে কিছু ফুলগাছ ও পাতাবাহার গাছও মাঝেমধ্যে শোভা পাচ্ছে। 'রেস্ট রুম', টেলিফোনের ব্যবস্থা এবং 'রিফ্রেশমেন্ট সপ' ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবই রয়েছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও চা-পানাদি পর্ব শেষ করে পুনরায় রওনা হলাম আমরা। গাড়ি ছুটে চলেছে। রাস্তার ধারে মাইলের পর মাইল আপেল, নাশপাতি, পীচ, চেরী, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের বাগান। গাছগুলি সমান উচ্চতায় সুন্দরভাবে ছাঁটা হয়েছে—এখনো পত্রহীন, শীতের প্রকোপ সবে কাটিয়ে উঠেছে। এই মিশিগান স্টেটে প্রচুর ফল হতো শুনলাম। এখন ফলের বাগান অনেক কমে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে এখানকার ফল ব্যবসায়ীরা অনেকে বাগান বিক্রি করে দিয়েছেন।

বিকেল ৬টা নাগাদ আমরা গ্যাঞ্জেস আশ্রমে পৌঁছলাম। মন্দিরে আরাত্রিক ভজন শুরু হয়েছে তখন। এখনো সন্ধ্যা হতে অনেক দেরি। সমুদ্রের মতো বিশাল লেক মিশিগানের পশ্চিমে সূর্য অস্তমিত হতে প্রায় ৯টা বেজে যায়। ৭টার পরই আশ্রমের রাত্রিকালীন আহারের ঘণ্টা বাজে। 'ডাইনিং হলে' গিয়ে দেখি ১৫।২০ জন ভক্ত সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। এঁরা অনেকেই দূর শহরাঞ্চল থেকে এসেছেন 'সেমিনারে' যোগ দেবার জন্য। বেশ বড় হল—চার-পাঁচশ লোক বসতে পারে। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য 'মুভেবল পার্টিশান' দিয়ে ছোট করা হয়েছে—সেখানেও অন্ততঃ ৪০।৫০ জনের বসার ব্যবস্থা। দেওয়ালে শ্রীশ্রীমায়ের পা মেলে বসা বড় ছবি, ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। আহারাদির পর আশ্রমের লাইব্রেরি, 'বুক সেলস রুম', 'লেকচার হল', মিউজিয়াম প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মিউজিয়ামটি সুন্দর—ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ছোটখাটো রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের, মায়ের ও স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ছোট পুতুলের সাহায্যে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। শিকাগোর ভক্তগৃহে স্বামীজীর ব্যবহৃত কাপ-প্লেট ইত্যাদি দু-একটি জিনিসও দেখলাম।

মন্দিরে ভোর-সাড়ে চারটার সময় মঙ্গলারতি দিয়ে আশ্রমের দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়। ধ্যান-জপের পর প্রতিদিন গীতা ও স্তোত্রাদি পাঠ হয়—সংস্কৃতে ও ইংরেজীতে। ৭॥টায় ব্রেকফাস্টের পর আশ্রমিকরা আশ্রমের নানাবিধ কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকেন। বেলা ১টায় লাঞ্চ। আশ্রমের একটি ছোটখাটো ডেয়ারি ও পোলট্রি আছে। এদেশীয় এক ব্রহ্মচারী সেগুলি দেখাশোনা করেন। ভাল জাতীর গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি দেখলাম। একটি ছাগল প্রতিদিন প্রায় ২ গ্যালন দুধ দেয় শুনলাম। ফলের বাগানগুলিও ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানে মৌমাছি-প্রতিপালনও হয়ে থাকে। প্রায় ডজনখানেক 'বী-হাইভ' রয়েছে। গত বছর এক হাজার পাউন্ডের উপর মধু এঁরা পেয়েছেন বললেন। আশ্রমের দূরে-কাছে বেশ কয়েকটি 'কটেজ' রয়েছে—এগুলি পুরনো বাড়ি; প্রথমদিকে সাধু-ব্রহ্মচারীরাই ব্যবহার করতেন। এখন আশ্রমবাড়ি সম্প্রসারিত হওয়ায় এগুলিতে ভক্তদের থাকতে দেওয়া হয়—বিশেষ করে আশ্রমে কোন উৎসবাদির সময়। শুক্রবারের সন্ধ্যাকালীন অধিবেশন দিয়ে 'সেমিনারের' (হিন্দু-বৌদ্ধ বার্তালাপ) কাজ শুরু হলো। বক্তা ও শ্রোতাদের এখনো অনেকে এসে পৌঁছাননি। শনিবার দুবেলা ও রবিবার সকালের অধিবেশনের পর সেমিনার সমাপ্তি হলো। প্রায় শ-খানেক ভক্ত এতে যোগ দিয়েছিলেন। মোট আটজন বক্তার মধ্যে চারজন বৌদ্ধ ও চারজন হিন্দুধর্মের নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করলেন। প্রতি বক্তাকেই তাঁর বক্তব্যের পর শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। বক্তাদের মধ্যে তিনজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও একজন হিন্দু সন্ন্যাসী; বাকি সকলে কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তারা সকলেই ভারতীয়; বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একজন সিংহলী, একজন তিব্বতী ও অপরজন সম্ভবতঃ বাংলাদেশের লোক। শিক্ষাবিদ যিনি তিনি কোরিয়ার লোক। বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই এখন এদেশের বাসিন্দা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধমঠ থেকে এসেছেন। Zen বৌদ্ধরা

আমেরিকায় খুবই প্রসারলাভ করেছেন। বক্তাদের অনেকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

গ্যাঞ্জেসে থাকাকালীন একদিন লেক মিশিগানের ধারে বেড়াতে গেলাম। সমুদ্র সৈকতের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই—সেই ঢেউ, সেই বালুরাশি। অপরপাড় দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু ঝিনুক তত দেখলাম না ; তবে বড় বড় 'স্যামন' মাছ মৃত অবস্থায় বালুরাশির উপর পড়ে রয়েছে দেখলাম। 'কেমিক্যাল ওয়াটার পলিউশন' এদেশে সম্প্রতি এত বেড়েছে যে, ক্যানসারের ভয়ে নদী-নালা-লেক প্রভৃতির মাছ এখানকার লোকে এখন খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বিদেশ থেকে আমদানি 'ক্যানড ফিস' বরং এঁরা পছন্দ করেন। তবে মাছের থেকে এঁরা মাংসের বেশি ভক্ত। ১৫।২০ মাইল দূরে লেকের ধারে আর একটি ছোট 'টাউন' রয়েছে, নাম হল্যান্ড। সুন্দর সাজানো-গোছানো বাড়ি-ঘরদোর। রাস্তার দুপাশে 'টিউলিপ' ফুলের সারি। জলে ভাসমান বহু 'মোটর বোট' দেখলাম। এখানের বাসিন্দা অধিকাংশই 'ডাচ।'

গ্যাঞ্জেস আশ্রমের বাড়ি-ঘরদোর গত ১০।১৫ বছরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এদেশীয় সাধু-ব্রহ্মচারীরাই প্রচুর পরিশ্রম করে আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন। এঁরা নিরলস এবং কাজকর্মে খুবই 'প্র্যাকটিক্যাল।' আমাদের মতো মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। এদেশে মজুরির হার এত বেশি যে, সাধারণ লোকের পক্ষে মজুর খাটানো প্রায় অসম্ভব। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম নিজেদেরই করে নিতে হয়।

'সেমিনার' সমাপ্ত হলে আমরা পুনরায় শিকাগো ফিরলাম। শিকাগো আশ্রমটি স্বামীজীর নামাঙ্কিত—বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি। বর্তমান আশ্রমটির পরিবেশ খুব সুন্দর। পাশাপাশি দুটি বাড়ি সৌভাগ্যক্রমে পাওয়ার ফলে বাড়ি দুটি একত্রে সংযোজিত হওয়ায় আশ্রমের পরিসর অনেক বেড়েছে। ঠাকুরঘর ও বক্তৃতার হলও বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'বিশ্বমেলা প্রাঙ্গণ' থেকে আশ্রমের দূরত্ব খুবই কম—মাত্র ৫।৭ মিনিটের হাঁটা পথ। আশ্রম থেকে আট-দশ মিনিট হাঁটলেই লেকের ধারের উন্মুক্ত পার্কে পৌঁছানো যায়। বিশ্বমেলা প্রাঙ্গণের অধিকাংশ স্থানই এখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত কেবল এখনকার বিশাল বিজ্ঞান ভবনটি (Science Museum) গত শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেলার সাক্ষ্য বহন করছে। মিউজিয়ামটি বিরাট ও নানাবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির আকর। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় লেগেই রয়েছে। কোন প্রবেশমূল্য নেই। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত একটি অতিকায় এখানে রয়েছে। আমেরিকা যেসব মহাকাশযান ইতিপূর্বে শূন্যে পাঠিয়েছে তাদের কয়েকটির 'মডেল' রয়েছে। ভিডিও ফিল্মের সাহায্যে তাদের গতিবিধি দেখানো হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রদানব রোবট অবিশ্বাস্য ধরনের কাজকর্ম করে চলেছে। এমনকি হাত-পা-মুখ নেড়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের কার্যাবলী। পিয়ানোতে সুন্দর গানের সুর বাজিয়ে মুগ্ধ করছে সকলকে। কমপিউটারের কর্মশক্তি দেখলে অবাক হতে হয়। আরও কত কী সব জিনিস!

শিকাগোর বিখ্যাত 'আর্ট ইনস্টিটিউট' দেখলাম, যেখানের 'কলম্বাস হলে' অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভায় একদা হিন্দুধর্মের বিজয়ঘোষণা করে স্বামীজী জগদ্‌বরেণ্য হয়েছিলেন। বর্তমানে বাড়িটি অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন 'কলম্বাস হল' বা ওয়াশিংটন হলে'র কোন অস্তিত্ব নেই—হল দুটি রূপান্তরিত হয়েছে ছোট ছোট 'হলে', যেখানে দেশ-বিদেশের নানাবিধ শিল্পকলা প্রদর্শিত হচ্ছে। মূল বাড়িটি সামনের বিরাট প্রবেশদ্বার সহ অপরিবর্তিত রয়েছে।

হেল পরিবারের বাড়িটি বর্তমানে আর দেখা যাবে না। সেই পুণ্য ভূমিতে এখন একটি বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি শোভা পাচ্ছে। তবে আশপাশের বাড়িগুলি প্রায় ঠিকই রয়েছে। হেল বাড়ির সন্নিকটে রাস্তার বিপরীত দিকে যে চার্চটি ছিল এবং যার একটি সিঁড়িতে অবসন্ন স্বামীজী একদিন সকালে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় হতাশ

হৃদয়ে বসে পড়েছিলেন, সেই চার্চটি এখনো রয়েছে। পূর্ব রাত্রিতে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে শিকাগো রেলস্টেশনে রেলের একখালি কামরায় কোনরকমে রাত কাটিয়ে সেদিনকার অখ্যাত অপরিচিত যুবক-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আশ্রয়ের সন্ধানে মিশিগান লেকের ধার ধরে অগ্রসর হতে হতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন এই চার্চটির প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ সিঁড়িতে। বিধিনির্দিষ্ট আশ্রয়দাত্রী মিসেস হেল তাঁর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে সাদরে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁর ধর্মমহাসভায় যোগদানের ব্যাপারেও নানাভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই পরিবারটির সঙ্গে স্বামীজীর এতই ঘনিষ্ঠতা হয় যে, আমেরিকা থাকাকালীন এইটিই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিল। ধর্মপ্রাণ হেল দম্পতি মিঃ ও মিসেস হেলকে তিনি যথাক্রমে 'ফাদার পোপ' ও 'মাদার চার্চ' বলতেন। হেল কন্যাদের তিনি বোনের মতো ভালবাসতেন। মেরী হেলকে স্বামীজী তাঁর জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পত্রাদিতে উল্লেখ করেছেন ; স্বামীজীর পত্রাবলীর পাঠকমাত্রই তা অবগত আছেন। শিকাগো রেলওয়ে স্টেশন এলাকাটি দূর থেকে দেখলাম। স্বামীজী যখন হেলদের বাড়িতে থাকতেন সেই সময় অনেকদিন তিনি নিকটবর্তী একটি পার্কে বেড়াতে যেতেন এবং সেখানে একটি বেঞ্চে বসে থাকতেন। কখনো মৃদুস্বরে গান গাইতেন। এইভাবে স্বামীজীকে প্রায় প্রতিদিন সেখানে বসে থাকতে দেখে এক ভদ্রমহিলার তাঁর প্রতি এতই আস্থা জন্মে যে, তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে স্বামীজীর কাছে গচ্ছিত রেখে বাজার করতে যেতেন। এই মেয়েটি পরবর্তী জীবনে বেদান্তের একজন অনুরাগী-ভক্ত হয়েছিলেন। সেই লিঙ্কন পার্ক আজও সগৌরবে সেই মধুময় স্মৃতি বহন করছে। পার্কে দাঁড়িয়ে আমার সেই কথাই মনে পড়ছিল।

শিকাগো বেদান্ত সোসাইটির স্থায়ীভাবে কাজ শুরু করেন স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তী পরিচালক স্বামী বিশ্বানন্দ যে বাড়িতে সোসাইটির কাজ করতেন সেই এল্ম স্ট্রীটের বাড়িটি হেলদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। বাড়িটি আজও রয়েছে দেখলাম। সোসাইটির কাজের সম্প্রসারণের ফলে এই বাড়ির পরিসর যথেষ্ট না হওয়ায় বর্তমান পরিচালক বাড়িটি বিক্রি করে এখনকার অপেক্ষাকৃত বড় বাড়িতে সোসাইটি স্থানান্তরিত করেন ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে।

শিকাগোয় থাকাকালীন একদিন শহর থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল উত্তরে বাহাই মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরটির কারুকার্য খুবই সুন্দর। মন্দিরের চারিদিকে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে পরিশোভিত উদ্যান। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ সুন্দরভাবে ছেঁটে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে। বাহাই সম্প্রদায়ের এই মন্দিরটি আমেরিকায় তাঁদের সবচেয়ে বড় মন্দির এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র।

শিকাগোর বিখ্যাত শেড অ্যাকোয়ারিয়াম দেখলাম। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই অ্যাকোয়ারিয়ামটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'ইনডোর অ্যাকোয়ারিয়াম।' পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে সংগৃহীত ছোট-বড় নানা আকৃতি ও বর্ণের প্রায় ৮০০ রকমের মাছের সমাবেশ এখানে। ভারতের রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে দেখলাম। একটি বিরাট গোলাকার স্বচ্ছ ৯০,০০০ গ্যালন জলের ট্যাঙ্কে নানা রকমের মাছ, হাঙ্গর ও সামুদ্রিক কচ্ছপকে যখন ডুবুরি জলে নেমে খাবার দেয় ও তাদের সঙ্গে খেলা করে তা একটি দেখার জিনিস।

সিয়ার্স টাওয়ার দেখলাম। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই বহুতল বিশাল বাড়িটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'প্রাইভেট অফিস বিল্ডিং।' ১১০ তলা বিশিষ্ট বাড়িটির উচ্চতা ১৪৫৪ ফুট। ছাদের উপর একজোড়া 'এ্যান্টেনা' রয়েছে ; এ্যান্টেনাসহ এর উচ্চতা ১৭০৭ ফুট। ১০৩ তলা পর্যন্ত 'এলিভেটর' চলে। পৃথিবীর দ্রুততম এই এলিভেটরের সেখানে পৌঁছতে সময় লাগে এক মিনিটের একটু বেশি। প্রায় ১২,০০০ কর্মী এই বাড়িটিতে কাজ করেন।

শিকাগো ও গ্যাঞ্জেসে দিন দশেক কাটিয়ে পুনরায় কর্মস্থল বস্টনে ফিরে এলাম। নিয়ে এলাম এক পরম আনন্দময় স্মৃতি।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

কলেরা ও অন্যান্য উদরাময় রোগ সম্বন্ধে নতুন চিন্তা-ভাবনা

ধীমান বড়ুয়া

‘কলেরা’ (ওলাউঠা) শব্দটি এখনো অনেকের মনে বেশ আতঙ্কের সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ যাঁরা আগেকার দিনে কলেরা মহামারীতে গ্রামকে-গ্রাম ধ্বংস হতে দেখেছেন। সারা পৃথিবী থেকে বসন্ত রোগকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবও বিশেষভাবে কমে গেছে ; কিন্তু কলেরার প্রকোপ যেন আমাদের উপমহাদেশ ছাড়িয়ে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। এসব দেখে কলেরা সম্বন্ধে আতঙ্ক হওয়াই স্বাভাবিক।

কলেরার বর্তমান অবস্থা

কলেরা যে জীবাণুঘটিত রোগ এবং এর জীবাণু (কলেরা ভিব্রিও—Vibrio cholerae OI biotype বা classical cholera vibrio) যে খাদ্য বা পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে তা অনেকদিন থেকেই জানা। প্রায় ২৮ বছর আগে (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে) একটি নতুন ধরনের কলেরা জীবাণু (এলটর—V. cholerae OI biotype Eltor) ইন্দোনেশিয়ায় সুলাওয়াসি বা সেলিবিস দ্বীপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। জীবাণুটি পরপর ঐ দেশের অন্যান্য দ্বীপে এবং পরে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে কলেরা-মহামারীর সৃষ্টি করে। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই জীবাণু কলকাতায় পেঁছায় বা ধরা পড়ে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মাদ্রাজ ও অন্যান্য অনেক জায়গায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের সাবেকী কলেরা জীবাণুকে (অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল কলেরা ভিব্রিওকে) সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে বসে। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশেও কয়েক বছরের মধ্যেই সেই রকম পরিবর্তন হলো ; কিন্তু এখন সেদেশে ক্লাসিক্যাল ও এলটর দুরকম জীবাণুই রয়েছে। এলটর ভিব্রিওর পশ্চিমমুখী অভিযান এখনো শেষ হয়েছে কিনা বলা যায় না, কারণ ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দেও একটি নতুন দেশ এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৬১ থেকে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মোট ৯৪টি দেশে এলটর কলেরা প্যান্ডেমিক (pandemic—বহুদেশব্যাপী মড়ক) ছড়িয়েছে। এই প্যান্ডেমিককে ‘সপ্তম কলেরা প্যান্ডেমিক’ বলা হয়, কারণ আগে ১৮১৭- ৯২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ছটি কলেরা প্যান্ডেমিক হয়ে গেছে, এবং সেগুলি সম্ভবতঃ ক্লাসিক্যাল কলেরা জীবাণুদ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল।

নতুন তত্ত্ব

সপ্তম প্যান্ডেমিক যেমন অনেক ক্ষতি করেছে তেমনি গবেষণায় প্রচুর উদ্দীপনাও যুগিয়েছে, ফলে অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব আমাদের হাতে এসেছে। এই গবেষণার মাধ্যমেই জানা গিয়েছে, এলটর জীবাণুটি ক্লাসিক্যাল জীবাণুর চেয়ে বেশি কষ্টসহিষ্ণু (hardy) অর্থাৎ এ অত সহজে মরে না। তাই মলের সঙ্গে বহিষ্কৃত জীবাণুগুলো জলে ও লোকজনের বাসস্থানের প্রতিবেশে বেশিদিন বেঁচে থাকে, আর জল ও খাবারের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। খুব নিকট সংস্পর্শও (intimate contact) মলের জীবাণুকে সোজাসুজি বা পরোক্ষভাবে লোকের মুখে পেঁছে দিতে পারে। এরকমভাবে দূষিত (infected) লোকদের অনেকেই কিন্তু সুস্থ থাকে বা মৃদুভাবে অন্য ডাইয়েরিয়ার মতো রোগে ভোগে। তবে এলটর, জীবাণু ও ক্লাসিক্যাল জীবাণুর মতো সাংঘাতিক বা মারাত্মক রকমের কলেরাও করতে পারে ; অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম লোকই এলটর দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হয়। দেখা গেছে যেসব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীতে লোক খুব ঘন সংঘবদ্ধভাবে বাস করে, সেখানে একজন মামুলি

কলেরা রোগী প্রতি প্রায় ৫০-১০০ জন জীবাণুবাহক সুস্থ লোক (healthy carrier) থাকতে পারে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও রোগীপ্রতি ৫ থেকে ১০ জন জীবাণুবাহক সুস্থ লোক প্রায়সময়েই দেখা যায়। এই সুস্থ জীবাণুবাহক ও মৃদুভাবে আক্রান্ত কলেরা রোগীরাই (mild cases) জীবাণু বেশি ছড়ায়।

এই প্যান্ডেমিক-এর সময় উত্তর-আমেরিকার গাল্ফ অব মেক্সিকোর তীরে বেশ কয়েকজন আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা গত কয়েক বছরের মধ্যে গ্রীষ্মের সময় গাল্ফের জল থেকে ধরা কাঁচা বা অর্ধ রন্ধিত (improperly cooked) সমুদ্রজাতীয় খাদ্য বিশেষ করে চিংড়ি জাতীয় মাছ খেয়ে এলটর-কলেরাতে আক্রান্ত হয়েছে। এই এলটর জীবাণু আর ইন্দোনেশিয়ার আদিম এলটর জীবাণুর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য পাওয়া গেছে। গবেষণা করে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, এই জীবাণুগুলি এখানে জলীয় উদ্ভিদ বা জলীয় প্রাণীর সংযোগে অনেকদিন ধরে বেঁচে আছে, আর উপযুক্ত সময়ে আবহাওয়া ও ঋতুর অবস্থা অনুযায়ী সংখ্যায় বেড়ে জল বা খাবারের সঙ্গে লোকের অন্ত্রে গিয়ে তাকে সময় সময় কলেরা রোগে আক্রান্ত করেছে। আগে এত ভাল পরীক্ষা-প্রণালী ছিল না বলে এই রোগীগুলি কলেরার রোগী বলে ধরা পড়েনি। ক্লাসিক্যাল কলেরা জীবাণুর এভাবে জলে বেঁচে থাকার কোন প্রমাণ এ-পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও এই প্রথম কলেরা জীবাণুর মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মধ্যে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ধরা পড়েছে (non-human reservoir বা host)। এই তথ্য যদি সত্যি হয় তাহলে কলেরার জীবাণুকে পৃথিবী থেকে মূলোৎপাটন (eradication) করা খুবই দুঃসাধ্য হবে। তবে উন্নত (developed) দেশগুলির মতো নিরাপদ জলের ব্যবস্থা, মল অপসারণ করার ব্যবস্থা, লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের (Personal & domestic hygiene) ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রচলন করতে পারলে কলেরার অস্তিত্ব বাস্তবপক্ষে (for all practical purposes) প্রায় নির্মূল করারই সমতুল্য হবে। তা কখন সম্ভব হবে বা আদৌ সম্ভব হবে কিনা বলা শক্ত।

নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি

কলেরা গবেষণালব্ধ আরও অনেক নতুন তত্ত্বের মধ্যে যেটিকে ল্যানসেট (Lancet) নামক স্বনামধন্য চিকিৎসা-বিদ্যাবিষয়ক পত্রিকা "বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার" বলে চিহ্নিত করেছে, তার কথা বিশদভাবে উল্লেখ করা দরকার। পেট খারাপ হলে আমাদের দেশে এক গ্লাস জলে চিনি ও লবণ গুলে তাতে লেবুর রস দিয়ে সরবত করে খাওয়ানো হয়। কোন কোন প্রাচ্যদেশে লবণ দিয়ে ভাতের কাঁজি করে খাওয়ানোর প্রচলন আছে। এইগুলোতে কোন কাজ হয় কিনা, আর হলে কি করে হয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় উপরোক্ত আবিষ্কারের মাধ্যমে।

ষাটের দশকে জানা গিয়েছিল যে, গ্লুকোজ (Glucose)-এর সঙ্গে পরিমাণ মতো লবণ (Sodium chloride) জলে মিশিয়ে মুখে খেলে, লবণ ও জল অন্ত্রনালীতে গিয়ে রক্তে শোষিত হয়। কলেরায় দাস্তবমির সঙ্গে যখন জল ও লবণ বেরিয়ে গিয়ে শরীরে জলশূন্য অবস্থা (dehydration) সৃষ্টি করে, তখন গ্লুকোজ ও সোডিয়াম ক্লোরাইড পরিমাণ-মতো জলে মিশিয়ে খেলে শরীরের হারানো লবণ ও জল প্রতিস্থাপিত (replaced) হয়, আর রোগী ভাল হয়ে যায়। লেবুর রসে ও ডাবের জলে পটাসিয়াম আছে, কিন্তু সোডিয়াম নেই বলে শুধু ডাবের জল খাওয়ালে কাজ হয় না। মুখে খাওয়ানো এই চিকিৎসাকে ওরাল রিহাইড্রেশন বা 'ও. আর.' (Oral rehydration বা O. R.) বলা হয়। চিনি ও ভাত অন্ত্রের মধ্যে ভেঙে গিয়ে গ্লুকোজ ছাড়ে বলে চিনির সরবত বা ভাতের কাঁজি এই কাজ করতে পারে। সাংঘাতিক অবস্থা (যাদের ইনট্রাভেনাস স্যালাইন দরকার) ছাড়া বেশির ভাগ কলেরা রোগীই মুখে গ্লুকোজ স্যালাইন (স্যালাইন=লবণজল) খেয়ে সেরে উঠতে পারে। শুধু লবণজলে এই উপকার হবে না। গ্লুকোজ ও সোডিয়াম ক্লোরাইড পরিমাণ মতো মেশাতে হয়। কলেরায় বা অন্যান্য সাংঘাতিক ধরনের উদরাময়ে মলের সঙ্গে পটাসিয়াম (Potasium) ও সোডিয়াম বাই-কারবোনেট (Sodium bicarbonate)-ও বেরিয়ে যায় ; সেজন্য এদুটি উপাদানও গ্লুকোজ স্যালাইন-এ মিশিয়ে দিলে ফল ভাল হয়। পরীক্ষা করে

দেখা গেছে যে, শুধু কলেরা নয়, সব রকমের তীব্র ধরনের (acute) উদরাময়েই এই চিকিৎসা প্রযোজ্য। কারণ কলেরা ও যেকোন তীব্র উদরাময়ে ডিহাইড্রেশন বা শরীরের জলশূন্য অবস্থাই মৃত্যুর প্রধান কারণ। মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষে প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু উদরাময়ে মারা যায় (অর্থাৎ মিনিটে ২-৩ জন)। আর উদরাময় হচ্ছে অপুষ্টির (malnutrition) প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি। অনুন্নত দেশে শিশু-হাসপাতালে ও সাধারণ হাসপাতালে উদরাময় রোগী সকল রোগীদের এক-তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ। সে-তুলনায় কলেরা রোগীর সংখ্যা অনেক কম। এইসব চিন্তা করে 'হু' (WHO) বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কলেরা ও ডাইয়েরিয়া দমন করার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচী (Special Programme for control of Diarrhoeal Diseases or CDD) তৈরি করেছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সব রকম ডাইয়েরিয়াজনিত মৃত্যু সংখ্যা ও অপুষ্টি রোগীর সংখ্যা কমানো, আর সঙ্গে সঙ্গে কি করে কলেরা ও অন্যান্য ধরনের ডাইয়েরিয়া নিরোধ করা যায় তার জন্য শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।[১]

বিশেষজ্ঞদের মতে পাতলা দাস্ত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে বেশি জলীয় খাদ্য দেওয়া উচিত, যেমন মায়ের দুধ (যা সবচেয়ে ভাল) বা গরুর দুধ (যা ছয় মাসের অধিক বয়স্ক শিশুকে জল না মিশিয়ে দিলে কোন ক্ষতি হয় না, যদিও আগের দিনে বলা হতো অর্ধেক দুধ ও অর্ধেক জল মিশিয়ে খাওয়াতে), ভাতের বা খুদের পাতলা জাউ (rice gruel) বা ভাতের কাঁজি একটু একটু লবণ ও লেবুর রস দিয়ে, মাছের বা তরকারির ঝোল (soup) ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞরা আরও প্রমাণ করেছেন, আমাদের দেশের শিশুদের পক্ষে খাওয়া বন্ধ করা খুবই খারাপ ; অপুষ্টি নিবারণ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো রুগ্ন শিশুকে তার অভ্যস্ত খাবার অল্প অল্প করে বারে বারে খাইয়ে যাওয়া ; তাতে কোন ক্ষতি হয় না, যদিও আগের দিনে খাওয়া বন্ধ করার নিয়ম ছিল। ডাইয়েরিয়া সেরে যাওয়ার পরও প্রায় ৭ দিন ধরে শিশুকে অতিরিক্ত খাওয়া দিলে ভাল হয়।

রোগীর শরীরে জলাভাব (dehydration) দেখা দিলে (অর্থাৎ যদি চোখ বসে যায়, জিভ ও ঠোঁট শুকিয়ে যায়, তৃষ্ণা খুব বেড়ে যায়, শিশু খুব ছটফট করতে থাকে, প্রস্রাব কমে যায় ও রঙ গাঢ় হয়ে যায়, কাঁদলে চোখের জল পড়ে না ইত্যাদি) দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া অন্যদের সব খাবার বন্ধ করে দিয়ে ৪-৬ ঘণ্টা শুধু 'ও. আর. এস.' (O. R. S. বা oral rehydration salt) জলে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। ভারতবর্ষে প্রায় ৭০টি উৎপাদক ফার্ম নানা নামে 'ও. আর. এস.' তৈরি করছে। তার মধ্যে কিছু ফার্মের 'ও. আর. এস.'-এর উপাদান (Composition) 'হু-ইউনিসেফ' (WHO-UNICEF)-এর 'ও. আর. এস.'-এর মতো যা ঠিক পরিমাণ জলে মিশিয়ে খাওয়ান নিরাপদ ও ফলপ্রসূ বলে অসংখ্য শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। অন্য কয়েকটি ফার্মের 'ও. আর. এস.'-এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ আছে যা সময় সময় ডাইয়েরিয়ার সৃষ্টি করতে পারে ; কতকগুলিতে আবার অপ্রয়োজনীয় উপাদান যোগ করে এর দাম বাড়ান হয়েছে। হু-ইউনিসেফের 'ও. আর. এস.'-এর উপাদান হলোঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড ৩·৫ গ্রাম, সোডিয়াম বাই-কারবোনেট ২.৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড ১.৫ গ্রাম ; গ্লুকোজ ২০ গ্রাম। এগুলি এক লিটার পরিষ্কার পানীয় জলে মেশাতে হয়। একবার তৈরি করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করা উচিত। রোগীর বয়স বা ওজন এবং তার শরীরে জলাভাবের গুরুত্ব অনুযায়ী 'ও. আর. এস.'-এর' পরিমাণ ঠিক করতে হয়। সাধারণতঃ শরীরের এক কেজি ওজন প্রতি ৫০—১০০ মিলিলিটার (এম. এল. বা সি.সি.) এই পানীয় খাওয়ালে শরীরের জলাভাব চলে যায় (বড়রা যত ইচ্ছা খেতে পারে)। তার পরে লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া যেতে

---

[১] লেখক জেনেভাস্থ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের 'ডাইয়েরিয়াল ডিজিজেস প্রোগ্রামের' ভূতপূর্ব ম্যানেজার।

পারে, যেমন নরম ভাত, পিষ্ট আলুসিদ্ধ (smashed potato), সিদ্ধ মাছ, ডিম প্রভৃতি। প্রত্যেকবার দাস্তের পরে বয়স অনুযায়ী ½—১ কাপ (প্রায় ২০০ সি. সি.) এই পানীয়, দাস্ত না থামা পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে যাতে আবার জলাভাব না হয়। টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় এ্যান্টিবায়োটিক কলেরাতে সাহায্য করে, তবে অন্য রকম জলীয় ডাইয়েরিয়াতে কোন অ্যান্টিবায়োটিক বা পায়খানা শক্ত করার ওষুধের দরকার হয় না—বরং তাতে ক্ষতি হতে পারে, বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে। বমি হতে থাকলেও এই পানীয় অল্প মাত্রায় বারে বারে দিলে কাজ হয়, কারণ বমির পরেও এর খানিকটা পেটে থেকে যায়, এবং বমি কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়; বমি বন্ধ করতে ওষুধের দরকার হয় না। ঘণ্টায় ৩-৪ বারের বেশি বমি না হলে কেবল এই পানীয়তেই কাজ হবে। অবশ্য শরীরের জলাভাব সাংঘাতিক ধরনের হলে ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরের জলাংশ পুনঃপূরণ (intravenous rehydration) করাই শ্রেয়। তবে যখন তা করার উপায় থাকে না তখন নাকের ভিতর দিয়ে নল ঢুকিয়ে পেটে 'ও. আর. এস.' পাঠিয়ে অনেক রোগীকে ভাল করা যায়।

রক্ত আমাশয় হলে শরীরে জলাভাব বেশি হয় না, তবুও উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে এই পানীয় এবং পুষ্টিকর ও লঘুপাক খাবার দিলে উপকার হয়। আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্ত আমাশয়ের জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিকে কাবু হয় না (drug-resistant)। আবার অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হবে কিনা তা নির্ণয় করতে হলে ভাল ল্যাবরেটরির দরকার। অনেক জায়গায় অ্যান্টিবায়োটিক না দিয়ে শুধু এই পানীয় ও ভাল খাবার দিয়ে এই রোগে মৃত্যুহার কমানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজকাল কলেরার চিকিৎসা অনেক সহজ হয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে। তবে ডাক্তার ও নার্সদের এই পানীয় তৈরি ও তার উপযুক্ত ব্যবহার করার জন্য শিক্ষণের প্রয়োজন, কারণ ছাত্রজীবনে তাঁদের এ-ব্যাপারে কোন শিক্ষা দেওয়া হয়নি। 'হু' (WHO) এই শিক্ষণের জন্য নানা ব্যবস্থা করে চলেছে। দেখা গেছে যে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী (village health worker)-দের শিক্ষা দিয়ে তাদের হাতে 'ও. আর. এস.' প্যাকেট দিলে ওরা বেশির ভাগ কলেরা ও অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা করতে পারে, এবং তারা রোগীর অবস্থা খারাপ বা সাংঘাতিক হবার আগে থেকেই চিকিৎসা শুরু করতে পারে। এর ফলে তারা মহামারীর শুরুতেই ব্যবস্থা নিয়ে মহামারী ছড়াবার আগে তাকে দমন করতে পারে। শুধু ভাল সংগঠনের (organization) আর পরিচালনার (management) অভাবেই এই সহজ চিকিৎসাপদ্ধতি সকলের কাছে পেঁছিতে অনেক সময় লাগে।

কলেরা টিকা

যদিও বর্তমানে প্রচলিত কলেরার টিকা নানা দেশে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে, এই টিকার কার্যকারিতা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে মাত্র ২৫ বৎসর আগে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশ, কলকাতা ও ফিলিপাইনের আটটি জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিচালনায় (controlled field trial) এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা গেছে যে, এই টিকা মাত্র ২ মাসের জন্য টিকা গ্রহণকারীদের ৬০-৭০ শতাংশকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিতে পারে; তারপরে এদের সেই ক্ষমতা দ্রুত কমে গিয়ে ৬ মাসের মধ্যে ৩০ শতাংশে দাঁড়ায়। এই ক্ষণস্থায়ী এবং আংশিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পাওয়া যায় শুধু যখন টিকা সম্পূর্ণভাবে শক্তিশালী (potent) থাকে। টিকার ফলপ্রসূতা পরীক্ষা করা খুব ব্যয়সাপেক্ষ ও কঠিন বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা না করেই টিকা ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই টিকা সুস্থ জীবাণুবাহকের (healthy carrier) হার কমায় না বলে টিকা ব্যবহার সত্ত্বেও জীবাণু ছড়ানো কমে না। এই সব কারণে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বিদেশ ভ্রমণে কলেরার টিকা দেওয়া সার্টিফিকেটের আবশ্যকতা বন্ধ করে দিয়েছে।

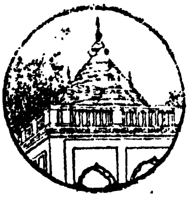

গ্রন্থ পরিচয়

অদ্বৈতবেদান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী

অদ্বৈতবেদান্তে জ্ঞান: মিনতি কর। আদিত্যময়, ৬৩কিউ মহানির্বাণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯। একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা।

অধ্যাপিকা মিনতি কর লিখিত 'অদ্বৈতবেদান্তে জ্ঞান' নামক গ্রন্থে ছয়টি বর্গকে জ্ঞানের বিভিন্ন দিক জটিলতম বিচার ও বিশ্লেষণ সহ আলোচিত হয়েছে। এসকল বিচার ও বিশ্লেষণের তাৎপর্য ও নৈপুণ্য উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি মূল বেদান্ততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম জ্ঞান সম্পর্কে জগতের সকল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এই যে, জ্ঞান একটি ধর্ম বা গুণ বা ব্যাপার। অর্থের প্রকাশই জ্ঞান, এই লক্ষণটি প্রায় অনেকেই স্বীকার করলেও, 'প্রকাশ' পদার্থটির ধারণাতে এবং 'অর্থে'র সঙ্গে এই প্রকাশের সম্বন্ধ বিষয়ে ধারণাতে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। প্রকাশকে তার্কিকগণ আত্মার আগন্তুক ক্ষণিক গুণ বলে মনে করেন। অর্থকে বিষয় করেই আত্মাতে ক্ষণিক (দ্বিক্ষণস্থায়ী) জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কারো মতে জ্ঞান মনের বা মস্তিষ্কের ব্যাপারমাত্র। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের মতে জ্ঞানই একমাত্র বস্তু—পারমার্থিক বস্তু। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম', 'সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম' ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যে যে জ্ঞানের কথা রয়েছে সে জ্ঞানই হলো ব্রহ্ম। বৃহত্তম পারমার্থিক বস্তু, আর সবকিছুই তাতে অধ্যস্ত বা কল্পিত, তার দ্বারা সিদ্ধ বা তদ্‌ভাস্য পদার্থ। জ্ঞান বা চৈতন্যই দৃক্, আর সব দৃশ্য। এই দৃশ্য পদার্থ দৃক্-চৈতন্য বা জ্ঞানের মতো সত্য (পারমার্থিক) হলে দৃশ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং দৃশ্যের প্রকাশই সম্ভব হতো না। তাই দৃশ্যকে ব্যবহারিক সত্য বা 'মিথ্যা' বলা হয়। 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ অনির্বচনীয়তা, অর্থাৎ চৈতন্য বা ব্রহ্মের ন্যায় 'সৎ' বা সত্যও নয়, আবার বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অসৎ (নেই) বা অলীকও নয়। এতাদৃশ দৃশ্য বা অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধও পারমার্থিক হতে পারে না—আধ্যাসিক বা ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তার দ্বারাই অর্থের প্রকাশ হয়ে থাকে চৈতন্যের বুকে। এই দৃশ্য অর্থের ভেদেই—অর্থাৎ উপাধির ভেদেই জ্ঞানের ভেদ প্রতীত হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানে বা সম্বিতে কোনও ভেদ নেই। সুতরাং বুঝতে হবে প্রকাশতত্ত্বটি জ্ঞানের আসল স্বরূপ—'অর্থপ্রকাশত্ব'-উপাধি সম্পর্কিত স্বরূপ।

দ্বিতীয় বর্গকে জ্ঞানের বা আত্মচৈতন্যের স্বপ্রকাশত্ব-নিরূপণ করা হয়েছে। 'স্বপ্রকাশ' মানে নিজেকে নিজে প্রকাশ করে তা নয়। স্ব এব প্রকাশঃ—নিজেই প্রকাশস্বরূপ। অর্থাৎ একে আর কেউ প্রকাশ করতে পারে না, সব কিছুকে প্রকাশ করেই আত্মচৈতন্য প্রকাশিত। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—চরম বিজ্ঞাতাকে আর কি দিয়ে জানবে? এই উপনিষদ্‌বাক্য থেকেই দার্শনিক সূক্ষ্ম লক্ষণ করলেন—বেদ্য না হয়েও ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য না হয়েও যে অপরোক্ষরূপে ব্যবহারের যোগ্য হয় সেই স্বপ্রকাশ। আত্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হলেও 'ফলচৈতন্য' অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত বা প্রকাশিত হয় না। অবেদ্যত্বের এই অর্থ। অহংরূপে অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যও বটে।

অন্যান্যদর্শনে 'জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব' অর্থ জ্ঞানকে জানবার জন্য আর একটা জ্ঞানের (অনুব্যবসায়ের) আবশ্যকতা নেই। জ্ঞান নিজেই (প্রদীপের ন্যায়) প্রকাশিত হয়—সাক্ষীর নিকট বা আত্মার নিকট। অদ্বৈতবেদান্তেও 'বৃত্তিরূপ জ্ঞান' জ্ঞানান্তর বিনাই সাক্ষী ভাস্য হয়ে থাকে। আত্মচৈতন্যের স্বপ্রকাশতা অর্থ প্রকাশস্বরূপতা।

আত্মচৈতন্য অজ্ঞানের সাধক বা ধারক (অধিষ্ঠান) বলে অজ্ঞানের নাশক হতে পারে না। তাই জ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক। ঘটবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞান হলে তবেই ঘটের অজ্ঞান নষ্ট হয়। চৈতন্যের দ্বারা ঘটাজ্ঞান নষ্ট হয় না। এইজন্য

চৈতন্যের অভিব্যক্তকে অজ্ঞাননাশক অন্তঃকরণ-বৃত্তি স্বীকার করা হয়। অন্তঃকরণ বৃত্তিকেও জ্ঞান বলা হয়। "বৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারাৎ।" 'অজ্ঞানের আবরণভঙ্গের জন্য বৃত্তি', 'সম্বন্ধের জন্য'—অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষীর সম্বন্ধের জন্য বৃত্তি, "বিষয়ের উপরাগের জন্য বৃত্তি"—এরূপ নানাপ্রকার মতবাদ বিদ্যমান বৃত্তির আবশ্যকতা সম্পর্কে। আবার স্মরণ বা স্মৃতির উপপত্তির জন্য সংস্কার এবং সংস্কারের জন্য বৃত্তি স্বীকারের প্রয়োজন। বৃত্তি-ধ্বংস থেকেই সংস্কার জন্মে। গ্রন্থের চতুর্থ বর্ণকে এই অন্তঃকরণবৃত্তি বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম আলোচনা করা হয়েছে। আত্মচৈতন্য নিত্য ও সর্বব্যাপী হলেও কোন পদার্থ জ্ঞাত, আবার অন্য পদার্থ অজ্ঞাত—এর উপপত্তির জন্য অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ বিষয়াকারতা স্বীকার করতে হয়। যা বৃত্তির বিষয় হয় তা-ই জ্ঞাত, না হলে অজ্ঞাত। বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েই অন্তঃকরণের বৃত্তি বা বিষয়াকারতা সম্ভব হয়। তাই প্রাতিভাসিক বিষয়ে—অর্থাৎ ভ্রম বিষয় রজ্জুসর্পাদিতে স্বাপ্ন-পদার্থে এবং যাদের অজ্ঞাত সত্তা নেই এমন সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে অন্তঃকরণ সম্বন্ধ সম্ভব নয় বলে অন্তঃকরণবৃত্তি হতে পারে না। ঐ বিষয়গুলিতে আবরণ না থাকাতে আবরণভঙ্গের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োজনও নেই। তথাপি ঐ সকলের স্মৃতি হয় বলে সংস্কারের জন্য ঐ সকল বিষয়ে অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকৃত হয়। অজ্ঞান, ভ্রম, ভ্রমবিষয়, রজ্জুসর্পাদি স্বাপ্নরথাদি পদার্থ এবং সুখ-দুঃখাদি পদার্থ সাক্ষীতেই অধ্যস্ত বলে তাদের আবরণ থাকে না, অজ্ঞাত সত্তাও থাকে না।

প্রসঙ্গতঃ সাক্ষীর আলোচনা করা হয়েছে। বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্যের মতে ঈশ্বরই সাক্ষী হলেও অধিকাংশের মতে জীবও ঈশ্বর হতে ভিন্ন নির্বিকার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা চৈতন্যই সাক্ষী। এই সাক্ষিত্বও আত্মচৈতন্যের নিরুপাধিক স্বরূপ নয়। কোনও প্রপঞ্চের দ্রষ্টা বলেই সাক্ষী। যেমন দৃক্ স্বরূপচৈতন্য উপাধিযোগে দ্রষ্টা হয়ে থাকে। স্বরূপতঃ আত্মচৈতন্য দৃক্-ই, দ্রষ্টৃ নয়। দৃশ্য-উপাধিযোগে দ্রষ্টৃ।

জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য, বা পরতঃ প্রামাণ্য—এটি দর্শনশাস্ত্রের এক জটিল সমস্যা। এ সমস্যার দুটি দিক। প্রথম, জ্ঞানের যে প্রমাত্ব বা প্রামাণ্য-তা কি জ্ঞানের যে প্রসিদ্ধ কারণসমূহ তা থেকেই জ্ঞানে উৎপন্ন হয়, অথবা তদতিরিক্ত অন্য কোনও কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। ন্যায়াদি মতে পরতঃ অর্থাৎ 'গুণ' নামক অন্য পদার্থ থেকে জ্ঞানে প্রামাণ্য উৎপন্ন হয়। বেদান্তাদি মতে স্বতঃ অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ থেকেই উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, যে জ্ঞানের প্রামাণ্য তার জ্ঞান আমাদের হয় কিরূপে? তা কি জ্ঞান হলেই তার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই প্রামাণ্যের জ্ঞান হয়, অথবা জ্ঞানের পরে জ্ঞানের সফলতা (সংবাদিপ্রবৃত্তি-জনকতা) দ্বারা প্রমাণ্যের অনুমিতি হয়। এস্থলেও ন্যায়াদি মতে পরতঃ-অনুমানাদির দ্বারা প্রামাণ্যগ্রহ হয়। বেদান্তাদি মতে দোষাদির সম্ভাবনা (সংশয়) না থাকলে স্বতঃই জ্ঞানের সঙ্গেই জ্ঞানটি প্রমা বলে বোধ হয়—স্বতঃ প্রামাণ্যগ্রহ হয়ে থাকে।

চরম ষষ্ঠ বর্ণকে চরমবৃত্তির আলোচনা করা হয়েছে। অন্তঃকরণের এই চরমবৃত্তির দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। কেউ কেউ একে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি বলে অভিহিত করেন। এই বৃত্তির দ্বারা প্রমেয় ব্রহ্মগত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে এবং প্রয়োজন নেই বলে ঐ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অন্যান্য জড় বিষয়ের স্থলের ন্যায় ব্রহ্মাত্মবস্তুকে প্রকাশিত করে না, কারণ ব্রহ্মাত্মা নিজেই প্রকাশ। সুতরাং [illegible] ফলে অ[illegible] কার্য চিত্তবৃত্তিও বিনষ্ট হওয়াতে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মাত্মাই হয়ে যায়। তাই উপনিষদ্ বলেন: "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে যায়। এই জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী জীবৎ-কালে জীবন্মুক্ত অবস্থায় থেকে দেহান্তে পরামুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

অধ্যাপিকা মিনতি কর বেদান্তের এসকল দুরূহ বিষয়সমূহ অদ্বৈতবেদান্তের জটিলতম গ্রন্থ ভাষ্য-টীকাদি অনুসারে আলোচনা করে এক সুকঠিন ব্রতে অবতীর্ণ হয়ে অদ্বৈতবেদান্তে গবেষণাকারীদের পথ সুগম করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উদ্বোধন

গ্রামবাসীদের পানীয় জল সরবরাহের জন্য **মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোম** একটি কূপ খনন করেছে। গত ২৭ জুন এটি উৎসর্গ করেন তামিলনাড়ুর আদি দ্রাবিড়কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ ই. রামকৃষ্ণণ।

গত ২৭ জুলাই **কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের** নবনির্মিত অফিস বাড়ির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ যোগদান করেছিলেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র মেঘালয় বোর্ডের এইচ. এস· এল. সি· পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং অপর একজন ছাত্র পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে।

ত্রাণ

অরুণাচলপ্রদেশঃ ইটানগর আশ্রমের মাধ্যমে অরুণাচলপ্রদেশের দুস্থ আদিবাসীদের মধ্যে ৫৯৭টি জামা, ৩২৫টি প্যান্ট, ১০০টি ফতুয়া, ১৩৭টি শাড়ি, ৪৯৭টি মহিলাদের পোশাক, শিশুদের জন্য ২,৯৮৫টি পশমের পোশাক এবং ১,৪২৮টি পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসনঃ মেদিনীপুর জেলার গোবরা ও বসন্তপুর অঞ্চলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ জনসাধারণের জন্য 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কার্যসূচী অনুযায়ী নতুন বাড়ি-ঘর নির্মাণের এবং যেসব বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়া)ঃ গত জুন মাসের রবিবার ও বুধবারসমূহে যথারীতি ধর্মীয় ক্লাসগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ জুন ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষে 'বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ১৭ জুন ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়।

গত ১৭ জুলাই গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে সকালে পূজা ও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যায় ভজন-সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরের বিশিষ্ট শিল্পী এন. কৃষ্ণস্বামী ভজন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গত ৬ মে সোসাইটির শান্তি আশ্রমে বাৎসরিক সাধন-শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠ, পূজা· পাঠ· আলোচনা সভা প্রভৃতি। বার্কলের আশ্রমের স্বামী অপরানন্দ এবং স্যাক্রামেন্টোর স্বামী প্রপন্নানন্দ এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

নতুন শাখাকেন্দ্র

কানাডার টরন্টোতে 'বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো' নামে রামকৃষ্ণ মঠের একটি নতুন শাখাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

পরিদর্শন

গত ৭ জুলাই শ্রীলংকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী ডব্লিউ. জে. এম· লোকুবন্দর **কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন** পরিদর্শন করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ৩০ জুলাই শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব তিথি এবং গত ১৭ ও ৩০ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ।

গত ২৪ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা যথারীতি চলছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ স্মরণ তীর্থ, মূলাজোড়, শ্যামনগর (উত্তর ২৪ পরগনা)ঃ ৯ মার্চ '৮৯ প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম জন্মোৎসব পালিত হয়। অপরাহ্নে মহামায়া ব্যানার্জী ও তৎসম্প্রদায় কর্তৃক লীলাকীর্তন এবং সন্ধ্যায় নবাবগঞ্জ সাধনতীর্থ কর্তৃক 'মাতৃসাধক বামাক্ষ্যাপা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২৯ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবও উদ্‌যাপিত হয়।

বালুরঘাট, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি-তীর্থ (পশ্চিম দিনাজপুর) আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব গত ২১ ও ২২ এপ্রিল ১৯৮৯, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দু-দিন সন্ধ্যায় —শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজনীয়তা আজকের সমাজ-জীবনে কতটা অপরিহার্য—তা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন স্বামী মঙ্গলানন্দ এবং ডঃ তাপস বসু। আলোচনা সভার পর গীতিনাট্য পরিবেশন করেন শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ-এর শিল্পীরা।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের জন্মস্থান **ময়নাপুরে** (জেলা বাঁকুড়া) প্রতিষ্ঠিত **অক্ষয়-স্মৃতি পাঠচক্রের** প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে পাঠচক্রের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে গত ২ এপ্রিল '৮৯ পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা-হোমাদি এবং অপরাহ্নে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের স্বামী সমাত্মানন্দ।

গত ৭ মে '৮৯ **প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের চকপাড়া** (লিলুয়া, হাওড়া) শাখার উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। এদিন শোভাযাত্রা, সমবেত প্রার্থনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ, বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং **শঙ্খধ্বনি** প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে স্বামী সনাতনানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের সভাপতি প্রতুল চৌধুরী। সভান্তে গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অশোকনগর শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গত ১৩ ও ১৪ মে বিশেষ পূজা, হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। উভয় দিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের সভায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অজ্ঞেয়প্রাণা এবং দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দ। ঐদিন চার-পাঁচশ ভক্ত-নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

বোকারো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের নতুন জমিতে গত ১৯ মার্চ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী স্মরণানন্দ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বোকারো স্টীল প্ল্যান্টের প্রবন্ধ নির্দেশক এস. আর. রামকৃষ্ণণ। বারাণসী সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে গত ৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন বাস্তুপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বোকারো স্টীল অথরিটি অব ইন্ডিয়া সঙ্ঘকে জমিটি দান করেছেন।

হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমঃ গত ১ মে শোভাযাত্রা, পূজানুষ্ঠান, পাঠ, ধর্মসভা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাবড়া সমাজ মিলন কেন্দ্রে আশ্রমের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায়

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুরাণানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক নিমাইচন্দ্র রায় ও আশ্রম-সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

চিকিৎসা-শিবির

শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪-পরগনা) গত ২৮ মে এক চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করেছিল। এই শিবিরে মোট ৮৭জন রোগী বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে। অভিজ্ঞ শল্য-চিকিৎসক ডাঃ কমলকৃষ্ণ দাঁ, ই.এন.টি.-বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিলকুমার আঢ্য এবং স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ তুষারকান্তি মিত্র এই সেবাকার্য পরিচালনা করেন। এই আশ্রম কর্তৃক আয়োজিত এটি পঞ্চম চিকিৎসা-শিবির। উল্লেখ্য গত ২৬ ফেব্রুয়ারি '৮৯ ডাঃ দাঁ ও ডাঃ আঢ্যের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত আশ্রমের চতুর্থ চিকিৎসা-শিবিরে মোট ৬৬ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কলকাতার

তিনশো বছর আগে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট ছিল রবিবার। বাংলা ২৩ ভাদ্র, ১০৯৭। হিজরি ২১ জেলকদ, ১১০১। তিথি ছিল সকালে আষাঢ় অমাবস্যা। তারপরে শ্রাবণ শুক্লা প্রতিপদ। সে-দিন ছিল সূর্যগ্রহণ। তবে ভারতে অদৃশ্য। নক্ষত্র ছিল পূর্বফাল্গুনী। রবি ছিল সিংহে। চন্দ্রও সিংহে। মঙ্গল ছিল কন্যায়। বুধ সিংহে। বৃহস্পতি মীনে বক্রী। শুক্র কন্যায়। শনি তুলায় ও রাহু কুম্ভে। কলকাতার অ্যাস্ট্রো-রিসার্চ ব্যুরোর অধিকর্তা অরুণকুমার লাহিড়ী এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মতে এই ঠিকুজি ঠিক করা হয়েছে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী** গত ২২ এপ্রিল '৮৯ (৯ বৈশাখ, ১৩৯৬), শনিবার পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২২ এপ্রিল (৯ বৈশাখ শনিবার ১৩১২ বাং) অধুনা বাংলাদেশস্থ শ্রীহট্ট জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ (ইংরেজী ও বাংলা) ও বার অভিন্ন। আনুমানিক ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহাপুরুষ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি কিছুকাল বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া সাহিত্য প্রতিভাও তাঁর ছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে ৮১ বছর বয়সে 'রামকৃষ্ণায়ণ' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে লেখা তাঁর একটি অপ্রকাশিত কাব্যজীবনীও আছে।

গত ৩০ জুন, '৮৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী **পঞ্চানন রায়** উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত মধ্যমগ্রামের দেবদাসপল্লীস্থ নিজবাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি নড়াইল (অধুনা বাংলাদেশ) কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আইন প্রভৃতি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। নড়াইলের স্বরাজ আশ্রম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খাদি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মধ্যমগ্রামে আসার পর তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সরব ছিলেন। বেলুড় মঠের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। উদ্বোধন কার্যালয়েও কিছুকাল তিনি প্রুফ-রিডিং-এর কাজ করেছেন। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ মার্চ উদ্বোধন কার্যালয়ে আসার পথে তিনি দমদম স্টেশনে এক দুর্ঘটনায় পতিত হন। এর পরেই তিনি অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে তিনি ভারত সরকার-প্রদত্ত সাম্মানিক পেনসনভোগী ছিলেন। গত ১৫ আগস্ট, ১৯৮৯ ভারত সরকার তাঁকে বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে মরণোত্তর তাম্রপত্র দানে সম্মানিত করেছেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

তেল-যুক্ত মাছ হতে উপকার

গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমো এবং জাপানীরা মাছ বেশি খায় এবং তাদের হৃৎপিণ্ডে রক্তজমে যাওয়া অসুখ (myocardial infection) পাশ্চাত্য দেশের লোকের চেয়ে অনেক কম। জাপানে আবার ওকিনাওয়া অঞ্চলে (যেখানকার লোকেদের মাছ খাওয়া জাপানের অন্য অংশের তুলনায় দ্বিগুণ) এই অসুখে মৃত্যু সবচেয়ে কম। নেদারল্যান্ডে একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে লোকেদের মাছ খাওয়ার পরিমাণ যত বেশি ছিল, পরের ২০ বৎসরে হৃৎপিণ্ডের (করোনারি—Coronary) অসুখ তত কম পাওয়া গেছে। এইসব দেখে তেলযুক্ত মাছ (oily fish) খাওয়ার উপকার (শুধু করোনারিতে নয়, অন্যভাবেও) সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল জেগেছে।

মাছের শরীরের তেলে দুরকমের লম্বাশিকলি পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (long-chain polyunsaturated fatty acids) আছে। একটি আইকোস্যাপেন্টিনয়িক (icosapentaenoic) অ্যাসিড ও অন্যটি ডোকোস্যাহেক্সিনয়িক (docosahexaenoic) অ্যাসিড ঠাণ্ডা জলের মাছে, যেমন অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের ম্যাকারেল ও হেরিং-এ এইসব এ্যাসিড সবচেয়ে বেশি আছে। হয়তো এই ফ্যাটি অ্যাডিসগুলির রক্তে চর্বি কমানোর ক্ষমতা থাকার জন্যই করোনারি রক্তনালীর অসুখ বন্ধ করতে পারে। দুটি সমীক্ষায়, ২০-৩০ গ্রাম ঐ ফ্যাটি অ্যাসিড লোককে চার সপ্তাহ খাওয়ানোর পর রক্তে কোলেস্টেরল (cholesterol), নিম্নঘন লাইপোপ্রোটিন (lowdensity lipoproteins) ; এবং ট্রাইগ্লিসারাইডস (tryglycarides) কম পাওয়া গেছে।

শুধু করোনারি রক্তনালীর অসুখ নয়, কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী অসুখ, যেমন রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, সোরিয়াসিস (psoriasis) এবং হাঁপানি—এগুলিও গ্রীনল্যান্ড এস্কিমোদের পাশ্চাত্যদেশের লোকের তুলনায় কম হয়। এই থেকে উপরিউক্ত প্রদাহযুক্ত ও রোগপ্রতিরোধক্ষমতাসম্পর্কীয় (inflammetory and immunological) রোগ দুটিতে ফ্যাটি অ্যাসিড-এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়েছে। খাদ্যে আইকোস্যাপেন্টিনয়িক অ্যাসিড বাড়ানোর ফলে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস ও সোরিয়াসিস-এ ভাল ফল দেখা যাচ্ছে। খাদ্যে দুটি ফ্যাটি অ্যাসিড বাড়ানোতে আথ্রাইটিসে প্রদাহ কমানোর ওষুধও বেশি ব্যবহার করতে হচ্ছে না। সাধারণভাবে না হলেও কোন কোন হাঁপানি রোগী আইকোস্যাপেন্টিনয়িক অ্যাসিড খেয়ে উপকার পাচ্ছেন।

[British Medical Journal, 3 December 1988, pp. 1421—22.]

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ চালু হবার আগে জীবাণুদের অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধক্ষমতা ছিল।

সাধারণতঃ বলা হয়, অনিয়ন্ত্রিত এবং এলোমেলো অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) ব্যবহারের ফলে অনেক জীবাণু এই ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা (antibiotic resistance) লাভ করছে। অ্যান্টিবায়োটিক-এর ব্যবহার চালু হয়েছে চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বরফে জমে যাওয়া অভিযাত্রী (explorer)-দের শরীর থেকে পাওয়া অনেক জীবাণুকে কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতাবিশিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে

পূর্বোক্ত অভিমতের (অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টি-বায়োটিকের ব্যবহারে প্রতিরোধক্ষমতা জন্মে) এই মতের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ জাগছে। কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা হসপিট্যাল-এর কে. কোয়ালিউস্কা-গ্রেচোউস্কা ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের দুজন উত্তরমেরু অভিযাত্রীদের অন্ত্র থেকে যে ক্লস্ট্রিডিয়া (clostridia) জীবাণু বার করেছেন, তাদের সেফক্সিডিন (cefoxidin) ও ক্লিন্ডামাইসিন (clindamycin) অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা পাওয়া গেছে। তাঁরা মনে করেন যে, হয়তো অভিযাত্রীরা এমন কোন জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছিলেন, যারা ঐসব অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে। আবার এও হতে পারে, তাঁরা মনে করেন, জীবাণুরা সীসার সংস্পর্শে এসে এই প্রতিরোধক্ষমতা পেয়েছে। অভিযাত্রীরা টিনে রক্ষিত খাবার খেয়ে থাকতেন যার ফলে তাঁদের দেহে উচ্চ পরিমাণে সীসা পাওয়া গেছে। অ্যালবার্টা ইউনিভার্সিটির ওয়েন বেটি অন্য একটি অভিযানের অভিযাত্রীদের দেহ পরীক্ষা করে মনে করছেন যে, শরীরকোষের একই 'জিন' (gene—বংশগতির নিয়ন্ত্রক উপাদান) সীসা এবং উপরিউক্ত দুটি অ্যান্টি-বায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টি করার জন্য দায়ী।

[New Scientist, 11 February, 1989, p. 34]

কৃশকায়, স্থূলকায় হওয়া ও

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র, যার ডাক্তারি নাম ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus), হলো সেই অসুখ যাতে রক্তে শর্করার (গ্লুকোজ-Glucose) পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। গ্রীক ভাষায় 'মেলিটাস' কথাটির অর্থ মধু। প্রস্রাবে মিষ্টি স্বাদ হওয়ার জন্য এই নামটি এসেছে। মানুষের ডায়াবেটিস প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত টাইপ-১ ও টাইপ-২। টাইপ-১ ডায়াবেটিস হয় যখন রক্তে ইনসুলিন (একটি গ্রন্থিরস-যা প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে নির্গত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে) কম হওয়ার জন্য দেহকোষগুলি রক্তবাহিত শর্করাকে কাজে লাগাতে পারে না ; ফলে শরীরের প্রোটিন, ফ্যাট বা চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট কমে গিয়ে শরীর কৃশ হয়। সাধারণতঃ শরীর-কোষগুলি শর্করাকেই অন্য কিছু হজম করবার জ্বালানি-রূপে ব্যবহার করে। সেইজন্য এই ধরনের রোগীরা খাওয়ার পরে ইনসুলিন ইনজেকশন নেন। এই ডায়াবেটিসকে বলে 'ইনসুলিন-নির্ভরশীল' (Insulin-dependent) ডায়াবেটিস। কিন্তু শতকরা ৭৫ ভাগ ডায়াবেটিস অন্য ধরনের—যাকে বলা হয় টাইপ-২ ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন-অনির্ভরশীল (Non-Insulin-dependent) ডায়াবেটিস। এদের রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন থাকলেও, তাদের দেহকোষগুলি ইনসুলিন-অপ্রতিক্রিয়াশীল (Insulin-insensitive) বা ইনসুলিন-বিরোধী (Insulin-resistant) হওয়ার জন্য রক্ত হতে ইনসুলিন নিতে পারে না ; এর ফলে রক্তের ইনসুলিনের পরিমাণ বেড়ে যায় অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ হয়।

স্থূলকায় মানুষ এবং জন্তুদের রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। অনেক জীববিজ্ঞানী মনে করেন যে, রক্তে ইনসুলিন বেশি থাকলে স্থূলকায় হয় ; কিন্তু চিকিৎসকদের মতে স্থূল-হওয়ার জন্য রক্তে ইনসুলিন বেশি হয়। গবেষণার কাজে জন্তুকে ব্যবহারই হয়তো এই মত-বিভিন্নতার কারণ। স্থূল বা কৃশ হওয়ার সঙ্গে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণের সঙ্গে কি সম্পর্ক—এই নিয়ে সারা পৃথিবীতে বহু গবেষণা চলছে এবং এর জন্য নানাধরনের স্বাভাবিক স্থূলকায় এবং ল্যাবরেটরিতে সৃষ্ট করা স্থূল-কায় জন্তুদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সকলেই একমত যে, রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বেশি হওয়া, মানুষ ও জন্তুর স্থূলতা ও টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। সে যাই হোক এটুকু এখনই বলা যায় যে, এই ধরনের ডায়াবেটিস রোগীর কম পরিমাণ খাওয়া এবং ওজন কমানো উচিত।

[New Scientist, 4 March, 1989, pp 52-55]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

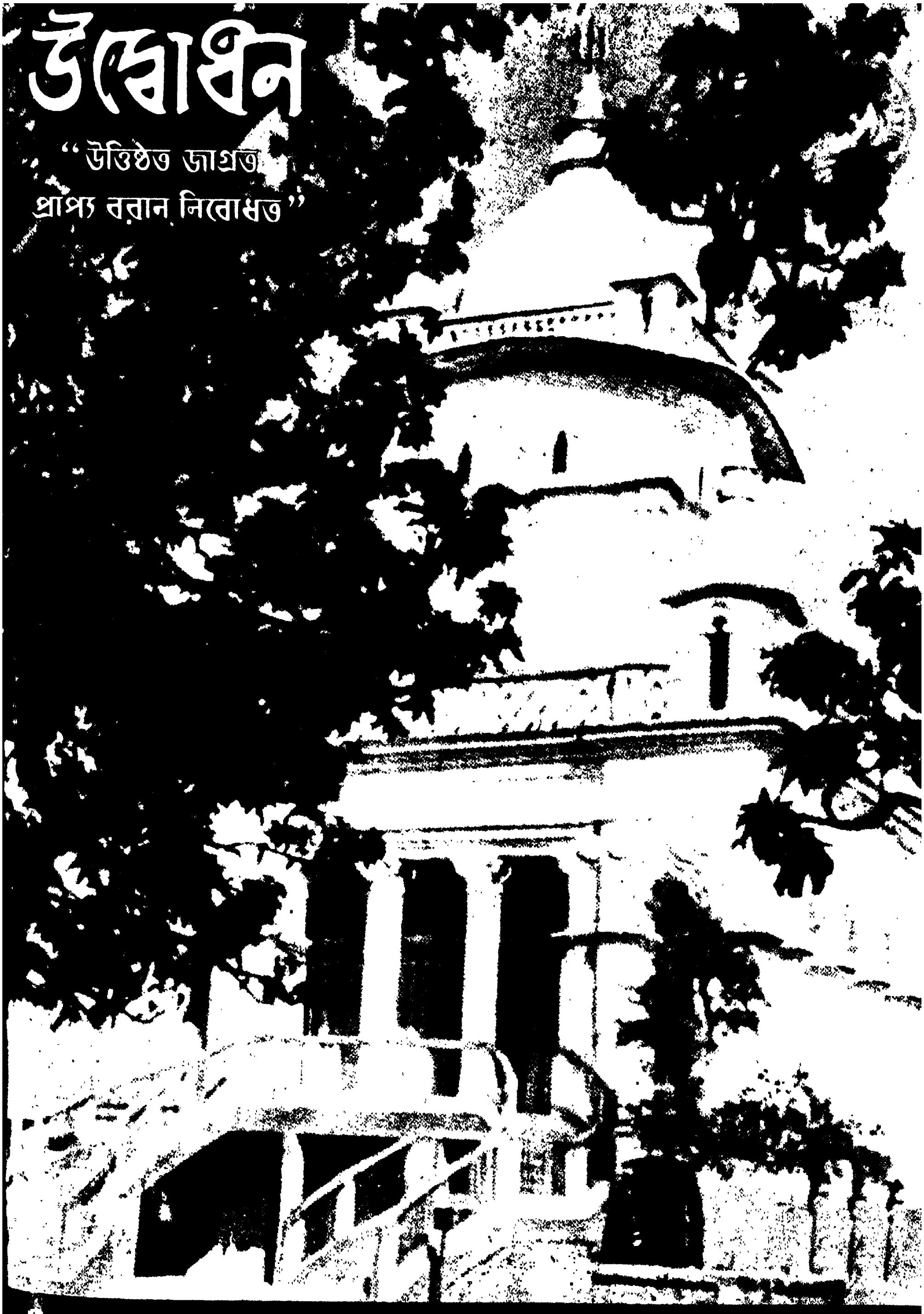

কার্তিক ১৩৯৬ ৯১তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ··· ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।··· এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ—১০ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

জয় তত্ত্বভাবরূপিণি অত্যন্তসূক্ষ্মাদলক্ষ্যানির্লেপে।
নোৎপন্নে তানুৎপাদনি শিবশক্তি পরস্বরূপিণি নমস্তে॥

জয় সকলশত্রুমর্দনি মৃগপতিগমন-প্রিয়েন্দুদীপ্তাঢ্যে।
ত্বং দেবী সমরকালেঽত্যদ্ভুতচেষ্টা তং নমস্তে॥

জয় শত্রুণাভিমুখং দংষ্ট্রাধরমুক্তশস্ত্রহুঙ্কারম্।
রিপুভয়দাভয়দভক্তামৃতমূর্দ্ধান্তির নমস্তে॥

জয় যে ভক্তাঃ শূলিনি প্রতাপমানাভিমানসন্তুষ্টাঃ।
তেষাং দৃষ্ট্যা পুরতো লক্ষ্মীঃ সঞ্চরতি চ নমস্তে॥

অর্থে শূলিনি দুর্গে গৌরি চণ্ডি প্রসীদ মাং দেবি।
অভিবাঞ্ছিতঞ্চ সিধ্যতু মম দেবি তব প্রসাদেন॥

দেবীপুরাণ (৩৬।১২, ১৮, ২১, ২৩, ২৭)

যিনি তত্ত্ব ও ভাবস্বরূপা, অত্যন্ত সূক্ষ্মা বলিয়া অলক্ষ্য, নির্লেপ, উৎপত্তিবিহীন, উৎপাদিকা, শিবশক্তি, পরস্বরূপা, তাঁহাকে নমস্কার।

যিনি সর্বশত্রুবিমর্দিনী, সিংহগমনপ্রিয়া, চন্দ্রপ্রভাশালিনী এবং যুদ্ধকালে যাঁহার অদ্ভুত বিক্রম, তাঁহাকে প্রণাম।

যিনি শত্রুর অভিমুখে দংষ্ট্রা দ্বারাও অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া হুঙ্কারধ্বনিতে শত্রুগণের ভয় ও ভক্তগণের অভয়োৎপাদন করেন, তাঁহাকে প্রণাম।

যিনি ভক্তগণকে প্রতাপ, মান, অভিমানাদি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন এবং যাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই তাহারা লক্ষ্মী লাভ করে, তাঁহাকে প্রণাম।

হে দেবি! হে শূলিনি! গৌরি! চণ্ডি! আমার প্রতি প্রসন্না হউন এবং আপনার প্রসাদে আমার অভিলষিত সমস্তই সিদ্ধ হউক।

কথাপ্রসঙ্গে

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধন-এর পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতা আমাদের সকলের হৃদয়ে সতত শুভবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগ্রত রাখুন এবং তাঁহার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

নামে 'বিজয়া' হইলেও ব্যাপারটি মোটেই সুখদায়ক নহে। বিজয়ার মুহূর্ত যতই আগাইয়া আসে ততই বিজয়জনিত বিনোদ নহে, বিচ্ছেদের বিষাদেই হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া যায়। শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলেরই একই অনুভূতি। এক অব্যক্ত বেদনায় সকলের মন টন্‌টন্‌ করিতে থাকে—যেন দেশসুদ্ধ লোকের বুকটা খালি হইয়া গেল। আমাদের সংসারে ব্যথার ভাগই বেশি, আনন্দের আস্বাদ আমরা কমই পাই। আমাদের সেই ব্যথাদীর্ণ সংসারে আনন্দময়ী আসিয়াছিলেন। মাত্র তিনদিনের জন্য তাঁহার আগমন। কিন্তু এই তিনদিন আমরা যেন অন্য এক ভুবনে অবস্থান করিতেছিলাম। আমাদের সকল দুঃখ, অপ্রাপ্তির বেদনা, প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি, দারিদ্র্যের বিষণ্নতা, ব্যাধির যন্ত্রণা আমরা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শুধু পূজার তিনদিনই নহে, তাহার বহু পূর্ব হইতেই আমাদের প্রাণে আনন্দের মূর্ছনা উঠিতেছিল। বস্তুতঃ সংবৎসর ধরিয়াই অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম এই তিনটি দিনের জন্য। সংবৎসর পরে মা আসিয়াছিলেন প্রতি বৎসরের মতো। কিন্তু প্রতি বৎসরের মতো আবার তিনি চলিয়া গেলেন। শূন্য হৃদয় লইয়া আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে আবার বছর ঘুরিয়া আসিবার জন্য। আবার আমাদের গৃহাঙ্গনে আনন্দময়ীর পদচিহ্ন পড়িবে, আমাদের গৃহগুলি ভরিয়া উঠিবে।

নবমীর দিন হইতেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদের সুরটিও মিশিয়া থাকে। সময় যত আগাইয়া চলে বিষাদের ভাবটি তত প্রকট হইতে থাকে। যখন নবমীর রজনী আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আমাদের বেদনার রূপ কী দাঁড়ায় তাহা মা-মেনকার কণ্ঠ দিয়া কবি উৎসারিত করিয়াছেন ঃ

(ও গো) নবমী নিশি
তুমি আর যেন পোহায়ো না,
তুমি গেলে আমার উমা যাবে,
এ দুঃখীর প্রাণ আর বাঁচবে না।
সপ্তমী অষ্টমীতে আমি ছিলাম মনের সুখেতে,
ওরে নবমী তুই মাথা খেতে
কেন এলি বল না ॥...

অথবা

ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।

*

রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না, ধরি পায়,
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।

*

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া দশমী দিনে,
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিবভবনে ॥

এতো আর্তি নয়, এ আর্তনাদ। একান্ত প্রিয়জনের বিচ্ছেদের বেদনা এইভাবেই মানুষকে অভিভূত করে।

কিন্তু উমা আমাদের একান্ত প্রিয়জন কিভাবে হইলেন? উমা তো দেবতা। হ্যাঁ, দেবতা তো নিশ্চয়ই; কিন্তু উমা যে আমাদের পরমপ্রিয়ও,

আমাদের 'পরাণ-পুতলি', উমা আমাদের প্রাণ। আমরা বিশেষ করিয়া বাঙালীরা, উমাকে যে আমাদের পরিবারের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছি। উমা আমাদের প্রতি পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উমা আমাদের দেবী, উমা আমাদের মাতা, উমা আমাদের কন্যা। রূপ হইতে রূপান্তরে উমা আমাদের কোমলতম অনুভূতিকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। সব রূপেই উমা আমাদের প্রিয়—দেবী হিসাবে, মাতা হিসাবে এবং কন্যা হিসাবে। কবির ভাষায়, "দেবতারে মোরা প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" এটিই আমাদের ঐতিহ্য। তাই উমা দেবী হইয়াও আমাদের ঘরের মা, আমাদের ঘরের মেয়ে। আবার ঘরের মা ও ঘরের মেয়ে হইয়াও উমা দেবী। আমরা কাহাকেও ছাড়িতে চাহি না। উমা আমাদের একে তিন, তিনে এক। তাই তো তাঁহার আগমনে দেশ জুড়িয়া এত আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়। তাই তো শুক্লপক্ষের নবমীর রাত যত গভীর হয় আমাদের হৃদয়-মন জুড়িয়া তত যেন অমাবস্যার অন্ধকার নামিয়া আসে। এই অন্ধকার উমার বিচ্ছেদ-আশঙ্কায়।

অবশেষে নবমীর নিশি অবসান হয়। বড় বেশি তাড়াতাড়িই যেন শেষ হইয়া যায় নবমীর রজনী। দশমীর প্রভাত আসে যথানিয়মে। কিন্তু এ-প্রভাত যেন না আসিলেই ভাল হইত। কিন্তু সত্যকে তো স্বীকার করিতেই হইবে। উমা আজ চলিয়া যাইবেন। বেলা বাড়িতে থাকে। ক্রমে আসে বিদায়ের ক্ষণ। এই মুহূর্তে সমস্ত বয়স্ক পুরুষ যেন গিরিরাজ হইয়া গিয়াছেন, সমস্ত বয়স্কা সন্তানবতী যেন মেনকা, অথবা, সকলেই যেন মাতৃবিচ্ছেদে কাতর সন্তান-সন্ততি—সকলেই যেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। উমার চোখেও বুঝি অশ্রুবিন্দু টলটল করিতেছে। যেখানে দেশসুদ্ধ মানুষ তাঁহার বিচ্ছেদচিন্তায় বিমর্ষ, সেখানে তিনি কেমন করিয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া রাখিবেন!

ঐ বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেন এই বাদ্য? কেন এত আতসবাজির রোশনাই? আনন্দময়ীর বিদায়লগ্নে আকাশ যখন ভারি হইয়া উঠিয়াছে তখন এই বাদ্য, এই আলোর রোশনাই কি বেমানান নহে? প্রশ্ন জাগে। প্রশ্ন তো জাগিবেই। কিন্তু এই 'কেন'-র উত্তর কি? উত্তর আছে। বিদায়ের সময় মা কাঁদিতেছেন, তাঁহার অগণিত সন্তান-সন্ততি কাঁদিতেছে, কাঁদিতেছে তাহারা যাহারা মাকে আপন কন্যা ভাবিয়া আদরের দুলালীর বিচ্ছেদে কাতর। বেদনার এই জমাট বাতাবরণকে লঘু করিবার প্রয়োজন। আমাদের সকলের বেদনাকে ভুলিবার জন্য এবং মাকে তাঁহার বেদনা ভুলাইবার জন্যই এই বাদ্য ও রোশনাই-এর আয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা স্মরণে আসিতেছে। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন (১৬ অক্টোবর ১৯১২) দুর্গাপূজার বোধনের দিন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী মঠে আসিয়াছেন। পূজার কয়দিন তিনি মঠেই আছেন। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হইতেছে। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বিসর্জনের পূর্বে দেবীর সামনে নানা মুখভঙ্গি ও রঙ্গব্যঙ্গ করিতেছেন। উপস্থিত সকলেই ডাক্তার কাঞ্জিলালের ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়া হাসিয়া খুন হইতেছেন। দেবীর সামনে এবং বিসর্জনের বিষাদময় গম্ভীর পরিবেশে এইসব অগভীর রঙ্গরস জনৈক মার্জিত-রুচি ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলিয়া মনে হইল। তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতে শুরু করিলেন। অপর একজন সাধু এসম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলিলেনঃ "না, না, এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।" কালিকাপুরাণেও বলা হইয়াছে (৬০।২১)ঃ "সম্প্রেষণং দশম্যান্তু ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ"—দশমীতে ক্রীড়া-কৌতুকাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবীকে বিসর্জন করিবে।

মায়ের এক নাম আনন্দময়ী। তাই তো তাঁহার আগমনে এত আনন্দ। বিদায়লগ্ন সর্বদাই দুঃখবহ। কিন্তু বিদায়লগ্নেও মা চাহেন আনন্দ যেন তাঁহার সন্তানদের কখনো পরিত্যাগ না করে। যাইবার সময় তাই বুঝি তিনি বলিয়া

গেলেন: 'আমি আছি, আমি তোমাদের ছাড়িয়া যাইব না। এই কয়দিন তোমরা আমার প্রতিমা লইয়া আনন্দ করিয়াছ, আজ হইতে আমার পুনরাগমন পর্যন্ত আমি তোমাদের অন্তরে নিহিত হইয়া রহিব। জীবনে দুঃখ আসিবে, ব্যর্থতা আসিবে, যন্ত্রণা আসিবে। আসুক। তাহাদের আসিতে দাও। তাহারা না আসিলে জীবনের সার্থকতা কোথায়? কিন্তু তোমাদের অন্তরে যে আমি রহিয়াছি, এই বোধ তোমরা কখনো হারাইও না। তাহা হইতেই তোমরা শক্তি পাইবে সাহসের সঙ্গে সকল দুঃখ, সকল ব্যর্থতা ও সকল যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিতে। তাহাদের অতিক্রম করিতে পারিবে কিনা তাহা লইয়া ভাবিও না। উপেক্ষার মধ্যে যে সাহস, যে শৌর্য, যে শক্তি থাকে তাহাতেই থাকে যথার্থ বিজয়ের বীজ। বীরের সার্থকতা বীরত্ব প্রকাশে, বীরের সার্থকতা সংগ্রামে। ভয়ই তো অসুর। তাহাকে যে জয় করে সে-ই তো বিজয়ী। তোমরা ভয়কে বিজয় করিয়া আনন্দে পরস্পরকে বিজয়ালিঙ্গনে বাঁধিয়া লও। আমি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হই।'

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

Sri Ramakrishna Math
P.O. Belur Math
17. 9. 1927

শ্রীমান বলাই,[১]

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। আমরা থাকি বা না থাকি—কারণ দিন-শেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সকলকেই যেতে হবে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জেনো—শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের জন্য চিরকাল থাকবেন। তোমরা তাঁরই সন্তান এবং আশ্রিত, আমরা উপলক্ষ মাত্র। সেজন্য তোমায় বলি—যেখানেই থাক, যাই কর, জানবে ঠাকুরই তোমাদের অতি আপনার জন। সদা সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন করবে, তাঁকে ধরে থাকবে। দুই বেলা নিত্য নিয়মিতভাবে ধ্যানজপ করবে। তাঁর উপর যে নির্ভরশীল তার নাশ নেই। ঠাকুর তার মঙ্গল করবেন। প্রার্থনা করি, ঠাকুরের কৃপায় তোমার বিশ্বাস অচল অটল হোক, তোমার তাঁর উপর ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধিলাভ করুক।...১৯শে আগস্ট শরৎ মহারাজের শরীর যাইবার পর আমার শরীর মন উভয়ই খারাপ যাইতেছে। শীঘ্র বোধহয় বাহিরে কোথাও যাইব। মঠের অন্যান্য সমস্ত কুশল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

তোমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

---

[১] স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞান-মানসিকতা

ধ্রুব মার্জিত

বস্তু-বিজ্ঞানের কোন শাখায় আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ না গ্রহণ করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী ছিলেন এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তিনি দেখেননি ; বরং তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিজ্ঞান ছিল পরস্পরের পরিপূরক। তাই তাঁর জীবন ও বাণীতে তিনি প্রতিভাত করে গেছেন এক অকল্পনীয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমকালীন বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কতটা অধিকারী ছিলেন তা আমাদের আলোচ্য নয়। তিনি কতখানি বৈজ্ঞানিক মানসের অধিকারী ছিলেন, কতখানি বিজ্ঞান-সচেতন তা-ই আমরা দেখার চেষ্টা করব। তাঁর দুশ্চর সাধনায় লয় এবং তাল এক মুহূর্তের জন্যেও কাটতে দেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের বলতেন, গুরুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি। এভাবে যাচাই করে তবে বিশ্বাস করবি। অর্থাৎ আগে পরীক্ষা (experiment) করবে তারপর সিদ্ধান্ত (inference)। বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্তির (reason) যেমন সম্পর্ক, ধর্মের সঙ্গে ঠিক তেমনই সম্পর্ক বিশ্বাসের (faith)। কেবলমাত্র কোন এক বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান মানুষের সমগ্র জীবনকে কখনো সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে পারে না।

বিজ্ঞান এবং ধর্মের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে হয়তো একে অপরকে প্রয়োজন নাও হতে পারে, কিন্তু মানুষের নিজের কল্যাণের জন্য নিজের পূর্ণতার জন্যই এই দুয়ের সমন্বয় অর্থাৎ যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের ঐক্য সাধন করা একান্তই প্রয়োজন। মানুষের লক্ষ্য ঈশ্বরতুল্য হওয়া, কেবলমাত্র বিদ্যাবোঝাই বিদ্যাবাগীশ হওয়া নয়। তাই বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ যুক্তির সঙ্গে জুড়তে হবে সাধনা, সেবা ও প্রেমকে। জগৎকে এই শিক্ষা দেবার জন্যই তাঁর প্রয়োজন ছিল বিজ্ঞানচেতনার। “ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা”—এই সনাতন নীতিবাক্যের নতুন করে ব্যাখ্যা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেনঃ “খালি পেটে ধর্ম হয় না।” আরও বললেন, “মাটির প্রতিমায় ঈশ্বরের পুজো হয়, আর জীবন্ত মানুষে হবে না ?” অর্থাৎ জগৎকে বাদ দিয়ে কিছু নয়। এই মাটির পৃথিবীর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন স্বর্গরাজ্যে তাঁর বাস নয়। এই বস্তু-জগতের কীট-পরমাণুর মধ্যেই তাঁর যদি বাস হয়ে থাকে তাহলে এই বিশ্বজগৎ মিথ্যা হয় কেমন করে ? আর তাই যদি না হয় তবে বস্তুতান্ত্রিক জগৎ আর বস্তু-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর-সন্ধানীর বিরোধ রইল কোথায় ?

যুগোপযোগী ব্যাখ্যা সহ জীবনের একপ্রান্তে আমাদের জন্ম অপর প্রান্তে মৃত্যু। এর মধ্যবর্তী ক্ষণস্থায়ী সময়টুকুতে লব্ধ অভিজ্ঞতাটুকুই হলো মানুষের ইহজীবনের সম্বল। সেই অভিজ্ঞতা আহরণের জন্য দীর্ঘ বারো বছর নিজের জীবন নিয়ে পরীক্ষা করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধনার সময় রাতের পর রাত তিনি ঘুমোননি। গবেষণাগারে নবসৃষ্টির আগ্রহ ও উল্লাসে বিজ্ঞানী যেমনভাবে ছটফট করে রাত জেগে কাটান—এও তো তাই। দীর্ঘ বারো বছরে তিনি বিশ্বের নানান ধর্মের রাজপথে গলিপথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেছেন, বিভিন্ন ধর্মে পৃথক পৃথকভাবে সাধনা করে পৃথক পৃথকভাবে একই চরম সত্যের উপলব্ধি করে সাধনার শেষে বলতে

পেরেছেনঃ "যত মত তত পথ।" মানুষের ইচ্ছা, রুচি, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সাধনার পথও ভিন্ন ভিন্ন, যদিও লক্ষ্য একটাই। এইভাবেই সুনিপুণভাবে সর্বধর্মের একীকরণ করে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানে সবগুলি শক্তিকেও মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন যে একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ত্ব (unified field theory) দ্বারা গ্রথিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা ধর্ম ও বিজ্ঞানের দুটি পৃথক মেরুতে দাঁড়ানো দুই মহান দার্শনিকের একই ধরনের চিন্তার ফসল নয় কি?

একজন বিজ্ঞানী যেমন তার পরীক্ষার ফলাফল প্রতিটি স্তরে স্তরে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ধর্মপথের সাধকদের জন্য সাধনার ধাপে ধাপে উন্নতি ও উপলব্ধির পথ-নির্দেশিকা রেখে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধক তাঁর সাধনার স্তরে স্তরে কি কি অনুভূতি লাভ করবেন তার উপলব্ধি তিনি শুধু নিজেই যে করলেন তাই নয়, অপরকেও জানালেন এবং ভাবীকালের সাধকদের জন্য তাঁর পরীক্ষার ফলাফল রেখে গেলেন। যদিও এতদিন মানুষ জানত কেবলমাত্র জড়শক্তির ক্রিয়াই প্রত্যক্ষগম্য এবং চিৎশক্তি হলো শুধুমাত্র অনুভবগম্য, কিন্তু, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, অধ্যাত্ম সাধনাও যেকোন বস্তু-বিজ্ঞানীর পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার মতোই প্রকাশযোগ্য।

জ্ঞানের সকল বিষয়ই ক্রমশঃ স্থূল হতে সূক্ষ্মে মিলিত হয়। তাই এমনও একটা সময়ও আসে যখন পদার্থবিজ্ঞান (Physics) পরিণত হয় দর্শনশাস্ত্রে (Philosophy)। বিগত কুড়ির দশকে আইনস্টাইন যখন বার্লিনের সভায় আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Theory of Relativity) সম্পর্কে বক্তৃতা করতেন তখন অনেকে চেঁচিয়ে বলত, "ওরে বুড়ো, তোর বস্তাপচা ইহুদি প্রচার বন্ধ কর।" তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাতত্ত্ব অভিনব পদার্থবিজ্ঞান (Physics) ছিল বলেই হয়তো তাদের কাছে বিষয়টি ইহুদিধর্মের তত্ত্বের মতো শোনাত। অর্থাৎ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হলে তা দর্শনের বাতায়ন দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে এমনভাবে প্রবেশ করে যে টেরই পাওয়া যায় না এবং তখন আর দুয়ে কোন ভেদ থাকে না। ঐ স্তরে তখন আর একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে একজন আধ্যাত্মিক প্রবক্তার থাকে না কোন ফারাক। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" অপরা বিদ্যার সমাদরও তিনি করে গেছেন। বলেছেন, "যে একটি বিদ্যাতে নিপুণ তার পক্ষে ঈশ্বরলাভ সহজ।" শিষ্য যোগীন মহারাজকে জাগতিক শিক্ষার পটভূমিকায় বলেছিলেন, "ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে?" অপূর্ব বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

বিষকে দূর করার ব্যাপারে বলেছিলেনঃ "এক উপায়ে জাতিভেদ দূর হতে পারে—তা হলো ভক্তি। ভক্তের কোন জাত নেই।" নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান হয়েও সেযুগে তিনি শূদ্রের ঘরে খেয়েছেন; পৈতার সময় ভিক্ষা নিয়েছেন শূদ্রের কাছ হতে। পরিবারকল্যাণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "দু-একটি সন্তান হলেই স্বামী-স্ত্রী ভগবানে মন রেখে ভাইবোনের মতো সংসারে থাকবে।" বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বের জনবিস্ফোরণের পটভূমিকায় এটি তাঁর এক বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা। এইভাবে গভীর অথচ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জগতের খুঁটিনাটি তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। কুসংস্কারহীন মন, সব বিষয়ে অদম্য কৌতূহল ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এসবই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের পরিচায়ক।

বিবেকানন্দের নান্দনিক ভাবনা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ সর্বক্ষণের সাহিত্যসেবী ছিলেন না। তথাপি তাঁর মননপ্রধান গদ্যরচনা ও চিঠিপত্রের মর্মস্পর্শী ভাষায় চকিত হন না, এমন পাঠক নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়। হয়তো সেই কারণেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতারা যাবতীয় ধর্মীয় সংস্কার দূরে রেখেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান। গদ্যের Infrastructure নিয়ে যেসব গবেষক নিমগ্ন তাঁরা তো বটেই, সাহিত্যের বিষয়সন্ধানী পাঠকেরাও বিবেকানন্দের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে পরম কৌতূহলী। বিবেকানন্দের সাহিত্যভাবনা তাঁর জনমুখী জীবনচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। বিশুদ্ধ ভাববাদী দার্শনিক বিশেষতঃ কান্ট, হেগেল এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের রচনার সঙ্গে নিবিড় পরিচিতি এবং স্বদেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও বিবেকানন্দের দর্শনভাবনা, এমনকি শিল্পদর্শন সম্পর্কে ভাবনা, কোনরকম অসাড় ভাবালুতার চোরাগলিতে পথ হারায়নি। জীবন সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণা ছিল বস্তুনির্ভর। অন্ধপারবশ্য তাঁকে মুহূর্তের জন্যও বিচলিত করেনি। সুতরাং জীবনের ক্ষেত্রে এমন তত্ত্বে তাঁর আকর্ষণ ছিল না, যা শুধু কালের সমর্থনে চিরন্তনতা দাবি করে। প্রথাই—নিত্য সত্য—এমন ধারণা সাধারণের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর নৈয়ায়িক বুদ্ধি ও প্রাতিভ জ্ঞানের সাহায্যে এমন একটি দার্শনিক সিদ্ধান্তে স্থির হয়েছিলেন, যাকে বলা যায় ভাববাদ-নির্ভর কর্মের দর্শন (Philosophy of praxis, based on Idealism)। যে-দর্শন তাঁর মানবজীবনচর্চায় মূর্ত হয়েছিল, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রেও সঙ্গত কারণে সেই দর্শনই সক্রিয়।

যেহেতু বিবেকানন্দ সমস্তক্ষণের সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন না, সুতরাং জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনার Totality-ই সাহিত্যবিচারে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু যদি তিনি প্লেটো-র মতো Monist হতেন, অথবা হেগেলের মতো Dualist বা কান্টের মতো Transcendentalist, তাহলে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের মূল সূত্রসমূহের সন্ধান অপেক্ষাকৃত অনায়াস হতো। বিবেকানন্দ প্লেটো-র মতো শুধুই সংবেদনশীল ছিলেন না, তিনি কারয়িত্রী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর গদ্যেও ক্ষেত্রবিশেষে কবিতার স্পর্শ লেগেছে। ফলে মূলতঃ Logical এবং Prescriptive গদ্যের লেখক হলেও বিবেকানন্দের গদ্যরচনায় সুনিয়ন্ত্রিত Emotion-এর অসদ্ভাব ছিল না। মাতৃভূমি ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং স্বদেশ ছাড়িয়ে বৃহৎ বিশ্বে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের যেখানে যেখানে পদপাত ঘটেছিল সেখানেই অপার বিস্ময়ের স্বর্ণকমল তাঁর শিল্পরসিক মনটিকে অমোঘ আকর্ষণে টেনে রেখেছিল। বিবেকানন্দের আগে বিশ্বনাগরিকত্বের বোধে উদ্দীপিত এমন মানুষ আর কে ছিলেন যিনি একটি দেশকে তার সমাজ-আচার-দর্শন-শিল্পকলা সমেত পূর্ণাঙ্গরূপে দেখেছেন এবং বিচার করেছেন? কালিদাসের কাব্য থেকে বৌদ্ধগ্রন্থ, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' থেকে মধুসূদনের কাব্য, বঙ্কিমের উপন্যাস, গিরিশচন্দ্রের নাটক; শেক্সপীয়র-মিল্টন থেকে কার্লাইল-এমার্সন-স্পেন্সার তাঁর যুবচিত্তকে নিত্যই ভোজ্য সরবরাহ করেছে। কিন্তু এইসব বাহ্য উপাদানের সক্রিয় প্রভাব মেনেও মানতে হয় তাঁর তীব্র অনুভূতিগত স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব এবং সদাজাগ্রত রসসন্ধানী তৃতীয় নয়নের বিস্তার।

যীশুর শেষ নৈশভোজের শত শত চিত্রে একই ভ্রান্তির সন্ধান পেয়েছিল যে-চোখ, সেই চোখই বহুনন্দিত রবিবর্মা-র ছবিকে গ্রহণ করেনি। বস্তুনির্ভর শিল্পের মধ্যে সঙ্গতি ও সম্ভাব্যতা বা Artistic Probability সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

না থাকলে শুধুই দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে কেউ লিখতে পারেন না।

> “ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশি চাল চিত্র-করা পটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!!”[১]

জাপানী আর্ট-এর এবং ছোট ছোট জাপানী কবিতার প্রশংসা করেছিলেন ১৩২৩-এর রবীন্দ্রনাথ। জাপানের ছোট ছোট কবিতার মধ্যে জাপানীদের মনের জঙ্গমতা খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ “জাপানী রূপরাজ্যের সমস্তটা দখল করেছে।” কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে জাপানের প্রশংসা করে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন “ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়।” একটা জাতিকে শুধু আর্টের জন্য বড় ভাবতে তিনিই পারেন, যিনি নিজেও একজন আর্টিস্ট। একটি বিকারহীন আর্টিস্টের মন থাকার জন্যই বিবেকানন্দ আর্টের জগতে পরানুচিকীর্ষাকে বিদ্রূপ করেছেন। ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের’ শেষ দিকে লিখছেনঃ

> “এখনো দূর পাড়াগাঁয়ে পুরানো কাঠের কাজ, ইঁটের কাজ দেখে এস গে। কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না।”[২]

এরপরেই লিখেছেনঃ

“নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছে; অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাক্যি যন্ত্রণামাত্র।”[৩] ‘আর্ট’ মানে সাহিত্য নয়, ছবি নয়, গান ও স্থাপত্য বা ভাস্কর্য নয়; আর্ট মানে একটা জাতির সাংস্কৃতিক জীবন, জাতিকে ভিতর থেকে স্পর্শ করার প্রশস্ততও প্রকৃষ্ট মাধ্যম—বিবেকানন্দ ‘আর্ট’ ব্যাপারটিকে এইভাবেই দেখেছিলেন। ফলে সামান্য আলপনা থেকে বড় বড় স্থাপত্যকর্মের কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। আবার পাশ্চাত্য আর্টেরও তিনি সমান রসিক ছিলেন। এইজন্য পারীর প্রশংসা করেছেন উদারচিত্তেঃ

> “ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী—এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।”[৪]

পারীর সৌন্দর্য-চেতনার সঙ্গে আমাদের পাড়াগাঁয়ের কাঠের মিস্ত্রি-র Aesthetic Sense-এর তুলনা কেইবা করেন? কিন্তু বিবেকানন্দ যখন দুই-এক কথাই সামান্য ব্যবধানে উচ্চারণ করেন, তখন মনে হয়, অতি তুচ্ছ থেকে বৃহৎ Sublime পর্যন্ত সর্বত্রই সৌন্দর্য যে কয়েকটি সূত্রের নিয়মাধীন সেবিষয়ে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সৌন্দর্যের বোধ চিন্ময় এবং স্থানকালাতীত হলেও সুন্দর বস্তুর উপর স্থান এবং কালের দাবি থাকবেই। ইউরোপীয় আর্ট নিন্দনীয় ছিল না তাঁর কাছে, কিন্তু ইউরোপীদের অনুকরণের জন্যই তিনি রবিবর্মা-র সঙ্গে ‘ফর্মা’ কথাটা জুড়ে দিয়েছেন তাচ্ছিল্যভরে। জীবনের কোন ব্যাপারেই Compromise করে চলার দুর্বলতা বিবেকানন্দের ছিল না, আর্টের ব্যাপারেও নয়।

যে-সৌন্দর্যের বোধ বিবেকানন্দকে যৌবনেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ-ভক্ত করে তুলেছিল সেই সৌন্দর্যাসক্তিই তাঁকে ‘বিদ্যাসুন্দর’ থেকে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি আবৃত্তিতে উৎসাহিত করত। ‘আধ্যাত্মিকতা’ শব্দটির গূঢ়ার্থ তাঁর শিল্প ও সাহিত্যভাবনায় নিশ্চয়ই সক্রিয় ছিল, কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা পৌত্তলিকতার নামান্তর নয়। সংস্কারমুক্ত একটি সরস মন বিবেকানন্দকে দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিল। প্রচলিত ধর্মে হোক বা আচারে হোক, নিবিড় আসক্তি

---

[১] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৫

[২] ঐ, পৃঃ ২১৪

[৩] ঐ, পৃঃ ২১৪

[৪] ঐ, পৃঃ ১৯৪

সৌন্দর্যবোধে বিঘ্ন ঘটায়। Aesthetic Sense-এর অধিষ্ঠান যে আসক্তিহীনতায় বিবেকানন্দ তারই অধিকারী ছিলেন, নইলে লিখতে পারতেন না ঃ

> "আসল ইংরেজী শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে।"[৫]

সম্পর্কে যে-দেশের মানুষের একটি রোমান্টিক সংস্কার আছে, সেই দেশের মানুষের কান এহেন উপমা বিদ্ধ করবেই। কিন্তু পরিহাস রসসিক্ত মন অনায়াসে লেখনীর জড়তা ভেঙে দেয়, সংস্কারের দুর্ভেদ্য দেওয়াল পার হয়ে যায় নান্দনিক চেতনার রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার করে। এই চেতনার জন্যই বিবেকানন্দ গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পকলার জড়বাদ সম্পর্কে critical এবং সচেতন মানবসম্পদকে পরিহার করে পৌত্তলিকতা নামক যে ভারতীয় জড়বাদ তারও critic। ১৮৯৪-এর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ

> "এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।"[৬]

এইসব মন্তব্য সেকাল কেন, একালের প্রেক্ষিতেও বিচার করা যেতে পারে। প্রথানুশাসনের কাছে নিঃশেষ আত্মসমর্পণ বিচারমূঢ়তা সৃষ্টি করে। প্যারাডাইস লস্টের মিল্টন ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রথা ভেঙেছিলেন, মেঘনাদবধের মধুসূদনও তাই। এই কাব্যদ্বয়ের বহু বীররসাত্মক পঙ্‌ক্তি বিবেকানন্দের স্মৃতিতে গভীর রেখাপাত করেছিল। মেঘনাদবধের প্রশংসায় তিনি মুখর হয়েছিলেন নানা কারণে। মেঘনাদবধের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের কার্পণ্যের পাশে বিবেকানন্দের ঔদার্য বিস্ময়কর নয় কি? মেঘনাদবধের বীররসাত্মক অংশগুলি যে তিনি সানন্দে আবৃত্তি করতেন তার কারণ অবশ্যই কাব্যরসের সঙ্গে তাঁর পাঠকচিত্তের ভাবৈক্য। সেইতো যথার্থ আত্মসম্বিতের চর্বণা। কাব্যপাঠের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া অথবা আপন উদ্বোধিত চিত্তকে কাব্যের পৃষ্ঠায় সন্ধান করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, 'সহজা প্রতিভা'কে যিনি অনুশীলনের দ্বারা 'উৎপাদ্যা প্রতিভা'য় রূপান্তরিত করতে পারেন। মিল্টনের রসিক ও মেঘনাদবধের সহৃদয়পাঠক বিবেকানন্দ ছিলেন 'সহজা প্রতিভা' ও 'উৎপাদ্যা প্রতিভা'র অধিকারী। এই দুই প্রতিভাশক্তির সমন্বয় ঘটেছিল 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক prescriptive প্রবন্ধে এবং কথ্যভাষাকে আপন ভাব ও ভাবনার প্রকাশমাধ্যমরূপে ব্যবহারের মধ্যে।

বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি[৭] অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক প্রতিবেদনের মতো নীতি-নির্দেশাত্মক, যদিও সূত্রমাত্রে বদ্ধ নয়।. সম্প্রতি এই প্রবন্ধটির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন উদয়কুমার চক্রবর্তী। প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন'-এর ৯১তম বর্ষের মাঘ সংখ্যার অন্তর্গত। বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি আকারে খর্ব। কিন্তু তাঁর প্রতিটি বাক্যই এক-একটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত। যেমন ঃ

১. "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

২. "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?"

৩. "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষা ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।"

৪. "ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাত, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার

---

[৫] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৩

[৬] ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮

[৭] ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫

যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয় দাঁত পড়ে না।"

৫. "কলকেতার ভাষা'ই আদর্শ হওয়া উচিত।"
৬. "ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষা পরে।"
৭. "হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায় ?"
৮. "যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয় ; মরে গেলে মরা ভাষা কয়।" ...ইত্যাদি

'বাঙ্গালা ভাষা' রচনাটি যদি অন্য কোন প্রাবন্ধিক আরও তথ্য ও বিশ্লেষণ সহ ১৯৬৯-তে ভিলা সেরবেলোনির শৈলী-সংক্রান্ত আলোচনা সভায় পাঠ করতেন তাহলেও অপ্রাসঙ্গিক হতো না অথবা হতো না কালানুচিত। ভাষার স্থিতিস্থাপকতা-বৃদ্ধির উপায়, ভাষায় সারল্য আনা, ভাষার মধ্যে ভাব ও ভাবনার প্রতিবিম্বন সন্ধান একালেও আলোচ্য। বিবেকানন্দ যা পেরেছেন, কোন তাত্ত্বিক তা পারেননি। 'সবুজপত্র' প্রকাশ হতে তখনো ঢের দেরি। কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর ভাষা জীবনের কত কাছাকাছি। 'বুড়ো শিব বসে আছেন', 'মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন', 'তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন', 'ময়রার দোকান যমের বাড়ি'... ইত্যাদি অজস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায় যেখানে কথ্যভাষা কলমের মুখে বিস্ময় জাগিয়ে উপস্থিত। অথচ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' -এর শুরুর ভাষা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। প্রথম বাক্যটির আকার কত বড়। চারটে কমা, তিনটে সেমিকোলনের পর পূর্ণচ্ছেদ। সংস্কৃতের সঙ্গে শব্দগুলির যোগ এতই প্রকট যে, পুরো সংস্কৃত হওয়ার জন্যে কয়েকটা অনুস্বার ও বিসর্গের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কলম যত এগিয়েছে ততই জড়তা কেটেছে এবং যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির তামসিকতার প্রতি ঘৃণা রূপ পেতে চলেছে তখন কথ্যভাষার আশ্রয়ে ভাষার বেগ বিস্ময়কর। অনুরূপ বেগ তাঁর চিঠির ভাষাতেও। বিশুদ্ধ মনন দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণের মুহূর্তে ভাষা ধীরে ধীরে উঠে গেছে climax-এ। বাক্যগঠন পদ্ধতিতে সমান্তরালতা দেখেছিলাম বঙ্কিমের 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে। বিবেকানন্দের 'বর্তমান সমস্যা' (ভাববার কথা) প্রবন্ধেও ঐ গঠনরীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে ঃ

> "ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান ; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা ; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ' "[৮]

গোটা একটা অনুচ্ছেদ এই রীতিতে গড়ে উঠেছে। এসব লেখা বাক্য ও বাক্যাংশের গঠনরীতির জন্যই পাঠকালে কম্পন সৃষ্টি হয়। বাক্যগুলি কাটাকাটা ও ছোটছোট। যেখানে তা নয়, সেখানে পরপর দুটি বাক্য এক প্যাটার্ন মেনে ভিতরকার আবেগকে যেন রাশ টেনে সংযত রাখে ঃ

> "কত পর্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধু-হৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসৃত হইয়া — নর-রঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি — ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।"[৯]

এখানে সমাসবদ্ধ সাধুশব্দের ব্যবহার প্রচুর। এভাষা কিছুতেই 'কলকেতার' ভাষা নয়, লেখ্য-ভাষা এবং পণ্ডিতি গদ্যে তা লেখা। তবে বিবেকানন্দের কথাতেই এই ভাষারীতির সমর্থন আছে ঃ 'ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষা পরে।' কন্টেন্ট এবং ফর্মের অভিন্ন-সম্পর্ক বোঝাতে ছোট এই বাক্যদুটির গুরুত্ব অনেকখানি। শুধু তাই নয়, লেখক বিবেকানন্দ নিজের রচনাতেও ভাব ও ভাষার পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন ঘটিয়েছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও প্রমদাদাস মিত্রকে যে ভাষায় চিঠি লেখা হয়েছে

---

[৮] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১

[৯] ঐ, পৃঃ ৩৪

তা অন্তরঙ্গ সংলাপের মতোই। ১৮৯০-এ প্রমদাবাবুর কাছে বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ

> “আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে? আশীর্বাদ করুন, যেন অটল ধৈর্য ও অধ্যবসায় আমার হয়।” ১০

আর ১৮৯৪-এ রামকৃষ্ণানন্দের কাছে লেখা একটা চিঠিতে বিবেকানন্দের ক্ষোভের প্রকাশ একেবারে ঋজু, মেদহীন বলিষ্ঠ ঃ

> “খালি thought-reading (পরের মনের কথা বলতে পারা) আর nonsense (বাজে) আজগুবি! দু-পয়সার brain (মস্তিষ্ক)-গুলো! ঘৃণা হয়ে যায়! তোদের নিজের বুদ্ধি বড় একটা খেলাতে হবে না—সাদা বাঙলা করে যা দিকি।” ১১

সুতরাং চিঠির ভাষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ মানা হয়েছে। একালের শৈলী-বিজ্ঞানীরা যে ‘রেজিস্টার’ শব্দটি ব্যবহার করেন (different kinds of human activities, different kinds of linguistic features are found to be appropriate) তা মনে রেখে বলা যায়, বিবেকানন্দ তিন ধরনের রেজিস্টার ব্যবহার করেছেন—কথ্য, লেখ্য-সাধু, লেখ্য-চলিত। চিঠি পত্রলেখকের মনের কথা ধরে রাখে। প্রবন্ধের ভাষা মূলতঃ Objective. বিষয়প্রধান বা মনন নির্ভর প্রবন্ধে বিবেকানন্দ বর্ণনামূলক বা descriptive এবং নীতি-নির্দেশাত্মক বা prescriptive গদ্য ব্যবহার করেছেন। ‘বর্তমান ভারত’ তথ্যমূলক রচনা, ভাষা প্রধানতঃ descriptive কিন্তু ‘স্বদেশমন্ত্র’ আবেগে কম্পিত। ভাষার তরঙ্গিতরূপ ‘উৎসাহ’ ভাব-জাত বীর রস প্রকাশে সার্থক। এই ভাষার প্রশংসায় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তিনি লিখছেন ঃ

> “এ রচনা একটা দিব্যমুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট-মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ—যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃপ্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।”

আসলে ভাষা যেহেতু এখানে ভাবের বাহক তাই—কোথাও দাঁত বসে যায়নি। হীরেমতির সাজ এখানে আছে বটে তবে বাঁদর এসে রসভঙ্গ ঘটায়নি। এভাষা ‘জ্যান্ত’, তাই ‘জেন্ত-কথা কয়’। আসলে বক্তব্যের Tenor বা অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভাষার Vehicle সম্পর্কে মনস্কতার ফলে যৎসামান্য সন্ধি-সমাসের আশ্রয়ে এই তৎসম শব্দাশ্রিত অংশটি মনে কেটে কেটে বসে যায়। ভাব ও ভাষায় ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে ‘বাঙ্গালা ভাষা’র লেখক যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, আপন রচনাতেও সেই সিদ্ধান্তকে সার্থকতা দিয়েছেন। ‘কলকেতার ভাষা’ তাঁর সমস্ত গদ্য রচনায় নিশ্চয়ই নেই, তবে লেখ্য-সাধুভাষা এবং লেখ্য-চলিতভাষা দুইই তাঁর সামর্থ্যে ইস্পাতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু ‘সাগরবক্ষে’, ‘Kali the Mother’-এর রচয়িতা যেমন সাধারণ অর্থে কবি ছিলেন না, তেমনি গদ্যের ধার নানাভাবে পরীক্ষা করেও সর্বজনগ্রাহ্য গদ্যশিল্পী নন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের উল্লেখ সশ্রদ্ধ হলেও বিবেকানন্দকে ঘিরে সাধারণ পাঠকের যে সংস্কার তার পরিচয়ই আলাদা। কিন্তু এই মানুষটির শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহল ও গভীর প্রজ্ঞা সম্পর্কে যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, তার উপর নির্ভর করে বিবেকানন্দের বিভিন্ন রচনার মধ্যে যে সচল Aesthetic sense সক্রিয় ছিল তার স্বরূপ-সন্ধান আগামী দিনের গবেষকের কর্তব্য হওয়া উচিত।

---

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২৬

১১ ঐ, পৃঃ ৪৫৫

অন্ধকারে আলো জ্বেলে

শেখ সদরউদ্দীন

অন্ধকারে আলো জ্বেলে আলোকময়ী
আয় মা কালী।
ঘরের মনের আঁধার নাশি আলোর প্রদীপ
দে মা জ্বালি॥
শিব-জায়া ভৈরবী তুই, আলো নাচে পায়ের তলে,
অশুভ নাশ করে মা নৃমুণ্ডমালা পরিস গলে।
শুম্ভ আর নিশুম্ভ মরে, তাথৈ তাথৈ দি যে তালি।
অন্ধকারে আলো জ্বেলে আলোকময়ী
আয় মা কালী॥
দুর্গাদেবীর ললাট হতে নবরূপে জন্ম নিলি,
ভগবতীর আরেকটা রূপ ত্রিভুবনে দেখিয়ে দিলি।
কখন মা তুই উগ্রচণ্ডী করালমূর্তি মা-করালী,
কখন মা তোর ভবানীরূপ,
শস্যে ভুবন তুই ভরালি।
মা-শিবানী, জগদ্ধাত্রী, চরণে তোর অর্ঘ্য ঢালি।
অন্ধকারে আলো জ্বেলে আলোকময়ী
আয় মা কালী॥

আমাকে শোধন করে

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়লাখনির কালো মানুষ আমি
কালো পাথরের গৃহে আমার ঘর
সারা শরীরে কালো ময়লা জমেছে
ফুসফুসে কালো স্তর

নীল আকাশ সাবান দিয়ে
আমাকে স্নান করাও
সবুজ সমুদ্রের গামছা দিয়ে
সারা শরীর মুছিয়ে দাও

চেতনার পোশাক পরিয়ে দাও
আমার শরীরে
শুদ্ধ বাতাসে
আমাকে শোধন করে।

বেদুইন

সুধাংশু দাম

পৃথিবীর মরুপথে আমি এক বেদুইন
জনম জনম ধরে ঘুরে মরি রাতদিন।
এখানে দুদিন থাকি, ওখানে দুদিন
আপনারে চিনে নিতে পথ চলা প্রতিদিন।
স্থূলে সূক্ষ্মে যাতায়াত অবিরাম—
ঘাটে ঘাটে ঘুরে ফিরি কতবার কত নাম।
অগণিত বিশ্বে আমি এক বেদুইন
জনম জনম ধরে পথ চলি প্রতিদিন।
যেখানে যখন থাকি হয় কিছু পরিচয়
অথচ তা দুদিনের, বেশিদিন কভু নয়।
এই আছি এই নেই, দেহখানি দিনদিন
সময়ের স্রোতমাঝে ভেসে চলে প্রতিদিন।
কুঁড়ি চায় ফুল হতে, ফুলে তার তৃপ্তি
আমি চাই প্রকাশিতে, আপনার ব্যাপ্তি।
তাই এত আসা যাওয়া, চলি এক বেদুইন
জনম জনম ধরে পথ চলি প্রতিদিন।

ভারত-আত্মজা নিবেদিতা

দিগম্বর দাশগুপ্ত

প্রতীচ্যের সর্বসুখ দিয়ে বিসর্জন
পরাধীন এ ভারতভূমি পরে এসে
আর্তজন সেবাব্রতে আত্মনিবেদন
করেছিলে জানি তুমি গুরুরই নির্দেশে।
শত বাধা বিঘ্ন তুমি হাস্যমুখে সয়ে
অটল অচল চিত্তে গুরুদত্ত ভার
তুলে নিয়েছিলে স্কন্ধে। প্রসন্ন হৃদয়ে
পালন করিতে শুভ কর্ম সেবিকার
দুঃখ-জ্বালা সন্তানের মোচনে নিয়ত
স্নেহময়ী জননীরই মতো তুমি জানি
এক হাতে গ্লানি ভার দূর করে যত
অন্য হাতে কল্যাণের শুভ দীপখানি—
জ্বেলেছিলে। লোকমাতা, নিবেদিতা তুমি,
সত্যিই সার্থক তোমার গুরুদত্ত নাম
ভালবেসেছিলে মনে প্রাণে প্রাচ্যভূমি
ভারত-আত্মজা তুমি তোমাকে প্রণাম।

মাধুকরী

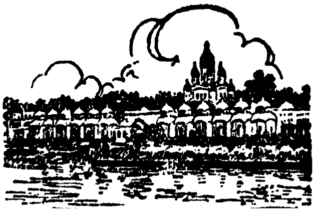

ভগবান রামকৃষ্ণ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

> “যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥”

যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ধর্মরক্ষার জন্য আমি নরাকারে অবতীর্ণ হই।—ইহাই ভগবানের কথা। হিন্দুমাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। কথাটা বুঝিতে হইলে গীতার এই শ্লোকে ব্যবহৃত দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। প্রথম—ধর্মের গ্লানি কাহাকে বলি ; দ্বিতীয়—অধর্মের অভুত্থানই বা কেমন ?

সহজ অবস্থার বিকৃতিকেই গ্লানি বলে। অর্থাৎ, সামঞ্জস্যের নষ্ট হইলেই গ্লানি হয়। তোমার দেহ সুস্থ আছে, অর্থাৎ দেহরক্ষার সকল শক্তি সমানভাবে কাজ করিতেছে। এই সমানভাবের কাজে ব্যাঘাত ঘটিলেই দেহের গ্লানি হয়—রোগ জন্মায়। তেমনই সমাজ-শরীরের যেসকল শক্তি সমাজপুষ্টির পক্ষে সদা নিযুক্ত, সেইসকল শক্তির মধ্যে কোনও একটা শক্তি নির্দিষ্ট কার্য হইতে যদি ব্যাহত হয়, এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহা হইলেই ধর্মের গ্লানি হইল, বুঝিতে হইবে। গ্লানির শব্দার্থ—বিকৃতি, ম্লান, দুঃখ, নিন্দা এবং বিপর্যয়।

ধর্মের গ্লানি হয় দুই উপায়ে। প্রথম—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বা বীরপুরুষের উপদ্রবে ; যেমন হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস ইত্যাদি। দ্বিতীয়—সমাজের অঙ্গবিশেষের মোহে, বিলাসে, দুষ্ট আদর্শে সমাজে ধর্মের গ্লানি হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের বিলাস-উপদ্রবে সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পরশুরাম অবতার হইয়াছিলেন। ধর্মযাজক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অর্থলোভী ও বিলাসী হইয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধদেব অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যখন সমাজের সকল অঙ্গ শিথিল হইবে, সকল শ্রেণী বিগড়াইবে, তখন কল্কি অবতার হইবে।

অধর্মের অভ্যুত্থান, অর্থাৎ দুষ্ট-আদর্শের প্রাবল্য। রাবণ-রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন, সিদ্ধ সাধক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তির দ্বারা কেবল বিলাসের পিপাসা মিটাইয়াছিলেন। তাঁহার উপদ্রবে সতীর সতীত্ব রক্ষা হইত না, সাধক নিশ্চিন্তে সাধনা করিতে পারিত না, সাধক কুলাঙ্গনারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার আদর্শে দেশটা লাম্পট্যে ভরিয়া গিয়াছিল। এই অধর্মের অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করিবার জন্য রামাবতার। রাম সংযতের, বিনয়ের, সমাজ-পক্ষপাতিতার, সামাজিক গুণ-গৌরবরক্ষার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। রাম রাবণের ঠিক antidote. রামের পিতা দশরথ, সেই দশরথের ষোল হাজার নারী—কামপত্নী। সেই রাম একপত্নীক, যথার্থ সংযমী ও সন্ন্যাসী। গৌতম বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পূর্বে ভারতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কেবল কর্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, জ্ঞান ও ভক্তির কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে সংযম সন্ন্যাস একেবারেই ছিল না। ফলে তাঁহারা বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে দুষ্ট-আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য সিদ্ধার্থের উদ্ভব। ক্রমে তিনি রাজ্য, ঐশ্বর্য, যুবতী স্ত্রী, বিলাস-বৈভব সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর এমন আদর্শ দেখাইলেন, যাহার প্রভাবে সমাজের মূল পর্যন্ত টলিয়া উঠিল। ভার্গব পরশুরামও ক্ষত্রিয়দিগের বিলাসতেজকে সংযত করিবার জন্য ব্রহ্মতেজের বিকাশ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস ও সংযমের সঙ্গে ক্ষাত্রবীর্য কেমনভাবে পরিস্ফুট হয়, তাহা ভার্গবের জীবনে বুঝা যায়।

ইংরেজের আমলে যখন আমরা ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করি, তখন দেশের অর্থাভাব খুব হইয়াছিল। অথচ, বিলাসের স্পৃহা কম ছিল না। ইংরেজী শিখিলেই তখন অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই অর্থোপার্জন করা যাইত। ইহার ফলে সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্যের সৃষ্টি হইল। আর ইউরোপের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির দুষ্ট-আদর্শে মুগ্ধ পঙ্কিল বিলাসের স্রোতে আমরা গা-ভাসান দিয়াছিলাম। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় আমলে আমরা সব ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধর্ম, সমাজ, মনুষ্যত্ব সর্বস্বই চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সর্ববিধ্বংসিনী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হইল ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভবে। গঙ্গার তরঙ্গে যেমন ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল—সে বেগ সামলাইতে পারে নাই, তেমন ব্রাহ্মসমাজও ইউরোপের বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া গেল।

“তদাত্মানং সৃজাম্যহম্”

তখন কৃপার সাগর সমাজের দুষ্ট-আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য—দরিদ্রের মান বাড়াইবার জন্য, দরিদ্রকে স্বর্ণসিংহাসন দিবার জন্য, সেবাব্রতকে সকল ব্রতের সার করিবার জন্য, কাঙাল-ফকিরের মধ্যে নারায়ণের অস্তিত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য, ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কর্মের পথ দেখাইবার জন্য—

“রামকৃষ্ণ”

কৃপার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্তমান যুগের ধর্মের গ্লানির সংহরণ ক্ষাত্রবীর্যে সম্ভবপর নহে। তাই তিনি দীনহীন পূজক ব্রাহ্মণের বেশে বাংলার নিত্য শ্যামায়মান পল্লীবাসের শান্ত, স্নিগ্ধ ছায়ার তলে করুণা ও দয়ার, সংযম ও সন্ন্যাসের বিনয় ও বৈরাগ্যের, ঔদার্য ও তিতিক্ষার ঠাকুররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সামঞ্জস্যের পূর্ণাবতার। সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল বিশ্বাসের, সকল আচারের, সকল সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বাঙ্গালায় শান্তিরাজ্য স্থাপনের বনিয়াদ গড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাতে তন্ত্রের ঔদার্য ও বিশ্বপ্রেম ছিল, বৈষ্ণবের মাধুর্য এবং অপরাজেয় দৈন্য ছিল। তিনি তাঁহার বিশাল যুগল বাহুর দ্বারা বিশ্বমানবতার বিরাট পুরুষকে আলিঙ্গণ করিয়া হৃদয়ের ঈশ্বরপদে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তন্ত্রের মহামন্ত্র যে নারীমাত্রেই জগজ্জননীর অংশরূপিণী—এই মন্ত্রে একা তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মা বলিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঘৃণা ছিল না, উপেক্ষা ছিল না, অবহেলা ছিল না—পাপী, তাপী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ম্লেচ্ছ, যবন সকলকেই—সকল মানুষকেই তিনি কোল দিয়াছিলেন। নব বসন্তের শুক্লপক্ষে নবকিশলয় প্রতিবিম্বিত কৌমুদীধারায় আপ্লুত হইয়া শুক্লাম্বর—শুক্লভাবপূর্ণ, শুক্লতেজোময়, শুক্লকর্মময়, শুক্লভক্তিশ্রমও মহাপুরুষ ভগবানের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া যে সুশিক্ষার ও সদুপদেশের মন্দাকিনীধারা ব্রাহ্মণ্যের ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী যদি মানুষ হয়, তবে তাহা পান করিয়া নিশ্চয়ই অমরত্বলাভ করিবে। যাঁহারা ভগবান রামকৃষ্ণের সেবাব্রতের গৈরিক-ধ্বজা উড্ডীন করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন, সমাজকে অপূর্ব আদর্শ দেখাইয়া মুগ্ধ করিতেছেন, ভগবান রামকৃষ্ণের করুণার আশিস কোটি ধারায় তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। তাঁহারা সর্বসিদ্ধির পথে অগ্রসর হউন। *

---

* ‘প্রবাহিণী’, ২২ ফাল্গুন ১৩২০

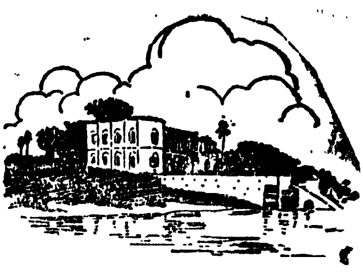

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ শ্রাবণ ১৩৯৬ সংখ্যার পর]

ট্রেন স্টেশনে আসিয়া থামিল; তাহারা সকলে একই স্টেশনে নামিবে। সকলের একই গ্রামে বাড়ি। আমাকেও তাহাদের সঙ্গে নামিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। বলিল, "মা, অপরাধী সন্তানগণের বাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়া যদি পবিত্র কর, তবে নিশ্চয়ই জানিব—তুমি আমাদের মার্জনা করিয়াছ।" আমি বলিলাম, "বাবা. আমি অন্তরের সঙ্গে তোমাদের ক্ষমা করিয়াছি; সন্তানের উপর কি মার রাগ থাকে?" কিন্তু তাহারা কোন মতেই বুঝে না। অবশেষে বলিল, "মা, তুমি রাত্রে একা এই গাড়িতে যাবে, পথে নানা ভয়। বরং রাত্রি কাটাইয়া সকালে তোমার স্নানাহার হইলে, আমরা ট্রেনে তুলিয়া দিয়া যাইব।" আমি বলিলাম, "বাবা, রাত্রে আমার ভয় কি? তোমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'তুমি অসহায়া, তোমার অভিভাবক কে আছে?' এখন দেখ—তোমরাই আমার অভিভাবক হইয়াছ, আমার পাছে কোন অনিষ্ট হয়, সেজন্য ভাবিতেছ। তোমরা স্বচ্ছন্দমনে বাড়ি যাও, আমার অভিভাবক আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমার কোনখানেই কোন ভয় নাই।" আমি যখন কিছুতেই নামিলাম না, তখন তাহারা আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

এই ছেলেগুলির সঙ্গে বহুকাল পরে আর একবার দেখা হইয়াছিল। তখন আমি মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ডের নিকটে থাকিতাম। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ছিলেন, গৃহীও অনেক আসিতেন। ঐ এগারোজনও একত্রে, বোধ হয় আমোদ করিবার উদ্দেশ্যে, সেই সময় একবার মুঙ্গেরে আসিয়াছিল। তাহারা সীতাকুণ্ড দর্শনে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। আমার তাহাদের কথা স্মরণ ছিল না, তাহাদের চিনিতেও পারি নাই। কিন্তু তাহারা প্রত্যহই আসিয়া আমার কাছে বসিয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিত। একদিন কতকগুলি লেখা কাগজ আনিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "মা, ইহাতে এক অপূর্ব সতীর কাহিনী আছে, দয়া করিয়া পড়িয়া দেখিবেন।" কিছুদূর পড়িয়াই আমার রেলগাড়ির কথা স্মরণ হইল; দেখিলাম—সেই ঘটনাটিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ও অতিরঞ্জিত করিয়া উপন্যাসের মতো লেখা হইয়াছে। তখন তাহাদের চিনিতে পারিলাম, এবং কি জানি, তাহারা মুঙ্গেরে হয়তো এইরূপ অতিরঞ্জিতভাবে কত কি বলিয়া বেড়াইবে—তাহাদের পক্ষে সেইরূপভাবে বলিয়া বেড়াইবারই সম্ভাবনা—ভাবিয়া, সেই রাত্রে সীতাকুণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম।

যাহা হউক, স্টেশনে ছেলের দল নামিয়া গেলে, আমি আর বসিতে পারিলাম না; অবসন্নভাবে বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। শরীর এতই অবশ হইয়াছে যে, হাতখানি যে তুলি, এমন ক্ষমতাও আর আমার নাই; পিপাসায় কণ্ঠতালু হইতে বুক পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে, মাথা তুলিবার পর্যন্ত ক্ষমতা নাই, কিন্তু ইহার পরের স্টেশনেই আমাকে নামিতে হইবে, সেই পর্যন্ত আমার টিকিট। পরের স্টেশনে যখন গাড়ি আসিয়া থামিল, তখন বেশ সহজভাবেই উঠিয়া গাড়ি হইতে নামিলাম। স্টেশনটি ছোট, দুটি একটি আলো টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি, স্টেশনে লোকের মধ্যে কেবল স্টেশন মাস্টার ও একটি কুলিকে দেখিতে পাইলাম। যাত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র আমি একা নামিলাম। নামিয়া এই রাত্রে আর কোথায় যাইব, স্টেশনেই এক পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি কাটাইব ভাবিলাম; ভাবিয়া স্টেশনের একপার্শ্বে গিয়া আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিলাম। স্টেশন মাস্টার দুই একবার লণ্ঠন হাতে করিয়া আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একবার আমার কাছে আসিয়া, হাতের লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিয়া আমাকে দেখিলেন, দেখিয়া চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাত্রে স্টেশনেই থাকিবেন?" আমি কোন উত্তর দিলাম না। পিপাসায় আমার গলা এত শুকাইয়া গিয়াছিল যে, উত্তর দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের আশায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন; অবশেষে, কি ভাবিয়া জানি না, আমাকে বলিলেন, "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—আপনার বড় পিপাসা হয়েছে, এই জমাদার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, এ মাজা ঘটিতে জল এনে দিলে আপনি খাবেন কি?" প্রশ্ন শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, অতিকষ্টে উত্তর দিলাম—'হাঁ'। স্টেশন মাস্টার দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে জমাদারকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। জমাদারের হাতে খুব বড় একটা ঘটি, তাহাতে এক ঘটি জল; জল খাইয়া দেখিলাম—জল নহে, অতি সুশীতল সরবৎ।

এ কথা এতদিন পরেও বলিতে গিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। শ্যামসুন্দরের লীলা আমি ভাবিতে গেলে সবই ভুলিয়া যাই, বলিয়া কি বুঝাইব? এ কি অপরূপ লীলা!—সেই রাত্রি, সেই স্টেশন, আর সেই জলের ঘটির কথা ভাবিলে, আমার মনে যে কি তরঙ্গ উথলিয়া উঠে, সে কি বলিয়া বুঝাইতে পারি? এমন একবার নয়, কত শতবার ঠিক এই রকমই হইয়াছে। এক বস্ত্রে পথে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু জীবনে অভাব কাহাকে বলে, জানি না।

মনে করিতে গেলে, কত কথা মনে পড়ে। একবার এলাহাবাদে ওপারে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক সাধু মহারাজ থাকিতেন। আমি ভিক্ষার্থে কোথাও যাই না, অন্নের জন্য কোন চেষ্টা করি না দেখিয়া, একজন দয়ার্দ্র হইয়া প্রতিদিন একটি লোটায় করিয়া ডালে চালে মিশাইয়া চুলায় বসাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আমার সকল দিন সমানভাবে যাইত না। যেদিন উঠিতাম, উঠিয়া চুলায় আগুন দিয়া খিচুড়ী করিয়া লইতাম। যেদিন না উঠিতাম সেদিন চাল ডাল সহিত লোটা চুলায় বসানো থাকিত, চুলা জ্বালা হইত না।—একদিন দশমী, সেদিন আমি আর উঠি নাই, পরদিন প্রাতে স্নানে গিয়া শুনিলাম, আজ একাদশী, শুনিয়া নিশ্চিন্তভাবে আসিয়া যথাস্থানে বসিলাম। তাহার পরদিন প্রাতে দেখি—ভয়ানক ক্ষুধা, উদরে যেন আগুন জ্বলিতেছে। এত সকালে কি খাইব, কোথায়ই বা খাইতে পাইব? ভাবিলাম—গঙ্গায় যাই, স্নান করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল খাইলেই ক্ষুধার শান্তি হইবে। কিন্তু স্নান করিয়া ক্ষুধা আরও বাড়িয়া গেল, অঞ্জলি ভরিয়া যত জল খাই, জঠরানল যেন ততই জ্বলিয়া উঠে—সে যে কি ক্ষুধা, তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। মনে হইল—কিছু না খাইলে আর আমি গঙ্গার গর্ভ হইতে উঠিতে পারিব না। কিন্তু গঙ্গার গর্ভে আহার্য কোথায় পাইব? পানীয়—সুস্বাদু গঙ্গাবারি আছে—যত ইচ্ছা খাইবার বাধা নাই, কিন্তু তাহাতে তো আমার ক্ষুধার শান্তি হয় না। দেখি যে, জলের উপর একটি আমলকী ফল ভাসিতেছে। ফলটি খুব সুপক্ব ও খুব বড়, এত বড় আমলকী ফল আর কখনো দেখি নাই। গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়াই ফলটি নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলাম। ফলে যেন অমৃতের আস্বাদ! আমলকী ফল যে এত রসভরা ও মিষ্ট হয়, আগে তাহা জানিতাম না।

ফল খাইয়া তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িলাম। কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেই ক্ষুধানল জ্বলিয়া উঠিল। কি আর করি, "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ, যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা—" এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখি, পথের ধারে প্রকাণ্ড এক বটগাছ, তাহার আপাদমস্তক লাল লাল ফলে ভরা। এমন সুন্দর লাল লাল ফল, কত পাখি খাইতেছে, আমিও কেন খাই না? এই কথা যেমন মনে হইল, অমনি বটগাছের উপর উঠিলাম। শাখা প্রশাখার জালে আচ্ছন্ন, ঘনপল্লবাবৃত বটগাছে উঠিয়া মনে হইল—কে যেন এই পল্লবদল দিয়া আমার বিশ্রামের জন্য শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে। দুটি একটি বট ফল মুখে দিয়া গাছের ডালের উপর দেহভার রাখিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এত গভীর নিদ্রা যে, কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি, কিছুই মনে নাই। আমার পা ধরিয়া কে যেন ধীরে ধীরে ঝাকাইতেছিল—তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম—গাছের নিচে আমার পূর্ব-পরিচিত একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, সে-ই আমার পা ধরিয়া নাড়া দিতেছিল। এলাহাবাদে একজন ভদ্রলোকের বাড়ি আমি কখনো কখনো যাইতাম, মেয়েটি সেই বাটীর বিধবা বধূ। আমাকে "সন্ন্যাসিনী দিদি" বলিয়া ডাকিত, কিন্তু এত লজ্জাশীলা যে, কখনো মুখ ফুটিয়া আমার সঙ্গে কথা বলিত না। আজ তাহাকে এইভাবে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি বড়ই আশ্চর্য হইলাম। গাছ হইতে নামিয়া বলিলাম, "এ কি ; তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে ?" আমার কথা শুনিয়া সে একটু সলজ্জ হাসি হাসিল।—দেখিলাম—সে এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে, পিঠময় ভিজা চুল, পরিধানে গরদের কাপড়, একহাতে একটি জলের ঘটি, আর এক হাতে গামছা দিয়া বাঁধা একখানি পিতলের রেকাবি ; গাছতলায় রেকাবিখানি নামাইয়া রাখিয়া সে আমার পা ধরিয়া নাড়া দিতেছিল। আমার কথার কিছু উত্তর না দিয়া সে রেকাবি বাঁধা গামছা খুলিল। দেখি যে, ছানা, মুগের ডাল ভিজানো, আখ, সন্দেশ এই সমস্ত রেকাবিতে সাজানো, তাহার উপর তুলসীমঞ্জরী। আমি দেখিয়া হাসিলাম, বলিলাম, "পাগলী, কোথা থেকে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে এখানে এলি, আমি এখানে আছি, তাই বা কি করে জানলি ?"—সে আনন্দপূর্ণ মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, জ্যাঠাইমা গঙ্গাস্নানে এসেছেন —আমিও সেই সঙ্গে এসেছি। চুপি চুপি পুল পার হয়ে তোমার জন্যে ঠাকুরের নৈবেদ্য নিয়ে এপারে তোমাকে খুঁজতে এলুম। এখানে এসেই বটগাছের পাতার ভিতর থেকে তোমার পা ঝুলছে দেখতে পেলুম। ভাগ্যে এখানে এসেছিলাম।" আমি তাহার কথা শুনিয়া অবাক, বলিলাম, "করেছিস কি ? এতক্ষণ সকলে তোকে খুঁজছেন, আর না দেখতে পেয়ে কত ভাবছেন। শাশুড়ির আঁচল না ধরে পথ চলতে পারিস না, এখন একা একা কি করে চলে এলি ? এ কি সাহস তোর ?" সে আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, "কে জানে, কেন আমার মনে হলো যে, এধারে এলেই তোমাকে দেখতে পাব। যদি দেখতে না পেতাম, তাহলে কি কষ্ট হতো, আর ভয়ও খুব হতো। সকালে মা যখন বললেন, "গঙ্গা নাইতে যাব", আমার তখনি তোমার কথা মনে হলো, ভাবলাম—কাল তুমি উপোস করে আছ,—মা এই যে আমার জন্য কত কি গুছিয়ে রেখেছেন, ভোরে উঠে ফল সাজিয়ে ঠাকুরের ভোগ দিয়েছেন—তোমায় কে খেতে দেবে ? একটু সরবতও হয়তো তুমি পাবে না। —তাই ভেবে মাকে বললুম আমিও গঙ্গায় যাব। মনে হলো—নাইতে গেলেই তোমাকে দেখতে পাব। কোথায় তুমি আছ, কি করে তোমার দেখা পাব—এসব কথা মনেই হলো না, মনে মনে জানতুম—নিশ্চয় তোমাকে দেখতে পাব। তাই চুপি চুপি নৈবেদ্যের থালা আর সরবতের ঘটি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, মাকে কিছু বলিনি। পথে মা দেখে বকতে লাগলেন। তখন 'ঘাটে জপ করে জল খাব' বলে তবে তাঁকে শান্ত করেছি। তোমাকে যদি না দেখতে পেতাম, তাহলে কি যে হতো।"*

[ক্রমশঃ]

---

* **উদ্বোধন ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১৯, পৃঃ ৯৭—১০২**

[সংশোধন : গত শ্রাবণ (১৩৯৬) সংখ্যায় 'সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী'র পাদটীকায় (পৃঃ ৪০০) মুদ্রণপ্রমাদে ২য় সংখ্যার স্থলে ১ম সংখ্যা হয়েছে। বর্ষ ও পৃষ্ঠা ঠিক আছে।—সংযুক্ত সম্পাদক]

মনের শক্তিবৃদ্ধির উপায়

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

"মনের শক্তি কিভাবে বাড়ানো যায়?" বহু জায়গাতেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি।

"ধ্যান করলে মনের শক্তি বাড়বে?" "আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কোনও পদ্ধতি আছে?" তরুণ ও মধ্যবয়স্ক নারী-পুরুষ প্রায়ই এই প্রশ্ন করেন। এই লেখায় আমরা কয়েকটি অভ্যাস (practice) সম্বন্ধে আলোচনা করব। ব্যায়াম করে যেমন শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, তেমনি মনের শক্তিও। এই ব্যায়ামগুলি আমরা বিভিন্ন গ্রুপকে শিখিয়ে ভাল ফল পেয়েছি। লক্ষ্য করেছি, এগুলি নিয়মিত অভ্যাস করলে মনের শক্তি তাড়াতাড়ি বাড়ে।

শক্তি কি সত্যিই কম?

আপনি অভিযোগ করছেন, আপনার মনের শক্তি কম। কিন্তু সত্যিই কি তাই? পড়ার বইয়ে আপনি মন দিতে পারেন না, কিন্তু খেলার মাঠে তো তা পারেন! বন্ধুদের নিয়ে নাটকের রিহার্সাল দিতে বললে আপনি দায়িত্ব নিতে ভয় পান না। অথচ নিজের ব্যবসা শুরু করতে বললে আপনি চিন্তায় পড়েন। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি মনের শক্তি খুবই প্রয়োগ করতে পারেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পারেন না। এই তো ব্যাপার? আসল বিষয় হলো, মনে আপনার শক্তি যথেষ্ট আছে। সমস্যাটা হলো—যেসব ক্ষেত্রে এই শক্তি দুর্বল বলে মনে হয়, সেখানে কি করবেন তা জানেন না।

একবার নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকান। লক্ষ্য করুন, বহু ক্ষেত্রেই আপনি সফল হয়েছেন। মনে শক্তি না থাকলে এতবার সফল হলেন কিভাবে?

দুর্বলতার অর্থ

কোন কাজ করতে গিয়ে যদি মনে হয় আপনার মানসিক শক্তি কম, তখন মনকে ভাল করে লক্ষ্য করুন। কি চলছে মনের মধ্যে?

সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ উঠছে মনে। আপনি ভাবছেন—কাজটা তো শুরু করব, কিন্তু পারব কি? কেন এই চিন্তা উঠছে? এর তিনটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি। দ্বিতীয়তঃ অতীতে হয়তো এ-ধরনের কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা আপনাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তৃতীয়তঃ কাল্পনিক ভয়। কোনও এক অজানা ভয় আপনার মনে উঠছে।

আত্মবিশ্বাস

যে-কাজ কঠিন বলে মনে হয়, সে-কাজেই আত্মবিশ্বাসের কমতি দেখা যায়। অথচ এই কঠিন কাজকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। কখনো কখনো সেগুলি হঠাৎ সামনে আসে। যেমন, হঠাৎ কারো হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে; আপনাকে ব্যবস্থা নিতে হবে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার। কিংবা অংক কষতে আপনার ভাল লাগে না, অথচ সামনে অঙ্ক পরীক্ষা। আপনি যদি সবসময় কঠিন কাজকে এড়িয়ে যান, তবে এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আপনি ঘাবড়ে যাবেনই। তার চেয়ে বরং আগে থেকেই কঠিন কাজ মোকাবিলা করার অভ্যাস করলে প্রয়োজনীয় সময়ে তা কাজে লেগে যাবে। কিভাবে এই অভ্যাস করবেন?

অভ্যাস-১

যেসব কাজ আপনার কঠিন বলে মনে হয় তার একটা তালিকা তৈরি করুন। দৈনন্দিন জীবন থেকেই কাজগুলি বাছবেন।

এবার এই তালিকা থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ তিনটিকে বেছে নিন। ধরুন—ঘর পরিষ্কার করা, বারট্রান্ড রাসেলের বই পড়া, অচেনা লোকের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলা, এই তিনটি কাজ আপনি বেছে নিলেন। এর মধ্যে আবার যেটি সহজ বলে মনে হচ্ছে সেটিকে লাল পেন্সিলে দাগ দিন। আধ ঘণ্টা ধরে এই কাজটি করুন এবার। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, করে যান। আপনার শরীর ও মনকে বাধ্য করুন আধ ঘণ্টা ধরে ঐ কাজ করতে। এবার পরীক্ষকের মতো নিজেকে নম্বর

(Marks) দিন ঐ কাজে সাফল্যের ভিত্তিতে। পরের দিন আবার ঐ কাজটি আধ ঘণ্টা ধরে করুন। মার্কস দিন নিজেকে। এভাবে পরপর তিনদিন করুন।

দুটি জিনিস আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ প্রথমদিনে ২০% মার্কস পেলে পরের দিন তা বেড়ে ৩০% এবং তৃতীয়দিনে ৪৫% হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ কাজটি এখন আর আপনার কাছে ততটা কঠিন লাগছে না।

এভাবে কঠিন কাজের তালিকা থেকে এক-একটা বেছে নিয়ে তিনদিন করে অভ্যাস করুন। এক মাসেই আপনি নতুন মানুষ হয়ে যাবেন। কারণ ততদিনে ৯।১০-টি কঠিন কাজ আপনার কাছে সোজা হয়ে এসেছে।

অভ্যাস-২

আপনার মধ্যে কোন্ প্রবৃত্তিটি সবচেয়ে জোরালো? রাগ? লোভ? ঈর্ষা? অহঙ্কার? পরের সমালোচনা করা? নিজের মনের দিকে ভাল করে তাকান। এবারে ঐ পাঁচটির মধ্যে একটিকে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিন। ধরা যাক রাগ-ই (ক্রোধ) আপনার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল। এবারে মনে মনে ঠিক করুন—আজ সারাদিন আমি একবারও রাগব না, বরং হাসিমুখে থাকব। সারাদিনের কাজ করে যান—স্কুলে যাওয়া, অফিসে কাজ করা, বাজার করা, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা, ইত্যাদি—কোন কারণেই রাগবেন না। রেগে যাবার পরিস্থিতি সামনে এলেও মুখে হাসি আনুন। একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করুনঃ যা-ই হোক না কেন আজ কিছুতেই রাগব না; অন্ততঃ আজকের দিনটায় হাসিমুখে থাকব, কাল যা-হোক করা যাবে। একটা দিন এভাবে করে দেখুন না।

রাতে শুতে যাবার আগে কাগজ-পেন্সিল দিয়ে নিজেকে মার্কস দিন। সারাদিনে মনে কতবার রাগ হয়েছিল বা কতবার প্রতিকূল পরিস্থিতির সামনে পড়েছিলেন? রাগকে যতবার জয় করতে পেরেছেন প্রতিবারের জন্য ৬ মার্কস যোগ করুন, যতবার জয় করতে পারেননি ততবার ৫ মার্কস করে বাদ দিন। এবার দেখুন, সব মিলিয়ে কত মার্কস পেলেন। প্রতি সপ্তাহে দুদিন এ-রকম বিভিন্ন প্রবৃত্তি নিয়ে অভ্যাস করুন। দেখবেন এক মাসের মধ্যেই আপনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।

অভ্যাস-৩

এই অভ্যাসটি কিন্তু অত্যন্ত জরুরী। রোজ সকালে ও রাতে প্রতিবার অন্ততঃ দশ মিনিট ধরে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী পড়ুন। এই অভ্যাসটি স্নান-খাওয়ার মতো প্রতিদিন করা চাই। মাত্র দশ মিনিটের তো ব্যাপার। দেখবেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে।

অতীতের ব্যর্থতার জের

ধরুন হঠাৎ আপনার সামনে এমন একটা জরুরী কাজ এসে পড়ল যা আপনাকে চিন্তিত করে তুলেছে। আপনি একটু ভয় পাচ্ছেন, কারণ অনুরূপ এক কাজে বা পরিস্থিতিতে অতীতে আপনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতীতের সেই ব্যর্থতা এবারেও আপনার আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছে। আপনি চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, বুঝতে পারছেন না কি করবেন। মনের শক্তি ফিরে পেতে চাইছেন আপনি। কি করা দরকার? একটা সাধারণ ও নির্দিষ্ট সমস্যার কথাই ধরা যাক। একজন ভদ্রমহিলা দুপুরে একটা টেলিগ্রাম পেলেন যে, তাঁর ননদ স্বামী-সন্তান-দেবরকে নিয়ে আসছেন সাতদিনের জন্য তাঁর বাড়িতে। ছেলে-মেয়ে স্কুলে, স্বামী অফিসে। খবরটি পেয়ে তিনি খুশি হলেন, সেইসঙ্গে চিন্তিতও। গত বছর তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি ও আরও কয়েকজন এসেছিলেন; সে-সময় তাঁদের খুব অসুবিধে হয়েছিল। সেই ঘটনার স্মৃতি তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

কেন অতীতের ব্যর্থতা আমাদের মনের জোর কমিয়ে দেয়? কারণ, অতীতকে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করি না। অতীতের ব্যর্থতাকে ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখতে পাব যে, দুটি কারণে ব্যর্থতা আসে—পরিস্থিতিগত (objective situation) এবং নিজের মানসিক অবস্থা (subjective condition)। উপরোক্ত ক্ষেত্রে এই ভদ্রমহিলার কথাই ধরা যাক। অতীতের ঘটনা বিচার করলে তিনি হয়তো দেখবেন যে, তখন অসুবিধে হয়েছিল, কারণ হয়তো তাঁরা শীতকালে এসেছিলেন এবং বাড়িতে বেশি লেপ-কম্বল ছিল না। কিংবা বাড়িতে কেউ অসুস্থ ছিল যার ফলে তিনি দুদিক সামলাতে পারেননি। এবারে

দেখুন, অতিথিরা আসছেন ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি ঠিক আগের মতো নয়—এবারে গ্রীষ্মকাল এবং বাড়িতে সবাই সুস্থ। ওঁরা আসাতে আপনার উপর যে অতিরিক্ত কাজ পড়বে তা স্বামী-সন্তানের সঙ্গে ভাগ করে নিন। যেসব নতুন চাপ পড়বে সে-সম্বন্ধে আগে থেকেই চিন্তা করুন এবং কিভাবে সমাধান করবেন তা ভাবুন। এবার নিজের মনকে সেইমতো প্রস্তুত (conditioned) করুন। মানুষ ভয় পায় কখন? যখন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থাকে কিংবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে পারে না। অতীতের ব্যর্থতা থেকে কিভাবে শিক্ষা নিলে ভবিষ্যতকে আপনি মোকাবিলা করতে পারবেন?

অভ্যাস-৪

অতীতের কোন ব্যর্থতা নিয়ে চিন্তা করুন ভাল করে। পুরো ঘটনা মনে করার চেষ্টা করুন। তারপর —

(১) ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখুন একটি কাগজে।

(২) ব্যর্থতা বা অসুবিধেগুলি (অতীত ঘটনার) নির্দিষ্ট করে লিখুন ১, ২, ৩, ৪···পয়েন্ট অনুযায়ী।

(৩) প্রতিটি ব্যর্থতার বা অসুবিধের কারণগুলি এক-এক করে লিখুন।

(৪) কিভাবে এগুলির সমাধান করা যেত এ-সম্বন্ধে ভাল করে ভাবুন এবং লিখে ফেলুন।

(৫) ভবিষ্যৎ ঘটনায় কি-কি অসুবিধা আসতে পারে তা লিখুন এক-এক করে এবার।

(৬) প্রতিটির সমস্যা কিভাবে করা যায় তাও লিখুন।

এবার আর কোন সমস্যা নেই। অভ্যাস-১ এবং অভ্যাস-২ আগেই তো করেছেন। এবার মন স্থির করে আগামী কাজের মোকাবিলা করুন।

কাল্পনিক ভয়কে দূর করা

অনর্থক আশঙ্কা বা কাল্পনিক ভয় মনের শক্তিকে কমিয়ে দেয়। ফলে কাজ করতে গিয়ে আপনি অসুবিধে বোধ করেন। এই সমস্যাকে জয় করবেন কিভাবে? প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করুন—আপনার ভয় কতখানি বাস্তব, কতটা কাল্পনিক। মা-বাবা, স্কুল-কলেজ, আত্মীয়-বন্ধু, আপনার নিজস্ব প্রবণতা ইত্যাদি আপনার মনকে বিশেষ রঙ-রূপ দিয়েছে। এর ফলে অনেক সময়ই আপনি অনেক কিছুকেই 'স্বাভাবিক' বলে মনে করেন যদিও বিচার করে দেখেননি এগুলি সত্যিই স্বাভাবিক কিনা। পরিণতি-স্বরূপ আপনার মন সত্য ও কল্পনার পার্থক্য বুঝতে পারে না। কিংবা মনে করেন, একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানে একটিই পথ আছে। মন তখন পরিস্থিতির সামগ্রিক বিশ্লেষণ না করে একটি অংশ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যান্য অংশ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকায় কল্পনা দানা বাঁধে এবং এই কল্পনাই সমস্যাকে ঘনীভূত করে।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরুন আপনি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন। আপনি জানেন না শেষ পর্যন্ত চান্স পাবেন কিনা। এটিই আপনাকে অস্থির করে তুলেছে। এবারে এই ভয়কে ভাল করে লক্ষ্য করুন। মনে কোন আশঙ্কা উঠছে এবং এটি কতখানি যুক্তি-যুক্ত তা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করুন।

আপনার আশঙ্কা	প্রশ্ন করুন
১। যদি চান্স না পাই?	এই 'যদি'র পারসেন্ট কত?
২। ইঞ্জিনীয়ার হতে না পারলে কি করব?	কেন ইঞ্জিনীয়ার হতে চাই? সামাজিক সম্মান ও অর্থের জন্য? আমি পাঁচ বছর পড়ে যত টাকার চাকরি পাব, একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্ডিনারী বি. এসসি. ডিগ্রী নিয়ে তো তত টাকাই পান?
৩। চান্স না পেলে লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়ব।	আপনি কি সব সময়ই সফল হয়েছেন অতীতে? আপনার বন্ধু বা আত্মীয় কোন কাজে ব্যর্থ হলে সবাই কি তাকে ছি-ছি করেছে?

এভাবে আরও অনেক প্রশ্ন করে বিশ্লেষণ করুন।

অভ্যাস-৫

বিপদ এলে মোকাবিলা করব, এই চিন্তার চেয়ে আগে থেকেই নিজেকে তৈরি করা দরকার, কাগজ-পেন্সিল নিন। আগামী মাসে বা বছরে যেসব সমস্যায় পড়তে পারেন এমন একটিকে বেছে নিন।

সমস্যাটিকে সঠিকভাবে গুছিয়ে লিখুন কাগজে। আপনার ভয়গুলিকে এক-এক করে লিখুন। এবারে প্রতিটি ভয় বা আশঙ্কাকে বিশ্লেষণ করুন গভীরে গিয়ে। মোটামুটি তিনটি দিক থেকে এগুলিকে দেখুন। প্রথমতঃ সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে কি? দ্বিতীয়তঃ এটি কতটা যুক্তিযুক্ত? তৃতীয়তঃ আমি কেন সমস্যাকে এভাবে দেখছি?

এবার লিখুন, আপনার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হলে কিভাবে এর মোকাবিলা করবেন। কতরকম পথে আপনি অবস্থাকে সামাল দিতে পারেন, এক-এক করে সেগুলি লিখুন। তারপর দেখুন—সমাধানের উপায় হিসেবে যেসব পথ আপনি নিতে পারেন তার জন্য কি-কি করা দরকার (resource mobilization)।

একটা ডায়েরী বা নোটবুক রাখুন শুধু এই কাজের জন্য। জীবনে যেসব সমস্যা আসতে পারে সেগুলি এক-এক করে বেছে নিয়ে এভাবে লেখার অভ্যাস করুন। সপ্তাহে একদিন এটি করুন। মাঝে-মাঝে ডায়েরীর পাতা উল্টে এগুলি পড়ুন। ছ-মাসের মধ্যেই দেখবেন, যে-কোন বিপদকে মোকাবিলা করার মতো মানসিক শক্তি আপনি লাভ করে ফেলেছেন।

দুঃখ সহ্য করা

দুঃখ এলে বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ কি করে? ডাক্তারদের ভাষায়—Fight or flight—অর্থাৎ লড়াই করে বা পালিয়ে যায়। আরেকটি পথ আছে—সহ্য করা। আপনি কখনো বক্সিং শিখেছেন? এতে একটা প্র্যাকটিস হলো ডামির আঘাত সহ্য করা। দুঃখকে শান্ত মনে গ্রহণ করার অভ্যাস করলে মনের জোর বাড়ে। দুঃখ এলে সব সময়ই প্রতিক্রিয়া (reaction) প্রকাশ করবেন না। মাঝে-মাঝে চেষ্টা করুন, একে গ্রহণ করতে, মনকে শান্ত রাখতে। দেখবেন যে, এতে আপনার সহ্যশক্তি বাড়ছে। সহ্যশক্তি বাড়ার অর্থ মন শক্তিশালী হওয়া। ফলে ভবিষ্যতে প্রতিকূল পরিবেশেও আপনি অস্থির হবেন না, অনিবার্য ঘটনাকে (যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু, কারোর হঠাৎ খারাপ আচরণ করা, কোন সামাজিক বা পারিবারিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি) শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারবেন।

অভ্যাস-৬

আপনার কোন প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা চিন্তা করুন। এই ঘটনা একসময় আপনাকে গভীর আঘাত দিয়েছিল। মনে-মনে সেই চিন্তা গড়ে তুলুন, ঘটনাটিকে নিখুঁতভাবে আবার সাজিয়ে তুলুন। যত খারাপই লাগুক, এটি করুন শান্ত মনে। দেখুন, মন কতখানি শান্ত রেখে আপনি সেই দুঃখজনক স্মৃতিকে সহ্য করতে পারছেন। আপনার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক নেই এমন সহকর্মী বা আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যদি খারাপ আচরণ করেন তবু রাগবেন না। শান্ত মনে তা সহ্য করার চেষ্টা করুন।

এবার ডায়েরীতে লিখুন আপনার সাফল্য কতটা। সপ্তাহে যদি একবার এ-ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হন এবং শান্তভাবে তার মোকাবিলা করেন দেখবেন দুমাস পর আপনার সহ্যক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন নিজের সাফল্য দেখে।

উপসংহার

উপরে যে ছ-টি অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে সেবিষয়ে আমার বিশেষ কোনও কৃতিত্ব নেই। বেদান্তদর্শনের মূল নীতিগুলিকে ভিত্তি করে এগুলি তৈরি করা হয়েছে। নীতিগুলি হলো এরকম। প্রথমতঃ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে। অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তিকে জাগানো যায়। দ্বিতীয়তঃ এই অভ্যাস রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী হলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ মায়ার মধ্যেই ব্রহ্ম লুকিয়ে আছে, অর্থাৎ সমস্যার মধ্যেই সমাধান লুকিয়ে আছে। ফলে সমস্যাকে বিশ্লেষণ করলে সমাধানকে খুঁজে পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ বেদান্ত হলো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় এক দর্শন যাকে বাস্তবে ফলপ্রসূ করে তুলতে হয়।

আধুনিক জগৎ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বেদান্তের কার্যকারিতা দেখানোই ছিল স্বামীজীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদিকে দৃষ্টি রেখে ব্যবহারিক বেদান্তের নতুন-নতুন প্রায়োগিক পরীক্ষা মানুষের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

ধারাবাহিক-প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা

জীবন মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ শ্রাবণ (১৩৯৬) সংখ্যার পর]

মহাভারতের বিরাটপর্বে মৃত কীচকের চিতায় দ্রৌপদীকে নিক্ষেপ করার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তা নেহাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই—অন্য কারণে নয়। শান্তিপর্বে জনৈক কপোতের মৃত্যুতে কপোতীর চিতায় প্রবেশের বিবরণ আছে।[১৫] বলা বাহুল্য, কোন ধর্মীয় কারণ নয়—দুঃখে অভিভূত হয়েই কপোতীর এই দেহত্যাগ।

মহাভারতের এইসব ঘটনার পাশাপাশি আবার এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে বিধবারা চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেননি। শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতী ; পুত্রবধূ অম্বিকা, অম্বালিকা ; পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তী ; অভিমন্যু, ঘটোৎকচ বা দ্রোণের পত্নীরা কেউই সহমৃতা হননি। বসুদেবের চার পত্নী সহমৃতা হলেও যাদবদের হাজার জন বিধবা পত্নী অর্জুনের সঙ্গে হস্তিনাপুরে যান। মহাভারতের স্ত্রী-পর্বে কৌরবপক্ষীয় কয়েক হাজার মৃত বীরকে তাঁদের অস্ত্র, রথ ও বস্ত্রের সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের ঘিরে তাঁদের পত্নীরা বিলাপ-ধ্বনি ও আর্তনাদ করছেন, কিন্তু কোন রমণী সহমরণে যাচ্ছেন না।[১৬]

রামায়ণে সতীদাহের স্পষ্ট কোন উদাহরণ না থাকলেও কয়েকবার এই ঘটনার উল্লেখ আছে। দশরথের মৃত্যুর পর কৌশল্যা সহমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেনঃ “আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গনপূর্বক অনলে প্রবেশ করিব।”[১৭] বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত তাঁকে অগ্নিতে প্রবেশ করতে হয়নি। অশোককাননে বন্দিনী সীতাকে রাবণ রামচন্দ্রের মায়ামুণ্ড দেখালে শোকাভিভূতা সীতা নানা বিলাপের পর রাবণকে বলেনঃ “রাবণ! তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও এবং কল্যাণের কার্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।”[১৮] রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে অতীতে অনুষ্ঠিত একটি সহমরণের ঘটনার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণকন্যা বেদবতী রাবণকে তাঁর মায়ের সহমৃতা হবার ঘটনার উল্লেখ করছেন। বেদবতীর পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, ভগবান বিষ্ণু তাঁর জামাতা হন। এই সংবাদে দৈত্যরাজ শুম্ভ অতি ক্রুদ্ধ হন এবং রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় বেদবতীর পিতাকে হত্যা করেন। এতে শোকাভিভূতা বেদবতীর মাতা তাঁর পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গন করে চিতারোহণ করেন। রাবণ বহুভাবে বেদবতীকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বেদবতী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভগবান বিষ্ণুই তাঁর স্বামী। অতঃপর রাবণ তাঁর ওপর বলপ্রয়োগ করতে চাইলে তিনি জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করেন।[১৯] বলা বাহুল্য, এই ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয় যে, রামায়ণের মূল কাহিনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং এই কাহিনীতে পূর্ববর্তী যুগের কথা বলা হয়েছে। বলা হয় যে, এই কাহিনীটি ইতিহাস নয়—উপকথা এবং পরবর্তী কালে, আনুমানিক ৫00 খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মূল কাহিনীর সঙ্গে এটি যুক্ত হয়েছে, কারণ রামায়ণে দশরথ বা রাবণের কোন পত্নীই সহমরণে যাননি।[২০]

শ্রীমদ্ভাগবতে মনুর বংশধর পৃথুর মৃত্যুর পর

---

[১৫] মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৪৮ অধ্যায়, পৃঃ ১৪৬

[১৬] ঐ, স্ত্রীপর্ব, ২৬–২৭ অধ্যায়, পৃঃ ১৯–২০

[১৭] রামায়ণ, রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশনস (১৯৮৪), অযোধ্যা কাণ্ড, ৬৬ অধ্যায়, পৃঃ ২৭১-২৭২

[১৮] ঐ, লঙ্কাকাণ্ড, ৩২ অধ্যায়, পৃঃ ৭৪২

[১৯] ঐ, পৃঃ ৯৬৭-৯৬৮

[২০] Position of Women in Hindu Civilization—A. S. Altekar, p. 121.

তাঁর পত্নী অর্চিদেবী এবং শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর রুক্মিণী প্রমুখ তাঁর আটজন পত্নীর প্রাণবিসর্জনের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে রুক্মিণী প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ পত্নীর সহমৃতা হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা আগেই বলা হয়েছে।

কাণে[২১], রমেশচন্দ্র মজুমদার[২২], আলটেকর[২৩] প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূচনাপর্বে এই প্রথা ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলা বাহুল্য, এই আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে (১০।১৮।৯) মৃতব্যক্তির হাত থেকে ধনু তুলে আনার কথাই শুধু বলা হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় নারীরাই সহমরণে যাচ্ছেন—অন্যরা নয়। রামায়ণে বেদবতীর মাতার ঘটনা প্রক্ষিপ্ত। সুতরাং সূচনাপর্বে এই প্রথা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (যদিও ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও এই প্রথা সাধারণ নিয়ম ছিল না), এই সিদ্ধান্তটি সঠিক।

বিভিন্ন পুরাণে সতীদাহের বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে এবং 'সতীর' প্রশংসাও আছে। বলা হয়ে থাকে যে, আনুমানিক ৪০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে পুরাণগুলি তাদের বর্তমান রূপ ধারণ করতে থাকে এবং এই সময় থেকেই সতীদাহ সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। মনে রাখা দরকার যে, পুরাণের সতী সম্পর্কিত বেশ কিছু কাহিনী পরবর্তী কালের চিন্তাপ্রসূত এবং পূর্ববর্তী যুগের ধ্যান-ধারণা বিরোধী। মহাভারতে যাদব পত্নীদের সতী হওয়ার কথা নেই, কিন্তু পদ্মপুরাণের উত্তর কাণ্ডে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা সকলেই চিতারোহণ করেছিলেন।[২৪] পদ্মপুরাণের পটল কাণ্ডে বলা হচ্ছে, সতী হওয়া সৌভাগ্য।[২৫] মহাভারতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁর পাঁচজন পত্নী অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেন, কিন্তু ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে বলা হচ্ছে যে, রুক্মিণী প্রমুখ তাঁর আট-পত্নী আগুনে প্রবেশ করেন।[২৬] ভাগবতপুরাণে ধৃতরাষ্ট্রের চিতায় গান্ধারীর প্রাণত্যাগ, ব্রহ্মপুরাণে ঋষি দধীচির মৃত্যুতে তাঁর পত্নী লোপামুদ্রা[২৭] এবং বিদর্ভ-রাজ সুধর্মার মৃত্যুতে তাঁর পত্নী সুশীলা[২৮] বামনপুরাণে সবনের মৃত্যুতে পত্নী সুবেদা[২৯] এবং নিষধরাজ্যের অধিপতি জ্যোতিষ্মান ও তাঁর পত্নী সুশ্রোণীর[৩০] চিতারোহণের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অন্যান্য পুরাণগুলিতেও এ ধরনের বেশ কিছু কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। মনে হয়, আনুমানিক ৪০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই প্রথা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বিষ্ণুস্মৃতি-তেই (আনুমানিক ১০০ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম বলা হয় যে, এই প্রথার কোন অযৌক্তিকতা নেই, কারণ কর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই প্রথার মাধ্যমেই একজন বিধবা—অন্য আত্মীয় নয়, মৃত্যুবরণ করে মৃতের কাছে যেতে পারে। এই প্রথা কিন্তু তখনো ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং স্মৃতিকার বিষ্ণু নিজেও বিধবার জন্য চিতারোহণ নির্ধারণ করেননি। তিনি একজন প্রাচীনতম স্মৃতিকার যিনি মনে করেন যে, বিধবা নারী স্বামীর উত্তরাধিকারিণী। তিনি বিধবাকে পুনর্বিবাহের অনুমতিও দিয়েছেন।

৪০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন সাহিত্যেও সতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন 'কামসূত্রে' উল্লেখ করেছেন নর্তকীরা কিভাবে সহমৃতা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নায়কের মন জয় করবে। " 'আমি নায়কের অনুগমন করিব, তুমি কেন আমাকে ধরিয়া রাখিবে?' —এই কথা বলিয়া মাতার সহিত কৃত্রিম কলহ করিবে।" অথবা " 'যে

---

[২১] History of the Dharmasastra—P. V. Kane, Vol. II, Part I, p. 625.

[২২] The Vedic Age—R. C. Majumdar (1957), p. 390.

[২৩] Position of Women in Hindu Civilization, p. 128.

[২৪] পদ্মপুরাণ, উত্তরকাণ্ড, ২৭৯ অধ্যায়

[২৫] ঐ, পটলকাণ্ড

[২৬] বিষ্ণুপুরাণ, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ২৯৫

[২৭] ব্রহ্মপুরাণ, পৃঃ ১৯৭

[২৮] ঐ, পৃঃ ৩৬০

[২৯] বামনপুরাণ, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ১৭৮-১৭৯

[৩০] ঐ, পৃঃ ১৮০

আমাকে এত ভালবাসে, যে এত শক্ত সে মরিলে আমি কিছুতেই বাঁচিতে পারি না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে মরিব’—এই কথা বলিবে।”[৩১] ভাসের ‘দূত ঘটোৎকচ’ ও ‘উরুভঙ্গ’ নাটকে মহাভারতের কাহিনীর বিরোধিতা করে অভিমন্যু, জয়দ্রথ ও দুর্যোধনের মৃত্যুতে যথাক্রমে উত্তরা, দুঃশলা ও পৌরবী-র সহমরণের কথা বলা হয়েছে। শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিক’ নাটকে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার আগেই চারুদত্তের পত্নী ধূতাকে চিতারোহণের উদ্যোগ করতে দেখা যায় (১০ম অঙ্ক)। দণ্ডীর ‘দশকুমারচরিত’ নাটকে সহমরণের কথা আছে। সেখানে বলা হচ্ছে—“ভাল হোক বা মন্দ হোক, নারীর ধর্ম স্বামীকেই অনুসরণ করা। অতএব এঁর সঙ্গেই আমি চিতা-আরোহণ করব।” (৪র্থ উচ্ছ্বাস)। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহাভারতের স্ত্রী-পর্বে কয়েক হাজার বীরকে তাঁদের রথ, অস্ত্র ও বস্ত্রের সঙ্গে চিতায় তুলে দেওয়া হলেও, তাদের পত্নীরা সতী হচ্ছেন না, কিন্তু ভট্টনারায়ণের ‘বেণীসংহারম্’ নাটকে কৌরব যোদ্ধাদের পত্নীদের সতী হওয়ার কথা আছে। সুন্দরক বলছেঃ “বীরমাতা যুদ্ধে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে সহমরণে প্রস্তুত রক্তবস্ত্রপরিহিতা পুত্রবধূসহ প্রাণত্যাগে উদ্যত (৪র্থ অঙ্ক)।” এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে দুর্যোধনের বন্ধু রাক্ষসের মারফৎ ভীম ও অর্জুনের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ পেয়ে দ্রৌপদীকে চিতারোহণের উদ্যোগ করতে দেখা যায়। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলছেনঃ “আমি তাঁদের অনুগমন করব। মহারাজ! আমার চিতা জ্বালুন, আর আপনিও ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে প্রিয়তমের নাশকের দিকে অগ্রসর হন!” মাঘের ‘শিশুপালবধ’ নাটকে সহমরণের কথা আছে (১৫।৯৩; ১৮।৬০-৬১)। সেখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সহমৃতা না হলে পরজন্মে ঐ পতি পাওয়া যায় না (৯।১৩)। বাণভট্টের ‘কাদম্বরী’-তে চন্দ্রাপীড়ের প্রাণহীন দেহ দেখার পর কাদম্বরীকে বলতে শোনা যায়ঃ “স্বর্গে চলেছেন আমার প্রিয়তম, কেঁদে অমঙ্গল করব কি রে? আজ তো আমার আনন্দের দিন। ওঁর পায়ের ধুলো হয়ে চলে যাব ওঁর সঙ্গে সঙ্গে। চিতা সাজিয়ে দে রে মদলেখা। ওঁর জন্য পুড়ে-পুড়ে শরীরের যেটুকু বাকি আছে, ওঁর কণ্ঠলগ্না হয়ে সেটুকু আগুনে জুড়িয়ে দি (উত্তরভাগ)।” শ্রীহর্ষের ‘প্রিয়দর্শিকা’ নাটকে বিন্ধকেতুর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদের সহমরণের কথা আছে (১।১১)। নারায়ণের ‘হিতোপদেশ’-এ সতীর পক্ষে বক্তব্য রাখা হয়েছে (বিগ্রহ, কথা-ছয়, ২৮-৩০)। তিনি তাঁর ‘নৈষধীয়চরিত’-এ বলছেনঃ “দাহের কারণে তাপের পীড়া বেশি হয় না, তবে বিরহের কারণে বেশি হবেই। তা যদি না হয়, তবে মেয়েরা মৃত স্বামীর সেবা করতে সানন্দে তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে প্রবেশ করেন কেন?” (৪।৪৬)। বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’-এ থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের পত্নী ও হর্ষবর্ধনের মাতা যশোমতীর সতী হওয়ার বিবরণ আছে। স্বামীর আরোগ্যলাভ অসম্ভব জেনে স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি চিতারোহণ করেন (৫ম উচ্ছ্বাস)। বলা বাহুল্য, এই ঘটনাটিকে সতী-র প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায় না, কারণ স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন। রাত্রির রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বাণভট্ট লিখছেনঃ “কালো অগুরুকাঠ দিয়ে রচিত চিতার মতো কেউ যেন কৃষ্ণ অগুরু বৃক্ষের কাঠ দিয়ে রাত্রিটা রচনা করেছে। সুন্দরী কুমুদলক্ষ্মীরা নির্মল পত্ররূপী গজদন্তপত্র ও বীজ কোষরূপী কর্ণালঙ্কারে এবং পরাগের শিরোমালায় প্রসাধন করে সতী নারীদের মতোই মৃতপতির অনুসরণ করার জন্যেই হাসতে হাসতে প্রস্তুত হয়েছে (৫ম উচ্ছ্বাস)।” জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহির সহমরণগামী নারীর সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন।

ভারতীয়দের মধ্যে সতীদাহের প্রাচীনতম ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনায়। ডাইওডোরাস সিকুলাসের (Diodorus Siculus) রচনা থেকে জানা যায় যে, গ্রীক ইউ-

---

[৩১] বাৎস্যায়নের কামসূত্র, ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন (১৯৮৬), পৃঃ ২০৪-২০৫

মেনেসের সেনাবাহিনীতে কেতু ছিলেন ভারতীয় সেনাদলের অধিনায়ক। খ্রীস্টপূর্ব ৩১৬ অব্দে ইরাণের মাটিতে এন্টিগোনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তিনি মারা গেলে তাঁর দুই পত্নী সহমরণে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কে সহমরণে যাবেন এই নিয়ে দুই পত্নীর মধ্যে বিরোধ শুরু হলো। জ্যেষ্ঠা পত্নী অন্তঃস্বত্ত্বা থাকায় গ্রীক সেনাপতিরা তাঁকে সহমরণে যেতে দিল না—কনিষ্ঠা অনুমতি পেলেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী কাঁদতে কাঁদতে দু-হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলে গেলেন, যেন কোন দুর্ঘটনার সংবাদ তাঁকে দেওয়া হয়েছে। অপর পত্নীকে তাঁর নারী-সঙ্গীরা বিয়ের কনের মতো সাজিয়ে-গুজিয়ে তাঁর গুণকীর্তন করতে করতে চিতার দিকে নিয়ে গেল। চিতার কাছে এসেই তিনি গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে তাঁর আত্মীয় ও সখীদের সেগুলো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দান করে দিলেন। তাঁর অলঙ্কারের মধ্যে আঙ্গুলে ছিল বহু মূল্যবান নানা রঙের পাথর বসানো আংটি, মাথায় ছিল নানা ধরনের পাথর দিয়ে তৈরি তারার মতো অলঙ্কার, গলায় ছিল অনেকগুলি হার। অবশেষে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর ভাইয়ের সাহায্যে চিতায় উঠে স্বামীর পাশে শয়ন করলেন। চিতায় আগুন দেবার আগেই সমস্ত সেনাবাহিনী সামরিক কায়দায় চিতার চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। দর্শকদের মধ্যে কারো চোখে ছিল জল, আবার কারো মুখে ছিল সতীর প্রশংসা।[৩২] আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে তাঁর অন্যতম সঙ্গী অ্যারিস্টোবুলাস বলেন যে, তিনি লোকমুখে শুনেছেন, ভারতের কিছু উপজাতীয় বিধবা নারীরা আনন্দের সঙ্গে স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতেন এবং যাঁরা যেতেন না তাঁরা সমাজের নিন্দার পাত্রী হতেন।[৩৩] স্ট্রাবোর রচনা থেকে জানা যায়, আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে পূর্ব-পাঞ্জাবে বসবাসকারী কঠ জাতির মানুষদের মধ্যে সতীদাহ প্রচলিত ছিল।[৩৪] ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথের মতে, সতী মূলতঃ একটি সিথিয়ান প্রথা যা মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতে এসেছে। গ্রীকরা খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তক্ষশীলায় এই প্রথা প্রত্যক্ষ করেছিল, কারণ সিথিয়ানরা সেদিন ছিল তক্ষশীলার অন্যতম সম্প্রদায়। সিসেরো বলছেন, ভারতে স্বামী মারা গেলে পত্নীদের মধ্যে কে প্রিয়তমা তা প্রমাণ করার জন্য পত্নীরা বিবাদে লিপ্ত হন। বিজয়িনী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সহমরণে যান এবং অন্য স্ত্রীরা দুঃখসাগরে ভাসেন।[৩৫] গ্রীক কবি প্রোপার্সিয়াস, ভেলেরিয়াস ন, সলিনাস, স্টবিয়াস ও সার্ভিয়াস স্বামীর মৃত্যুর পর ভারতীয় নারীদের সতী হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিজয়িনীর উল্লাস ও হাসিমুখে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণে তাদের সাহস ধৈর্য ও নিষ্ঠা এবং পরাজিতের বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৬] সিসিরো-র 'টাসকিউলিয়ান ডিসপিউটেশন' ও প্লুটার্কের 'নীতিমালা' গ্রন্থেও সতীর উল্লেখ আছে।[৩৭]

সতীদাহ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রাচীন শিলালিপিও পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে প্রাচীনতম শিলালিপি হলো ৫১০ খ্রীস্টাব্দে খোদিত গুপ্ত-সম্রাট ভানু গুপ্তের এরাণ শিলালিপি। এই শিলালিপি থেকে জানা যায়, ৫১০ খ্রীস্টাব্দে হূনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামন্তরাজা গোপরাজ মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর পত্নী সহ-

---

[৩২] Classical Accounts of India—Dr. R. C. Majumdar (1960), p. 240-241.

[৩৩] Ibid., p 276.

[৩৪] History of the Dharmasastra, Vol. II, Part I, p. 626 ; Oxford History of India—V. A. Smith, (1967), p. 86.

[৩৫] Testimonies of the Ancients Regarding the Sutee Custom, the Asiatic Journal, May (1827) p. 621-622.

[৩৬] Ibid.

[৩৭] সতীদাহ—গোরাচাঁদ মিত্র (১৩৮৪), পৃঃ ১৮

মরণে যান।[৩৮] এই লিপিতে গোপরাজ ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর মূর্তি খোদাই করা আছে। ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মাতা যশোমতীর সতী হওয়ার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ৭০৫ খ্রীস্টাব্দের নেপাল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীররাজ ধর্মদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী রাজ্যবতী সহমরণে যেতে উদ্যত হলে তাঁর পুত্র মানদেব তাঁকে নিবৃত্ত করেন।

৭০০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে হিন্দু স্মৃতিকারগণ অনেকেই সতীর পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখতে থাকেন এবং তাঁদের সকলের বক্তব্য একই ধরনের। বলা বাহুল্য সতী বা সহমরণের পক্ষে তাঁদের বক্তব্য হাস্যকর। শঙ্খ বলেন, স্ত্রী সহমৃতা হলে স্বামীর দেহে যত রোম আছে তত বছর সে স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বর্গবাস করবে। হারীত বলেন, সহমরণে গিয়ে একজন নারী তার মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলকে পবিত্র করে। প্রবলতম পাপ সত্ত্বেও তার স্বামী উদ্ধার পায় এবং তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সাড়ে তিন কোটি বছর সুখে স্বর্গে বাস করে। পরাশর-ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য পালন করলে বিধবা নারী মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করে। এর ঠিক পরেই আবার বলা হয়েছে, মানুষের দেহে সাড়ে তিন কোটি রোম আছে। যে-নারী স্বামীর মৃত্যুর পর সহগমনে যায় সে সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গে বাস করবে। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পরাশর সহমরণেরই পক্ষপাতী। বলা হচ্ছে যে, সাপুড়ে যেমন জোর করে সাপকে গর্ত থেকে টেনে বের করে আনে, ঠিক সে রকমই সতী তার স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করে এবং তার সঙ্গে সাড়ে তিন কোটি বছর সুখে স্বর্গবাস করে। স্ত্রী যদি অসতী হয় বা স্ত্রীর চিতারোহণ যদি স্বেচ্ছায় না হয়, তাহলেও স্বর্গে স্বামী-স্ত্রীর স্থায়ী আসন মিলবে। অঙ্গিরা বলেন, ধর্মে বিধবাদের জন্য একমাত্র বিধান হলো সতী হওয়া। পতির মৃত্যুতে যে নারী অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয় সে স্বর্গে অরুন্ধতীর সমান মহীয়সী হয়। মানুষের দেহে সাড়ে তিন কোটি রোম আছে। সহগমনকারী নারী শরীরের রোমরাজির সমসংখ্যক সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গলোকে স্বামীর সঙ্গে আনন্দে বসবাস করে। সাপুড়ে গর্ত থেকে যেমন বলপূর্বক সাপকে টেনে বের করে, সহগমনকারী নারীও ঠিক সেভাবে স্বামীকে নরক থেকে টেনে এনে স্বর্গসুখ উপভোগ করে। পতির অনুগমন করলে পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল পবিত্র হয়। এই ধরনের নারীরা চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বের সমান কাল পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বর্গে বসবাস করে। ব্রাহ্মণ, উপকারী ও বন্ধু-হত্যাকারী স্বামীকে সহমৃতা পত্নীরাই পাপমুক্ত করতে পারে। সহমৃতা না হলে নারী পরবর্তী কালে কখনই নারীজন্ম থেকে মুক্তি পায় না। দক্ষসংহিতায় বলা হচ্ছে, সহমরণগামী নারী স্বর্গে পূজিতা হয়। সাপুড়ে যেমন সাপকে সবলে গর্ত থেকে টেনে বের করে, তেমনি সহমরণগামী স্ত্রীলোক স্বামীকে মাতৃকুল নরক থেকে টেনে বের করে। সহমৃতা নারী পিতৃকুল ও স্বামীকুলকে পবিত্র করে। ব্রহ্মপুরাণে বলা হচ্ছেঃ "সমস্ত অবস্থায় স্বামীর অনুগমন করাই স্ত্রীজাতির ধর্ম। বেদে এবং লোকসমাজে এই পথই প্রশস্ত বলে অভিহিত। পতিব্রতা নারী স্বামীর সাহায্যেই স্বর্গে গমন করে থাকে। যে-নারী স্বামীর অনুগমন করে, সে বহুকাল পর্যন্ত স্বর্গে বাস করে।"[৩৯] কূর্মপুরাণে বলা হচ্ছে, স্বামী ব্রহ্মহত্যাকারী, কৃতঘ্ন বা মহাপাতকী হলেও সহমৃতা রমণী সেই স্বামীকে উদ্ধার করে। স্ত্রীলোকেরা যে পাপই করুক না কেন, সহগমনই তাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলে কথিত আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।[৪০]

[ক্রমশঃ]

---

[৩৮] The Classical Age—R. C. Majumdar (1954), p. 33 ; History of Dharmasastra, Vol. II, Part I, p. 629.

[৩৯] ব্রহ্মপুরাণ, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ১৫৫

[৪০] কূর্মপুরাণ, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ২০৬

ধারাবাহিক-সঙ্কলন

সৎসঙ্গ রত্নাবলী

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[শ্রাবণ (১৩৯৬) সংখ্যার পর]

স্বামী দেবী গিরিজীর কথা

(১৭)

সহচারী বিজানাতি

মানুষের সঙ্গে মিশিলে তবে তার চরিত্র বুঝা যায়। শ্রীরামচন্দ্র পম্পা সরোবরের ধারে বক দেখিতে পাইয়া বলিতেছেন—

পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্মিকঃ।
শনৈঃ শনৈঃ পদং ধত্তে প্রাণিনাং বধশংকয়া ।।

হে লক্ষ্মণ, দেখ, পম্পাসরোবরের এই বক পরমধার্মিক। কেননা, পাদপিণ্ডে প্রাণিবধের আশঙ্কায় সে সন্তর্পণে পদনিক্ষেপ করিতেছে।

তখন সরোবরস্থ একটি মৎস্য বলিয়াছিল—রাম? তুমি কি জান? এই বক আমাকে নির্বংশ করিয়াছে—

'বকং কিং বর্ণিতো রাম তেনাহং নিষ্কুলীকৃতঃ।
সহচারী বিজানাতি চরিত্রং সহচারিণাম্ ।।'

হে রাম, এই বক সম্পর্কে তুমি কি বলিতেছ? তুমি কি জান এই বক আমাকে নির্বংশ করিয়াছে? যে সর্বদা সঙ্গে থাকে সে-ই সহচরগণের চরিত্র বিশেষভাবে জানে।

লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন—

ন জানাসি রাঘবত্বং বকঃ পরমদারুণঃ।
নির্জীবভক্ষকো গৃধ্রঃ সজীবভক্ষকো বকঃ ।।

হে রাঘব, এই বক কিরূপ নিষ্ঠুর তাহা তুমি জান না! শকুন মৃতপ্রাণী ভক্ষণ করে, আর বক জীবিতপ্রাণী ভক্ষণ করে (অর্থাৎ শকুন অপেক্ষাও বক নিষ্ঠুর)।

(১৮)

আতুর সন্ন্যাস

আতুর সন্ন্যাসে কোন বিধি নাই। রোগী যদি শুনিতে পায় তবে 'প্রৈষমন্ত্র' শুনাইয়া মাথায় একটি গেরুয়া কাপড় রাখিয়া দিলেই হইল। তবে রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে আর দ্বিধার দরকার নাই।

বিবিদিষা সন্ন্যাসীর আত্মবিচার অথবা নির্গুণ-উপাসনা ব্যতীত আর কোন বৈদিক কর্মে অধিকার নাই। তবে যদি অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অধিকার না থাকা সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহার জন্য কোন কোন পুরাণে সগুণ উপাসনাও বিহিত আছে।

আজকাল তো বাবাজী, সন্ন্যাস সব খেলা। সন্ন্যাসীর এই তিনজন ব্যতীত আর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই—পিতামাতা, গুরু ও ঈশ্বর।

(১৯)

সাধুর অভিমান

এক ফকির রাস্তার পাশে মস্তরাম হইয়া শুইয়া আছেন। এদিকে বাদশাহ যাইতেছেন। রাস্তার লোকেরা সকলে বাদশাহকে দেখিয়া সেলামাদি করিল, কিন্তু ফকির বেপরোয়া। সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল 'ফকির? তুমি বাদশাহকে সেলাম করিলে না?' ফকির জবাব দিলেন—'আমি ছাড়া আবার কে বাদশাহ আছে?' বাদশাহ বুঝিলেন যে এ ব্যক্তির বস্তুলাভ হইয়াছে। কিছুদিন পর বাদশাহের বৈরাগ্য হইল। এক ছিন্নবস্ত্র লইয়া বাদশাহ ঐ ফকিরের চেলা হইলেন। প্রথম প্রথম লোকে খুব খাতির করিয়া ভাল ভাল ভিক্ষা দিত। তারপর আস্তে আস্তে খাতির মন্দা হইয়া আসিল। সংসার তো! বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ফকির একদিন এক ভাঙ্গিকে বলিয়া বাদশাহের কুঠিয়া নোংরা করাইয়া রাখিলেন। বাদশাহ আসিয়া কুঠিয়া নোংরা দেখিলেন ও গোঁফে তা দিয়া বলিলেন—'যদি আজ বাদশাহ থাকিতাম তবে ঐ ব্যাটাকে শূলে চড়াইতাম।' ফকির বুঝিলেন যে, বাদশাহের এখনও খুস্কি (অভিমান) আছে। আবার বারো বৎসর পর ফকির একদিন বাদশাহের কুঠিয়া ঐরূপ নোংরা করাইয়া রাখিলে বাদশাহ এবার বলিলেন—'কি আর করা যাইবে, যদি বাদশাহ

থাকিতাম তাহলে ওকে দেশছাড়া করিতাম।' ফকির বুঝিলেন যদিও পূর্বাপেক্ষা মোলায়েম তথাপি এখনো কিছু খুস্কি আছে। আরো বারো বৎসর গেল। ফকির একদিন ভাঙ্গি দ্বারা এক ঝুড়ি ময়লা বাদশাহের মাথায় নিক্ষেপ করাইলেন। এবার বাদশাহ শান্তভাবে বলিলেন—'কোঈ বাত নেহি, ওভি ধূলে হ্যায়, ইয়ে শরীরভী ধূলহী হ্যায়।'—ফকির বুঝিলেন এতদিনে বাদশাহর অভিমান গিয়াছে।

সাধু হইলেও অভিমান কি সহজে যায়?

(২০)

সংস্কারের প্রভাব

অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এক সাধু এক চাষার জমি হইতে দুটি মূলা তুলিয়া নিয়া খাইয়াছিলেন। প্রথম ডাকিয়া কাহাকেও না পাইয়াই সাধু ঐরূপ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে মালিক আসিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 'মূলা-চোর' বলিয়া সাধুকে সাত চাবুকের ঘা লাগাইল। তখন সাধু উহা প্রারব্ধের দান ভাবিয়া ধীরভাবে সহ্য করিলেন। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পর সাধুর একদিন ধ্যানে বসিয়া মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'দুটি মূলার জন্য সাত চাবুক, বেটার এত অন্যায়? ওকে পেলে একবার দেখিয়া লইতাম।'

দেখ সংস্কারের কী অপরিসীম প্রভাব!

(২১)

মান—আহার

এক সাধু গ্রামের বাহিরে এক গুহায় থাকেন। সাতদিন পর একদিন বাহিরে আসেন। তখন লোকের ভিড় লাগিয়া যায়। কেহ একটু দুধটুধ বাহিরে রাখিয়া আসে, তা-ই খান। অপর এক বিদ্বান সাধু সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। তিনি ঐ সাধুর কথা শুনিয়া বলিলেন—'তোমরা জান না, দুধ ছাড়াও আরো অনেক মুখ্য আহার ঐ সাধু করিয়া থাকে। বিশ্বাস না হয়, দেখ, এরপর যেদিন তিনি বাহির হইবেন সেদিন তোমরা কোন লোক সেখানে দর্শনার্থী হইয়া যাইও না। দেখ তিনি কি করেন।' নির্দিষ্ট দিনে সাধু বাহিরে আসিলেন ও এদিক ওদিক তাকাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া হার্ট ফেল করিয়া তখনই মারা গেলেন।

তাৎপর্য এই যে, সকলের প্রদত্ত মান সম্মান বড় ভীষণ তাকতদেনেওয়ালা। উহা দুর্বলকেও সবল করিয়া তোলে। উহার অভাবেই সাধুর প্রাণে এমন ধাক্কা লাগিল যে, তাহার ইহজীবনের লীলাই একেবারে শেষ হইয়া গেল।

আমার জীবনেও পূর্বোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একস্থানে কুটির-নির্মাণ করিয়া বাস করিতাম। ধ্যান ভজন করিয়া যখন একটু বেলায় বাহির হইতাম তখন বাহিরে দর্শনার্থী লোকের ভিড় লাগিয়া যাইত। আমিও ধ্যানের মাত্রা বাড়াইয়া দিলাম। ফলে অবেলায় কুটির হইতে বাহির হইলেও লোকের ভিড় আরও বাড়িয়া গেল। এইরূপে কিছুদিন গেল। পরে একদিন মনে হইল—'মূর্খ-মন! কেন একটু মান সম্মানে ভুলিয়া রহিয়াছ? ভাল চাও তো এখান থেকে পালাও।'

সেই রাত্রেই সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

(২২)

শরীর ও সাধন

শরীর ঠিক হইবে তারপর সাধন করিব ইহা হইবার নহে। শরীর যেমনই থাকুক, ঐ সঙ্গেই সাধন ভজন যাহা করিবার করিয়া যাইতে হইবে। বিক্ষিপ্ত মন নিয়েই সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে, ক্রমে মন স্থির হইবে।

(২৩)

পারমেশ্বরীয় মায়া ও লৌকিক মায়া

লৌকিক মায়াবীই কত খেলা দেখায়, মহামায়াবী পরমেশ্বরের তো কথাই নাই। আলমোড়ার মতিশাহর দোকানে এক যাদুকর উপস্থিত। মতিশাহ বলিলেন—'এমন খেলা দেখাও যাহা কেহ দেখে নাই।' যাদুকর বলিল—'বড় পিপাসা পাইয়াছে। আগে জল খাওয়াও তাহার পর খেলা দেখাইব।'

মতিশাহ বলিল—'আমি জল আনিয়া দিতেছি।'

যাদুকর বলিল—'না, আমি সিপাহী লাইনের ঝরনার জল খাইব।' অতঃপর সে তাহার সঙ্গী নিজের ছেলেকে বলিল—'যা বেটা জল লইয়া আয়।'

পুত্র—না, আমি এত রোদে যাইব না।

যাদুকর—যা, যা। বাপকে জল খাওয়াইবি না?

পুত্র—না, আমি যাইতে পারিব না।

যাদুকর—'কি পিতার আদেশ অবজ্ঞা !' বলিয়া ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া 'এমন ছেলে মরাই ভাল' বলিয়া তখনই একটি দা দিয়া ছেলের মাথা কাটিয়া ফেলিল। মতিশাহ ভয়ে অস্থির। তাহার দোকানের সামনে খুন! এক্ষুনি পুলিস আসিয়া হাঙ্গামা করিবে। দর্শকরাও বিপদের ভয়ে যে যার মতো সরিয়া পড়িবার জোগাড় করিল। একটু পরেই যাদুকর 'জয় হো শেঠজী, ইনাম মিলে' বলিয়া হাত পাতিল। ছেলে তাহার পাশেই বসিয়া আছে।

যাদুকর অদ্ভুত খেলা দেখাইল। বস্তুতঃ কিছুই হয় নাই। তেমনি পরমেশ্বরের মায়ায় এই জগৎ ভেল্কি দেখাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছু হয় না। আত্মা সুখদুঃখ সব কিছুর অতীত। স্বপ্নে পরিদৃশ্যমান সান্ধ্য আকাশের রক্তিমাভা দ্বারা কি জাগ্রতের শুদ্ধ স্ফটিকে রক্তিমার সঞ্চার হইতে পারে? পারে না। সেইরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও এই দেহেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় দৃশ্য প্রপঞ্চের কল্পিত সম্বন্ধে আত্মার কিছুমাত্র বিকার হয় না।

(২৪)

হরিদ্বারের যাদুকর

কুম্ভের সময় এক যাদুকর রাস্তায় খেলা দেখাইতেছে। লোকের ভিড় হইয়াছে। এক সাধু মোহন্তও সেখানে দাঁড়াইয়াছেন। যাদুকর লক্ষ্য করিয়াছে যে একজন মালদার মোহন্তও দর্শক। যাদুকর মাটিতে উপুড় করিয়া রাখা একটি টুকরি উঠাইয়া দেখাইল, সেখানে একটি খরগোস রহিয়াছে। ডুগডুগি বাজাইয়া একটু পরে টুকরি উঠাইয়া দেখিল সেখানে খরগোসটি নাই। বেচারি কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুঁজিতে লাগিল ও মোহন্তকে বলিল, 'আপনি গরিবের খরগোসটি কেন চুরি করিলেন? এইটিই আমার সম্বল।' মোহন্ত তো অবাক। যাদুকর মোহন্তকে তাঁর গায়ের চাদরটা সামনে ঝাড়িতে অনুরোধ করিল। মোহন্ত যেই চাদরটা ঝাড়িয়াছেন অমনি তাহার মধ্য হইতে ধুপ করিয়া খরগোসটা মাটিতে পড়িল। সকলে অবাক। মোহন্ত যাদুকরকে একটি টাকা বকশিশ দিলেন।

(২৫)

প্রপঞ্চ না হইয়াই হইয়াছে

এক রাজার মৃত্যু হইয়াছে। দুই রানী। ছোট রানীর পুত্র বুদ্ধিমান, বড় রানীর পুত্র নির্বোধ। বড় রানী ছোট রানীর পুত্রকেই রাজা করিয়া দিলেন। লোকের পরামর্শে কিছুদিন পর বড় ছেলে তাহার মাকে (বড় রানীকে) দোষ দিল যে, তুমি মা হইয়া আমার প্রাপ্য রাজগদি আমাকে না দিয়া ছোট ভাইকে দিলে? মা বলিলেন, 'আচ্ছা, এক মাস পর তোকে রাজা বানাইব।' পরদিন বড়রানী গৃহচত্বরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা (ছোট ছেলে) জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হইয়াছে মা?' বড় রানী—'বেটা তুই আমাদের আশা ভরসা ছিলি যে, রাজ্য চালাইব। বড় ছেলেটা তো নির্বোধ গাধা। কিন্তু যে কালো সাপটা তোর নিদ্রাবস্থায় রাত্রে তোর শরীরে ঢুকিয়াছে, সে আর তোকে কদিন বাঁচতে দিবে? তাই কাঁদিতেছি যে এখন এ রাজ্যের কি হইবে?' রাজা বলিল, 'হ্যাঁ মা ঠিক বলিয়াছ, তাই সকাল থেকে শরীরটা বড়ই দুর্বল লাগিতেছে।' রাজার খাওয়া কমিয়া গেল, শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িল ও একমাসের মধ্যেই একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া রাজা রাজকার্যের অযোগ্য হইয়া পড়িলেন। তখন বড় রানী তাঁর বড় পুত্রকে রাজা বানাইলেন। কিন্তু সে নির্বোধ যাকে শাস্তি দিতে হইবে তাহাকে দেয় পুরস্কার আর যাহাকে পুরস্কার দিতে হইবে তাহাকে শাস্তি। কিছুই সে বোঝে না। প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল ও তাহাকে অপমান করিতে লাগিল। তখন নূতন রাজা তাহার মাকে বলিল, 'এই নে তোর রাজগদি, আমি এসব পারিব না।' বড়রানী বলিলেন—'সে তা আমি আগেই জানি। দাঁড়া, আর এক মাস পর তোর হাত হইতে রাজগদি নিব।' পরদিন বড়রানীর আদেশে রাজ্যে খুব আনন্দোৎসব, গান বাজনা হইতেছে। শয্যাশায়ী ছোট রাজা গান বাজনা আনন্দের শব্দ শুনিতে পাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বড়রানীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, এত গান বাজনা কিসের?' বড়রানী বলিলেন—'বেটা! তোর শরীর হইতে সেই কালো সাপটা সকাল বেলা বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন তোর জীবনের আশা হইয়াছে। তাই আনন্দোৎসব হইতেছে।' অতঃপর 'ঐ দেখ সেই কালো সাপটা' বলিয়া তাকে লইয়া গিয়া একটা মৃত কালো সাপ দেখাইলেন। ছোট রাজা সাপটা বাহির হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত

হইয়া বলিলেন—'হাঁ, এইজন্যই সকাল হইতে শরীরটা বেশ সুস্থ বোধ করিতেছি।' বড়রানী কোন ভীলকে বলিয়া একটা মৃত কালো সাপ পূর্বেই আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। ছোট রাজার শরীর ভাল হইতে লাগিল ও এক মাস পর সে আবার রাজা হইল।

সাপটা যেমন রাজার পেটে না ঢুকিয়াই ঢুকিয়াছে এবং বস্তুতঃ বাহির না হইয়াই বাহির হইল, এই প্রপঞ্চও তেমনি বস্তুতঃ না হইয়াই হওয়ার ন্যায় দেখায় ও বিনষ্ট না হইয়াই জ্ঞানে বিনষ্ট হইয়া যায়।

(২৬)

অমৃতবর্ষী কথা

রাত্রিতে যোগবাসিষ্ঠ পাঠ শেষ হইয়াছে। সকলে পাঠের বিষয়বস্তুর আলোচনা করিতেছে। সেখানে উপস্থিত জনৈক সাধু তাহাতে সহর্ষে যোগ দিলেন। তিনি কিন্তু পাঠের সময় দেওয়ালে ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহাও দেবী গিরি স্বামীজী লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই সাধুটিকে সোৎসাহে আলোচনায় যোগ দিতে দেখিয়া দেবী গিরিজী সহাস্যে বলিতেছেন ঃ

একস্থানে একটি স্থূলকায় ব্যক্তি ভাগবতের কথা শুনিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে একটু দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া মুখ খুলিয়া ঘুমাইতেছিল। অবসর বুঝিয়া একটা কুকুর আসিয়া তাহার মুখে প্রস্রাব করিয়া দিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি কিছুই টের পায় নাই। কথাশেষে সকলে যখন বলাবলি করিতেছে, 'আহা! আজ কি সুন্দর মধুর কথা হইয়াছে, আজ যেন অমৃতধারার বর্ষণ হইয়াছে', তখন সেই ঘুমন্ত ব্যক্তিও সেই আলোচনায় যোগদান করিয়া ঠোঁট দুটি চাটিতে চাটিতে বলিল—'হ্যাঁ, ঠিকই বলিয়াছেন আপনারা, আজ অমৃতবর্ষণ হইয়াছে ঠিকই। কিন্তু ঐ অমৃতের স্বাদ আমার মুখে নোনতা নোনতা (খারা খারা) লাগিতেছে।'

(২৭)

ক্রোধরাহিত্য

টিহরীর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে রাগাইবার জন্য এক ব্যক্তি সকলের সামনে তাঁহাকে বিকট মুখভঙ্গি করিয়া আওয়াজ করিতে লাগিল। স্বামীজীর বিন্দুমাত্র বিরক্তি নাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন—'বাহ্‌জী বাহ্‌।'

এই প্রসঙ্গে সেখানে উপস্থিত স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজী দুটি ঘটনা বলিলেন—

পাঞ্জাবের এক উত্তম সাধু। কেহ তাঁহাকে কখনো ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। এক দুষ্ট লোক তাঁহার ক্রোধ উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। সকালে সাধু ধ্যান ভজনে আছেন—আর ঐ লোকটি পাঁচ দশ মিনিট পর পর দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করে 'একটু আগুন আছে?' সাধু ধীরশান্ত ভাবে জবাব দেন—'না ভাই, নাই।' শেষবার সাধু শান্তভাবে বলিলেন—'ভাই বারবার তো বলিতেছি যে, এখানে আগুন নাই। আগুন যদি থাকিত তবে জ্বলিয়া উঠিত।' তখন সে ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

সাধু একনাথ ভগবদ্ভক্ত ও ক্রোধরহিত। দুষ্ট লোক তার ক্রোধ উৎপন্ন করাইতে এক গরিব ব্রাহ্মণকে তার কন্যার বিবাহের জন্য দুইশত টাকা দিবার প্রলোভন দেখাইয়া পাঠাইল। ব্রাহ্মণ জুতা লইয়াই একনাথের মন্দিরে উঠিলেন। একনাথ কিছুই বলিলেন না। ব্রাহ্মণ একনাথের আসনে নোংরা পা লইয়াই বসিয়া পড়িলেন। তথাপি একনাথ শান্ত। তিনি পত্নীকে অতিথি নারায়ণের সেবার জন্য উত্তম দ্রব্য তৈয়ার করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। খাদ্য পরিবেশনের সময় ব্রাহ্মণ লাফাইয়া একনাথের স্ত্রীর পিঠে চড়িয়া বসিল। অসভ্যতার চূড়ান্ত! কিন্তু একনাথ স্ত্রীকে বলিলেন, 'দেখিও, ব্রাহ্মণ যেন তোমার পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া কোন আঘাত না পান।' স্ত্রীও একনাথের মতো উন্নতা, তিনি উত্তর দিলেন—'আমার পুত্র রামও তো আমার পিঠে চড়ে, তাহাতেও আমার কোন কষ্ট হয় না। অতিথি নারায়ণ আমার পিঠে চড়িয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।'

[দেবী গিরিজীর কথা ডায়েরীতে এখানে শেষ। ডায়েরী হইতে অতঃপর স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজীর জীবনী ও কথোপকথন উপস্থাপিত হইবে। —সঙ্কলক]

পরিক্রমা

স্বর্গারোহণী

বীরেশ্বর পাল

হিমালয় ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কতবারই বদ্রীক্ষেত্রে এসেছি। 'ওপেনিং সেরিমনি' অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ায় বদ্রীনারায়ণের মন্দির খোলার অনুষ্ঠান দেখবার সাধ ছিল বহুদিন থেকেই। এক স্বামীজীর মুখে বদ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শুনেছিলাম। তিনিই বলেছিলেন, বদ্রীনারায়ণের মন্দিরের পিছনে নীলকণ্ঠ পর্বত পার হয়ে স্বর্গারোহণী বা মহাপ্রস্থানের পথ, যে-পথ দিয়ে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থান করেছিলেন। একমাত্র যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। তখন থেকেই স্বর্গারোহণী দেখার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। তাই এবার 'দুন এক্সপ্রেসে' রওনা দিলাম।

ভোরের আবছা অন্ধকার তখনো রয়েছে। ঠিক সময়েই হরিদ্বার স্টেশনে ট্রেন পৌঁছল। সকলেরই ট্রেন থেকে বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে নামার তাড়াহুড়ো। কে আগে নামবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। প্রত্যেকের সঙ্গে সাথীর সংখ্যার থেকে মালপত্রের গাঁটরির সংখ্যাই বেশি। প্লাটফর্মে নেমে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মালপত্রের সংখ্যা মেলাতেই ব্যস্ত! হরিদ্বার স্টেশনে ট্রেন প্রায় ফাঁকা আর কিছুদূর গিয়ে ট্রেনটির গতি যেখানে রুদ্ধ হয়ে যাবে—তার নাম দেরাদুন। দেরাদুন থেকে তীর্থযাত্রীদের কাছে হরিদ্বারের আকর্ষণ অনেক বেশি। তাই অধিকাংশ যাত্রী হরিদ্বারকে ভ্রমণের কেন্দ্র করে আশপাশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখেন। যেমন—কনখল, হৃষীকেশ, লছমনঝুলা, দেরাদুন, মুসৌরী ইত্যাদি।

ট্রেন থেকে নেমে হিমশীতল স্নিগ্ধমধুর ফুরফুরে বাতাসে দুদিনের ট্রেন-জার্নির ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। হিমের পরশ প্রায় কিছুটা এসেছে। ট্রেন থেকে নেমেই সোয়েটার ও চাদর গায়ে দিতে হলো। স্টেশনটি ভারি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও কোলাহলশূন্য।

স্টেশনের বাইরে এলাম। নীলকণ্ঠ মহাদেবের মূর্তির মুখমণ্ডলটি বিস্তারিত, নিমিলিত ত্রিনয়ন ও জটাজুট। মুখে স্মিত হাসি। শিল্পীর তারিফ না করে পারা যায় না। হরিদ্বার স্টেশনের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই এমন আকর্ষণীয় মূর্তিটি করা হয়েছে বোঝা যায়।

যাত্রীদের নিয়ে রিকশ ও টাঙ্গাওয়ালাদের টানাটানি। সকলেই বলছে—আমি ভাল হোটেল ও ধর্মশালায় নিয়ে যাব। এক রিকশওয়ালা নাছোড়বান্দা। আমায় সে হরকি পৌড়ি নিয়ে যাবেই। কথোপকথনের মধ্যে জানতে পেরেছে আমি হরকি পৌড়ি যাবো। 'বাবুজী হরকি পৌড়ি দূর হ্যায়। রিকশমে চলিয়ে। মুঝে পতা হ্যায় কিতনা দূর হ্যায়। ম্যায় এঁহা হরশাল আতা হুঁ।' রিকশওয়ালার আকুতি-মিনতিতে গলে গেলাম। দুটো টাকা তার হাতে দিয়ে বললাম—'ভাইয়া, দো রুপেয়া রাখ দো। কুছ চায়-ওয়ায় পি লেনা। ম্যায় পয়দলহি চলা যাউঙ্গা। রাস্তামে কুছ কাম হ্যায়।' রিকশওয়ালার মুখে হাসি। আমিও পেলাম নিষ্কৃতি।

স্টেশন এলাকা ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। রাস্তায় তখনো যানবাহনের হুড়োহুড়ি পড়েনি। স্বচ্ছন্দে আপনমনে হেঁটে চলেছি। রাস্তার মাঝে তে-মাথার মোড়ে পদ্মের ওপর পদ্মাসনে চতুর্বাহু শ্বেত-শুভ্র প্রাণোজ্জ্বল শিবমূর্তি। একহাতে রুদ্রাক্ষের মালা ও অন্যহাতে কমণ্ডলু। উপরের দুই হাতে দুটি ঘট নিয়ে নিজের মাথায় নিজেই জল ঢালছেন। একজন যাত্রী বললেন, 'ভবিষ্যতে ভক্তেরা তাঁর মাথায় জল দেবেন কিনা এই সন্দেহে বুঝি শিব ঠাকুর নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন' আসলে একটি ফোয়ারার

মাধ্যমে সব সময় শিবজীর মাথায় জল ঢালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হরিদ্বার পৌরসভার এক মনোজ্ঞ অবদান এটি।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম গঙ্গার ধারে ভোলাগিরি আশ্রমে। তখনো সর্বসাধারণের প্রবেশদ্বার খোলা হয়নি। অন্য এক গেট দিয়ে ঢুকে মূল মন্দিরে ভগবান শঙ্করাচার্য, ভোলাগিরি মহারাজ ও শিবজীকে দর্শন করে চলে যাচ্ছি। এমন সময় এক স্বামীজী মহারাজ ডেকে হাতে কিছু প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ খেয়ে মাথায় হাত মুছতে মুছতে বাজারের মধ্য দিয়ে হরকি পৌড়িতে এসে পৌঁছালাম। হরকি পৌড়ি হরিদ্বারের প্রাণকেন্দ্র। হরিদ্বার শহরের মূল আকর্ষণ হরকি পৌড়ি। ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে হরকি পৌড়ির সিঁড়িতে বসে আছি। গঙ্গার নীল জলধারা অবিরাম গতিতে নৃত্যের ভঙ্গিতে প্রবাহমান। গঙ্গার এক তীরে মনসাপাহাড়, অপর পাড়ে চণ্ডীপাহাড়। দূরে গিরিরাজ হিমালয়। হরকি পৌড়ির এক নৈসর্গিক ভাবগম্ভীর পরিবেশ। এখানে মানুষের মন এক পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। স্বতই মনটি ঊর্ধ্বলোকে পৌঁছে যায়। পৌড়ি অর্থে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে যেমন ওপরে ওঠা যায়—তেমনি হরকি পৌড়ির পরিবেশ মনকে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে পৌঁছে দেয়। তাই হরকি পৌড়ি একটি সার্থক নাম। এখানে বসে কোথা দিয়ে সময় চলে যায় বোঝা যায় না। গঙ্গার জল মাথায় নিয়ে প্রার্থনা করলাম—'মা ভগবতী গঙ্গে! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক। তুমি ত্রিভুবন পবিত্র করছ। আমার প্রতি প্রসন্না হও। স্বর্গারোহণী-পথে পাড়ি দেবার শক্তি দাও মা! তুমি কৃপা না করলে আমার সাধ্য নেই যে, এই দুর্গম গিরি লঙ্ঘন করি।' শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত গঙ্গাস্তোত্র মনে পড়ল:

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে
শঙ্করমৌলি নিবাসিনি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।"

মন না চাইলেও এবার হরকি পৌড়ি থেকে গাত্রোত্থান করতে হলো। রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছি। দুচার মিনিট পর একটি টেম্পো এসে দাঁড়াল। হৃষীকেশ যাবার যাত্রী তার পূর্ণ হয়নি। তাই নিজের গরজেই আমায় তুলে নিল। পাঁচ টাকা ভাড়া। বাসের থেকে এক টাকা বেশি। তবু স্বচ্ছন্দে হৃষীকেশ যাওয়া যাবে। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ২২ কিঃ মিঃ রাস্তা। এই রাস্তাটুকু শাল, পলাশ ও ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পিচঢালা রাস্তায় যেতে ভ্রমণের আনন্দ অনুভব করা যায়। এই জঙ্গলের মধ্যদিয়ে আঁকা-বাঁকা সরীসৃপের মতো হরিদ্বার-হৃষীকেশ রেল লাইন চলে গেছে। এই পথটুকু ট্রেনে যেতেও মন্দ লাগে না। বনানীর অপরূপ রূপের শোভা, নানা বন্য ফুলের গন্ধ মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর হৃষীকেশ পৌঁছলাম। হৃষীকেশ। ঋষিভূমি। ঋষিদের তপস্যার স্থান। তপোভূমি। এককালে এখানে কেবলমাত্র ঋষিদেরই বসবাস ছিল। এখন অবশ্য সাধারণ গৃহস্থদের সংখ্যাই বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। হৃষীকেশ শহর পার হয়ে মুনি-কি-রেতী ছাড়িয়ে হিমালয়ের কোলে 'কৈলাস আশ্রমে' উঠলাম। বেশ কিছুটা খাড়া সিঁড়ি বেয়ে আশ্রমের মূল মন্দিরে পৌঁছলাম। কৈলাস আশ্রমটি হৃষীকেশের মধ্যে একটি প্রাচীন আশ্রম। আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা ধনরাজগিরি মহারাজ। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময় সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য দেওয়া হয় এবং মেলা বসে। আশ্রমে ভগবান শঙ্করাচার্য, মহাবীরজী, দশমহামণ্ডলেশ্বর ও শিবজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। পূজারী মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর সঙ্গে দেখা। তিনি সস্নেহে তাঁর কুঠিয়ায় নিয়ে গেলেন। প্রসাদী ফলমূল, দই-দুধ খেতে দিলেন। পেট তো বারুদঠাসা হয়ে গেল। আজকের দিনটি এখানে কাটিয়ে পরদিন সকালেই স্বর্গারোহণীর পথে পাড়ি দিতে হবে।

আশ্রমের সামনেই কল্লোলিনী গঙ্গা। গঙ্গার পরপারে গীতাভবন, পরমার্থ-নিকেতন, স্বর্গাশ্রম ও মহেশ যোগীর আশ্রম হিমালয়ের কোলে ছবির

মতো সাজানো। চেয়ে থাকি। চোখের পলক ফেলতেও ইচ্ছা হয় না। আশ্রম-চত্বরে বসে সামনে হিমালয়ের অপরূপ রূপের শোভায় মন ঈশ্বরীয় আবেশে মেতে ওঠে! বুঝতেই পারি না—কোথা দিয়ে সময় চলে যায়! সন্ধ্যা-আরতির সময় নির্দেশ করে শঙ্খধ্বনি হলো। আশ্রমস্থ সকলে—ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী-মহারাজেরা মূল মন্দিরচত্বরে হাজির হলেন। শাঁখ, ঘণ্টা ও ডমরুর ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত, পূতঃ গন্ধে মাতোয়ারা। আরতি সমাপনান্তে সমবেত সন্ন্যাসীদের সমস্বরে শিবমহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ! রাতের আহার সেরে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

সকাল হতেই শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করে রওনা দিলাম—বদ্রীনারায়ণের পথে। আশ্রমের সামনে দিয়েই চলে গেছে বদ্রীনারায়ণ ও কেদারনাথের পথ। আশ্রম থেকে রাস্তায় নামতেই একটি বাস এসে হাজির। হাত দেখিয়ে দাঁড় করালাম। বাসটির গন্তব্যস্থল যোশীমঠ। ভালই হলো। আমিও ঐ পথের যাত্রী।

বাস ছুটে চলেছে—দুর্গম হতে আরও দুর্গমতর গভীর হিমালয়ের পথে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর বাস থামল ব্যাসীতে। এখানে মহামুনি ব্যাসদেবের মূর্তি আছে। রাস্তার দুধারে বেশ কিছু দোকান-পাট। এখানে কেদার-বদ্রী হতে ফেরার পথে এবং কেদার-বদ্রী যাত্রাপথে বাসযাত্রী ও ড্রাইভার-কন্ডাকটার ১০।১৫ মিনিট চা খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা দেয়। পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে বাস ছুটে চলেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে মর্তভূমিতে ধাবমানা গঙ্গার বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও হিমালয়ের অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে এক সময়ে দেবপ্রয়াগ এসে গেলাম।

দেবপ্রয়াগ—কেদার-বদ্রী পথের প্রথম প্রয়াগ। এখানে ভাগীরথী-গঙ্গার সাথে অলকানন্দা মিলিত হয়েছে। গঙ্গার জলধারার কিছুটা সোনালী বর্ণ। অলকানন্দার নীল জলধারা। দুয়ের এক অপূর্ব মিলন। যেন শ্যামের পাশে রাধা। কেদার-বদ্রীর পথে ছয়টি প্রয়াগ—দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শোণপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ। যেখানেই এক নদীর সঙ্গে এক বা ততোধিক নদীর সঙ্গম বা মিলন হয়েছে সেখানেই প্রয়াগের সৃষ্টি হয়েছে। কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডার নদীর সঙ্গে অলকানন্দার মিলন, নন্দপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মন্দাকিনীর, রুদ্রপ্রয়াগে আবার অলকানন্দার সঙ্গে মন্দাকিনীর, শোণপ্রয়াগে শোণ নদীর সঙ্গে মন্দাকিনীর আর বিষ্ণুপ্রয়াগে ধৌলি নদী ও অলকানন্দার সঙ্গম।

প্রায় ছটা নাগাদ যোশীমঠ পৌঁছলাম। হিমালয়পথে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হতে দেরি হয়। তাই এখনো সূর্যের প্রখর আলো। যোশীমঠ বেশ জাঁক-জমকপূর্ণ জায়গা। এখানে দোকান-পাট, হোটেল, ধর্মশালা ও থাকা-খাওয়ার সবরকম সুখ-সুবিধা আছে। যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ। ভগবান শঙ্করাচার্যকে ঈশ্বর এখানে জ্যোতিঃ রূপে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন। তাই জায়গাটি জ্যোতির্মঠ নামে খ্যাত। জ্যোতির্মঠই ভাষান্তরিত হয়ে যোশীমঠ নাম পেয়েছে। এটি ভগবান শঙ্করাচার্যের উত্তরধাম। শঙ্করাচার্যের গদী ও নৃসিংহ-বদ্রী দর্শন করে একটি ধর্মশালায় রাতের আশ্রয় নিলাম। ভোর হতেই অভ্যাসমতো ঘুম ভেঙ্গে গেল। বারান্দায় বসে আছি। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। একটা চাদর গায়ে দিলে ভাল হয়। যতদূর দৃষ্টি যায়—হিমালয়ের গায়ে উঁচু-নিচু ঘর-বাড়ি, চাষের ক্ষেত, গাছভর্তি আপেল। দূরে বরফাবৃত গিরিশৃঙ্গ। অপূর্ব মনোহর দৃশ্য! দেখতে দেখতে সকালের কিছুটা সময় কেটে গেল। একটা দোকানে গরম জিলিপি ও চা খেয়ে চড়াই-উতরাই পিচঢালা পথে হাঁটতে হাঁটতে প্রাতঃভ্রমণ করে হিমালয়ের দৃশ্য উপভোগ করে এলাম। তাছাড়া পায়ের গাঁটগুলি একটু ছাড়িয়ে নিয়ে দুর্গম মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি দেবার মহড়াও দিয়ে নিলাম।

সকাল নটা। ধর্মশালায় ফিরে স্নান সেরে একটি দোকানে ডাল-রুটি খেয়ে স্থানীয় সরকারি অফিসে গেলাম। এখান থেকে অনুমতিপত্র নিতে হবে। প্রতিরক্ষার কারণে স্বর্গারোহণীর পথ নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্গত। বিদেশীদের ক্ষেত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র ভারতীয়রা অনুমতিপত্র নিয়ে যেতে পারেন। অনুমতিপত্র ছাড়া

যাত্রা করলে প্রতিরক্ষা আইনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আটক পড়তে হতে পারে। যোশীমঠের সাব-ডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে অনুমতিপত্র পেতে দুপুর একটা বেজে গেল। তারপর তাড়াহুড়ো করে বাস ধরবার চেষ্টা করছি। যোশীমঠ হতে বদ্রীর বাসপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ ও দুর্গম। এই পথটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে। বদ্রীনাথ থেকে যখন বাস বা অন্য কোন যান ছাড়বে—সেই যানগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না যোশীমঠ পৌঁছাবে—ততক্ষণ পর্যন্ত যোশীমঠ থেকে কোন যান ছাড়বে না। বাসের টিকিট কেটে বসে আছি। প্রায় দুঘণ্টা পর সোরগোল উঠল—'গেট খুল গিয়া, গেট খুল গিয়া।' তাড়াতাড়ি সমস্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাসযাত্রীরা বাসে যে যার সিট দখল করে বসল। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে বাস ছাড়ল। যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথ মাত্র দুঘণ্টার পথ। কিন্তু ঐ পথটুকু অত্যন্ত বিপদ-সংকুল। কত যে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় পড়ে অলকানন্দার জলে তলিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

কিছুক্ষণ পর বাস পাণ্ডুকেশ্বরে কয়েক মিনিটের জন্যে থামল। এখানে যোগ-বদ্রী মন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে তাম্রশাসনপত্র আছে। এখানে রাজা পাণ্ডু বাস করতেন। তাই তাঁর নামানুসারে জায়গাটির নাম পাণ্ডুকেশ্বর। অতি সাবধানে বাস চলেছে চড়াই-উতরাই পথে। এবার বাস থামল হনুমান চটিতে। হনুমানজী মন্দিরের কাছে। পূজারী সকল বাসযাত্রীকে লাল তিলক পরিয়ে দিচ্ছেন। যাত্রীরাও খুচরো পয়সায় পূজা দিচ্ছেন। আবার বাস চলল। একেবারে বদ্রীনারায়ণে থামবে। এই পথটুকু আরও খতরনাক। ভয়ে সকলেই 'ত্রাহি মধুসূদন' করছে। আমাদের বাসে এক ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি সামনের সিটে বসেছেন। তিনি ভগবানের নামগান ছাড়া বাক্যস্ফূর্তি করেন না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আকারে-ইংগিতে উত্তর দেন। কেউ কিছু ফল-মূল দিলেও নিচ্ছেন না। তিনি সারাটা পথ বদ্রীনাথের জয়গান করতে করতে চলেছেন। যাত্রীরাও তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে দিচ্ছেন। বিপদে পড়ে সবাই মধুসূদনকে ডাকে, অন্যসময় ভগবানকে ভুলে থাকে। বাস যতক্ষণ না বদ্রীনাথ পৌঁছল ততক্ষণ পর্যন্ত বাসের যাত্রীরা ব্রহ্মচারীজীর সংগে সুর মিলিয়ে গাইতে লাগল—"বদরী নারায়ণ—নারায়ণ—না-রায়ণ—বদরী নারায়ণ।"

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ বাস বদ্রীনাথ পৌঁছল। সকলেই বাস থেকে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বালানন্দ তীর্থাশ্রমে উঠলাম। হিমালয়-ভ্রমণকে কেন্দ্র করে বহুবারই এখানে উঠেছি। প্রতিবার আমি এখানে এসেই উঠি। প্রত্যেক ঘরে চৌকি, লেপ-তোষক ও কম্বলের ব্যবস্থা আছে। ঘর সংলগ্ন রান্নাঘর ও শৌচালয়ও আছে। বদ্রীনাথে স্বচ্ছন্দে কয়েকটা দিন কাটানো যায় এই বালানন্দ তীর্থাশ্রমে। যাত্রীনিবাসটি এক স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন।

সন্ধ্যায় বদ্রীনাথ মন্দিরে মাইকে ভজন-কীর্তনের সংগে সংগে স্বামীজীর ঘরেও ভগবানের নাম-গান শুরু হয়েছে। একটু উঁকি দিয়ে দেখতে গেছি—আর স্বামীজীর চোখাচোখি। ডেকে ভিতরে বসতে বললেন। আমার ইচ্ছা ছিল বদ্রীনাথ মন্দিরে যাবার। এখন সবই তাঁর ইচ্ছা! এই ভেবে আসরে বসে গেলাম। দেখলাম বাসের সেই ব্রহ্মচারীজী হারমোনিয়াম নিয়ে মধুর স্বরে ভগবানের ভজন গাইছেন।

রাত্রি নটা। বদ্রীনাথ মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। সামনেই একটা টিনের চালাঘরে বাঙালী খানা পাওয়া যায় শুনে গেলাম। হোটেলের মালিক একজন বাঙালী মহিলা। রান্না করার লোকজনও বাঙালী। নৈশভোজন সেখানেই হলো।

ভোর হতেই ঘণ্টার ধ্বনি ও 'ভজ গোবিন্দম্' গানের সুরে বদ্রীনাথ শহর আলোড়িত ও মুখরিত। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিলাম। এমন সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ। এখানে এ-সময় কে আবার আমায় ডাকতে পারে? দরজা খুলে দেখি—টিন কাঁধে এক পাহাড়ী লোক। 'বাবুজি, গরম পানি চাহিয়ে?' এক টাকা দিয়ে গরম জল নিলাম। বদ্রীনাথ মন্দিরের কাছে উষ্ণকুণ্ড থেকে গরম জল নিয়ে যাত্রীদের দিয়ে কিছু পয়সা

রোজগার করে। ভোরবেলায় বদ্রীনাথের কনকনে ঠাণ্ডায় এক টাকার বিনিময়ে গরম জল পেলে কে আবার ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করবে ?

তাড়াহুড়ো করে বদ্রীনাথ মন্দিরে গেলাম। ঠাণ্ডার তীব্রতায় খুব একটা বেশি ভিড় নেই। খুব ভালভাবে বদ্রীনাথজীকে দর্শন করলাম। বদ্রীনাথজীকে স্নান করাচ্ছেন দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত রাওয়ালজী। স্নানান্তে বদ্রীনাথকে গৈরিক বসন পরিয়ে তুলসীপাতার মালা ও নানান জাতের ফুলে সাজিয়ে দিলেন। দিলেন নানা অলঙ্কার পরিয়ে। একমাত্র এই স্নানের সময়টিতেই বদ্রীনাথের আসল শিলারূপটি দেখতে পাওয়া যায়। শিলা মূর্তিটি দীর্ঘকাল যাবৎ খরস্রোতা অলকানন্দার অতল জলে থাকার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই মূর্তিটির পূর্ণ অবয়ব বুঝতে পারা যায় না। তবে যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যান-মূর্তিটি কিছুটা বুঝতে পারা যায়। ভগবান শঙ্করাচার্য খরস্রোতা অলকানন্দায় ডুব দিয়ে তুলে মূর্তিটিকে উদ্ধার করেন এবং মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই ভগবান শঙ্করাচার্য মন্দিরের ও বদ্রীনাথের পূজার কিছু বিধি প্রবর্তন করেন। একমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত রাওয়ালজী ছাড়া আর কেউ বদ্রীনাথজীকে স্পর্শ করতে পারেন না। রাওয়ালজী হলেন চিরকুমার ব্রহ্মচারী। যদি তাঁর গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করার ইচ্ছা হয় তবে তিনি আর বদ্রীনাথের পূজো করতে পারবেন না। তখন দক্ষিণ ভারত থেকে আর একজন চিরকুমার পণ্ডিতকে এনে পূজার ভার দিয়ে তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে যাবেন।

বদ্রীনাথ শহরটি ভারি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। নর ও নারায়ণ পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহমানা অলকানন্দা। অলকানন্দার দুই তীরে নর ও নারায়ণ পাহাড়ের কোলে বদ্রীনাথ শহর। নারায়ণ পাহাড়ে বদ্রীবিশালজীর মন্দির। মন্দিরটি অপূর্ব কারুকার্য ও পৌরাণিকত্বের নিদর্শন। রাত্রে বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে ও ভারি সুন্দর দেখায়। নারদ-শিলার কাছাকাছি দুই পাহাড়ের সংযোগস্থলে লোহার পুল। এই পুল পার হয়েই বদ্রীবিশালজীর মন্দিরে যাওয়া যায়। বদ্রীনারায়ণ—বদরী অর্থে সংস্কৃত ভাষায় কুল। একদিন নারায়ণ বৈকুণ্ঠ হতে অন্তর্ধান হয়ে নারায়ণ-পাহাড়ে তপস্যায় রত হলেন। এদিকে প্রভুর অদর্শনে লক্ষ্মী অস্থির হয়ে পড়লেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদের কাছে তিনি জানতে পারলেন—নারায়ণ নারায়ণ-পাহাড়ে তপস্যায় বসেছেন। পতিপ্রাণা লক্ষ্মী চলে এলেন নারায়ণের কাছে। প্রখর রৌদ্র। যোগাসনে ধ্যানমগ্ন নারায়ণ। তাঁর ধ্যান ও তপস্যায় যাতে ব্যাঘাত না হয় তাই তিনি পতিসেবায় নিরত হলেন। কুল বৃক্ষের সৃষ্টি করে ছায়াদান করতে লাগলেন। তাই এখানে নারায়ণ বদ্রীনারায়ণ নামে খ্যাত।

বদ্রীনাথ শহরে রাত কাটাবার মতো যাত্রীনিবাস, হোটেল, দোকান-পাট কোন কিছুরই অভাব নেই। বদ্রীনাথজীর পাদপদ্মে অর্থাৎ মন্দিরের ঠিক নিচেই তপ্তকুণ্ড। এটিকে মার্কণ্ডেয় শিলাও বলা হয়। ঋষি মার্কণ্ডেয় এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। এই তপ্তকুণ্ডে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত তীর্থযাত্রীরা স্নান করে পরিতৃপ্তি লাভ করে। বদ্রীনাথ মন্দিরের দুই পাশে বাজার ও রকমারি জিনিসের কেনাকাটির বাজার। এই বাজারে গরম জিলিপি, খাবার-দাবার ও ঘর সাজাবার লোভনীয় উপকরণাদি, পূজার সামগ্রী, পাহাড়ী ঔষধ জড়ি-বুটি পাওয়া যায়। অলকানন্দার তীরে মন্দিরকে কেন্দ্র করে পাঁচটি শিলা আছে। শিলাগুলি হলো—নারদ-শিলা, নৃসিংহ-শিলা, বরাহ-শিলা, গরুড়-শিলা ও মার্কণ্ডেয়-শিলা। এই পাঁচটি শিলা পঞ্চশিলা নামে খ্যাত। এই শিলাগুলি স্পর্শ করাই রীতি। বদ্রীনাথ মন্দিরের পিছনে নারায়ণ-পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোয় বরফাবৃত নীলকণ্ঠ পাহাড়ের চূড়াটি বড়ই আকর্ষণীয়। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। যেন চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছা হয় না। চাঁদনীরাতে এই নীলকণ্ঠ পাহাড় যেন মায়াময়। নীলকণ্ঠ পাহাড় বদ্রীনাথ শহরের অন্যতম আকর্ষণ। অলকানন্দার উপত্যকার পূর্ব ও পশ্চিম তীর জুড়ে পুণ্য বদ্রীক্ষেত্র। [ক্রমশঃ]

স্মৃতিকথা

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের অল্প যে কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদের ও পুরনো বেলুড় মঠ সম্বন্ধে যা মনে পড়ে, তা লিখে রাখার জন্য আমার কাছে কিছু অনুরোধ আসে। যেসব ঘটনা ও কথাবার্তাদি আমি নিজে দেখেছি ও শুনেছি, প্রধানতঃ সেগুলিই লিখছি। তবে বিশ্বস্তসূত্রে শোনা কিছু বিষয়েরও উল্লেখ থাকবে। এগুলি সত্তর বছরেরও কিছু আগের ঘটনা ও কথাবার্তা। সাধ্যমতো মনে করে লেখার চেষ্টা করেছি। তবু কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। যখন যে ঘটনা যতটুকু মনে পড়েছে, তখন সেটি ততটুকু লিখেছি। তাই এই লেখাটি হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশমাত্র, আর সেজন্যই পরস্পর নিরপেক্ষ।

ঈশ্বরেচ্ছায় ইংরেজী ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস নাগাদ আমরা চার-পাঁচজন সহপাঠী বন্ধু বৌবাজার নেবুতলা অঞ্চল থেকে প্রত্যূষে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির দর্শনে যাই। সেখানে পৌঁছে বিগ্রহাদি দর্শনের পর মন্দির-অফিস থেকে দুপুরে ভবতারিণীর অন্নপ্রসাদ পাবার অনুমতি নিয়ে আসি (তখনো সেখানে বিনা দক্ষিণায় প্রসাদ বিতরণ করা হতো)। খুব তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে যখন উঠি, তখন বেলা আন্দাজ একটা হবে। ফেরার কোন তাড়া নেই, কারণ হাতে প্রচুর সময় আছে। তখন নাতিশীতোষ্ণ মধুর বসন্তকাল, মন্দিরচত্বর থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে আমরা নিশ্চিন্তমনে পঞ্চবটী প্রভৃতি জায়গা দেখছি, বেড়াচ্ছি আর গল্প-স্বল্প করছি। এমন সময় আমাদেরই মধ্যে কে একজন হঠাৎ গঙ্গার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বলে উঠল, "ওপারেই বেলুড় মঠ আছে বলে শুনেছি। হাতে তো অনেক সময় রয়েছে। চল্ না ফেরার পথে ওটা একবার দেখে যাই!"

বাকি ছেলেরা তখন বলে ওঠে, "ওরে স্যারের কথা কি মনে নেই? বেলুড় মঠ যেতে বারণ করেন, তিনি আমাদের বরং পায়ে হেঁটে একদিন দক্ষিণেশ্বর দেখে আসার কথা যে বলেছিলেন। তাই ওখানে গেলে তাঁকে কি অসম্মান করা হবে না?"

তখন ঐ বিষয়টি আলোচনা করে আমরা দেখলুম যে সত্যই স্যারকে অসম্মান করার বিন্দুমাত্রও ভাব আমাদের মনে নেই, অন্য পাঁচ জায়গায় যেমন বেড়াতে যাই, তেমনই ও জায়গাটা একবার বেড়িয়ে দেখে যাব মাত্র। সুতরাং ওখানে যাওয়া স্থির করে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই সেই উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ি।

দুপয়সা করে পারানি দিয়ে আমরা নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরপাড়ায় পৌঁছাই। সেখান থেকে লোকদের জিজ্ঞেস করে করে জি. টি. রোড ধরে বরাবর দক্ষিণে চলে আমরা বেলুড় গ্রামে পৌঁছাই। হেমপালের গলি দিয়ে বেলা তিনটে-সাড়ে তিনটে আন্দাজ বেলুড় মঠের উত্তর-পশ্চিম সীমানার খিড়কি দরজা দিয়ে মঠে ঢুকি। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পাই না। আমরা তখন সামনের পূবমুখী সরু হাঁটা রাস্তা ধরে চলতে থাকি। একটু চলার পরে দেখি সামান্য দূরে বাঁদিকে একটি দোতলা বাড়ি, আর তারই কয়েক হাত দূরে পূবদিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় দোতলা বাড়ির কোল ঘেঁষে বেশ বড় একটি উঠান রয়েছে। আমরা সেই উঠোনে পৌঁছে ছোট বাড়িটিকে বাঁয়ে রেখে সামনের বড় বাড়িটির পশ্চিম দালানে গিয়ে হাজির হই। সেখানেও কাউকে দেখতে না পেয়ে আমরা এদিক ওদিক তাকাতে থাকি। তখন আমরা ডানদিকে একটি খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে একটি সরু বারান্দা আর ডানহাতি ওপরে ওঠার জন্য একটি সিঁড়িও দেখতে পাই। সাহস করে আমরা ঐ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। দোতলা থেকে দুই-তিন ধাপ নিচে পৌঁছে আমরা দেখতে পাই—সামনে সরু গলির মতো একটি বারান্দা আর বাঁদিকেও কয়েকটি দরজার কোল ঘেঁষে সরু আর একফালি বারান্দা।

আমরা আরও দেখি যে সিঁড়ি থেকে ঠিক এক-দু হাত দূরে ডানদিকে একটি দরজার পরদা দখিনা বাতাসে নড়ছে। আমরা বড় আশা করেছিলাম ওপরে কারুর না কারুর দেখা পাবই, কিন্তু তা হলো না। বিনা অনুমতিতে ওপরে ওঠাটা অতি অন্যায় কাজ হবে ভেবে আমরা একেবারে ওপরে না উঠে সেই নিচের দু-তিনটে ধাপে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। আর তখন কি করব তা খুব নিচু গলায় বলাবলি করতে লাগলাম। ডানদিকের পরদা-টাঙানো দরজাটি খোলাই ছিল। আর পরদার খুব কাছে বসে একজন সাধু কি কাজ করছিলেন। বাতাসে পরদাটা নড়ার ফাঁকে হঠাৎ তাঁর নজর আমাদের ওপর পড়ল। তিনি তখন অতি মধুর স্বরে আমাদের ঘরের ভিতরে আসার জন্য আদর করে আহ্বান জানালেন। আমরা তখন অকূলে কূল পেয়ে সাহস করে ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনিও সাদরে আমাদের কাছে বসিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কথায় কথায় তিনি জানতে পারলেন যে, আমাদের একজন 'স্যার' (মাস্টারমশায়) আছেন, যাঁর কোচিং ক্লাসে আমরা পড়তে যাই। তখন তিনি আমাদের বললেন—"তোমাদের মাস্টারকে কি একবার এখানে আনতে পার না?"

আমরা বললাম—"মনে হয় তা পারা যাবে।"

তিনি বললেন—"তাহলে সামনের ছুটির দিনে তাঁকে এখানে এনো।"

আমরা বললাম—"বেশ তো তাঁকে আনার চেষ্টা করব।"

আমাদের ফিরে আসার সময় হলে সেই গৈরিকধারী সুঠাম-গঠন, সৌম্যমূর্তি, যজ্ঞোপবীত ও নীল রঙের মোটা কাঁচের চশমাধারী সহৃদয় সাধুটি স্বয়ং আমাদের ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর-প্রণাম করিয়ে প্রত্যেকের হাতে ঠাকুরের কিছু প্রসাদ দিলেন। আমরাও সানন্দে তা ধারণ করে খুব হৃষ্টমনে কলকাতা ফিরে এলাম। মঠে এলেই ভক্তদের সযত্নে প্রসাদ দেওয়া ছিল মঠের রীতি—নিয়ম। আর এর মূলে ছিলেন 'মঠের মা'—শ্রীশ্রীঠাকুরের 'দরদী' সন্তান পরম পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ।

কলকাতা ফিরে আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র স্যারের কাছে গিয়ে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে যাবার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা জানালাম, আর বেলুড় মঠের সাধুটি স্যারকে আগামী ছুটির দিনে সেখানে যাবার জন্য শুধু যে বিশেষভাবে অনুরোধই জানিয়েছেন তা নয়, অধিকন্তু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথাও যে বলেছেন সে কথাও আমরা তাঁকে জানালাম। সব কথা স্থিরভাবে শুনে কোনরূপ আপত্তি না করে তিনি ঐদিন যেতে রাজি হলেন। কেন তিনি এক-কথায় যেতে সম্মত হলেন তা আমরা তখন কেমন করে জানব! যা হোক, আমরা পরবর্তী ছুটির দিনে কখন এসে স্যারকে নিয়ে বেলুড় মঠে যাব ইত্যাদি বিষয় জেনে নিয়ে বিদায় নিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরে নির্দিষ্ট সময়ে স্যারের কাছে গেলাম। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় আমরা বেলুড় মঠ পৌঁছলাম। ঐ দিন স্যারের সঙ্গে আরও তিন-চার জন নতুন ছেলে ছিল। স্যারকে নিয়ে পূর্বদিনের পরিচিত সেই সাধুটির ঘরে (স্বামীজীর দোতলা ঘরের ঠিক নিচের ঘরটিতে) গেলাম ও সকলেই তাঁকে প্রণাম করে বসলাম। তিনিও সহৃদয়তার সঙ্গে স্যার ও বাকি ছেলেদের সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলতে থাকেন। আমরা যখন গল্পগুজবে মেতে রয়েছি, তারই ফাঁকে স্যার কখন নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে গিয়ে মঠের এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে থাকেন। সেই সময় তিনি শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দজী মহারাজের (পূঃ বাবুরাম মহারাজ) দর্শনলাভ করেন। আর তিনিও স্যারের সঙ্গে পূর্বপরিচিত আপনজনের মতো ব্যবহার করেন। কথাটি আমরা কেউ কেউ পরে স্যারের মুখে শুনেছি। যে সাধুটি আমাদের জমিয়ে রেখে কথাবার্তা বলছিলেন, তিনি যে পরমপূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ, তা আমরা পরে জেনেছিলাম। যা হোক, জ্ঞান মহারাজের কাছে আমাদের সেদিন তখন বেশ মজায় কাটছে, এমন সময় কে একজন এসে বলে গেলেন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজজী ঐদিকে আসছেন। সে কথা শুনে জ্ঞান মহারাজজী আমাদের নিয়ে উঠে পড়লেন ও তাঁর ঘরের উত্তরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় হাজির হলেন।

ইতিমধ্যে বাবুরাম মহারাজজী মঠের ভিতর দিক থেকে চার-পাঁচজন ভক্তের সঙ্গে গঙ্গার ধারের সেই বারান্দাটিতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আসতে দেখে জনৈক সাধু একখানি মাঝারি সাইজের শতরঞ্চি এনে জ্ঞান মহারাজের ঘরের দিকে বারান্দায় পেতে দিলেন। বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার দিকে মুখ করে পূবমুখী হয়ে তাতে বসলেন। উপস্থিত (তখনকার দিনে রবিবার ও অন্যান্য ছুটি-ছাটার দিনেও মঠে ঐ রকম কম লোকই আসতেন) পাঁচ-সাতজন ভক্ত ও স্যার তাঁকে ঘিরে বসলেন, আমরাও সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বা বসে রইলাম। পূঃ বাবুরাম মহারাজ পূর্বোক্ত ভক্তদের সাথে নানারূপ সৎপ্রসঙ্গ করতে থাকেন। স্যারও তা শুনতে থাকেন। দু-এক জন ভক্ত মাঝে মাঝে কিছু কিছু প্রশ্ন বাবুরাম মহারাজকে করছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের উপর ঐ সব সৎপ্রসঙ্গাদি চলেছিল। আগত ভক্তদের সঙ্গে ঐ সৎপ্রসঙ্গাদি চালালেও মহারাজজীর প্রধান লক্ষ্য ছিলেন একজন—আমাদের স্যার। সেই সময়ে স্যারের জীবনে যেসব গুরুতর ও জটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছিল ও যাদের কোন সমাধানই তিনি নিজে খুঁজে পাচ্ছিলেন না, মহারাজজী আদৌ জিজ্ঞাসিত না হলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ ভক্তদের উপলক্ষ করে সেই সমস্যাগুলির প্রত্যেকটিরই যথাযথ সমাধান করে দিয়েছিলেন। স্যারের মনে হয়েছিল মহারাজজী তাঁকে লক্ষ্য করেই এসব বলছেন। এবং এতে তিনি খুব অবাকও হয়েছিলেন।

যেসব কথাবার্তা হচ্ছিল আমরা যে তা খুব একটা বুঝছিলাম তা নয়। কিন্তু সেগুলি শুনতে আমাদের ভালই লাগছিল। সেখান থেকে উঠে আসতে ইচ্ছা করছিল না। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে আমরা চঞ্চল ছাত্ররা সেসব কথা শুনছিলাম। তখন তো ভাবতে পারিনি যে আমরা তখন শুধু দৃষ্টিপাতমাত্র জীবের মুক্তিদানে সক্ষম এমন একজন ঈশ্বরকোটি দেবমানবের সান্নিধ্যে ছিলাম। সেজন্যেই একটা অজানা আকর্ষণ বোধ করছিলাম। তাই অমন শান্তশিষ্ট হয়ে সেখানে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বাবুরাম মহারাজজী আসর ছেড়ে উঠে পড়লে অন্য সকলেও উঠে পড়েন, আর যে যার ইচ্ছামত অন্যত্র চলে গেলেন।

আমরা তারপর এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকি। মঠে আরও কিছুক্ষণ কাটাবার পর সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে স্যার আমাদের নিয়ে কলকাতা ফিরে চললেন। তার আগে স্যারের সঙ্গে আমরা সকলে ঠাকুরঘরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে আসি। সিঁড়ি থেকে নেমেই দেখি সেখানে বাবুরাম মহারাজজী দাঁড়িয়ে আছেন। তখন স্যার ও আমরা তাঁকে প্রণাম করি। সেইসময় স্যার তাঁকে জানান যে, আমরা এখনই ফিরব। তখন তিনি আমাদের সেখানে একটু দাঁড়াতে বলে নিকটস্থ ঠাকুরের প্রসাদ রাখার ভাঁড়ার-ঘরে গিয়ে স্বয়ং প্রসাদ নিয়ে আসেন, আর নিজের হাতে স্যার ও আমাদের প্রত্যেককে দেন। প্রসাদ-ধারণের পর আমরা যখন পুনরার তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিতে যাই, তখন তিনি স্যারকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—“আবার আসবি।”

স্যারও উত্তরে “হ্যাঁ” বলেন। এই শুভদিনটি থেকে স্যারের সঙ্গে আমাদের বেলুড় মঠে নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু হলো।

ঐ দিনের পর থেকে প্রতি রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনেও স্যার—কেবল তিনি একাই নন—আমাদের মধ্যে যতজনকে পারতেন সঙ্গে টেনে নিয়ে নিয়মিতভাবে বেলুড় মঠে যাওয়া-আসা শুরু করে দেন। যে স্যার একদিন আমাদের বিশেষ কিছু বিরূপ মন্তব্যসহ স্পষ্টভাবে বেলুড় মঠে যেতে নিষেধ করেছিলেন, এর মধ্যে এমন কি ঘটে গেল যার ফলে বেলুড় মঠে যাবার কথা জানানো মাত্র দ্বিরুক্তি না করে তিনি তাতে রাজি হয়ে গেলেন, আর প্রথম দিন যাবার পর থেকেই মঠে নিয়মিতভাবে যাওয়া-আসা শুরু করে দিলেন! এই ব্যাপার-দুটি আমাদের কাছে হেঁয়ালির মতোই রয়ে গেল।

কিছু সমস্যার সমাধান করে দেবার জন্য তখন তিনি কিছুকাল ধরে ব্যাকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তখনো সেসব সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ভগবানের প্রতি অভিমানেই তিনি মঠে যেতে চাননি, আর আমাদেরও সেখানে যেতে নিষেধ করেছিলেন। হয়তো এইটিই প্রথম দিকে বেলুড় মঠে আমাদের যেতে না দেওয়ার কারণ ছিল।

স্যারের নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে স্বামী নির্বেদানন্দ)। [ক্রমশঃ]

যৎকিঞ্চিৎ

ই তো আলো—এই তো আলো

কমলা সেন

কলকাতার তিনশো বছর নিয়ে আজ আলোচনা দিকে দিকে। কালের প্রবাহে তিনশো বছর কতটুকু! তবু কলকাতা ঐতিহাসিক নগরী। সারা দুনিয়া একে চেনে। দলে দলে মানুষ এখানে আশ্রয় নেয়। মাথা গোঁজার ঠাঁই মেলে, কিছু-না কিছু করে বাঁচা যায়, তাই আসে—না 'সোনার খনি' বলে আসে? অথচ কত দূরদূরান্তের মানুষও প্রয়োজনের তাগিদে এসে, বেড়াতে এসে এর প্রেমে পড়ে উপড়ে ফেলেছে স্বদেশের শিকড়। ভিনদেশী কতজন জীবন উৎসর্গ করেছেন এদেশের কল্যাণের জন্য! এই অনন্যা নগরীর ভেদ নেই, বিরাগ নেই—তাই এর ভালবাসার টানে কেউ না এসে পারে না!

স্মৃতির মণিমাণিক্য কুড়োতে চায় মন, পেতে চায় অতীতের সুগন্ধ। ভোরের আলো ফোটার আগেই ট্রামের ঘণ্টি ঘুম ভাঙাত। হোস পাইপের ফোয়ারা ধুয়ে দিত রাতের বাসি ধুলো। সুখশয়ন ছেড়ে মানুষ বেরিয়ে পড়ত আকাশের প্রসাদ পেতে, বুকভরে বাতাস নিতে। দুপুরে ভেসে আসত কাঁসরের ঠনঠন, সন্ধ্যেয় মুশকিল-আসান-এর টিমটিমে আলো, কুলপীমালাই-এর ডাক। 'চাই বেলফুল'-এর গন্ধ কি ভোলা যায়? দিনের কাজের চাকা চলত মৃদুমন্দ তালে। চলার পথে কুশল-বিনিময়। শান্ত জীবনযাত্রায় কৃত্রিমতার পলস্তারা নেই। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক। গরিব বড়লোকে পার্থক্য চিরকাল। কিন্তু ধনী-বাবুদের উৎসব-বিলাসে শুধু নয়, সৎ কাজেও ছিল অকুণ্ঠ দান। গোপনদানে কত দরিদ্রের বাঁচবার আশ্বাস।

হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির স্পর্শ হৃদয় জাগাত। সম্ভ্রমের দূরত্ব রেখেই বড়রা ছোটদের কাছে টানতেন। তারাও তাঁদের সম্মান রক্ষা করে চলত। জ্ঞানি-মনীষি-শিক্ষকদের চিন্তায়, কর্মে এমন একটা আলো ঠিকরে পড়ত যে, মানুষ আপনিই প্রণত হতো। শিক্ষক ছাত্রদের জাগাতেন, পুঁথির বাইরেও জীবনের পথ দেখাতেন। তারাও শাসনের আড়ালে হৃদয় চিনতে ভুল করত না। দেশপ্রেমিক নেতাদের কাছে প্রেরণা পেয়ে মহৎ মানুষের জীবন-বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণদল দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত। মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ভাঙিয়ে দিত মৃত্যুর ভয়।

গ্রামের মানুষ 'আজব শহর' কলকাতায় এসে দেখত আলোর রোশনাই, কল টিপলেই জল, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেন্ট—কত কী! গঙ্গায় পুণ্যস্নান, কালীঘাটের জাগ্রত কালীকে প্রণাম, আবার হাইকোর্ট দেখার সাধ। ছেলে-নাতিকে নতুন রূপকথা শোনাতে হবে যে! এই বিচিত্র রঙ্গভরা কলকাতাকে নিয়ে কবি-কবিয়ালেরও কত কবিতা-ছড়া!

কলকাতার মানুষ বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায় জীবনের অর্থ খুঁজে পেত। কত বড় মাপের মানুষ জন্মেছেন এখানে, নানা দেশ থেকেও কত বড় মানুষ এসেছেন। তাঁদের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জীবনাদর্শ জাগিয়েছে এদেশের মানুষকে। স্বার্থহীন কল্যাণকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন যুবশক্তিকে। তাঁরা মানুষের মূল্য হারাতে দেননি, প্রলোভন, মিথ্যার কাছে মাথা নত করতে দেননি। কত মহৎ প্রতিভা ভাবীকালের জন্য সম্পদ রেখে গেছেন। এই কলকাতা ধনী, মধ্যবিত্ত, গরিব, মূর্খ, জ্ঞানী সকলের।

এর বুকে ঠাঁই পেয়ে, একে ভালবেসে মানুষ ধন্য। তবু বেরিয়ে পড়ে তীর্থের দেবদেউল, ইতিহাসের ভাঙাগড়া। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের আকর্ষণে ভিতরকার একটা বিবাগী-সত্তাই বুঝি সেসব টেনে বার করে। ঘরের বাইরেও এত অপার বিস্ময়। ভিখারি তখন রাজরাজেশ্বর, ভোগী হয় মুক্ত সন্ন্যাসী, একদিন ফিরে আসে পরিক্রমা-শেষে—এই কলকাতারই প্রেমের টানে।

তারপর কলকাতার রং, মন বদল হতে লাগল। ভিতরে ভিতরে একটু যেন ভাঙন ধরল। হৃদয়ের

দেওয়া-নেওয়ায় দেনা-পাওনার চুলচেরা হিসাব দেখা গেল নানা ক্ষেত্রে, জীবনস্রোতের এখানে-ওখানে কাদা উঠল ঘুলিয়ে। প্রাণের সহজ সুরটি হঠাৎ হঠাৎ বেসুরো বাজতে লাগল। বড়রা নিজেদের কালের গর্বে পরের প্রজন্মকে ঠিক বুঝতে চেষ্টা করলেন না। আহত যৌবন প্রতিবাদের ঝড় তুলল। ফাটল ধরল শ্রদ্ধা আর স্নেহের সম্পর্কে। বেকার ছেলেদের অনেকেই ঘরের তাড়া খেয়ে বাইরেটাকে আশ্রয় করল। নেতাদের বক্তৃতায় পথের সন্ধান পেল না। অথচ রাজনীতির বুলি কপচে, তুচ্ছ আলোচনায় মেতে উঠল। নানা দলের স্বার্থে বিকিয়ে যেতে লাগল যুবশক্তি। তরুণদল রূঢ় বাস্তবকে ভুলতে চাইল উগ্র উল্লাসে বারোয়ারী পূজায়, উৎসব-অনুষ্ঠানে মেতে উঠে। ব্যর্থতার লজ্জায় কত ছেলে আশ্রয় খুঁজল গোপন ভ্রান্ত পথে। সকলের উপর, নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ‘আত্মহননের’ পথ বেছে নিল।

বাঙালীর বুদ্ধির প্রশংসা সর্বত্র। কিন্তু মোহে পড়ে বুদ্ধিমানও মাঝে মাঝে পথ ভুল করে। অনুকরণের মোহে, উপকরণের জোলুসে ভুলে বাঙলা প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। উৎসবে, নিমন্ত্রণে হৃদয়ের অনুভব, আনন্দের শুদ্ধতা ম্লান হয়ে গেল। ‘আরো চাই’-এর ক্ষুধার ছোঁয়াচ ছোটদেরও লাগল।

আত্মকেন্দ্রিক মানুষ অগণিত লোকের মাঝেও নিঃসঙ্গ। প্রতিবেশীর সুখদুঃখের খবর রাখার সময়ই বা কোথায় ব্যস্ততার যুগে? শহরের চেহারাটাই যেন অচেনা হয়ে উঠল। অজস্র দোকানপাট সর্বত্র। পথও আর পথিকের নয়—কোথাও হকারের, কোথাও ভিখারির। বাঁচবারই প্রয়োজনে বোধকরি মস্ত মস্ত বাড়ি মাথা তুলল আকাশপানে। বড় গর্বের সেনেট হল অন্যরূপ নিল। ময়দান, আউটরাম ঘাট আর তেমন মন ভরাতে পারে না। কলকাতা থেকে সবুজও বিদায় নিল। আলোর রোশনাই আর বাইরের চেকনাইতে ঢাকা পড়ে না, বুকের ভাঙাচোরা মানুষ পথ খোঁজে—কোথায় হৃদয় জুড়াতে পারবে। ধর্মের চেয়ে ধর্মের মোহে পড়ে ভক্তিগদগদ মানুষ পূজারীর হাতে পূজার উপচার তুলে দেয়। দেবতা ব্যথিত নয়নে খোঁজেন—ভক্ত কোথায়! আশ্রমে, মঠে সর্বত্যাগী মানবপ্রেমিক সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে প্রাণের বেদনা জানিয়ে শান্তি পেতে চায়। কিন্তু নেবার মনই যে হারিয়ে গেছে।

দরদী মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ চেষ্টা করতে লাগলেন, কলকাতাকে জীবনবোধে জাগাতে, ভ্রান্তিমোচন করে পথের সন্ধান দিতে। জন্মনগরীর নানাসমস্যা, যন্ত্রণা দেখে রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই ব্যথিত হৃদয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেনঃ “সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক।...ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিতে অবিচলিত করিয়া রাখুক।” জীবনধর্মে বিশ্বাসী কবি বললেনঃ

“Calcutta lives on itself ··· Our towns should mirror our national cultures and artistic sensibility. I look forward to a Calcutta which would reflect the ideal” সত্যই “If Calcutta is a city of challenge, it is also a city of hope”—কবি বলেছেন।

হিমালয়-প্রেমী উমাপ্রসাদ বলেছিলেনঃ “দেখ, কলকাতাসুন্দরীর কত রূপ! খানাখন্দে ভরা ইঁট-পাথরের শহরটাতে ঋতুরঙ্গলীলার অকুণ্ঠ প্রকাশে এখনো মন ভোলায়। ছেলেবেলার মতো মেঘে মেঘে ইচ্ছে মতো কত ছবি দেখতে পাই। তোমরা এখানে নিত্য পাহাড়ে চড়, অতল খাদ, জলপ্রপাতের শতধারা দেখতে পাও। চিনে নাও কলকাতাকে—তারপর আপন করে পাবে দুর্গম হিমালয়কে।”

জলে-ভাসা, হাজার ফাটল-ধরা, জঞ্জালের পাহাড়-তোলা কলকাতার এমন ভালবাসামাখা সকৌতুক পরিচয় কজন দিতে পারেন? দেশকে চিনে নিয়ে তার ধ্যানে ডুবতে পারলে তবেই ঠিক ভালবাসা যায়। কলকাতার তিনশো বছরেও তার বলিচিহ্নহীন রূপ দেখার নয়ন পেলে তবেই তার

'রূপের পাথারে' মন হারিয়ে যেতে পারে।

জঞ্জালের বুকে জেগে-ওঠা চারাগাছটার সবুজ লাবণ্য মুগ্ধ করে—ওখানেই ও পেয়েছে প্রাণের রস, পুজোর দিনে। বড় দিনে কলকাতা আলোর মালায় সাজে। অগুনতি মানুষ পথে। তাদের চলায়, হাতের ভঙ্গিতে, চোখের চাউনিতে কত কথা! এই তো কল্লোলিনী তিলোত্তমা! জনসমুদ্রের কল্লোল-গানে মুখর কলকাতা প্রাণদায়িনী সুধা বুকে নিয়ে ডাকছে সকল পথের, সকল মতের মানুষকে। ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ নিয়েও ভালবাসার বিপুল শক্তিতে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত তার হৃদয়ের সুর বাজছে মঠে-মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে—মন্ত্রে স্তবে আজানে, ঢাকের বাদ্যিতে। আর শান্তির সুর শুনিয়ে বয়ে চলেছেন তাপহারিণী গঙ্গা।

এক সাধু বৃন্দাবনে গেলেন। বৃন্দাবনের রজঃ অঙ্গে মেখেও নয়ন রইল শুষ্ক। কেন কান্না জাগে না! আর্তহৃদয়ে ফিরে এসে ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরে। সহসা কী বুকফাটা কান্না! চোখের জলে ভিজে গেল পথের ধূলি। সেই ধূলি মাথায় তুলে নিলেন সাধু, মাখলেন সারা অঙ্গে—ঠাকুর কি বৃন্দাবনেই, এখানে নন! কেন এমন ভুল হলো!

কলকাতার বুকেও কত তীর্থ। দেবালয়, মহৎ মানুষের লীলাধাম। মানুষ চলে আর মাথা নোয়ায়। পরমপুরুষের ডাক আকাশে-বাতাসে আজও ছড়িয়ে আছে। বিশ্বজননী সারদা বাগবাজার থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর ভালবাসার আলো। ঐ সিমলে থেকে বেরিয়ে এলেন দামালছেলে বিবেকানন্দ, ভয় ভাঙলেন সকলের—আত্মবিশ্বাসের বীর্যের, প্রেমের মন্ত্র শুনিয়ে। স্বদেশ ছেড়ে এদেশকে মাতৃভূমি জেনে মানুষকে ভালবেসে যিনি আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁর পায়ের ধূলি এখনো কলকাতার পথেপথে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে, প্রণাম সেই ভারত-ভগিনী বিদেশিনী মহীয়সী নিবেদিতাকে যিনি এই বাগবাজারের বোসপাড়ায় তিল তিল করে নিজের সবটুকু ভারতকে নিংড়ে দিয়েছিলেন। ঐতো বিশ্বকবির বাসভবন জোড়াসাঁকোয়। পুরনো আমহার্স্ট স্ট্রীটে ঐতো নবজীবনের অগ্রদূত রামমোহনের বাড়ি। একটু এগিয়ে গেলেই দেখা পাবে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের নিবাস—মহাজ্ঞানী থেকে দীনতম মানুষটিও যাঁর কাছে ঋণী—বীর্যে আর ভালবাসায় জাগালেন যিনি মানুষের মূল্যবোধ, ঘোচালেন অশিক্ষার অন্ধকার। দেশপ্রেমের পাঠ নাও নেতাজীর কাছে। 'বাংলার বাঘ'-এর হুঙ্কারও কান পাতলে শুনতে পাবে। উজ্জ্বল সংস্কৃতির গৌরবময় পীঠস্থান আজও এই মহানগরী। সাহিত্যরসিক বাঙালীর বইমেলা কলকাতার মতো এমন আর কোথায় জমে? জ্ঞানী আর সাধারণ এক হয়ে মেলে—অ-পাঠকেরও বইপড়ার নেশা ধরে যায়। বিশ্ববন্দিত শিল্পীরা আসেন কলকাতার সমজদার শ্রোতার হৃদয়হরণ করতে। কলকাতার মন জয় করতে পারলেই না খেলোয়াড়দের খেলার সুখ! আর কলকাতার ছেলেদের কথা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ওদের একজনও যদি ভ্রান্ত আদর্শে পথ হারায়, তবে তার জবাবদিহি আমাদেরই করতে হবে। কোথাও কারো বিপদ দেখলে এরাই বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের মতো হয়ে যায়। সত্যপথের সন্ধান পেলে এরাই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। যুগে যুগে দেশে দেশে আনে বিপ্লব, সর্বস্ব ত্যাগ করে, হাসতে হাসতে প্রাণ দেয়। এই কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"জীবনে ক্ষত আছে, যন্ত্রণা আছে। তবু বাঁচতে হবে, হাসতে হবে। নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচাও। সেই তো জীবন।"

মৃত্যুভীত মানুষ এই অমৃতকথা শুনে ভয় থেকে, অবিশ্বাস থেকে উত্তীর্ণ হবে। যুবকদের জাগরণের জন্য আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পরমপ্রেমিক, মহাত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দকে। তাঁর সকল কর্মে, সকল বাণীতে প্রকাশিত দেশের যুবশক্তির উপর অন্তহীন বিশ্বাস এবং আশা। কলকাতার যুবকদের প্রতি তাঁর 'কলকাতা অভিনন্দনের উত্তর' চিরদিন আলো দেখাবে।

ক্রীড়া-সমীক্ষা

উপেক্ষিত কবাডি ও বাংলার মেয়ে

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন তাঁর দেশের ছেলেমেয়েরা সতেজ মন ও সুগঠিত শরীরের অধিকারী হোক। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার, ফুটবল প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। কবাডি নামক দেশীয় খেলাটি সম্পর্কে স্বামীজী কিছু বলেছেন বলে জানি না, তবে খেলাটি শরীরচর্চার তথা মানসিক সতর্কতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। সাবেককালের পুরনো হাডুডু খেলাই কবাডি হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বড় অবহেলিত এই খেলা। তবে কবাডিতে বাংলার মেয়েরা অনেক এগিয়ে রয়েছে। কবাডি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া তৈরি হয় ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলার মেয়েরা প্রথম কবাডির জাতীয় আসরে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় প্রথমে খেলা হয়েছিল কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। বাংলার অধিনায়ক ছিলেন বুটা খাটুয়া। সে-বছর বাংলা রানার্স হয়। বোম্বাইয়ের মেয়েরা ছিনিয়ে নেয় জয়ের পতাকা, কিন্তু এর পরের বছর থেকেই বাংলার কবাডি খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলার মেয়েরা আবার জাতীয় আসরে ফিরে এল ১৯৭২-এ। হায়দ্রাবাদে বাংলার মেয়েদের কবাডির কোর্টে দেখা গেল। জাতীয় কবাডির আসরে বাংলার দল আবার রানার্স হলো ১৯৭৪-এ আসানসোলে। তারপর পরপর দুবছর রানার্স হলো বাংলার মেয়েরা এবং তারপর শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিনিয়ে নিল একটানা বিশবছর বিজয়ী মহারাষ্ট্রের কাছ থেকে বাঙ্গালোরের মাটিতে। সেবারের অধিনায়ক ছিলেন দীপ্তি ভট্টাচার্য। এরপর বাংলার মহিলা কবাডিতে এল ভাঁটার টান। জোয়ার এল ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে। ১৯৮২ ছাড়া জয়ের মুকুট বাংলার ঘরেই রয়েছে।

গত ৪ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি (১৯৮৯) মহারাষ্ট্রের অমরাবতী স্টেডিয়ামে জাতীয় কবাডির আসরে প্রায় বার হাজার দর্শকের সামনে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে জয়ের মুকুট ঘরে আনল বাংলার মেয়েরা। বিদর্ভ কবাডি এসোসিয়েশনের অধীনে হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডল এই খেলার আয়োজন করে। বাংলা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়। কোয়ার্টার ফাইন্যালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ও ফাইন্যালে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলার অধিনায়কত্ব করেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মণিকা নাথ। সমগ্র প্রতিযোগিতার মান বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পান বাংলার মেয়ে রমা সরকার। রমা নদীয়া জেলার চাকদা অঞ্চলের মেয়ে। স্থানীয় কলেজে তিনি বি. এ. পড়ছেন। বাংলার মেয়েরা সেমিফাইন্যালে পাঞ্জাবকে ৬৫-২৭ পয়েন্টে ও ফাইন্যালে মহারাষ্ট্রকে ৩৬-২৮ পয়েন্টে হারায়।

বাংলার মহিলাদের প্রশিক্ষক বরুণ ব্যানার্জী। তবে মহিলা কোচও পশ্চিমবাংলায় আছেন সুস্মিতা ব্যানার্জী ও ভবানী সাধুখাঁ। বাংলার জুনিয়র মেয়েরাও জাতীয় কবাডির আসরে পিছিয়ে নেই। তারা ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত জাতীয় প্রতিযোগিতায় একটানা জয়লাভ করে চলেছে। বাংলার মেয়েরা '৮২-এর এশিয়ান গেমসে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে। বাংলার মেয়েরা ইতিমধ্যে জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, মঙ্গোলিয়া, নেপাল ও ভুটান সফরে ভারতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করছে।

কিন্তু এই সাফল্যের মধ্যে আছে কিছু করুণ সুরও। সাজসরঞ্জাম, ব্যায়ামাগার, বিজ্ঞান-ভিত্তিক কোচিং, পুষ্টিকর আহার এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে বাংলার মেয়েরা ভুগছে। এইসব অবস্থার মধ্যে দিয়েও গত বছর অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন রমা সরকার।

এসব সত্ত্বেও কবাডি কেন গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল না ? এ প্রশ্ন আজ সবার। শুধুমাত্র নদীয়া, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরে এর প্রসার ঘটেছে। কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় কবাডির আন্তর্জাতিক আসর বসছে। গ্রামের মেয়েরা দলে দলে আসছে এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে—এটাই আশার আলো।

পরমপদকমলে

কেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর সাহস করে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। অসন্তুষ্ট হবেন না। আপনি বললেন, 'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে ; টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে, ডাকার মতো ডাকতে হয়।' আপনি গান ধরলেন, 'ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।' গান শেষে বললেন, 'ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হয়। তারপর সূর্য দেখা দেবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান।' সেইখানেই আমার অভিমান। তিনি আমার মা। শ্যামা মা। নির্জনে বসে আমি মাকে বললুম—'মা, তুমি আমাদের কেমন মা? কতকাল ধরে সেই একই কথা শুনে এলুম—আমি তোকে দুঃখ দোবো, জ্বালা-যন্ত্রণা দোবো, তোর সব কিছু কেড়ে নোবো, কেন? না, তাহলে তুই আমাকে ডাকবি। যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ। বা, কথা! আমি যদি তোমার ছেলে হই, তাহলে তুমি আমাকে কাছে ডাকবে না কেন! তোমার সামান্য কৃপায় তো আমার মন ঘুরে যেতে পারে। দেহ যখন দিলে, তখন দেহের প্রয়োজনে তো আমাকে জীবিকা খুঁজতেই হবে। হা অন্ন! হা অন্ন! এ তো মা তোমারই খেলা। অন্নদাস করেই তো পাঠালে। পাশাপাশি পাঠিয়ে দিলে অন্নদাতা। তোমার সৃষ্টির প্রয়োজনেই তুমি পুরে দিলে সংসার-বাসনা। সংসারের প্রয়োজনেই বিবাহ। বিবাহ মানেই সন্তানাদি। আমার ইচ্ছেতে তো কিছু হয়নি মা। সবই তোমার ইচ্ছে। সাধকই তো বলছেন—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। তুমি আমাকে সংসারের চক্রে ফেলবে। দাসত্ব করাবে। হা অন্ন, হা অন্ন করে দিগ্বিদিকে ছোটাবে। তারপর তুমিই আমাকে সংসারবদ্ধ জীব বলে ঘৃণা করবে। সেভাবে তোমাকে ডাকা হলো না বলে সরে থাকবে। এ তোমার কেমন বিচার! আমার জাগতিক মা কি আমাকে দিনান্তে ডেকে ঘরে তুলতেন না! আমার জন্যে ব্যাকুল হতেন না! আমি ভুলে থাকলেও তিনি তো আমাকে ভুলতেন না। আর তুমি জগৎ-মাতা হয়ে এই ব্যবস্থা করলে যে, আমাকে যতরকম বিপদে ফেলে আমাকে দিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদাবে। আমার জীবিকা টলোমলো হবে, পুত্র-কলত্র অকালে চলে যাবে, মামলা-মকর্দমা, চূড়ান্ত অপমান, সবই আমাকে সহ্য করতে হবে। সব হারিয়ে সর্বহারা হয়ে আমি তোমাকে ডাকব। তাতেও তোমার কৃপা হবে কিনা কে জানে! এমনই অনিশ্চিত ব্যাপার। তখন সাধকরা বলবেন—এক জন্মে কি হয় বাবা! কত জন্ম সাধনা করলে তবেই না মাকে পাওয়া যায়! আবার এও শুনলুম, মিনমিনে আস্তিকের চেয়ে নাস্তিক ভাল। শত্রুরূপে ভজনা। কংসের মতো, মহিষাসুরের মতো, রাবণের মতো। আমার বড় অভিমান মা তোমার ওপর। একবারও কি আমার কথা তোমার মনে পড়ে না! তাহলে সাধক কেন বললেন—কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়। আমার জাগতিক মাতা যদি আমার প্রতি উদাসীন হতেন, জগৎ কি তাঁকে ক্ষমা করত। আর তুমি জগৎ-মাতা বলে সবকিছুর ঊর্ধ্বে! তোমার বিধানই বিধান, আর আমার অভিমান ভেসে যাবে? সারাটা জীবন আমি অনাথের মতো ঘুরবো? সংসারের খিদমৎ খেটে যাবো। খারাপ

যা-কিছু হবে, সবই আমাকে ভেবে নিতে হবে, তোমার পরীক্ষা। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলতে হবে, মা, সবই তোমার পরীক্ষা, তুমি যা করছ সবই আমার মঙ্গলের জন্যে। সাধক বলবেন—'মাকে হেরব বলে ভাবনা তোমরা কেউ করো না আর।/সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার।/ছেলের মুখে মা, মা বুলি শুনবে বলে শিবরানী/আড়াল থেকে শোনে, পাছে দেখলে যদি না ডাকে আর।' কি সুন্দর! সারা জীবন আমি ছটফট করব, আর তুমি আড়াল থেকে দেখবে। কারণ, দর্শনমাত্রই আমার ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি একবার দেখা দিয়ে দেখ না, আমার অবস্থাটা কি হয়!'

ঠাকুর আপনিই বলুন। আপনারও তো এই একই অভিমান হয়েছিল। রামপ্রসাদকে দেখা দিলি মা, আমাকে দেখা দিলি না, বলে মায়ের হাতের খড়্গ নিয়ে নিজের জীবন বলি দিতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই এক রোকে মায়ের দর্শন পেলেন। তারপর কি হলো আমরা সবাই জানি। টাকা মাটি হলো, মাটি টাকা হলো। আপনি পরমপুরুষ, আমি শুধুই পুরুষ। তাহলে অহৈতুকী কৃপা কথাটা কোথা থেকে এল? বৃষ্টিধারায় পৃথিবী স্নাত হয়, তার জন্যে পৃথিবীকে তো সাধনা করতে হয় না। তার সুন্দর ব্যবস্থা তো তিনিই করে রেখেছেন সৃষ্টিকালে। তিনের চার ভাগ জল করলেন আর একের চার ভাগ স্থল। সূর্যকে এনে বসালেন গ্রহরাজির মাঝখানে। স্থল যেই উত্তপ্ত হলো বাতাস উঠে গেল ওপরে। জলকণা নিয়ে বাতাস ছুটে এল জলভাগ থেকে। জলকণা উড়ে গেল মেঘের পেখম মেলে। ঊর্ধ্বাকাশের শৈত্যে জমে বিদ্যুতের স্পর্শে নেমে এল বারিধারা হয়ে। কাল থেকে কালান্তর এই আবর্তনই চলবে। বিজ্ঞানের হাতে পৃথিবীকে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমাদের জীবন! কৃপাধারা কেন আসে না অযাচিত। আমাদের জীবনও তো সংসার-কটাহে উত্তপ্ত হচ্ছে নিয়ত, মন উড়ে যাচ্ছে বিষয় থেকে। বিষয় মনে হচ্ছে বিষ। অবিরত মন বলছে—মা তুমি কোথায়? বলছে—মন চল নিজ নিকেতনে/সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।/বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন।' তবু মা আসেন না। ক্ষণিকের তরেও না।

ঠাকুর আপনি বললেন, 'বিড়ালের ছানা কেবল মিউমিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনো হেঁশেলে, কখনো মাটির ওপর, কখনো বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউমিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।' তাই যদি হয়, তাহলে আর কবে তিনি আসবেন! অবিরতই তো মিউমিউ করছি। আপনি বলেছিলেন, ঈশ্বর মন দেখেন। মনে-মুখে এক হতে হবে। সে পরীক্ষাও দিতে রাজি আছি। 'আর কবে দেখা দিবি মা! হর মনোরমা! দিন দিন তনুক্ষীণ, ক্রমে আঁখি জ্যোতিহীন।' আর একটা জীবনও তো চলে গেল।

মা যদি সংসারী জীবকে এলে দেন তাহলে তারা তো আরও নষ্ট হয়ে যাবে। আরও বখে যাবে। মায়ের সংসার মা কেন গোছাবেন না! কেন মা আমাকে শাসন করে পথে আনবেন না! জীবনের পর জীবন নষ্ট হতেই থাকবে। তারপর একজীবনে আমি মায়ের দর্শন পাব। আপনি বললেন, 'তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চোখে তাঁকে দেখে, সেই কানে তাঁর বাণী শোনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গযোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সঙ্গে রমণ হয়। ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই তো চারদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারদিকে হলদে দেখা যায়। তখন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়।'

ঠাকুর, সবটাই আমার দিকে। আমাকে হতে হবে। মা কেন হওয়াবেন না?

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

মানুষ কেন নেশা করে

শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত*

নেশা কাকে বলে ?

যেকোন পদার্থ কিংবা অভ্যাসের উপর অতিরিক্ত আসক্তিকেই সাধারণ ভাষায় নেশা বলে। কিন্তু চিকিৎসকদের প্রয়োজন একটি সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। সব চেয়ে বেশি প্রচলিত সংজ্ঞা দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা (W. H. O.)। সংজ্ঞাটি হলোঃ

(১) একটি পদার্থ গ্রহণ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন এবং যেকোন উপায়ে পদার্থটি যোগাড় করার অদমনীয় প্রচেষ্টা।

(২) পদার্থটির মাত্রা বাড়ানোর প্রবণতা।

(৩) পদার্থটির উপর মানসিক নির্ভরতা এবং সেই পদার্থটির ক্রিয়ার উপর এক ধরনের শারীরিক নির্ভরতা।

(৪) ব্যক্তি ও সমাজের উপর অনিষ্টকর ক্রিয়া।

এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থা দিয়েছেন নেশায় অভ্যস্ত হবার সংজ্ঞাঃ

একটি পদার্থ বারবার গ্রহণের ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যার বৈশিষ্ট্যের ভিতরে রয়েছে

(১) যে ভাললাগা-বোধ এই পদার্থ সৃষ্টি করে সেই বোধকে ধরে রাখার জন্য পদার্থটি নেবার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অদম্য আকাঙ্ক্ষা নয়।

(২) মাত্রা বিভাগের কোন প্রচেষ্টার অভাব কিংবা সামান্য প্রচেষ্টার অস্তিত্ব।

(৩) পদার্থটির উপর খানিকটা মানসিক নির্ভরতা, কিন্তু শারীরিক নির্ভরতার অভাব। সুতরাং সে-পদার্থ গ্রহণ করলে শারীরিক কোন অসুবিধা হয় না।

এই সংজ্ঞাতে দুটি জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমতঃ মাদক শব্দটির ব্যবহার নেই। সব সময় পদার্থ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে আজকাল চিকিৎসকরা মাদকাসক্তি কথাটি ব্যবহারই করেন না। এখন এই রোগটির নাম 'পদার্থের অপব্যবহার' কিংবা 'পদার্থের অপব্যবহারজনিত রোগ'।

দেখা গিয়েছে মাদকরূপে পরিচিত নয় এমন বহু পদার্থেরই অপব্যবহার মানুষ করে। যেমন, পেট্রোলের গন্ধ শোঁকা, বার্নিশের গন্ধ শোঁকা, এ্যাসপিরিন খাওয়া ইত্যাদি।

এই জন্যই আমরা 'মাদকাসক্তি' শব্দটি ব্যবহার না করে, 'পদার্থের অপব্যবহার' নামই ব্যবহার করি।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, নেশার দুটি প্রধান লক্ষণঃ

(১) পদার্থটির মাত্রা বাড়ানোর প্রবণতা। অর্থাৎ সুখানুভূতি পেতে হলে ক্রমশঃই পদার্থের মাত্রা বাড়াতে হবে।

(২) পদার্থটি গ্রহণ করা বন্ধ করলে শারীরিক এবং মানসিক অস্বস্তি।

প্রথম বৈশিষ্ট্যের নাম সহিষ্ণুতা (Tolerance) আর দ্বিতীয়টির নাম বিরতিলক্ষণ (Withdrawal Symptoms)।

এই দুটি লক্ষণ, বিশেষ করে বিরতিলক্ষণই মাদক ব্যবসায়ের প্রধান ভিত্তি।

নেশার শ্রেণীবিভাগ

চিকিৎসকরা সাধারণতঃ মাদককে চারভাগে ভাগ করেন। যথা—

(১) যেগুলিতে স্নায়ুর ক্রিয়া অবদমিত হয়। যেমন মদ, বারবিটিউরেট (সোনেবিল, লিগাটন ইত্যাদি)। বেন্‌জোডায়াপিন (কামপোজ, ভ্যালিয়াম, নাইট্রোসান ইত্যাদি।) মিথাকুয়ালোন (ম্যানড্রাক্স প্রোডোম ইত্যাদি)। এবং আফিম। আফিমের অনুরূপ কিংবা আফিম থেকে তৈরি অন্যান্য মাদক যথা—কোডিন, মরফিন, হেরোইন, মেথিডিন ইত্যাদি।

---

* 'সতুবদ্যি' ছদ্মনামে লেখকের অনেকগুলি গ্রন্থ রয়েছে।—সংযুক্ত সম্পাদক

এগুলি স্বল্পমাত্রায় খেলে একটা আনন্দদায়ক প্রশান্তি দান করে আর বেশি মাত্রায় খেলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অত্যন্ত বেশি খেলে মৃত্যুও হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তেজক। এর ভিতরে রয়েছে ক্যাফিন (চা, কফি ইত্যাদি), নিকোটিন (তামাক, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি)। তাছাড়া রয়েছে অ্যামফিটামিন, কোকেন, এফেড্রিন ইত্যাদি। এগুলি স্নায়বিক উত্তেজক। এই মাদকে বেশি সময় কাজ করা যায় আর ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন কমে যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর মাদক অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে। এগুলির ভিতরে রয়েছে মেসকালিন, এল-এস-ডি, (লাইসারজিক অ্যাসিড ডাইইথাইল অ্যামাইড) ইত্যাদি।

গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধি, চরস ইত্যাদিও অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে। তবে এগুলির সঙ্গে অলীক অনুভূতি সৃষ্টিকারী অন্যান্য মাদকের কিছু পার্থক্য থাকার দরুন এগুলিকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মাদক বলা হয়।

এই শ্রেণীবিভাগ চিকিৎসকদের খুব কাজে লাগে।

নেশাগ্রস্তরা হামেশাই একটি মাদক না পেলে সেই গোষ্ঠীর অন্য মাদক ব্যবহার করে। ধরা যাক একজন নেশাগ্রস্ত হেরোইনে অভ্যস্ত। হঠাৎ কোন কারণে তার পক্ষে হেরোইন সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে দেখল তার পক্ষে মদ কিংবা ভ্যালিয়াম সংগ্রহ করা সম্ভব। সে তখন মদ কিংবা ভ্যালিয়ামের নেশা ধরতে পারে। সে নিজে কিংবা তার পরিবার-পরিজন ভাবতে পারে রোগী এখন নেশামুক্ত, কিন্তু সে তখনো চিকিৎসকদের কাছে নেশাগ্রস্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বের যে-সমস্যা নিয়ে সে হেরোইন খেয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছিল, সেই সমস্যা নিয়েই সে ডাক্তারের কাছে আবার ফিরে আসে।

মাদকের শ্রেণীবিভাগ আরো অনেক রকম হতে পারে। একটি শ্রেণীবিভাগ—আইনী আর বেআইনী

হেরোইন সবসময় বেআইনী। কিন্তু আফিম সরকার অনুমোদিত দোকান থেকে কিনলে আইনী। আবার অননুমোদিত দোকান থেকে কিনলে বে-আইনী। মদ, গাঁজা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

সম্পূর্ণ বেআইনী মাদকের সঙ্গে অপরাধ জগতের সম্পর্ক নিকটতর, কিন্তু মদ-গাঁজার মতো আংশিক বেআইনী মাদকের সঙ্গে অপরাধ জগতের সম্পর্ক অতটা নিকট নয়।

আর একরকম মাদক সম্পূর্ণ আইনী। যেমন কাফ সিরাপ। এগুলি চিকিৎসকরা ব্যবহার করেন এবং রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দেন। কিন্তু এগুলি পাওয়া যায় ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই। রোগীরা একবার নেশাগ্রস্ত হলে এগুলি আইনানুগ উপায়েই সংগ্রহ করতে পারেন। কাশির ওষুধে থাকে কোডিন আর এফেড্রিন। কোডিন আফিম-এর একটি উপাদান। তৈরি হয় আফিম থেকে। তাছাড়া এফেড্রিনের ও মানসিকবৈকল্য সৃষ্টির ক্ষমতা আছে।

সুতরাং নেশা হিসাবে অনেক নেশাখোরই কাশির সিরাপ পছন্দ করেন। অর্থাৎ কাশির চাইতে কাশির ওষুধ অনেক বেশি বিপজ্জনক। বলা যায়, এরকম হাজারো ওষুধে-নেশা প্রসারিত হয় ডাক্তারদের মাধ্যমে। অ্যাসপিরিন থেকে শুরু করে তাবৎ বেদনানাশক ওষুধ নেশা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যতরকম হাঁচি-কাশির ওষুধ আছে তার খদ্দেরের ভিতরে নেশাখোররাই সংখ্যা-গুরু। ঘুমের ওষুধের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

তথাকথিত পেটের অসুখ অর্থাৎ অম্বল থেকে শুরু করে পায়খানার গোলমাল পর্যন্ত সব রকম অসুখের ওষুধেরই বাজার সৃষ্টি করার প্রধান কায়দা নেশা ধরিয়ে দেওয়া। টনিক বলে কোন পদার্থের অস্তিত্ব চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বীকার করে না। স্বীকার করে না যৌন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে এরকম কোন ওষুধের অস্তিত্ব, অথচ এজাতীয় ওষুধ আছে হাজারে হাজারে। এগুলিরও প্রধান খরিদ্দারদের বেশির ভাগ নেশাগ্রস্ত।

আইনানুগ হলেও মাদক হিসাবে এগুলি খুবই বিপজ্জনক। মরফিন, পেথিডিন, পেন্টাজোসিন ইত্যাদি মাদক যখন ডাক্তাররা ব্যবস্থা দেন তখন

এগুলি 'আইনী', কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মেনে রোগীরা যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের এগুলি সংগ্রহ করতে হয় চোরাবাজার থেকে। একই মাদক তখন হয়ে দাঁড়ায় 'বেআইনী'।

'বেআইনী' আর 'আইনী' শ্রেণীবিভাগ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কোন্ মাদকের সঙ্গে অপরাধ জগৎ কতটা জড়িত।

এছাড়া মাদকের শ্রেণীবিভাগ করা যায় সামাজিক অনুমোদনের ভিত্তিতে। আমাদের দেশে তামাকের সামাজিক অনুমোদন রয়েছে। কেউ সিগারেট খেলে আমরা তাকে নেশাগ্রস্ত বলি না। পাশ্চাত্য সমাজে সামাজিক যোগাযোগের সময় মদ্যপান করাকে কেউ নেশা করা বলে না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ সমাজে মদ্যপানের সামাজিক অনুমোদন নেই। আর সামাজিক অনুমোদন না থাকলে যাঁরা নেশা করেন তাঁদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বাড়ে। এমনিতেই নেশাগ্রস্তরা পরিবার আর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। মাদকের যদি সামাজিক অনুমোদন না থাকে তাহলে তাঁদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আরো বাড়ে।

নেশায় কি ক্ষতি হয়?

জীবনসংগ্রাম সর্বকালেই জটিল। এ সংগ্রামে প্রতি স্তরে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। এই জ্ঞান আমরা আহরণ করি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অতীত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সাহায্যে। নেশা করলে বিকৃত হয় অনুভূ [illegible] ফলে আমাদের প্রেরণা আর কর্মও হয় ভ্রান্তিমূলক। ফলে যেকোন নেশাই মানুষকে জীবনসংগ্রামে অপটু করে। এছাড়া সবচাইতে বড় ক্ষতি হয় মানুষের ভালবাসার বন্ধনের। সামাজিক বন্ধনের একটি প্রধান ভিত্তি ভালবাসা। বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী প্রত্যেকের সঙ্গেই সম্পর্কের ভিত্তি ভালবাসা।

নেশাগ্রস্তের কিন্তু প্রধান বন্ধন মাদক। ব্যক্তিত্বের চরম অবনতির সময় তার একমাত্র বন্ধন হয়ে দাঁড়ায় মাদক। সে-অবস্থায় তার স্বাভাবিক পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না।

নেশাগ্রস্তের মনের অবক্ষয়ের আর একটি লক্ষণ নাবালকত্ব। সাবালকের প্রধান লক্ষণ তাদের নিজের এবং অপরের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা। নাবালকের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার অভিভাবক। নেশাগ্রস্ত রোগী অপরের দায়িত্ব কিংবা নিজের দায়িত্ব কোনটাই গ্রহণ করতে পারে না। তার মনের অবক্ষয়ের সঙ্গে সে ক্রমশঃই অপরের মুখাপেক্ষী হতে থাকে। এই অর্থে প্রতিটি নেশাখোরই নাবালক।

বাস্তবকে অস্বীকার করার প্রবণতা এদের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এরা বাস্তব অবস্থা মেনে নিতে চায় না—তার পরিবর্তনের চেষ্টাও করে না। সেই জন্যই মিথ্যা কথা বলায় এরা এত অভ্যস্ত যে, অনেক সময় মনে হয় এরা সত্যি কথা বলতে পারে না কিংবা হয়তো এরা বুঝতে পারে না সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য। জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে জীবন এবং পরিবেশের বাস্তবকে জানা এবং বোঝা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন কোন্ ক্ষেত্রে বাস্তবকে মেনে নিতে হবে আর কোন্ ক্ষেত্রে তার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। বাস্তবকে অস্বীকার করার জন্যই তারা নেশা করে। সুতরাং বাস্তবের সঙ্গে এই স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নেশাগ্রস্তদের এই মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস খুব মুশকিলে ফেলে তাদের [illegible]। ডাক্তাররা এই রোগীদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তাদের মনের পরিবর্তন করতে পারবেন না—অথচ মিথ্যাচারই যার স্বভাব তার সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করাও সম্ভব নয়।

নেশাগ্রস্তের দৈহিক ক্ষতি নির্ভর করে সে কি নেশা করছে এবং কেমন তার স্বাস্থ্য তার ওপর। তাছাড়া সেটি নির্ভর করে সে কেমন করে নেশা করছে তার ওপরেও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—তামাকের ধূমপান করলে ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমে, সুতরাং যেকোন রকম ক্যান্সারেরই সম্ভাবনা বাড়ে। ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশি। আবার যারা খৈনি খায় তাদের বেশি সম্ভাবনা মুখের

ভিতরে ক্যান্সার হবার। মদ খেলে লিভার, মস্তিষ্ক তথা সারাদেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যারা মদের সঙ্গে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না তাদের লিভারের সিরোসিস হবার সম্ভাবনা বেশি। আফিম এবং মরফিন, হেরোইন, ও পেথিডিন জাতীয় আফিমের মতো মাদক ক্ষতি করে চেতনার ; অর্থাৎ মানুষটির মৃত্যুর আগেই মৃত্যু হয় তার মনুষ্যত্বের।

নেশা ক্ষতিকর এ সংবাদ কারো অজানা নয়। তবুও মানুষ নেশা করে। সিগারেট এবং মদে শরীর খারাপ হয়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে —এ সংবাদ ডাক্তারদের অজানা নয়। তবু ও মদ ও সিগারেট বহু ডাক্তার ব্যবহার করেন। পেথিডিন, মরফিনে চেতনার ক্ষতি করে, এ তথ্য জানা সত্ত্বেও পেথিডিন, মরফিনের নেশা যাঁরা করেন তাঁদের ভিতরে ডাক্তার, নার্স, এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-কর্মীরাই সংখ্যাগুরু।

লোকে কেন নেশা করে?

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর মানুষ আজও জানে না— তবে অনেকগুলো কারণই উল্লেখ করা যেতে পারে।

জীবন যে দুঃখময় এবিষয়ে বিশ্বের প্রায় সবাই একমত। কিন্তু অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করলে অতৃপ্তির দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। আজকের পৃথিবীর ভোগভিত্তিক (consumerist) জীবনদর্শন সে-আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমশঃই বাড়িয়ে চলেছে। বেতার, দূরদর্শন, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, [illegible] ণীর জীবনযাত্রার আদর্শ ইত্যাদি প্রতিমুহূর্তে আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে চলেছে এছাড়া অপরিবর্তনীয় দুঃখের কারণগুলি তো রয়েছেই। মানুষের জরা, মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি নেই. মুক্তি নেই প্রিয়বিরহের হাত থেকে।

বিশ্বের পরিবর্তন, জীবনের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাহলে দুঃখমুক্তির উপায় কি? উপায় চেতনার পরিবর্তন। সাময়িক হলেও নেশা আনে সেই চেতনার পরিবর্তন। সুতরাং সাময়িকভাবে দুঃখমুক্তি, উৎকণ্ঠামুক্তি নেশাগ্রস্ত হবার একটি প্রধান কারণ।

এ সাময়িক মুক্তিতে ভবিষ্যৎ জীবনসমস্যা জটিলতর হয়—তবে সমস্যা যেমন জটিলতর হয় তেমনি সে-সমস্যা থেকে সাময়িক নিজেকে অপসারণের আকাঙ্ক্ষাও হয় তীব্রতর। আমরা জানি পলায়নী মনোবৃত্তি জীবমাত্রেরই আছে। মানুষেরও আছে। আছে সভ্যতার সূচনা থেকেই।

যেকোন শ্বেতসার (Carbohydrate—অর্থাৎ চাল, গম, ভুট্টা, চিনি, গুড় ইত্যাদি) ভেজা অবস্থায় খোলা জায়গায় গরমে রেখে দিলে গেঁজিয়ে যায় তার ভিতরে মদ তৈরি হয়। সুতরাং আদিমকাল থেকেই কোন না কোন রূপে মানুষের সমাজের সঙ্গে মদের পরিচয় হয়েছে।

আদিমকাল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার এ্যান্ডিস পর্বতমালার আশপাশের দেশগুলিতে কোকা গাছ পরিচিত। সেখানকার সাধারণ মানুষ সামান্য চুনের সঙ্গে কোকা গাছের পাতা চিবোত। তাতে ক্ষুধাবোধ কমত, ক্লান্তি কমত, কর্মক্ষমতা বাড়ত। তেমনি তামাকের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের পরিচয়ও আদিমকাল থেকে। যেমন পরিচয় গাঁজার সঙ্গে ভারতীয়দের।

কিন্তু আদিমযুগে ব্যক্তিস্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ কিংবা রাষ্ট্রস্বার্থের জন্য কখনো এগুলি ব্যবহার করা হয়নি। সেইজন্য এইগুলি কোন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে বলে জানা যায় না। উপজাতিভিত্তিক সমাজ থেকে রাষ্ট্রে উত্তরণের সময়ই প্রথম আমরা নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলনের উল্লেখ পাই। বুদ্ধদেবের পঞ্চশীলের একটা শীল ছিল মদ না খাওয়া। হজরত মহম্মদেরও নির্দেশ ছিল নেশা বন্ধ করা। দুজনেরই আবির্ভাব নিজেদের দেশে উপজাতিভিত্তিক সমাজ থেকে রাষ্ট্র-উদ্ভবের সময়। আজও আমরা দেখতে পাই মাদক প্রচারে স্বার্থ রয়েছে এরকম ব্যক্তি কিংবা শ্রেণী না থাকলে মাদক কোন বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি করে না।

নেশাগ্রস্ত হবার কারণ

(১) নিজেকে সঙ্গীসাথীদের সমকক্ষ এবং তাদের সহধর্মী বন্ধু বলে প্রমাণ করার চেষ্টা। যেকোন গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলতে গেলে একাত্মতার

একটি প্রধান লক্ষণ একসঙ্গে আহার করা। ঠিক তেমনি যে-সমাজে নেশা চালু সে-সমাজে ঢুকতে হলে কিংবা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে তাদের নেশার সঙ্গী হলে ব্যাপারটা সহজ হয়। একবার শুরু করলে উতরাইয়ের পথ যথেষ্ট পিচ্ছিল। সুতরাং পতন হতে দেরি হয় না। ভাগ নিতে গেলে ভাগ দিতে হয়। তাছাড়া একবার নেশাগ্রস্ত হলে মাদক না নিলে বিরতিলক্ষণ দেখা দেয়, দেখা দেয় শারীরিক আর মানসিক কষ্ট। তারপর আসে নেশার আর্থিক দায়িত্ব। অন্য বিষয়ে দায়িত্বহীনতা এ দায়িত্বের সহগামী। তার ফল পরিবার, পরিজন, কর্মস্থল ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা। নেশাখোরের সমাজ হয়ে দাঁড়ায় তার নিজস্ব সমাজ। এইভাবে দেহে আর মনে সৃষ্টি হয় সঠিক মাদকাসক্তি। এই বিচ্ছিন্নতা এখানেই থামে না। অনেক নেশাগ্রস্তকে দেখা যায় একা একা নেশা করতে। তখন তারা নেশাখোরসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

(২) কৌতূহলের খেসারত—উঠতি বয়সের ছেলেরা অনেক সময় নেহাতই কৌতূহলের বশে নেশা শুরু করে। এত লোক নেশা করছে—দেখাই যাক না কি হয়। প্রথম প্রথম এটাই থাকে তাদের মনোভাব। পরের স্তরে দেখা দেয় সহিষ্ণুতা আর বিরতিলক্ষণ। অর্থাৎ ক্রমশঃ বেশি মাদকের চাহিদা এবং মাদকের অভাবে দৈহিক আর মানসিক কষ্ট। নেশার চরিত্র অনেকটা মাছ ধরার বঁড়শির মতো। সে বঁড়শি গেলা যায়। কিন্তু ওগরানো যায় না। এ বঁড়শি একবার গলায় আটকালে ছাড়ানো বড় কঠিন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব।

প্রশ্ন হলো এই বাঁধা পড়তে কত সময় লাগে? সময়টা নির্ভর করে মাদক এবং খাদক দুইয়েরই ওপর। আধুনিক কোকেনক্র্যাক খেয়ে একদিনেই আসক্তি জন্মাতে পারে, হেরোইনে জন্মাতে পারে তিন-চারদিনে, আবার সিদ্ধিতে সারা জীবনেও আসক্তি না জন্মাতে পারে। তেমনি কেউ নেশাগ্রস্ত হন তাড়াতাড়ি। আবার অনেকের খুব দেরি হয়।

(৩) ধর্মীয় কারণ—ক্রীশ্চানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মদ্য ব্যবহার করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের সুফী সাধকরা অনেক সময় গাঁজা খেতেন। শক্তি-সাধকদের কারণপানে কোন দোষ নেই। তেমনি কারণ (মদ) যদি বঁড়শি হয়ে গলায় গেঁথে যায় তাহলে আপনি কারণকে দোষ দিতে পারেন না।

(৪)আর একটি কারণ সহজানন্দ—জীববিজ্ঞান বলে সমস্ত জীবেরই গতি দুঃখ থেকে আনন্দের দিকে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন কিংবা ভারতীয় বেদ —সবাই বলছে আনন্দই জীবনের অভিমুখ। অতএব মাদক যদি আনন্দবোধ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে মাদকে দোষ কোথায়? এই সহজলভ্য আনন্দের উপকরণই অনেক সময় বঁড়শি হয়ে গলায় গেঁথে যায়।

(৫) ঐতিহ্য, পরিচিতি আর প্রাপ্তি—এতক্ষণ যা বলা হলো তা প্রায় সর্বকালে সর্বদেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু স্থান-কালভেদে অভ্যাসের পরিবর্তন দেখা যায়।

ভারতের উত্তর দিকে গাঁজার চল বেশি। দক্ষিণ দিকে চালু মদ। আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সব নেশাই চলে।

ঐতিহ্যের কথা যদি বলা যায় তাহলে বলতে হয় গাঁজা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রাচীন আর্যাবর্তে যে সোমরস পান করা হতো মনের উপর তার প্রধান ক্রিয়া ছিল অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করা। গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধি আর চরসের যে অনুভূতি তার সঙ্গে এর খুবই মিল। সুতরাং উত্তর ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে গাঁজার প্রচলনের একটা যোগাযোগ কল্পনা করলে খুব ভুল হবার কথা নয়। এর সঙ্গেই যোগ দেয় প্রাপ্তির প্রশ্ন। উত্তর ভারতে বহু জায়গায় গাঁজা সহজলভ্য।

চালের খাবার সারা ভারতে প্রচলিত হলেও দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই তার প্রচলন বেশি। বিশেষ করে চালের গুঁড়োর ব্যবহার সমগ্র উপমহাদেশের ভিতরে দক্ষিণদেশেই সবচেয়ে বেশি। তাদের তুলনায় বাঙালীরা চালের গুঁড়ো প্রায় ব্যবহার করেন না বললেই চলে। কারণ গৃহিণীরা বলেন চালের গুঁড়োর খাবার ততটা নরম হয় না। দক্ষিণদেশীয় গৃহিণীরা কিন্তু বহুকাল ধরেই এর একটা সমাধান আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপে ইস্ট কিংবা বেকিং

পাউডার দিয়ে ময়দা নরম করা হয়। ইউরোপে যেরকম ইস্ট দিয়ে ময়দা গেঁজিয়ে নেয়, দক্ষিণ ভারতে তেমনি গেঁজিয়ে নেওয়া হয় চালের গুঁড়ো। গেঁজিয়ে নিলে যৌগ শ্বেতসার ভেঙে সরলতর শ্বেতসার তৈরি হয়, তবে তার সঙ্গে বাড়তি উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড আর সুরাসার। রান্নার উত্তাপে সুরাসার উড়ে যায়, কিন্তু সরল শ্বেতসার থেকে যায়।

গরম না করলে এইরকম পদ্ধতিতে মদও তৈরি হতে পারে।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য ; গেঁজিয়ে নেবার ঐতিহ্যের সঙ্গে হয়তো মদ্যপানের কোন ঐতিহ্যগত সম্পর্ক আছে। যেমন থাকতে পারে হিমালয় অঞ্চলের জংলী গাঁজা গাছের সঙ্গে উত্তর ভারতে প্রচলিত গাঁজার নেশার সম্পর্ক। তাহলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নেশার আধিক্যের কারণ কি? তাদের না আছে ঐতিহ্য, না আছে ইতিহাস, অথচ তারা নেশার রাজা। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় ডলার একটা কারণ। ডলার সর্বশক্তিমান। সেই ডলার দিয়ে ওরা অন্য জিনিসের মতো সবরকম মাদকও সংগ্রহ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবহারের ঐতিহ্য না থাকলেও সহজে প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে একটা কারণ বলে ভাবলে অবৈধ কিছু হবে না। দুবছর আগেও এদেশে মিথাকুয়ালোনের (Mandrax, Prodom ইত্যাদি) নেশা একটা বড় সমস্যা ছিল। কিন্তু মিথাকুয়ালোন এখন পাওয়া যায় না। সুতরাং এই নেশার কোন সমস্যাও নেই। অতএব বলা যেতে পারে মাদক সহজলভ্য কিনা তার ওপরও নেশার বিস্তার নির্ভর করে।

(৬) নেশার বয়স ও মানসিকতার শিকড়—এ্যামফিটামিন জাতীয় নেশা জনপ্রিয় ছাত্র আর বুদ্ধিজীবী মহলে। অ্যামফিটামিন খেলে প্রথম প্রথম মনে হয় মানসিক ক্ষমতা বাড়ছে।

পেশার সঙ্গে নেশার সম্পর্কের এরকম উদাহরণ আরো আছে। যেমন, ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়-প্রতিনিধিদের আর অভিনেতাদের ভিতরে মদ্যপের সংখ্যা সাধারণের চাইতে বেশি।

নেশার সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক বেশ স্পষ্ট। উঠতি বয়সে অর্থাৎ কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের সময় মানুষের মনে একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফ্রয়েড সে বিদ্রোহের অনেক চটকদার নাম দিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের মতামত প্রাক্-বৈজ্ঞানিক। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধ রয়েছে, কিন্তু এ বিদ্রোহ অস্বীকার করার উপায় নেই। অস্বীকার করার উপায় নেই এ বিদ্রোহের কয়েকটা ভাল দিক। যেমন—এই বিদ্রোহের ফলে ছেলেদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সেই ব্যক্তিত্ব সহায়তা করে নতুন পরিবার, নতুন সমাজ গঠনে। এই বিদ্রোহের ফলেই তারা প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের পুনর্বিচার করে তাদের তরুণ দৃষ্টি দিয়ে। কখনো তারা চেষ্টা করে এ সমাজ ধ্বংস করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে, আবার কখনো চেষ্টা করে প্রাচীন সমাজ সংস্কার করে তার উন্নতি করতে। এই বিদ্রোহের একটা লক্ষণ সামাজিক নিয়মকানুন ভাঙা। অনেক তরুণই এই সময় নিয়মের ভালমন্দ বিচার করে না। ডিরোজিওর আমলে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী একদিকে যেমন গুরুজনদের উত্যক্ত করার জন্যই গোমাংস, মদ ইত্যাদি খেয়েছে, অন্যদিকে তারাই আবার দেশে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক ভাবধারাও নিয়ে এসেছে। মাইকেলের ভিতরে আমরা যেন একই সঙ্গে দুটি ধারার প্রবাহ দেখতে পাই—একদিকে মদ আর মেমসাহেব, আর অন্যদিকে মেঘনাদবধ আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই দুটো ধারার বিচ্ছিন্নতাও সে-যুগে দেখা গিয়েছে। একদিকে যেমন রূপচাঁদ পক্ষীর নেশার আড্ডা, অন্যদিকে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের মতো বিশুদ্ধচরিত্র প্রতিভা।

উঠতি বয়সের ছেলেদের সিগারেট, মদ, গাঁজা ইত্যাদি নেশা শুরুতে অনেক সময়ই বিদ্রোহের প্রকাশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলোই বড়শি হয়ে তাদের গলায় আটকায়। এ ছাড়া রয়েছে শিকড়ের প্রশ্ন। যে গাছের শিকড়ের বিস্তার গভীরে, সে গাছ ঝড়ে পড়ে না, খরায় মরে না। তেমনি যাদের মনের শিকড় নিজের পরিবার, নিজের সমাজ, নিজের দেশ আর সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত তাদের নেশাগ্রস্ত হওয়া কিংবা অন্য কোন জীবনবিরোধী কাজে জড়িত হবার সম্ভাবনা কম।

এ তথ্যের সমর্থনে কিছু যুক্তি দেখানো যেতে পারে। যেমন—যেকোন নেশাই মেয়েদের চাইতে ছেলেদের ভিতরে অনেক বেশি দেখা যায়। মেয়েদের পেটের সন্তান তার নিজের রক্ত, মাংস। তাই

সংসারের সঙ্গে সে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তার ভালবাসার বন্ধন যতটা দৃঢ়, পুরুষের ক্ষেত্রে হয়তো সে-বন্ধন ততটা দৃঢ় নয়। এই বন্ধনই হয়তো মেয়েদের রক্ষা করে। তাছাড়া নেশাগ্রস্ত আর ভাঙা সংসারের যোগাযোগ পরিসংখ্যান স্বীকার করে।

(৭) ভাঙা সংসার এবং নেশা—আমেরিকায় ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের পরিসংখ্যানে দেখা যায় সাবালক পুরুষদের শতকরা দশজন মাদকাসক্ত (Alchoholic)। কিন্তু সাবালিকা মেয়েদের ভিতরে মাদকাসক্তের সংখ্যা দু থেকে তিন ভাগ। গত দশ বছরে আমেরিকায় পরিবার ভাঙা অনেক বেড়েছে, বেড়েছে স্বাধীন যৌনাচার। সেই সঙ্গে বেড়েছে মেয়েদের ভিতরে মদ্যপের সংখ্যা। কারো কারো মতে এ সংখ্যা এখন ছেলেদের অর্ধেকের কাছাকাছি।

(৮) ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ এবং নেশা—একই পরিবেশের সবাই নেশা করে না। তার কারণ কি? একই প্রশ্ন করা যেতে পারে যেকোন রোগের কারণ সম্পর্কে। আসলে সব রোগেরই কারণ দুটো—ক্ষেত্র এবং বীজ অর্থাৎ ব্যক্তি এবং পরিবেশ। জীবাণুঘটিত অসুখের বেলায় ব্যক্তির রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা যতই কম হোক না কেন, পরিবেশে জীবাণু না থাকলে ব্যাধি হতে পারে না। আবার ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতার তুলনায় পরিবেশের আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবেই। পরিবেশ বলতে এক্ষেত্রে আমরা বুঝি দুঃখময় জীবন। এ সম্পর্কে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। বুদ্ধদেবের দুঃখের শ্রেণীবিভাগের সমালোচনাও আমরা করি। লোভকে মানুষ কমাতে পারেনি; কমাতে পারেনি ভোগের আকাঙ্ক্ষাকেও। ক্রমবর্ধমান ভোগভিত্তিক জীবনদর্শনের প্রভাব বাড়ছে। অন্যদিকে পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নিয়ে লোভের চরম মূল্য অর্থাৎ পৃথিবী থেকে জীবনের অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ কম্পমান।

অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ দুঃখমুক্তি, উৎকণ্ঠামুক্তি, বেদনামুক্তির—অন্তত সাময়িক মুক্তির একটা উপায় ব্যবহার করে এসেছে। সে-পথ দুঃখের কারণ কিংবা দুঃখ দূর করার পথ নয়। যে চেতনা দুঃখবোধ করে সেই চেতনার পরিবর্তনই সেই পথ। সে-পথ নেশার পথ। সে-পথ মাদকাসক্তির পথ।

উদাহরণ—আমাদের রাঢ়দেশে বেজায় গরম পড়ে। চাষীরা ভোর রাতে হালের গরু নিয়ে মাঠে যায়। বাড়ি ফেরে অনেকটা বেলা থাকতে। গরমে গা জ্বালা করে, মশায় ছেঁকে ধরে। এদিকে রাত্রে না ঘুমোলে ক্লান্তি কাটে না। সকালবেলা মুনিষ, গরু কেউই কাজে বেরোতে পারে না। এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান রয়েছে রাঢ়দেশে। আগের রাত্রে খানিকটা জলভাত বাখর (দেশি ইস্ট) মাখিয়ে রাখা হয়। ভাতটি পচে। তার ভিতরে খানিকটা মদ তৈরি হয়। মাঠ থেকে ফিরলে গরুকে ঠাণ্ডা করে স্নান করিয়ে জাবনার পর সেটা খাইয়ে দেওয়া হয়। মুনিষও একটা ভাগ পায়। ফলে গরু মানুষ কারোরই ব্যথাবোধ থাকে না। গরম কিংবা মশার উপদ্রবও বুঝতে পারে না। ঘুমোয় মড়ার মতো। ঘুমোয় তারা মদের নেশায় আর পরদিন কাজে বার হয় মদের আশায়! সবাই পচাই মদ খায় না। বহু উপায়ের ভিতর বাখর ভাত খাওয়া বেঁচে থাকার একটা উপায়মাত্র। তবে গরমকালে আমানির জল অনেকেই খায়। পান্তা-ভাতের উপরে যে জল থাকে তাকে বলে আমানির জল। এর স্বাদ একটু টকটক। এতে থাকে প্রোটিন আর বি-কমপ্লেক্স। আর সুরাসার থাকে অনেক পরিমাণে কম।

যারা ভাত খায় না—তারা কি করে? উত্তর ভারতে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় লোকে ঠাণ্ডাই খায়। ঠাণ্ডাই বড়ি কিংবা ঠাণ্ডাই সরবৎ দুরকমই ব্যবহার করা হয়। বড়িতে শুধুমাত্র সিদ্ধি থাকে। সরবতে সিদ্ধির সঙ্গে জল, নুন, মিষ্টি মেশানো হয়। গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শেষের উপাদানগুলি দেহের পক্ষে খুবই উপকারী। ফলপ্রদ সিদ্ধিও। তবে জল, নুন, মিষ্টি—এগুলো গ্রীষ্মে দেহের যা ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি পূরণ করতে চেষ্টা করে। আর সিদ্ধি চেষ্টা করে গ্রীষ্মের অনুভূতি কমাতে। পচাই কিংবা আমানিতেও জল, প্রোটিন আর ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স দেহের ক্ষতিপূরণ করে আর সুরাসারের কাজ অনুভূতি কমানো।

প্রশ্ন হতে পারে তাহলে নেশাতে আপত্তি কেন? টোপ দেখে বঁড়শি গিললে গলায় আটকে ধরা পড়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তার চাইতেও

বড় কারণ—পরিবেশে জীবনবিরোধী জটিলতা চিরকালই রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে বাঁচার পথ খুঁজতে গেলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দিগ্‌দর্শী চেতনা। সেইজন্য সভ্যতার আদি যুগ থেকে এই চেতনাকে শিক্ষা দিয়ে শাণিত করার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য সুস্থতর, অগ্রগামী আর দীর্ঘতর জীবনের সন্ধান বাড়ানো। চেতনাকে বিকৃত করার অর্থ—সে সম্ভাবনাকে কমানো। উদাহরণ—দেহের তাপ ৯৭/৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকলে মানুষ সুস্থ বোধ করে। তার চাইতে ৫।১০ ডিগ্রি কম-বেশি হলে অস্বস্তি, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। পরিবেশের তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই। দেহের নিজস্ব তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করে দেহের নিজস্ব তাপকে নিরাপদ সীমার ভিতর রাখতে। দেহের তাপবোধ এবং তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের অতন্দ্র সতর্কতা জীবনের একটি অপরিহার্য শর্ত। ঠাণ্ডাইয়ের নুন, চিনি আর জল এবং পচাইয়ের প্রোটিন, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স আর জল জীবনের সহায়ক চেতনাকে তারা রক্ষা করতে চেষ্টা করে, আঘাত করে না। কিন্তু সিদ্ধি আর সুরাসার আঘাত করে বোধ আর চেতনাকে।

বোধ আর চেতনার হ্রাস সবসময় ক্ষতিকর নয় একথা সত্যি। ডাক্তাররা অনেক সময়ই রোগীদের ঘুমের ওষুধ দেন এমনকি অজ্ঞানও করেন। অবশ্য ডাক্তাররা ভালমন্দ বিচার করেই একাজ করেন।

(৯) আয়াট্রোজেনিক ড্রাগ অ্যাডিকশন (অর্থাৎ চিকিৎসাজনিত মাদকাসক্তি)—তবে ডাক্তাররাও সর্বজ্ঞ আর সর্বদর্শী নন। অনেক নেশাগ্রস্ত রোগী মাদক প্রথম সেবন করেন ওষুধ হিসাবে ডাক্তারের নির্দেশে। তারপর সেই ওষুধই মাদক হয়ে তাঁর গলায় বঁড়শির মতো আটকে থাকে।

নেশাগ্রস্ত হবার অনেকগুলি কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো। তার ভিতরে পলায়নবৃত্তি একটি। এ বৃত্তি নেশার একটি প্রধান কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

(১০) শ্রেণীস্বার্থ, রাষ্ট্রস্বার্থ এবং নেশা—বুদ্ধত্ব লাভের পর বোধিসত্ত্ব নিজেকে বুদ্ধ বলে ঘোষণা করে ধর্মপ্রচারে বের হলেন। তাঁর উপদেশের ভিতরে ছিল পঞ্চশীল অর্থাৎ চরিত্রের পাঁচটি দিক, যে দিকগুলির সঠিক উন্নয়নের সপক্ষে তিনি প্রচার করেছিলেন। এর ভিতরে একটি উপদেশ ছিল মদ খাবার বিরুদ্ধে। হজরত মহম্মদও মদ খাবার বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। আসলে নেশা শব্দের ব্যুৎপত্তি আরবী শব্দ থেকে।

বুদ্ধদেবের আমল ছিল ভারতে উপজাতিভিত্তিক সমাজ (Tribal Society) থেকে রাষ্ট্রে উত্তরণের সময়। হজরত মহম্মদও আরব উপজাতিগুলিকে ভেঙে রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। আমাদের জাতিরাষ্ট্র সবসময়ই শ্রেণীভিত্তিক। তাহলে কি শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নেশা প্রসারের সম্পর্ক রয়েছে? তাছাড়া পৃথিবীর দুই দিকপাল এত সমস্যা থাকতে নেশা নিয়ে এরকম চিন্তিত হয়েছিলেন কেন? আধুনিক যুগেও শ্রেণীস্বার্থ এবং রাষ্ট্রস্বার্থের সঙ্গে নেশার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দেখা যায়। যেমন—নরহত্যার জন্য যে সৈন্যবাহিনী, সর্বদেশেই তাদের বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে মদ সরবরাহ করা হয়। বিনামূল্যে অর্থাৎ শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রের অর্থে।

(১১) যুদ্ধ ও মাদকাসক্তি—ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে আমেরিকান সৈন্যদের প্রায় অর্ধেক হেরোইন ইত্যাদি মাদকাসক্ত।

মাদক সরবরাহে আমেরিকার সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু পরোক্ষ সমর্থন ছিল সন্দেহ নেই। তা না থাকলে এত বেশি সংখ্যক সৈন্য মাদক সেবন করতে পারত না। হয়তো তাঁদের যুক্তি ছিল যে সৈন্যরা দেশ থেকে এত দূরে জলায়-জঙ্গলে ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিতে গিয়েছে, তাদের সামান্য আনন্দলাভের চেষ্টার বিরুদ্ধতা করার কোন যুক্তি নেই। তারা তো প্রাণ দিতে গেছে দেশের জন্যই। সে নেশা থেকে কিন্তু আমেরিকান সমাজ আজও মুক্তি পায়নি। বরং তাদের সমস্যা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলেছে।

সভ্যতার উষাকাল থেকে যে-সমস্যা মানবসমাজকে বিষিয়ে চলেছে তার কোন সমাধান অর্থাৎ মাদক সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। ভবিষ্যতে হবে কিনা তাও জানা নেই।

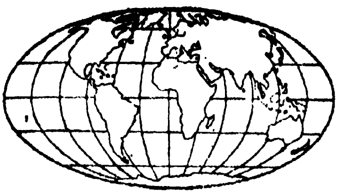

বাতায়ন

জাপান গবেষণায় সামনের সারিতে, কিন্তু ফলে নয়

বর্তমানে বিজ্ঞান-গবেষণায় জাপান বিশ্বের সব জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য—অন্ততঃ প্রচেষ্টায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অবদানে নয়। উন্নত দেশগুলির বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ জাপানী। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিতে যত গবেষণাসংস্থা আছে, তাদের সামগ্রিক সংখ্যার চেয়ে জাপানে গবেষণাসংস্থার সংখ্যা অনেক বেশি। জাপান সরকারের সাম্প্রতিক হিসাব থেকে জানা যায় যে, সরকার গবেষণার কাজে জাতীয় আয়ের ২·৮ শতাংশ ব্যয় করে। আয়-ব্যয়ের এই অনুপাত পশ্চিম জার্মানীর সমান এবং আমেরিকার তুলনায় সামান্য বেশি। গতবছরে জাপান ৪৩ বিলিয়ন (আমেরিকান) ডলার গবেষণার খাতে ব্যয় করেছিল, কিন্তু ৪৯০,০০০ বৈজ্ঞানিককে ভালভাবে কাজে লাগাতে জাপানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ঐ দেশের 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংস্থা' (সায়েন্স ও টেকনোলজি এজেন্সি) ১৯৮৮-র ডিসেম্বরের রিপোর্টে জানাচ্ছে যে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের অনুরূপ বৈজ্ঞানিকদের কাজের তুলনায় জাপানের বৈজ্ঞানিক অবদান কম মৌলিক। এজেন্সির ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে এই ব্যাপারে বড় সমস্যা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরনো ধরনের প্রথা ; তবে এও বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত কোম্পানিগুলি যারা দেশের গবেষণার ৮০ শতাংশ দায়িত্ব বহন করে, সেগুলিও এর জন্য কম দায়ী নয়। ঐ এজেন্সি ১০০০ উচ্চস্থানীয় বৈজ্ঞানিককে গবেষণার কুড়িটি বিষয়ে বিদেশীদের কাজের সঙ্গে জাপানীদের কাজের তুলনামূলক মান নির্ণয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকরা জানালেন সংবাদ-প্রযুক্তিতে এবং নতুন জিনিসের উপর গবেষণার ব্যাপারে তাঁরা আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে আছেন, কিন্তু জৈববিজ্ঞান সংক্রান্ত, মৃত্তিকাসংক্রান্ত এবং বায়ো-ইলেকট্রিক্যাল ও প্যারালাল ডেটা প্রসেসিং-সংক্রান্ত অধিকাংশ গবেষণায় তাঁরা পিছিয়ে আছেন। অবশ্য ইউরোপের তুলনায় জাপান ১৫'২০ বিষয়ে এগিয়ে আছে। এই বিষয়গুলির মধ্যে আছে বংশগতিনিয়ন্ত্রক প্রকাশ (gene expression), মস্তিষ্কের কার্যকলাপ, সমুদ্রগর্ভে সন্ধান, ভূতত্ত্ব এবং সমুদ্র ও আবহাওয়ার মধ্যে আদান-প্রদান। ঐ এজেন্সির গবেষণাপ্রণালী নির্ধারণে ডাইরেক্টর যোশিরো মিকি বলেছেন ঃ "জাপান এখন বিজ্ঞান গবেষণায় পাশ্চাত্যের সমতুল্য হতে পেরেছে। এর বেশি এগিয়ে যেতে হলে বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টিমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে।" এজন্য শিক্ষাক্ষেত্র, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সুসুমো টোনেগায়া বলেছেন, জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরনো নিয়মতান্ত্রিকতার জন্য অল্পবয়সী বৈজ্ঞানিকরা নতুন ধরনের সৃষ্টির কাজে উৎসাহ পাচ্ছে না। এর অন্য দিক হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকরা ব্যক্তিগত কলকারখানায় কাজ করতে চাইছেন না ; কারণ, দেখা গিয়েছে এই সব কারখানার ৬২ শতাংশ বৈজ্ঞানিকরা সংখ্যায় ও গুণমানে অনেক নিম্নস্তরের।

বিদেশীদের বৃত্তি দিয়ে জাপানের বিজ্ঞানসংস্থায় গবেষণা করতে আনার চেষ্টায় একটা বাধা পড়েছে। বিদেশ থেকে খুব কমই দরখাস্ত আসছে। যোশিরো মিকির মতে, কেন এমন হচ্ছে সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার।

[New Scientist, 7 January 1989]

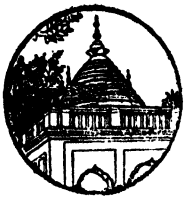

গ্রন্থ পরিচয়

যত মত তত পথের পথিকেরা

তরুণ সান্যাল

আন্তঃসম্পর্কিত বিশ্বে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। ১৯৮৮। সোভিয়েত দেশ অফিস, ১৮, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি, কলকাতা ৭০০০১৯।

বহু গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী-দেবদেবীর আরাধনায় বিভক্ত নানা রুশ জন-জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন রাজপুত্র ভ্লাদিমির হাজার বছর আগে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। 'একের অনলে বহুরে আহুতি' দিয়ে কিয়েভ-রুশের ঐক্যবদ্ধ স্লাভ মন-মনন এবং ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ঐক্য গড়ে উঠেছিল। গত বছর (১৯৮৮) রুশ অর্থোডক্স চার্চের প্রতিষ্ঠার হাজার বছর উদ্‌যাপন হলো। নানা ধর্মের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল মস্কোয়—সুজদালে—কিয়েভে। ভারত থেকে আমন্ত্রিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। এ ছিল যেন 'যত মত তত পথ'-এর বিশ্বসমাবেশ।

এই মহাসম্মেলনের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, যা কেবল রুশ অর্থোডক্স চার্চের সহস্র বর্ষপূর্তিই নয়। সভ্যতার সূত্রপাত থেকে মানুষের সমাজেই 'দত্ত দম্যত দয়ধ্বম্‌'-এর উপদেশ যেমন বারবার উচ্চারিত হয়েছে, পাশাপাশি তেমনি মানুষের যা কিছু মহিমা সব কিছু ধ্বংসের জন্য অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় নানা দেশ সজ্জিত, যে-কোন মুহূর্তে সে-অস্ত্র প্রয়োগে কেবল মানুষ নয়, তাবৎ উদ্ভিদ, ভূচর-খেচর-জলচর পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, অথচ অন্যদিকে প্রতিটি রাষ্ট্রই একে অপরের উপর নির্ভরশীল এখন, তা সে যে ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা সেখানে বিধৃত হোক না কেন। মানবজাতি এক অবিভাজ্য অবস্থানে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সীমানায় এসে পৌঁছেছে। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে চূড়ান্তভাবে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বস্তু ও পরিষেবা উৎপাদনমূলক নানাবিধ মূল্যবোধহীন অন্ধ জাতীয় আয়বৃদ্ধিবাদ (GNP-ism) মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না। বরং পৃথিবীতে মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রকৌশল ভাণ্ডারে যে সামর্থ্য সঞ্চিত আছে, তা দিয়ে সর্বজীবের কল্যাণ অর্জন করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পালা চলেছে। সে-পর্যায়ে মুক্তমনা স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কেবল রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নয়, প্রয়োজন হয়েছে বিশ্বজুড়ে পরস্পর নির্ভরশীল আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিকাশও—বিশ্বশান্তির কল্যাণে যে সংস্কৃতি ঘোষণা করতে পারে, "রাজ্য নয়, স্বর্গ নয়, মুক্তিও নয়, দুঃখ-সন্তপ্ত প্রতিটি জীবের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষিত।"

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রুশ অর্থোডক্স চার্চের মেট্রোপলিটান আলেক্সি ও ভারততত্ত্ববিদ্‌ আকাডেমিসিয়ান ইয়েভগেনি চেলিশেভ পরস্পর মত-বিনিময়ের জন্য মস্কোয় এ. পি. এন. ভবনে মিলিত হয়েছিলেন গত ৩০ জুন ১৯৮৮। অধ্যাপক চেলিশেভ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সোভিয়েত যোগাযোগের উত্তরোত্তর সম্পর্কবৃদ্ধি বিষয়ে বলেন। সোভিয়েত দেশে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে আগ্রহের কথা তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেন। তাছাড়া বলেন, সোভিয়েত সমাজ নবায়নের পর্বে অর্থোডক্স চার্চের সদর্থক সৃষ্টিশীল ভূমিকার কথা। মেট্রোপলিটান আলেক্সি রুশ দেশে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পর সহস্রবর্ষব্যাপী ঐ ধর্মের অবদানের কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন: ১৯তম পার্টি সম্মেলন তাঁর প্রতিবেদনে মিখাইল গোরবাচভ রুশ ব্যাপটিজমের সহস্রাব্দ পূর্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিভিন্ন মতবিশ্বাসীদের, ঈশ্বর-

বিশ্বাসী ও নিরীশ্বরবাদীদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার বিকাশের উপর জোর দিতে হবে। মেট্রোপলিটান নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দিয়ে বলেছেন ঃ "আমরা আবার সেই সব ধারণা, সেই সব বিষয় স্মরণ করাই যা আমরা প্রায় ভুলেই বসেছিলাম—বদান্যতা, দানশীলতা, করুণা, নির্দিষ্ট সাহায্যদান, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও দম্ভ কাটিয়ে ওঠা···আমি মনে করি তার আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা নিয়ে মানুষই পেরেস্ত্রোইকার প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু।"

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেছেন ঃ "আমি আগে অনেককে বলতে শুনেছি, আপনাদের দেশে ধর্মাচারণের কোন স্বাধীনতা নেই। আপনাদের উৎসবে যোগ দিয়ে বুঝেছি কথাটা সত্য নয়।" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মন্তব্য করেন ঃ "ধর্ম হলো যিনি সবার উপরে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা। তার মানে আমি কোন সমুচ্চ আদর্শ এবং মহতী নীতির সেবক। এই আদর্শ ও নীতিসমূহ কি? প্রধানতঃ নৈতিক আত্ম-পরমোৎকর্ষ। নিজের আত্মোন্নতির জন্য সতত প্রযত্নবান হতে হবে, কোন মন্দির বা গির্জায় যাবার পর প্রত্যেকবার যেন অনুভব করতে পারি, আরও শুদ্ধ হলাম, আরো ভাল হলাম; বদান্যতা, সততা ও নিরাসক্তির নীতির প্রতি আরও নিবেদিতপ্রাণ হলাম। ···এই কথাগুলিতে ব্যক্ত সমস্ত ধর্মের সার কথা। ···বিভিন্ন ধর্মের (খ্রীস্টান, ইসলাম, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি) মধ্যে কঠোর ভেদাভেদ প্রায়শঃই প্রথাগত ও কৃত্রিম···যদি নাস্তিকতা কোন মানুষকে সৎ হতে সাহায্য করে, যদি প্রতিবেশীদের ভালমন্দ সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে তোলে সেক্ষেত্রে আমি বলব তিনিও ধর্মপ্রাণ। অন্যদিকে কোন মানুষ যিনি মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন, সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেন তিনি যদি নীতিভ্রষ্ট হন তাহলে তাঁকে কোনমতেই ধর্মপ্রাণ বলে গণ্য করা যায় না।··· আমি বলব, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিকাশ, তার আত্মোন্নতির বিজ্ঞান।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে।'

সোভিয়েত দেশ অফিস কর্তৃক প্রকাশিত 'আন্তঃসম্পর্কিত বিশ্বে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি' পুস্তিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র বত্রিশ। কিন্তু বিশিষ্ট তিন ব্যক্তির স্পষ্ট ও হৃদয়নিঃসৃত বক্তব্য ভারত ও সোভিয়েত মৈত্রীকেই প্রসারিত করবে না, কার্যতঃ বিশ্বশান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণের প্রতি উৎসর্গীকৃত-প্রাণ যেকোন ব্যক্তি ও জাতির পথ-নির্দেশিকার কাজ করবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

(১) উপনিষদ সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ স্বামী সংবিদানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক ঃ ব্রহ্মচারী জ্যোতিচৈতন্য, রামকৃষ্ণ আশ্রম, পশ্চিম রাজাপুর, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৩২।

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

(২) শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসীয়ম্ ঃ শ্রীধর ভাস্কর বর্ণেকর। প্রকাশক ঃ স্বামী হীরানন্দ, শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, ১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৭০০০৩২। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা।

(৩) শ্রীসারদাসহস্রনাম ঃ সংকলক—স্বামী অপূর্বানন্দ। প্রকাশক ঃ স্বামী প্রেমরূপানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া-৭২২১৬১। মূল্য ঃ আট টাকা।

(৪) স্বামী গদাধরানন্দ—জীবন ও সাধন ঃ সম্পাদক শ্রীঅনাথবন্ধু ঝা। প্রকাশক ঃ শ্রীভক্তিভূষণ চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক, আড়াইডাঙ্গা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পোঃ—আড়াইডাঙ্গা, মালদহ। মূল্য ঃ পনের টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

যুব সম্মেলন

গত ১৬ জুলাই '৮৯ **সালেম আশ্রম** এক যুব সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক বিষয় ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এ উপলক্ষে ৩৫০জন কুষ্ঠরোগীকে বিছানার চাদর এবং ২০টি দুস্থ স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে জামা-কাপড় দেওয়া হয়েছে।

চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির

মনসাদ্বীপ আশ্রম গত ১২ আগস্ট থেকে সপ্তাহব্যাপী এক চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। ঐ শিবিরে মোট ২০০জন রোগীকে পরীক্ষা করা হয় এবং ১৮ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

পরিদর্শন

গত ১৮ আগস্ট মেঘালয়ের পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী এস. পি. সুয়ের এবং পরিষদীয় মন্ত্রী এস. সি. মারেক **চেরাপুঞ্জী আশ্রম** পরিদর্শন করেছেন।

ত্রাণ

আসাম বন্যাত্রাণ : কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৩,৫০০ শাড়ি, ৩,৫০০ ধুতি ৮,৯৭২টি শিশুদের পোশাক ৪৮০টি লণ্ঠন, প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ : মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দুটি অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২,৫০০ শাড়ি, ২,৫০০ ধুতি, ৩,৪৪৮টি শিশুদের পোশাক, ১২৫কিলো গুঁড়ো দুধ, ২৫ কিলো ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১,৯৮০ কিলো পশুখাদ্যও বিতরণ করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র বন্যা ও ঝঞ্ঝাত্রাণ : বোম্বে আশ্রমের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার পেন ও আলিবাগ অঞ্চলের ছয়টি গ্রামের ১৪৩৭টি পরিবারের মধ্যে ১,৪৩৭টি কম্বল, ১,৩১৭টি প্লাস্টিকের মাদুর, ১০ কুইণ্টাল চাল, ৫০টি শাড়ি, ৩০ সেট বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন : 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' কার্যসূচী অনুযায়ী মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রামনগর ১নং ব্লকে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ির নির্মাণ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি সমূহের মেরামত করার কাজ চলছে।

বাঁকুড়া আশ্রম বাঁকুড়া জেলার খাত্রা থানার অন্তগর্ত দুটি গ্রামের সাতটি বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত ছাদ পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছে।

বহির্ভারত

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি : গত সেপ্টেম্বর মাসে শনি রবি ও বুধবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মী বিষয় এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ আলোচনা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বাম প্রপন্নানন্দ ও স্বামী গণেশানন্দ। ১৩ সেপ্টেম্ব স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কেন উপনিষদের ওপর এক বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন। তাছাড়া প্রতিদিন সন্ধ ৬ টায় ভক্তিগীতিও পরিবেশিত হয়েছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৭ মে, ১৯৮৯ **রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসতে** উদ্যোগে মঠ-প্রাঙ্গণে **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভা প্রচার পরিষদের** প্রথম সম্মেলন (সারাদিন ব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদ

স্বামী গহনানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ২৪-পরগনা জেলার ৫২টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪০জন প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে স্বামী প্রমেয়ানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী সর্বদেবানন্দ এবং স্বামী পুরুষানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের নিকট তাঁদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

চিকিৎসা-শিবির

গত ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর **পুরী রামকৃষ্ণ মঠ** পুরী রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় দুই দিনের এক চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করেছিল। পুরীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য জি. সি. নায়েক ২ সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টায় শিবিরের উদ্বোধন করেন। শিবিরে ডেন্টাল এবং ই. এন. টি. এই দুটি বিভাগ ছিল। দুটি বিভাগে দুদিনে মোট ১২১ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। রাউরকেল্লা থেকে আগত ডেন্টাল সার্জন এবং স্থানীয় সদর হাসপাতালের ই. এন. টি সার্জনগণ এই চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী আত্মানন্দ (তুলেন্দ্র) গত ২৭ আগস্ট এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। ঐ দিন ভূপাল থেকে রায়পুরে ফেরার পথে বেলা ২-৩০ মিঃ রায়পুর থেকে ৭৫ কিঃ মিঃ দূরে তাঁর গাড়িটি উল্টে যায় এবং তিনি সেই গাড়ির নিচেই চাপা পড়েন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে উদ্ধার করে তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁর জীবনরক্ষার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অবশেষে বিকাল তিনটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে নাগপুর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সঙ্ঘ ত্যাগ করে রায়পুরে একটি আশ্রম পরিচালনা করেন। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পুনরায় যোগদান করেন এবং রায়পুর আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দেহত্যাগের আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন রায়পুর কেন্দ্রের প্রধান। যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী স্বামী আত্মানন্দ মধ্যপ্রদেশের আবুঝমারে আদিবাসী উন্নয়নের যে বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তা সরকার ও জনসাধারণের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছে। বিদগ্ধ পণ্ডিত, বলিষ্ঠ লেখক এবং বিশিষ্ট বাগ্মীরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হিন্দিভাষী অঞ্চলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারে তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর ভদ্র ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁর দেহত্যাগ সঙ্ঘের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালনঃ গত ৩০ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি এবং গত ২৩ ও ২৯ সেপ্টেম্বর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাঃ স্বামী গর্গানন্দ সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ঢাকুরিয়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রভাত ফেরী, পূজা, চণ্ডীপাঠ, ধর্মমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। দ্বিতীয় দিন সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দকে খিচুড়ি ও পায়েস প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের উভয় দিনই বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী তত্ত্ববোধানন্দ প্রথম দিনের এবং স্বামী ভৈরবানন্দ দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন।

গত ৯ এপ্রিল **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব কমিটি, সাহাপুর (বেহালা, কলিকাতা-৩৮)** কর্তৃক শিবধাম মন্দিরে প্রভাতফেরী, বিশেষপূজা, পাঠ, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৪তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভৈরবানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন নচিকেতা ভরদ্বাজ।

আদ্রা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৩-১৬ মে চারদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। প্রথম দিন শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় পাঁচ-ছয়শ ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের প্রতিদিনই অপরাহ্নে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে আলোচনা করেছেন স্বামী উমানন্দ, স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ, স্বামী ঈশাত্মানন্দ, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা অজেয়প্রাণা।

বালি গ্রামাঞ্চল (পূর্ব) রামকৃষ্ণ পাঠচক্র গত ২৮ মে পাঠচক্রের প্রথম বার্ষিকী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৪তম জন্মোৎসব সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শেখরানন্দ এবং ভাষণ দেন স্বামী সর্বগানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ আত্মনির্ভরশীল কর্মী সংঘ (সন্তোষপুর), কলকাতা-৭৫ আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে ২৫ ও ২৬ মার্চ। প্রথম দিনে স্বামীজীর জীবন ও বাণী এবং আজকের দিনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন স্বামী পুরাতনানন্দ এবং ডঃ তাপস বসু। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। সভার পর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জ্যোৎস্না চ্যাটার্জী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অরুণ গুপ্ত প্রমুখ।

গত ২০ মে **নয়াদিল্লীর মহাবীর এনক্লেভের (পালাম)** বাঙালী কলোনির সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কালীবাড়িতে স্থানীয় রামকৃষ্ণকথামৃত পাঠকচক্রের প্রথম বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। বাঙালী কলোনির বাসিন্দারাই এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন। মহাবীর এনক্লেভের সাংস্কৃতিক মঞ্চের এটাই প্রথম নাট্যানুষ্ঠান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পানিহাটি চিড়ার মহোৎসবে যোগদানের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে এবছর ১৭ জুন কলকাতার, বিশেষ করে শ্যামপুকুর ও দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ পল্লীর প্রবেশ পথ থেকে কীর্তন করতে করতে তাঁরা শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঠাকুরবাড়ি ও গৌরাঙ্গতলা হয়ে মণি সেনের ঠাকুরবাড়িতে আসেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মণি সেনের ঠাকুরবাড়ির উঠানেই ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নৃত্য-

কীর্তনাদি করেছিলেন (১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে)। ভক্তদের সংকীর্তনের দল মণি সেনের ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করলে এক ভাবগম্ভীর আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মণি সেনের বংশধরগণ ভক্তদের সাদর সম্ভাষণ জানান এবং কীর্তনাদির পর রাধাকান্তজীর ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করেন। বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, বাগবাজার, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও রহড়া বালকাশ্রম থেকে বেশ কিছু সাধু-ব্রহ্মচারী আনন্দোৎসবে যোগদান করেন।

গত ১ নভেম্বর ১৯৮৮ থেকে এপ্রিল '৮৯ পর্যন্ত **বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (কলকাতা)** নিম্নোলিখিত অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ

২০ নভেম্বর 'নিতাইচন্দ্র রায় স্মারক বক্তৃতা' দিয়েছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। বিষয় ছিল বিবেকানন্দ-গবেষণার অভিজ্ঞতা। ৪ ডিসেম্বর '৮৮ বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন আলোচনার বিষয় ছিল 'স্বামীজীর ভাবে কাজ।' ২৫ ডিসেম্বর এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিনের দুটি অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল 'স্বামীজী আমাদের মানুষ হতে বলেছেন' এবং 'জাতীয় সংহতি ও স্বামী বিবেকানন্দ।' অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্বামী গিরিজাত্মানন্দ। পরে বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে। ৮ জানুয়ারি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'মাতৃ অনুধ্যান' অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। ১৬ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী বন্দনানন্দ। ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর অতিথি-বক্তা হিসাবে স্বামীজীর উপর বক্তৃতা দেন। ২১-২৩ এপ্রিল দিবসত্রয় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পরিক্রমা' অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী অমলানন্দ। তিন দিনের তিনটি অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল 'শ্রীশ্রীমাঃ গুরুশক্তি', 'শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় সাধনা', এবং 'স্বামীজীর ভাবে মানুষ হওয়া ও মানুষ গড়া।' প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ও বক্তা ছিলেন যথাক্রমে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, দীপ্তি ঘোষ। দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বামী নিত্যরূপানন্দ, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডঃ শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়। এবং তৃতীয় অধিবেশনে স্বামী পরমাত্মানন্দ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, ডঃ কমল নন্দী ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। তাছাড়া শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির দিনে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ, জীবনী আলোচনা ও রঙীন আলোকচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়।

গত ১৯ এপ্রিল **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের** দ্বারভাঙ্গা হলে 'সুতনু মুন্সী স্মারক বক্তৃতা' সভার আয়োজন করেছিলেন **বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাংবাদিকতা বিভাগ**। বিষয়ঃ সংবাদপত্রের সামাজিক দায়িত্ববোধ। এবিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য দা টেলিগ্রাফ, প্রতিক্ষণ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, আমন্ত্রিত হয়েছিলেন উদ্বোধনের সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দও। জনাকীর্ণ সেই সভায় মডারেটর ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়। আলোচনা-সভার উদ্বোধন করেন উপাচার্য ডাঃ ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী। সভায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। সহ-উপাচার্য ডঃ ভারতী রায় সহ বহু প্রবীণ অধ্যাপক এবং সাংবাদিকও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতার তিনশো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ৪ মে থেকে ১২ মে ১৯৮৯ নয়দিনের একটি আলোচনা-চক্র **কলকাতা টিন-এজ ফোরাম এবং সোভিয়েত দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের** যৌথ উদ্যোগে গোর্কী সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেছেন কলকাতার বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সঙ্গীত-শিল্পী এবং ক্রীড়াতারকা সহ বহু মান্য-ব্যক্তি। সোভিয়েত দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্ম-

চারিগণও এই আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। কলকাতা সম্পর্কে নানা মূল্যবান বক্তব্য ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী সেখানে শোনা গিয়েছিল। ১২ মে সমাপ্তি দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধন পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তিনি কলকাতার বিগত ৩০০ বছরের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্থান এবং তাঁদের প্রবর্তিত ভাব আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও অবদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

গত ১৭-১৯ মে মধ্যপ্রদেশ **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোয়ালিয়র রামকৃষ্ণ আশ্রমে ১ম দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী স্মরণানন্দ। স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন জীবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কৃষ্ণকান্ত তেওয়ারী। ইন্দোর, জব্বলপুর, রেওয়া, অমরাবতী, গোয়ালিয়র—এই পাঁচটি আশ্রম এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল। ২০ মে রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির ক্রীড়াঙ্গনে নবনির্মিত হনুমানজীর মন্দির উদ্ঘাটন করেন স্বামী স্মরণানন্দ। হনুমান চরিত্রের উপর আলোচনা করেন স্বামী আত্মানন্দ। সম্মেলন উপলক্ষে এক ক্রিকেট টুর্নামেন্টেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা **রাজলক্ষ্মী বসু** (জন্ম ৫ জানুয়ারি ১৮৯৮) গত ৬ আগস্ট '৮৯ দুপুর একটার কিছু পরে তাঁর ভবানীপুরের (কলিকাতা-২৫) আশু বিশ্বাস রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় বিরানব্বই বছর। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দজীর (বাবুরাম মহারাজের) অনুজ শান্তিরাম ঘোষের কন্যা। শৈশবে মাতৃহারা হওয়ার পর পিসেমশায় ভক্তপ্রবর বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতে (বলরাম মন্দিরে) তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। সেইসূত্রে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সান্নিধ্যে আসেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দের তিনি বিশেষ স্নেহধন্যা ছিলেন। শৈশবে স্বামী বিবেকানন্দকেও তিনি দর্শন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে তাঁর আজীবন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে বলরাম মন্দির ও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী এবং মঠ-মিশনের অন্যান্য কেন্দ্র থেকে সাধুরা তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অন্তিম সময়ে দেখা যায় তাঁর করাঙ্গুলি জপের মুদ্রায় রয়েছে। তাঁর স্বামী বীরেন্দ্রকুমার বসু আই. সি. এস. পরীক্ষায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা সকলেই কৃতী এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁরা সকলেই মঠ-মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হাওড়া রামকৃষ্ণ-মন্দিরের সভাপতি **সাধনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ৩০ মে '৮৯ রাত ৮-১৫ মিঃ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ প্রয়াত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানলাভ করে এম. এ. পাশ করার পর শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম ও বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি রামকৃষ্ণ-মন্দির নামে একটি আশ্রম ও রামকৃষ্ণ শিক্ষালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চিরকুমার আশ্রমবাসী সাধনবাবুর আদর্শ জীবন লক্ষ্য করে বহুলোক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অনন্তকুমার মুখার্জী** গত ৩ এপ্রিল '৮৯ তাঁর রাঁচির বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের তিনি সতীর্থ ছিলেন।

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

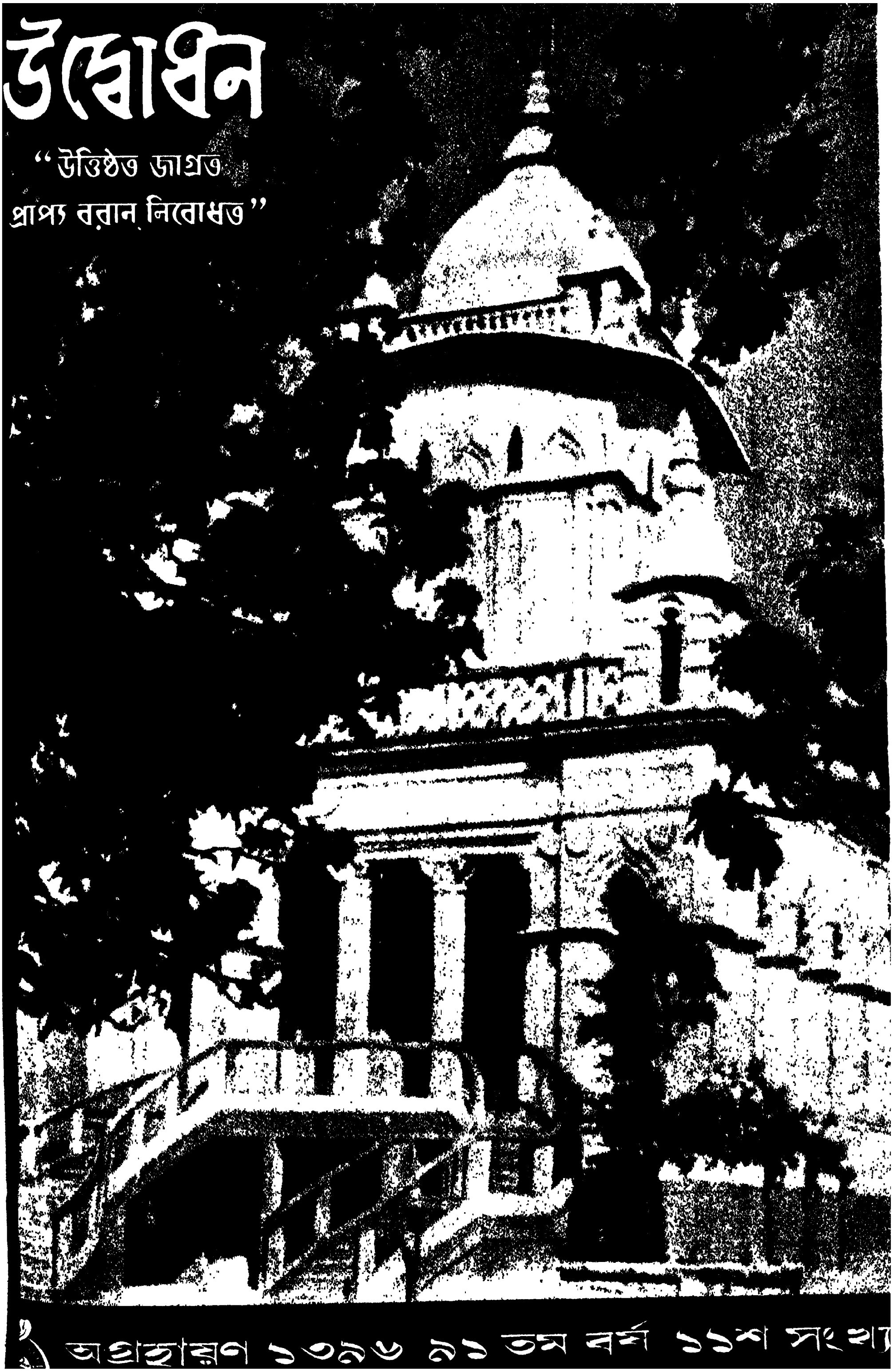

অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ ৯১তম বর্ষ ১১শ সংখ্য

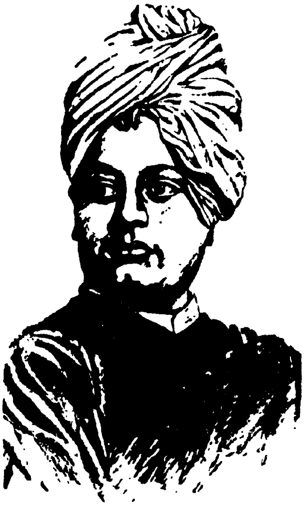

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাশ্চং দধতীং দক্ষিণে করে॥
রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীম্।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

কথাপ্রসঙ্গে

জগদ্ধাত্রী : রূপে ও তত্ত্বে

কাত্যায়নী তন্ত্রে বলা হইয়াছেঃ ত্রেতাযুগের আদিতে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে জগৎকল্যাণের জন্য দেবী জগদ্ধাত্রী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তদনুসারে ঐ তিথিতেই দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা হইয়া থাকে। মায়াতন্ত্রে বলা হইতেছেঃ "পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং কার্তিকে শুক্লপক্ষকে।/দিনোদয়ে চ মধ্যাহ্নে তথা সায়াহ্নকেঽহনি॥"—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে জগদ্ধাত্রীপূজা করিতে হয়।

সিংহবাহিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর কল্পনা কত প্রাচীন সেবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন দেবী জগদ্ধাত্রী আসলে দেবী বসুন্ধরা। এশিয়া মাইনরের আনাতোলিয়ার ফ্রিজিয় জাতি খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়ের গুহামন্দিরে এক সিংহবাহনা দেবীর পূজা করিত। ফ্রিজিয়রা এই দেবীকে তাহাদের ভাষায় বলিত 'গদান মা'। ভাষাচার্য সুকুমার সেনের মতে, উহা আসলে মাতা ধরিত্রীর মূর্তি। ইহার ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন, হিন্দুদের জগদ্ধাত্রীর কল্পনা ফ্রিজিয়দের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন, দেবী জগদ্ধাত্রী দেবী ধরিত্রী বা পৃথিবীদেবীরই রূপভেদমাত্র। কালিকাপুরাণে (৩৭।২৫-২৮) আছে—পৃথিবী-দেবী রাজর্ষি জনককে জগদ্ধাত্রী বা লোকধাত্রী

রূপে দেখা দিয়াছিলেন। পুত্র নরককে পৃথিবী-দেবী বলিয়াছিলেনঃ “অহং তে জননী তাত ময়া জাতোঽসি পুত্রক।/পৃথিব্যহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ন্ত্বিদম্।” (৩৮।৬৩)—পুত্র, আমি তোমার জননী, আমা হইতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমিই জগদ্ধাত্রী পৃথিবী, আমার স্বরূপই মৃত্তিকা। চণ্ডীর মধ্যেও দেবীর পৃথিবীরূপের পরিচয় আছে। দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবী কর্তৃক নিহত হইলে দেবগণ যখন দেবীর স্তুতি করিতেছেন তাহাতে দেবীর মহীস্বরূপের সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়ঃ “আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি” (১১।৪)—পৃথিবীরূপে বিরাজিতা আপনি একাই জগতের আশ্রয়স্বরূপা।

জগদ্ধাত্রীর রূপকল্পনা ভারতে সুপ্রাচীন হইলেও পৃথকভাবে তাঁহার পূজার্চনার ইতিহাস কিন্তু প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না। বঙ্গদেশে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বীয় রাজধানী কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেন। ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৭৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দের।

কথিত আছে, অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র প্রত্যেকে অহঙ্কারবশতঃ নিজেকেই দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবিতে আরম্ভ করেন। প্রত্যেকেই নিজেকে পরমেশ্বর বলিয়া আস্ফালন করিতে থাকেন। তাঁহাদের ধারণার অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য আদ্যাশক্তি কোটিসূর্যসম জ্যোতির্ময়ী রূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রকটিত হন। দেবতারা এরূপ মূর্তি ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নাই। দেবীর পরিচয় জানিবার জন্য প্রথমে বায়ু গেলেন। দেবী বায়ুকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বায়ু সদর্পে বলিলেনঃ “আমি দেবশ্রেষ্ঠ বায়ু। আমার প্রতাপে আমি জগৎকে স্থানচ্যুত করিতে পারি।” ইষৎ হাস্য করিয়া দেবী বায়ুর সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেনঃ “ইহাকে স্থানচ্যুত বা উত্তোলন কর।” মহা অবজ্ঞার সঙ্গে বায়ু দেবীর কথা শুনিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটিকে স্থানচ্যুত বা উত্তোলন করিতে তিনি সমর্থ হইলেন না। নতমস্তকে ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া তিনি ফিরিয়া যাইলেন। তাহার পর আসিলেন অগ্নি। স্পর্ধাভরে তিনি দেবীকে আপন পরিচয় প্রদান করিলেনঃ “আমি অগ্নি। আমি সমগ্র পৃথিবীকে নিমেষমাত্রে ভস্মীভূত করিতে পারি।” দেবী সহাস্যে ঐ তৃণটি অগ্নির সম্মুখে রাখিয়া বলিলেনঃ “ইহাকে দগ্ধ কর।” অগ্নির অবস্থাও বায়ুর মতো হইল। আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও সামান্য তৃণটিকে তিনি দগ্ধ করিতে পারিলেন না। অতঃপর বরুণ এবং চন্দ্রেরও একই অভিজ্ঞতা হইল। হতমান দেবচতুষ্টয় তখন বুঝিলেন, বস্তুতঃপক্ষে তাঁহাদের নিজস্ব কোন শক্তি নাই। যাহা তাঁহাদের আপন গৌরব বলিয়া এতকাল ভাবিয়াছিলেন তাহা আসলে প্রতিফলিত গৌরব। অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারা ঐ জ্যোতির্ময়ী দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। সেই আরাধনার ফলে তাঁহারা উপলব্ধি করিলেনঃ ঐ জ্যোতির্ময়ী দেবীই সমুদয় শক্তির উৎস। তাঁহার অঙ্গুলিহেলনেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তিনিই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, জগৎ তাঁহাতে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তিনি জগদ্ধাত্রী।

এই উপাখ্যানের উৎস অজ্ঞাত। তবে ইহার পশ্চাতে যে কেন উপনিষদের বিখ্যাত উমা-হৈমবতী উপাখ্যানের ছায়াপাত ঘটিয়াছে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ছায়াপাত বিনা কারণে নহে। দুর্গা এবং জগদ্ধাত্রী যে অভিন্ন তাহার ইঙ্গিত এই উপাখ্যানের মধ্যে রহিয়াছে। উমা-হৈমবতী যে প্রকৃতপক্ষে দুর্গারই নামভেদমাত্র তাহা আমরা জানি। জগদ্ধাত্রী যে উমা-হৈমবতীই তাহা ঐ উপাখ্যানে বুঝানো হইয়াছে।

দেবী দুর্গাই যে নামান্তরে ও রূপান্তরে জগদ্ধাত্রীরূপে পূজিত হন তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। চণ্ডীতে প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মাকৃত দেবীর স্তবে আছেঃ “ত্বয়ৈব ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।/ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা” ॥ (১।৭৫)—হে দেবী, আপনি এই জগৎকে ধারণ করেন, আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, আপনি এই জগৎকে পালন করেন এবং প্রলয়কালে আপনিই ইহাকে সংহার করেন।

'জগদ্ধাত্রী' শব্দটির অর্থ জগৎকে যিনি ধারণ করেন। দুর্গা আদ্যাশক্তি। তিনি জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করেন। তাঁহার এই ত্রিবিধ ভূমিকার কথা ব্রহ্মার স্তবে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে অতিরিক্ত একটি ভূমিকাও। তাহা হইল ধারয়িত্রীর ভূমিকা। এবং এই ভূমিকার কথাই ব্রহ্মাকর্তৃক সর্বাগ্রে কথিত। দেবী সম্পর্কে মেধাঋষির বর্ণনাতেও 'জগদ্ধাত্রী' শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে—বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্" (চণ্ডী, ১।৭০)। অন্যত্র মেধাঋষির কণ্ঠে আমরা শুনিঃ "দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ" (৫।১১৬)—তিনি দুর্গা ভগবতী মঙ্গলরূপা, যাঁহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে। মহিষাসুর বধের পর ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা যখন দেবীর স্তব করিতেছেন তখন যে তাঁহারা দেবীর জগদ্ধাত্রীরূপকে স্মরণ করিতেছিলেন মেধাঋষি সুরথকে তাহা বলিয়াছিলেনঃ "এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।/অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ।" (৪।২৯)—স্বর্গের নন্দনবনে জাত দিব্য পুষ্প এবং গন্ধ ও অঙ্গরাগ দ্বারা দেবগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুত ও পূজিত হইয়া জগতের ধাত্রী [বলিলেন]।

দেবী দুর্গার সর্বশেষ যে কর্মটি চণ্ডীতে কীর্তিত তাহা হইল নিশুম্ভ ও শুম্ভ বিনাশ। নিশুম্ভ ও শুম্ভকে বধ করিলে উল্লসিত দেবগণ দেবীর স্তব করিতে শুরু করিলেন। দেবতাদের সেই স্তবের উপসংহারে বলা হইতেছেঃ "বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং। (১১।৩৩)—হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি বিশ্বকে পরিপালন করেন। হে বিশ্বাত্মিকা, আপনি বিশ্বকে ধারণ করেন। আবার চণ্ডীর সর্বশেষ অধ্যায় ত্রয়োদশ অধ্যায় (শ্লোক ১৩), মার্কণ্ডেয় মুনি বলিতেছেনঃ রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী দুর্গা জগদ্ধাত্রীরূপে তাঁহাদের কাছে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন—"পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।" এইভাবে চণ্ডীর আদ্য মধ্য ও অন্ত জুড়িয়া দুর্গাই জগদ্ধাত্রী অথবা জগদ্ধাত্রীই দুর্গা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রথমেই উল্লেখিত হইয়াছে, কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীপূজা হয়। জগদ্ধাত্রী এবং দুর্গা বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে কার্তিকী শুক্লা নবমী তিথি 'দুর্গানবমী' নামে এবং দেবী জগদ্ধাত্রী 'মহাদুর্গা' নামে অভিহিত হইয়াছেনঃ "কার্তিকে শুক্লপক্ষে চ যা দুর্গানবমী তিথিঃ /সা প্রশস্তা মহাদেব মহাদুর্গাপ্রপূজনে॥" —হে মহাদেব, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দুর্গানবমী তিথি মহাদুর্গার পূজার জন্য প্রশস্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জগদ্ধাত্রীপূজায় দুর্গাপূজার মতো সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই দিনে পূর্বাহ্নে সপ্তমী, মধ্যাহ্নে অষ্টমী এবং সায়াহ্নে নবমী পূজার প্রথা হইলেও, কোথাও কোথাও দুর্গাপূজার মতোই দিবসত্রয় ধরিয়া জগদ্ধাত্রী-পূজাও হইয়া থাকে। দশমীর বিসর্জনও দুর্গা-দশমীর বিধি অনুসারেই হইয়া থাকে।

সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি আছে বৈসাদৃশ্যও দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী এবং জগদ্ধাত্রী করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী। কিন্তু এই বৈসাদৃশ্য আপাতঃ, মূলতঃ নহে। কারণ মহিষাসুরই প্রকৃতপক্ষে করীন্দ্রাসুর অথবা করীন্দ্রাসুরই প্রকৃতপক্ষে মহিষাসুর। চণ্ডীর বর্ণনা হইতেই ইহা বুঝা যায়। চণ্ডীর তৃতীয় অধ্যায়ে—যেখানে দেবীর সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে—দেখা যায় যুদ্ধে মায়াবী মহিষাসুর মহিষাকৃতি ত্যাগ করিয়া নানা রূপ ধারণ করিয়াছিল। প্রথমে সে সিংহরূপ ধারণ করে। দেবী খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ এক খড়্গধারী পুরুষরূপ ধারণ করিল। দেবী তাহাকেও বিনাশ করিলেন। তখন মহিষাসুর মহাগজ বা বৃহৎ হস্তীর (করীন্দ্রের) আকার ধারণপূর্বক শুণ্ডদ্বারা দেবীবাহন সিংহকে আকর্ষণ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল। দেবী খড়্গদ্বারা শুণ্ডটিকে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। করীন্দ্রাসুর বিনষ্ট হইল। মহিষাসুর তখন পুনরায় স্বমূর্তি (মহিষমূর্তি) ধারণ করিল। অতঃপর সিংহবাহিনী দেবী মহিষাসুরের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। সুতরাং

মহাগজ বা করীন্দ্ররূপই মহিষাসুরের সর্বশেষ মায়ারূপ, অর্থাৎ করীন্দ্রাসুরই রূপান্তরে মহিষাসুর এবং দেবী জগদ্ধাত্রীরূপে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। পুরাণান্তরে মহিষাসুরের আরও ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গ্রহণের উল্লেখ থাকিলেও, মহিষাসুরের সর্বশেষ মায়ারূপ যে করী বা হস্তী সেবিষয়ে সকল পুরাণই একমত।

কিন্তু ইহা তো হইল দেবীর পৌরাণিক রূপের আলোচনা। সিংহারূঢ়া গজাসুরনাশিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপের আধ্যাত্মিক বা প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা হইল এইঃ পরিদৃশ্যমান যে বিশ্বচরাচর আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে ইহার নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এক অদৃশ্য মহাশক্তির হস্তে। সেই শক্তি সুকঠোর শৃঙ্খলায় জগৎকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, গিরি-নদী-সমুদ্র—এককথায় সমগ্র প্রকৃতি—তাঁহার নির্দেশে স্ব-স্ব ভূমিকা সুচারুভাবে পালন করিতেছে। সংঘর্ষহীন এই অনবদ্য শৃঙ্খলায় জগৎ আপন গতিতে প্রবহমান। কিন্তু ইহা তো বহির্জগতের শৃঙ্খলা। আসল জগৎ তো আমাদের অন্তরে। বহির্জগতের শেষ আছে, সীমা আছে; কিন্তু মনোজগতের শেষ নাই, সীমা নাই। অসীম অন্তর্জগতের শৃঙ্খলা নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিমানুষের চারিত্রিক শৃঙ্খলার উপর। যে সমষ্টিশক্তি বহির্জগতকে শাসন করিতেছেন তাহাই ব্যষ্টিশক্তি হিসাবে প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত। সেই শক্তির জাগরণ চাই। মন আমাদের সেই শক্তিকে যথেচ্ছ চালনা করে। আমরা সকলেই আমাদের স্ব-স্ব মনের ক্রীতদাস। মনই আমাদের প্রভু। আর ইহারই ফলে জগতে যত অনর্থের সৃষ্টি, জগতে যত বিশৃঙ্খলা, যত ছন্দপতন। জওহরলাল নেহরু বলিতেনঃ "জগতে যত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সবগুলির সূত্রপাত মানুষের মনে। মানুষের মনে সঞ্জাত ঈর্ষা, লোভ, অসহিষ্ণুতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে একটি দেশের সঙ্গে অপর একটি দেশের যুদ্ধে।" কথাটি খুবই সত্য।

জগতে যথার্থ শৃঙ্খলা, যথার্থ ছন্দ তখনই রচিত হয় যখন মানুষ তাহার মনকে ক্রীতদাস করিয়া স্বয়ং তাহার প্রভু হইতে পারে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেনঃ "যে মহাযোদ্ধা একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করিয়াছে আমি তাহাকে বীর বলিয়া স্বীকার করি না। আমি বীর বলি তাহাকে যে আপন মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, নিজের মনকে যে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছে।" শ্রীমা বলিতেনঃ "মন না মত্ত হস্তী। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে।" সকল সন্ত-সাধকগণই তাহাই বলেন। বাস্তবিক, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেনঃ "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।/তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" (গীতা, ৬।৩৪)—হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চল, অতীব বিক্ষোভকর, প্রবল এবং দৃঢ়। বাতাসকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা সুকঠিন, মনকে নিয়ন্ত্রণ করাও তেমনই অত্যন্ত কঠিন। যাঁহারা এই দুঃসাধ্য কর্মটি সম্পাদন করিতে পারেন তাঁহারা সমগ্র জগৎকেই নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ। এইরূপ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই জগতের যথার্থ ধারক, তাঁহারাই জগতের যথার্থ শক্তি-কেন্দ্রস্বরূপ। আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের আশ্রয় করিয়াই জগৎকে ধারণ ও পোষণ করেন। তাঁহারা না থাকিলে সভ্যতার ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়, মানবসমাজ বিপন্ন হয়। কৃষ্ণ-বুদ্ধ হইতে খ্রীস্ট-রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যেসকল ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিদের জগৎ এযাবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাঁহারা এই তথ্যটিকেই প্রকট করিয়াছেন। জগদ্ধাত্রী কর্তৃক করীন্দ্রাসুরের নিগ্রহ ও বিনাশের প্রকৃত তাৎপর্য এইখানে। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত সহজ কথায় জগদ্ধাত্রীরূপের তাৎপর্য পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেনঃ "জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।" (কথামৃত, ১।৬।৩) "তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন"—অর্থাৎ সে-ই তখন জগদ্ধাত্রী হইয়া যায়। এই 'হওয়া'-র তত্ত্বটিই জগদ্ধাত্রীরূপের মর্মকথা। স্বামীজীর মতে, এই 'হইতে থাকা' এবং পরিশেষে 'হওয়া'-ই হইল ধর্ম।

প্রবন্ধ

মাতা জগদ্ধাত্রী

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জগদ্ধাত্রী পূজামণ্ডপে হরনাথ বসু নিবিষ্টমনে পূজা দেখিতেছেন। দুর্গাপূজার মতো জগদ্ধাত্রী পূজা বহুপ্রচলিত নয়। সেজন্য যেখানে ইহা হয় সেখানে বহু নরনারীর ভিড়। হরনাথের ভিড়ের দিকে লক্ষ্য নাই, বেদিতে মূর্তির দিকেও নয়। মাতা জগদ্ধাত্রীর বিশ্ববিধায়িনীশক্তির কথা ভাবিয়া তিনি ভাববিভোর।

পরমেশ্বরকে আমরা যখন পিতা বলিয়া ডাকি তখন তাঁহার নানা অনন্ত কল্যাণগুণের কথা চিন্তা করি, সেইসব গুণকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করি, স্তব গাই। নানা উপনিষদে এই সকল স্তুতি বর্ণিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবানকে মাতা বলিয়া ধ্যান-চিন্তা করিবার কথা বিশেষ করিয়া বলিতেন। পিতৃ-ভাব যে তিনি মানিতেন না তাহা নয়। পিতৃভাব-মূলক ব্রাহ্মসমাজের বহু গান তিনি শুনিতে ভালবাসিতেন—শুনিয়া সমাধিস্থ হইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের নানা স্থানে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতা ও মাতার মধ্যে আমাদের লৌকিক জীবনে যেমন বড় একটা ভেদ নাই, তেমনি আমরা যখন আধ্যাত্মিক স্তরে উঠি এবং শ্রীভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাই তখন এই সম্বন্ধ পিতা হইতে পারে, মাতাও হইতে পারে। যে-সকল গুণ ও ঐশ্বর্য পিতা-ভগবানের উদ্দেশে আমরা প্রয়োগ করি ঐ সকল গুণ কি মাতা-ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না? অবশ্যই চলে, যদিও সম্পূর্ণভাবে নয়। পরমেশ্বরী যখন দৈত্য-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন তখন তাঁহার ভিতর যেসব শক্তিবিকাশের বিবরণ আমরা চণ্ডীতে পড়ি তাহা অমানুষিক পৌরুষশক্তি। সাধারণ একজন নারীর ভিতর যদি ঐরূপ পৌরুষ দেখিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতাম। কিন্তু ইনি তো সাধারণ নারী নন। ইনি ভগবতী। ইঁহার মধ্যে সকল পৌরুষশক্তি যদি প্রকাশ পায় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। যাহা হউক জগজ্জননীর মধ্যে আমরা সাধারণতঃ নারীর যেসব গুণ তাঁহাকে স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, করুণাময়ী, ক্ষমাময়ী, কান্তিময়ী, শান্তিময়ী করে,

পিতা ও মাতার মধ্যে আমাদের লৌকিক জীবনে যেমন বড় একটা ভেদ নাই, তেমনি আমরা যখন আধ্যাত্মিক স্তরে উঠি এবং শ্রীভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাই তখন এই সম্বন্ধ পিতা হইতে পারে, মাতাও হইতে পারে। যে-সকল গুণ ও ঐশ্বর্য পিতা-ভগবানের উদ্দেশে আমরা প্রয়োগ করি ঐ সকল গুণ কি মাতা-ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করা চলে না? অবশ্যই চলে, যদিও সম্পূর্ণভাবে নয়। পরমেশ্বরী যখন দৈত্য-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন তখন তাঁহার ভিতর যেসব শক্তিবিকাশের বিবরণ আমরা চণ্ডীতে পড়ি তাহা অমানুষিক পৌরুষশক্তি। সাধারণ একজন নারীর ভিতর যদি ঐরূপ পৌরুষ দেখিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতাম। কিন্তু ইনি তো সাধারণ নারী নন। ইনি ভগবতী। ইঁহার মধ্যে সকল পৌরুষশক্তি যদি প্রকাশ পায় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জগদ্ধাত্রী—জগৎকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন, পড়িতে দিতেছেন না, স্খলিত হইতে দিতেছেন না। শিশুকে যখন মা তাঁহার বুকে ধরিয়া থাকেন শিশু পড়িতে পারে না। একটি সুবৃহৎ গাছের দিকে তাকাইয়া দেখ—কত শাখা-প্রশাখা পত্র-পুষ্প-ফলভার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মানুষের মায়ের মতো এই বৃক্ষও কি ডালপালা ফুলফলের প্রতি স্নেহ পোষণ করে না? এই মহীরুহ কি মহীমাতার একটি প্রতিমা নয়? জগৎকে যিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন তিনি জগতের ছোট-বড় সব কিছুকেই আশ্রয় দিতেছেন। একটি ক্ষুদ্র তৃণ, একটি ধূলিকণাও মাতার সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, ভালবাসা হইতে বঞ্চিত নয়।

ঐসব গুণেই বিশেষভাবে আরোপ করি। তাঁহার প্রত্যেকটি গুণকে আমরা অসীমতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে চাই। অনন্ত তাঁহার ক্ষমা, অসীম তাঁহার শান্তি, বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই তাঁহার সৌন্দর্যের। ধৈর্যের তাঁহার তুলনা নাই। একজন সাধারণ নারীর কোন গুণের একটি সীমা আছে। তাঁহার কোনও গুণকে যদি আমরা অতিমাত্রায় বাড়াইতে চাই তাহা হইলে তাহা খোশামোদের পর্যায়ে পড়িয়া যায়। উহা সেই নারীর মর্যাদা বাড়ায় না, বরং তাঁহাকে খাটো করিয়া তোলে। পক্ষান্তরে জগজ্জননীর গুণবর্ণনে কখনো অত্যুক্তি হইতে পারে না।

পূজামণ্ডপে বসিয়া হরনাথ এইসব ভাবনাই ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মনে ভগবদ্‌গীতার এই স্তবকটি মনে পড়িয়া গেল—'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।' (গীতা ১০।৩৪) নারীর মধ্যে এই গুণগুলি শ্রীভগবানের বিভূতি—নারীর কীর্তি অর্থাৎ কর্মশক্তি, শ্রী, মিষ্ট কথা, স্মৃতি-শক্তি, মেধা, সহ্য করিবার শক্তি এবং ক্ষমা গুণ। ঐ গুণগুলিকে যদি সম্মিলিতভাবে দেখা যায় এবং ঐ সম্মিলন যদি বৃহৎ, অতিবৃহৎ অনন্ত আকার ধারণ করে তাহা হইলে আমরা যাহা পাই তাহাই মাতা জগদ্ধাত্রী। এই মূর্তিতে রজঃ ও তমোগুণের স্পর্শ বিশেষ নাই। সর্বসত্ত্বময়ী মূর্তি।

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়
যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।"

হরনাথ বসুর হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ প্রিয় গানটির (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।৩) গুঞ্জন উঠিতে লাগিল। মাতা জগদ্ধাত্রীর সর্বসত্ত্বময়ী মূর্তি অন্তরে বাহিরে বিস্তারিত হইতে আরম্ভ করিল। লাল চেলি পরিহিতা নানালংকারভূষিতা স্মিতহাস্যময়ী মাতা অসংখ্য আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী—জগৎকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন, পড়িতে দিতেছেন না, স্খলিত হইতে দিতেছেন না। শিশুকে যখন মা তাঁহার বুকে ধরিয়া থাকেন শিশু পড়িতে পারে না। একটি সুবৃহৎ গাছের দিকে তাকাইয়া দেখ—কত শাখা-প্রশাখা পত্র-পুষ্প-ফল-ভার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মানুষের মায়ের মতো এই বৃক্ষও কি ডালপালা ফুলফলের প্রতি স্নেহ পোষণ করে না? এই মহীরূহ কি মহীমাতার একটি প্রতিমা নয়? ভক্ত হরনাথ বসুর হৃদয়ে ভাবের পর ভাব উঠিতেছে—জগদ্ধাত্রীমাতার এই সকল ভাব এক 'মূল প্রত্যয়'কে কেন্দ্র করিয়া উঠিতেছে। জগৎকে যিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন তিনি জগতের ছোট-বড় সব কিছুকেই আশ্রয় দিতেছেন। একটি ক্ষুদ্র তৃণ, একটি ধূলিকণাও মাতার সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, ভালবাসা হইতে বঞ্চিত নয়।

জগন্মাতা বা ব্রহ্মশক্তি সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এই তিন প্রক্রিয়া দ্বারা সংসারকে চালাইতেছেন। আমরা সাধারণতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার নায়িকাকে এক বলিয়া জানি। যখন দুর্গা বা কালী বা অন্নপূর্ণা প্রভৃতি মহাশক্তিময়ীর উপাসনা করি তখন মোটামুটি তাঁহার সকল শক্তিরই বর্ণনা করি। যেকোনও দেবীর স্তব-স্তুতিতে ইহা দেখা যায়। হিন্দুর উপাসনার ইহা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত বেদে। বেদবাণী—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" সত্য এক, ঋষিরা নানাভাবে তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডে আছে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" এই যাহাকিছু দেখিতেছ সব সেই বৃহত্তম এক সত্য—ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি, তাঁহা দ্বারাই পালন এবং তাঁহাতেই লয়। মনকে শান্ত করিয়া এই তত্ত্বের উপাসনা কর।

অতএব আমরা যখন মায়ের পূজা করি তখন তাঁহার সর্বস্তরের শক্তির কথা ভুলি না। তিনি দুর্গাই হউন বা কালীই হউন বা লক্ষ্মী সরস্বতী শীতলাই হউন্ অবিভাজ্য ব্রহ্মশক্তির উপর তিনি দাঁড়াইয়া—তিনি "তজ্জলান্", তিনি সমগ্র। তবে আমি ভক্ত, কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জগন্ময়ী মহামায়াকে কোনও বিশেষ রূপে ও নামে তাঁহার আরাধনা করিবার অধিকার আমার আছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে মায়ের কত কীর্তি, কত মহিমার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। মহিষাসুর নাশের জন্য ত্রিলোকের সকল শক্তি একত্রিত হইয়া এক অতুলনীয় সর্বব্যাপিনী সংহারমূর্তি পরিগ্রহ করিল। উহা দেখিয়া—

"চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।"
(চণ্ডী ২।৩৩-৩৪)

লোকসমূহ ক্ষুব্ধ হইল, সাগর মহাসাগর উদ্বেল এবং বসুন্ধরা চঞ্চল হইল। পর্বতসমূহ টলমল করিতে লাগিল।

ভক্ত সাধারণতঃ ঐরূপ প্রচণ্ড মূর্তির ধ্যান করেন না। যদি কখনো করেন তখন ভয়ার্ত হইয়া কেবল বলিতে থাকেন—প্রসীদ, প্রসীদ, মা। কিন্তু দেবতারা অসুরবধের পর সংগ্রামমত্তা মাতার সাত্ত্বিক বিভূতিগুলি স্মরণ করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। সংসারকে ধরিয়া রাখিতে মায়ের সেই বিভূতিগুলিরই তো বেশি প্রয়োজন। তিনিই বিশ্বচেতনা বলিয়া অভিহিতা—তাঁহাকে 'নমো নমঃ'। তিনিই সর্বজীবের বুদ্ধিতে প্রকাশিতা। তিনিই শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, সমৃদ্ধি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, সর্বব্যাপ্তি স্বরূপিণী মহামাতা—।
(চণ্ডীঃ উত্তরচরিত, ৫ম অধ্যায়)

যদিও জগন্মাতা ত্রিগুণময়ী তবুও ভক্তের ভাব ও শ্রদ্ধা অনুযায়ী তাঁহাকে একটি বা দুটি গুণের মাধ্যমে পূজা ও ধ্যান করিতে কোনও বাধা নাই। মাতা জগদ্ধাত্রী প্রধানতঃ সত্ত্বময়ী। সেজন্য ভক্ত হরনাথ বসু তাঁহার মনকে সাত্ত্বিকভাবে মায়ের উপাসনায় নিবিষ্ট রাখিয়াছেন।

“ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।” হরনাথ বসু মায়ের একটি সাত্ত্বিক প্রকাশ ভাবিয়া যেই একটু নিঃশ্বাস লইতেছেন অমনি হৃদয়ের গভীর হইতে অন্য একটি ভাব আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। এমনি করিয়া তাঁহার অন্তরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মূর্তি জাগিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাকে ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রিতে জগন্মাতারূপে পূজা করিয়াছিলেন। সেই রাত্রি হইতে নারীশরীরে তাঁহার ভিতর জগদ্ধাত্রীর পালনীশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কি? শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের জিহ্বায় যে মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, কথিত আছে তাহা জগদ্ধাত্রী মন্ত্র।

বাহিরে বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। কলিকাতায় দর্শনের সময় মায়ের মুখ অবগুণ্ঠনাবৃতা। চরণদুটি শুধু স্পর্শ করা যাইত। শ্রীশ্রীমাকে আবিষ্কার করিবার শক্তি স্ত্রীভক্তদেরই ছিল। স্ত্রীভক্তদের সহিত কত অন্তরঙ্গ কথা কহিতেন! তাঁহাদের লিপিবদ্ধ স্মৃতিকথায় আমরা ইহা দেখিতে পাই। জয়রামবাটীতে মায়ের দৈনিক কার্যকলাপ আমরা বহু সাধুভক্তের লিখিত কাহিনীতে পড়িয়া বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত হই। বৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘের পরিপালন ও পরিপুষ্টির জন্য তাঁহার নিরলস নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যাপৃতি অতি বিস্ময়কর। শ্রীশ্রীমায়ের এই নিরন্তর কর্মপ্রবাহে রজঃ বা তমোগুণের কোনও চিহ্ন নাই। তাঁহার সকল কাজ ও কথাবার্তার মধ্যে এক আশ্চর্য জীবন্ত সত্ত্বের প্রকাশ। নহিলে তাঁহাকে অল্পক্ষণের জন্যও দর্শন করিলে, তাঁহার কাছে বসিলে, তাঁহার পাদস্পর্শ করিলে এত শান্তি, এত শক্তি, এত অভয় ও আনন্দ ভক্তেরা পাইতেন কি করিয়া?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—“ও সারদা সরস্বতী।” স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে একবার শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নহবতে পাঠাইবার সময়ে ইঙ্গিতে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যাঁহার নিকট তাঁহাকে তিনি পাঠাইতেছেন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্বময়ী প্রেমময়ী মহাশক্তি শ্রীরাধা। রজঃ ও তমোগুণ বিরহিতা হইয়া জগতের অশেষ বৈচিত্র্য ও ভেদের মধ্যে অপূর্ব সমবুদ্ধি বজায় রাখিয়া শ্রীশ্রীমা সকল কর্ম করিতেন—কি গঙ্গাস্নান, কি ঠাকুরপূজার আয়োজন, কি তরকারি কোটা, কি রন্ধন করা, কি ভক্তদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা,—সর্ব অবস্থায়, সকল পরিবেশে মা একই মা—বেদান্তপ্রতিমা মা—জগদ্ধাত্রী মা।

ভক্ত হরনাথ বসুর হৃদয়ে পূজাবেদীতে আরাধিতা মাতা জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সহিত নরদেহধারিণী মানসপটেভাসিতা জননী সারদামাতার কোন ভেদ রহিল না। তাঁহার চিত্ত অপার্থিব আনন্দে ভরিয়া গেল।

শান্তির দিশারী শ্রীমা সারদা দেবী

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপন করতে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জগৎ-নিয়ামক ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে মনুষ্যরূপ পরিগ্রহপূর্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ধর্মসংস্থাপন এবং দুষ্টদমন—এই দুটি কার্য ছাড়াও ভগবানের মনুষ্যরূপে আবির্ভাবের আরেকটি তাৎপর্যের কথা শাস্ত্রাদিতে বলা আছে, তা হলো—লীলাবিলাস। ভগবান মনুষ্যদেহে ঠিক সাধারণ মানুষের মতো সুখ-দুঃখ, জরা-ব্যাধিকে স্বীকার করে নিয়ে ক্রীড়া করতে ভালবাসেন। ভগবানের এই লীলাবিলাসই সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ মনোগ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ। অবতারগণ জীবকে যে যুগধর্ম শিক্ষা দেন, যে বাণী দেন, লীলাবিলাসের মধ্যে দিয়েই সেসব বাণী তাঁদের জীবনে প্রথম বাস্তবায়িত হয়। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"—অবতারজীবনে এইটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অবতারের সাধনা, সংসার-ধর্ম পালন, আপাতঃ দৃষ্টিতে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ—সবকিছুর মধ্যেই লোকশিক্ষার ভাবটি পরিস্ফুট।

ভগবান তখন মনুষ্যদেহ ধারণ করে জগতে আসেন, তখন তাঁর অনির্বচনীয় শক্তি পরমা প্রকৃতিকেও দেহধারিণী করে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এ যেন নিজেকেই দুই অংশে বিভক্ত করে রূপ পরিগ্রহ করা। কারণ, মূলতঃ ভগবান ও তাঁর শক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তত্ত্বের দিক দিয়ে শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। লৌকিক দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন দেহ বলে মনে হয়। এই ভিন্ন দেহে অবতীর্ণ না হলে ভগবল্লীলার মাধুর্য সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় না এবং লোকশিক্ষার দিকটিও যথার্থরূপে পরিবেশিত হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীতে সেই জন্মরহিত অব্যয়াত্মা জগন্নিয়ামক ঈশ্বর যখন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হলেন তখনো নিয়ে এলেন তার পরমা প্রকৃতিকে জীবনসঙ্গিনীরূপে। ভগবৎ-শক্তি পরমাপ্রকৃতি যিনি পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে মহামায়ারূপে কীর্তিত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণি দেবী—ভক্তদের শ্রীশ্রীমা।

সুদীর্ঘ বারো বছর বিভিন্ন মতে ও পথে সাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের বাণী ও শিবজ্ঞানে জীব-সেবারূপ যুগাদর্শ নির্দেশ করে ধর্মে ধর্মে ভেদ, মানুষে মানুষে ভেদ দূর করার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে মনুষ্যসমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শান্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। মহাসমাধিতে লীন হওয়ার কিছুদিন পূর্বে শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলেছিলেন: "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" মা অনুযোগের স্বরে বলেছিলেন, "আমি মেয়েমানুষ। তা কি করে হবে?" ঠাকুর নিজ অঙ্গ দেখিয়ে বলেছিলেন, এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে। মা-ও আর কথা না বাড়িয়ে বলেছিলেন, "সে, যখন হবে, তখন হবে।" "পোকার মতো কিলবিল করছে"—ঠাকুরের এ কথা কলকাতার লোকদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আধুনিক নগরকেন্দ্রিক ভোগবাদী সভ্যতার পীড়নে নিষ্পেষিত শান্তিহীন সকল মানুষকে শান্তির পথ প্রদর্শন করতেই শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুরের এই নির্দেশ। আর শ্রীশ্রীমা-ও "সে যখন হবে, তখন হবে" বলে লোককল্যাণে নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন।[১]

বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ক্রমবর্ধমান। কেউ-ই যেন শান্তিতে নেই। সকলেরই এক কথা, শান্তি নেই। যার টাকা-কড়ি, নানা ভোগসামগ্রী আছে তার যেমন শান্তি নেই, আর যার কিছু নেই তারও শান্তি নেই। অথচ সকলেই শান্তি চায়। শান্তিই জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। মানুষের যত কর্মপ্রচেষ্টা, যত কিছু সম্পদ আহরণের স্পৃহা, [illegible] ধর্মকর্ম—সবকিছুর মূলেই থাকে শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। শান্তি মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বলেই আমাদের ধর্মে জীবনের সর্বশেষ গতি হিসাবে শান্তিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে

---

[১] শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ (১৯৭৫), পৃঃ ১৪৬-৪৭

অবশ্য এই শান্তির অর্থ আমরা দৈনন্দিন জীবনে 'শান্তি' বলতে যা বুঝি—উদ্বেগরহিত সাংসারিক সুখ—তার থেকে অনেক ভিন্ন। এই শান্তির অর্থ সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার উপশম—যাকে বলে 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ'। এ-শান্তি সকলের লভ্য নয়। বহু জন্ম-জন্মান্তর সাধনলব্ধ শুভ সংস্কারের ফলে কারো কারো মনে সেই চিরশান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু সকলেই সংসার-জীবনে যে শান্তি চায়, তা-ও পায় না। বর্তমান সমাজে ক্রমশঃ তা যেন আরও দুর্লভ হয়ে উঠছে। আধুনিক অত্যুগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষকে আজ স্বার্থপর করে তুলছে। পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, গড়ে তুলছে পারস্পরিক মানসিক ব্যবধান। তারই বিষময় ফল সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। পারিবারিক জীবনে মানুষ আজ অসহিষ্ণু। সাংসারিক কাজকর্মে সমন্বয়ের অভাব। কারো মনোভাব কেউ বুঝতে পারছে না—বুঝতে চেষ্টাও করছে না। এই হচ্ছে বর্তমান সমাজজীবনের চিত্র। অথচ পারিবারিক শান্তি নির্ভর করে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মতামতের যুক্তিসঙ্গত মর্যাদা ও পারস্পরিক সহানুভূতির ওপর নির্ভর করে, যার যতটুকু মর্যাদা পাওয়ার অধিকার তাকে ততটুকু প্রদানের মধ্যে এবং সকলকে আপন করে নেওয়ার মানসিকতার মধ্যে। অথচ উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তৎপ্রসূত স্বার্থপূর্ণ মন সহজে তা করতে পারছে না। ফল—সংসার থেকে শান্তি অন্তর্হিত। কিন্তু সংসা[illegible] শান্তি সকলেই খুঁজছে। বরং তা অত্যধিক মাত্রায় খুঁজতে গিয়েই মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়ে অত্যুগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জালে আবদ্ধ হয়ে অশান্তিকে ডেকে আনছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারীদের শান্তিতে সংসারজীবন অতিবাহিত করার উপায় বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো বা পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকতে অর্থাৎ বড়লোকের বাড়ির দাসী যেমন মনিবের সকল কাজ[illegible]রে, অথচ মনিবের সংসারের প্রতি তার কোন আসক্তি জন্মে না, কিংবা পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকলেও যেমন তার গায়ে পাঁক লাগে না, সেরূপ ভাবে মানুষকে সংসারে থাকতে অর্থাৎ নিরাসক্ত হয়ে সংসারধর্ম পালন করতে বলেছেন। এরূপ করতে পারলে তবে 'ধোঁকার টাটি' সংসার 'মজার কুটি'তে পরিণত হবে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো আর সাধারণ মানুষের মতো সংসার করেননি। তিনি যে দিব্যসংসার করেছেন, সাধারণ মানুষ সে-সংসারের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে না। তাই বড়লোকের বাড়ির দাসী বা পাঁকাল মাছের মতো নিরাসক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব তার একটি দৃষ্টান্ত মানুষের সম্মুখে থাকলে তা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রীশ্রীমায়ের সংসারজীবন জীবের কাছে এই দৃষ্টান্ত। তাঁর সংসারজীবন সাধারণ মানুষের জীবনের বিশেষ পথপ্রদর্শক। মায়ের সংসারের যে-চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধারণতঃ সংসারে যেসব ঝামেলা, যা মানুষকে সাংসারিক জীবনে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে—যার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ করে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তদপেক্ষা মায়ের সংসারের ঝামেলা ছিল অনেকগুণ বেশি। ভ্রাতাদের স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত ঝগড়া-মনোমালিন্য, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পারস্পরিক হিংসা, রাধুর হরেক বায়নাক্কা, ছোটমামীর পাগলামি, নলিনীদিদির শুচিবাই—এইসব নিয়ে মায়ের সংসার। তার ওপর ভক্তদের দীক্ষা দেওয়া, তাদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা—এসব তো আছেই। অথচ মা কী স্থির ধীর ও শান্তভাবে সকল দিক সামাল দিয়ে সুচারুভাবে সংসারের দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছেন। এর মধ্যেও কখনো তাঁর ঈশ্বর-চিন্তায় ব্যাঘাত হয়নি। ঠাকুরের সেবাপূজা তো আছেই, তার উপর ভক্তদের কল্যাণের জন্য জপেরও বিরাম নেই। অবাক লাগে কীভাবে তাঁর পক্ষে হাসিমুখে শান্তভাবে এতসব ঝামেলা সহ্য করা সম্ভব হলো! সম্ভব হলো তাঁর অনাসক্তির বলে। সবই ঠাকুরের—তাঁর নিজের কিছু নেই। তিনিই সুখ দিচ্ছেন, তিনিই দুঃখ দিচ্ছেন—এই ছিল তাঁর ভাব। মায়ের অনাসক্তি সম্বন্ধে মায়ের অন্যতম জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ "শ্রীমায়ের পারিবারিক জীবনের আলোচনায় অগ্রসর হইয়া প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয় তাঁহার অনাসক্তি। কার্য তিনি করিতেছেন, এমনকি মনে হইতেছে তিনি যেন সাধারণ মানবেরই ন্যায় শোকতাপে জর্জরিত; কিন্তু পরমুহূর্তেরই আচরণে তাঁহার নির্লিপ্তস্বরূপ

মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে।"[২]

মায়ের সুচারুরূপে সংসার পরিচালনার আর একটি উপায় ছিল যারা তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাদের মতামত নিয়ে কাজ করা। শ্রীশ্রীমা বলতেনঃ "যা-কিছু কর না কেন, সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে একটু পরামর্শ শুনতে হয় বই কি। একটু আলগা দিয়ে সব দিক দূরে দূরে লক্ষ্য করতে হয়—যাতে বেশি খারাপ না হয়।" বলতেন, দেখ, "সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।"[৩] শ্রীশ্রীমাকে দেখি কোন কাজ করতে হলে ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, কিছু কিছু কাজের দায়িত্বও তাঁদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন। অথচ ভ্রাতারা তাঁরই অর্থ-সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। শুধু ভ্রাতারা কেন, মায়ের সংসারে যারা তাঁর আশ্রিত, যেমন—নলিনীদিদি, মাকু প্রভৃতি। সংসারের শান্তি রক্ষার্থে মা তাঁদের সঙ্গেও আলোচনা করতেন, তাঁদের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। এ সম্বন্ধে দুটি ঘটনা উল্লেখ্যঃ রাধুর ছেলের অন্নপ্রাশন এগিয়ে আসছে। তার জন্য কিছু কেনাকাটা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ উৎসবাদিতে কালীমামাই বাজার করার দায়িত্ব পেয়ে থাকেন। সেইবার মায়ের হাতে বিশেষ টাকা-পয়সা নেই। কালীমামাকে দিয়ে বাজার করালে খরচ বেশি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাজার করার দায়িত্ব মামাকে না দিলে তিনি ভীষণ চটে গিয়ে অশান্তি বাধাবেন। একদিকে টাকা-পয়সার টানাটানি, অপরদিকে মামার রাগজনিত অশান্তি—এই উভয়সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মা বরদা মহারাজকে বললেন, "দেখ, এবার আমার হাতে টাকা-পয়সা বেশি নেই। কালীকে দিয়ে বাজার করাতে গেলে অনেক খরচ। তুমিই এবার কোতুলপুর, আনুড় থেকে দেখে দেখে বাজারগুলি করে ফেল। বাকি সামান্য কিছু কালীকে দিয়ে করাব।" দেখা যাচ্ছে সংসারের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মা কালীমামাকে বাজারের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করছেন না। অথচ টাকা-পয়সার অভাবের কথা বলে অনায়াসেই তা তিনি করতে পারতেন।[৪]

মা রাধুর শ্বশুর বাড়িতে তত্ত্ব পাঠাবেন, এজন্য নলিনীদিদির সঙ্গে পরামর্শ করছেন। নলিনীদিদিও যা করলে মায়ের মান থাকে সেভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন। এই পরামর্শটুকু না করলে নলিনীদিদি কুরুক্ষেত্র বাধাতেন। কারণ রাধুর মায়ের (পাগলী মামীর) সঙ্গে নলিনীদিদির সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। তাই রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠালে নলিনীদিদির খুশি হওয়ার কথা নয়। অথচ এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ করাতেই এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি অতিক্রম করে বিষয়টিকে সুন্দর করে তোলা সম্ভব হলো।[৫]

সংসারে শান্তিতে থাকার আরেকটি বিশেষ উপায় শ্রীশ্রীমা বলে গেছেন তাঁর অন্তিম উপদেশের মধ্যে। লীলাসংবরণের দিন কয়েক পূর্বে জনৈকা ভক্ত-মহিলাকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর শেষ উপদেশ উচ্চারণ করেছিলেন, "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"[৬] এই বাণী শুধু কথার কথা ছিল না। জগজ্জননী লীলাবিগ্রহ ধারণ করে সুদীর্ঘ কালের সংসার-লীলায় এই বাণীকে স্বীয় জীবনে চমৎকারভাবে রূপায়ণ করেছেন। সংসারে নানা সমস্যা আছে এবং তজ্জনিত অশান্তিও স্বাভাবিক। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখতে পাব আমাদের অনেক অশান্তির মূলে আমরা নিজেরাই অনেকাংশে দায়ী। আমাদের স্বভাবের একটি দিক অপরের দোষদর্শন। তার ফলে সংসারে অপর সকলের সঙ্গে মনোমালিন্য, অশান্তি। আমরা ভুলে যাই যে, প্রত্যেকেরই দোষ থাকতে পারে এবং আমাদের নিজেদেরও কিছু দোষ আছে। আমরা যদি মায়ের উপদেশ অনুসরণ করে অপরের দোষদর্শন থেকে বিরত হয়ে নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হই, তাহলে অনেক অশান্তিই আমরা অতিক্রম করতে পারি।

প্রশ্ন আসতে পারে, অনেক সময় স্বাভাবিকভাবেই অপরকে সংশোধনের দায়িত্ব আমাদের উপর এসে

---

[২] শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৬৩

[৩] ঐ, পৃঃ ৩৭৭

[৪] ঐ, পৃঃ ৩৬৭

[৫] ঐ, পৃঃ ৩৭৭

[৬] ঐ, পৃঃ ৫৯৮

পড়ে। সেসব ক্ষেত্রে অপরের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না রাখলে কিভাবে সে-দায়িত্ব পালন করা যাবে? আসলে এখানে এরূপ প্রশ্নের অবকাশ নেই। কাউকে শোধরানোর জন্য স্নেহপূর্ণ ও সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারা তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে তাকে দোষদর্শন বলে না। আসলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু অপরের দোষ খুঁজে বের করার জন্যই মানুষ দোষান্বেষণ করে। মানুষের এটি একরকম স্বভাব। আর এ থেকেই যত অশান্তি। শ্রীশ্রীমাকে দেখি তিনি কারও দোষ দেখতেন না। বলতেনঃ "মানুষ আগে নিজের মনটিকে দোষী করে পরে অপরের দোষ দেখে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করে বলতেনঃ তিনি মন্দকে উন্নত করতেই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন, "লোকে কেবল দোষই দেখে, গুণটি দেখে ক-জন? গুণটি দেখা চাই।" যারা অপরের দোষদর্শন করে বেড়ায় মা তাদেরও দোষ দেখতেন না। বলতেনঃ "তা দেখ, লোকেরই বা দোষ কি? আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে, 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারিনে' বলে কত প্রার্থনা করে তবে দোষ দেখাটা গেছে।"[৭] কোন কটু কথায় ভর্ৎসনা না করে কত যত্নে, কত স্নেহে তিনি অপরের দোষ সংশোধন করে দিতেন! কারও কাজে কোন ত্রুটি থাকলে তাদের দোষের দিকে ইঙ্গিত না করে স্নেহের সুরে বলতেন, "বাবা, এরূপ করলে হয় না।" সংসারে কয়জন চেষ্টা করে এভাবে অপরকে শিক্ষা দিতে?

জনৈক ভক্ত কোনও খারাপ আচরণ করেছেন। অন্য এক অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমাকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন সেই ভক্তকে নিকটে আসতে না দেন। মায়ের উত্তরঃ "আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।"[৮] কোন সম্ভ্রান্তকুলমহিলা কর্মবিপাকে কোন দুষ্কর্ম করেছেন। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্তা হয়ে মায়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। কিন্তু নিজের দুষ্কর্মের কথা চিন্তা করে ঠাকুরঘরে যেতে সঙ্কোচ করছেন। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন, "মা আমার উপায় কি হবে?" মা তাকে সযত্নে ঘরে নিয়ে গেলেন। দুষ্কর্মের জন্য কোন ভর্ৎসনা নয়, রূঢ়ভাষায় কোন নীতি-উপদেশও নয়; সস্নেহে তার গলা জড়িয়ে ধরে মা বললেন, "এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছে।...ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি?"[৯] মা তাকে শুধু অভয়ই দেননি, দীক্ষাও দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে, যেসব ক্ষেত্রে তিনি মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে তাদের কল্যাণ করতে সচেষ্ট।

শ্রীশ্রীমা যে অপরের দোষ-ত্রুটি স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সংশোধন করে দিতেন, তা তিনি পারতেন অকৃত্রিম ভালবাসার দ্বারা সকলকে আপন করে নিতে পারার মানসিকতায়। আর এখানেই আমাদের অক্ষমতা। আমাদের স্বার্থপূর্ণ মন সহজে কাউকে ভালবাসতে পারে না—আপন করে নিতে পারে না। তাই আমাদের মন অপরের দোষদর্শনে সদাতৎপর। আর মায়ের কাছে কেউ পর ছিল না, সকলেই ছিল তাঁর আপনার। তাঁর অপার্থিব মাতৃস্নেহের নিকট সকলেই সমান। সেখানে সন্ন্যাসী, গৃহী, পাপী, পুণ্যবান এবং উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান কোন প্রভেদ নেই। প্রশ্ন জাগে সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপভাবে সকলকে আপন করে নেওয়া, নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা কি সম্ভব? উত্তর—হয়তো নয়। কিন্তু এই হলো আদর্শ। জীবনে তা-ই অনুসরণীয়। লোকশিক্ষার্থে স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারিণী জগজ্জননীর অন্তিম বাণীর কিছুমাত্র যদি মানুষ স্বীয় জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে, তবে সংসার-তাপদগ্ধ যন্ত্রণাকাতর অশান্ত মানুষ সংসার-জীবনে শান্তি পাবে। তাছাড়া নান্য পন্থা—অন্য কোন পথ নেই।

---

[৭] শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৩৩ ও ৪৩৬

[৮] ঐ, পৃঃ ৪৩২

[৯] ঐ, পৃঃ ৪৬৪

প্রাচীন ভারতে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা

জীবন মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে ঃ “যে স্ত্রী সহমরণে যায় সে মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোমের মতো সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গে বাস করে। সাপুড়ে যেমন গর্ত থেকে সাপ উদ্ধার করে সেরকম সহমৃতা নারীও পতিকে নরক থেকে আকর্ষণ করে স্বর্গে নিয়ে যায়। সেই নারী সেখানে অপ্সরাদের স্তুতি শুনে চৌদ্দ ইন্দ্রের অবস্থানকাল পর্যন্ত সুখে কাল কাটায়। পতি যদি ব্রহ্মহত্যাকারী, কৃতঘ্ন বা বন্ধুহত্যাকারী হয় তাহলেও সে নিজের প্রভাবে পতিকে পবিত্র করে থাকে। যে পতির সহমৃতা হয় সে স্বর্গে অরুন্ধতীর মতো সসম্মানে বাস করে। পতির মৃত্যুর পর নারী যতক্ষণ না চিতায় ওঠে ততক্ষণ তার দেহ অশুদ্ধ থাকে। সহমৃতা নারীর পিতৃকুল, মাতৃ ও শ্বশুরকুল পবিত্র হয়।… পৃথক চিতায় উঠে পত্নী পতির সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও নিজের নিজের বর্ণের নারীরা নিজের পতির চিতায় উঠবে। সহমরণ বিষয়ে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল সবারই নিয়ম সমান।”[৪১] গরুড়পুরাণ আরও বলছে ঃ “স্ত্রী যদি পুত্র, মাতা, পিতা ছেড়ে স্বামীর অনুগমন করে তাহলে সে চিরসুখী হয়। পতির অনুগামিনী নারী নক্ষত্রদের সঙ্গে স্বর্গে দিব্য প্রমাণে সাড়ে তিনকোটি বছর বাস করে। পরে মহাভোগযুক্ত কুলে জন্মায়।”[৪২] গরুড়পুরাণেই অন্যত্র বলা হচ্ছে ঃ “যে স্ত্রী সন্তানাদি ছেড়ে স্বামীর চিতায় প্রাণত্যাগ করে সেই দম্পতি দিব্যস্ত্রী পরিবৃত হয়ে স্বর্গে যায়। সব রকম পাপ ও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করলেও সে যদি স্বামীর চিতায় আরোহণ করে তাহলে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হতে পারে। স্বামী যদি মহাপাপী ও দুষ্কর্মা হয়, তাহলেও স্বামীর অনুগামিনী স্ত্রী সেসব পাপ নাশ করে থাকে।”[৪৩] বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হচ্ছে ঃ “যে-স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় সে স্বামীকে

সতী হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের কিছু বিধিনিষেধ ছিল—ইচ্ছে হলেই সকল মহিলা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে পারতেন না। গর্ভবতী নারী, শিশু-সন্তানের জননী, রজঃস্বলা বা অদৃষ্ট-ঋতু নারীর পক্ষে সতী হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতে সহমরণই বিধবা নারীর একমাত্র ভবিষ্যৎ ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ এসম্পর্কে নানা মত প্রকাশ করেছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন সতীর কোন উল্লেখই করেননি—তাঁরা বিধবার ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়েছেন। বৌধায়ন এবং মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকার মেধাতিথি বিধবার জন্য ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়েছেন। অনেক শাস্ত্রকার আবার সতী হওয়া বা ব্রহ্মচর্য পালন করা—সম্পূর্ণভাবে বিধবার ওপরেই ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। শুক, বিষ্ণু, ব্যাস প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। প্রাচীন ভারতে এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা সতীদাহের বিরুদ্ধে সরাসরি মত প্রকাশ করেছেন। খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কবি বাণভট্ট তীব্র কশাঘাত করেছেন এই প্রথাকে। বিরাট বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি করে স্ত্রী স্বামীর কিছুটা মঙ্গল করতে পারেন, কিন্তু সহগমনের ফলে নিজেকে আত্মহননের পাপে লিপ্ত করা ভিন্ন অন্য কিছু হয় না। মেধাতিথির মতে এই প্রথা বৈদিক ঐতিহ্যবিরোধী। তাঁর মতে এই প্রথা আত্মহত্যার নামান্তর—সুতরাং তা বর্জনীয়। বিভিন্ন তান্ত্রিক লেখকরাও এই প্রথার নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে, নারী হলো দেবীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। যদি কোন ব্যক্তি বিধবাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে চিতায় পাঠায় তাহলে সে সরাসরি চিরন্তন নরকে নিক্ষিপ্ত হবে (১০।৭৯-৮০)।

---

[৪১] গরুড়পুবাণ, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ৩৪৭

[৪২] ঐ, পৃঃ ৩৯২

[৪৩] ঐ, পৃঃ ৪১৩

গুরুপাপ থেকে উদ্ধার করে। নারীর পক্ষে এর চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর কিছু নেই। এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়ে পূর্ণ এক মন্বন্তর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে পারেন।”[৪৪] পরবর্তী কালে রচিত নারায়ণের হিতোপদেশ-এ (২৮-৩০) বলা হচ্ছে ঃ “মানুষের দেহের কেশের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। স্বামীর মৃত্যুর পরে যে তার অনুগমন করে সে তত বৎসরই স্বর্গে বাস করে।··· ওঝা যেমন নিজের শক্তিতে কোন সর্প বিল থেকে তুলে নিয়ে আসে তেমনি নারীও তার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় স্বর্গলোকে—সেইখানেই সে অভ্যর্থিত হয়। যে-নারী তার মৃত স্বামীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে একই চিতায় দেহত্যাগ করে সে শত শত পাপ করলেও স্বামীসহ স্বর্গে যায়।” নির্ণেয়সিন্ধু-তে বলা হচ্ছে ঃ নারী সহমরণে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে জন্ম-জন্মান্তরে পশুর দেহে প্রবিষ্ট হয়ে সে আবদ্ধ থাকবে। সেখান থেকে আর মুক্তি পাবে না।

সতীদাহের পক্ষে এইসব মতামত সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ৭০০ থেকে ১১০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতে—বিশেষতঃ কাশ্মীরে সতীর সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্ননের রাজতরঙ্গিণী থেকে কাশ্মীরের রাজপরিবারে সতী হওয়ার প্রচুর ঘটনা জানা যায়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র বিবাহিতা পত্নীরাই নয়—রাজার মৃত্যুতে পত্নী, উপপত্নী, দাস-দাসী, মাতা, ভগিনী, শ্যালিকা, ধাত্রী, পুত্রবধূ, শাশুড়ি—এমনকি রাজ-অন্তঃপুরের বিড়ালেরও অগ্নিতে প্রাণ-বিসর্জনের উদাহরণ আছে। রাজা শঙ্করবর্মার মৃত্যুতে তাঁর পত্নীরা ছাড়াও জয়সিংহ এবং লাড ও বজ্রসার নামে দুই ভৃত্য চিতারোহণ করেন।[৪৫] রাজা অনন্তদেবের মৃত্যুতে দাস-দাসী ও যানবাহক,[৪৬] কলশের মৃত্যুতে জয়মতী নাম্নী উপপত্নীসহ সাতজন বিবাহিতা পত্নী,[৪৭] আনন্দের মৃত্যুতে মাতা গঙ্গা,[৪৮] মল্লের মৃত্যুতে তাঁর পত্নী কুমুদলেখা ও নন্দা, শ্যালিকা বল্লভা, পুত্রবধূদ্বয় সহ্নন ও রহ্নের পত্নী আসমতী ও সহজা, ছয়জন দাসী, ধাত্রী চান্দ্রী; ভোগসেনের মৃত্যুতে তাঁর পত্নী মল্লা,[৪৯] দিহ্নভট্টারকের মৃত্যুতে তাঁর ভগ্নী[৫০] অগ্নিতে প্রবেশ করেন। বাণভট্টের হর্ষচরিত-এর পঞ্চম উচ্ছ্বাসে দেখা যায় যে, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুতে তাঁর ভৃত্য, সুহৃদ ও অমাত্যদের অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, পত্নী ছাড়া অন্যদের এই আত্মদান কেন? এ কি নিছক প্রভুভক্তি, না বলপূর্বক বাধ্য করা। চক্রান্তের মূলে কুঠারাঘাত করা, না নিছক পরলোকে বিশ্বাস।

সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর-এর (রচনাকাল আঃ ১১০০ খ্রীঃ) সতীর উদাহরণ আছে। সোমদেবের মতে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর আত্মাহুতি তো স্বাভাবিক ঘটনা। তিনি বলছেন ঃ “স্বাধ্বী পত্নীর কর্তব্যই হলো পতি-অনুগামিনী হওয়া।”[৫১] এই গ্রন্থে অন্য ধরনেরও বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। পিতার মৃত্যুতে মাতা সহমরণে যান এবং পুত্রও সরস্বতী-প্রবাহে প্রাণ বিসর্জন দেন (৪।২)। পুত্র ও কন্যার মৃত্যুতে মাতা, (১২।১১) রাজার মৃত্যুতে সেনাপতি (১২।১৫) এবং রাজকুমারের মৃত্যুতে তার বয়স্যের (১৭।৬)—এমনকি পতির মৃত্যুতে তাঁর অসতী পত্নীর (১০।২) চিতারোহণের কথা জানা যায়। কেবলমাত্র তাই নয়, এই গ্রন্থে সহমরণের আরও কিছু বিস্ময়কর উদাহরণ আছে। অযোধ্যা নগরে রাজা বীরকেতু জনৈক চোরের প্রাণদণ্ড দেন। চোরকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ধনবান বণিক রত্নদত্তের কন্যা রত্নাবতী চোরকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং পিতাকে বলে যে, বধ্যব্যক্তিকে সে স্বামীত্বে বরণ করেছে। সুতরাং পিতা হয় বধ্যব্যক্তির প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করুন অথবা কন্যার সহমরণের ব্যবস্থা করুন। চোরের মৃত্যুর পর রত্নাবলী

---

[৪৪] বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড—নীহাররঞ্জন রায় (১৯৮০), পৃঃ ৬০১-এ উদ্ধৃত।

[৪৫] রাজতরঙ্গিণী (অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত), ১৩৮৮, পৃঃ ৯৫।

[৪৬] ঐ, পৃঃ ১৩৪

[৪৭] ঐ, পৃঃ ১৪৪

[৪৮] ঐ, পৃঃ ১৬৯

[৪৯] ঐ, পৃঃ ১৯৯

[৫০] ঐ, পৃঃ ১৯৯

[৫১] কথাসরিৎসাগর (সম্পাদনা ঃ শ্রীগোপীমোহন সিংহরায়), ১২।১২, পৃঃ ২০৩।

তার দেহ চিতায় উঠিয়ে নিজেও চিতারোহণে উদ্যোগী হয় (১২।১২)। গ্রন্থটিতে ঐ ধরনের আরও একটি কাহিনী আছে (১৬।২)। এই গ্রন্থে রাজকন্যা মায়াবতীর প্রতি জনৈক ধীবরপুত্রের আকর্ষণের কাহিনী আছে। রাজকন্যার বিহনে ধীবরপুত্র নৈরাশ্যে প্রাণত্যাগ করে। এতে রাজকুমারীও সহমরণের সঙ্কল্প করে (১৬।২)। রাজার মৃত্যুতে পতিতা কুমুদিকাকেও চিতায় উঠতে দেখা যায় (১০।২)। কুট্টনীমতম্ থেকে জানা যায় যে, মণিকান্ত, ভাস্করবর্মা, নরসিংহ, বামদেব এবং কদম্বদেবের পুত্র ভাট মারা গেলে তাদের প্রণয়িনী পতিতারাও সহমরণে যায়।

কহ্লন তাঁর গ্রন্থে রাজমহিষীদের সতী হওয়া সম্পর্কে দুটি প্রতারণার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুতে তাঁর অন্যান্য মহিষীরা চিতারোহণ করেন, কিন্তু রানী দিদ্দার সঙ্গে অমাত্য নরবাহনের গোপন চুক্তি ছিল। তাই মন্ত্রী নরবাহন চিতারোহণোদ্যোগী দিদ্দাকে রাজ্যের স্বার্থে জোর করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনেন।[৫২] চিতারোহণের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য রানী জয়ামতী মন্ত্রী গর্গকে প্রচুর সম্পত্তি দান করেছিলেন। স্থির ছিল গর্গ যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। চিতা প্রস্তুত ছিল। বিম্বজলি চিতারোহণে প্রাণ দিলেন। শিবিকারূঢ়া জয়ামতী ইচ্ছে করেই পথে বিলম্ব করলেন—আশা যে, গর্গ উপস্থিত হয়ে তাঁকে রক্ষা করবেন। শেষপর্যন্ত গর্গ এলেন না—অনিচ্ছুক রানীকে বাধ্য হয়েই আগুনে ঝাঁপ দিতে হলো।[৫৩]

রাজপুতানাতে প্রথম সতীর উল্লেখ পাওয়া যায় ৮৪২ খ্রীস্টাব্দে। এসময় চাহমান বংশীয় রাজা চন্দ্রমহাসেনের মা সতী হন। এর পরে সতী হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় ৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। এসময় রাজপুতানার ঘাটিওয়ালায় সম্পল্লদেবী সতী হন। আলটেকরের গবেষণা অনুসারে, ১০০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে রাজপুতানায় সতী হওয়ার আর কোন তথ্য জানা যায় না। ডঃ ভাণ্ডারকর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১২০০ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাজপুতানায় মাত্র কুড়িটি সতীদাহের ঘটনা ঘটে। ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যেও সতীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন লিপি থেকে চোল, পল্লব, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজপরিবারের মধ্যে কোন সতীদাহের ঘটনা পাওয়া যায় না। চোলরাজ প্রথম পরান্তকের রাজত্বকালের (৯০৭—৯৫৪ খ্রীঃ) সূচনাপর্বে একটি সতীর ঘটনা জানা যায়।[৫৪] চোলরাজ সুন্দর চোলের (৯৫৭—৯৭৩ খ্রীঃ) জনৈকা মহিষীও সতী হন।[৫৫] রাজেন্দ্রদেব চোলের আমলের (১০১৪–১০৪৪ খ্রীঃ) বেলাতুরা শিলালিপি (শক ৯৭৯) থেকে জানা যায় যে, স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে দেকব্বে নাম্নী জনৈকা শূদ্রা নারী পিতা-মাতার আপত্তি সত্ত্বেও অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেন।[৫৬]

দশম শতাব্দীর সূচনায় আরবীয় পর্যটক সুলেমান কিছুকাল ভারতের পশ্চিম উপকূলে বসবাস করেছিলেন। তাঁর রচনা থেকে জানা যায় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর রানীরা কখনো কখনো সহমরণে যেতেন—এ সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে তাঁদের স্বেচ্ছাধীন।[৫৭] কালক্রমে হিন্দুধর্মে এই প্রথা স্বীকৃত হয় এবং জাভা, সুমাত্রা ও বলিদ্বীপে তা বিস্তৃত হয়।

এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সতী হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ ছিল—ইচ্ছে হলেই সকল মহিলা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে পারতেন না। গর্ভবতী নারী, শিশু-সন্তানের জননী, রজঃস্বলা বা অদৃষ্ট-ঋতু নারীর পক্ষে সতী হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদপুরাণ, এবং বামনপুরাণে গর্ভবতী নারীর সতী হওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে। গরুড়পুরাণ বলেছেঃ "যারা গর্ভবতী এবং শিশু-সন্তানবতী তারা ছাড়া সবারই সহমৃতা হওয়া উচিত।"[৫৮] পরবর্তী কালের গ্রন্থ কথাসরিৎসাগর-এও সন্তানসম্ভবা নারীকে

---

[৫২] রাজতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১১।

[৫৩] ঐ, পৃঃ ১৯৫

[৫৪] The Age of Imperial Unity—R. C. Majumdar (1955), p. 395, f. n.

[৫৫] Ibid, p. 396

[৫৬] History of the Dharmsastra, Vol. II, Part I, p, 629

[৫৭] Position of Women in Hindu Civilization, p. 128

[৫৮] গরুড়পুরাণ, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ৩৪৭।

সহমরণে বাধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (৪।২)। যদি রজঃস্বলার তৃতীয় দিনে কারো স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে মৃতদেহ একরাত্রি রেখে দেওয়া হতো এবং চতুর্থ দিনে স্নানান্তে শুচি হয়ে বিধবা নারী সহমরণে যেতে পারত। নারদ, বৃহস্পতি ও মিতাক্ষর উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী কালে বৃহস্পতির নাম করে বলা হয় যে, অন্য কেউ শিশুসন্তানের দায়িত্ব নিতে রাজি হলে, শিশুর মা সহমরণে যেতে পারেন—এমনকি গর্ভবতী মহিলাও সন্তানপ্রসবের পর অনুমরণে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজ পণ্ডিত কোলব্রুক এই মত গ্রহণে রাজি নন। তাঁর মতে এই বক্তব্য হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী।”[৫৯]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূচনাপর্বে এই প্রথা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু কালক্রমে তা সর্বসাধারণের জন্য প্রচলিত হয়। মিতাক্ষরের মতে সহমরণই হলো ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সবার জন্য সাধারণ ব্যবস্থা। অধ্যাপক আলটেকরের মতে ১000 খ্রীস্টাব্দ থেকে ব্রাহ্মণরাও কিছু কিছু এই প্রথা গ্রহণ করতে শুরু করেন। সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারতে কোন ব্রাহ্মণ রমণীর সহমরণের কথা নেই। আগেই বলা হয়েছে, রামায়ণের বেদবতীর মায়ের কাহিনী প্রক্ষিপ্ত বলে চিহ্নিত। মহাভারতের স্ত্রীপর্বে কৌরবদের ব্রাহ্মণ সেনাপতি দ্রোণাচার্যের মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টি এবং শ্মশানে তাঁর বিধবা পত্নী কৃপীর বিলাপ প্রভৃতির বর্ণনা আছে, কিন্তু কৃপীর কণ্ঠে কখনই সহমরণের কথা উচ্চারিত হয়নি। স্মৃতিকার হারীত ব্রাহ্মণ নারীর সতী হওয়ার বিরোধী। তাঁর মতে—সতী হয়ে তাঁরা স্বামীদের স্বর্গে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হন। বিষ্ণুও এই মত প্রকাশ করেছেন (বিষ্ণু, ২৫।১৪)। অঙ্গিরা, ব্যাস ও সমসাময়িক অনেক লেখকই এই মতের সমর্থক। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণের মহিলারই এটা প্রধান কর্তব্য। পদ্মপুরাণ ব্রাহ্মণ মহিলাদের জন্য এই প্রথা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বলা হয়েছে যে, এই কাজে যে ব্যক্তি বিধবা ব্রাহ্মণীকে সাহায্য করবে সে ভয়ঙ্কর ও অমার্জনীয় ব্রহ্মহত্যা পাপে দোষী হবে। (সৃষ্টিকাণ্ড, ৪৯।৭২-৭৩)।

একাধিক স্ত্রী থাকলে অনেক সময় প্রিয়তমা পত্নী সহমরণে যেতেন এবং অন্যদের জন্য পৃথক চিতার ব্যবস্থা করা হতো। অনেক সময় আবার সকলেই একই চিতায় আরোহণ করতেন। সতীদাহের আরেকটি রূপ হলো অনুমরণ। স্বামীর দাহকার্যের সময় স্ত্রী উপস্থিত না থাকলে, পরে স্বামীর কোন স্মৃতিচিহ্ন, যথা চিতার ভস্ম বা পাদুকা এবং সেটুকুও না পাওয়া গেলে, তা বাদ দিয়েই পৃথক কোন চিতায় স্ত্রীর প্রাণত্যাগ অনুমরণ নামে চিহ্নিত। ব্রহ্মপুরাণে বলা হচ্ছে যে, দেশান্তরে পতির মৃত্যু হলে সাধ্বী স্ত্রী পতির পাদুকাদ্বয় বুকে ধরে শুচিশুদ্ধ অবস্থায় অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। ব্যাস ধর্মশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যু যদি এমন কোন স্থানে হয়, যেখানে একদিনেই পৌঁছানো সম্ভব এবং স্ত্রী যদি সহমরণে কৃতসংকল্প হন, তাহলে একদিনের জন্য স্বামীর মৃতদেহ রেখে দেওয়া হবে এবং স্ত্রী এলে উভয়কে একই চিতায় দাহ করা হবে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হচ্ছে, “স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত স্বামীগতচিত্ত হয়ে স্বামীর কোন প্রিয় বস্তুর সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করে বিধবা আত্মাহুতি দিতে পারেন, তিনিও পূর্বোক্ত ফল (স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বর্গবাস) প্রাপ্ত হন।” কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ নাটকে শিবের দ্বারা মদন ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তাঁর পত্নী রতি অনুমরণে উদ্যোগী হলে আকাশবাণী দ্বারা তিনি নিবৃত্ত হন (৪র্থ সর্গ)। বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’-এ কনৌজ-অধিপতি গ্রহবর্মার মৃত্যুতে হর্ষের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে অনুমরণের উদ্যোগ করতে দেখা যায় (৮ম উচ্ছ্বাস)। হালের ‘গাথাসপ্তশতী’-তে অনুমরণের কথা আছে। মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকার মেধাতিথি (৯00 খ্রীঃ)-র মতে অনুমরণ আত্মহত্যা। তিনি এই প্রথার নিন্দা করেছেন। অপর পক্ষে, বিজ্ঞানেশ্বর (১১00 খ্রীঃ) ও মাধবাচার্যের মতে অনুমরণ ধর্মসম্মত ; আত্মহত্যা নয়।

শাস্ত্রকারদের মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মহিলাদের জন্য অনুমরণ বৈধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ মহিলাদের ক্ষেত্রে তা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। গরুড়পুরাণ ও

---

[৫৯] On the Duties of a Faithful Hindu Widow, Henry Colebrook, Asiatic Researches, Vol. IV (1795), p. 216

গোতমের মতে, ব্রাহ্মণ মহিলাদের পৃথক চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া নিষিদ্ধ। অঙ্গিরা, ব্যাঘ্রপাদ, পৈঠীনাসী, রঘুনন্দন, ভবদেব ভট্ট—সকলেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

যদি কোন নারী অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প করেও কোন কারণে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার কি হবে? আপস্তম্ভের মতে, এই ধরনের চিতাভ্রষ্টা মহিলাকে 'প্রজাপত্য' নামধেয় প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হতে হবে। অত্রি সংহিতাতেও অনুরূপ মত প্রকাশিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতে সহমরণই বিধবা নারীর একমাত্র ভবিষ্যৎ ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রকারগণ এ সম্পর্কে নানা মত প্রকাশ করেছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন সতীর কোন উল্লেখই করেননি—তাঁরা বিধবার ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়েছেন। বৌধায়ন এবং মনুসংহিতার ব্যাখ্যাকার মেধাতিথিও বিধবার জন্য ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়েছেন।

অনেক শাস্ত্রকার আবার সতী হওয়া বা ব্রহ্মচর্য পালন করা—সম্পূর্ণভাবে বিধবার ওপরেই ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। শুক, বিষ্ণু, ব্যাস প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। বিষ্ণুধর্মসূত্রে (২৫।১৪) বলা হচ্ছে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য পালন করবে। ব্যাস সংহিতায় বলা হয়েছে, "পতিব্রতা স্ত্রী মৃত পতির সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করবে অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবে।"

প্রাচীন ভারতে এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা সতীদাহের বিরুদ্ধে সরাসরি মত প্রকাশ করেছেন। খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কবি বাণভট্ট তীব্র কশাঘাত করেছেন এই প্রথাকে। তাঁর রচিত 'কাদম্বরী'-তে সতী সম্পর্কে শাণিত বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে তিনি বলছেন: "এই যে সহমরণ ব্যাপারটা—এর কোন অর্থ হয় না। যারা কিছু জানে না বোঝে না, তারাই শুধু এই রাস্তায় চলে। এ শুধু মূঢ়তার একটা শখ। অজ্ঞানের পথ এটা। এ একটা হঠকারিতা। এ হলো সংকীর্ণ দৃষ্টি। এত বড় ভুল আর হয় না। এই যে বাবা ভাই বন্ধু বা স্বামী মারা গেলে প্রাণ ছেড়ে দেওয়া—এ একটা নির্বুদ্ধিতা। ··· ভাল করে ভেবে দেখলে এই আত্মহত্যা একরকমের স্বার্থপরতাই। শোকের বেদনা সহ্য করতে পারছি না। কি তার প্রতিকার? জ্বলন্ত মৃতের চিতায় প্রাণ বিসর্জন। কিন্তু যে মারা গেছে, তার এতে কী উপকার হলো? সে তো আর এতে করে বেঁচে উঠল না, তার পুণ্যও এতে বাড়ল না, কোন শুভলোকে যাবার ছাড়পত্রও মিলল না, নরকে যাওয়ার থাকলে তা রদ হলো না, আর দেখাও মিলল না, পরস্পরের মিলনও হলো না।··· খালি বর্তালো আত্মহত্যার পাপ।"[৬০] বিরাট বলেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি করে স্ত্রী স্বামীর কিছুটা মঙ্গল করতে পারেন, কিন্তু সহগমনের ফলে নিজেকে আত্মহননের পাপে লিপ্ত করা ভিন্ন অন্য কিছু হয় না। মেধাতিথির মতে এই প্রথা বৈদিক ঐতিহ্য বিরোধী এবং এর কোন প্রামাণিক মূল্য নেই। তাঁর মতে এই প্রথা আত্মহত্যার নামান্তর—সুতরাং তা বর্জনীয়। বিভিন্ন তান্ত্রিক লেখকরাও এই প্রথার নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে, নারী হলো দেবীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। মহানির্বাণ-তন্ত্র স্পষ্টই বলছে: "ভর্তাসহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্" ॥ (১০।৭৯)—অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে কুলকামিনীকে কখনো দগ্ধ করো না। যদি কোন ব্যক্তি বিধবাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে চিতায় পাঠায় তাহলে সে সরাসরি চিরন্তন নরকে নিক্ষিপ্ত হবে (১০।৭৯-৮০)। দাক্ষিণাত্যের দ্বাদশ শতকের লেখক ঋষি দেবনভট্টও এই প্রথার ঘোরতর নিন্দা করেন। তাঁর মতে এটা খুবই নিম্নস্তরের ধর্মানুষ্ঠান।[৬১]

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন শাস্ত্রকার ও শাসকদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সতীপ্রথা রদ করা সম্ভব হয়নি, বরং তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে আইনের মাধ্যমে অমানবিক ও অর্থহীন সতীদাহ প্রথা রদ করা হয়।

---

[৬০] সংস্কৃত সাহিত্য রচনা সম্ভার, ৮ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, পৃঃ ১৫১-৫২

[৬১] Position of Women in Hindu Civilization, p, 124

কবিতা

মমি

অরুণকুমার দত্ত

ছাতিফাটা তৃষ্ণা নিয়ে আমি খেতে চাই
অনেক অনেক জল
পেতে চাই স্নিগ্ধ সুশীতল পরশ,
কিন্তু বিস্বাদে তিক্ত হয়ে ওঠে সমস্ত মুখ ;
আমি প্রাণভরে নিতে চাই সজীব সতেজ শ্বাস
বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াব বলে,
কিন্তু অবশ থরথর হয়ে ওঠে সর্বশরীর ;
আমি সুমধুর ঐকতান শুনতে চাই কানভরে
দেহমনে আনতে চাই ছন্দ লয় ও সুর,
কিন্তু সশব্দ বিস্ফোরণ বধির করে সমস্ত বোধ ;
আমি নীলকণ্ঠ নই,
সমুদ্র মন্থন করে কখনো তুলতে চাইনি হলাহল,
তবু আজ বিষে বিষে জর্জরিত
আমার রোমকূপ ;
আমি এক মারণ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া মমি,
আমার পিরামিডের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে
সভ্যতার এক করুণ ইতিহাসের অসংখ্য প্রমাণঃ
সেখানে প্রগতির জয়রথ এগিয়ে চলেছে
দুর্নিবার গতিতে,
গর্বিত সৌধমালা দাঁড়িয়ে আছে
সম্ভোগের উপকরণ সাজিয়ে,
কিন্তু যেখানে নীরবে অপেক্ষা করছে
প্রকৃতির চরম অভিশাপ।

উৎসর্গ

মণিময় গুপ্ত

ধূপ আপনারে জ্বালায়ে জ্বালায়ে
সুরভি বিলায় শুধু।
ফুল ঝরে যায় আপন হিয়ার
বিলায়ে অমৃতমধু॥
আপনারে দহি দীপ দেয় আলো
নাশিয়া অন্ধকার।
ব্যথা-বেদনায় সে প্রেম মহান
প্রতিদান নাহি যার॥

রাসরসতাণ্ডবী

স্বামী অচ্যুতানন্দ

শ্যামল সুন্দর—রাসরসেশ্বর—নটবর
মরি মরি।
নয়নাভিরাম—নবঘনশ্যাম—এ কি রূপ
আজি হেরি !!
যমুনা পুলিনে-তমালের বনে, নাচে শ্যাম
রাই সনে।
কালোমেঘকোলে বিজলীঝলকে
এ মধু বৃন্দাবনে॥
চাঁচর চিকুরে শোভে শিখিপাখা, ললাটফলকে
তিলক অলকা।
বিশালবক্ষে ভৃগুপদরেখা, নয়নে
করুণা মাখা॥
গলে বনমালা ধরি পীতবাস, কমললোচন
মুখে মৃদু হাস।
রূপের ছটায় মদন বিনাশ,
নাচে দিক আলো করি।
মরি মরি,—এ কি রূপ আজি হেরি !!
মোহন মুরলী মধুর অধরে—ডাকিছে আকুল
'রাধা-রাধা' স্বরে।
যমুনা উতাল, ময়ূর মাতাল
নাচিছে পেখম ধরে॥
সে বাঁশীর টানে সকলি ফেলিয়া ব্যাকুলিতহৃদে
আসে গোপবালা।
ধেয়ানের ধনে বক্ষে ধরিয়া মিটাতে
বিরহ জ্বালা॥
চরণে নূপুর রুনুঝুনু বাজে, মরি কি রঙ্গে
রাই-কানু নাচে।
সজ্জিত কিবা অপরূপ সাজে
রাসমণ্ডল মাঝে॥
রাসতাণ্ডবে গোপীজন সাথে
নাচে রাসেশ্বর ধরি হাত হাতে
জীবে ব্রহ্মেতে অভেদ বুঝাতে
একদেহ হয় আজ!
নাচে সুখে রসরাজ!!

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ

সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিতে মগ্ন থাকার ইচ্ছা। গুরুর কথায় বেছে নিলেন 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'র মন্ত্র। এক নতুন ধরনের মুক্তির পথ। শুরু করলেন এক অভিনব ধরনের সন্ন্যাসীর দল, যাঁরা দীক্ষা নিলেন এক নতুন মন্ত্রে—নিষ্কাম কর্মের মধ্যে নিজেদের মুক্তি। সব মানুষের সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

নিবেদিতার কথায়ঃ "…ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় নিজেদের সংঘবদ্ধ করেন, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, নূতন ধরনের সামাজিক কর্তব্যের প্রবর্তন ও তাহার বিকাশ-সাধন।"[১]

স্বামীজীর বাণীর বিশেষত্ব হলো তিনি দর্শনের কঠিনতম তত্ত্বকে প্রতিদিনের জীবনে পৌঁছে দিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেনঃ "…the most distinctive feature of Swami Vivekananda's teaching is that he applied his philosophic principles to the affairs of everyday life."[২] একদিকে এর মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা, অন্যদিকে ছিল স্বামীজীর অদম্য দেশপ্রেম। যদিও সন্ন্যাসী, স্বামীজী ছিলেন যথার্থ দেশপ্রেমিক।

নিবেদিতা লিখেছেনঃ "আচার্যদেবের প্রকৃতিতে আর একটি জিনিস বদ্ধমূল ছিল। তিনি নিজেই জানিতেন না, কিরূপে উহার সামঞ্জস্য করিবেন। উহা হইল তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের দুর্গতির জন্য ক্ষোভ।"[৩] মানুষের দেবত্বে বিশ্বাসী এই সন্ন্যাসীর কাছে ভারতীয় জনসমাজ দিল সমগ্র মানবজাতিরই একটা অংশ এবং সামগ্রিকভাবে এই জাতীয় জনসমাজ রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাবার প্রয়াসী। নিবেদিতা লিখেছেনঃ "তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না; তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী।"[৪]

ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তি তার অগণিত জনসাধারণ। তাদের শিক্ষা দেওয়া, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা—এক কথায় তাদের মানুষ করা—এই ছিল স্বামীজীর জীবনের ব্রত। জাতীয় পুনর্জাগরণের অন্যান্য দিকগুলির উপরেও স্বামীজী জোর দিয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা, আত্মনির্ভর হওয়া এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ করা—এর রূপায়ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে নয়, ধর্মের ভিত্তিতেই স্বামীজী করতে চেয়েছিলেন। 'মায়া'র মায়া কাটিয়ে মানুষের দেবত্ব শক্তির আবিষ্কারে এটা ঘটা সম্ভব। এইজন্যেই তিনি 'মানুষ তৈরি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

স্বামীজীকে নিছক জাতীয়তাবাদী বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা তাঁর কাম্য ছিল এই কারণে যে, ভারত এই দুটি জিনিসেরই রূপায়ণ সমগ্র পৃথিবীকে দেখাতে সমর্থ। স্বামীজীর কাছে জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদ একে অন্যের পরিপূরক। স্বামীজীর জীবনে দুটি ধারার সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। একটি পৃথিবীকে সঞ্চালিত করা, অন্যটি জাতিগঠন। নিবেদিতা লিখেছেনঃ "…আমার স্থির বিশ্বাস, সেই জীবনেও (স্বামীজীর) অনুরূপভাবে দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়াছেঃ প্রথম—সমগ্র জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করা; দ্বিতীয়—এক মহাজাতি সংগঠন।"[৫]

স্বামীজী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর অন্তঃকরণ সর্বদাই পৃথিবীর নিপীড়িত দুঃখী মানুষের কষ্টে পীড়িত হতো এবং তাদের কিসে দুঃখ দূর হবে সেই ভাবনায় কাতর থাকত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে স্বামী বিবেকানন্দের দান অপরিসীম। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির রূপ

---

[১] স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি (১৩৮৪), পৃঃ ৩৪

[২] Swami Vivekananda : A Historical Review—R. C, Majumdar, p. 110

[৩] স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি (১৩৮৪), পৃঃ ৪১

[৪] ঐ

[৫] ঐ, পৃঃ ১৮৭

কল্পনা করেছিলেন। তিনি জানতেন জাতির পুনরুত্থানের জন্যে প্রধান প্রয়োজন জনগণের উন্নতি। বহু দেশনেতার পূর্বে এক্ষেত্রে স্বামীজীর নাম আসতে পারে। তদানীন্তন বহু দেশনেতা রাজনীতিতে জনগণের প্রবেশ সমীচীন মনে করতেন না, কারণ তাতে, তাঁদের মতে নৈরাজ্য প্রকাশের সম্ভাবনা। তাঁরা বরং জনসভা করা, বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন। এসব স্বামীজীর কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মনে হতো এবং তিনি এই নীতির বিরোধী ছিলেন। স্বামীজী তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি ও জনগণের জন্যে যে চিন্তা, যে আশার বাণী জাগিয়েছিলেন সারা ভারতবর্ষে সেই বীজের ওপর দেশপ্রেমের মহীরুহটি গড়ে উঠেছিল।

স্বামীজীর মতে জাতীয় উদ্দেশ্য ছাড়া জাতিগঠন হতে পারে না। তিনি বলেছিলেনঃ "... ব্যক্তির পক্ষে যেমন, প্রত্যেক জাতির পক্ষেও তেমনি জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। উহাই তাহার জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। উহাই যেন তাহার জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর, অন্যান্য সুর যেন সেই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গত হইয়া ঐকতান সৃষ্টি করিতেছে।"[৬] যদি কোন জাতি এই জাতীয় সত্তাকে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দীতে গড়ে উঠেছে, পরিত্যাগ করে সে জাতির মৃত্যু সুনিশ্চিত।

স্বামীজীর কাছে প্রত্যেক জাতিরই একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য থাকে যেটি তার নিজস্ব। একটি জাতি সমগ্র মানবজাতিরই একটি অংশ, কেবল তার ভাবগত উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তিনি রে'নর সঙ্গে একমত যে, জাতীয় জনসমাজগঠনের ধারণাটিতে মূলতঃ ভাবগত উপাদান প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতির যা উদ্দেশ্য তাকে বেছে নিতে হয়। স্বামীজীর মতে ভারতে ধর্মই সেই জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ এবং তাই তার জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর। ভারতবর্ষ যদি তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে ধর্মকে সরিয়ে নিয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছু আনার চেষ্টা করে ভারতের কৃষ্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। স্বামীজীর মতে স্বাদেশিকতা রাজনৈতিক তাৎপর্যবিহীন নয়। যদিও স্বামীজী নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, তবুও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই তিনি দেশবাসীর প্রথম লক্ষ্য হিসাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।[৭]

জাতীয়তা গঠনের মূল সূত্রগুলি হলো ভাষা, সরকার, ধর্ম এবং ভৌগোলিক একাত্মতা। কিন্তু ধর্ম স্বামীজীর মতে সবচাইতে মূল্যবান। তিনি বলেছিলেনঃ "ইহা আমরা সকলেই স্পষ্টভাবে জানি যে, অগণিত ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন—জাতি, জলবায়ু, এমনকি বংশের বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর।"[৮]

স্বামীজীর কাছে জাতীয় জনসমাজের ধারণা মূলতঃ ভাবগত ধারণা—মানসিক অনুভূতির উপর নিহিত। বহুপূর্বেই ভারতের সভ্যতার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিরূপে গড়ে উঠেছিল। ভারতের আত্মা তার এই অনুভূতিরই প্রকাশ—এবং এইটিই ভারতের প্রাচীন বাণী। কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সবাইকেই এই তথ্যটি সর্বাগ্রে আবিষ্কার করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের অদম্য সাধনার ফল এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভারতবর্ষের পুনরাবিষ্কার।

মধ্যযুগে ধর্ম দিয়েই সভ্যতাকে চিহ্নিত করা যেত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই সভ্যতা 'জাতিভিত্তিক' রূপে পরিগণিত হতে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীকে 'the epoch of nationalist development'' (জাতীয় প্রগতির যুগ) বলা হলো। এবং ম্যাকাইভারের কাছে জাতীয় জনসমাজের ধারণা ছিলঃ "...a content more pervasive and more real than the conceptions of social unity which preceded it.[৯] (একটি অভ্যন্তরস্থ বস্তু যা এর পূর্ববর্তী সামাজিক একত্বের ধারণার চেয়ে অনেক পরিব্যাপক এবং বাস্তব)। অধ্যাপক রে'নর মতে "জাতীয় জনসমাজের ধারণা মূলতঃ

---

[৬] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১০৯-১১০

[৭] Swami Vivekananda : A Historical Review—R. C. Majumdar, p. 119

[৮] বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৮

[৯] The Modern State, R. M. MacIver, p. 132

ভাবগত।" এবং এটি একটি বিশেষ ঐক্য যা সেই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিরাই ভোগ করে। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এটি একটি ভাবগত চেতনার ভিত্তিতে সম্প্রদায় গঠনের সম্মিলিত প্রয়াস। জাতীয় জনসমাজ এই ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতে একটি সম্মিলিত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের রূপ নেয়। জাতীয়তাবাদ বলতে একটি জাতিগোষ্ঠীর ভাবগত চেতনার কথা বোঝায়, অতএব এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক সত্য। বর্ণ, শ্রেণীর বাধাকে এটি অতিক্রম করে। এ পর্যন্ত জনসাধারণ গোষ্ঠীজীবনের কোনও স্বাদই পায়নি। জাতীয়তাবাদের চিন্তার আগমনে জনসাধারণ একই গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার স্বাদ পেল।

সমসাময়িক ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন একসূত্রে গ্রথিত ছিল না। এক এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিবর্তনও সমান স্তরে ছিল না। তার মূল সূত্র ছিল বিভিন্ন ভাগে খণ্ডিত, ফলে বিভিন্ন খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব জাতীয় জনসমাজ গঠন, যার মূল ভিত্তি ভাবগত ঐক্য তা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ এই ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং ভারতের পবিত্র ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আদর্শকে এর ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে।"[১০] তিনি অনুভব করেছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতগঠনে এইটিই হবে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। অন্য কোনও পন্থা ভারতের মতো দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি বলতেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রসারের ফলে জাগতিক জ্ঞানেরও প্রসার ঘটবে এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রভূত উন্নতি হবে। কিন্তু জাগতিক জ্ঞান যদি আধ্যাত্মিকতা-বিহীন হয় তাহলে তা ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি করবে এবং ভারতবর্ষ কোন দিনই একসূত্রে গ্রথিত হবে না। স্বামীজীর দৃষ্টিতে যে জাতীয় ঐক্যের কর্মপন্থা ধরা পড়েছিল তা ছিল বর্ণ ও জাতির ঊর্ধ্বে এবং স্বামীজী সমগ্র জনসাধারণকেই এর মূল শক্তি বলে পরিগণিত করেছিলেন।

ধর্মই ভারতের জাতীয় ভাবের প্রকাশ। এ কথা স্বামীজী জানতেন এবং ধর্মের শক্তির কথা স্বামীজীর অবিদিত ছিল না। 'জাতীয়তাবাদ' ও 'আধ্যাত্মিকতা' শক্তির মূল এ কথা স্বামীজী স্মরণ রেখেছিলেন। জাতির শক্তি সঞ্চয়ের মূলে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকার কথা মনে রেখে স্বামীজী বলেছিলেন ঐক্য সর্বপ্রথম আনতে হবে মানুষের চিন্তায়। যে সভ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দী নতুন নতুন চিন্তাধারায় আপ্লুত হয়েছে এবং অন্তর্নিহিত শক্তির উৎপাদন করেছে। তা-ই ছিল স্বামীজীর মতে যথার্থ সভ্যতা। হিন্দুরা যদি তাদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল বেদান্তকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয় তাহলে অচিরেই মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচে যাবে এবং এমন এক ঐক্যের সৃষ্টি করবে যা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দল-উপদলের মধ্যে ঐক্যের সেতু রচনা করবে এবং ভারতীয় জনসমাজ একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে। ভারতীয় জাতিকে যদি গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হয় তাহলে তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতেই হবে। জাতীয় সংহতি তখনই আসবে যখন তা এই সর্বজনীন চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

জাতীয়তা গঠনে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক আত্মীয়তাসূত্রে বিধৃত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতের সঙ্ঘবদ্ধতার ভিত্তিরূপে বেদান্তের চিন্তায় সারা ভারতকে প্লাবিত করতে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ ও প্রবাদপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নববেদান্ত জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে সীমিত ছিল না, পরন্তু ভাবকে জীবন ও বাস্তবের সঙ্গে মিলন ঘটানোর প্রয়াসেই ছিল তা নিবেদিত।

জাতীয় জীবনের ভিত্তি জনগণ—এই সত্যটিও স্বামীজীর অবিদিত ছিল না। সেজন্য ভারতের প্রগতিতে জনগণের ভূমিকার ওপর স্বামীজী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।"[১১] ভারতের পুনর্গঠনে জনগণের জাগরণ যে যুগের আহ্বান তা স্বামীজী জানতেন।

---

[১০] বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩

[১১] ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭২

তিনি তাঁর আর্ষদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন শূদ্রের ভাবী জাগরণ। তিনি বলেছিলেন এই নিপীড়িত জনগণ ক্রমশঃ তাদের প্রাপ্য দাবী আদায় করে নিতে উত্থিত হচ্ছে। স্বামীজীর অন্তঃকরণে তাঁর অগণিত অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিপীড়িত দেশবাসীর জন্য রক্তক্ষরণ হতো। তিনি দেখেছিলেন তারা সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে যুগে যুগে। স্বামীজী জানতেন এই দারিদ্র্যপীড়িত মানুষগুলোর কাছে অন্নই দেবতা। স্বামীজী যে আধ্যাত্মিক জাগরণের স্বপ্ন দেখতেন তার ভিত্তিভূমি এই গরিব-দুঃখী মানুষগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে তাদের দুঃখমোচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি বলতেন, জাতির মেরুদণ্ড ভারতের অগণিত জনসাধারণ অর্ধেক রুটি পেলে সমাজে বিপ্লব আনতে সমর্থ। রক্তবীজের বংশধর এরা। এদের সাহস, বীর্য, মহাপ্রাণতা সবই স্বামীজীর গোচরে ছিল।

একটা ধারণা আছে যে, কখনো কখনো জাতীয়তাবাদ মানুষে মানুষে বিভেদসৃষ্টিকারী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেজন্য স্বামীজী তার একটি উদার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে জাতীয়তাকে সর্বজনীন হতে হবে। এবং তার আওতায় সবাইকে নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য জনসাধারণকে সুসংহত, কর্মোদ্যোগী হতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। ধর্মের মাধ্যমেই একমাত্র এটি করা সম্ভব বলে স্বামীজী মনে করতেন। কারণ, ধর্মই, তা যেভাবেই জনসাধারণের কাছে প্রতিভাত হোক না কেন, ভারতীয় জনগণের সবচেয়ে শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তি (motive power) যা তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। ভবিষ্যতে এই শক্তিই ভারতকে পুনর্জাগরিত করতে পারবে যদি তা বেদান্তের মূল চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দকে একই সঙ্গে 'দেশপ্রেমিক' (patriot) ও 'সন্ত' (saint) দুটি ভূমিকা পালন করতে দেখে এর তাৎপর্য এখন ঐতিহাসিকদের কাছে ধরা পড়বে।

জে. এস. মিলের মতো অন্যান্য চিন্তাবিদগণ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন পাশ্চাত্য জগতে শিল্পবিপ্লবের ফলে একই জাতি একটি দরিদ্র শ্রেণী এবং একটি ধনিক শ্রেণী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ফলে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়ে দুটি বিরোধী শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু স্বামীজীর বিশ্লেষণ অনুসারে বেদান্তের মূল সূত্রকে ভিত্তি করলে এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি সম্ভব যাতে ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। স্বামীজীর কর্মসূচী ছিল জনগণের সর্ববিধ উন্নতির ভিত্তিভূমি রাজনৈতিক চিন্তার ওপর না হয়ে ধর্মের ভিত্তির ওপর গড়ে তোলা। তাতে সমষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টিরও মুক্তিলাভ সম্ভব। এটিই স্বামীজীর নববেদান্তের একটি প্রধান কথা।

স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের ধারণাকে অতি-জাতীয়তাবাদ বলা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদ সীমিত অর্থে স্বামীজীর কাছে কখনো প্রতীয়মান হয়নি। কারণ স্বামীজী জানতেন কোন জাতি অন্য জাতি বা সম্প্রদায় থেকে বিছিন্নভাবে বাঁচতে পারে না—তা সে জাতি যত বড় বা যত মহৎ হোক না কেন। স্বামীজীর 'অতি-জাতীয়তাবাদ' ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব এটি বিদেশীদেরও এর পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে রাখে না; কারণ, তাঁর দেশবাসীর মতো বিদেশীরাও ঈশ্বরের অংশ। স্বামীজীর মতে ভারতের অবনতির কারণ অন্য জাতি ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্নতা। তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে ভারতও তার পা মিলিয়ে চলুক। বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ক্রীস্টোফার ঈশারউডের ভাষায় তা ছিল "a kind of super-nationalism, a kind of internationalism sublimated"[১২] যদিও আন্তর্জাতিকতা স্বামীজীর চিন্তায় ছিল, কিন্তু সবকিছুকেই অতিক্রম করে যে চিন্তার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হলো বেদান্তের সর্বজনীন মঙ্গলের ভাবনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিন্তা ও চেতনায় মানুষ এবং মানুষের প্রতি ভালবাসাই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ছিল।

---

[১২] **Swami Vivekananda Centenery Memorial Volume 1963, p. 536**

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী কাশীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ যাঁরা পরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলে পরিগণিত হন। বাবুরাম মহারাজের পূত সংস্পর্শে এসে স্যারের যে পরিবর্তন হলো এবং সেদিনের ঐ ছাত্রদের মধ্যে দুজন পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের সাধু হন—এসবের মূলে যে ঈশ্বরেচ্ছাই ক্রিয়াশীল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চিন্তা উঠেছিল দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে। তারপর যা কিছু ঘটল, সব যেন পরপর সাজানো। ভাবী 'রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোম'-এর সূক্ষ্ম বীজটি ঐদিন সকলের অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণই বাবুরাম মহারাজের মাধ্যমে বপন করে দিয়েছিলেন।

বাবুরাম মহারাজজীর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—কি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী, কর্মচারী, ভক্ত, সবার ভিতরে ঠাকুরের ভাব ঢুকিয়ে দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করে নিতেন। তিনি বলতেন, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই ঠাকুরের কাজ—পায়খানা সাফ থেকে যাবতীয় কাজ ঠাকুরের সেবা। তাই তাঁরও সব কাজ ছিল ভালবাসা দিয়ে মাখা। নিজস্ব বলতে তাঁর কিছুই ছিল না—সবই ঠাকুরের। সামান্য কথায় ঠাকুরের উদ্দীপন হয়ে মুখ-চোখ লাল হয়ে যেত। শ্রীশ্রীমাঠাকরুন বলতেন, বাবুরাম 'মঠের মা'। তাঁর শরীর যাওয়ার পর শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ "মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত। হায়, ঠাকুর তাকেও নিয়ে গেলেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেনঃ "ও আমার দরদী।" পরবর্তী জীবনে বাবুরাম মহারাজের ভালবাসায় কত যুবক যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তিনি আমাদের বলতেনঃ "আমি কি আর তোদের ভালবাসি? যদি ভালবাসতাম, তাহলে তোরা আমার আজীবন গোলাম হয়ে থাকতিস। আহা, ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন! তার শতাংশের এক ভাগও আমরা তোদের ভালবাসি না।" অসময়ে কেউ মঠে এলে, নিজের খাবার দিয়ে দিতেন। তিনি নিজে খেতেন খুব কম ; বেশির ভাগ আমরা যারা কখনো তাঁর পাশে খেতে বসার সুযোগ পেয়েছি তাদের পাতে তুলে দিতেন। নতুন কেউ এলে বলতেনঃ "মাকে দেখেছিস? মহারাজকে দেখেছিস? ব্যস, তাহলে আর তোদের কিছু করতে হবে না। এলে গেলেই তোদের হবে।" যদি কেউ বলতঃ "না, দেখিনি," অমনি তাদের বলতেনঃ "আগে তাঁদের দর্শন করে আয়।"

কিভাবে মঠ পরিচালনা করতে হবে, জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের ভাবপ্রচার করতে হবে, মঠে যেন সর্বদা বিদ্যাচর্চা বজায় থাকে এবং শুধু একটি বাবাজীর আখড়া তৈরি না হয়—এসব বিষয়ে স্বামীজীর নির্দেশে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। চরিত্রগঠনের দিকে মহারাজজী খুব নজর দিতেন। উচ্চশিক্ষিত কেউ মঠে যোগ দিতে এলে বলতেনঃ "যা, গরুর জাব কাটগে যা। আগে অভিমান দূর হোক, তারপর ঠাকুরের কাজ করবি।" আবার কারোর তেমন বিদ্যাবুদ্ধি নেই অথচ দিবারাত্র ঠাকুরসেবা নিয়ে পড়ে আছে, কিন্তু পড়াশুনো করছে না, তাদের প্রতি যেন তাঁর বেশি সহানুভূতি ছিল। তাই বলতেনঃ "কিরে, তোরা কি কুলিগিরি করতে এসেছিস? পড়াশুনো করগে যা। মূর্খ ভক্ত দিয়ে কি ঠাকুরের কাজ চলে?"

যার যা দরকার দিতেন বটে, কিন্তু যেন-তেন প্রকারেন ঠাকুরসেবা তিনি সইতে পারতেন না। কেউ আলুর খোসা বেশি ছাড়ালে বকতেন। কপি

ও বেগুনের বোঁটার ভিতরের নরম শাঁসটি রেখে শক্ত বোঁটা ও আলুর খোসা গরুর জন্য রেখে দিতেন। তখন তো পয়সায় মুঠো মুঠো দেশলাই কাঠি বাজারে মিলত। কিন্তু একটি কাঠিও বেশি জ্বালাবার উপায় ছিল না। বলতেনঃ "ভক্তরা কত কষ্ট করে রোজগার করে পয়সা দিচ্ছে। অপচয় একদম করবি না।" তরকারি কাটা চলছে, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের জীবনী বা কথামৃত-পাঠ চলছে। সাধু-ব্রহ্মচারী কর্মী সবার সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে যেন ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় সেজন্য সর্বদা তিনি সচেষ্ট থাকতেন।

ঠাকুরঘরে যখন তিনি পূজায় বসতেন তা দেখবার মতো দৃশ্য ছিল। উত্তরমুখী হয়ে পশ্চিম দরজার কাছে আসনে বসতেন। ফুলদানীতে নানাবিধ ফুল দিয়ে ঠাকুরের বেদী সাজানো হতো। মহারাজের প্রিয় বড় বড় পদ্মের মতো 'ম্যাগ্নোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা' দেওয়া হতো। সামনে একটি বহুকোণবিশিষ্ট প্রায় গোলাকার মার্বেল পাথরের বেদী। তার উপরও ফুলদানি বসানো হতো। ঠাকুরের ভোগের সময় ছাড়া। মহীশূর থেকে কত সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি ধূপ আসত। এছাড়া ছিল মঠে তৈরি ষোড়শাঙ্গ ধূপ। মঠে যাঁরা থাকতেন তাঁদেরও তা শেখানো হতো। ফুল ও ধূপের গন্ধে আমোদিত ঠাকুরঘরটি যেন ছিল আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ।

শান্তভাবে প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে বসে আড়ম্বরহীন 'ভাবের পূজা' করতেন বাবুরাম মহারাজ। তখন ঠাকুরের জীবন্ত উপস্থিতি যেন অনুভূত হতো। তিনি অন্নভোগ দিতেন কিনা মনে নেই। তবে তাঁকে ঠাকুরের আরতি করতে দেখিনি; আরতি স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ করতেন। লক্ষ্মণ মহারাজ (স্বামী অক্ষরানন্দ) ও স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ কখনো কখনো করতেন। আরতির সময় তাল-মান-লয় যেন ঠিকমত চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন তিনি। ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। তাঁর সান্নিধ্যে এলে একটি শুদ্ধ পবিত্রভাব সকলেই অনুভব করত। রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রমুখ মঠে থাকতেন, তখন কি হতো তা বলে বোঝানো যাবে না। কাকে রেখে কার কাছে যাব! একটি জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিক শক্তিতরঙ্গ যেন সারা মঠে খেলে বেড়াত।

তখন গরিব হলেও মঠের ভাবই ছিল আলাদা। দুর্গাপূজা অথবা কোন উৎসবের দিনে সারাদিন খেটেখুটে রাতে সবাই যখন পরিশ্রান্ত, তখন হয়তো রান্না হতো ভাত, সোনামুগের ডাল, লঙ্কা দিয়ে মাখা আলুসেদ্ধ আর পায়েস। প্রভাকর ছিল রাঁধুনী। সে যে কি অমৃত তা আর কি বলব! অপূর্ব তার স্বাদ। এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে। বাবুরাম মহারাজ প্রতিদিন সকালে মঠবাড়ির পূবে গঙ্গার ধারে কিছু চাল বা ধান বা ছোলা নিজে ছড়িয়ে দিয়ে 'আয়' 'আয়' বলে ডাকতেন; আর এক ঝাঁক পায়রা সোনার বাগান (লেগেট হাউস) ও তার কাছাকাছি জায়গা থেকে এসে সেগুলো খেয়ে যেত। ওদের সঙ্গে কিছু চড়াই পাখিও আসত। নিয়ম ছিল তিনি আসতে না পারলে সেদিন অন্য সাধুরা এসে তাদের খাইয়ে যাবে।

ইংরেজী ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস হবে। বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমার বাল্যবন্ধু ও স্যারের ছাত্র ফণীর কাছে শিমুলতলায় আছি। ফণীর কাছে জানলাম যে, বাবুরাম মহারাজ ভীষণ অসুস্থ। বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম যে, তিনি স্টেশনের পাশেই শচীনবাবুর বাড়িতে আছেন। কয়েক দিন পরে একদিন শেষরাত্রের ট্রেন ধরে খুব ভোরে দেওঘরে গিয়ে শচীনবাবুর বাড়িতে পৌঁছালাম। বাবুরাম মহারাজ যে ঘরে ছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখি তিনি এত রোগা হয়ে গেছেন যে, তাঁকে যেন চেনা যায় না। ঐ সময় তিনি বিছানায় বসে পায়ে মোজা পরার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। আমি ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে তিনি আমাকে ঐ মোজা পরিয়ে দিতে বললেন, আমি সানন্দে তা করলে আমাকে কাছে বসতে বলে তিনি শিমুলতলায় খাওয়া-দাওয়ার ও থাকার সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ স্নেহবশে

প্রশ্নাদি করে জেনে নিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওখানে নিয়মিত মাছ পাওয়া যায় না এটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা। তাই তিনি বলেনঃ "রামটাম [বলরামবাবুর পুত্র] ওরা সব বাজারে যাবে। ওদেরকে ভাল মাছ নিয়ে আসতে বলে দে।"

এই সব কথার ফাঁকে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি তখন কিছু খাব, না বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শনাদি করে এসে তারপর খাব। উত্তরে আমি জানালাম যে, পুজো-দর্শনাদি সব সেরে এসে তারপর খাব। তখন মহারাজজী বলেনঃ "তা বেশ। মন্দির চিনিস কি? একা গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে যদি না পারিস, তবে এখান থেকে একটু পরে ছেলেরা কেউ যখন মন্দিরে যাবে তখন তার সঙ্গে গিয়ে পুজো-দর্শনাদি সব করে আসতে পারিস।"

আমি বললামঃ "মন্দির চিনি। আর একা গিয়ে পুজোদি সব সেরে আসতেও পারব।"

তারপর ওখানেই স্নানাদি সেরে আমি একাই মন্দিরে যাই ও পুজো-দর্শনাদি সেরে সাড়ে আটটা-নটা আন্দাজ ফিরে আসি। সে সময় মহারাজজীর বাড়িটির পিছন দিকে পশ্চিমে যে বারান্দা ছিল সেখানে একখানি ক্যাম্প-চেয়ারে বসে একখানি বই পড়ছিলেন। আমি তখন নিঃশব্দে, সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে মাটিতে বসি। অল্পক্ষণ পরেই মহারাজজী আমাকে কাছে বসে থাকতে দেখে বলেনঃ "কিরে, দর্শন করে ফিরলি?"

উত্তরে আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

তারপরেই তাঁর স্বভাবসুলভ প্রশ্নঃ "কিছু খেয়েছিস কি?"

উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি খুব রেগে ধমক দিয়ে বললেনঃ "এত বেলা হয়ে গেল। যা, ওদের কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে আগে খেয়ে আয়। আমি ওসব ভালবাসি না। শিগ্গির যা, খেয়ে আয়।"

বাড়িটির ভিতর দিকে যেখানে সাধু ও অন্যান্য সকলে ছিলেন আমি সেদিকে যেতে থাকি। মহারাজজীকে অত উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ধমক দিতে শুনে তাঁরা সকলেই খুব অপ্রতিভ হয়ে পড়েন আর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে যত্ন করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান ও আদর করে খাওয়ান। জলযোগ সেরে আমি মহারাজজীর কাছে-কাছেই থাকি।

দুপুরে খাওয়ার সময় হলে সাধুরা এসে আমাকে খাওয়ার জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুব যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন। যখন খাওয়া প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে, তখন একজন সাধু মাঝারি মাপের একটি বাটিতে মৌরলা মাছের ঝোল এনে আমাকে দিয়ে বললেনঃ "পূজনীয় মহারাজজী তাঁকে দেওয়া ঝোল থেকে কিছুটা নিয়ে বাকিটা তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি সকলেই মঠে ভক্তদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে প্রসাদ পেতেন। বাবুরাম মহারাজজীর পাশে বসার সৌভাগ্য যে ভক্তের হতো, তিনি ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ছাড়াও মহারাজজীর নিজ পাত থেকে নিজ হাতে তুলে দেওয়া ভাল ভাল প্রসাদ পাওয়ার বিশেষ সৌভাগ্যও লাভ করতেন। এ ব্যাপার তখন অনেক ভক্তই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর পাঠানো ঝোল পেয়ে খুশি হলেও আমি তাতে অবাক হইনি। কারণ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ প্রেমস্বরূপই ছিলেন! এই কারণে তাঁর মহাপ্রয়াণের পর মাস্টার মহাশয় বলেছিলেনঃ "ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলে গেল।"

আহারান্তে আমি মহারাজজীর কাছে যাই। গিয়ে দেখি তিনি সকালের ছোট ঘরটির পরিবর্তে পাশের বড় হলঘরে মাঝের একখানি তক্তপোশে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন। তাঁর বাঁদিকে আরও দু-তিনখানি আর ডানদিকে একখানি তক্তপোশ পাতা রয়েছে, ছোট ঘরটিতে দুপুরে বেশি গরম হতো বলে তখন হলঘরটিতে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হতো। তাঁর কাছে গেলে তিনি তাঁর ডানদিকের তক্তপোশখানি দেখিয়ে আমাকে সেখানে বিশ্রাম করতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেনঃ "রাত্রে থাকিবে তো।" আমি বললামঃ "না বিকেলের ট্রেনে ফিরে যাব।" আমার শিমুলতলায় ফিরে যাবার ট্রেন কটায় জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে জানালামঃ "সাড়ে চারটা আন্দাজ।"

তখন তিনি বলেনঃ "ওখানে শুয়ে ঘুমো, সময়মত আমি তোকে তুলে দেব।"

একটু পরে দেখলাম কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) তাঁর বাঁদিকের তক্তপোশটিতে এসে শুলেন। হঠাৎ দেখি বাবুরাম মহারাজ রোগের অসহ্য যাতনায় বিছানায় পড়ে ছটফট করছেন আর কৃষ্ণলাল মহারাজকে বলছেনঃ "কৃষ্ণলাল, এ অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না। মা যেন শীঘ্র মুক্তি দেন।" আমার ঘুমটুম তখন কোথায় চলে গেল। এভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিজেকে সামলে নিলেন। এত রোগ যন্ত্রণার মাঝেও কিন্তু তিনি আমাকে ডেকে দিতে ভোলেননি। বেলা তিনটে আন্দাজ আমাকে বলেনঃ "ওরে ওঠ, দেখ ট্রেনের সময় হয়ে আসছে কিনা?" আমিও উঠে পড়ি আর ফিরে যাবার জন্য তৈরি হতে থাকি। ঐ সময় স্থানীয় কোন ভক্ত মহারাজজীর জন্য কিছু কচি তালশাঁস আনেন। তিনি সেবকদের তা থেকে কিছু তালশাঁস শিমুলতলায় নিয়ে যাবার জন্য আমাকে দিতে বলেন। সেই সময় আমাকে কিছু খেতেও দেওয়া হয়। তারপর মহারাজজী ও অন্য সকলকে যথাযোগ্য প্রণামাদি করে বাবা বৈদ্যনাথজীকে স্মরণ করে আমি যথাসময়ে শিমুলতলায় ফিরে যাই। আমি একজন অতি নগণ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছেলে। কিন্তু যতক্ষণ মহারাজজীর কাছে ছিলুম, দারুন অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে প্রাণঢালা আদর-যত্ন করতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেননি। তাঁর নামটি যে "প্রমানন্দ", আর ঠাকুরের "দরদী"।

অসুখ ও শরীর সারবে এই আশাতেই বাবুরাম মহারাজকে দেওঘর আনা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল ভাল হবার পরিবর্তে শরীর দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে শরীরের উপর তাঁর বিতৃষ্ণার ভাবও বেড়ে যাচ্ছে। ফলে তিনি ঔষধপত্রও আর খেতে চাচ্ছেন না। এই ধরনের সব সংবাদ পেয়ে রাজা মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে দেওঘরে পাঠালেন। এক বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভাইকে কাছে পেয়ে খুশি হবেন, নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পারবেন, তাঁর কথা মান্য করে ঔষধপথ্যাদি খাবেন, আর অপর দিকে তিনি আদর-যত্ন করে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে ঔষধপথ্যাদি খাওয়ানো প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ সিদ্ধ করতে পারবেন—এইসব বিষয় ভেবেই স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে দেওঘরে পাঠিয়েছিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজজী দেওঘরে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকলেন। কিন্তু বাবুরাম মহারাজকে ঔষধপথ্যাদি খাওয়ানো প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। বাবুরাম মহারাজের শরীর চিকিৎসার বাইরে চলে যেতে লাগল। এমন সময় একদিন বেলা তিনটা আন্দাজ আমি বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে গেছি। একটু পরেই রাজা মহারাজজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্বোধন থেকে স্বামী সারদানন্দজী এসে উপস্থিত। পরস্পর অভিবাদনাদির পর রাজা মহারাজজী অত্যন্ত দুঃখ, আক্ষেপ ও অনুযোগের সঙ্গে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে বলতে থাকেনঃ "বাবুরামদাকে দেখাশুনা করার আর তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঔষধপথ্যাদি সব খাওয়ানো ও অন্য ব্যবস্থার জন্য কত আশা করে তারকদাকে তাঁর কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারকদা তা না করে ওখানে গিয়ে চুপচাপ রয়ে গেলেন। তিনি যদি ওসব কাজ নাই পারবেন, তবে সে কথা তখন আমায় একটু জানিয়ে দিলে আমি নিজে গিয়ে বাবুরামদাদাকে দেখাশুনা করতাম, আর ঔষধপথ্যাদি সব খাওয়াবার ব্যবস্থাদিও করে দিতাম।" রাজা মহারাজজীর কথা শেষ হতে না হতেই সারদানন্দজীও বলে উঠলেনঃ "তা হলেও তোমাকেই বা যেতে হতো কেন? আমি নিজে গিয়েই বাবুরামদাকে দেখাশুনার সব ভার নিতাম ও ব্যবস্থাদি করতাম।" এইভাবে তাঁরা দুজনে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হৃদয়ে আরও কিছু কথাবার্তা বলেন। বাবুরাম মহারাজের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তাঁকে বলরাম-মন্দিরে রাজা মহারাজের কাছে এনে রেখে চিকিৎসা করানো হবে বলে সম্ভবতঃ ঐ সময়েই তাঁরা দুজনে স্থির করলেন।

বাবুরাম মহারাজ বলরাম-মন্দিরে আসার পর

কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত ডাক্তার ইউ· এন· ব্রহ্মচারীকে আনিয়ে তাঁকে দেখানো হয়। সব দেখে শুনে ডাঃ ব্রহ্মচারী তাঁর নবাবিষ্কৃত ঔষধটি ইনজেকশন করে দেবার কথা বলেন। "ও আসুরিক চিকিৎসা আমি করাব না," বাবুরাম মহারাজ পরিষ্কার বলে দিলেন। রাজা মহারাজজী, শরৎ মহারাজজী প্রভৃতি ঐ ইনজেকশন নেবার জন্য তাঁকে আর অনুরোধ করেননি। আর ডাক্তারবাবুও তাঁকে আর তা দিতে চাননি। দেওঘর থেকে যখন বাবুরাম মহারাজজীকে কলকাতায় আনা হলো তাঁর অমন সুন্দর দেবশরীরে আর কিছুই ছিল না। কেবল হাড় কয়খানির উপর একটু চামড়া ঢাকা ছিল—যেন সাত-আট বছরের বালক। সে শরীরের দিকে চাইতে পারা যেত না।

দু-একদিন পরে বিকেলে বেলুড় মঠে পৌঁছে শিবানন্দ মহারাজজীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ঠাকুরঘরের দিকে পিছন করে পূর্বাস্য হয়ে অতি গম্ভীরভাবে হাত জোড় করে চেয়ারে বসে আছেন আর সামনে চার-পাঁচ জন পুরনো ভক্ত স্থাণুর মতো মেঝেতে বসে আছেন। জ্বলন্ত আগুনের কাছে গেলে যেমন তার উত্তাপ অনুভূত হয়, তেমনই স্বামী প্রেমানন্দজীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মহাপুরুষ মহারাজজীর হৃদয়ে তখন যে শোকাগ্নি তীব্রভাবে জ্বলছিল, তার উত্তাপ ঐ ভক্তদের গ্রাস করে তাঁদের হৃদয়ে এক অজানা অব্যক্ত দুঃখের ভাব জাগিয়ে তুলে একেবারে মুহ্যমান করে ফেলেছিল। এইভাবে অল্প কিছুক্ষণ কাটার পর মহাপুরুষ মহারাজজী সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভক্ত কয়টিকে অতি আবেগ-বিজড়িত করুণকণ্ঠে বলতে থাকেনঃ "দেখ, বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে দেওঘর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ঠাকুর যদি করেন তবেই তাঁর শরীর থাকবে, নচেৎ নয়। তাই তোমরা প্রত্যেকেই ব্যাকুলভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর যাতে তিনি শীঘ্র সেরে ওঠেন। তোমাদের পরিচিত অন্যান্য সব ভক্তদের জানিয়ে দাও তাঁরাও যেন কাতরভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন যাতে বাবুরাম মহারাজ শীঘ্র ভাল হয়ে ওঠেন। এইসব মহাপুরুষ যতদিন এ জগতে থাকেন ততদিনই এ জগতের কল্যাণ। তোমরা তো আর ঠাকুরকে দেখনি। এইসব মহাপুরুষদের দেখলে তবেই ঠাকুর সম্বন্ধে একটু-আধটু যা হয় কিছু ধারণা করতে পারবে। ঠাকুর যেন বাবুরাম মহারাজকে ভাল করে দেন এই প্রার্থনা তাঁর কাছে কর।"

কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ গাঢ়তর হতে লাগল। শেষে ভাবাবেগ সামলাবার জন্য যেন তিনি চুপ করে থেকে হাত জোড় করে ঠাকুরের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ঐ দিনের মতো তাঁর এত ভাবাবেগ আগে কেউ দেখেনি।

অবশেষে স্বধামে প্রত্যাবর্তনের সময় এল। ৩০ জুলাই মঙ্গলবার, ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে, বিকেল ৪-১৫ মিনিটে বলরাম-মন্দিরে বাবুরাম মহারাজজী শ্রীগুরুপদে লীন হলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর মহাপুরুষ মহারাজজী মঠের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন।

সকলের প্রতি কি ভালবাসাই না মহাপুরুষ মহারাজের দেখেছি! সকলের মধ্যে তিনি ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা ও নির্ভরতা যেন ঢুকিয়ে দিতেন। একটি চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেনঃ

"আমরা থাকি বা না থাকি—কারণ দিনশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সকলকেই যেতে হবে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জেনো—শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের জন্য চিরকাল থাকবেন। তোমরা তাঁরই সন্তান এবং আশ্রিত, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। সেজন্য তোমায় বলি—যেখানেই থাক, যাই কর, জানবে ঠাকুরই তোমাদের অতি আপনার জন। সদা সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন করবে, তাঁকে ধরে থাকবে। দুই বেলা নিত্যনিয়মিতভাবে ধ্যান-জপ করবে। তাঁর উপর যে নির্ভরশীল তার নাশ নেই। ঠাকুর তার মঙ্গল করবেন। প্রার্থনা করি ঠাকুরের কৃপায় তোমার বিশ্বাস অচল অটল হোক, তোমার তাঁর উপর ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধিলাভ করুক।"* [ক্রমশঃ]

---

* সম্পূর্ণ চিঠিটি গত সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৯৬) প্রকাশিত হয়েছে।—সংযুক্ত সম্পাদক

যাত্রাগানের শহর কলকাতা

প্রভাতকুমার দাস

॥ ১ ॥

কলকাতার অতীত ইতিহাসে, তথাকথিত রাজা-মহারাজা এবং বাবু সম্প্রদায় প্রভাবিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাত্রাগানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাগানবাড়ি এবং বৈঠকখানার হৈ-হুল্লোড়ের প্রাঞ্জল ঐশ্বর্যে সমকালীন অপরাপর প্রমোদ পরিকল্পনার মধ্যে যাত্রাগানের প্রাধান্যও লক্ষ্য করার মতো। বার্ষিক পূজা-পার্বণ এবং নানারকম পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে, কবি-খেউড়-আখড়াই, বাঈজী ও ভাঁড়দের চিত্তরঞ্জনী আয়োজনের সঙ্গে সগৌরবে যাত্রার আসরও সরগরম হয়ে উঠতো। বস্তুত বাংলার এই অতি প্রাচীন লোককলাটি নানা ধারায় নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। দেখা যায়, সুদূর সেই অতীত থেকে শুধু লোকগীতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক সময় বাংলা যাত্রাগানের সূত্রপাত হয়েছিল, তারপর 'চণ্ডীযাত্রা', 'ভাসানযাত্রা' প্রভৃতির বিবর্তন ধারায় 'রাসযাত্রা' ও 'কৃষ্ণযাত্রা' ক্রমান্বয়ে জনগণের প্রিয়তম বিনোদক হয়ে উঠেছে। বাংলার মাটিতে একদা কৃষ্ণনাম প্রচারের প্রবল জোয়ার এসেছিল, যার ফলে এই লোককলাকে ধর্মপ্রচারকরা খুবই কাজে লাগিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল জনসমাজে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই যাত্রা পরিবেশনায় অশিক্ষিত ধর্মপ্রিয় সাধারণ মানুষের মর্মমূলে কৃষ্ণমাহাত্ম্য পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাগানের মধ্যে কালিয়দমন পালাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, এমনকি এই জনপ্রিয় পালা চৈতন্য-সমসাময়িক কালে প্রবর্তিত হয়ে পরবর্তী প্রায় চারশো বছর পর্যন্ত লোকসমাজে বহুল প্রচারিত হয়েছে, বলা যায় রামমোহন-এর সময় পর্যন্ত। কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি এই পালা পরিবেশনা, কালক্রমে মনোরঞ্জনী আয়োজনে চটুল হাস্যপরিহাস এবং অশ্লীলতায় চরমভাবে আক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। রুচিবিকৃতির এই সূচনাপর্বকে প্রথম বাধা দিয়ে সত্যিকার ভদ্রজনোচিত পরিবেশনার প্রতি আগ্রহী হন কেঁদুলী গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান শিশুরাম অধিকারী। পরবর্তী কালে গোবিন্দ অধিকারী দীর্ঘকাল কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এমনকি নিজের কবিত্বকে কাজে লাগিয়ে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক গান বেঁধেছিলেন. তিনি এবং কলকাতার সমীপবর্তী শালকিয়ায় তাঁর গদিঘর ছিল। তাঁর শিষ্য কৃষ্ণকমল গোস্বামীও কৃষ্ণযাত্রাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কলকাতার ইংরেজী-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক নব্য জোয়ারে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণযাত্রার দীর্ঘকাল পরিক্রমার ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে অবতীর্ণ সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নাম নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় যিনি তাঁর দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে 'কণ্ঠ' বা 'কণ্ঠমহাশয়' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব তাঁর ভক্তিপ্লুত গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় ও গানে আকৃষ্ট হয়েছেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা শহরে প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের পরে তদানীন্তন বাবু ও জমিদার পৃষ্ঠ পাযকদের দৃষ্টি থিয়েটারের প্রতি আকর্ষিত হয় ইংরেজদের চেষ্টার ফলে। এই সঙ্কটসময়ে যাত্রাপালার অধিকারীরা, বাবু ও জমিদারদের মনোরঞ্জনের জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রশ্রয় দিলেন জাঁকজমকপূর্ণ উত্তেজক রুচির সদ্যজনপ্রিয় 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাকে। গোপাল উড়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাকে জনপ্রিয় করেছিলেন নাচ-গান ও হাস্যরসের উদ্ভট উপকরণে। তৎকালীন কলকাতার চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে এই যাত্রা খুব আলোড়ন এনেছিল। অনেকের মতে পাথুরিয়াঘাটার নৃসিংহ মল্লিক ছিলেন গোপাল উড়ের পৃষ্ঠপোষক। লোকনাথ দাস কিংবা 'লোকা ধোপা' নামে এক ব্যক্তিও এই সময় বেশ নাম করেছিলেন। শোনা যায়, লক্ষাধিক অর্থব্যয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদল করেছিলেন ধনকুবের রাধামোহন সরকার। গোপাল

ছিলেন তাঁরই দলের মালিনীর ভূমিকায় জনপ্রিয় অভিনেতা। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তদানীন্তন 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার রোমাঞ্চকর বর্ণনা পাঠ করলে বোঝা যায় সে সময়ের সমাজ মানসে কি পরিমাণ প্রভাব ফেলেছিল এই যাত্রা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, তরুণ বাবুসম্প্রদায় এই যাত্রা শুনে বা উপভোগ করে শুধু যে তৃপ্ত হতেন তা নয়, ধনাঢ্য ভদ্রসন্তানগণ একত্রিত হয়ে সখের যাত্রাদল তৈরি করে নিজেরাও এই রস প্রচার করতে ভালবাসতেন। ফলে কলকাতা শহরে ব্যাপকভাবে সখের যাত্রাদলের প্রচলন হতে শুরু করে। কলকাতায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রার পাশাপাশি যেসব সখের দল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সেগুলির মধ্যে 'কামরূপ যাত্রা' 'নলদময়ন্তী যাত্রা' 'নন্দবিদায় যাত্রা' অন্যতম। যেসব সখের দলে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠেছিল—তার মধ্যে ভবানীপুরের উমেশ মিত্রের দল, মধ্য-কলকাতার আরপুলিগলির দল ও সিমুলিয়া সখের যাত্রাকোম্পানী অন্যতম।

এই সখের যাত্রাগানের সর্বাত্মক প্রভাব কলকাতার সংস্কৃতি মহলে নানাভাবে আলোড়ন আনে। সেসব দলের মধ্যে, বরানগর নিবাসী ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের দল, শ্রীনাথ সেনের দল, দক্ষিণ বরাহনগরের দল, বেলতলা-ভবানীপুরের শিবঠাকুরের দল, কলকাতা হাড়কাটা গলির স্বরূপ দত্তের দল, বৌবাজারের অক্রূর দত্তের দল, বাগবাজারের সখের দল, দ্বারকানাথ মল্লিকের পাড়ায় জোড়াসাঁকোর দল, রবীন্দ্রনাথের মেজকাকা গিরিন্দ্রনাথের দল, ব্রজমোহন রায়ের দল, হরিমোহন রায়ের দল, রসিকলাল চক্রবর্তীর দল, রামধন মিস্ত্রীর দল, প্যারিমোহনের দল, মহেশ চক্রবর্তীর দল, দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের দল, ঝড়ুদাস অধিকারীর দল, শিশিরকুমারের দল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব যাত্রায় প্রধানতঃ বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ছাড়াও মধুসূদন-এর 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি নাটকও পালা আকারে অভিনীত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত কলকাতায় সখের যাত্রার প্রভাব অত্যন্ত লক্ষণীয় ছিল। অবশ্য যাত্রাগানের সর্বাত্মক জনপ্রিয়তা পরিবর্তনের পালা বদলে, জনরুচির তাগাদায় ভাঁড়ামি আর অশ্লীলতায় নিন্দিত হয়েছে। কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত নাট্যাভিনয়ের বিশেষ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে যাত্রাগান তার নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে ক্রমশঃ অবনতির দিকে নেমে গিয়েছে। অশিক্ষিত, নিম্নরুচির মানুষের প্রমোদ-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যাত্রা নোংরামি-সর্বস্ব প্রমোদ উপকরণে পরিণত হয়েছে। যাত্রাগানের কুরুচিপূর্ণ লঘুরসের প্রাদুর্ভাব কাটিয়ে, প্রকৃতই পুরাণ প্রচারের পুরাতন রীতিরই সংস্কার সাধন করে, যুগোপযোগী করে পরিবেশনের কাজে ব্রতী হন মনোমোহন বসু। মনোমোহনের এই পরিবর্তিত চিন্তা অন্যতর অর্থে কার্যকরী করতে পেরেছিলেন চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, যিনি মদন মাস্টার নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। মদন মাস্টার ছিলেন অধ্যাপক, শিক্ষিত মানুষ। মদন মাস্টার যাত্রার প্রয়োগরীতি ছাড়াও নাচ গান সংলাপ সাজসজ্জা ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির সংস্কার সাধন করে যাত্রাকে প্রথম অগ্রগতির পথে প্রবাহিত করেন। মদন মাস্টার যাত্রায় সঙ্গীত পরিবেশনাকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য এবং গানের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য জুড়ি প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। অবশ্য মতান্তরে এমন তথ্যও প্রচারিত—ইতিপূর্বে সংগীত পারদর্শী শ্রীদাম ও সুবল প্রথম তাঁদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যই এই জুড়ি প্রথা প্রচলন করেছিলেন। মদন মাস্টারের সখের যাত্রাদলটি পরে পেশাদার দলে রূপান্তরিত হয়, সেই সঙ্গে দোগাছিয়ার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর যাত্রাদলটিও। হরিনারায়ণের সঙ্গে একত্রে সংযুক্ত হয়ে মতিলাল রায়ও যাত্রাদল করে নতুন পদ্ধতিতে পালা পরিবেশনের সূত্রপাত করেন। মদন মাস্টারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নবীন মাস্টার দলের দায়িত্ব নেন কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁর প্রয়াণ হলে তাঁর স্ত্রী কৈলাসবাসিনী—দলটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দল তখন 'বৌমাটারের' দল হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে, এই দলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল কলকাতা শহর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, কৈলাসবাসিনীর সার্থকতার অনুপ্রেরণায়, কলকাতায় কয়েকটি যাত্রাদল স্থাপিত হয়, যেগুলির পরিচালনার ও অভিনয়ের ভার গ্রহণ করেন মহিলারা।

নীলকণ্ঠের বন্ধু মতিলাল রায় গীতাভিনয়ের ঝোঁক নিয়ে যাত্রা পরিবেশনা শুরু করলেও সংলাপ-প্রধান পূর্ণাঙ্গ পালার মাধ্যমে যাত্রাগানের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেন। নীলকণ্ঠের দলগঠনের আট-নয় বছর পরে মতিলাল সখের দল গঠন করেছিলেন। নিছক বিনোদক হিসাবে নয়, যাত্রাকে লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করে তিনি রসিকমহলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। কেবল পুরাণ নয়, দেশ ও জাতির কল্যাণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের জন্য দেশবাসীর চিত্তে জাগরণের গান শোনাতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে, কেশবচন্দ্র সেন মতিলালের যাত্রার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁর 'কমল কুটির'-এ 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা দর্শন করে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেব ভাবসমাধি লাভ করেন। শুধু তাই নয়, ঠাকুরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার দুর্লভ সম্মানও মতিলাল অর্জন করেছিলেন। কলিকাতায় মতিলাল প্রথমে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে এবং পরে আহিরিটোলায় তাঁর দলের গদিঘর স্থাপন করেছিলেন। মতিলালের উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর দুই পুত্র ধর্মদাস এবং ভূপেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘকাল পিতার আদর্শে যাত্রাগান পরিবেশন করে গেছেন।

যাত্রাগানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পালা রচয়িতা হিসাবে মতিলাল যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে সেই খ্যাতিকেই নানা দিক থেকে মহিমান্বিত করেছিলেন মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। মথুরানাথ পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর থেকে এসে কলকাতার ঠনঠনিয়া এলাকায় প্রথম আড্ডা গেড়ে ছিলেন। সমকালীন জনপ্রিয় আর একটি দল, গণেশ অপেরাও যাত্রার নানা সংস্কার করে প্রায়-পড়ে-যাওয়া-বাজার থেকে যাত্রাকলাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। এই সময়ে, যাত্রা পরিবেশনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়—সাত-আট ঘণ্টার যাত্রাকে কমিয়ে তিন-চার ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করার চেষ্টার মধ্যে। মথুরানাথ সাহার দলের পালাকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক পালা 'পদ্মিনী' পরিবেশন করে যাত্রার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার কাজকেও ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন মথুরানাথ। এই সময় কলকাতায় মুকুন্দদাসের যাত্রাও গণ-জাগরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যাত্রাগান, মধ্য বিশ দশকে একটা নতুন ধারায় বাঁক নেয়। মথুরানাথ সাহার উদ্যোগে থিয়েট্রিক্যাল চমকও যখন যাত্রা দর্শকদের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে, তখন প্রভাত বসু যাত্রার পুরাতন ও প্রথাগত অভিনয়রীতির মধ্যে আঙ্গিক অভিনয় প্রবর্তন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। যার প্রধান দীর্ঘ একটানা সংলাপের প্রচলন যাত্রা আসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রভাত বসুর নিজস্ব উদ্ভাবনায় তা নতুন পথ পেল।

কলকাতায় দীর্ঘদিন ধরে যেসব অঞ্চলে যাত্রাগানের প্রচলন অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে হলো—চোরবাগান, নিমতলা, জোড়াবাগান, আহিরিটোলা, শোভাবাজার এবং ভবানীপুর। পেশাদার দল হিসাবে কলকাতার যাত্রার খ্যাতি যারা বহন করত এবং আহিরিটোলায় তাদের গদিঘর বসিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে যাদব বাঁড়ুজ্জের দল, ভূষণ দাসের দল, সিমুলিয়া নাট্য সমাজ ও প্রসন্ন নিয়োগীর দল উল্লেখযোগ্য। একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো, যাত্রার জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে, শহর কলকাতায় এক-একটা দল ভেঙে-ভেঙে নতুন দল সৃষ্টি হতে লাগল। উদাহরণ হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে, ভূষণ দাসের যাত্রাদল 'সাধন ভাণ্ডারী' নাম নেয় সাধনচন্দ্র ভাণ্ডারীর হাতে, সাধনচন্দ্র ছেড়ে দিলে সেই দল শশিভূষণ হাজরার হাতে আসে এবং দলটি 'শশি হাজরার দল' হিসাবে রূপান্তরিত হয়। পরে আর্য অপেরা তৈরি হয় এই শেষোক্ত দলটিরই ভাঙা-রূপ হিসাবে। 'নবদ্বীপ বাণী' বা সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দল, যা সত্যম্বর

চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রাদল নামে পরিচিত ছিল, তা পরবর্তী কালে 'সত্যম্বর অপেরা' নাম গ্রহণ করে এবং আজকের দিনেও নানা হস্তান্তরের মধ্যে তার অস্তিত্ব বর্তমান। বর্ধমান-কালনার ব্যবসায়ী গণেশচন্দ্র ঘোষ, যিনি প্রসন্ন নিয়োগীর দল কিনে নিয়ে 'প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রা সম্প্রদায়' হিসাবেই দল চালাচ্ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে জামাতা হরিপদ কুমার ঐ দলের নাম পরিবর্তন করে শ্বশুরের নামেই দলের নামকরণ করেন 'গণেশ অপেরা পার্টি'। 'সিমুলিয়া নাট্যসমাজ' নামে আরেকটি দলের নাম পরিবর্তন করে শ্রীচরণ ভাণ্ডারী নিজের নামে 'ভাণ্ডারী অপেরা' প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িক কালে পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) 'বৈকুণ্ঠ নাট্যসমাজ' যা পরবর্তী কালে 'নট্ট কোম্পানী' হিসাবে খ্যাতি পায়, কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে গদিঘর স্থাপন করে বাণিজ্য শুরু করে। এই দলটির অস্তিত্ব এখনও লুপ্ত হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, আলোচ্য পর্বে পালাকার হিসাবে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। এছাড়াও অহিভূষণ ভট্টাচার্য এবং অঘোরনাথ কাব্যশাস্ত্রীর নামও উল্লেখযোগ্য। অহিভূষণ তাঁর 'সুরথ উদ্ধার' পালাতে প্রথম বিবেক চরিত্রের অবতারণা করেন, যা বাংলা যাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে দীর্ঘদিন জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের শেষের দিকে কলকাতার যাত্রার সঙ্গে এক প্রতিভাবান পালাকার আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তাঁর জীবিতাবস্থায় 'পালাসম্রাট' উপাধিতে সংবর্ধিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম ব্রজেন্দ্রকুমার দে। পরবর্তী পঞ্চাশ বর্ষব্যাপী বাংলা যাত্রার আধুনিকতার ক্ষেত্রে যাবতীয় নতুনত্ব, তার প্রায় সবকটি তিনিই প্রবর্তন করেছেন। তাঁর রচিত পালাগুলির নিরীক্ষামূলক প্রযোজনার ক্ষেত্রে কলকাতার যাত্রাজগতের দুই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি সূর্য দত্ত ও পঞ্চু সেনের নামও সবিশেষ যুক্ত। সমসাময়িক কালে গর্ব করার মতো আরো কিছু নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণিভূষণ মতিলাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা পাল প্রভৃতি। উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে কলকাতার যাত্রার খুবই বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়। জমিদারতন্ত্রের বিলোপের ফলে পতনোন্মুখ যাত্রার অগ্রগতি এমনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, যাত্রার অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। বারোয়ারি পুজার ব্যবস্থাপকরা কিছুকাল যাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা করলেও যাত্রাকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে ওঠে। কলিয়ারি শিল্পাঞ্চলের এবং চা-বাগানের শ্রমিক সম্প্রদায়ের হাতে যাত্রার ভবিষ্যৎ নিহিত হলে, একমাত্র বাণিজ্যিক কারণে, যাত্রার সামগ্রিক উপস্থাপনা চটুল, জাঁকজমকপূর্ণ সস্তা দরের নাচগান সমন্বিত হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্নমানের পর্যায়ে অবনত হয়। বর্তমান শতাব্দীর ষাট দশকের অব্যবহিত আগে পরে, নানা দিক থেকে যাত্রার আসরে নানা রোমাঞ্চকর ও লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। এই সময় শোভাবাজার রাজবাড়ি যাত্রা-উৎসবের আয়োজন করে। ফলে, কলকাতার শিল্পাভিমানী দর্শকমণ্ডলীর কাছে যাত্রাগানের প্রতি নতুন আগ্রহ গড়ে উঠে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রকাননে, 'বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ' আয়োজিত যাত্রা-উৎসবও যাত্রাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে। কয়েক বছরের মধ্যে যাত্রার প্রথাগত উপস্থাপন-পদ্ধতি পরিবর্তন করে যাত্রাকে আধুনিক করে প্রযোজিত করার ব্যাপারে যাত্রার অধিকারীরা মনোযোগী হয়ে ওঠে। স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষদের পরিবর্তে মহিলাদের অভিনয়, যাত্রার সময়সীমা সংক্ষিপ্তকরণ, আলো-টেপ-মাইক প্রভৃতি যান্ত্রিক প্রয়োগভাবনার রূপায়ণ, বিষয়বিন্যাসে ও অভিনয়-রীতিতে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ পরিবেশন, দর্শনীর বিনিময়ে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িকভাবে, বাংলার নানা গ্রামে-গঞ্জে যাত্রা প্রদর্শনের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিবর্তনগুলি খুব দ্রুত সম্পন্ন হতে থাকে। পরবর্তী দু-দশকের মধ্যে এমনই অবস্থার সৃষ্টি হয়, যে কলকাতার জনপ্রিয়তার কাছে অপরাপর বিনোদকগুলি সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও মুমূর্ষু যাত্রার পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। চলচ্চিত্র ও মঞ্চের অনেক নামী ও অনামী শিল্পীর সংযোগ ঘটে যাত্রার সঙ্গে। এমনকি,

কলকাতার যাত্রার পক্ষে যথার্থই গৌরবের ব্যাপার ঘটে—সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায় সকল বহুমান্য ব্যক্তির নাম একে একে যাত্রাজগতের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। ষাটের দশকে সামাজিক পালার প্রবর্তনার ফলে সাম্প্রতিককালের নানা জীবন্ত সমস্যা যাত্রাপালার বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সামাজিক পালারই একটি ভক্তিরসাশ্রিত শাখা হিসাবে নানা মনীষীর জীবনকথা যাত্রায় রূপায়িত হয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় রামকৃষ্ণদেবের জীবনকাহিনী পঞ্চাশ দশকের শেষে প্রথম রূপায়িত করেন সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, আর্য অপেরায় সেই পালা অভিনীত হয়। এর পরে ষাটের দশকের শেষে পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ পালায় যাত্রাপালা প্রথার প্রবর্তন করে প্রথম আংশিক আলোর ব্যবহার করে একটি নতুন সম্ভাবনা যুক্ত করেন। পূর্ণেন্দুশেখর যাত্রায় রামকৃষ্ণ-চরিত্রাভিনেতা হিসাবে সবচেয়ে সার্থক অভিনেতা। নিউ প্রভাস অপেরার ‘পাগল ঠাকুর’ পালাটিও অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল তাঁরই চরিত্রায়নে। পরবর্তী কালে, ভক্তিরসাশ্রিত পালার প্লাবনে বাংলা যাত্রার একটি বিশেষ ধারা চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, নট্ট কোম্পানীর ‘ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’, ‘নটী বিনোদিনী’, তরুণ অপেরার ‘বীর সন্ন্যাসী’, তারা মা অপেরার ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’ প্রভৃতি পালা স্মরণীয় প্রযোজনা। পূর্ণেন্দুশেখর এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া, রামকৃষ্ণ-চরিত্রের রূপকার হিসাবে শেখর গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর লাহিড়ীর নামও যুক্ত হয়েছে।

কলকাতার উত্তরাঞ্চলে, কোম্পানীবাগান অঞ্চলে (অধুনা রবীন্দ্রকাননে) ইদানীংকালের যাত্রাদলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে; খ্যাত-অখ্যাত যাত্রাদলের সংখ্যাও প্রায় দুই শতাধিক। এইসব যাত্রাদলের পৃথক পৃথক গদিঘর আছে। সুবিন্যস্ত জাঁকজমকপূর্ণ চোখধাঁধানো পরিবেশে আধুনিক যাত্রাজগতের বহির্জগৎ আলোকিত। বিত্তবৈভবময় যাত্রার অস্তিত্ব যে কত প্রকট, তার প্রমাণ দৈনিক কাগজ কিংবা বেতারকেন্দ্র-প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখলে বোঝা যায়। প্রায় কয়েক কোটি টাকা যার সামগ্রিক বার্ষিক লগ্নী, মাত্র কয়েকগজ প্রশস্ত চিৎপুর রোড বা রবীন্দ্রসরণীস্থ বঙ্গ সংস্কৃতির সেই বাণিজ্যক্ষেত্রটিকে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় প্রায় শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু অভিজ্ঞমহলের ধারণা, নিছকই মুনাফা-শিকারের অব্যর্থ প্রেমে চিৎপুর যাত্রার দীর্ঘ ঐতিহ্যলালিত প্রাচীন ধারণাটি লুপ্ত হয়ে গিয়ে যে শিল্পবন্দরটি স্থাপিত হয়েছিল, কালের অমোঘ সত্যে নিছকই বাণিজ্যিক কারণে আজ তা ব্যর্থতার চূড়াকে স্পর্শ করতে চলেছে। এই অবস্থা দীর্ঘকাল চললে, ইদানীন্তন কলকাতার যাত্রার বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ আধুনিকতার তলে, সত্যিকার গৌরবময় প্রাচীনতম ক্ষীণস্রোতটি অচিরকালের মধ্যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। একমাত্র প্রকৃত সংস্কারকের স্পর্শে এই অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে।

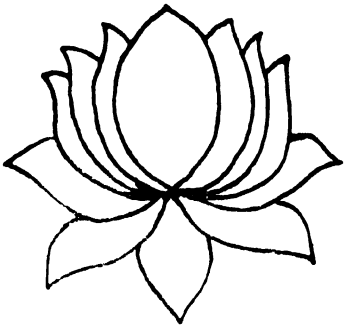

স্বর্গারোহণী

বীরেশ্বর পাল

[পূর্বানুবৃত্তি]

বদ্রীনাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে নারায়ণের মূর্তি। মূল মন্দিরের চতুর্দিকে আছে লক্ষ্মীর মন্দির, গরুড় মন্দির ইত্যাদি। মন্দিরের বামে ক্ষেত্রপাল মন্দির এবং মন্দিরের নিচে তপ্তকুণ্ডের পাশে আদি কেদারেশ্বরের মন্দির।

বদ্রীনাথ মন্দিরে ভারতের অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পাণ্ডাদের জ্বালাতন নেই। এখানে দৃষ্টি-পুজো। পূজার ডালি হাতে নিয়ে বদ্রীনাথজীর সামনে দাঁড়ালেই ভক্তের পুজো ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বদ্রীনাথ মন্দিরের বামে অনতিদূরে ব্রহ্মকপাল। এই ব্রহ্মকপালে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক কাজ ও শ্রাদ্ধ করলে অক্ষয় স্বর্গবাস হয় বলে লোকবিশ্বাস। এখান হতে চড়াই পথে পাহাড়ের উপর একটি ঝরনার উৎপত্তিস্থলে উপস্থিত হলাম। বড়ই মনোরম পরিবেশ। নামতে ইচ্ছা হয় না। এই ঝরনার তীরে বসে দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই ইন্দ্রের নামানুসারে ঝরনাধারাটি ইন্দ্রধারা নামে খ্যাত। কয়েক ঘণ্টা পর ফিরে এলাম বদ্রীনাথ মন্দিরে। মন্দিরের এক পাণ্ডা নারায়ণজীর প্রসাদ বিতরণ করছেন। সাধু-সন্ন্যাসী, ভক্ত, তীর্থযাত্রী সকলেই প্রসাদ নিচ্ছেন। প্রসাদের পরিমাণ দেখে আমিও দুই হাত পাতলাম। যা পেলাম ও খেলাম তাতে অমৃতের স্বাদ পেয়ে মনটা ভরে গেল। ইন্দ্রধারা দেখতে গিয়ে চড়াই-উতরাই করে ক্ষুধায় পেটে জাঁতা পাক দিচ্ছিল। এবার নারায়ণজীর কৃপায় ও প্রসাদে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে দেড় মাইল দূরে চরণপাদুকা দেখতে চললাম। বদ্রীনাথ মন্দিরের ডান দিকে বাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। বাজার পার হয়ে, কিছুদূরে গিয়ে চড়াই পথে চরণপাদুকা। চড়াই পথ হলেও এমন কিছু কষ্ট হয় না। তাই সকল তীর্থযাত্রী ইচ্ছা করলে নারায়ণের চরণপাদুকা দর্শন করে ধন্য হতে পারেন। নীলকণ্ঠ পাহাড়ের কাছাকাছি এক শিলায় নারায়ণের পায়ের ছাপ আছে। ঐটিই চরণপাদুকা। এখান থেকে ঋষিগঙ্গা নামে খ্যাত এক ঝরনার জল এনে বদ্রীনারায়ণের ভোগ রান্না হয়। চরণপাদুকা দর্শন করে বেশ কিছুটা পথ চড়াই পথে এগিয়ে এলাম। এখান থেকে নীলকণ্ঠের পূর্ণ রূপটি নজরে পড়ে। এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নানান জাতের ফুলের মেলা। তার মধ্যে ব্রহ্মকমলও রয়েছে। এখানে আছে উর্বশীকুণ্ড। কুণ্ডের জল স্বচ্ছ ও নীলাভ। উর্বশীকুণ্ডের আশপাশের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি তাতে যেন নৃত্য করছে। এখানে নারায়ণের উরুদেশ থেকে অপ্সরা উর্বশীর জন্ম হয়েছিল বলে জায়গাটির নাম উর্বশীকুণ্ড। এমনই মায়াময় পরিবেশ যে, এখান হতে যেতে আর মন চায় না। সূর্য অস্তমিত হতে বেশি দেরি নেই। নামতে শুরু করলাম। অতি সাবধানে নেমে বদ্রীনাথ শহরে চলে এলাম।

মন্দিরে আরতির সময় হয়ে এসেছে। যাত্রীদেরও ভিড় জমেছে। বদ্রীনাথজীর শৃঙ্গার বেশ ও আরতি দেখার জন্য ভিড়। মন্দিরপ্রান্তে সিঁড়িতে বসে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইকে 'ভজ গোবিন্দম্' গানের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠল। বদ্রীনারায়ণজীর আরতি দেখতে সবাই জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ আর নড়ছে না। পিছনের ভক্তদের অসুবিধা দেখে মন্দির কমিটির লোকজন—যাঁদের দর্শন হয়েছে তাঁদের সামনে থেকে সরে দাঁড়াতে বলছেন যাতে পিছনের ভক্তেরা

আরতি-দর্শন করতে পারেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! কোন প্রকারে ভিড়ের ফাঁক দিয়ে এক নজর বদ্রীনাথজীকে দর্শন করে চলে এলাম। মন্দিরের ডান পাশে এক লম্বা টিনের চালায় নারায়ণের নাম-গান হচ্ছে। চালাঘরের এক প্রান্তে একটু উঁচু বেদীর ওপর এক সন্ন্যাসী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন। সমবেত ভক্তরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গান করছেন। অবাক হলাম ন-দশ বছরের একটি পাহাড়ী বালককে দেখে। গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা। কুঞ্চিত কেশরাশি। নাক-মুখ-চোখ ভারি সুন্দর। পরণে ধুতি ও কপালে বিষ্ণুতিলক। দেখলে মনে হয় দেবশিশু। ভক্ত প্রহ্লাদের কথা মনে পড়ে যায়। শিশুটি নিমীলিত নেত্রে বিভোর হয়ে হাততালি দিয়ে তন্ময় হয়ে সকলের সঙ্গে মধুরকণ্ঠে গাইছে—"বদরী নারায়ণ—নারায়ণ—না-রায়ণ, বদরী নারায়ণ।" প্রায় আধ ঘণ্টা পর গান সমাপ্ত হলো। মন্দির বন্ধ হতেই সমস্ত ভক্তের দল যে যার রাতের আশ্রয়ে চলে গেল। আমিও বালানন্দ তীর্থাশ্রমে ফিরে এলাম।

তীর্থাশ্রমের স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম স্বর্গারোহণী যাত্রার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আগামী কালই স্বর্গারোহণ অর্থাৎ স্বর্গারোহণী পথে যাত্রা।

নানান ভাবনা-চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল হুঁশ নেই। ঠাণ্ডায় লেপ ছেড়ে আর উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। দরজায় ঠকঠক শব্দ। এবার উঠতেই হলো। দরজা খুলে দেখি ২৪।২৫ বছরের এক পাহাড়ী সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক। সঙ্গে আরও দুটি পাহাড়ী ছেলে। প্রথম দেখা হলেও বুঝতে পারলাম এরাই আমায় স্বর্গারোহণীর পথপ্রদর্শক। ছেলেগুলি সহজ, সরল ও নম্র। প্রধান গাইডের নাম হায়াৎ সিং। বেশ বুদ্ধিমান। ছেলেটি বললে—'বাবুজী, জল্দি তৈয়ার হো জাইয়ে। আভি যাত্রা করেঙ্গে। যাত্রাকা সামান কাঁহা হ্যায়? সব কুছ্ বন্দোবস্ত্ হো গিয়া। রাস্তেকে কিনার মেরা ঘর হ্যায়। উঁহা পর সব কুছ সামান হ্যায়।'

পাহাড়ী অভিযানের পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলাম। স্বামীজীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে হায়াৎ সিং-এর সঙ্গে রওনা দিলাম। কাছেই একটা চায়ের দোকানে সকলে মিলে চা-বিস্কুট খেয়ে বদ্রীনাথজীকে দর্শন ও প্রণাম করে 'জয় বদ্রীবিশালজী কি জয়' বলে রওনা দিলাম। অলকানন্দার বাম তীরের পায়ে চলা পথ-রেখা ধরে এগিয়ে চলেছি মানা গ্রামের দিকে। কিছুদূর গিয়ে পায়ে চলা পথকে ফেলে রেখে সামান্য একটু চড়াই পথে এগিয়ে নর ও নারায়ণের মা—মাতাজীকে দর্শন করে এলাম। ছোট্ট একটি মন্দিরে শ্বেত-শুভ্র প্রস্তরের চতুর্বাহু দুর্গামূর্তি! এবার হায়াৎ সিং তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে স্বর্গারোহণী যাত্রার সামগ্রী জোগাড় করা ছিল। তাঁবু, চাল, ডাল, আলু, স্টোভ, কেরোসিন ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী হায়াতের নিতে ভুল হয়নি। স্বর্গারোহণী যাত্রার প্রাক্কালে হায়াৎ তার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভোলেনি। মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা শুরু করলাম।

মানা গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনীর ক্যাম্প। প্রতিরক্ষার কারণে স্বর্গারোহণী নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত—একথা আগেই বলা হয়েছে। তাই যোশীমঠ হতে নিয়ে আসা অনুমতিপত্র মিলিটারী অফিসারদের দেখালে তবেই ঐ পথে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। মানা গ্রাম ভারতীয় এলাকার সর্বশেষ জনপদ। এখানে বেশ কিছু সাধারণ মানুষের বসবাস আছে। বাইরে থেকে এদের পোশাক নোংরা দেখালেও এদের অন্তর হিমালয়ের মতো বিশাল ও পবিত্র। এদের হৃদয়ের একটু ছোঁয়া পেলে আমরা ধন্য হই। এদের ঘরগুলি খুব ঝকঝকে ও সাজানো। পুরাণ ও মহাভারতে মানা গ্রামের মানুষকে বলা হয়েছে মার্চা বা গন্ধর্ব জাতি।

মানা গ্রামের পাশেই কয়েকটি প্রসিদ্ধ গুহা আছে। গ্রামের সামান্য উপরে ব্যাস-গুহা। মহামুনি ব্যাসদেব এখানে বসে বেদ বিভাগ করেছিলেন। পাশেই গণেশ গুহা। গণেশ

ব্যাসদেবের মুখ-নিঃসৃত বেদবাণী দ্রুত লিখন করেছিলেন। কিছুটা দূরে মুচকুন্দ গুহা। মুচকুন্দ এখানে তপস্যা করেছিলেন। গুহাটি বেশ বড়সড়। যাত্রাপথে এগুলি দর্শন করতে গিয়ে কিছুটা মূল্যবান সময় খরচ হয়ে গেল। কিন্তু এগুলি না দেখেও যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না।

আজ স্বর্গারোহণী পথে প্রথম রাত্রি লক্ষ্মীবনে কাটাতে হবে। যেমন করেই হোক, সন্ধ্যার পূর্বে সেখানে পৌঁছতেই হবে। হাঁটার গতি বাড়ালাম। ভীমপুলের কাছে এলাম। কথিত আছে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জ্ঞাতিহত্যার অনুশোচনায় দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব হিমালয়-তীর্থ পর্যটনে ও মহাপ্রস্থানে স্বর্গারোহণীর পথে যাত্রা করেন। সেই সময় মানা গ্রাম পার হয়ে অনতিদূরে সরস্বতী নদী পার হওয়ার সময় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন কয়েকটন ওজনের একটি পাথরের বোল্ডার ফেলে পুল তৈরি করেন যার উপর দিয়ে পাণ্ডবেরা নদী পার হয়ে যান। তাই এটি ভীমপুল নামে খ্যাত।

ভীমপুল পার হয়ে লক্ষ্মীবনের পথ ধরলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে সংকীর্ণ পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। ডান দিক দিয়ে খরস্রোতা অলকানন্দা গর্জন করতে করতে চলেছে। লক্ষ্মীবনের বেশ কিছুটা পথ ছোট ছোট রঙ-বেরঙ-এর ফুলে ভরা। প্রায় দুঘণ্টা পর একটি জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে পাহাড়ের এক ভয়াবহ ধ্বস নেমেছে। ধ্বস দেখে আমার মনও ধ্বসে গেল। কেমন করে যাবার উপায় হবে বুঝতে পারছি না। যাইহোক, উপায়ের ভাবনা হায়াৎ সিং-এর। আমার ভেবে লাভ নেই। হায়াৎ সিং বলল—'বাবুজী এখানে একটু বসুন।' একটি বড় পাথরের উপর আড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি হলো। এইরকম পরিবেশে এক কাপ গরম চা খেয়ে কিছুটা ক্লান্তি দূর হলো। প্রায় এক ঘণ্টা পর অলকানন্দার জলে খিচুড়ি তৈরি হলো। খিচুড়ি খেয়ে ও অলকানন্দার সুমিষ্ট জল পান করে আবার রওনা দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ অলকানন্দার ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পর খুব খাড়া একটি পাহাড় অতি কষ্টে অতিক্রম করে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার অগ্রসর হলাম। কিছুদূর গিয়ে এক বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। যেন সবুজ ঘাসের কার্পেট পাতা। আর কিছুদিন পর বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে। নভেম্বর মাসের প্রথমেই এই বিস্তীর্ণ সবুজ সমতলভূমি বরফে সম্পূর্ণ ঢেকে যাবে। মনে হচ্ছে সুকোমল সবুজ ঘাসের বিছানার ওপর শুয়ে পড়ি। এখান থেকে অলকানন্দার অপরপারে সুদীর্ঘ পাহাড়ের শীর্ষ হতে নির্গত 'বসুধারার' দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। সুউচ্চ পাহাড়ের মাথা থেকে এই ঝরনাধারাটি নেমে আসছে—যেন মনে হয় আকাশ থেকে পড়ছে। তাই এই ঝরনাধারাটি 'আকাশগঙ্গা' নামেও খ্যাত। পাহাড়ের শীর্ষ হতে ঝরনাধারাটি পাহাড়ের গাত্র স্পর্শ না করে যখন নিচে পড়ছে, তখন জলধারাটি ভেঙ্গে একেবারে বাষ্পাকারে জলকণার মতো পড়ছে। বসুধারা যেখান হতে নেমে আসছে, সেখানে পাহাড়ের শীর্ষে আটটি ধারা আছে। ধারাগুলির নাম—ধ্রুব, ধার, সোম, অনিল, অনল, প্রদ্যুৎ, প্রত্যুষ ও প্রভাস। এই আটটি ধারার জলধারাই বসুধারা বা আকাশগঙ্গা। দেবর্ষি নারদ এখানে তপস্যা করেছিলেন।

বসুধারার দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। সন্ধ্যার আগেই লক্ষ্মীবন পৌঁছতে হবে। বসুধারাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। বারে বারে পিছন ফিরে বসুধারাকে দেখেও যেন আশা মিটছে না। পথ হাঁটছি, আর পিছন ফিরে ফিরে বসুধারাকে এক পলক দেখে নিচ্ছি। লক্ষ্মীবন পর্যন্ত পায়ে চলার পথরেখা পাওয়া যায়। তারপর পথরেখা তো দূরের কথা, দিশাহারার মতো চলতে হবে। কঠিন পথ কাকে বলে এর পর আগামীকাল থেকেই টের পাওয়া যাবে।

বেলা প্রায় গড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার ঝিকিমিকি আলোয় পৌঁছালাম লক্ষ্মীবন। এখানে রাত কাটাবার মতো কয়েকটি গুহা আছে। লক্ষ্মীবনে জুনিপার ও ভুজবৃক্ষের জঙ্গল আছে। নানান জাতের ফুলও দেখতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে

এল। গুহার মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে বসে হিমালয়ের নিস্তব্ধতার রূপ অনুভব করছি। গুহার মুখে হায়াৎ সিং তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রান্নাবান্না করছে। মাঝে মধ্যে মনের আনন্দে গান গাইছে। এরই ফাঁকে চানাচুরের সঙ্গে এক কাপ কফি পেয়ে মনটা তৃপ্তিতে ভরে গেল। রাত প্রায় আটটা নাগাদ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে গুহার মধ্যে শুয়ে পড়লাম।

ভোরের আবছা অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়লাম। চা তৈরি। কঠিন ঠাণ্ডায় দাঁতমাজা, মুখধোয়ার বালাই নেই। ঠাণ্ডা জল দাঁতে দেয় কার সাধ্য! এক গ্লাস করে চা খেয়ে রওনা দেওয়া হলো। পাহাড়ের রীজ ধরে হেঁটে চলেছি। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট জুনিপার গাছ। মাঝে মধ্যে পা হড়কে যাবার ভয়। জুনিপারের ঝুঁটি ধরে নিজেকে রক্ষা করে চলেছি। লক্ষ্মীবন পার হয়ে এক মাইল পশ্চিমে ভগীরথ সড়ক গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ। হিমবাহের উৎস-মুখ থেকে তীব্র গতিতে জলধারা বেরিয়ে আসছে। এটাই অলকানন্দার উৎসস্থল। ভগীরথ সড়ক ধরে মাইল দুয়েক পশ্চিমে এগিয়ে গেলে কুবেরের পুরী—অলকাপুরী। দূর থেকে এই অলকাপুরীকে দেখে মনে হয় যেন এক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

এবার লক্ষ্মীবন পার হয়ে অলকাপুরী হিমবাহের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। পাহাড়ের রীজ ধরে হেঁটে চলতে যেমন গড়িয়ে পড়ে যাবার ভয় (আর গড়িয়ে পড়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু) তেমনি অলকাপুরী হিমবাহের উপর দিয়ে হাঁটার আর এক বিপদ! হিমবাহের ওপর শুধু বোল্ডার আর বোল্ডার। শুধু যেন বোল্ডারের সমুদ্র। এই বোল্ডারের সমুদ্র পার হওয়ার সময় অসাবধান হলেই মুখ থুবড়ে পড়ে দন্তবিহীন হতে হবে। চাই কি, হত-পা ভেঙে স্বর্গারোহণী বা যাত্রার এখানেই দফারফা! অতি সাবধানে পথ চলেছি। মাঝে মধ্যে স্মরণ হচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চ-পাণ্ডবদের কথা। এই পথে যুধিষ্ঠির ছাড়া সকলেই মহাপ্রস্থান করেছিলেন। জানি না, এখন আমার ভাগ্যে কী আছে! চার পাণ্ডবদের মতো মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে স্বর্গলাভ করব? কে জানে? আর তাতেই বা ক্ষতি কি? এখানে এভাবে মৃত্যু তো অতি পুণ্যের। তাছাড়া, মৃত্যুভয়ে পিছিয়ে গেলে কোনদিন কি স্বর্গারোহণী দেখা সম্ভব হবে?

বড় বড় পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে চলেছি। পথের রেখা বলতে কিছুই নেই। কিছুদূর এগিয়ে নজরে পড়ল নীলকণ্ঠ পাহাড়। নীলকণ্ঠ পর্বত থেকে অজস্র ঝরনাধারা নেমে আসছে। এই জলধারাগুলিই সহস্রধারা নামে খ্যাত। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। সত্যিই এ পথে আসা খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয় হিমালয়ের রূপ। আরও কিছুটা এগিয়ে দেখলাম পাঁচটি অপরূপ জলপ্রপাত—পঞ্চধারা। পঞ্চধারাগুলি হলো প্রভাস, পুষ্কর, গয়া, নৈমিষ ও কুরুক্ষেত্র। ভগবান বিষ্ণুর আদেশে এই পঞ্চতীর্থের দেবতারা এখানে তপস্যা করেন। এই ধারাগুলি একত্রিত হয়ে নদীর আকারে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীটি পার হতে বেশ বেগ পেতে হয়। নদী পার হয়ে শিল-সমুদ্রের অর্থাৎ বোল্ডারের রাজত্ব শেষ হলো। এবার শুরু হলো মোরেন গিরিশিরা। এটি সম্পূর্ণ ঝুরো মাটির পাহাড়। দুই পাশ সম্পূর্ণ ঢালু। হাজার-হাজার ফিট খাদ! চলার একটু বেসামাল হলেই মৃত্যু। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখার উপায় নেই। পা হড়কে গেলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। কারণ যে বাঁচাতে যাবে তারও মৃত্যু অনিবার্য। মোরেন গিরিশিরা পার হলেই নীলকণ্ঠের রীজের ধারে খানিকটা সমতলভূমি। এই জায়গাটির নাম মাজনা বা চক্রতীর্থ। এখানে নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্রটি রেখে যোগাসনে বসেছিলেন। তাই এই জায়গাটির নাম চক্রতীর্থ। পাহাড়ের মাথা থেকে জায়গাটি দেখলে মনে হয় সম্পূর্ণ চক্রাকার। নামের সঙ্গে জায়গাটির সাদৃশ্য যথেষ্ট। এখানে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটি গুহা আছে। গুহাতেই রাতের মতো আশ্রয় নিলাম। লক্ষ্মীবন থেকে চক্রতীর্থের দূরত্ব তেমন নয়। মাত্র ৬/৭ মাইল। কিন্তু পথের দুর্গমতার জন্য সারাদিন কাবার হয়ে যায়। এই পথটুকু অতিক্রম করতে শরীর পাত

হয়ে যায়। চক্রতীর্থের উচ্চতা ১৪,০০০ ফিট। চক্রতীর্থ থেকে মোরেন হিমবাহ অদৃশ্য হলেই কেবল তুষার ও বরফের রাজত্ব।

চক্রতীর্থ থেকে সতোপন্থের দূরত্ব তিন মাইল। সময় লাগে চার ঘণ্টা। একটার পর একটা কঠিন চড়াই পথ ভেঙে ভেঙে হেঁটে চলেছি। জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে একের পর এক পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি। মেঘে ঢেকে গেলাম। মেঘের মধ্যে দিয়েই হেঁটে চলেছি। ঝিরঝিরে হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। মাঝে-মধ্যে দমকা হাওয়া। হাতে না গলিয়ে ওয়াটার প্রুফটা মাথায় দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় বর্ষাতিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। হায়াৎ সিং অনেক কষ্টে বর্ষাতিটা কুড়িয়ে নিয়ে এল। বৃষ্টি থামল ; কিন্তু শুরু হলো বালুকণার মতো ঝুর ঝুর করে শিলাবৃষ্টি। থামবার উপায় নেই। তাই তুষারপাতের মধ্যেই হেঁটে চলেছি। বহু ক্লেশ স্বীকার করে জীবনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এগিয়ে চলেছি। মাঝে-মধ্যে দুর্বল মনে আশঙ্কা আসছে এখানেই মহাপ্রস্থানের পথে আমারও না জীবনের প্রস্থান ঘটে। মনটা শক্ত করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মনটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোনক্রমে টলতে-টলতে সতোপন্থ হ্রদের তীরে এসে পৌঁছলাম। এখানে থাকার মতো পাকা আশ্রয় আছে। একত্রে ১৫/১৬ জন যাত্রীর থাকতে কোন অসুবিধা হয় না। আমাদের মতো ছয়জন পাহাড়ী যাত্রী সতোপন্থ এসেছেন। তাঁরা এসেছেন সতোপন্থে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক কাজ করতে। সতোপন্থ হ্রদ তাঁদের কাছে বদ্রীনারায়ণের ব্রহ্মকপালের চেয়েও মাহাত্ম্যপূর্ণ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আমাদের দেখে পাহাড়ী মানুষগুলো তো অবাক। আমাদের সেবা ও মদত করবার জন্য এগিয়ে এলেন। আজ এঁদের ফিরে যাবার কথা ছিল। দুর্যোগ দেখে পথে বার হননি। সারা রাস্তা তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এখন যেন শরীরের ভিতরটা গুড়গুড় করছে, দাঁতে দাঁত লাগছে। যেন একটা লেপ গায়ে দিতে পারলে ভাল হয়। লেপ আর এখানে কোথায় পাব ? এক গ্লাস কফি খেয়ে কিছুটা আরাম হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার। হিমালয়ের আবহাওয়া এমনই মজার। দিনের আলো দেখা গেল। সতোপন্থের পথে এ যেন ঈশ্বরের সত্য পরীক্ষা। এই হ্রদ সত্যপথ নামেও পরিচিত। হ্রদটি ত্রিভুজাকৃতি। যেন একটা পানের মতো। হ্রদের জল নীলাভ ও বেশ গভীর। হ্রদের জলে পাশাপাশি তিনটি ছোট পাহাড়ের ঢিপি। দেখলে মনে হয় পবিত্র হ্রদের জলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জাগ্রতভাবে অবস্থান করছেন। আজকের রাতটা আমরা সবাই একই পরিবার। বন-ভোজনের মতো রাত্রে একসঙ্গে রান্নাবান্না হলো। একসঙ্গে সবাই মিলে আনন্দে রাতের আহার সেরে সতোপন্থের তীরে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

অবশেষ রাত শেষ হলো। আমরাও কম্বল-মুড়ি ছেড়ে উঠলাম। হায়াৎ সিং স্টোভ জ্বেলেছে। চা খেয়ে ঘরের বাইরে এলাম। আমাদের কপাল ভাল। আজ আকাশ পরিচ্ছন্ন। চা খেয়ে পাহাড়ী লোকেরা বদ্রীনাথের পথে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা দিলেন। লোকগুলি হায়াৎ সিং-এর পরিচিত। দুদিনের কঠিন দুর্গম পথ পার হয়ে এবং গতকালের দুর্যোগপূর্ণ তুষারপাতের মধ্যে হেঁটে এখন আমার মনের জোর অনেক বেড়ে গেছে। কনকনানি ঠাণ্ডা হলেও হ্রদের জলে স্নান করে হ্রদের জলে দণ্ডায়মান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে প্রণাম করে, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম।

হায়াৎ সিং স্টোভে দিনের খাবার তৈরি করছে। এই ফাঁকে আমি হ্রদটি পরিক্রমা করে নিলাম। হ্রদটির পরিসীমা প্রায় ছয় ফার্লং। উচ্চতা ১৫০০০ ফিট। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বর্গারোহণী পথে যাত্রা করতে হবে। হায়াৎ সিং ঝাল ঝাল মুখরোচক আলুর দম ও সুজির হালুয়া বানিয়েছে। পরিতৃপ্তি সহকারে আলুর দম ও হালুয়া খেয়ে রওনা দিলাম স্বর্গারোহণীর পথে। সতোপন্থ হতে স্বর্গারোহণী মাত্র চার

কিঃ মিঃ পথ। পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। সম্পূর্ণ পথটি ফলার মতো গিরি-শিরার পথে হেঁটে যেতে হয়। ঝুরঝুরে মোরেন পাহাড়। পাহাড়ের দুই ধার সম্পূর্ণ ঢালু। দুইপাশে হাজার হাজার ফিট খাদ। ফলার মতো গিরি-শিরার পথে অত্যন্ত সাবধানে পথ অতিক্রম করে চলেছি। ভয়ে বুক দুরদুর করছে। মাঝে-মধ্যে পা হড়কে যাচ্ছে। নার্ভ ফেল করছে। ত্রাহি মাং মধুসূদন! ভয়ে মুখ শুকিয়ে আমসি। এমত অবস্থায় পিছিয়ে আসারও উপায় নেই। কারণ একই বিপদ। অতএব মনকে শক্ত করে এগোতেই হবে।

কিছুদূর যাওয়ার পর সোমকুণ্ড কাছে না গিয়ে দূর থেকেই সোমকুণ্ড দর্শন করলাম। সোমকুণ্ড থেকে আরও এক মাইল পথ। অতি সাবধানে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছি। বারে বারে পা হড়কে পড়ে যাবার উপক্রম। আর বুঝি শেষ রক্ষা হয় না। স্বর্গারোহণী পৌঁছতে না পেরে এখানেই না পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে পড়ে স্বর্গলাভ হয়! দূরে বরফাবৃত স্বর্গারোহণী পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখনো এক মাইল পথ বাকি। আর যেন পারছি না। বদ্রীনাথজীকে স্মরণ করে মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করছি। প্রায় এক ঘণ্টা পর—ভয়-ভীতি-দুর্ভাবনার পাহাড় মনের মধ্যে নিয়ে দুর্গম গিরিশিরা লঙ্ঘন করে অবশেষে স্বর্গারোহণী হ্রদের তীরে পৌঁছলাম। ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে, আজকের এই পথে বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি হলে কোন মতেই এই দুর্গম গিরিপথ লঙ্ঘন করা সম্ভব হতো না।

স্বর্গারোহণী পাহাড়ের কোলে লম্বাকৃতি বড় হ্রদ। হ্রদের তীরে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট নানান রঙের ফুল ফুটে আছে। হ্রদের জলে ফুরফুরে মৃদু-মন্দ বাতাসের জন্যে তির তির করে ঢেউ খেলছে। ছোট ছোট হাঁসের মতো পাখি জলে চড়ে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে বরফাবৃত গিরিশৃঙ্গ। গিরিশৃঙ্গগুলি স্বর্গারোহণীর হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে এক অপরূপ রূপের শোভা সৃষ্টি করেছে। হ্রদটি সূর্যকুণ্ড নামেও অভিহিত। স্বর্গারোহণী পাহাড় বরফে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। হিমানী সম্পাতের কারণে স্তরে স্তরে বরফ জমে সিঁড়ির মতো হয়ে উপরে উঠে গেছে—অনন্তলোক। কিংবদন্তী—এই পথ বেয়েই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেছিলেন বা মহাপ্রস্থান করেছিলেন। পথ দেখিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন কুকুরবেশী ধর্ম। যুধিষ্ঠিরের অটুট মনোবল, তপস্যা ও নিষ্ঠায় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে ইন্দ্র স্বয়ং রথ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে সুরলোকে নিয়ে যাবার জন্য। ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে রথে আরোহণ করতে অনুরোধ করলেন ; কিন্তু যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুকুরটিকেও রথে নিতে চাইলে ইন্দ্র রাজি হলেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাকে না নিলে যাবেন না বললেন। এটি যুধিষ্ঠির শেষ পরীক্ষা। কিন্তু প্রতিবারের মতো তিনি এই পরীক্ষাতেও সহজেই উত্তীর্ণ হলেন। দেখা গেল আর কেউ নন, ছদ্মবেশে ধর্ম স্বয়ং। তখন ইন্দ্র ও ধর্মের সঙ্গে রথে আরোহণ করে যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অটুট ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও সর্বাঙ্গীণ চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্যের জন্য সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। তিনি স্বর্গারোহণী পর্বতের বরফাবৃত সিঁড়ি বেয়েই কি অনন্তলোক বা স্বর্গলোকে পৌঁছেছিলেন?

হ্রদের তীরে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো। স্বর্গারোহণীতে চাঁদনী রাত আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চারিদিকের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। এমন ভাবময় মায়াময় প্রাকৃতিক পরিবেশ আর কখনো দেখিনি। আহা! যা দেখলাম, কোনদিনই তা ভুলব না। এমন স্বর্গীয় ভাবঘন পরিবেশে অবস্থানের অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমার নেই। তাই যা দেখলাম আমার মানসপটেই চিত্রিত করে রাখলাম। সেই অপূর্ব স্বর্গাস্বাদ পাঠককে দিতে পারছি না বলে সত্যিই আমি দুঃখিত। সত্যিই, এ যেন অপূর্ব স্বর্গরাজ্যই! স্বর্গে পৌঁছে কে আবার মর্তে ফিরে যেতে চায়! কিন্তু ফিরতে যে হয়ই।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৬ ॥

আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলাম, আর হাসিমাখা মুখ দেখিতে লাগিলাম। বাড়িতে থাকিতে সে কখনো আমার সঙ্গে কথা বলিত না, কেবল হাসিত। তাহার সেই লজ্জামাখা হাসি আমার বড় মিষ্ট লাগিত; আমি কেবল তাহার হাসিই দেখিতাম, কথা কখনো শুনি নাই।—ও যে এত কথা বলিতে পারে, তাহাও জানিতাম না। তাহার হাসি দেখিয়া, আর কথা শুনিয়া আমার যেন অর্ধেক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল।—গাছের তলায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ পাইতে বসিলাম। সেখানে যে দু-একজন উপস্থিত ছিল, তাহারাও প্রসাদ পাইল, আমরাও পাইলাম। তবুও সে প্রসাদ যেন অফুরান। আমার উদর একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার শাশুড়ীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম—তাঁহারা এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে মনে করিয়া পাগলের মতো হইয়াছেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া, আর আমাকে তাহার সঙ্গে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে তিরস্কার করিবার কথাও ভুলিয়া গেলেন। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহারা অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমাতে তো আর আমি ছিলাম না, কেমন করিয়া যাইব? সেদিন কোথা দিয়া যে দিবারাত্র গিয়াছে, সে জ্ঞান আমার ছিল না, কেবল সেই একটি মাত্র কথাই মনে ছিল,—সেই তাঁর হাতে করে প্রসাদ বহিয়া আনিবার কথা!—তুমি,—তুমি আমার কত যত্নের নিধি—তুমি কিনা হাতে করে প্রসাদ বয়ে আনলে! তা তোমার বহিবার অভ্যাস কিছু নূতন নয়—গোয়ালার ছেলে, দুধের ভার তো চিরদিনই বহিয়াছ। দুধের ভার কেন, কোন্ ভার বা না বহিয়া থাক? নদীতে যেমন একই জলে ঢেউ-এর উপর ঢেউ উঠে, তেমনি সেই একই কথার নূতন নূতন করে ঢেউ উঠছে আর সকল অঙ্গে কদম ফুলের মতো কাঁটা দিয়ে উঠছে। দুই চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়ছে,—কেন কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি, সে বুদ্ধি তখন হারিয়ে গেছে। শেষে সব বুদ্ধিই হারিয়ে গেল, দিন রাত্রির জ্ঞান হারিয়ে গেল, কেবল জড়ের মতো পড়েছিলাম। আজ আমি বলতে বলতে আবার সব ভুলে যাচ্ছি।—কি বলব, কার কথা বলব? জীবনের কথা বলতে গেলে, সেই এক কথাই বার বার আবৃত্তি করতে হয়। কেবল শ্যামসুন্দর! শ্যামসুন্দর!! শ্যামসুন্দর!!! এছাড়া আর আমার বলবার কোন কথাই নাই।—আমার কথা আমি কেমন করে বুঝিয়ে বলব, সে যে আমাকে একেবারে পাগল করে দেয়, বুঝিয়ে বলবার মতো বুদ্ধি আর আমার থাকে না।

কাশীতে আর একদিন—সে বেশিদিনের কথা নয়—আমার জ্বর হয়ে ভারী অরুচি হয়েছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, "একটু যদি লেবুর আচার পাই, তবে দুটি ভাত খেতে পারি। হিন্দুস্থানীরা বেশ আচার করে, এখন অরুচির মুখে বোধ হয় ভাল লাগত।" ভোর বেলায়—তখনও রৌদ্র উঠে নাই, দেখি যে শ্যামবিহারী খালি পায়ে একটা ভাঁড় হাতে করে দুয়ারে এসে উপস্থিত। শ্যামবিহারী জাতিতে ক্ষত্রিয়, কাশীতে ডাক্তারী করে, প্রণবাশ্রমে যাওয়া আসা করিত, সেখানে তাহার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এই ভোরে, খালি পায়ে ভাঁড় হাতে করে শ্যামবিহারী আমার দুয়ারে কেন, এই কথা মনে করছি, এমন সময় শ্যামবিহারী ভাঁড় নিয়ে এসে

আমার কাছে রাখলে, ভাঁড়ে লেবুর আচার, জারক, লেবু, আরও নানারকম আচার। শ্যামবিহারী ভাঁড় নামিয়ে খুব বিনয় করে বললে, "মাতাজি, আমি শোলিতে (শুদ্ধবস্ত্রে) এই আচার এনেছি, আপনি দয়া করে গ্রহণ করবেন।" আমি আচার দেখে কি যেন হয়ে গেলাম, শ্যামবিহারীকে আর দেখতে পেলাম না, দেখলাম—যেন শ্যামসুন্দর নিজে ভাঁড় হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন।

একথা বললে লোকে আমাকে পাগল বলে মনে করবে। ছেলেবেলায় একবার মেমের কাছে বলেছিলাম, —"মাটির ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য;" আজ আবার বলছি—শ্যামসুন্দর যে নিজে হাতে করে আচার এনেছিলেন, একথাও তেমনি সত্য, সত্য, সত্য! এখন যখন বেদান্ত পড়ি, আর ভাবি—ভাঁড়ও নাই, আচারও নাই, শ্যামবিহারীও নাই, কেবল শ্যামসুন্দর আছেন। আমিও নাই, তুমিও নাই, এক ছাড়া কিছুই নাই—তখন সৃষ্টিপ্রপঞ্চ কুয়াসার মতো সূর্যালোকে মিলিয়ে যায়; কিন্তু তখনই যদি শ্যামসুন্দরের সেই আচারের ভাঁড় হাতে করে নিয়ে আসার কথা মনে পড়ে, সে কি মিথ্যা বলে, মায়া বলে মনে হয়? সে যে প্রত্যক্ষ সত্য। সেই এক ছাড়া দুই আর কিছু নাই—এ যেমন সত্য, সে আচারের ভাঁড় নিজে হাতে নিয়ে এসেছিল, সেও তেমনি সত্য, দুই-ই এক সঙ্গে সত্য। এর কোনখানে মায়ার নামগন্ধ নাই।

সেদিন রাত্রে স্টেশনে যে মিছরীর সরবতে আমার পিপাসা-শান্তি হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট অমৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাহার আস্বাদও যেন অমৃতের মতো, আর অমৃতের মতোই—এতক্ষণ যে শরীর আমার বোঝা হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে আবার নূতন শক্তি আনিয়া দিল। সরবত খাইয়া আমার মনে হইল যে, এখন আমি অনায়াসে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাইতে পারি। সরবতের ঘটি আমার কাছে রাখিয়া স্টেশন মাস্টার চলিয়া গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা, তুমি এমনভাবে একা পথে বাহির হয়েছ?" এমনভাবে সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার সেই বাৎসল্যমাখা-স্বরে আমার আবার ছেলেবেলার কথা, বাবার কথা মনে গেল। স্টেশন মাস্টারের নাম হরিবাবু; পরে তাঁহার নাম জানিয়াছিলাম, এখনও আমার সে নাম মনে আছে।

স্টেশন মাস্টার যে টিকিট দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকদূর পর্যন্ত পথ চলিবার ভাবনা আর ভাবিতে হয় নাই। পথে মাঝে মাঝে হাঁটিয়া চলিবার কথা ভাবিয়াছি, কিন্তু আমাকে এক পাও হাঁটিয়া চলিতে হয় নাই। বৃন্দাবনের কাছাকাছি একটা বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হয়, সেখান হইতে ভাড়া দশ আনা কি বারো আনা পয়সা। সেখানে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন আর হাঁটিয়া যাইবার কথা মনে স্থান পাইল না, তখন মনে হইল, আমি যেন পাখির মতো এই মুহূর্তেই উড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতে পারি। ট্রেন আসিয়া এখনই চলিয়া যাইবে; আমার টিকিট নাই, টিকিট কিনিবার মূল্যও নাই। এইটুকু পথ মাত্র, এতদূর আসিয়া এখানে আর বিলম্ব আমার কোন মতেই সহিল না। জীবনে আমি সেই প্রথম ভিক্ষার্থিনী হইলাম। প্রথম ভিক্ষার্থিনীও বটে, শেষ ভিক্ষার্থিনীও বটে; আর কখনো আমাকে ভিক্ষা চাহিতে হয় নাই। স্টেশনে অগণ্য লোক যাতায়াত করিতেছে—তাহাদের সকলের নিকটেই আমি আজ ভিক্ষার্থিনী, কে এমন দয়ালু আছে যে, আজ আমার বৃন্দাবন পৌঁছিবার পাথেয় দিয়া প্রাণ বাঁচাইবে? আমার সম্মুখ দিয়া গাড়ি চলিয়া যাইবে, আমি যদি যাইতে না পারি, তবে —মনে হইতেছিল, গাড়ির চাকার তলায় পড়িয়া এখনই শরীরের ভার হইতে মুক্ত হইব। আমি সেই জনসঙ্ঘের নিকটে জোড় হাতে বলিলাম, "বাবা, দয়া করিয়া তোমরা কেহ আমার টিকিট কিনিয়া দাও, আমি বৃন্দাবন যাইব।" আমার কথা শুনিয়া সেই লোকের ভিড়ের ভিতর হইতে একজন হিন্দুস্থানী যুবক আসিয়া তখনই ভাড়ার কয়েক আনা পয়সা আমার হাতে দিল। সেই যে কয়েক আনা পয়সা, তখন আমার কাছে তাহার যে মূল্য, দরিদ্রের নিকট মহামূল্য রত্নের মূল্যও তাহা অপেক্ষা অধিক নয়। ভিক্ষাদাতাকে যেন আমার বরদাতা দেবকুমার বলিয়া মনে হইল।

আমাকে পয়সা দিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৃন্দাবনে তোমার কে আছে? সেখানে কি তোমার কোন পীড়িত আত্মীয়কে দেখিতে যাইতেছ?" আমি

বলিলাম, "না বাবা, আমি কানাইলালের দর্শনে যাইতেছি।" সে আমার কথা শুনিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, "কানাইলাল? সেই নন্দ গোয়ালার ছেলে? সে তো চোর আর লম্পট। মূর্খেরাই তাহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে। তাহার জন্য কেন এত কষ্ট করিতেছ?" তাহার এই কথা শুনিয়া আমার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যেন আগুন ছুটিয়া গেল। "এই নাও তোমার পয়সা" বলিয়া তাহার পয়সাগুলি তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। তখন চারিধারে বেশ একটু ভিড় জমিয়া গেল, গোলমাল হইতে লাগিল। এই সময় একজন বাঙালী ভদ্রলোক "মা, তোমার টিকিট নাও" বলিয়া একখানি টিকিট আনিয়া আমার হাতে দিলেন। দিয়া বলিলেন, "কেন মা, অবোধের উপর রাগ করিতেছ? ওরা মূর্তি-পূজাদ্বেষী, ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক করিবার সুবিধা পাইলে ওরা আর সহজে ছাড়ে না। ওদের স্বভাবই ঐ রকম।" যিনি টিকিট দিলেন, লজ্জায় আমি আর তাঁহার মুখের দিকে যেন চাহিতে পারিলাম না। গাড়িতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কেন আমি লোকের কাছে হাত পাতিয়াছিলাম! আমার নিজের যে কি প্রয়োজন আমি তারই বা কি জানি? তুমি যদি না নিয়া যাইতে, বৃন্দাবনে কি আমি নিজের চেষ্টায় আসিতে পারিতাম? এতদিন আমি যে কখনো কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করি নাই, তাহাতে কবে আমার কি অভাব হইয়াছে? আজ এমনই পাগল হইয়াছিলাম যে, তোমাকেও ভুলিয়া গেলাম? আমার এ শাস্তি হইবে না কেন? ও ব্যক্তির কি দোষ, আমি যখন তাহার নিকট অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়াছি, তখন সে তো আমায় যাহা ইচ্ছা বলিতেই পারে।" সেইদিন গাড়িতে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, "এ জীবনে আর লোকের নিকট আঁচল পাতিব না।" ঠাকুর আমার সে প্রতিজ্ঞা আজ পর্যন্ত অটুট রাখিয়াছেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। পথে চলিতেছি আর পথের ধুলায় পড়িয়া প্রণাম করিতেছি। পথের ধুলাসকল গায়ে মাখিতেছি, আর চোখের জলে কেবলই ধুলো ভিজিয়া যাইতেছে। "জয় জয় বৃন্দাবন, জয় জয় গোবর্ধন, জয় জয় যমুনা," পাগলের মতো এইসব কত কি বলিতেছি, আর পথে চলিয়াছি। সে যে আমার কি দিন—সে আনন্দ কি আর পাইব? কোথায় যাইতেছি—কোথায় যাইব, সেসব কিছুই মনে নাই, কেবল চলিয়াছি। যত গাছ দেখি, সবই তমাল-তরু মনে হয়; পাতা দেখি আর মনে হয়—এ ব্রজের নব-কিশলয়। এক একবার গাছের তলায় গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি—তখন ভাবি, আমার নন্দদুলাল বুঝি এই গাছে উঠিয়া খেলা করিতেছেন। যেন পাতার ভিতর হইতে রাঙা নূপুর পরা পা দুখানা ঝুলিতেছে। এই যে সব পথ হয়তো ব্রজদুলাল বাঁশী হাতে করে গরুর পাল নিয়ে এই পথ দিয়াই গিয়াছেন। পথে বোধ হয়, এখনও গরুর ক্ষুরের চিহ্ন আছে। এই সেই বৃন্দাবন, সত্য সত্য বৃন্দাবন, আজ আর আমার স্বপ্ন নয়। "চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।"

গোবিন্দের মন্দির কোথায় সে-কথা আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। মনে জানি, ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে আনিয়াছেন, নিজেই ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। দুইদিন কিছুই খাই নাই। জানি, নিশ্চয়ই ঠাকুর ডাকিয়া নিয়া গিয়া প্রসাদ দিবেন। "তুমি যদি নিজে ডাকিয়া প্রসাদ না দাও, আমি আর কিছুই খাব না, না খাইয়া মরি সেও ভাল।" ভাবিয়া একটি নির্জন-স্থানে গিয়ে বসিয়া রহিলাম। সে জায়গাটির নাম যষ্ঠীর বন। ক্রমে সেই নির্জন বনে অনেক লোক-সমাগম হইতে লাগিল, সবই প্রায় যাত্রীর দল। কত আসিতেছে, কত যাইতেছে। কেহ আসিয়া দুটি একটি করিয়া পয়সা দিয়া প্রণাম করিতেছে। আমি নির্বাকভাবে বসিয়া আছি। আবার কেহ কেহ আসিয়া আমার সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি মূর্খ, কোন প্রশ্নের অর্থই বুঝি না, কিন্তু তখন যে কেমন করিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছি, নিজেই কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একজন, দুইজন, ক্রমে অনেকে আসিয়া দাঁড়াইল, শেষে যেন একটি বিচার-সভা বসিয়া গেল। যে যাহা বলিতেছে, আমি তাহারই উত্তর দিতেছি।*

[ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন ১৫শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৯, পৃঃ ১০২-১০৪, ১৪২-১৪৫

মাধুকরী

নরদেবতা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

দেবতা, গুরু, সখা, মিত্র, বন্ধু—আমাদের সর্বস্ব—যখন আসিয়াছ, তখন যুগান্তরে যেমন পার্থসারথি হইয়া এই মরধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তেমনি আমাদের বড় সাধের মনোরথে সমাসীন হইয়া পুনরায় উহাকে পরিচালিত কর—দেবতা। তোমার অমৃত-বাণীতে আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব—তোমার আশ্বাস পাইয়া আবার ধর্মক্ষেত্রে—এই ভারতক্ষেত্রে সমবেত হইব। দ্বাপরের শেষভাগে পার্থের রথ পরিচালনা করিয়াছিলে—আজ হে ব্রাহ্মণরূপী নর-দেবতা, এই সমাজরথকেও তুমি অগ্রগামী করিয়া দাও। গো-ব্রাহ্মণের বড় দুর্দিন, বেদবাণী অজ্ঞাত, মহান তুমি অণু হইয়া মর্ত্যের মানবরূপে তোমার চির-আদরের ধর্মকে রক্ষা কর। তাই দয়াময়, আজ বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ নরনারী তোমায় করজোড়ে আহ্বান করিতেছি।

তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আমাদের শ্রদ্ধার আসনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। তুমি না রাখিলে আমাদের কে রাখিবে? তুমি পতিতের সংরক্ষণকারী—দুর্বলের বল। শ্রীরামকৃষ্ণরূপী নরদেবতা—দয়া করিয়া যদি অবতীর্ণ হইয়াছ, তবে তোমার সাধের ভারতভূমিকে ম্লেচ্ছ-দুর্গতি হইতে মুক্ত কর। যে আবর্জনায় সমাজ-প্রাঙ্গণ অপবিত্র রহিয়াছে—যে মলিন ছায়ায় সমাজগৃহ অস্পৃশ্য—অব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে, আমরা সেই ছায়া অপসারিত করিতে বাঞ্ছা করি। বাঞ্ছাকল্পতরু, পূর্ণ কর আমাদের বাসনা। দেবতা, তুমি—শক্তিময় তুমি- এমন শক্তি আমাদের দান কর, যাহাতে সমাজরূপী এই স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠাকে আমরা পরিশুদ্ধ করিতে পারি। আমাদের অঙ্গনে মায়ের চরণলেখামালা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সক্ষম হই।

ভাগীরথীতটে তুমি আসিয়াছ, গঙ্গার জলকল্লোল-গানে আমরা সেকথা শুনিতে পাইয়াছি। মর্মে মর্মে তোমার আগমনকে অনুভব করিয়াছি। সর্বৈশ্বর্যময় নিঃস্ব, বিরক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া তুমি আসিলেও তোমার চক্ষের ঐ প্রসন্ন দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি কে? তুমি নিরক্ষরতার ছলনা করিলেও অনুভব করিয়াছি, তুমিই সেই বেদগোপ্তা। নহিলে কাহার বাক্যামৃতে বেদ ও বেদান্তবাণী এমন করিয়া নিঃসারিত হয়? তুমি চির-শঠ। এবার ছলনা করিলেও তোমার চাতুরী যে ধরিতে পারিয়াছি দেবতা! তুমি রামকৃষ্ণ—একাধারে তুমিই কি রাম ও কৃষ্ণ নহ?

উঠ, উঠ, বাঙ্গালী! এই মাহেন্দ্রক্ষণে একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মি! তোমার শ্মশান-শয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলি-ধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ গ্রামের গ্রাম্য-দেবতাগণ! আর এস—বাঙ্গালী ভাই-ভগিনী, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, বৃদ্ধ-যুবা, বালক-বালিকা—আজ সকলে সম্মিলিত হইয়া এই অপূর্ব রামকৃষ্ণরূপী নর-দেবতাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি—যুগপূর্বে আমাদের যিনি দুষ্কৃত মোচন করিয়াছিলেন, ইনিই তিনি!*

সংগ্রহ: প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

* স্বরাজ, ফাল্গুন, ১৩১৪

কবিশেখর কালিদাস রায়ঃ তুলসীমঞ্চের সন্ধ্যাপ্রদীপ

পলাশ মিত্র

আজকের এই প্রচারসর্বস্ব যুগে কবি কালিদাস রায়ের (এঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হলো) জনপ্রিয়তা বা প্রচার কতটা ব্যাপক, সে-বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তাঁর 'ছাত্রধারা', 'ভাদুরানী এস ঘরে,' 'বৃন্দাবন অন্ধকার' এবং আরও কিছু কবিতার কথা বাঙালী কাব্যপাঠক বিস্মৃত হবেন কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণব-ভাবমূলক কবিতা এবং পল্লীজীবনই তাঁর কবিতার প্রধান উপাদান হলেও, "প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বদেশপ্রেম, বীরগণের শৌর্যাবদান, মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা, বাৎসল্যমাধুর্য, দাম্পত্যপ্রেম, ভগবদ্‌ভক্তি, নারীর সতীত্ব-গৌরব ও গৃহ-লক্ষ্মীত্ব, বীরাঙ্গনাদের আত্মাহুতি, গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ, বাঙালীর উৎসব আমোদ পূজাপার্বণ, বাংলা ও ভারতের সংস্কৃতি, শিক্ষকজীবন" প্রভৃতি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে।

কালিদাস রায়ের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও-বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।"১

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য পাঠ করলে কালিদাস রায়ের কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। মোহিতলাল লিখছেনঃ 'কালিদাসবাবু রবীন্দ্র-যুগের ছন্দোনৈপুণ্য মাত্র আশ্রয় করিয়া, প্রাচীন বাংলার কাব্যধারাটিকে নবীন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অলঙ্কারপ্রীতি যেমন সংস্কৃতের অনুরূপ, তেমনি সরল অকপট অনুভূতির সহিত অর্থগৌরব মিলিয়া তাঁহার কাব্যে খাঁটি Classical ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত তিনি তাঁহার কবিতাগুলিতে বাঙালীসুলভ ভাবাকুলতা এবং বাংলার পল্লী-জীবনের অন্তর-বাহিরের রূপমাধুরীও পরিবেশন করিয়াছেন ; প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবও অল্প নহে। এই সকল গুণের সমবায়ে কবি কালিদাসের কবিতা যেমন লোকপ্রিয়তা, তেমনি একটি সহজ স্বকীয়তা অর্জন করিয়াছে।"২

আসলে কালিদাস রায়ের দুটি ভঙ্গি—একটি ক্ল্যাসিকাল আর অন্যটি রোম্যান্টিক। আবার এক-দিকে বৈষ্ণববংশের উত্তরাধিকার এবং অন্যদিকে শিক্ষকজীবনের পরিমার্জিত রুচি, তথ্যানুসন্ধান ও যুক্তিবোধ তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। "বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে"-র মতো উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি অগণিত কাব্যরসিক বাঙালী পাঠক এই মুহূর্তে অতি সহজেই আবৃত্তি করবেন অথবা "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" দিয়ে শুরু সেই অবিস্মরণীয় কবিতাটি। বাঙলা ভাষায় যে কটি অসাধারণ কবিতা পাঠক-

---

১ কবিশেখর স্মৃতিরক্ষণ কমিটির পত্রিকা

২ উদ্ধৃত : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—কনক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬৮), পৃঃ ৫৩৯

মনে চিরকালের সম্পদ হিসাবে স্থায়ী আসন নিয়েছে, কালিদাস রায়ের একাধিক কবিতা সে-তালিকায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে কালিদাস রায়ের জন্ম। তারিখ ২২ জুন ১৮৮৯। তাঁর পিতৃ ও মাতৃকুল উভয়ই ছিল কাব্যধারায় স্নাত। সাধক পদকর্তা লোচনদাসের বংশে তাঁর জন্ম (পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং মাতা রাজবালা দেবী) আর উদ্ধবদাস ও গোকুলানন্দ সেন ছিলেন তাঁর মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ। কালিদাস রায়ের পিতা ছিলেন কাশিমবাজার রাজবাড়ির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কাশিমবাজারের প্রাকৃতিক পরিবেশ কালিদাস রায়ের কবিমনের সহায়ক হয়েছিল।

'ছাত্রধারা' নামক যে-বিখ্যাত কবিতার কথা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিছক কবিকল্পনার ফসল নয়। কবিশেখর কালিদাস রায় ছিলেন আজীবন শিক্ষক, বলা যায় 'শিক্ষকশেখর।' জীবিকারূপে তিনি শিক্ষাব্রতই অবলম্বন করেছিলেন এবং জীবনের পঞ্চাশটি বছর তিনি ছাত্রদের জন্যই উৎসর্গ করেছিলেন। 'ছাত্রধারা' কবিতায় তাই দেখি, শিক্ষকশেখর ও কবিশেখর কালিদাস রায় এক হয়ে গিয়েছেন। একটি কবিতার মধ্য দিয়ে দুটি হৃদয়নদীর এই অপূর্ব মিলন অন্যত্র দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

কালিদাস রায়ের সমকালীন কবিদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী (জন্ম ১৮৬৮), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮) এবং নজরুল ইসলাম (১৮৯৯)। "এঁদের মধ্যে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের মধ্যে কবিপ্রকৃতিগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকায় এঁরা 'কবি-চতুষ্টয়' নামে পরিচিত হয়েছেন।"[৩]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেনঃ "কালিদাসের কাব্যে প্রাচীন ভাবাদর্শের মর্মোৎসারিত সার্বভৌম মানবিক রসের উদ্বোধন ও সময় সময় শব্দৈশ্বর্যভারাক্রান্ত, অলংকারবহুল ভাষায় অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মুখ্য স্বরূপে অনুভূত হয়।"[৪]

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য সম্পর্কে অন্য বক্তব্য থাকতেই পারে। বিশেষ করে প্রতিবাদ জানাতে হয় 'শব্দৈশ্বর্যভারাক্রান্ত' কথাটির। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে। কালিদাস রায়ের কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেনঃ "তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙ্গিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"[৫]

আসলে বাংলা কবিতার মূল্যায়নে আমরা বহু সময়ে যথার্থ বিবেচনার পরিচয় দিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। কালিদাস রায় এবং কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই বিচারবিভ্রাট কিছুটা ঘটেছে বলে বর্তমান লেখক মনে করেন।

কালিদাস রায় দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন (মৃত্যু ১৯৭৫)[৬] এবং তাঁর ছিয়াশি বছরের জীবনসীমায় পর্ণপুট (১ম ও ২য়), ঋতুমঙ্গল, বল্লরী, চিত্তচিতা, লাজাঞ্জলি, রসকদম্ব, ক্ষুদকুঁড়া, ব্রজবেণু, বৈকালী, হৈমন্তী, পূর্ণাহুতি, তৃণদল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া আহরণ, আহরণী, সন্ধ্যামণি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দিন ফুরানোর গান, দন্তরুচি কৌমুদী প্রভৃতি কাব্য-সংকলনগুলির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

কবি কালিদাস রায় মননশীল প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসাবেও বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী। তাঁর 'পদাবলী সাহিত্য'-এর গ্রন্থ-পরিচিতিতে যথার্থই তাঁকে গদ্যে-পদ্যে

---

[৩] সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার—ক্ষেত্র গুপ্ত (১৩৬৮), পৃঃ ৩৮

[৪] বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (১৯৬৩), পৃঃ ১৯২

[৫] স্মৃতিরক্ষণ কমিটির পূর্বোক্ত পুস্তিকা

[৬] সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (১৯৭৬), পৃঃ ৬১৯ ; স্মৃতিরক্ষণ কমিটির পুস্তিকায় সাতাশি বছর বলা হয়েছে।

সমশক্তিসম্পন্ন লেখক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমশক্তিসম্পন্ন সব্যসাচীত্বেই যে তাঁর অনন্যসাধারণতা, সে-কথাও এখানে অনুক্ত থাকেনি।[৭] বলা হয়েছে, "কবি কালিদাস তাঁহার জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ কাব্যরসেই বিভোর ও কবি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশোর্ধ্বে তাঁহার কবিমন কাব্যরস-বিশ্লেষণের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে। এ যেন কাব্যরচনার প্রত্যক্ষ রাজৈশ্বর্যভোগ পরিত্যাগের পর তাহার পরোক্ষ রহস্য অনুধ্যানের পালা কবিজীবনে আবির্ভূত হইয়াছে।"[৮]

বস্তুতঃ প্রবন্ধ ও সাহিত্যসমালোচনার মাধ্যমে কালিদাস রায়ের যে-পরিচয় উদ্ঘাটিত হলো, তাতে বিস্মিত ও পুলকিত না হয়ে থাকা যায় না। তাঁর আলোচনার ধারা ছিল মাধুর্যমণ্ডিত। শুষ্ক পাণ্ডিত্যের নীরস তাত্ত্বিক আলোচনা নয় ; গুরুমশায়ের বেত্রদণ্ড আস্ফালনের নির্মম অরসিক প্রয়াস নয়; সৌন্দর্যমুগ্ধ এক কোমল কবিপ্রাণের মরমী উপস্থিতি তাঁর সাহিত্যসমালোচনাকে এক অনন্যসাধারণ দীপ্তি প্রদান করেছে। এসব কথা স্মরণ করেই বোধকরি উক্ত হয়েছেঃ "রচনার উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া কবি কালিদাস সমালোচক কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দিক দিয়া সমালোচকেরই প্রাধান্য।"[৯]

কালিদাস রায়ের 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' ও 'পদাবলী সাহিত্য' গ্রন্থ-দুটির কথা বিদগ্ধ পাঠক বিস্মৃত হবেন বলে মনে হয় না। তাঁর রচনা-পারিপাট্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের শান্ত করুণ আবেদন ও এর ভক্তিরসাশ্রিত সুগভীর অনুভূতিমালা রূপলাবণ্যে ভরে উঠেছে। এ ছাড়াও আছে সাহিত্যপ্রসঙ্গ, শরৎ-সাহিত্য, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ও গান নিয়ে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। কবিসুলভ সহানুভূতি এবং রসোপলব্ধির হরগৌরী-মিলনে তাঁর সমালোচনাসাহিত্যের দোসর মেলা ভার। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামেও তিনি লিখতেন।

সমাজ ও ব্যক্তিমানসের নানা সমস্যা ও অসঙ্গতি নিয়ে সমাজসচেতন কালিদাস রায় যে-রম্যরচনা ও কৌতুকনক্সা লিখেছেন, তার কথা না বললে এ-আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবি-প্রাবন্ধিক-সাহিত্যবেত্তা-শিক্ষাব্রতী-ছান্দসিক কালিদাস রায় এখানে এক অভিনব রসলোকের কারবারী। তাঁর চালচিত্র, রঙ্গচিত্র ও নির্বাচিত সরস গল্প এক স্বতন্ত্র আবেদনে পাঠকের মনোলোক আলোকিত করে। এমনকি 'আত্মকথা' কবিতায় নিজের সম্পর্কে যা লিখেছেন, তাতেও তাঁর রসবোধের পরিচয় মেলেঃ

আমি কবি কালিদাস রায়,
কেহ কবি বলে, কেহ বলে না আমায়।
ছাত্রেরা মানে না মোরে
শিখাইলে যত্ন করে
হয় হাই তোলে বসে, নয়তো ঘুমায়।

এবং তারপরেঃ

পারিশারে ফাঁকি দেয়,
মুদী ঠকে দাম নেয়
ডাক্তারের বারান্দায় বসে থাকি ঠায়
উৎসর্গ করিলে বই
বলে, জানি নাতো কই
পাঁচবার বই দিলে, তা-ও ভুলে যায়।

পাঠক এ থেকেই কালিদাস রায়ের রসবোধ ও সত্য ভাষণের স্বরূপ বুঝতে পারবেন। তাঁর 'ছাত্রসঙ্গীতে' এই সত্যের কথাই বলা হয়েছেঃ

মোরা—গাহি সত্যের জয়।
সদা—বরিব সত্যে, স্মরিব সত্যে, দুরিব মিথ্যাভয়।

মোহিতলাল মজুমদার যাকে 'প্রাণের তাগিদ ও মনের ক্ষুধা'[১০] বলেছেন, কালিদাস রায়ের মধ্যে

---

[৭] কালিদাস রায় ঃ পদাবলী সাহিত্য, ১৩৮৩

[৮] ঐ

[৯] ঐ

[১০] আধুনিক বাঙলা সাহিত্য (১৩৬৫), পৃঃ ২৫৫

তা যে ষোল আনার স্থলে আঠারো আনা ছিল, তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। তাঁর "কাব্য-জীবনের নিয়ামক শক্তি বৈষ্ণব প্রীতিরস, পল্লীবাংলার শান্ত মাধুরী, প্রেম ও প্রকৃতি" বলে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১১] যা লিখেছেন, তা যেমন যথার্থ, তেমনই মোহিতলাল-কথিত এই উক্তিটিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন, "প্রতিভাসম্পন্ন কবিমাত্রেই নিজের ভাষা নিজেই সৃষ্টি করেন।"১২

বলা বাহুল্য, কালিদাস রায়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কাব্যরচনায় কোনরকম বাহাদুরী নেবার প্রয়াস বা ইচ্ছা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। তথাপি নিজস্ব ভাব-ভাবনায় প্রাণের তাগিদে ও মনের ক্ষুধায় যে-জলমাটি যে-ফুলের পক্ষে অনুকূল, সেই জলমাটিতে সেই ফুলই ফোটাতে চেয়েছেন তিনি। বাংলার সারস্বত প্রাঙ্গণে নীরব পূজারীর সাধনাই তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানেই তাঁর অনন্যতা। মহৎ কবির মতোই কবিতার ভাষায় শব্দবিন্যাসের মধ্য দিয়ে চিত্র-সৃষ্টি ও তার অর্থ উদ্ঘাটন—যা ভাবের উপলব্ধিতে সহায়ক হয়: সেবিষয়ে কালিদাস রায়ের সচেতনতা ছিল পূর্ণমাত্রায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়"।১৩—কালিদাস রায়ের বহু কবিতা পড়লে রবীন্দ্রনাথের এই কথার যথার্থতা বোঝা যায়।

ছন্দোশাস্ত্রের নীতিরক্ষার্থে নয়, কবিতার সঙ্গীতধর্ম রক্ষার জন্যই ছন্দোপ্রয়োগ করার কথা এজরা পাউন্ড যেভাবে বলেছেন,১৪ কালিদাস রায়ের কবিতা পড়লে তারও সার্থকতা নজর এড়ায় না। কবি যা বলতে চান তা যদি পরিষ্কার করে বলতেই না পারেন, তাহালে শব্দের সার্কাস ছাড়া পাঠক আর কিছুই পাবেন না। এজরা পাউন্ড তাঁর 'দি সিরিয়াস আর্টিস্ট' প্রবন্ধে জানিয়েছেনঃ "Good writing is writing that is perfectly controlled, the writer says just what he means. He says it with complete clarity and simplicity."১৫ এই complete clarity এবং simplicity কালিদাস রায়ের কবিতার সম্পদ। এবং সে কারণেই আপাত কোনও প্রশংসার ছাড়পত্র কালিদাস রায়ের জন্য প্রয়োজন হয় না। শঙ্করীপ্রসাদ বসু যথার্থই বলেছেনঃ

> "নিপুণ শব্দে ও ছন্দে রচিত দেশ-সংস্কৃতির প্রাণরসে পূর্ণ তাঁর [কালিদাস রায়] কবিতা 'আধুনিক' শব্দটির জন্য কাতর ছিল না, কিন্তু তা বহুক্ষেত্রে কবিতা—তাও অস্বীকার করা যায় না।"১৬

বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্যপ্রবাহের দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষদর্শী কালিদাস রায়ের মজলিসী সত্তার পরিচয় বহু নন্দিত। 'রসচক্র সাহিত্যসংসদ' তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর কর্ণধার। সেই সময়কার স্মৃতিকথা তাঁর 'শরৎসান্নিধ্যে' গ্রন্থে বিধৃত আছে।

কবিখ্যাতির জন্য বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। যদিও এর সবগুলিই প্রায় শেষ বয়সে তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তথাপি তাঁকে সম্মানিত করে দেশ ও জাতিই ধন্য হয়েছে। ১৯৬৩-তে আনন্দ পুরস্কার ও ১৯৬৮-তে 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান তিনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী ও সরোজিনী স্বর্ণপদক, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি· লিট. এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মরণোত্তর ডি· লিট. সম্মানে ভূষিত করেন।

---

১১ বাঙলা সাহিত্যেব সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১৩৯২), পৃঃ ৫০৫

১২ আধুনিক বাঙলা সাহিত্য

১৩ সাহিত্যেন তাৎপর্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পঃ বঃ সরকার, পৃঃ ৭৩৮

১৪ Literary Essays of Ezra Pound, p. 3, p. 50. ১৫

১৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৭ম খণ্ড (১৯৮৮), পৃঃ ৬১৬

বৈষ্ণবকবি লোচনদাসের এই উত্তরপুরুষের ধমনীতে ছিল বৈষ্ণবতা। ছিল দেশ ও জাতির প্রীতি, দেশের মনীষী-মহাপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালবাসা। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁদের পরিমণ্ডলভুক্ত ব্যক্তি ও বিষয় সম্বন্ধে তিনি যেসব কবিতা লিখেছেন, তার কিছু উল্লেখ না করলে আলোচনা সম্পূর্ণতা পাবে না।[১৭]

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত দিগ্‌দর্শনী পত্রিকা 'উদ্বোধন'-এর বেশ কয়েকটি সংখ্যায় ও অন্যত্র কালিদাস রায় 'যুগযুগান্তের রামকৃষ্ণ' (উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৪২), 'পরমহংসদেবের বাণী' (ঐ, বৈশাখ ১৩৪৮), 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী' (ঐ, পৌষ ১৩৪৯), 'সারদা মা' (ঐ, বৈশাখ ১৩৬১), 'স্বামীজী' (ঐ, পৌষ ১৩৭০), 'গিরিশচন্দ্র' (ঐ, কার্তিক ১৩৪৪), 'গিরিশচন্দ্র' (ঐ, মাঘ ১৩৬৪), 'গৌরী মা' (ঐ, ভাদ্র ১৩৪৬), 'সিস্টার নিবেদিতা' (ঐ, মাঘ ১৩৫৮) নামক কবিতা লিখেছিলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায়, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথায় "কালিদাস রায় শ্রীরামকৃষ্ণকে যুগে যুগে অবতীর্ণ অবতার-পুরুষ বলেই গ্রহণ করেছেন।" রামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদা তাঁর চোখে 'করুণার যমুনা, শুচিতার জাহ্নবী, ভগিনী নিবেদিতা কবির কাছে 'মূর্তিমতী গীতা।' এবং স্বামীজী? শঙ্করী প্রসাদ লিখেছেন: "কালিদাস রায় নানা কবিতায় স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের বহুমখী রূপকে ধরতে চেয়েছেন। কখনো দেখেছেন সংগ্রামক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত মহানায়ককে, যাঁর আহ্বান: চাই শক্তি, চাই ঋদ্ধি, রক্তে মাংসে হও বলীয়ান। লভেনি কখনো কেহ বিনা বলে আত্মার সন্ধান।"[১৮] বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর আরও একটি উৎকৃষ্ট কবিতার কয়েকটি উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি:

সন্ন্যাসী সাজিলে বটে, রহিলে না পর্বতে কাননে
বসিলে না ধুনী জ্বালি বটতলে মৃগচর্মাসনে
লইয়া মমতামুগ্ধ মৃগনেত্র, গদ্‌গদ-হৃদয়
কোন্ বনে যাবে তুমি? আত্মমুক্তি তব কাম্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ অনেক খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিত্ব কবি কালিদাস রায়ের কবিতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সারস্বতপ্রাঙ্গণের একনিষ্ঠ পূজারী কাব্যলক্ষ্মীর চরণে নৈবেদ্য নিবেদন করে বলেছেন:

যা দিয়েছ প্রভু মোরে এ সংসারে কৃপা ক'রে
তাহাতেই চরিতার্থ আমি
আমার যা কিছু আছে কজন তা পাইয়াছে?
এই ভাগ্য কজনের স্বামী?

কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিহৃদয়ের নানা রঙের সংবাদ অথবা তাঁর ধ্যান-গম্ভীর পরমানন্দের লাবণ্যমণ্ডিত রূপের সন্ধানে পাঠক-সমালোচক কৌতূহলী হোন বা না হোন, তার প্রতি কবির বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি বাংলা ও বাঙালীর ভীরু বক্ষ, ক্ষীণ কণ্ঠ এবং ভাঙাগড়া বিপর্যয়ের মধ্যে 'তুলসীর দীপসম' জ্বলে উঠতে চেয়ে বলেছেন:

আমি বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর অন্তরের কথা,
বাঙ্গলার আশা-তৃষ্ণা, স্মৃতিস্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
ছন্দে গেয়ে-যাই আমি। অভ্রভেদী নহে তার তান,
দেশদেশান্তর লাগি নহে মোর কুলায়ের গান।

শান্ত, অনাড়ম্বর অথচ সৌন্দর্যময় জীবন-প্রবাহে যে-কবির অবস্থান—এমন কথা তিনি ছাড়া আর কে বলতে পারেন?

---

[১৭] শঙ্করীপ্রসাদ বসু পূর্বোক্ত গ্রন্থে ইতিপূর্বে অনালোচিত কালিদাস রায়ের এই রচনামালা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আমাদের তথ্য এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

[১৮] বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৬-৬১৭

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

মানব-স্নায়ুতন্ত্র ঃ যোগ ও শারীরবিজ্ঞানের আলোকে

বাণী মার্জিত

মানবজীবনের সার্থক ও পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে—যোগের প্রভাব অপরিসীম। নানান ধরনের যোগের সাহায্যে মানুষ তার মন ও শরীরের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়ে. তাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে অতি উচ্চ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। মন ও শরীরের মধ্যে শরীরকেই আমরা দেখতে পেলেও স্থূল শরীরের তুলনায় সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ মনের শক্তি কিন্তু অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে মনই প্রতি মুহূর্তে মানুষকে তাড়না করে চলেছে—‘এটা কর’, ‘ওটা কর’, ‘এটা করো না’ বলে। মনের নানা নির্দেশ এসে শরীরটাকে খাটায় এবং শরীর মনের বিনীত ভৃত্যের মতো কাজগুলি সমাধা করে। বস্তুতঃ মন এবং শরীর এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত যে, মনকে বাদ দিয়ে একা শরীর কিছু করতে পারে না। ‘আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলে দেখতে পাইনি’ অথবা ‘অন্যমনস্ক ছিলাম বলে শুনতে পাইনি’—এ কথাগুলি থেকে বোঝা যায়—চোখ দিয়ে আমরা দেখলেও বা কান দিয়ে শুনলেও এদের সঙ্গে মনের সংযোগ একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে চোখ খোলা থাকলেও দেখা যাবে না, কান খোলা থাকলেও মানুষ বধির। শরীরের তুলনায় মনের গঠনও অনেক বেশি জটিল ও বিচিত্র। শারীরিক ব্যায়ামের ফলে শরীরের পেশীগুলির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকাশ—একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত করা সম্ভব, কিন্তু মনের নিয়ন্ত্রণ করে ও যোগসাধনের ফলে মনের বিকাশ সীমাহীনভাবে ঘটিয়ে মানুষ দেবত্বে উপনীত হতে পারে।

মন আমাদের সাধারণভাবে সর্বদাই বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল অবস্থায় থাকে এবং তার মধ্যে নানান ধরনের বৃত্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচটি মনোবৃত্তি আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সদা সর্বদা বশীভূত করে রেখেছে। এদের মধ্যে মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র অবস্থাগুলি হলো সহজাত (instinct) প্রবৃত্তি এবং নিরুদ্ধ অবস্থাটি সাধনার দ্বারা আয়ত্তে আনতে হয়।

মূঢ় অবস্থায় মানুষ কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানশূন্য হয়ে কাম, ক্রোধ, নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদি বৃত্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা তমোগুণের প্রকাশ।

ক্ষিপ্ত অবস্থায় মন অস্থির ও চঞ্চল থাকে এবং এ অবস্থায় মন কখনো কোন বিষয়ে স্থির থাকতে পারে না। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মন অস্থিরভাবে ছুটে বেড়ায়। তবে এ অবস্থায় মন কোন একটা সুখের বিষয় পেলে সেটিকে অবলম্বন করে কিছুক্ষণের জন্য নিবিষ্ট হয়। অল্প সময়ের জন্য সেটিকে ধরে থেকে মন আবার অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দুটিই রজোগুণের প্রকাশ। যে অবস্থায় মানবমন ভিতরে কিংবা বাইরে কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অবলম্বন করে কেবলমাত্র সাত্ত্বিকভাবের সাহায্য নিয়ে সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে স্থিরচিত্ত হয় সেই অবস্থাকে একাগ্র অবস্থা বলে। নিরুদ্ধ অবস্থায় মন লক্ষ্যে পৌঁছানোর সাধনায় এতই একাগ্র হয়ে উঠে যে, এ অবস্থায় সে নিজেকেও অর্থাৎ তার দেহ ও মনকে ভুলে যায়। এ অবস্থা মনের অতি উচ্চ অবস্থা। একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বভাবের প্রকাশ। সমস্তপ্রকার বাসনা, কামনা পরিত্যাগ করে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের সীমানার বাইরে মনকে রাখার সাধনাকে যোগ বলে। “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ’—চিত্তকে বিভিন্নপ্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম গ্রহণ করতে না দেওয়াই ‘যোগ’। চিত্তকে

দমন করা, চিত্তের বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা ও তাকে প্রত্যাবৃত্ত করে চৈতন্যঘন আনন্দময় পথের দিকে চিত্তকে ফেরানোর কাজটি হলো যোগের প্রথম সোপান।

মনকে বশীভূত করার কাজটি কিভাবে সম্ভব সেটিকে দেখাই হবে প্রথম কাজ। মনকে বশে আনতে হলে শরীরের উপর অর্থাৎ 'স্নায়ুতন্ত্রের' (Nervous system) উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। তাকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারলে ক্ষতিকর উত্তেজনাকে বশীভূত করে মনকে ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করা যায়।

স্নায়ুতন্ত্র কয়েক কোটি স্নায়ুকোষের (Nerve cell) সমন্বয়ে গঠিত এবং এই কোষগুলিই শরীরের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে সংবাদপ্রবাহ (sensation) পরিবহন করে। স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হলে দেহ ও মন সংযত হবে এবং প্রাণক্রিয়াকে (sensation) আয়ত্তে আনা যাবে। প্রাণক্রিয়াকে আয়ত্ত করতে পারলে হবে কর্মে সিদ্ধিলাভ। মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস সম্পর্কে যোগশাস্ত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে। যোগশাস্ত্রের মতে ধ্যানে পৌঁছাতে হলে কোন বিশেষ একটি চিন্তাকে আশ্রয় করে অগ্রসর হতে হবে। শাস্ত্রে মেরুমজ্জার বিশেষ কতকগুলি স্থানকে চিহ্নিত করে সে অঞ্চলের স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে কতকগুলি চক্র, পদ্ম বা কেন্দ্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঐ চক্রগুলি ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী নিচের দিক হতে উঁচুর দিকে ক্রমান্বয়ে সজ্জিত।

প্রথম ঃ মূলাধার-চক্র। এটির অবস্থান মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন প্রান্তে কুণ্ডলিনীর ত্রিকোণকে ঘিরে।

দ্বিতীয় ঃ স্বাধিষ্ঠান-চক্র। এটির অবস্থান উদরের নিচে জননেন্দ্রিয়মূলে।

তৃতীয় ঃ মণিপুর-চক্র। এর অবস্থান নাভিদেশে।

চতুর্থ ঃ অনাহত-চক্র। এর অবস্থান বক্ষঃস্থলে।

পঞ্চম ঃ বিশুদ্ধ-চক্র। এর অবস্থান কণ্ঠে।

ষষ্ঠ ঃ আজ্ঞা-চক্র। এর অবস্থান ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে।

সপ্তম ঃ সহস্রার-চক্র। এটির অবস্থান মস্তকের অভ্যন্তরে।

এই চক্রগুলিতে ক্রমান্বয়ে মনঃসংযোগ করাই ধ্যানের প্রণালী। মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামের দুটি স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ বর্তমান। ইড়ার সাহায্যে অন্তর্মুখী ও পিঙ্গলার সাহায্যে বহির্মুখী শক্তিপ্রবাহ গমনাগমন করে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে সুষুম্না নামের একটি শূন্য নালী বরাবর চলে গেছে। ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না—এই তিন নাড়ীতে প্রাণ (sensation) প্রবাহিত হয় বলে একে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই প্রাণপ্রবাহে স্নান করার নামই প্রাণায়াম করা। মূলাধার-চক্র থেকে আজ্ঞা-চক্র পর্যন্ত স্থানটি হলো কর্মময়ী অবিদ্যাপ্রকৃতির স্থান। একে প্রাণায়ামের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। মূলাধার-চক্রকে আয়ত্ত করে উপরের দিকের চক্রগুলিকে ক্রমশঃ আয়ত্তাধীন করতে হয়। সুষুম্না পথটি সাধারণতঃ রুদ্ধ থাকে, কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্যানে মনঃসংযোগের অভ্যাসের ফলে ক্রমে ক্রমে সুষুম্না-পথের রুদ্ধদ্বার অবারিত হয়। তখন ঐ পথ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে প্রাণশক্তিকে প্রবাহাকারে মেরুদণ্ডের নিচে চালাতে পারলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করা যায়। যোগীরা এই শক্তিকে বিশ্রামরত অবস্থায় কুণ্ডলীকৃত সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'কুলকুণ্ডলিনী' কথার অর্থ হলো কুল (দেহ) মধ্যে মূলাধার পদ্মে অধোমুখে তিনটি বেষ্টনে কুণ্ডলীভাবে বিরাজিত জীবের মূলা শক্তি। যোগসহায়ে জাগরিত কুলকুণ্ডলিনী একটির পর একটি চক্র ভেদ করে নিচের দিক হতে উপরের দিকে ওঠে। অবশেষে তা ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে শিবের সঙ্গে মিলিত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি যখন যে চক্রের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে তখন মন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে কারণ প্রত্যেক অবস্থা বা ভূমি হচ্ছে মনের নূতন নূতন স্তর।

যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের যে বর্ণনা আমরা পেলাম সেগুলি আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কতটা স্বীকৃত তা এবার দেখা যেতে পারে। যোগীরা যদিও বলেছেন চক্রগুলিকে স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায় না কিন্তু শবব্যবচ্ছেদবিদ্যার (Anatomy) সাহায্যে এগুলিকে মোটামুটিভাবে এভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ

সুষুম্নাকাণ্ড—Spinal cord, সুষুম্নানালী—Central Canal, ব্রহ্মরন্ধ্র—Intraventricular foramen, ব্রহ্মপুর—3rd ventricle, পিঙ্গলা—Discending or Pyramidal tract, (কেউ কেউ একেই Right Sympathetic trunk বলেছেন), ইড়া—Ascending tract (Left Sympathetic trunk), চক্র বা পদ্ম—Nerve plexus, মূলাধার-চক্র—Pelvic plexus, স্বাধিষ্ঠান-চক্র—Hypogastric plexus, মণিপুর-চক্র—Coeliac plexus, অনাহত-চক্র—Cardiac plexus, বিশুদ্ধ-চক্র—Pharyngeal plexus, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান—Nasion, ঐ সমতলে মস্তিষ্কের তলদেশে—শিবসতী-গ্রন্থি—Pituitary gland, তার পিছনে আজ্ঞা-চক্র—Hypothalamus, এর একটু উপরে ব্রহ্মপুরকে ঘিরে মানস-চক্র—Thalamus এবং সকলের উপরে সহস্রার-চক্র—Sensory cortex (Frontal lobe) ।

আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System) প্রধানতঃ দুটিভাগে বিভক্ত। প্রথমটি শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে বলে এটিকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (Central Nervous System) নামে অভিহিত করা হয়। এটি মস্তিষ্ক (Brain), সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিতীয়টিকে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম (Autonomic Nervous System) বলা হয় কারণ এর বেশির ভাগ কাজই অনৈচ্ছিক পেশীর (Involuntary muscle) সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা যুক্ত। এই ধরনের পেশী আমাদের দেহের আন্তরযন্ত্র (Viscera) যেমন হৃদ্‌যন্ত্র (Heart), শিরা (vein), ধমনী (Artery) ফুসফুস (Lung), খাদ্যনালী (Gastro-intestinal tract) মূত্রাশয় (urinary bladder) ইত্যাদিতে আছে। খাবার পর 'পেট ভরে গেল' অথবা 'খেয়ে তৃপ্তি হলো' এই ধরনের অনুভূতিগুলি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সাহায্যে আমরা বুঝি। অপর পক্ষে বাইরের কোন উত্তেজনা যেমন স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ বা শ্রবণ ইত্যাদির অনুভূতি আমরা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের সাহায্যে অনুভব করি। দেখা গেল একটি ভিতরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় এবং অপরটি বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়। এই দুটি সিস্টেম আবার অবস্থান ও কাজের প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় রাখে। একটি উত্তেজিত হলে অন্যটি প্রশমিত থাকে।

অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়—সিমপ্যাথেটিক ও প্যারা-সিমপ্যাথেটিক। বেশির ভাগ আন্তরযন্ত্র এই দুটির সঙ্গেই যুক্ত এবং তাদের কাজ সেক্ষেত্রে একে অপরের বিপরীতমুখী।

প্যারা-সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে লোকের চোখের তারা ছোট (constricted pupil), মুখ উদ্ভাসিত ও আর্দ্র, নাড়ী ধীরগতিসম্পন্ন (slow pulse-rate), রক্তের চাপ (Blood pressure) কম, মূত্রাশয় ও খাদ্যনালীর মাংসপেশী সংকুচিত (contracted), লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের পেশী শিথিল (Spincters dilated)—এই সকল লক্ষণগুলি দেখা যাবে। অপরপক্ষে মানুষ সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুদ্বারা প্রভাবিত হলে দেখা যাবে তার চোখের তারা বড়, পাণ্ডুর শুষ্ক মুখ (pale and dry face), নাড়ী দ্রুতগতিসম্পন্ন, রক্তচাপ উর্ধ্বমুখী, মূত্রাশয় ও খাদ্যনালীর পেশী শিথিল, লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের পেশী সংকুচিত হয়েছে।

সিমপ্যাথেটিক সিস্টেমে নার্ভতন্তু ছাড়া আর একটি অতিরিক্ত অংশ আছে যেটিকে বলা হয় সিমপ্যাথেটিক ট্রাঙ্ক (Sympathetic trunk)—এটি দেখতে পুঁতির মালার মতো। এটি মেরুদণ্ডের বাইরে দুই পাশে লম্বালম্বিভাবে মস্তকের তলা (Base of skull) থেকে কটিদেশের ককসিস (coccyx) পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষুম্না থেকে স্নায়ুতন্তু আন্তরযন্ত্রে যাবার আগে কতকগুলি স্নায়ুজাল (Nerve plexus) তৈরি করে যেগুলির সঙ্গে সিমপ্যাথেটিক ট্রাঙ্ক স্নায়ুতন্তু দ্বারা যুক্ত। এই plexus-গুলি আন্তরযন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। এগুলি এরূপ—হৃদ্‌যন্ত্রের জন্য কার্ডিয়াক প্লেক্সাস (cardiac plexus), পৌষ্টিক তন্ত্রের জন্য ইসোফেজিয়াল, সিলিয়াক ও পেলভিক প্লেক্সাস

(oesophageal, coeliac and pelvic plexus), ফুসফুসের জন্য পালমোনারী প্লেক্সাস (pulmonary plexus), মলাশয় ও জনন-রেচন তন্ত্রের জন্য হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস (Hypogastric plexus) ইত্যাদি। এইসব জায়গা থেকে উত্তেজনা নার্ভতন্তুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডে এবং সেখান থেকে ইড়ার (ascending tract) সাহায্যে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালেমাস, সেখান হতে থ্যালেমাস হয়ে মস্তিষ্কের সম্মুখের অংশের (Frontal lobe) সংবেদনশীল কর্টেক্সে (Sensory cortex) পৌঁছায়। মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্স (Moter cortex) থেকে কর্মাত্মক (Motor) স্নায়ুতন্তু দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টা বহিরিন্দ্রিয়ে প্রেরিত হচ্ছে।

মস্তিষ্কের ভিতরে কয়েকটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ (ventricle) আছে যেগুলির গঠন অনেকটা তালশাঁসের ভিতর ছোট জলভরা গর্তের মতো। মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠগুলি একে অপরের সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র (Intraventriculer foramen) দ্বারা যুক্ত এবং জলীয় পদার্থ (cerebro-spinal fluid) দ্বারা পূর্ণ। এই প্রকোষ্ঠ আবার নিচের দিকে সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতরে যে সূক্ষ্মনালী (central canal) আছে তার সঙ্গে যুক্ত। কটিদেশের কাছে মেরুদণ্ডের কতকগুলো অস্থির পরই সুষুম্না শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু একটি অতি সূক্ষ্ম সুষুম্নার আচ্ছাদন (Filum terminal coccyx) পর্যন্ত নেমে গেছে। সুষুম্নানালী এর মধ্যেও আছে তবে অতি সূক্ষ্ম। জলীয় পদার্থ (C. S. F.) মস্তিষ্ককে ঘিরে থেকে তাকে বাইরের আঘাত থেকে যেমন রক্ষা করে তেমনি ভিতরের চাপকেও (Intracranial pressure) নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্য দিয়ে কোন স্নায়ুপ্রবাহ চলাচল করে না।

স্নায়ুতন্তু দিয়ে দুরকম প্রবাহ চলাচল করে—একটি সংবেদাত্মক (Sensory), এটি মস্তিষ্কের দিকে স্নায়ুপ্রবাহ বহন করে ও অন্যটি কর্মাত্মক বা চেষ্টাত্মক (Motor)—মস্তিষ্ক থেকে বাইরে সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্নায়ুপ্রবাহ বহন করে। এই নার্ভতন্তুগুলি বিভিন্ন চক্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কি প্রভাব আমাদের শরীরে প্রকাশ করে দেখা যাক।

মূলাধার-চক্র (pelvic plexus) ও স্বাধিষ্ঠান-চক্র (Hypogastric plexus)—এ দুটি আমাদের শরীরের রেচন-জননতন্ত্র (Urogenital System), মলাশয়, মূত্রাশয় ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। এই চক্রগুলিতে সেন্ট্রাল ও অটোনমিক নার্ভতন্ত্রের সহাবস্থান (Co-ordination) সবচেয়ে বেশি এবং মানসিক ও দৈহিক সংযোগ গঠিত হয়। এই চক্রকে আয়ত্ত করতে পারলে অনৈচ্ছিক (Autonomic) ও মানসিক কাজকে আয়ত্ত করে এমন এক শক্তির অধিকারী হওয়া যাবে যার সাহায্যে যে-কোন কামনা, বাসনা জয় করে উচ্চতর অবস্থায় পৌঁছানো যাবে। ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ। পবিত্রতাই সর্বপ্রকার ধর্ম ও নীতির ভিত্তি। (ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ) ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হলে শক্তিলাভ হয়। আমাদের শরীরের যাবতীয় রস (Tissue fluid & plasma) অপরিবর্তনশীল (Stable) অবস্থায় থাকে কেবলমাত্র অটোনমিক সিস্টেম ও অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের (Endocrine system) সহাবস্থানের ফলে। এদের কাজ শিবসতী-গ্রন্থির (pituitary gland) মাধ্যমে আজ্ঞা-চক্র (Hypothalamus) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আজ্ঞা-চক্রই হচ্ছে এই স্নায়ু ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণক্ষেত্র (neuro endocrine regulatory centre)। প্যারাসিমপ্যাথেটিক সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত থেকে সপ্তম, নবম ও দশম (facial, glossopharyngeal ও Vagus) ক্রেনিয়াল নার্ভ আমাদের খাওয়া ও পরিপাক কার্যে সাহায্য করে। মণিপুর-চক্র ও বিশুদ্ধ-চক্রের সঙ্গে এগুলির যোগাযোগ আছে। দশম (Vagus) নার্ভ এছাড়াও অনাহত চক্র ও শ্বাসযন্ত্রের পালমোনারী প্লেক্সাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নিচের দিকের চক্রগুলির উপর সংযম এলে তবেই আরও উপরের চক্রে (Spiritual plane) ওঠা যাবে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রাণায়ামের একটা যোগাযোগ দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এইরকম : প্রাণায়ামের সময় মেরুদণ্ড সোজা করে বসে লম্বা নিঃশ্বাস নেওয়া হয়। আমাদের শরীরে অক্সিজেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অক্সিজেন আমাদের দেহের যাবতীয় কোষসমূহকে পুষ্টি যোগায়। লম্বা নিঃশ্বাসের

সাহায্যে একবারে অনেক বেশি পরিমাণে আমরা অক্সিজেন টেনে নিতে পারি। এবার কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ভিতরে ধরে রাখলে কোষগুলি বেশি সময় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসবে। মেরুদণ্ড সোজা রাখলে শ্বাসনালীও সোজা থাকবে এবং এই কাজকে তরান্বিত করবে। লম্বা নিঃশ্বাস নিলে এক মিনিটে আমরা কম সংখ্যক নিঃশ্বাস নিতে পারি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস (ছোট ছোট) নিলে এক মিনিটে বেশি সংখ্যক নিঃশ্বাস নেওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু গতি যদি মাঝে মাঝে বাধা পায় তার কাজও সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তুফান এক্সপ্রেসকে হাওড়া থেকে দিল্লী পৌঁছাতে অনেক বেশি সংখ্যক প্ল্যাটফর্মে থামতে হয় বলে তার গতি রাজধানী এক্সপ্রেসের তুলনায় অনেক কম। তেমনি প্রাণিজগতেও দেখা গেছে যাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে অন্যের চেয়ে বেশি তারা কম দিন বাঁচে। যেমন—কুকুর প্রতি মিনিটে ২৮-২৯ বার শ্বাস নেয়, বাঁচে ১৩-১৪ বছর, ঘোড়া ১৮-১৯ বার শ্বাস নেয়, বাঁচে ৪৮-৫০ বছর, মানুষ ১২-১৩ বার শ্বাস নেয় বাঁচে প্রায় ১০০ বছর, কচ্ছপ ৪-৫ বার শ্বাস নেয়,বাঁচে ১৫০ বছর। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাণায়াম করলে আমরা বেশি শক্তির অধিকারী হতে পারি। শরীর সুস্থ থাকলে মনও সুস্থ থাকে। এর সাহায্যে আমরা মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে সবল হতে পারি।

সবশেষের আলোচ্য বিষয় হলো আজ্ঞা-চক্র (Hypothalamus), মানস-চক্র (Thalamus) ও সহস্রার-চক্র (Sensory cortex)। আমাদের যাবতীয় সংবেদনশীল (Sensory) স্নায়ুপ্রবাহ আজ্ঞা-চক্র থেকে মানস-চক্রে এবং সবশেষে সহস্রার-চক্রে পৌঁছায়। এখান হতে সব কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। আজ্ঞা-চক্রের (Hypothalamus) পিছনের দিকটি সিমপ্যাথেটিক ও সামনের অংশ প্যারাসিমপ্যাথেটিকের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় ১২০০ গ্রাম ; সেই ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালেমাসের ওজন মাত্র চার গ্রাম। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও এটিই ব্যক্তি ও জাতি গঠনের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র।

আমাদের মস্তিষ্কের সামনের অংশটি (Frontal lobe) তিনকোণা। তার বাইরের দিকটি বুদ্ধি (intellectual activity), ভিতরের দিকটি আবেগ (emotional behaviour) এবং তলার দিকটি অটোনমিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানস-চক্র এবং তলার দিকে আজ্ঞা-চক্র মস্তিষ্কের একটি গহ্বর—ব্রহ্মপুরকে (3rd ventricle) ঘিরে থাকে, যার প্রবেশদ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র (Intraventricular foramen)।

যোগিগণ কর্তৃক বর্ণিত দেহের ব্যাখ্যা এবং আধুনিক শারীরবিদ্যায় বর্ণিত দেহের ব্যাখ্যা যা আমরা আলোচনা করলাম সে-দুটিকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে পাওয়া পৃথক দু-ধরনের জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু নয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে পাওয়া হলেও যোগে বর্ণিত দেহ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা এবং শারীরশাস্ত্রের ব্যাখ্যা দুটি একে অপরের পরিপূরক। এই দুটি জ্ঞান মিলে মানবের বাহ্য দেহ ও আন্তরদেহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান হওয়া সম্ভব। ব্যাখ্যা দুটির মধ্যে কোন মতভেদও নেই সে-কারণে। তবে এটা আংশিকভাবে হলেও সত্য যে, যোগ-সাধনায় রত ব্যক্তিগত অনেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের দেওয়া দেহ-সম্পর্কে ব্যাখ্যাগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না ; অপর দিকে শারীরবিদ্যায় সম্যক জ্ঞান থাকলেও শারীরবিজ্ঞানীরা আবার যোগের প্রাথমিক দিকগুলি *সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। একারণেই স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সম্পর্কে এত আগ্রহী ছিলেন। স্বামীজীর এই ভাবনা যে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত তা আর আজকের দিনে বলার অপেক্ষা* রাখে না।*

লেখিকা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিজ্ঞান (অ্যানাটমি) বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা।

আনন্দের সন্তান

রসেবসে

সুদীপ বসু

পুত্র সন্ন্যাসী হলে পিতা যে শুধু পুত্রের মুণ্ডপাতই করতে থাকেন তা-ই নয়, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়েরই বিরোধী হয়ে ওঠেন। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। পিতা তখন পুত্রগর্বে গর্বী। যোগেন মহারাজের (স্বামী যোগানন্দের) পিতা তেমনই একজন মানুষ। বরাহনগর এবং আলমবাজার মঠে তাঁর বিশেষ খাতির ছিল। তার একটা কারণ তিনি অতিশয় রসিক ব্যক্তি। আর মঠ তখন আনন্দের সন্তানদের আনন্দগানে পূর্ণ। কাজেই চৌধুরী মশায়ের সেখানে বেশ সমাদর।

“চৌধুরী মহাশয়··· দেখিতে দীর্ঘাকার, বর্ণ সাধারণ, শরীর দোহারা, পেট বসা, মেরুদণ্ড সম্মুখের দিকে কিছু বক্র; উভয় কর্ণ লোমযুক্ত, ভ্রূদ্বয় প্রশস্ত ও রোমশ। তাঁহার বামস্কন্ধে একখানি কোঁচানো চাদর, পরিধানে ঝলমলে থান, কোঁচার ডগা বাঁদিকের কঁসিতে গোঁজা, বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীত, হাতে কখনো লাঠি, কখনো ছাতি। তিনি আলমবাজার মঠে আসিলে যোগেন মহারাজের পিতা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি আসিয়াই শুরু করিতেন, ‘আর বেঁচে সুখ নেই। বাপের নামেই তো বেটার পরিচয় হয়, আর আমার বেলায় কিনা বেটার নামে বাপের পরিচয়! আমার নন্দ ঘোষের দশা। নন্দের বেটা কেউ তো বলে না, সকলে কেষ্টর বাপ নন্দ বলে থাকে। আমি যেখানে যাই সেখানে যোগের বাপ বলে সম্মান করে—আমার বেটা যোগে, একথা কেউ বলে না। একেই বলে পোড়া কপাল।’ তারপর কালী বেদান্তীর সহিত একপালা হইত। চৌধুরী মশায় বলিতেন, ‘মা-কালীই তো সকলে বলে থাকে, এ যে দেখি বাবা-কালী!’ তারপর নিতান্ত ভালমানুষ বাবুরাম মহারাজ যখন কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া সমুখ দিয়া যাতায়াত করিতেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধেও এক পালা হইত—‘ইনি দাদাবাবু না দিদিবাবু?’···তিনি গল্প বলিতে সুনিপুণ ছিলেন, ···দুই তিন ঘণ্টা গল্প বলিয়া যাইতে পারিতেন এবং শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে ‘বুড়ো গোপাল’ হলেও কাজের বেলায় দিব্যি শক্ত, সমর্থ। প্রাচীনপন্থী লোক, চা-পানের তিনি ঘোর বিরোধী। কিন্তু একটু একটু আফিম খেতেন। অখণ্ডানন্দ ভাবলেন বুড়ো গোপাল-দার পেছনে একবার লাগা যাক। এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শদাতা নরেন্দ্রনাথ। আফিমের কৌটো থেকে গুলিগুলো বের করে নিয়ে খয়ের আর কুইনিনের গুলি তৈরি করে তাতে আফিমের জল মাখিয়ে কৌটোয় রেখে দিলেন। কয়েকদিন কেটে গেল। বুড়ো গোপাল-দা এই নব আফিমের গুলি খেয়ে বেশ ভালো আছেন। আফিমের সঙ্গে দুধও খেতে হয়। দুধের রঙের জলও খাচ্ছেন। কেননা অখণ্ডানন্দ পেঁপের ডাঁটা দিয়ে কড়া থেকে দুধ খেয়ে নিয়ে সেখানে জল পুরে রাখছিলেন। এইভাবে তিনদিন গেল। তারপর অখণ্ডানন্দ ব্যাপার ফাঁস করলেন, হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। শুনেই ‘তবে রে শালারা’ বলে বুড়ো গোপাল-দা তাড়া করলেন। অনতিবিলম্বে শরীর ম্যাজম্যাজ, হাই উঠতে লাগল, আফিমের ডোজ ডবল করে, সে যাত্রা নিজেকে সামলে নিলেন বুড়ো গোপাল-দা।

চায়ের সম্পর্কে গোপাল-দার ছিল অদ্ভুত এক ধারণা। নিজে তো চা খেতেনই না, অপরে কেউ চা খাক তাও তিনি পছন্দ করতেন না। এই নিয়ে রসিকতা জমে উঠত খুব মাঝে মাঝে। একবার গোপাল-দা একজন সাধুকে বললেন ঃ “ওরে চা খাসনি, খাসনি—রক্ত-হেগে মরবি।” সাধুটি বললেন ঃ “গোপাল-দা যত ফোঁটা চা, তত ফোঁটা রক্ত।” গোপাল-দা মুখ ভেঙিয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন ঃ “খুব খা, খুব খা!” সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ধারাবাহিক-সঙ্কলন

সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

॥২॥

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজী : জীবনকথা

পাঞ্জাবের ঝঙ্গ জেলায় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে এক ক্ষত্রিয় বংশে স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্মবিষয়ে অত্যধিক প্রীতি লক্ষিত হয়। সুমধুর প্রকৃতি, সরল স্বভাব, সত্যনিষ্ঠা, ভগবন্নামকীর্তনে তন্ময়তা, সৎসঙ্গে রুচি প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। যৌবনে গ্রন্থসাহেব ও সংস্কৃত যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ ও চিন্তনে তাঁহার দীর্ঘসময় অতিবাহিত হইত। বৈরাগ্যের প্রেরণায় গৃহত্যাগ করিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধ মহাত্মা অনন্তপ্রকাশজী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যথাসময়ে উদাসীন সম্প্রদায়ের দীক্ষানুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর তিনি 'ব্রহ্মপ্রকাশ' নামে ভূষিত হন।

শিষ্যের দিব্য মেধা দর্শনে গুরু তাঁহাকে হৃষিকেশের স্বামী মঙ্গলনাথ নামক এক সুপণ্ডিত উচ্চ কোটির মহাত্মার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন। মঙ্গলনাথজী তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন : "এতো দেখছি ফরিশ্‌তা!" অর্থাৎ কোন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ বা দেবযোনিবিশেষ। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার দিব্য অপূর্ব মেধা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইত। দুই একবার শুনিলেই যেকোন শাস্ত্রীয় বিষয় বা শ্লোক তাঁহার চিত্তপটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যাইত। শারীরকসূত্র, উপনিষদ্, গীতাদির ভাষ্য ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের বহু প্রকরণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সুদীর্ঘকাল মননের ফলে ঐসকল তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া জিজ্ঞাসু শ্রোতৃবৃন্দের সংশয় নিরাশপূর্বক সকলের আনন্দবর্ধন করিতেন। তীব্র বৈরাগ্যবান, সদা নির্জনবাসপ্রিয়, ভিক্ষামাত্রোপজীবী, নিরন্তর অধ্যাত্ম-চিন্তননিরত তাঁহার সুমধুর কথাপ্রসঙ্গে আমরা সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম। বৈরাগ্য তাঁহার পরম ভূষণ ছিল। কৌপীন, আচ্ছাদন, একটি চাদর, কমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র ও পাদত্রাণ ব্যতীত আর কোন বস্তুই তিনি সঙ্গে রাখিতেন না। জীবনের শেষ পর্যন্ত অর্থাদি সংগ্রহ তো দূরের কথা, তাহা স্পর্শও করেন নাই। কেহ সকাতরে কিছু দিতে আসিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না। কোন দ্রব্য সংগ্রহ বা সঞ্চয় তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র ভিক্ষা (মাধুকরী) গ্রহণেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

উত্তরকাশীতেই তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি। তখন তিনি লক্ষেশ্বরে একটি কুঠিয়ায় বাস করিতেন। সকলের শেষে তিনি ভিক্ষায় বাহির হইতেন। সত্র তাঁহার জন্য রুটি রাখিয়া দেওয়া হইত। স্বামী দেবীগিরিজীর সঙ্গে তখন আমি প্রায়ই লক্ষেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম। স্বামী সদ্‌গুরুজী, শরণদাসজী ও অন্যান্য বিরক্ত মহাত্মারাও সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। ঐ সকল সাধুগণের পরস্পর শাস্ত্রীয় কথা ও আলোচনা শ্রবণে কি আনন্দই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত তাহা ভাষায় বলিবার নহে। স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজী উত্তরাখণ্ডের বৈরাগ্যবান ত্যাগী তপস্বী মহাত্মাগণের মুকুটমণি ছিলেন। স্বামী দেবীগিরিজীর আশ্রমে আমি থাকিতাম। দেবীগিরিজী একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন : "যথার্থ সাধুজীবন, ফকিরী বড় কঠিন বাবাজী, ফকির দেখ ব্রহ্মপ্রকাশ। আমি নিত্য প্রাতে তাঁর ধ্যান করি।" —একজন প্রসিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার এই উক্তি হইতেই স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশ কোন্ স্তরের সাধু ছিলেন তাহা অনুমেয়।

গ্রীষ্মকালে গঙ্গোত্রীতে একটি গুহায় তি তপস্যা করিতেন। একবার উত্তরকাশী হইতে সেখানে আসিয়া গুহাটি খালি দেখিয়া সেখানে আস বিছাইবার কালে দেখিতে পাইলেন জমিতে কয়েক

মুদ্রা পড়িয়া রহিয়াছে। উহা তিনি একটি লাঠির সহায়ে ঠেলিতে ঠেলিতে বাহিরে ফেলিয়া দিবার প্রয়াস করিতেছেন দেখিয়া নিকটস্থ একজন সাধু বলিলেন ঃ "অত কষ্ট কেন করছেন মহারাজ, হাত দিয়ে তুলে ফেলে দিন না?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "এ বস্তুর স্পর্শও খারাপ। তাই লাঠি দিয়ে ফেলছি।" বোধ হয় ঐ গুহায় পূর্বে নিবাসকারী কেহ ঐ পয়সা ফেলিয়া গিয়া থাকিবে।—এইরূপ বৈরাগ্য তাঁহার জীবনকে আমৃত্যু সমলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সৎসঙ্গ ও উপদেশ যিনি একবার শুনিয়াছেন তিনি তাহা জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। বহু সুপণ্ডিত সাধু ও ভক্ত নিত্য তাঁহার সৎসঙ্গের লোভে অপরাহ্ণে তাঁহার নিকট সমবেত হইতেন।

তাঁহার দিব্যজ্ঞান সমুজ্জ্বল বুদ্ধি ভক্তিরসেও তুল্যরূপে সিঞ্চিত ছিল। ভক্তি ও ভক্তপ্রসঙ্গে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা বহিত। আবার বেদান্তবিচারপ্রসঙ্গে তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তিসমূহ সুন্দর দৃষ্টান্ত সহায়ে দুরূহ সমস্যাসমূহের সরল সমাধান করতঃ সকলকেই তুল্যরূপে বিস্মিত ও পরিতৃপ্ত করিত। উত্তরকাশী, হৃষিকেশ ও কনখলে তাঁহার দুর্লভ স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় পাইয়া বেদান্তগ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিবার বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। হৃষিকেশে অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন এক অঙ্গ পক্ষাঘাতে ক্লিষ্ট হইয়া অশক্ত হইয়াছে অনুভব করিয়া অতঃপর পরাধীন হইয়া দেহরক্ষা নিষ্প্রয়োজন বোধে দৃঢ়সঙ্কল্প সহায়ে অন্নগ্রহণ পরিত্যাগ করিলেন এবং কেবল গঙ্গাজল কিঞ্চিৎ পান করিয়া ৪।৫ দিন পর আত্মসমাহিত চিত্তে দেহনির্মুক্ত হইয়া বিদেহ কৈবল্য লাভ করেন।

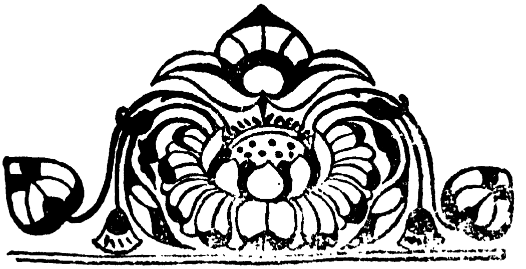

পরমপদকমলে

সেই আবেগে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কি করে কি হয়! ঠাকুর বলছেন, 'প্রথমটা একটু উঠেপড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।' এই উঠেপড়ে লাগাটা কি রকম! ঠাকুরই দিয়েছেন পথের নির্দেশ। তাঁর মতে, কাম-কাঞ্চনের ঝড়-তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি। কাম-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। কিসের সঙ্গে যোগ? তাঁর সঙ্গে যোগ। তিনি কে? তাঁর বিশেষণ আমরা জানি। তাঁকে আমরা জানি না। বিশেষণ হলো—সৎ-চিৎ-আনন্দ। তিনি সচ্চিদানন্দ। সেই যোগে মানুষ সৎ হবে। নিজের সঙ্গে নিজের যোগ হবে। চিৎকে, চৈতন্যকে সে খুঁজে পাবে। স্বরূপের দর্শন পাবে। ফলে সে আনন্দের সন্ধান পাবে। মানুষের সমস্ত নিরানন্দের কারণ আসক্তি। আসক্তি তার ভয়ঙ্কর দুটি বস্তুতে—কাম আর কাঞ্চন। দুটি বস্তু গাঁট ছড়ায় বাঁধা। কামের জন্য প্রয়োজন কাঞ্চনের। আবার কাঞ্চন এলে আসবে কাম। এই দুই বস্তু মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অস্বীকার করার উপায় নেই। এ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। উঠেপড়ে লাগা মানে, কাম-কাঞ্চনের মোহ থেকে দূরে থাকা। দূরে থাকা মানে মন থেকে দূর করা। মন থেকে তাড়াতে না পারলে মন ছোঁক ছোঁক করবে। ঠাকুর বলছেন, 'মনই সব জানবে। জ্ঞানই বলো আর অজ্ঞানই বলো, সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত, মনেই সাধু এবং মনেই অসাধু, মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান। তার মানে পথ হলো সুদৃঢ় ইচ্ছা, বাহন হলো মন।

মাঝি গোপীদের বলেছিলেন—এক মন না হলে আমি যমুনা পার করি না। গোপীরা ভাবলেন, মাঝি বুঝি ওজনের কথা বলছে। না, ওজন নয়, মাঝি বলছেন মনের কথা। এক মন, এক কৃষ্ণ। মনে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেউ ঢুকে থাকলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। এক কৃষ্ণ, এক রাধা। মনকে রাধা করতে না পারলে, কৃষ্ণ-সাধা হবে না। ভড়ং হবে, ভণ্ডামি হবে আর মনে বজবজ করবে দুই 'ক'-এর আসক্তি। পথ বড় কঠিন। উপনিষদ বলছেন ঃ

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

—যাঁরা জানেন, যাঁরা বিবেকবান তাঁরা বলেন, ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুরতিক্রমণীয়, আত্মজ্ঞান লাভের পথও সেইরকম দুর্গম। তাহলে কি হবে? উপনিষদ বলছেন ঃ

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

—তোমরা ওঠ। মোহনিদ্রা ছেড়ে ওঠ। আত্মজ্ঞানের সন্ধান কর। সন্ধান পাবে কোথায়? শ্রেষ্ঠ আচার্যের সঙ্গ কর। তিনি তোমাকে আত্মজ্ঞানের সন্ধান দেবেন। তিনি বলবেন, বাসনার লেশমাত্র থাকতে ভগবানলাভ হয় না। যেমন সুতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাকলে ছুঁচের ভিতর যায় না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।'

এই বাসনাহীন মন কেমন? ঠাকুর বলছেন ঃ যেন শুকনো দেশলাই—একবার ঘষলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। আর ভিজে হলে ঘষতে ঘষতে কাটি ভেঙে গেলেও জ্বলে না। সেই মতো সরল, সত্যনিষ্ঠ, নির্মল-স্বভাব লোককে একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগের উদয় হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে শত শতবার উপদেশ করলেও কিছু হয় না।'

পথের নির্দেশ তাহলে পাওয়া গেল ঠাকুরের কথায়—প্রথম সাধুসঙ্গ। সদ্‌গুরু চাই জীবনে। গুরুকে চাইবার আগে নিজের মানসিক প্রস্তুতি চাই। যেমন, আমরা স্নান করি দেহশুদ্ধির জন্যে, সেইরকম মানস-শুদ্ধির জন্যে প্রয়োজন সঙ্কল্প-স্নানের। সেই স্নানে মন হবে সরল, হবে সত্যনিষ্ঠ, হবে নির্মল। এই তিন গুণ নিয়ে যেতে হবে গুরুর কাছে। কারণ এমন আকাঙ্ক্ষীকেই একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগের উদয় হয়। অনুরাগের উদয় হলো, তবু বাকি রয়ে গেল অনেক পথ। অনুরাগ মানে রুচি। নামে রুচি। অন্যকথা, বিষয়কথা ভাল লাগছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, মনে বনে কোণে নির্জনে কিছু ভাবি। সংসারের সব কাজই করছি বড় লোকের দাসীর মতো। আমার, আমার করছি বটে; কিন্তু বেশ একটা বোধ ক্রমেই জন্মাচ্ছে, এর কিছুই আমার নয়। অনুরাগ থেকে আসবে বিরাগ—বৈরাগ্য। বড়লোকের দাসীর মন পড়ে থাকে নিজের বাড়ির দিকে। সেই নিজের বাড়ি হলো, নিজের ভেতর। আলোকিত, মোহমুক্ত, নির্ভার এক অবস্থা। বাইরে থেকে ভেতরে আসতে হলে চাই অনাসক্তি। তুলসীদাসজীর কথায়—"সব ছাড়োয়ে সব পাওয়ে।" বৈরাগ্য থেকে আসবে অভাববোধ। তৃপ্তি নেই কোনও কিছুতেই। শঙ্কর যেমন বলেছেন—"ন যোগে, ন ভোগে, ন বাজিমেধে।" ভোগ, যোগ, বিষয়কর্ম, কোনও কিছুই আর ভাল লাগছে না। ভীষণ এক শূন্যতা। এই অবস্থা হলো বিরহের অবস্থা। সর্ব শরীর জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীমতীর অবস্থা। কৃষ্ণ-বিরহে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। শীতল শিলায় শয়ন করলে পাথর পুড়ে যাচ্ছে। মহাপ্রভুর অবস্থা। ঠাকুর বলছেন—পাওয়া যায় তাঁকে; কিন্তু সেই আকুতি চাই—কি রকম? গুরু শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ রেখেই ছেড়ে দিলেন। শিষ্য বাতাসের আশায় ছটফটিয়ে মাথা জলের ওপর তুলল। গুরু বললেন, "কি বুঝলে? যা বুঝলে সেই বোঝা লাগাও ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে। ঠিক ওইরকমটি হলে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

এইবার আমার প্রশ্ন আমার কাছে—পারবে ওই ছটফটানি আনতে? অ্যামেচার সাধক, সারা জীবন 'সেয়ান পাগল, বুঁচকি বগল' হয়েই কাটবে নাকি? কৃপা করুন, কৃপাময়।

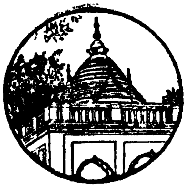

গ্রন্থ পরিচয়

মনঃসমীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারত-বিচার

সুকুমার বসু

যা আছে ভারতে ঃ বিজয়কেতু বসু। ১৪।১ পার্শীবাগান লেন, কলিকাতা-৯। কুড়ি টাকা।

প্রাচীন ভারতের উপনিষদোত্তর কালে মহাভারত লোকশিক্ষার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সেই যুগের শিক্ষাপদ্ধতিতে ক্রয়বিক্রয় প্রথার প্রচলন ছিল না। শিক্ষার প্রসারে ব্রতী কতিপয় সদাচারী পণ্ডিত ব্যক্তি কথকতার মাধ্যমে জনসাধারণকে সুনাগরিক হবার জন্য তৎকালীন রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবন-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত এবং উপজীব্য-তথ্য এবং ধর্মাচারের মূল বক্তব্যগুলি সহজবোধ্য করে প্রচার করতেন। মুখবন্ধে ঐ বক্তব্যটি প্রকাশ করে গ্রন্থকার দাবি করেছেন যে, মহাভারতকার মানসিক ব্যাধির উৎস এবং প্রধান কারণগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না। মনের মধ্যে জাত অসুস্থতার নিরাময় যে মনোবিজ্ঞান-সম্মত হওয়া উচিত এবং মনোবিশ্লেষক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত—লেখকের মতে—"মহাভারতকার এ সত্য অবগত ছিলেন।" গ্রন্থকার তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাভারতের বিভিন্ন কথা-কাহিনী পর্যালোচনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মহামতি ব্যাস শুধু অন্যতম মহাকাব্যের স্রষ্টা ছিলেন না, তিনি প্রাচীন ভারতের সংসারধর্মনীতির রূপরেখা প্রণয়নের পথিকৃৎও ছিলেন।

মহাভারতকে গ্রন্থকার চিকিৎসাগ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন। বিশেষভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে মহাভারত পাঠের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি তিনি দিয়েছেন (পৃঃ ৩—৪)।

ফ্রয়েড ধরে নিয়েছিলেন মনোচিকিৎসক শ্রোতা হবেন, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার বলেছেন, মহাভারতকার ধরে নিয়েছিলেন "যাঁরা চিকিৎসিত হতে চান তাঁরা শ্রোতার ভূমিকায় থাকবেন" (পৃঃ ২৬)। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি এবং মহাভারতকারের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কারণ গ্রন্থকার কোথাও বুঝিয়ে বলেননি। সিগারেট খেতে খেতে, লজেন্স চুষতে চুষতে বা পা নাড়তে নাড়তে মনঃসমীক্ষণ করানো যায় না—সংযম চিকিৎসার প্রাক্‌শর্ত (পৃঃ ২৬)। কিন্তু ঐগুলি যেখানে মনোরোগের লক্ষণ সেখানে ঐ প্রাক্‌শর্ত দিলে রোগী চিকিৎসকের কাছে আসবে কি ? যদিও আসে, তাহলে আমার মনে হয়, রোগীর কাছ থেকে বাঞ্ছিত সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। এইসব ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ করা দুরূহ। এখানে চিকিৎসাপদ্ধতির গণ্ডীর কথা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ প্রাক্‌শর্তটি 'চিকিৎসকের' আচরণে আরোপ করলে সুবিধা অনেক। রোগী তাতে সহজেই কাছের মানুষ হয়। রোগী আড়ষ্ট না থেকে প্রাণ খুলে সবকিছু বলতে পারে। তখন আপনা থেকেই সে প্রাক্‌শর্ত পালন করতে সুরু করে।

পুস্তকের ২৯ পৃঃ থেকে ৪৩ পৃঃ পর্যন্ত মনঃসমীক্ষণের আলোচনা তত্ত্বাভিত্তিক। এই আলোচনা সকলের কাছে যে গ্রহণীয় হবে তা মনে হয় না। এক্ষেত্রে ভিন্ন মত থাকবেই। তবে গোটা বইটিতেই লেখকের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। তাঁর এই গ্রন্থ চিন্তাশীল মনঃসমীক্ষকদের আকৃষ্ট করবে। বিশেষতঃ কলকাতা শহরে যাঁরা মনঃসমীক্ষণ শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কাছে পুস্তকটি সমাদৃত হবে, এই আশা রাখি।

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা ঃ সুভাষ দে সরকার। প্রকাশক ঃ শ্যামলকুমার সরকার, মকদুমপুর, বি. জি. রোড, মালদহ। মূল্য ঃ কুড়ি টাকা।

বাস্তবদৃষ্টিতে ধর্ম ঃ সুফলচন্দ্র দাস। প্রকাশক ঃ করুণাকণা দাস, ৮৫৭ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া-৭১১১0৪। মূল্য ঃ পনেরো টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ছাত্রকৃতিত্ব

১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় **পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ ও নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের** ছাত্রগণ নিম্নলিখিত স্থান অধিকার করেছেঃ

পুরুলিয়া—২য়, ৪র্থ, ৮ম এবং ১০ম (দুজন)

নরেন্দ্রপুর—৪র্থ, ১১শ, এবং ১২শ

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের দুজন ছাত্র ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় অর্থবিদ্যা ও সংস্কৃতে ২য় স্থান অধিকার করেছে।

শিক্ষক সম্মানিত

চিঙ্গেলপত্তু আশ্রম পরিচালিত বয়েজ হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কার লাভ করেন।

মাদ্রাজ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজ্য সরকার প্রদত্ত ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কারে সম্মানিত হন।

ত্রাণ

অসম বন্যাত্রাণঃ শিলচর আশ্রমের মাধ্যমে কাছাড় জেলার উদারবন্দ, মারুয়া, অরুণাচল এবং অন্য পাঁচটি অঞ্চলের বাহান্নটি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৩৩৯৩টির মধ্যে ২৬৮৩টি শাড়ি, ২৬১৫টি ধুতি, ৫০৫৬টি বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ ৪৮০টি লণ্ঠন বিতরণ করা হয়েছে।

করিমগঞ্জ আশ্রমের মাধ্যমে করিমগঞ্জ জেলার ৩০টি গ্রামের ১৩৩৮টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ১০৪৮টি শাড়ি, ১০০০ ধুতি, ৩৯৪০টি শিশুদের পোশাক, ৮০ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ ২টিন বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

টরন্টো বেদান্ত সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় টরন্টো শহর থেকে ১২০ মাইল দূরে ক্যাম্প ওয়েসেনোস্কন (Camp Wesceneaskin) নামক এক নির্জন স্থানে গত ৭-৮ জুলাই দুদিনের এক রিট্রিট বা সাধনশিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। মোট ৩২জন ভক্ত এই শিবিরে যোগদান করেছিলেন। শিবির পরিচালনা করেছেন টরন্টো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। শিবিরে ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ এবং শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাও হয়। মূল শিবিরের অঙ্গ হিসাবে ২ থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা ৪ জুলাই একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে তারা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের কাহিনী এবং তাঁদের কথিত গল্প নিজ নিজ ভাষায় পরিবেশন করে।

দেহত্যাগ

স্বামী নারায়ণানন্দ (ইন্দু) গত ১১ সেপ্টেম্বর রাত্র ১০-৩০ মিঃ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর। গত ২৮ আগস্ট তিনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তার পূর্বে তিনি বহুমূত্ররোগে ভুগছিলেন।

স্বামী নারায়ণানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি দিল্লী, কনখল, মাদ্রাজ মঠ, পুরী মিশন, জয়রামবাটী প্রভৃতি কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। এছাড়া ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নোয়াখালি ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। অনাড়ম্বর জীবন ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ঝামাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলিকাতা-৯) গত ৫-৯ এপ্রিল পর্যন্ত সঙ্ঘের ১০ম বর্ষ পূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মীয় আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-সভাগুলিতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ, সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। উৎসবের প্রথম ও শেষদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

তেঁতুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, (মুর্শিদাবাদ) আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব উৎসব ১৩ ও ১৪ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুদিন ব্যাপী এই উৎসবের অঙ্গ ছিল বিশেষ পুজো, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, আলোচনা সভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। আলোচনা সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর আলোকে জাতীয় সংহতি এবং ধর্মসমন্বয়ের বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন স্বামী ভৈরবানন্দ, ডঃ হোসেনুর রহমান, ডঃ তাপস বসু প্রমুখ। সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেন রেবতীভূষণ মণ্ডল ও সহশিল্পীবৃন্দ।

ডিব্রুগড় রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি গত ৬ ও ৭ মে এবং ১২-১৪ মে বার্ষিক উৎসব এবং তার ষাট বর্ষপূর্তিতে হীরকজয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছে। এ-উপলক্ষে ভক্ত সম্মেলন, ধর্মীয় আলোচনা, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজাদি· জনসভা, প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি জনসভায় সভাপতিত্ব করেছেন ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কমলেশ্বর বোরা। প্রধান অতিথি ছিলেন ডিব্রুগড়ের ডেপুটি কমিশনার নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। উৎসবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রেখেছেন স্বামী সুমেধানন্দ, স্বামী অলোকানন্দ এবং স্বামী সুখাত্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উঃ ২৪-পরগনা—গত ১৭ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের ১২৭তম জন্মতিথিতে বিশেষপূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ· ভজন-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব উদ্‌যাপন করে। দুপুরে সহস্রাধিক ভক্ত-নর-নারীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

সাহেবপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) গত ২৩ জুলাই পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। দুপুরে বহু ভক্ত-নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও কুমারেশ দাশশর্মা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মানবেন্দ্র চক্রবর্তী।

অখিল ভারত রামকৃষ্ণ পরিষদ (কলিকাতা-৬৩) গত ৯ জুলাই কামালগাজী সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের যৌথ উদ্যোগে ঐ স্কুলে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তার ওপর এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল। বহু ছাত্র ও যুবক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। তাছাড়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন স্বামী গিরিজানন্দ, স্বামী সুপর্ণানন্দ, ডঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দার প্রমুখ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)-এর ১৩৫তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ২৩ জুলাই, রবিবার, স্কটিশচার্চ কলেজের অগিলভি হলে, সন্ধ্যায় **অয়ন** সংস্থার উদ্যোগে

শ্রীম-স্মরণানুষ্ঠানে শ্রীম-র জীবন ও তাঁর অমর সৃষ্টি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, ডঃ তাপস বসু, অধ্যাপিকা তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। ঐ অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মানসী বরাট। কৃষ্ণদাস পালিতের পরিচালনায় 'অয়ন'-এর শিল্পীবৃন্দ এবং অমিতাভ দত্ত সংগীতাঞ্জলি পরিবেশন করেন। এই স্মরণানুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রীম-র দৌহিত্রী এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কৃপাধন্যা স্নেহলতা গুপ্ত।

৪ ও ৫ জুন দিবসদ্বয় ব্যাপী **ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** অর্ধ-বার্ষিক সম্মেলন **কোনাবন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মঠে** সম্পন্ন হয়। এতে ভক্তসম্মেলন, ধর্মসভা, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজো ও পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কুড়িটি আশ্রমের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দ ও আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তিদানন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানধন্য **শ্যামপুকুরবাটীতে** গত ২৭ আগস্ট থেকে সঙ্ঘের তিনদিনব্যাপী 'দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস' অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। ভাষণ দান করেন স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী নিত্যরূপানন্দ, প্রব্রাজিকা শুদ্ধপ্রাণা, প্রণবেশ চক্রবর্তী ও নির্মাল্য বসু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গত ১১ জুন **নদীয়া, উত্তর ২৪-পরগনা এবং বর্ধমান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নবদ্বীপ সেবা-সমিতি প্রাঙ্গণে। তিনটি জেলা থেকে মোট ২৫টি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী প্রমেয়ানন্দ ও স্বামী বিমলাত্মানন্দ। এ-উপলক্ষে বিকালে এক ধর্মসভারও আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ শনিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত **কলাবেড়িয়া রামকৃষ্ণালয়** কেন্দ্রে বলাইলাল চিনির পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্বোধন করেন স্থানীয় মঠচণ্ডীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভবেশ্বরানন্দ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত** গত ৮ জুলাই '৮৯ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন শিলং জেল রোড গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। চিরকুমারী, রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিতা জ্যোৎস্না দেবী শিলং সারদা সঙ্ঘের প্রাক্তন সভানেত্রী ছিলেন এবং বহুজনসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শৈশবে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালীন সময়ে তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দর্শন ও স্নেহলাভে ধন্যা হয়েছিলেন।

আগরতলা রামকৃষ্ণ আশ্রম (বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন)-এর প্রবীণ কর্মী এবং শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **হরেন্দ্রচন্দ্র মহালনবীশ** গত ২৯ আগস্ট পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রমে আবাসিক কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। নিষ্ঠাবান কর্মী ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

বিগত ২৮ জুলাই, '৮৯ রাত্রি ১১টা ৪৫মিঃ-এ অধ্যাপক বনবিহারী ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী **কৃষ্ণভাবিনী দেবী** ৮৮ বছর বয়সে করজপরত অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তিনি বাগেরহাট ও কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

পেপটিক আলসার এবং ভাত বা রুটি খাওয়া

সম্প্রতি-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ৬৫জন ডিওডিন্যাল আলসার (Duodenal ulcer—অন্ত্রে ক্ষত) রোগীর খাদ্যতালিকা থেকে দেখা গিয়েছে—ভাত খাওয়া, আলসার হবার প্রবণতা বাড়ায় এবং অড়হর-ডাল ও গমের রুটি খেলে ঐ প্রবণতা কমে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও অসমে জনগণ প্রধানতঃ ভাত খায়, এবং সেখানে আলসার বেশি দেখা যায়। ঐসব অঞ্চলে যারা ভাত খায় না, তাদের আলসার কম হয়। রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের জনগণ সাধারণতঃ রুটি খায় এবং সেখানে আলসার কম দেখা যায়। সাধারণভাবে, আলসার হওয়ার একটি কারণ হলো পাকস্থলীতে বেশি অ্যাসিড নিঃসরণ হওয়া। ভাত ও রুটি খেলে অ্যাসিড নিঃসরণ একই হয় এবং অড়হর ডাল খেলে আরও বেশি অ্যাসিড আসে, তবে অ্যাসিড নষ্ট করার জন্য মিউসিন (mucin) তৈরি করার ক্ষমতা ভাতের কম, আটার বেশি এবং অড়হর ডালের আরও বেশি। দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিতে জল-হাওয়ার জন্য অড়হর ডাল চাষ হয় না। উত্তর প্রদেশে অড়হর ডাল খাওয়া খুবই প্রচলিত। তাছাড়া রুটি খাবার সময় চিবানো বেশি হয়, এবং ভাত কম চিবিয়ে গিলে খাওয়া হয়। চিবানোর সময় লালা নিঃসরণ বেশি হয় যেটা পাকস্থলীর অ্যাসিডকে নষ্ট করে। পেপটিক আলসার হওয়া সম্পর্কে এই তথ্যটিও মনে রাখতে হবে। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরকে ভাত, অড়হর ডাল এবং রুটি খাইয়ে, এবং ইঁদুরের পাকস্থলী-রস পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে অ্যাসিড এবং মিউসিন সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্যগুলি সত্য। ভাত-খাওয়া ইঁদুরের মধ্যে পেপটিক আলসার বেশি পাওয়া গিয়েছে। প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে—খাদ্যে ভাতের পরিমাণ কমিয়ে, রুটি বাড়িয়ে এবং ডাল যোগ করলে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে পেপটিক আলসার কমানো যেতে পারে।

[Ancient Science of Life,
January & April 1989
pp. 250-257]

স্যাকারিন খেলে কি ক্যানসার হয় ?

লোকে সাধারণতঃ যে পরিমাণে স্যাকারিন (saccharin) খায়, তাতে ক্যানসার হয়, এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইঁদুরকে স্যাকারিন খাইয়ে মূত্রাশয়ে (urinary bladder) ক্যানসার হতে দেখা গিয়েছে, তবে তাদের অত্যন্ত বেশি পরিমাণে স্যাকারিন খাওয়ানো হয়েছিল। যেসব ডায়াবেটিস রোগী, চিনির বদলে বেশি রকম স্যাকারিন বা অন্য কিছু খান, তাঁদের মূত্রাশয়ে ক্যানসার হবার সম্ভাবনার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

[British Medical Journal, 10 December
1988, p. 1535]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

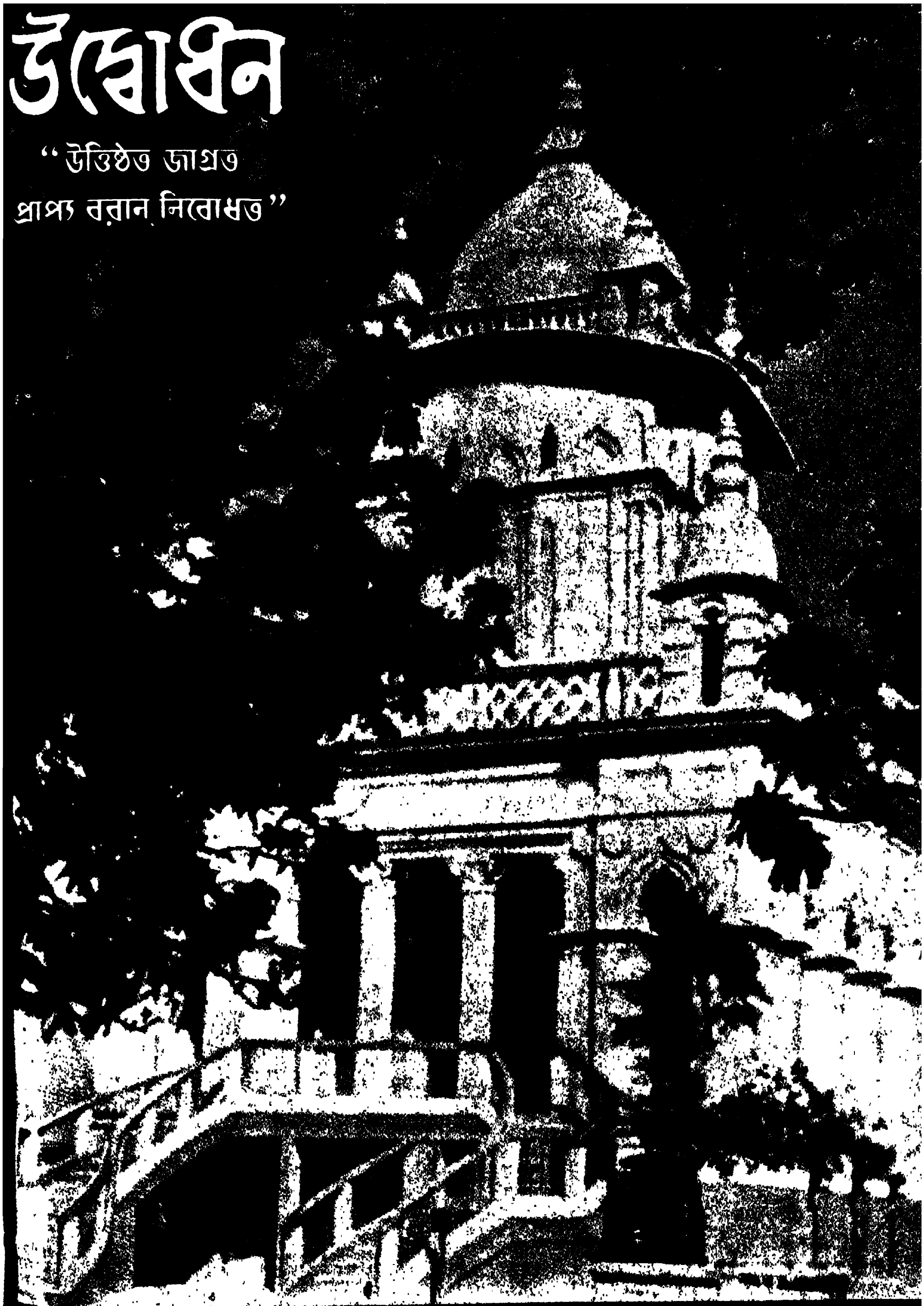

পৌষ ১৩৯৬ ৯১ তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা
উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ—১২শ সংখ্যা পৌষ, ১৩৯৬

দিব্য বাণী

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগতসেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

*

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণী করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥

স্বামী অভেদানন্দ

পরমাপ্রকৃতি দেবী মানবীরূপিণী
অভয়া বরদা জন-ত্রিতাপহারিণী।
আশ্রিত সেবকে কর সদানন্দময়
জগত-জননি নমি সারদে তোমায়॥

*

বেঁধেছ মোদের মন স্নেহের বন্ধনে
দোষসব গুণ করে নেছ নিজগুণে।
রাখিয়াছ স্নেহক্রোড়ে দোষী সবাকারে
অহেতুকী কৃপা তব কে বুঝিতে পারে॥

[স্বামী অভেদানন্দকৃত অনুবাদ]

কথাপ্রসঙ্গে

মমতাময়ী

বেলুড় মঠ। কয়েক বছর হইল সারদাদেবী মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার সমাধিভূমির উপর নির্মিত মন্দিরে জনৈকা মহিলা প্রণাম করিয়া সারদাদেবীর ছবির দিকে তাকাইয়া আছেন। সঙ্গে আঁচল ধরিয়া তাঁহার শিশুকন্যাটিও তাহাই করিতেছিল। একটু পরে দেখা গেল সে একবার ছবির দিকে তাকাইতেছে, একবার তাকাইতেছে তাহার নিজের মায়ের দিকে। ছবিতে যাঁহাকে দেখিতেছে তাঁহার সঙ্গে নিজের মায়ের মুখের কি সে মিল খুঁজিয়া পাইল? হ্যাঁ, তাহাই। সে তাহার মাকে প্রশ্ন করিলঃ "মা, এ ফটো তোমার কিনা বল, ঠিক করে বল, এ ফটো তোমার কিনা?" অবোধ শিশুকে মা আর কি বলিবেন! কিন্তু কন্যার প্রগল্‌ভ প্রশ্ন থামিতেই চায় না। বারবার ঐ একই প্রশ্নে সে তাহার মাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

স্বামী সারদেশানন্দ তখন শ্রীমায়ের মন্দিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীমা যখন স্থূলদেহে বর্তমান ছিলেন তখন তিনি তাঁহার অন্যতম সেবক ছিলেন। তাঁহার মনে হইল নিষ্পাপ শিশুটি মিথ্যা বলে নাই। সে তাহার অজ্ঞাতসারে যথার্থ সত্যের উপরেই আলোকপাত করিয়াছে। মন্দিরে স্থাপিত শ্রীমায়ের ছবিকে তাহার নিজের মায়ের ছবি বলিয়াই মনে হইয়াছে। সারদেশানন্দজী লিখিতেছেনঃ "শিশুর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সত্যই সত্য উদ্ভাসিত—এই মা-ই তো সকল মায়ের অন্তরে।" বাস্তবিক শ্রীমা সারদাদেবী জগতের মাঃ "নিখিল মাতৃহৃদয়সাগরমন্থনসুধামূরতি।" অপাপবিদ্ধ শিশুর দৃষ্টিতে সেই পরম সত্যটিই ধরা পড়িয়াছে। শুধু তাহার মা-ই নহে, জগতের সকল মায়ের মুখই ঐ মায়ের মুখে বসানো রহিয়াছে, আবার ঐ মায়ের মুখই সকল মায়ের মুখে প্রতিবিম্বিত।

মায়ের জীবন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, অথচ ব্যঞ্জনায় দূরবগাহী। এক নিঃসন্তান নিরক্ষর সাধারণ বিধবা গ্রাম্য নারী কিভাবে জগতের মা হইয়া যাইলেন, সে কাহিনী উপন্যাসের চাহিতেও সম্মোহক, মহাকাব্যের চাহিতেও উদ্দীপনাময়ী। অথচ প্রতিদিনের সূর্য-উঠার ন্যায় একান্তভাবেই সত্য সেই কাহিনী। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র ঘটনার শুধু উল্লেখ করিব। ঘটনাগুলিই বুঝাইয়া দিবে একটি সন্তানকেও গর্ভে ধারণ না করিয়া মা কিভাবে অগণিত সন্তানের "সত্য সত্য জননী" হইয়াছিলেন। যে-ই মায়ের স্নেহসান্নিধ্যে আসিয়াছে, সে-ই অনিবার্যভাবে অনুভব করিয়াছেঃ "এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মা-ও বাসিতে পারেন?...কে জানিত সে মা এইরূপ মা—এইরকম করিয়া মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়া আপনার হইতেও আপনার করিয়া নিবেন!"

মায়ের সেবক স্বামী অরূপানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী রাসবিহারী) জয়রামবাটীতে মায়ের 'নূতন বাড়ি' নির্মাণের কাজ দেখাশুনা করেন। একদিন বিশেষ জরুরী কোন প্রয়োজনে তাঁহাকে নিকটবর্তী একটি গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। দুপুরে খাইবার সময় তিনি ফিরিতে পারিলেন না। সকলের খাওয়া হইয়া গেল। কিন্তু মা খাইলেন না। সকলের সব অনুরোধ ব্যর্থ হইল। মা বলিলেনঃ "রাসবিহারী আসুক। তারপর খাব 'খন।" দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইল, তখনও রাসবিহারী মহারাজ ফিরিলেন না। এত দেরি হইতেছে দেখিয়া মা বেশ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝেই খোঁজ লইতেছেন রাসবিহারী মহারাজ আসিলেন কিনা। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া উদ্বেগে বারবার ঘর-বাহির করিতেছেন। অবশেষে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে রাসবিহারী মহারাজ ফিরিলেন। আসামাত্রই তিনি শুনিলেন মা তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া খুবই চিন্তা করিতেছেন এবং তখনও পর্যন্ত না খাইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার বিলম্বের কারণ বলিলেন এবং ব্যথিত কণ্ঠে অনুযোগ করিলেনঃ "মা, তোমার শরীর ভাল নয়, আর তুমি এই সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাসী রয়েছ?" সন্তানকে ফিরিতে দেখিয়া মায়ের মুখে তখন স্বস্তির হাসি ফুটিয়াছে। কোমল কণ্ঠে শুধু বলিলেনঃ "বাবা, তোমার খাওয়া হয়নি, আমি কি করে খাব?"

মায়ের শেষ অসুখের সময় উদ্বোধনে একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ মায়ের জনৈক সেবক দেখিলেন পথ্য গ্রহণের পর মা খাটে শুইয়া আছেন। সেবক ভাবিলেন পাখা করিলে হয়তো মা আরাম পাইবেন এবং ঘুমাইয়া পড়িবেন। তিনি হাতপাখা লইয়া হাওয়া করিতে শুরু করিলেন। কয়েক মুহূর্তও হয় নাই—মা ব্যস্তভাবে বলিলেনঃ "আর না, তোমার হাত ব্যথা করছে।" সেবক বলিলেনঃ "হাতপাখায় এত তাড়াতাড়ি ব্যথা হয় না। ব্যথা হলেই আমি থামব। আপনি ব্যস্ত হবেন না।" সেবকের কথায় মা চোখ বুজিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বলিলেনঃ "না, বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে; থাক্, আমি অমনি ঘুমুচ্ছি।" সেবক থামিলেন না। দু-এক মিনিট যাইতে না যাইতে মিনতির স্বরে মা বলিলেনঃ "বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে ভেবে আমার ঘুম আসছে না। তুমি পাখা বন্ধ কর, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।" সেবককে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল।

মা আছেন জয়রামবাটীতে। দূরদেশ হইতে এক ভক্ত আসিয়াছেন। তিন-চার দিন আছেন। তাঁহার ইচ্ছা মায়ের গৃহীত অন্নের কিছুটা শুকাইয়া বাড়িতে লইয়া যাইবেন। মাকে তাঁহার ইচ্ছার কথা তিনি জানাইলেন। ভক্তটির ফিরিবার পূর্বদিন দুপুরে আহারের পর মা একটি রেকাবিতে করিয়া কিছু ভাত ভক্তটিকে দিয়া বলিলেনঃ "এই গো, তোমার সেই জিনিস।" ভক্তটি তাহা পাইয়া মহানন্দে রোদে শুকাইতে দিলেন। মা তখন তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেনঃ "দেখো, যেন কাকে মুখ না দেয়।" ভক্তটি মাকে আশ্বস্ত করিলেন। মা বারান্দায় বসিয়া, ভক্তটি অদূরে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। ভক্তটির আবার তামাক খাওয়ার অভ্যেস ছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি ভাবিলেন, একবার ঘরে গিয়া তামাকটা খাইয়া আসি। এখুনি চলিয়া আসিব। তামাক খাইতে খাইতে প্রসাদের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন। তামাকের আবেশে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন তা তাঁহার হুঁশ নাই। যখন ঘুম ভাঙিল তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙামাত্র প্রসাদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া গিয়া দেখেন মা সেখানে একই জায়গায় একইভাবে বসিয়া আছেন। দেখিয়া ভক্তটির লজ্জার সীমা রহিল না। কোনরকমে মাকে বলিলেনঃ "মা, আজ আপনার বিশ্রাম হয়নি ?" মা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ "না বাবা, তোমার ওটিতে পাছে কাকে মুখ দেয়, তাই বসে আছি।"

জয়রামবাটীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম হইতে এক দরিদ্র মুসলমান কয়েকটি কলা লইয়া মায়ের বাড়িতে আসিয়াছে। মাকে খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে সে বলিলঃ "মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন ?" মা খুব আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়াইয়া বলিলেনঃ "খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বই কি।" জনৈকা মহিলা ভক্ত সেখানে ছিলেন। ঐ লোকটির পাশের গ্রামেই তাঁহার বাড়ি। তিনি তৎক্ষণাৎ মাকে বলিলেনঃ "ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন ?" মা তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া কলাগুলি ঠাকুরের পূজার জন্য যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলেন এবং লোকটিকে মুড়ি-মিষ্টি দিলেন। সে খুশি হইয়া চলিয়া গেল। মা তখন গম্ভীর কণ্ঠে পূর্বোক্ত মহিলাকে বলিলেনঃ "কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি। ভাঙতে পারে সবাই, গড়তে পারে কজন ?"

বাগবাজারে মায়ের কাছে জনৈকা অসৎচরিত্রা মহিলার আসা লইয়া একবার ভক্তমহলে, বিশেষ করিয়া মহিলা ভক্তদের মধ্যে, আলোড়ন শুরু হয়। জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাভক্ত বলিয়া পাঠাইলেন যদি ঐ মহিলা মায়ের কাছে আসে তাহা হইলে তিনি আর মায়ের বাড়িতে আসিতে পারিবেন না। ঠাকুরের সময় হইতে ভক্তটির পরিবারের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের গভীরতম সংযোগ। কথাটি মায়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিষ্কম্প কণ্ঠে বলিলেনঃ "সে যদি না আসতে চায়, আসবে না। কিন্তু ও আমার কাছে আসবে। যদি তাতে কেউই এখানে না আসে তাহলেও ওকে আমি আসতে বারণ করতে পারব না।"

সন্ন্যাসি-সন্তানদের সন্ন্যাস-নাম ধরিয়া তিনি ডাকিতে পারিতেন না বা সন্ন্যাস-নামে তাঁহাদের উল্লেখ করিতেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেনঃ "আমি মা কিনা, সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে প্রাণে লাগে।" আবার, সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের নেত্রী হিসাবে আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে এই পরম মমতাময়ীকে চরম নির্মমও হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অন্তরস্থিত মমতাময়ী জননীকে তিনি সেক্ষেত্রেও প্রাণপণে প্রয়াস করিয়াও আড়াল করিতে পারেন নাই। এক চক্ষুতে অগ্নিবর্ষণ, অপর চক্ষুতে অশ্রুবর্ষণ—একই সঙ্গে দুই-ই হইয়াছে। আদর্শচ্যুতির অপরাধে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত পরম প্রিয় এক সেবক-সন্তানের বিদায়কালে মা কাঁদিতেছেন, সন্তানও কাঁদিতেছেন। খানিক পরে মা বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া সন্তানকে কলঘরে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিতে বলিলেন। তারপর পরম মমতায় সন্তানের মাথায় হাত বুলাইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেনঃ "আমায় ভুলো না।" সন্তানও ধরা-গলায় বলিলেনঃ "মা, আপনি?" মা বলিলেনঃ "মা কি কখনও ভুলতে পারে? জেনো, আমি সব সময় তোমার কাছে আছি।" সন্তান পথে নামিলেন। জননী জানালায় দাঁড়াইয়া আছেন। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সন্তানের দিকে অশ্রু-সজল নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

আমরা এতক্ষণ মায়ের দিক হইতেই মমতার আকার দেখাইয়াছি। তাঁহার মমতা কিভাবে অপরকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। দৃষ্টান্তটি একটি অনন্যসাধারণ মুমূর্ষু বালকের। বালকটির বয়স নয় কি দশ বৎসর। অনাথ এই বালক মায়ের বাড়িতে থাকিত। দুরারোগ্য ব্যাধিতে সে আক্রান্ত। তাঁহাকে বাঁচাইবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। অবশেষে অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু তখনও তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ রহিয়াছে। মা তাহার বিদায়-মুহূর্ত আসন্ন জানিয়া নির্দেশ দিলেন তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে যাহাতে সেখানে সে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে। যখন সে-ব্যবস্থা হইল তখন নির্ভীক বালক জিজ্ঞাসা করিলঃ "তাহলে আমার মৃত্যু কি নিকটে?" "মায়ের আদেশ" বলিয়া সকলে তাহার প্রশ্নকে এড়াইয়া গেলেন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বলিলঃ "নিশ্চয়ই। মাকে আমার প্রণাম। তাঁর কথা তো শুনতেই হবে। আপনারা আমাকে নিয়ে চলুন।" তখন শয্যাশুদ্ধ তাহাকে সকলে বাহিরে লইয়া আসিলেন। মা বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আনত-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। চোখ দিয়া অবিরল অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বালকের সারা গায়ে গঙ্গামাটি দিয়া প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার নাম লিখিতে লাগিলেন। বালক প্রশ্ন করিল "তোমরা কি লিখছ আমার গায়ে?" স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বলিলেনঃ "দেবতাদের নাম লিখছি। প্রথমে লিখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপর শ্রীকৃষ্ণ, তারপর অন্যান্য দেবতার নাম।" ছেলেটি শুইয়া শুইয়া নামগুলি দেখিল। তাহার পর বলিলঃ "সব নাম মুছে শুধু একটি নাম লেখ—সারদা। ঐ নামটি নিয়েই এতদিন বেঁচেছি—মরণের সময় ঐ নামটি নিয়েই আমি যাব।" তাহাই করা হইল। বালকের মুখ তখন অপূর্ব এক তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃষ্টি মায়ের দিকে—মায়ের কাছে সে শেষ বিদায় চাহিতেছে। মা এতক্ষণ নীরবে কাঁদিতেছিলেন, আর সামলাইতে পারিলেন না। ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলে বালককে কাঁধে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া চলিলেন। সমস্ত পথ সে চমৎকার কথা বলিতেছিল। নদীতীরে পৌঁছানো-মাত্র তাহার কণ্ঠ নীরব হইল। শয্যা নামানো হইলে সবাই দেখিল সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

বালক চলিয়া গেল। পড়িয়া রহিল তাহার নিস্পন্দ দেহখানি—যাহার উপর অগ্নির অক্ষরে লেখা রহিয়াছে একটি নাম—সারদা। সে তাহার জীবন দিয়া বুঝাইয়া দিল—যে দেহটি সে নদীতীরে ফেলিয়া গেল সেই দেহটি যাঁহার নিকট হইতে সে পাইয়াছিল তিনি তাহার এই জীবনের জননী, আর সেই দেহে যাঁহার নাম বহন করিয়া জীবননদীর পরপারে সে চলিল তিনি তাহার জন্মজন্মান্তরের জননী, অনন্ত জীবন ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক।

সত্যিকারের মা

স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

মায়ের পরিচয় তিনি মা। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের আসন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। মা বহু কষ্ট সহ্য করেন তাঁর সন্তানের জন্য, কুপুত্র হলেও মা চিরদিন মা-ই থাকেন। মা সন্তানকে ঘিরে থাকেন তাঁর কল্যাণকারিণী সমস্ত শক্তি দিয়ে, দুঃখে-বিপদে মনপ্রাণ দিয়ে সন্তানের পাশে থাকেন অবিচল। মায়ের ভালবাসা শুধু অনুভবই করা যায়। সর্বদেশে সর্বকালে শিশুর কাছে মায়ের মতো আপনজন আর কেউ নেই। শুধু মানুষেরই নয়, পশুপক্ষীরও সন্তান-স্নেহ মানুষ-মায়ের চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ্রীমা কে? তিনি সকল মায়ের সমষ্টি, জগতের সব মায়ের স্নেহভালবাসা দিয়ে গড়া অনুপম মাতৃমূর্তি। তাই তাঁর স্নেহে ভাল-মন্দের বিচার নেই, পাপী-পুণ্যবানের ভেদ নেই, সাধু-গৃহীর গণ্ডি নেই। সকলের ওপর তা সমভাবে বর্ষিত।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দিব্যজীবনের প্রথম ও শেষ কথা তিনি মা। বিশ্বমাতৃত্বের ভাবঘনমূর্তি তিনি। তিনি সতের মা, অসতের মা, ধনীর মা, নির্ধনের মা, পতিতের মা, অনাথ-কাঙালের মা। তিনি স্বদেশের মানুষের মা, তিনি বিদেশের মানুষের মা। তিনি সকলের মা।

মা ভালবেসে সকলকে কাছে টেনেছিলেন। ভালবাসা দিয়েই সকলকে এনেছিলেন দেহাতীত চেতনায়। মা যেন পতিতপাবনী গঙ্গা। পাপহারিণী গঙ্গার মতোই মা সকলের পাপতাপকে ধুয়ে মুছে আপন অঙ্কে স্থাপন করেছিলেন। জগতের গোলক ধাঁধায় পড়ে মানুষের জীবন হয় ক্ষতবিক্ষত। কে দেবে এখানে শান্তি-সন্ধান? শাস্ত্রজালে জীবনরহস্যের সমাধান সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব হয় না। বরং বিভ্রান্ত হয়ে সে শোনেঃ 'তোমার কৃত দুষ্কর্মের জন্য তুমি নরকগামী হবে।' এহেন পরিস্থিতিতে সে শোনে এই অভয়বাণীঃ "মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন"; অথবা "ভয় কি, বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি?" অথবা "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। তোমাদের ভাবনা কি?" অথবা "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে"; অথবা "কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে। আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখ যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।" এতে যে স্বস্তি, যে নির্ভরতা, যে সাহস সে পায় তার কি কোন তুলনা আছে? এই অভয়-আশ্বাসের আকর্ষণে দেশ-বিদেশের নরনারী এসেছেন মায়ের কাছে। তাঁদের আচরণ, তাঁদের ভাষা, তাঁদের রুচির ব্যবধান সবকিছুই যেন মুছে যেত তাঁর বিশ্বপ্রসারিত মাতৃস্নেহের কাছে। সেখানে চলত অন্তরের ভাষার সংলাপ, যার কাছে লৌকিক ভাষার মূল্য অতি সামান্য।

মা নিজ ঐশী শক্তিতে বুঝতে পেরেছিলেন, যে যুগপ্রয়োজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব তাতে তাঁকেই পূর্ণতা সম্পাদন করতে হবে। আর বিশ্বের সকল দুর্জয় শক্তি মাতৃস্নেহের কাছে হয় পরাভূত। ঠাকুর মাকে একদিন বলেছিলেন, দায় কি শুধু তাঁর একার? মাকেও তাঁর কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। একদিন গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "তুমি কিরকম মা?" মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেনঃ "আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য জননী।" শ্রীমায়ের এই কথার অন্তরালে গূঢ় রহস্য রয়েছে। তিনি শুধু আমাদের এক

জন্মের মা নন, জন্মজন্মান্তরের মা। পূর্ব পূর্ব জন্মে শত শত আত্মীয় স্বজন পেয়েছিলাম, এজন্মেও পেয়েছি, পরজন্মেও পাব। এসবই অনিত্য, আমাদের দেহও অনিত্য, কিন্তু জীবাত্মা হিসাবে আমরা নিত্য। প্রতি জন্মেই আমরা একটি করে গর্ভধারিণী মা পেয়েছি, তাঁদের কাছ থেকে মাতৃস্নেহও পেয়েছি। কিন্তু তাঁরা কেউই আমাদের চিরকালের মা নন, এক-একটি জীবনের মা। কিন্তু যিনি জগজ্জননী, যিনি সৃষ্টির অন্তর্গত সকল মানুষ, কীটপতঙ্গ পশুপক্ষীর মা, তিনি আমাদের চিরদিনের মা, জন্মজন্মান্তরের মা। প্রতি জন্মেই জীব জন্মে মায়ের মাধ্যমে। পশুপক্ষীরূপিণী মা, মানবী মা, যে মা-ই হোন না কেন, তাঁর মাধ্যমে জগন্মাতারই স্নেহের আংশিক স্পর্শ আমরা পেয়েছি। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যে সেই জগন্মাতা, আমাদের সকলেরই জন্মজন্মান্তরের মা। মানবদেহ ধারণ করে থাকলেও নিজ মানবদেহ ধারণ করে তাঁর জগন্মাতৃত্ব তিনি যে বিস্মৃত নন, তা তিনি কখনো সুস্পষ্টভাবে, কখনো ইঙ্গিতে বলেছেনঃ "ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই আমার সন্তান। আমি এই পিঁপড়েটিরও মা।" এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি সন্তান হিসাবে দেখেন, সেকথাও তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন। ক্ষমাও তাঁর কাছে ছোট কথা। তিনি বলছেন, মায়ের কাছে ছেলের কোন অপরাধই হয় না, সন্তানের কাছে এর চেয়ে বড় আশ্বাসবাণী আর কি হতে পারে? মায়ের কাছে ছেলের যখন অপরাধ হয় না, আমরা কি তাহলে চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা ছেড়ে, সাধনভজন ছেড়ে বেপরোয়াভাবে চলব? চলতে পারি, যদি শ্রীশ্রীমাকে আমাদের আপনার মা বলে, জন্মজন্মান্তরের মা বলে, জগন্মাতা বলে ঠিকঠিক বোধ সর্বদা সজাগ থাকে? এই ভাব রক্ষার জন্যই সাধনভজন প্রয়োজন।

ভালবাসার প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের চেয়েও অধিক পরিমাণে দেখা যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে। জনৈকা অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে চলে যেতে বললে মা তাকে নিজের কাছে ডেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। জনৈক স্ত্রীভক্ত একদা শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের খাবার এনে দেন। পরে শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ স্ত্রীভক্তটির হাত দিয়ে খাবার পাঠাতে নিষেধ করেন। বলেন, ওর স্পর্শ-করা খাবার গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মা সেদিন করজোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তাঁর কাছে মা বলে কেউ কিছু চাইলে তিনি না করতে পারবেন না। আর একদিনের ঘটনা, একজন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়িয়েছেন মায়ের দুয়ারে। নিজকৃত দুষ্কর্মের, নিজ অপবিত্রতার কথা ভেবে ভয়ে মায়ের ঘরে প্রবেশ করতে পারছেন না, পাছে সেই পবিত্র ঘর অপবিত্র হয়। মা বাইরে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ "এস, মা ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও—ভয় কি?" ভালবাসায় আপনার করে নেওয়ার এরকম ঘটনা মায়ের জীবনে অসংখ্য।

আমরা শ্রীশ্রীমায়ের এই অদ্ভুত করুণারূপিণী মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। মাকে দেখা গেছে সাধারণ মানুষ যেমন সংসার করে, সেভাবে আত্মীয়স্বজন পরিবৃত অবস্থায়। তাঁকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন চিন্তাধারার ও সংস্কারের মানুষ। আছে রাধারানী ও তার পাগলী মা, শুচিবাইগ্রস্তা নলিনী-দিদি। তারা মাকে সর্বদা নিজ নিজ আচরণে জর্জরিত করছে, কিন্তু মা আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে এসব জাগতিক ভাবের ঊর্ধ্বে অতি সহজেই নিজেকে সর্বদা তুলে রাখছেন।

শ্রীশ্রীমাকে যখনই আমরা জগজ্জননীরূপে পাই, তখনই আমাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে তাঁর অমোঘ জ্ঞানদায়িনী শক্তি, যখনই তাঁকে দেখতে চাই গুরুরূপে, তখনই তিনি মাতৃরূপে আমাদের বুকে টেনে নেন, আবার গুরু ও জননীরূপে তাঁকে ধরতে গিয়ে দেখি তিনি সমস্তের ঊর্ধ্বে দেবীরূপে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। কিন্তু সবার উপরে তিনি মা। নিত্য প্রবাহিনী সুরধুনীর মতোই মানুষের পাপ তাপ ধুয়ে মুছে নেবার জন্য; তাপিতের তাপ হরণের জন্য, ভক্ত-হৃদয়কে প্রেম ও শান্তির সুবাসে ভরিয়ে দেবার জন্য পরমকল্যাণময়ী বিশ্বজননী আমাদের মা হয়ে এবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কামারপুকুরের পুণ্য ভূমিখণ্ড এবং সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুরের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানগণের আশ্রয়ের জন্য শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। মায়ের নিজের কথা—"তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে।"[১] রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শ্রীমায়ের সেই প্রার্থনার ফলশ্রুতি। স্বামী বিবেকানন্দ বলরাম মন্দিরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহূত সভায় শ্রীশ্রীমাকে 'সংঘজননী' রূপে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছিলেন।[২] স্বামীজী মঠের সমস্ত রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শ্রীমায়ের সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন প্রার্থনা করতেন এবং শ্রীমায়ের নির্দেশ ও ইচ্ছাকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতেন। মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজও ভুবনেশ্বরে মঠ স্থাপন করার পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন এবং মা সন্তোষ প্রকাশ করে ঠাকুরের কৃপায় শুভ কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।[৩]

কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারেও মায়ের ইচ্ছা ও আগ্রহই মহারাজ ও সারদানন্দ মহারাজের কাছে চূড়ান্ত মনে হয়েছে। পারিবারিক একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে লাহাবাবুদের সঙ্গে রামলাল-দা প্রভৃতির মনকষাকষির সম্ভাবনা দেখা দেয়। একদিন জয়রামবাটীর নিকটবর্তী বদনগঞ্জ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক এবং মায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রবোধবাবুর (প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের)* সঙ্গে শ্রীমা কথা বলছেন। "কথা প্রসঙ্গে প্রবোধবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন যে, এই ব্যাপারে লাহাবাবুরা বিরক্ত হইবেন এবং ভবিষ্যতে কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণে হয়তো বাধা দিবেন। অবশ্য প্রবোধবাবুর মতে তাহাতেও ক্ষতি ছিল না ; কারণ ঠাকুর মঠ-মন্দিরের জন্য বসিয়া নাই, আর এমন মঠ-মন্দির পূর্বেই বহু জায়গায় হইয়া গিয়াছে। মা ইহা শুনিয়া ঈষৎ ক্ষুন্নস্বরে কহিলেন—'ও কি কথা গো ? ঠাকুরের জন্মস্থান পুণ্যস্থান, মহাপীঠস্থান, তীর্থভূমি। ও-রকম বলতে আছে' ?"[৪] ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই যথেষ্ট—কামারপুকুরে মন্দির হবেই এবং হয়েছেও। মন্দিরের জন্য ঠাকুরের ভিটার সংলগ্ন জমি ক্রয়ের ব্যাপারে শ্রীমায়ের যে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল তা স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' বইটি থেকে জানা যায়ঃ

"কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান সংলগ্ন জমি 'গোঁসাইয়ের ভিটা' ক্রয় করিয়া মন্দির আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠার জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ঐ জমির মালিক লাহাবাবুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভার প্রবোধবাবুর উপরে দিয়াছেন। প্রবোধবাবু সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে যাতায়াত করেন। মাতাঠাকুরানীর ঐ

---

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং (১৩৭৫), পৃঃ ৪২৭-৪২৮

২ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ (১৩৭০); পৃঃ ২০১

৩ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয় (১৩৮৯), পৃঃ ৯৪-৯৫

* প্রবন্ধ-লেখক প্রবোধবাবুর পুত্র।

৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫৪৫

বিষয়ে আগ্রহ রহিয়াছে, সেজন্য প্রবোধবাবু সময় সময় আসিয়া তাঁহাকে খবর দিয়া যান, কতদূরে কি হইল।"৫

এ-সম্বন্ধে প্রবোধবাবুকে লেখা স্বামী সারদানন্দের দু-একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। পুরী থেকে ২৮ নভেম্বর ১৯১৭ লিখছেনঃ "কামারপুকুরে মন্দিরার্থ জমি ক্রয়ের বাবতে ২৯০ টাকা শ্রীশ্রীমার নিকটে পাঠানো হইয়াছে। তুমি তাঁহার নিকটে যাইলেই পাইবে। লাহাবাবুদের সকল শরিককে গোঘাটে লইয়া যাইয়া রেজেস্ট্রি করাইয়া লওয়াই আমাদের মত —একথা ইতিপূর্বে তোমাকে জানাইয়াছি।... শ্রীমহারাজের আশীর্বাদ জানিবে। তাঁহার ইচ্ছা যতশীঘ্র পার কামারপুকুরের মন্দিরার্থ জমিটি ক্রয় ও রেজেস্ট্রি করিয়া লও।..."

কলকাতা থেকে ৪ পৌষ ১৩২৪ (১৯১৭) লিখছেনঃ "কামারপুকুর মন্দিরের জমির বাবতে ১২৫ টাকা তোমাকে কল্য পাঠান হইয়াছে। প্রাপ্তি-সংবাদ দানে সুখী করিবে। লাহাবাবুদের যে দুইজন শরিকের দলিল রেজেস্ট্রি করা এখন হইল না তাঁহারা কতদিন নাগাদ উহা করিয়া দিবেন তাহা জানাইবে।... শ্রীমহারাজ জমি রেজেস্ট্রি হইয়াছে জানিয়া সুখী। ঐ সম্বন্ধে কেশবানন্দের এক পত্রও পাইয়াছি।" কলকাতা থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৪ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেনঃ "রেজেস্ট্রি কাজ শেষ হইয়াছে জানিয়া খুশি হইলাম। এখন লাহাবাবুদের নিকট হইতে পুকুরপাড়ের জায়গাটুকু যদি কিনিতে পার অবসর মতো চেষ্টা দেখিও।"

এই জমি কেনার কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে শুনে শ্রীশ্রীমা যে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন তা 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' বইটি থেকেই জানা যায়ঃ

"আজ লাহাবাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা দরদস্তুর অনেকটা পাকাপাকি স্থির করিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে (প্রবোধবাবু) মায়ের বাড়ি আসিবেন মাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সব কথা বলিবার জন্য।... কামারপুকুরের ভাল খবর শুনিয়া মা বিশেষ আনন্দিত।"৬

কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দির ও আশ্রম ইত্যাদির জন্য গোঁসায়ের ভিটেটুকু ছাড়াও শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের দেহান্তের পরেও অনেক জমি ক্রয় করা হয়েছে। এই সব জমিক্রয়, মন্দির ও আশ্রম নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সবই করেছেন পরবর্তী কালের সন্ন্যাসী সন্তানগণ। ফলতঃ শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেনঃ "ঠাকুরের জন্মস্থান পুণ্যস্থান মহাপীঠস্থান, তীর্থভূমি।" সেই তীর্থভূমির আকর্ষণে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ ভক্তিবিনম্র চিত্তে কামারপুকুর তীর্থদর্শনে আসেন এবং ধন্য হন।

পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন কতকাল আগে লিখেছিলেনঃ

অযোধ্যাসদৃশ এই কামারপুকুর।
যেইখানে বাল্যলীলা হৈল শ্রীপ্রভুর॥
তথায় বসতি করে যত নরনারী।
পশুপাখী তৃণ আদি গুল্মলতা করী॥
শ্রীপাদবন্দন করি জুড়ি দুই করে।
পদরজ দিয়া রাখ অধম পামরে॥৭

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজ শ্রীশ্রীমায়ের অভিপ্রেত ও আশীর্বাদধন্য কাজ। মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলি প্রভুর শরীর। তাদের প্রত্যেকটির ওপর সঙ্ঘজননীর সদাজাগ্রত স্নেহদৃষ্টি আছে ; কিন্তু কামারপুকুরের পুণ্য ভূমিখণ্ডে তাঁর যে বিশেষ দৃষ্টি আছে, একথা যেন আমরা কেউ ভুলে না যাই।

---

৫ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৮১

৬ ঐ. পৃঃ ১৮১-১৮৩

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি. ৮ম সং (১৩৭৮), পৃঃ ১১

অনন্যা, অপরূপা সারদা

সুজাতা সেন

নদীর ওপর দিয়ে একটি জাহাজ চলে গেল। যাবার কালে তার চতুর্দিকে একটা আলোড়ন হলো ঠিকই, কিন্তু বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া গেল তখন, যখন জাহাজের জলকাটা ঢেউগুলো ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হয়ে দূরে নদীর পাড়ে এসে আছড়ে পড়ল। ঢেউয়ের ধাক্কা জাহাজের গুরুত্বকে স্বীকার করায়। মায়ের ভাবধারাও তেমনি তৎকালীন সমাজের বুকে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর তিরোধানের সত্তর বছর পরে তার ঢেউ বহুগুণে স্ফীত হয়ে বর্তমান যুগের চিন্তাশীল সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে। এই কম্পন আমরা এখন ক্রমে অনুভব করতে পারছি।

আমাদের প্রতিটি সমস্যা ও সঙ্কটের দ্বারে দ্বারে মায়ের কৃপারশ্মি এসে করাঘাত করছে। যেন প্রতিটি রন্ধ্রপথে তা ঢুকে যেতে চায়। বলছেঃ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!" তাঁকে ছাড়া আমাদের বাঁচবার পথ আর নেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ধ্যানে, কর্মে, নিদ্রায়, স্বপ্নে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের একমাত্র বাঁচবার পথ।

ঠাকুর জগতের মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি যা বলে গিয়েছেন তা আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না, ধরতে পারি না। পাখির বুলির মতো আবৃত্তি করি মাত্র। তাই অসীম কৃপাময়ী শক্তিরূপিণী মা এলেন কাছের মানুষটি হয়ে একেবারে হাত ধরে ঠাকুরের আদর্শকে আমাদের দেখাবেন বলে। অশেষ দুঃখকষ্ট স্বীকার করে সুদীর্ঘকাল মা আমাদের জন্য গার্হস্থ্যজীবন যাপন করলেন।

পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে মা সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের ওপর তাঁর ভাবনার আলোক বিকীরণ করে গিয়েছেন। কারণ একটি গৃহস্থের পারিবারিক জীবন ছাড়াও আছে সামাজিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, যার মধ্যে দিয়ে তার ব্যাপ্তি ঘটে, সে সম্প্রসারিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রের এই ভূমিকাগুলোর চিন্তাধারারও মোটামুটি একটি ছবি মা এঁকে দিয়েছেন।

তাই গৃহস্থের দাবি—মা ষোল আনা আমাদের। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আমাদের চাই না। হলুদমাখা হাত, ধানের গাদার পাশে মাটির বারান্দায় বসা স্নেহবিগলিতা মাকেই আমরা চিনি—তাঁকেই আমরা চাই। শুধু আমাদের জন্যই মা গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ কেমন করে সহজভাবে, সংসারের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিরাটের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সংসারের বিপুল কর্মকাণ্ড সেই বিরাটেরই মঞ্চ। এই বিশেষ সূত্রটি মা সংসারী মানুষের কাছে ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। ছোট্ট একটি সংসারকে কেন্দ্র করে একটি অসম্পূর্ণ মানুষ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তার খণ্ড ব্যক্তিসত্তা সংসারের মাঝে বহুজনের হিতার্থে, বহুজনের সুখার্থে অখণ্ড সত্তার মাঝে বিলীন হয়ে যায়। সংসারের এই কর্মকাণ্ডই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবার একটি পথ।

আহারে-বিহারে, ভাবে-ভঙ্গিতে মা ছিলেন অনন্যা। তাঁর চিন্তাধারাও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। মা আবির্ভূতা হলেন নৈঃশব্দের পণ নিয়ে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী এলেন বেদ-বেদান্ত, কাব্য-মহাকাব্য, কাহিনী-কিংবদন্তীর নায়িকা হয়ে—আর মা এলেন আত্মগোপন করে। মা গার্গীর প্রজ্ঞা, সীতার পাতিব্রত্য, সাবিত্রীর দৃঢ়তা, দময়ন্তীর তেজস্বিতা, খনা-লীলাবতীর জ্ঞান নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করেই রইলেন। দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের স্বল্পালোকে দিনের পর দিন কাটালেন। সীতার বনবাস-জীবন অপেক্ষা সে-জীবন বড় সুখের ছিল না। হয়তো দিনে একবার মা দূর থেকে ঠাকুরের দর্শন পেতেন। কোনদিন বা সে সৌভাগ্যও হতো না। স্বয়ং শ্রীমুখে বলেছেনঃ "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে কীর্তনের আখর

শুনতুম, পায়ে বাত ধরে গেল। মনকে বোঝাতুম—তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ তাঁর দর্শন পাবি?" কোন ইতিহাস নেই যা এই কাহিনীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিতে পারে, কোন মহাকাব্য নেই যা এই আত্মবিলয়ের মহিমা কীর্তন করতে পারে।

মায়ের আবির্ভাবের কাল এবং সামাজিক পটভূমিকার দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখি, তখনকার নারীসমাজের চেহারা ছিল ভিন্ন। নারীদের আত্মবিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মা আবির্ভূতা হলেন। সূর্যের জ্যোতির দিকে আমরা তাকাতে পারি না ; কিন্তু যখন সে তার জ্যোতি আড়াল করে চাঁদের বুকে জ্যোৎস্না হয়ে উথলে পড়ে, তখন তার পরম স্নিগ্ধ আলোতে আমরা স্নান করি। মাও তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্যকে আড়াল করে, লজ্জাপটাবৃতা কুলবধূরূপে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর এই আবির্ভাবকে এক কথায় বলা যেতে পারে বিপ্লব। যিনি পরবর্তী জীবনে সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্ঘজননী, যাঁর কণ্ঠে বাগ্বাদিনী সদা বিরাজিতা, যিনি স্বয়ং সারদা-সরস্বতী, সেই সারদামণি লুকিয়ে লুকিয়ে এক আনার একখানি বর্ণপরিচয় পড়ছেন—ভাগ্নে হৃদয় তাও কেড়ে নিচ্ছেন—বলছেনঃ "মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখে কি হবে? শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?" অশিক্ষিত পল্লী বধূর অবগুণ্ঠনের আড়ালে মহাবিদ্যার এ এক অভিনব লীলা!

কিন্তু এই রূপঢাকা সারদারূপের যেন তুলনা নেই। এত মাধুর্য অন্য কোন মাতৃরূপের মধ্যে আর ফুটে ওঠেনি। বৃন্তের কোল ঘেঁষে একটি কুঁড়ি জাগল। কোন লগ্নে তার জন্ম হলো, ধীরে ধীরে গন্ধহীন দেহের কোষে কোষে কখন একটু একটু মধু সঞ্চারিত হলো, তারপর পূর্বাকাশে চোখ মেলে প্রাণের সবটুকু সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যের দিকে তার প্রথম হাসিটি মেলে দিল—কে তার হিসাব রাখে? এই রহস্য যেমন নিঃশব্দ—তেমনি নির্বন্দ্ব। মায়ের আবির্ভাবের গুরুত্বও এইখানেই।

মায়ের জীবনে কোন প্রশ্ন ছিল না। তাঁর জীবনটি ছিল সকল প্রশ্নের এক নীরব মহান উত্তর। একদা ভারতের পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর আলোচনার আসরে একটি নিষ্কম্প বলিষ্ঠ নরীকণ্ঠ একটি বিরাট প্রশ্ন করে ছিল, আজও ইতিহাস তাকে বহন করে চলেছেঃ "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্যাম্?" আমি চিরন্তন সুখ চাই—সেদিন এই ঋষিপত্নীকণ্ঠে সমগ্র মানবহৃদয়ের এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসাটিই চিরকালের জন্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার একটি নীরব, নিটোল উত্তর মায়ের সমগ্র জীবন। যে-বৈরাগ্য মৈত্রেয়ীকে সংসারের বিষয়সম্পত্তি থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল—সেই বৈরাগ্য আঁচলে বেঁধে মা সংসারের যাবতীয় বস্তুর সমাদর করেছেন। আত্মজ্ঞানলাভের দ্বারা অমৃতকে হৃদয়ে অনুভব করা যায়—মা আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনে সেই অমৃতের অধিকারিণী হয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছেনঃ "ও আমার শক্তি।" মহাশক্তি ভিন্ন এ আর কার পক্ষে সম্ভব?

সংসারের ভেতরে তিনি ছিলেন—কিন্তু সংসার তাঁর ভেতরে ঢুকতে পারেনি। বিরাট আশ্বাস নিয়ে মা যেন বললেনঃ ভয় নেই গো তোমাদের! সংসারে রয়েছ, কি আসে যায়? সংসার-কাননে নিঃশব্দে ফুটে ওঠো। গন্ধ বর্ণের বাহার যদি না থাকে, না থাক। গোলাপের মতো আলো করে নাই বা হলো তোমাদের জন্ম! নরম শিশিরসিক্ত স্নিগ্ধ একটি বনফুলের মতো পাতার আড়ালে ফুটে ওঠো। ওখান থেকেই কর সূর্যপ্রণাম। আত্মীয়-অনাত্মীয়, আহূত-অনাহূত, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান সকলের ভেতর দিয়ে ঈশ্বর তো মুখ ঢেকে আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন গোপনে। গোপনেই তাঁকে চিনে নাও। সেবা, যত্ন, ভালবাসা দিয়ে সাজাও তোমার নৈবেদ্যের ডালি। ছোট, বড়, ভালো, মন্দ, সৎ, অসৎ সকলের মঙ্গলচিন্তায় ঘোরাও তোমার জপের মালা। আমার কাছ থেকে শিখে নাও। এইজন্যই তো আমার আসা! বললেনঃ "কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ।" বনের বেদান্তকে মা এভাবে ঘরে এনে তুললেন।

গৃহস্থের জন্য এসেছেন, তাই মায়ার রাজ্যকে অস্বীকার করেননি। বরঞ্চ দেখিয়েছেন মায়ার রাজ্যে কোন বস্তু ফেলে দেবার নয়। সুলভ-দুর্লভ, আসল-নকল, ভালো-মন্দ সবকিছুই আসবে—যাবে। ধনদৌলত, অভাব-অনটন কিছুই জগৎ-ছাড়া নয়। শুধু চাই গ্রহণোপযোগী মন এবং ব্যবহারোপযোগী দৃষ্টি। এটাই ছিল মায়ের সমগ্র জীবনের মূল বক্তব্য। মনের ভূমিকা হবে সাক্ষীর। ধনদৌলত যদি আসে তাকে গ্রহণ, আবার অভাব যদি আসে তাকেও অস্বীকার নয়। শুধু পরিত্যাগের বিষয়—ধনের অহঙ্কার, অভাবজনিত হীনম্মন্যতা। মায়ের চরিত্রে দেখি চিত্তের দৃঢ়তা, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসন্নতা, সহনশীলতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি উচ্চভাবের স্রোত। ঘোর তমোগুণাচ্ছন্ন মানুষ যে সেই মহাজীবনের মহিমা বুঝতে সক্ষম হবে না এতে আর আশ্চর্য কি? অবশ্য ইতিপূর্বে তো আর এরকম প্রামাণ্য দৃষ্টান্তও তো মানব-সংসারে আর পাওয়া যায়নি! এই অভিনবত্বের অধিকারিণী মা। তাই কখনো ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করছেন, অর্থ ও অলঙ্কার হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছেন, বলছেনঃ "আমি যে বাবা মেয়েমানুষ!" সব আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে মায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। রাধু, রাধুর মায়ের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন। ভাইদের সুখদুঃখের মাঝে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। কখনো দৈবকবচ, ধারণ করছেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আবার বৈপরীত্যে দেখি ডাকাতবাবা ও মায়ের সঙ্গে দেশ-কাল-জাতির অতীত সম্পর্ক স্থাপনা করেছেন, তুঁতে মুসলমান ডাকাতের এঁটো পরিষ্কার করছেন, নিবেদিতার তৈরি খাবার মুখে দিচ্ছেন, রাধু-মাকুকে অব্রাহ্মণের চরণস্পর্শে নিয়োজিত করছেন, শুচি-অশুচি পাপ-পুণ্য উচ্চ-নীচ সবকিছুর ঊর্ধ্বে একটি অতি উচ্চ শুদ্ধ ভাবরাজ্যের মধ্যে বিচরণ করছেন। ছোট্ট একটি বটফলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অদৃশ্য অংশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মহীরুহশক্তি যেমন ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা পল্লবের মধ্য দিয়ে নব নব রূপে ও ছন্দের মধ্যে লীলায়িত হয়ে অবশেষে বিশালত্বের মধ্যে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে, মাও তেমনি মায়াময় সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অণুর অণু হয়ে প্রবিষ্ট হয়েছেন—তারপর আপনার প্রচ্ছন্ন ঐশীশক্তিকে ধীরে ধীরে বিচিত্র অবস্থা, বিচিত্র ভাব ও রূপের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে কালে কালোত্তীর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আমরা সংসারে প্রবেশ করে কত রঙীন স্বপ্ন দেখি, ধীরে ধীরে সে-স্বপ্ন একদিন মিলিয়ে যায়—সংসারচক্রের আবর্তে পাক খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে দেখি কোথায় সেই স্বপ্ন? তখন ভাবি জগৎ মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, মিথ্যা ঈশ্বর। মায়ের পারিবারিক জীবনে দেখি কত ঘাত-প্রতিঘাত। মায়ের জীবনে এমন কোন অধ্যায় নেই যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ঐহিক সুখ, প্রাচুর্য, শান্তি বলে কিছু ছিল। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ, কলহপূর্ণ ছিল তাঁর সংসার। কিন্তু তার মধ্যে মা শান্ত, অবিচলিতা, সদাপ্রসন্না। তিনি দেখালেন এই সুখ-দুঃখ, হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থপরতার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই জ্বলে ওঠে সত্য—চকমকি পাথরে পাথরে ঠিকরে ওঠা আলোর মতো। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই দয়া, মায়া, প্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণ বিকশিত হয়ে ওঠে। এই সাত্ত্বিক সত্তাই ঈশ্বরের আলো। সংসারে থেকে এই আলোতে অবগাহন করা যায়। এই আলোতে স্বয়ং অবগাহন করেছেন মা। শারীরিক, আর্থিক, মানসিক কত ক্লেশ মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ বুজে সব তিনি সহ্য করেছেন, দেখিয়েছেন এগুলো সব বাহ্যিক উপকরণ মাত্র, মনের বস্তু নয়। বাহ্যিক উপকরণের দ্বারা ভিতরের কোন ক্ষতি হয় না। পৃথিবীর ওপর কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়, আকাশে কত উল্কাপাত, বজ্রপাত—তাতে কি পৃথিবীর ফুল ফোটা, চাঁদ ওঠা বন্ধ হয়? হয় না। কারণ তারা জীবনের আনন্দকে, আলোকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রমাণ করে। তা যদি না হতো পৃথিবী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত—আকাশও চির তমসাচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাই মা নির্দ্বিধায় বললেনঃ "জীবনে অশান্তি কাকে বলে টের পেলুম না." "হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট

সর্বদা অনুভব করতুম।" নহবতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে প্রায় বন্দিনী-জীবন কাটিয়েও বলছেন : "ঠাকুরের সেবার জন্য কোন কষ্টই গায়ে লাগেনি"।

জীবনে অশান্তি এড়াবার, শান্তি পাবার নিশ্চিত পথটিও বলে দিলেন। বললেন : সংসারে কি চাইতে হয়?—নির্বাসনা! বাসনার নির্বাণেই তো সুখ। তাই নির্বাসনাই প্রার্থনা করতে হয়। আরো বললেন : "যদি শান্তি পেতে চাও মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের।" কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছেন : "ঠাকুর আর দোষ দেখতে পারি না।" জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বলছেন, "আমার দৃষ্টি তোমার মতো নির্মল করে দাও।" এ কান্না জগতের জন্য জগন্মাতার কান্না। তোমাদের দৃষ্টি জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হয়ে উঠুক—ঘরে ঘরে এই আশীর্বাদ রেখে গেছেন মা। শুদ্ধ কর তোমাদের চোখের আলো, পবিত্র কর মন। তৃষ্ণা যখন ব্যর্থ হয়ে জ্বালার রূপ ধরে, বেদনা যখন আহত হয়ে অমঙ্গলের আশ্রয় নেয়, তোমার কল্যাণী দৃষ্টির শুভালোক তাদের ওপর শতধারায় বর্ষিত হোক। কি সংসার, কি সমাজ সকল ক্ষেত্রে তোমার আদর্শের চেয়ে বড় বিশল্যকরণী আর নেই।

"নলিনী, ওমা নলিনী, ওঠ মা ঘরে চল। কেন বাইরে কষ্ট পাচ্ছিস মা?—আহা! নলিনী ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, বুঝতে পারে না। তাই রাগ করে কষ্ট পায় আর সকলেও তার ওপর বিরক্ত হয়।" এইভাবে কোমল কণ্ঠে অভিমানিনীর সব ব্যথা জুড়িয়ে দিচ্ছেন। এলেন এক অনুতপ্তা মহিলা। তাঁকে বললেন : "এস মা এস, পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। ভয় কি? ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও।" হতভাগিনীকে বুকে টেনে নিলেন মা। বলতেন : "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে তাকে ভালো করতে হয়, তা জানে ক-জন?"

আজ সংসারের ক্ষুদ্র অঙ্গনে যে সমস্যা, সমাজের বৃহত্তর প্রাঙ্গণেও সেই সমস্যাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে একমাত্র কার্যকরী পন্থা হলো সংসারের ঘরে ঘরে, সমাজের স্তরে স্তরে মায়ের দেখানো সহানুভূতি, ভালবাসা ও শুভভাবনাকে সঞ্চারিত করে দেওয়া। তাহলে এই শক্তিই সবল এবং সুস্থ ধারায় আপনার গতিকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারবে। "আমার কৃপা যে কার ওপর নেই!"—বলছেন মা। মায়ের বাৎসল্যের কাছে সব সন্তান সমান। বলছেন মা—"শরৎও আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার তেমন ছেলে।" কিন্তু মায়ের কাছে শরতের চেয়ে আমজাদ যেন একটু বেশি। শরৎ তাঁর অনাঘ্রাত, নিটোল, নিষ্কলঙ্ক পুষ্প, আমজাদ তাঁর কীটদষ্ট কুসুম। সুবাসিত নিখুঁত ফুলে দেবসেবা হয়। কিন্তু তাঁর আমজাদকেও তো তিনি ফেলবেন না। তাঁর কাছে দুই-ই সমান আদরের। যে সাম্যবাদ আজকের দিনের ও যুগের চিন্তা ও প্রয়োজন, মায়ের সুদীর্ঘ গার্হস্থ্যজীবন সেই সাম্যবাদেরই সার্থক রূপায়ণ। "তোমার মধ্যে যিনি আমার মধ্যেও তিনি। তুমি আমার অম্বিকা-দাদা"—এক-বাগ্দীকে বলছেন মা। এই সাম্যবাদের পশ্চাতে ছিল আত্মজ্ঞান। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের ভাবনার মধ্যে ব্রাহ্মণ বালক আর সত্যনিষ্ঠ জাবালাতনয়ের কোন বৈষম্য ছিল না। প্রাচীন ভারত বলেছে এই আধ্যাত্মিক চেতনাই জীবনের সকল স্তরে—রাজ্যপালন, সমাজসেবা, বিদ্যার্জন, গার্হস্থ্যধর্ম-পালন, সবকিছু বিকাশের প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ। মা কেদারবাবুকে বলেছেন : "শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবের মূল ঠাকুর তিনিই আদর্শ, তাঁকে ধরে থাকলে বেচাল হবে না।"

একটি আদর্শকে সামনে রেখে কর্ম কর—তাহলে বেচাল হবে না; এইটিই মা জীবনের সব ক্ষেত্রে বলতে চেয়েছেন। বালবিধবা, শুদ্ধাচারী কঠোর সংযমী ক্ষীরোদবালা দেবীর জীর্ণ দেহখানির দিকে চেয়ে মা করুণায় বিগলিতা হয়ে বললেন : "দেহ নষ্ট হলে কি দিয়ে ভজনা করবে মা?" খাওয়ার জন্য দেহ নয়—দেহের জন্য খাওয়া। এই দেহ ঈশ্বর-সাধনার মন্দির। সংস্কারাবদ্ধ মনে আদর্শের সূত্র ধরিয়ে দিলেন। গার্হস্থ্যজীবনে সন্তানকামনা? তাও

একটি আদর্শ। বললেনঃ "তোমাদের ছেলেমেয়ে না হলে আমার ভক্তসন্তান বাড়বে কি করে?" সুসন্তানের যথার্থ জনকজননী হও—এই কথাটি বুঝিয়ে দিলেন এক নবদম্পতিকে। আধ্যাত্মিকজগতের মূল সুরটিও ধরিয়ে দিলেন। হামা দিয়ে এগিয়ে আসা ন্যাড়ার দিকে পূজোর নৈবেদ্যের একটি কলা বাড়িয়ে ধরলেন মাঃ "খা, গোপাল খা।" বুঝিয়ে দিলেন ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। মায়ের সমগ্র জীবনটি ছিল একটানা, নিরবচ্ছিন্ন উপাসনা। কারো ভাব নষ্ট করেননি। কর্মের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—তপস্যা কাকে বলে। প্রতি কর্মে, শ্রবণে, মননে, বচনে, দর্শনে ছিল তাঁর পূজার নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা।

"খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না। ওতে ঠাকুর ভুল হয়ে যায়। যে যা বলে বলুক ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর তাই করবে।" যেটা মঙ্গলকর, শুভঙ্কর, সেটা করাই ধর্ম। সংসার হোক, অরণ্য হোক, যেখানে শ্রীহীনতা সেখানে ধর্ম নেই। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। সংসারে থেকে কতগুলো সামাজিক বিধান, দেশাচার মেনে, জীবনের কর্তব্যসমূহের সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে আত্মবিকাশ লাভ করাই ঈশ্বরলাভের পথ এবং সংসারাশ্রমের ধর্ম। কিন্তু যে কর্তব্য আনন্দের সন্ধান দেয় না, যে বিধান শুধু অত্যাচারের নামান্তর, যে সংসার শুভচেতনাকে জাগ্রত করে না, তার আশ্রয় জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাকে ত্যাগ করায় কোন অধর্ম হয় না। আবার অসম্পূর্ণ জীবনকে অস্বীকার করে আত্মহননের মধ্যেও কোন সমাধান বা মহত্ত্ব নেই। জীবনের উদ্দেশ্য এত ক্ষুদ্রও হতে পারে না। তাই মাকে দেখি নলিনী, রাধু, মাকু সকলকে আপনার কল্যাণী ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন ও নিরন্তর শুভচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেনঃ "আমি ছেলেদের কল্যাণের জন্য সব করতে পারি। ওতে কোন দোষ হয় না।" মায়ের পঞ্চতপা নিজের জন্য নয়—আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বই আর কিছু নয়। সুসন্তান প্রসব ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, পবিত্রতা ও ধৈর্যের পঞ্চতপায় বসতে হবে। মা তাঁর পূত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, বর্তমান যুগের এই আদর্শহীনতার চোরাবালিতে অর্ধমগ্ন হয়ে তারই কালোত্তীর্ণ বেগ আজ আমরা অনুভব করতে পারছি। তরঙ্গে তরঙ্গে তারই জলোচ্ছ্বাস—যেন বলছে, আমাকে গ্রহণ করা ছাড়া এখন আর অন্য উপায় নেই।

সত্যি মায়ের আদর্শকে সামনে রেখে চলাই আমাদের বাঁচবার একমাত্র পথ এবং ভবিষ্যৎকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়। আমরা দেখছি বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা জাগ্রত মন রয়েছে—এই মন স্থির থাকতে পারছে না, অস্থিরভাবে কিছু একটা ধরতে চায়। চলায় ফেরায় সর্বদা এক বৈদ্যুতিক স্ফুরণ, অফুরন্ত শক্তি যা সে তার ক্ষুদ্র দেহে ধরে রাখতে পারছে না। এই উদ্বৃত্ত শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে তবেই তার যথোচিত বিকাশ এবং সমাজের মঙ্গল। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়, আবার প্রদীপে সংযোগ ঘটালে তাকে শুভকাজে লাগানো যায়। সংযোগ ঘটানোই আসল। আমাদের ধৈর্য, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতার মধ্য দিয়ে এই প্রাণশক্তিকে কল্যাণী-ধারায় প্রবাহিত করে দেওয়া—এটাই আমাদের আজকের দিনের প্রধান কর্তব্য এবং সমাজসেবা। শুধু গর্ভধারণ ও প্রসবের মধ্যে মাতৃত্বের গৌরব নেই। সেই মাতৃত্ব শুধু জৈবিক। যেমন একটি সিংহজননীর স্নেহ তার শাবককে হিংস্রকর্মে প্রবৃত্ত করায়। শুদ্ধ আত্মার পবিত্র আলোকে একটি নারী 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' জননীতে রূপান্তরিত হন। গরিয়সী মদালসার আদর্শ আজও ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবনাকে সঞ্জীবিত করে চলেছে। এইজন্যই মায়ের জননীরূপে আসা ও গার্হস্থ্যজীবন যাপন করা। একশ বছর আগেকার সমাজের পটভূমিকায় নবীন ভাবনার যে বীজ মা ছড়িয়ে গিয়েছেন—আজ বর্তমান যুগের গর্ভে তারই রূপান্তর ঘটছে—ভবিষ্যতের কোলে জন্ম নেবে তার নতুন জীবন। মায়ের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে। নতুন দিনের ইতিহাস নিশ্চয় একথা একদিন বলবে।

অনুভবে মা সারদা

মানস দাস

আরশিতে মুখ দেখলে
বিস্বাদ মনে এসে জড়ো হয়।
তখনি অনুভূত হয় তোমার অস্তিত্ব।
গ্লানি আর হতাশার বালুতটে
দাগ রেখে কতটুকু লাভঃ
ভাবতে গিয়ে অনুভব করি
তোমার অস্তিত্ব।
দম্ভের চুড়োয় উঠে 'সব আমি'
ভাবতে ভাবতে
টান পড়ে ভাবনার বল্গায়।
হৃদয়ের কুঠুরিতে
চৈতন্য অঘোরে ঘুমোলে ;
ঝুঁটি ধরে নাড়া দাও তুমি।
অনুভব হয় তোমার অস্তিত্বের।
গর্ভধারিণী নও, নও তুমি স্তন্যদায়িনী,
চেতনার জন্ম দিয়ে
মমতার স্নেহছায়ে অদৃশ্য বাঁধন দিয়ে
তুমি আজ
কোটি কোটি সন্তানের মা।
বিশ্বজননী তুমি, অভয়ারূপিণী তুমি,
পাপী-পুন্যবানের, সৎ-অসতের
তুমি মা সারদা।

হতেই পারে

অরুণকুমার দত্ত

হতেই পারে, আমরা পদে পদে ভুল করব,
তোমার শাসন বারণ কিছুই মানব না,
হতেই পারে, ত্রিতাপ জ্বালায় ও অভ্যাসবশে
মাঝে মাঝেই আমরা উল্টোপথে হাঁটব,
তাই বলে কি তুমিও মুখ ফিরিয়ে থাকবে ?

ভয় ও ভক্তির ব্যবধান কি গড়ে না তুললেই নয় ?
আমরা তো পড়ে যাবই,
না হলে তোমার হাত ধরব কি করে ?
আমাদের মরুর রুক্ষতা না থাকলে
তোমার করুণা অঝোরে ঝরবে কেমন করে ?

আমাদের বেচালে চলা তো
তোমার অখণ্ড অবসর ভরিয়ে তোলার জন্যই,
তোমার অতল প্রশান্তির ওপরে
না হলে কি করে ঘটবে চঞ্চল তরঙ্গ বিক্ষেপ ?

তুমি এ সবই বোঝ, আর তাই
সকৌতুকে প্রাজ্ঞের হাসি হাসতে থাক,
তাই তো, মাগো,
তুমি এত কঠোর হয়েও ক্ষমাসুন্দর,
এত দূরের হয়েও এত আপনার জন।

সেই মানবী

মধুসূদন পাল

ধ্যানে ও সন্ধানে গেল এতটা জীবন
দেখাই হলো না সেই মানবীর সাথে
দেবীর মতোন যাকে আমি তুলে দেবো
আমার সমস্ত পূজার অর্ঘ্য,
যার পদতলে মুখ রেখে জেনে নেব
নিবেদন কাকে বলে ; কাকে বলে সব
কিছু দিয়ে থুয়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া।
তেমন প্রতিমা কি শুধু কল্পনায় সম্ভব,
বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই ?

আছে। তাঁর কাছে সর্বসমর্পণে
জেনে নেওয়া যাবে
কতখানি মধুময় হতে পারে
যাবতীয় নিখিলের বিষ।

মাধুকরী

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কয়েকটি পত্র

মাস্টার মহাশয়কে লিখিত

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

(ডাকঘরের তারিখ ঃ
৭ অক্টোবর ১৯০৩)

চিরজীবেষু,

পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন পরে

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত টাকা পাইয়া সকল সমস্যা জ্ঞাত হইলাম। আর কৃষ্ণকুমারীর দরুন পাঁচ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি ও পুস্তক তুমি পাঠাইয়াছিলে তাহাও প্রাপ্ত হইলাম। তুমি আমার ৺বিজয়া দশমীর আশীর্বাদ জানিবে। তুমি তোমার চিঠি ত্রয়োদশীর দিন প্রাপ্ত হইলাম। আমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদ বৌমাতাকে এবং বালক-বালিকাদিগকে জানাইবে। এক্ষণে শারীরিক আমি ভাল আছি। এখানকার কায়িক মঙ্গল, তোমাদের মঙ্গলাদি লিখিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

৬ই ভাদ্র ১৩০১ সাল

চিরজীবেষু,

পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ পরে তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আমার যাইবার কথা লিখিয়াছ, কিন্তু আমি এখন যাইতে পারিলাম না। কারণ মা গর্ভধারিণী শ্যামাদেবী এখনও পর্যন্ত সারিতে পারেন নাই। অদ্য পথ্য করিয়াছেন, এখনও বেশ বল পান নাই।

অক্ষয় মাস্টার (অক্ষয়কুমার সেন) ডাক্তার আনিয়া আমাকে আরোগ্য করিয়াছেন। এখনো টনিক খাইতেছি। আমি বেশ ভাল হইয়াছি। আমার জন্য কোনও চিন্তা করিবে না। তুমি দশ টাকা পাঠাইয়াছিলে—পাইয়াছি। তুমি দীর্ঘায়ু হও। যেন তোমার ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও মন থাকে আমার এই ইচ্ছা। বৌমা কেমন থাকে, সংবাদ লিখিবে ও তাহাকে আমার আশীর্বাদ দিইবে। আমি, তাহাকে ভালবাসি ছেলেরা সকলে কেমন আছে লিখিবে। তোমার শাশুড়ী কেমন আছে ? কৃষ্ণকুমারীকে আমার আশীর্বাদ দিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে।

এখানকার কায়িক মঙ্গল। তোমাদের মঙ্গল লিখিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
তোমার মাতা

শ্রীশ্রীকালী

(ডাকঘরের তারিখ ঃ
১৯. ৭. ১৯০৭)

চিরজীবেষু,

পরে বাবাজীবন অদ্য তোমার প্রেরিত আট টাকা পাইলাম। তুমি নন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ভাবনাদি করিবে না। কারণ তুমি সুশিক্ষিত, সকলই ঈশ্বর-ইচ্ছায়। শুনিলাম তুমি সামান্য রুটি ইত্যাদি আহার কর। ইহাতে তোমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইবেক। আমার কথায় পূর্ববৎ আহারাদি করিবে। আমি কলিকাতা যাইয়া কাহার নিকট দাঁড়াইব, তোমরা আমার একমাত্র [আপনার জন]। আর চারুর (মাস্টার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের) অসুখ শুনিয়া মনোকষ্টে রহিলাম। চারুর সুস্থ সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। এখানকার কুশল। তোমাদের কুশল লিখিবে। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

জয়রামবাটী
৭ বৈশাখ ১৩১৬

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবা। শ্রীমান চারুর অসুখের সংবাদে চিন্তিত রহিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শ্রীমান সত্বর আরোগ্য হয়, ইহাই প্রার্থনা। শ্রীমানকে ভালরকম চিকিৎসা করাইতেছ ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য ৺পুরীধামে পাঠাইয়াছ জানিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। ভগবান করুন শ্রীমান এখন আরোগ্য লাভ করে।

শ্রীশ্রীকথামৃত শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের কথা। তুমি উহা প্রকাশ করিয়া মানবের অশেষ উপকার করিয়াছ। এক্ষণে ঐ পুস্তকের বন্দোবস্ত (ঠাকুরের নামে আয় উৎসর্গ ?) করিবার যে সংকল্প করিয়াছ তাহা অতি উত্তম। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার সৎ ইচ্ছা পূর্ণ করুন। এখানকার মঙ্গল। ভরসা করি তোমরা কুশলে আছ।

ইতি
আশীর্বাদিকা
তোমার মা

॥ ২ ॥

মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীকে লিখিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা ২৪ শ্রাবণ

চিরজীবেষু,

পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ বিশেষ পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। মা, তোমাকে পত্র লিখিতে পাই না। সেজন্য কিছু মনে করিও না। আমার জ্বর হইয়াছিল। এখনও পথ্য হয় নাই। বোধ হয় কাল পথ্য হইবে এইরূপ বাসনা আছে। কুইনাইন খাইয়া ভাল আছি।

মা, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। তুমি আবার এখানে আসিবে। ভয় কি··· অনেক জিনিসপত্র পাইয়াছি এবং নিমকি ও গজা উত্তমরূপ হইয়াছিল। ঠাকুরকে খাওয়াইয়াছিলাম। তোমার বাই শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। কি করিবে মা, একটু ধৈর্য ধরিয়া থাক, ৺ভগবানের কৃপায় ভাল হইবে। মাস্টার মহাশয়কে বেশ যত্ন করিবে ও ছেলেদিগকে বেশ করিয়া খাওয়াবে।

মাস্টার মহাশয় যে কুইনাইন পাঠাইয়াছিলেন তাহা মধ্যে মধ্যে খাইয়া থাকি। এখানকার কায়িক মঙ্গল। তোমাদের মঙ্গল সর্বদা লিখিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে ও মাস্টার মহাশয়কে আমার আশীর্বাদ দিইবে। ইতি

তোমার মা

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

২ আষাঢ়
(১৭. ৭. ১৮৯৪ঃ
ডাকঘরের তারিখ)

চিরজীবেষু,

পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ পরে তোমার এই পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে, 'মা আমাকে ভুলিয়াছেন'। কিন্তু আমি ভুলি না। আর এখানে ছেলেরা প্রায় আসা-যাওয়া করে। উহাদের মুখে তোমাদের সংবাদ পাই। সেইজন্য তোমাদের পত্র লিখি না। তাহাতে দুঃখিত হইও না। আমি তোমাকে মনের সহিত খুব ভালবাসি ও বিশেষ ভালবাসি। তুমি প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়াছ। ওকথা মুখে আনিও না। বলিলে মহাপাপ হয়। কি করিবে? এইটুকু সহ্য করিয়া থাক। আমাদের দেশে আসিয়া নদীর তটে বেড়াইবে। আমি তোমাকে রোজ মনে করি এবং মনের সহিত খুব ভালবাসি। আর মাস্টার মহাশয় যে দুইখানি কাপড় দিয়াছিলেন [তাহা] আমি পরিতেছি। এই কথা মাস্টার মহাশয়কে বলিবে। আমার আশীর্বাদ মাস্টার মহাশয়কে জ্ঞাত করিবে ও তুমি আমার আশীর্বাদ লইবে। ছেলেদিগকে ও তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ, কৃষ্ণকুমারীকে (নিকুঞ্জদেবীর ভগ্নীকে) আমার আশীর্বাদ জানাইবে। তুমি ভগবানের শরণাগত··· আমার [শরীর] একই [-রকম] আছে। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে চিঠি দিও। মা, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি ও খুব মনে রাখি। এখানকার কায়িক মঙ্গল। তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। ইতি

তোমার মা*

---

* মাসিক বসুমতী, ৩২ বর্ষ, ২য় খণ্ড, পৌষ ১৩৬৩, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮

সংগ্রহঃ প্রদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মানবী হয়েই ছিলে চিরদিন
দেবতা তোমার স্বামী।
প্রণমামি প্রণমামি।
গৃহ-তপোবনে তোমার সাধনা,
শত কাজে রত, তবু আনমনা,
অন্তরে তব, তপ করে উমা
তন্ময়ী দিবাযামি।
ছিলে না স্বামীর লীলাসঙ্গিনী
সহধর্মিণী ছিলে।
সহধর্মিণী তুমি যে তাঁহার,
শক্তি তাঁহাকে দিলে।

ছিল না তোমার কিছু তাঁহা ছাড়া,
তুমি হয়েছিলে তাঁহাতেই হারা,
সবচেয়ে বড় সুকঠিন ব্রত
তুমি যেচে বেছে নিলে।
জননী তুমি যে জগজ্জননী
জ্ঞাতে অজ্ঞাতে স্মরি,
তোমার পুত্র কন্যার ভিড়ে
জগৎ উঠিছে ভরি।
ভুবন ভবনে তুমি মা গৃহিণী,
স্নেহের পরিধি বাড়িতেছে দিনই
প্রতি গৃহে গৃহে পূজা করি মোরা
তোমার প্রতিমা গড়ি।
আজিকে তোমার শতবার্ষিকী
পুণ্য জন্মতিথি।
শত সহস্র বার্ষিকী যাবে
আয়ু যে বাড়িবে নিতি।
তব নামে হবে নরনারী শুচি,
হবে সংযমী, সত্যেতে রুচি,
তারাই আনিবে বিশ্বশান্তি
গড়িবে নতুন ক্ষিতি।*

মা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভুবনকে তুমি ক্ষুদ্র ভবন করি
ঈশ্বরী, হয়েছিলে সারদেশ্বরী।
তুচ্ছ ক্ষুদ্র গৃহকাজে যেত দিন,
হৃদয় জগন্মঙ্গল ব্রতে লীন।
তুমি মহীয়সী ষড়ৈশ্বর্যময়ী—
মানবী হইয়াছিলে, দুঃখ-সুখ সহি।
মহিমা তোমার ঢাকিয়া রাখিত বেশ,
পল্লীর বধূ বলিয়া জানিত দেশ
অতি দুর্লভ, সুলভ হইয়া থাকে,
মহাকাল দেন পরে চিনাইয়া তাকে।
গৃহ-অঙ্গনে তোমার আসন পাতা
চিনিতে দাওনি তুমি যে জগন্মাতা।
বিশ্ব জুড়িয়া উঠিছে জয়ধ্বনি,
বিশ্ব-জননী তুমি গো সারদামণি।**

* মাসিক বসুমতী, ৩১ বর্ষ, ২য় খণ্ড, পৌষ ১৩৫৯, পৃঃ ৩৬০
** মাসিক বসুমতী, ৩২ বর্ষ, ২য় খণ্ড, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, পৃঃ ২০২

সংগ্রহ : প্রদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায়

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী

সরলাবালা দাসী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৭ ॥

আমি যে নিজে কিছু বলিতেছি না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কে যেন আমাকে বলাইতেছে, আমি কেবল মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই বলিয়া যাইতেছি।

দিন যত শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, লোকের সংখ্যাও ততই কমিতে লাগিল, শেষে সে স্থান প্রায় নির্জন হইয়া আসিল। আমি প্রথমে যেখানে আসিয়া বসিয়াছিলাম, এখনও সেই একই স্থানে বসিয়া আছি। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিলেন। তাঁহার কাপড় ফের দিয়া পরা। গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা যে ফের দিয়া কাপড় পরেন, আমি তাহা জানিতাম না ; কিন্তু তাঁহার মুখে চোখে এমন একটি ভাব ছিল যে, তাঁহাকে পতিতা বলিয়া আমার কিছুতেই মনে হইল না। রমণী আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মা, সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, রাত্রে আপনি কোথায় থাকিবেন?" আমি বলিলাম, "ঠাকুর যেখানে রাখেন, সেখানে থাকিব।" তখন রমণী বলিলেন, "মা, এই নির্জন স্থানে রাত্রিবাস করা সম্ভব নয়, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার গৃহে আসেন, তবে আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়া যাই।" রমণীর কথার উচ্চারণ ও সুরের টান শুনিয়া মনে হইল, তাহার বাড়ি আমাদের দেশে নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, তুমি কে ও কোথায় তোমার বাড়ি, ফের দিয়া কেন কাপড় পরিয়াছ, এই সকল কথার উত্তর পাইলে আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।" আমার কথা শুনিয়া রমণী একটু লজ্জিতভাবে হাসিলেন, বলিলেন, "আমাদের বাড়ি ঢাকায়। আমি স্বামীর সহিত তীর্থদর্শনে আসিয়াছি, আমার স্বামী ঐ গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে এইরকম কাপড় পরে। বৃন্দাবনে আমাদের বাসাবাড়ি করা হইয়াছে, আপনি যদি সঙ্গে যান, সেখান হইতে গোবিন্দ-দর্শনেরও সুবিধা হইবে।" আমি তাঁহার সেই সরল কথাগুলি শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম ও বিনাবাক্যে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলাম।

পথে চলিতে চলিতে ভদ্রলোকটি ক্রমশঃ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গি এমন সম্ভ্রমসূচক যে, তাহাতে আমার মনে বড়ই তৃপ্তি হইল। আমি যে আজই বৃন্দাবনে আসিয়াছি, এখনও গোবিন্দ-দর্শন অথবা স্নানাহার কিছুই হয় নাই, তাহাও ক্রমশঃ তিনি জানিয়া লইলেন। গৃহিণী আমাকে বাসায় লইয়া গিয়াই ফলমূল মিষ্ট ইত্যাদি দিয়া জলযোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "মা, আমি এখনও গোবিন্দ-দর্শন পাই নাই আর তাঁহার প্রসাদও পাই নাই, কেমন করিয়া খাইব।" গৃহিণী আমার কথা শুনিয়া লোক সঙ্গে দিয়া আমাকে গোবিন্দ-দর্শনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

যখন মন্দিরে গেলাম, তখন ঠাকুরের আরতি হইতেছে। খুবই ভিড়, কিন্তু ভিড়ে আর আমার কি করিবে, সমস্ত ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম—শ্রীমুখের সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ নৃত্য করিতেছে। মুহুর্মুহুঃ প্রদীপা-

লোকে যেন রূপতরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে। নাকে নোলক দুলিতেছে। আমি জ্ঞান হারাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের—

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো!!

শ্লোক পড়িতেছি, আর একদৃষ্টে মুখচন্দ্রমা দেখিতেছি। কি করিতেছি, কোথায় আছি, এ কোন্ স্থান, কিছুই আমার মনে নাই। লোক আছে কি নির্জন স্থান, সে বোধও আমার নাই। আমার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, আমি তাহা জানি না। ঠাকুরের সম্মুখে নগ্নমস্তকে দাঁড়াইতে নাই, বৃন্দাবনের এই নিয়ম। আমার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া চারিপাশ হইতে অনেকেই “নঙ্গা শির’ বলিয়া চিৎকার করিতেছে। কেহ কেহ বা আমাকে গালিও দিতেছে, কিন্তু সে-সকল শব্দের একবর্ণও আমার কানে যাইতেছে না। অবশেষে একজন আমার পিছন হইতে সজোরে আমাকে এক ধাক্কা দিল। আমি “নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণু” পড়িতেছি, আর নাকে সেই নোলক দুলিতেছে দেখিতেছি, জগৎ আছে কি না আছে যেন তাহারও ধার ধারি না—সহসা সেই প্রবল ধাক্কায় সচেতন হইলাম। সচেতন হইয়া আমার মতো স্বভাবের পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইল, অর্থাৎ আমার ভয়ানক রাগ হইল। আমার সেই ক্রুদ্ধ নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া যে ধাক্কা দিয়াছিল, সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, “ঠাকুরের সম্মুখে খালি মাথায় থাকার জন্যই সে আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। অনেকে আমার মাথায় কাপড় দিবার জন্য চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল, আমি শুনি নাই, তাই সে আমাকে ধাক্কা দিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে।” যে ধাক্কা দিয়াছিল, সে গোবিন্দজীর পূজারী। আমি রাগিয়া তাহাকে বলিলাম, “আমি খালি মাথায় আছি বলিয়া তুমি আমাকে সাবধান করিতেছ, কিন্তু তোমার মাথায় কাপড় কই? স্বামীর সম্মুখে রমণীর বিনা অবগুণ্ঠনে থাকিতে নাই, এজন্য ‘যদি মাথায় কাপড় দিবার দরকার হয়, তবে তুমি কেন বিনা অবগুণ্ঠনে আছ? এ বৃন্দাবন, ললিতা দেবীর রাজ্য, এখানে নন্দের নন্দন ছাড়া আবার অন্য পুরুষ কে আছে যে সে বিনা অবগুণ্ঠনে থাকিবে?’ আমার কথা শুনিয়া পূজারী প্রথমে যেন থতমত খাইয়া গেল, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া ঠাকুরের গলা হইতে একছড়া মালা লইয়া আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। মালাগাছি আসিয়া আমার মাথায় পড়িল, আমি মালা লইয়া তখনই কুটী কুটী করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সেই মালার জন্য কতই কাঁদিলাম। “গোবিন্দ আমাকে নিজের গলার প্রসাদী মালা দিলেন, আমি সেই মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।”—এই কথা ভাবিতেই আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গোবিন্দ-দর্শনের পর বৃন্দাবনে প্রথম রাত্রি আমার এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কাটিল।

তার পরদিন সকালবেলায় বৃন্দাবনে প্রথম প্রভাত। সারারাত্রি জাগিয়া এত যে কাঁদিয়াছি, সে কথা আর আমার একটুও মনে নাই, বরং মনে হইতেছে, যেন অনেক দুঃখের পর চিরদিনের আকাঙ্ক্ষিত নিধি পাইয়া সুখের স্বপ্নে রজনী কাটাইয়াছি। দর্শন মিলিয়াছে, আর আমার কিসের অভাব, দুঃখই বা কি আছে? শিশুকাল হইতে এ জীবনপ্রবাহ কত পথেই না বহিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এইটুকু জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, কতই না আয়োজন! আজ মনে হইতেছে, যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন, আজ তাহা সার্থক হইয়াছে, আজ সাগরের আশ্রয় পাইয়া অবিরাম গতিধারা বিরাম লাভ করিয়াছে। আজ যেন আর আমার কিছু চাহিবার নাই, কিছু পাইবারও নাই। আমার চিরদিনের সকল বাসনা সকল কামনা কুড়াইয়া আজ গোবিন্দের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

সকালে ঘরের বাহিরে আসিয়াই প্রথমে কুমারকে দেখিতে পাইলাম। কুমার সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস গ্রহণের সময় পূর্বনাম ত্যাগ করিয়া

“কুমার ভিক্ষু” এই নাম লইয়াছিল, এইজন্য “কুমার” এই নামই তাহার পরিচয়। জীবনে বহুদেশ ভ্রমণে, বহুলোকের সঙ্গে পরিচয়ে—মানব-প্রকৃতিতে নানা বিচিত্রভাব দেখিয়াছি, কিন্তু সেই বহু লোকের ভিতরও কুমারের মতো এমন নিতান্ত শিশুস্বভাব আমি আর কাহারও দেখি নাই। বারান্ডার এক কোণে বসিয়া কুমার একখানি ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, আমাকে দেখিয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, আবার নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল। সেই একবার দৃষ্টিতেই আমি তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, সে ঠিক পাঁচ বৎসরের ছেলের আলাভোলা সরল চাহনি। কুমারের বেশভূষায় তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিনিতে পারিবার উপায় ছিল না। আমি কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, সে তখন একমনে কাগজ পড়িতেছিল, আমি যে দাঁড়াইয়া আছি, সে খেয়ালও তাহার ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া যেন নিতান্ত পরিচিতের মতো জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি ইংরেজী জান ?” ‘তুমি !’ অন্য কেহ এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো আমি রাগ করিতাম, কিন্তু কুমারের কথায় রাগ হইল না। আমি উত্তর দিলাম, ‘না’। কুমার আবার কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিল, “জানলে বেশ হতো।”

কুমারের সঙ্গে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তাহার পর কতদিন তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার যে সেই বিচিত্র বালক-স্বভাব—তাহার আর কোন পরিবর্তন দিখি নাই। কুমারের নিকট তাহার জীবনের পূর্ব ইতিহাস যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সংসারাশ্রমে সে যেমন দুঃখ পাইয়াছিল, তেমন দুঃখ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু তাহার সেই সদানন্দভাব দেখিলে সে কথা কেহ মনেও করিতে পারিত না। কুমার কখনও আমাকে মান্য করিয়া কথা বলে নাই, কখনও—মা বলিয়াও ডাকে নাই—‘মা’ এই শব্দ একদিনও আমি তাহার মুখে উচ্চারিত হইতে শুনি নাই, কিন্তু মায়ের নিকট সন্তানের দাবি আবদার সে যেমন মিটাইয়া লইতে জানিত, অতি বড় দুষ্ট দুরন্ত ছেলেও তাহা পারে না। যে ছেলে এমনই আলাভোলা যে, নিজ শরীরের শীত, রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা—কোন বিষয়েই খেয়াল নাই, জননীকে সর্বক্ষণই তাহার জন্য সচেতন থাকিতে হয়। কুমারের ভাব দেখিয়া মনে হইত, জগৎই যেন তাহার মায়ের কোল, কাজেই নিজের অভাব অসুবিধার কথা ভাবিবার তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

কুমারের কথা বলিতে গিয়া আর একটি ছেলের কথা মনে পড়িল—কুমারকে দেখিবার দুই তিন দিন পরেই তাহাকে দেখিতে পাই। ছেলেটির নাম অসিতনাথ, পদ্মাতীরের দেশের কোন জমিদারের ছেলে। কুমার যেমন সদানন্দ, সে তেমনি সদাই মলিন। তাহার মুখ এত মলিন যে, দেখিলে মনে হয়, সে যেন চিরদিন কেবল দুঃখই পাইয়া আসিয়াছে ; অথচ, সে জমিদারের এক ছেলে,—কত আদরের ছেলে, তাহার দুঃখের কোন কারণই নাই। কুমার কোন সঙ্কোচ-সম্ভ্রমের ধার ধারে না, পাঁচ বৎসরের ছেলের মতো সকলের কাছেই তার নিঃসঙ্কোচ সরলভাব। অসিতনাথ এত লাজুক যে, মুখ তুলিয়াও মুখের দিকে চাহিতে পারে না। আমি প্রতিদিন গোবিন্দ-দর্শন করিতে যাইবার সময় মন্দিরের দ্বারে তাহাকে দেখিতে পাইতাম। আসিবার সময়ও দেখিতাম, সে দাঁড়াইয়া আছে। তিন চারিদিন প্রতিদিনই তাহাকে এইভাবে দেখিতাম। অবশেষে একদিন মন্দিরের বাহিরে আসিতেই সে আমাকে প্রণাম করিল, “গোপাল, গোপাল” বলিয়া আমিও তাহাকে করজোড়ে নমস্কার করিলাম। সে তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। কি যে সে মলিন মুখ—কেবল চোখের জলে ভাসিতেছে! তেমন মলিন মুখ দেখিলে নিতান্ত নিষ্ঠুরেরও হৃদয় গলিয়া যায়। আদর করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, “কাঁদ কেন বাবা, নীলমণি আমার !” তখন তাহার আর ধৈর্য রহিল না, একেবারে শিশুর মতো কাঁদিয়া উঠিল। কি কথা আমাকে বলিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার এই

ভাব দেখিয়া মন্দিরের দুয়ারে অনেক লোক আসিয়া জড় হইল, সে তখন অনেক কষ্টে সংযত হইয়া আবার আমাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি তাহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সেদিন রাত্রে বিশ্রামঘাটে যমুনা আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। আরতি হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে লোকের ভিড়ও কমিয়া গেল, ক্রমশঃ ঘাট নির্জন হইয়া গেল। আমি বাড়ি না ফিরিয়া যমুনার ঘাটেই বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া যে কত সময় চলিয়া যাইতেছে, কত রাত্রি হইতেছে, সে কথা একেবারেই মনে ছিল না। অন্ধকার নির্জন রাত্রে ঘাটে বসিয়া আমার চণ্ডীর কথা মনে পড়িল। চণ্ডী আমার দিদিগতপ্রাণ ছোট ভাই, সর্বদা কেবল দিদিকে আগলাইয়া বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। পাছে কেহ দিদিকে বকে, পাছে কেহ দিদির উপর রাগ করে, দিদিকে দোষ দেয়, সর্বদাই তাহার এই ভয়। যেদিন রাত্রে প্রথম ক্রিয়া লইতে যাই—আমি যে ক্রিয়ার দীক্ষা লইতে যাইতেছি কেহ জানিতে পারে, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না—চণ্ডী আমাকে বলিল, "দিদি, তুমি আমার কাপড় পরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারিবে না।" দুই ভাই-বোনে এই পরামর্শ করিয়া আমি চণ্ডীর কাপড় পরিয়া বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় যদি বাবার সম্মুখে আসিয়া পড়ি এইজন্য চণ্ডী দুয়ারে পাহারা দিতেছিল, তবুও আমি আসিয়াই বাবার সম্মুখে পড়িলাম। তখন চণ্ডীর যে ভয়! বাবা পাছে আমাকে বকেন, এই ভয়ে চণ্ডীর মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়াছিলে?" ভাবিয়াছিলাম—"সত্য কথা কিছুতেই বলিব না" কিন্তু উত্তর দিবার সময় মুখে বাহির হইল—"দীক্ষা নিতে"। বাবার রাগ কিছু বেশি ছিল বলিয়া অনেক সময় আমি—যদি বাবা রাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার কথার উত্তরে খুব বড় গোছের একটা মিথ্যা কথা বলিব ভাবিয়াছি, কিন্তু বলিবার সময় ঠিক কথাটাই বলিয়া ফেলিতাম, কখনও মিথ্যা বলিতে পারি নাই। বাবা শুনিয়া বলিলেন, "দীক্ষা নিতে? আবার কি দীক্ষা নেবার খেয়াল হলো?" এই কথা বলিয়া যখন আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন চণ্ডী একেবারে আমার বুকের ভিতরে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, "বাবা যদি তোমার কাপড় দেখতে পেতেন, যদি জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুই কেন কালপেড়ে কাপড় পরেছিস?' আমার এমন ভয় হয়েছিল! ঠাকুরকে কেবল বলছিলাম, 'হে ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, বাবা যেন দিদির কাপড় দেখতে না পান'।" আর এক রাত্রের কথাও মনে পড়িল, যে রাত্রে চণ্ডীর দেহ বুকে লইয়া সৎকারের জন্য শ্মশানে গিয়াছিলাম। বিশ্রামঘাটে অন্ধকার রাত্রে আবার সেই অন্ধকার রাত্রে গঙ্গাতীরের শ্মশান মনে পড়িল।—আমার সংসারের যত কিছু বন্ধন সেই রাত্রে চণ্ডীর চিতায় সবই পুড়িয়া গিয়াছিল। আজ যে আমি পথে বাহির হইয়াছি—চণ্ডী যদি তেমন করিয়া আমাকে সকল সংস্কারের বাহির না করিত, তবে আমি এমনভাবে পথে বাহির হইতে পারিতাম কিনা কে জানে! *

[ক্রমশঃ]

---

* উদ্বোধন ১৫শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩১৯, পৃঃ ১৪৫-১৪৮ ও বৈশাখ ১৩২০, পৃঃ ২২৬-২৩০

সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

॥২॥

সঙ্কলক : স্বামী ধীরেশানন্দ

স্বামী ব্রহ্মপ্রকাশজীর কথা

ব্রহ্মপ্রকাশজীর দেহত্যাগ

ব্রহ্মপ্রকাশজী অনশনে দেহত্যাগ করিবার দুই দিন পূর্বে তাঁহাকে দর্শন করিতে জনৈক সাধু হৃষিকেশ গিয়াছিলেন। তিনি 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করাতে ব্রহ্মপ্রকাশজী বলিলেন ঃ

জিস্ মরণসে জগ্ ডরে
মেরে মন আনন্দ।
মরণসেহী পাইয়ে
পূরণ পরমানন্দ ॥

অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

"অধুনা কিং কর্তব্যম্ ?"

সাধুটি উত্তর দিলেন ঃ

বাক্কায়শ্চিত্তৈঃ সুখদং যমঘ্নং
গোবিন্দপাদাম্বুজচিন্তনং চ ॥

তখন বলিলেন ঃ 'ঠিক'। আর কোন কথা বলিলেন না। দুদিন পর সকালে সজ্ঞানে আসনে বসিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

(১)

ষড়দর্শনের সমন্বয়

ষড়দর্শনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। কিন্তু সারগ্রাহী দৃষ্টিতে দেখিলে সর্বদর্শনের লক্ষ্য এক অদ্বৈতে। অদ্বৈতেই সকলের সমন্বয়।

পূর্বমীমাংসা কর্মের বিধান করিয়াছেন। তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধ না হইলে বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারই হইবে না।

সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক দ্বারা অসঙ্গ চিৎ পুরুষকে জানাইয়া দেয়। উহাই 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ। মহাবাক্যার্থজ্ঞানের উহা উপযোগী হইয়া থাকে।

যোগাভ্যাস চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাইয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে সহায়ক হয়। একাগ্র চিত্ত না হইলে বেদান্ত-বিচার হইবে কি করিয়া? অতএব যোগ চিত্ত-বিক্ষেপনিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক হইয়া থাকে।

ন্যায়-বৈশেষিক যুক্তি দ্বারা বেদবিরোধী নাস্তিকাদি মত খণ্ডন করতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব অর্থাৎ বেদান্তের 'তৎ' পদার্থ-নিরূপণ করিয়া থাকে। এইরূপে উহা অখণ্ড মহাবাক্যজ্ঞানের সহায়ক হয়।

সর্বশেষে বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের একত্বের পরিবেশক। ব্যাসদেব আসিয়া অখণ্ড মহাবাক্যার্থ ব্রহ্মসূত্রে পরিবেশন করিয়াছেন।

যেমন ভাণ্ডারায় কেহ বাজার হইতে জিনিস আনে, কেহ কাঠ আনে, কেহ জল আনে, কেহ বা রান্না করে, আবার কেহ পঙ্গতে অন্ন পরিবেশন করে। সকলেরই এক লক্ষ্য—ভোজন। আপাতদৃষ্টিতে এক-একজন বিভিন্ন কর্ম করিল, কিন্তু সকলের দ্বারাই মূল কর্ম ভোজনের ব্যবস্থা হইল। ব্যাসদেব হইলেন অন্নপরিবেশনকারীর ন্যায়। অপর সকলের সমবেত সহায়তায় অন্ন তৈয়ার হইয়াছে, ব্যাসদেব উহা বিতরণ করিয়াছেন মাত্র। তিনি 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের এক অখণ্ড বাক্যার্থ জ্ঞাপন করিয়া দিলেন মাত্র। তাই আচার্যদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। পরবর্তী ব্যাখ্যাতৃবৃন্দই বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রকারদের সকলেরই লক্ষ্য এক। মোক্ষ অর্থাৎ সর্বদুঃখনিবৃত্তিই লক্ষ্য। সর্বদুঃখনিবৃত্তিই আনন্দপ্রাপ্তি।

কোন ব্যক্তি মাথায় বোঝার ভারে কাতর, দুঃখিত। তার বোঝাটি নামাইয়া দিলেই সে কত সুখ অনুভব করে। অন্য কোন বিষয়প্রাপ্তি বিনাই সে কত আরাম, সুখ অনুভব করে। তাই বলা হইল দুঃখ-নিবৃত্তিই সুখপ্রাপ্তি। নৈয়ায়িক একবিংশতি দুঃখ-ধ্বংসকেই মোক্ষ বলে। দুঃখধ্বংস হইলেই আনন্দপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ। ইহা বেদান্তেরও কথা।

এই প্রকারে দেখা যায় সর্বদর্শনই এক লক্ষ্যের

দিকে চলিয়াছে। এক এক দর্শনের এক একটি function. মূর্খরাই শুধু ঝগড়া করিয়া মরে।

জগৎ মনঃকল্পনা মাত্র। মনো তা সকলেই প্রতি বস্তুটিকে সত্য মনে করিয়া ব্যবহার করিতেছে। মঙ্গলনাথজী অন্ধের দৃষ্টান্ত দিতেন। অমৃতসরে দেওয়ালির দীপশোভা। রাস্তায় কতকগুলি অন্ধ একে অপরকে বলিতেছে 'আজ আপ বড়া দীদার (দর্শন) দিয়া'। অন্ধ—তাদের আবার দর্শন কি? অজ্ঞানী জীবের ব্যবহারও তেমনি।

(২)

ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য

ব্রহ্মসূত্রের উপর কত ভাষ্য। কোন্ মত ব্যাস-সম্মত? শঙ্করের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। দেখা যায় অন্যান্য দর্শনকার কপিল, গোতমাদিও তাঁহাদের দর্শনে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতেছেন। তাহা হইলে তাঁহারা ব্যাসকে অদ্বৈতবাদী মনে করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ ব্যাসদেবই হইলেন উত্তরমীমাংসা-কার। অতএব শঙ্কর একা নন, কপিল গোতমাদিও ব্যাসকে অদ্বৈতবাদী মনে করিতেন। একথা 'ব্যাসসূত্রতাৎপর্যনির্ণয়' গ্রন্থে বলা হইয়াছে।

[বিষ্ণুদেবানন্দজী বলিলেন: পুরাণাদিতে বেদান্তই ব্যাস লিখিয়াছেন। দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত লিখেন নাই। তাই বলিতে হয় অদ্বৈতবাদই ব্যাসের নিজস্ব মত।

রামলালগিরিজী বলিলেন: ব্যাসসূত্র (ব্রহ্মসূত্র) উপনিষদ্ বাক্যসমূহেরই নির্ণয়াত্মক। রামানুজ বা মাধ্ব কেহই উপনিষদ্ভাষ্য লিখেন নাই কেন? পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ উপনিষদ্ভাষ্য আগে না লিখিয়া উপনিষদ্বাক্যের বিচারাত্মক ব্যাসসূত্রের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে যাওয়া ঠিক নহে। ব্রহ্মসূত্র ন্যায়। উহার মূল শ্রুতি। অতএব শ্রুতিব্যাখ্যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শঙ্কর তাহাই করিয়াছেন।

মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন: আচার্যরা সকলেই সর্বজ্ঞ। কাজেই বলিতে হয় তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ মর্ম জানিয়াও লোককল্যাণের জন্য অন্য অর্থ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ দুরূহ। তাই আচার্য রামানুজ ও মাধ্বউপাসনার উপর জোর দিয়াছেন।]

(৩)

কর্মবশে স্থাবরযোন:প্রাপ্তি

যোগবাসিষ্ঠের মতে পাষাণেরও জীবন আছে, অন্তঃকরণ আছে। তবে তাহা ঘনসুষুপ্ত। উহাকেই অর্থাৎ ঘনসুষুপ্ত জীবকেই জড় বলা হয়। পাপবশে জীবের পাষাণ দেহ প্রাপ্তিও হইতে পারে। তবে সেই দেহ—পর্বতাদি পাষাণ শরীর, টুকরা পাথর নহে। জীবময়ী সৃষ্টি। জীব দুই প্রকার। ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জীব। ভোক্তা জীব তো প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই জানে। ভোগ্য জীবই ঘনসুষুপ্ত পাহাড় পর্বতাদি। মানবশরীরেও প্রতি অণুপরমাণুতে জীব বিদ্যমান। ঐগুলি ভোগ্য শরীরের জীব। তাহারা মুখ্যজীবের শেষ বা উপকারক। এইরূপে সবই জীবময়, চেতনময়। একবার পাষাণ-দেহ হইলে এ কল্পে আর তাহার উদ্ধার হইবে না। তাই গীতায় টীকাকাররা বলিয়াছেন, স্থাবর পাষাণাদি দেহ হইলে আর উদ্ধারের আশা নাই। তাই মানবশরীর থাকিতে থাকিতেই শ্রেয়োলাভের চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। প্রতি প্রাণীতেই চুরাশি লক্ষ যোনির সংস্কার-বিদ্যমান। তাই নূতন জন্মলাভমাত্রই তাহাদের সেরূপ চেষ্টা বা প্রবৃত্তি দেখা যায় যেমন বিড়ালের ইঁদুর ধরা। পূর্ব সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয়।

(৪)

প্রযত্ন বিনা প্রার্থনা নিরর্থক

সাধুরা উত্তম দেশে দেহত্যাগ করিতে চাহেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি—কেন চাহিবে না? এই শরীর যাহা দ্বারা ঈশ্বর-ভজন হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিতে ভাল জায়গা তো লোকে খুঁজিবেই। লোকে বলে, 'কেন দুষ্ট বস্তু ত্যাগ করিতে পারি না?' কুয়ার ভিতর গলিত শবদেহ পড়িয়া আছে। তাহা দূর না করিলে জল খাইতে গেলে দুর্গন্ধ তো লাগিবেই। লোকে বলে জলে দুর্গন্ধ, কিন্তু দুর্গন্ধের হেতু দূর করিবার চেষ্টা করিবে না।

'ন তা হো দূর বদ্ অমলি (স্বভাব)
ইবাদৎ (প্রার্থনা) ক্যা বনাতী হ্যায়।
পড়া মুরদার (শবদেহ) কুয়েমে
নিকালে হ্যায় দলো (ঘড়া) পানী ॥'

—কুয়া হইতে গলিত শব বাহির না করিয়া ঘড়ায় করিয়া জল উঠাইয়া সেই জল পান করিলে দুর্গন্ধ তো লাগিবেই। তেমনি দুষ্ট স্বভাব বা অভ্যাস পরিত্যাগ না করিয়া কেবল প্রার্থনা কি করিতে পারে? [ক্রমশঃ]

স্মৃতিকথা

কেমনে ভুলি করুণা তাঁর

কেশবচন্দ্র নাগ

আমার বড় বৌদি স্বপ্নে মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পান। জিতেনদাকে (স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে) এই কথা বললে, জিতেনদা বললেন : "শ্রীমা উদ্বোধনে আছেন। মায়ের কাছে গিয়ে বড় বৌদি যেন স্বপ্নের কথা জানান।" তখন আমার বয়স সতের-আঠার বছর। একদিন সকালের ট্রেনে বৌদিকে নিয়ে দেশের বাড়ি গুড়াপ থেকে কলকাতা এলাম। উদ্বোধনে যখন পৌঁছালাম তখন দুপুর হয়েছে। ঘণ্টা পড়েছে, সবাই প্রসাদ পেতে বসেছেন। আমি ও আমার বড় বৌদি সারদানন্দজীর অফিস ঘরে বসলাম। ইতিমধ্যে কেউ ওপরে খবর দিয়েছে দুজন ভক্ত এসেছে। ওপর থেকে খুব জোরে মহিলাকণ্ঠে হাঁক এল : "কে গো?" সারদানন্দজী বললেন : "গুড়াপ থেকে একটি ছেলে ও একজন মহিলা এসেছেন। মাকে প্রণাম করতে চান।" পরে জানলাম যিনি হাঁক দিচ্ছিলেন তিনি গোলাপ-মা। পরে দেখেছি গোলাপ-মা খুব জোরে কথা বলতেন, কিন্তু যোগীন-মা ধীরে। শুনলাম, মা বলে দিয়েছেন : "আগে ওরা প্রসাদ পেয়ে নিক। তারপর দেখা করবে।" প্রসাদ পেয়ে মায়ের দর্শন হলো। বড় বৌদি মাকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। মা কি বলেছিলেন মনে নেই। তবে আমি দীক্ষা নেব একথা মাকে বললাম। মা আমাকে পরে সময় করে আসতে বললেন।

তারপর বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। ততদিনে কিষাণগঞ্জে সামান্য মাস্টারী করছি। দীক্ষা নেবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কি একটা যোগাযোগ হওয়াতে কলকাতা এলাম। শুনলাম মা বলরাম মন্দিরে আছেন। দেখা করতে ছুটলাম। গিয়েই স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা। বললাম : "মায়ের কাছে দীক্ষা নেব।" তিনি বললেন : "খুব ভাল কথা। মহাভাগ্যবান তুমি।" মায়ের সঙ্গে দেখা হতেই দেখলাম তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। খুব অবাক হলাম। সেই কবে দেখা হয়েছিল তাও সামান্য সময়ের জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য, মা ভোলেননি! বলরাম মন্দিরে আমার দীক্ষা হলো। আবার ফিরে গেলাম কিষাণগঞ্জে। গণিত-শিক্ষক হিসাবে খুব নাম হতে শুরু হয়েছে তখন আমার।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ। প্রচণ্ড অসুখে পড়লাম। দেশের বাড়ি গুড়াপে এলাম। বাড়িতে সবাই খুব চিন্তায় পড়লেন। গুড়াপে তখন একজন ভাল ডাক্তার এসেছিলেন। তিনিই দেখছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। রোগ ক্রমে বেড়েই যেতে লাগল। পরিজনেরা ভয় পেলেন। বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে এল। তবে চিকিৎসার কোন ত্রুটি ছিল না। ক্রমে ভীষণ শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। ডাক্তার বললেন : "অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগবে।" বাড়ি থেকে কে যেন বর্ধমান গেল অক্সিজেন সিলিন্ডার আনতে। সেই রাতটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কষ্টটা যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বুঝিবা শেষ রাত। বাড়িতে কারো চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। মাকে অসুস্থ অবস্থায় সেবা করেছিলেন মা-কালী স্বয়ং। আমার এই দুঃসময়ে মা কি আমায় বাঁচাবেন না? বারবার শুধু তাঁর কথা ভাবছি। তাঁকে ডাকছি। হাত-পা নাড়ার ক্ষমতা নেই। শুধু কাঁদছি, আর কাঁদছি। এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ স্পষ্ট দেখলাম, মায়ের মতোন কে যেন একজন আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, মা-ই তো! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সরু লাল পাড় শাড়ি। দুচোখে করুণা যেন ঝরে পড়ছে। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ওঃ, সে কী সুখস্পর্শ! মনে হচ্ছিল আমি সেরে যাচ্ছি। আমি হাত-পা নাড়তে পারছি। হয়তো কথাও বলতে পারব। মা আমাকে সাদা একটা গুলি, অনেকটা ন্যাপথালিনের মতোন, খাইয়ে দিলেন। গুলিটা যত গলা দিয়ে নামছে ততই আমার মনে হচ্ছে আমার সমস্ত রোগযন্ত্রণা নিয়ে সেই গুলি যেন শরীরে মিশে যাচ্ছে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কোন খেয়াল নেই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। মনে হলো আমার শরীরে কোন কষ্ট নেই, কোন যন্ত্রণা নেই, কোন রোগ নেই। আমি সুস্থ—সম্পূর্ণ সুস্থ। নিজেই এতদিন পর বিছানা ছেড়ে উঠলাম। সবাইকে অবাক করে হাঁটলাম। সকালে ডাক্তার এলেন। খুব জোরের সাথেই বললাম : "ডাক্তারবাবু আমি সেরে গেছি। আমি ভাল হয়ে গেছি।" ডাক্তার অবাক। বললেন : "ভগবানই তোমাকে বাঁচিয়েছেন।" অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেরৎ গেল। আমি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠলাম। সুস্থ হয়ে উঠলাম নয়, আমি দ্বিতীয়বার জীবন পেলাম। আমার জীবনদাত্রী—মা।

শ্রুতিলিখন : দেবাশিস মহন্ত

স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ও আমি

সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা)

পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (ছদ্মনাম 'নিরালা') হিন্দী সাহিত্যের এক দিক্‌পাল। মুখ্যতঃ তিনি ছিলেন কবি। এই প্রতিভাধর মানুষটি যে আক্ষরিক অর্থে একজন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। নাগপুর কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত কথামৃতের হিন্দী অনুবাদ তাঁরই করা। কথামৃতের এই হিন্দী অনুবাদ অগণিত হিন্দীভাষী মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। নিরালাজীর 'চতুরি চামার' নামে একটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থটির প্রকাশক রাজকমল এ্যাণ্ড সন্স, দিল্লী। ঐ পুস্তিকাতে 'স্বামী সারদানন্দ' সম্পর্কে তাঁর একটি স্মৃতিকথা আছে। বর্তমান প্রবন্ধটি তার বঙ্গানুবাদ।

সাম্প্রতিককালের একজন সাহিত্য-সমালোচক নিরালাজীকে 'মাতোয়ালা নিরালা' নামে অভিহিত করেছেন। সত্যিই তিনি ছিলেন এক মাতোয়ালা কবি, এই মাতোয়ালা কবি-মানুষটি কখনই সংসারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি। ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময়ই দারিদ্র্যের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছে। আর সেযুগে শুধু সাহিত্যের সেবা করে একজন কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে সংসার নির্বাহ করাও সম্ভব ছিল না। এছাড়া একের পর এক পারিবারিক বিপর্যয় তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তিনি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন :

দুঃখ হী জীবনকী কথা রহী,
ক্যা কহুঁ উসে যো নহীঁ কহী।—সংযুক্ত সম্পাদক

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের কথা। এক সাধারণ বিবাদে বাংলার মহিষাদল রাজ্যের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তখন গ্রামের বাড়ি উন্নাওতে ছিলাম। ঐ সময় আমি প্রায়ই আচার্য মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীজীর সঙ্গে দেখা করতে কানপুরে তাঁর জুহির বাড়িতে যেতাম। তাঁর কাছে যাওয়ার পিছনে কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ আমার ছিল না। হিন্দী সাহিত্যে তাঁর মহান অবদানের জন্য আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। তিনিও আমাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনিই আমার হিন্দী ও বাঙলা ব্যাকরণের ওপর লেখাটি সম্পাদনা করে 'সরস্বতী'-তে প্রকাশ করেছিলেন। আমার মতো একটি বাউণ্ডুলে মানুষের আর্থিক অসুবিধার কথা তিনি ভাল করেই জানতেন। তাই আমার সে অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি দুটি খবরের কাগজে আমার নাম চাকরির জন্য সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরাও আমার যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু কাজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর যোগ্যতা বলতে তো আমার বিশেষ কিছুই ছিল না। ঐ সময় সাহিত্যসেবার প্রেরণা থেকে যা কিছু লিখতাম তা এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পাদকের দপ্তর থেকে আমার কাছে ফিরে আসত, মাত্র দুটি প্রবন্ধ ও দুটি কবিতা তখন পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। দ্বিবেদীজী আর কি করবেন!

এই সময় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী তাঁদের হিন্দী পত্রিকার জন্য এক যোগ্য সম্পাদকের খোঁজে জুহিতে দ্বিবেদীজির কাছে এলেন, দ্বিবেদীজী স্বামীজীকে আমার কথা বললেন। স্বামীজী যোগ্যতার প্রমাণ পাঠাবার জন্য আমাকে একটি চিঠি দিলেন। বাংলায় থাকার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। দু-চার বার বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার কাজে যোগ দিতেও গিয়েছিলাম, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান শিষ্য পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী যখন মহিষাদলে এসেছিলেন তখন তাঁকে তুলসী রামায়ণ পাঠ করে শুনিয়ে তাঁর অনুপম স্নেহ ও

আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম। পত্রোত্তরে স্বামী মাধবানন্দজীকে এই যোগ্যতার কথাই জানিয়েছিলাম। স্বামীজীর চিঠি ইংরেজীতে ছিল। আমি বাঙলাতেই জবাব দিয়েছিলাম।

কিছুদিন পরে দ্বিবেদীজীর কাছে গিয়ে শুনলাম স্বামীজী কলকাতাতেই এক সুযোগ্য সম্পাদক পেয়ে গেছেন। বাড়িতে ফিরে আমিও এক পত্র পেলাম। তাতে তিনি লিখেছেন: "একটু অপেক্ষা করুন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হলে হয়তো আপনারও প্রয়োজন হবে।" এই চিঠি পাবার পরেই মহিষাদল রাজ্য থেকে আমার কাছে তার আসে—"শীঘ্র চলে এসো।" তার পেয়ে ভাবলাম ইস্তফা গ্রাহ্য না হয়ে আমার রাগ করে চলে আসার দোষ যখন ক্ষমা হয়েছে, তখন আর যেতে আপত্তি কি? আমি মহিষাদলে চলে গেলাম। কিন্তু রাজা, যোগী, আগুন ও জলের বিপরীত রীতির কথা তখন মনে ছিল না। এরই মধ্যে 'সমন্বয়' এই সার্থক নামে একটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সুন্দর হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হলো। আমার কাছেও একটি কাগজ এলো। সেই সঙ্গে এলো লেখা পাঠাবার জন্য অনুরোধও। আমি 'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে একটি লেখা পাঠালাম। যখন লেখাটি প্রকাশিত হলো তখন আমি লেখাটি সম্বন্ধে আচার্য দ্বিবেদীজীর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি প্রবন্ধটি পড়ে আমাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। আমি এই ধরনের মৌলিক রচনা যেন লিখি, আচার্য দ্বিবেদীজীর এই আশীর্বাদপূর্ণ উৎসাহবাক্য সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে সাহিত্যসেবায় অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। দ্বিবেদীজী ছাড়া আরও কয়েকজন অগ্রজ সাহিত্যিক এই লেখাটির শৈলী ও বিষয়বস্তু প্রকাশের মুনসিয়ানার জন্য আমাকে আশীর্বাদ জানালেন। এদিকে রাজার উল্টো রীতি আমার সামনে উপস্থিত হলো। ঠিক এই সময় 'সমন্বয়' পত্রিকার পরিচালক স্বামী আত্মবোধানন্দজী আমাকে লিখলেন: "সমন্বয় পত্রিকার জন্য বাঙলা জানে এরকম একজন লোকের প্রয়োজন। আমাদের কাজে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আপনি চলে আসুন।" পত্র পেয়ে আমি চলে গেলাম। গিয়ে দেখি আট মাসের মধ্যে সমন্বয়ের দুজন সম্পাদক বদল হয়েছে। সম্পাদক হিসাবে স্বামী মাধবানন্দজীর নাম ছাপা হচ্ছিল। তিনি হিন্দী খুবই ভাল জানতেন। শুধু হিন্দী ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য একজন হিন্দীভাষী সম্পাদকের প্রয়োজন ছিল। এভাবেই 'সমন্বয়' প্রকাশে সহায়তা করতে কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী আত্মবোধানন্দজীর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করলাম। এখানেই প্রথম আচার্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের দর্শন পাই। এটি ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের কথা।

স্বামী সারদানন্দজীর রাশভারি স্থূলকায় চেহারার জন্য ওঁকে দেখে খুবই সম্ভ্রম হতো। এমনিতেই ছোট থেকেই আমার ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। ভূতের দেখা পাবার জন্য রাতে শ্মশানে ঘুরে বেড়াতাম। মাঝরাত্রে রওনা হয়ে ১৬ মাইল পথ হেঁটে সকালে আচার্য দ্বিবেদীজীর সঙ্গে দেখা করতাম। তবুও সারদানন্দজীর মুখের দিকে আমি অনেক দিন চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। তবে কখনো কখনো ওঁকে প্রণাম করে নতমস্তকে ওঁর আলোচনাসভায় যোগ দিতাম। কিন্তু যেদিন কোন দার্শনিক গ্রন্থের-পাঠ হতো সেদিন সভা থেকে চটপট পালিয়ে আসতাম, কেননা দার্শনিক তত্ত্বের কথা শুনলেই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত আমার। কয়েকমাস তাঁর আলোচনা-সভায় নির্বাক শ্রোতা হয়েই বসে থাকলাম। স্বামীজীও আমার "যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" নীতি দেখে প্রসন্ন হয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন। একদিন সাহস করে প্রশ্ন করে বসলাম: "এ সংসার আমার মধ্যে আছে, অথবা আমি এ সংসারের মধ্যে আছি?" আমার প্রশ্ন শুনে তিনি স্নেহমাখা স্বরে আমাকে উত্তর দিচ্ছিলেন: "এরকম নয়।"

পরিবেশ ছোট বয়স থেকেই আমাকে সাধু ও ঈশ্বরের অনুরক্ত করে তুলেছিল। এরজন্য ঘুমোলেই দেবদেবীদের স্বপ্ন খুব দেখতাম। জাগ্রত অবস্থায় যাঁরা কথাই বলতেন না, ঘুমের মধ্যে তাঁরাই অফুরন্ত কথা বলতেন। কিন্তু স্বপ্নে দেবতাদের সঙ্গে সংলাপ আমার পক্ষে সুখকর

হতো না। কেননা, মনে এই প্রশ্ন সব সময়ই উঠত, জাগ্রত অবস্থায় দেবতারা কেন কথা বলেন না? ক্রমে ক্রমে নানা দার্শনিক চিন্তা মনে ভিড় করতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘোর নাস্তিক হয়ে পড়লাম। যখন 'সমন্বয়' পত্রিকা সম্পাদনার জন্য গেলাম তখন এই অবস্থাই ছিল। তবে পূর্ব সংস্কারের বলে আস্তিক ভাব কখনো কখনো মনে উঁকি দিত মাত্র। আমি একদিন স্বামী সারদানন্দজীকে বললামঃ "আমি ঘুমুলে দেবতারা আমার সঙ্গে কথা বলেন।" উনি একটু হেসে মধুর স্বরে বললেনঃ "বাবুরাম মহারাজের সঙ্গেও দেবতারা কথা বলতেন।" স্বামী প্রেমানন্দজীর পূর্বনাম ছিল বাবুরাম, আগেই বলেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে তাঁরই আমি প্রথম দর্শন পেয়েছিলাম—মহিষাদলে।

কয়েকদিন পরে আমি একদিন দুপুরবেলা ঘুমোচ্ছি (দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস আজও আমার আছে)। স্বপ্নে দেখি, স্বামী সারদানন্দজী মহাধ্যানে মগ্ন, তাঁর সমস্ত শরীর থেকে যেন দিব্য জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তিনি কমলাসনে বসে, উর্ধ্ববাহু, মুদ্রিত নেত্র, মুখে মহা আনন্দের ছটা। ঘুম ভাঙতে মনে হলো, আমার সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেদিন মহারাজের মধ্যে মহাজ্ঞানের যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমার মনে বিরোধী শক্তির প্রভাব সবসময়ই প্রবল ছিল। তীব্র ও তীক্ষ্ণ দার্শনিক বজ্রপ্রহারে আমি এইসব বিরোধী চিন্তা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করতাম এবং যখন তা করা সম্ভব হতো তখনই সাহিত্যসেবায় মন লাগাতে পারতাম। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আকাশ থেকে এই পৃথিবীতে এসেও যেন আকাশেই থেকে যেতাম। আর যত লড়াই করতাম ততই যেন মনের বিরোধী ভাব আরো প্রবল হয়ে উঠত। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কি রকম তা এই সময় আরো ভাল করে বুঝতে পারলাম। যখন মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন স্বামী সারদানন্দজী তাঁর মধুর হাসিতে আমার সব ক্লান্তি দূর করে দিতেন। এই মহাদার্শনিক, মহাকবি, মহামনস্বী, আকুমার ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসিপ্রবর মহাপণ্ডিত, সর্বস্বত্যাগী সাক্ষাৎ মহাবীরের সান্নিধ্যে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব এবং মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হতো। অনেক বড় বড় কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতকে দেখেছি। কিন্তু, হায়রে সংসার! কাচের টুকরোকে তুমি হীরে বলে চালাতে কতই না পটু!

স্বামী সারদানন্দজীর সেবক হঠাৎ একদিন আমাকে বললেনঃ "তুমি দীক্ষা নেবে?—এসো।" তাঁর কথা শুনে ভাবলাম—প্রসাদের মতো এখানে বোধ হয় দীক্ষাও বিতরণ হয়ে থাকে। নিতে আপত্তি কি? বড়কে গুরু বলে মানতে আমার কখনই আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল 'গুরুভাব' মেনে নিতে। মন্ত্র নিলে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে, আর যেখানে পাবার কিছু ব্যাপার থাকে সেখানে যে ব্রাহ্মণ সন্তান পা না বাড়ায় তাকে বেকুব ছাড়া আর কি বলা যাবে! আমি প্রায় দৌড়ে স্বামীজীর (স্বামী সারদানন্দজীর) ঘরে গিয়ে আসনে বসে পড়লাম। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "কি চাই?" আমি বললামঃ "মন্ত্র নিতে এসেছি।" আমার বলার সুরে কে জানে কি ছিল! আমার তো তন্ত্র-মন্ত্রে মোটেই বিশ্বাস ছিল না। স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেনঃ "পরে হবে।" আমি মনে মনে ভাবলাম কে জানে কপালে কি আছে! কয়েকদিন চলে গেল, আমি আর তাঁর কাছে যাইনি।

ওখানে কখনো কখনো শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে তুলসী রামায়ণ পাঠ করতাম। তখন শ্রীশ্রীমা স্থূল শরীরে ছিলেন না। প্রথম যেদিন পাঠ করলাম, সেদিন স্বামী সারদানন্দজী আমাকে দুটি প্রসাদী রসগোল্লা দেওয়ালেন। আর সকলে একটি করেই পেলেন। পরে স্বামী সারদানন্দজীর জ্যেষ্ঠ গুরুভাই, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রিয় শিষ্য শঙ্করানন্দ মহারাজকে দুটি রসগোল্লা পেতে দেখেছি। একদিন পাঠের পরে শঙ্করানন্দ মহারাজ তাঁর ভাগ থেকে একটি রসগোল্লা আমাকে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে সারদানন্দজী যে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেন সেই সিঁড়ি

দিয়ে নিচে নামার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম। প্রসাদ আমার হাতেই ছিল। মনটি ছিল সুপ্রসন্ন। যেন তুলসীদাসজী আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। ঠিক ঐসময় স্বামী সারদানন্দজীও ওপরে আসছিলেন। আমাকে ভাবমগ্ন দেখে তিনি রাস্তা ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবমগ্ন থাকলেও আমার মন সজাগ ছিল। তাঁকে দেখে আমিও একপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম, উনি চলে গেলে আমি নিচে নামব। তখন সারদানন্দজী আমাকে প্রশ্ন করলেনঃ "এ প্রসাদ কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ?" (তাঁর সঙ্গে আমার বাঙলাতেই কথাবার্তা হতে।) আমি বললামঃ "আমার নিজের জন্য।" উনি তখন বললেনঃ "আচ্ছা, প্রসাদ খেয়ে দেখা করো।" আমি চটপট প্রসাদ খেয়ে ওপরে গেলাম। স্বামীজী তাঁর ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে খুব স্নেহভরে বললেনঃ "সেদিন তুমি কি বলেছিলে?" আমি বললাম আমার তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস নেই। তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ "তোমার দীক্ষা হয়েছে?" আমি বললামঃ "হাঁ, কিন্তু তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ন-বছর।" তিনি তখন বললেনঃ "আমরা তো শ্রীরামকৃষ্ণকেই ঈশ্বর বলে মানি।" আমি বললামঃ "আমিও তো মানি।" আমি কখনো প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করতাম না, তা ঠিকই হোক, আর ভুলই হোক। যাঁরা বক্তা, লেখক, কবি বা দার্শনিক তাঁরা আগে কি বলেছেন আর পরে কি বলেছেন, এনিয়ে মাথা ঘামান না। এব্যাপারে আমার জীবন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে! কিন্তু স্বামী সারদানন্দের ভারতীয় কান এরকম ছিল না যে, ইংরেজী সঙ্গীতের রর্সবোধ করতে না পেরে তাকে সঙ্গীত বলেই স্বীকার করবেন না। তিনি ভাবস্থ এক গুরুর মূর্তিতে আমার সামনে এলেন। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন এক পরম প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। তিনি আমার জিহ্বাতে নিজের আঙ্গুল দিয়ে একটি বীজমন্ত্র লিখতে লাগলেন। তিনি কি লিখেছেন তা বুঝবার জন্য আমি সমস্ত মন দিয়ে চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারলাম না।

এরপর পরোক্ষভাবে তিনি কখনো কখনো আমাকে ধ্যান-ধারণার কথা মনে করিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মাথায় খেয়াল চেপে গেল, দেখব জিহ্বার মন্ত্র আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। পূজা-পাঠ যেটুকু বা করতাম, তাও বন্ধ করে দিলাম। তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমার মনে হতে লাগল যে, সবকিছু যেন উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে, আর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুরা আমাকে আকর্ষণ করছেন। এতে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, নিশ্চয়ই এই সাধুরা আমার ওপরে বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করেছেন। ঠিক এই সময় 'সমন্বয়' পত্রিকার কর্মকর্তা উদ্বোধন ছেড়ে 'মতওয়ালা' অফিস ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি ঘরে থাকতে লাগলেন। 'মতওয়ালা' কাগজ তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওখানে তখন বালকৃষ্ণ প্রেস ছিল। 'মতওয়ালা' কাগজের সম্পাদক মহাদেব প্রসাদ শেঠ ঐ প্রেসের মালিক ছিলেন। তিনি ওখানেই থাকতেন। আমিও ওখানেই একটি ঘরে থাকতে লাগলাম। একদিন মহাদেববাবুকে বললামঃ "আমার মনে হয় এই সাধুরা যাদু জানে।" মহাদেববাবু গম্ভীরভাবে বললেনঃ "এ আপনার ভ্রম।"

একদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, জ্যোতির সমুদ্র। শ্রীকৃষ্ণের হাতের ওপরে আমার মাথা রয়েছে। আমি সেই জ্যোতির সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। তারপর গত দশ বছর ধরে এতসব অলৌকিক দর্শনাদি হয়েছে যে, এখন বড় বড় কবি ও দার্শনিকের চমৎকার উক্তি পড়েও হাসি পায়। আর তিন বছর হলো সেই মন্ত্র, যা স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ আমার জিহ্বায় লিখে দিয়েছিলেন, জ্যোতির্ময় রূপে আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আমি সে মন্ত্র পড়ে নিলাম।

ভাষান্তরঃ অশোকা চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে বহির্দেশের অজ্ঞতা প্রচুর। তার কারণ ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই দেশ বহু বছর লৌহ যবনিকার আড়ালে ছিল। সেদেশের সরকারি সূত্রে প্রকাশিত মুখপত্র থেকে কয়েকটি বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো।

নিরক্ষরতা

জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার (ইউনেস্কো) পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে নিরক্ষর লোকের (১৫ বছর বয়সী ও তদূর্ধ্ব) সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং ১৯৭০-এ যেখানে এই সংখ্যা ছিল ৭০ কোটি আর ১৯৮০-তে ছিল ৮১ কোটি ৪০ লক্ষ, তার তুলনায় ১৯৯০-এ সংখ্যাটি সম্ভবতঃ ৮৮ কোটি ৪০ লক্ষে দাঁড়াবে। আপেক্ষিক হিসাবে (অর্থাৎ জনসংখ্যার তুলনায়) দুনিয়া জুড়ে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিয়ক্ষরতা ক্রমশঃ কমে আসছে—১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে ৩২ শতাংশ থেকে ১৯৮০-তে ২৯ শতাংশ এবং ১৯৯০-এ আনুমানিক ২৬ শতাংশ। কিন্তু অনাপেক্ষিক হিসাবে (অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে) নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জার সরকারের একটি পত্রিকা 'ভেস্তনিক ভোসপিতানিয়া'র হিসাবে বলা হয়েছিল রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করতে আরো ১২০ বছর লাগবে; সাইবেরিয়া ও ককেশাসে লাগবে ৪৩০ বছর এবং মধ্য-এশিয়ায় লাগবে ৪৬০০ বছর। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এই বহুজাতিক দেশজুড়ে সর্বত্র নিরক্ষরতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য যখন একটি বিশেষ সারা-রাশিয়া কমিশন স্থাপন করা হয়, তখন প্রতি ১০ থেকে ২০ জন ছাত্রের জন্য ছিল মাত্র একটি কলম, একটি পেন্সিল ও একটি খাতা। ১৯২০-র আগে মধ্য-এশিয়ায় বা কাজাকস্তানে আদৌ কোন উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। আজ সেখানে রয়েছে ১৩০টি এই রকম প্রতিষ্ঠান, এবং এখানে প্রতি দশ লক্ষের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, জাপান বা অস্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি।

সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষা দেওয়া হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং সর্বস্তরে সকলেই এই শিক্ষা পেতে পারেন। ১৯৩০-এর দশকে প্রাথমিক শিক্ষা আর ১৯৫০-এর ও ১৯৬০-এর দশকে আটসালা বিদ্যালয়-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ১৯৭০-এর দশকে বাধ্যতামূলক হয় সম্পূর্ণ (দশ বছর ব্যাপী বিদ্যালয়-শিক্ষা) মাধ্যমিক শিক্ষা।

সংবাদপত্র

সোভিয়েত ইউনিয়নে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতা বলতে বোঝায় ব্যক্তি-মালিকদের অধীনতা থেকে সংবাদপত্রের ও সাময়িক পত্রিকার বৈষয়িক স্বাধীনতা। সেখানে কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকা ব্যক্তি-মালিকাধীন নয়। প্রকাশকদের মধ্যে আছে কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সংস্থা, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, জনসংগঠন, পেশা-সংক্রান্ত সমিতি, ধর্মীয় সংস্থা, অন্যান্য সমিতি ও সংগঠন। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার পক্ষে এইগুলি করা নিষেধঃ যুদ্ধ প্রচার, জাতিগত ঘৃণা বা বর্ণবিদ্বেষ উসকে দেওয়া, দাঙ্গা-হানাহানিতে প্ররোচনা দান, সোভিয়েত সরকারকে হেয় করা, মিথ্যা সংবাদ অথবা যার সত্যতা খুঁটিয়ে দেখা হয়নি—এমন সংবাদ প্রকাশ করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ৮ হাজারেরও বেশি সংবাদপত্র এবং ৫ হাজারেরও বেশি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সমস্ত সংবাদপত্রের একবারের মোট মুদ্রণ-সংখ্যা ১৯ কোটি কপি এবং বছরে মোট ৪৩০ কোটি কপি। সাময়িক পত্রগুলির মোট বাৎসরিক প্রচার-সংখ্যা ৩৫০ কোটি কপিরও বেশি। ট্রেড ইউনিয়নের সংবাদপত্র 'ত্রুদ'-এর প্রচার-সংখ্যাই সর্বাধিকঃ—১,৮৮,৪৫০০০ কপি। কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র 'প্রাভদা' ছাপা হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ কপিরও বেশি। যুবজনের সংবাদপত্র 'কমসোমলস্কাইয়া প্রাভদা'র মুদ্রণ-সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ কপিরও বেশি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্র 'ইজভেস্তিয়া'

৮০ লক্ষ কপি ছাপা হয়। স্কুল-পড়ুয়াদের জন্য 'পাইয়োনিয়ার স্কাইয়া প্রাভদা' ছাপা হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক কপি। এ ছাড়া আছে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকা, উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পত্রিকা এবং বড় বড় কলকারখানার পত্রিকা, জনসংগঠন পত্রিকা।

ধর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে বিবেকের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ২০ হাজার উপাসনালয় আছে, আর আছে ২০টি মঠ ও ১৮টি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ধর্মবিশ্বাসীদের সমাবেশকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো বা ধর্মবিশ্বাসীদের ভুল বুঝিয়ে কুসংস্কারের জন্ম দেওয়াকে সেদেশের আইনে ধর্মের ছদ্মবেশে অপরাধমূলক কাজ বলে গণ্য করা হয়।

ধর্মসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রুশ অর্থোডক্স চার্চ 'মস্কো পেট্রিয়ার্কি জার্নাল' প্রকাশ করে। রুশ অর্থোডক্স চার্চ প্রকাশনা বিভাগ নিয়মিতভাবে বাইবেল, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পঞ্জিকা, উপাসনা গ্রন্থ প্রভৃতিও প্রকাশ করে। শিয়া, সুন্নি এবং ইহুদি সম্প্রদায় নিয়মিত তাদের ধর্মপুস্তক প্রকাশ করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্মেনিয়ান এ্যাপস্টলিক চার্চের চ্যান্সেলর আর্চবিশপ নার্সেস পোসাবেলা কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে (২১ মে ১৯৮৮) বলেনঃ "সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন আর কেউ বলেন না যে ধর্মই আফিম। আগে যখন এই কথাটা বলা হতো তখন বড়লোকেরা ধর্মের নামে গরিবকে শোষণ করত। কিন্তু এখন তো আর শোষণ নেই। এখন ধর্ম সম্পর্কে সোভিয়েত নাগরিকরা তাঁদের পছন্দমত মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। যেমন অনেক পার্টি-সদস্য তাঁদের ছেলেমেয়েদের ব্যাপটাইজড্ করছেন।" তিনি বলেনঃ "গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন নতুন হাওয়া বইছে। গর্বাচভকে আমরা খ্রীস্টানরা একজন প্রকৃত খ্রীস্টান হিসাবে দেখি। আবার কমিউনিস্টরা তাঁকে প্রকৃত কমিউনিস্ট হিসাবে দেখেন। কমিউনিজমের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নেই। মার্কস ও এ্যাঙ্গেলস উভয়েই খ্রীস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দুজনেই খ্রীস্টান শিক্ষা পেয়েছিলেন। খ্রীস্টান ধর্মই তাঁদের আত্মত্যাগ ও দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিয়েছে। স্তালিনের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকে ধর্ম আচরণে ভয় পেত। কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। এখন কত শতাংশ লোক গির্জায় যান বলতে পারব না তবে চার্চগুলি ভালই চলছে। গত এপ্রিল মাসে (১৯৮৮) রাশিয়ার প্রধান খ্রীস্টান ধর্মগুরু গর্বাচভের সঙ্গে সরকারিভাবে বৈঠক করেন। বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে চার্চপ্রধানের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। এটা আগে কোনদিন ভাবা যেত না।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গতবছর (১৯৮৮) ৫—১৬ জুন সোভিয়েত রাশিয়ায় খ্রীস্টধর্মের সহস্রবর্ষ পূর্তি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। [প্রতিবেদনঃ আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২ মে ১৯৮৮, পৃঃ পাঁচ]

মাদকাসক্তি

বহু বছর ধরেই সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে সদ্যজ্ঞাত মাদকাসক্তদের (drug-addicts) নথিবদ্ধ সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্পূর্ণ সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে সেদেশের কাছে এই তথ্যটাও দুশ্চিন্তার কারণ। মাদকদ্রব্যে আসক্তির শিকার যারা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা নবীন-বয়সী, এমনকি কিশোর পর্যন্ত। বর্তমানে যে বিধি রয়েছে, সেই অনুসারে প্রত্যেক মাদকাসক্তের নামে একটি রেজিস্ট্রেশন কার্ড ভর্তি করে নেবার পর তাকে পাঠানো হয় স্থায়ী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির কাছে। এইসব মাদকাসক্তের চিকিৎসা করা হয় বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত রকমের মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহার খুব কড়াকড়িভাবে চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হেরোইন, এল-এস-ডি, কানাবিস এবং অন্য কতকগুলি সাংঘাতিক বিপজ্জনক মাদকদ্রব্য উৎপাদন করা বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ।

[কলকাতাস্থ সোভিয়েত দেশ অফিস থেকে ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ **সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ ১০০ প্রশ্ন ও উত্তর** থেকে সংগৃহীত]

ধর্ম ও নৈতিকতা

প্রিয়ব্রত ঘোষ

আমি এখন যে অবস্থায় আছি, সেটাই আমার প্রকৃত অবস্থা নয়। সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম ও ইচ্ছার দ্বারা আমাকে প্রকৃত আমিতে পরিণত হতে হবে। আমার ভিতরে একটা মহাজীবন ও মহানিয়ম আছে। এজন্য বাইরের জগতের ক্রীড়নক আমি হতে পারি না। বহির্জগৎকে অন্তর্জগতের বশে আনতে হবে। এতে আত্মোন্নতি হয়। একটা গাছ বাইরের জগৎ থেকে খাদ্যরস পাচ্ছে। সেই রসকে সে আত্মস্থ করছে ; কিন্তু বাইরের জগৎকে জানার বা জয় করার কোন ইচ্ছা গাছের নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার ধারণা নেই; নিজের ভিতরে এমন কোন শক্তি তার নেই যা তাকে ঊর্ধ্বতর কোন ধারণার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রিত মানুষের সমস্যা ও দ্বন্দ্ব হলো—সে জানে সে কি এবং ত [illegible] কি হতে হবে। বাস্তবজীবন ও ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক জীবন—এ দুই জীবনের সংঘাত তার মধ্যে। এই সংঘাতের প্রকৃতি হলো—আমি ইন্দ্রিয়জীবনে তুষ্ট, আবার আমিই ঐ জীবনকে ঘৃণা করি। এ সংঘাত কেমন করে থামানো যাবে? নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের সম্পর্কের মধ্যে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

আমি বৃহৎ হতে পারি এটা অনুভব করি যখন আমার ক্ষুদ্র সত্তা পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে অল্পবিস্তর ত্যাগস্বীকার করি। তার মাধ্যমে আমার ভালবাসা, সহানুভূতি, দয়া, মায়া ইত্যাদি গুণগুলি ক্রমবিকশিত হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের স্পন্দন পারিবারিক জীবনেই প্রথম অনুভূত হয়। আমি ভাই-বোনদের ভালবাসি, বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করি, স্ত্রী-সন্তানদের ভালবাসি—এগুলি কর্তব্য বলে পালন করি। আমার মন তাতে আমাকে অনুপ্রাণিত করে। পারিবারিক কর্তব্যের জীবন আমাদের জীবনে ছন্দ ও সুর আনে। এ-সমাজবদ্ধ জীবনে প্রবেশ করে ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বন্ধনগুলো সম্বন্ধে সচেতন হই। ঐগুলিকে ধ্বংস না করে বৃহতের আলোতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আরো বৃহৎ পরিবার, আরো বৃহৎ সমাজ। ধন, ক্ষমতা এগুলোকে ক্রমেই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মনে হয় ; ঐগুলোর ক্ষুদ্র চরিত্র ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে তারা আমাদের আরো বৃহত্তর সত্তালাভের সহায়ক হয়। এভাবে দ্বন্দ্বের সমাধান হয়। প্রবৃত্তিগুলিই ঊর্ধ্বায়িত হয়ে বৃহত্তর জীবনের ভিত্তি রচনা করে এবং নৈতিক নীতি ঐগুলিকে একত্রিত করে। নৈতিক নীতির সাহায্যে প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করে আমরা ক্রমশঃ বৃহৎ সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রবেশ করি। এই জীবনগুলিতে উন্নততর আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাদ পাই ; কিন্তু সেগুলি অনন্তজীবন থেকে বহু দূরে। সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক জীবন ও অনন্তজীবনের মধ্যে বহু ফারাক। এ ব্যবধান নৈতিক জীবনে সবসময়ে থেকে যায়। এর কি কোন সমাধান নেই?

সমাধান ধর্মের মধ্যে পাওয়া যাবে। নৈতিক জীবনে আমরা আদর্শের দিকে এগিয়ে যাই, আদর্শকে অনুসরণ করি। ধর্মজীবনে ঐ আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়, ঐ কামনা বাস্তবায়িত হয়, মানুষ অসীম জীবনের অংশীদার হয়। সে ক্রমেই ঈশ্বরে সবকিছু সমর্পণ করে দেয়। ডঃ কেয়ার্ড নৈতিক জীবন ও ধর্মজীবনের সম্পর্ক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন: “It is the elevation of spirit into a region where hope passes into certitude, struggle into conquest, interminable effort and endeavour into peace and rest.” (Philosophy of Religion, P. 284). ক্রমবিকাশমান ধর্মীয় জীবনকে অনন্তের দিকে যাত্রা না বলে অনন্তের মধ্যে যাত্রা বলা সমীচীন। ডঃ কেয়ার্ড বলেছেন: “The religious progress is not progress towards but within the sphere of infinite.” (p. 284)

ধর্মজীবনের কথা রামকৃষ্ণদেবের উদাহরণেরই সাহায্যে বোঝা এবং বোঝানো সহজ। “বৈষ্ণবরা

বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা আছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে, তাদের থাক থাক আছে—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠেছেন, তাকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন-ভজন করছে—পূজা, জপ, ধ্যান ও নামগুণ-কীর্তন করছে—সে-ব্যক্তি সাধক। যে-ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করছে তাকেই সিদ্ধ বলে, যেমন বেদান্তের উপমা আছে—অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানলায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়। 'নেতি, নেতি, নেতি'। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে 'ইহ'—এই বাবু—অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে, কিন্তু বিশেষরূপে জানা হয় নাই।

"আর এক থাক আছে তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তাহলে আর এক রকম অবস্থা—যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বর পেয়েছে বটে—যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৬৮) ধর্মজীবনের লক্ষ্য হলো ভগবানলাভ। ভগবানকে পাওয়া, পূর্ণরূপে পাওয়াই হলো ধর্মজীবনের চরিতার্থতা। নৈতিক জীবনে মানুষের এই আদর্শ নাও থাকতে পারে। ভগবানের চিন্তা সেখানে জীবনের কোন ভূমিকেই স্পর্শ না করে থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মজীবনে ভগবানকে বাদ দিয়ে কোন কিছু হতে পারে না। এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা বা তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতার ওপর ধর্মজীবনের বিকাশের তারতম্য, উন্নতির পার্থক্য সূচিত হয়।

যথার্থ ধর্মপ্রাণ মানুষ সর্বত্রই ঈশ্বরকে দেখতে পায়, ফলে সকলের প্রতিই তার গভীর প্রেম প্রকাশিত হয়। প্রেম, দয়া, করুণা—এসবের ধারা ঝরনার মতো তার জীবন থেকে উৎসারিত হয়। অর্থাৎ ধার্মিক মানুষ নৈতিক মানুষ না হয়ে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ "আমার জিনিস, আমার জিনিস বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোককে ভালবাসা এটা দয়া থেকে, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। শুকদেব নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।" (কথামৃত, পৃঃ ১১৬৯) শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ধর্মীয় জীবন ও নৈতিক জীবন দুই একীভূত হয়েছিল। তার প্রমাণ পাই স্বামীজী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীম-র লেখায়ঃ "ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি **যথার্থই গুরুদেবের পদানুসরণ করিয়াছ**।... সর্ববস্তুর প্রাণ তিনি (অর্থাৎ ঈশ্বর) ... হে মহাযোগিন্! সর্বভূতস্থ সেই হরির সেবার জন্য ... কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে ;... তোমার গভীর অপার প্রেমের অধিকারী সকলেই হইল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বিদেশী, স্বদেশবাসী ধনী, দরিদ্র, নর-নারী সকলকেই তুমি প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছ।" (কথামৃত, পৃঃ ১১৭৩-১১৭৪)

ধর্মপ্রাণ মানুষের জীবনে নৈতিকতার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে নৈতিক জীবনও ধর্মীয় জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সেন্ট জন বলেছেনঃ "যে নিজের ভাইকে ভালবাসতে পারে না সে কিরূপে ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—ভালবাসবে ?" অর্থাৎ দৃষ্ট মানুষের প্রতি ভালবাসা অভ্যাস করলে সেই ভালবাসাই ক্রমে ঈশ্বরের দিকে চালিত হয়। রামকৃষ্ণদেব বলেছেনঃ "নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।" (কথামৃত, পৃঃ ৬০) সুতরাং বলা যেতে পারে নৈতিক জীবন ধর্মীয় জীবনের অঙ্গ এবং নৈতিক জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ধর্মীয় জীবনের মধ্যেই। ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি ধারণাগুলি বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মমতের ওপর প্রয়োগ করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান আমরা পাব।

পরিক্রমা

দেবীতীর্থ জ্বালামুখীর পথে

দিলীপকুমার দত্ত

হিমালয়ের বুকের অভ্যন্তরে ধ্যান-গম্ভীর স্বর্গীয় প্রকৃতির এক নিভৃত কোটর—জ্বালামুখী। ভারতের একান্ন দেবীপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। সুদূর অতীত থেকে শত-সহস্র মানুষ হিমালয়ের পথ, প্রকৃতি আর মানুষের স্বর্গীয় লাবণ্যে ভরা অন্তর-ঐশ্বর্যের আকর্ষণে ছুটে এসেছে এই জ্বালামুখীর কোলে, তাকে পরিণত করেছে মহামানবের মিলনমেলায়। সর্বোপরি তীর্থের আকর্ষণ তো আছেই। তীর্থের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ভারতের চিরায়ত অধ্যাত্মবাদেরই বাহ্য প্রকাশ—একথা আজকের বস্তুসুখসর্বস্ব কিছু মানুষ যতই অস্বীকারের চেষ্টা করুন না কেন ঘরের মায়া, পথের দুর্গমতা, পাথেয়ের অভাব, সমাজ-পরিবেশের সঙ্কট-মুহূর্তে কোন কিছুই তীর্থকামী মানুষগুলিকে বাধা দিতে পারেনি। তীর্থ তো কেবল দেবমন্দিরের বিগ্রহ দর্শন ও পূজাচার নয়, তাকে উপলক্ষ করে পথ, প্রকৃতি আর মানুষের সেই মহিমাকে, তাদের অসীমতাকে আস্বাদন, ভূমার পটভূমিতে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করে পূর্ণতার সাধনসিদ্ধি—যা তাদের সমস্ত সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে উত্তরণ ঘটায় বোধের ঊর্ধ্বলোকে। মনের সেই ঊর্ধায়িত অবস্থাই তো তীর্থপ্রাপ্তি—তীর্থের যথার্থ পুণ্যলাভ।

হিমাচল প্রদেশের নানা জায়গা ঘুরে এসে পৌঁছেছি ধরমশালার স্নেহচ্ছায়ায়। এখান থেকেই এক রৌদ্রোজ্জ্বল শারদ প্রভাতে আমাদের যাত্রা জ্বালামুখীর উদ্দেশ্যে, স্থানীয় ভাষায় যার নাম জাওলাজী। ধওলাধার পর্বতমালার একটি গিরি-শিরার উপর কাংড়া উপত্যকায় ধরমশালা—বর্তমানে কাংড়ার সদর শহর। চার থেকে ছ-হাজার ফুট উচ্চতায় তিনটি স্তরে বিস্তৃত এ শহরের নিচের অংশ কোতোয়ালি বাজার. নানা সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-কেন্দ্র, মনোরম উদ্যান-অট্টালিকায় শোভিত অভিজাত অঞ্চল। মধ্যাংশ লোয়ার ধরমশালায় আছে বাস-স্টেশন, অসংখ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বিপণি, পর্যটক-নিবাস প্রভৃতি। আর ওপরের অংশ আপার ধরমশালা বা ম্যাকলিয়ডগঞ্জ—যেখানে আছে দলাই লামার ভারতীয় 'পোতালা' আর অপূর্ব তিব্বতীয় স্থাপত্য ও চিত্রাবলীশোভিত বৌদ্ধগুম্ফা, আছে উষ্ণ প্রস্রবণ আর তারই উপর ভাগশুনাথ শিবমন্দির, আছে চাপলাস-দেওদারের ঘোমটায় ঢাকা অনতি-বিস্তৃত ডাল-হ্রদ যার উঁচু পাড়ে কয়েকটি ছোট্ট দেব-মন্দির ও সাধন-কুটির, আর আছে ধরমশালার অতন্দ্র-প্রহরী সবুজ অরণ্যানী বেষ্টিত পর্বতশিখর ট্রাইউন্ড যার উচ্চতা দশ হাজার ফুটেরও বেশি।

ধরমশালা থেকে হোসিয়ারপুরগামী বাসে জ্বালামুখী আড়াই ঘণ্টার পথ, দূরত্ব তিপান্ন কিলোমিটার। পাকদণ্ডির পাকে পাকে সংকীর্ণ পথ গগ্গল পর্যন্ত তের কিলোমিটার উতরাইয়ে নেমে এসে পাঠানকোট-কুলুর প্রশস্ত সড়ককে চিরে এগিয়ে গেছে কাংড়ার দিকে। কোতোয়ালি বাজারের বিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমি ছাড়িয়ে আসার কিছু পরেই খরস্রোতা নদী কাউপালমালা। সেতু অতিক্রম করে আসার সময় কিশোরী নদী তার উচ্ছল সুনীল জলধারা, বর্ণাঢ্য উপলরাশি আর দু-তীরের আরণ্য-সৌন্দর্যের চুম্বকে মনকে যেন বেঁধে রাখতে চায়। হিমালয়ের প্রকৃতিকে পূর্ণ প্রাণবন্ত করেছে এ-ধরনের অগণিত নদী-গিরিখাদ-ঝর্নাধারাগুলিই—যারা পাহাড় আর অরণ্যের ধ্যানগম্ভীর পটভূমিতে নয়নের দ্বারপথে সমগ্র চেতনাকে পৌঁছে দেয় সৌন্দর্যস্বর্গের রসতীর্থে।

উতরাই পথে সুদেড় ছাড়িয়ে আসার পর থেকেই বহু দূরে চোখে পড়ে পাহাড়ের কোলে কোলে বিস্তৃত বিপাশা-শতদ্রু প্রকল্পের কয়েকশো বর্গমাইল ব্যাপী জলভাণ্ডার—যা হিমাচল-পাঞ্জাব-হরিয়ানা-রাজস্থানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বড় উৎস। চাপলাস-পিয়ার-দেওদার-পাইনের নিবিড় অরণ্য আর ছোট ছোট নদী-গিরিখাদের বুক চিরে বা তাদের তীর ধরে নিঃশব্দে ছাড়িয়ে এলাম ছোট ছোট গ্রাম ঘাগো, চেড়ী, বড়। ঢাকের বাদ্যে চারিদিক মুখরিত করে চেড়ী গ্রামে

নদীর তীর ধরে উঠে আসছিলেন চম্বী মাঈর পূজারীবৃন্দ। বাস থামিয়ে অন্তরের উষ্ণ অভ্যর্থনায় সবাইকে তাঁরা বিতরণ করে গেলেন পূজার নির্মাল্য ঘৃতপক্ব গরম হালুয়া। আজ বিজয়া দশমী। হিমালয়ের কোলে হৈমবতীর সে-প্রসাদী আশীর্বাদ-লাভে আমরা সবাই অভিভূত।

গগ্গল ছাড়িয়ে এলাম আধঘণ্টার মধ্যেই। উচ্চতা সাতশ সত্তর মিটার অর্থাৎ আড়াই হাজার ফুটের কিছু বেশি। ডানদিকের প্রশস্ত পথ গেছে সাতাত্তর কিলোমিটার দূরে পাঠানকোট, বামের পথ পালামপুর যোগীন্দরনগর হয়ে মাণ্ডি যেখান থেকে দ্বিধাবিভক্ত পথের একটি গেছে চণ্ডীগড় ও সিমলার সংযোগপথ বিলাসপুর, অন্যটি বিপাশার লারজিগর্জ হয়ে কুলু-মানালি হয়ে বরফঢাকা রোটাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ঢুকে গেছে হিমালয়ের দুর্গম গভীরে লাহুল স্পিতির বুকে। আমাদের গতি পাঠানকোট-মাণ্ডির পথ চিরে সোজা দক্ষিণে। এপথে গগ্গল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বেই গোমতীতীরে মনোরম জনপদ কাংড়া—বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পের সঙ্গে যে নামটি জড়িত। কাংড়ায় মিনিট পনেরর বিরতিকালে স্টেশনচত্বরে প্রকাশ টী স্টলের গৌরীশঙ্কর কুমার সন্ধ্যার পূজামণ্ডপে হার্দ্য আমন্ত্রণ জানান। বলেন, কাছেই মিলিটারির ব্যারাকে বহু বাঙালী আছেন, তাঁদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে। অতিরিক্ত আকর্ষণ ব্যারাকের কাছেই তারাদেবীর মন্দির। ফেরার পথে আমন্ত্রণ রক্ষা করার কথা দিয়েও তা রাখতে পারিনি কাংড়া থেকে ধরমশালা ফেরার শেষ বাস ধরতে না পারার আশঙ্কায়।

বাস চলছে। দূরে বজ্রেশ্বরী মাতার শুভ্র মন্দির-চূড়া গাছপালার শীর্ষে ঝলমল করে উঠছে প্রভাতী সূর্যের আলোয়। ফিরোজ শাহ তুঘলক, শেরশাহ, গজনীর সুলতান মামুদ প্রভৃতির হাতে কাংড়া ও তার পালিকা ধাত্রী বজ্রেশ্বরী লুণ্ঠিতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছেন বারবার। ফিরোজ শাহ তুঘলক নাকি কেবল তাতেই সন্তুষ্ট থাকেননি, বজ্রেশ্বরী মাতার বিগ্রহ মক্কার রাজপথে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর পদতলে পিষ্ট করে নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন। ঐতিহাসিক কাংড়ার এসকল টুকরো টুকরো তথ্য বাসের মধ্যেই শোনাচ্ছিলেন নরীন্দর পাল—এই কাংড়া থেকেই যাঁকে সহযাত্রী হিসাবে পাশে পেয়েছি। বাড়ি কয়েক মাইল সামনে রানীতাল। ভোরে কাংড়া এসে এখন চলেছেন হোসিয়ারপুরে। সেখান থেকে দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবেন তাঁর সরকারি কর্মস্থল সিমলায়।

কাংড়া থেকে মাইল দুয়েকের মধ্যেই গোমতী-গঙ্গা। সেতুর উপর দাঁড়ানো বাসের বাতায়নপথে এক অপূর্ব স্বর্গলোক যেন ঝলসে উঠল চোখের সামনে। বিস্তীর্ণ উপত্যকা অংশে জলরাশি গভীরতা পেয়ে অনুচ্ছল গম্ভীর। দু-তীরের অগণিত অরণ্যময় পাহাড়-শিখরের কোলে কোলে স্বল্পবৃহৎ বিস্তার নিয়ে বহমানাগোমতী। জলের বুকে মাথা তোলা ছোট ছোট পাহাড়-শিখর সৃষ্টি করেছে শম্বুকাকৃতি ছোট ছোট দ্বীপের। একদিকে অতীত ইতিহাসের বেদনার্ত করুণ স্মৃতি, অন্যদিকে চোখের সামনে উদ্ভাসিত প্রকৃতির বর্ণনাতীত স্বর্গীয় সুষমাধারা—এই দুই ভিন্ন স্বাদের ঠিক সীমারেখাটির উপর যেন দাঁড় করিয়ে দেয় মানসিক বোধকে, গোমতী-গঙ্গার ঠিক বুকের উপর দৃষ্টিশক্তি যেন অন্ধ হয়ে যেতে চায়। বর্ণে গন্ধে মদির পুষ্পেই তো কীটের দংশন বেশি। বুঝিনি বাস কখন আবার চলতে শুরু করেছে। গগ্গল থেকে এতক্ষণ পথ ছিল প্রায় সমতল। এবার শুধুই ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা। মেঘ জমছে আকাশে, পাহাড়ের কোলে, অরণ্যশীর্ষে। বৃষ্টি আসন্ন। পথের পাশে পাশে কিছুক্ষণ দেখা গেল ন্যারো গেজ রেললাইন যা পাঠানকোট থেকে নূরপুর, নাগরোটা, জ্বালামুখী রোড, কাংড়া হয়ে শেষ হয়েছে কুলু উপত্যকায় মাণ্ডি জেলার যোগীন্দ্রনগরে। পালামপুর, বৈজনাথমন্দির স্টেশনও এই রেলপথের উপরেই। ধ্বস, তুষারপাত এড়িয়ে বছরে মাত্র কয়েকমাসই এ-পথে ট্রেন চলে।

ছাড়িয়ে এলাম রানীতালের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ জনপদ। পথ এখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বামে গেছে জুকন্দিয়া সিটি, অপরটি আমাদের গতিপথ। এই রানীতালেরই মানুষ নরীন্দর পাল। এতক্ষণ শোনাচ্ছিলেন কাংড়ার ইতিহাস-প্রসঙ্গে রণজিৎ সিং-এর কথা—একদিকে রাজপুত নৃপতি সংসারচাঁদ, অপরদিকে নেপালরাজের সেনাপতি অমর সিং থাপাকে কৌশলে বিতাড়ন করে কাংড়া দুর্গে শিখ

পতাকা ওড়াবার কাহিনী। বাসে 'জাওলাজী'তে পূজা দিতে আসা স্থানীয় মানুষের ভিড় ক্রমশঃ বাড়ছে।। ফল-ফুলের সঙ্গে অনেকের হাতেই একটি করে দুধের ভাণ্ড। পার হয়ে এলাম কুড়ি মিটার দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গপথ। গোমতী-গঙ্গা হারায়নি, মাঝে মাঝেই পাহাড়ের নানা বাঁকের মুখে কখনো কাছে, কখনো দূরে তার অপরূপ নীল মাধুরী নিয়ে অমরাবতীর সুধারাজ্য রচনা করে চলেছে। সাধ্য কি তার চুম্বক হাতছানি উপেক্ষা করে দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরাই। রেলপথটিও মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে। তার যাত্রাপথে অতল শূন্যতার ওপর প্রাচীরবিহীন সংকীর্ণ সেতুগুলি হৃৎকম্প জাগায়। কিন্তু শ্যামল পার্বত্য সুষমার মনোহারিত্ব সে ভয়কে নিমেষে ঢেকেও ফেলে। আর এসবেরই মাঝে মাঝে উপকরণের প্রাচুর্যহীন ছোট ছোট স্নিগ্ধ গ্রাম—খোলা, গম্মন, কুঠার। কুঠার থেকে পথ আবার দ্বিধাবিভক্ত। বামের পথ গেছে জলন্ধরের দিকে। আমাদের বাস বাঁক নিয়েছে ডাইনে।

বৃষ্টিকে আর আটকে রাখা গেল না। মাথার উপর মেঘের রাজ্য কখন সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে আর হিমশীতল বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিছুই টের পেতে দেয়নি চেতনা-অপহরণকারিণী লাবণ্যময়ী প্রকৃতি। টের পেলাম যখন মেঘ আর জলকণা একাকার হয়ে দৃশ্যমান জগৎকে অদৃশ্য করে বৃষ্টি এল ঝাঁপিয়ে, চারিদিক মথিত করে তুলল ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। নদী-মাটি-পাহাড়-অরণ্য-মেঘ সব যেন একসঙ্গে উল্লাসে মেতে উঠল। ইউক্যালিপটাস আর চীর দেওদারের গগনভেদী অরণ্যে তুমুল আন্দোলন তুলে বাতাসও তাতে যোগ দিয়েছে শোঁ শোঁ শব্দে। সুন্দিয়া গ্রাম সবে ছাড়িয়ে এসেছি। তারপর থেকেই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন আমাদের প্রায় বন্দীদশা। বৃষ্টির প্রবল ধারা গড়িয়ে নামছে বাসের বন্ধ জানালার কাঁচের ওপিঠে। বাইরের জগৎ পুরো অদৃশ্য। সর্পিল চড়াইপথে পাহাড় যখন অতি নিকটে, কেবল তখন দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট পাহাড়ের গা বেয়ে গুম্ গুম্ শব্দে নেমে আসছে গৈরিক জলধারার প্রবল স্রোত। বাসের মধ্যে বসে থাকলেও এতক্ষণ প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির কোলে অবাধ বিচরণের কোনও বাধা ছিল না। মন তাই কিছুটা অসহিষ্ণু। নরীন্দর পাল পাহাড়ী বৃষ্টির শরৎকালীন চরিত্র বুঝিয়ে ভরসা দিলেন: "ভয় নেই, বৃষ্টি এখনি থেমে যাবে।" প্রবল ধারার মধ্যেই ছাড়িয়ে এলাম সাপরী, ঘীনা ও আরো কয়েকটি গ্রাম। নরীন্দরের সান্ত্বনাবাক্যকে মর্যাদা দেবার বিন্দুমাত্র প্রবণতা দেখা গেল না বরুণদেবের মধ্যে। জ্বালামুখীও ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। বন্ধ বাসের ভিতর এতগুলি মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস গুমোট গরম হয়ে উঠছে। বৃষ্টির ছাটকে উপেক্ষা করে জানালার কাচ নামিয়ে দিলাম। শীতল বাতাসে শরীর-মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। বৃষ্টির উল্লাসে মত্ত হিমালয়ের সে আর এক মাধুরী। 'মুহল' ছাড়াবার পরেই নরীন্দর সতর্ক করে দিলেন—"নেক্সট্ স্টপেজ জাওলাজী।" সেইসঙ্গে সান্ত্বনাও দিলেন—ওয়েটিংরুমের পাশেই বাস দাঁড়াবে, সুতরাং খুব বেশি ভিজতে হবে না। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বৃষ্টির বেগ হঠাৎই স্তিমিত হয়ে এল। সেই হালকা ঝিরঝিরে ধারার মধ্যেই বাস এসে থামল জ্বালামুখীতে। মানুষ আর মালপত্রের ভিড়ে ওয়েটিং রুমে পা রাখার জায়গা নেই। ছুটে এসে উঠলাম চত্বরের একপাশে সিংজীর চায়ের দোকানে।

বৃষ্টিস্নাত সজীব সতেজ চেহারার মদিরতা নিয়ে আমাদের সামনে দেবীতীর্থ জ্বালামুখীর অপরূপ লাবণ্য। চারপাশের মাটির রং গৈরিক। স্টেশন-চত্বর পার হয়ে একটি পথ উঠে গেছে কালীধর পাহাড়ে। তারই ওপর মন্দিরের স্বর্ণশিখর মেঘভাঙা সূর্যের খর আলোয় হলুদের বন্যা ছড়াচ্ছে। বৃষ্টি একেবারে থামার অপেক্ষায় চায়ের গ্লাস হাতে জনারণ্যে বসে উপলব্ধি করে চলেছি নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্যে এক মহান মিলনকে। চতুরাশ্রম-ভিত্তিক প্রাচীন ভারতবর্ষের এক অখণ্ড চেতনায় বিধৃত অমর আত্মাটিকে যেন এখনো নিঃশেষে চিনে নেওয়া যায় এই তীর্থভূমিতে এসেই। গঙ্গারামপুর জেলার চক গ্রামের প্রাচীন মানুষ গুরুবচন সিং ক্ষণিকের মিষ্ট সাহচর্যে সেই চেনাকে আরো অবারিত করে তুললেন চোখের সামনে। আত্মিক শিক্ষাদানের দেশ সনাতন ভারতবর্ষ মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে অহম্-এর আবরণমুক্ত চিত্তের

প্রসারতা অর্জনের মাধ্যমে। দেবতাত্মা হিমালয়ের দেবস্থান, তীর্থপথগুলিতে সেই আত্মিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ ভোগবৈরাগ্যের সাধনসিদ্ধ মানুষের সন্ধান আজও মেলে। গুরুবচন তাঁদেরই একজন। সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা ক্ষেত-খামার, সুখময় গৃহকোণ ছেড়ে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়েন তীর্থের পথে একাই। উদ্দেশ্য আত্মানুসন্ধান। এবারের যাত্রায় নাঙ্গাল, ভাকরা, কুলু, পাণ্ডো, চিন্তোপূর্ণি বৈষ্ণোদেবী হয়ে এখানে এসেছেন। পথে পথে কাটাবেন আরো দু-তিন সপ্তাহ। বানপ্রস্থ-আশ্রমবাসী এই অসম বয়সের মানুষটি বাস ধরতে এগিয়ে যাবার আগে বার তিনেক পশ্চিম রেলের পালানপুর-গান্ধীধাম শাখার পদমপুর স্টেশন ও সেখান থেকে চক গ্রামের পথনির্দেশ সহ একান্ত হৃদ্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। মনটা বড় স্নিগ্ধ আর সেইসঙ্গে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এইসব মানুষের প্রাণের উত্তাপে। এঁরাই তো ভারতের প্রাণগরিমার চিরন্তন ধারক।

মন্দির পর্যন্ত কিলোমিটার-খানেক পথের দুপাশে অজস্র পণ্যসামগ্রীর বিপণি। বিক্রেতাদের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করে এসে দাঁড়াই তোরণদ্বারের সামনে। তোরণের বাইরে গায়ত্রী-মন্দির। তোরণদ্বারের ভিতরে সিঁড়ি উঠে গেছে জ্বালামুখীর মন্দির-চত্বরে। মন্দিরের অভ্যন্তরে মেঝের মাঝখানে গর্ত, সেখানে পাহাড়ের গুহার মধ্যে গর্ভগৃহ। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে ছ-সাত ফুট উঁচু লেলিহান অগ্নিশিখা। এই শিখাই জ্বালামুখী তীর্থের আরাধ্যা। বিষ্ণুচক্রে একান্ন খণ্ডে বিভক্ত সতী-অঙ্গের লেলিহান জিহ্বার পতনে এই মহাপীঠের উৎপত্তি—দেবী এখানে শিখাময়ী অম্বিকা, ভৈরব উন্মত্ত। গুহামুখের সামনের অংশের তিনদিক কুণ্ডের আকারে বাঁধানো। অগণিত মানুষ ভক্তিনম্রচিত্তে গুহামুখের আগুনে নিক্ষেপ করছেন পূজার অর্ঘ্য-সামগ্রী। নানারঙের মোজাইক টালি দিয়ে মন্দিরের মেঝে এবং দেওয়াল বাঁধানো। দেওয়ালগুলিতেও ছোট বড় নানা আকারের খোপের ভিতরে পাহাড়-গায়ের ফাটল থেকে বেরিয়ে আসা নীলাভ অগ্নিশিখা। হাত দিলে তাপ লাগে না। কাছে গেলে গন্ধকজাতীয় একটা গন্ধ টের পাওয়া যায়।

মন্দিরে পূজা-দক্ষিণা সংগ্রহে ব্যস্ত তীর্থপূজারী অনেক। তাঁদেরই মধ্যে বড় ভাল লাগল এক সৌম্য প্রশান্ত প্রৌঢ় পূজারীকে। মুখের পবিত্র হাসি মনকে মুগ্ধ করে। তাঁর কাছেই শুনলাম রাজা ভূমিচন্দ্রের কথা। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে গুহাভ্যন্তরে খুঁজে পান এই জ্বালামুখ, আর তাকেই বেষ্টন করে গড়ে তোলেন এই মন্দিরের প্রাচীন কাঠামো। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ীই নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূজারী হিসাবে নিয়ে এলেন ব্রাহ্মণ কমলাপতি আর শ্রীধরকে। বর্তমান সেবাইতরা তাঁদেরই বংশধর।

গর্ভগৃহের উর্ধ্বাংশে একটি স্বর্ণছত্র। সেটিরও ইতিহাস শোনালেন পূজারীজী। মোগল সম্রাট আকবর নাকি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মাহাত্ম্য বন্ধ করার জন্য গুহামুখে জলপ্লাবন সৃষ্টি করে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সে শিখা। পারেননি। জলের স্রোত ভেদ করে অতল উৎস থেকে উঠে আসা আগুনের শিখা আরো লেলিহান হয়ে উঠেছিল। ধর্মভীরু আকবর জ্বালামুখের মাহাত্ম্য মেনে নিয়ে দেবীর জন্য নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ঐ স্বর্ণছত্র এবং এ-ঘটনার পর থেকেই তিনি হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান-ধর্মে ঐক্যের প্রসারকামী। কাহিনীটির সত্যতা কতখানি জানি না, তবে শুনে বড় ভাল লাগল। এই সঙ্গেই শুনলাম মন্দিরের বর্তমান স্বর্ণশিখর পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের অবদান।

দেবী-মন্দিরের পাশেই উঁচু চত্বরে সিদ্ধেশ্বর শিব গোরক্ষনাথের মন্দির। লিঙ্গ বা প্রস্তরমূর্তি নয়, ধ্যানী মহেশের বিরাট এক বর্ণময় চিত্র সেখানে। আশপাশে তুলসীদাসের কবিতার চরণ উৎকীর্ণ। মন্দিরের সামনে একটি সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ—'গোরখ ডিব্বো'। ভিতরে ঢুকলে চোখে পড়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ির নিচে একটি জলকুণ্ড আর তার উপর প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। পুরোহিত পাশের একটি দ্বার উন্মোচন করতে সেখানেও দেখা গেল জলকুণ্ডের উপর কম্পিত অগ্নিশিখা।

জ্বালামুখীর আর একটি বড় আকর্ষণ কালীধর পাহাড় ও তার শীর্ষে অবস্থিত টেরা মন্দির। জ্বালামুখী মন্দির-চত্বর থেকে শিখরপ্রদেশ উচ্চতায় প্রায় চার হাজার ফুট, আর পথ ওঠা-নামায় মাইল ন-দশ। গোটা পথটাই ছায়াঘন গভীর অরণ্যে আর

অজস্র ফুলের বর্ণবৈভবে বড় মনোরম। প্রথমদিকে মাইল দেড়েক স্বল্প চড়াই পথ ফুট তিনেক চওড়া করে বাঁধানো। গর্জন, অর্জুন আর চাপলাশের ছায়ায় সূর্যের আলো পথের উপর রচনা করে চলে বিচিত্র আলপনা। বাঁধানো পথটুকুর মধ্যে একে একে পড়ে শঙ্কর-শিবাজী মন্দির, মহাকালী-ভৈরব মন্দির, রাধাকিষেণজীর মন্দির। দিগন্তের পাহাড়শ্রেণীর তরঙ্গায়িত বিস্তার আর প্রকৃতির ধ্যানী মৌনতা গোটা পরিবেশে সঞ্চার করে দেয় এক পরম পবিত্রতা। রাধাকিষেণজীর পাশে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের কালো কষ্টিপাথরে তৈরি মূর্তিটির অপরূপ লাবণ্য বড়ই দৃষ্টি কাড়ে। কিন্তু মনকে সবচেয়ে বেশি কেড়ে নেয় এসকল মন্দিরের সেবাইত ও পথচলতি মানুষজনের মধুর বিনম্র ব্যবহার, তাদের অন্তরের সারল্য আর মাধুর্য, যা হিমালয়ভ্রমণে একটি সেরা প্রাপ্তি। বাঁধানো পথ শেষ হয়েছে উঁচু প্রাচীরঘেরা এক গৃহের সামনে যার ভিতর-চত্বরে তিনদিকে ঘেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে নানা দেবদেবীর মূর্তি। আছেন শস্ত্রধারিণী ষড়ভুজা সন্তোষী মাতা, রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, অম্বিকেশ্বর মহাদেব, রাধাকৃষ্ণ। একপাশে ব্রহ্মকুণ্ডে কাকচক্ষু জল। কৃষ্ণ এখানে রাধার মতোই শ্বেতশুভ্র যা অনভ্যস্ত চোখ ঠিক মানতে চায় না।

এবার একটি সঙ্কীর্ণ পথরেখা শুধু প্রাচীর বেষ্টন করে মন্দিরের পিছন থেকে দুর্ভেদ্য অরণ্যের বুক চিরে খাড়া উঠে গেছে কালীধর পাহাড় শীর্ষে। ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন বনপথ ভয় জাগালেও মুগ্ধ করে অনেক বেশি। ওঠা এবং নামার পথে আমাদের সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল হরিয়ানার জুন্দা কলেজের ছাত্র লাজপৎ রায়। বছর কুড়ি-বাইশের যুবক। বছর পাঁচ ধরে একা একা ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসে পথ এখন তাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। আজ এখানে জুন্দা থেকেই আসা অন্য এক কলেজের পরিচিত ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা হলেও লাজপৎ তাদের সঙ্গী হয়নি, দলের ভিড়ে হৈ-হট্টগোলে প্রকৃতিকে ঠিকমত উপভোগ করা যায় না বলে।

পথ আর প্রকৃতির প্রেমমুগ্ধ লাজপতের নানা কথা শুনতে শুনতেই এক সময়ে উঠে এসেছি শীর্ষচত্বরে। চোখ জুড়িয়ে দেয় বিশ্বশিল্পীর তুলিতে আঁকা চারপাশের বিস্তৃত জগৎ। বহু নিচে বিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমি, দূর প্রান্তগুলিতে সবুজ অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের সাম্রাজ্য। মহাবারিধির নীরব নিথর ঊর্মিরাশি যেন। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের নিচে ঝলমল করছে পৃথিবী।

চত্বরের এককোণে টেরা মন্দির। আসলে শিবমন্দির। ঊনিশশো পাঁচের ভূমিকম্পে মন্দির প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ডিগ্রী কোণে কাত হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে। সে-কারণেই মন্দিরের নাম কালক্রমে টেরা মন্দির আর কালীধর পাহাড়ের স্থানীয় পরিচিতি টেরা পাহাড় হিসাবে। চত্বরের একপ্রান্তে অনুচ্চ প্রাচীরের উপর বসেছিলেন জটা-শ্মশ্রুভারানত গৈরিকবস্ত্রধারী জনৈক সাধু—সন্ত শচীন্দর। তাঁর কাছেই শুনলাম মন্দিরের ইতিহাস। প্রথমে আত্মপরিচয় দিতে না চাইলেও নিবিড় কথাবার্তাকালে পূর্বপ্রসঙ্গ কখন যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল। অযোধ্যার মানুষ শচীন্দ্র সন্ন্যাস-জীবনে সন্ত শচীন্দর হয়ে মানুষের মধ্যেই খুঁজে ফেরেন ঈশ্বরকে। প্রথানুগ পূজার্চনায় তাঁর বিশ্বাস নেই। পরিব্রাজকরূপে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে মানুষকেই তিনি ঈশ্বরের আসলরূপ বলে মনে করেন। তাই মানুষকে বড় ভালবাসেন তিনি। মানুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের অপূর্ণতার তত্ত্বে তিনি ধ্রুব-বিশ্বাসী

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় আত্মস্থ সন্তজীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে ভঙ্গ অভঙ্গ ছোট বড় অসংখ্য শিবলিঙ্গ, নানা দেব-দেবীর মূর্তি, টেরা মন্দির, চারপাশের অগণিত পাহাড়ে অনন্ত বিস্তৃত মানবময় পৃথিবী—সব যেন আর একবার দুলে ওঠে। সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আমার চারপাশে যেন প্রকট হয়ে ওঠে অধ্যাত্মভূমি ভারতের চিরায়ত সত্য—যে-সত্য উপনিষদ্ তুলে ধরেছে এই পৃথিবী ও তার মানুষকেই শ্রেষ্ঠ মূল্য অর্পণ করে—সেই মন্ত্রবাণী ঃ "ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু।…ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধু।" "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" —"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।" কেমন যেন এক বেদনা-ঝলসিত পরম আনন্দের বোধ নিয়ে বসে পড়ি সাধু শচীন্দ্রের পায়ের কাছে।

প্রবন্ধ

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের আলোকে

প্রাচীন ভারতের দেশরক্ষা-নীতি

বলরাম মণ্ডল

বৈদিক সাহিত্যে গান্ধার, পুরু, যদু, তুর্বসু প্রভৃতি আর্যজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এঁরা বিভিন্ন রাজবংশ স্থাপন করেছিলেন যেগুলির বৃত্তান্ত রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের নৃপতিগণ যে নীতি অবলম্বন করে রাজ্যশাসন করতেন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যুগেও সেই ধারাই অব্যাহত ছিল। প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাষ্ট্রনৈতিক পারদর্শিতা ও শাসনপ্রণালী পরবর্তী যুগের শাসকবর্গকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রামায়ণ, মহাভারত, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতিতে বহু রাজবংশ ও নৃপতিবর্গের বংশবৃত্তান্ত ও শাসনপদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজার কাজ শুধু রাজ্যশাসনই ছিল না, তাঁর মূল ব্রত ছিল সর্বতোভাবে প্রজার কল্যাণসাধন, সত্য ও ধর্মের রক্ষা। রাজা ছিলেন প্রজাবর্গের কাছে ঈশ্বরের প্রতিভূ। তাঁর সকল কর্মে ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা, মর্যাদা, বীর্য, শৌর্য প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণগুলির প্রকাশ ছিল তাই কাঙ্ক্ষিত। হরিশচন্দ্র, দশরথ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ, রন্তিদেব, উশীনর প্রভৃতির নৃপতিবৃন্দ প্রাচীন ভারতের রাজধর্মের সার্থক পালক।

রাজা কখনো বিলাস-ব্যসনে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবেন না। সবসময় তিনি নিজেকে বিলাসিতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন:

> ব্যসনানি চ সর্বাণি ভূপতিঃ পরিবর্জয়েৎ।
> লোকসংগ্রহণার্থায় কৃত্যকব্যসনী ভবেৎ॥
> (বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, ২।৬৫।২৭)

অরাজক রাজ্যে ভিন্ন রাজ্যের মানুষ কন্যার বিবাহ দেবে না, কেননা সেরাজ্যের মানুষের মধ্যে মমতা এবং বিত্ত দুয়েরই অভাব ঘটবে:

> অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু নৈব কন্যা প্রদীয়তে।
> বিদ্যতে মমতা নৈব তথা বিত্তেষু কস্যচিৎ॥
> (বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, ২।৬৫।৪১)

রামায়ণে (আদিকাণ্ড, ৭ম সর্গ) রাজা দশরথের আটজন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র। এঁদের মধ্যে সুমন্ত্র ছিলেন অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত। কেউ কেউ মনে করেন, অবশিষ্ট সাতজন তাঁদের নামের সঙ্গে সংগতি রেখে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন: প্রশাসন, আরক্ষা, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, উন্নয়ন, কূটনীতি, আইন ও বিচার। এঁরা ছাড়া ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব মহারাজ দশরথের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন। ঋষি সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋত্বিক হয়েও মন্ত্রিত্ব করতেন এবং এঁরা সকলেই রাজা দশরথকে রাজ্যশাসন ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। এঁদের সকলের দক্ষতা ও সহযোগিতায় রাজা দশরথ অযোধ্যার প্রজাগণকে পরম যত্নে পালন করতেন। —"স শশাস জগদ্ রাজা দিবি দেবপতির্যথা।" (রামায়ণ, ১।৭।২৩)—দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য শাসন করেন (মন্ত্রীদের সাহায্যে) রাজা দশরথও সেইভাবে তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। রাজা দশরথ কিরকম নৃপতি ছিলেন? রামায়ণে (১।৬।১) বলা হচ্ছে:

> তস্যাং পুর্য্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ।
> দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ॥

—সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদবিদ্, প্রজাসকলের কল্যাণকারী, দূরদর্শী, মহাতেজস্বী এবং পুরবাসীগণের প্রিয় রাজা দশরথ রাজত্ব করতেন।

রাজা ছিলেন সর্বগুণান্বিত। অমাত্যগণও ছিলেন রাজারই প্রতিরূপ। তাঁরা ছিলেন বিদ্বান, বিনীত, নিরহংকার, কর্মদক্ষ, জিতেন্দ্রিয়, শ্রীমান, মহানুভব, শস্ত্রনিপুণ, পরাক্রান্ত, কীর্তিমান, সদাসতর্ক, বাক্ ও কর্মে সমন্বয়কারী, তেজস্বী, ক্ষমাশীল এবং সদাসন্তুষ্ট। ক্রোধ, কাম কিংবা ধনের জন্য কখনো তাঁরা মিথ্যা

কথা বলতেন না। (১।৭।৬-৭)

ভারতীয় রাজধর্ম অনুসারে রাজাকে শুধু নিজে কুশলী ও সৎ হলেই চলবে না, তাঁর পরামর্শদাতাদেরও সমভাবে কুশলী ও সৎ হতে হবে, নতুবা রাজধর্ম যথাযথভাবে পালিত হবে না। প্রাচীন ভারতবর্ষের নৃপতিবর্গ এব্যাপারে সদা-অবহিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-পুরাণাদি তারই সাক্ষ্য দেয়।

রাজ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য রাজাকে নানারকম ব্যবস্থা নিতে হতো। অমাত্যগণ এবিষয়ে রাজাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতেন। দশরথের শাসন-বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকালে বাল্মীকি (১।৭।৯) সেকথা জানিয়েছেনঃ

তেষামবিদিতং কিঞ্চিৎ স্বেষু নাস্তি পরেষু বা।
ক্রিয়মাণং কৃতং বাপি চারেণাপি চিকীর্ষিতম্॥

—স্বপক্ষের কিংবা শত্রুপক্ষের কোন ঘটনাই দশরথের মন্ত্রিগণের অজ্ঞাত ছিল না, উভয়পক্ষেই যা করছে, বা করবে বলে স্থির করেছে সবই তাঁরা গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পারতেন। গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তার কথা মহাভারতেও পাই। শান্তিপর্বে (৮৬।১৯) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম বর্ণনাকালে সেকথা বলছেনঃ

বাহ্যমাভ্যন্তরং চৈব পৌরজানপদং তথা।
চারৈঃ সুবিদিতং কৃত্বা ততঃ কর্ম প্রযোজয়েৎ॥
চারৈঃ সুবিদিতং কৃত্বা ততঃ কর্ম প্রযোজয়েৎ॥

—রাজা গুপ্তচরের মাধ্যমে দেশের ও নগরের ভিতর ও বাইরের খবর ভাল করে জেনে প্রয়োজনীয় কার্য করবেন। রাজ্যকে সুরক্ষিত কিভাবে করা হতো? বাল্মীকি (১৬।২১) বলছেনঃ

যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিণাম্।
সম্পূর্ণ-কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব॥

অগ্নিতুল্য তেজস্বী, পরাজয়ে অসহিষ্ণু, অস্ত্রবিদ্যায় মহাপারঙ্গম বীরগণের দ্বারা সিংহপূর্ণ গুহার মতো (অযোধ্যা) নগরী দুর্ভেদ্য ছিল। ব্যাসদেবও ভীষ্মের মুখে জানিয়েছেনঃ

ভাণ্ডাগারায়ুধাগারং প্রযত্নেনাভিবর্ধয়েৎ।
নিচয়ান্ বর্ধয়েৎ সর্বাংস্তথা যন্ত্রায়ুধালয়ান্॥
(শান্তিপর্ব, ৮৬।১২)

ধনাগার ও অস্ত্রাগারসকল যত্নপূর্বক বর্ধিত করতে হবে এবং শস্যরাশি বৃদ্ধি ও কামান প্রভৃতির নির্মাণগৃহগুলিও সমৃদ্ধ করতে হবে।

পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার প্রাচীন ভারতীয় রাজধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলঃ “প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি (আদিকাণ্ড ৭।১০—দোষ প্রমাণিত হলে রাজা বা অমাত্যগণের পুত্রও দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেত না। ভীষ্ম বলেছেনঃ “পুত্রস্যাপি ন মৃষ্যেচ্চ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে।” (শান্তিপর্ব, ৯১।৩২)—যখন রাজা পুত্রের অপরাধও ক্ষমা করেন না, তখন সেই আচরণই ‘রাজধর্ম’ বলে অভিহিত হয়। উৎকোচ প্রদান ও গ্রহণ কি হতো না? নিশ্চয়ই হতো। কিন্তু তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম বলে পরিগণিত হতো। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেনঃ রাজা কখনো গুপ্তধন গ্রহণ করবেন না। করলে রাজার বিচারশক্তি লোপ পাবে। ন্যায়বিচার লোপ পেলে, সেই অধর্ম রাজা ও রাজার বিচারকগণকে পীড়ন করে (শান্তিপর্ব, ৮৫।১৩)।

ন চাপি গূঢ়ং দ্রব্যং তে গ্রাহ্যং কার্যোপঘাতকম্॥
কার্যে খলু বিপন্নে ত্বাং সোহধর্মস্তাংশ্চ পীড়য়েৎ॥

রাজকার্যের সুবিধার জন্য রাজা গ্রামপ্রতি একজন করে অধিপতি, দশটি গ্রামের জন্য একজন অধিপতি, কুড়িটি গ্রামের জন্য একজন অধিপতি, শত গ্রামের জন্য একজন, সহস্র গ্রামের জন্য একজন অধিপতি নিযুক্ত করতেনঃ

গ্রামস্যাধিপতিঃ কার্যো দশগ্রাম্যাস্তথা পরঃ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈবং সহস্রস্য চ কারয়েৎ॥
(শান্তিপর্ব, ৮৭।৩)

বর্তমানের পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থাকে মহাভারতের যুগেরই নবীকরণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

মৎস্যপুরাণে আছে যে, রাজা কখনো বিনা পরীক্ষায় কোন ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করবেন না, যেকোন স্থানে শয়ন করবেন না, কোন অজ্ঞাত জলাশয় বা পুষ্করিণীতে স্নান করবেন না। এমনকি, কোন অজ্ঞাত স্ত্রীলোকের সাথে একাসনে উপবেশন করাও তাঁর উচিত নয়। অন্য কোন রাজার রাজ্যে বিচরণ করার প্রাক্কালে রাজাকে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু বিচার করে

দেখতে হবে যে, অপর রাজ্যে যেখানে তিনি যেতে চাইছেন সেখানে খাবার গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে নিরাপদ কিনা, প্রয়োজন হলে এসকল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হতো। একমাত্র গুপ্তচরই রাজাকে সবকিছুর রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করত। বলা হচ্ছে, একজন গুপ্তচরের প্রতিও আবার রাজার অগাধ বিশ্বাস রাখা ঠিক নয়। এভাবে রাজার নিজেকে রক্ষার মাধ্যমে দেশরক্ষার কথা চিন্তা করতে হতো। তবে বর্তমানের ন্যায় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, প্রতিবেশী রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আক্রমণ, সিংহাসনের অধিকার নিয়ে গৃহবিরোধ, চক্রান্তও যে চলত তাও প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে জানা যায়।

আধুনিককালে দেশরক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক ববস্থা নেওয়া হয়। প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির অনুসরণ করা হতো কিনা সেসম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। তবে তখনো আকাশপথে যে যুদ্ধ হতো তা অনুমান করতে পারা যায়। পুরাণ-সাহিত্যে, রামায়ণ, মহাভারত, ও কালিদাসের কাব্য প্রভৃতিতে বিমানযানের ও পাশুপতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বারুণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন, এসব অস্ত্রশস্ত্রের নামকরণ ও প্রয়োগ-কাহিনী নিছক কল্পনাপ্রসূত।

মৎস্যপুরাণে ছয়প্রকার দুর্গের কথা বলা হয়েছে—ধনুদুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বার্ক্ষদুর্গ, জলদুর্গ এবং গিরিদুর্গ। মহাভারতে ভীষ্মও ছয়প্রকার দুর্গের কথা বলেছেন—ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুগ, অপদুর্গ এবং বনদুর্গ। এসকল দুর্গের মধ্যে সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে খাদ্য, পানীয়, ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার ব্যবস্থা ছিল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকও সকল সময় দুর্গমধ্য থাকতেন। সৈন্যবিভাগে ও রাজকার্যে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে যে গুণগুলি প্রাধান্য পেত তা হচ্ছে উত্তমজাতি, বীর, ক্ষমাশীল, উৎসাহী প্রভৃতি। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হতো। দূত নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হতো সেই ব্যক্তি যে অপরের ভাব দেখে সবকিছু বুঝতে পারতো। মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ৮৫।২৮) দূতের নিয়োগে সাতটি গুণের কথা লিখিত আছে:

কুলীনঃ শীলসম্পন্নো বাগ্মী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
যথোক্তবাদী স্মৃতিমান্ দূতঃ স্যাৎ সপ্তভির্গুণৈঃ॥

সৎকুলোৎপন্ন, সৎস্বভাবাপন্ন, বাক্‌পটু, কার্যনিপুণ, প্রিয়ভাষী, যথোক্তবাদী ও মেধাবী এই সাতটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দূত হবার যোগ্য।

ধৈর্যশীল, রাজভক্ত লোককেই রাজার দেহরক্ষী নিয়োগ করা হতো। বিদেশসচিব হতেন নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও বিবিধ ভাষাতে পারদর্শী ও বিদ্বান। আয় ও ব্যয় বিভাগে যেসব লোক নিযুক্ত হতো তাদের দেশের কৃষি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে হতো। রক্ষাকার্যের ভার যাদের ওপর থাকে প্রায়শই তারা দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী হয়। সেজন্য রাজাকে সেবিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত করার জন্য সর্ববিষয়ে-পরিদর্শকদের নিযুক্ত করা হতো। তাঁরা দেখতেন রাজ্যে সর্বত্র যথার্থ শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ন্যায়পরায়ণতা বজায় আছে কিনা। ভীষ্ম বলছেন:

জিঘাংসবঃ পাপকামাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
রক্ষাভ্যাধিকৃতা নাম তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥

—রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই হিংস্রস্বভাব, পাপকর্মে প্রবৃত্ত, পরধনহরণকারী এবং শঠ হয়। সর্ববিষয়-পরিদর্শকগণ এদের থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করেন।

ভীষ্ম যখন এই কথাগুলি বলেছিলেন তারপর করেক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কথাগুলি যে আজও কত সত্য তা মর্মে মর্মে সকলেই অনুভব করবেন।

প্রাচীন ভারতীয় রাজধর্মে সর্বাপেক্ষা যে বস্তুটি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো লোককল্যাণ। রাজধর্ম মূলতঃ এবং প্রধানতঃ ধর্মাশ্রয়ী হবে সেকথাও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বারম্বার উচ্চারিত। "প্রজানাং রক্ষণং কার্যং ন কার্যং ধর্মবাধকম্।" (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৮৬।২৩)—রাজার কর্তব্য হলো প্রজারক্ষা এবং ধর্মবিরোধী কোন কাজ যেন রাজা না করেন। কারণ, ধর্মের পোষণ এবং রক্ষাই হলো রাজধর্ম।

পরমপদকমলে

অংশে অংশ মিলে পূর্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর সংসার করতে বারণ করেননি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যদি হতে না পারো, তাহলে ভজন কর ; কিন্তু সংসার করবে বিদ্যারূপিণী সংসারী হও। সংসারদুর্গে বসে সস্ত্রীক সাধন-স্ত্রীর সঙ্গে। সংসার মায়া। স্ত্রীও মায়া। কিন্তু তারও প্রকারভেদ আছে। ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন ঃ "মায়া দুইপ্রকার—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। তার মধ্যে বিদ্যা-মায়া দুইপ্রকার—বিবেক এবং বৈরাগ্য। এই বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়।" ঠাকুর কেন বিবাহ করলেন ? কি প্রয়োজন ছিল তাঁর ? অবশ্যই লোকশিক্ষার জন্যে। শত সন্ন্যাসী যেমন আছেন, কোটি গৃহীও তেমনি আছেন। সংসার-নরকে কে তাঁদের পথ দেখাবেন ? ঠাকুর ছিলেন গৃহীর গুরু। অদ্বৈতগুরু তোতাপুরী সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন ঃ "স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ব্যক্তি যথার্থ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে ; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টি-সম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।"

ঠাকুর নিজে বললেন ঃ "কে বলেছে সংসারে থেকে ভগবান লাভ হয় না ? মুনি-ঋষিদের অনেকেই তো সংসারী ছিলেন, তাঁদেরও তো ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। তবে বে-থা করবার আগে মনটা ষোল আনা যখন নিজের হাতে থাকে, তখন এক চোট ভগবানের ভজন করে নিতে হয়। তাহলে পরে ততটা গোল বাঁধে না। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে যেমন হাতে আঠা লাগে না, ঠিক সেই মতো। তবে মন মুখ এক করে তাঁকে ডাকতে হয়। ভাবের ঘরে চুরি হলে কিছুই হবে না। মাথায় বোঝা নিয়েও যে ভগবানের স্মরণ মনন করে, সে তো বীর ভক্ত। সংসারে থেকে ভগবানের আরাধনা, ঠিক শবসাধনার মতো ; শবের ওপর বসে সাধন করার সময় মাঝে মাঝে তার মুখে জল-ছোলা দিতে হয়, নইলে সাধকের ঘাড় ভেঙে দেবে। পরিবারবর্গের খাবার যোগাড়টা আগে করে দিতে হয়। ঘরে চাল নেই শুনলে উপাসনার ভাব কোথায় উড়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে, অন্ততঃ কিছুদিনের মতো ভগবৎ-আরাধনা না করলে তাঁর উপর নির্ভর আসে না বা তেমন রসও পায় না।"

ঠাকুর শুধু ভক্তি বললেন না, বললেন নির্ভর। নির্ভর ভক্তিরও ঊর্ধ্বে। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়া বুকে। শ্রীমা থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসার পর কয়েকমাস সারাদিন নহবতে থেকে 'সংসারের' কাজকর্ম সেরে, রাত্রিতে তিনি ঠাকুরের ঘরে তাঁর শয্যায় শয়নের অনুমতি পেয়েছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে পরীক্ষা করলেন ঃ "কি গো, তুমি কি আমায় সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ ?" মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ "না, আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে যাব ? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" মা কেমন করে এমন কথা বলেছিলেন ! ঠাকুর জানতেন ঃ "ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী।" একদিন ঠাকুরের পদসংবাহন করতে করতে মা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমাকে তোমার কি মনে হয় ?" ঠাকুর বললেন ঃ "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।"

মা প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসছেন—এল বেহুঁশ জ্বর। পড়ে আছেন, ভূমিশয্যায় চটিতে। মা-কালী তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন ঃ "তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" সবই মা ভবতারিণীর খেলা। তিনি জানতেন রামকৃষ্ণসম্ভাবিতকে, জানতেন সারদা-সম্ভাবনাকে। তিনি জানতেন, রামকৃষ্ণ স্বল্পায়ু। যে-লীলা অবতীর্ণ হবে তাঁকে ঘিরে, তাঁর অবর্তমানে কে তা ধারণ করবে, কে প্রবাহিত

করবে সেই বিচিত্র, ঐশ্বরিক লীলাতরঙ্গ! করবেন সারদা। তিনি হবেন, মা-সারদা। মা-ভবতারিণী নিজেই তো ঠাকুরের ইষ্টপথের সহায় হতে পারতেন। তিনিই তো সব। মা-সারদার কি প্রয়োজন ছিল? ঠাকুর নিজেই বলছেনঃ "মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।" একবার এক যুবক ভক্ত ঠাকুরকে বলছেঃ "আপনাকে যারা অবতার বলে তারা ইতর।" ঠাকুর বিস্মিত। "সে কি কথা! তুমি তাদের ছোটলোক বলছ! তাদের না হয় চিনতেই ভুল হয়েছে! ভক্তির আতিশয্যে বলে ফেলেছে অবতার।" যুবকটি সক্রোধে বললেঃ "আপনি অবতার নন। আপনি স্বয়ং সাক্ষাৎ শিব।" সচল শিব ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সচল কালী মা সারদা।

ঠাকুর এসেছিলেন আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাতে। তিনি দেখলেন—দারপরিগ্রহ ভগবানলাভের অন্তরায় হয় না। সনাতন মতের আশ্রমমর্যাদা রক্ষায় ভার্যাগ্রহণের বিধান আছে। তিনি নিজেই বলছেনঃ "দশবিধ সংস্কারসম্পন্ন না হলে মনোবৃত্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, আর পূর্ণতা লাভ না করলে প্রকৃষ্টরূপে ধর্মপ্রবর্তক ও আচার্য হওয়া যায় না।" ঠাকুরের বিবাহ সাধারণ মানুষের বিবাহ-বিভ্রাট নয়। এ যেন জগতের মাতা-পিতা গৌরী-শঙ্করের মিলন। তিনি স্ত্রীকে শ্রীভগবতীর মূর্তিবিগ্রহ জ্ঞানে ভক্তি-পূজা করতেন। বলতেনঃ সারদা মহাশক্তি-স্বরূপিণী, বাগ্‌দেবী সরস্বতী। রূপদর্শনে মোহিত হয়ে হীনচেতা মানুষ পাছে অপরাধগ্রস্ত হয় তাই এবার বাহ্যরূপ লুকিয়ে অন্তরে দিব্যরূপের সজ্জা করে এসেছেন। নিত্যসম্বন্ধবশতঃ আমার শরীরপালনে যুগেযুগে তাঁর আগমন। তিনি আমার চেয়েও বড়, তিনিই আমার শক্তি।

আমার ভাবরাজ্যের অবতার ঠাকুর বড় ব্যবহারিক ছিলেন। ধর্মজগতের সমস্ত সিদ্ধান্তকে তিনি ফলিত করতে চাইতেন জীবনচর্যায়। তিনি মায়ার নতুন নামকরণ দিলেন—কামকাঞ্চন।

ঠাকুর কাঞ্চন-বিজয় করলেন এই ভাবে—এক হাতে টাকা, অপর হাতে মাটি। গঙ্গার ধারে বসে বিচার—টাকাতে কি হয়? ঘর, বাড়ি, মান, ঐশ্বর্য হয়। মাটিতেও ঠিক তাই হয়। ভগবানলাভ তো হয় না। টাকা আর মাটি তাহলে একই বস্তু। কাকবিষ্ঠা। টাকা আর মাটি দুটোই জলে যাও। গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হলো টাকা আর মাটি।

এইবার কাম-বিজয়। সেই রাতের সেই দিব্য-ঘটনা। সারদা ঠাকুরের পাশে একই শয্যায় নিদ্রিতা। 'ধর্মবিজ্ঞানী, অতিসাহসী গবেষক রামকৃষ্ণ' নিজের মনকে বসালেন বিচারে—

> "মন ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়; সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল, তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।"

ঠাকুর যেই হাত বাড়াতে গেলেন, অমনি গভীর সমাধি। ঠাকুর বলেছেনঃ "ও যদি এত ভাল না হতো, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে! বিবাহের পর মাকে ব্যাকুল হয়ে ধরেছিলাম, মা আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব এককালে দূর করে দে। মা সে-কথা সত্যসত্যই শুনেছিলেন।"

ফলহারিণী-কালীপূজোর সেই রাত। ঠাকুরের সেই ঘর। আলিম্পনভূষিত দেবীর পীঠে শ্রীসারদা অর্ধবাহ্যদশায় সমাসীনা। কলসের মন্ত্রপূত বারি, বারেবারে সিঞ্চিত হলো তাঁর অঙ্গে। তাঁকে অভিষিক্ত করে, মন্ত্র শ্রবণ করিয়ে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ঠাকুর—

> "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

শ্রীমা-ই ঠাকুরের প্রথম ও প্রধান শিষ্যা, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধিতা। দুজনেই সমান। অংশে অংশ মিলে পূর্ণ।

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

মাসরুম চাষের সহজ পদ্ধতি

প্রশান্তকুমার পণ্ডিত

মাসরুম (Mushroom) হলো একধরনের খাদ্যোপযোগী ছত্রাক এবং খেতে খুব সুস্বাদু হওয়ার জন্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মাসরুমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে আসছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাসরুমের চাষ করা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পশ্চিমী দেশগুলির হোটেল এবং রেস্টুরেন্টগুলিতে মাসরুম এখন জনপ্রিয় খাদ্যের মধ্যে পড়ে। ভারতবর্ষের মতো নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা মতাবলম্বী অধিক জনবসতিযুক্ত দেশে মাসরুম চাষ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মাসরুমকে সবধর্মের মানুষ এবং আমিষাশী ও নিরামিষাশী সবাই ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও ক্রমাগত শিল্পাঞ্চল ও জনবসতি বৃদ্ধি হওয়ার জন্যে সামগ্রিকভাবে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমে আসছে। মাসরুম এমনই এক জিনিস যা খুব অল্প পরিমাণ জায়গায় বহুল পরিমাণে হতে পারে। ফ্রান্সে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাসরুম চাষ শুরু হয়; তারপর তা ব্রিটেন, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড, আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, হল্যান্ড, জাপান, চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

মাসরুমের নানাপ্রকার প্রজাতি আছে। সব মাসরুম সব জায়গায় জন্মে না। কিছু কিছু মাসরুম আছে শীতপ্রধান দেশে জন্মায়, যেমন অ্যাগারিকাস (Agaricus) প্রজাতি। প্লিউরোটাস (Pleurotus) নামে প্রজাতিটি আধা শীত আধা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে জন্মায়। আর ভলভ্যারিয়েল্লা (Volvariella) প্রজাতিটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চাষ করার সুবিধে। ভারতবর্ষে ভলভ্যারিয়েল্লা প্রজাতির চাষই সুবিধাজনক। ভলভ্যারিয়েল্লার যেসব প্রজাতিগুলি খাওয়া হয় সেগুলি হলো ডাইপ্লেসিয়া (Diplacea), ভলভ্যাসিয়া (Volvacia) এবং এসকিউলেন্টা (Esculenta)। আরও মাসরুম প্রজাতি ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য দেশে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় ও চাষ করা হয়। যেমন: অরিকিউলেরিয়া (Auricularia), লেন্টাইনাস (Lentinus), ট্রেমেল্লা (Tremella), ট্রাইকোলোমা (Tricholoma), কপ্রাইনাস (Coprinus), মরচেল্লা (Morchella) ইত্যাদি। স্বাদ ও সুগন্ধের দিক থেকে মরচেল্লার কদর বেশি।

বিভিন্নপ্রকার মাসরুমের চাষ-পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারের হয়। তারমধ্যে কিভাবে সহজে ভলভ্যারিয়েল্লা প্রজাতির—ভারতবর্ষে যেটির চাষ সুবিধাজনক, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

ভলভ্যারিয়েল্লা এমনিতেই বর্ষাকালে পচা খড়ের ওপর জন্মায়। খড়ের ওপর ছাড়াও বর্তমানে তুলোর বর্জ্য-পদার্থের ওপরও ভলভ্যারিয়েল্লাকে চাষ করা হচ্ছে, যেহেতু ভারতবর্ষে প্রচুর কাপড়-কল আছে এবং তুলোর বর্জ্য-পদার্থ সহজলভ্য; তবে খড় ভারতবর্ষের সবজায়গায় সহজলভ্য, তাই খড়ের ওপর চাষ করা গন্ডগ্রামেও সম্ভব। সাধারণতঃ মার্চ থেকে অক্টোবর মাস ঐ মাসরুম চাষ করার উপযুক্ত সময়। বিজ্ঞানসম্মত চাষঘরে অবশ্য সব মাসরুমই সবসময় চাষ করা যায় তাপমাত্রা বাড়িয়ে বা কমিয়ে। কিন্তু তা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তাতে বহু খরচ। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন চাষকেন্দ্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এটি চাষ করা হয়। সাধারণতঃ ভলভ্যারিয়েল্লা চাষের জন্য ৫০%-৬০% আদ্রর্তা ও ৩২°-৩৮°C উষ্ণতার প্রয়োজন হয়।

মাসরুম চাষ করতে গেলে প্রথমেই দরকার হয় মাসরুমের বীজের—যা স্পন (spawn) নামে পরিচিত। স্পন সাধারণতঃ দুভাবে তৈরি করা যায়, খড়ের ওপর ও বিভিন্ন শস্যদানার ওপর। তারমধ্যে প্রথমোক্তটির সুবিধে বেশি। প্রথমে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যযুক্ত অংশে খড় কেটে নিতে হবে। কাটার আগে খড় ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে

নেওয়া দরকার। তারপর ঐ খড় ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে যাতে খড় পুরোপুরি জল শোষণ করতে পারে। এজন্য দু-তিনবার জলের পরিবর্তন করা দরকার। তারপর ছোলার বা অড়হরের বেসন ঐ খড়ের উপর ভাল করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই বেসনের পরিমাণ হবে ভিজে খড়ের পুরো ওজনের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ। তারপর ঐ মিশ্রিত পদার্থকে বড় মুখওয়ালা বোতলে (তিনভাগের দুভাগ অংশ) ঢুকিয়ে দিয়ে বোতলের মুখ তুলো দিয়ে ভাল করে বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ঐ বোতলকে অটোক্লেভ নামে একটি যন্ত্রে জীবাণুমুক্ত করতে হবে ২০ পাউন্ড চাপে ১ ঘণ্টা রেখে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় স্টেরিলাইজেশন (sterilization), স্টেরিলাইজ করা বোতলগুলিতে এবার বিশুদ্ধ ভলভ্যারিয়েল্লার মাইসেলিয়াম (একরকম সুতোর মতো অংশ যা দিয়ে ছত্রাকের শরীর তৈরি) স্থানান্তরিত করতে হবে জীবাণুমুক্ত ঘরে বুনসেন বার্নারের আগুনের সামনে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইনোকুলেশন (inoculation)। এইজন্যে সাধারণতঃ একটা কালচার রুমের (culture room) দরকার হয়, যার দুটো দরজা থাকবে, জামা জুতো খুলে সেখানে ঢুকতে হবে। কাজ করার আগে আলট্রা-ভায়োলেট (U. V.) আলো দিয়ে ঘরটি জীবাণুমুক্ত করে তারপর আগুনের সামনে ইনোকুলেশন করতে হবে। তা নাহলে বাতাসে ভাসমান অন্যান্য জীবাণু স্পনের বোতলে জন্মাবে। এবার ইনোকুলেশনযুক্ত বোতলগুলিকে ভলভ্যারিয়েল্লার ঠিক মতো বৃদ্ধির জন্য ৩৫° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ১০ থেকে ১২ দিন রেখে দেওয়া দরকার।

মাসরুম চাষের জন্যে দশ ফুট লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া ছোট ছোট কুঁড়েঘরের দরকার হয়। ঘরের দেওয়াল বাঁশের তৈরি হবে তার ওপর পাতলা করে খড়-মাটির আস্তরণ থাকবে। ঘরের ছাউনি খড়ের হলেই ভাল হয়, কারণ অ্যাজবেস্টস বা টিন হলে তাপ বেশি হবে। প্রতি ঘরে চারটি করে সারি থাকবে। সারির মাঝে মাসরুম তোলার (harvest) জন্য ছোট রাস্তা থাকবে। ঘরের মেঝেতে মাটির মধ্যে ইঁট বসানো থাকবে। খোলা ছায়াযুক্ত জায়গাতেও ভলভ্যারিয়েল্লার চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু অধিক বৃষ্টি, ঝড় ও তাপমাত্রার হাত থেকে মাসরুমকে রক্ষা করা দরকার।

এবারে কিভাবে মাসরুম-চাষের জন্য বেড তৈরি করতে হবে সে আলোচনায় আসা যাক। তিন-চার ফুট লম্বা খড়ের আঁটিকে প্রথমে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জলে ভেজাতে হবে তারপর অতিরিক্ত জল খড় থেকে ফেলে দিতে হবে। কয়েকটি ভিজে খড়ের মাথা একদিকে রেখে ঠিক সমসংখ্যক আঁটির মাথা তার উল্টোদিকে রাখতে হবে। অন্য দুটি দিকও ঐভাবেই হবে। এভাবে কয়েকটি স্তরে স্তরে খড়ের আঁটি সাজিয়ে এক একটি ছোট ছোট বেড তৈরি করা হয়। সবচেয়ে ওপরের খড়ের স্তরটি আস্তরণ হিসেবে কাজ করে।

এর পরের কাজ হলো বেডের ওপর স্পন লাগানো। স্পন লাগানোর আগে খড়ের বেডের ওপর ছোলার বা অড়হরের বেসন কিছু ছড়িয়ে দিতে হয় দশ থেকে পনেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে দূরত্বে। খড়ের মধ্যে জন্মানো কিছু পরিমাণ স্পন এবার বেসনের ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। এগুলি কিন্তু খড়ের এক একটি স্তরের উপর দিতে হবে। সবচেয়ে উপরের স্তরটিতে অনিয়মিতভাবে স্পন ছড়িয়ে দিলেই হবে। এরপর বেডকে একটু চাপ দেওয়া দরকার ভিতরকার ফাঁকা বায়ুস্তর কমিয়ে দেবার জন্য। ফাঁকা জায়গায় বেড তৈরি করলে স্পন লাগাবার পর ওপরের স্তর পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার—বৃষ্টি, তাপমাত্রা ও ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ভিতরকার তাপমাত্রা বাড়াবার জন্য। ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পলিথিনের চাদর সরিয়ে নিতে হবে। এক একটি বেডের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা হবে যথাক্রমে ২ ফুট× ২ ফুট× ২ফুট।

এর পরের কাজ হলো বেডে জল দেওয়া। স্পন বোনার পরই বেডে জল দেওয়া দরকার বেডকে সব সময় ভিজে রাখার জন্য। সাধারণতঃ সকালে একবার জল প্রয়োগই যথেষ্ট কিন্তু যখন তাপমাত্রা বেশি হয় তখন সকাল ও সন্ধ্যে দুবার জল দেবার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় বেডের ওপরের অংশে ঘন ঘন

জল ছিটানোর প্রয়োজন হয় বেডের ভিতরকার আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য।

ভলভ্যারিয়েল্লা দেখতে ছাতার মতো হয়। সাধারণতঃ স্পন বোনার সাত থেকে নয় দিন বাদে অজস্র গুচ্ছাকারে বেডের চারপাশ থেকে মাসরুম বেরিয়ে আসে। প্রথমেই তা খোলা ছাতার মতো হয় না। প্রাথমিক অবস্থাকে 'বাটন' (Button) বলা হয়। পনেরো থেকে কুড়ি দিন পর্যন্ত মাসরুম জন্মায় দু থেকে চার দফায়।

সধারণতঃ সকালের দিকে মাসরুম বেড থেকে তোলা হয়, মাসরুমকে হাতের সাহায্যে অল্প নাড়িয়ে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণতঃ দু থেকে চার দিন অন্তর অন্তর মাসরুম তোলা হয় মাসরুমের বৃদ্ধি অনুযায়ী। বাটন অবস্থায় মাসরুম সংগ্রহ করা দরকার এবং ভাল করে পরিষ্কার করে ধোয়া দরকার। শুকিয়ে বিক্রি করার জন্যে মাসরুম তোলার পর শতকরা দুইভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে তিন থেকে চার ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে তারপর শুকিয়ে বায়ুনিরোধক পাত্রে রাখতে হয়। সাধারণতঃ প্রতিটি বেড থেকে চার থেকে সাত কেজিঃ মাসরুম উৎপন্ন হয় ঋতু ও তাপমাত্রা অনুযায়ী।

এছাড়াও আরেকটি সহজ পদ্ধতিতে মাসরুমের চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্পন তৈরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা একই, শুধু বেডের বদলে ছিদ্রকরা পলিথিন ব্যাগ বা নাইলন দড়ির ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। খড়কে ছোট ছোট করে কেটে জলে ডুবিয়ে রেখে কিছু ছোলা বা অড়হরের বেসন মিশিয়ে ব্যাগে ভরতে হয়। তারপর ঐ ব্যাগের মধ্যে স্পন বোনা হয়। ব্যাগকে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। নিয়মিত প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিতে হয়। কিছুদিন বাদে দড়ির বা পলিথিন ব্যাগের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মাসরুম বেরিয়ে আসে। স্পন পাওয়া গেলে বাড়িতে সহজেই এ পদ্ধতিতে মাসরুম চাষ করা সম্ভব।

উইপোকা, পিঁপড়ে, শামুক প্রভৃতি মাসরুমের ফলন কমিয়ে দেয়। এছাড়া ব্যাকটেরিয়া-জনিত কিছু রোগও মাসরুমের শত্রু। এই রোগ বাটন অবস্থায় মাসরুমকে পচিয়ে দেয়। এ-সমস্ত পোকা-মাকড় ও রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বেডে মেলাথায়োন (০·০২৫%) কীটনাশক, টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিক (০·০২৫%)-এর সেপটান (২%) ব্যবহার করতে হয়।

বাইরের দেশগুলিতে মাসরুমের এখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা হচ্ছে ও রীতিমতো শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষে মাসরুমের চাহিদা বাড়লেও চাহিদা অনুযায়ী শিল্প গড়ে-ওঠেনি। যত উন্নতমানের মাসরুম প্রজাতি বা ভ্যারাইটি ব্যবহার করা হবে তত ফলনও বেশি হয়। আমাদের দেশে খরচ অনুযায়ী ফলন কম হওয়ার জন্যে রপ্তানির বাজারে অসুবিধা হয়।

ভারতে ভলভ্যারিয়েল্লা ছাড়া প্লিউরোটাস প্রজাতিও চাষ করা হয়। হিমাচল প্রদেশের শোলানে একটি বড় মাসরুম চাষের কেন্দ্র আছে। মাসরুম চাষের সবথেকে সমস্যা হলো স্পন তৈরি করা। যদি কোন সরকারি গবেষণাগার থেকে স্পন সহজে কৃষকদের দেওয়া যায় তাহলেও মাসরুম চাষের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হবে। বর্তমানে তুলোর বর্জ্য-পদার্থের ওপর এবং পাটের বর্জ্য-পদার্থের ওপর মাসরুম চাষ করার চেষ্টা চলছে। কারণ এই দুটিই ভারতবর্ষে সহজলভ্য।

◆

দিব্য মাতৃস্নেহের এক অনুপম আলেখ্য

সচ্চিদানন্দ ধর

শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের ছেলেরা : তারকনাথ ঘোষ। শতরূপা ৭বি, যামিনী কবিরাজ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৪। পনেরো টাকা।

যুগপ্রয়োজনে কালোপযোগী আধ্যাত্মিক ভাব নিজ জীবনে রূপায়িত করে বর্তমান বিশ্বমানবকে শাশ্বত শান্তি এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে গেছেন। এই সর্বতোভদ্র, কল্যাণ-শ্রীমণ্ডিত আধ্যাত্মিক ভাবটিই বিস্তারিত হয়েছে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের জীবনচর্যায়, বিশেষতঃ তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার পর শ্রীমা সারদাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি এবং প্রতিমূর্তি হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে তাঁর সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদের জীবনে বিকশিত করে তোলেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী সন্তানগণের কেউ কেউ শ্রীমার স্নেহ-সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি', 'জ্ঞানদাত্রী' সারদার সঙ্গে তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের যে দিব্য-ভাবাশ্রিত মাতৃভাব ও গুরুভাবের সম্পর্ক ছিল তা-ই প্রতিটি জীবন পর্যালোচনা করে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদা যৌথভাবেই তাঁদের সন্ন্যাসী সন্তানদের দিব্য-ভাবাশ্রিত মানবীয় জীবনকে লোককল্যাণে আদর্শরূপে গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের প্রত্যেকেরই এক-একটি দিকে বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ভাবই সমন্বয়মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণভাবের পরিপূরক। গ্রন্থকার অন্যান্য আকরগ্রন্থ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানদের দিব্যভাবাশ্রিত জীবনের চিত্ররূপটি আমাদের সম্মুখে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে স্বল্প পরিসরে গ্রন্থটিতে 'দিব্য' জননীর সঙ্গে স্নেহাশ্রিত সন্তানদের বিচিত্র সম্পর্কের রমণীয় আলেখ্যটি পরিস্ফুট হয়েছে।

আকরগ্রন্থানুসারী এই গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব এবং সন্ন্যাসী সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধিতে খুবই সহায়ক হবে। সাধারণ কয়টি ছাপার ভুল উপেক্ষা করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

স্বামী অভেদানন্দজীর জীবন ও বাণী

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতি-চয়ন : শ্রীনারায়ণচন্দ্র গুহরায় সম্পাদিত। অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী আশ্রম, পোঃ সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। মূল্যের উল্লেখ নেই।

স্বামী অভেদানন্দ রামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট শিষ্য। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি যেসব প্রসঙ্গ করেছিলেন তার কয়েকটি স্বামী নিত্যাত্মানন্দ নিজের দিনপঞ্জীতে লিখে রেখেছিলেন। তার থেকে সাতটি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'রাজযোগ-আত্মসংযম' এগুলির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মন্তব্য করেছিলেন : "আত্মসম্মানবিহীন জাতির এই অবস্থা হয়। এখন দেশে character (চরিত্র) নাই। এ তৈরি কর, দেখবে নিমেষে সব হয়ে যাবে।" দুঃখের বিষয়, এ-উক্তির পরে ছেষট্টি বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু আমাদের চরিত্র এখন পর্যন্ত গঠিত হয়নি।

গ্রন্থের প্রথম 'স্মৃতিচয়ন' অংশে যাঁদের পূর্বপ্রকাশিত মূল্যবান স্মৃতিকথা থেকে সংকলন করা হয়েছে তাঁরা হলেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সতীশচন্দ্র নাথ, তামসরঞ্জন রায়, যশোদাকান্ত রায়, শিশিরকুমার আচার্য এবং দেবীপ্রসাদ সেন।

সযত্ন সম্পাদনার জন্য সম্পাদক ধন্যবাদার্হ। বইটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৭-১০ অক্টোবর **বেলুড় মঠে** শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজার প্রতিদিন এবং মহাষ্টমীর দিন কুমারীপূজা দর্শনের জন্য প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। প্রতিদিন ভক্তদের হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ২০ হাজার ভক্তনরনারী প্রসাদ পান। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে:

আগরতলা, আঁটপুর, আসানসোল, বরিশাল (বাংলাদেশ), বারাসাত, বম্বাই, কাঁথি, ঢাকা (বাংলাদেশ), গুয়াহাটি, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ), পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জী), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট (বাংলাদেশ) এবং বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর **সালেম আশ্রম (তামিলনাড়ু)** মহিলা যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। প্রায় ৩০০ জন ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ঐ দিন ২৮ জন দুস্থ ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়া হয়।

ভুবনেশ্বর আশ্রম উড়িষ্যার বারিপদায় গত ১৫-১৯ অক্টোবর চারদিন ব্যাপী এক যুবসম্মেলন ও জাতীয় সংহতি শিবিরের আয়োজন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২৩০ জন যুবপ্রতিনিধি এই শিবিরে যোগদান করেছিল। শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উড়িষ্যার বিধানসভার অধ্যক্ষ পি. কে. দাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাজ মঠ গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত মাদ্রাজ মিশন আশ্রম পরিচালিত সারদা বিদ্যালয়ের মাঠে 'কালচারাল বুক ফেয়ার নামে' এক পুস্তক-মেলার আয়োজন করেছিল। মেলার উদ্বোধন করেন তামিলনাড়ুর শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক কে. আনবাঝাগন। মোট ৫২টি প্রকাশন সংস্থা ঐ মেলায় যোগদান করেছিল। মাদ্রাজ মঠের উদ্যোগে এই প্রথম পুস্তক-মেলা অনুষ্ঠিত হলো।

উদ্বোধন

গত ২৯ সেপ্টেম্বর **মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের** নবনির্মিত অতিথিভবনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী।

পরিদর্শন

ত্রিপুরার রাজ্যপাল সুলতান সিং, মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার এবং রাজস্বমন্ত্রী বিভু দেবী দুর্গাপূজার সময় **আগরতলা আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

গত ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের বাণিজ্যদপ্তরের তদানীন্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী **ঢাকা কেন্দ্র** পরিদর্শন করেন।

বহির্ভারত

টরেন্টো বেদান্ত সোসাইটি (কানাডা): গত অক্টোবর মাসের ১, ১৫, ২২ এবং ২৯ তারিখ (প্রত্যেকটিই রবিবার) যথাক্রমে ঈশ্বরের মাতৃরূপ, গীতা, জীবন্মুক্তি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ৭ ও ৮ অক্টোবর দুর্গাপূজা এবং ২৮ অক্টোবর কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ অক্টোবর টরেন্টো রিচভিউ কলেজিয়েট ইনস্টিটিউটে বেদান্ত সোসাইটির তহবিল গঠনের জন্য স্থানীয় ভক্তদের পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভারতনাট্যম, বীণা ও বাঁশী বাদন এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া): অক্টোবর মাসের বুধবার ও রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ১০ অক্টোবর সন্ধ্যা ৮টায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি: অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি শুক্রবার অপরোক্ষানুভূতি এবং প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি: গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে শনিবার ও রবিবারগুলিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাছাড়া ৪ ও ২৫ অক্টোবর এবং ৮ ও ২২ নভেম্বর কেন উপনিষদের উপর বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং ১৫ ও ২৯ নভেম্বর রাজযোগের ওপর বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। ৭ অক্টোবর ভক্তিগীতি, স্তোত্রাদি পাঠের মাধ্যমে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ নভেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত হয় জগদ্ধাত্রী পূজা।

ত্রাণ

গুজরাট বন্যাত্রাণ: রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে পঞ্চমহল জেলার গোধার তালকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২১০টি পরিবারের মধ্যে ৪২০০ কিলোঃ বাজরা, ৬০২ কিলোঃ মুগডাল, ২০২টি ধুতি ২০৮টি শাড়ি, ২২০টি চাদর, ৪৭৮ মিটার কাপড়, ৪৪০টি স্টীলের বাসন, ২০০টি বই বিতরণ করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র বন্যা ও ঝঞ্ঝাত্রাণ: বোম্বাই আশ্রমের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার আলীবাগ তালুকে ঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চারটি গ্রামের ১৬৩টি পরিবারের মধ্যে পুনরায় ১৬৩টি কম্বল, ১৬৩টি প্লাস্টিক সীট দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই জেলার সুধাগড় তালুকের ৮টি বিদ্যালয়ের ১০৩৯ জন ছাত্রছাত্রীকে ৭২৭২টি বই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণ

শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ (ভরত মহারাজ) গত ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৯ শনিবার (বাঙলা ১ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬ শুক্রবার) রাত ১২-০৭ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছর। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন উপসর্গ বৃদ্ধি পেলে গত ২ জুন (১৯৮৯) তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া তাঁর জীবনে এই প্রথম। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত এই কয়মাস তিনি সেখানেই ছিলেন।

স্বামী অভয়ানন্দ, যিনি 'ভরত মহারাজ' নামে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত, ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মাজখারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল অতুলচন্দ্র গুহ। ছাত্রজীবনে ঢাকার ন্যাশন্যাল এইচ. ই. স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি স্বদেশী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে বিশিষ্ট বিপ্লবী পুলিন দাসের নেতৃত্বাধীন অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। ফলে তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি যে-পথে চলছেন তা তাঁকে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা দিতে পারবে না। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণায় এক বন্ধুর সঙ্গে বেলুড় মঠে আসেন। সেখানে তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ প্রমুখের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য ও স্নেহছায়ায় আসার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁর জীবনপথের সন্ধান পান। শ্রীরামকৃষ্ণের বারজন ত্যাগী পার্ষদের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মার্চে অতুল সংসার-আশ্রম ত্যাগ করে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ তাঁর নতুন নামকরণ, করেছিলেন 'ভরত' এবং এই নামেই তিনি সমধিক

পরিচিতি লাভ করেন। ১৯১১ (১৯১২?) খ্রীস্টাব্দে তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নিকট দীক্ষালাভ করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিদিবসে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ভুবনেশ্বরে তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দান করেন।

ভরত মহারাজের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় বেলুড় মঠেই অতিবাহিত হয়েছে। সংঘে যোগদানের প্রথম দিকে বছর চারেক বেলুড় মঠে কাটানোর পর তিনি মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে প্রথমে কর্মী এবং পরে তত্ত্বাবধায়ক (Manager) নিযুক্ত হন। প্রায় সতের বছর মায়াবতীতে কাটিয়ে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বেলুড় মঠে ফিরে আসেন এবং মঠের সংযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের (Joint Manager) দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠের তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের সদস্য (ট্রাস্টী) এবং রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভরত মহারাজের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ইন্দিরা-জননী কমলা নেহরু শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আশ্রিতা ছিলেন। তিনি গুরুদর্শনে যখনই মঠে আসতেন তখন ইন্দিরাও তাঁর সঙ্গে আসতেন। সেসময় ভরত মহারাজই তাঁদের দেখাশুনা করতেন। তখন থেকেই ভরত মহারাজের সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ট স্নেহসম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও ভরত মহারাজের সঙ্গে তাঁর গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্কটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ভরত মহারাজ শ্রীমতী গান্ধীর কাছে ছিলেন পিতৃপ্রতিম বা ততোধিক শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর দুবার তাঁকে সাময়িকভাবে সংঘাধ্যক্ষের কাজ চালাতে হয়েছিল—প্রথমবার ১৯৮৫-র ১৩ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল এবং দ্বিতীয়বার ১৯৮৮-র ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৯-র ২৩ জানুয়ারি।

ভরত মহারাজ ছিলেন অদ্ভুত এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাঁদের সকলের হৃদয়েই সেই ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বহির্ভারত থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তিনি সহজেই তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারতেন। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মতবাদ ও ভাষা কোন ব্যবধান হয়ে উঠত না। সরকারি উচ্চপদাধিকারী, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবী থেকে আরম্ভ করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ভরত মহারাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও গভীর সহমর্মিতার জন্য অসংখ্য ভক্ত নরনারীর কাছে তিনি ছিলেন এক নির্ভয় আশ্রয়স্বরূপ।

স্বামী অভয়ানন্দ দীর্ঘ আশি বছর ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘকে বহুভাবে নিরলস ও অকৃপণ সেবা করে গিয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে রামকৃষ্ণ সংঘ শুধুমাত্র তার প্রবীণতম সদস্যকেই হারায়নি, হারিয়েছে সংঘের আদি যুগের প্রাচীনতম জীবিত প্রতিভূকেও।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদঃ গত ১০ ও ১২ নভেম্বর যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাঃ প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর ধর্মালোচনা যথারীতি চলছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২২ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিরোজিও হলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। প্রথম দিনে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং প্রধান অতিথি স্বামী অমলানন্দ। তাঁরা মাধবানন্দজীর স্মৃতিচারণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিশিষ্ট দুজন প্রাক্তন ছাত্র, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায় এবং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র মাধবানন্দজীর ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। স্বামী মাধবানন্দজীও এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নেন স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী মেধসানন্দ, ডঃ হোসেনুর রহমান এবং ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। এই দিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজীও অল্পসময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল স্বামী মাধবানন্দের রেকর্ড করা বক্তৃতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'স্বামী মাধবানন্দ এবং সমকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজ' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ গত ২৩ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এই শহরের প্রতিটি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক মোট ৪০জন ছাত্র-ছাত্রীকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সাহিত্য থেকে নির্বাচিত বই উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী দিব্যানন্দ। সভায় বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আশ্রমের তরফ থেকে মুষ্টিভিক্ষায় চাল সংগ্রহ করে দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সাপ্তাহিক বণ্টনের কাজ অনেক দিন থেকেই চলছে। ঐদিন অন্য একটি সভায় এই কার্যসূচীরও মূল্যায়ন করা হয়। ঐদিন বালক-বালিকাদের যোগব্যায়াম প্রদর্শনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ২ অক্টোবর এই আশ্রমের তরফ থেকে সত্তর জন অনাথ প্রতিবন্ধী বালক-বালিকাকে নতুন জামা-কাপড় দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে বিকালে এক ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে সেবাধর্ম নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী অনাময়ানন্দ, স্বামী মঙ্গলানন্দ এবং স্বামী হীরানন্দ।

গত ২১ ও ২২ অক্টোবর **সান্ডেলের বিল বিবেকানন্দ পাঠচক্রের** ব্যবস্থাপনায় ও **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার**-এর সহযোগিতায় কনকনগর সৃষ্টিধর ইনস্টিটিউশনে এক শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ'। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী সুপ্রভানন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী স্মরণানন্দ এবং স্বামী সর্বদেবানন্দ। সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্মেলনে যোগদান করেন।

চকগোপাল বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মেদিনীপুর)-এর উদ্যোগে গত ২৮ সেপ্টেম্বর নৈপুর শান্তিসুধা ইনস্টিটিউশনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন উক্ত ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক অজিতকুমার ভুঞ্যা। এই শিবিরে দুজন মহিলাসহ মোট ৭৫জন রক্তদান করেন।

দিনহাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (কুচবিহার) গত ৬ অক্টোবর দুস্থ ব্যাক্তদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ করে। অনুষ্ঠানে বস্ত্রবিতরণ করেন দিনহাটা মহকুমা শাসক। সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বামনমুড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সঙ্গে একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে একটি চক্ষুচিকিৎসা-বিভাগ সংযুক্ত করা হয়। গত ২৩ অক্টোবর এই বিভাগের উদ্বোধন করেন পুরী রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নিগমাত্মানন্দ।

রামপাড়া (হুগলী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘের উদ্যোগে গত ২২ অক্টোবর অপরাহ্নে শ্রীকানাইলাল দে-র বহির্বাটীতে শ্রীশ্রীকালীমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সভায় ৩০০ জনের মতো ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজজীর মন্ত্রশিষ্যা **রানী দে** গত ৩১ অক্টোবর ১৯৮৯ মঙ্গলবার রাত্রি ১১টা ২০ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। শৈশবে নিয়মিত রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াতের মাধ্যমে মঠ-মিশনের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজীর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। রেঙ্গুনে থাকাকালীন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের স্নেহাশীর্বাদও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বামী ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন-এর অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদাধিকারী শ্রীহিমাংশুভূষণ দে-ও শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। বিবাহের পর থেকে নিয়মিত বেলুড় মঠে যাওয়া, মঠের সাধু-মহারাজদের দর্শন ও সেবা করা, যথাসাধ্য দানধ্যান ও রোগীদের সেবা করা তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতি বুধবার তিনি যাদবপুরস্থ নিজ বাড়িতে কথামৃত পাঠচক্রের আয়োজন করতেন। নানা অসুবিধার জন্য তিনি ছোটবেলায় ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারেননি। কিন্তু তিন সন্তানের জননী হয়েও এবং সাংসারিক দায়দায়িত্ব যথাযথপালন করেও দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের বলে প্রাইভেটে প্রথমে ম্যাট্রিক ও আই. এ. এবং পরে বি.এ. পাশ করেন। সদা হাস্যময়ী, সেবাপরায়ণা এবং রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবাশ্রিতা এই নারীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল চৌষট্টি বছর।

বহির্ভারত

রামকৃষ্ণ সেণ্টার অফ সাউথ আফ্রিকা (২৭।২৯ আবেলিয়া রোড, আশার ভিলে) তাদের বয়স্কদের জন্য প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা (ইংরেজী) 'জ্যোতি'র ১৪শ সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ১৯৮৯) এবং শিশুদের জন্য প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা (ইংরেজী) 'দীপিকা'র ১৪শ সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ১৯৮৯) প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৯ জুলাই ১৯৮৯ বিকেলে সেণ্টারের শ্রীসারদাদেবী আশ্রমে একটি স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন মিঃ জগদীশন আর. দীবর। বক্তৃতার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি
আগামী ১২ জানুয়ারি ১৯৯০ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে
এক যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
স্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ হল **সময় ঃ বেলা তিনটা**
আলোচ্য বিষয় ঃ **স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও যুবসমাজ**
সভাপতি ঃ অধ্যাপক **নিমাইসাধন বসু**
প্রধান অতিথি ঃ অধ্যাপক **শঙ্করীপ্রসাদ বসু**
বিশেষ অতিথি ঃ অধ্যাপক **হোসেনুর রহমান**
এবং
আগামী ৩০ জানুয়ারি ১৯৯০ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত
কলকাতা ময়দানে আয়োজিত **কলকাতা পুস্তক মেলায়**
অন্যান্য বারের মতো এবারেও উদ্বোধন কার্যালয় অংশগ্রহণ করবে।

অধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

বিজ্ঞান সংবাদ

চোখে ছানি পড়ে কেন

চোখে ছানি (ক্যাটার‍্যাক্ট—Cataract) পড়ে কেন—প্রশ্নটি যতটা সোজা, উত্তর তত সোজা নয়। রোগটি নতুন নয়, এই ধরনের রোগী প্রায় প্রতি ঘরেই পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে ছানি পড়ার দরুন অন্ধ হয়ে আছে, এরকম লোকের সংখ্যা এক কোটি ৭০ লক্ষ। অস্ত্রোপচার করে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু দরিদ্র দেশে এত রোগীকে অপারেশন করার ব্যবস্থা কোথায়? ১৯৭৫-১৯৮৫, এই দশকে ইংলণ্ড ও ওয়েলস্-এ ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশনের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৬-১৯৭৬, এই দশকে আমেরিকায় এই অপারেশন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭৭ শতাংশ; ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় ১০ লক্ষ লোকের ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশন হয়েছে। সকলেই একমত যে রোগের প্রতিরোধই শ্রেষ্ঠ পথ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বার্ধক্যে চোখে ছানি পড়া প্রহেলিকা হয়েই থেকে যাচ্ছে।

ছানি পড়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যান্ত্রিক, ভৌত বা রাসায়নিক। চোখের ভিতরে যে স্বচ্ছ লেন্স (lens) আছে, তার একটি আবরণী (capsule) আছে এবং ভিতরে প্রোটিন-বিশিষ্ট আঁশ (fibre) আছে। সেজন্য আবরণী বা ভিতরের আঁশের ক্ষতি হলে ধীরে ধীরে ছানি পড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এক বিশেষ ধরনের শর্করা জাতীয় পদার্থ, গ্যালাক্টোজ (galactose) রক্তে বাড়লে চোখে ছানি পড়ে। রক্তে এটি বাড়ে যদি শরীরে এক রকম এনজাইম (enyzime)-এর অভাব হয়। ষাট বছরের নিচের বয়সে যাদের ছানি পড়ে তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস রোগীরা সংখ্যায় অন্যদের তুলনায় তিন-চার-গুণ। ছানি পড়ার কারণ হিসাবে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক রশ্মিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে ধরা হয়। আয়োনাইজিং, মাইক্রোওয়েভ এবং ইনফ্রা-রেড রশ্মি যে লেন্স-এর ক্ষতি করে তা সবাই জানে, তবে আলট্রাভায়োলেট রে সম্বন্ধে এতদিন জোর দিয়ে কিছু বলা যায়নি। চোখের সামনের অংশে যে কর্নিয়া (cornea) নামক স্বচ্ছ পরদা আছে, তা অধিকাংশ আলট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে দেয় এবং কেবল ২৯৫ এন. এম. বা তার চেয়ে বড় আলোকরশ্মি-তরঙ্গকে ভিতরে যেতে দেয়; কিন্তু লেন্স ২৯৫-৪০০ এন. এম. রশ্মি-তরঙ্গকে শুষে নেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে ছানি পড়ার প্রাধান্য দেখা যায়, তার কারণ হিসাবে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে সন্দেহ করা হয়ে আসছে। আরও কতকগুলি কারণে এই রশ্মিকে সন্দেহ করা হয়; এই রশ্মি লেন্সকে কিছুটা হলদে করে এবং বৃদ্ধ বয়সে রঙ্গীন লেন্স আরও বেশি আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি শুষতে থাকে। আবার অন্যদিকে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিসম্বন্ধে এইরকম মতের বিরুদ্ধেও কিছু কিছু তথ্য আছে। একটি হলো, বেশি বয়সে ছানি-পড়া লেন্স-এর আবরণীতে লেন্স-এর চাইতে বেশি পরিবর্তন পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, পাঞ্জাবের মেঘভরা সমতলভূমিতে বসবাসকারী লোকদের চেয়ে আলোকোজ্জ্বল হিমালয় অঞ্চলের লোকদের ক্যাটার‍্যাক্ট বেশি হয় যদিও শেষোক্ত জায়গায় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির পরিমাণ বেশি। অবশ্য পরবর্তী কালের একটি সমীক্ষায় ছানি পড়ার সঙ্গে দারিদ্র্যের, পুষ্টির অভাবের এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সামঞ্জস্য দেখানো হয়েছে। আবার ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে এবং ইংলন্ডের অক্সফোর্ড অঞ্চলে (কিছুটা আশ্চর্যের ব্যাপার!) পাতলা দাস্ত হওয়ার আধিক্য (ডাইয়ারিয়া)-কে ছানি পড়ার কারণ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। সম্প্রতি অনেকক্ষণ ধরে সূর্যকিরণে থাকলে ছানি বেশি পড়ে, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে বহির্বায়ুমণ্ডলে রক্ষাকারী ওজোন (ozone) কমে যাওয়ার ফলে, আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি শুধু লেন্সকে নয়, রেটিনা (retina—চক্ষুবলের পিছনে যে স্নায়ু শিরাবাহিত পর্দা) এবং ত্বকের ক্ষতিসাধন করছে।

[British Medical Journal 3 June, 1989, pp. 1470-1471]

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

TRIBENI TISSUES LIMITED

2 LEE ROAD
CALCUTTA-700 020

Phone : 44-2281—85

★

UDBODHAN
Phone : 55-2447
DECEMBER 1989
WB/NC/CL-3
Postal Reg. No. WB/NC-19

রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা

বৃদ্ধ-আশ্রম

একটি আবেদন

সহৃদয় ও বদান্য জনসাধারণ, শিল্পপতি, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অকৃপণ দানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরিচালনাধীন উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র এই বৃদ্ধ-আশ্রমের ছয়তলবিশিষ্ট বাসগৃহটির দ্বিতল অবধি নির্মাণকার্য শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছু সংখ্যক বৃদ্ধজন ইতিমধ্যে তাতে আশ্রয় গ্রহণও করেছেন। গৃহটির ত্রিতলের নির্মাণকার্যও এগিয়ে চলেছে। যাঁদের অর্থদানে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এইটুকু পর্যন্ত করা সম্ভব হয়েছে, তাঁদের আজ আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

এক্ষণে অর্থাভাবে পূর্ণাঙ্গ গৃহটির নির্মাণকার্য ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য পুনরায় মহানুভব শিল্পপতি, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণ প্রভৃতির নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত হলে সর্বসাকুল্যে একশত জন বৃদ্ধ ব্যক্তি তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। আইনানুসারে আয়করমুক্ত দানের অর্থ "রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা"-র অনুকূলে এ/সি চেক/ড্রাফট পাঠালে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সাদরে গৃহীত হবে।

বৃদ্ধ-আশ্রমে প্রবেশেচ্ছু কোন ব্যক্তি "রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা"-র অনুকূলে একটি পাঁচ টাকার এ/সি ড্রাফট ও তার সংগে নিজের নাম-ঠিকানাযুক্ত এবং এক টাকার ডাকটিকিট দেওয়া একটি ২২ সে. মি. × ১০ সে. মি. খাম পাঠালে আবেদন ফর্ম ও নিয়মাবলী পাঠানো হবে।

রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা,
৫৯ মতিলাল গুপ্ত রোড
কলিকাতা-৭০০০০৮
ফোন : ৭৭-৭২২২

স্বামী গোপেশানন্দ
অধ্যক্ষ

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার এণ্ড সন্স
(কোন ব্রাঞ্চ নাই)
জুয়েলার্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০ ● ফোন : ২৮-৮৭১৩

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : ছত্রিশ টাকা □ সডাক বিয়াল্লিশ টাকা □ প্রতি সংখ্যা : পাঁচ টাকা
আজীবন গ্রাহকমূল্য : একহাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম [illegible] একশো টাকা)
সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ সংযুক্ত সম্পাদক : মী পূর্ণাত্মানন্দ

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
★ CALCUTTA ★

205/UDB/B
163081

GOPAL BOOK BINDING WORKS
CAL 23